বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ

দলিলপত্র : দশম খণ্ড

সশস্ত্র সংগ্রাম (২)

সম্পাদক : হাসান হাফিজুর রহমান

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য মন্ত্রণালয়

প্রকাশক	:	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তথ্য মন্ত্রণালয়-এর পক্ষে- গোলাম মোস্তফা হাক্কানী পাবলিশার্স বাড়ী # ৭, সড়ক # ৪ ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫ ফোন : ৯৬৬১১৪১, ৯৬৬২২৮২ ফ্যাক্স : (৮৮০২) ৯৬৬২৮৪৪ E-mail : info@paramabad.com
কপিরাইট	:	তথ্য মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রথম প্রকাশ	:	জুন, ১৯৮৪ আষাঢ়, ১৩৯১
পুনর্মুদ্রণ	:	ডিসেম্বর, ২০০৩ অগ্রহায়ণ, ১৪১০
পুনর্মুদ্রণ	:	জুন, ২০০৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৪১৬
প্রচ্ছদ	:	বকুল হায়দার
মুদ্রাকর	:	মো: আবুল হাসান হাক্কানী প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং সড়ক # ৯, লেইন # ২, বাড়ি # ১ ক # এ, সেকশন # ১১, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

HISTORY OF BANGLADESH WAR OF INDEPENDENCE
DOCUMENTS, VOL-10

Published by: Golam Mustafa
Hakkani Publishers
House # 7, Road # 4, Dhanmondi, Dhaka-1205
Tel: 9661141, 9662282, Fax: (8802) 9662844
E-mail: info@paramabad.com
On behalf of Ministry of Information
Government of the People's Republic of Bangladesh

Copyright: Ministry of Information
Government of the People's Republic of Bangladesh

Printed by: Md. Abul Hasan
Hakkani Printing & Packaging
Road # 9, Lane # 2, House # 1
Block # A, Sec. # 11, Mirpur, Dhaka-1216.
First Published: June, 1984
Reprint: December, 2003
Reprint: June, 2009

ISBN: 984-433-091-2(set)

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ

দলিলপত্র : দশম খণ্ড

সচিব
তথ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা, বাংলাদেশ

পুনর্মুদ্রণ প্রসঙ্গে

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় ১৯৭৭ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস লিখন ও মুদ্রণ প্রকল্প গ্রহণ করে। পরবর্তীকালে এই প্রকল্প স্বাধীনতা যুদ্ধ সংক্রান্ত দলিল ও তথ্যসমূহ প্রকাশনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা ও বস্তুনিষ্ঠতা রক্ষা করা ও বিকৃতির আশংকা এড়িয়ে যাবার জন্যই ইতিহাস রচনার পরিবর্তে দলিল ও তথ্য প্রকাশকেই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়েছে। আর সে প্রকল্পের ফসলই "বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র"। প্রায় ১৫,০০০ পৃষ্ঠায় ১৫ খন্ডে এসব দলিলপত্র প্রণয়ন করে ১৯৮২ সালে তা প্রকাশ করা হয়। এই প্রকল্পের সঙ্গে জড়িত গবেষক ও সম্পাদকবৃন্দের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল এই দলিলপত্র গ্রন্থমালা।

প্রথম প্রকাশের পরপরই বস্তনিষ্ঠতা ও নিরপেক্ষতায় "বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র" গ্রন্থমালা সর্বমহলে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়।

এই গ্রন্থমালা প্রকাশের অল্প সময়ের মধ্যেই এর সমুদয় কপি বিক্রি হয়ে যায়। পরবর্তীকালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ সংক্রান্ত সকল গবেষণায় এই গ্রন্থমালা রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে।

"বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র" গ্রন্থমালার চাহিদা উত্তরোত্তর বাড়ছে। বিভিন্ন মহল থেকে তথ্য মন্ত্রণালয়ে গ্রন্থমালার চাহিদাপত্র আসতে থাকায় মন্ত্রণালয় "বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র" গ্রন্থমালা সীমিত সংখ্যায় পুনর্মুদ্রণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা শেষে পুনর্মুদ্রণের দায়িত্ব অর্পণ করা হয় দেশের প্রখ্যাত প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান "হাক্কানী পাবলিশার্স" কে। পুনর্মুদ্রণের ক্ষেত্রে তথ্যের কোন ব্যত্যয় বা ব্যতিক্রম যাতে না হয়, সে ব্যাপারে সর্বাত্মক সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। গত দুই দশকে প্রকাশনা প্রযুক্তিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। ফলে পুনর্মুদ্রিত দলিলপত্রের অঙ্গসৌষ্ঠব আরও সুন্দর ও দৃষ্টিনন্দন হয়েছে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, "বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র" গ্রন্থমালার সংস্করণটি বরাবরের মতই পাঠক ও গবেষকদের কাছে আদৃত হবে।

ঢাকা
ডিসেম্বর ২০০৩

(নাজমুল আলম সিদ্দিকী)
ভারপ্রাপ্ত সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য মন্ত্রণালয়
প্রেস-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নং-তম/প্রেস-১/২/এফ-২/৯৭/বিবিধ-১/৯৬৯ তারিখ : ৩০ অক্টোবর ২০০৩

প্রেরক : অঞ্জলী রানী চক্রবর্তী
সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রেস-১)

প্রাপক : জনাব গোলাম মোস্তফা
স্বত্বাধিকারী
মেসার্স হাক্কানী পাবলিশার্স
মমতাজ প্লাজা (৪র্থ তলা)
ধানমন্ডি, ঢাকা।

বিষয়ঃ "বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র (১৫ খণ্ড)" পুনর্মুদ্রণের নিমিত্তে প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জার নমুনা অনুমোদন।

সূত্র : তাঁর ০৮ অক্টোবর ২০০৩ তারিখের আবেদন।

মহোদয়,

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত আবেদনের সাথে প্রাপ্ত নমুনা অনুযায়ী প্রচ্ছদ, প্রিন্টার্স লাইন ও অঙ্গসজ্জা মোতাবেক বিষয়োক্ত গ্রন্থাবলী চূড়ান্ত মুদ্রণের অনুমোদন প্রদান করা হলো। মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্বাচিত / অনুমোদিত প্রচ্ছদ নির্দেশক্রমে এতদ্ সাথ ফেরত প্রদান করা হলো।

সংযুক্তি : বর্ণনা মোতাবেক।

আপনার বিশ্বস্ত

(অঞ্জলী রানী চক্রবর্তী)
সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রেস-১)

প্রকাশকের কথা

প্রতিটি দেশ বা জাতির জন্য তার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস একটি অমূল্য সম্পদ। সে আলোকে বাংলাদেশের ১৯৭১ সনের স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং তৎপূর্বের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস আমাদের কাছে এক গৌরবময় সম্পদ। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস প্রণয়নের জন্য ১৯৭৭ সনে তৎকালীন সরকার বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস লিখন ও মুদ্রণ প্রকল্প গ্রহণ করে। নিরপেক্ষতা ও যথার্থতা বজায় রাখার জন্য স্বাধীনতা সংগ্রাম ও স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলাদি সংগ্রহ ও যাচাইপূর্বক তা সংকলন করা হয়। তারই ফলশ্রুতি 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র'' গ্রন্থাবলী। বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় ১৯৮২ সনে ১৫ খন্ডে এই গ্রন্থাবলী প্রকাশ করে । এ উদ্দেশ্যে গঠিত কমিটির সম্মানিত সদস্যগণের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল এই গ্রন্থাবলী।

এই গ্রন্থাবলী প্রকাশ হওয়ার অল্প দিনের মধ্যে তার পুরো স্টক ফুরিয়ে যায়। এই গ্রন্থাবলী স্বাধীনতা যুদ্ধ বিষয়ক সকল গবেষণা কর্মের গুরুত্বপূর্ণ রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং হবে। কিন্তু স্টক না থাকায় বাংলাদেশের বর্তমান জনগোষ্ঠীর একটি বৃহৎ অংশ আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস জানা থেকে দীর্ঘদিন যাবৎ বঞ্চিত রয়েছে এবং দুস্প্রাপ্যতা অনেক গবেষণা কর্মে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে।

এমতাবস্থায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র গ্রন্থাবলী পুনর্মুদ্রণের সিদ্ধান্তটি অত্যন্ত সময়োপযোগী বলে আমরা মনে করি।

বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এ রকম একটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ কর্মকান্ডের দায়িত্ব আমাদেরকে অর্পণ করায় আমরা গৌরবান্বিত। এই ভিত্তিতে গ্রন্থাবলীর বিষয়সূচি সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত রেখে নতুন আঙ্গিকে নির্ভুলভাবে পুনর্মুদ্রণের আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। আশা করি, পুনর্মুদ্রিত গ্রন্থাবলী পাঠক-গবেষকদের চাহিদা মেটাতে সক্ষম হবে।

বিশাল এই কর্মকান্ডে যাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, আমরা তাঁদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

০৭ ডিসেম্বর ২০০৩

স্বা:/-
(গোলাম মোস্তফা)
স্বত্বাধিকারী
হাক্কানী পাবলিশার্স

মুখবন্ধ

বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস প্রকল্পের নয় সদস্যবিশিষ্ট প্রামাণ্যকরণ কমিটির তরফ থেকে এই দলিল সংগ্রহের প্রকাশনা সম্পর্কে দুটি কথা নিবেদন করছি। এ প্রকল্পের উৎপত্তি ও গঠন, এর মূল উদ্দেশ্য ও কার্যপ্রদ্ধতি সম্পর্কে ভূমিকায় বিস্তারিত বলা হয়েছে।

বিপুলায়তন ও সংগৃহীত উপাত্ত থেকে প্রকাশিতব্য দলিলসমূহ নির্বাচনে কমিটির সদস্যবৃন্দ নিরপেক্ষ ভূমিকা পালনে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন । তাঁরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে দলিলাদির পান্ডুলিপি ধৈর্য ধরে পরীক্ষা করেছেন, বিস্তারিত আলোচনা-সমালোচনার মাধ্যমে সংযোজন ও সংশোধনের জন্য মূল্যবান উপদেশ দিয়ে প্রকল্প বাস্তবায়নে সহায়তা করেছেন। আমাদের কোন মন্তব্য ছাড়াই দলিলগুলো সরাসরি পাঠক ও গবেষকদের কাছে উপস্থিত হচ্ছে। দলিলপত্র যথাসম্ভব মূলসূত্র থেকে উদ্ধারের চেষ্টা করা হয়েছে। প্রকাশিত দলিলগুলো প্রামাণ্যকরণ কমিটি অনুমোদন করে দিয়েছেন।

প্রায় সাড়ে তিন লাখ পৃষ্ঠাব্যাপী দলিল থেকে প্রাথমিক নির্বাচনের গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন প্রকল্পে নিয়োজিত বিভিন্ন গবেষকবৃন্দ। তাঁরা প্রথমে জনাব হাসান হাফিজুর রহমানের নেতৃত্বে এবং পরে প্রফেসর কে, এম, মহসীনের তত্ত্বাবধানে এ দায়িত্ব যথাযথ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সংগে পালন করেছেন।

প্রামাণ্যকরণ কমিটির সকল সদস্যকে এবং প্রকল্পের গবেষকবৃন্দকে তাঁদের প্রশংসনীয় ভূমিকার জন্য আমি অশেষ ধন্যবাদন জানাই। সেই সঙ্গে প্রয়াত বাংলাদেশের বিশিষ্ট কবি ও সাংবাদিক জনাব হাসান হাফিজুর রহমানকে তাঁর বিশেষ অবদানের জন্য শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি।

বিভিন্ন সূত্রে সংগৃহীত ও সুবিবেচনার সাথে নির্বাচিত দলিলগুলো থেকে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের একটি সার্বিক, প্রামাণ্য ও নিরপেক্ষ চিত্র রেরিয়ে আসবে, আমরা এ আশা পোষণ করছি সংগৃহীত সমুদয় দলিল একটি স্থায়ী আর্কাইভস্ গঠনে সহায়তা করবে। অনুদঘাটিত ও অনাবিস্কৃত দলিলগুলো ভবিষ্যতে সংগৃহীত হলে পরিশিষ্টের মাধ্যমে সেগুলি মূল দলিলের সংগে সংযোজিত হতে পারে।

প্রকাশিত দলিলগুলো পাঠক সমাজ ও গবেষকদের কাছে সমাদৃত হলে আমাদের শ্রম সার্থক বলে মনে করব।

২৫ জুন,
১৯৮৪

মফিজুল্লাহ কবীর
চেয়ারম্যান
প্রামাণ্যকরণ কমিটি,
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস প্রকল্প।

ভূমিকা

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়সীমা ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত। এই সময়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সংগে সম্পর্কিত সারা বিশ্বে যা কিছু ঘটেছে তার তথ্য ও দলিলপত্র সংগ্রহ এবং সেসবের ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস রচনা ও মুদ্রণের দায়িত্ব অর্পিত হয় মুক্তিযুদ্ধ ইতিহাস লিখন ও মুদ্রণ প্রকল্পের ওপর। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে এই প্রকল্পটি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এর কাজ শুরু হয় ১৯৭৮ সালের জানুয়ারী থেকে (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

ইতিহাস রচনার দায়িত্বপ্রাপ্ত হলেও এই প্রকল্প স্বাধীনতা যুদ্ধসংক্রান্ত দলিল ও তথ্যসমূহ প্রকাশনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এর কারণ, সমকালীন কোন ঘটনার বিশেষ করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের মতো একটি যুগান্তকারী ঘটনার ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা ও বস্তুনিষ্ঠতা রক্ষা করা এবং বিকৃতির সম্ভাবনা এড়িয়ে যাওয়া বস্তুত অত্যন্ত দুরূহ। এ জন্যই আমরা ইতিহাস রচনার পরিবর্তে দলিল ও তথ্য প্রকাশকেই অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছি। এর ফলে দলিল ও তথ্যাদিই কথা বলবে, ঘটনার বিকাশ ও ধারাবাহিকতা রক্ষা করবে, ঘটনা পরম্পরার সংগতি রক্ষা করবে।

এই লক্ষ্য সামনে রেখেই কয়েকটি খন্ডে সংগৃহীত দলিলসমূহ প্রকাশের সিদ্ধান্ত প্রকল্প গ্রহণ করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রকল্পের সামনে একটি বিশেষ বিবেচ্য বিষয় দেখা দেয় এই যে, দলিলপত্র সংগ্রহের সময়সীমা স্বাধীনতা যুদ্ধকেন্দ্রিক হওয়া সত্ত্বেও এ সত্যও সমান গুরুত্বপূর্ণ যে, স্বাধীনতা যুদ্ধের পশ্চাতে বিরাট পটভূমি রয়েছে। স্বাধীনতা যুদ্ধকে এই পটভূমি থেকে বিচ্ছন্ন করে দেখা যায় না। এই পটভূমির ঘটনাবলী- যাকে মুক্তিসংগ্রাম বলে অভিহিত করা যায়- তার অনিবার্য পরিণতিই স্বাধীনতা যুদ্ধকে অবশ্যম্ভাবী করে তোলে। তাই মুক্তিসংগ্রামের স্বরূপ জানা ছাড়া স্বাধীনতা যুদ্ধকে তুলে ধরা সম্ভবই নয়। এই পরিস্থিতিতে স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল প্রকাশের সংগে এর পটভূমি সংক্রান্ত দু'খণ্ড দলিলসংগ্রহ প্রকাশের সিদ্ধান্ত প্রকল্প গ্রহণ করে। এর ফলে প্রকল্পের দলিল প্রকাশের পরিকল্পনা নিম্নরূপে দাঁড়ায় :

প্রথাম খণ্ড	ঃ	পটভূমি (১০৫-১৯৫৮)
দ্বিতীয় খণ্ড	ঃ	পটভূমি (১৯৫৮-১৯৭১)
তৃতীয় খণ্ড	ঃ	মুজিবনগর : প্রশাসন
চতুর্থ খণ্ড	ঃ	মুজিবনগর : প্রবাসী বাঙালীদের তৎপরতা
পঞ্চম খণ্ড	ঃ	মুজিবনগর : বেতারমাধ্যম
ষষ্ঠ খণ্ড	ঃ	মুজিবনগর : গণমাধ্যম
সপ্তম খণ্ড	ঃ	পাকিস্তানী দলিলপত্র : সরকারী ও বেসরকারী
অষ্টম খণ্ড	ঃ	গণহত্যা, শরণার্থী শিবির ও প্রাসংগিক ঘটনা
নবম খণ্ড	ঃ	সশস্ত্র সংগ্রাম (১)
দশম খণ্ড	ঃ	সশস্ত্র সংগ্রাম (২)
একাদশ খণ্ড	ঃ	সশস্ত্র সংগ্রাম (৩)
দ্বাদশ খণ্ড	ঃ	বিদেশী প্রতিক্রিয়া : ভারত
ত্রয়োদশ খণ্ড	ঃ	বিদেশী প্রতিক্রিয়া : জাতিসংঘ ও বিভিন্ন রাষ্ট্র
চর্তুদশ খণ্ড	ঃ	বিশ্বজনমত
পঞ্চদশ খণ্ড	ঃ	সাক্ষাৎকার
ষোড়শ খণ্ড	ঃ	কালপঞ্জী, গ্রন্থপঞ্জী ও নির্ঘন্ট

চার

মূল পরিকল্পনায় ৭২০০ পৃষ্ঠা মুদ্রণের পরিকল্পনা থাকলেও সংগ্রহের পরিমাণ বিপুল হয়ে যাওয়ায় আমাদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে হয়। নতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রতিটি খণ্ড প্রায় ৯০০ পৃষ্ঠা, সর্বমোট ১৫০০০ পৃষ্ঠার মধ্যে সংগ্রহগুলির মুদ্রণ সম্পন্ন করার বাজেট বরাদ্দ অনুমোদিত হয়। এই ভিত্তিতে আমাদের কাজ এগিয়ে যায়।

দলিল ও তথ্যাদি সংগ্রহের ব্যাপারে নীতিমালা আমরা ব্যাপক ও খোলামেলা রেখেছি। তবে পটভূমি সম্বন্ধে দলিল ও তথ্যাদি গ্রহণে কিছুটা সংযত দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন করি। আমরা শুধু সেইসব তথ্য ও দলিলই পটভূমি খন্ডে সন্নিবেশিত করার সিদ্ধান্ত নিই, যা বাংলাদেশের বর্তমান ভূখন্ডের বৈশিষ্ট্য ও এখানে বসবাসকারী জনগণের আশা আকাঙ্খার সংগে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। অর্থাৎ যেসব ঘটনা, আন্দোলন ও কার্যকরণ, এই ভূখন্ডের জনগণকে মুক্তিসংগ্রামের দিকে উদ্বুদ্ধ ও পরিচালিত করেছে, প্রধানত সেসব সংক্রান্ত দলিল ও তথ্যই এই খন্ডে কালানুক্রমিকভাবে সাজানো হয়েছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা বাংলাদেশের অতীত ঘাঁটতে বহু দূর-অতীতে প্রত্যাবর্তন করিনি। ১৯০৫ সালের বংগভংগ থেকেই পটভূমি সংক্রান্ত দলিল-তথ্যাদি-সন্নিবেশন শুরু করি। আমরা মনে করি, বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ব্যাখ্যায় এই শুরুর সীমাটি বাহুল্যবর্জিত, প্রত্যক্ষ ও যুক্তিগ্রাহ্য।

১৯০৫-এর বংগভংগ এবং তা রদ-এর পর ১৯৪০ সাল পর্যন্ত মধ্যবর্তী এ দীর্ঘ সময়ের আর কোন দলিল এ খন্ডে সন্নিবেশ করা হয়নি। কারণ ১৯১১ থেকে ১৯৪০ পর্যন্ত এই ভূখন্ডে অনুষ্ঠিত সকল রাজনৈতিক আন্দোলন সর্বভারতীয় বৃটিশবিরোধী আন্দোলনের অন্তর্ভূক্ত ছিল। ১৯৪০ সালে গৃহীত লাহোর প্রস্তাবে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রীয় সত্তারূপে বাংলার প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা নিহিত ছিল। আর তা উত্থাপন করেছিলেন বাংলাদেশেরই সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠীর অবিসংবাদিত নেতা এ, কে, ফজলুল হক। ১৯৪৬ সালে নিতান্ত অবৈধভাবে দিল্লী কনভেনশনে লাহোর প্রস্তাবের যে সংশোধনী করা হয়, তাতে বাংলার স্বতন্ত্র রাষ্ট্রীয়রূপের প্রশ্নকে পরিহার করা হয়। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগ সম্পর্কে মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা ঘোষণার পর স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা হয়, কিন্তু সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং যেভাবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয় তাতে স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হয়। এরই পরিণতিতে পরবর্তীকালে বাংলাদেশের জনগণের সম্মুখে স্বায়ত্ত্বশাসন তথা স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করা ঐতিহাসিক প্রয়োজন হয়ে দেখা দেয়। এই ঐতিহাসিক প্রয়োজনকে মূর্ত করে তুলেছে এমন সমস্ত দলিলই এ খন্ডে সন্নিবেশিত হয়েছে।

পটভূমি সংক্রান্ত দলিলপত্র দুটি খন্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডটি শেষ হয়েছে ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খানের ক্ষমতা দখলের সময়সীমায়। এখানে কাল বিভাজন করা হয়েছে একান্তই খণ্ড পরিকল্পনার পৃষ্ঠাসংখ্যার সুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখে- কোন বিশেষ ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে নয়।

পটভূমির বেলায় যে ধরনের দলিল ও তথ্যাদি আমরা গ্রহণ করেছি সেগুলি হলো গেজেট বিজ্ঞপ্তি, পার্লামেন্টের কার্যবিবরণী, কোর্টের মামলা সম্পর্কিত রিপোর্ট ও রায়, কমিশন রিপোর্ট, রাজনৈতিক দলের কর্মসূচী ও প্রস্তাব, জনসভার প্রস্তাব, আন্দোলনের রিপোর্ট, ছাত্রদলের প্রস্তাব ও আন্দোলন, গণপ্রতিক্রিয়া, সংবাদপত্রের প্রতিবেদন, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের প্রামাণ্য সমীক্ষা ও প্রবন্ধ, রাজনৈতিক পত্র, সরকারী নির্দেশ ও পদক্ষেপ ইত্যাদি। স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল ও তথ্যাদির বেলায় সংগ্রহের ধরন বিস্তৃততর হয়েছে স্বাভাবিকভাবেই। কারণ এই যুদ্ধের সংগে সারা বিশ্ব জড়িত হয়ে পড়েছিল। ফলে কেবল বাংলাদেশের অভ্যন্তরে নয়, সারা বিশ্বের বিষয়াদি জোগাড় করা অপরিহার্য হয়ে দেখা দেয় এবং প্রকল্প সেভাবেই অগ্রসর হয়। এ ব্যাপারে ব্যক্তিগত ডায়েরী, চিঠিপত্র, সাক্ষাৎকার, স্মৃতিকথা, সরকারী নথিপত্র, রণকৌশল ও যুদ্ধসংক্রান্ত লিপিবদ্ধ তথ্যাদি, মুক্ত এলাকায় মুক্তিবাহিনী ও বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসনিক তৎপরতা, জনসাধারণের সক্রিয় অংশগ্রহণ, কমিটি গঠন, বিবৃতি, বিশ্বজনমত, বিভিন্ন দেশের পালামেন্টের কার্যবিবরণী প্রভৃতি নানা ধরনের তথ্য ও দলিল এই সংগ্রহের অন্তর্ভূক্ত করা হয়। এ ক্ষেত্রে আমরা বিশেষভাবে নজর রেখেছি যাতে সর্বসাধারণের মনোভাব প্রতিফলনে কোন ফাঁক না থাকে। এই লক্ষ্য সামনে রেখে গণসহযোগিতার প্রতিস্তরের তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করা হয়েছে। প্রতিটি খন্ডে যতদূর সম্ভব মূল দলিল সন্নিবেশিত করার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়েছে। তবে যেসব দলিল ঐতিহাসিক গুরুত্ব অর্জন করেছে এবং যেগুলি বাদ দিলে ঘটনার ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয় না সেগুলি আমরা প্রকাশিত সূত্র থেকে গ্রহণ করেছি।

পাঁচ

এ কাজে একটিই আমাদের প্রধান বিবেচ্য ছিল, সঠিক ঘটনার সঠিক দলিল যেন সঠিক পরিমাণে বিন্যস্ত হয়। আমাদের কোন মন্তব্য নেই, অঙ্গুলি সংকেত নেই, নিজস্ব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণও নেই। আমরা বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ মনোভাব আগাগোড়া বজায় রাখার চেষ্টা করেছি। এই মূল লক্ষ্য সামনে রেখেই দলিল-তথ্যাদি বাছাই, সম্পাদনা এবং বিন্যাস করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে আমরা শুধু এইটুকু সতর্কতা অটুট রেখেছি যাতে কারো প্রতিনিধিত্ব ক্ষুণ্ণ না হয়। দলিলের যথার্থতাই যার যা ভূমিকা ও গুরুত্ব তা যথাযথভাবে তুলে ধরবে। বস্তুত জনসাধারণই এ ধরনের ঘটনার প্রকৃত মহানায়ক। জনসাধারণের মধ্যে অবস্থা পরিবর্তনের ইচ্ছা যখন পরিণত ও অপ্রতিরোধ হয়ে ওঠে, কেবল তখনই জনগনের মধ্য থেকে যোগ্যতম নেতৃত্বের অভ্যুদয় ঘটে। বাংলাদেশের বেলাতেও তাই ঘটেছে। আর তাই এমন সব দল বা সংগঠনের দলিল অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যে দল বা সংগঠন আমাদের জাতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে হয়তো মুখ্য ভূমিকা বা নেতৃত্ব গ্রহণ করেনি। তবু একাত্তরের অনেক আগেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা চিন্তা একটা দেশের একটা জাতির নিদিষ্ট লক্ষ্যাভিসারী অন্তঃস্রোতকেই সামনে তুলে ধরে। আসলে মহীরুহের চারপাশে জেগে ওঠা অজস্র গাছপালা নিয়েই বনের গঠন-কাঠামো। বনকে জানতে হলে এর সবটাই জানা দরকার।

তবে ব্যাপক প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে সবটুকু হয়তো প্রতিফলিত নাও হয়ে থাকতে পারে। এর দুটো কারণ, প্রথমত গ্রন্থের সীমিত পরিসরে স্থান সঙ্কুলানের প্রশ্ন, দ্বিতীয়ত অনেক তথ্য ও দলিল হাতে না আসা যা বহুক্ষেত্রে যোগাযোগ করেও পাওয়া যায়নি, কিছু ক্ষেত্রে যোগাযোগেরও সুযোগ ঘটেনি। সবাইকে আমরা জায়গা দিতে চেয়েছি এবং ভূমিকা অনুযায়ী গুরুত্ব বিধানের দিকেও লক্ষ্য রেখেছি- এইটেই মূল কথা। এই নীতি পটভূমি ও অন্যান্য খন্ডে একইভাবে অনুসৃত হয়েছে।

সাড়ে তিন লাখ পৃষ্ঠার মতো দলিল ও তথ্যাদি সংগ্রহসংখ্যা দিক থেকে বিপুল বলতে হবে। তবু আমাদের ধারণা এই যে, বহু দলিল ও তথ্য এখনো সংগ্রহের বাইরে রয়েছে। বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি লোকই কোন না কোন ভাবে স্বাধীনতা যুদ্ধের সংগে জড়িত ছিলেন। গ্রামে গ্রামে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বহু ঘটনার উদ্ভব হয়েছে, বহু বীরত্বগাথা, বহু ত্যাগ, বিশ্বাসঘাতকতা, অত্যাচার, নিপীড়নের কাহিনী স্তরে স্তরে গড়ে উঠেছে। এর পরিমাণ অনুধাবন করা কঠিন। তাছাড়া সারা বিশ্ব জুড়েও ছিল এ সম্পর্কে সমর্থন ও প্রতিক্রিয়া এবং প্রবাসী বাঙালীদের ব্যাপক তৎপরতা। তাই সংগ্রহের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে তা বলা যায় না। দেশ ও বিদেশের তথ্য সংগ্রহের কাজ তাই কেবল বাড়তে পারে, শেষ সীমায় পৌছানোর ঘোষণা দেয়া এখনই সম্ভব নয়। এর জন্য দীর্ঘ পরিক্রমা ও সক্রিয়তার প্রয়োজন।

সীমিত সময়ের জন্য আমাদের প্রকল্পের আয়ু; তদুপরি আমাদের লোকবলও মাত্র চারজন। এই অবস্থায় এই বিশাল কাজের কতখানি বাস্তবায়ন সম্ভব তা ভাববার বিষয়। তবু আমরা অসাধ্য সাধনের লক্ষ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম এবং যতদূর সফল হয়েছি তাতে স্বাধীনতা যুদ্ধসংক্রান্ত তথ্য ও দলিলের ভিত্তিভূমি রচিত হয়েছে, নির্দ্বিধায় এ কথা বলা যায়। এখন এর বিকাশ ও উন্নয়নের অপেক্ষা রাখে মাত্র। তথ্য ও দলিল সংগ্রহ করতে গিয়ে আমাদের যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে এ কথা বলা যায়।

দলিলপত্র সংগ্রহের ক্ষেত্রে আমাদের প্রচেষ্টা ছিল ব্যাপক এবং খোলামেলা। ব্যক্তিগত যোগাযোগ ছাড়াও এ উদ্দেশ্যে আমরা বিভিন্ন সময়ে পত্রপত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেছি এবং মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পত্রপত্রিকার দপ্তর, গ্রন্থাগার এবং ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন শ্রেণীর জনগণের কাছে প্রেরণ করেছি কয়েক হাজার প্রশ্নমালা কিন্তু দুঃখজনকভাবে আশানুরূপ সাড়া মেলেনি। প্রতিটি রাজনৈতিক, ছাত্র, শ্রমিক এবং কৃষক সংগঠনের সাথেই যোগাযোগ করা হয়েছে- কিন্তু দলগতভাবে নয়, ব্যক্তিগতভাবে কেউ কেউ দিয়ে গেছেন নিজস্ব সংগ্রহের দলিলপত্র। আবেদনের জবাবে আশানুরূপ সাড়া না পাবার কারণ হিসেবে আমরা দুটি বিষয় লক্ষ্য করেছি : প্রথমত, ইতিহাসের গুরুত্ব সম্পর্কে অসচেতনতা, যার ফলে খুব কমসংখ্যক মানুষই দলিলপত্র সংগ্রহ বা সংরক্ষণ করে থাকেন এবং দ্বিতীয়, ভিত্তিহীন সংশয়- বিশেষ করে কারো কারো প্রতিক্রিয়ায় আমাদের মনে হয়েছে যে, ইতিহাস প্রণয়নের প্রচেষ্টাটি সরকারী হওয়ায় এর সততা ও বস্তুনিষ্ঠতা সম্পর্কে তাঁরা

যথেষ্ট সন্দিহান এবং ফলে দলিলপত্র প্রদানের মাধ্যমে পরিকল্পিত ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করার পরিবর্তে অপূর্ণাংগতার সম্ভাবনাকেই যেন তাঁরা মেনে নিয়েছেন। ব্যাপক ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে এই সমস্যা আমরা অনেকটা কাটিয়ে উঠেছি। সরকারী উদ্যোগের কারণে ইতিহাসের নিরপেক্ষতা সম্পর্কে যে আশঙ্কা, তা আমাদের দলিল খণ্ডগুলি নিরসন করবে বলে আমরা মনে করি।

এছাড়াও আমরা লক্ষ্য করেছি, এমন অনেকের কাছেই দলিল ও তথ্যাদি রয়েছে যা তাঁরা হাতছাড়া করতে রাজী নন। অনেকেই কিছু ছেড়েছেন, কিছু হাতে রেখে দিয়েছেন। আবার কারো কারো প্রত্যাশা, দলিলাদি পুরানো হলে সেগুলি অনেক বেশী লাভের উৎস হয়ে উঠতে পারে। আমরা মূল দলিলের ফটোকপি রেখে অনেককেই তাঁর মূল কপি ফেরত দিয়েছি। এ ক্ষেত্রেও অনেকেই ফটোকপি রাখারও সুযোগ দিতে রাজী হননি- অর্থাৎ তাঁর হাতের দলিলটি তিনি বেরই করেননি ভবিষ্যতের আশায়। সরকার দলিল সংগ্রহের ব্যাপারে কোন অর্ডিন্যান্স পাস করেননি। ফলে দলিল পাওয়ার জন্য আমরা ব্যক্তিগত অনুরোধ ও প্রয়াস চালাতে পারি, আইনগত চাপ সৃষ্টি করতে পারি না। অথচ এ কথাও সত্যি যে, স্বাধীনতাসংক্রান্ত দলিল মাত্রই জাতীয় ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ, তাকে ব্যক্তিগতভাবে বা প্রতিষ্ঠানগতভাবে কুক্ষিগত করে রাখা উচিত নয়।

এই সংগে আমরা দুঃখের সংগে উল্লেখ করি যে, এই প্রকল্প শুরু হবার আগেই স্বাধীনতা যুদ্ধের বিশিষ্ট নেতাদের অনেককে আমরা হারিয়েছি। ফলে তাঁদের কাছে রক্ষিত দলিলপত্র পাওয়ার কিংবা তাঁদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের সুযোগ থেকে আমরা বঞ্চিত হয়েছি।

এইসব বাধাবিঘ্নের মধ্যেই আমাদের এগিয়ে যেতে হয়েছে। ফলে আমাদের এতদসংক্রান্ত যে বুনিয়াদ তৈরী হয়েছে তা অতীতের ত্রুটি সংশোধনে এবং ভবিষ্যতের সম্ভাবনার ক্ষেত্রে প্রস্তুত করতে সহায়ক হতে পারে। যে তথ্যগত ফাঁক থেকে যাচ্ছে তা পূরণ হওয়া দরকার। সম্ভব হলে অপ্রকাশিত দলিলপত্র থেকে কিংবা ভবিষ্যতে আরো দলিলপত্র সংগৃহীত হলে তা থেকে নির্বাচন করে অতিরিক্ত খণ্ড প্রকাশ করে এই ফাঁক পূরণের চেষ্টা করা যাবে। দেশে-বিদেশের দুষ্প্রাপ্য দলিল সংগ্রহের চেষ্টা অব্যাহত রাখা একান্ত জরুরী বলেই আমরা মনে করি। এ ধারা ক্ষুণ্ন হলে এ কাজ দুরূহতর হবে, এমনকি এটা সম্পূর্ণ করা অসম্ভব হয়ে উঠতে পার। এ ব্যাপারে স্থায়ী কর্মসূচী সুফলদায়ক হবে সন্দেহ নেই।

দলিল এবং তথ্য প্রামাণ্যকরণের জন্য সরকার নয়-সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রামাণ্যকরণ কমিটি গঠন করেন (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ প্রফেসর মফিজুল্লাহ কবীর এই প্রামাণ্যকরণ কমিটির চেয়ারম্যান।

কমিটির সদস্যরা হলেন :

ডঃ সালাহউদ্দীন আহমদ, প্রফেসর, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
ডঃ আনিসুজ্জামান, প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।
ডঃ সফর আলী আকন্দ, পরিচালক, ইনস্টিটিউট অফ বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী।
ডঃ এনামুল হক, পরিচালক, ঢাকা যাদুঘর।
ডঃ কে, এম, করিম, পরিচালক, জাতীয় আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার।
ডঃ কে, এম, মহসীন, সহযোগী প্রফেসর, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
ডঃ শামসুল হুদা হারুন, সহযোগী প্রফেসর, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
জনাব হাসান হাফিজুল রহমান, সদস্য-সচিব।

প্রকল্পের কর্মীবৃন্দ নির্দিষ্ট গ্রন্থের জন্য দলিলাদি বাছাই করে প্রামাণ্যকরণ কমিটির সামনে পেশ করেন। প্রামাণ্যকরণ কমিটি সেগুলি নির্ভুল ও গ্রহণযোগ্য কি না তা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যাচাই করেন। কমিটির সর্বসম্মত সিদ্ধান্তানুযায়ী যে সকল দলিল ও তথ্য প্রামাণ্য বলে গ্রহীত হয়, কেবলমাত্র সেগুলিই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। গ্রন্থের জন্য পেশকৃত দলিলাদির কিছু কিছু কমিটি নাকচ করেন; কিছু নতুন দলিল ও তথ্য যা গ্রন্থের উৎকর্ষের জন্য নেহাৎ জরুরী তা সংগ্রহের জন্য নির্দেশ দেন। প্রকল্পের পক্ষ থেকে তাঁদের এই নির্দেশ যথাসাধ্য পালন করা

হয়েছে। তবে এ-ক্ষেত্রে অনেক সময় প্রকল্পকে বেশ দুরূহ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। একেই লোকবল নগণ্য, তার ওপর স্বাভাবিক কাজ সেরে নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য দলিলের সন্ধানে প্রকল্পের কর্মীদের হিমশিম খেতে হয়েছে। তবুও কর্মীরা লেগে থেকেছেন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সফলও হয়েছেন। তবে সংগ্রহ যথাসময়ে হয়তো হয়নি, অনেক সময় গড়িয়ে গেছে। ফলে খণ্ডবিশেষে সংযোজন অধ্যায় যোগ করতে হয়েছে। বিশেষভাবে পটভূমি খণ্ড সংকলনে এই পরিস্থিতি প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ১৯০৫ সালের মূল গেজেট বিজ্ঞপ্তিটি পাওয়া যাচ্ছিল না। পটভূমি খন্ডের জন্য আমরা প্রামাণ্য গ্রন্থ থেকে এই বিজ্ঞপ্তিটি উদ্ধৃত করি। কিন্তু প্রামাণ্যকরণ কমিটি যতদূর সম্ভব মূল দলিল সংকলনের পক্ষপাতী। তাই মূল দলিল সংগ্রহের চেষ্টা নতুনভাবে নেয়া হয়। ঢাকা গেজেটে এই বিজ্ঞপ্তি ছাপা হয়নি। কোলকাতা গেজেটেও নয়। ইতিমধ্যে পটভূমি খণ্ডটি প্রেসে চলে যায়। এই গেজেটের ফাইল লোকচক্ষুর অন্তরালে ছিল, হঠাৎ অন্য কাগজের স্তূপের ভেতর ধূলিধূসরিত অবস্থায় পাওয়া যায়। তমিজুদ্দিন খানের রীট আবেদনের মূল দলিল খুঁজতে গিয়ে অপরিসীম পরিশ্রমের পরও তা পাওয়া যায়নি। এর মূল কপি সিন্ধু হাইকোর্টে রয়েছে। আনা সম্ভব হয়নি। সুতরাং তা উদ্ধৃতির আকারেই গিয়েছে। এ থেকে প্রামাণ্যকরণ কমিটির সংকলনের কাজ নিখুঁত ও সুষ্ঠু করার জন্য অটল আগ্রহ ও আন্তরিকতাই ব্যক্ত হয়। প্রকল্পের কর্মীরাও তাঁদের এই অনুভূতির যথাসাধ্য মর্যাদা দিয়েছেন; তাঁদের নির্দেশাবলী বাস্তবায়নে কসুর করেননি, প্রায় ক্ষেত্রেই সফল হয়েছেন। পটভূমি খন্ডে দলিলসমূহ কালানুক্রম অনুযায়ী সাজানো হয়েছে। অন্যান্য খন্ডের দলিলের বেলাতেও কমবেশী এই নীতি অনুসৃত হয়েছে। প্রতিটি খন্ডেই নির্ঘন্ট ও কালপঞ্জী দেয়া হয়েছে। শেষ খন্ডে গ্রথিত হচ্ছে সকল খন্ডের নির্ঘন্ট এবং কালপঞ্জী; ফলে পাঠকদের পক্ষে কোন খন্ডে কী আছে তা একনজরে জানা সম্ভব হবে।

প্রামাণ্যকরণ কমিটির সিদ্ধান্ত ছিল দলিলসমূহ মূল যে ভাষায় আছে তাতেই ছাপা হবে; কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এতে বিশেষ অসুবিধে দেখা দেয়। বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় মূল দলিলগুলি আমরা সংকলনে স্থান দিয়েছি। তাছাড়া উর্দু, হিন্দী, আরবী ও রুশ ভাষার বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ দলিল অনুবাদসহ সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। স্কান্দেনেভীয়, ফরাসী, জার্মান, জাপানী ও ইন্দোনেশীয় প্রভৃতি ভাষায় বেশ কিছু দলিল ও তথ্য থাকা সত্ত্বেও তার অনুবাদ করা এবং গ্রন্থে সেসবের স্থান দেয়া এখনও সম্ভবপর হয়নি। এগুলি ভবিষ্যতের জন্যে জমা রইল। প্রাসঙ্গিকতা ও পরিসরের কথা বিবেচনা করে কোন কোন দলিল সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে, তবে সে ক্ষেত্রে আমরা বিশেষভাবে লক্ষ্য রেখেছি যাতে মূলের বিকৃতি না ঘটে।

বর্তমানে আমাদের সংগ্রহে প্রায় সাড়ে তিন লাখ পৃষ্ঠার দলিল ও তথ্যাদি জমা হয়েছে। এর ভেতর ১৫ হাজার পৃষ্ঠা ছাপা হচ্ছে। বাকি দলিল ও তথ্যাদি ছাপার বাইরে রয়ে যাবে। এছাড়া সংগ্রহের প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকায় আরও দলিলপত্র সংগৃহীত হবে। এগুলির গুরুত্বও কম নয়। অর্থাৎ এগুলির ওপর গবেষণা করা এবং তার ওপর ভিত্তি করে প্রকল্প-প্রকাশিত খণ্ডগুলির বাইরেও নতুন তথ্য সংবলিত মুক্তিসংগ্রাম ও স্বাধীনতা যুদ্ধ সংক্রান্ত গ্রন্থ প্রকাশের সম্ভাবনা অবারিত থেকে যাবে। এ সুযোগ সম্প্রসারিত করা দেশ ও জাতির স্বার্থেই একান্ত অপরিহার্য। কারণ এ সম্পর্কে যত বেশী বস্তুনিষ্ঠ তথ্যাদি জাতি জানতে পারবে আমাদের অগ্রযাত্রা তত বেশী নির্ভুল ও সচ্ছল হবে। তাছাড়া এ আমাদের অনন্ত অনুপ্রেরণার উৎস; তাই এ সম্পর্কিত প্রতিটি ছত্র পরম যত্ন, দায়িত্ব ও আগ্রহে সংরক্ষিত করা দেশ ও সরকারের নৈতিক কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। বস্তুত প্রায় প্রতিটি আত্মসচেতন দেশই তাদের অভ্যুদয়ের সঙ্গে জড়িত ঘটনাবলী সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য স্থায়ী আর্কাইভস প্রতিষ্ঠা করে থাকেন এবং এ সংগ্রহের কাজ ও এর ওপর গবেষণার কর্মসূচী অব্যাহত রাখেন। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম ও স্বাধীনতা যুদ্ধের ব্যাপারে এ সম্ভাবনার বাস্তবায়ন করার সুযোগ সৃষ্টি সমানভাবে দরকার- বিশেষভাবে এ কারণে যে, এ সংগ্রামে এ দেশের সর্বস্তরের জনসাধারণ অংশগ্রহণ করেছিলেন, যত দিন যাবে তাদের সংগে যোগাযোগ তত বৃদ্ধি পাবে, নতুন নতুন তথ্য আর্কাইভস-এর সংগ্রহ সমৃদ্ধতর করতে থাকবে। এ সুযোগ বিনষ্ট করা দুর্ভাগ্যজনক ছাড়া আর কিছুই বলা যাবে না।

প্রকল্পের বিপুল পরিমাণ দলিল ও তথ্যাদি সংগ্রহের কাজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দিয়ে যাঁরা আমাদের সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। এ পর্যায়ে কিছু প্রতিষ্ঠান, সংগঠন, ব্যক্তি ও কর্মীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ঢাকা যাদুঘর, বাংলা একাডেমী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরী, বাংলাদেশ অবজারভার লাইব্রেরী, দৈনিক বাংলা লাইব্রেরী, জাতীয় সংসদ লাইব্রেরী এবং

জাতীয় আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার বিভিন্নভাবে আমাদেরকে সাহায্য করেছেন। বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট, চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় যাদুঘর এবং দিনাজপুর কালেকটরেট হতেও আমরা কিছু দলিল ও তথ্যাদি পেয়েছি। এছাড়া তথ্য মন্ত্রণালয়, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয় গ্রন্থাগার এবং সামরিক গোয়েন্দা পরিদপ্তর (ডি, এম, আই)-এর সৌজন্যে বহুসংখ্যক দলিল-দস্তাবেজ আমরা সংগ্রহ করতে পেরেছি। তাঁদের সক্রিয় সহযোগিতার জন্য আমরা তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

ব্যক্তিগত উদ্যোগে ও ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে অনেকে দলিলপত্র দিয়ে প্রকল্পকে সাহায্য করেছেন। তাঁদের মধ্যে কিছু নাম এখানে উল্লেখ করা খুবই সংগত মনে করছি। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী কিছুসংখ্যক মূল্যবান দলিল প্রকল্পকে দিয়েছেন। বিদেশে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন এবং মার্কিন কংগ্রেসের বহুসংখ্যক দলিল এ, এম, এ, মহিতের সৌজন্যে আমরা পেয়েছি। প্রবাসে বাংলাদেশ আন্দোলনের সংগে জড়িত অনেকে তাঁদের দলিলপত্র প্রকল্পকে দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে মরহুমা রাশীদা রউফ, আজিজুল হক ভূইয়া, ডঃ এনামুল হক, আমীর আলী, সাখাওয়াত হোসেন ও জহিরউদ্দীন আহমদের নাম উল্লেখযোগ্য। বিদেশ হতে কিছু মূল্যবান দলিল পাঠিয়েছেন মাহমুদুল হক এবং খোন্দকার ইব্রাহিম মোহাম্মদ। মুজিবনগর সরকার এবং স্বাধীন বাংলা বেতারের দলিলপত্র সংগ্রহের ক্ষেত্রে যাদের সাহায্য-সহযোগিতার কথা আমরা বিস্মৃত হব না তাঁরা হলেন হাসান তৌফিক ইমাম, মওদুদ আহমদ, মাঈদুল হাসান, আবদুস সামাদ, দেবব্রত দত্তগুপ্ত, শামসুল হুদা চৌধুরী ও আলমগীর কবীর। পটভূমি পর্যায়ের কিছু গুরুত্বপূর্ণ দলিল দিয়ে সাহায্য করেছেন বদরউদ্দীন উমর, কাজী জাফর আহমদ, অজয় রায়, ইসমাইল মোহাম্মদ, যতীন সরকার, শেখ আবদুল জলিল, ডঃ সাঈদ-উর-রহমান এবং আমিনুল হক। ইসমত কাদির গামা, শামসুজ্জামান মিলন, উৎপল কান্তি ধর, স্বপন চৌধুরী ও রেজা মোস্তাক স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল ও তথ্যাদি দিয়েছেন। উল্লেখিত সকলকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এছাড়া আমাদের বিপুল সংগ্রহের বিরাট কর্মকান্ডের সংগে জড়িত রয়েছেন আরও অনেকে। এই স্বল্প পরিসরে তাঁদের প্রত্যেকের নাম উল্লেখ করা সম্ভব নয়। আমাদের আর্কাইভস-এর দলিল সংরক্ষণ খাতায় তাঁদের সকলের নাম দলিলাদির উৎস হিসেবে লিখিত রয়েছে। তাঁদেরকেও ধন্যবাদ।

দলিল ও তথ্যাদি সত্যতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে প্রামাণ্যকরণ কমিটির অবদান কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি। কমিটির সদস্যগণ পরম ধৈর্য, যত্ন ও আগ্রহ সহকারে দলিলাদির প্রাসঙ্গিকতা ও মূল্য বিচার করেছেন। তাঁরা শুধু দলিলাদির সত্যতা যাচাই করেননি, প্রকল্পের উন্নয়ন এবং বিশেষ করে খণ্ডসমূহের তথ্যসমৃদ্ধি ও সৌকর্য বৃদ্ধির জন্য মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে আমরা বিশেষভাবে কমিটির চেয়ারম্যান প্রফেসর মফিজুল্লাহ কবীরের কথা আন্তরিকভাবে সংগে স্মরণ করছি।

দলিল সংগ্রহ খণ্ড গুলির প্রকাশনার ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়কে ধন্যবাদ জানাই। এই সংগে বাংলাদেশ সরকারের মুদ্রণ বিভাগ এবং দি প্রিন্টার্স-এর প্রতিও আমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি।

সবশেষে আরও কয়েকজনের কথা বলতে হয়- স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলসংগ্রহ খণ্ডগুলির পেছনে রয়েছে যাঁদের অক্লান্ত শ্রম ও নিরলস সাধনা, তাঁরা এই প্রকল্পের চারজন গবেষক- সৈয়দ আল ঈমামুর রশীদ, আফসান চৌধুরী, শাহ আহমদ রেজা এবং ওয়াহিদুল হক। শুধুমাত্র চাকরির দায়িত্বে নয়- গবেষণার স্পৃহা ও প্রকল্পের কাজের সংগে একাত্মতায় তাঁরা দলিল ও তথ্যাদি সংগ্রহের কাজ হতে শুরু করে দলিলসমূহের সংগ্রহ, বাছাই, সম্পাদনায় সহায়তা, প্রেসকপি তৈরীকরণ, মুদ্রণ তত্ত্বাবধান-সর্ববিধ কাজ সীমিত ও সংকীর্ণ সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করেন। এছাড়া সুকুমার বিশ্বাস ও রতনলাল চক্রবর্তীর শ্রম ও নিষ্ঠার কথা উল্লেখযোগ্য। প্রশাসনিক দিক থেকে আবদুল হামিদের গভীর দায়িত্ববোধ এবং নিরলস তৎপরতা প্রকল্পের স্বাভাবিক কাজকর্ম অব্যাহত রাখতে সাহায্য করেছে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে যাঁরা আত্মহুতি দিয়েছেন, যাঁরা নির্যাতিত হয়েছেন, যাঁরা ত্যাগ স্বীকার করেছেন, সর্বব্যাপী প্রতিকূল পরিবেশে যাঁরা দেশপ্রেমের দীপশিখা অমলিন রেখেছেন, যাঁরা আমাদের কর্মের পথে প্রতি মুহূর্তের প্রেরণাস্বরূপ তাঁদের সকলের উদ্দেশে গভীর শ্রদ্ধা ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্রের এই সংগ্রহ আমরা দেশের মানুষের হাতে তুলে দিচ্ছি।

হাসান হাফিজুর রহমান
সম্পাদক

সংযোজন

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস প্রকল্পের সাবেক পরিচালক জনাব হাসান হাফিজুর রহমানের আকস্মিক মৃত্যুর পর তথ্য মন্ত্রণালয়ের দু'জন উপসচিব কিছুকাল প্রকল্পের দায়িত্বে ছিলেন এবং এরপর পরিচালকের দায়িত্ব আমার ওপর অর্পন করা হয়। হাসান হাফিজুর রহমানের জীবদ্দশায় প্রকল্পের কাজ সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে চলছিল তবে তিনি চার খন্ডের মুদ্রিত রূপ দেখে যেতে পেরেছিলেন আর ছয় খণ্ড মুদ্রণের জন্য প্রেসে পাঠানো হয়েছিল। এই প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য তাঁর আন্তরিক উৎসাহ ও নিরলস পরিশ্রমের কথা আমরা সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করছি।

স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসের দলিলপত্র সংকলন ও মুদ্রণের গুরুদায়িত্ব সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলে সচেতন ছিলেন। ফলে হাসান হাফিজুর রহমানের মৃত্যুর পর প্রকল্পের কাজের স্বাভাবিক গতি ব্যাহত হয়নি। প্রামাণ্যকরণ কমিটির গঠন পূর্বানুরূপ থাকে এবং এই কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত কোন বিষয় পরিবর্তন করা হয়নি। পূর্বে গৃহীত নীতির ভিত্তিতে এবং কর্মরত গবেষক ও অফিস কর্মচারীদের নিয়ে প্রকল্পের অবশিষ্ট কাজ চলতে থাকে। তবে প্রকল্পের জন্য নির্ধারিত সময়ের সীমাবদ্ধতার জন্য দলিল ও তথ্যাদি সংগ্রহ এবং সেগুলোর সম্পাদনা যুগপৎভাবে করতে হয়েছে বলে দলিল খণ্ডসমূহের ক্রম অনুযায়ী মুদ্রণের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা যায়নি। কোন কোন খন্ডের বিষয় সম্পর্কিত পর্যাপ্ত দলিল ও তথ্যপ্রাপ্তির বিলম্বই তার একমাত্র কারণ।

প্রামাণ্যকরণ কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত ভূমিকাটি পরবর্তী খণ্ডগুলিতেও অপরিবর্তিতভাবে সন্নিবেশ করা হয়েছে। আমাদের মূল লক্ষ্য ছিল সবগুলো দলিলখন্ডের মধ্যে গুণগত ও পদ্ধতিগত সামঞ্জস্য অক্ষুন্ন রাখা এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সকল খন্ডের মুদ্রণ ও প্রকাশনা সম্পন্ন করা। এ কাজ সুষ্ঠুভাবে করতে পারলেই দায়িত্ব পালনে আমরা সমর্থ হয়েছি বলে ভাবতে পারব।

কে এম মোহসীন

দলিল প্রসঙ্গঃ সশস্ত্র সংগ্রাম (২)

বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সশস্ত্র পর্যায়ের যাবতীয় কর্মকান্ডের দলিলসমূহ তিন খন্ডে বিভাজন করা হয়েছে। ভূমিকার চতুর্থ পৃষ্ঠায় এ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

বর্তমান সশস্ত্র সংগ্রাম (২) প্রস্তুত করা হয়েছে মুজিবনগর সরকার গঠনোত্তর কালে বাংলাদেশের বিভিন্ন সেক্টরের যুদ্ধ তৎপরতাকে কেন্দ্র করে। সাধারণভাবে জুন-জুলাই থেকে মধ্য ডিসেম্বরে হানাদার বাহিনীর চূড়ান্ত আত্মসমর্পণ পর্যন্ত সেক্টরে সেক্টরে সংগঠিত যুদ্ধের ধারা প্রতিরোধমূলক ছিল না, তা ছিল কেন্দ্রীয় কমান্ডের অধীন, সংগঠিত ও আক্রমণমুখী। মুজিবনগরে অনুষ্ঠিত সেক্টর কমান্ডারদের সম্মেলনে (পৃঃ ১-৬, ২০২-০৪) গৃহীত কার্যক্রমের পর বাংলাদেশের সশস্ত্র স্বাধীনতা যুদ্ব ক্রমশঃ এ রূপ গ্রহন করে। উল্লিখিত সময়ের যুদ্ধের বৈশিষ্টের জন্যেই সশস্ত্র সংগ্রাম (২)-এর এই পরিকল্পনা।

সশস্ত্র যুদ্ধেও বিবরণ সংগ্রহ ও সন্নিবেশ করা ছিল অত্যন্ত দুরূহ কাজ। যুদ্ধকালে সেক্টরসমূহের দৈনন্দিন ঘটনাবলীর ধারাবাহিক বিবরণ অনেক ক্ষেত্রে রক্ষিত হতে পারেনি। এ কারণে, যুদ্ধে যারা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত মুখ্যতঃ তাদের সাক্ষাৎকার, লিখিত প্রতিবেদন ও গ্রন্থ প্রভৃতিকে এখানে প্রাথমিক দলিল হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া, পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত বিবরণও কিছু এসেছে।

সাক্ষাৎকারগুলির বেশীরভাগ বাংলা একাডেমীর অংগীভূত জাতীয় স্বাধীনতার ইতিহাস পরিষদ (জুলাই,৭২-ডিসেম্বর, ৭৩)-এর উদ্যোগে গৃহীত। ২ ও ৩ নং সেক্টর কমান্ডারদ্বয়-ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ (পৃঃ ৭৩) ও মেজর জেনারেল কে, এম শফিউল্লাহ (পৃঃ ২০০)-এর সাক্ষাৎকারসহ কয়েকটি বাংলা একাডেমীর গবেষক জনাব সুকুমার বিশ্বাস ব্যক্তিগতভাবে গ্রহণ করেছিলেন। এগুলি এখানে সেক্টর অনুসারে বিন্যস্ত করা হয়েছে।

প্রথমে সেক্টর কমান্ডারদের সাক্ষাৎকার বা তাঁদের রচিত বিবরণসমূহের মাধ্যমে সেক্টরের ঘটনাবলী উন্মোচনের চেষ্টা করা হয়েছে, পরে পৃথক শিরোনামে সাব-সেক্টর কমান্ডারবৃন্দ এবং অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধাদের বক্তব্য সন্নিবেশ গোটা সেক্টরের ঘটনার ব্যাপকতা তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়া, স্বাধীনতাযুদ্ধের সংগঠক, অনিয়মিত গণবাহিনীর সদস্য বা ফ্রিডম ফাইটারদের (গেরিলা যোদ্ধা) সাক্ষাৎকার ও তাদের সম্বন্ধে প্রদত্ত বিবরণ এবং পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত বিরণের সাহায্যেও রণাংগনের ঘটনাপ্রবাহকে যথাসম্ভব আরও স্পষ্ট করে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এখানে ৭নং সেক্টর অধিনায়ক লেঃ কর্নেল (অবঃ) কাজী নুরুজ্জামানের সাক্ষাৎকার বা তাঁর নিজস্ব কোনো প্রতিবেদন দেওয়া সম্ভব হয়নি- সাক্ষাৎকার প্রাদানে তিনি অক্ষমতা জ্ঞাপন করছেন। যুদ্ধে তাঁর ভূমিকা সম্বন্ধে সাব-সেক্টর প্রধানদের প্রদত্ত বর্ণনায় (পৃঃ ৩৩৫-৩৬৭) জানা যাবে। অপরদিকে, বি-ডি-এফ-বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সংগঠিত তিন ব্রিগেড ফোর্স-এর অন্যতম 'জেড' ফোর্সে (পৃঃ ৪৭৬-৫০৯) এর মূল কমান্ডার জিয়াউর রহমান (পরবর্তীতে লেঃ জেনারেল ও রাষ্ট্রপতি)- এর সাক্ষাৎকারও সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি তাঁর অকালমৃত্যুর কারণে। এই ফোর্স কোন নির্দিষ্ট সেক্টরের অন্তর্গত না থাকাতে এ বিষয় আলাদা শিরোনামে (পৃঃ ৪৭৬) বিবৃত হয়েছে। এবং এ ব্যাপারে ঐ ব্রিগেডের সামরিক অফিসারদের প্রদত্ত বিবরণসমূহের ব্যাপক সাহায্যে নেওয়া হয়েছে। অন্য দুটি ব্রিগেড ফোর্স- 'কে' ফোর্স (পৃঃ ৭৩) এবং 'এস' ফোর্স (পৃঃ ২০০)- এর যুদ্ধ তৎপরতা ও গঠন সংক্রান্ত তথ্যাদি এসেছে এদের মূল কমান্ডারদ্বয়ের নিজস্ব বর্ণনায়।

বাংলাদেশের সশস্ত্র সংগ্রাম কেবল স্থলযুদ্ধেই সীমিত ছিল না, তা নৌ এবং বিমানযুদ্ধেও সম্প্রসারিত হয়েছিল। বাংলাদেশ নৌবাহিনীর গঠন ও তার অপারেশনসমূহের বিবরণ মিলবে সাক্ষাৎকার ভিত্তিক তথ্যরাজিতে (পৃঃ ৫১০-৫২১) এবং মুক্তাঞ্চল থেকে প্রাকাশিত পত্রিকার খবরে (পৃঃ ৫২১-৫২২)। অনুরূপ, বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর গঠন ও তার যুদ্ধ তৎপরতার সাক্ষ্য পাওয়া যাবে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী (বি-ডি-এফ)- এর তৎকালীন

বার

ডেপুটি চীফ অব স্টাফ এয়ার ভাইস মার্শাল এ, কে, খন্দকার (পৃঃ ৫২৩) এবং ক্যাপ্টেন আবদুস সাত্তার (পৃঃ ৫৬৮)- এর ভাষ্য। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে মেডিক্যাল কোর ও সিগন্যাল কোরও গঠন করা হয়েছিল। সীমিত আকারে হলেও এরা পৃথক সত্তা নিয়ে কর্মতৎপর। এদের তৎপরতা সম্বন্ধেও কিছু তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে যথাক্রমে ৫২৬ ও ৫২৮ পৃষ্ঠায়।

প্রত্যেক সেক্টরে মুক্তিবাহিনীর চূড়ান্ত পর্বের লড়াই সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন দেওয়া হয়েছে গোটা রণাংগনের পরিস্থিতি তুলে ধরার জন্য (পৃঃ ৫২৯-৫৩৭) এবং এর পরই পাক-ভারত যুদ্ধের বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে পূর্বাঞ্চলজুড়ে ভারতীয় মিত্র বাহিনীর যুদ্ধ তৎপরতার বিবরণ (ভারতীয় সূত্র থেকে আহরিত) সংযোজিত হয়েছে। ভারতীয় বাহিনী ও বাংলাদেশ বাহিনী মিলে গড়ে উঠেছিল এই কমান্ড। এদের যৌথ কার্যক্রম, হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে পরিচালিত এদের দ্রুত যৌথ সামরিক অভিযানগুলি এবং সে সবের সাফল্যজনক চূড়ান্ত পরিসমাপ্তি সম্বন্ধে সম্যক ধারণা পাওয়া যাবে এ বিবরণে।

সশস্ত্র সংগ্রামের পর্যায়ে বি-ডি-এফ-এর গঠন ছিল চূড়ান্ত নির্ধরক ঘটনা। সামগ্রিক যুদ্ধ স্ট্র্যাটেজি প্রণয়ন, রণক্ষেত্রকে বিভিন্ন সুবিধাজনক সেক্টরে বিভাজন, এবং এগুলিতে সৈনাধ্যক্ষ নিয়োগ, ব্রিগেড ফোর্স গঠন, নতুন সামরিক অফিসার ট্রেনিং ও তাদের নিয়োগ, নৌ ও বিমান বাহিনী গঠন, গণবাহিনী (ফ্রিডম ফাইটার) গঠন ও প্রশিক্ষণ প্রভৃতি যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল বি-ডি-এফ-এর নিয়ন্ত্রণাধীন। এ সম্বন্ধে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল আতাউল গণি ওসমানীর একটি পূর্ণাংগ সাক্ষাৎকার সংযোজিত হয়েছে এ খন্ডের পরিশিষ্টে (পৃঃ ৫৫৯)। স্বাধীনতার পরপরই গৃহীত ও তাঁরই সংশোধিত এ সাক্ষাৎকারটি বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সামগ্রিক প্রেক্ষিত উন্মোচনে প্রভূত সাহায্য করবে।

গণবাহিনী বলে পরিচিত গেরিলা মুক্তিযোদ্ধাদের ভূমিকা ছিল স্বাধীনতা যুদ্ধে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এ বাহিনী গড়ে উঠেছিল হাজার হাজার তরুণ ছাত্র-যুবক নিয়ে। সেক্টর-সাব-সেক্টরের আওতায় এরা প্রচন্ডভাবে সক্রিয় ছিল দেশের অভ্যন্তরে অবিরাম আঘাত হানার মাধ্যমে হানাদার বাহিনীকে প্রতিনিয়ত পর্যুদস্ত করার কাজে। তথ্যের স্বল্পতার দরুন এদের অপূর্ব সাহসিকতাপূর্ণ বিচিত্র ও বিশাল কর্মকান্ডের সামান্য অংশই বর্তমান খন্ডে প্রতিফলিত হয়েছে।

সাক্ষাৎকারগুলিতে বর্ণিত ঘটনাবলীর ধারাবাহিকতা ও কালানুক্রমিকতার ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়েছে, সম্পাদনায় অনেক ক্ষেত্রে বিশ্লেষণাত্মক বর্ণনা ও পুনারাবৃত্তি পরিহার করে শুধু ঘটনা পরিস্থিতিকে রাখা হয়েছে, এবং মুদ্রণ প্রমাদ এড়ানোর যথাসাধ্য প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। তবু অনিচ্ছাকৃত দু'একটি ত্রুটি রয়ে গেছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য, ১ নং সেক্টরের যুদ্ধ বর্ণনাকারীদের মধ্যে শামসুল ইসলাম-এর (পৃঃ ৬২) নাম অমুদ্রিত থেকে গেছে।

জাতীয় স্বাধীনতার সশস্ত্র লড়াইয়ের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ যেমনটি হয়ে থাকে, বলতে গেলে, বাংলাদেশের গোটা ভূখণ্ডই ছিল রণক্ষেত্রবিশেষ। বহু প্রথাগত সম্মুখ-যুদ্ধে ও সংঘর্ষে, বিস্তর অ্যামবুশে, গেরিলা, পদাতিক, নৌ কমান্ডো ও বৈমানিকদের বীরত্বপূর্ণ দুঃসাহসিক অভিযানে এবং তাদের বিপুল আত্মোৎসর্গে পরিপূর্ণ ছিল এ রণক্ষেত্র। এর প্রতিটি ঘটনার তথ্যোদ্ধার সুদীর্ঘকালীন প্রয়াসসাপেক্ষ। এখানে প্রকল্পের নির্দিষ্ট-কাল পরিসরে যে পরিমাণ তথ্য সংগ্রহ করা গেছে, তারই ভিত্তিতে গ্রন্থের সীমিত আয়তনের দিকে লক্ষ্য রেখে স্বধীনতা যুদ্ধের সশস্ত্র পর্বের ঘটনাকে সেক্টরে সেক্টরে বিন্যস্ত করে একটি প্রতিনিধিত্বশীল চিত্র উপস্থাপন করা হয়েছে।

পরিশিষ্ট

[এক]

The Bangladesh Gazette, Par II September 1, 1977, Page 503
Ministry of Information & Broadcasting.

*** *** ***

বিজ্ঞপ্তি

ঢাকা, ২৩শে আগস্ট ১৯৭৭

নং-তথ্য/৪ই-২৫/৭৭/৪১৪৮১-স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস রচনার উদ্দেশ্যে দৈনিক বাংলার প্রাক্তন সম্পাদক জনাব হাসান হাফিজুর রহমানকে তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত অফিসার পদে ১৯৭৭ সনের ১লা জুলাই হইতে জনস্বার্থে এক বৎসরের জন্য চুক্তি ভিত্তিতে নিয়োগ করা হইল।

২। চুক্তির শর্তানুযায়ী তিনি তাঁহার বেতন ও অন্যান্য সুবিধাদি পাইবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে-

আবদুস সোবহান

উপ-সচিব

পরিশিষ্ট

[দুই]

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING
DACCA

N. 51/2/78-Dev/231 Dated 18-7-1978

RESOLUTION

In connection with the Writing and Printing of the History of Bangladesh War of Liberation the Government have been pleased to constitute and Authentication Committee for the Project "Writing and Printing of a History of Bangladesh War of Liberation" with the following members :

1. Dr. Mafizullah Kabir	Pro-Vice Chancellor, Dacca University.
2. Professor Salahuddin Ahmed	Chairman, Department of History, Jahangirnagar University.
3. Dr. Safar Ali Akanda	Director, Institute of Bangladesh Studies, Rajshahi.
4. Dr. Enamul Huq	Director, Dacca Museum.
5. Dr. K. M. Mohsin	Associate Professor, Deptt. of History, Dacca University
6. Dr. Shamsul Huda Harun	Associate Professor, Deptt of Political Science, Dacca University.
7. Dr. Ahmed Sharif	Professor and Chairman, Deptt. of Bengali, Dacca University.
8. Dr. Anisuzzaman	Professor, Deptt. Bengali, Chittagong University
9. Mr. Hasan Hafizur Rahman	O.S.D., History of Bangladesh War of Liberation Project.

The following shall be the terms of reference of the Committee :

(a) To verify, endorse and authenticate the collected data and documents to be included in the History of Bangladesh War of Liberation.
(b) To determine validity and price of documents are required for the purpose.

Syed Asgar Ali
Section Officer.

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING
DACCA

N. 51/2/78-Dev/10493/(25) Dated 13-2-1979

RESOLUTION

In Partial modification of Resolution issued under No. 51/2/78-Dev/231. dated 18.7.78 Govt. have been pleased to reconstitute an Authentication Committee for the Project "Writing and Printing of a History of Bangladesh war of Liberation" with the following members :

1.	Dr. Mafizullah Kabir Pro-Vice Chancellor, Dacca University.	Chairman
2.	Prof. Salahuddin Ahmed Chairman, Deptt. of History, Jahangirnagar University.	Member
3.	Dr. Anisuzzaman Prof. Deptt. of Bengali, Chittagong University.	Member
4.	Dr. Safar Ali Akanda Director, Institute of Bangladesh Studies, Rajshahi.	Member
5.	Dr. Enamul Huq Director, Dacca Museum.	Member
6.	Dr. K. M. Mohsin Associate Professor, Deptt. of History, Dacca University.	Member
7.	Dr. Shamsul Huda Harun Associate Professor, Deptt. of Political Science, Dacca University.	Member
8.	Dr. K. M. Karim Director, National Library and Archives, Dacca.	Member
9.	Mr. Hasan Hafizur Rahman O.S.D., History of Bangladesh War of Liberation Project.	Member-Secratary

2. The following shall be the terms of reference of the Committee:
To verify, endorse and authenticate the collected data and documents to be included in the History of Bangladesh War of Liberation.
To determine validity and price of documents required for the committee.

M. A. Salam Khan
Section Officer

সূচীপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়		পৃষ্ঠা
১।	১নং সেক্টরে সংঘটিত যুদ্ধের বিবরণঃ	---	১
	-প্রতিবেদনঃ মেজর (অবঃ) রফিক-উল ইসলাম	---	১
	-১নং সেক্টরের কতিপয় গেরিলা অপারেশন	---	৪৩
২।	১নং সেক্টরে সংঘটিত যুদ্ধের আরও বিবরণ	---	৫৯
	-প্রতিবেদনঃ শামসুল ইসলাম		
	-সাক্ষাৎকারঃ মেজর মাহফুজুর রহমান	---	৬২
	-সাক্ষাৎকারঃ নায়েক সুবেদার মনিরুজ্জামান	---	৬৯
৩।	২নং সেক্টর ও ‘কে’ ফোর্সের যুদ্ধ বিবরণ	---	৭৩
	-সাক্ষাৎকার ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ	---	৭৩
৪।	২নং সেক্টরের যুদ্ধ সম্পর্কে অন্যান্যের প্রদত্ত বিবরণ	---	১৪৬
	-সাক্ষাৎকারঃ মেজর আইনউদ্দিন	---	১৪৬
	-Daturmura Theatre	---	১৪৮
	-সাক্ষাৎকারঃ মেজর গাফফার	---	১৫৩
	-সাক্ষাৎকারঃ মেজর ইমামুজ্জামান	---	১৭০
	-সাক্ষাৎকারঃ লেঃ কর্নেল মোস্তফা কামাল	---	১৭১
	-সাক্ষাৎকারঃ মেজর শহীদুল ইসলাম	---	১৭৩
	-সাক্ষাৎকারঃ ক্যাপ্টেন হুমায়ুন কবির	---	১৭৫
	-প্রতিবেদনঃ মেজর জাফর ইমাম	---	১৭৮
	-সাক্ষাৎকারঃ সুবেদার মেজর লুৎফর রহমান	---	১৮৪
	-সাক্ষাৎকারঃ সুবেদার আবদুল ওয়াহাব	---	১৯০
	-সাক্ষাৎকারঃ সুবেদার গোলাম আম্বিয়া	---	১৯৩
	-সাক্ষাৎকারঃ মেজর দিদার আতাউর হোসেন	---	১৯৪
৫।	৩নং সেক্টর ও ‘এস’ ফোর্সের যুদ্ধ বিবরণঃ	---	১৯৯
	-সাক্ষাৎকারঃ মেজর জেনারেল কে, এম, শফিউল্লাহ	---	১৯৯
৬।	৩ নং সেক্টরের যুদ্ধ সংক্রান্ত অন্যান্যের বিবরণ	---	২১৭
	-সাক্ষাৎকারঃ ব্রিগেডিয়ার এম, এ, মতিন	---	২১৭
	-সাক্ষাৎকারঃ লেঃ কর্নেল গোলাম হেলাল মুর্শেদ খান	---	২১৯
	-সাক্ষাৎকারঃ সিপাই আফতাব হোসেন	---	২২২
	-সাক্ষাৎকারঃ মেজর দোস্ত মোহাম্মদ শিকদার	---	২২৩

ক্রমিক নং	বিষয়		পৃষ্ঠা
	-সাক্ষাৎকারঃ মেজর শাসুল হুদা বাচ্চু	---	২২৩
	-প্রতিবেদনঃ মেজর এস, এ, ভূঁইয়া	---	২২৫
৭।	৪নং সেক্টরে সংঘটিত যুদ্ধের বিবরণঃ	---	২৩৫
	-সাক্ষাৎকারঃ ব্রিগেডিয়ার চিত্তরঞ্জন দত্ত	---	২৩৫
৮।	৪নং সেক্টরের যুদ্ধ সম্পর্কে অন্যান্যের প্রদত্ত বিবরণ	---	২৪৫
	-সাক্ষাৎকারঃ লেঃ কর্নেল মোহাম্মদ আবদুর রব	---	২৪৫
	-যুদ্ধের ডায়েরীঃ	---	২৫৮
	-সাক্ষাৎকারঃ মেজর ওয়াকিউজ্জামান	---	২৭৮
৯।	৫নং সেক্টরে সংঘটিত যুদ্ধের বিবরণ	---	২৮৩
	-সাক্ষাৎকারঃ লেঃ জেনারেল (অবঃ) মীর শওকত আলী	---	২৮৩
১০।	৫নং সেক্টরে সংঘটিত যুদ্ধ সম্পর্কে অন্যান্যের বিবরণ	---	২৮৮
	-সাক্ষাৎকারঃ মেজর তাহের উদ্দিন আখঞ্জি	---	২৮৮
	-সাক্ষাৎকারঃ মেজর এস এম খালেদ	---	২৯০
	-সাক্ষাৎকারঃ মোঃ রফিকুল আলম	---	২৯২
	-একটি অপারেশনের রিপোর্ট	---	২৯৪
	-সাক্ষাৎকারঃ নাজমুল আহসান মহিউদ্দিন আলগীর	---	২৯৬
১১।	৬নং সেক্টরের যুদ্ধ বর্ণনা	---	২৯৮
	-সাক্ষাৎকারঃ এয়ার ভাইস মার্শাল এম, কে, বাশার	---	২৯৮
১২।	৬নং সেক্টরের যুদ্ধ সম্পর্কে অন্যান্যের প্রদত্ত বিবরণ	---	৩০৩
	-সাক্ষাৎকারঃ লেঃ কর্নেল দেলোয়ার হোসেন	---	৩০৩
	-সাক্ষাৎকারঃ মেজর সুলতান শাহরিয়ার রশীদ	---	৩১০
	-সাক্ষাৎকারঃ সৈয়দ মনসুর আলী	---	৩১৩
	-সাক্ষাৎকারঃ সুবেদার মেজর মোঃ কাজিম উদ্দীন	---	৩১৪
	-সাক্ষাৎকারঃ মোঃ নুরুজ্জামান	---	৩১৮
	-সাক্ষাৎকারঃ লেঃ কর্নেল মতিউর রহমান	---	৩২১
	-সাক্ষাৎকারঃ মেজর মোঃ আবদুস সালাম	---	৩২৬
	মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি (প্রতিবেদন)	---	৩২৮
১৩।	৭নং সেক্টরে সংঘটিত যুদ্ধের বিবরণঃ	---	৩৩৪
	-যুদ্ধের ঘটনাপঞ্জীঃ ব্রিগেডিয়ার গিয়াসউদ্দিন চৌধুরী	---	৩৩৪
	-Reorganization of Troops at Rajshahi	---	৩৪২
	-সাক্ষাৎকারঃ মেজর (অবঃ) রফিকুল ইসলাম	---	৩৪৭

ক্রমিক নং	বিষয়		পৃষ্ঠা
১৪।	৭নং সেক্টরে সংঘটিত যুদ্ধের আরও বিবরণঃ	---	৩৫১
	-প্রতিবেদনঃ ডাঃ মাহবুবুল আলম	---	৩৫১
	-সাক্ষাৎকারঃ নায়েক মোঃ আমিনউল্লাহ	---	৩৫৪
	-সাক্ষাৎকারঃ হাবিলদার মোঃ ফসিহউদ্দিন আহমদ	---	৩৫৫
	-মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি (প্রতিবেদন)	---	৩৫৬
	-৭নং সেক্টরের মুক্তিবাহিনীর তৎপরতা	---	৩৫৬
	- Operation Avoya Bridge: বদিউজ্জামান	---	৩৬৪
১৫।	৮নং সেক্টরে সংঘটিত যুদ্ধের বিবরণঃ	---	৩৬৭
	-সাক্ষাৎকারঃ লেঃ কর্নেল এম, এ, ওসমান চৌধুরী	---	৩৬৭
	-সাক্ষাৎকারঃ লেঃ কর্নেল এম, এ মঞ্জুর	---	৩৬৯
১৬।	৮নং সেক্টরের যুদ্ধ সম্পর্কে অন্যান্যের বিবরণ	---	৩৭২
	-সাক্ষাৎকারঃ লেঃ কর্নেল মোস্তাফিজুর রহমান	---	৩৭২
	-সাক্ষাৎকারঃ তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী	---	৩৭৪
	-সাক্ষাৎকারঃ মেজর আবদুল হালিম	---	৩৭৬
	-সাক্ষাৎকারঃ মেজর অলীক কুমার গুপ্ত	---	৩৭৭
	-সাক্ষাৎকারঃ সুবেদার মেজর তবারকউল্লাহ	---	৩৭৯
	-সাক্ষাৎকারঃ নায়েক বুবেদার আবদুল মতিন পাটোয়ারী	---	৩৭৯
	-সাক্ষাৎকারঃ ক্যাপ্টেন আবদুল গনি	---	৩৮১
১৭।	৯নং সেক্টরে সংঘটিত যুদ্ধের বিবরণঃ	---	৩৮২
	-প্রতিবেদনঃ মেজর (অবঃ) এম, এ জলিল	---	৩৮২
১৮।	৯নং সেক্টরের যুদ্ধ সম্পর্কে অন্যান্যের বিবরণঃ	---	৪২২
	-সাক্ষাৎকারঃ মেজর মেহেদী আলী ইমাম	---	৪২২
	-সাক্ষাৎকারঃ লেঃ শামসুল আরেফিন	---	৪২৭
	-সাক্ষাৎকারঃ মোঃ নূরুল হুদা	---	৪২৯
	-সাক্ষাৎকারঃ শাসুল আলম তালুকদার	---	৪৩৫
	-সাক্ষাৎকারঃ ডাঃ মোহাম্মদ শাহজাহান	---	৪৪১
	-সাক্ষাৎকারঃ রাজিনা আনাসরী	---	৪৪২
	-সাক্ষাৎকারঃ স, ম, বাবর আলী	---	৪৪৩
	-সাক্ষাৎকারঃ ক্যাপ্টেন (অবঃ) নূরুল হুদা	---	৪৪৪
১৯।	১১নং সেক্টরে সংঘটিত যুদ্ধের বিবরণঃ	---	৪৪৮
	-সাক্ষাৎকারঃ লেঃ কর্নেল (অবঃ) আবু তাহের	---	৪৪৮

ক্রমিক নং	বিষয়		পৃষ্ঠা
	-কয়েকটি অপারেশনের বর্ণনা	---	৪৫১
২০।	১১নং সেক্টরের যুদ্ধ সম্পর্কে অন্যান্যের বিবরণঃ	---	৪৬০
	-সাক্ষাৎকারঃ মেজর আবদুল আজিজ	---	৪৬০
	-সাক্ষাৎকারঃ সুবেদার মেজর জিয়াউল হক	---	৪৬৩
	-সাক্ষাৎকারঃ সুবেদার মোসলেহউদ্দিন আহমদ	---	৪৬৫
	-সাক্ষাৎকারঃ মিজানুর রহমান খান	---	৪৬৬
	-সাক্ষাৎকারঃ লেঃ কর্নেল এম, এ, মান্নান	---	৪৬৭
	-১১ নং সেক্টরের যুদ্ধের আরও বিবরণ	---	৪৭২
২১।	'জেড' ফোর্স গঠন ও তার যুদ্ধ ও তৎপরতাঃ	---	৪৭৬
	-সাক্ষাৎকারঃ মেজর অলি আহমদ	---	৪৭৬
	-সাক্ষাৎকারঃ মেজর আমিন আহমদ চৌধুরী	---	৪৭৭
	-সাক্ষাৎকারঃ ক্যাপ্টেন মাহবুবুর রহমান	---	৪৮৯
	-সাক্ষাৎকারঃ ক্যাপ্টেন আবদুল কাইয়ুম চৌধুরী	---	৪৯১
	-সাক্ষাৎকারঃ মেজর বজলুল গনি পাটোয়ারী	---	৪৯৫
	-সাক্ষাৎকারঃ মেজর মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন	---	৪৯৬
	-সাক্ষাৎকারঃ ক্যাপ্টেন হাফিজউদ্দিন আহমদ	---	৪৯৮
	-সাক্ষাৎকারঃ মেজর আবদুল হালিম	---	৫০৪
	-সাক্ষাৎকারঃ মেজর সৈয়দ মুনিবুর রহমান	---	৫০৫
	-ইস্ট বেঙ্গলের গর্বঃ চিলমারী যুদ্ধ (প্রতিবেদন)	---	৫০৮
২২।	বাংলাদেশ নৌবাহিনী গঠন ও তার যুদ্ধ তৎপরতা	---	৫১০
	-সাক্ষাৎকারঃ মোঃ রহমতউল্লাহ	---	৫১০
	-সাক্ষাৎকারঃ বদিউল আলম	---	৫১৪
	-On the Water fronts-Spectacular Achievements	---	৫২১
	- Marine Commandos' Vital Blow	---	৫২১
২৩।	বাংলাদেশ বিমান বাহিনী গঠন ও তার যুদ্ধ তৎপরতাঃ	---	৫২৩
	-সাক্ষাৎকারঃ এয়ার ভাইস মার্শাল আবদুল করিম খোন্দকার	---	৫২৩
২৪।	বিভিন্ন সেক্টরে চিকিৎসা তৎপরতা	---	৫২৬
	-সাক্ষাৎকারঃ কর্নেল মোহাম্মদ শামসুল হক	---	৫২৬
২৫।	বিভিন্ন সেক্টরে যোগাযোগ তৎপরতাঃ	---	৫২৮
	-সাক্ষাৎকারঃ মেজর এম, এইচ, বাহার	---	৫২৮

ক্রমিক নং	বিষয়		পৃষ্ঠা
২৬।	চূড়ান্ত পর্যায়ে সংঘটিত যুদ্ধের বিবরণ	---	৫২৯
	-প্রতিবেদনঃ মেজর (অবঃ) রফিকুল ইসলাম	---	৫২৯
২৭।	মিত্র বাহিনীর তৎপরতা ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্য (প্রতিবেদন)	---	৫৩৮
	পরিশিষ্ট-		
২৮।	স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর রণনীতি ও রণকৌশলঃ		
	-জেনারেল এম, এ, জি ওসমানীর বিশেষ সাক্ষাৎকার	---	৫৫৯
	সংযোজন-		
২৯।	বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর তৎপরতার আরও বিবরণ	---	৫৬৮
	-প্রতিবেদনঃ ক্যাপ্টেন আবদুস সাত্তার	---	৫৬৮
৩০।	নির্ঘন্ট	---	৫৭১

শিরোনাম	সুত্র	তারিখ
১। ১নম্বর সেক্টরে সংঘটিত যুদ্ধের বিবরণ	'লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে' - মেজর (অবঃ) রফিক-উল-ইসলাম বীর উত্তম, ঢাকা, ১৯৮১	.... ১৯৭১

বিলম্বিত কনফারেন্স

১০ই জুলাই আমি আগতলা থেকে ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের একখানি বিমানে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। পথে গৌহাটিতে আধ ধন্টার জন্য থেমে রাত সাড়ে আটটার দিকে কলকাতার আকাশে পৌছে গেলাম। নীচে তখন মুষলধারায় বৃষ্টির সাথে বেগে বাতাস বইছিলো। এহেন দুর্যোগে কয়েকবার চেষ্টা করার পর আমাদের বিমান রানওয়ে স্পর্শ করলো। ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে আমার চার ঘন্টার কষ্টকর যাত্রা শেষ হলো। রাত তখন ৯টা।

অচেনা কলকাতায় আমি সম্পূর্ণ অপরিচিত আগন্তুক। বিমান বন্দরের ভবনে কিছুক্ষণ পায়চারী করার পর একটা ট্যাক্সি ভাড়া করলাম। শিখ ড্রাইভারকে বললাম বাংলাদেশ আর্মি হেডকোয়ার্টারে নিয়ে যেতে। কিন্তু রাতে আর্মি হেডকোয়ার্টার খুঁজে পেলাম না। তখন ড্রাইভারকে মাঝারি ধরনের একটি হোটেলে নিয়ে যেতে বললাম।

বহুদিনের পরিচর্যার অভাবে আমার চুল, দাড়ি সমানে বেড়ে উঠেছিলো। পায়ে ক্যাম্বিশের জুতো জোড়া ছেঁড়া ও ময়লা, গায়ে বেঢপ মাপের জামাটিও আকারে বেশ বড়, পরনে ট্রাউজার এং হাতে কিছু সরকারী কাগজপত্র ভর্তি একটি কাপড়ের থলে, এই ছিলো আমার সেদিনকার সর্বাঙ্গীণ চেহারা। শিখ ড্রাইভার নিশ্চয়ই আমার সাথে রসিকতা করে থাকবে। সে আমাকে একটি ব্যয়বহুল হোটেলে পৌঁছে দিলো। হোটেলে ঢুকতেই অনুভব করলাম রিসেপশন রুমটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। আমি যেন হঠাৎ করে দারুণ একটা আঘাত পেলাম। মনের অজান্তেই হাত বাড়িয়ে আমার থলেটি স্পর্শ করলাম। সেখোনে উপস্থিত সুন্দর বেশভূষায় সজ্জিত পুরুষ ও মহিলাদের বিস্মিত দৃষ্টির মুখে আমি বেশ অপ্রস্ত্তত হয়ে পড়লাম। মুহূর্তে হতভম্ব ভাবটা কাটিয়ে রিসেপশনিষ্টকে জিজ্ঞাস করলাম, “একটা রুম পাওয়া যাবে কি?” ভদ্রলোক আড়চোখে আমার পা থেকে মাতা পর্যন্ত একটু জরিপ করে নিলেন।আমার জুতো, ট্রাইজার, শার্ট, থলে, দাড়ি কোন কিছুই তার দৃষ্টি এড়ালো না। তারপর কিছুটা কৌতুহলের হাসি ফুটিয়ে প্রশ্ন করলেন, “আপনি কি...?” “হ্যাঁ, আমি বাংলাদেশ থেকে এসেছি”, সাথে সাথে জবাব দিলাম।

পরদিন সকালে হোটেল ত্যাগ করলাম। কিন্তু এক রাতের ভাড়া হিসাবে পকেটে যা ছিল অর্ধেকটা বেরিয়ে গেছে। বাংলাদেশ বাহিনীর হেডকোয়ার্টারে যাওয়ার সারাটা পথে আমি শুধু সেই শিখ ড্রাইভারকে অভিসম্পাত করছিলাম।

১১ই থেকে ১৭ই জুলাই পর্যন্ত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো। সম্মেলনের আলোচনা সকালে শুরু হয়ে শেষ হতো রাতে। সেখানে সকল সেক্টর কমান্ডারই উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনে আমরা নানা ধরনের সমস্যা এবং সমন্বিত ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্পর্কে আলোচনা করি। উল্লেখ্য যে, তখন পর্যন্ত আমাদের চিন্তার কিংবা কাজের কোন সমন্বয় ছিলো না।

কলকাতা ৮ নম্বর থিয়টার রোডের ভবনটিতে আমরা মিলিত হয়েছিলাম। এটা ছিলো বিএসএফ-এর অফিস। যুদ্ধের সময় বাংলাদেশ সরকারকে এটি ব্যবহার করতে দেয়া হয়েছিলো।

একাত্তরের মার্চে রফিক-উল-ইসলাম সাবেক ইপিআর সেক্টর হেডকোয়ার্টার, চট্রগ্রামে ক্যাপ্টেন পদে সেক্টর এ্যাডজুটেন্টের দায়িত্ব পালন করছিলেন।

আমাদের প্রথম অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন জনাব তাজউদ্দীন আহমদ। বাংলাদেশ বাহিনীর কমান্ডার-ইন-চীপ কর্নেল (অবঃ) এম, এ, জি, ওসমানী প্রথম দিনের অধিবেশনে যোগ দিতে পারেননি।

১২ই জুলাই দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে ছিলেনঃ
১। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ।
২। কর্নেল (অবঃ) এম, এ, জি, ওসমানী।
৩। লেঃ কর্নেল এম, এ, রব।
৪। গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ, কে, খন্দকার।
৫। মেজর (অবঃ) নূরুজ্জামান।
৬। মেজর সি, আর, দত্ত।
৭। মেজর জিয়াউর রহমান।
৮। মেজর কে, এম, সফিউল্লাহ।
৯। মেজর খালেদ মোশাররফ।
১০। মেজর মীর শওকত আলী।
১১। উইং কমান্ডার এম, কে, বাশার।
১২। মেজর ওসমান চৌধুরী।
১৩। মেজর রফিক-উল-ইসলাম।
১৪। মেজর নাজমুল হক।
১৫। মেজর এম, এ, জলিল।
১৬। মেজর এ, আর, চৌধুরী।

দশ দিনব্যাপী সম্মেলনে যুদ্ধের বিভিন্ন দিক, বিভিন্ন ধরনের সমস্যা এবং ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করি। এই বৈঠকে লেঃ কর্নেল এম, এ, রব বাংলাদেশ বাহিনীর চীফ-অব-স্টাফ এবং গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ, কে, খন্দকার ডেপুটি চীফ-অব-স্টাফ নিযুক্ত হন।

সম্মেলনে গুরুত্বপূর্ণ যেসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিলো তা হচ্ছেঃ

১। বিভিন্ন সেক্টরের সীমানা নির্ধারণ।

২। নিম্নলিখিতভাবে গেরিলা যুদ্ধের আয়োজনঃ

(ক) নির্ধারিত এলাকায় নির্দিষ্ট দায়িত্ব দিয়ে পাঁচ অথবা দশজনকে নিয়ে গঠিত ট্রেনিংপ্রাপ্ত গেরিলা দলকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পাঠানো হবে।

(খ) গেরিলাদের শ্রেণীবিভক্তিঃ

অ্যাকশন গ্রুপঃ এই গ্রুপের সদস্যরা শত্রুর বিরুদ্ধে সরাসরি গেরিলা হামলা পরিচালনা করবে। তারা শতকরা ৫০ থেকে ১০০ ভাগ হাতিয়ার বহন করবে।

গোয়েন্দা সেনাঃ এই গ্রুপের গেরিলারা সাধারণতঃ সংঘর্ষে জড়িত হবে না। এরা শত্রুপক্ষের খবরাখবর সংগ্রহ করবে। এদের সাধারণতঃ শতকরা ৩০ ভাগের বেশী অস্ত্র থাকবে না।

গেরিলা ঘাঁটিঃ প্রতিটি ঘাঁটিতে গেরিলাদের থাকা-খাওয়ার জন্য কয়েকটি নিরাপদ গৃহের ব্যবস্থা থাকবে যেখান থেকে যথাযথ খবরপ্রাপ্তির পরই পরবর্তী লক্ষ্যস্থলে তারা পৌঁছতে পারবে। প্রত্যেক ঘাঁটিতে একটি করে মেডিক্যাল গ্রুপ থাকবে যারা প্রয়োজনে গেরিলাদের চিকিৎসা করবে। প্রত্যেক ঘাঁটিতে একজন রাজনৈতিক নেতার দায়িত্ব থাকবে। এদের দায়িত্ব ছিলো বিভিন্ন কর্মপদ্ধতির মাধ্যমে পাকিস্তানীদের মানসিকভাবে দুর্বল করে দেয়া এবং একই সংগে বাঙ্গালীরা যেন মানসিক সাহস ও শক্তি হারিয়ে না ফেলে সেদিকে লক্ষ্য রাখা। শত্রুর বিরুদ্ধে বড় ধরনের আক্রমন পরিচালনার উদ্দেশ্যে আরো বেশীসংখ্যক গেরিলা কিংবা নিয়মিত বাহিনীর সৈনিকদের স্থান সংকুলানের জন্য প্রতিটি ঘাঁটিকে তৈরী রাখাও এদের দায়িত্ব ছিল।

৩। নিয়মিত বাহিনীর সদস্যদের অবিলম্বে ব্যাটালিয়ন ফোর্স এবং সেক্টর ট্রুপস-এর ভিত্তিতে সংগঠিত করতে হবে।

৪। শত্রুর বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানে নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে যুদ্ধ পরিচালনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

(ক) প্রতিটি সুবিধাজনক স্থানে শত্রুর বিরুদ্ধে রেইড এবং অ্যামবুশের মাধ্যমে আঘাত হানার জন্য বিপুলসংখ্যক গেরিলাকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

(খ) শিল্প প্রতিষ্ঠান চালু রাখতে দেয়া হবে না। বিদ্যুতের খুঁটি, সাবস্টেশন প্রভৃতি উড়িয়ে দিয়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ অচল করার মাধ্যমে এ কাজ করতে হবে।

(গ) পাকিস্তানীদেরকে কোন কাঁচামাল কিংবা উৎপাদিত পণ্য রফতানী করতে দেয়া হবে না। এসব জিনিস যেসব গুদামে থাকবে সেগুলো ধ্বংস করে দিতে হবে।

(ঘ) শত্রুপক্ষের সৈন্য ও সামরিক সরঞ্জাম আনা-নেয়ার জন্য ব্যাবহারযোগ্য বাহন রেলপথ, নৌযান পরিকল্পিতভাবে ধ্বংস করতে হবে।

(ঙ) রণকৌশলগত পরিকল্পনা এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে যাতে শত্রুরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়তে বাধ্য হয়।

(চ) শত্রুদের ছত্রভঙ্গ করার পরে তাদেও বিচ্ছিন্ন গ্রুপগুলোর ওপর গেরিলারা মরণপণ আঘাত হানবে।

বিভিন্ন সেক্টর এবং ফোর্স পুনর্গঠনের কাজে ইপিআর-এর ভূমিক ছিলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায়ে ইপিআর বাহিনীর কাছ থেকেই বাংলাদেশ সরকার প্রায় সমুদয় অস্ত্র ও গোলাবারুদের ব্যাবস্থা করেছিলো। শুধু তাই নয়, প্রথম থেকেই বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে তারাই প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলো। ইপিআর-এর অয়্যারলেস সেট এবং যানবাহন ব্যাপকভাবে কাজে লেগেছিলো। মুক্তিযুদ্ধে ইপিআর-এর সিগন্যালরা এবং ড্রাইভাররা খুবই গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে।। সেই দুর্দিনে স্বাধীনতার জন্য নিবেদিত প্রাণ ড্রাইভাররা শত্রুপক্ষের তুমুল গোলাবৃষ্টির মধ্য দিয়ে আমাদের সৈন্য ও রসদ বহন করে দৃঢ় মনোবল ও সাহসিকতার অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টন্ত স্থাপন করেছে।

আমাদের এই সম্মেলনে বাংলাদেশকে এগারোটি সেক্টরে বিভক্ত করা হয়।

১ নম্বর সেক্টরঃ চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং নোয়াখালী জেলার অংশবিশেষ নিয়ে (মুহুরী নদীর পূর্ব এলাকা) এই সেক্টর গঠিত হয়। সমগ্র সেক্টরটি আবার পাঁচটি সাব-সেক্টরে ভাগ করা হয়। আমি এই সেক্টরে কমান্ডার নিযুক্ত হই। এই সেক্টরের মোট সৈন্যসংখ্যা ছিলো ২১শ’। এর মধ্যে ১৫শ’ ইপিআর, ২শ’ পুলিশ, ৩শ’ সাময়িক বাহিনী এবং নৌ ও বিমান বাহিনীর সদস্যসংখ্যা ছিলো প্রায় একশ’। এখানে গেরিলাদের সংখ্যা ছিলো

প্রায় ২০ হাজার, যার মধ্যে ৮ হাজারকে অ্যাকশন গ্রুপ হিসাবে গড়ে তোলা হয়। এদের মধ্যে শতকরা ৩৫ ভাগকে অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাগুলি দেয়া হয়েছিলো।

২ নম্বর সেক্টরঃ কুমিল্লা ও ফরিদপুর জেলা এবং নোয়াখালী ও ঢাকার অংশবিশেষ নিয়ে এই সেক্টর গঠিত হয়। সেক্টর কমান্ডার নিযুক্ত হন মেজর খালেদ মোশাররফ। সেক্টরটি ৬টি সাব-সেক্টরে বিভক্ত ছিলো। সমগ্র সেক্টরে নিয়মিত বাহিনীর সদস্য ছিলো প্রায় ৪ হাজার এবং গেরিলা ছিলো ৩০ হাজার।

৩ নম্বর সেক্টরঃ মেজর কে এম সফিউল্লাহর অধীনে মৌলবীবাজার মহকুমা,ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমা, নারায়নগঞ্জ মহকুমা, এবং কেরানীগঞ্জের অংশবিশে নিয়ে এই সেক্টর গঠিত হয়। ১০টি সাব-সেক্টরে বিভক্ত এই সেক্টরের গেরিলা সদস্যোর সংখ্যা ছিলো প্রায় ১০ হাজার। এস-ফোর্স গঠনের পর মেজর সফিউল্লাহকে তাঁর কমান্ডার নিযুক্ত করা হয়। মেজর নূরুজ্জামানকে ৩ নম্বর সেক্টরের দায়িত্ব দেয়া হয়।

৪ নম্বর সেক্টরঃ উত্তরে সিলেট সদর এবং দক্ষিণে হবিগঞ্জ থানার মধ্যবর্তী সমস্ত অঞ্চল নিয়ে গঠিত এই সেক্টরের কমান্ডার নিযুক্ত হন মেজর চিত্তরঞ্জন দত্ত। সেক্টরটি ৬ টি সাব-সেক্টরে বিভক্ত ছিলো। সেক্টরের সৈন্যসংখ্যা ছিলো ২ হাজার এবং গেরিলা ছিলো ৮ হাজার। সেক্টর হেডকোয়ার্টার ছিলো করিমগঞ্জে। পরে তা নাসিমপুরে স্থানান্তর করা হয়।

৫ নম্বর সেক্টরঃ সিলেট জেলার উত্তরাঞ্চল নিয়ে গঠিত এই সেক্টরে কমান্ডার নিযুক্ত হন মেজর মীর শওকত আলী। সেক্টরে নিয়মিত বাহিনীর সংখ্যা ছিল প্রায় ৮’শ এবং গেরিলা ছিলো ৭ হাজার। সেক্টরটি ৬ সাব-সেক্টরে বিভক্ত ছিলো।

৬ নম্বর সেক্টরঃ এই সেক্টর রংপুর ও দিনাজপুর জেলা নিয়ে গঠিত। উইং কমাণ্ডার এম কে বাশার ছিলেন সেক্টর কমাণ্ডার। সাব সেক্টর সংখ্যা ছিলো ৫টি। সৈন্যসংখ্যা ছিলো প্রায় ১২শ’ এং গেরিলা ছিলো ৬ হাজার। সেক্টর হেডকোয়ার্টার ছিলো রংপুর জেলার পাটগ্রামের নিকট বুড়িমারীতে।

৭ নম্বর সেক্টরঃ রাজশাহী, পাবনা, বগুড়া জেলা এং দিনাজপুর জেলার অংশবিশেষ নিয়ে গঠিত। সেক্টর কমাণ্ডার নিযুক্ত হন মেজর নাজমুল হক। যুদ্ধকালে এক মটর দুর্ঘটনায় তিনি মারা গেলে সেক্টর কমাণ্ডার হিসাবে মেজর কিউ এন জামন দায়িত্ব গ্রহন করেন। সাব-সেক্টরের সংখ্যা ছিলো ৮টি। সৈন্যসংখ্যা প্রায় ২ হাজার এবং গেরিলার সংখ্যা ছিলো ২ হাজার।

৮ নম্বর সেক্টরঃ ১৫ই জুলাই পর্যন্ত এ সেক্টরে কমাণ্ডার ছিলেন মেজর এম এ ওসমান চৌধুরী। এ সময় মেজর এম এ মঞ্জুর পাকিস্তান থেকে পালিয়ে আসেন এবং তাঁকে ৮ নম্বর সেক্টরের কমাণ্ডার নিযুক্ত করা হয়। এর আওতায় ছিলো কুষ্টিয়া, যশোর, খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালী জেলা। পরে বরিশাল ও পটুয়াখালীকে এই সেক্টর থেকে বাদ দেওয়া হয়। সেক্টরে সৈন্যসংখ্যা ছিলো ২ হাজার। গেরিলা ৭ হাজার। সাব-সেক্টর ছিলো ৭টি। সেক্টর হেডকোয়ার্টার ছিলো বেনাপোলে.ব্রাহ্মণবাড়িয়া

৯ নম্বর সেক্টরঃ বরিশাল, পটুয়াখালী এবং খুলনা ও ফরিদপুর জেলার অংশবিশেষ নিয়ে গঠিত হয়। সেক্টর কমাণ্ডার নিযুক্ত হন মেজর এম এ জলিল। সাব-সেক্টরের সংখ্যা ছিলো ৮টি। গেরিলা ছিলো প্রায় ১৫ হাজার। নিয়মিত সৈন্য ছিলো এক ব্যাটালিয়নের মত।

১০ নম্বর সেক্টরঃ এই সেক্টরের কোন আঞ্চলিক সীমানা ছিলো না। শুধু নৌ-বাহিনীর কামাণ্ডোদের নিয়ে গঠিত এই সেক্টরের সদস্যদের শত্রুপক্ষের নৌ-যান ধ্বংস করার জন্য বিভিন্ন সেক্টরে পাঠানো হতো। প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্নসংখ্যাক কমাণ্ডো নিয়ে এক-একটি গ্রুপ গঠিত হতো। যে সেক্টরের এলাকায় কমাণ্ডো অভিযান পরিচালিত হতো সেই এলাকার সেক্টর কমাণ্ডারের অধীনে থেকে কমাণ্ডোরা কাজ করতো। নৌ-অভিযান শেষ হওয়ার পর কমান্ডোরা আবার তাদের মূল সেক্টর অর্থাৎ ১০ নম্বর সেক্টরে ফিরে আসতো।

১১ নম্বর সেক্টরঃ এই সেক্টরটি ছিল মেজর তাহেরের কমাণ্ডে। ১৫ই নভেম্বর এক অভিযানে তিনি আহত হলে স্কোয়াড্রন লিডার হামিদুল্লাহকে এই সেক্টরের কমান্ডার করা হয়। এখানে সাব-সেক্টর ছিলো ৮টি এবং গেরিলার সংখ্যা ছিলো প্রায় ২০ হাজার।

এই সম্মেলনে সেক্টরসমূহ সম্পর্কে সিদ্ধান্তের পর সৈনিকদেরও নিম্নলিখিত গ্রুপে পুনর্গঠন করার সিদ্ধান্ত নেয়া হলো।

নিয়মিত আর্মি ব্যাটালিয়নঃ তখনকার স্বল্পসংখ্যক ব্যাটালিয়নগুলো নিয়ে প্রথম বাংলাদেশ বাহিনী গঠিত হয়। এইসব ব্যাটালিয়নের জনশক্তি ছিলো খুবই কম। প্রত্যেক সেক্টর থেকে লোক সংগ্রহ করে এই শক্তি বৃদ্ধির চেষ্টা চলে। তারপর এগুলোকে ব্রিগেড গ্রুপে ভাগ করা হয়। কে-ফোর্স, এস-ফোর্স এবং জেড-ফোর্স নামে এগুলো পরিচিত হয়। এসব বাহিনীর অধিকাংশ লোকই ছিলো ইপিআর-এর।

সেক্টর ট্রুপসঃ উপরোক্ত ব্যাটালিয়নগুলোতে যেসব ইপিআর, পুলিশ এবং সামরিক বাহিনীর লোককে অন্তর্ভুক্ত করা যায়নি তাদেরকে যার যার সেক্টরে যুদ্ধ করার জন্য ইউনিট ও সাব-ইউনিটে ভাগ করা হয়। নিয়মিত ব্যাটালিয়নগুলোর চাইতে সেক্টর ট্রুপের অস্ত্রবল ছিলো কিছুটা কম। ওপরের প্রথম ও দ্বিতীয় গ্রুপ মুক্তিফৌজ, এম এফ, মুক্তিবাহিনী অথবা নিয়মিত সৈন্য হিসাবে পরিচিত। এদেরকে সেনাবাহিনীর বিধি-বিধান ও নিয়মকানুন মেনে চলতে হয়। এদেরকে জীবনধারণের ভাতা হিসেবে একটা যুক্তিসংগত অংকের অর্থ দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়, কিন্তু তারা কোন বেতন গ্রহন করেনি। সরকারীভাবে তাদের নাম রাখা হয় ''নিয়মিত বাহিনী''।

অনিয়মিত বাহিনী অথবা ফ্রিডম ফাইটার্স (এফ এফ) ঃ

গেরিলা পদ্ধতিতে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য যেসব লোককে ট্রেনিং দেয়া হতো তারা ছিলো ফ্রিডম ফাইটাস। এস সরকারী নাম ছিলো অনিয়মিত অথবা গণ-বাহিনী। এরা সেনাবাহিনীর নিয়ম-কানুন অনুসারে চলতে বাধ্য ছিলো না। অনেক ক্ষেত্রেই নিয়ম-শৃঙ্খলার অভাব ছিলো এই গ্রুপের বৈশিষ্ট্য। তবে আমরা নিশ্চিত ছিলাম যে, সুদীর্ঘ এবং কঠোর সংগ্রামী জীবনযাপনের মধ্য দিয়ে তারা আপনা থেকেই সুশৃঙ্খল হয়ে উঠবে। সাধারণতঃ এদেরই বলা হতো 'গেরিলা'। মুক্তিফৌজ এবং ফ্রিডম ফাইটারদেরও সাধারণভাবে এফ-এফ বা ফ্রিডম ফাইটার্স বলা হতো এবং এই নামে সকল যোদ্ধাই সুপরিচিত ছিলো।

অনিয়মিত বাহিনীর লোকরা কোন বেতন কিংবা জীবনধারণ ভাতা পেতো না। ট্রেনিংয়ের পর বাংলাদেশের ভেতরে পাঠানোর সময় তাদেরকে রাহা খরচ হিসাবে কিছু অর্থ দেয়া হতে। একে বলা হতো 'ইনডাকশন মানি' বা নিযুক্তি-ভাতা।

আমাদের নিয়মিত (এম এফ) এবং অনিয়মিত (এফ এফ) বাহিনীর সাংগঠনিক কাঠামো এবং সদস্যসংখ্যা হিসাব করে তাদের জন্য কাপড়-চোপড়, রেশন, অস্ত্র, গোলাগুলি, অয়্যারলেস সেট এবং টেলিফোন সেট, কম্পাস, বাইনোকুলার ইত্যাদি প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের তালিকা তৈরী করে পুরো সেক্টরের অত্যাবশ্যকীয় জিনিসপত্রের সাকুল্য তালিকা সরকারের কাছে পেশ করতে হতো। আমাদের সরকার আবার ভাসত সরকারের কাছ থেকে জিনিসগুলো সংগ্রহ করতেন। অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের ব্যাপারে আমাদের অভিজ্ঞতার কথা আগেও বলেছি। নিঃসন্দেহে এই সমস্যার জন্য প্রথমদিকে আমরা মার খেয়েছিলাম। সেক্টরগুলোতে ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে তেমন কোন সামঞ্জস্য ছিলো না। কিছু ছিলো চীনের তৈরী, কিছু বৃটিশ, আবার কিছু আমেরিকান। এগুলোর গোলাগুলি নিয়ে আমাদের নিদারুণ সংকটে পড়তে হতো। শেষ পর্যন্ত আমাদেরকে শুধু একধরনের (সম্ভবত ভারতীয়) অস্ত্র দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়।

যানবাহনের সমস্যার তো কোন অন্তই ছিলো না। খুচরা যন্ত্রপাতির অভাবে প্রায়ই গাড়ীগুলি অচল থাকতো। এরপর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, যেভাবে হোক যতদূর সম্ভব বেশী গাড়ী চালু রাখতে হবে। ভারত সরকারের

সাথে উচ্চ পর্যায়ের আলোচনার পর ভারতীয় সেনাবাহিনীর ই-এম-ই (ইলেকট্রিক্যাল, মেকানিক্যাল এ্যাণ্ড ইকুইপমেন্ট) বিভাগকে এই কাজের ভার দেয়া হয়।

চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধার অভাব ছিলো প্রকট। ভারতের হাসপাতালগুলো আহত শরণার্থীতে ভরে গিয়েছিল। এদের বেশীর ভাগই ছিলো বুলেট কিংবা বেয়োনেটের আঘাতে আহত। আমরা বাঙ্গালী সৈনিকদের জন্য কয়েকটি অস্থায়ী ফিল্ড হাসপাতাল গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেই। পরে সবচাইতে বড় হাসপাতালটি স্থাপিত হয়েছিল ২ নম্বর সেক্টরে। যুদ্ধের সময় খুব কমসংখ্যাক চিকিৎসকই চিকিৎসকই ভারতে গিয়েছিলেন। এই ঘাটতি পূরণের জন্য ৪র্থ বর্ষের মেডিক্যাল ছাত্রদের পর্যন্ত কাজে নিয়োগ করা হয়। তারা চিকিৎসা ক্যাম্প এবং সাব-সেক্টরের দায়িত্বও গ্রহণ করে। ভারতের সামরিক হাসপাতালগুলোতে আমাদের আহত সৈনিকদের চিকিৎসা করানোর জন্যও ভারতীয় সেনাবাহিনীর সংগে একটা ব্যবস্থা করা হয়েছিলো।

এ রকম আরো অনেক সমস্যার কথা এবং সেগুলোর সমাধানের উপায় নিয়ে আমাদের আলোচনা হয়। সেক্টরগুলোতে কতগুলো অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য এবং যন্ত্রপাতি একেবারেই ছিলো না। এ ব্যাপারে আমাদের চাহিদা ঠিক সময়ে পূরণ করা হবে বলে প্রতিশ্রুতিও পেয়েছিলাম। কিন্তু যুদ্ধকালীন সময়ে আমরা কখনো পর্যাপ্ত পরিমাণে কিছুই পাইনি কিংবা ঠিক সময়েও পাইনি। হয়তো এর কোন যুক্তিসঙ্গত কারণও থাকতে পারে। বর্ষার সময়ে আমাদের অধিকাংশ সৈনিকের জন্য জরুরী ভিত্তিতে আচ্ছাদন নির্মাণের কথা ছিলো, কিন্তু কোন সময়েই এ আচ্ছাদনের উদ্দেশ্য সাধিত হয়নি। তাঁবুর সাজসরঞ্জাম ও চাহিদা অনুযায়ী কখনো পাইনি। শীতে কম্বলের সংখ্যা ছিলো অল্প, গরম কাপড় তারও কম। আমাদের সৈনিকরা অধিকাংশ যুদ্ধই করেছে খালি পায়ে। জংগলে চলাচলের বুট ছিলো মাত্র কয়েক জোড়া। আমরা বিপুলসংখ্যক প্লাস্টিকের স্যাণ্ডেল পেয়েছিলাম। ওগুলো ছিলো বাথরুমের জন্য উপযুক্ত, যুদ্ধক্ষেত্রের জন্য নয়।

প্রতিটি সেক্টরের সামরিক অভিযানের ক্ষমতা এবং কি পরিমাণ সৈন্য আমাদের আছে সেসব নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা করেছিলাম। কমাণ্ডো ধরনের হামলার জন্য তখনো আমরা নিয়মিত সৈন্যদের পুরা পুনর্গঠন করতে কিংবা ট্রেনিং দিতে পারিনি। তাই বাংলাদেশের খুব ভেতরে প্রবেশ করার পরিকল্পনা আমরা কিছুদিনের জন্য বাদ দিয়ে তখনকার মতো সমগ্র সীমান্ত এলাকা বরাবর শত্রুর ওপর আঘাত হানার প্রস্তুতি নেই। গেরিলা তৎপরতার ওপরেই সবচাইতে বেশী গুরুত্ব দেয়া হয়। এই উদ্দেশ্যে বিপুলসংখ্যক লোককে গেরিলা যুদ্ধের ট্রেনিং দেয়া হয়। স্থানীয়ভাবে আমরা স্বল্পসংখ্যক ফ্রিডম ফাইটারকে প্রধানতঃ বিএস এফ-এর সহযোগিতায় ট্রেনিং দেই। যুদ্ধে আমাদের লোকবলের চাহিদা পূরণের জন্য ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রতিমাসে কয়েক হাজার ফ্রিডম ফাইটারকে ট্রেনিং দেওয়ার একটি ব্যাপক পরিকল্পনা হাতে নেয়। আমরা আশা করেছিলাম এর দ্বারা কয়েক মাসের মধ্যে আমরা পর্যাপ্তসংখ্যক গেরিলাকে গড়ে তুলতে পারবো এবং এদেরকে দিয়ে পাকবাহিনীকে সব সময় ব্যতিব্যস্ত রাখা যাবে। ইত্যবসরে সরাসরি অভিযান পরিচালানার জন্যে নিয়মিত সৈন্যদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্গঠন কাজ পূর্ণোদ্যমে চলবে। ফ্রিডম ফাইটারদের ওপর যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রভৃতি ধ্বংসের দায়িত্ব থাকবে। প্রয়োজনে তারা শত্রুদলকে অ্যামবুশ করবে এবং সশস্ত্র ঘাঁটি, জ্বালানি ও অস্ত্রপাতি মজুতের স্থান কিংবা অন্যান্য সরবরাহ কেন্দ্রের ওপর হামলা চালাবে। এরপর নিয়মিত বাহিনীর সর্বাত্মক অভিযানে শত্রুপক্ষকে সহজেই কাবু করা যাবে।

এইভাবে আমরা চূড়ান্ত রণকৌশল নির্ধারণ করি। কিন্তু প্রশ্ন দাঁড়ায়, কে কখন সেই সর্বাত্মক অভিযান চালাবে।

তখনকার মতো যুদ্ধের জন্য সর্বাধিকসংখ্যাক লোককে ট্রেনিং দেয়ার ব্যাপারেই আমরা বেশী আগ্রহী ছিলাম। ট্রেনিং কর্মসূচীর মেয়াদ ছিলো দুই থেকে তিন সপ্তাহের। এই সময়ের মধ্যে তারা রাইফেল, লাইট মেশিনগান, হ্যাণ্ড গ্রেনেড, বিস্ফোরক প্রভৃতি কিভাবে ব্যবহার করতে হয় তা শিখতো। এছাড়া অ্যামবুশের কায়দা-কানুন এবং রণাঙ্গনের বিভিন্ন কৌশল কিছু শেখানো হতো। আমাদের সব প্রচেষ্টার লক্ষ্য ছিলো গুণগত নয়, পরিমাণগত নয়, পরিমাণগত দিক

দিয়ে কি করে আরো বেশী লোক গড়ে তোলা যায়। প্রয়োজনীয় সকল প্রকার দ্রব্যসামগ্রীর সরবরাহ এবং ট্রেনিংয়ের জন্য আমাদেরকে পুরোপুরি ভারতীয় সেনাবাহিনীর ওপর নির্ভর করতে হতো। এ ব্যাপারে আমাদের সংগে সব সময় যোগাযোগ রাখার উদ্দেশ্যে ভারত সরকার তাদের কয়েকজন সিনিয়র সামরিক অফিসারকে নিয়োগ করেন। ব্রিগেডিয়ার র‍্যাংকের এইসব অফিসার ভারতীয় বাহিনীর ইস্টার্ন কমাণ্ডের সামরিক এবং প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে থেকে কাজ করতেন। তাদের নিযুক্তি ছিলো ভারতীয় সেক্টর কমাণ্ডার হিসাবে। ভারতের একজন সেক্টর কমাণ্ডার বাংলাদেশের দুই অথবা তিনটি সেক্টরের দায়িত্বে ছিলেন। প্রধানতঃ ভারতীয় সেক্টর কমান্ডারদের মাধ্যমেই বআংলাদেশ বাহিনীর হেডকোয়ার্টার এবং ইস্টার্ন কমাণ্ডের সাথে আমাদের যোগাযোগ রাখতে হতো। যুদ্ধের যাবতীয় নীতিমালা আমাদের হেডকোয়ার্টার এবং ভারতীয় ইস্টার্ন কমাণ্ড যৌথভাবে প্রণয়ন করতেন। এই সকল নীতি কার্যকর করার দায়িত্ব দেয়া হতো ভারতীয় এবং বাংলাদেশ সেক্টর কমাণ্ডারদের হাতে। অনেক সময় পরস্পরবিরোধী একাধিক নির্দেশও আসতো। তখন আমরা পড়তাম বিপাকে, কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি হতো।

১৫ই জুলাই আমরা অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন আহমদের সঙ্গে এই বৈঠকে মিলিত হই। এ অনুষ্ঠানে অবশ্য কোন মত বিনিময় কিংবা বিভিন্ন সেক্টরের পরিস্থিতি সম্পর্কে কোন আলোচনা হয়নি। সে রাতে সেটি ছিলো শপথগ্রহণের অনুষ্ঠান। আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে শপথ গ্রহণ করি।

কলকাতা ত্যাগের পূর্বেই জানতে পারলাম পাকিস্তান থেকে কয়েকজন বাঙালী সামরিক অফিসার পালিয়ে আসতে পেরেছেন। এইসব অফিসারের কাছেই জানা গেলো যে, অন্যান্য বাঙালী অফিসারও আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগ দেয়ার উদ্দেশ্যে পালানোর চেষ্টা করছেন। কিন্তু এই পালানো চেষ্টা, অর্থাৎ পাকিস্তানের সীমান্ত পার হয়ে ভারতে আসা এবং তারপর যুদ্ধে যোগ দেয়া খুবই বিপজ্জনক ছিলো- বিশেষ করে পাকিস্তানে যারা পরিবার পরিজন নিয়ে বসবাস করছিলেন তাদের জন্যে তো বটেই। পাকিস্তান থেকে আমাদের অফিসাররা চলে আসছেন এ খবরে আমরা খুবই খুশী হয়েছিলাম। আবার অন্য কিছু ঘটনা আমাদের ভাবিয়ে তুলেছিলো। আমাদের যুব শিবির থেকেও ও সময় কিছু লোক পালিয়ে যায়। হয়তো যুব শিবিরের কষ্ট সহ্য করতে না পেরে কিংবা ব্যাক্তিগত ও পারিবারিক সমস্যায় হতাশাগ্রস্ত হয়ে তারা এ কাজ করেছিলো। তবে এদের সংখ্যা ছিলো নগণ্য। এই ঘটনা তেমন কোন উল্লেখযোগ্য সমস্যারও সৃষ্টি করেনি।

যুব শিবিরে কিছু লোকের মধ্যে হতাশ ছিলো এ কথা সত্য। জুলাইয়ের শেষ দিকে মেজর খালেদ মোশাররফ এবং আমি আগরতলার কাছে এই ধরনের একটি শিবির দেখতে যাই। সেখানে তিন হাজার যুবক দু'মাসেরও বেশী সময় ধরে ট্রেনিংয়ের জন্য অপেক্ষা করছিলো। স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যাবস্থা ছিলো খুবই দুঃখজনক। খাদ্য ও পানি সরবরাহের ব্যবস্থা নেই চললেই চলে। অন্যান্য যুব শিবিরেরও একই হাল। লক্ষ্যহীন সুদীর্ঘ অপেক্ষার পর একটি লোকের পক্ষে হতাশ হয়ে পড়াটা খুবই স্বাভাবিক। যুব শিবিরের সংখ্যা পরের দিকে প্রায় দ্বিগুণ হওয়া সত্ত্বেও এতো বিপুলসংখ্যক যুবকের জন্য সকল ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা দুরূহ হয়ে পড়েছিলো।

আরেকটি বিষয় উল্লেখ না করে পারছি না- শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় গ্রহণকারী খুব কম লোকের মধ্যেই ট্রেনিং গ্রহণের কিংবা শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাওয়ার আগ্রহ দেখা যেতো। যুদ্ধকালে এক লাখেরও বেশী মুক্তিযোদ্ধা ট্রেনিং নেয়। কিন্তু এর মধ্যে শতকরা এক ভাগও শরণার্থী শিবিরের লোক ছিলো না। এর কারণ সম্ভবতঃ যুব শিবিরগুলোতে যারা এসেছিলো তারা তাদের পরিবার-পরিজন বাংলাদেশে ফেলে এসেছিল, তাই ট্রেনিংয়ের পরই তারা বাংলাদেশে ফিরে যাওয়ার জন্য ছিলো উদগ্রীব। তাদের স্বদেশ ত্যাগের একমাত্র উদ্দেশ্যে ছিলো সামরিক ট্রেনিং গ্রহণ করা। অন্যদিকে বাড়িঘর থেকে পলিয়ে যুব শিবিরে যারা আশ্রয় নিয়েছিলো তারা পরিবার-পরিজন সহই সেখানে থাকতো। জীবন বাঁচানোর জন্য অন্ততঃ দু'বেলা দু'মুঠো আহার জুটবে এই নিশ্চয়তাও শিবিরে তাদের ছিলো। বাংলাদেশে তাদের জন্য দুশ্চিন্তা করার মতো খুব বেশী কেউ ছিলো না। শিবিরে তাদের জীবনের

ভয়ও কম ছিলো। এসব কারণেই অন্ততঃ সেই মুহূর্তে দেশে ফেরার তেমন আগ্রহ তাদের ছিলো না। তাদের নিরাপদ স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা কারা করছে, কিভাবে করছে, এ নিয়ে তাদের তেমন মাথাব্যাথা ছিলো না। মনে মনে তারা চাইতো কষ্টের কাজটুকু অন্যে করুক, তারা একদিন ধীরেসুস্থে ফিরতে পারলেই হলো। শরণার্থী শিবিরের বাসিন্দাদের মধ্যে এবং নিছক ভয়ে যারা দেশত্যাগ করেছিলো তাদের মধ্যে এই মনেবৃত্তি লক্ষ্য করা গেছে। যুদ্ধে তাদের বিশেষ কোন আবদার ছিল না, কিছু থাকলে তা ছিলো পরিসিস্থিতিসাপেক্ষ, স্বেচ্ছাপ্রণোদিত নয়। এদিকে শত ভয়-ভীতি এবং দারুণ বিপদের মধ্যেও যে সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালী দেশেই থেকে গিয়েছিলো, স্বাধীনতার জন্য তাদেরকেই দিতে হয়েছে সবচাইতে বেশী মূল্য।

যুদ্ধের পরিবর্তিত গতি

জুন মাসের শেষদিকে বাংলাদেশের স্বধীনতা যুদ্ধের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়। এই সময়ে প্রচলিত যুদ্ধ পদ্ধতি এবং গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধ করার জন্য বাংলাদেশ বাহিনীকে পুনর্গঠিত করা হয়। বস্ততঃ জুনের চতুর্থ সপ্তাহ থেকে পুর্নগঠন প্রক্রিয়া শুরু হলেও বিভিন্ন সেক্টরের তৎপরতার মধ্যে সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে জুলাই মাসে আমরা এক সম্মেলনে মিলিত হয়েছিলাম। এই সম্মেলনের কথা আগেই বলেছি। ১৫ই মে পর্যন্ত আরা যা কিছু সাহায্য পেয়েছিলাম তার ব্যাবস্থা করেছিলো ভারতীয় বিএসএফ। যাহোক, সময়ের বিবর্তনে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের দু'টি নতুন ডিভিশনকে বাংলাদেশে এনে মোতায়েন করারপর পুরো যুদ্ধ পরিস্থিতিতে আমূল পরিবর্তন ঘটে। এই কারণে সবকিছুতে ভিন্নতর সমন্বয়, প্রতিরক্ষা প্রস্তুতি এবং ব্যাপক সাহায্যের প্রয়োজন দেখা দেয়। কিন্তু এই প্রয়োজন মেটানোর সামর্থ্য বিএসএফ-এর ছিলো না। তাই ১৯৭১-এর ১৬ই মে ভারতীয় সেনাবাহিনী বিএসএফ-এর কাছ থেকে বাংলাদেশের অস্বাভাবিক ঘটনাবলী মোকাবিলার দায়িত্ব গ্রহণ করে।

লক্ষ্য করার বিষয় যে, বিভিন্ন পাকিস্তনী ডিভিশনের আক্রমণকারী দলগুলো ২৫শে মার্চ রাতে আকস্মিক সশস্ত্র আক্রমণের ৭২ ঘন্টার মধ্যেই বিভিন্নস্থানে অবস্থান গ্রহণের কাজ সম্পন্ন করে। চলাচলের কাজ বিমানযোগে সম্পন্ন করা হয়। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার দূরত্ব বিবেচনা করে (১২০০ মাইল ভারতীয় এলাকা) এবং ভারতের ওপর দিয়ে সকল প্রকার পাকিস্তানী বিমান চলাচল বন্ধ থাকায় পাকিস্তানের পুরো দুটি আর্মি ডিভিশনকে পূর্বাঞ্চলে স্থানান্তর করতে অন্ততঃ এক মাসের কম সময় লাগার কথা নয়। এই হিসাবে দেখা যায় যে, এক মাস আগে অর্থাৎ ৭১-এর ২৮শে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে যাত্রার প্রস্তুতি শুরু না করলে দুই ডিভিশন পাকসেনা ২৮শে মার্চের মধ্যে বাংলাদেশে আসতে পারতো না। বাংলাদেশে গণহত্যার উদ্দেশ্য নিয়েই এইসব আর্মি ডিভিশন এখানে এনে মোতায়ন করার ষড়যন্ত্র হয়েছিলো। সবকিছুর তোড়জোড় শুরু হয়েছিলো ২৮শে ফেব্রুয়ারীর আগেই। তা হলে দেখা যায়, ভুট্টো ১৬ই ফেব্রুয়ারী যে হুমকি দিয়েছিলেন তার সাথে এই ষড়যন্ত্রের নিশ্চয়ই একটা যোগসাজশ ছিলো। ভুট্টো বলেছিলেনঃ ''কেউ পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ঢাকা যেতে চাইলে তাকে নিজ দায়িত্বেই যেতে হবে, তা তিনি খাকী পোশাকে অথবা সাদা কালো যে পোশাকেই যান না কেন।'' রাওয়ালপিণ্ডির আর্মি হেডকোয়ার্টারে ২২শে ফেব্রুয়ারী যে উচ্চ পর্যায়ের সম্মেলন হয়, সম্ভবত সেখানেই ষড়যন্ত্রের সূত্রপাত ঘটে।

৯ম ডিভিশনের ৩১৩ ব্রিগেডকে বিমানযোগে সিলেট পাঠানো হয়। ১১৭ ব্রিগেড যায় কুমিল্লায়। ১৪ ডিভিশনের অধীনে কুমিল্লায় যে ৫৩ ব্রিগেড অবস্থান করছিলো ইতিমধ্যেই তাকে চট্রগ্রামে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। ৯ম ডিভিশনের বাংলাদেশে আসার পরই মেঘনার পূর্বদিকের সমগ্র এলাকা অর্থাৎ সিলেট, কুমিল্লা, নোয়াখালী, চট্রগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের সার্বিক দায়িত্ব তাদের ওপর ন্যস্ত করা হয়। এই পরিকল্পনা অনুসারে ৫৩ ব্রিগেড চট্টগ্রাম, ১১৭ ব্রিগেড কুমিল্লায় এবং ৩১৩ ব্রিগেড সিলেটে অবস্থান গ্রহণ করে। আগে থেকেই পূর্বাঞ্চলে মোতায়েন ১৪ ডিভিশনের ওপর ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, যশোর, খুলনা, প্রভৃতি জেলার দায়িত্ব ছিলো। ৫৩ ব্রিগেডকে ৯ম ডিভিশনের অধীনে এবং ৯ম ডিভিশনের ২৭ ব্রিগেডকে ১৪শ ডিভিশনের অধীনে ন্যস্ত

করা হয়। ১৪শ ডিভিশনের ৫৭ ব্রিগেড ঢাকায় অবস্থান করছিলো। এই ডিভিশনের অপর ব্রিগেডটি ছিলো উত্তরবঙ্গে।

পশ্চিম পাকিস্তানের কোয়েটা থেকে ১৬শ ডিভিশন চলে আসার পর উত্তর বঙ্গের দায়িত্ব এই ডিভিশন গ্রহন করে। জেনারেল টিক্কা খান পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর হওয়া ছাড়াও এই সকল বাহিনীর সাবিক কমাণ্ডের দায়িত্বও গ্রহন করেছিলেন। ১১ই এপ্রিল লেঃ জেনারেল এ, এ, কে, নিয়াজী ইস্টার্ন কমাণ্ডের কমাণ্ডার নিযুক্ত হওয়ার পর জেনারেল টিক্কা খান তাঁর এই বাড়তি দায়িত্ব ছেড়ে দেন। এরপর তিনি শুধু গভর্নর এবং সামরিক আইন প্রশাসক হিসাবে কাজ করেন। পাকিস্তানীদের উল্লিখিত সেনাবাহিনী ছাড়াও পরে আরো দুটি ডিভিশন গড়ে তোলা হয়। এই দুটি পাক ডিভিশনের জন্য বাংলাদেশ বাহিনী এবং এমনকি ভারতীয় বাহিনীতেও পুনর্গঠনের প্রয়োজন দেখা দেয়। বাংলাদেশ বাহিনীর পুনর্গঠনের সঙ্গে সঙ্গে সকল সেক্টরে পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযানও অব্যাহত থাকে। আমাদের আক্রমণাত্মক তৎপরতা অক্ষুণ্ণ রাখা এবং লড়াইয়ের উদ্যমকে সমুন্নত রাখাই ছিলো এর উদ্দেশ্য।

অপারেশন জ্যাকপট

ভারতীয় সেনাবাহিনী ১৬ই মে বিএসএফের নিকট থেকে বাংলাদেশে সামরিক তৎপরতা চালাবার পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করে। এক সপ্তাহ পরে ২৩শে মে তারিখে ভাগিরথী নদীর তীরে একটা গোপন ট্রেনিং ক্যাম্প চালু করা হয়। এই ক্যাম্পের অবস্থান ছিলো পলাশীর স্মৃতিসৌধের পাশে। এর সাংকেতিক নাম দেয়া হল ক্যাম্প 'সি ২পি'। ক্যাম্পের জন্য লোক সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ভারতীয় নৌ-বাহিনীর অফিসাররা বিভিন্ন যুব শিবির সফরে বেরিয়ে পড়েন। আমার ক্যাম্পে আগত নৌ-বাহিনীর অফিসার বললেন, 'আমি কয়েকজন নিপুণ সাঁতারু বাছাই করতে চাই, তাদেরকে তরুণ এবং ভাল স্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হবে।' জুন মাসের মধ্যে ১৫০ জন স্বেচ্ছাসেবকের প্রথম দলটি বাছাই করে 'সি ২পি' ক্যাম্পে পাঠানো হয়। আগস্টের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে এরা কঠোর এবং শ্রমসাধ্য ট্রেনিং সমাপ্ত করে। পুরো ব্যাপারটাই ছিলো ভারতীয় নৌ-বাহিনীর দায়িত্বে।

বাংলাদেশে নৌ-পথে সৈন্য এবং অন্যান্য সমর সরঞ্জাম পরিবহনের ব্যবস্থা বানচাল করার উদ্দেশ্যে জাহাজ এবং নৌ-যানগুলো ধ্বংস করাই ছিলো এই উদ্যোগের লক্ষ্য। অল্প খরচে দ্রুত এই লক্ষ্য অর্জনে পর্যাপ্তসংখ্যক স্বেচ্ছাসেবক দরকার ছিলো- যাদেরকে সাঁতারের এবং 'লিমপেট' মাইনসহ বিভিন্ন প্রকার বিস্ফোরক দ্রব্য ব্যবহারের ট্রেনিং দেয়া যেতে পারে। এ কাজের জন্য উচ্চ ট্রেনিংপ্রাপ্ত লোকদের নিয়ে একটা বিশেষ কর্মসূচী গ্রহন করা হয় এ বিষয়ে বিস্তারিত কর্মসূচী প্রণীত হয় নৌ-বাহিনীর হেডকোয়ার্টারে। পরিকল্পনা অনুসারে চট্টগ্রাম ও মঙ্গলার সামুদ্রিক বন্দর, চাঁদপুর, দাউদকান্দি, নারায়ণগঞ্জ, আশুগঞ্জ, নগরবাড়ী, খুলনা, বরিশাল, গোয়ালন্দ ফুলছড়িঘাট এবং আরিচা ঘাটের নদীবন্দরগুলোর ওপর সরাসরি আক্রমণ চালানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অভিযানের সাংকেতিক নাম দেয়া হয় 'অপারেশন জ্যাকপট'। অপারেশন কার্যকরী করার চূড়ান্ত দায়িত্ব দেয়া হয় সংশ্লিষ্ট সেক্টর কমাণ্ডারদের উপর।

২৮শে জুলাই আমি ডেলটা সেক্টরের কমাণ্ডিং অফিসার ভারতীয় সেনাবাহিনীর ব্রিগেডিয়ার সাবেগ সিং-এর সাথে বসে চূড়ান্ত পরিকল্পনা তৈরী করেছিলেন। চার ঘন্টারও বেশী সময় আমরা বিস্তারিত আলোচনা করি এবং চট্টগ্রাম বন্দর ও কর্ণফুলী নদীর ম্যাপ ও চার্ট পর্যালোচনা করি। চন্দ্রতিথি, আবহাওয়ার অবস্থা, জোয়ার-ভাটার সময় বাতাসের গতি-প্রকৃতি, স্রোতের গতি এবং আরো অসংখ্য তথ্য আমাদের আলোচনায় প্রাধান্য লাভ করে। মে মাস থেকেই বন্দরের তৎপরতা সম্পর্কে খোজখবর নিচ্ছিলাম। আমরা ইতিমধ্যেই বাংলাদেশের বন্দর এলাকা সম্পর্কে একটা পরিস্কার চিত্রও পেয়ে যাই। অপারেশনে আমাদের নৌ-মুক্তিযোদ্ধারা কোথায় কি ধরনের সমস্যার মোকাবেলা করতে পারে তাও আমরা বিশদভাবে পর্যালোচনা করি। বন্দরের জন্য পাক-বাহিনী কি ধরনের রক্ষাব্যবস্থা গ্রহন করেছে এবং সন্ত্রাসীরা কোথায় কিভাবে পাহারার ব্যবস্থা করেছে এসব বিষয়ে আলোচনা হয়। সে সময়ে রাতের বেলায় নদীমুখে সকল প্রকার নৌ-চলাচল নিষিদ্ধ ছিলো। প্রধান কয়েকটি গানবোট নিয়মিত

টহল কার্যে নিযুক্ত ছিলো। আমাদের পরিকল্পনা গোপন রাখতে পারলে এসব বাধা তেমন কোন সমস্যাই নয়। ঠিক হলো পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবস অর্থাৎ ১৪ই আগস্টের ৬০ জন ট্রেনিংপ্রাপ্ত তরুণকে চট্রগ্রাম বন্দরে পাঠানো হবে। রাতে তারা সাঁতার কেটে কর্ণফুলী পাড়ি দিয়ে যত বেশীসংখ্যক জাহাজে গিয়ে লিমপেট মাইন লাগিয়ে দেবে। তারপর তারা ভাটার টানে দূরে সরে যাবে।

১০ই আগস্ট 'অপারেশন জ্যাকপট' শুরু হয়। চট্টগ্রাম বন্দরের জন্য বাছাইকৃত ৬০ জন তরুণকে তিন ভাগে ভাগ করি। ১ এবং ২ নম্বর গ্রুপ স্থলপথে মিরেশ্বরাই, সীতাকুণ্ড এবং চট্টগ্রাম শহর হয়ে কর্ণফুলীর পূর্বপাড় চরলাক্ষার সর্বশেষ ঘাঁটিতে গিয়ে পৌছবে। ৩ নম্বর গ্রুপ চরলাক্ষায় উপনীত হবে নৌকাযোগে। তিনটি গ্রুপেরই সার্বিক কমাণ্ডে থাকবেন একজন কমাণ্ডর। তাদের সকলের কাছে থাকবে লিমপেট মাইন, এক জোড়া 'ফিন' (সাঁতারের সময় পায়ে লাগানোর জন্য) এবং শুকনো খাবার। প্রতি তিনজনের কাছে একটি করে স্টেনগান থাকবে। সার্বিক দায়িত্বে নিযুক্ত গ্রুপ কমান্ডারকে আরো দেয়া হয় হালকা ধরনের অথচ শক্তিশালী একটি ট্রানজিস্টার সেট। তার জন্য সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য হচ্ছে, অল ইন্ডিয়া রেডিওর কলকাতা কেন্দ্রের প্রতিটি সঙ্গীতানুষ্ঠান তাকে শুনতে হবে খুব মন দিয়ে। এতে ব্যর্থ হলেই সমস্ত পরিকল্পনা ভেস্তে যাবে।

৯ই আগস্ট হরিণা ক্যাম্পে তাদেরকে চূড়ান্ত নির্দেশ দেই। পথপ্রদর্শক এবং কুলীসহ তাদের সকলকে বলে দেয়া হয় এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় কখন কিভাবে অগ্রসর হতে হবে, পথে কোথায় কোথায় থামবে ইত্যাদি। প্রতিটি এলাকায় আমাদের বিশ্বস্ত গেরিলা বেস কমাণ্ডারের ঠিকানা দিয়ে দেয়া হয়, এরা তরুণদের খাদ্য ও আশ্রয় দেবে এবং চরলাক্ষার পথে যাওয়ার ব্যবস্থা করবে। ১৩ই আগস্ট ১ নম্বর এবং ২ নম্বর গ্রুপ চরলাক্ষার পূর্ববর্তী ঘাঁটিতে পৌছে যায়। জায়গাটি চট্টগ্রাম শহরের কাছেই। পথে অবশিষ্ট অংশটুকু এদের জন্য খুবই মারাত্মক, কারণ তাদেরকে শহরের ভেতর দিয়ে গিয়ে নৌকায় নদী পার হতে হবে। তারপরই তাদের শেষ ঘাঁটি চরলাক্ষা।

এদিকে গুজব ছড়িয়ে পড়েছিলো যে, ১৪ই আগস্ট পাকিস্তানের স্বাধীনত দিবসে দখলদার বাহিনীর ওপর মুক্তিবাহিনী সাংঘাতিক আক্রমণ চালাবে। এ কারণে শত্রুরা ছিলো পুরো সতর্ক অবস্থায়। সারারাত ধরে কারফিউ চলতো। লোকজনকে তল্লাশীর জন্য পথের মোড়ে মোড়ে বসানো হয়েছিলো অসংখ্য চেকপোস্ট। মেশিনগান ফিট করা আর্মি জীপগুলো সারা শহর টহল দিয়ে বেড়াচ্ছিলো। নতুন করে আবার বাড়ি বাড়ি তল্লাশী শুরু হয়। বিভিন্ন এলাকা ঘেরাও দিয়েও অভিযান চালানো হয়। পথচারী সবাইকে কঠিন তল্লাশী করা হয়। এতসব তল্লাশী ফাঁকি দিয়ে শহরের মাঝখান দিয়ে পার হতে হবে ১ নম্বর এবং ২ নম্বর গ্রুপকে। তারপর আছে নদী পার হবার সময় আর এক তল্লাশীর ঝামেলা। সেটা পার হলো আশা আছে সময়মত এই দুই গ্রুপ চরলাক্ষায় পৌছে যাবে। কিন্তু কোন কারণে যদি দলের একজনও ধরা পড়ে তাহলে সমস্ত অভিযান বাতিল হওয়ার সম্ভাবনা। তাই এই হামলাকারী দলের নেতা নিজেও আমাদের মতই চিন্তিত ছিলো।

আরো একটি কারণে এই দলের নেতা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। নৌকায় করে ৩ নম্বর গ্রুপটির ১৩ তারিখে ঘাঁটিতে পৌছার কথা ছিলো, তারা সে ঘাঁটিতে পৌঁছেতে সক্ষম হয়নি। এদিকে ১৩ই আগস্ট কলকাতা রেডিওর সংগীতানুষ্ঠান শোনার জন্য ট্রানজিস্টার খুলতেই তার কানে ভেসে এলো পুরোনো দিনের বাংলা গান "আমার পুতুল আজকে প্রথম যাবে শ্বশুর বাড়ি"। এই গানের ভেতর দিয়ে সে এবং তার দল প্রথম সংকেত লাভ করে। কমাণ্ডার জানে, আগামী ২৪ ঘন্টার মধ্যে আরেকটি গান সে শুনতে পাবে। ওটি শোনার পরই সে ট্রানজিস্টার ফেলে দিতে পারবে। 'অপারেশন ক্যাকপট' সফল না হওয়া পর্যন্ত তাদের আর কোন গান শোনার জন্যে উদগ্রীব হয়ে রেডিও শুনতে হবে না।

নগরীতে মোতায়েন আমাদের লোকেরা চমৎকারভাবে দায়িত্ব পারল করেছিলো। তারা মিশনের নৌ-মুক্তিযোদ্ধাদের নিরাপদে একেবারে চরলাক্ষায় পৌঁছানোর ব্যবস্থা করে দেয়। রাস্তায় একটি এ্যাম্বুলেন্স এবং বিদ্যুৎ বিভাগের একটি পিকআপ ভ্যান দেখতে পেলেও পাকিস্তানী সৈন্যদের মনে তেমন সন্দেহ জাগেনি। শুধু

তাই নয়, পাক-বাহিনীর নাকের ডগা দিয়ে গেঁয়ো পোশাক পরা একদল লোক ফলমূল, মাছ, চাউল এবং লবণের ঝুড়ি নিয়ে ফেরী নৌকায় উঠলো এবং চালক যখন নিশ্চিত মনে নৌকার মুখ ঘুরিয়ে কর্ণফুলীতে পারি জমালো তখনো পাকিস্তানীরা কিছু বুঝতে পারেনি। সবাই ভেবেছিলো বাজার সেরে বাড়ি ফিরছে। এই সব হাটুরে সওদার জন্য আগেই তাদেরকে টাকা-পয়সা দেওয়া হয়েছিলো। প্রতিটি ঝুড়ির একেবারে তলায় চটের থলেতে ছিলো লিমপেট মাইন, 'ফিন' ইত্যাদি। আবার কোনটায় ছিলো স্টেনগান।

১৪ই আগস্ট রেডিওতে দ্বিতীয় বাংলা গানটি শোনা গেলঃ "আমি তোমায় যতো শুনিয়েছিলাম গান, তার বদলে চাইনি কোন দান"। আসলে এটা ছিলো সাংকেতিক নির্দেশ। যার ফলে সেই রাতেই নৌ-মুক্তিযোদ্ধাদের পাকিস্তানী জাহাজসমূহে আঘাত করার কথা।

কিন্তু দুর্ভাগ্য, এই দলের অভিযান একদিন পিছিয়ে গেলো। ৩ নম্বর গ্রুপ ছাড়া সকলেই রাতের মধ্যে চরলাক্ষায় পৌঁছে গিয়েছিলো। ৩ নম্বর গ্রুপের যোদ্ধারা প্রায় ৮০ মাইল হেঁটে আসার পর ১৪ই আগস্ট একটি দিন তাদের বিশ্রাম দরকার। দিনের আলোতে কিছুটা ' রেকি' করাও দরকার। লক্ষ্যবস্তুগুলো প্রতিটি সদস্যের দেখা উচিত। যেখান দিয়ে তারা পানিতে নামবে এবং কাজ শেষ করে যেখানে তাদের উঠতে হবে সেসব জায়গাও আগে থাকতে দেখে রাখতে হবে। তাই একেবারে তাড়াতাড়ি করলেও পরবর্তী রাতের আগে কিছু আর হচ্ছে না।

১৪ই আগস্ট এখানে কিছু না ঘটলেও শত্রুপক্ষের জন্য সময়টি খুব একটা স্বস্তির ছিলো না। সারা রাত্রি সমগ্র সীমান্ত এলাকা এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন অংশে শত্রুর বিরুদ্ধে আমাদের যোদ্ধারা অসংখ্য আক্রমণ চালায়। আমাদের হতাশাগ্রস্ত জনগণও চাইছিলেন তাদের ছেলেরা ১৪ই আগস্ট কিছু একটা করুক। এমন একটা কিছু করুক যাতে পাকিস্তানীদের উচিত শিক্ষা হতে পারে।

১৫ই আগস্ট চরলাক্ষায় আমাদের ৪০ জন তরুণ-যাদের অধিকাংশেরই বয়স বিশের কোটা পার হয়নি- তাড়াতাড়ি রাতের খাবার খেয়ে নিয়ে স্বল্পক্ষণের একটু ঘুম দেয়।

রাত ১টা। বন্দরনগরী পুরো নিদ্রামগ্ন। শান্ত নদীতে শুধু স্রোতের কুলুকুলু ধ্বনি। নিঃশব্দে ওরা নদীর পাড়ের দিকে দ্রুত এগিয়ে যায়। অপর পাড়ের জেটিগুলো তখন বৈদ্যুতিক আলোয় ঝলমল। সার্চলাইট ফেলে নদীর ওপর লক্ষ্য রাখছে সান্ত্রীরা। ওরা ক্লান্ত। হয়তো ঘুমে ঢুলুঢুলু।

১৪ই আগস্ট এবং তার পূববর্তী কয়েকদিন পাকিস্তানীদের ওপর দিয়ে বেশ বড় রকমের ধকল গেছে। এ-রাতে তাদের সকলেই যেন একটু নিশ্চিন্ত। পাকা প্লাটফরম-এর ওপর লম্বা লম্বা ক্রেনের ছায়াগুলোকে কেমন ভৌতিক মনে হয়। তবে সান্ত্রীরা এ ছায়া চেনে। নদীর দিক থেকে তাদের কোন ভয়ের আশংকা নেই। কোন নৌকা কিংবা সাম্পান জাহাজের দিকে অগ্রসর হতে চাইলেই পরিস্কার দেখা যাবে। সে ক্ষেত্রে দূরপাল্লার অস্ত্রের কয়েকটি রাউন্ডই যথেষ্ট। কিন্তু তেমন কখনো ঘটেনি।

এমভি আল-আববাস এসেছে ৯ই আগস্ট। ১২ নম্বর জেটিতে নোঙ্গর করা এই জাহাজ ১০,৪১০ টন সামরিক সরঞ্জাম নিয়ে এসেছে।

একখানি বার্জে (ওরিয়েন্ট বার্জ নম্বর ৬) ২৭৬ টন অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ বোঝাই করে মৎস্য বন্দরের জেটির সামনে রাখা হয়েছে। এটাকে ট্রেনে ঢাকা নিয়ে যাওয়া হবে।

এমভি হরমুজ ১৪ই আগস্ট চট্টগ্রাম পৌছেছে। সঙ্গে নিয়ে এসেছে ৯,৯১০ টন সমর সম্ভার। ১৩ নম্বর জেটিতে জাহাজটি ভেড়ানো।

আরো কয়েকখানি জাহাজ ও বার্জ এদিক-ওদিক রয়েছে। নেভাল জেটিতে ছিলো দু'টি গানবোট এবং একখানি বার্জ। সন্ধ্যার পরই গানবোট দুটি অজ্ঞাত স্থানে অভিমুখে রওয়ানা হয়ে যায়। আমাদের ছেলেদের কপাল খারাপ। এমন সুন্দর দুটি শিকার হাতছাড়া হলো। রাত সোয়া আটটা। আল-আববাস এবং হরমুজের মাস্টার এবং ক্রুরা গভীর নিদ্রায় অচেতন। পাহারাদার এবং মিলিটারী সান্ত্রী আধো ঘুম আধো জাগরণে ঢুলছে। রাত দুটো বাজলেই তাদের ডিউটি শেষ। আর মাত্র ৪৫ মিনিট বাকী। তারপর অন্যরা আসবে।

মাথাটা পানির ওপরে রেখে ততক্ষণে আমাদের ছেলেরা যার যার লক্ষবস্তুর কাছে পৌঁছে গেছে। কালবিলম্ব না করে তারা জাহাজগুলোর গায়ে লিমপেট মাইন লাগিয়ে গিয়েই আবার তেমনি নিঃশব্দে নদীর ভাটিতে ভেসে যায়। আরো দক্ষিনে সরে গিয়ে তারা পূর্ব তীরে উঠে পড়ে। রাত পোহাতে তখনো অনেক বাকী। নিরাপদ দূরত্বে সরে যাবার পর্যাপ্ত সময় তারা পেয়ে যায়। সকাল নাগাদ তারা পটিয়া এবং সেখানে সারাদিন বিশ্রাম নিয়ে ১ নম্বর সেক্টর হেডকোয়ার্টার হরিণার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবে।

রাত ১টা ৪০ মিনিট। হঠাৎ কান ফাটানো আওয়াজে বন্দরনগরী চট্টগ্রাম কেঁপে ওঠে। লোকজন শয্যা থেকে লাফ দিয়ে নেমে পড়ে। শিশুরা ভয়ে কান্না শুরু করে। কিন্তু কি ঘটছে কেউ তা বলতে পারে না।

১টা ৪৫ মিনিট। আরেকটি প্রচন্ড বিস্ফোরণ। তারপর তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম। একটির পর একটি বিস্ফোরণে চট্টগ্রাম তখন থর থর করে কাঁপছে। আতংক ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র। সান্ত্রীরা দিকবিদিক জ্ঞান হারিয়ে পাগলের মতো ইতস্তত বিক্ষিপ্ত গুলি ছুড়তে শুরু করে। ৬ নম্বর ওরিয়েন্ট বার্জ দেখতে না দেখতে তলিয়ে গেল। আল-আববাস এবং হরমুজও দ্রুত ডুবতে থাকে। জাহাজের খোলে প্রচন্ড বেগে তখন পানি ঢুকছে। আশেপাশের জাহাজ ও বার্জগুলোও ক্ষতিগ্রস্ত। বিস্ফোরণে জাহাজের ক্রুদেরও অনেকে হতাহত হয়। কিন্তু ভয়ে কেউ সাহায্যের জন্য ওদিকে অগ্রসর হচ্ছে না, পাছে আবার বিস্ফোরণ শুরু হয়ে যায়।

সূর্যোদয়ের সাথে সাথেই সিনিয়র অফিসাররা দ্রুত বন্দরে গিয়ে উপস্থিত হন। সমগ্র এলাকায় সান্ধ্য আইন জারি করা হলো। মুক্তিবাহিনীর খোঁজে হেলিকপ্টারগুলো তখন আকাশে উঠে গেছে। পাকিস্তানীরা তাদের জিঘাংসা মেটাতে নদীর পূর্ব পাড়ের জনপদগুলোর উপর নির্বিচারে কামানের গোলাবর্ষণ করতে থাকে। নদীর পাড়ের গ্রামগুলোতে আগুন লাগিয়ে দেয়া হয়। সন্দেহের বশবর্তী হয়ে নিরপরাধ গ্রামবাসী এবং জেলেদের ধরে এনে মুক্তিবাহিনীর খবর বের করার বহু চেষ্টা হয়। শেষে কিছু না পেয়ে নদীর পাড়ে দাঁড় করিয়ে তাদের গুলি করে হত্যা করা হয়। নিরপরাধ নিরস্ত্র গ্রামবাসী আর জেলেদের রক্তাক্ত লাশগুলো স্রোতের টানে ভেসে চলে সমুদ্রের দিকে।

পটিয়াতে আমাদের যোদ্ধারা তখন বিশ্রাম নিচ্ছিলো। তারা একটি অতি বিপজ্জনক ও জটিল 'মিশন' সফল করেছে। তাদের এ সফল অভিযান স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে একটি বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।

ভোর তখন পাঁচটা। ঢাকাস্থ ইস্টার্ন কমাণ্ড হেডকোয়ার্টারের অপারেশন রুমে কর্তব্যরত স্টাফ অফিসার ঘটনার বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ না করেই সত্বর ঘটনা সম্পর্কে 'কোর' কমান্ডারকে অবিহিত করার সিদ্ধান্ত নেন। গেরিলাদের চাঁদপুর এবং মঙ্গলা বন্দরের হামলার খবরও কুমিল্লা এবং যশোর সেনানিবাস থেকে তড়িৎগতিতে হেডকোয়ার্টারে পাঠানো হয়। এই সকল আক্রমণে একদিকে যেমন শত্রুর বিপুল পরিমাণ সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি হয়, অপরদিকে পাকিস্তানীদের মিথ্যা দম্ভ আর অহমিক হয় ধূলিসাৎ। অপারেশন জ্যাকপট সফল হয় পুরোপুরিভাবে।

এদিনের ঘটনা সম্পর্কে ১৬ই আগস্ট পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর তদন্ত রিপোর্ট লেখা হয়েছিলোঃ "পরিস্থিতি পর্যালোচনার প্রেক্ষাপটে ক্ষয়ক্ষতি এবং হতাহতের ব্যাপারে জাহাজের কোন ব্যক্তিকেই দায়ী করা চলে না। কারণ পূর্ব থেকে কিছুই টের পাওয়া যায়নি এবং গেরিলারা যে এমন ধরনের অভিযান চালাতে পারে বা চালাবে তা কেউ কল্পনাও করতে পারেনি। অবশ্য নদীর দিকটা ভাল করে দেখাশোনার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। দিন-

রাত্রির কোন সময়েই কোন নৌকা ইত্যাদিকে আর জাহাজগুলোর ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে দেয়া হচ্ছে না।'' (পাক সেনাবাহিনীর তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট থেকে উদ্ধৃত)।

সামুদ্রিক ও নদীবন্দরগুলোর উপর এই চমকপ্রদ সফল হামলা পাকিস্তানীদের হকচকিত করে দিয়েছিলো। এমন একটা দুঃসাহসী অভিযান মুক্তিযোদ্ধারা চালাতে পারে এটা ছিলো পাকিস্তানীদের চিন্তারও বাইরে। এই হামলার আগ পর্যন্ত আমাদের যুদ্ধের পদ্ধতি সম্পর্কে পাকিস্তনীরা মোটামুটি পরিচিত হয়ে উঠেছিলো। সারা দেশ জুড়ে এ সময়ে মুক্তিযোদ্ধারা অসংখ্য ছোট ছোট হামলা চালায়। কিন্তু জুন-জুলাই মাসের এইসব ছোট ছোট হামলাগুলি ছিলো কম তাৎপর্যপূর্ণ। হ্যাণ্ডগ্রেনেড নিক্ষেপ, শত্রুর গাড়ি ধ্বংস, রাজাকার, দালাল, শান্তিবাহিনী বা আলবদর, আলশামস-এর লোকজন হত্যার মধ্যে এ সময়ের ঘটনাবলী সীমিত ছিলো। কোন গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যবস্তুর ওপর তখনও হামলা চালানো হয়নি। শত্রুপক্ষের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারাও ছিলো তখন পর্যন্ত অক্ষত। এমন কি নেতৃস্থানীয় বাঙালী দালালরা পর্যন্ত বেশ আয়েশের সাথে তাদের দৈনন্দিন কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছিলো। মাঝে- মধ্যে এদের ওপর পরিকল্পনাহীন কয়েকটি হামলা হলেও তা ব্যর্থ হয়ে গেছে। মাঝখান থেকে গেরিলারা ধরা পড়ে পাকিস্তানীদের হাতে প্রাণ দিয়েছে।

রণকৌশলের দিক থেকে শত্রুপক্ষের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রসমূহ বিভিন্ন হেডকোয়ার্টার, অফিসার মেস, অস্ত্র ও রসদ গুদাম, বিদ্যুৎ ও জ্বালানী কেন্দ্র, বন্দর, রেলওয়ে-এসবের উপর আগস্ট পর্যন্ত কোন সুপরিকল্পিত 'গেরিলা' হামলা চালানো হয়নি। ফলে আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক মহলে বাংলাদেশ প্রশ্ন মৃতপ্রায় হয়ে পড়ে। মুক্তিযোদ্ধাদের এবং দেশের মানুষের মনোবল কিছুটা যেন ভেঙ্গে পড়ে।

অন্যদিকে পাক-বাহিনীর অবস্থা তখন বেশ সুবিধাজনক। যুদ্ধের প্রথমদিকে আমাদের নিয়মিত বাহিনী তাদের বেশ কিছু ক্ষতি করেছিলো। শত্রুপক্ষে হতাহতের সংখ্যাও ছিলো প্রচুর। বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া খবরে মোটামুটি জানা যায়, পাঁচ থেকে ছয় হাজার শত্রুসৈন্য নিহত এবং আট থেকে দশ হাজার তখন আহত হয়েছিলো। আহতদের মধ্যে অন্তত এক-তৃতীয়াংশ পুনরায় যুদ্ধ করার অনুপযুক্ত হয়েছিলো।

সামরিকভাবে গেরিলা তৎপরতা সন্তোষজক না হলেও ভবিষ্যতের জন্য আমরা অবশ্যই আশাবাদী ছিলাম। মুক্তিযোদ্ধারা সম্পূর্ণ প্রচলিত পদ্ধতিতে দু'থেকে তিন সপ্তাহের ট্রেনিং পেত এবং ট্রেনিং শেষ করেই বাংলাদেশের অভ্যান্তরে তাদেরকে গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধ করতে হতো। তাছাড়া মুক্তিযোদ্ধাদের প্রায় সবারই বয়স কম, আবেগ বেশী। কেউ কেউ আবার অতিরিক্ত উচ্চভিলাষী। এরা প্রত্যেকেই গ্রুপ লিডার কিংবা ঐ ধরনের কিছু একটা হতে চাইতো। এটা বুঝতে চাইতো না যে সবাই ''লিডার'' হলে অনুসারী কোথা থেকে আসবে। অবশ্য যুদ্ধ সম্পর্কে আমাদের সকলের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত এর চাইতে বেশী কিছু আমাদের আশা করার ছিলো না।

এমনি যখন আমাদের অবস্থা যে সময়ে অপারেশন 'জ্যাকপট'-এর সাফল্য একথা প্রমাণ করেছিলো যে, যথাযথ শিক্ষা এবং নেতৃত্ব দিতে পারলে আমাদের ছেলেরাও অবিশ্বস্য কাজ করতে পারে। তাদের মধ্যে আন্তরিকতার কোন অভাব ছিলো না। তারা বুদ্ধিমান, কোন পরিস্থিতিতে কি করতে হবে দ্রুত তা বুঝে নিতেও সক্ষম। তাদের মানসিক উৎকর্ষ ছিলো নিঃসন্দেহে নিরক্ষর পাকিস্তানী সৈন্যদের চাইতে উত্তম। শিক্ষিত এক বিরাট গেরিলা বাহিনী আমরা পেয়েছিলাম, এটা আমাদের সৌভাগ্য।...

সেপ্টেম্বর থেকে প্রতি মাসে ২০ হাজার গেরিলাকে ট্রেনিং প্রদান করে তাদেরকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এই হিসাবে '৭১- এর ডিসেম্বরের মধ্যে বাংলাদেশে গেরিলাদের সংখ্যা অনুমান করা হয় এক লাখের ওপরে। এদের মধ্যে শতকরা ৩০ ভাগ যথাযথভাবে কাজ করলেও পাক বাহিনীর সময় পরিকল্পনায় একটা ভাঙ্গন ধরানো সম্ভব। এই পরিস্থিতিতে গেরিলাদের নিয়েই ব্যস্ত থাকতে হবে পাকিস্তানী

সেনাবাহিনীকে। আর চূড়ান্ত আঘাত হানার সেটাই সুবর্ণ সুযোগ। একদিকে যেমন চলছিলো এসব পরিকল্পনা, অন্যদিকে সময়ের সাথে সাথে ভারত ও পাকিস্তান ক্রমান্বয়ে এগিয়ে চলছিলো একটা অবশ্যম্ভাবী যুদ্ধের দিকে।

কোণঠাসা

সেপ্টেম্বর থেকেই ভারতে ব্যাপক যুদ্ধ প্রস্তুতি শুরু হয়। ডিভিশনাল এবং কোর হেডকোয়ার্টারগুলো অগ্রবর্তী স্থানসমূহে অবস্থান গ্রহণ করতে থাকে। সরবরাহ ব্যবস্থা ও রণপ্রস্তুতিতে ব্যাপক চাঞ্চল্য লক্ষ করা যায়। ভারতীয় সেনাবাহিনী সম্ভাব্য সংঘর্ষস্থল- অভিমুখী সড়ক নির্মাণ, সেতুগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের কাজ পূর্ণ উদ্যমে শুরু করে। কতগুলো ইউনিট সীমান্তবর্তী ঘাঁটিসমূহে অবস্থান নেয়। ভূ-প্রকৃতি এবং সম্ভাব্য রণাঙ্গনের অবস্থা বিশ্লেষণসহ ব্যাপক পর্যবেক্ষণ তৎপরতা চলতে থাকে।

এদিকে আমরা প্রতিদিন ট্রেনিংপ্রাপ্ত শত শত মুক্তিযোদ্ধাকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পাঠাচ্ছিলাম বটে, কিন্তু তেমন কোন উল্লেখযোগ্য ফল পাচ্ছিলাম না। সকল স্তরে নেতৃত্বদানের অভাবই ছিল আমাদের প্রধান অন্তরায়। কোন স্থানেই আমদের কার্যকর নিয়ন্ত্রণ স্থাপিত হচ্ছিলো না এবং গেরিলা তৎপরতা আশানুরূপ জোরদার করার ক্ষেত্রেও পেছনে পড়ে যাচ্ছিলাম। এ সময়ে বাংলাদেশে নেতৃত্বেও শূণ্যতা পূরণের জন্য, বিশেষ করে গেরিলা ঘাঁটিগুলোর জন্য কিছুসংখ্যক এম-সি-এ (গণপরিষদ সদস্য) কে ট্রেনিং দেওয়ার একটা উদ্যোগ নেয়া হয়। উপস্থিত এম-সি-এ দের যারা উৎসাহী এবং শারীরিক দিক থেকে সমর্থ- তাঁদেরকে গেরিলা যুদ্ধের কায়দা-কানুন, বিশেষতঃ গেরিলাদের নিয়ন্ত্রণ ও নেতৃত্বদানের বিষয়ে ট্রেনিং প্রদানই এই প্রচেষ্টর লক্ষ্য। কথা ছিল ট্রেনিংয়ের পর তারা বাংলাদেশে যার যার এলাকায় গিয়ে গেরিলা তৎপরতা পরিবচালনা করবেন। আমার সেক্টরে এম-সি-এ জনাব মোশাররফ হোসেন এবং আরো কয়েকজন রাজনৈতিক নেতা এ ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ গ্রহন করেন। গেরিলাদের নেতৃত্বদানের জন্য তাঁদেরকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পাঠানো হয়েছিলো। অন্যান্য সেক্টরের কয়েকজন এম-সি-এ কে পাঠানো হয়। কিন্তু সারা দেশে এ কাজের জন্য প্রেরিত এম-সি-এ দের সংখ্যা ছিল নিতান্তই নগণ্য। অল্প কয়েকজন এস-সি-এ ট্রেনিং গ্রহণ করেছিলেন, যুদ্ধ করতে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছিলেন তার চাইতেও কম। ফলে পরিকল্পনাটি তেমন কোন কাজে আসেনি।

সমগ্র উপমহাদেশ জুড়ে একদিকে যখন ব্যাপকতর যুদ্ধ আসন্ন হয়ে আসছিলো তখন অন্যদিকে সামরিক আরো জোরদার করার জন্য আমাদের অর্থাৎ সেক্টর কামন্ডারদের ওপরও চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছিলো। বলা হচ্ছিল শত্রুকে আগে ছত্রভঙ্গ করে ও দুর্বল করে রাখতে হবে। তাহলে সহজেই চূড়ান্ত অভিযান চালিয়ে তাদের পরাভূত করা সম্ভব হবে এবং এই লক্ষ্য অর্জন করতে হবে যথাসাধ্য স্বল্প সময়ের মধ্যে, সম্ভব হলে নভেম্বরের মধ্যেই।

অথচ অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য দিক দিয়ে আমাদের যা সামর্থ তাতে করে এই সীমিত সময়ের মধ্যে আরদ্ধ দায়িত্ব পালন করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। আমার ১ নম্বর সেক্টরের আওতায় ছিলো মহুরী নদীর সমগ্র পূর্বাঞ্চল, অর্থাৎ পুরো চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা। এখানে শত্রুপক্ষের শক্তি ছিলো দুই ব্রিগেডের বেশী। এ ছাড়া পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত আরো দু'টি আধা-সামরিক ব্যাটালিয়ন এই অঞ্চলে শত্রুপক্ষের শক্তিবৃদ্ধি করছিলো। আমাদের পক্ষে ছিলো ইপিআর, পুলিশ এবং সেনাবাহিনীর লোক নিয়ে তিনটি ব্যাটালিয়ন। সমগ্র সেক্টরে অফিসার পেয়েছিলাম সেনাবাহিনীর চারজন এবং বিমান বাহিনীর দু'জন। পাক সোনাবাহিনীর পক্ষে এখানে অফিসারের সংখ্যা ছিলো অন্যূন ১৫০। ১ নম্বর সেক্টরে সাব-সেক্টর করেছিলাম পাঁচটি। এর প্রতিটির কমান্ডে ছিলো একজন অফিসার কিংবা একজন জেসিও। কমাণ্ড সংক্রান্ত জটিল সমস্যাবলীর ব্যাপারে এঁদের অভিজ্ঞতা ছিলো নিতান্তই সামান্য। আর আমার এলাকায় সক্রিয় যুদ্ধ চলছিলো অর্ধশতাধিক মাইলেরও অধিক সীমান্ত এলাকা জুড়ে।

সেক্টর হেডকোয়ার্টারেই সমস্যার চাপ ছিলো সবচাইতে বেশী। আমার একজন মাত্র স্টাফ অফিসারকে সকল প্রাশাসনিক এবং সরবরাহ ব্যাবস্থা দেখতে হতো। কাজের মেয়াদ ছিলো দিনরাত ২৪ঘন্টা এবং সপ্তাহে সাত দিন। কাজের অসহ্য চাপে আমার স্টাফ অফিসার শেষ পর্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়ে। কিন্তু হাসপাতালে কয়েকদিন থাকার পর আবার তাকে কাজ শুরু করতে হয়। এই অবস্থার কোন বিকল্প খুঁজে পাচ্ছিলাম না।

আমাদের সরবরাহ ঘাঁটি ছিলো আগরতলায়। তিন হাজার লোকের জন্য রেশন, জ্বালানী, তাঁবু ও অন্যান্য সরঞ্জাম, কাপড়-চোপড়, অস্ত্রশস্ত্র, ঔষধপত্র সবকিছু সেখান থেকে নিয়ে আসতে হতো। সেই একই গাড়িতে করে দুর্গম পার্বত্য অঞ্চল পাড়ি দিয়ে এগুলো আবার বিভিন্ন সাব-সেক্টরে পৌঁছানো হতো। বৃষ্টি-বাদলের দিনে সরবরাহ ব্যাবস্থা চালু রাখতে আমাদের জীবন ওষ্ঠাগত হয়ে উঠেছিলো। কোন কোন সময় গাড়ি রাস্তার বাইরে গড়িয়ে পড়লে কিংবা হাঁটু সমান কাঁদায় চাকা বসে গেলে সেই গাড়ি না তোলা পর্যন্ত কিংবা রসদপত্র মাথায় করে গন্তব্যস্থলে না পৌঁছানো পর্যন্ত সেখানে একজন অফিসারকে অপেক্ষা করতে হতো।

গেরিলা বাহিনীর প্রাশাসনিক এবং অভিযান নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত দায়িত্ব ছিলো আরো কষ্টকর। বাংলাদেশের অভ্যান্তরে নিযুক্ত লাভের আশায় শত শত গেলিলা প্রতিদিন আমার হেডকোয়ার্টারে আসতো। তাদেরকে এলাকা ভিত্তিক গ্রুপে ভাগ করতে হতো, তারপর আসতো দায়িত্ব সম্পর্কে তাদেও ব্রিফিং-এর পালা। প্রতিটি গ্রুপকে ব্রিপিং করতে কম করে হলেও এক ঘন্টা সময় লাগতো। বিশেষ কাজের জন্য ব্রিফিং-এ সময় লাগতো আরো বেশী। প্রত্যেক গ্রুপকেই অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ, এবং রাহা খরচ দিতে হতো। ছেলেদের নিরাপদে ভেতরে পাঠানোর জন্য শত্রু বাহিনীর তৎপরতা ও চলাচল সংক্রান্ত সর্বশেষ খবর সংগ্রহ করতে হতো। টহলদার শত্রুসেনারা এক জায়গায় থাকতো না বলে সর্বশেষ খবরেরও পরিবর্তন ঘটতো। এদের কাছে গাইড থাকতো। তারা নিরাপদ রাস্তা ধরে নিকটবর্তী ঘাঁটিতে নিকটবর্তী ঘাঁটিতে (সাধারনতঃ সীমান্তরেখা থেকে ৮-১০ মাইলের মধ্যে) গেরিলাদের পৌঁছে দিতো। নতুন আগন্তুকদের সম্পর্কে ঘাঁটিতে আগেই খবর দেয়া থাকতো। সেখানে তাদের খাদ্য ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা হতো। একই পদ্ধতিতে সেখান থেকে তাদের রওয়ানা হতে হতো পরবর্তী ঘাঁটিতে। তাদেরকে অতি সাবধানে আক্রমণ স্থলের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য যানবাহনের দরকার হতো। প্রত্যেক গ্রুপ সদস্যদের নাম-ঠিকানা, তাদের পরিকল্পিত পথ, ঘাঁটি, অস্ত্রশস্ত্র, গোলা-বারুদের হিসাব, কাপড়-চোপড়, রেশন, পথ খরচের টাকা-পয়সা সব কিছুর বিস্তারিত রেকর্ড রাখতে হতো। দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করার পর প্রতিটি গ্রুপের সাথে আমাদের যোগাযোগ রাখতে হতো। তাদের উপর নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করা এবং নির্ধারিত দায়িত্ব পালন নিশ্চিত করার ব্যাপারেও আমাদের তৎপর থাকতে হয়। গ্রুপগুলো নিরাপদে গন্তব্য স্থলে পৌঁছে যাওয়ার পর আমাদের তারা সে খবর জানিয়ে দিতো। তারা কোন অভিযান চালালে কিংবা শত্রুপক্ষের কোন তথ্য সংগ্রহ করতে পারেলে তাও আমাদের জানাতে হতো। আমাদের সেক্টরের ভিন্ন জায়গায় তিনটি গোপন অয়্যাসলেস সেট চালু ছিলো। এগুলোর মাধ্যমে বাংলাদেশ থেকে আমরা নিয়মিত খবর সংগ্রহ করতাম। এছাড়া খবর সংগ্রহ করে এক বিরাট নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছিলাম। বিভিন্ন দলের কাছ থেকে খবর নিয়ে এরা সেক্টর হেডকোয়ার্টারে পৌঁছে দিতো। ফেরার পথে আবার তারা বিভিন্ন দলের গাইড হিসেবে কাজ করতে। এইভাবে তাদের আবর্তনমূলক কাজ চলতো দিনের পর দিন। চর্তুদিকে সবকিছু সবসময় চালু রাখাই ছিলো আমাদের প্রধান দায়িত্ব। এর কোন একটা থামলেই বিপদের সম্ভাবনা।

স্বাধীনতা যুদ্ধের সাথে জড়িত সকল শ্রেণীর লোকেরই তখন সঙ্গীন অবস্থা। মন্ত্রীসভার সদস্যবৃন্দ, আর্মি হেডকোয়ার্টারের নেতৃবৃন্দ, কিংবা ফ্রন্ট লাইনে সংগ্রামরত যোদ্ধ সকলেরই অবস্থা অভিন্ন। যুদ্ধরত সৈনিক ও গেরিলাদের ওপর নির্দেশ আসতে থাকে যুদ্ধ আরো জোরদার করার। মুক্তিযোদ্ধারা শত্রুকে অনবরত আঘাত হেনে চলেছিলো। তাদের হাতে বিপুলসংখ্যক শত্রু নিহত কিংবা আহতও হয়েছে। নিজেরাও হতাহত হয়েছে। কিন্তু কোনদিন এর স্বীকৃতি কিংবা প্রশংসা তারা খুব বিশেষ পায়নি। এ কারণে স্বভাবতই তারা ছিলো ক্ষুব্ধ।

পার্বত্য চট্টগ্রামের একেবারে উত্তর প্রান্তে ডেমাগিরিতে কয়েক শত ছেলে ট্রেনিং নেয়ার জন্য মাসের পর মাস অপেক্ষা করেছে। তাদের মধ্যে কয়েকজন জ্বরে এবং রক্ত আমাশয়েও মারা গেছে। অন্যদেরকে দিনের পর দিন,

সপ্তাহের পর সপ্তাহ অনাহারে কাটাতে হয়েছে। শত মাইল দুর্গম এবং পার্বত্য অঞ্চল ও নিবিড় বনানী পার হয়ে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেয়ার জন্য তারা এসেছিলো। কিন্তু কেউ তাদের সম্পর্কে সামান্যতম আগ্রহও প্রকাশ করেনি। তারা যে মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে বাড়িঘর ছেড়েছিল তার স্বীকৃতিও কারো কাছ থেকে তারা পায়নি।

যুদ্ধে নিয়োজিত গেরিলাদের শতকরা পঞ্চাশ জনের জন্য ভারত অস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহ করছিলো (পরে অবশ্য শতকরা ৯০ জনকে অস্ত্র সরবরাহের ব্যাবস্থা করা হয়)। বাকী ছেলেদের খালি হাতে যুদ্ধে পাঠানো কিংবা অপেক্ষা করতে বলা ছাড়া আমাদের কোন গত্যন্তর ছিলো না। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর হেডকোয়ার্টারের নির্দেশ ছিলো, অস্ত্র ছাড়া কাউকে যেন গেরিলা যুদ্ধে পাঠানো না হয়। আমাদের সবচাইতে সহজ উপায় ছিলো দুই গ্রুপের অস্ত্র দিয়ে তিনটি গ্রুপকে পাঠানো। ফলে প্রতিটি গ্রুপের শতকরা ৩০ থেকে ৪০ ভাগ ছেলেকে সরবরাহের অপ্রতুলতার জন্য ক্যাম্পে বসিয়ে রাখতে হতো। এদের জন্য আবার রেশন পেতাম না, ফলে সমস্যা আরো মারাত্মক আকার ধারণ করতো। আমরা স্থানীয়ভাবে এর কিছুটা সমাধান বের করেছিলাম। সকল অফিসার, জেসিও এবং অন্যান্য র‍্যাংকের সৈনিক মিলে একটা মাসিক চাঁদার ব্যবস্থা করেছিলাম। এর মাধ্যমে যা কিছু আয় হতো তা দিয়ে বাড়তি আহার যোগানোর চেষ্টা চলতো। এই ব্যবস্থা ছিলো অনিয়মিত এবং পরিস্থিতির চাপে পড়েই আমাদের এটা করতে হয়েছিলো। অথচ এর জন্যও আমাদের ভুল বোঝা হতো, আমরা হতাম সমালোচনার পাত্র। উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা আমাদেও সম্পর্কে অনেক গোপন চিঠিতে লিখতেন, "বাংলাদেশের সেক্টও কমান্ডাররা পুরো নিয়ম মেনে চলছেন না"। এ বিষয়ে ভারতীয় অফিসারদেও এই মতামত সম্ভবত অনেকাংশে সঠিক ছিলো। তাদেও ওপর ভারতীয় আর্মি হেডকোয়ার্টারের সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকতো, গেরিলাদের ট্রেনিং শেষ হওয়ার তিন থেকে চার দিনের মধ্যে সকলকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পাঠানোর ব্যাবস্থা করতে হবে-তা সে সবাইকে অস্ত্র সরবরাহ করে কিংবা মাত্র কিছু অস্ত্র সরবরাহ করেই হোক। কিন্তু আমাদের উপর বাংলাদেশে সেনাবাহিনীর হেডকোয়ার্টারের নির্দেশ ছিলো সবাইকে অস্ত্র সজ্জিত না করে কোন গ্রুপকেই যেন বাংলাদেশের অভ্যান্তরে যুদ্ধে পাঠানো না হয়।

বাংলাদেশ আর্মি হেডকোয়ার্টার এবং ভারতীয় আর্মি হেডকোয়ার্টারের মধ্যে সমন্বয় তখনও পুরো গড়ে ওঠেনি বলেই হয়তো আমাদের জন্যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিলো।

গেরিলা যোদ্ধা

আগস্ট মাস থেকেই আমাকে কাপ্তাই পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং চট্টগ্রাম বন্দরের নিকটবর্তী বাংলাদেশের একমাত্র তৈল শোধানাগারটি অচল করার জন্য চাপ দেয়া হচ্ছিল। কিন্তু এই গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র দুটি ধ্বংস হলে পাকিস্তানীদের চাইতে আমাদের ক্ষতি বেশী হবে বলে মনে করে আমি দুটি প্রস্তাবই প্রত্যাখ্যান করি। বিদ্যুৎ ব্যাবস্থা বিচ্ছিন্ন এবং জ্বালানীর অভাব দেখা দিলে শত্রুদের যানবাহন চলাচল সীমিত হয়ে পড়বে এবং এতে করে তাদের তৎপরতাও হ্রাস পাবে। কিন্তু আমার মনে হয়েছিলো কেন্দ্র দুটি ধ্বংস না করেও অন্যভাবে আমাদের লক্ষ্য হাসিল করা সম্ভব।

আমরা ভাবনাকে সামনে রেখে একটি নতুন পরিকল্পনা প্রণয়ন করে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ব্রিগেডিয়ার সাবেগ সিং-এর সঙ্গে কথা বলি। তিনি ভারত সরকারের পক্ষ থেকে বাংলাদেশে ১,২ এবং ৩ নম্বর সেক্টরের কার্যক্রম ও চাহিদা সংক্রান্ত বিষয়ে সমন্বয়কারীর দায়িত্বে ছিলেন। আমার পরিকল্পনা ছিলোঃ

১। মদনঘাটে বিদ্যুৎ বিভাগের সাব-স্টেশন ধ্বংস করা।

২। কাপ্তাই এবং চট্টগ্রামের মধ্যে যতগুলি সম্ভব বৈদ্যুতিক পাইলন ধ্বংস করতে হবে।

আমার বিশ্বাস ছিলো, দু'টি কাজ করতে পারলেই শত্রুপক্ষের বিদ্যুৎ সরবরাহ বিশেষ করে চট্টগ্রাম বন্দরের বিদ্যুৎ ব্যবস্থা বিঘ্নিত হবে এবং এতে ওদের বাণিজ্য ও অন্যান্য জাহাজ নোঙ্গরে অচলাবস্থা সৃষ্টি হবে।

যথারীতি পরিল্পনাটি বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গ্রহীত হলে এ কাজের জন্য আমি আমার সাথে কার্যরত বিমান বাহিনীর নির্ভীক অফিসার ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট সুলতানকে মনোনীত করলাম। সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে তাকে আমি পরিকল্পনাটি বুঝিয়ে দিলাম এবং তার রেইডিং পার্টির সদস্যদেররক বেছে নিতে বললাম। এরপর সবাই মিলে আমরা কয়েকটি মহড়া দিলাম। 'রেইডিং' পার্টির সদস্যদেরকে কি কাজে কোথায় পাঠানো হচ্ছে সেকথা আগে বলা হতো না। একবারে সর্বশেষ ঘাঁটিতে পৌঁছার পর যখন তারা লক্ষ্যবস্তুর উপর আঘাত হানতে যাবে তখনই তাদেরকে বলা হবে, তার আগে নয়। সুলতান তাঁর দলের লোক এবং প্রযোজনীয় অস্ত্রশস্ত্র বেছে নিলো। বিদ্যুৎ ব্যবস্থা ধ্বংস করা ছাড়াও সুলতানের ওপর ঐ এলাকায় গেরিলা তৎপরতা হ্রাস পাওয়ার কারণ নির্ণয়ের দায়িত্ব দেয়া হলো।

১১ই সেপ্টেম্বর সুলতানের সঙ্গে কয়েকজন বিশেষ ট্রেনিংপ্রাপ্ত এবং কিছুসংখ্যক নিয়মিত সৈন্যকে হরিণা থেকে এ অভিযানে পাঠানো হলো।

৩রা অক্টোবর তার পার্টি দুঃসাহসী অভিযান চালিয়ে শহর থেকে মাত্র মাইলখানেক দূরেই মদনাঘাটের বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার ধ্বংস করে দিলো। বহুসংখ্যক বৈদ্যুতিক পাইলনও উড়িয়ে দেওয়া হয়। এতে কাপ্তাই থেকে সরবরাহ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে পড়ে। বিশেষভাবে সুরক্ষিত মদনাঘাট বিদ্যুৎ কেন্দ্রটির চারদিকে ছিলো ইঁটের দেয়াল আর দুর্ভেদ্য কাঁটাতারের বেড়া। এখানে মোতায়েন থাকতো ১০জন নিয়মিত সৈন্য এবং ২০ জন আধা-সামরিক বাহিনীর সদস্যের একটি প্লাটুন। তারা সব সময় চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখছিলো। তার মধ্যে থেকে সুলতান তাঁর দল নিয়ে শত্রুর উপর সফলতার সাথে এই আক্রমণ সম্পন্ন করে। আগস্ট মাসের মাঝামাঝিতে বন্দরের জাহাজ ধ্বংসের পর আবার দুঃসাহসী হামলায় শত্রুরা দিশেহারা হয়ে পড়ে। তারা বুঝতে পারলো যে গেরিলারা ক্রমান্বয়ে অধিকতর শক্তিশালী হয়ে উঠছে।

অভিযান শেষ করে ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট সুলতান ঐ এলাকার অধিকাংশ গেরিলা গ্রুপের সঙ্গে যোগাযোগ করে। তাদের অসুবিধা এবং সমস্যাবলী নিয়েও আলোচনা হয়। ১১ই অক্টোবর হরিণায় ফিরে এসে সুলতান বিস্তারিত রিপোর্ট পেশ করেন।

গেরিলারা গ্রামাঞ্চলে বেশ কার্যকর অবস্থান গড়ে তুলছিলো। বস্তুতঃ সারা দেশটাই তখন বিরাট এক গেরিলা ঘাঁটিতে পরিণত হয়েছিলো। ফলে যখন তখন ছেলেরা যেকোন দিকে অভিযান চালাতে পারতো। রাতগুলো ছিলো একান্তভাবেই তাদের। ফলে পাকিস্তানী সৈন্যরা রাতের বেলায় পারতপক্ষে বাইরে বের হতো না।

আমাদের পক্ষে জনগনের সমর্থন ছিলো ব্যাপক। গেরিলাদের সাহায্যে আসতে পারলে লোকজন সম্মানিত এবং গর্ব অনুভব করতো। গেরিলাদের খাদ্য ও আশ্রয় দেয়ার অপরাধে পাকিস্তানীরা বহু লোককে হত্যা করেছে, তাদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে, সহায়-সম্পত্তি লুট করে সেই লুটের মালের বখরা পুরস্কার হিসাবে রাজাকার ও দালালদের দেয়া হয়েছে। এতদসত্ত্বেও জনগণের হৃদয় আবেগ এবং উচ্ছ্বাসের উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে, যখন দেখেছে অল্প বয়সী তরুণেরা ভারী অস্ত্র-গোলাবারুদের ভারে ন্যুব্জ হয়েও দৃঢ়প্রত্যয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে শত্রুহননে এগিয়ে চলেছে। বাংলার জনগণ মুক্তিযোদ্ধাদের স্বাগত জানানোর জন্য সাগ্রহে প্রতীক্ষা করেছে দিনের পর দিন। দেশের ভেতরে অবস্থানকারী লোকজন যদি সেদিন এই ত্যাগ স্বীকার না করতো তাহলে অঙ্কুরেই আমাদের স্বাধীনত আন্দোলনের স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটতো।

যুদ্ধের মুখোমুখি

আমরা সিদ্ধান্ত নেই, রণকৌশলের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ এলাকা এবং যেসব সীমান্ত ফাঁড়িতে শত্রুর প্রহরা একটু কম, সেগুলো দখলের মাধ্যমেই আমাদের অভিযান শুরু হবে। প্রতিটি অভিযান শুরুর পূর্বেই ভারতীয়

গোলন্দাজ বাহিনী আমাদের সহযোগিতা করবে। সীমান্তবর্তী এলাকা এবং সীমান্ত ফাঁড়ি দখল পরিকল্পনার পেছনে কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য ছিলো, সেগুলো হচ্ছেঃ

(ক) এইসব সীমান্ত ফাঁড়ি বা সীমান্ত এলাকা দখলের যুদ্ধে আমাদের বাহিনীর দক্ষতা ও দুর্বলতা আমরা নিরূপন করতে পারবে।

(খ) সকলকে বুঝিয়ে দেয়া যে, লক্ষ্য অর্জনে আমরা বদ্ধপরিকর। এবং আমাদের এই অভিযান অব্যাহত থাকবে। এতে করে শত্রুরা গেরিলাবিরোধী তৎপরতা কমিয়ে আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থায় আরো বেশী শক্তি নিয়োগ করবে। শত্রুদের এভাবে সীমান্ত এলাকায় ব্যস্ত রাখতে পারলে দেশের অভ্যন্তর ভাগে শত্রুর সংখ্যা কমে যাবে, ফলে গেরিলাদের কাজ করা আরো সহজ হবে।

(গ) এ ধরনের সংঘর্ষের মাধ্যমেই শত্রুর প্রস্তুতি এবং তার প্রতিরোধ ক্ষমতার মাত্রাও আমরা পরিমাপ করতে পারবো।

সীমান্তরেখা বরাবর আমাদের তৎপরতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানীরা ঠিকই অভ্যান্তর ভাগের শক্তি কমিয়ে সীমান্তে এনে সৈন্য জড়ো করতে থাকে। এতে বিভিন্ন স্থানের পরিস্থিতি গেরিলাদের অনুকূল হয়ে ওঠে। অবশ্য, এই সঙ্গে কিছুটা অসুবিধাও দেখা দেয়। সীমান্ত এলাকায় শত্রুর শক্তি বৃদ্ধি পাওয়ায় নতুন ট্রেনিংপ্রাপ্ত গেরিলাদের সেই পথ দিয়ে দেশের ভেতরে পাঠানো ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। ভেতরে প্রবেশের প্রায় সকল পথই শত্রুসৈন্যরা বন্ধ করে দেয়।

২২শে সেপ্টেম্বর চম্পকনগর সীমান্ত ফাঁড়ি এবং প্রধান সড়কের ওপর গুরুত্বপূর্ণ বল্লভপুর এলাকা দখল করার জন্য আমরা প্রচেষ্টা চালাই। আক্রমণের আগে ভারতীয় গোলন্দাজ বাহিনী লক্ষস্থলের ওপর গোলাবর্ষণের মাধ্যমে শত্রুর সুদৃঢ় অবস্থানগুলো ধ্বংস করার চেষ্টা করে।

কিন্তু দীর্ঘ ছয় ঘণ্টা যুদ্ধের পর আমরা পশ্চাদপসরণে বাধ্য হই। কামানের গোলায় শত্রুর তেমন কোন ক্ষতি হয়নি। পাকিস্তানীদের বাংকারগুলো ছিলো খুব মজবুত। প্রতিটি প্রতিরক্ষা বাংকারেই শত্রুরা ভূগর্ভে কয়েকদিন থাকার মতো রসদপত্র মজুত করে রেখেছিলো। ঘাঁটিগুলোর মধ্যে আবার গভীর ট্রেঞ্চপথে যোগাযোগ ছিলো। তাছাড়া আমরা যা অনুমান করেছিলাম তার চাইতেও বেশী ছিলো তাদের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের সম্ভার।

চম্পকনগর সীমান্ত ফাঁড়ি আক্রমণের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিলো ক্যাপ্টেন মাহফুজকে। ফাঁড়ির ডান পাশ দিয়ে নিজেদেরকে আড়াল করে আমি ওদের অগ্রসর হবার নির্দেশ দেই। কিন্তু লক্ষ্যস্থলের চারপাশে কয়েকশ' গজ এলাকায় গা ঢাকা দেয়ার মত তেমন কোন ফসলের ক্ষেত, উঁচু ভূমি অথবা বন-জঙ্গল ছিলো না। পার্শ্ববর্তী একটি পাহাড় থেকে আমি যুদ্ধ পরিচালানা করছিলাম। ফাঁড়িটি থেকে এর দূরুত্ব ছিলো আটশত গজের মত। সেখান থেকে আমি লক্ষ্যস্থলের অনেক কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম। অয়্যারলেসে মাহফুজ আমার সাথে যোগাযোগ রাখছিলো। আমাদের বাহিনীর 'কভার' দেয়ার জন্য কামানসহ ভারতীয় গোলান্দাজ বাহিনীর একজন পর্যবেক্ষকও আমার সাথে ছিলেন। আগেই উল্লেখ করেছি, আমাদের সৈন্যদের অগ্রসর হওয়ার আগে কামান থেকে গোলাবর্ষণ করা হয়। কামানের গোলাবর্ষণ শেষ হলে আমাদের বাহিনী চূড়ান্ত আঘাত হানার জন্য দ্রুত অগ্রসর হতে থাকে। এ সময় শত্রুরাও প্রচন্ড বেগে গুলীবর্ষণ শুরু করে। ফাঁড়ির হান এবং বাম উভয় পার্শ্ব থেকেই একটি করে মেশিনগান আমাদের 'কোম্পনীকে' যথেষ্ট বিপাকে ফেলে দেয়। দুর্ভাগ্যক্রমে মাহফুজের একমাত্র অয়্যারলেস সেটটিও তখন বিকল হয়ে পড়ে। একটির বেশী দেবার মত মজুত কোন সেট আমাদের ছিলো না। অয়্যারলেস সেট নষ্ট হতেই মাহফুজ তার প্লাটুনের সাথে যোগাযোগ হারিয়ে ফেলে এবং আমার ও মাহফুজের মধ্যকার সংযোগও বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কিছুক্ষণ পরেই শুভপুর সেতুর দিক থেকে পাকিস্তানীদের কামানের গোলা আমাদের ওপর এসে পড়তে থাকে। এদিকে করেরহাট এলাকা থেকে আরো শত্রুসৈন্য দ্রুত চম্পকনগর এসে পৌঁছায়।

কামানের গোলা, বিশেষ করে এয়ারবার্স্ট শেল বিস্ফোরণের ফলে আমাদের কোম্পানীর পক্ষে আর অগ্রসর হওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। পাকিস্তানী মেশিনগানগুলোর সঠিক অবস্থান জানার জন্য আমি মাহফুজের সাথে যোগাযোগ করার অনেক চেষ্টা করি। অবস্থান জানতে পারলে ভারতীয় কামান থেকে মেশিনগানের ওপর গোলাবর্ষণ করা যেতো। আমাদের অবস্থান থেকে আমি কিংবা ভারতীয় গোলন্দাজ পর্যবেক্ষক কেউই মেশিনগানগুলো দেখতে পাচ্ছিলাম না। যোগাযোগ ব্যবস্থা অচল হয়ে পড়ায় আমাদের সকল পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়।

এই পরিস্থিতিতে কোম্পানীকে আরো এগিয়ে যেতে বলা আত্মহত্যারই সামিল ছিলো।

বল্লভপুর এলাকাতেও আমাদের কোম্পানী কমান্ডারকে শুরুতেই থমকে পড়তে হয়। তার দুটি প্লাটুন লক্ষ্যস্থলের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলো, কিন্তু প্লাটুন কমান্ডারদের সাথে যোগাযোগ রক্ষার জন্য তার হাতে কোন অয়্যারলেস সেট ছিলো না। প্লাটুন দুটির সন্ধান লাভের জন্য সে তখন বার্তাবাহক পাঠায়। তাদের খুঁজে পাওয়া গিয়েছিলো বটে, কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। দিনের আলো ফুটে উঠতেই পাকিস্তানীরা আমাদের দেখে ফেলে এবং তাদের কামানগুলো সক্রিয় হয়ে ওঠে।

এই দুটি আক্রমণেই একমাত্র যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবে আমরা সফল হতে পারিনি। কোম্পানী কমান্ডারদের যোগাযোগ রক্ষার জন্য আমার কাছে অয়্যারলেস সেট ছিলো অপ্রতুল আর প্লাটুন কমান্ডারদের সাথে যোগাযোগ রক্ষার জন্য কোম্পানী কমান্ডারদের কোন অয়্যারলেস সেট ছিল না। নিজের প্লাটুনগুলোর সাথে সুষ্ঠু ব্যবস্থা না থাকলে কোন কোম্পনী কমান্ডারের পক্ষে রাত্রে এ ধরনের আক্রমণ চালানো বেশ অসুবিধাজনক হয়ে পড়ে।

সাময়িকভাবে আমরা ব্যর্থ হলেও এ দুটো প্রচেষ্টায় আমরা বুঝতে পারি যে, আমাদের সেনারা যুদ্ধের জন্য উল্লেখযোগ্য দক্ষতা অর্জন করতে পেরেছে। যথাযথভাবে পরিকল্পনা নেয়া হলে এবং যোগাযোগের সাজসরঞ্জাম ও ভারী অস্ত্রের সাহায্যে পাওয়া গেল, আমাদের বিশ্বাস, নিশ্চয়ই আমরা জয়ী হতে পারবো।

যুদ্ধের তখন ছয় মাস চলছে। এ সময়ে কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। এগুলো পরোক্ষভাবে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের ওপর নতুন প্রভাব বিস্তার করে। ঘটনাগুলোর একটি হচ্ছে ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর। চুক্তি অনুযায়ী দু'দেশ কোন সংকট এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণের মুখে পরস্পরের সাহায্যে এগিয়ে আসবে বলে অঙ্গিকার করে। চুক্তি স্বাক্ষরের পর আমাদের সাহায্য করার ব্যাপারে ভারত আরো বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করে। ভারতের সরকার এবং জনগণ বুঝতে পারে, বাংলাদেশ প্রশ্নে তারা যে পদক্ষেপ নিয়েছে, সে ব্যাপারে এখন আর তারা একা নয়। অচিরেই এই প্রতিরক্ষা চুক্তির প্রভাব ভারতে এবং বাংলাদেশে, বিশেষ করে মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। ভারত এতদিন পর্যন্ত খুব সন্তর্পণে এবং সাবধানে এগিয়ে চলছিলো। চুক্তির পর আমাদেরকে সর্বাত্মক সাহায্যের ব্যাপারে তার সমস্ত দ্বিধাদ্বন্দ্ব কেটে যায়।

এদিকে দুই পক্ষেই যুদ্ধ পরিকল্পনা আরো ব্যাপকতর হয়ে ওঠে। গেরিলাদের মধ্যে যেন নতুন করে প্রাণের সঞ্চার হয়। প্রতিদিনই সড়ক ও রেল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করার কাজ চলতে থাকে। প্রকাশ্য দিনের বেলাতেও হামলা ও অ্যামবুশ শুরু হয়ে যায়। ভারতীয় ও পাকিস্থানীদের উভয় পক্ষের কামানের গর্জনে সীমান্ত এলাকা হয়ে ওঠে চরম উত্তেজনাময়।

এদিকে ২৮শে সেপ্টেম্বর নাগাল্যান্ডের ডিমাপুরে বাংলাদেশী পাইলটরা ট্রেনিং শুরু করে। গোড়াপত্তন হয় বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর। প্রায় একই সময় পাকিস্তান নৌ-বাহিনী থেকে পালিয়ে আসা ৪৫ জন নৌ-সেনা নিয়ে বাংলাদেশ নৌ-বাহিনীরও গোড়াপত্তন হয়। সেপ্টেম্বররে দুটি নৌ-যানও আমরা সংগ্রহ করি। এম-ভি পলাশ এবং এম-পি পদ্মা নামের জাহাজ দুটি ছিলো কলকাতা পোর্ট কমিশনারের। প্রায় ৩৮ লাখ টাকা খরচ করে এগুলোকে যুদ্ধের উপযোগী করে তোলা হয়। প্রতিটি নৌযানে দুটি করে ৪০ মিলিমিটার কামান (এল-৬০) বসানো হয়।

অক্টোবরের মধ্যে দুটি জাহাজই অভিযান শুরু করার জন্য প্রস্তুত হয়ে ওঠে। "অপাশেন হট প্যান্টস" সাংকেতিক নামে শুরু হয় অভিযান, যার লক্ষ্য ছিলো খুলনা ও মঙ্গলা এলাকায় শত্রুপক্ষের নৌযানের ওপর আঘাত হানা এবং পসুর নদীর মোহনায় মাইন স্থাপন করা।

হতবুদ্ধি ইয়াহিয়া

অক্টোবর থেকে আমরা গেরিলাদের তৎপরতা সম্পর্কে উৎসাহব্যঞ্জক খবর পেতে থাকি। তবে বাংলাদেশের বিভিন্ন বন্দর দিয়ে পণ্যসামগ্রী বাইরে প্রেরণ এবং বাইরে থেকে সামরিক সরঞ্জাম ও অন্যান্য জিনিস নিয়ে আসা অব্যাহত গতিতেই চলতে থাকে। বাইরের যেসব মালামাল আসতো সেগুলো আবার যথারীতি দেশের ভেতর বিভিন্ন গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যাচ্ছিলো। নৌ-বাহিনীর ডুবুরীদের সাফল্যজনক তৎপরতা সত্ত্বেও নৌ-যোগাযোগ ব্যাবস্থা বিচ্ছিন্ন করার ব্যাপারে আমরা বিশেষ সফলতা লাভ করতে পারিনি। বিষয়টি বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, বেশ কতগুলো কারণে পাকিস্তান সরকার তার নৌ-যোগাযোগ মোটামুটি সুষ্ঠুভাবে চালু রাখতে সমর্থ হয়েছিলো।

(ক) বিদেশী শিপিং কোম্পানীগুলোকে পাকিস্তান সরকার যেকোন সম্ভাব্য দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে আকর্ষণীয় ক্ষতিপূরণ দানের প্রস্তাব করেছিলো।

(খ) অভ্যান্তরীণ নদীপথগুলোতে মোটামুটি ব্যাপকভাবে সশস্ত্র নিরাপত্তা ব্যবস্থাসহ নৌ-যানগুলোর চলাচলের ব্যাবস্থা করা হয়েছিলো।

(গ) উপকূল এলাকা এবং সামুদ্রিক বন্দরগুলোতে গানবোটের তৎপরতা বৃদ্ধি করা হয়।

(ঘ) শত্রুরা নৌ-কমান্ডারদের কার্যপদ্ধতি জেনে যাওয়ায় তারা পর্যাপ্ত রক্ষাব্যাবস্থা গ্রহণ করে।

পাল্টা ব্যবস্থা হিসাবে আমরা বেশি করে নৌ-কমান্ডো নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেই। আমরা আরো যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করি সেগুলো ছিলোঃ

(ক) আই, ডব্লিউ, টি, এ- এর জাহাজগুলোতে ক্রু হিসেবে গোপনে নৌ-কমান্ডো নিয়োগ করা।

(খ) নদীর তীর এবং সাগরের উপকূল থেকে সুবিধাজনক দূরপাল্লার হাতিয়ারের সাহায্যে নৌ-যানগুলোর ওপর সরাসরি আক্রমণ চালানো। এবং

(গ) এতদঞ্চলের আবহাওয়াগত কারণে সকাল-সন্ধ্যায় সৃষ্ট মৌসুমী কুয়াশার সুযোগ নিয়ে 'লিমপেট' মাইন দ্বারা পাকিস্তানী জাহাজসমূহ ধ্বংস করা।

১২ই অক্টোবর ইয়াহিয়া খান জাতির উদ্দেশ্যে এক বেতার ভাষণ দেন। তিনি তাঁর ভাষায় 'জাতীয় জীবনের এই ভয়াবহ মুহূর্তে' আল্লাহ এবং ইসলামের নামে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাঁর পেছনে ঐক্যবদ্ধ হতে বললেন। বিরস, গম্ভীর এবং মদালস কণ্ঠে তিনি বললেনঃ-

(ক) পাকিস্তানের সমগ্র সীমান্ত বরাবর ভারত ব্যাপকভাবে সৈন্য সমাবেশ করেছে।

(খ) ট্যাংক, গোলন্দাজ ইউনিট এবং বিমান বাহিনীকে পাক সীমান্তের কাছে এনে জড়ো করা হয়েছে (তাঁর জিজ্ঞাসা, 'এসবের অর্থ কি?')। এবং

(গ) চট্টগ্রাম এবং মঙ্গলা বন্দরে নৌ-বাহিনীর ডুবুরীদের হামলা হয়েছে। সড়ক, রেলপথ ও সেতু ধ্বংস করা হচ্ছে এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ বিচ্ছিন্ন করা হচ্ছে।

ইয়াহিয়ার এই বক্তৃতার বিশেষ কয়েকটি দিক লক্ষণীয়। সবকিছুর জন্য তিনি বরাবর ভারতকেই দোষারোপ করেছেন এবং সচেতনভাবে মুক্তিবাহিনীর কথা এড়িয়ে গেছেন।

এতে পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে, তিনি যুদ্ধ করার একটা অজুহাত খুঁজছেন। এক বদ্ধ উন্মাদ, যে মুক্তিবাহিনীর আঘাতে ক্ষতবিক্ষত, ক্রোধোন্মত্ত- তাঁর কথায় সেটাই প্রমাণিত হলো। ততদিনে আমরা তাকে আরো নির্মম আঘাত হানার প্রস্তুতি নিয়ে ফেলিছি।

জুলাই মাস থেকেই চট্রগ্রাম বন্দর এলাকার তেল সংরক্ষণাগারে একটা আক্রমণ চালানোর জন্য আমরা পরিকল্পনা করছিলাম। এ কাজের জন্য বিশেষভাবে বাছাই করা কয়েকটি ছেলেকে আলাদাভাবে ট্রেনিং দেয়া হয়। কিন্তু উপরোক্ত হাতিয়ার না পাওয়ায় অক্টোবরের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হয়। পাকিস্তানের বিমানের জন্য উচ্চ দাহ্যশক্তিসম্পন্ন জ্বালানী ভর্তি ট্যাংকগুলো ছিলো সংরক্ষণাগারটির প্রধান আকর্ষণ। ১৬ই অক্টোবর ট্রেনিংপ্রাপ্ত গণ-পরিষদ সদস্য জনাব মোশাররফ হোসেনের নেতৃত্বে বিশেষ দলকে উক্ত তেল সংরক্ষণাগারে আক্রমণ চালানোর জন্য পাঠানো হয়। আক্রমণের আগের রাতে শত্রুরা কিভাবে যেন শহরে গেরিলা দলের উপস্থিতি টের পেয়ে যায়। চট্রগ্রামে তারা যেখানে উঠেছিলো পাকিস্তানিদেরর সে এলাকা ঘিরে ফেলে। সৌভাগ্যক্রমে একটি ড্রেনের ভেতর দিয়ে আমাদের পুরো দলটি আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হয়। কিন্তু তাদের অস্ত্রশস্ত্র খোয়া যায়। ফলে আক্রমণের পরিকল্পনা অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত হয়ে যায়।

ওদিকে ইয়াহিয়া খান ভারত আক্রমণের একটি যথাযথ অজুহাত খুঁজছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ বাধিয়ে একটি মারাত্মক আন্তর্জাতিক সংকট সৃষ্টি করে বাংলাদেশের সমস্যা থেকে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি অন্যদিকে ফেরানো যাবে। তাঁর সমর-অধিনায়করাও সে ধরনের একটি যুদ্ধের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিলেন। অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে সৈয়দপুরে এক জনসমাবেশ পাকিস্তানীদের হস্টার্ন কমাণ্ডের কমাণ্ডার লেঃ জেনারেল নিয়াজী ঘোষনা করলেন, উভয় ফ্রন্টেই পরবর্তী যুদ্ধ ভারতের মাটিতেই হবে। নিয়াজীর মুখ থেকে কথাটা বোধ হয় বেফাঁস বেরিয়ে পড়েছিলো-কারণ ইয়াহিয়া খান তখন পর্যন্ত প্রকাশ্যে যুদ্ধের কথা বলেননি। কিন্তু না বললে কি হবে, ২০ এবং ২২শে অক্টোবর পাকিস্তানীদেররা সীমান্ত থেকে ভারতের পাঁচ মাইল অভ্যন্তরে কমলপুর গ্রামের ওপর গোলাবর্ষণ করলো। যুদ্ধের জন্য পাকিস্তানী উস্কানিমূলক তৎপরতায় বহুসংখ্যক বেসামরিক নাগরিক নিহত এবং আহত হলো। একদিন পর ২৩শে অক্টোবর পাক বাহিনী পশ্চিম ফ্রন্টের সম্ভাব্য রণাঙ্গনগুলোতে সৈন্য সমাবেশ শুরু করে।

অঘোষিত যুদ্ধ শুরু

নভেম্বর নাগাদ ভারতের তিনটি কোরের অধীনে সাতটি পদাতিক ডিভিশন যুদ্ধের জন্য সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহন করে। কুম্ভীগ্রামের ঘাঁটি পুনরায় চালু করা হয় এবং ভারতীয় নৌ-বাহিনীর ইস্টার্ন ফ্লীটকে সক্রিয় করা হয়। যেকোন আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য তাদের ব্যাপক পরিকল্পনা তখন চূড়ান্ত।

ভারতীয় সেনাবাহিনী পূর্ব ফ্রন্টে পাকিস্তানের সকল দুস্কর্মের উপযুক্ত জবাব দেয়ার জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত ছিলো। এ সময়ই ভারতীয় সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় বেলুনিয়া পুনর্দখল করার জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। একই সঙ্গে অন্যান্য সেক্টরেও অনুরূপ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। বেলুনিয়া ৫ই নভেম্বর আক্রমণের (ডি-ডে) দিন নির্ধারিত হয়।

কিন্তু ৪ঠা নভেম্বর এক মর্মান্তিক ঘটনায় আমরা সকলেই বিচলিত হয়ে পড়ি। আমার অন্যতম সাব-সেক্টর কমান্ডার ক্যাপ্টেন শামসুল হুদা সেদিন রাত সাড়ে ৮টায় মারা যান। বেলুনিয়া অভিযানে তিনটি কোম্পানীকে তাঁর নেতৃত্বে রাখার পরিকল্পনা ছিলো। অকুতোভয় যোদ্ধা হিসাবে সৈন্যরা তাঁকে ভালবাসতো, প্রশংসা করতো। আমি নিজেও দেখেছি কি নির্ভীকভাবে রণাঙ্গনের অগ্রবর্তী এলাকায় তিনি দায়িত্ব পালন করেছেন। এরূপ

একজন অফিসারকে দেখলাম তাঁর ক্যাম্পের মধ্যে পড়ে আছেন, প্রাণহীন নিস্পন্দ। জায়গায়টি রক্তে ভেসে গেছে, মাথার খুলী ছিন্নভিন্ন বিক্ষিপ্তভাবে চারদিকে ছড়ানো। কয়েক মিনিট আগেও তিনি তাঁর সৈন্যদের সাথে কথা বলেছেন, পরের দিনের অভিযান সম্পর্কে কয়েকটি চূড়ান্ত নির্দেশ দিয়েছেন। যতদূর জানা যায়, বাড়ি থেকে তাঁর খুব খারাপ খবর এসেছিল। বিগত কয়েক মাস ধরে আমরা অনিশ্চয়তার মধ্যে যুদ্ধ করছিলাম। অনিশ্চয়তা ও হতাশায় মনোবল ঠিক রাখা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিলো কিছু লোকের পক্ষে। আমার সেক্টরে বাড়িঘর নিয়ে কিংবা পারিবারিক কোন বিষয়ে আলোচনা নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলাম। খুবই নিষ্ঠুর আদেশ সন্দেহ নেই, কিন্তু সৈনিকগণের ওপর ক্ষতিকর আবেগ সৃষ্টি করতে পারে এমন ধরনের কথাবার্তা থেকে বিরত রাখার জন্যেই এটা করতে হয়েছিলো। আমাদের দুর্ভাগ্য, ৪ঠা নভেম্বর রাত সোয়া ৮টার দিকে ক্যাপ্টেন শামসুল হুদাকে তাঁর বিছানায় বসে কি যেন চিন্তা করতে দেখা যায়। সীমাহীন এক অবসাদ তাঁকে পেয়ে বসেছিলো। এক সময় আপনার অজান্তেই তিনি স্টেনগান হাতে তুলে নিয়ে নলটি নিজের চিবুকে ঠেকান। তারপর যন্ত্রচালিতের মতো ট্রিগার চালান।

বেলুনিয়া অভিযান নিয়ে আমি তখন ভারতীয় ব্রিগেড কমাণ্ডারের সাথে আলোচনা করছিলাম। খবর পেয়ে প্রথম বিশ্বাসই করতে পারিনি। কিন্তু কঠিন বাস্তবতাকে এক সময় স্বীকার করে নিতেই হলো। আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হয় যে পরিকল্পনা অনুযায়ী আগামীকালই অভিযান শুরু হবে। পুরো একটা জাতির ঘোর দুর্দিনে ব্যক্তিজীবনের ট্রাজেডীগুলো আমরা শুধু মনে মনেই রাখতে পেরেছি, আর কিছু করতে পারিনি সেদিন।

নিয়মিত পদাতিক বাহিনী এবং মিলিশিয়া নিয়ে বেলুনিয়ায় পাকিস্তানের শক্তি ছিলো দুই ব্যাটালিয়নের মতো। এক ব্যাটালিয়ন ছিলো উত্তরের অংশ এবং বাকী অংশ ছিলো দক্ষিণ ভাগে। শক্তিশালী বাংকার তৈরী করে এবং বেশ বিস্তৃত এলাকা জুড়ে মাইন পেতে তারা অবস্থান গ্রহণ করেছিলো। এ সমস্ত অবস্থান সম্পর্কে সন্ধান না নিয়ে আক্রমণ চালালে অহেতুক লোকক্ষয় হতে পারে। কোনভাবে উত্তরের অংশের শত্রুদলকে বাকী অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে বিচ্ছিন্ন অংশে সাহায্য সহযোগিতা প্রেরণ বন্ধ করতে পারলে পাকিস্তনীরা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হবে। আত্মসমর্পণ না করলেও কয়েকদিনের মধ্যেই তাদের নির্মূল করা সম্ভব হবে। আমরা তাই সিদ্ধান্ত নেই, উত্তরের এবং দক্ষিণের এই দুই অংশের মাঝামাঝি কোন স্থানে অতি সন্তর্পণে রাত্রির অন্ধকারে নিঃশব্দে অবস্থান গ্রহণ করবো। ট্রেঞ্চ এবং বাংকার গড়ে তুলব রাতারাতি। এবং পরদিন সূর্যের আলো ছড়িয়ে পড়লেই পাকিস্তনীরা দেখতে পারবে তাদের উত্তরের অংশ দক্ষিণের বাহনী থেকে রাত্রির অন্ধকারে হয়ে পড়েছে বিচ্ছিন্ন। মাঝখানে বসে আছে তাদের যমদূত মুক্তিসেনারা।

নভেম্বর ৪ তারিখ। অন্ধকার এবং শীতের রাত। কনকনে ঠান্ডা বাতাস বইছে। ক্যাম্প ছেড়ে বেলনিয়া অভিযানে এগিয়ে চলে মুক্তিসেনাদের দল। সৈন্যদের দীর্ঘসারি যাত্রা শুরু করতেই বৃষ্টি শুরু হয়ে যায়। বৃষ্টির সাথে বাতাসের বেগও বেড়ে যায়। হাড় কাঁপানো শীতে আমাদের ঠোঁট কাঁপছিল। আমরা পশ্চিম দিকে এগিয়ে চলি। প্রাকৃতিক দুর্যোগ কষ্ট হলেও বস্ত্তত আমাদের সুবিধেও ছিলো যথেষ্ট। আবহাওয়া খারাপ দেখে সে রাতে শত্রুদের টহলদাররা আর বাইরে বেরোয়নি। তারা ধারণাও করতে পারেনি যে এই রাতটিকেই আমরা বেছে নেবো। দমকা বাতাসের গর্জনে আমাদের চলাফেরা এবং ট্রেঞ্চ খোঁড়ার আওয়াজ তলিয়ে যাচ্ছিলো। ভোর হতে না হতেই আমাদের সবগুলো কোম্পানী যার যার জায়গায় পৌছে প্রতিরক্ষামূলক ট্রেঞ্চে অবস্থান গ্রহণ করে। আমরা তখন শীতে প্রায় জমে যাচ্ছিলাম। কিন্তু একটু পরেই বৃষ্টি থেমে গিয়ে পরিষ্কার সূর্যালোক চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

দেরি না করে আমরা নিকটবর্তী শরণার্থী শিবির এবং গ্রাম থেকে লোক নিয়ে সাজসরঞ্জাম বহনের ব্যবস্থা করি। যানবাহন চলাচলের জন্য পাহাড় এবং ধানক্ষেতের ভেতর দিয়ে চার মাইল দীর্ঘ রাস্তার ব্যবস্থা আমাদের করতে হয়। হাজার হাজার লোক স্বতঃস্ফূর্তভাবে দিনরাত কাজ করে চলে। তিনদিনের মাথায় রাস্তাটি যানবাহন চলাচলের উপযোগী হয়ে ওঠে। আমাদের সাহায্য করার জন্য বেসামরিক লোকদের মধ্যে অভূতপূর্ব উৎসাহ লক্ষ্য করি। ফলে আমাদের মনোবল বেড়ে যায় বহুগুণ।

একজন অধ্যাপক বাংকারের জন্য সি, আই, সিটের বোঝা মাথায় বহন করেছেন্ চার মাইল পথ অতিক্রম করে টিনগুলো যথাস্থানে নামিয়েই আবার তিনি পেছন দিকে দৌড়ে গেছেন আরেক বোঝা আনতে। ছয় বছরের একটি ছেলেকে দিয়ে কোন কাজ করানো হবে না বলাতে সে সেদিন কেঁদে ফেলেছিলো।

আমাদের এই অবস্থান গ্রহণ করায় শত্রুর মধ্যে তেমন কোন ত্বরিত প্রতিক্রিয়া দেখতে পেলাম না। তারা হয়তো ভেবেছিলো, এটাও মুক্তিফৌজের এ্যামবুশ ধরনের কিছু একটা হবে্ তারা মুক্তিবাহিনীকে হটিয়ে দেয়ার জন্য একটি কোম্পানী পাঠায়। কিছুক্ষণের সংঘর্ষে ২৯ জন শত্রুসেনা নিহত হয় এবং অন্যেরা উপায়ান্তর না দেখে পালিয়ে যায়। এমন কি তারা লাশগুলোও নিতে পারেনি ৭ই নভেম্বর দুটি স্যাবর জেট সারাদিন আমাদের অবস্থানের ওপর স্ট্র্যাপিং করে। এতে আমাদের টিন বহনকারী একজন বেসামরিক লোক নিহত হয়। আশ্চর্যের ব্যাপার, শত্রুরা তেমন ব্যাপক আকারে আমাদের আক্রমণ করতে আসছিলো না। তাছাড়া, উত্তর অংশে পাকিস্তনীদের আমরা যেভাবে ঘেরে ফেলেছিলাম- সেখান থেকে তাদের মুক্ত করারও তেমন কোন চেষ্টাও করছিলো না আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারলাম. পাকিস্তানীরা এতদিনের আক্রমণাত্মক ব্যবস্থার পরিবর্তে এখন আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা নিয়েছে। এ সময়ে বেলুনিয়ায় পাকিস্তানীদের একটি অয়্যারলেস বার্তা আমরা 'ইন্টারসেপ্ট' করি। সেটা ছিলো-"বেলুনিয়া থেকে নিজেরাই পালাবার ব্যবস্থা করো"।

কয়েকজন শত্রুসেনা আমাদের ব্যূহ ভেদ করে পালাবার চেষ্টাও করেছিলো, কিন্তু তারা আমাদের গুলিতে নিহত হয়। ১১ই রভেম্বরের মধ্যে আমরা অবশিষ্ট শত্রুসেনাদের ধ্বংস করে ফেলি। বেশ কিছু পাকিস্তানী আমাদের হাতে বন্দী হয়।

যুদ্ধবন্দীদের কাছ থেকে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর দুর্ভাগ্যের কথা আমরা জানতে পারি। সর্বত্রই শত্রুসৈন্যদের একটা সাধারণ অভিযোগ ছিলো যে, অফিসাররা তাদের সাথে ফ্রন্ট লাইনে থাকতো না। শুধু গোলাগুলি ছাড়া অন্য সবকিছুরই অভাব ছিলো। তাদের তিক্ত অভিযোগঃ "এমন কি খাদ্যের জন্যও আমাদেরই ব্যবস্থা করতে বলা হতো।" প্রতিটি সেক্টরে যুদ্ধবন্দীদের কাছে এবং মৃত সৈনিকদের পকেটে অনেক চিঠি পাওয়া গেছে। এগুলো পশ্চিম পাকিস্তানে তাদের মা-বাবা আত্মীয়স্বজনের কাছে লেখা। কিন্তু পাঠাতে পারেনি। এসব চিঠিতে তাদের করুন অবস্থা এবং প্রতিটি স্তরে শৃংখলার কাঠামো সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়ার এক করুণ চিত্র পাওয়া যায়। এই ছিলো তাদের সাফল্য- মাসের পর মাস দস্যুবৃত্তি, পাশবিক অত্যচার এবং যাবতীয় জঘন্য অপরাধের উপযুক্ত পুরস্কার। একজন সিপাই তার বাবাকে লিখেছেঃ "গত মাসে এগারোশত টাকা পাঠিয়েছি, বোধহয় পেয়েছেন। দুদিন যাবৎ অজ্ঞাতপরিচয় এক স্থান অভিমুখে আমরা চলেছি। গতকাল মুক্তিবাহিনীর হামলার মুখে পড়েছিলাম। এতে আমাদের প্লাটুনের দু'জন মারা গেছে। এর আগে খালের পানিতে পড়েও একজন মারা যায়। এখানে ভীষণ বৃষ্টি হয়। যেদিকে তাকাই সেদিকেই শুধু বড় বড় নদী আর পুকুর।

লোকজন ভয়ে আমাদের কাছে ঘেঁষতে চান না। গ্রাম থেকে আমরা খাবার সংগ্রহ করি, কিন্তু এরজন্য কোন দাম দেই না। আমাদের অফিসাররাও কোন দাম দেয় না। আমরা এখন একটি গ্রামে বিশ্রাম নিচ্ছি। কাল সকালেই আবার রওয়ানা হতে হবে। রাতে চলাফেরা করতে পারি না। এখানে অনেক মুক্তিফৌজ। আমি পশ্চিম পাকিস্তানে বদলী হওয়ার জন্য দরখাস্ত করেছি। আমার জন্য দোয়া করবেন।"

পরদিন ভোরই মুক্তিবাহিনী এই প্লাটুনটি অ্যামবুশ করে। ফলে দলের আরো দশজন সৈন্য মারা যায়। নিহতদের একজনের পকেটেই চিঠিটি পাওয়া গিয়েছিল।

আমরা বেলুনিয়া অভিযানের আয়োজন করেছিলাম ৪ঠা নভেম্বর। অর্থাৎ এই তারিখ থেকেই সীমিত এবং স্থানীয় পর্যায়ে হলেও, ভারতীয়রা সরাসরি যুদ্ধে অংশ নেয়। আর ৫ই নভেম্বর শুরু হয়ে যায় ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যকার অঘোষিত যুদ্ধ।

যুদ্ধ পরিকল্পনা

নভেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যেই আমরা বেলুনিয়া থেকে শত্রুসেনাদের পুরোপুরি বিতাড়িত করি। পাকিস্তান রেডিও অবশ্য তখনো বেলুনিয়া তাদরে দখলে আছে বলে সমানে প্রচার করে চলেছিলো। পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ একদিকে মিথ্যা প্রচার অভিযান চালিয়ে যাচ্ছিলো অপরদিকে ঢাকা-চট্রগ্রাম রোডের গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ কেন্দ্র ফেনী থেকে ক্রমান্বয়ে তাদের সৈন্য সরিয়ে নিচ্ছিলো।

২১শে নভেম্বর ঢাকা থেকে এপি প্রতিনিধি একটি বার্তায় বলেন, পাকবাহিনী এবং মুক্তিফৌজের মধ্যে মরণপণ লড়াই শুরু হয়েছে। এই লড়াইয়ে পাকিস্তনীদের যে শক্তি ক্ষয় হচ্ছে তাতে ভারতের সাথে সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে তারা যে কি করবে বোঝা যাচ্ছে না। ঢাকা-চট্রগ্রাম এবং অন্যান্য শহরে গেরিলাদের হামলায় পর্যুদস্ত পাকিস্তানিরা দিশেহারা। এ সময়ে মুক্তিফৌজ অন্তত সাতটি থানার ওপর আক্রমণ চালিয়ে থানাগুলোকে মুক্ত করেছে। দেশের অধিকাংশ স্থানে মুক্তিবাহিনী বিদ্যুৎ সরবরাহ চরমভাবে ব্যাহত করেছে। বন্দরে কাজকর্ম বন্ধ। শিল্প কারকানার শ্রমিকরা যে যার বাড়ির পথ ধরেছে। বিস্তীর্ণ পল্লী অঞ্চলে মুক্তিফৌজের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে। সেখানে তারা নিজেদের শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছে। রাজাকার এবং দালালদের বিচার শুরু হয়ে গেছে। মুক্তিফৌজের দ্রুত শক্তি বৃদ্ধি এবং অভিযানের তীব্রতায় ইয়াহিয়া কান এবং নিয়াজী বেসামাল। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পাকিস্তানিরা বিতাড়িত হচ্ছিলো, প্রতি মুহূর্তে লোকক্ষয়ের সংখ্যা বাড়ছিলো। কিন্তু এখানেই শেষ নয়, পূর্ব পাকিস্তান শিগগিরই হাতছাড়া হয়ে যাবে এই আশংকায় তারা ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। আর এই আশংকা সত্য হলে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর উৎকৃষ্ট কয়েকটি ডিভিশন তাদের হারাতে হবে দীর্ঘদিনের জন্য।

ইতিমধ্যে পাকিস্তান কয়েকবারই পশ্চিম ফ্রন্টে ভারতের আকাশসীমা লংঘন করে। পূর্ব ফ্রন্টে নিয়াজী দুঃসাহসী একটা কিছু করে তার সৈন্যদরে মনোবল বৃদ্ধির চেষ্টা করেন। পাকিস্তানী সৈন্যরা ২১শে নভেম্বর পশ্চিমবঙ্গের রানাঘাটের নিকটবর্তী ভারতীয় বয়রা গ্রামে হামলা চালায়। ট্যাংক, কামান ও জঙ্গী বিমান তাদের সহযোগিতা করেছিল। এতে কয়েকজন ভারতীয় সৈন্য নিহত। তবে বেশী মারা যায় বেসামরিক ব্যক্তিরাই বিপুল সংখ্যক লোক আহতও হয়। বরতের মাটিতেই যুদ্ধ হবে নিয়জী বোধ হয় তার এই দম্ভের যথার্থতা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিলেন। ভারতীয় এলাকায় অনুপ্রবেশের অনুমতিও তিনি নিশ্চয়ই ইয়াহিয়ার কাছ থেকে পেয়েছিলেন। এর খেসারতও তাকে হাতে হাতে পেতে হয়। ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রচন্ড পাল্টা আক্রমণে তারা শুধু পেছনেই হটে আসে না, ১৩টি শেফি ট্যাংক এবং ৩টি স্যাবর জেটকে এই সীমিত যুদ্ধে হারিয়ে ফিরে আসতে হয় নিজ এলাকায়। দুজন পাকিস্তানী পাইলট বন্দী হয় ভারতের হাতে।

এসব উস্কানিতেও মিসেস গান্ধী ছিলেন স্থির। পাকিস্তানী কামানের গোলায় ভারতের বেসামরিক লোক হতাহত হচ্ছিল। বিষয় সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতির ছিল প্রচুর। তা সত্বেও ভারত সরকার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক মহল তীব্র ক্ষোভ প্রাশ করতে থাকে। মিসেস গান্ধি অবশ্য আশা করছিলেন যে, শেষ পর্যন্ত কয়েকটি বৃহৎ শক্তির সুমতি হবে। তারা ইচ্ছা করলে ইয়াহিয়াকে দিয়ে বাংলাদেশের গণহত্যা বন্ধ করিয়ে সমস্যার একটা রাজনৈতিক সমাধান করাতে পারবেন।

২১ নভেম্বর পাকিস্তান সমূহ বিপদ টের পেয়ে জাতিসংঘে এক নালিশ দায়ের করে বসে। তার বক্তব্য, ভারতীয় সেনাবাহিনী ১২টি ডিভিশন পূর্ব পাকিস্তানের চারটি সেক্টরে আক্রমণ শুরু করেছে। একই দিন ইয়াহিয়া সারা পাকিস্তানে জরুরী অবস্থা জারি করেন। এর চারদিন পর অর্থাৎ ২৫শে নভেম্বর পাকিস্তান সফররত উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন এক চীনা প্রতিনিধিদলের ভোজসভায় ইয়াহিয় বক্তৃতাচ্ছলে জানিয়ে দেন যে, হয়তো দিনদশেকের মধ্যে আমাকে আর এখানে নাও পাওয়া যেতে পারে কারণ আমাকে সম্ভবত যুদ্ধে যেতে হবে।

২৭শে নভেম্বর পাকিস্তানী গোলন্দাজ বাহিনী পশ্চিম দিনাজপুরের ভারতীয় শহর বালুরঘাটের উপর প্রচন্ড হামলা চালায়। কামানের গোলার ছত্রছায়ায় এক ব্রিগেড পাকসেনা হিলিতে ভারতীয় অবস্থানের ওপর আক্রমণ

করে। পদাতিক বাহিনীর সঙ্গে ট্যাংক বহরও ছিল। প্রথম দফায় পাকিস্তানীদের ৮০ জন সৈন্য ও চারটি ট্যাংক ধ্বংস হয় এবং তাদের আক্রমণ প্রতিহত হয়। পরের দিন দ্বিতীয় দফা হামলার সময় তিনটি পাকিস্তানী ট্যাংক আটক করা হয় এবং তাদের বহুসংখ্যাক সৈন্য প্রাণ হারায়। ভারতীয় পক্ষের ক্ষয়ক্ষতিও ছিল ব্যাপক। এবার ভারতীয়রা প্রতিশোধ নিয়ে এগিয়ে আসে বিপুল শক্তিতে। তারা আন্তর্জাতিক সীমারেখা পার হয়ে বাংলাদেশের ভেতর কয়েক মাইল ঢুকে পড়ে। ভারত সরকার আগেই তার সৈন্যদের সীমান্ত এলাকায় সীমিত আকারে অভিযান পরিচালনার আদেশ দিয়ে রেখেছিলেন। নির্দেশ ছিল, সীমান্তের ওপার থেকে ভারতের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার হুমকি দেখা দিলে সৈন্যরা তা নির্মূল করার জন্য বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারবে। ভারত তখন শুধু তার সীমান্ত রক্ষাই নয়, প্রয়োজন দেখা দিলে সমুচিত প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যও পুরোপুরি প্রস্তুত।

পরিস্থিতি বিস্ফোরণোন্মুখ হয়ে উঠলে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন প্রস্তাব দেন যে, ভারত এবং পাকিস্তান দুই পক্ষকেই সীমান্ত এলাকা থেকে সৈন্য সরিয়ে নিতে হবে। ইয়াহিয়া খান বাহ্যত প্রস্তাবে সম্মতি জানান। অপরপক্ষে ভারত এই শর্তে সম্মত হয় যে, বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তানকে তার সৈন্য সরিয়ে নিতে হবে। সকল সমস্যার মূল কারণ হচ্ছে বাংলাদেশে পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনীর কার্যকলাপ এবং এদেরকে সরিয়ে নেয়া না হলে এই অঞ্চলে শান্তি আসবে না। এই সব প্রস্তাব যখন আদান-প্রদান হচ্ছিলো পাকিস্তান তখন পশ্চিম ফ্রন্টে রাতের অন্ধকারে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি স্থানে সৈন্য সমাবেশ করে। এ ঘটনা ১লা ও ২রা ডিসেম্বর। ২রা ডিসেম্বরেই পাকিস্তান সংঘর্ষের বিস্তৃতি ঘটানোর অসৎ উদ্দেশ্য মরিয়া হয়ে আগরতলার ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় গোলাবর্ষণ করে। এদিন নয়াদিল্লীতে কংগ্রেসে কর্মী সম্মেলনে বক্তৃতাকালে মিসেস গান্ধি স্পষ্ট কণ্ঠে ঘোষণা করেন, তথাকথিত বৃহৎ শক্তিবর্গ যেভাবে চাইবে সেভাবে কাজ করার দিন শেষ হয়ে গেছে। ভারতের স্বার্থ যাতে রক্ষিত হয় সেই দিকে, দৃষ্টি রেখে আজ আমাদের কাজ করতে হবে।

অক্টোবর মাসেই জম্মু কাশ্মীরের পুঞ্চ সেক্টরে পাকিস্তানীদের প্রথম যুদ্ধপ্রস্তুতি লক্ষ্য করা গিয়েছিলো। পশ্চিম পাকিস্তানের সমরপ্রস্তুতি এবং তৎসঙ্গে বাংলাদেশের অবস্থার ক্রম অবনতি এবং কোটি কোটি বাঙালীর চরম দুর্দশার প্রতি বৃহৎ শক্তিগুলোর উদাসীনতা লক্ষ্য করে ভারত সরকার তখনই তাদের সশস্ত্র বাহিনীকে সম্ভাব্য আপৎকালের জন্য পুরোপুরি হুঁশিয়ার থাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন। পাকিস্তান এর আগে তিনবার ভারত আক্রমণ করেছে সে কথা ইন্দিরা গান্ধী ভুলে যাননি।

ভারতের সাথে সম্ভাব্য যুদ্ধে পাকিস্তান পশ্চিম ফ্রন্টে প্রথম অভিযানেই রাজনৈতিক এবং রণকৌশলের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ যতোদূর সম্ভব বেশী এলাকা দখল করে নেয়ার পরিকল্পনা করেছিলো। পাকিস্তানের মূল পরিকল্পনায় ছিলো, একটি সাঁজোয়া ডিভিশন এবং দুটি পদাতিক ডিভিশন এগিয়ে গিয়ে ভারতের ওপর হামলা চালাবে। দরকার হলে আক্রমণকারী ডিভিশনগুলোর শক্তি বৃদ্ধির জন্য আরো পদাতিক ও সাঁজোয়া বাহিনীর সৈন্য পাঠানো হবে। পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত পাক সেনাবাহিনীর বাকি অংশের দায়িত্ব ছিল সমস্ত বরাবর ভারতীয় বাহিনীকে স্থানীয়ভাবে প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধে ব্যস্ত রাখা। ভারতীয় সেনাবাহিনীকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে অনেকগুলো প্রলুব্ধকারী হামলার পরিকল্পকারী করা হয়। পাকিস্তানীরা আশা করেছিল এইসব প্রলব্ধকারী হামলায় বিভ্রান্ত হয়ে ভারত তার সেনাবাহিনীকে বিশেষ করে সেনাবাহিনীর শক্তিশালী রিজার্ভ বাহিনীকে মূল রণাঙ্গন থেকে অন্য কোনো ক্ষেত্রে নিয়োজিত করে ফেলবে। ফলে পাকিস্তানের মূল আক্রমণকারী বাহীনীর পক্ষে অতি সহজে এবং স্বল্প প্রচেষ্টায় গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে যুদ্ধ পরিচালনা এবং জয়লাভ করা সম্ভব হবে।

এই লক্ষ্য সামনে রেখে পাকিস্তান তার১২ পদাতিক ডিভিশনের ওপর পুঞ্চ এলাকা দখল করার দায়িত্ব অর্পণ করে। পাকিস্তান আশা করেছিল, পুঞ্চ এলাকায় হামলা চালালে জম্মু ও কাশ্মীরে অবস্থিত ভারতীয় বাহিনী এ এলাকাতে তীব্র যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়বে ফলে তারা আর চেনাব নদীর দক্ষিণে যাবার সুযোগ পাবে না। সেই ফাঁকে পাকিস্তান চেনাব নদীর দক্ষিণে তার মূল হামলা চালিয়ে সফল হবে। এখানে উল্লেখযোগ্য, পাকিস্তানের এই ডিভিশনটি কাশ্মীরেই অবস্থান করেছিলো এবং এর অধিকাংশ সৈন্য কাশ্মীরেরই লোক।

পাকিস্তানে আরো পরিকল্পনা করেছিলো যে রাভী নদী বরাবর সুদৃঢ় প্রতিরক্ষাব্যূহ গঠন করে তারা নওশের-রাজৈরি এলাকা দখল করে ফেলবে। এ কাজের দায়িত্ব দেয়া হলো গুজরাটে অবস্থিত ২৩ পদাতিক ডিভিশনকে।

১নম্বর কোরের ওপর দায়িত্ব দেয়া হলো সাকারগড় এলাকায় ভারতকে যুদ্ধে জড়িয়ে ফেলার। প্রলুব্ধকারী হামলা চালিয়ে ভরতীয় বাহিনীকে ঐ এলাকায় যুদ্ধে নামাবার পরিকল্পনা করা হয়। উদ্দেশ্য ছিল আসল আক্রমণ এলাকা সম্পর্কে যেন ভারত কিছুই বুঝে উঠতে না পারে।

লাহোর এবং কাসুর সোলেমানকি এলাকায় ৪ নম্বর কোরকে ইরাবতী এবং গ্রান্ড ট্র্যাংক রোডের মধ্যবর্তী চানগানওয়ালা নালা পর্যন্ত সমস্ত অঞ্চল রক্ষা করার দায়িত্ব দেয় হয়। রহিম ইয়ার খান এবং করাচীসহ কচ্ছের রানের মধ্যবর্তী এলাকা রক্ষার দায়িত্ব দেয়া হয় ১৮ পদাতিক ডিভিশনের ওপর।

ইয়াহিয়া খান চেয়েছিলেন উল্লেখযোগ্য পরিমাণে গুরুত্বপূর্ণ ভারতীয় ভূখন্ড বিশেষ করে জম্মুকাশ্মীর সেক্টরের বেশ কিছু এলাকা প্রথমেই দখল করে ফেলতে। যুদ্ধে পূর্বাঞ্চলের কোন জায়গা খোয়া গেলে ভবিষ্যতে তা উদ্ধারের জন্য পশ্চিমাঞ্চলের এই দখলকৃত জায়গার বিনিময়েও তিনি দর কষাকষি করতে পারবেন, এই ছিলো তার আশা।

লক্ষ্য অর্জনের জন্য পশ্চিমাঞ্চলে তাকে প্রথমেই আক্রমণাত্বক ভূমিকা নিতে হবে এবং পূর্বাঞ্চলে জেনারেল নিয়াজীকে রাখা হবে আত্মরক্ষামূলক ভূমিকা।

পাকিস্তান সেনাবাহিনী তার ইস্টার্ন কমান্ড অর্থাৎ বাংলাদেশের জন্য সীমিত সংখ্যক আক্রমণাত্মক অভিযানসহ প্রধানত আত্মরক্ষামূলক তৎপরতার ভিত্তিতে একটি পৃথক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলো। গুটিকয়েক আক্রমণাত্মক অভিযানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল শুধু যুদ্ধটাকে ভারতের মাটিতে গড়িয়ে দেয়ার উদ্দেশ্য।

বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা সীমান্তে রেখার যতো কাছে অবস্থান দেয় যায় ততদূর পর্যন্ত এলাকা নিয়ে শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার পরিকল্পনা করা হয়।

ভারত থেকে বাংলাদেশে আসার যতোগুলো পথ রয়েছে সেই সবগুলো পথেই এই ধরনের সুদৃঢ় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার পরিকল্পনা করা হয়। গুরুত্বপূর্ণ শহর এবং যোগাযোগ কেন্দ্র যেমন চট্রগ্রাম, ফেনী, লাকসাম, চাঁপুর, কুমিল্লা,আখাউড়া, দাউদকান্দি, ভৈরব, ঢাকা,খলনা, যশোর, ঝিনাইদহ এবং বগুড়ার চারপাশে চুড়ান্ত প্রতিরক্ষাব্যূহ গড়ে তোলার ব্যবস্থা নেয়া হয়। যে কোনো মূল্যে ঢাকাকে রক্ষা করাই ছিল পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য।

এই ধরনের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সাথে পাল্টা আঘাত (কাউন্টার অ্যাটাক) হানার জন্যেও প্রস্তুতি নেওয়া হয়। পাকিস্তান ইস্টার্ন কমান্ডের এই বিস্তারিত রণপরিকল্পনা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর চীফ অব স্টাফ আগস্টের মাঝামাঝি সময়ে বাংলাদেশ সফরকালে অনুমোদন করেছিলেন। পরিকল্পনা প্রধান লক্ষ্য ছিল মুক্তিযোদ্ধারা যাতে কোনো শহর দখল করে সেখানে সরকার প্রতিষ্ঠা করতে না পারে। কারণ এটা করতে পারলেই তারা বিভিন্ন দেশের স্বীকৃতি আদায়ের চেষ্টা করবে। পাকিস্তানিরা অগ্রবর্তী প্রতিরক্ষা ঘাঁটিগুলোতে তিন থেকে চার সপ্তাহ চলার মতো গোলাগুলি, রসদপত্র রাখার এবং পশ্চাৎবর্তী প্রতিরক্ষা অবস্থানসমূহে পর্যাপ্ত পরিমাণে রসদ রাখার ব্যবস্থাও করে। অগ্রবর্তী ঘাঁটি রক্ষা দুস্কর হয়ে পড়লে সেখান থেকে যোগাযোগ কেন্দ্র কিংবা গুরুত্বপূর্ণ শহরে পশ্চাদপসরণ করে সে সব স্থান রক্ষার জন্য লড়াই করে যাওয়ার পরিকল্পনা করা হয়।

কয়েকমাস ধরে পাক সেনাবাহিনী এসব প্রতিরক্ষা ঘাঁটির সকল ব্যবস্থা নিয়ে বেশ তৎপর ছিল। তারা হাজার হাজার কংক্রিটের বাংকার এবং পিল বক্স নির্মাণ করে। ট্যাংক চলাচল ঠেকানোর জন্য সম্ভাব্য পথগুলোতে গভীর নালা কেটে রাখে।

এ ব্যাপারে পাকিস্তানীদের অর্থের কোনো অভাব ছিল না। শরণার্থী সাহায্য ও পুনর্বাসন কর্মসূচীর নাম করে ইয়াহিয়া খান মোটা অংকের অর্থ যোগাড় করেছিলেন। আসলে ভারত থেকে তখনো কোনো শরণার্থী ফিরে আসেনি। অল্প সংখ্যাক যারা এসেছিলো তারাও সেনাবহিনীর তথ্যকথিত অভ্যর্থনা কেন্দ্র দিয়ে ফিরে আসেনি। তারা যে পথে ভারত গিয়েছিলো সেই গোপন পথেই ফিরেছে। মাঝ থেকে শরণার্থীদের জন্য পাওয়া পুরো টাকাটাই প্রতিরক্ষা বাজেটের অংশ হিসেবে নিয়াজীর হাতে তুলে দেয় হয়। বেলুনিয়ার একটি মাত্র ট্যাংকবিরোধী নালা তৈরী করতে পাকিস্তানীরা প্রায় ২০ লাখ টাকা করচ করে।

অপরপক্ষে ভারতীয় সেনাবাহিনী পশ্চিম ফ্রন্টে আক্রমণাত্মক প্রতিরক্ষা এবং পূর্ব ফ্রন্টে ঝটিকা আক্রমণ চালিয়ে বাংলাদেশ মুক্ত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। অবশ্য পশ্চিম ফ্রন্টে ভারতীয় সেনাবাহিনী অনুকুল পরিস্থিতির সুযোগে কোন কোন সেক্টরে পুরোপুরি আক্রমণ চালিয়ে পাকিস্তানের অভ্যন্তরে যতোদুর সম্ভব অগ্রসর হওয়ারও পরিকল্পনা করে।

ভারতীয় সেনাবাহিনীর সামরিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যগুলো ছিল নিম্নরুপঃ

(1) যথাসম্ভব স্বল্প সময়ের মধ্যে (সর্বাধিক তিন সপ্তাহের ভেতরে) মুক্তিফৌজের সহযোগিতায় বাংলাদেশ স্বাধীন করা।

(2) চীন দেশের দিক থেকে সম্ভাব্য হামলার বিরুদ্ধে ভারতের উত্তর সীমান্ত রক্ষা।

(3) আক্রমণাত্মক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে সংহতি রক্ষা এবং

(4) নাগাল্যান্ড, মনিপুর এবং মিজোরাম এলাকায় বিদ্রোহাত্মক তৎপরতার দমন করা।

এই কাজগুলো মোটই সহজসাধ্য ছিলো না। বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি দ্রুত সৈন্য চলাচলের জন্য অনুপযুক্ত। পুরো দেশ জুড়ে রয়েছে নদীনালা খাল বিল। এগুলোর জন্য যে কোনো বাহিনীর অভিযাত্রা ব্যাহত হতে বাধ্য।

এই সব প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধক অবস্থানের মূল্যায়ন করে বাংলাদেশকে মোটামুটি চারটি পৃথক সেক্টরে ভাগ করা হয়। এই সব সেক্টরে ভারত এবং পাকিস্তানীদের অবস্থান ছিলো নিম্নরূপঃ

১। উত্তর পশ্চিম সেক্টর : যমুনার পশ্চিম এবং পদ্মার উত্তরের অঞ্চল এই এলাকার অন্তর্ভুক্ত। সেক্টরের আওতাধীন জেলাগুলো ছিলো রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া, রাজশাহী এবং পাবনা। মেজর জেনারেল নজর হোসেন শাহের অধীনে পাকিস্তানের ১৬ ডিভিশন এই সেক্টরের হেড কোয়ার্টার স্থাপন করেছিলো নাটোরে। এই সেক্টরে সর্বত্র এবং বিশেষ করে ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর, হিলি ও রংপুরে দুর্ভেদ্য প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছিলো।

পাকিস্তানী ১৬ ডিভিশনের মোকাবিলায় ভারত তার ৩৩ কোরের (লে. জেনারেল থাপা) অধীনে দুটি মাউন্টেন ডিভিশনকে নিয়োজিত করে। এই ডিভিশনগুলোর সহায়ক হিসেবে নিয়োজিত ছিলো ডিবিশনাল গোলন্দাজ বাহিনী, একটি মাঝারি ট্যাংক রেজিমেন্ট এবং হালকা উভয়চর ট্যাংকের (পিটি-৭৬) আর একটি রেজিমেন্ট। ভারতীয় ডিভিশনগুলো ছিলো উত্তরে কুচবিহার জেলায় ৬ মাউন্টেন ডিভিশন, বালুরঘাট এলাকায় ২০ মাউন্টেন ডিভিশন এবং শিলিগুড়ি এলাকায় ৭১ ব্রিগেড। বাংলাদেশে অভিযানের দায়িত্ব পালন ছাড়াও ৩৩ কোরকে সিকিম ও ভুটানের মধ্যে দিয়ে সম্ভাব্য চীনা আগ্রাসন প্রতিহত করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিলো।

২। পশ্চিম সেক্টর : পদ্মার দক্ষিণ এবং পশ্চিম এলাকা নিয়ে গঠিত এই সেক্টরের জেলাগুলো হচ্ছে কুষ্টিয়া, ফরিদপুর, যশোর, খুলনা, বরিশাল এবং পটুয়াখালি। এই সেক্টরের মেজর জেনারেল এম এইচ আনসারীর নেতৃত্বে পাকিস্তানের ৯ পদাতিক ডিভিশন মোতায়ন করা হয়। এই সেক্টরের হেড কোয়ার্টার ছিল যশোরে।

পাকিস্তানী ৯ পদাতিক বাহিনীর মোকাবিলায় ভারতীয় পক্ষে ছিলো জেনারেল রায়না'র কমাণ্ডে নবগঠিত ২ কোর। এই কোরের আওতায় দুটি ডিভিশন ছিল মেজর জেনারেল দলবীর সিং-এর নেতৃত্বে ৯ পদাতিক ডিভিশন এবং মেজর জেনারেল মহিন্দর সিং বারার-এর নেতৃত্ব ৪ মাউন্টেন ডিভিশন। জেনারেল রায়নার সহায়তায় আরো ছিল দুটি ট্যাংক রেজিমেন্ট এবং ডিভিশনের সহায়ক গোলন্দাজ বাহিনী।

৩। উত্তর সেক্টর : এই সেক্টর গঠিত হয়েছিলো ময়মনসিংহ ও ঢাকা জেলার কিছু অংশ নিয়ে। পাকিস্তানীদের পক্ষে এই সেক্টরের দায়িত্ব ছিল ব্রিগেডিয়ার এ কাদেরের নেতৃত্বে ৯৩ ব্রিগেড এবং এর আওতায় ৩১ বালুচ ও ৩৩ পাঞ্জাব রেজিমেন্ট, আধা সামরিক বাহিনী (নবগঠিত ইপিসিএপি-এর দুটি উইং), কয়েকটি মুজাহিদ ইউনিট এবং একটি মর্টার ব্যাটারি। এই এলাকার উত্তরাংশ পাকিস্তানীদের প্রধান শক্তি ছিল লে. কর্নেল সুলতান মাহমুদের নেতৃত্বে ৩১ বালুচ রেজিমেন্ট। এদেরকে ময়মনসিংহের উত্তরাঞ্চলে মোতায়েন করা হয়েছিলো। উল্লেখ্য যে, সুলতান মাহমুদই ছিলো সবচাইতে বেশী সংখ্যক বাঙালীকে হত্যার প্রধান হোতা। কমলপুর-খকশীগঞ্জ-জামালপুর এবং হাতিবান্ধা শেরপুর জামালপুর বরাবর যে এলাকা রয়েছে তার প্রতিরক্ষার দায়িত্ব ছিলো এই রেজিমেন্টের ওপর। এছাড়া ডালু-হালুয়াঘাট-ময়মনসিংহ বরাবর এলাকার দায়িত্ব এরা পালন করতো।

এই সেক্টরের বিপরীতে ভারতীয় মেঘালয় এলাকায় ছিলো ১০১ কমুনিকেশন জোন। এই জোনের আওতাধীন ভারতীয় সৈন্যরা আসাম, ত্রিপুরা, মেঘালয়, অরুণাচল, নাগাল্যান্ড এবং মিজোরামে দায়িত্ব পালনরত সৈন্যদের চলাচল ও রক্ষাণাবেক্ষণ সংক্রান্ত সকল প্রকার সহযোগিতা প্রদান করতো। এই এলাকায় ভারতীয়দের যোগাযোগ ব্যবস্থা তেমন উন্নত না থাকায় বিরাট বাহিনীর পক্ষে এখানে দীর্ঘস্থায়ী তৎপরতার চালানো সম্ভব ছিল না। তাই এই সেক্টরে ভারতীয় সৈন্য সংখ্যা ছিলো সীমিত। এলাকাটি প্রতিরক্ষার দায়িত্বে ছিলেন ভারতীয় মেজর জেনারেল গুরবক্স সিং। তাঁর অধীনে ছিলো ব্রিগেডিরা হরদেব সিং ক্লেয়ার-এর নেতৃত্বে ৯৫ মাউন্টেন ব্রিগেড গ্রুপ এবং ২৩ পদাতিক ডিভিশন থেকে আনীত একটি পদাতিক ব্যাটালিয়ন। এখানে ভারতীয় বাহিনীকে সহযেগিতা করেছে কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বে টাঙ্গাইল এলাকার সক্রিয় মুক্তিযোদ্ধারা।

৪। ইস্টার্ন সেক্টর : মেঘনায় পূর্ব পার্শ্বের এলাকা নিয়ে গঠিত এই সেক্টরের জেলাগুলো হচ্ছে সিলেট, কুমিল্লা, নোয়াখালী, চট্রগ্রাম ও পার্বত্য চট্রগ্রাম। পাকিস্তান এই সেক্টরে তাদের ১৪ ডিভিশন এবং ৩৯ অস্থায়ী ডিভিশন মোতায়েন করেছিলো। মেজর জেনারেল আবদুল মজিদের নেতৃত্বে ১৪ ডিভিশনের সৈন্যরা কুমিল্লা পর্যন্ত এলাকার দায়িত্বে ছিলো। ২০২ ব্রিগেড সিলেট, ২৭ ব্রিগেড ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও আখাউড়া, ১১৭ ব্রিগেড কুমিল্লা, ৩১৩ ব্রিগেড ব্রাহ্মণবাড়িয়া উত্তরাঞ্চল ও মৌলভীবাজার এলাকার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলো। ৫৩ পদাতিক ব্রিগেড ছিলো লাকসাম ও ফেনীর দায়িত্বে।

চট্রগ্রাম ও কক্সবাজার এলাকার দায়িত্বে ছিল পাকিস্তানের ৩৯ পদাতিক ডিভিশন। কমাণ্ডার ছিলেন মেজর জেনারেল রহিম খান।

ভারতের পক্ষে এই সেক্টরের দায়িত্বে ছিলো লে. জেনারেল সগত সিং-এর নেতৃত্বাধীন ৪র্থ কোর। তার অধীনে ছিলো মেজর জেনারেল কৃষ্ণরাও- এর অধীনে ৮ম মাউন্টেন ডিভিশন, মেজর জেনারেল গনজালভেস-এর ৫৭ মাউন্টেন ডিভিশন এবং মেজর জেনারেল আর, ডি হিরার অধীনে ২৩ মাউন্টেন ডিভিশন। বাংলাদেশের ৮টি ব্যাটালিয়ন এবং আমাদের ১ থেকে ৫ নম্বর সেক্টরের সকল ট্রুপসকে সগত সিং-এর অধীনে ন্যস্ত করা হয়েছিল। অভিযান সংক্রান্ত দায়িত্ব ছাড়াও ৪র্থ কোরের ওপর আগরতলা শহর, বিমান ঘাঁটি এবং ঐ এলাকায় বিমান বাহিনীর সকল প্রতিষ্ঠান রক্ষার ভার ছিলো।

প্রাথমিক অবস্থায় বাংলাদেশ পাকিস্তানীদের ১৪ ডিভিশনের কেবল ৪টি পদাতিক ডিভিশন ছিলো। ২৮শে মার্চের মধ্যে ৯ এবং ১৬ ডিভিশন দুটি এখানে চলে আসে। এরপর বাংলাদেশে তারা আরো দুটি ডিভিশন গড়ে

তোলে। এই দুটি ছিলো ৩৬ এবং ৩৯ অস্থায়ী ডিভিশন। ১৯৭১-এর অক্টেবরের মধ্যে পাকিস্তান এখানকার সবগুলো ডিভিশনের পুনর্গঠন কাজ সম্পন্ন করে। ডিভিশনগুলোর সাথে অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে ছিলো গোলন্দাজ ও ভারী মর্টার বহর এবং ট্যাংক বহর। আমেরিকান শেফি ট্যাংক চিলো ৬০টি। বিমান বাহিনীতে ছিলো ২০ খানি এফ-৮৬ স্যাবর জেট এবং নৌবাহিনীতে ছিলো অজ্ঞাত সংখ্যাক গানবোট এবং অন্যান্য উপকূলীয় নৌযান।

এর মোকবিলায় ভারত তার ৭টি পদাতিক ডিভিশনকে এই এলাকায় যুদ্ধ করার জন্য নিয়োজিত করে। পশ্চিম পাকিস্তানের ফ্রন্টে আক্রমণাত্নক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এবং চীন সীমান্তে সম্ভাব্য হামলা মোকবিলায় প্রয়োজনীয় সৈন্য নিয়োজিত করার পর বাংলাদেশে যুদ্ধ চালনার জন্য ভারতের হাতে এই ৭টি পদাতিক ডিভিশন ছাড়া আর কোনো নিয়মিত ফোর্স ছিলো না। এইগুলোর মধ্যে ৬টি ছিল পুর্ণাঙ্গ ডিভিশন এবং ২টি স্বতন্ত্র পদাতিক ব্রিগেড। ডিভিশনগুলোকে যুদ্ধে পূর্ণ সহায়তা দেয়ার জন্য ছিলো হালকা এবং মাঝারি পাল্লার গোলন্দাজ বহর, পিটি-৭৬ ধরনের উভচর ট্যাংকের দুইটি রেজিমেন্ট এবং টি-৫৪ ধরনের একটি ট্যাংক রেজিমেন্ট। এছাড়া ৩টি স্বতন্ত্র ট্যাংক স্কোয়াড্রন এবং দুটি দ্রুত চলাচলে সক্ষম (মেকানাইজড) ব্যাটালিয়নকে যুদ্ধের জন্য নিয়োজিত করা হয়।

ভারতীয় বিমান বাহিনীর ৭টি জঙ্গী বোমারু বিমানের স্কোয়াড্রন এই এলাকার জন্যে নিয়োজিত করা হয়। এছাড়া ছিলো সৈন্য পরিবহনের জন্য কিছু সংখ্যক হেলিকপ্টার। বিমানবাহিনী জাহাজ আই.এন,এস ভীক্রান্ত সহ ইস্টার্ন ফ্লীট ছিলো এই অঞ্চলের সমুদ্রে প্রায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি। বাংলাদেশের উপকূলের অদূরবর্তী সমগ্র সাগর এলাকা অবরোধের দায়িত্বে ছিলো এই ইস্টার্ন ফ্লীটের উপর ন্যস্ত। যুদ্ধ যদি শুরু হয় তাহলে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সমুদ্রপথে সৈন্য কিংবা সমসরঞ্জাম নিয়ে আসা নিয়াজীর পক্ষে আর কিছুতেই সম্ভব হবে না।

এটা সাধারণ মাপকাঠি হিসাবে মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত যে কোনো আক্রমণ পরিচালনা করে সফলতা অর্জন করতে হলে প্রতিটি আত্মরক্ষাকারী সৈনিকের বিরুদ্ধে তিনজন আক্রমণকারী নিয়োগ করতে হবে। পূর্বাঞ্চলে ভারত কিন্তু সেই অনুপাতে পাকিস্তানের চাইতে শক্তিশালী ছিল না। অনুপাত যেখানে ৩:১ হওয়া দরকার, সেখানে ভারত ও পাকিস্তানের তুলনামূলক অনুপাত ছিলো ২:১। কিন্তু ইস্টার্ন কমান্ডার লে. জেনারেল অরোরা যে ৭টি ডিভিশন পেয়েছিলেন তার চাইতে বেশী সৈনিক পাওয়ার আর কোনো আশাই করতে পারতেন না এবং এই বাহিনী দিয়েই তাকে তার আরব্ধ কাজ সমাধা করতে হবে। এটা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন।

তবে জেনারেল অরোরার আস্থা ছিল জয়ী তিনি হবেনই। বাংলাদেশের সমগ্র বাহিনী তাঁর সহযোগিতায় প্রস্তত ছিলো। এর মধ্যে নিয়মিত ব্রিগেডগুলো ছিলো কে ফোর্স, এস ফোর্স এবং জেড ফোর্স। ৯টি সেক্টরের ২০ হাজার বাঙালী সেক্টর ট্রপস অস্ত্র হাত প্রস্ত্তত। এক লাখ গেরিলা সর্বত্র শত্রুকে তখন তাড়িয়ে নিয়ে ফিরছিলো। সর্বশেষ এবং সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ ভারত-বাংলাদেশ যৌথ বাহিনীকে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদানের জন্য তৈরি হয়েছিলো। ইয়াহিয়া কিংবা নিয়াজীর জন্য তাদের অন্তরে করুণার লেশমাত্র অবশিষ্ট ছিলো না। যুদ্ধ শুরু হওয়ার অনেক আগেই বাঙালীদের এই ঘৃণা পাকিস্তানের পরাজয় এক রূপ নিশ্চিত করে রেখেছিলো।

জনসাধারণের সমর্থনের ওপর ভিত্তি করেই প্রধানত ভারতের বিজয় নিরূপণ করা হয়েছিলো। জনসাধারণের একটি বিরাট অংশ ততোদিনে রাইফেল, এলএমজি, স্টেনগান ইত্যাদি চালানো কিংবা গ্রেনেড নিক্ষেপের কায়দা কানুন শিখে ফেলেছিল। শত্রুপক্ষের খবরা খবর সংগ্রহ করা এবং প্রায় সকল ধরনের অস্ত্রের পরিচিতি সম্পর্কে তারা মোটামুটি অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছিল। কোন অস্ত্রটি কোন দেশের তৈরী তাও অনেকে বলতে পারতো। আমার ২ নাম্বার সাবসেক্টরে আট বছরের একটি ছেলে প্রায় প্রতিটি টহলদের পার্টির সাথেই স্কাউট হিসেবে কাজ করতো। দিনের বেলা সে একাই চলে যেতো শত্রুর সব কিছু দেখে আসার জন্য। ফিল্ড ম্যাপের ওপর আঙুল দিয়ে সে

আমাদের বুঝাতো : এই হচ্ছে বল্লবপুর গ্রাম স্যার। আর এখানে আছে বড় একটা পুকুর। মেশিনগানটি বসানো আছে এখানে। এই এলাকায় মাইন লাগানো আছে। কিন্তু স্যার গরু বাছুর এখান দিয়ে হেঁটে যেতে দেখেছি কিছুই হয়নি। তাই ওটা নিশ্চয়ই ভুয়া মাইন ক্ষেত্র। এই যে এখানে একটি স্কুল বিল্ডিং, অফিসাররা এখানে থাকে। এই ভাবে যুদ্ধের এলাকার সব কিছু ছেলেটি আমাদের বুঝিয়ে দিতো।

বিভিন্ন অঞ্চলের ভু-প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করে জেনারেল অরোরা তাঁর পরিকল্পনা চূড়ান্ত করেছিলেন। প্রধান লক্ষ্যে ছিলো, যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব ঢাকা মুক্ত করা। শত্রুর শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ঘাঁটিগুলো এড়িয়ে এবং যোগাযোগ ও সরবরাহ লাইন দখল করে দ্রুতগতিতে ঢাকা দখল করাই ছিল পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য।

ঢাকা একবার মুক্ত হয়ে গেলেই শত্রুর বিচ্ছিন্ন অবস্থানগুলো আপনা-আপনি আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হবে। তাহলে অত্যন্ত ধীরে সুস্থে এই সব এড়িয়ে যাওয়া অবস্থানগুলোকে ধ্বংস করা যাবে।

প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতাসমূহ যুদ্ধের লক্ষ্য নির্ধারণ করে। চূড়ান্ত বিজয় লাভ হলে এটা অপরিহার্য হয়ে পড়ে যে, ঢাকাকে আসল লক্ষ্যবস্তু হিসাবে যুদ্ধ চালাতে হবে এবং অন্যান্য লক্ষ্যবস্তু নির্ধারণ করতে হবে প্রাকৃতিক সেক্টর হিসাবে আলাদা ভাবে।

উত্তর-পশ্চিম সেক্টরের বগুড়া ছিলো প্রধান যোগাযোগ কেন্দ্র। সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, এই সেক্টরের সকল জায়গার শত্রু সৈন্যদের উপর আক্রমণ চালিয়ে তাদেরকে শেষ করতে হবে তবে প্রধান অভিযান ঘোড়াঘাট ও গোবিন্দগঞ্জ হয়ে বগুড়া মুক্ত করার লক্ষ্যেই পরিচালিত হবে।

পশ্চিম সেক্টরে যশোর ছিল প্রধান যোগাযোগ কেন্দ্র। ঝিনাইদহ-মাগুরা-ফরিদপুর হয়ে ঢাকার সাথে এর সংযোগ। তাই ঝিনাইদহ এবং মাগুরা দখল করতে পারলে যশোরে পাকিস্তনীরা বিপাকে পড়বে এবং মিত্র বাহিনীর পক্ষে দ্রুত ঢাকা অভিমুখে যুদ্ধাভিযান চালানো সম্ভব হবে। তাই মূল হামলা ঝিনাইদহ-মাগুরা দখলের উদ্দেশ্য পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। তবে শত্রুকে বিভ্রান্ত করার জন্যে যশোরের দিকে একটা আক্রমণ চালাবারও সিদ্ধন্ত নেয়া হয়।

উত্তর সেক্টরে মিত্র বাহিনীর একটি ব্রিগেডকে জামালপুর-টাঙ্গাইল সড়ক হয়ে ঢাকা অভিমুখে অগ্রসর হওয়ার দায়িত্ব দেয়া হয়।

পূর্ব সেক্টরে লক্ষ্য রাখতে হবে, ঢাকা যেন চট্রগ্রাম কিংবা কুমিল্লা থেকে কোন সাহায্য না পেতে পারে। মেঘনা নদী বরাবর তিনটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অর্থাৎ চাঁদপুর, দাউদকান্দি এবং আশুগঞ্জ দখল করতে পারলেই এই উদ্দেশ্য হাসিল করা সম্ভব। প্রথম অবস্থায় কুমিল্লা, গ্যারিসন এড়িয়ে গেলেও চলবে।

ঢাকা মুক্ত করার লক্ষ্যে দাউদকান্দি থেকে ভৈরব পর্যন্ত মেঘনা নদীর উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা এবং এরপর জামালপুর-টাঙ্গাইল অক্ষ বরাবর অগ্রসররত দলটির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে রাজধানী অভিমুখে যুদ্ধাভিযান পরিকল্পনার অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে পড়ে।

পশ্চিম সেক্টরের অগ্রসরমান কলামের জন্য গোয়ালনন্দঘাট দিয়ে পদ্মা পার হওয়ার ব্যবস্থা থাকবে। বিশাল এই নদীটি পার হওয়ার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা আগে থাকতেই করে রাখতে হবে।

চট্রগ্রাম অভিমুখে অগ্রসর হওয়ার সময় আমর সঙ্গে নিজস্ব এক ব্রিগেড সেক্টর ট্রুপস ছাড়াও ভারতীয় ২টি বাহিনীর ব্যাটালিয়ন এবং বেঙ্গল রেজিমেন্টর একটি ব্যাটালিয়ন ছিলো। এই সব সেনা নিয়ে গঠিত হয় বিচিত্র এক বাহিনী যার নাম দেয়া হলো 'কিলো ফোর্স'। আমাদের পথ ছিলো সবচাইতে দীর্ঘতম অথচ যানবহনের সংখ্যা ছিলো সবচাইতে কম। ফিল্ড আর্টিলারী আমাদের সহায়তায় ছিলো বটে, তবে কোন ট্যাংক কিংবা অন্য কোনো প্রকার সাহায্যকারী ইউনিট ছিল না। এই সেক্টরে আমি ইতিমধ্যেই শত্রুর পশ্চাৎভাগে দুটি নিয়মিত

কোম্পানীকে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। আমার একটি কোম্পানী মীরেশ্বরাই এলাকা এবং ফটিকছড়ি এলাকায় নিরাপদে ঘাঁটি স্থাপন করে বসেছিলো। সমগ্র বেলুনিয় অঞ্চল বেশ কয়েকদিন আগে কয়েকদিন আগে থেকেই শত্রুমুক্ত হয়েছিলো। ফেনী মুক্ত করার জন্য আমাদের প্রস্তুতি চূড়ান্ত। ১৯৭১-এর ২রা ডিসেম্বরের কথা বলছি। পরের দিন মিসেস গান্ধী কলকাতায় এক জনসভায় বক্তৃতা দেবেন। আমরা অনেকেই আশা করেছিলাম এই সভায় হয়তো তিনি বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার কথা ঘোষণা করবেন।

স্বাধীনতার চূড়ান্ত লড়াই

বেলুনিয়ায় আমার অগ্রবর্তী কমান্ড পোস্টের দিকে জিপ চালিয়ে এগিয়ে যাই। ধুলায় আচ্ছন্ন পথ। দুই পাশে ফসলের সোনালী মাঠ। ধান কাটা মৌসুম এসে গেছে।

অন্যান্য দিনের মতোই সূর্য ডুবে গেল। তারপর সমস্ত এলাকা পূর্ণ চাঁদের আলোয় ভরে ওঠে। পথের পাশে একটা টহলদার দলকে ব্রিফিং দেয়া হচ্ছিলো। অল্প দূরেই আমাদের মেশিনগানের আওয়াজ শোনা যায়। ফাঁকে ফাঁকে পাকিস্তানীদের মেশিন গান,......কখনও বা আর্টিলারী শেলিং শুরু হয়। সব কিছু নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা.... বাংলাদেশের হয়তো সব ফ্রন্টেই তা ঘটেছিলো প্রতিদিন।

মিসেস ইন্দিরা গান্ধী সেদিন কলাকাতায় এক বিশাল জনসভায় ভাষন দিলেন। তাঁর নয়াদিল্লি ফিরে যাবার কোনো তাড়াহুড়োই ছিলো না।

জেনারেল অরোরার ইস্টার্ন কমাণ্ড হেড কোয়ার্টারে আর একটা কর্মব্যস্ত দিনের অবসান ঘটলো। যেহেতু প্রধানমন্ত্রী রাজধানীর বাইরে তাই ইস্টার্ন কমান্ডে কেউ কোনো গুরুরত্বপূর্ণ নির্দেশ বা সিদ্ধান্ত পাওয়ার আশা করছিলো না। ওদিকে ইয়াহিয়া খান তখন ইসলামাবাদে। দশ দিনের মধ্যে যুদ্ধ করার যে পূর্বাভাস তিনি দিয়েছিলেন তা শেষ হতে আরো দুই দিন বাকী।

ভারতের সমস্ত অগ্রবর্তী বিমান ঘাঁটিসমূহ যুদ্ধের প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছিল। তবে বিমান ঘাঁটিগুলোতে যুদ্ধের সবগুলো বিমান তখন পর্যন্ত পৌছেনি। ভারতীয় নৌবাহিনীর ইস্টার্ন ফ্লীট এবং ওয়েস্টার্ন ফ্লীট তখন পর্যন্ত শান্তি কালীন ঘাঁটিতেই অবস্থান করছিলো।

পাকিস্তানের বহুল প্রচারিত সাবমেরিন ৩১১ ফুট দীর্ঘ পি-এন-এস গাজী এগিয়ে চললো ভারতের নৌ ঘাঁটি বিশাখাপত্তমের দিকে। উদ্দেশ্য ছিলো ভারতের বিমানবাহী যুদ্ধ জাহাজ 'ভিক্রান্ত' কে টর্পেডো মেরে ডুবিয়ে দেয়া। ৩রা ডিসেম্বর। শুক্রবার। ভারতীয় সময় বিকাল ৫টা ৪৭ মিনিটে পাকিস্তানী বিমান বাহিনী অতর্কিতে ভারতের ৭টি বিমান ঘাঁটিতে একযোগে হামলা চালায়। রাত সাড়ে আটটায় জম্মু এবং কাশ্মীরে দক্ষিণ-পশ্চিম ছাম্ব এবং পুঞ্চ সেক্টরে ব্যাপক আক্রমণ অভিযান শুরু করে।

এই ধরনের পরিস্থিতির জন্য ভারত পুরো প্রস্তত ছিলো। মিসেস গান্ধী দ্রুত রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং ঐ রাতেই ১২টা ৩০ মিনিট জাতির উদ্দেশ্য প্রদত্ত বেতার ভাষণে সকলকে চরম ত্যাগ স্বীকারের জন্য তৈরী হওয়ার আহবান জানালেন। ততোক্ষণে জেনারেল অরোরাও আক্রমণের নির্দেশ পেয়ে যান। ভারতীয় নৌবাহিনী ইতিমধ্যেই সফল অভিযান শুরু করে দিয়েছিলো। বিশাখাপত্তম উপকূলের মাত্র কয়েক মাইল দূরে ভারতীয় ডেস্ট্রয়ার 'আইএনএস রাজপুত' পাকিস্তানী সাবমেরিন গাজীর সন্ধান পেয়ে যায়। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই 'রাজপুতের ডেপথ' চার্জে পাকিস্তানের সাবমেরিন গাজী টুকরো টুকরো হয়ে সাগর গর্ভে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। একই সঙ্গে অন্যদিকে ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং মুক্তিবাহিনী যৌথভাবে আন্তর্জাতিক সীমান্তরেখা অতিক্রম করে বাংলাদেশ প্রবেশ করলো। ইস্টার্ন ফ্লীটও দ্রুত লক্ষ্যস্থল অভিমুখে অগ্রসর হলো। ভারতীয় বিমানবাহিনী কিছুক্ষণ আগে থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানের প্রায় সবগুলো বিমান ঘাঁটি এবং রাডার কেন্দ্রের উপর আঘাত হেনে

চলেছিলো। রাত ৩টায় ভারতীয় বিমানগুলো ঢাকা এবং কুর্মিটোলা বিমান ঘাঁটির উপর প্রথম হামলা শুরু করে । ইতিহাসের আর একটি মহান স্বাধীনতার চূড়ান্ত সংগ্রামের সূচনা হলো।

যুদ্ধের প্রথম দিনে সকল রণাঙ্গনে পাকিস্তানীরা মরণপণ শক্তিতে আক্রমণ প্রতিরোধ করার চেষ্টা করলো। বেলা ১০ টার মধ্যে ভীক্রান্ত তার নির্দিষ্ট গন্তব্যস্থলে পৌচে যায়। কিছুক্ষণের মধ্য ৬টি 'সী হক' বিমান চট্রগ্রাম এবং কক্সবাজারের গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যস্থলগুলোতে আঘাত হানার জন্য ডেক থেকে উড়ে গেলো।

পূর্ব সেক্টরে অর্থাৎ মেঘনার পূর্ব দিকের অঞ্চলে পাকিস্তানী সৈন্যদের ধ্বংস করার দায়িত্ব ভারতীয় ৪র্থ কোরের ওপর ন্যাস্ত ছিলো। এই সেক্টরে প্রধান সড়কপথে রণকৌশলগত প্রতিবন্ধকতা ছিলো দুটি স্থানে ব্রাহ্মণবাড়িয়া এবং লাকসামে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া দখল করতে পারলে পূর্ব সেক্টরের সকল পাকিস্তানী সৈন্য বিশেষ করে সিলেট ও মৌলভীবাজারের সৈন্যরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে বাধ্য। একই সঙ্গে লাকসাম আমাদের দখলে এলে কুমিল্লা গ্যারিসন চট্রগ্রাম ও ঢাকা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। চাঁদপুর ও ফেনী দখলের দায়িত্ব ছিল ৪র্থ কোরের উপর। যুদ্ধ শুরু হওয়ার ১০ দিনের মধ্যেই এই স্থান দখল করার পরিকল্পনা নেয়া হয়। একই সঙ্গে উত্তরে শমসেরনগর বিমান ঘাঁটি, মৌলভীবাজার এবং সিলেটও মুক্ত করার দায়িত্ব এই কোরের ওপর ছিলো। ৪র্থ কোরের প্রাথমিক পরিকল্পনায় ঢাকা মুক্ত করার পরিকল্পনা ছিলো না। সে অনুসারে কোর কমান্ডার সগত সিং ৮ নং মাউন্টেন ডিভিশনকে শমসেরনগর বিমান ঘাঁটি, মৌলভীবাজার এবং সিলেট শহর মুক্ত করার নির্দেশ দেন। করিমগঞ্জের নিকট সীমান্ত অতিক্রম করে ৮ম মাউন্টেন ডিভিশনের একটি কলাম সিলেটের দিকে এবং অন্য একটি মৌলভীবাজারের দিকে অগ্রসর হয়। শমসেরনগর বিমার ঘাঁটি মুক্ত হয় প্রথম দিনেই। পাকিস্তানীরা অবস্থা বেগতিক দেখে এই অঞ্চলের অধিকাংশ সীমান্ত ফাঁড়ি থেকে পশ্চাদপসরণ করতে থাকে।

এই কোরের ৫৭তম ডিভিশনকে আগরতলার নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার পর আখাউড়া মুক্ত করে ব্রাহ্মণবাড়িয়া পথে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। কুমিল্লা এবং ময়নামতি মুক্ত করার কাজে নিযুক্ত ২৩ মাউন্টেন ডিভিশনকে সাহায্য করাও ৫৭ ডিভিশনের দায়িত্ব ছিলো। তারপর মেঘনা নদীর তীরে গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ কেন্দ্র চাঁদপুর এবং দাউদকান্দি করার লক্ষে যুদ্ধভিযান চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশও এই ডিভিশনকে দেওয়া হয়।

এই সেক্টরে দক্ষিণে ফেনী শহর থেকে পাকিস্তানীরা এক সময় সন্তপর্ণে পালিয়ে যায়। সাথে সাথে আমার বাহিনী শহরটিতে প্রবেশ করে। ফেনী আমাদের হাতে চলে আসায় চট্রগ্রাম পাকিস্তানীদের সঙ্গে দেশের অন্যান্য স্থানের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এসময় কুমিল্লা ও লাকসাম এলাকায় প্রচন্ড যুদ্ধ শুরু হয়।

আমার সেক্টরে ফেনী এবং বেলুনিয়া এলাকা সম্পূর্ণভাবে শত্রুমুক্ত হওয়ার পর পাকিস্তানীরা ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে লাকসামের দিকে পশ্চাদপসরণ করে। এটাই হচ্ছে একমাত্র এলাকা (অর্থাৎ চট্রগ্রাম সেক্টর) যেখানে ভারতীয় সেনাবাহিনীর কোন নিয়মিত পুরো ব্রিগেড যুদ্ধে নিয়োজিত হয়নি। এখানে অভিযান চলেছে প্রধানত আমার তিন ব্যাটালিয়ন সেক্টর ট্রপস (যার মধ্যে থেকে ২ কোম্পানী ইতিপূর্বেই চট্রগ্রামের অভ্যন্তরে প্রেরণ করা হয়েছিল) এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীর দুটি ব্যাটালিয়নের শক্তির ওপর নির্ভর করে।

বেলুনিয়া ও ফেনীতে আমাদের হাতে চরম মার খাওয়ার পর ৫৩ ব্রিগেডসহ পাকিস্তানের ১৫ বালুচ রেজিমেন্ট ৬ই ডিসেম্বর লাকসামের দিকে পলায়ন করেছিলো। ৬ই ডিসেম্বর আমরা ফেনী মুক্ত করে চট্রগ্রামের পথে অগ্রসর হই। সামনে আমাদের ৬৫ মাইল পথ। শুভপুরের কয়েক মাইল দক্ষিণে ধুমঘাট রেল সেতুটি দখল করা এবং রক্ষা করার জন্য আমি সাথে সাথেই দুটি প্লাটুনকে পাঠিয়ে দেই ধুমঘাটের পথে। চট্রগ্রামের পথে অগ্রসরমান আমাদের মূল বাহিনীতে ছিলো আমার সেক্টরের তিনটি নিয়মিত এবং বাংলাদেশের একটি কামান বহর নাম ছিল মুজিব ব্যাটারী। (শেখ মুজিবর রহমানের নাম অনুসারে)। ভারতীয় বাহিনীতে ছিলো ২য় রাজপুত ব্যাটালিয়ন, বিএসএফ-এর একটি গোলন্দাজ রেজিমেন্ট। এই সেক্টরে বাংলাদেশ বাহিনীর কমান্ডার

হিসাবে আমি এবং ভারতীয় বাহিনীর কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার আনন্দ স্বরূপ ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য করে চলছিলাম। আগেই বলা হয়েছে আমাদের এই যৌথ বাহিনীর নাম ছিলো 'কিলো ফোর্স'।

ফেনী থেকে রওনা হওয়ার পথে পাকিস্তানের ৩৯ অস্থায়ী ডিভিশনের সৈন্যদের মোকাবিলা হবে বলে আমরা জানতাম। পাকিস্তানী এই ডিভিশনের সঙ্গে কামান ও সাঁজোয়া বহরও ছিলো। আমার বা ভারতীয় বাহিনীর সাথে কোন ট্যাংক বিধ্বংসী অস্ত্র ছিলো না। এই কারণে ভারতীয় বাহিনী একটু সতর্কতার সঙ্গে অগ্রসর হচ্ছিলো। আমাদের মূল বাহিনী ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক পথে অগ্রসর হচ্ছিলো। একই সাথে একটি বাংলাদেশ ব্যাটালিয়নকে চট্টগ্রাম পাহাড়ের মধ্য দিয়ে পাঠানো হয় হাটহাজারী এবং চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টের মাঝামাঝি জায়গায় অবস্থান গ্রহণ করার জন্যে। এই জায়গাটি বন্দর নগরী চট্টগ্রামের কয়েক মাইল উত্তরে। আর আমরা মূল বাহিনী মহাসড়ক পথে চট্টগ্রামের পশ্চিম দিক দিয়ে এগিয়ে চললাম।

চট্টগ্রামের অগ্রাভিযান আমরা ছাগলনাইয়া মুক্ত করার পর ৭ই নভেম্বর ফেনী নদীর সেই স্মরণীয় শুভপুর সেতুর কাছে গিয়ে পৌছি। চট্টগ্রামের পথে আমাদের সামনে এটিই হচ্ছে সর্বশেষ প্রধান বাধা। অবশ্য এরপরও কয়েকটি ছোটখাটো সেতু রয়েছে। শুভপুর সেতুর কাছে গিয়ে দেখি পাকিস্তানীরা সুদীর্ঘ সেতুটির দুটি স্প্যান সম্পুর্ণ ধ্বংস করে রেখে গেছে। আমরা আরো খবর পাই যে তারা ৮ মাইল দুরে মিরেশ্বরাইতে গিয়ে প্রতিরক্ষা ব্যূহ গড়ে তুলেছে।

তৎক্ষণাৎ ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ারিং কোরের সদস্যদের ডাকা হয়। তারা যৌথবাহিনীর যানবাহন ও ভারী অস্ত্রশস্ত্র পার করার জন্য ফেনী নদীতে একটি প্লাটুন ব্রিজ তৈরী করার কাজে লেগে যায়। কিন্তু নতুন সেতুর জন্যে অপেক্ষা না করে আমার সৈন্য দলের একটি অংশকে নিয়ে আমি ৮ই ডিসেম্বর বিকেলে নৌকাযোগে নদী পার হয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হই। স্বল্পতম সময়ে করেরহাটে আমার সেক্টর হেড কোয়ার্টার স্থাপন করে আমরা জোরারগঞ্জ পর্যন্ত এলাকা শত্রুমুক্ত করি। ভারতের ব্রিগেড কমান্ডারও করেরহাট পৌছে যান। আমার এলাকায় যুদ্ধের জন্য রসদপত্র সংগ্রহই ছিল বড় সমস্যা। আমাদেরকে খাদ্য দ্রব্য এবং অন্যান্য জিনিসপত্রের জন্য পুরোপুরি ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর ওপর নির্ভর করতে হচ্ছিলো। এগুলোর জন্য ভারতীয় সেনাবাহিনীকে আবার তাদের পেছনের ঘাঁটির ওপর নির্ভর করতে হতো। এই ঘাঁটি ছিলো শুভপুর থেকে প্রায় ৫০ মাইল দূরে। এই পথটুকুর অধিকাংশ স্থানই ছিলো আবার ভীষণ খারাপ। তাই আমাদের রসদ সরবরাহ ব্যবস্থায় একটা মারাত্বক সংকটের সৃষ্টি হয়েছিলো। হয়তো এই কারণেই আমার সঙ্গের ভারতীয় ব্যাটালিয়নগুলো সাবধানে এগুতে চাইছিলো। ভারতীয় কমাণ্ডার যুদ্ধের সরঞ্জাম এবং রসদের সরবরাহ সম্পর্কে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত বেশি দূর সামনে অগ্রসর হতে চাইছিলো না। এদিকে শত্রুরা শুভপুর সেতু ধ্বংস করে আমাদের সকলকে আরো সংকটে ফেলে দিয়েছিলো। এই প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও আমরা বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে পারছিলাম না। জাতিসংঘে আমাদের জন্য ক্ষতিকারক কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের এবং পাকিস্তানের অনুকূলে মার্কিন ৭ম নৌবহরের সরাসরি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার পূর্বেই যত তাড়াতাড়ি পারা যায় আমাদের চট্টগ্রাম পৌছতে হবে।

ইতিপূর্বেই আমি মিরেশ্বরাইয়ের নিকট গেরিলা তৎপরতায় লিপ্ত আমার নিয়মিত কোম্পানী এবং মিরেশ্বরাই ও সীতাকুন্ডু এলাকার সকল গেরিলা গ্রুপকে নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলাম যে, তারা যেন শত্রুর ওপর প্রচন্ড আক্রমণ শুরু করে। ৯ই ডিসেম্বর দিবাগত রাতে প্রতিটি গেরিলা দল মহাসড়ক অভিমুখে অগ্রসর হতে থাকে। গ্রাম গ্রামান্তর থেকে তারা গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে সড়কের দিকে আসছিলো এবং এতে করে ২০ মাইল দীর্ঘ এবং ১০ মইল প্রস্থ জুড়ে এলাকায় এমন একটা ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিলো যে, মনে হচ্ছিলো মুক্তিবাহিনীর পুরো একটি কোরই বোধ হয় আক্রমণ চালিয়েছে। সেই রাতেই পাকিস্তনীরা পশ্চাদপসরণের আদেশের জন্য অপেক্ষা না করেই পেছনের দিকে পালিয়ে যায়।

এদিকে আমরা যখন একটি জাতি হিসেবে আমাদের অস্তিত্বকে টিকেয়ে রাখার জন্য লড়াই করছিলাম, আন্তর্জাতিক কূটনীতির ক্ষেত্রে তখন চলছিল আরেক খেলা, কিছু আমাদের সমর্থনে আবার কিছু ছিলো আমাদের

বিরূদ্ধে। ৫ই ডিসেম্বর নিরাত্তা পরিষদে পাকিস্তানের পক্ষে অবিলম্বে যুদ্ধ বিরতির জন্য যে প্রস্তাব পেশ করা হয়েছিল, সোভিয়েত ইউনিয়ন তাতে ভেটো দেয়। পাকিস্তান যখন হেরে যাচ্ছিলো সেই মুহূর্তে যুদ্ধবিরতি মানা হলে ইসলামাবাদেরই তাতে সুবিধা হতো, আর আমরা যেটুকু অর্জন করেছিলাম তাও হারাতাম।

এরপরের দিন অর্থাৎ ৬ই ডিসেম্বর ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের ঘোষণা করলে তা মুক্তিযোদ্ধাদের এবং বাংলাদেশের জনগণের মনোবলকে বহুগুণে বাড়িয়ে দেয়। পাকিস্তানের বন্দীশালায় আটক শেখ মুজিবুর রহমানের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে সেদিন মিসেস গান্ধী বলেছিলেন, এই নবজাত রাষ্ট্রের যিনি জনক, বর্তমান মুহূর্তে আমাদের সমস্ত চিন্তা তাকেই কেন্দ্র করে।

৮ই ডিসেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে সৈন্য প্রত্যাহারের একট প্রস্তাব সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে পাস হয়েছিলো। প্রস্তাবটির উদ্যোক্তা ছিলেন মার্কিন সরকার। বৃহৎ শক্তিবর্গের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র এবং চীন পাকিস্তানকে ভরাডুবির হাত থেকে বাঁচানোর চন্য যুদ্ধবিরতির পক্ষে ভোট দিয়েছিলো। প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট পড়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের। বৃটেন, ফ্রান্স এবং অন্য ৮টি দেশ ভোটদান থেকে বিরত থাকে।

সাধারণ পরিষদে মার্কিন প্রস্তাব গ্রহণের বিষয়টি আমাদের কাছে তেমন বিস্ময়ের কিছু ছিলো না। এতে এমন কিছুই ঘটেনি যা আমাদের লক্ষ্যচ্যুত করতে পারে। ভারত, পাকিস্তান কিংবা এই মহতী জাতি সংস্থার অন্যান্য সদস্য হয়তো এই প্রস্তাব মানতে বাধ্য। কিন্তু আমরা তখনো জাতিসংঘের সদস্য নই। এবং তাই এ প্রস্তাব মানতে বাধ্যও নই। আমরা যুদ্ধ করেছিলাম নির্যাতিত বাংলার লক্ষ লক্ষ মানুষকে মুক্ত করতে। আমাদের এই লক্ষ্যে ছিলো অত্যন্ত পবিত্র আর সেই লক্ষ্যে অর্জনের প্রায় চুড়ান্ত পর্যায়ে আমরা পৌছে গিয়েছিলাম। এমনকি এ সময় যদি ৭ম নৌ-বহর পাকিস্তানের সহায়তা করার জন্য যে কোনোভাবে যুদ্ধজড়িয়ে পড়তো তবুও আমরা এই মুক্তির সংগ্রাম চালিয়ে যেতাম। ৭ম নৌ-বহরের যুদ্ধে যোগদানের ফলে হয়তো বাংলার আরো অসংখ্য মানুষ প্রাণ হারাতো। কিন্তু মৃত্যু আর ধ্বংসযজ্ঞ এ দুটোর কোনটিই তখন এ দেশের মানুষের অজানা কিছু নয়। পাকিস্তানের জন্যে এই যুদ্ধ ছিল নিছক জয় এবং পরাজয়ের। কিন্তু আমাদের জন্যে এই যুদ্ধ ছিলো জাতি হিসেবে বেঁচে থাকার মরণপণ সংগ্রাম, অন্যথায় সম্পুর্ন নিশ্চিহ্ন হয় যাবার। এ যুদ্ধ আমাদের দেবে গৌরবময় জীবনের সন্ধান নতুবা মৃত্যু।

ভারতের চীফ অব আর্মি স্টাফ জেনারেল এসএইচএফ মানেকশ যুদ্ধের এক নতুন কৌশল অবলম্বন করলেন ৮ই ডিসেম্বর থেকে। যৌথবাহিনীর সাফল্যে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হয়ে তিনি এক সময়োচিত মনস্তাত্বিক যুদ্ধ (সাইকোলজিক্যাল ওয়ার) শুরু করেন। তার ভাষণ পর্যায়ক্রমে বেতারে প্রচারিত হতে থাকে। অন্যদিকে এই ভাষন প্রচারপত্রের মাধ্যমে বিমানের সহায়তায় পাকিস্তানী অবস্থানসমূহের ওপর বিলি করা হয়। বাংলাদেশে পাকিস্তানী সোনাবাহিনীর অফিসার ও জওয়ানদের উদ্দেশ্য মানেকশ তার বার্তায় সরাসরি বলেন, অস্ত্র সংবরণ করো, নইলে মৃত্যু অবধারিত। যৌথবাহিনী তোমাদের চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে। তোমাদের বিমান বাহিনী সম্পূর্ণ ধ্বংস ও নিয়ে আর কোনো সাহায্য পাবে না। বন্দরগুলোও এখন অবরুদ্ধ, তাই বাইরে থেকেও কোনো সাহায্য পাওয়ার আশা বৃথা। মুক্তিবাহিনী এবং জনগণ এখন প্রতিশোধ নিতে উদ্যত। তোমাদের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গেছে। সেই সাথে তিনি তাদের এই আশ্বাসও দেন সময় থাকতে অস্ত্র সংবরণ করলে তোমাদের সৈনিকদের যোগ্য মর্যাদা দেয়া হবে।

মুক্তিযোদ্ধারা এবং ভারতীয় সেনাবাহিনী দীর্ঘদিন একত্রে থেকে কাজ করে আসছিলো। ১০ই ডিসেম্বর ভারতীয় সেনাবাহিনীর সিনিয়র কমান্ডারের অধীনে ভারত এবং বাংলাদেশ বাহিনীর এক যৌথ কমান্ড গড়ে তোলা হয়।

এই দিনই (১০ই ডিসেম্বর) ঢাকা রেডিওর ট্রান্সমিটারের ওপর সরাসরি এক বিমান হামলায় বেতার প্রচার বন্ধ হয়ে যায়। ভীক্রান্ত এর বিমান বহর তখন চট্রগ্রাম পোর্ট বিমানবন্দর ও সামরিক দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য কেন্দ্রের ওপর সমানে আক্রমণ যাচ্ছিলো।

মার্কিন ৭ম নৌ-বহরের টাস্কফোর্স ইতিমধ্যেই মালাক্কা প্রণালী অতিক্রম করে দ্রুত বঙ্গোপসাগরের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলো। মার্কিনী এই বহরে ছিল পারমাণবিক শক্তি চালিত বিশাল বিমানবাহী জাহাজ 'এন্টারপ্রইজ' এবং আরো ৬টি যুদ্ধ জাহাজ। এ ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের অজুহাত ছিলো বাংলাদেশে মার্কিন নাগরিকদের সরিয়ে নেয়ার জন্যই ৭ম নৌ-বহরকে এই অঞ্চলে আনা হচ্ছে। এই যুক্তি মার্কিন জনসাধারণের কাছেও গ্রহণযোগ্য ছিলো না, কারণ আমাদের যৌথ কমান্ড ১১ই ডিসেম্বর থেকে বিমান হামলা সাময়িকভাবে স্থগিত রেখে ঢাকা বিমানবন্দর মেরামতের সুযোগ করে দেয়। যাতে আন্তর্জাতিক পথের বিমানগুলোতে বিদেশী নাগরিকরা ঢাকা ত্যাগ করতে পারেন। কিন্তু মার্কিন নাগরিকদের মধ্যে এ সময়ে ঢাকা ত্যাগের তেমন কোনো লক্ষণ দেখা যায়নি।

ততক্ষণে যুদ্ধ সম্পর্কে সবাই স্পষ্ট ধারনা করতে পারছিলো। যৌথবাহিনী সাফল্যের সাথে মেঘনার ওপারে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণের পর সামরিক বিশেষজ্ঞরা অভিমত প্রকাশ করেছিলেন সাত থেকে দশ দিনের মধ্যে ঢাকার পতন ঘটবে। নিয়াজী অবশ্য তখনো নিরাপদে ঢাকায় বসে হুংকার দিচ্ছিলেন, প্রতি ইঞ্চি জায়গার জন্য একটি প্রাণ বেচেঁ থাকা পর্যন্ত আমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাবো। রাও ফরমান আলী কিন্তু ঠিকই বুঝেছিলেন খেলা শেষ। বাংলাদেশে পাকিস্তানীরা যে জঘন্য অপরাধ করেছিলো, অপারেশন জেনোসইডের অন্যতম স্তপতি ফরমান আলী সে বিষয়ে পুরো সচেতন হয়ে পড়েছিলেন। পরাজয় তখন অবশ্যম্ভাবী। মুক্তিবাহিনীর হাত থেকে রক্ষ পাবার উদ্দেশে ১১ই ডিসেম্বর তিনি যুদ্ধ বিরতির জন্য জাতিসংঘ সদর দফতরে এক আবেদন জানান। ফরমান আলী এখনকার সকল পাকিস্তনীকে অপসরণের ব্যবস্থা করারও অনুরোধ করেন। সঙ্গে সঙ্গে ইয়াহিয়া খান জাতিসংঘকে জানিয়ে দেন যে, ফরমান আলীর প্রস্তাব অনুমোদিত। ইয়াহিয়ার তখনো আশা, যুক্তরাষ্ট্র এবং চীন তাকে উদ্বার করতে নিশ্চয়ই এগিয়ে আসবে। নিয়াজীকে তিনি আরেকটু অপেক্ষা করার জন্য নির্দেশ দেন।

চীন বেধহয় একা অজুহাতের জন্যই অপেক্ষা করছিলো। আর ৪ঠা ডিসেম্বর মার্কিন ৭ম নৌবহর বঙ্গোপসাগরে প্রবেশ করে।

চট্রগ্রাম সেক্টরে আমাদের সকল সৈন্য ৯ই ডিসেম্বর বিকালের মধ্যে শুভপুর সেতু বরাবর ফেনী নদী পার হয়ে যায়। সামনে শত্রুরা কোথায় কি অবস্থায় আছে পর্যবেক্ষণের জন্য আমরা যথারীতি টহলদার দল আগেই পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। পাকিস্তানীরা মিরেশ্বরাই ছেড়ে যাচ্ছে বলে ১০ই ডিসেম্বর একজন গেরিলা বেস কমান্ডার আমাকে খবর দেয়। মিরশ্বরাই থেকে ১৫ মাইল দূরে গিয়ে সীতাকুন্ডুতে তারা নাকি নতুনভাবে অবস্থান গ্রহণ করেছে। আমি সাথে সাথে মিরেশ্বরাই দখল করার জন্য একটি ব্যাটালিয়ন পাঠিয়ে দেই। তখনো আমাদের কোনো যানবাহন ফেনী নদী পার হতে পারেনি। ব্যাটালিয়নের সৈন্যদের তাই পায়ে হেঁটেই অগ্রসর হতে হচ্ছিলো। ভারী অস্ত্রশস্ত্র ও মালপত্র নেওয়ার জন্য কয়েকটি রিকশা ও গরুর গাড়ি জোগাড় করা হয়।

বিকেলে আমি পরিষদ সদস্য মোশাররফ হোসেনকে নিয়ে একখানি রিকশায় মিরেশ্বরাইয়ের দিকে যাত্রা শুরু করি। আমাদের ব্যাটালিয়নও তখন একই দিকে মার্চ করে যাচ্ছিলো। পথে তাদের পেছনে ফেলে আমরা এগিয়ে যাই। অবশ্য এই ভাবে একা সামনে এগিয়ে যাওয়া ছিলো খুবই ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। পাকিস্তানীরা ঠিক কোথাও রয়েছে কিনা তখনো আমরা তা জানতাম না। তারা সকলেই মিরেশ্বরাই ত্যাগ করেছে কিনা তারও কোনো নিশ্চয়তা ছিলো না। তবু আমি ঝুঁকিনিয়ে মিরেশ্বরাই পৌছে দেখি একটু আগে শত্রুসেনারা সে স্থান ছেড়ে চলে গেছে। স্থানীয় কয়েকজন কর্মকর্তা মিরেশ্বাই হাইস্কুল ভবনে আমার সাথে একত্র হলেন। পাকিস্তানীরা আবার রাতে ফিরে আসতে পারে বলে তারা আশংকা করছিলেন। আমাদের তখন অত্যন্ত দ্রুত চট্রগ্রাম দখল করা দরকার। তাই মিরেশ্বরাইতে আমরা দ্রুত প্রতিরক্ষা অবস্থান গড়ে তুললাম। এপ্রিল ও মে মাসে এই

অঞ্চলেই আমরা যুদ্ধ করেছিলাম, তাই পুরো এলাকাটি আমার এবং আমার অধিকাংশ সৈন্যেও কাছে ছিলো সুপরিচিত। মিরেশ্বরাইতে আমরা বেসামরিক প্রশাসন চালু করি। কেরেরহাটে অবস্থানরত ভারতীয় ব্রিগেডিয়ার আনন্দ স্বরুপকে আমার নতুন অবস্থানের কথা জানিয়ে তাঁকে সত্বর এখানে চলে আসার অনুরোধ জানাই। চট্রগ্রামের পথে শত্রুসেনার সঠিক অবস্থান জানার জন্য একটি টহলদার দলকে পাঠিয়ে দেই মিরেশ্বারই থেকে সীতাকুন্ডের দিকে। ভোরেই আবার যাত্রা শুরু করতে হবে। তাই মিরেশ্বরাই হাই স্কুলে সে রাতটা কাটালাম।

পরের দিন স্বল্পকালীন সংঘের্ষের পারই সীতাকুন্ডে শত্রুদের প্রতিরোধ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। সীতাকুন্ড অতিক্রম করার পর ১৩ই ডিসেম্বর কুমিরায় পৌছে আমরা পাকিস্তানীদের শক্তিশালী ঘাঁটির সম্মুখীন হই। ভূমি বৈশিষ্ট্যের কারণে এই জায়গাটি শত্রুদের খুবই অনুকূলে ছিলো। পশ্চিমে সাগর এবং পূর্বে উঁচু পাহাড়ের মধ্যবর্তী সরু এলাকা জুড়ে পাকিস্তানীদের সুদৃঢ় অবস্থান নিয়ে বসেছিলো। সড়কের এক স্থানে গভীর খালের ওপর সেতুটি ওরা ধ্বংস করে দিয়েছিলো। রাস্তার ওপর প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা ছাড়াও পার্শ্ববর্তী উঁচু পাহাড়ে যক্ষ্মা হসপাতালের কাছে ছিলো তাদের মূল প্রতিরক্ষা ঘাঁটি। পরবর্তী চবিবশ ঘন্টা উভয় পক্ষে তুমুল সংঘর্ষ হয়। আমাদের কয়েকজন সংঘর্ষে হতাহত হলেও পরদিন সকালের মধ্য আমরা পূর্বদিকে অগ্রসর হতে সক্ষম হই। বেসামরিক জনসাধারণ শত্রুসেনাদের অবস্থান সম্পর্কে আমাদের খরাখবর দিচ্ছিলো। সংবাদ অনুযায়ী সঠিক লক্ষ্যস্থলের ওপর কামান দেগে ওদের ঘায়েল করছিলাম। ১৪ই ডিসেম্বর ভোর রাত ৩টায় আমরা কুমিরা পুরোপুরি শত্রুমুক্ত করে ফেলি। চট্রগ্রাম এখন মাত্র ১২ মাইল দূরে। কুমিরা মুক্ত হওয়ার মাত্র ৩ ঘণ্টার মধ্যে আমাদের যানবাহন এবং কামানগুলো ভাঙা সেতু এড়িয়ে খাল পার হতে শুরু করে। কয়েক হাজার নারী, পুরুষ ও শিশু ভাঙা সেতুর কাছে জমায়েত হয়ে আমাদের সাহায্য করেছিলো। একদল খালের খাড়া পার কেটে ডাইবারসন রোডের ব্যবস্থা করছিলো। অন্য দল আবার গাছ, পাথর, মাটি যা কিছু পাচ্ছিলো তাইদিয়ে খাল ভরে ফেলার চেষ্টা করছিলো। আমি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য দেখছিলাম। এই সময় এক বৃদ্ধা আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, বাবা, চিন্তা করো না। এ কাজ আমরাই পারবো। দ্যাকো তোমাদের মালপত্র আর গাড়ি-ঘোড়া কিভাবে পার করার বন্দোবস্ত করছি। দরকার হলে আমরা সবাইখালে শুয়ে পড়বো। আর তার ওপর দিয়ে তোমাদের গাড়ী পার করার ব্যবস্থা করবো। দেরি করো না বাবা। প্রত্যেক মুহূর্তে তারা আমাদের লোক মারছে। বৃদ্ধা একটু থামলেন। তার দুই চোখ পানিতে ভরে গেছে। বৃদ্ধা বলে চললেন, তোমরা জানো না, কিছুদিন আগে ঈদের সময় চাটগাঁওয়ে একটি লোকাল ট্রেন থামিয়ে তারা সকল বাঙালী যাত্রীকে খুন করেছে। প্রায় এক হাজার হবে। দা ছুরি এসব দিয়ে মেরেছে। আমার মেয়ে আর নাতি নাতনিও ছিলো আর বলতে পারবো না তোমরা এগিয়ে যাও, তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাও। তিনি আমাকে প্রায় ঠেলে দিয়েই আবার কাজে ফিরে গেলেন। আমিও পাকিস্তানীদের এই নৃশংস হত্যাকান্ডের কথা শুনেছিলাম। তবে চট্রগ্রামের সর্বশেষ যে খবর আমি পেয়েছিলাম, তা ছিলো আরো ভয়াবহ। পাকিস্তানী সামরিক জান্তা এবং অবাঙালিরা সম্মিলিতভাবে পরিকল্পনা করেছিলো চট্রগ্রাম শহরের কয়েক হাজার বাঙালীকে নির্বিচারে হত্যা করতে। এটা ছিলো তাদের শেষ মরণ কামড়।

ততোক্ষণে বঙ্গোপসাগরে ৭ম নৌ-বহরের অনুপ্রবেশে পরিস্থিতি বেশ জটিল হয়ে উঠেছিলো। চট্রগ্রামের কোন সমুদ্র উপকূলে টাস্কফোর্স-এর মার্কিন বাহিনী অবতরণ করতে পারে বলে আশংকা করা হচ্ছিলো। তাই যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব আমরা চট্রগ্রাম মুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেই। সেই উদ্দেশ্য ভারতের ২৩ ডিভিশনের ৮৩ ব্রিগেড লাকসাম থেকে দ্রুত যাত্রা শুরু করে এবং কুমিরার কাছে আমাদের সাথে যোগ দেয়। অন্যদিকে ভারতের বিমানবাহিনী ও ইস্টার্ন ফ্লিট পাকিস্তানী অবস্থানগুলোর ওপর অবিরাম বোমাবর্ষণ করে চলেছিলো। এখানকার পাকবাহিনীকে ধ্বংস করা এবং পোর্ট অচল করে দেয়ার জন্যই এই আক্রমণ চলছিল। বোমার আঘাতে জ্বালানি তেলের ট্যাংকগুলো কয়েকদিন ধরে জ্বলছিল। ক্ষতিগ্রস্ত এবং নিমজ্জিত জাহাজের সংখ্যাও ছিল প্রচুর। ডুবন্ত চ্যানেল প্রায় পুরোপুরি বন্ধ। পোর্টের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ছিলো ব্যাপক। ৫০০ এবং ১০০ পাউন্ড বোমার গর্তগুলোর ভরাট এবং ধ্বংসস্তূপ পরিস্কার করতে পরে সময় লেগেছিলো এক বছরেরও বেশি।

মুক্তিযোদ্ধারা খবর নিয়ে এলো যে কিছু পাকস্তানী অফিসার ও সৈন্য কক্সবাজার হয়ে স্থলপথে পালাবার চেষ্টা করছে। কেউ কেউ আবার জাহাজে করে কেটে পড়বার চেষ্টা করছে। কয়েকটি পাকিস্তানী জাহাজকে বিদেশী জাহাজের মতো রং লাগিয়ে এবং বিদেশী পতাকা উড়িয়ে ছদ্মবেশে পালাবার জন্যে প্রস্তুত রাখা হয়েছে। এই খবর ভারতের ইস্টর্ন ফ্লিটকে পাঠালে ইস্টার্ন ফ্লিট সতর্ক হয়ে যায়। ছদ্মবেশে পালানোর চেষ্টা করতে গিয়ে বেশ কয়েকটি পাকিস্তানী জাহাজ ভীক্রান্ত-এর গোলায় মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

বার্মা দিয়ে পাকিস্তানীদের পালাবার চেষ্টা বন্ধ করার জন্য এ সময়ে কক্সবাজারে একটি অভিযানের পরিকল্পনা নেয়া হয়। সেই উদ্দেশ্যে রোম ফোর্স নামে এক নতুন বাহিনী সৃষ্টি হয়। এই বাহিনীতে ছিলো ভারতের ১/২ গুর্খা রাইফেলস এবং ১১ বিহার রেজিমেন্টের দুটি কোম্পনী। মর্টার সজ্জিত এই বাহিনী ভারতের একখানি সওদাগরী জাহাজে ১৪ই ডিসেম্বর কক্সবাজারের উপকূলে গিয়ে পৌছে। সেখানে মুক্তিবাহিনীর সদস্যদের সহায়তায় রোম ফোর্স তীরে অবতরণ করে। কিন্তু ঐ এলাকায় কোনো পাকিস্তনীকে অবশ্য তারা পায়নি।

১৫ই ডিসেম্বর গভীর রাতে পাকিস্তানের চীফ অব আর্মি স্টাফের কাছ থেকে নিয়াজী শেষ নির্দেশ লাভ করেন। ভারতীয় সেনাবাহিনীর চীফ অব স্টাফ আত্মসমর্পণের যে শর্ত দিয়েছেন যুদ্ধ বিরতির জন্য তা গ্রহণ করা যেতে পারে বলে এত নিয়াজীকে পরামর্শ দেয়া হয়। এই রাতেই দুটার মধ্য বাংলাদেশের যে সব স্থানে পাকিস্তানী সোনাদল অবস্থান করেছিলো নিয়াজী তাদেরকে ওয়্যারলেস যোগে যুদ্ধ বিরতি পালন এবং যৌথ বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করা নির্দেশ জারি করে দেন।

রাত শেষ হয়ে আসে। ১৬ই ডিসেম্বর শেষ রাতের দিকে ভারতীয় ৯৫ মাউন্টেন ব্রিগেডের কমান্ডে নিয়োজিত ব্রিগেডিয়ার ক্রেয়ার নিয়াজীর হেড কোয়ার্টারের একটি অয়ারলেস মেসেজ ইন্টারসেপট করেন। এই বার্তায় ভোর ৫টা থেকে নিয়াজী তার সকল সেনাদলকে যুদ্ধ বিরতি পালন করতে বলেছিলেন। ক্লেয়ার সাথে সাথে এই অয়ারলেস বার্তার কথা জেরারেল নাগরাকে জানিয়ে দেন পরিস্থিতি পর্যালোচনার পর ব্রিগেড কমান্ডার এবং ডিভিশনাল কমান্ডার মিরপুর ব্রিজের কাছে দ্বিতীয় ছত্রী ব্যাটালিয়ন যেখানে অবস্থান করছিলো সেখানে পৌছান। সেখানে অবস্থানরত মুক্তিবাহিনী এবং ভারতীয় প্যারা ব্যাটালিয়ন থেকে তার জানতে পারলেন যে ভোর ৫টার পর ব্রিজের কাছে আর গেলাগুলি হয়নি। এরপর জেনারেল নাগরা তার একজন এডিসি এবং ভারতীয় ছত্রী ব্যাটালিয়নের একজন অফিসারকে শ্বেত পতাকাবাহী একটি জিপে করে ব্রিজের অপর পাড়ে পাঠিয়ে দেন। তখন বেলা ৯টা। জীপের আরোহীরা নিয়াজীর উদ্দেশে লেখা জেনারেল নাগরার একটি বার্তা বহন করছিলো। রণক্ষেত্রের করোতার পরিবর্তে বার্তাটিতে নাটকীয়তাই ছিলো একটু বেশী। জেনারেল আমীর আবদুল্লাহ খান নিয়াজী এবং জেনরেল নাগরা দুজন ছিলেন ব্যাক্তিগত জীবনে পরিচিত সম্ভবত তাই বার্তাটিতে ছিলো নরম সুর। প্রিয় আবদুল্লাহ আমি এসে পড়েছি। তোমার সব বাহাদুরী আর খেলা শেষ। আমার কাছে এখন আত্মসমর্পণ করবে, এই আমার উপদেশ। পাকিস্তানের জন্য সত্যই তখন সকল খেলা শেষ। নিজ বাহিনীর প্রতি যুদ্ধ বিরতি এবং আত্মসমর্পণ করার যে নির্দেশ নিয়াজি জারি করেছিলেন, ১৬ই ডিসেম্বর সকালেই তা ভারত সরকারকে জানিয়ে দেয়ার জন্য তিনি ঢাকাস্থ মার্কিন সামরিক এ্যাটচিকে অনুরোদ করেন। তার অনুরোধ যথারীতি ভারতে মার্কিন দুতাবাসের মাধ্যমে ভারত সরকারকে জানানো হয়।

চট্রগ্রাম এলাকায় আমরা তখন কুমিরার দক্ষিণে আরো কয়েকটি স্থান শত্রুমুক্ত করে ফেলেছি। আমাদের যাত্রা বিম্বিত করার উদ্দেশ্য এসব জায়গায় কিছুকিছু পাকিস্তানী সৈন্য অবস্থান করছিলো। পথের সকল বাধা পরাভূত করে ১৬ই ডিসেম্বরের মধ্যে আমরা ভাটিয়ারীর শক্তিশালী শত্রু ঘাঁটির সম্মুখীন হই। একান থেকে ফৌজদারহাট এলাকা পর্যন্ত পাকিস্তানীরা দুর্ভেদ্য প্রতিরক্ষামূলক ঘাঁটি গড়ে তুলেছিলো। এখানে তাদের অধিকাংশ সৈন্য এবং সমরাস্ত্র এনেও মোতায়েন করেছিলো। আমাদের লক্ষ্য ছিলো কিভাবে এই কমপ্লেক্স আমরা ধ্বংস করতে পারি। যুদ্ধ করতে করতে ওরা যদি চট্রগ্রাম শহরে মধ্য দিয়ে গিয়ে অবস্থান করতে পারে তাহলে

আমরা পড়বো বিপদে। বাড়িঘর অধ্যুষিত এলাকায় যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে প্রতিটি বাড়িই আত্মরক্ষাকারীর আড়াল হিসেবে কাজে লাগাতে পারবে। সেই পরিস্থিতিতে শহরের মধ্যে পা বাড়ানো আমাদের জন্য দুরূহ হয়ে পড়বে।

তাই ফৌজদারহাট এবং চট্টগ্রামের মাঝখানে শত্রুদের অবরোধ করার জন্য সিদ্ধান্ত নেই। উদ্দেশ্য ছিলো ভাটিয়ারী এবং ফৌজদারহাটে অবস্থান গ্রহণকারী সৈন্যরা যেন পেছনে গিয়ে শহরে প্রবেশ করতে না পারে। পরিকল্পনা অনুযায়ী শত্রু বাহিনীর পেছনে আমাদের সৈন্যরা তাদের পশ্চাদপসরণের পথ রুদ্ধ করে রাখবে এবং সামনে থেকে আমাদের অবশিষ্ট অংশ আক্রমণ চালাবে। অভিযানের এই পদ্ধতি কতটা "ঘাড়ে ধরে মুখে আঘাত করার মতো" বলা যেতে পারে। সেই অনুসারে ভারতের ৮৩ ব্রিগেডের দুটি ব্যাটালিয়ন ২ রাজপুত এবং ৩ ডোগরাকে পেছনের পথ বন্ধ করে দেয়ার জন্য পাঠানো হয়। ভারতের তৃতীয় আরেকটি ব্যাটালিয়ন সম্মুখে সমরে আমাদের মুক্তিযোদ্ধা ব্যাটালিয়নের সাথে যোগ দেয়। পূর্বোক্ত ব্যাটালিয়ন দুটি রাতের আঁধারে সড়ক থেকে প্রায় ১৫ মাইল পূর্ব দিক দিয়ে পাহাড়ী রাস্তা ধরে ফৌজদারহাটের কিছুটা দক্ষিণে গিয়ে আবার সড়কে উঠবে এবং সেখানে রাস্ত বন্ধ করে অবস্থান গ্রহণ করবে এই ছিলো তাদের প্রতি নির্দেশ। পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে অগ্রসরমান এই দলের মালামাল বহনের জন্য প্রায় ১২০০ বেসামরিক লোক জোগাড় করা হয়। প্রয়োজনীয় সব জিনিসই এই বাহিনীর সাথে থাকবে যাতে তারা অন্তত ৪ দিন চলতে পারে। খাদ্যদ্রব্য, গোলাবারুদ, ট্যাংক বিধ্বংসী কামান, মর্টার, মাটি খোঁড়ার সরঞ্জাম, রান্নার উনুন এবং অন্যান্য তৈজসপত্র এ পুরো দুটি ব্যাটালিয়নের জন্য যা কিছু প্রয়োজন সবই বহন করতে হবে। এছাড়া বেসামরিক লোকজন যারা যাবে তাদের খাদ্য এবং কিছু জ্বালানি কাঠও সঙ্গে থাকবে।

১৫ ডিসেম্বর সন্ধ্যার কিছু আগেই ব্যাটালিয়ন দুটি পাহাড়ের ভেতর দিয়ে যাত্রা শুরু করে। স্থনীয় কিছু লোক আগে আগে যেতে থাকে গাইড হিসেবে। এই অভিযানের সাফল্যের উপরই চট্টগ্রামে আমাদের চুড়ান্ত লড়াইয়ের ফলাফল নির্ভর করছে।

ইতিমধ্যে আমার নির্দেশে মিরেশ্বরাই এবং সীতাকুন্ড এলাকার প্রায় ২০০০ গেরিলা একত্র হয়ে কয়েকটি নির্ধারিত স্থানে অবস্থান গ্রহণ করে। যথাসময়ে তাড়াও লড়াইয়ে যোগ দেবে। শহর এলাকা সম্পর্কে ভালো ভাবে জানে বলে রাস্তায় যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে তারা খুব কাজে লাগবে। তাই এদেরকে একত্রিত করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত রাখলাম।

ভাটিয়ারীতে ১৫ই ডিসেম্বর সন্ধ্যায় আমরা পাকিস্তানীদের প্রথম রক্ষাব্যূহের ওপর আক্রমণ চালাই। দুটি কোম্পানীর এই আক্রমণ ওরা প্রহিত করে দেয়, আমাদের পক্ষে হতাহত হয় ২জন। ১৬ই ডিসেম্বর অগ্রবর্তী দলটি শত্রুর পেছনে ব্যারিকেড সৃষ্টি করার পরই আমাদের আসল আক্রমণ শুরু হবে। তাই আমরা পরের দিন প্রধান হামলা চালাবার জন্য ব্যাপক প্রস্ত্তুতি শুরু করি।

ঢাকার অদূরে ভারতীয় জেঃ নাগরা যে দুজন অফিসার জেঃ নিয়াজীর কাছে পাঠিয়েছিলেন তার ২ ঘণ্টা পর ১১টার দিকে ফিরে আসেন। তাদের জীপের পেছনে পেছনে একখানি গাড়ীতে করে আসেন পাকিস্তানের ৩৬ ডিভিশনের কমান্ডার চেনারেল মোহাম্মদ জামসেদ। জেনারেল নিয়াজীর সরকারী প্রতিনিধি হিসেবে তিনি যৌথবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণের প্রস্তাব নিয়ে আসেন। এরপর নাগরা এবং আরো কয়েকজন অফিসারকে জামসেদের হেডকোয়ার্টারে যাওয়া হয় এবং সেখান থেকে তারা নিয়াজীর অফিসে যাওয়ার প্রাক্কলে নাগরা কলকাতাস্থ ইস্টার্ন কমান্ডের হেডকোয়ার্টার এবং ৪র্থ কোরের হেডকোয়ার্টারের সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে যথারীতি খবর পাঠিয়ে দেন। এর আগে সকাল সাড়ে সাতটার দিকে নিয়াজী অয়্যারলেস যোগে মানেকশকে আত্মসমর্পণের সর্বশেষ মেয়াদ আরও ৬ ঘণ্টা বাড়িয়ে দেয়ার অনুরোধ করেছিলেন। একই সঙ্গে তিনি আরো অনুরোধ করেন যে, আত্মসমর্পণের শর্তাবলী নির্ধারণ করার জন্য তিনি যেন একজন সিনিয়র ভরতীয় সামরিক অফিসারকে ঢাকা পাঠিয়ে দেন।

এতসব ঘটনা সম্পর্কে আমরা কিছুই জানতাম না। আমরা ভাটিয়রীতে তখন যুদ্ধে লিপ্ত। আমাদের অগ্রবর্তী দল সাফল্যের সঙ্গে পাহাড়ী পথ ধরে এগিয়ে যাচ্ছিলো। কথা ছিলো ১৬ই ডিসেম্বর কোন এক সময়ে তারা শত্রুর পেছনের দিকে রাস্তা বন্ধ করে অয়্যারলেসে সে খবর আমাদেরকে জানিয়ে দেবে। আমরা সবাই তখন তাদের খবর শোনার জন্য রূদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছিলাম।

নাগরার কাছ থেকে নিয়াজীর আত্মসমর্পণের ইচ্ছার কথা জানতে পেরে জেনারেল অরোরা তার চিফ অব স্টাফ মেজর জেনারেল জ্যাকবলকে বিমানযোগে ঢাকা পাঠিয়ে দেন। ততক্ষণ মিরপুর যৌথবাহিনী ব্রিজ পার হয়ে ঢাকয় প্রবেশ করতে শুরু করে। এ সময়ে নগরীর রাস্তাঘাট ছিলো জনমানবশূন্য।

মুক্তিবাহিনী এবং ভারতীয় সৈন্যদের রাজধানীতে প্রবেশের খবর দাবানলের মতো চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। উল্লাসের জোয়ারে ঢাকার লক্ষ লক্ষ লোক নেমে আসে রাস্তায়। জনমানবহীন নিঃশব্দ নগরী মুহূর্তে ভরে উঠে মানুষের বিজয় উল্লাসে। ওরা এসেছে এই বাণী উচ্চারিত হতে থাকে মানুয়ের মুখে মুখে। আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে ধ্বনি ওঠে জয় বাংলা সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। যৌথ বাহিনীর জন্যে মানুষ এগিয়ে আসে ফুলের ডালি নিয়ে হৃদয়ের গভীর আর ভালোবাসা নিয়ে।

ঢাকায় সেদিন একদিকে চলছিলো মানুষের বিজয় মিছিল। তারই পাশাপাশি ছিলো পরাজিত পাকিস্তানীদের পলায়নের হাস্যকর দৃশ্য। কিন্তু মানুষ যে কতো জিঘাংসাপরায়ণ হতে পারে পাকিস্তানীরা তার এক নতুন নজীর সৃষ্টি করেছিলো। পালিয়ে যাবার সেই মুহূর্তেও পাকিস্তানীরা বিভিন্ন নিরীহ মানুষের ওপর এলোপাতাড়ি গুলি চালায়। ফলে বহু নিরীহ বাঙালী হতাহত হন।

আত্মসমর্পণের একটি খসড়া দলিল সহ মেজর জেনারেল জ্যাকব বেলা ১টায় জেনালে অরোরার হেডকোয়ার্টার থেকে ঢাকা এসে অবতরণ করলেন। বেলা ২টা ৫০ মিনিটে জেনারেল অরোরা তাঁর সৈনিক জীবনের সবচাইতে আকাঙ্ক্ষিত বার্তাটি পেয়ে গেলেন। জীবনে খুব কমসংখ্যক সেনানায়কই এমন বার্তা পেয়েছেন। বার্তাটি ছিলো, নিয়াজী তার সেনাবাহিনীর সকলকে নিয়ে আত্মসমর্পণে রাজী হয়েছেন এবং আত্মসমর্পণের দলিলেও স্বাক্ষর করেছেন। পশ্চিম সেক্টরে পাকিস্তানী ৯ ডিভিশনের জিওসি মেজর জেনারেল আনসারীর আত্মসমর্পণ পর্বর ততোক্ষণে সাঙ্গ হয়েছে। বিকাল ৩টার মধ্যে মুক্তিবাহিনীর শত শত তরুণ এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীর একটি ব্রিগেড বিজয়ীর বেশে রাজধানী ঢাকায় প্রবেশ করে। আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানের জন্য জেলারেল অরোরা তার বিমান ও নৌবাহিনীর চীফ অব স্টাফকে নিয়ে একটু পরেই ঢাকায় অবতরণ করলেন।

আমার বিশ্বস্ত জেসিও সুবেদার আজিজ এবং ১৫ বছরের এক কিশোর মুক্তিযোদ্ধা এতসব ঘটনার কিছুই অবহিত ছিল না। দুজনাই তখন ভাটিয়ারীতে অন্যান্যের সঙ্গে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ। পাকিস্তানীদের একটি খালের অপর পারে হটিয়ে দিয়ে পুনরায় আক্রমণ পরিচালনার জন্য তারা অবস্থান গ্রহণ করেছিলো। অল্প বয়স্ক ছেলেটি কাছেরই এক গ্রামের। তাদের গ্রাম এর আগেই শত্রুমুক্ত হয়েছে। মা-বাবার সাথে দেখার করার জন্য ১৫ই ডিসেম্বর তাকে ১২ ঘণ্টার ছুটি দিয়েছিলাম। কিন্তু সে প্রত্যয়দীপ্ত কণ্ঠে জবাব দিয়েছিলো, না স্যার। চট্রগ্রাম মুক্ত করার পরই আমি বাড়ি ফিরবো। কয়েকদিন বা আর লাগবে। আত্মসমর্পণের জন্য নিয়াজীর নির্দেশ তখনো তার সকল সেনাদলের কাছে পৌছেনি। আমরা জানতাম না যে, বেলা ৪টা ৩১ মিনিটে ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠান সমাপ্ত হচ্ছে।

চট্রগ্রাম শহর থেকে মাত্র ৬ মাইল দূরে মহাসড়কের ওপর ভাটিয়ারী দখলের জন্য আমরা তখন লড়াই করছি। আক্রমণ চালাচ্ছে মুক্তিবাহিনীর একটি কোম্পানী। ঘড়িতে তখন বেলা ৪টা ৩০ মিনিট। ঢাকায় এবং অন্যান্য জায়গায় অস্ত্রের গর্জন থেমে গেছে। নিয়াজী এবং অরোরা হয়তো হাতে কলম নিয়ে আত্মসমর্পণের চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করছেন। নিয়তির নির্মম পরিহাস। ঠিক সেই মুহূর্তে ঢাকা ঢেকে ১৬০ মাইল দূরে পাকিস্তনীদের একটি কামানের গোলা আমার অধীনস্থ মুক্তিযোদ্ধা এই কোম্পানীর মাঝখানে এসে পড়লো।

সুবেদার আজিজ এবং ১৫ বছরের সেই ছেলেটি দুজনই গোলার আঘাতে আহত হলো। আস্তে আস্তে পশ্চিম আকাশে সূর্য ডুবে গেল, সেই সাথে বাতাসে মিলিয়ে গেলো তাদের শেষ নিঃশ্বাস। তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে ধীরে ধীরে। একজন পাকিস্তানী মেজর ভাটিয়রীর ভাঙ্গা ব্রিজের মুখে এসে দাঁড়ালো। হাতে তার শাদা পতাকা। তারা নিয়াজীর নির্দেশ পেয়ে গেছে, এখন আত্মসমর্পণ করতে চায়।

পরিশেষ

রণাঙ্গণে এবার নেমে আসে প্রশান্ত নীরবতা।

রাইফেল, মেশিনগান, মর্টার, কামানের গোলাগুলির শব্দ থেমে যায়। থেমে যায় আহতের কান্না, মুমূর্ষের করুণ আর্তনাদ। নতুন এই রাত্রির প্রহর আসে কোন এক হারানো অতীতের শান্তির স্বপ্ন নিয়ে। এমনি সুন্দরের স্বপ্নে আবহমানকাল ধরে মানুষের সংগ্রাম চলেছে।

ভাটিয়ারীতে মহাসড়কের ওপর সেতুটি পাকিস্তানীরা ধ্বংস করে দিয়েছিলো। হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধা আর স্বেচ্ছাসেবক ১৬ই ডিসেম্বর সারারাত কাজ করলো ভাটিয়ারীর খালের মধ্য দিয়ে একটা বিকল্প রাস্তা তৈরী করতে। রাতেই আমরা সমস্ত সৈন্য এবং গেরিলাদের চট্রগ্রাম শহরে এবং চট্রগ্রাম ও পার্বত্য চট্রগ্রামের অন্যান্য এলাকায় নিয়ন্ত্রনভার গ্রহণ করার দায়িত্ব বুঝিয়ে দেই। ফেনীর অংশবিশেষসহ শুভপুর পর্যন্ত এলাকার নিয়ন্ত্রণভার আমরা আগেই নিয়েছিলাম। আমার সম্পূর্ণ বাহিনীকে পর দিন খুব সকাল বেলায়ই চট্রগ্রাম শহরে প্রবেশ করে গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহের নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণের নির্দেশ দিলাম। একটি ব্যাটালিয়নকে অবশ্য রাতেই খাল পার হয়ে শহর অভিমুখে যতোদূর সম্ভব এগিয়ে অবস্থান গ্রহণ করতে পাঠিয়ে দেই।

শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত সার্কিট হাউসকে আমার হেডকোয়ার্টার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। পাকিস্তানী সৈন্যদের নির্দেশ দেওয়া হলো পোর্ট এলাকায় নৌবাহিনীর হেড কোয়ার্টার এবং চট্রগ্রাম ক্যান্টনমেন্টে আত্মসমর্পণের জন্য জমায়েত হতে। পাকিস্তানী বন্দীদের দায়িত্ব ভারতীয় সেনাবহিনীর উপর ন্যস্ত হয়। চট্রগ্রামে পাকিস্তানী সেনাবহিনীর ১৬১ জন অফিসার, ৩০৫ জন জেসিও এবং নৌ ও বিমান বাহিনী সমপর্যায়ের লোক এবং তিন বাহিনীর ৮,৬১৮ জন সৈন্য আত্মসমর্পণ করে।

১৭ই ডিসেম্বর ভোর পর্যন্ত বিকল্প রাস্তার কাজ সম্পন্ন হলো না। ফলে তখন পর্যন্ত সে স্থান দিয়ে গাড়ী পার করাও সম্ভব ছিল না। আমি পুলের এপাড়ে গাড়ী থেকে নেমে পড়লাম একটা ছোট প্যাকেট হাতে নিয়ে। তারপর একটা লাঠিতে ভর দিয়ে খাল পার হয়ে ওপারে গিয়ে উঠলাম। দুদিন আগে কুমিরার যুদ্ধে আহত হওয়ায় আমাকে লাঠিতে ভর দিয়ে বেশ খুঁড়িয়ে চলতে হচ্ছিলো।

পাকিস্তানীদের আত্মসম্পর্ণের ব্যাপেরে লোকজন তখনো পুরোপুরি নিশ্চিত হতে পারেনি। তা সত্ত্বেও শহরের কিছু লোক আমাদের এগিয়ে নেয়ার জন্য ভাটিয়ারীর ভাঙা সেতু পর্যন্ত এগিয়ে এসেছিলাম। আমি আমার এক বন্ধুর গাড়ীতে উঠে বসলাম। গাড়ী ছুটে চললো সোজা সার্কিট হাউসের দিকে।

অগণিত নারী-পুরুষ রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে। পথের দুই ধারে দাঁড়িয়ে তারা হাত তুলে যৌথ বাহিনীর সৈন্যদের এবং মুক্তিযোদ্ধাদের অভিনন্দন জানাচ্ছিলো। জয় বাংলা ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে ওঠে। কেউ কেউ বোধ হয় তখনো পুরো বিশ্বাস করতে পারেনি যে সত্যিই যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। ভয়ে ভয়ে বাড়ির ভেতর থেকে উঁকি দিয়ে তারা সেই অবিশ্বাস্য দৃশ্য দেখছিল। পাকিস্তানীদের তখন অস্ত্র সংবরণের পালা। বাস ও ট্রাকে করে তারা দ্রুত ছুটে পালাচ্ছিলো নৌবাহিনীর হেডকোয়ার্টার এবং ক্যান্টনমেন্টের দিকে।

সার্কিট হাউস তখন বহু লোক জমা হয়ে গেছে। জনতার ভিড় ঠেলে আমি এগিয়ে যাই। যুদ্ধের এই কয় মাসে আবার দাড়ি বেশ বড় হয়ে যাওয়ায় অনেক বন্ধু এবং পরিচিতজনই আমাকে চিনতে পারলো না।

এমনি একটা সুন্দর মুহূর্তের জন্য সযত্নে এই প্যাকেটটি সাথে রেখেছি দীর্ঘ নয় মাস। এবার ওটাকে খুলে ফেললাম। সুন্দর করে ভাজ করা বাংলাদেশের পতাকাটি একটা কিশোর ছেলেরা হাতে দিয়ে তাকে পাঠিয়ে দিলাম সার্কিট হাউসের ছাদে। সেখানে তখনো পাকিস্তানের পতাকা উড়ছিলো। ছেলেটি পাকিস্তানের পতাকা নামিয়ে ছুড়ে ফেলে দেয় নিচে। সেখানে ওড়ানো হয় স্বাধীন বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বেও প্রতীক জাতীয় পতাকা। সে সময় হাজার হাজার মানুষ দৌড়ে আসছে সার্কিট হাউসের দিকে। সমস্ত এলাকা ভরে গেছে মানুষের ভিড়ে। পতাকা উত্তোলনের সময় মুহূর্তের জন্য নিস্তব্ধ হয় উত্তাল জনসমুদ্র অবিস্মরণীয় সেই ঐতিহাসিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করার জন্য। তারপর বাতাসের দোলা লাগে, উড়তে থাকে নতুন পতাকা। নিস্তব্ধ নতা উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে সেই জনসমুদ্রে ওঠে জয়ধ্বনি জয় বাংলা।

পাকিস্তানীদের হাতে বন্দী ধ্বংসের পথযাত্রী একটা জাতি পেয়ে গেল স্বাধীনতা। দুঃস্বপ্নের রাতের শেষে সেই পতাকার রক্তিম সূর্য বাংলার মানুষের জন্য নিয়ে এলো নতুন আশার বাণী। সমস্ত পৃথিবীতে সেই বিজয়ের বার্তা পৌছে দিতে যেন মানুষ এক যোগে মুহূর্মুহু স্লোগান দিতে থাকে জয় বাংলা। শহরের প্রতিটি প্রান্ত থেকে তেমনি আবেগে লক্ষ কণ্ঠ ধ্বনিত হতে লাগলো জয় বাংলা। খুলে গেল সমস্ত আবদ্ধ দুয়ার বাঁধভাঙা স্রোতের মত বেরিয়ে আসে সকল মানুষ। দীর্ঘ দিনের দুঃসহ যন্ত্রণার শেষে তারা উপভোগ করতে চাইলো উষ্ণ সূর্যালোক, মুক্ত বাতাস, সুন্দর সম্ভাবনাময় নতুন স্বাধীনতা। ভয়াবহ গণহত্যার মধ্য দিয়ে তারা বেঁচে থেকে স্বাধীনতার আনন্দ উপভোগ করতে পারছে এ কথা যেন কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছিলো না। তবুও সেই সব মানুষ বেঁচে আছে। মেঘমুক্ত নীল আকাশের নিচে সোনালী সূর্যের আলোকে মানুষ বিস্ময়ে চেয়ে থেকে বাংলার নতুন পতাকার দিকে। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের পতাকাকে অভিবাদন জানিয়ে আমি নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে রইলাম কিছুক্ষণের জন্য, অবাক বিস্ময়ে। ভুলে গেলাম আমার চারপাশের উত্তাল জনসমুদ্রের কথা। তখন ৯টা ১৫ মিনিট, ১৭ই ডিসেম্বর, ১৯৭১সাল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রায় প্রতিটি ঘরে বিভিন্ন আকারের নতুন জাতীয় পতাকা শোভা পেতে লাগলো। শুধু ঘরের ছাদই নয়, গাছপালা, লাইটপোস্ট, দোকানপাট যেখানেই সম্ভব সেখানেই মানুষ উড়ালো নতুন পতাকা। উৎসবের সাড়া পড়ে গেলো সমস্ত শহরে। যুদ্ধের নয় মাস এমনি একটা সুন্দর মুহূর্তের জন্যে প্রায় প্রতিটি বাঙালীর ঘরেই লুকিয়ে রাখা হয়েছিলো বাংলাদেশের পতাকা। ধরা পড়ে অনেকে আবার পাকিস্তানীদের হাতে নির্মমভাবে নিহত হয়েছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পৃথিবীর সবচাইতে বেদনাময় ঘটনার পরিসমাপ্তি ঘটলো হয়তো বা সাময়িকভাবে। এই নিষ্ঠুর ঘটনা ছিল অবিশ্বাস্য, আর তাই হয়তো এখানে কান্নায় ভাষারও হারিয়ে গিয়েছিলো। বিকৃত বিকারগ্রস্ত রক্তলিপ্সু পাকিস্তানীরা নিরীহ নারী-পুরুষ এবং শিশু হত্যার নৃশংসতায় হিটলারের নাজী বাহিনীকেও হার মানিয়েছিলো। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জার্মানির পক্ষ অবলম্বনকারী দুটি সরকার ছাড়া আর সমস্ত পৃথিবীর সরকার একযোগে রুখে দাঁড়িয়েছিলো হিটলারের গণহত্যার বিরুদ্ধে। অথচ বাংলাদেশের পাকিস্তনীরা যখন গণহত্যা চালালো তখন এইসব সরকারের কয়েকটি পাকিস্তনীদের বিরুদ্ধে না গিয়ে বরং ইয়াহিয়াকে গণহত্যায় সহায়তা করলো। একটা কঠিন সত্য পৃথিবীর মানুষের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ক্রমান্বয়ে বিশ্ব নেতৃবৃন্দের অনেকেরই নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটেছে। তাদের মুখে মানবতার বুলি আসলে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

বিজয়ের মধ্য দিয়ে নয় মাসের দুঃস্বপ্নের অবসান ঘটলো। বাংলার মানুষ আবার তার নিজের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের অধিকার অর্জন করলো। পথে-প্রান্তরে পর্বতাঞ্চলে নদনদী খালে বিলে বাংলার প্রতিটি অঞ্চলে বাঙালী আবার নির্ভয়ে ঘুরে বেড়াতে পারবে। ছায়ার মতো অনুসারী মৃত্যুর ভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে থাকতে হবে না আর। রাতের অন্ধকারে প্রতিটি অচেনা শব্দ মৃত্যুর অশুভ পদধ্বনি হয়ে আসবে না। চারদিকে আনন্দ আর উল্লাসের ঢেউ। ২৫শে মার্চের সেই ভয়াভহ রাতের পর এই প্রথম মহিলারা নির্ভয়ে বেরুতে পারলো। ঘরের বাইরে ছোট

ছোট ছেলেমেয়েরা দল বেঁধে ছুটে চলছে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে হাত মেলাতে। মার্চ করে চলছে মুক্তিবাহিনী। পথের দুই পাশে উচ্ছ্বসিত জনতা তাদের জানাচ্ছে প্রাণঢালা অভিনন্দন। সুখী মানুষের আনন্দ কোলাহলের সে এক অভূতপূর্ব সমাবেশ। মুক্তিযোদ্ধাদের ফুলের মালা পরিয়ে দিচ্ছে কেউ। অনেকে গাইছে গান। নির্মল হাসিতে যেন সমস্ত মানুষের রূপ উদ্ভাসিত। কারো চোখে ছিল সুখের অশ্রুজল। একজন আনন্দের আতিশয্যে বাঁধ ভাঙা চোখের জল সামলাতে গিয়ে শাড়ির আঁচল কামড়ে রেখেছেন দৃঢ়ভাবে। কাছেই কোথাও মাইকে বাজছিল অতি প্রিয় সেই গান ''মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি''। এমনি অনেক ফুলের মত জীবনকে হয়তো আমরা যুদ্ধ করে বাঁচাতে পেরেছি। আবার অনেকেই আমরা বাঁচাতে পারিনি। আমার মনে হলো সেই সব শহীদের কথা, যারা নিজ দেশে বন্দির মতো জীবন যাপন করছিলো। পাকিস্তানীরা এদেশকে পরিণত করেছিল বন্দীশালায়। যেখানে তার মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করে রেখেছিল বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষকে। সেই বন্দিশালায় পাকিস্তানীদের হাতে নির্মমভাবে নিহত অসংখ্য মানুষের ত্যাগ আর গভীর জীবনবেদনা ছিল এতই মহান যে শ্রদ্ধায় নত হয়ে আমি অনুচ্চ স্বরে বললামঃ

'' ... এবং শান্তি, আর যুদ্ধ নয়-

তোমাদের বিদেহী আত্মার জন্য

চাই শুধু শান্তি, যুদ্ধ নয়।

এই বন্দীশালা, এখানেই ছিল

তোমাদের তীর্থের জীবন।''

ইতিহাসের এই মর্মান্তিক নাটকের যবনিকাপাত সে কি বিজয়ের আনন্দে উদ্ভাসিত নাকি শোকের বেদনায় আপ্লুত? অথবা সেখানে ঘটেছে বিজয় আর বেদনার অপূর্ব সংমিশ্রণ? এই নির্মম ও অচিন্তনীয় গণহত্যাকে কি পৃথিবীর মানুষ ইতিহাসের পালাবদলের অমোঘ বিধান বলেই সমস্ত দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারবে ?

সার্কিট হাউসের সামনে সবুজলনে দাঁড়িয়ে আমি ভাবছিলাম সেই বিষাদময় সমস্ত ঘটনার কথা। যুদ্ধের নয় মাসের শহীদদের কথা আবার মনে পড়লো। পাকিস্তানীরা এদের হত্যা করেছিলো গ্রামে-গঞ্জে, নগরে-বন্দরে শহরে-মসজিদে-মন্দিরে। অনেককেই ধরে নিয়েছিলো আরো নিষ্ঠুরভাবে অশেষ যন্ত্রনা দিয়ে হত্যা করার জন্য। বাংলার এই অসহায় মানুষগুলো আর কোনো দিনই ফিরে আসবে না। কিন্তু পাকিস্তানীরা যখন এদেরকে বেঁধে নিয়ে যেতো হত্যা করার উদ্দেশ্যে সেই মুহূর্তে এই সব অসহায় মানুষ কি ভাবতো কে জানে? তাদের আপজনেরই বা কি গভীর মর্মবেদনায় ভেঙ্গে পড়তো চিরবিদায়ের সেই মুহূর্তে? এইসব মানুষকে যখন পাকিস্তানীরা লাইনে দাঁড় করিয়ে হত্যা করতো, রাস্তায় টেনে নিয়ে যেতো জীপের পেছনে বেঁধে, বেয়োনেট আর রাইফেলের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত করে ফেলতো তখন মৃত্যুপথযাত্রী সেই সব মানুষ কি ভাবতো আমরা কোনো দিন তা জানবো না। নিষ্পাপ শিশু, অবলা নারী, অসহায় বৃদ্ধ এদের কেউই সেদিন রক্ষা পায়নি। পাকিস্তানীদের হাত থেকে।

সেই সব প্রাণের বিনিময়ে আজ আমরা স্বাধীন। আমার চিন্তায় বাধা পড়লো। একজন বৃদ্ধ এগিয়ে এলেন আমার দিকে। যুদ্ধে তার ছেলে হারিয়ে গেছে চিরদিনের জন্য। মুখে তাঁর হাসি নেই নেই অশ্রুজল। তিনি শান্ত, অতিশান্ত। আমাকে জড়িয়ে ধরে তিনি গভীর প্রশান্তিতে চোখ বুজে রইলেন কিছুক্ষণ।

মানব হৃদয়ের সেই অব্যক্ত বেদনা কেউ কোন দিন বুঝতে পারবে না।

১ নম্বর সেক্টরের কতিপয় গেরিলা অপারেশন

[মেজর (অবঃ) রফিক-উল-ইসলাম, বীর উত্তম-এর ২০ মার্চ ১৯৮৩ তারিখে গৃহীত সাক্ষাৎকার থেকে]

Of the numerous raids, ambushes and attacks in all the sectors, a number of actions have been enumerated in the following texts. These actions would depict a picture of the war and the gradual process of transformation of the inexperienced freedom fighters into an effective and cohesive fighting force through continuous actions against the Pakistanis all over the country.

No.1 Sector: A number of small guerilla groups comprising of 3 to 5 students, trained on the use of hand-grenades and small arms were being inducted into Bangladesh from as early as the first week of May. The attacks were primarily to kill leading collaborators as well as officers of the Pakistan Army. The first organized guerilla group with appropriate training on weapons and explosives was sent in No.1 Sector on June 4, through Baishnapur area in the afternoon. On June 10, one our fighting patrol laid an ambush near Hiaku on Ramgrh-karerhat road. In the subsequent encounter, 4 Pakistanis were killed. Our troops withdrew without suffering any casualty.

It may be mentioned here that this road of about 15 miles from karerhat to Ramgarh passes through mountain area covered with dense forests. There is negligible human habitation. The mountains and the jungles provide excellent hiding places for the guerillas. There have been innumerable actions on this road. Pakistani strong defences were at Karerhat, Hiaku and Ramgrah, controlling the major roads leading upto Chittagong, 50 miles away. These positions mutually support each other and there had been heavy movement of traffic between these 3 centres throughout the war. The movement was necessitated by the need to supply arms, ammunition, fuel, ration, reinforcement and evacuation of casualties. At a later stage the Pakistanis did build up some reserve of arms, ammunition and ration, But due to the fast changing nature of the battle and the increasing number of casualties the Pakistanis had to maintain heavy traffic all through the war.

From June onward action by our regular troops as well as the guerillas against the Pakistanis were becoming more organized and effective.

The total frontage of No.1 sector was approximately 400 miles of which 50 miles were the active front. The entire active front was divided into 5 sub-sectors for the purpose of carrying out regular guerilla operations. Throughout the war there has been regular actions along the active frontage against the Pakistanis in every sub-sector. Besides this the trained guerillas had kept the Pakistanis restless through raids and ambushes deep inside Bangladesh.

On June 21 a raid was conducted on the Pakistani defences at Sreenagar area by 10 guerillas who crept close to the defences under cover of darkness. Earlier, the defences had been reconnoitered to identify the positions of the automatic and semi-automatic weapons. The raiding party successfully neutralized these weapon positions by 75 mm rocket launchers. There after the raiders lobbed grenades inside a number of bunkers and

destroyed 2 parked vehicles. The Pakistanis opened up with their weapons blindly, firing in all directions, hoping to scare off the raiders. The raid lasted for more than one hour in which 2 vehicles were destroyed and 5 Pakistanis suffered casualties.

On June 23, another ambush was laid near Hiaku. A small convoy carrying ration to Ramgarh hit the ambush. The guerillas had take position in the dense jungle on the high ground by the road side. The convoy was attacked by rocket launchers and LMG. A microbus was destroyed, killing 1 officer and 3 other Pakistani soldiers, 2 others were injured. The Pakistanis were mentally prepared for ambush on this road and they took immediate cover in the dense jungle on the other side. Meanwhile from nearby camp at Hiaku reinforcement reached the scene of action. By that time our ambush party had dis-appeared into the jungle and returned to the base.

On July 1, I sent a platoon with Capt. Shamsul Huda to raid Debipur post. The raid was successful. Our troops leaped from one bunker to another, lobbing hand-grenades and blasting the occupants of the bunkers with sub-machinegun fire. Having completed the mission, the guerillas withdrew to the base. On our side Sepoy Fazlur Rahman, Habilder Abdul Hussain, Sepoy Toha Mia fought very bravely and died in action. 6 Pakistani soldiers were killed and 12 others were injured.

At midday on July 3, a micro-bus carrying a number of Pakistanis including one Captain was ambushed by our troops at Chikanchara on Ramgarh-Karerhat road. The Captain and 4 other Pakistanis were killed in the action. We carried out numerous actions on this road and killed a number of the Pakistanis. They rarely moved on this road at night, restricting their move to the day-light as far as possible.

On July 11, Hanaponi Bridge in Mirsharai was demolished by the guerillas. On 15 July, Subedar Raham Ali with a group of 20 others laid on ambush between Begam Bazar and Ramgarh. A convoy carrying ration and ammunition was caught in the ambush. As our troops opened fire, the Pakistanis, new and not acquainted to the terrain, were completely be-wildered and ran in panic for shelter. 6 Pakistanis were killed and many were injured in the action.

Most raids on the BOP’s and enemy defences were almost identical. Our troops carried out reconnaissance, specially about LMG & MG positions of the Pakistanis. Thereafter, small groups of usually 10 to 15 people would stealthily creep upto their positions. Some of the guerillas would position themselves to prevent themselves to prevent the Pakistanis from receiving reinforcements, as well as to cover the withdrawal of our own forces after the actions were over. The rest of the guerillas would go for direct action against selected bunkers. Thereafter, if time and situation permitted, a few would go for more bunkers or other lucrative targets, spraying those with carbine fires or lobbing hand-grenades. The aim was to harass the Pakistanis and to inflict as much casualty as possible without suffering any loss. We did not want, at that stage, to destroy enemy in piece-meal nor did we have adequate resources to achieve such aim. We concentrated on continuous raids and ambushes which would demorlise the Pakistani soldiers, soldiers, sap their will power to fight and inculcate in them a fear of absolute uncertainty of absolute uncertainty of the war and the cause for which they were in Bangladesh.

A raid was conducted on Guthuma BOP on July 16. The Pakistanis suffered 3 casualties. The guerillas returned safely.

On July 19, we raided Pakistani position at Kariabazar. This raid was organized on an information that the Pakistanis under a Major from a Punjab regiment had imprisoned about 200 Bengalees who were trying to excape to India. These Bengalee prisoners, with many women in that group, were being tortured by the Pakistanis. The raid was aimed at freeing the prisoners. At about 1: 30 that night, the raiding group with 45 men, Carrying 2 inch mortars, rocket launchers, LMGs, and rifles raided the high school in Kariabazar where the Major with his Punjabi troops were staying. The prisoners were kept in nearby shops and houses. As the raid started, our soldiers kept the enemy pinned down in the school building by firing from LMGs so that the Pakistanis could not come out. Then the guerillas shouted at the prisoners to escape under cover of the fire. Taking advantage of the darkness of the night, 150 of the prisoners managed to escape. There after heavy firing from mortars and rocket launchers continued for over thirty minutes. 18 Pakistani soldiers were killed. On our side there was no casualty.

On July 23, the freedom fighters put mines on the railway track between Bortakia and Mirsharai. The mine exploded when a train was passing. One engine and a compartment was derailed and railway communication remain suspended for some time.

Another raid was conducted on the Pakistani location at Hiaku. The area was being used as a parking place for military vehicles. On July 27, we conducted a raid on this position at about 4 in the evening with mortars and rocket launchers. This raid in daylight caught the Pakistanis totally by surprise. During 15 minutes of the raid, the vehicle park was totally destroyed. 4 Pakistanis wet killed on the spot and unknown number of soldiers were reportedly injured. Many vehicles were set on fire and these were burning for a few hours in the night.

On August 3, Group Captain Khandakar and Col. Rab from HQ Bangladesh Forces visited No.1 sector to discuss and co-ordinate guerilla operations as well as other military actions against the Pakistan Army. This co-ordination was being done in line with the decisions arrived at the sector commanders conference at Calcutta from July 10.

In the co-ordination meeting it was decided to step up guerilla operations against the Pakistanis. As thousands of able bodied men were voluntarily joining the war of liberation, more and more training centers were opened all over the border regions and we were receiving hundreds of trained boys at regular intervals. The trained guerillas themselves demanded to be sent for offensive actions and we were only too obliged to accept their requests. Continuous reports of atrocities by the Pakistanis hardened the attitude of the population as well as the guerillas. The helped us in allocating aggressive and dangerous tasks to various guerilla groups. It was considered an honour if a group was allocated more difficult and risky operational tasks.

On August 9 our troops raided Pakistani position near Andar Manik BOP and overran the Pakistani defences in the encounter, lasting over 1 hour. Naik Haris Miah took the lead in physically assaulting the defences and displayed great courage during this raid.

Firing from his carbine and throwing grenades, he daringly leapt from one to the other bunker and single handedly claimed a number of Pakistani casualties. The Pakistanis, caught inside their dugouts, could not put up any meaningful fight. At the end of the encounter our troops withdrew safely-leaving behind many dead and injured Pakistanis.

In Patacourt near Zoralganj a company of Pakistani soldiers and Razakars were ambushed on August 10. A group of 20 guerillas under Mohiuddin engaged this company and in the brief encounter I Pakistani soldier was killed while 2 soldiers and 3 Razakars were injured. The guerillas disappeared into the countryside without suffering any casualty.

14 August was the independence day of Pakistan and we decided to carry out large scale raids and ambushes against the Pakistanis on the day. Pakistani high command apprehended such escalation and accordingly warned all its forces to remain on the maximum alert. We knew of the preparedness and planned all actions thoroughly. There were 10 planned raids on Pakistani positions in No.1 sector coinciding with the independence days. These operations were along the active battle front from Chagalnya to Ramgarh. Besides, there were many ambushes and other smaller actions throughout the sector.

On of the most important raids was conducted on Sreenagar near Shuvapur. Shreenagar defences were reconnoitred well in advance, pinpointing the locations of command post, LMG and MG post, ration and ammunition dumps. The raiding party stealthily moved close enough to the defence and neutralized the weapon posts with rocket launchers. Thereafter it was a conventional raid, lasting a brief period and the guerillas disappeared into the darkness of the night. This particular raid was conducted by a platoon and 2 Pakistanis were killed while 4 others were injured. Our forces did not suffer any casualty.

On August 25, a raid was conducted at Amlighat area near East Wali Nagar. The Pakistanis suffered 3 casualties. One of our soldiers was slightly injured in the action. However they all returned to base safely.

On August 28 railway track near Mirsharai was mined by FF group 15 led by Nizam. At 8-25 a.m. a train carrying Pakistani soldiers and Razakars was derailed by the mine explosion. It was learnt that the Pakistanis had suffered 35 casualties in the action.

On 5 September, raid was conducted on a Razakar camp near Chittagong. 6 Razakars were killed and many were wounded seriously.

On 12 September an ambush was laid in Samarkand area, close to the international borders, Elements of 19 Rajput Batallion (India) Provided covering fire during the operation. A Pakistani patrol party suffered 5 casualties and rest of them fled away without any fighting.

On September 14 a very important meeting was held with the Indian Army Commander Lt. Gen. Jagjit Singh Aurora. It was decided to step up conventional military

Operations side by side, with the guerillas activities. Salient features of the planned military actions were:

1. Take over of lightly held Pakistanis positions.
2. Retaliatory action against the Pakistanis and inflicting heavy casualties on them.
3. Disruption of the Pakistanis lines of communication.
4. Stepping up of guerilla activities.

We realized that such decision, communicated by the Indian commander himself, was in fact coming from the government of India. This also indicated Indian Army's preparedness to face any adventurism by the Pakistan Army. This definitely was a welcome development for us and it was felt that the Indian Force's would, in the process, get deeply involved in our liberation struggle.

On 15 and 16 September we held elaborate planning discussion and meeting with Brigadier Shabeg Singh, local commander of the Indian force. The meeting wall attended by Khaled Mosharaf and Shafiullah also.

On 15 September an ambush against the Pakistanis at Amjadhat area in Pourshuram was laid by 10 of our soldiers. The Pakistani's counter attacked and the fighting continued for more than 2 hours. Naik Nadirussaman fought very galantly and helped in the safe withdrawal of the entire ambush party. The Pakistanis suffered 8 casualties. One of our man was injured.

On 18 September the first meeting Col. Sharma of 19 Raj RIF was held at Sreenagar area. The capture of lightly held Pakistani positions were to be carried out in coordination with the Indian forces, deployed along the border. Such coordination was necessary so that if the Pakistanis made any retaliatory attack and tried to cross the international borders, these could be repulsed. However, the actual attack on the Pakistani positions and the holding of the ground had to be done by the by the Bangladesh forces. The operational plan had to cover many aspects including those of limited fire support that the Indian army promised us in time of extreme crisis.

On the night our forces ambushed enemy patrol at Gourangapara. More than 15 Pakistanis were casualties in the action.

On 19 September complete operational reconnaissance of the Pakistani positions were held by Col. Sharma and me jointly. The Indian artillery unit Commander was also present to prepare artillery fire support plants. We recognized our troops by drawing surplus elements from main HQ & sub-sectors. While the operations were being planned guerilla activities continued other areas and deep inside Bangladesh.

On 20 September Subedar Raham Ali attacked the Pakistanis at Champaknagar BOP and after a brief battle withdrew to the base without suffering casualty. The Pakistanis suffered 3 casualties in the action.

Next day, on 21 September an ambush near Guthuma BOP left 3 Pakistanis injured while we suffered 1 casualty. Another ambush at Khajuria that day left one Pakistani soldier and 1 Razakar killed.

In the morning of 22nd September one platoon ambushed the Pakistanis in area Jochandpur. A company of Pakistan army was caught in the ambush. It was too big a target for our small ambush party. On our side soldier Ruhul Amin was injured and we lost 2 rifles, 1 mortar and a spare barrel of LMG. There was no casualty on the Pakistani side. That day, in the evening there was exchange of artillery, fire between the Pakistanis and Indians in Sreenagar area.

On 23 September, 10 Naval Commandos were sent by a small boat for attaching limpet mines against ships in outer anchorage off the port of Chittagong. Due to long distance involved and the rough sea they rough sea they could not reach the target and had to abandon the operation. While returning to shore one commando, Muhammad Hossain, was drowned in high sea. Another party of 3 Commandos were sent for action against the Pakistani Navy's coastal gun at Patenga, on Chittagong sea shore. The Pakistanis were fully on the alert and 2 of the commandos were captured by them.

On 23rd September at 3-30 in the morning one company attacked Pakistani position at Ballavpur. Another company under Captain Mahfuz attacked Pakistani position at Champaknagar. Prior to these attacks, artillery fired for ten minutes on both the targets. The Pakistanis had prepared very strong defences with well prepared bunkers. Artillery fire could not neutralize any of the enemy weapon positions. The Pakistanis quickly sent reinforcements and brought heavy artillery fire from Karerhat on our troop position. After repeated attempts to capture these two targets the attacks were called off. We lost 1 and 2 were injured. One Indian soldier was injured inside the Indian territory due to Pakistani counter-bombardment. The attacks failed.

That day in the evening an ambush in West Devpur area left 2 Pakistani soldiers killed.

On September 25 at 7 a.m. an ambush by 15 of our guerillas in area of Guthuma left 3 Pakistani casualties. A raid on Champaknagar BOP that night left 5 Pakistani casualties. The raid was carried out with rocket launchers and many bunker were destroyed.

On 26 September a raid was carried out on Pakistani position at Guthuma BOP. One of our soldiers, Naik Haris Miah crawled within a few yards of the bunkers and lobbed grenades inside. Others tried into various defence positions and withdrew quickly under cover of the darkness. 2 Pakistani soldiers were casualties in the action.

On the 26 September another ambush in Devpur area at 10-30 a.m. left 5 Pakistani casualties. One civilian was wounded due to stray firing.

On the Feni River, Andarmanik BOP was a strong position of the Pakistanis. Every evening the soldiers would fall-in for morning and evening roll-call. On getting this information one of our ambush party laid ambush around the BOP. As soon as the roll-

call was over the party opened fire with LMG's and rifles. The Pakistanis were taken completely by surprise in the open area of the BOP. By the time the Pakistan soldiers could jump into their their trenches and bunkers. 15 of them including one J. C. O. were casualties. In total 2 Pakistani platoons had assembled for the roll-call.

At 5-00 in the morning of 29 September, another ambush was laid in East Madhupur by a section of guerillas. 3 Pakistani vehicles, apparently bringing some reinforcements, were ambushed. 2 of the vehicles were damaged. However the Pakistanis did not suffer any casualty in this action.

That night at 11.30, raids were carried out on Ballavpur and Chagalnaya defence. Pakistani casualty in Ballavpur could not be ascertained. The raid on Chagalnaya was carried out under fire support provided by Indian artillery. In this action 5 Pakistani soldiers were killed and 7 were injured. One Pakistani artillery observer had taken position on a tree and was directing artillery fire against our forces. The raiding party located the observer and shot him down.

Next morning at 4 an important culvert at Champaknagar was blown up and the Pakistanis there were cut off from receiving ration or reinforcement.

On October 1, 16 guerillas under group leader Nizam raided a camp at Durgapur High School in Mirsharai. The camp was mainly for the Razakars and it had earned notoriety in that area for creation a reign of terror and oppressing the people. After very careful preparation for a number of days the guerilla group raided the camp at night and in the fierce battle for more than one hour killed 20 of the collaborators and captured 7 rifles. While a number of Razakars put up some resistance initially, others fled away in the darkness of the night. In that operation one freedom fighter Farid was killed but before dying he himself had claimed 10 enemy died.

Earlier that day at 10-30 hours a group of guerillas ambushed a section of the enemy patrolling near Guthuma. One soldier was killed and the rest of the patrol party managed to run away, leaving behind the dead. Such ambushes during broad-day-light and the resultant success were encouraging and we were confident that the guerillas had achieved certain standard where we could start relying on them for much more effective action against the Pakistanis.

Next day there was night raid on Pakistani position at Champaknagar BOP. In this raid 2 Pakistani soldiers were killed. One of our soldiers was hit by a bullet and was critically injured.

In the early morning of October 3, an ambush was laid in Amjadhat area in Belonia. A small enemy party was moving to the company headquarters, probably for food. The party was ambushed at 5-00 in the morning. 2 of them were seriously injured and carried away by rest of the party. It was learnt that the 2 injured and carried away by rest of the party. It was learnt that the 2 injured soldiers had died later.

Another ambush was laid near Karalia Tila in Karerhat on that night. 2 Pakistani soldiers and 3 Razakars were killed while they were on patrol duty and came into the ambush. Our forces returned to base safely.

As the raids and ambushes were going on in different areas at different times. We were preparing to launch small scale conventional attacks on lightly held Pakistani positions with a view to capture and hold the grounds for future military operations. In my sector, Pakistani position near Pourshuram was choosen as the first target and from the morning of 3rd October was started detailed reconnaissance. Since the beginning of October, as the raids and ambushes increased in intensity, frequency and ferocity, the Pakistanis became more jittery and nervous. Indian military officials and myself came under intense fire from Pakistani M. G's and mortars during the reconnaissance. A civilian in the area was injured by stray firing. This type of sporadic firing was common feature in the battlefront from October onward.

On 4 October further reconnaissance was carried out in other areas for suitable targets. At the same time we had to evaluate the battle worthiness of our fighting force.

The regular soldiers had remained in the battle front from the beginning of the fighting. They had no rest and were almost continuously engage in battle. Such continuous engagement in battle affected their fighting capability. They needed rest, regrouping, rearmament. But we could not afford to provide reasonable rest since the number of regular troops were limited. And we would be required to carry out the immediate military tasks with these very troops.

The guerillas themselves had come under tremendous pressure. They were moderately trained. The lack of adequate training was compensated to some extent by motivation and commitment to the cause of independence. We however observed that a certain amount of fear was impeding their fighting ability. The fear was not so much for their personal safety. It was of the savage reprisal by the Pakistan Army against innocent civilian population in the surrounding areas where guerilla actions took place. As a result, the guerillas were hesitant to go into action in areas with civilian population nearby.

This hesitation in the mind of the freedom fighters allowed free hand to the Razakars who created a reign of terror and intolerable nuisance for the people. Yet with all these difficulties we were continuing conventional attacks as well as guerilla actions.

At 10-00 a.m. on 4 October, 2 Pakistani soldiers were killed near Guthuma BOP. Next day on 5 October a senior Indian military officer visited out headquarter for coordination on the future military operations and at 11-00 a.m. that day an ambush near East Debpur BOP left 2 enemy killed. One of our soldier suffered minor injuries.

On 6 October reconnaissance with Brig Shabeg Singh and the commanders of various Indian army units deployed along the border area near Sreenagar was carried out, At 2-45 that afternoon a guerilla group blew up bridge between Chagalnaya and Muhuriganj. At the same time raid on Pakistani position in Karimganj Bazar High School left 3 Pakistani soldiers killed. 5 Razakars and 1 civilian were also killed in the encounter.

At 3 p.m. that day I visited number 2 Sector Headquarters at Melaghar for inter sector coordination meeting with Sector Commander Khaled Mosharraf. There we received information of heavy concentration of Pakistan Army in Chagalnaya area.

Immediately, Chagalnaya was engaged by artillery fire. Report collected later confirmed of considerable Pakistani casualties.

In the early hours of 7 October a patrol of 2 sections of the Pakistanis was ambushed in Belonia in day light. In the brief encounter the Pakistanis lost 2 soldiers and 3 Razakers.

Further to the east in Sabroom area the Pakistanis had concentrated larger forces and brought forward some of their mortars. This threatened a number of refugee camps and hospital which fell within the range or the mortars.

There were a number of raids and ambushes against the Pakistanis on October 6. Madunaghat on the Halda river, few miles away from Chittagong City had a electric sub-station. One of our raiding parties crossed 70 miles from main camp and destroyed 2 transfomers in a daring raid in the early hours of the day. Sepoy Mannan fired the critical shells that destroyed the transformers but in the process of firing was hit by a bullet. He succumbed to his injury later.

At 08-00 hours there was another action against the Pakistanis in Chagalnaya BOP. Our raiding party crept close to the enemy defence at night and lay in wait. A group of Pakistanis had started preparing their bunkers very carelessly. At that time the raiding party swung into action and killed 3 Pakistanis. We suffered one casualty.

At 6-00 p.m. that evening 2 guerillas crawled upto Dhaka-Chittagong Highway where 2 vehicles were parked and some soldiers were unloading ammunition. The guerillas threw hand-grenades and soon disappeared into the darkness of the night. One of the Pakistanis lay injured and the vehicles were badly damaged.

On October 7 a bridge on Chagalnaya-Belonia road was demolished by the guerillas. This was done to isolate the Pakistanis in the Belonia bulge. The bridge was covered with small arms, LMG and MG fire by the Pakistanis from nearby positions. But the guerillas managed to complete their task under heavy firing.

That day the guerillas attacked and destroyed a Tehsil office at Radhanagar and raided Pakistani defences at Mokamia. In the raid in Mokamia 2 Pakistanis were killed.

An ambush was laid at Purba Debpur area at 8-30 a.m. On October 8. A Pakistani patrol moved into the ambush and immediately came under attack. 3 Pakistanis were killed and 1 was injured. The guerillas returned to base without suffering any lose.

A raiding party lay in wait near Pakistani defences at Guthuma in the evening of 8 October. That was the usual time for the Pakistanis to fall-in for evening roll-call. As soon as the roll-can was over and the Pakistanis were about to disperse, the raiding party opened up with LMG and 2” mortar fire. 10 Pakistani soldiers were casualties. The guerillas disappeared in the darkness of the night and returned to base safely.

At 7-30 in the evening of October 9 there was a raid on Pakistani defences near Guthuma BOP. One Pakistani soldier was injured and a militiaman was killed.

That night I returned to my headquarters after reconnoitering of the forward areas. At the headquarters I met col. Sharma of 19 Raj RIF. We held discussions for future actions. The Indian army's role, as on that day was to halt any Pakistani attempt to cross the international border on the pretext of pursuing the Freedom Fighters. At the same time, the Indian Army was in a position to provide limited support to us as the launching base for various raids and ambushes. Soon after we had finished discussions capt. Mahfuz entered the room to give us a good news. About 10 days earlier we had sent a special guerilla team to demolish the railway bridge between Dhumghat and Muhuriganj. It was a difficult task as the bridge was guarded. Purposefully we refrained from any activity in that area and as such the sentries on duty were not very alert. Many of our guerillas in nearby villages were advised to lie law and keep observing the Pakistanis and their habits and wait for the final raid. They were also required to provide safe base for the raiding party, guide them upto the target area and help them withdraw to safety after the raid was over.

The raiding party along with the demolition experts were launched inside in the last weak of September. They carried out rehearsals of the action on a small bridge near the sub-sector HQ. Explosives for the action were dispatched in a number of installments to avoid detection. These were stocked in 2-isolated farm houses-only about a mile away from the target. Thereafter the main guerilla group moved inside and reached the target area. There, the party carried out detail reconnaissance for a number of days and observed the duty pattern of the sentries, their state of alertness, timings of change of sentry etc. Finally the raid was carried out on the night of 6 October and the bridge could only be damaged partially. This however disrupted the railway communication between Chittagong and Dhaka.

During this time a rumour spread that a section of the politicians who were actually collaborators in disguise, were trying for a rapprochement with Pakistan. The rumour spread quickly. The soldiers as well as the guerillas and the people were greatly agitated. There were demands for sever punishment of the collaborators and we vowed to achieve military solution to the problem since the Pakistanis had blocked the path for a political dialogue. The fighting men were advised to hit the enemy harder for a decisive military victory.

On 10 October the guerillas raided Pakistani position in Barabazar in which Pakistanis suffered 6 casualties.

On October 12 there was a raid on Pakistani defences at Parshuram area. 2 sentries were killed and the guerillas withdrew immediately after the raid, lasting only fifteen minutes.

At 9-30 p.m. the guerillas ambushed Pakistani patrol near Radhanagar on Dhaka-Chittagong road. 2 soldiers were killed and I was injured.

That night Pakistani President Yahya Khan, speaking on the Pakistan Radio mentioned of heavy Indian build up all along Pakistani border and of commando activities in which roads, railway bridges and power supply lines had been destroyed. From the

Speech it was very evident that Yahya Khan was referring to the guerilla activities of the Freedom Fighters and that our actions had hit his ego and destroyed his dreams of subduing the Bengalees.

On 14 October the sector commanders in the eastern region went to Agartala to receive the Bangladesh Prime Minister and the Acting President. They arrived in a special aircraft of the Indian Air Force. We held brief discussion about our difficulties-specially due to the short supply of arms and ammunition. There was a reference during the discussion about the rumour of some politicians trying for a rapprochement with Pakistan. The Acting President and the Prime Minister confirmed the rumour but advised us not to give it any currency which could demoralize the fighters. We were also assured that nothing short of independence will be acceptable to them.

On 15 October our forces raided Pakistani positions at Ballavpur, Darogarhat and Chaygharia. In all these raids 6 Pakistanis and many Razakars and militiamen were killed and 8 were injured.

On 16 October the Acting President Syed Nazrul Islam and Prime Minister Mr. Tajuddin Ahmed visited forward defences in Sreenagar area-only about a mile away from the Pakistani defences and well within their mortar range. That day a special commando group under a political leader Mr. Mosharaf Hussain, M. C. A. was inducted inside Bangladesh. The task assigned to them was to destroy fuel dump near Chittagong Naval Base.

The guerillas ambushed a patrol party of the Pakistanis near village Jagannath Sonapur in the early hours of 17 October. In the ambush the guerillas used 2" mortars & LMG's. 2 Pakistani soldiers and 3 militiamen were killed. Another ambush on that day at Devpur BOP area in Belonia left 3 Pakistani soldiers killed. On our side Sepoy Amjad Ali of BDR (11 wing) was seriously injured.

"On 17 October at 05-30 in the morning, our guerillas laid ambush in East Devpur area. Fighting continued for almost half an hour in which 3 Pakistani soldiers were killed. On that day I held discussion with Lt. Col. Bisra of 8 Bihar (Indian Army) and planned conventions operations against the Pakistani positions. More coordination was needed between Bangladesh and Indian forces in all respect including controlling and directing troop movements, deployment, ground actions and fire support. Due to lack of such coordination, Indian artillery had fired, by mistake, on our position near Chagalnaya injuring 4 of our soldiers.

In the early hours of 18 October we raided Guthuma BOP. Prior to the raid 50 rounds of 3" Mortar were fired. The Pakistanis called for artillery fire on our troops. The raid continued for half an hour during which 10 Pakistani soldiers were killed. We offered 2 casualties. Sepoy Latif was injured critically and evacuated to Belonia Hospital where he died later on.

Another raid on Pakistani defences at Matua village area that morning claimed 3 Pakistani casualties.

On 21 October, a Pakistani patrol was ambushed at Amjadnagar at 10-30 in the morning. One Pakistani soldier was killed and 3 militiamen were injured. One civilian in the nearby area was also injured by stray bullet. At 12-30 that day a group of Pakistani soldiers and militiamen were moving to Chandgazi in 5 rickshaws. They were attacked by the guerillas operating in that area at 12-30. 3 Pakistanis were killed. One of the rickshaw-pullers was also killed in the action.

In another ambush on that day in Baro Panua near Ramgarh, 5 Pakistanis were injured.

And in Mirdharbazar, 2 platoons lay in ambush for an expected Pakistani patrol party. One guerilla section was deployed as cut-off party in South Jodhpur. The Pakistani patrol reached the ambush and came under heavy fire. The fighting continued and reinforcement was sent by the Pakistanis from Chagalnaya through South Joshpur. This platoon of reinforcement hit the cut-off party and suffered heavy casualties. In both these ambushes our forces used 2” mortars, LMG,s and rifles. It was learnt later that 10 Pakistani soldiers were killed and 15 others were injured in both the ambushes in Mirdharbazar and South Joshput.

On 22 October there was another ambush in Barapanua. The Pakistanis suffered 3 casualties and the guerillas captured 1 LMG, few 303 rifles and some ammunition. It was on that day that some medium guns of the Indian army were moved forward closer to the international border. Indian Corps Headquarter also moved into the battle location and movement of heavy stores and equipment were noticeable all along the border.

On 27 October there was an ambush near Guthuma in which one Pakistani was injured. That night we sent one company under Lt. Raquib inside Bangladesh for guerilla operations in areas between Mirsharai to Chittagong. Dr. Mannan, an M. P. from the Chittagong area also went along with the group.

On 28 October an ambush party lay in wait near Debpur BOP. The Pakistanis received some supplies of ration and ammunition which they were unloading from bullockcarts at about 8 a.m. At that time the guerillas opened fire with LMG and killed 2 soldiers and 2 Razakars.

Last days of October were hectic for us as well as the Indian Army. We planned large number of attacks on Pakistani position. There were exchanges of small arms fire very frequently. Sporadic exchange of artillery fire claimed heavy casualties-specially of the civilian population. Pakistanis used to fire artillery shells on the civilian areas for reasons best known to them.

And all Indian Army nits Started moving to their battle locations.

On 1st November an important conference was held at 83 Brigade Headquarter at Shantir Bazar. For the first time Indian Army units were allowed to enter Bangladesh territory, occupy defences and relieve Bangladesh Forces for other tasks. 8 Bihar

Regiment and 2 Rajput Battalion of the Indian Army were to establish firm bases in Belonia. From these firm bases our forces were to operate and occupy vital positions in order to cut off the Pakistanis in Belonia and Pourshuram areas. The final date of operation was set for the night of 5/6 November. Till then, we decided to continue normal operations in the area in order not to arouse suspicion in the mind of the Pakistanis.

On 3rd November a group of guerillas were trying to demolish a bridge on Ranirhat-Rangmati raod. Suddenly a Pakistani patrol composed of militiamen and Razakars reached the spot. One guerilla, Parimal Sikder was captured and taken to the Pakistani camp nearby. The rest of the guerillas immediately raided the camp and recovered Parimal. About 4 Pakistanis were killed in the raid. One guerrilla was injured.

On November 5 our planned operation to cut off the Pakistanis in Belonia was launched at 20-30 hours. The operation has been described in greater detail elsewhere.

In the morning of 6 November guerillas raided Andarmanik BOP with the help of 2”mortar and 73 mm rocket. 3 Pakistani casualties were claimed in this raid.

On 6 November the guerillas were engaged in a frontal encounter with a Pakistani patrol in Durgapur in Mirsharai Police Station. Fighting continued for 15 minutes. One Pakistani was killed and 2 others were injured. On our side Mozammel Huq was injured when he was hit by a bullet. The group managed to evacuate him to safety and render medical treatment secretly.

On 7 November the Pakistanis attacked our position in Belonia with two platoons. The attack was repulsed by Habilder Ali Hossain and members of his section. They had taken defences on the high embankment of a big pond. The defence was well prepared and all areas in front and the flanks were covered by fire. The Pakistanis made successive counter attacks which were repulsed by the section.

Another counter attack on our position in Belonia bulge made some headway when 3 of our soldiers including the platoon commander were lost in the encounter and rest of the troops started withdrawing to the rear. At that time EPR subeder Gani was rushed forward. Gani launched a bold attack on the Pakistanis. The position was retaken and the situation saved.

On 8 November the guerillas ambushed a Pakistani patrol on Ramgrah-Karerhat road. Occupying high ground on the roadside, the ambush party opened fire with LMG's and carbines and threw hand-grenades. 4 Pakistanis were killed and 2 others were injured in the brief encounter.

On 12 November an ambush was laid by a platoon in Bishwanathala in Champaknagar area. At 10-00 in the morning, an enemy patrol of 2 sections was caught in the ambush. 7 Pakistanis were killed and one injured while rest of the troops ran away. One injured militiaman was captured. The prisoner died on way to our camp and was buried enroute.

On 16 November a raid was conducted on East Debpur BOP. The raid continued for one hour. The BOP at that time was being manned mainly by militiamen. 3 of the Pakistanis were killed in the action. 7 Razakars, on duty in the BOP, surrendered to our forces. Large quantity of arms and ammunition were captured.

On 17 November Group 19 under Moinuddin ambushed a Pakistani patrol party near Mirsharai. There were 3 enemy casualties. One of the guerllas suffered minor injury.

On 18 November an attack was launched on Pakistani camp at Karnafuli Tea Estate. There were 6 enemy casualties. Another attack that day on Pakistani position in Fatikchari left 2 Pakistani soldiers killed. Our forces captured 60 Rifles, one LMG, 2 Stenguns and huge quantity of ammunition. 11 policemen were also arrested in that operation.

On 20 November a conference was held at 181 Brigade Headquarter to decide on the reorganization of our forces to prepare for joint military action against the Pakistanis in our area of operation. By that time heavy movement of military personnel, vehicles, stores and equipments on both sides had reached a peak. It was apparent that the preparations were nearing completion for the final battle. After visiting some of the forward positions, I returned to my headquarters. The troops were offering their Eid prayers. Many of them knew nothing about their families for the last 8 months. As they bowed to Allah for prayers they were all crying like small children. I joined the prayers, tried to maintain a calm composure and later exchanged greetings with the troops with a faint smile in my face,But the smile probably betrayed the turmoil in my mind. Many of them embranced me and burst into tears.

By 21 November the northern half of Belonia was liberated and the battle for rest of Belonia was to start soon. The Pakistanis meanwhile concentrated lager forces in Feni area.

On 22 November there was a raid on a Pakistani camp at Tabalchari in which there were 2, Pakistani casualties. 13 Razakars along with their rifles, and ammunition, surrendered to our forces. That day 2 of our companies operating inside Belonia bulge along with 6 and 14 kumayun battalions captured 10 Pakistani soldiers. There were 22 others who were injured and taken prisoner. 2 of our guerillas were also injured and one JCO,s leg was blown in a mine explosion.

On 23rd November an ambush in Champaknagar BOP area claimed 2 Pakistani casualties. I held a meeting with the Zonal 'Council (A committee of Bangladesh political leaders of the area to advise the military commanders on civil affairs) at Shanti Bazar and discussed matters regarding civil administration in the liberated areas in Bangladesh. Thereafter meeting was held with the Commander of 'K' Force composed of Indian and Bangladesh forces in No.1 Sector. The Indian Brigade commander obtained permission from higher authorities and it was decided that in extreme emergencies Indian officers could be loaned to command our troops. We did not have even 5% of the officers

required. However we did not need that help and managed to continue fighting with available officers and JCO's.

On November 24 we captured Fulgazi and Chandgazi and consolidated our position in the whole area. Next day I visited the liberated areas in Belonia and inspected the defences there. That day the guerillas attacked a Razakars camp in Mirsharai area. They killed 3 Razakars and recovered a number of rifles and ammunition.

On 26 November our forces liberated more areas in Belonia. As the news of our success in battle field started spreading all around, the Razakars started surrendering to our forces in larger number.

On 27 November about 30 Razakars surrendered at Chagalnaya alongwith their arms and ammunition. That day, we visited liberated areas beyond Munshirhat along Belonia-Feni Road. The people had already started coming back to their home in the liberated areas.

On 28 November the guerillas attacked an enemy patrol at Hadir Fakir Hat in Mirsharai. There were 4 Pakistani casualties. Soon afterwards the Pakistanis sent reinforcement in the bazar. They burnt down. They burnt down the entire bazar and started killing civilians. The guerillas who had withdrawn after the action were infuriated by the savagery of the Pakistanis and immediately launched a suicidal attack against the Pakistanis. Guerilla Shah Alam charged at the Pakistanis with his carbine and risking his life through heavy firing single handedly, eliminated 8 Pakistanis before he was captured. The Pakistanis brutally tortured and killed him on the spot and left his dead body in the burning bazar. The guerillas later recovered the dead body and buried it with due solemnity.

On 30 November the guerillas raided Pakistani position on Nalua Tea garden. There were 5 Pakistanis casualties. One LMG and 2 rifles were captured.

Towards the end of November it was clear to all that the war would start any time. It was also talked about that Yahya Khan was looking for some pretext to start an all-out war in the region, raise the issue in the United Nations, call for immediate cease fire and deploy UN observers along the international borders. The positioning of UN observers could be a source of great hindrance to the steady supply of arms and ammunition that we were receiving from India.

Indian Army meanwhile was in full preparedness. Our guerilla activities which had reached the peak in the last month, were now being coordinated to coincide with the military operations by the Indian and Bangladesh forces. All guerilla groups operating inside Bangladesh were instructed to carry out their activities behind enemy lines in order to disrupt Pakistani lines of communication and inflict heavier casualties on the Pakistanis. They were also instructed to disrupt all troop movements so that the Pakistanis could not send timely reinforcement to any places which was threatened by our joint military operations.

On 4 December the guerillas in Hathazari area received information that the Pakistanis had started arresting the people in Katirhat bazar area on suspicion of being members of the liberation forces. The Pakistani is burnt down a number of houses and arrested 30 Bengalees who were taken to the market to be shot. On this information the guerillas in the area raided Katirhat immediately. In the ensuing battle 6 Pakistanis were killed, while others fled to their nearby camp. The guerillas released the arrested persons and withdrew to their respective shelters.

When the war broke out on 3 December, the guerillas intensified their activities behind Pakistani lines and carried out larger number of raids and ambushes.

On 9 December the guerilla company operating in Nazirhat area attacked the Pakistanis there. This company under Lt. Shawkat killed 20 enemy soldiers and inflicted heavy casualties on them. The Pakistanis left their dead and fled toward Chittagong. We suffered 5 killed and 3 wounded.

Sd/-.........
20 March, 1983.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২। ১ নম্বর সেক্টরে সংঘটিত যুদ্ধের আরও বিবরণ	বাংলা একাডেমীর দলিলপত্র	.... ১৯৭১

১। জুন মাসঃ

(ক) তহশীল অফিস-

(১) ফেনী শহর (২) খিতাবচর (৩) পটিয়া (৪) কানুনগোপাড়া (৫) মৌলভীবাজার (৬) আনোয়ার থানার ২টি তহশীল অফিস।

(খ) গ্রেনেড চার্জ-

(১) নিউমার্কেট ৩ জন (২) রেয়াজউদ্দিন বাজার ৫ জন (৩) রেয়াজউদ্দীন বাজার ৩ জন (৪) পাঁচলাইশ থানা ৩ জন (৫) মিউনিসিপ্যালিটি, আলী মোল্লা চৌঃ আহত হয়। (৬) রেয়াজউদ্দিন বাজার ৪ জন আহত।

২। জুলাই মাসঃ

(ক) তহশীল অফিস-

(খ) গ্রেনেড চার্জ-

(১) নিউমার্কেট ৫ জন (২) সদরঘাট ৭ জন নিহত ১১ জন আহত (৩) কক্সবাজার ২ জন (৪) আমিন মার্কেট ১ জন (৫) রেয়াজুদ্দিন বাজার ২ জন আহত (৬) রেয়াজুদ্দিন বাজার কেউ মারা যায়নি (৭) চুনার গুদামের মোড় ১ জন। (৮) জুবলী রোড ৩ জন (৯) খাতুনগঞ্জ ৩ জন।

(গ) দালাল অপারেশন-

(১) পোপাদিয়ায় চেয়ারম্যান কাসেম-(এই অপারেশনে বোয়ালখালীর আবুল হাসান সাহায্য করিয়াছে)

(২) রাউজানের ফয়েজ আহমদ ৮ জন ডাকাত মুহজুল্লাহ ও তৎপুত্র (৩) চেয়ারম্যান দেলওয়ার সওদাগরের বাড়ী জ্বালিয়ে দেওয়া হয়, গাড়ীটিও, (৪) চরকানাই-এর নাজির আহমদ (৫) বোয়ালখালীতে দুইজন রাজাকার হত্যা।

৩। আগস্ট মাসঃ

(ক) গ্রেনেড চার্জ-

(১) রেয়াজুদ্দীন বাজার ২ জন (২) নিউমার্কেট ২ জন (৩) কোর্ট বিল্ডিং-বিস্ফোরণ হয় নাই
(৪) কলেজিয়েট স্কুল ২ জন (৫) সিটি কলেজ ১ জন (৬) চাইনিজ ডেন্টিস্ট-কেউ মারা যায়নি।

(খ) দালাল অপারেশন-

(১) বুধপুরায় ৩ জন (২) মালিয়ারায় ৭ জন (৩) জিরিতে ৩ জন (৪) সারেন্ডার রাইফেলসহ ৪ জন (৫) বোয়ালখালীতে ১ জন (৬) রাউজানে ১ জন (৭) রাঙ্গুনিয়ায় ৩ জন।

(গ) রাজাকার অপারেশন-

(১) জিরি মাদ্রাসায় ২১ জন রাজাকার নিহত, ১৬ টি রাইফেল (২) বোয়ালখালীতে ১ জন রাজাকার (৩) রাইজানে ৮জন রাজাকার (৪) ....২ জন রাজাকার, ২ জন পুলিশ ও চেয়ারম্যান নিহত।

(ঘ) অন্যান্য-

(1) ১৩২০০০ ভোল্টের দুটো পাওয়ার পাইলন কলকারকানার মেইন ইলেকট্রিক সাপ্লাই লাইন ধ্বংস- ২৮ দিন সমস্ত কলকারখানা বন্ধ থাকে, (২) কৈয়াগ্রাম ১টি পুল বিনষ্ট, (৩) রেলের বিট উপড়ে ফেলায় ট্রেন লাইনচ্যুত (দোহাজারী লাইন)।

৪। সেপ্টেম্বর মাসঃ

(ক) রাজাকার অপারেশনঃ

(১) কালারপুল থানা-২ জন রাজাকার, ৬টি রাইফেল ও এমুনিশন (২) লাখাড়া-তিনজন রাজাকার দুইটি রাইফেল (৩) ধলঘাট ৭ জন মুজাহিদ (৪) বোয়ালখালী থানা- ২ জন পাঞ্জাবী, ২ জন পুলিশ, ৩৫ জন রাজাকার ও মুজাহিদ (৫) ধলঘাট-৭ জন মুজাহিদসহ মোট ২১ জন (৬) জৈষ্ঠাপুরা-১ জন রাজাকার (৭) মিলিটারী পুলে ১ জন পাঞ্জাবী।

(খ) গ্রেনেড চার্জ-

(১) রেয়াজুদ্দিন বাজার ২ জন (২) স্টেশন রোড-কেউ মারা যায়নি (৩) লালদীঘিরপাড়-জামাতের মিছিলে ৭/৮ জন নিহত।

(গ) দালাল অপারেশন-

(১) কোরাইল ডাঙ্গায় ১ জন (২) লারোয়াতলীতে ১ জন (৩) বোরলায় ১ জন (৪) ধলঘাটে ১ জন।

(ঘ) অন্যান্য-

(১) ১টি পুল ধ্বংস (২) লাখাড়ায় Signal wireless station সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেওয়া হয় (৩) কোরাইল ডেঙ্গা পাহাড়ে কাঠ কাটা নিষিদ্ধ করা হয় (৪) ফসফরাস দিয়ে পেট্রোল পাম্প ধ্বংস করে দেওয়া হয়।

৫। অক্টোবর মাসঃ

(ক) রাজাকার অপারেশন-

(১) কডুরখিল গ্রামের সকল রাজাকারদের বাড়ীঘর পুড়িয়ে দেওয়া হয়। (২) পরদিন কডুরখিল গ্রামে ৫২ জন রাজাকার ও ..... বন্দী (৩) ধলঘাট রেলওয়ে স্টেশনে ট্রেন আক্রমণ- ২১ জন পুলিশ ও রাজাকার ধৃত (৪) পশ্চিম পটিয়ায় ২ জন রাজাকার ও ৬টি স্টেনগান উদ্ধার (৫) রাউজানে তিনজন রাজাকার (৬) শিলচলে সাতজন পাঞ্জাবী সাহয্যকারী (৭) বান্দরবন রাস্তায় চারজন পাঞ্জাবী (৮) দুইজন মুজাহিদ।

(খ) দালাল অপারেশন-

(১) পশ্চিম পটিয়ায় ১ জন (২) রাউজানে ৫ জন (৩) রাঙ্গুনিয়ায় ৩ জন।

(গ) অন্যান্য-

(১) একটি ট্রেন বিস্ফোরক দিয়ে সম্পূর্ণ উড়িয়ে দেওয়া (২) তিনটি কাঠের চালি .... দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া হয় (৩) কাঠ ব্যবসায় ও চালনায় সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষনা করা হয়।

৬। নভেম্বর মাসঃ

(ক) রাজাকার-পাঞ্জাবী অপারেশন-

(১) টাউনে গ্রেনেড চার্জ করে তিনজন রাজাকার হত্যা (২) পারুয়ায় গ্রেনেড চার্জ করে তিনজন মিজো ও একজন পাঞ্জাবী (৩) মগদাইরে গ্রেনেড চার্জ করে একজন রাজাকার (৪) ফজলপুরে গ্রেনেড চার্জ করে তিনজন রাজাকার (৫) ধলঘাটে ট্রেন আক্রমণ করে ...... জন মুজাহিদ (৬) ধলঘাটে এম্বুশ- ৯ জন পাঞ্জাবী ও তিনজন মিলিশিয়া।

(খ) দালাল অপারেশন-

(১) রাউজান ১ জন (২) রাউজান ৪ জন

(গ) অন্যান্য-

(১) ট্রেন ইঞ্জিন লাইনচ্যুত করে দেওয়া হয় (২) ২টি পুল নষ্ট করে দেওয়া হয় (৩) ৪৪০০০ ভোল্টের ছোট ইলেকট্রিক লাইনটি নষ্ট করে দেওয়া হয় (৪) ১টি কাঠের চালি ডুবিয়ে দেওয়া হয় (৫) ১৩২০০০ ভোল্টের মেইন সাপ্লই লাইনটিও নষ্ট করে দেওয়া হয়-মিল কারখানা আবার বন্ধ করে দেওয়া হয় (১৩ দিনের জন্য)।

৭। ডিসেম্বর মাসঃ

এই অপারেশনে সাহায্য করেন কমান্ডার অশোক কুমার চাকমা। এই মাসে মাত্র একটি অপারেশন করা হয়। উক্ত দল বন্যায় একটি পাঞ্জাবী আক্রমণ প্রতিহত করতে গিয়ে ১ জন ক্যাপ্টেনসহ ৭ জন পাঞ্জাবী, বাদবাকি মিজো ও রাজাকারসহ মোট ২৭ জন শত্রুসৈন্য নিহত করেন। পহেলা ডিসেম্বর তারিখে এই অপারেশন করে রাউজান আসার পথে ২রা ডিসেম্বর তারিখে করিম সাহেবকে চিরিঙ্গা নামক স্থানে গ্রেফতার করা হয়।

তারপর থেকে যতদিনে করিম সাহেব মুক্তি না পান ততদিনে সকল প্রকার অপারেশন বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সেই হিসাবে অনেকদিন আর কোন অপারেশন করা হয়নি। গ্রেফতারকারী নূরুল আলম ও তার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তার মুক্তি সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হবার পর ১১ই ডিসেম্বর তারিখে আর একটি অপারেশন মগদাইরের রাজাকার-মিলিশিয়া ক্যাম্পটি দখল করা হয়। এর পরেও আরো তিনজন রাজাকার ও ই-পি-আর এর পুলিশকে ধরা হয়।

----

১ নম্বর সেক্টরের যুদ্ধ বর্ণনা

[সাক্ষাৎকারঃ মেজর মাহফুজুর রহমান *, বীর বিক্রম, ২৫ আগস্ট,১৯৭৩]

On 3rd May 71, a new camp was sited and selected for us at place called harina 5 miles away from Sabrum. Maj (now Brig) Ziaur Rahman, Maj (now Col) Shawkat Ali, Maj (now retd) Rafique, Capt (now Major) Khaleque, Capt (now Major) Oli, Capt (now Major) Enamul Haque, myself, Mr. Ishaque (adm-Offr), Mr. Muree (MTO), many MCAs were there. Later on joined many other offrs-Sqn Ldr (now. Col) Shamsul Haque, Major (now Lt. Col) Khurshid, Flt Lt. (now Sqn Ldr) Sultan, Capt (now Maj) Matiur Rahman Capt Shams (late), Fit Lt. Abdur Rouf, Flng Offr Shawkat and many others. This place became the HQ No.1 Sector and was commanded by Major (now retd) Rafiqul Islam.

Took few days to orient with the area and the adjacent borders to locate the en's disposition. Some of the allied offrs came to our Sector HQ and showed us some mines, explosives etc. on 10th May, Major (now Brig) Ziaur Rahman took me to Alinagar B. S. F. post and got me introduced with Capt P. K. Ghosh (Ali), the Comd of the post, who had been taking part with our troops in many operations inside Bangladesh. I was brought here for a particular mission. Next morning, I went with him to Shubhapur Bridge to see our troops still holding it with their last efforts. I got the task, for which I was brought here, to blow up the Muhuric Rly bridge at any cost. At 12 O'clock night 11th -12th April took two pls under Sub Sabed Ali and Sub Jalal Ahmed and stared for the bridge. One of the brave Engr NCO Nk Zulfiquar Ali was my demolition 2IC. Some of own and allied forces already made few attempts before to blow this bridge up. But as it used to be guarded always by Pak troops during day and Razakars and collaborators at night, the attempts could not be successful. However, on my way also found many unarmed sentries like those whom I had to arrest and carry them along with us in the mission in carrying our explosive boxes. It was last quarter moonlit night, by the time we reached near bridge tactically through many difficulties it was 4 o'clock morning. Found some 10-15 civilians around it walking and gossiping. Observed for few minutes if there were any Pak troops. Straightway got into my job without loosing any more time. Within 10 minutes about 200-300 civilians got together on the other side of the bridge and started shouting for not to blowing up the bridge. Some of them started threatening us to bring the Pak troops. Through these shoutings howling and worries, some 20-25 minutes had to be taken to put those boxes of charges on both sides of the bridge and complete it. I told the platoons to fall back at a safer distance and shouted for the civilians to leave the places at once. With my repeated warning even, they did not pay any attention. I put the safety fuse fire and ran for 1.5 minutes. With an ear-breaking sound one part of the bridge was blown. I joined my PL and left for the camp. En attacked Shobhapur bridge this morning and captured it.

In June, Major (now Brig) Ziaur Rahman took skeleton of 8 E Bengal and many other mixed up forces from No.1 Sector and raised a new complete battalion at TURA. Capt Khaleque, Capt Sadeque, Capt Oli, Capt Ejaz were with it. I remained in No.1 Sector and was made No.3 Sub-Sector Comd at Subroom. No.1 Sub-Sector under Capt Shams (late)

* মেজর মাহফুজুর রহমান একাত্তরের মার্চে লেফটেন্যান্ট হিসাবে চট্রগ্রামে অবস্থানরত ৮ম বেঙ্গল রেজিমেন্টে ছিলেন।

was at Belonia, No.2 Sub-Sector under Capt (now Major) Matiur Rahman was at Srinagar near Shobhapur. No.3 with me opposite to Ramgarh, No.4 Sub-Sector under Sub Khairuzzaman of EPR at a place named Tabalchari north of Kasalong RF in Bangladesh. Mojor (now Col) Shawkat also got posted and took over the command of NO.5 Sector at Sylhet. Capt (now Major) Enamul Haque was the Adjt. Flt Lt. (now Sqn Ldr) Sultan Ahmed was the Inducting Offr.

I had been operating from my Sub-Sector HQ inside Bangladesh from Ramgarh, Chikanchara, Hiaku, Narayanhat, Karerhat, Shobhapur, Zorarganj, Mastan nagar and maximum upto Miressarai 20 miles inside from the border. During last 2-3 months, my Sub-Sector troops in these areas of operations created a quite panic and fear in the enemy. An estimated en casualty during these last three months only in different operations exceeded three hundred. My Sector Comd Major Rafiq's and whole Sector people's blessings were with me, because of which I could dedicate myself along with my troops with best satisfaction. Brig Anand Sorup took over the Command of No.1 Sector and 1st visited my Sub-Sector on 28th August 71 and cheered us up.

I was asked to take over the command of No.2 Sub-Sector at Srinagar, one of the sensitive most place for infiltration etc, 15th September 71. Met my old brave fighter friend Capt P.K. Ghosh (Ali), Lt. Col Himmat Singh CO 4 Guards, Capt Bajwa the only Arty OP there. All were happy to find me there with them. Mr. Khairuddin MCA, one of the youth camp Comd and Afsaruddin Barrister, another Camp Comd (of 'Black Shirts') met me in my camp and needed my help and co-operation. Led an operation with a Coy of 4 Guards on that very night on en PI at Champaknagar BOP, in which Lt. Col Himmat Singh himself was there with me.

On 19th Sept 71, 4 Guards were replaced by 14 Raj Rif. Lt Col Om Prakash Sharma CO of the bn made a plan with me for an attack on en Coy at Ballavpur and Champaknagar. Rehearsed for days in my camp for that night attack. At dawn 0330 hrs on 21st September led that attack with two coys and a battery of fd support. One coy under acting Lt Abdul Hamid led for Ballavpur and a Coy under me for Champaknagar simultaneously. Own shelling were undoubtedly tremendous but they could neither soften the en up nor could neutralize them at H+ 1 (Rapid). Almost all shells fell around the tgt and the en out of fear of life opposed us with their last breath. We failed to capture the tgts. One of my Sep got wounded by en fire and two Sepoys of 19 Raj Rif were wounded by en shelling.

On 5th October, Mr. Samad acting defence Secretary of Bangladesh, General Sarkar and Brig Shah Beg visited my camp and asked about the complete situation of the ea. During past few days, many bridges, electric pylons were blown, many ambushes, raids and assaults were carried out on ens effectively; and due to more concentration of more allied forces in my Sub-Sector, the en started thinning out and getting back from the adjacent border belts of Ballavpur, Madhugram, Sri nagar and Chagalnaiya.

One of my pl under command Sub Rafiqul Islam of Police whom I sent few days ago inside Bangladesh at Mirersarai along with a coy of FFs, stayed there for two weeks and operated against Pakistanis many operations effectively and returned with a cut head of a Pakistani Major who died in one of the operation against that pl. One of the bravest

Student (FF) died in one operation, Nk Zulfiquar got burst on his left shoulder, Sepoy Nurul Alam of 8 E Bengal got burst on his abdomen and back thighs, but returned through many difficulties safely.

On 15th October, Mr. Tajuddin Ahmed Prime Minister, Mr. Syed Nazrul Islam Acting President of Bangladesh, younger brother of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, some more VIPs, General Narendar Singh, Major (now Lt Col) Nurul Islam and forty other Officers visited my camp and encouraged my troops for the excellent operations done by them.

Extended my defence more from Nalua BOP on the north under a brave JCO Sub Loni Mia of EPR who had been operating upto Chandgazi in Belonia bulge and upto Amlighat BOP on the south under another brave JCO N/Sub Rahmat ali of EPR who had been operating upto Karerhat-Shobhapur. Some more brave JCOs acting Sub Major Fakhruddin of EPR, Sub Sabed Ali of 8 E Bengal, Sub Abdul Ghani of EPR, who had been during past few months operation In many fronts against the en and created havoc.

On 21 October, 3 of my best Pls. one of Sub Sabed Ali under Lt Shawkat Alley, the 2nd one of NI Sub Rahman AU under Lt Farooque Ahmed and the 3rd one of Sub Rafiqul Islam under Lt Raqib were infiltrated permanently inside Bangladesh in three different places at Fatikchari, Nazirhat and Mirersarai respectively where they had been operating gallantly till the day of Independence.

A conference was held in my area on 24th October. Brig Sandhu Comd 83 Bde, Lt Col Bisla CO 8 Bihar, Lt Col Virk Comd Arty, Major Bajwa Comd Samarganj BOP and myself were there and after that all of us went out for a reccee on the bordering areas upto Belonia BOP. I was intimated to move three-fourth of my Sub-Sector troops towards somewhere near Belonia within few days. Attended the 2nd conference on behalf of Major Rafiq the Sector Comd at 83 Bde HQ at Shantirhat on 30th October. Issued warning order to my troops for next operation. Recceed the general area at Guthuma and Motai BOPs. Attended 3rd conference at 83 Bde HQ again on 1st November, this time with Lt Gen Sagat Singh and Maj Gen Heera, regarding the infiltration conventionally in side Belonia.

The task given to us by the 83 Bde was to make the rd-block at Parshuram 4 miles south of Belonia, to block and attack two en bns at Belonia and to stop and repulse en assault on us from south of our defence. The Belonia bulge was divided equally into two Sectors East and West having river Muhuri in the centre flowing straight from north to south. I was made Ops Comd from No.1 Sector for Eastern Sector and Capt (now Major) Zafar Imam from No. Sector made Comd of western Sector. Capt Zafar had his complete 10 E Bengal with an attached coy of 2 E Bengal under Capt Helal Mushed. I had four mixed Coys of mostly E P R boys, two Coys with Lt Mansurul Amin and two Coys with me. Lt Mansur's 6 PI Comds were Sub Aziz of EPR, Hav (now N/Sub) Imam of E Bengal, Hav (now N/Sub) Ershad of Police and 6 PI Comds with me were Sub Loni Mia EPR, acting Sub Maj Fakhruddin of Epr, Sub Abdul Ghani of EPR, Ha V Shaheed of EPR, N/Sub Nuruzzaman of EPR, N/Sub Din Mohd of EPR. Three 3" Inch Mortars were

with Lt Mansur under N/Sub Manic of EPR and 3" inches Mortars were with me under N/Sub Syed Ahmed of E Bengal. 2 Rajput was attached with my Sector and 3rd Dogra with Cant Zafar's Sector.

On night 3rd. 4th November infiltrated inside Belonia for reccee sitting" Our rd-block positions with Six comds under me and "Six pl comds under Capt Shams. If was astonishing that we did not come across any en during our reccee from more than 5 miles areas inside from the border. Capt Shams No.1 Sector Sub-sector comd died this evening. Major Rafiq Sector Comd and Major Paradhan of Belonia came to see him. He was buried in Bangladesh graveyard at Belonia. Lt. Mansoor took over the command of No.1 Sub Sector.

At 1730 hrs on 5th November, we first infiltrated conventionally inside Bangladesh at Belonia bulge. The last end of our making rd-block was at a place named Salia Dighi, 2 miles south of Parshuram PS, 5 miles inside from the border by the side of the main road Belonia Chagalnaiya. One of the Pl of 2 Rajput and an Arty OP were with me. It was complete dark at night and was raining cats and dogs while we infiltrate, which helped us a lot from being detected by en. While walking troops were falling here and there in slippery tracks, loosing one another in the darkness, missing the track and started shivering terribly out of severe cold. By the time we reached our destination it was 12 0'clock midnight and it was storming heavily at that time. Started positioning troops and digging then and there. The FFs who were supposed to bring the def stores like CGI sheets and planks behind us, could not proceed because of the heavy wind storm. Made more or less strong alround def with the sources available there in the area.

Next early in the morning at 0530 hrs on 6th November an en reccee patrol was probably returning to their position at Gutuma BOP, bumped in front of Sub Loni Mia's PI and got hit and remained there for ever. En came to know about out def by about 1000 hrs and stared assaulting from alround. Whole day through storm they had been trying to dislodge us from the position but failed. At night, my left fwd PI under Hav Shaheed was attacked by an en PI, en was repulsed and suffered some cas; their dead bodies were lying in front of the PI scatteredly.

At 0445 hrs on 7th November, a coy of 11 Punjab attacked my left fwd PI under Hav Shaheed again, overran the position and reached upto the Coy Hq at Salia Dighi. I could not believe what had happened. I would see both my troops and the en were together running towards us. En could not reach upto our coy HQ at Salia Dighi and returned from there, but occupied Hav Shaheed's PI position on a pond about 100 yd in front of Coy HQ. Five Steps, two FFs and PI Comd Hav Shaheed were captured and killed by the en. Seven dead bodies had been lying there for two days, Hav Shaheed was taken away at Fenny jail where he was shot dead. One of his nephew was also with him in the same jail who was luckily safe till the day of Independence.

For two days we tried to recapture my posn from en, but could not do that. En launched many offensive operations since last two days on our positions. First and biggest achievement was done on 8th November in the evening. Parshuram and Belonia came under our Occupation. Now we were a little … from the rear, en was in front only towards south.

At dawn on 9th November, attacked with a PI of acting Sub Maj Fakhruddin and a PI of Lt Kumud of 2 Rajput on en position at village South Berabaria and recaptured my lost PI position of Hav Shaheed. The en neither did burry the dead bodies of their troops nor did burry those of ours. We found15 rotten dead bodies lying scatteredly all over; the files, insects and the ants were eating them. Not a single face could be identified as they were already eaten up by the insects. In the pocket of one of the en dead bodies was found the small holy Quran and a piece of paper in which written “2484547 Sep Mushtaque Ahmed”. En left many arms, ammos, stores and eqpts behind while running away; in one of the bucket was written 11 Punjab.

En Attacked with 3 Sabre Jets on our position and Parshuram at 1530 hrs on 9th November, straffed and bombed with napalm. One of my Sep got hit and wounded and a Sep of allied force (Maj Shahid’s coy) got hit and died on the spot and many civs died and houses were burnt. On 10th November, en had been launching attk with bns from Chitalia and Kaptan bazar, but could not move us from posn at all. 4 Sabre jets attacked again today at 1530 hrs and Inf on the ground. In the evening about a bn str attacked on our def from Chitalia on the right, Satkuchia in front and Guthuma on the left, but failed. The Almighty Allah was with us. En suffered hy cas and made a clean break of about 2-3 miles. Next morning one of the PAF CESNA appeared and started flying over our positions at a high altitude and started bringing precise arty fire on us. En left Guthuma BOP on 12 November which I occupied then and there. Lt. Col Dutt Co 2 Rajput and Maj Rafiq my Sector Comd paid a visit in the front line in our positions and gave us much cheer. I brought my Coys a mile ahead from Salia Dighi the previous position and deployed now in a better place.

All the Ops Comds were called for a conference in Bde HQ at Belonia. Capt (now Maj) Zafar Imam also there, we embraced each other because of the successful joint operation. Maj Gen Hira was pleased very much and cheered us for the same. We were orderd to adv infront on our present axis rd Belonia-Chagalnaya so far we could do easily. We advanced for about another 2 miles upto a gen line Motaikhal and got resisted by en strong positions at Ketranga on my right, Kaptan bazar in front and Baghmara on my left.

Attened another conference at Bde HQ on 19th November. Now we came under a new 181 Bde under Brig Anand Sourp. A new bn 6 Jat was attached with my coys whos CO was Lt Cot Hasabnis. We ordered make a 2nd rd- block south of Mohammadpur through Khejuria BOP, about 9 miles south of Belonia, with my coys and 6 Jat. En had been using fd Arty against us. We assaulted an en position at a village named Jagatpur, where 10 Razakars and 12 ORs of 15 Baluch surrendered. One of the Naik of 6 Jat died in that operation. Most of the ens from Chitalia, Kaptan bazar, Mohammadpur and Khejuria were encircled and made to surrender. Allied PT. 76 amphibious tks were used in our support on 24th November. En gave a strong opposition at Amjadhat and Chandgazi bazaar. We kept our momentum and reached upto Mridhyar bazar on 25th November. One of the very good civ helper and guide Mr. Abdul Quader Majumder of Chagalnaiya, who had been helping us throughout, joined me in front battle now. En started running away and concentration around Gangadhar bazar, Rezumia br and Fenny.

Attended another conference in 181 Bde HQ at Santir bazar on 28th November with Brig Anand Sorup, CO 6 jat, CO 14 Kumaon, CO 32 Mahar; and we were given the next task. This time I was given a risky and a longer area of responsibility. One of my PI under a Sub Loni Mia had to be positioned at a village named Matua about a mile away in front of the nose of the en from my Coy HQ and Dakhin Jashpur. Finding this PI isolated from others, en had been harassing it throughout the ni. A steam roller was brought by the en in front of that PI and started moving from one side to another.

We thought it to be a tk, but later on we got info by our civil sources that it a rd-roller. After repeated request, Brig Anand Sorup agreed and gave me some reinforcement-a Gurkha PI from Maj Gurung's Coy of 32 Mahar, which I immediately put with Sub Loni Mia's PI infront. Through en firing, shelling, mining and patrolling, I had to move to all of my PI posts from one end to the other. Now it became difficult to move because of en's by mining all around and it was not possible to breach all of them. One of the Nk of 32 Mahar while bringing a 57 RCL for one of my PI infront unfortunately stepped ion en's a/per mine and lost his right ankle upto the knee. I went with my RMO Dr Shafiqur Rhman Bhuiyan who was a final year medical student of chittagong Medical College, gave first aid and sent him to the ADS at Mridhyarbazar. Immediately after that one of the sep of Sub Maj Fakhruddin's PI stepped blindly in the same mine field. Not a single shell dressing or field dressing was aval with us at that moment. We had to tear a blanket and wrap the wound with that and send him to Mridhyarbazar.

On 3rd December, Lt Col Hargobind Singh CO 32 Mahar with his O gp came to meet me at my Coy HQ. who wanted to have a look on en's positions all over. At night, his Gurkha PI, which was under me with Sub Loni Mia's PI infront, was asked to fall back for another operation. While withdrawing, unluckily got hit by one of the en's spray bullet and died on the post. A very strong post at Chringa Dighi infront of my Coy was registered throughout the day by own and allied artys and attacked by Maj Gurung's Coy of 32 Mahar in the evening on 5th December En left the posn before the attk leaving countless mines behind. While clearing and advancing, few brave civilian guides of the areas were wounded.

Sub Maj Fakhurddin, one of my PI comd got hit by en fire on his right leg below his knee. He was evacuated to the ADS at Mridhyarbazar and his MG Comd N/Sub Shafiullah took over the Comd of his PI. I was ordered to adv and take up def now at panua (north) Kashipur and Nijpanua by the side of the River Muhuri near Rezu Mia bridge.

Here I was told that 4 E Bengal was on my right proceeding towards Chittagong from Fenny and 32 Mahar was on my left along the International border. We were advancing under 181 bde towards Chittagong. Now I came to my old areas of responsibilities and operations where I had been leading many operations. On 6th December I reached with my Coys at Karaiya bazar, where I found and met Lt Mumtaz of 4 E Bengal with his Coy heading for Dhumghat. I was happy to see the regular tps of E Bengal after long time here.

1st time the HQ of No.1 Sector was established in Parshuram inside Bangladesh. Met with Sector Comd and Maj Enamul Haq Chy thereafter long. Advancing with 32 Mahar

from Gangadhar bazar toward Chittagong trough the gen axis Dacca-trunk rd. While retreating en had blown off Shorbhapur and other important brs. Crossed the river Fenny by jurinda (boats) and reached Karerhat at midnight on 8th December.

On 9th December morning, I was asked with my coys to lead 32 Mahar with one of their coy of Maj Vasker on the main rd: Capt Ali an Allied Arty OP was with us. En had been shelling continuously on us while withdrawing. Reached Zoraganj and deployed my troops there. Maj Rafiq Sector Comd and Mr. Mosharraf Hossain MCA of Zoraganj area joined us here and cheered a lot. Now three Coys were advancing on three axes-I was with my coy on the rly axis towards Sitakund, Maj Gurunf with his coy on Dacca trunk rd axis and Maj Vasker on the right of the rd through cross country.

Reached BARAIYADHALA Rly Sta early in the morning at 0345 hrs after walking with my coy throughout the night. Here I found old coys of mine who infiltrated inside Bangladesh long ago in the month of October 71under Lt Raqib, Farooq and Shawkat. Lt Raqib had been operating around Mirersarai, Lt. Farooq around Sitakund and Lt Shawkat around Nazihat and Hathzari. I was very happy to meet all of my old Sub-Sector troops safe and sound, except some troops under Lt Shawkat died in Nazirhat operation.

En concentrated in larger str in and around Sitakund. A new task was given to 32 Mahar by Brig Anand Sorup this time. I was told to go in the rear of the en, behind Sitakund with my Coy and a Coy of 31 Jat under Maj Prakash to make a rd-block by 0400 so that the en cannot escape from there; and Lt Col Hargobind singh CO 32 Mahar himself with one of the coy and Maj gurung with another coy were attacking the en at Sitakund Rly Sta. the attk was launched at midnight and most of the en had already left the posn by then except some of the rear party who while tying to escape now came in front of our posn; some of them got killed and some surrendered. Here I got Lt Mansoor and Lt Farooq again with their Coys and started advancing in three axes-Lt Mansoor by the axis Rly line, myself by the Dacca-trunk rd and Lt Farooq on the right of the rd by the coastal areas.

On 15th December we reached Kumira with all Sector troops and deployed them there. En had been shelling heavily on our positions, unluckily one of the shell landed on Capt Ali, an allied Arty OP who had been with me since last few days from Karerhat, and died on the spot. My first allied Arty OP with my Coy was Capt Darkunde at Belonia and Capt Ali was our 2nd Arty OP who had been staying, sleeping, eating, operating with me and lasting died in our country soil.

On 16th December 71, Lt Col Bisla CO 8 Bihar, my old and close Sub Sector neighbour, requested me much to accompany him this time for next operation upto Chittagong City. His area of operation was Fayez Lake one of the thickest Bihari centre where hundreds of innocent Bengalis were slaughtered. CO 32 Mahar did not want to leave me and I became a shuttle cock there with my troops. I did not accompany anyone till I got permission from my Sector Comd. En had been still shelling blindly. Last victim was Sub Mafiz EPR of Lt Mansoor's Coy, who died on the spot when shell landed by his side. Gen NIazi with his troops surrendered. Bangladesh was liberated.

Sd/- (Mahfuzur Rahman)
8 E Bengal
25 August, 1973.

১ নম্বর সেক্টরের যুদ্ধ বর্ণনা

[সাক্ষাৎকারঃ নায়েব সুবেদার মনিরুজ্জামান, ২৪ আগস্ট, ১৯৭৩]

৮ই মে সীমান্ত পার হয়ে ভারতে আশ্রয় নেই। হরিণাতে ২৪ ঘণ্টা অবস্থানের পর মেজর জিয়াউর রহমানের আদেশে শুভপুর অঞ্চলে বল্লভপুর এলাকায় আসি। শুভপুর-বল্লভপুরে পাকসেনাদের সাথে ২২ দিন যুদ্ধ চলে। এখানে মেজর জিয়াউর রহমান ও ক্যাপ্টেন ঘোষ (BSF) যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন।

সংবাদদাতার মাধ্যমে জানতে পারলাম যে, পাকিস্তানী সৈন্যরা আমাদের উপর আক্রমণ চালাবে। যুদ্ধের শেষদিন রাতে তিনটা থেকে আমাদের মর্টার মেশিনগান দিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে ফায়ার শুরু করতে বাধ্য হই। ভোর পাঁচটা থেকে আটটা পর্যন্ত আমাদের অন্যান্য ফোর্স শুভপুর হতে আমলীঘাট পর্যন্ত Defence Position ছাড়তে বাধ্য হয়। পাকিস্তানীদের Artiliery 105 mm-এর গোলা মধুগ্রাম-আমলীঘাটে বৃষ্টির মত পড়তে থাকে। আমাদের গোলাবারুদ শেষ করে আমরা সকাল নটায় ভারতের আমলীঘাট এলাকাতে একত্রিত হই। ভারতীয় সেনাবহিনীর একজন অফিসার ব্রিগেডিয়ার পাণ্ডের অধীনে আমাদের এক Conference হয়। মেজর জিয়াউর রহমান, ক্যাপ্টেন অলি ও অন্যান্য EPR বেঙ্গল রেজিমেন্টের JCO ও NCO এই Conference-উপস্থিত ছিলেন।

ব্রিগেডিয়ার পান্ডে বললেন যে, “আমার ৩০ বছরের চাকরি জীবনে অনেক বড় বড় যুদ্ধ দেখেছি, কিন্তু শুভপুরের যুদ্ধের মত কোথায়ও দেখিনি। মুক্তিফৌজদের চিন্তার কোন কারণ নেই। এ হল যুদ্ধের প্রথম অধ্যায়। দ্বিতীয়, তৃতীয় এখনো বাকি আছে। যুদ্ধের দ্বিতীয় অধ্যায় আপনাদেরকে সম্পন্ন করতে হবে। তৃতীয় অধ্যায়ে আপনারা অন্যের সাহায্য পেতে পারেন। বাংলাদেশের হিরো বনেগা তো মুক্তিফৌজ বনেগা। আওর কেছিকা হক নেহি হায়। খোদা হাফেজ, জয় বাংলা।”

মেজর জিয়াউর রহমান আমাদের সান্ত্বনা দেয়ার জন্য সন্ধ্যা পর্যন্ত আমাদের সাথে ছিলেন। সন্ধ্যাবেলায় আমাদেরকে ঘন জংগলের মধ্যে ক্যাম্প করা নির্দেশ দিয়ে তিনি চলে যান। ক্যাপ্টেন অলি আমাদের সাথে থেকে যান। এখানে কয়েকদিন অবস্থানের পর ছাগলনাইয়া থানার অন্তর্বতী চাঁদগাজি Sub-Sector গঠন করা হয়। এক Company সৈন্য এবং Mortar Platoon নিয়ে জুন মাসের প্রথম মাসের প্রথম সপ্তাহে ১/২ তারিখে আমরা চাঁদগাজিতে defence তৈরী করি। সেখান থেকে Commando Operation শুরু হয়ে যায়। ক্যাপ্টেন অলি Sub-Sector Commander-Second in Command ক্যাপ্টেন শহীদ শামসুল হুদা যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন-যিনি মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে সদয় ব্যবহার করতেন। তিনি অত্যান্ত দয়ালু ছিলেন। যে কোন Operation কে জয়যুক্ত করতে তিনি নিজের সৈন্যদের উদ্বুদ্ধ করতেন এবং আপ্রাণ পরিশ্রম করতেন।

চাঁদগাজি ডিফেন্সে থাকাকালীন পাকিস্তানী সৈন্যদের এক ব্যাটালিয়ান আমাদের উপর আক্রমণ করে (জুন মাসের ১৫ তারিখ)। সেই আক্রমণের দাঁতভাংগা জবাব দেয়া হয়। পাকিস্তানী সৈন্যরা পিছু হটে যায়। সেইদিন আমাদের একটা Artillery Battery ছিল। ১৬ই জুন পাকিস্তানী সৈন্যরা আবার এক ব্রিগেড সৈন্য নিয়ে আমাদের উপর আক্রমণ চালায়। কিন্তু পাকিস্তানীরা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাদের অনেক লোক হতাহত হয়। পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে তারা পিছু হটতে বাধ্য হয়। চাঁদগাজি দিঘীতে আমাদের Defence ছিল। দ্বিতীয় আক্রমণের দিন ভারতীয় সেনাবাহিনীর ব্রিগেডিয়ার সাবেক সিং উপস্থিত থেকে Command করেছিলেন।

১৬/১৭ই জুন পাকিস্তানী সৈন্যরা সকাল ৮টা থেকে তৃতীয়বার আক্রমণ শুরু করে। তৃতীয়বার আক্রমণে আমাদের Defence এর অবস্থানগুলোতে তারা fire করে। পাঁচটার সময় হেলিকপ্টারযোগে তারা আমাদের Defence- এর উপর “রেকী” আরম্ভ করে। তাদের একটা Commando Battalion হেলিকপ্টারযোগে আমাদের defence- এর তাদের সুবিধাজনক জায়গায় অবতরণ করাতে শুরু করে। তারা

দালালদের মাধ্যমে Propaganda করেছিল যে তাদের এক ব্যাটালিয়ন Commando তারা অবতরণ করাচ্ছে মুক্তিফৌজকে ধ্বংস করার জন্য। রাত বারটার সময় ক্যাপ্টেন শামসুল হুদার নির্দেশ অনুযায়ী Special Messenger আমাকে একটা চিঠি দেন। তাতে লেখা ছিল, এক ঘণ্টার মধ্যে position ছেড়ে কৃষ্ণনগর বাজারে report করতে- সমস্ত গোলাবারুদ শেষ করে কৃষ্ণনগরে যাবার জন্য এই Message পেয়ে ম্যাসেঞ্জারকে আমি গ্রেফতার করি এবং বললাম যে আমি নিজে শামসুল হুদার কাছে যাব এবং message clarify না করা পর্যন্ত তুমি এই জায়গা থেকে কোথাও যেতে পারবে না। আমি নিজে শামসুল হুদার সাথে সাক্ষাৎ করি। তিনি আমাকে বললেন, "এটা একটা আশ্চর্য ঘটনা। Defence ছাড়ার কথা আমি বলি নাই। ব্রিগেডিয়ার সাবেক সিং বলেছেন।"

আমার সন্দেহ হয়েছিল এটা পাকিস্তানী কোন গুপ্তচরের কাজ। ক্যাপ্টেন শামসুল হুদা টেলিফোনযোগে ব্রিগেডিয়ার সাবেক সিংকে বললেন যে আমাদের সৈন্যরা ডিফেন্স ছেড়ে যেতে রাজী নয়। এমতাবস্থায় আমি কি করব? ব্রিগেডিয়ার বললেন, সবার কাছে আমার অনুরোধ জানিয়ে দেন, তারা যেন অতি সত্বর নির্দিষ্ট স্থানে একত্রিত হয়ে যায়, আমি সকালে তাদের সাথে সাক্ষাৎ করব। এই আদেশ অনুযায়ী মুক্তিযোদ্ধারা কৃষ্ণনগরে পৌছে।

কৃষ্ণনগরে মেজর জিয়াউর রহমান উপস্থিত ছিলেন। তিনি একজন JCO- কে জিজ্ঞেস করলেন, Mortar Platoon ? সে বলল, এখানে আসে নাই। ঐ লোকটাকে জিয়াউর রহমান অত্যন্ত দুঃখের সাথে জিজ্ঞেসা করলেন, Mortar Platoon-কে ছেড়ে তোমরা কেন এসেছ? পরে আমি সেখানে পৌছলাম। জিয়াউর রহমান আমাকে জিজ্ঞেস করলেনম মুনীর, defence ছারতে কে বলেছে? আমি বললাম, জানি না স্যার। ক্যাপ্টেন হুদা মেজর জিয়াউর রহমানকে বললেন, স্যার, ভারতীয় সেনাবাহিনীর কমাণ্ডার আদেশে defence ছাড়তে হয়েছে। আপনি ব্রিগেডিয়ার সাবেক সিং-এর সাথে এ ব্যাপারে আলাপ করুন।

১৮ই জুন ব্রিগেডিয়ারের একজন সহকর্মী অফিসার কৃষ্ণনগরে আসেন এবং বলেন যে ব্রিগেডিয়ার সাহেব বিকেলে আসবেন। আপনার কোন চিন্তা করবেন না, সমস্ত সৈন্য নিয়ে আমরা পংবাড়ী চলে গেলাম। সেখানে কিছুক্ষণ অবস্থানের পর ব্রিগেডিয়ার সাবেক সিং, মেজর জিয়াউর রহমান, ক্যাপ্টেন রফিক, ক্যাপ্টেন অলি, ক্যাপ্টেন হুদা, ক্যাপ্টেন হামিদ পংবাড়ীতে আসেন। ব্রিগেডিয়ার সাবেক সিং প্রায় এক ঘণ্টা সেখানে সবার উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দেন। তিনি মর্টার কমাণ্ডোকে ডেকে পাঠান। ক্যাপ্টেন হামিদ আমাকে দেখিয়ে দেন। ব্রিগেডিয়ার আমাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, আব বহুত নারাজ হো গেয়া কেউ, লড়াই খতম নেহি হায়, বহুত লড়াই করনা হায়। হাম পাকিস্তানী কা হাত মে ঘেরা জোয়ান কো মারনে নেহি দেংগা। তিনি আমাদেরকে নানা উপদেশ দেন এবং ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণে বাংগালী অফিসারদের সাথে আলাপ-আলোচনা করেন। সেখানে আমাদের সাধারণ চা ও জলখাবার তিনি অত্যন্ত আনন্দের সাথে গ্রহন করেন। তিনি একজন বিখ্যাত ও বিচক্ষণ, সাহসী, বুদ্ধিমান ও প্রকৃত কমাণ্ডার হিসেবে পরিচয় দিয়েছিলেন।

পংবাড়ীতে আমরা বিশ্রাম নিচ্ছিলাম। পংবাড়ী থেকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে গেরিলা কায়দায় অপারেশন চলতে থাকে। ছাগলনাইয়া থানা এলাকায় জুন মাসের শেষভাগে রিষ্টমুখ/রিকশামুখ ক্যাম্প তৈরী করা হয়। এখানে অবস্থানকালীন গেরিলা যুদ্ধ চলতে থাকে। ১৪ই আগস্ট ভোর বেলায় তিনটার সময় আমরা ক্যাপ্টেন হুদার আদেশে একটা কমান্ডো অপারেশন-এর ব্যবস্থা গ্রহণ করি। আমার মর্টার প্লাটুন চাঁদগাজিতে পাকিস্তানী সৈন্যদের ঘাঁটি আক্রমণের পরিকল্পনা নেয়। ভোর ৭টা ৪০ মিনিটে আমার পায়ে একটা গুলি লাগে। তার ফলে আমার দ্বিতীয় ব্যক্তিকে দায়িত্ব দিয়ে আমি চিকিংসা গ্রহণ করতে চলে যাই। সেইদিন পাক বাহিনীর মারাত্মক ক্ষয়ক্ষতি হয়। এই যুদ্ধের খবর বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল।

২৬শে আগস্ট পাকিস্তানীরা ছাগলনাইয়া থানার আমজাদহাটে প্রতিরক্ষাব্যূহ তৈরী করে। মুক্তিযোদ্ধারা মর্টার প্লাটুনের সাহায্যে তাদের উপর গোলাবর্ষন করে। পাকিস্তানীদের বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হয়। তারা মুহুরী নদী পার হয়ে

খাদ্যদ্রব্য অস্ত্রশস্ত্র ফেলে পিছু হটতে থাকে। গুতুমা, পরশুরাম, ছাগলনাইয়া অঞ্চলে এইভাবে যুদ্ধ চলতে থাকে। আমরা বিলেনিয়া এলাকাতে সোনাছড়ি ক্যাম্প স্থাপন করি। অক্টোবর মাসের ২০ তারিখে ১ নং সেক্টর কমাণ্ডার মেজর রফিক সাহেবের আদেশে আমাকে Artillery OP, ভারতীয় সেনাবাহিনীর ৫৭ মাউন্টেন রেজিমেন্টে রিপোর্ট করতে হয়। সেখানে তিনদিন তাদের কমাণ্ড প্রসিডিউর শিক্ষা নিতে হয়। ২৪শে অক্টোবর আমাকে অবজারভার ডিউটিতে পাঠানো হয়। সেটা হলো করেরহাটে পাক বাহিনীর সৈন্য অবস্থান, তার উপর আর্টিলারীর ফায়ার করানো-রাত দুইটার সময় নয়টিলা অঞ্চল এলাকা থেকে ভোর ছটা থেকে আর্টিলারীর ফায়ার করানো- রাত দুইটার সময় নয়টিলা অঞ্চল এলাকা থেকে ভোর ছটা থেকে আর্টিলারী ফায়ার শুরু করানো হয়। পাকিস্তানীদের অবস্থানগুলোর উপর প্রথম মিডিয়াম রেজিমেন্টের ফায়ার আরম্ভ হয়। তখন আর্টিলারী কমাণ্ডিং অফিসার বলেছেন, আজ পাকিস্তানী কো মন এয়াদ আগেয়া।

আমার দায়িত্ব শেষ করে ২৪ ঘণ্টা পরে আর্টিলারী কমাণ্ডারের কাছে পৌছি। কমাণ্ডিং অফিসার, ব্রিগেড কমাণ্ডার মেজর জেনারেল, সেক্টর কমাণ্ডার সবাই আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। আমার সাথে সাক্ষাৎ হলে তারা আমাকে জিজ্ঞেস করেন এই কাজ সমাধা করতে আমার অসুবিধার কথা। পথে আমার অসুবিধার কথা তাদের কাছে বর্ণনা করলাম। সবকিছু বর্ণনা করা এখানে সম্ভব নয়।

ব্যাটারী কমাণ্ডার মেজর ওয়াতর সিং, ক্যাপ্টেন বি, কে, ফালিয়া, মেজর চৌধুরী তাঁদের সাথে অবস্থান করতে থাকি। তাঁরা আমাকে সর্বতোভাবে সাহায্য, সহযোগিতা করেছেন। মুক্তিযুদ্ধেও তাঁরা আমাদেরকে অনেক সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন। ১০ই নভেম্বরে মুন্সিরহাট ও ফুলগাজী এই সমস্ত এলাকার যুদ্ধে পরশুরাম থানার অন্তর্গত অঞ্চলে মুক্তিযোদ্ধা ও ভারতীয় বাহিনীর প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছিল। কিন্তু পাক বাহিনী কোথা থেকে আক্রমণ চালাচ্ছে তার সঠিক কোন হদিস পাওয়া যাচ্ছিল না। তাদের অবস্থান সম্বন্ধে জানতে চেষ্টা করলে একমাত্র OP ছাড়া কোন উপায় নেই। কমাণ্ডিং অফিসার সিদ্ধান্ত নিলেন পাক বাহিনীর অনুসন্ধান নিতে হবে। তিনি আমার কাছে জিজ্ঞেস করলেন, মনির সাব, কেয়া হোগা। আমি বললাম, আপনি আমাকে একটা অর্য়ারলেস নিয়ে আবার আদেশ দেন, আমি যাব। তিনি বললেন, আপনার জীবনের ঝুঁকি কে নেবে? আমি নিজেই ঝুঁকি নিয়ে যাব বলে বললাম। তিনি আমাকে বলেন নিজের ঝুঁকির কথা কাগজে লিখে দেয়ার জন্য। তিনি আমাকে একা যেতে দিলেন না। তারপর আমরা Op group চলে গেলাম সিদ্ধিনগর। একটা বৃক্ষের উপর রাত বারটা থেকে ভোর ছটা পর্যন্ত পাকিস্তানীদের অবস্থান জানার জন্য বসে থাকি। কিন্তু কোন সন্ধান না পেয়ে শেষ পর্যন্ত সেখান থেকে চলে গেলাম খেদাবাড়ী-সৌভাগ্যবশত সেখান থেকে একটা উঁচু বৃক্ষ দেখতে পাই। তার উপর উঠলে মুন্সিরহাট পরিস্কার দেখা যায়।

১৬ নভেম্বর আমরা Artillery target record করছিলাম। দেখতে পেলাম ফেনী হতে একটা ট্রেন পরশুরামের দিকে যাচ্ছে। ট্রেনটা দেখে আমাদের অনেক সাহায্য হয়েছে। গাড়ী উত্তরদিকে যাচ্ছে। আমাদের কাজ অব্যাহত থকে। Gun ranging অবস্থায়। বোমা রেলওয়ে লাইনের উপর পড়ে। রেল লাইনের একটা fish plate নষ্ট হয়ে যায়। ট্রেনটা যখন ফেরত আসে তখন ওখানে এসে তিনটা বগি পড়ে যায়। ওটা দেখে আমরা আশ্চর্য হয়ে যাই। পুরনো মুন্সিরহাটে পাকিস্তানীদের Artillery gun position-এ মিত্রবহিনীর গোলার আঘাতে gun position ও চালক উভয়েই ধ্বংস হয়।

১৭ই নভেম্বর ভোর থেকে পাকিস্তানীরা মুন্সিরহাট, ফুলগাজী,পরশুরাম অঞ্চল ছেড়ে ফেনীর দিকে চলে যেতে বাধ্য হয়। ১৮ই নভেম্বর ফুলগাজী মুক্তিযোদ্ধাদের দকলে আসে। পাক বাহিনী ফেনী অঞ্চল থেকে long range কামানের সাহায্যে আত্মরক্ষা fire করে। এদিকে পরশুরাম অঞ্চলে পাক বাহিনীর ৬০/১০০ সৈন্য কয়েকজন অফিসারসহ মুক্তিযোদ্ধা ও মিত্রবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে। পাকিস্তানী সৈন্যগণ ফেনী থেকে আর্টিলারী আক্রমণ অব্যাহত রাখে। ১লা ডিসেম্বর পর্যন্ত এভাবে যুদ্ধ চলতে থাকে।

আমি ২৭শে নভেম্বর নিজের সেক্টরে ফেরত আসি। বর্তমানে নিজের মর্টার প্লাটুনের দায়িত্ব গ্রহণ করি। মুন্সিরহাটের দক্ষিণে পাঠাননগরে অবস্থান করি। আমরা চট্রগ্রামের দিকে অগ্রসর হতে থাকি। ৩১ নম্বর জাঠ রেজিমেন্ট করেরহাট থেকে চট্রগ্রামের দিকে অগ্রসর হতে থাকে।

আমরা জোরারগঞ্জ, মিরশ্বরাই, সীতাকুণ্ড, বারবকন্ড, কুমিরা, ছোট কুমিরাতে ১৪ই ডিসেম্বর সাতে ১২ ঘণ্টা অবস্থান করি। ১৫ তারিখ ভোর ৩ টা থেকে অগ্রগতি শুরু হয়। সকল ৭টার সময় কুমিরা পৌছি। এখানে পাকিস্তানীদের সাথে তুমুল যুদ্ধ হয়। ৫৬টা আর্টিলারী গান-এর সাহায্যে আমাদের অগ্রগতি অব্যাহত থাকে। বেলা ৮টার সময় কুমিরা টি বি হাসপাতাল পর্যন্ত পৌছলে পাকবাহিনী আত্মরক্ষা ফায়ার আরম্ভ করে, যার ফলে মিত্র বাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর অনেকে হতাহত হয়।

১৫ই ডিসেম্ভর বারটার সময় পাক বাহিনী আমাদের ওপর পাল্টা আক্রমণের প্রস্ত্তিতি নেয়। রেকি গ্রুপ ধরা পড়ে। জাঠ রেজিমেন্টের মর্টারের ফায়ার। শেষবারের মত জোয়ানরা ইচ্ছামত ফায়ার করে জয়যুক্ত হন। পাক বাহিনীর ঘাঁটিগুলোর ক্ষতিসাধন হয়। মেজর এ্যাডজুট্যান্ট ৩১ জাঠ রেজিমেন্ট সংবাদ পাঠালেন- মুক্তিবাহিনীকে মোবারকবাদ জানালেন।

১৬ই ডিসেম্বর শুক্রবার পাক সেনারা আত্মসমর্পণ করে চট্রগ্রামম, কুমির, সীতাকুন্ডে। চট্রগ্রামে মুক্তিবাহিনী উল্লাসে ফেটে পড়ে।

স্বাক্ষর /- (এন, এম, মুনীরুজ্জামন)
২৪-৮-৭৩

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩। ২নম্বর সেক্টর ও ’কে ফোর্সের যুদ্ধের বিবরণ।	সাক্ষাৎকারঃ ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ ১৯৭৪-১৯৭৫	.... ১৯৭১

সামগ্রিকভাবে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য আমি আমার যুদ্ধের এলাকাকে কয়েকটি সাব-সেক্টর-এ বিভক্ত করে নেই। আমার সাব-সেক্টরগুলি নিম্নলিখিত জায়গায় তাদের অবস্থান গড়ে তোলে।

(ক) গঙ্গাসাগর, আখাউড়া এবং কসবা সাব-সেক্টরঃ এর উপ-অধিনায়ক ছিলেন ক্যাপ্টেন আইনউদ্দিন। তার সঙ্গে ছিল লেঃ ফারুক, ক্যাপ্টেন মাহবুব এবং সেকেন্ড লেঃ হুমায়ুন কবির। এখানে ৪র্থ বেঙ্গলের ডেলটা কোম্পানী এবং ই, পি, আর-এর দুটি কোম্পানী ছিল। এদর সঙ্গে মর্টারের একটা দল ছিল। এই সাব-সেক্টর কসবা, আখাউড়া, সাইদাবাদ, মুরাদনগর, নবীনগর, ব্রাক্ষ্মণবাড়িয়া পর্যন্ত তাদের অপারেশন চালাত।

(খ) দ্বিতীয় সাব-সেক্টর ছিল মন্দভাগেঃ এর উপ-অধিনায়ক ছিলেন ক্যাপ্টেন গাফফার (বর্তমানে মেজর)। তার অধীনে চালি কোম্পানী এবং একটা মর্টারের দল। এ দলটি মন্দভাগ রেলওয়ে স্টেশন হতে কুটি পর্যন্ত তাদের অপারেশন চালাতো।

(গ) তৃতীয় সাব-সেক্টরে ছিল শালদা নদীঃ এর উপ-অধিনায়ক ছিলেন মেজকর আবদুস সালেক চৌধুরী (মরহুম)। এর অধীনে এ কোম্পানী এবং ই, পি ,আর-এর একটা কোম্পানী ছিল। এ দলটি শালদা নদী, নয়নপুর এবং বুড়িচং এলাকা পর্যন্ত তাদের অপারেশন চালাতো।

(ঘ) চতুর্থ সাব-সেক্টরে ছিল মতিনগরেঃ কমান্ডে ছিল লেঃ দিদারুল আলম। হেডকোয়ার্টার কোম্পানীর কিছুসংখ্যক সৈন্য এবং ই, পি, আর-এর একটা কোম্পানী গেমতীর উত্তর বাঁধ থেকে কোম্পানীগঞ্জ পর্যন্ত এই সাব-সেক্টরে অপারেশন চালাতো।

(ঙ) সগেমতীর দক্ষিণে ছিল নির্ভয়পুর সাব-সেক্টরঃ এর উপ-অধিনায়ক ছিলেন ক্যাপ্টেন আকবর এবং লেঃ মাহবুব। এ দলটির অপারেশন কুমিল্লা থেকে চাঁদপুর এবং লাকসাম পর্যন্ত ছিল।

(চ) রাজনগর সাব-সেক্টর ছিল সর্বদক্ষিণেঃ এ সাব-সেক্টরের উপ-অধিনায়ক ছিলেন ক্যাপ্টেন জাফর ইমাম, ক্যাপ্টেন শহীদ এবং লেঃ ইমামুজ্জামান। এই সাব-সেক্টর বেলুনিয়া, লাকসামের দক্ষিণ এলাকা এবং নোয়াখালীতে অপারেশন চালোতো। এই সাব-সেক্টরে ৪র্থ বেঙ্গল-এর ’বি’ কোম্পানী, ই, পি, আর-এর ১টি কোম্পানী ও গণবাহিনীর লোক নিয়ে তৈরী এক সদ্যগঠিত কোম্পানী। জুলাই মাসে পাকিস্তানী সেনারা কসবা এবং মন্দভাগের পুনঃদখলের প্রস্ত্ততি নেয় এবং কুটিতে ৩১তম বেলুচ রেজিমেন্টের বাহিনী এবং গোলন্দাজ বাহিনী সমাবেশ করে। ক্যাপ্টেন গাফফারের অধীনে মন্দভাগ সাব-সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধারা শত্রুসেনাদের মোকাবেলার জন্য তৈরী ছিল। জুলাই মাসের ১৯ তারিখে শত্রুসেনার একটি কোম্পানী নিয়ে শালদা নদীতে নৌকাযোগে অগ্রসর হয়। সুবেদার ওহাবের নেতৃত্বে মন্দভাগ সাব-সেক্টরের একটা প্লাটুন মন্দভাগ বাজারের নিকট শত্রুদের এই অগ্রবর্তী দলটির উপর প্রচন্ড আঘাত হানে। এ সংঘর্ষে শত্রুসেনারা সম্পূর্ণ হতবুদ্ধি হয়ে যায়। শালদা নদীর তীর থেকে সুবেদার ওহবের প্লাটুনটি শত্রুসেনার উপর অতর্কিত আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণে অন্ততঃপক্ষে ৬০/৭০ জন লোক হতাহত হয় এবং অনেকেই নদীত ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ হারায়। এই আক্রমণে ৪র্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈন্যরা ৩১তম বেলুচ রেজিমেন্টের অধিনায়ক কর্নেল কাইয়ুম, ৫৩ তম গোলন্দাজ বাহিনীর কুখ্যাত অফিসার ক্যাপ্টেন বোখারী, আরো তিন-চারজন অফিসার এবং ৮/১০ জন জুনিয়ার

* খালেদ মোশাররফ একাত্তরের মার্চে ৪র্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টে সেকেন্ড-ইন-কমান্ড হিসাবে মেজর পদে ছিলেন

অফিসার প্রাণ হারায়। ক্যাপ্টেন বোখারী ২৫শে মার্চের পর থেকে কুমিল্লা শহরে অনেক হত্যাকান্ডের জন্য দায়ী ছিল। তার মৃত্যুতে কুমিল্লাবাসীরা অত্যন্ত আনন্দিত হয়। শত্রুসেনারা শালদা নদীতে এই বিরাট পর্যুদস্তের পর তাদের বাহিনীকে পিছু হটিয়ে কুটিতে নিয়ে যায়। এবং আমি আমার ঘাঁটি মন্দভাগ ও শালদা নদীতে আরো শক্ত করে তুলি।

পাকিস্তানের ঢাকা-চট্রগ্রাম রেলওয়ে লাইন সম্পর্কে জেনারেল টিক্কা খাঁ দম্ভ করে ঘোষণা করেছিল যে ওটা জুলাই মাসের মধ্যে খুলবে। তার সেই আশা চিরতরে ধূলিসাৎ হয়ে যায়। পাকিস্তান আমলে এই রেললাইনে ট্রেন চলেনি। ইতিমধ্যে জুলাই মাসে আমি খবর পাই যে, পাকবাহিনী বেলুনিয়াতে ঢোকার চেষ্টা করছে। আমি ক্যাপ্টেন জাফর ইমামকে নির্দেশ দেই যেন তাদেরকে ঢুকতে বাধা দেওয়া হয়। এসময় ক্যাপ্টেন জাফর ইমাম ছাগলনাইয়াতে পাকবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। পাকবাহিনী ছাগলনাইয়ার উপরে ফেনীর দিক থেকে চট্রগ্রাম সড়কের উপর আক্রমণ চালায়। এ আক্রমণে তাদের ২০/২৫ জন লোক হতাহত হয়। শত্রুসেনারা পিছু হটে যায়। কিন্তু তার কয়েকদিন পরে পাকসেনারা ছাগলনাইয়ার দক্ষিণ থেকে ফেনী-চট্রগ্রাম পুরনো রাস্তায় অগ্রসর হয়। এবং ক্যাপ্টেন জাফর ইমামের সৈনিকদের উপর অতর্কিত আক্রমণ চালায়। আমাদের কিছুসংখ্যক হতাহত হওয়ায় এবং শত্রুদের গোলার মুখে টিকতে না পেরে ক্যাপ্টেন জাফর ইমাম আমার কাছে পরবর্তী কর্মপন্থার নির্দেশ চেয়ে পাঠান। আমি ক্যাপ্টেন জাফর ইমামকে বলি ছাগলনাইয়া থেকে তার সৈন্যদের সরিয়ে বেলুনিয়ার সাব-সেক্টর রাজনগরে আনার জন্য। আমাদের এই মুভে বেলুনিয়াতে অবস্থিত শত্রুসেনারা ঘিরে যাওয়ার আতঙ্কে বেলুনিয়া থেকে ফেনীতে পশ্চাদপসরণ করে এবং ফেনীতে তাদের প্রধান ঘাঁটি গড়ে তোলে। বেলুনিয়া শত্রুমুক্ত হওয়ায় আমি বেলুনিয়াকে শত্রকরণ থেকে মুক্ত রাখার দৃঢ়মনস্থ করি। ক্যাপ্টেন জাফর ইমামকে বান্দুয়াতে (ফেনী থেকে ২ মাইল উত্তরে) এবং ইমামুজ্জামানকে তাদের নিজ নিজ কোম্পানী নিয়ে প্রতিরক্ষাব্যূহ তৈরী করার জন্য নির্দেশ দেই। বান্দয়াতে সম্মুখবর্তী অবস্থান গড়ার পথ মুন্সিরহাটে ক্যাপ্টেন জাফর ইমামের অধীনে আমার সেনাদল বেশ মজবুত প্রতিরক্ষাব্যূহ গড়ে তোলে। বেলুনিয়া একটি ১৭ মাইল লম্বা এবং ১৬ মাইল চওড়া বাঙ্ক। এই বেলুনিয়াতে আমরা যে প্রতিরক্ষা ঘাঁটি গড়ে তুলি সে প্রতিরক্ষাব্যূহকে ধ্বংস করার জন্য পাকসেনারা এর পর থেকে যথেষ্ট চেষ্টা চালিয়ে যায়। পরবর্তীকালে অনেক যুদ্ধে তাদের বিপুল ক্ষয়ক্ষতি এবং সৈন্য হতাহত হয়। বেলুনিয়া সেক্টর পাকসেনাদের জন্য ভয়ংকর বিভীষিকা রূপ ধারণ করে। এর সঙ্গে সঙ্গে এই স্থানের জনসাধারণও যথেষ্টে ক্ষয়ক্ষতি এবং কষ্ট স্বীকার করে। এখানকার জনসাধারণের কষ্টকে ভাষার বর্ণনা করা যায় না। পাকবাহিনীর গোলার আঘাতে প্রতিটি বাড়ি প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় ও অনেক নিরীহ লোক মারা যায়। কিন্তু স্থানীয় জনসাধারণ কোনদিনও তাদের মনোবল হারায়নি। যুদ্ধ যতদিন চলে ততদিনই তারা মুক্তিবাহিনীর অসামরিক ব্যবস্থাপনায় হাসিমুখে সাহায্য করে। অনেকক্ষেত্রে তারা সেনাবাহিনীর সাথে সাথে রক্ষাব্যূহকে শক্তিশালী করার জন্য পরিখা খননে ও অন্যান্য কাজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাহায্যে করে। মে মাসে আমাদের মুন্সিরহাট ডিফেন্স এবং বান্দুয়ার অবস্থানটি বেশ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এ জায়গাটি আমরা এজন্যে প্রতিরক্ষা ঘাঁটির জন্য মনোনীত করেছিলাম। জায়গাটার সামনে কতগুলো প্রাকৃতিক বাধাবিঘ্ন ছিল যেগুলি শত্রুসেনার অগ্রসরের পথে বিরাট বাধার বিরাট বাধাস্বরূপ। এতে শত্রুসেনাদের নাজেহাল করার যথেষ্ট সুযোগ ছিল। আমাদের অবস্থানটি দুহরী নদীর পাশ ঘেঁষে পশ্চিমদিক থেকে ছিলোনিয়া নদীকে ছাড়িয়ে পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ব্যূহটি কমপক্ষে ৪ মাইল চওড়া ছিল। আমরা এই অস্থানটি এইভাবে পরিকল্পনা করেছিলাম যে, শত্রুসেনাদের বাধ্য হয়ে আমাদের ঘাঁটি আক্রমণ করার সময় প্রতিরক্ষার শুধু সামনে ছাড়া আর কোন উপায়ে আসার রাস্তা ছিল না। এ পরিকল্পনা অনুযায়ী শত্রুসেনাদের আসার মনোনীত জায়গাগুলোতে এলে সবচেয়ে বেশী ধ্বংস করা যায়। পরবর্তীকালে আমাদের এই পরিকল্পনা ঠিকই কাজে লেগেছিল। যেসব জায়গা দিয়েই শত্রুরা আসার চেষ্টা করেছে যথেষ্ট হতাহত হয়েছে। এই সেক্টরে প্রথমে আমাদের সৈন্যসংখ্যা ছিল দুঃকোম্পানী (৩০০ জনের মত) এবং কিছুসংখ্যক গণবাহিনী। শত্রুসংখ্যা আমাদের চেয়ে সব সময় বেশী ছিল এবং এছাড়া শত্রুদের ছিল শক্তিশালী অস্ত্র, গোলাবারুদ, বিমান বাহিনী ও ট্যাংক। আমাদের মুন্সিরহাটে প্রধান ঘাঁটি সম্বন্ধে শত্রুদের ধোঁকা দেওয়ার জন্য বন্দুয়া রেলওয়ে স্টেশনের কাছে ছিলোনিয়া নদীর উপর একটি অগ্রবর্তী স্থাপনের নির্দেশ

দেই। এটা ছিল একটি ডিলেয়িং পজিশন। এ পজিশনের সামনে রাস্তা ও রেলের সেতুগুলি ধ্বংস করে দেয়া হয় যাতে শত্রুদের অগ্রসরে আরো বাধার সৃষ্টি হয়। শত্রুসেনার সম্ভবত অগ্রসরের রাস্তার পশ্চিম এবং পূর্ব পার্শ্বে রাস্তার দিকে মুখ করে আমরা বেশ কতগুলো উঁচু জায়গায় এবং পুকুরের উঁচু বাঁধে শক্ত এবং মজবুত বাঙ্কার তৈরী করি এবং তাতে হালকা মেশিনগান এবং মেশিনগান লাগিয়ে দেই। এ ছিল একরকমের ফাঁদ যাতে একবার অবস্থানের ভিতরে অগ্রসর হলে দু'পাশের গুলিতে শত্রুসেনারা ফিরে যেতে না পারে। এসব বাঙ্কার এমনভাবে লুকোনো ছিল যে সম্মুখ থেকে বোঝার কোন উপায় ছিল না।

৭ই জুনের সকাল। আমরা জানতে পারলাম শত্রুসেনারা ফেনী থেকে বেলুনিয়ার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। ১০টার দিকে জন্দুয়ার আশেপাশে শত্রুসেনারা এসে জমা হতে লাগল এবং প্রথমবারের মত আমাদের পজিশনের উপর গোলাগুলি চালাতে লাগল। আমার নির্দেশ ছিল যে শত্রুদের এই গোলাগুলির কোন জবাব যেন না দেয়া হয়। শত্রুসেনারা বন্দুয়া সেতুর উপর একটা বাঁশের পুল নির্মাণ করে যেমনি পার হওয়ার চেষ্টা করছিল, ঠিক সে সময় আমাদের অগ্রবর্তী ডিলেয়িং পজিশনের বীর সৈনিকরা তাদের উপর গুলি চালায়। এতে প্রথম সারিতে যেসব শত্রুসেনা সেতু অতিক্রম করার চেষ্টা করে তারা সবাই গুলি খেয়ে পানিতে পড়ে যায়। এ পর্যায়ে শত্রুসেনাদের অন্তত ৪০/৫০ জন লোক হতাহত হয়। এরপর শত্রুসেনারা পিছে হটে যায়। কিছুক্ষণ পর আবার প্রবল গোলন্দাজ বাহিনীর সহায়তায় তীব্র আক্রমণ চালায়। আমাদের ডিলেয়িং পজিশনের সৈনিকরা শত্রুদের আরো বহুসংখ্যক লোক হতাহত করে বীরত্বের সাথে আক্রমণ প্রতিহত করতে থাকে কিন্ত আক্রমণ যখন আরও তীব্ররূপ ধারণ করে ডিলেয়িং পজিশনকে তারা পরিত্যাগ করে প্রধান ঘাঁটি মুন্সিরহাটে পিছু হটে আসে। শত্রুরা কিছুটা সফলতা লাভ করায় আরো প্রবল বেগে সামনের দিকে অগ্রসর হতে থাকে এবং ছিলোনিয়া নদী পর্যন্ত অগ্রসর হয়। এখানে এসে তারা নদী পার হওয়ার সকল প্রস্তুতি নেয়। আমাদের প্রধান ঘাঁটি থেকে ৮০০ গজ সামনে আনন্দপুর নামক গ্রামে শত্রুসেনারা তাদের সমাবেশ ঘটাতে থাকে। নদী পার হয়ে আমাদের আক্রমণ করার জন্য শত্রুরা সকল প্রস্তুতি নিতে থাকে। নদী পার হবার পূর্ব মুহূর্তে কামানের সাহায্যে আমাদের ঘাঁটির উপর তারাপ প্রবল আক্রমণ আরম্ভ করে। তারা বৃষ্টির মত গোলা আমাদের অবস্থানের উপর ছুড়ছিল। এ আকস্মিক আক্রমণ চালানোর উদ্দেশ্য আমরা ভালভাবেই বুঝতে পারছিলাম। এই সুযোগে পাকসেনারা নদী পার হবার জন্য নৌকা এবং বাঁশের পুলের সাহায্যে এগিয়ে আসতে থাকে। যদিও আমরা শত্রুদের কামানের গোলায় যথেষ্ট বিপর্যস্ত ছিলাম তবুও মানসিক দিক দিয়ে আমাদের সৈন্যদের মনোবল ছিল বিপুল। ওদের বেশসংখ্যক সৈন্য নদী পার হয়ে আমাদের অবস্থানের ২০০/৩০০ গজ ভিতরে চলে আসে এবং কিছুসংখ্যক তখনও নদী পার হচ্ছিলো। ঠিক সেই সময়ে আমাদের মর্টার এবং মেশিনগান গর্জে ওঠে। আমাদের এ অকস্মাৎ পাল্টা উত্তরে শত্রসেনারা অনেক হতাহত হতে থাকে। তবুও তারা বাধাবিপত্তি ডিঙ্গিয়ে প্রবল বেগে অগ্রসর হতে থাকে। আর আমাদের সৈনিকরাও তাদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করতে থাকে। তবুও তারা নিঃসহায় অবস্থাতে ও দক্ষতার সাথে অগ্রসর হতে থাকে। কিন্ত আল্লাহ হয়ত ওদের সহায় ছিলেন না। এ সময়ে তারা আমাদের সামনের মাইন ফিল্ডের মুখে এসে পড়ল। তাদের পায়ের চাপে একটার পর একটা মাইন ফাটতে আরম্ভ করল। আমাদের চোখের সামনে অনেক শত্রুসেনা তুলোর মত উড়ে যেতে লাগল। আমাদের গোপনে অবস্থিত পাশের মেশিনগানগুলির বৃষ্টির মত গুলি ও মাইনের আঘাত তাদের মধ্যে একটা ভয়াভহ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে। শুধু কয়েকজন শত্রু এসব বাধাবিপত্তির মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে আমাদের কয়েকটি অগ্রবর্তী বাঙ্কারেস সামনে পর্যন্ত পৌছায়, কিন্ত আমাদের সৈনিকরা গ্রেনেড হাতে তাদের জন্য প্রস্তুত ছিল এবং তারা সেখানেই আমাদের গ্রেনেডের মুখে ধ্বংস হয়। এই বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে শত্রুনারা আর সামনে এগোতে পায়নি। যারা পিছনে ছিল তারাও সংকটজনক অবস্থা এবং ভয়াবহতা বুঝতে পেরে পিছনে দিকে পলায়ন করতে শুরু করে। শত্রুসেনাদের পালাতে দেখে আমাদের সৈনিকরাও উল্লাসে চেঁচিয়ে ওঠে এবং আরো প্রবল গতিতে তাদের গুলি করে মারতে থাকে। আমাদের মর্টারও পশ্চাদপসরণরত শত্রুদের ওপর অনবরত আক্রমণ চালিয়ে তাদের হতাহত করতে থাকে। আমাদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পেয়ে ওদের খুব কম সৈন্য ছিলোনিয়া নদীর অপর পারে পিছু হটে যেতে সক্ষম হয়। এ সময়ে আমাদের উপর শত্রুসেনারা অনবরত কামানের গোলা চালিয়ে যাচ্ছিল

যাতে তাদের বিপর্যস্ত ও পর্যুদস্ত যে সমস্ত অবশিষ্ট সৈনিক ছিল তারা নিরাপদে আরো পশ্চাৎঘাঁটি অনন্দপুর পর্যন্ত পৌছতে পারে। এর কিছু পরে দুটোর সময় তাদের গোলন্দাজ বাহিনীর গোলাগুলি বন্ধ হয়ে যায়। সমস্ত যুদ্ধক্ষেত্রে নীরবতা নেমে আসে। আমরা কিছুক্ষণ আবার তাদের পুনঃআক্রমণের জন্য অপেক্ষা করতে থাকি, কিন্তু পরে জানতে পাই যে তাদের অবস্থা সত্যি বিপর্যস্ত এবং তাদের মনোবল একেবারেই ভেঙ্গে গেছে। পুনঃআক্রমণের শক্তি আর তাদের নেই। সমস্ত যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের অন্ততঃপক্ষে ৩০০ জনের মৃতদেহ পাওয়া যায় এবং ছিলোনিয়া নদীতে কত ভেসে গেছে সেটারও হিসাব আমরা পাই না। পরে জানতে পারি যে পাকিস্তানীরা একটা ব্যাটালিয়নের চেয়েও বেশী সৈন্যদল নিয়ে এ আক্রমণ চালিয়েছিল এবং এ ব্যাটিলিয়নের ৬০ ভাগের মত লোক নিহত বা আহত হয়েছে। এদের অনেকের কবর এখনও ফেনীতে আছে।

এর পর থেকে শত্রুসেনারা আনন্দপুরে স্থায়ী ঘাঁটি করার জন্য বাঙ্কার খোড়ার কাজ করে দিল। আস্তে আস্তে ওদের সৈন্যসংখ্যাও বেড়ে যেতে লাগল। আমরা খবর পেলাম ওর প্রচুর অস্ত্র এবং নতুন সৈন্য চট্রগ্রাম এবং ঢাকা থেকে এনে সমাবেশ করছে। সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর কামান ও ট্যাঙ্ক তারা নিয়ে এসেছে। ৭ই জুনের বেলুনিয়া যুদ্ধের পর তাদের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এবং হতাহতের সংখ্যা দেখে পাকিস্তানীরা বুঝতে পেরেছিল যে আমি এই জায়গাতে তাদের সঙ্গে আবার সম্মুখ সমরে যুদ্ধের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং সেজন্য আমার পরিকল্পনা অনুযায়ী তাদেরকে আমি ফাঁদে ফেলার জন্য তৈরী ছিলাম। পাকসেনারা আমার পরিকল্পনা অনুযায়ী অগ্রসর হয়ে সে ফাঁদে পা দিয়ে যথেষ্ট ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিল। সে কারণে ভবিষ্যতে তারা যাই করুক খুব সতর্কতার সাথে কাজ করার প্রস্ত্তুতি নিতে থাকে। বিলুনিয়ার বিপর্যয় পাকিস্তানী সেনাদের সবাইকে বিচলিত করে তোলে। তারা এই সিদ্ধান্ত নেয়, যে কোন উপায়ে বেলুনিয়াকে পুনর্দখল করতেই হবে। তাই তাদের সৈন্য সমাবেশ চলতে থাকে। জেনারেল আব্দুল হামিদ খান, চীফ অফ স্টাফ স্বয়ং জুলাই মাসে ফেনীতে আসেন বেলুনিয়া যুদ্ধের প্রস্ত্তুতি এবং পরিচালনার জন্য। আমি আমার প্রতিরক্ষার অবস্থান আরও শক্তিশালী করার চেষ্টা করি। মন্দভাগ থেকে ক্যাপ্টেন গাফফারকে চতুর্থ বেঙ্গল রেজিমেন্ট-এর ’সি’ কোম্পানী নিয়ে এবং আর কিছু মর্টার নিয়ে বেলুনিয়া সেক্টরে গিয়ে প্রতিরক্ষাব্যূহ আরো শক্তিশালী করে তোলার নির্দেশ দেই। যেহেতু আমার কাছে আর কোন সৈন্য ছিল না, তাই আমি এ তিনটা কোম্পানী দিয়ে জাফর ইমামকে শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য তৈরী থাকার নির্দেশ দেই। শত্রুরা আমাদের প্রতিরক্ষা থেকে মাত্র ৮০০ গজ দূরে গতিয়ানালার অপর পারে তাদের প্রস্ত্তুতি চালিয়ে যাচ্ছিল। উভয়পক্ষে অনবরত গোলাগুলি বিনিময় হত, আর তাছাড়া শত্রুদের গোলন্দাজ বাহিনী আমাদের ঘাঁটির উপর অবিরাম শেলিং চালিয়ে যেত। আমাদের সৈনিকদের বাঙ্কার ছেড়ে বাইরে চলাফেরার উপায় ছিল না। কিন্তু শত্রুর এই গোলাগুলির এবং আর্টিলারী ফায়ারিং-এর মধ্যেও আমাদের বীর বঙ্গশার্দুলরা তাদের মনোবল হারায়নি এবং এতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। তারা এ গোলাগুলিকে যুদ্ধক্ষেত্রেও বাজনার মত মনে করত। মাঝে মাঝে আমাদের সৈনিকরা পরিত্যক্ত মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে শত্রুদের অনেক হতাহতও করত এবং অনেক সময় ১০৬ মিলিমিটার ট্যাঙ্কবিধ্বংসী কামানের সাহায্যে তাদের বাঙ্কার উড়িয়ে দিয়ে আসত। এসব আকস্মিক আক্রমণাত্মক কার্যে শত্রুরা যথেষ্ট ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ত এবং তাদের যথেষ্ট হতাহত হত। তারপরই তারা শুরু করত গোলান্দাজ বাহিনীর সাহায্যে অবিরাম বৃষ্টির মত গোলাগুলি। এভাবে জুলাই মাসের ১৭ তারিখ পর্যন্ত চলল। পাকিস্তানীদের যুদ্ধের প্রস্ত্তুতি দেখে ঐ এলাকার জনমনে যথেষ্ট ত্রাসের সৃষ্টি হয়। প্রথমবারের আক্রমণে যদিও জনসাধারণের বেশী ক্ষতি হয়নি, সেহেতু সেবার শত্রুসেনারা ছিল আমাদের হাতে পর্যুদস্ত। যুদ্ধের বিভীষিকা তারা প্রত্যক্ষভাবে সেবার দেখেছিল কিন্তু এবারের পাকবাহিনীর প্রস্ত্তুতির খবরের সত্যি তারা চিন্তিত হয়ে পড়েছিল। এ সময় ছিল ভরা বর্ষা। সব জায়গাতে ছিল পানি। পানি ভেঙ্গে ছেলেমেয়ে নিয়ে শত্রুদের অকস্মাৎ আক্রমণের মুখে নিরাপদ জায়গায় সরে যাওয়া অসম্ভব হতে পারে। এজন্য আমরা স্থানীয় লোকদের নির্দেশ দেই যাতে তারা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আগেই দূরে সরে যায় বা সরে যেতে পারে। কেউবা স্বেচ্ছায় আর কেউবা নিরুপায় হয়ে বিপদের ঝুঁকি নিয়ে স্ব স্ব স্থানে রয়ে যায়। আমাদের সৈনিকরা প্রতিরক্ষাব্যূহের উন্নতি চালিয়ে যেতে থাকে। যেসব জায়গা দিয়ে শত্রুদের আমাদের অবস্থানের ভিতরে অগ্রসর হওয়ার সম্ভাবনা ছিল আমরা সেসব জায়গাতে মাইন লাগাতে থাকি। ১৭ই জুলাই রাত ৮টায় আমাদের উপর শত্রুরা অকস্মাৎ আক্রমণ

শুরু করে দেয়। প্রায় আধঘণ্টা পর তিনটি হেলিকপ্টার আমাদের অবস্থানের পাশ দিয়ে পিছনের দিকে চলে যায়। চারিদিক অন্ধকার ছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছিল। হেলিকপ্টারগুলো অবস্থানের পিছনে অবতরণ করার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের সৈনিকরা বুঝতে পেরেছিল যে শত্রুসেনারা প্রতিরক্ষাব্যূহের পিছনে ছত্রীবাহিনী নামিয়েছে। আমাদের অগ্রবর্তী অবস্থানগুলো থেকেও খবর আসতে লাগল যে শত্রুরা মুহুরি ও ছিলোনিয়া নদীর পাড় দিয়ে এগিয়ে আসছে। ওদের সঙ্গে ট্যাঙ্কও আছে। অবস্থানের সামনে বিপুল সৈন্য নিয়ে শত্রুর আক্রমণের প্রতিরক্ষা আর পিছনে তাদের ছত্রীবাহিনী আমাদের সৈনিকদের পিছন থেকে ঘিরে ফোলার জন্যও প্রস্তুত। এরকম একটা সংকটময় অবস্থাতেও ক্যাপ্টেন জাফর ইমাম এবং ক্যাপ্টেন জাফর ইমাম এবং ক্যাপ্টেন গাফফার এবং লেঃ ইমামুজ্জামান ও ক্যাপ্টেনশহীদের নেতৃত্বে সামান্য শক্তি নিয়েও যুদ্ধের জন্য আমাদের সৈনিকদের মনোবল ছিল অটুট। আমার সব অফিসার এ চরম মুহূর্তে তাদের সাহস এবং দৃঢ়প্রত্যয়ের পরিচয় দিয়েছিল। রাত তখন সাড়ে ৯টা। বৃষ্টি বেশ একটু জোরালো হয়ে উঠেছে। শত্রুরা তাদের অগ্রসর অব্যাহত রেখেছে। এ সময়ে ক্যাপ্টেন গাফফারের অবস্থানের পিছন থেকে শত্রুরা হামলা চালায়। ক্যাপ্টেন গাফফার এবং তার সৈনিকরা বীরত্বের সাথে শত্রুসেনাদের হামলার মোকাবেলা করে। প্রায় ১ ঘণ্টা যুদ্ধের পর শত্রুসেনারা বেশ কিছু হতাহত সৈনিক ফেলে ক্যাপ্টেন গাফফারের অবস্থান থেকে বিতাড়িত হয়ে যায়। এ সময় ক্যাপ্টেন জাফর ইমামের কোম্পানীর সামনেও শত্রুরা আক্রমণ চালায়। শত্রুদের ট্যাঙ্কগুলিও আস্তে আস্তে যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে এগিয়ে আসছিল। শত্রদের কামানের গুলি সমস্ত অবস্থানের উপর এসে পড়ছিল। লেঃ ইমামুজাজামান,যাঁর কোম্পানী সবচেয়ে বামে ছিল, সেখানেও শত্রুরা আস্তে আস্তে চাপ দিতে থাকে। ক্যাপ্টেন জাফর ইমাম আমাকে এ পরিস্থিতির কথা জানায়। আমি বুঝতে পারলাম যে, শত্রুসেনারা ডানে, বামে এবং হেলিকপ্টারের সাহায্যে আমার প্রতিরক্ষাব্যূহের পিছনে পজিশন নিয়েছে এবং আস্তে আস্তে আমার সমস্ত ট্রুপসদের ঘিরে ফেলার মতলব এঁটেছে। শত্রুদের চাপ আস্তে আস্তে বেড়েই চলছিল। উভয়পক্ষেরই ক্রমেই বেড়ে চললো। তাদের অনেকেই আমাদের মাইন ফিল্ডের ভিতর পড়ে গিয়ে প্রাণ গিয়ে প্রাণ হারাচ্ছিল, কিন্তু তবুও তারা অগ্রসর হচ্ছিল। ইতিমধ্যে আমার ৫ জন লোক নিহত ও ৩৫ জন আহত হয়। এই অন্ধকারে সমস্ত অবস্থান জুড়ে চলছিল সম্মুখসমরে হাতাহাতি যুদ্ধ। যদিও শত্রুদের ক্ষয়ক্ষতির সংখ্যা আমাদের চেয়ে অনেক বেশী হচ্ছিল, তবুও আমার পক্ষে ৩০/৪০ জন- হতাহতের পরিমাণ খুবই মারাত্বক ছিল। তাছাড়া আমার সৈন্যসংখ্যা ছিল অনেক কম আর অস্ত্রশস্ত্রেও ছিলাম আমি তাদের চেয়ে অনেক দুর্বল। আমি বুঝতে পারলাম সকাল পর্যন্ত তারা যদি আমাকে এভাবে ঘিরে রাখতে পারে, তাহলে তাদের বিপুল শক্তিতে দিনের আলোতে এবং ট্যাংক ও কামানের গোলায় আমার সৈন্যদের সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেবে।

রাতের অন্ধকারে তাদের ট্যাঙ্ক এবং কামানের গোলা আমাদের উপর কার্যকরী হয়নি। কিন্তু দিনের আলোতে এসব অবস্থানের জন্য মারাত্বক হয়ে দাঁড়াবে। আমি ক্যাপ্টেন জাফর ইমামকে বর্তমান অবস্থান থেকে ডাইনে বা বামে সরে গিয়ে শত্রুদের এড়িয়ে পিছনে এস চিতুলিয়াতে নতুন প্রতিরক্ষাব্যূহ তৈরী করার নির্দেশ দেই। এ নির্দেশ অনুযায়ী রাত ১ টায় ক্যাপ্টেন জাফর, ক্যাপ্টেন, শহীদ এবং ক্যাপ্টেন গাফফার তাদের স্ব স্ব দল নিয়ে শত্রুদের এড়িয়ে চিতুলিয়াতে নতুন প্রতিরক্ষা অবস্থানে পৌছে। পৌছার সঙ্গে সঙ্গে নতুন অবস্থানের জন্য তৈরী শুরু হয়ে যায়। তখন সকাল ৯ট কি ১০টা। আমি নিজেও যথেষ্ট উদ্বিগ্ন ছিলাম লেঃ ইমামুজ্জামান এবং তার দলটির না পৌছানোর জন্য। যখন প্রতিরক্ষাব্যূহ তৈরী চলছিল আমি তিন-চারজন সিপাই সঙ্গে নিয়ে আগে অগ্রসর হয়ে যাই- শত্রুদের সম্বন্ধে জানবার জন্য। চেতুলিয়া থেকে বেশ কিছু দূর আগে মুন্সিরহাটের নিকট যেয়ে দেখতে পাই যে শত্রুরা সকাল পর্যন্ত মুন্সিরহাটে রেলওয়ে স্টেশন পর্যন্ত দখল করে নিয়েছে এবং এর আগে আর অগ্রসর হওয়ার সাহস করেনি। তারা ভাবছিল যে আমাদের পিছনের পজিশনগুলো হয়ত এখনও আছে। আমরা যে রাত্রে এসব ঘাঁটি ত্যাগ করে চেতুলিয়াতে নতুন ব্যূহ রচনা করেছি এ সম্বন্ধে তারা সকাল ১০টা পর্যন্ত জানতে পারেনি এবং তারা খুব সতর্কতার সাথে অগ্রসর হচ্ছিল। আমি প্রায় ১টা পর্যন্ত আমার রেকি বা অনুসন্ধান শেষ করে চেতুলিয়াতে ফেরত আসি, ঠিক এই মুহূর্তে শত্রুদের আরো তিন চারখানা হেলিকপ্টার আসে এবং আমাদের অবস্থানের ৭০০/৮০০ গজ ডাইনে রেলওয়ে লাইনের উঁচু বাঁধের

পিছনে অবতরণ করে। এছাড়া আরো দুটো হেলিকপ্টারের আসে যেগুলি আমাদের বামে আধা মাইল দূরে একটা পুকুরের বাঁধের পিছনে অবতরণ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে সেদিক থেকে ভয়ংকর গোলাগুলির আওয়াজ শুনতে পাই। আমি বুঝতে পারলাম শত্রুরা আমার ট্রুপসদের চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলেছে এবং আমাদের প্রতিরক্ষা অবস্থান তখনও কিছুই তৈরী হয়নি। এ সময় ছিল আমার পক্ষে চরম মুহূর্ত। বাম থেকে গোলাগুলির আওয়াজ আরো প্রচন্ডতর হচ্ছিল। আমি তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্ত নেই এবং ক্যাপ্টেন জাফর ও ক্যাপ্টেন গাফফারকে নির্দেশ দেই এখনই এই মুহূর্তে তাদের নিজ নিজ কোম্পনী নিয়ে বর্তমান অবস্থান পরিত্যাগ করার জন্য। আমি এবং আমার সমস্ত সৈন্যকে অবস্থানটি পরিত্যাগ করার আধা ঘণ্টার মধ্যে শত্রুরা সেদিন আক্রমণ চালায়।

এবারও শত্রুসেনারা আমাকে এবং আমার সেনাদলকে সামান্য মুহূর্তের জন্য ধরার সুবর্ণ সুযোগ আবার হারিয়ে ফেলে। হয়তবা এ ছিল পরম করুণামতয় আল্লাহের আশীর্বাদ। আমি পরে জানতে পারি আমার অবস্থানের বাম থেকে যে গোলাগুলির আওয়াজ শুনতে পেয়েছিলাম তা ছিল লেঃ ইমামুজ্জামানের সৈনিকদের সঙ্গে পাকসেনাদের সংঘর্ষ। পাকসেনারা যখন হেলিকপ্টার যোগে বামে অবতরণ করছিল সে সময় লেঃ ইমামুজ্জামানের সৈন্যদলের সামনে তারা পড়ে যায়। এতে তাদের যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি হয়। লেঃ ইমামুজ্জামান শত্রুদের প্রচন্ড আঘাত হেনে পরে বাম দিক দিয়ে পিছনে হটে আসে এবং আমার সঙ্গে মিলিত হয়। যদিও আমাকে অবস্থান পরিত্যাগ করতে হয়েছিল এবং পাকবাহিনী আবার বেলুনিয়া পুনঃদখল করে নেয় তবুও শত্রুদের হতাহত হয় তা ছিল অপূরণীয়। আমাদের পশ্চাদপসরণ একটা রণকৌশল ছিল। সৈন্য, অস্ত্র, গোলাবারুদ সবকিছুই ছিল নগন্য। সে তুলনায় শত্রুদের শক্তি ছিল বিরাট। আমার তখনকার যুদ্ধের নীতি এবং কৌশলই ছিল শত্রুদেরকে অকস্মাৎ আঘাত হানা বা তাদেরকে প্রলোভন দেখিয়ে আমার মনোনীত জায়গায় অগ্রসর হতে দেওয়া এবং তাদেরকে পর্যুদস্ত এবং ধ্বংস করা- শত্রুদের এভাবে ব্যতিব্যস্ত রেখে আস্তে আস্তে নিজের শক্তি আরো গড়ে তোলা এবং সংগঠনকে শক্তিশালী করা। অংকুরেই ধ্বংস হয়ে যাওয়াটা আমার উদ্দেশ্য ছিল না। এ পরিপ্রেক্ষিতে সব সংঘর্ষেই আমি পাক সেনাবাহিনীকে আঘাত হানতাম অতর্কিতে। আবার যখন যথেষ্ট ক্ষতিসাধন হত তখন অকস্মাৎভাবেই সংঘর্ষ এড়িয়ে অন্য জায়গায় চলে যেতাম। এতে শত্রুরা আরো মরিয়া হয়ে উঠতো এবং পাগলের মত আমার নতুন অবস্থানে এসে আঘাত হানত। বারবারই এ রণকৌশলের পুনরাবৃত্তি হত। যে সময় বেলুনিয়ার সম্মুখসমর চলছিল, ঠিক সে সময় আমি শত্রুর পিছনের এলাকায় আঘাত হানার জন্য তৈরী হচ্ছিলাম। আমার হেডকোয়ার্টারস-এ অন্ততঃপক্ষে চার হাজার গেরিলা সে সময় প্রশিক্ষণরত ছিল। এদেরকে আমি বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে বিশেষ ধরনের গেরিলা যুদ্ধের পদ্ধতিতে শিক্ষা দিচ্ছিলাম। একটি দলকে শিক্ষা দিচ্ছিলাম ডিমোলিসন (বিস্ফোরক) ব্যবহার-যাদের প্রথম প্রথম উদ্দেশ্য ছিল দেশের অভ্যন্তরে যত রাস্তা ও রেলওয়ে সেতু আছে সেগুলি ধ্বংস করে দেওয়া- যাতে শত্রুরা অনায়াসে যাতায়াত করতে পারে এবং বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে পাক সেনাদল তাদের রেশন ঠিকমত পৌঁছাতে না পারে। এ ছাড়া এ দলটির আরো কাজ ছিল শিল্পক্ষেত্রে- কিছু মনোনীত শিল্পকে সাময়িকভাবে অকেজো করে দেওয়া। বিশেষ করে ঐ সব শিল্প, যাদের তৈরী মাল পাকবাহিনী বিদেশে রপ্তানী করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে সক্ষম হবে। এসব শিল্প অকেজো করার সময় আমাকে অনেক সতর্কতার সাথে পরিকল্পনা করতে হয়েছে, যেহেতু সব শিল্পই আমাদের দেশের সম্পদ এবং এগুলি সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিলে পরবর্তীকালে স্বাধীনতার পর আমাদের নিজেদেরই আবার সংকটের সম্মুখীন হতে হবে, সে কারণে প্রতিটি টার্গেট সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর পরিকল্পনাগুলিকে যথেষ্ট বিবেচনার সাথে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করতে হত এবং তারপরই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতাম। শিল্পগুলিকে ধ্বংস না করে এগুলিকে সাময়িক অকেজো করার এক অভিনব পদ্ধতি আমি খুঁজে পাই। আমার সেক্টর-এর বেশীরভাগ শিল্প ঢাকার চারপাশে- ঘোড়াশাল এবং নরসিংদীতে অবস্থিত ছিল। আমি জানতে পেরেছি যে, এসব শিল্পের জন্য বৈদ্যুতিক শক্তি সাধারণত সাজিবাজার পাওয়ার হাউস ও কাপ্তাই থেকে পাওয়ার লাইনের মাধ্যমে আসে। আমি আমার গেরিলাদের প্রথম টার্গেট দেই ওই সব পাওয়ার লাইন উড়িয়ে দেয়ার জন্য। প্রতি সপ্তাহে ২০টি টিম বিভিন্ন এলাকায় পাওয়ার লাইনের পাইলন ধ্বংস করতে থাকে। এর ফলে প্রায় ৭৫ শতাংশ বিদ্যুৎ সরবরাহ শিল্প এলাকাগুলোতে বন্ধ হয়ে যায়। পাকবাহিনী নিরুপায় হয়ে প্রত্যেক পাইলনের নীচে এন্টি-পার্সোনাল মাইন পুঁতে রাখত যাতে আমার লোকজন

পাইলনের কাছে না যেতে পারে। তার সিদ্ধিরগঞ্জ পাওয়ার হাউস থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে শুরু করে। আমি যখন এ খবর জানতে পারি, তখন সিদ্ধিরগঞ্জের সরবরাহ কেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ যাতে না যেতে পারে তার পরিকল্পনা করতে থাকি। আমার হেডকোয়ার্টাস থেকে তিনটি দলকে ঢাকার বিদ্যুৎ সরবরাহ পদ্ধতি সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য আনার জন্য প্রেরণ করি। এক সপ্তাহের মধ্যে তার পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসন্ধান চালিয়ে যায় এবং আমাকে সমস্ত খবর পৌঁছায়। তারা আরো জানায়, পাকবাহিনীর একটি শক্তিশালী দল ট্যাঙ্কসহ সিদ্ধিরগঞ্জ বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্রে তাদের আস্তানা গেড়েছে। চতুর্দিকে বাঙ্কার প্রস্ত্তত করে সে জায়গাটিকে পাহারা দিচ্ছে। সে কেন্দ্রটিকে অকেজো করতে হলে একটা বিরাট যুদ্ধের পর সেটিকে দখল করতে হবে। শত্রুঘাঁটি যেরূপ শক্তিশালি ছিল তাতে সফল হওয়া সম্ভব হতেও পারে, নাও হতে পারে। আর তাছাড়া আমিও প্রকৃত পক্ষে কেন্দ্রটি সম্পূর্ণরূপে উড়িয়ে দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলাম না। আমি এসব ভেবে অন্য পন্থা অবলম্বন করার জন্য চিন্তা করতে থাকি। এ সময়ে ওয়াপদার একজন ইঞ্জিনিয়ার আমার ক্যাম্পে আসেন। তাঁর সঙ্গে এ ব্যাপারে আমার বিস্তারিত আলোচনা হয়। আমার যে অনুসন্ধান দলটি খবরাখবর এনেছিল, তারা আসার সময় বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্রের একটা নীলনকশা ওয়াপদার প্রধান থেকে চুরি করে এনেছিল। আমি ইঞ্জিনিয়ার জনাব ভূইয়াকে এ নীলনকশা অনুযায়ী বিদ্যুৎ সরবরাহের একটি সম্পূর্ণ হুবহু মডেল আমার হেডকোয়ার্টার-এ তৈরীর নির্দেশ দিই। ইঞ্জিনিয়ার জনাব ভুইয়া আমার নির্দেশ অনুযায়ি ঢাকা, টঙ্গি, ঘোড়াশাল, নারায়ণগঞ্জের বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইনের একটা পূর্ণাঙ্গ মডেল তৈরী করেন। সে মডেলের উপর ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের সঙ্গে আলোচনাকালে আমি বুঝতে পারি যে, ঢাকাতে মোট ন'টি জায়গাতে (পোস্তগোলা, ডেমরা, হাটখোলা, জংসন, খিলগাঁও, মতিঝিল, ধানমন্ডি, শাহবাগ, কমলাপুর, উলন) গ্রীড সাবস্টেশন আছে এবং এ সাবস্টেশনগুলি যদি আমরা ধ্বংস করে দিতে পারি তবে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাবে। এও বুঝতে পারি যে, বিদ্যুৎ সরবরাহ সিদ্ধিরগঞ্জ থেকে মোটামুটি তিনটা লাইনে আসে এবং যদি সবগুলো সাবস্টেশন একসঙ্গে উড়িয়ে না দেয়া যায়, তাহলে বিদ্যুৎ সরবরাহ অন্য পথ দিয়ে চলবে। ঢাকার এবং শিল্প এলাকার বিদ্যুৎ সরবরাহ অকেজো করে দেয়ার জন্য আমি জুলাই মাস থেকে ১৬ টি টিম ট্রেইন করতে থাকি। এসব টিমে ৮ থেকে ১০ জন গেরিলাকে এভাবে ট্রেনিং দেই যাতে তারা সাবস্টেশন গুলির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রপাতি খুব কম সময়ের মধ্যে চিনে নিতে পারে এবং সেগুলো অনায়াসে ধ্বংস বা অকেজো করে দিতে পারে। ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা এমনভাবে করা হয় যাতে তারা এ কাজে সম্পূর্ণ পারদর্শিতা অর্জন করে। দু'মাস ট্রেনিং-এর পর এসব টিমগুলোকে আমার হেডকোয়ার্টারে মডেলের উপর একটা পূর্ণাঙ্গ রিহার্সালের বন্দোবস্ত করি যাতে প্রত্যেকটা টিমের প্রতিটি ব্যক্তির তার কার্য সম্বন্ধে কোন সন্দেহ না থাকে। নিজ নিজ কার্য যাতে তৎপরতার সাথে করতে পারে সে জন্য এ ব্যবস্থা করা হয়। এ টিমগুলিকে আমি কসবার উত্তরে আমাদের যে গোপন প্রবেশপথ ছিল, সে পথে ঢাকাতে প্রেরণ করি। টিমগুলি নবীনগর এবং রূপগঞ্জ হয়ে নদীপথে ঢাকার উপকণ্ঠে পৌছে এরা প্রথম তাদের রেকি (সন্ধানী) সম্পন্ন করে। অনুসন্ধানের পর জানতে পারে যে কতগুলো সাবস্টেশনে পাকিস্তানীরা ছোট ছোট আর্মি পাহারা দলের বন্দোবস্ত করেছে। আবার কোন কোনটিতে পশ্চিম পাকিস্তানী পুলিশ কিম্বা রাজাকার দ্বারা পাহারার বন্দোবস্ত করেছে। দলগুলি তাদের সমস্ত সরঞ্জাম এবং অস্ত্র ঢাকায় বিভিন্ন জায়গাতে লুকিয়ে রেখে বর্তমান অবস্থান সম্বন্ধে আমাকে খবর পাঠায় এবং নির্দেশের অপেক্ষায় থাকে। আমি বুঝতে পারলাম যদিও কোন কোন জায়গায় ছোট ছোট পাহারার বন্দোবস্ত করা হয়েছে তবুও এগুলি ধ্বংস করার সুযোগ এখনই। এরপর হয়ত পাহারা আরও সুদৃঢ় হওয়ার আশঙ্কা আছে। সে জন্য আর কালবিলম্ব না করে সবগুলো পাওয়ার সাবস্টেশন একযোগে অতিসত্বর ধ্বংস করার বা অকেজো করার নির্দেশ পাঠাই। আমার নির্দেশ পাওয়ার পর সব টিমই নিজ নিজ কমান্ডারদের নেতৃত্বে একযোগে জুন মাসের ২৭ তারিখের রাতে অকস্মাৎ তাদের আক্রমণ চালায়। তারা এসব আক্রমণে ধানমন্ডি, শাহবাগ, পোস্তগোলা, উলন, মতিঝিল, ডেমরা প্রভৃতি সাবস্টেশনগুলি ধ্বংস বা সাময়িক অকেজো করে দিতে সক্ষম হয়েছিল। আক্রমণের সময় আমার লোকদের সঙ্গে অনেক যায়গায় পাকসেনাদের সংঘর্ষ হয়- বিশেষ করে ধানমন্ডি সাবস্টেশনে। এই দলটির নেতৃত্ব দিচ্ছিল রুমি। সে একাই স্টেনগান হাতে পাকসেনাদের উপর হামলা চালায় এবং সকলকে গুলি করে মেরে ফেলে। তার অসীম সাহসিকতার ফলে অন্যান্য লোকরাও উজ্জীবিত হয়ে ওঠে এবং পাকসেনাদের উপর

ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং সাবস্টেশনটি ধ্বংস করে দেয়। এরূপ সংঘর্ষ শাহবাগ ও ডেমরাতে ঘটে। বাকী জায়গাগুলোয় আমার লোকেরা এমন অকস্মাৎভাবে সাবষ্টেশনগুলির ভেতর ঢুকে পড়ে যে পাকসেনারা বা পাকিস্তানী পুলিশরা কিছু বোঝার আগেই তাদের হাতে বন্দী বা নিহত হয়। এ অপারেশন-এ অন্তত ৭৫ শতাংশ সফলতা লাভ করে। ঢাকার বিদ্যুৎ সরবরাহ ২৪ ঘণ্টার জন্য সম্পূর্ণ সচল হয়ে যায়। যদিও পাকিস্তানীরা বিমানযোগে সাবস্টেশনের যন্ত্রপাতি পশ্চিম পাকিস্তান থেকে নিয়ে আসে এবং কিছুটা সরবরাহ পুনরুদ্ধার করে-তবুও শিল্প এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ চিরতিরে কমে যায়। এতে পাটকলগুলি চালাবার প্রচেষ্টা অনেকাংশে কমে যায়।

এ সময়ে আমি আরো জানতে পারি যে প্রিন্স সদরুদ্দিন জাতিসংঘের পক্ষ থেকে ঢাকায় আসছেন সরেজমিনে অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য। জেনারেল টিক্কা খান সে সময় প্রস্ততি নিচ্ছিল প্রিন্স সদরুদ্দিনকে বাংলাদেশে সবকিছু স্বাভাবিক অবস্থা দেখাবার জন্য। আমি তার এ প্রচেষ্টাকে বানচাল করার জন্য আরো পাঁচটি দল তৈরী করি। তাদের কাজ ছিল ঢাকার বিভিন্ন জায়গায় গ্রেনেড বিস্ফোরণ ঘটানো এবং অবস্থা যে স্বাভাবিক নয় সে সম্বন্ধে প্রিন্স সদরুদ্দিনকে বুঝিয়ে দেওয়া। পরিকল্পনা অনুযায়ী দলগুলি ঢাকার বিভিন্ন জায়গায় বিস্ফোরণ ঘটায়-প্রিন্স সদরুদ্দিনের অবস্থানকালে। সবচেয়ে বড় সবিস্ফোরণ ঘটায় মতিঝিলে। আলম এবং সাদেক এ দুজন গেরিলা ১টা গাড়ীর ভিতরে ৬০ পাউন্ড বিস্ফোরক রেখে মতিঝিলে হাবিব ব্যাঙ্ক বিল্ডিং-এর সামনে বিলম্বিত ফিউজের মাধ্যমে ভয়ংকর বিস্ফোরণ ঘটায়। এ বিস্ফোরণের ফলে হাবিব ব্যাঙ্কের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। এই ঘটনায় সমস্ত ঢাকা শহর আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে। জনসাধারণ সঙ্গে সঙ্গে সব কাজকর্ম বন্ধ করে দেয়। সেদিন রাতেই প্রিন্স সদরুদ্দিন যখন হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে বিশ্রাম করছিলেন, এ দলটি হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের বারান্দায় আরেকটা বিস্ফোরক ভর্তি গাড়ী বিস্ফোরণ ঘটায়। চতুর্দিকে এসব বিস্ফোরণে জাতিসংঘের মহামান্য পর্যবেক্ষক বেশ ভাল করে বুঝতে পেরেছিলেন যে টিক্কা খান যাকে স্বাভাবিকভাবে দেখানোর চেষ্টা করছে, তা স্বাভাবিক নয়। ঢাকার অপারেশন যখন চলছিল তখন আমি আমার বেঙ্গল রেজিমেন্টের সেনাদের এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গেরিলাদের মিলিত দল বিভিন্ন থানায় পাঠাচ্ছিলাম থানাগুলি দখল করে নেয়ার জন্য। এই দিনগুলি ছিল বিশেষ অসুবিধার-কারণ আমার ট্রেনিংপ্রাপ্ত ছেলেরাও সেনারা সবাই ছিল যুদ্ধের জন্য প্রস্ততে। কিন্তু ছিল না শুধু অস্ত্র আর গোলাবারুদ। অনেক চেষ্টা করেও গোলাবারুদ এবং অস্ত্রের কোন ব্যবস্থা করতে পারছিলাম না।

আমাদের বন্ধুরা সব সময় আমাদের আশ্বাস দিত ‘এই অস্ত্র এসে পড়ছে’। কোন সময় বলত ট্রেনে মালভর্তি হয়ে গেছে, বন্যার জন্য আসতে পারছে না, কেননা রেললাইন বন্ধ। আবার কোন সময় বলত ফ্যাক্টরিতে তৈরী হচ্ছে। এমনও সময় গেছে যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ অপারেশন পরিকল্পনা তৈরীর পর আমাদেরকে সে পরিকল্পনা পরিত্যাগ করতে হতো অস্ত্রের অভাবে। নিজেদের কাছে যেসব অস্ত্র ছিল সেসবেরও গোলাবারুদ অত্যান্ত রেশনিং এর পরেও প্রায় শেষ হওয়ার পথে ছিল। এসময় সমস্ত মুক্তিবাহিনীতে হতাশার ভাব পরিলক্ষিত হয়। অনেক সময় বহু অনুরোধের পর হয়ত ৩০৩ রাইফেলের ৫ রাউন্ড করে গুলি সাহায্য পেতাম। এ ধরনের যুদ্ধের জন্য ছিল অতি নগন্য। এসব অসুবিধা এবং সংকটের মধ্যেও আমরা ভেঙ্গে পড়িনি। আমি আমার সেনাদলকে নির্দেশ দিই, যে উপায়ে হোক আর যেখানেই হোক পাক বাহিনীকে এ্যামবুশ করে বা অতর্কিতে আক্রমণ করে তাদের অস্ত্রশস্ত্র গোলাবারুদ ছিনিয়ে নিয়ে নিজেদেরকে সজ্জিত করে তুলতে হবে। এ যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে। সকলকে আত্মনির্ভরশীলতা এবং আত্মবিশ্বাস আরো বাড়াতে হবে। আমার এ নির্দেশ বেশ কাজে লাগে। সকলেই আবার পূর্ণ উদ্যমে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকে।

জুলাই মাসে টিক্কা খান আবার মন্দভাগ এবং শালদা নদী পুনর্দখল করার প্রচেষ্টা চালায়। পাকিস্তানীরা বেলুচ নামক জায়গায় সৈন্য সমাবেশ করে। আমাকে এ খবর আমাদের লোকেরা পৌঁছায়। আমি ক্যাপ্টেন গাফফারকে মন্দভাগের অবস্থান আরো এগিয়ে বাজারের নিকট অবস্থান শক্তিশালী করার নির্দেশ দেই। শত্রুসেনারা সকালে বেলুচ রেজিমেন্টের দুটি কোম্পানীকে সামনে রেখে অগ্রসর হয়। সকাল সাড়ে দশটায় শত্রুসেনারা অবস্থানের অগ্রবর্তী স্থান পর্যন্ত অগ্রসর হয় এবং আমাদের মাইনফিল্ডের ভিতর আটকা পড়ে যায়।

তবুও তারা অগ্রসর হতে থাকে। তারা তখন আমাদের অবস্থান থেকে ৫০ গজের মধ্যে এসে পড়ে, ক্যাপ্টেন গাফফারের সেনাদল তাদের উপর অকস্মাৎ গুলিবর্ষন শুরু করে। শত্রুরা আমাদের অবস্থান এত সামনে আছে তা জানত না। চতুর্দিকে গুলিতে তাদের দুটি কোম্পানী ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় এবং শত্রুসেনারা চারিদিকে ছুটাছুটি করতে থাকে। এতে তাদের নিহতের সংখ্যা আরও বেড়ে যায়। ৩১ বেলুচ কিছুক্ষন পর তাদের আক্রমন পরিত্যাগ করে। কিন্তু এক ঘন্টা পরে পাকসেনারা শালদা নদীর দক্ষিন তীরের সাথে আমাদের অবস্থানের ডান পাশ দিয়ে পিছনে আসার চেষ্টা করে । তারা যে এরুপ একটা কিছু করতে পারে ক্যাপ্টেন গাফফার তা পূর্বেই অনুমান করেছিল। এ জন্য ক্যাপ্টেন গাফফার তৈরীও ছিল। সুবেদার ওহাবের অধীন একটি কোম্পান কে সে আগে থেকেই শালদা নদীর তীরে এ্যামবুশ পজিশনে রেখেছিল। শত্রুরা অজ্ঞাতে এ এ্যামবুশ পজিশনটির ফাদে পড়ে যায়। নিরুপায় হয়ে তারা অবস্থানটির উপর প্রবল আক্রমণ স্থগিত রেখে পাকসেনারা পিছু হটে যায়। ক্যাপ্টেন গাফফারের সেনাদলও সুবেদার ওহাবের সেনাদল পশ্চাৎগামী শত্রুদের পিছনে ধাওয়া করে। এ সময় অনেক আহতও নিহত হয় । যুদ্ধের শেষে সমস্ত যুদ্ধক্ষেত্রে খুজে আমরা অন্তত ১২০টা মৃতদেহ খুজে পাই এবং আরো অনেক মৃতদেহ যেগুলি পানিতে ছিল, খুজে পাওয়া যায়না। এ যুদ্ধের ফলাফল আমার পক্ষে অনেক লাভজনক ছিল। আমরা ৮টা মেশিনগান, ১৮টা হালকা মেশিনগান প্রায় দেড়শ (১৫০) রাইফেল, ২টা রকেট লাঞ্চার, ২টা মর্টার অজস্র গোলাবারুদ হস্তগত করি। আরো অনেক অস্ত্রশস্ত্র যেগুলি পানিতে ছিল, সেগুলি খুজে পাওয়া যায়নি। মৃতদেহগুলির মধ্যে ১ জন ক্যাপ্টেন, ১ জন লেফটেন্যান্ট এবং আরো কয়েকজন জুনিয়র কমিশণ্ড সনাক্ত করা হয়। শত্রুরা এ সময় বৃষ্টি এবং বন্যার জন্য আমাদের হাতে বেশ নাজেহাল হচ্ছিল এবং তাদেরকে বাধ্য হয়ে গতিবিধি শুধু রাস্তায় সীমিত রাখতে হচ্ছিল। কিন্তু আমরা শত্রুদের এ দুর্বলতা সম্পুর্নভাবে কাজে লাগাতে পারছিলাম না যেহেতু তখন আমরা অস্ত্রশস্ত্রের দিকে দুর্বল ছিলাম-যদিও ইতিমধ্যে আমাদের বেশ সংখ্যক লোক ট্রেনিং পেয়ে প্রস্তুত ছিল। অস্ত্রের অভাবে এসব ট্রেনিংপ্রাপ্ত লোকদের আমরা ভেতরে পাঠাতে পারছিলামনা। শত্রুরা আমাদের দুর্বলতা বুঝতে পেরে তাদের গতিবিধি আরো বাড়াবার জন্য জলযানের যোগাড় করতে লাগল বাংলাদেশের যত লঞ্চ, স্টিমার, স্পীডবোট ছিল, সেগুলি দখল করে মেশিনগান ফিট করে এগুলিকে গানবোট হিসাবে ব্যবহার করতে লাগল।

আমাদের কাছে খবর আসে যে, শত্রুরা 'পাক বে' কোম্পানীতে তিনশত ফাইবার গ্লাস স্পীডবোট তৈরীর নির্দেশ দিয়েছে। নারায়নগঞ্জের 'পাক বে' ডাকইয়ার্ডে এসব স্পীডবোট তৈরীর কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। এই বে' কোম্পানীর একজন অফিসারের ভাই আমার মুক্তিবাহিনীতে ছিল। সে এসে খবর দেয় যে এই স্পীডবোটে লাগাবার জন্য তিনশ ইঞ্জিন সদ্য আনা হয়েছে এবং সেগুলি 'পাক বে'র গুদামে মওজুত রাখা আছে আমি তৎক্ষনাৎ সেই ছেলেটিকে আরো দশজন গেরিলা মনোনয়ন করার নির্দেশ দিই এবং এই সিদ্ধান্তে পৌঁছি যে, ফাইবার গ্লাস স্পীডবোট প্রস্তুত হয়ে গেলে শত্রুদের গতিবিধি অনেক গুনে বেড়ে যাবে, এই বর্ষার মওসুমে শত্র সেনারা বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে পৌঁছতে পারবে। তখন আমাদের মুক্তিবাহিনীর পক্ষে সুদূর গ্রামের গোপন অবস্থানগুলি অত্যন্ত বিপদজনক হয়ে পড়বে। সে জন্য এই মেশিনগুলিকে এখনই ধ্বংস করে দিতে হবে। নির্দেশমত মনোনীত দলটিকে প্রশিক্ষনের পর নারায়নগঞ্জে পাঠিয়ে দিই। নারায়নগঞ্জে এসে তারা প্রথম 'পাক বে'র গুদামটি রেকি (অনুসন্ধান) করে এবং জানতে পারে যে, দুজন পুলিশ এবং দুজন চৌকিদার যে গুদামটিতে মেশিনগুলো রাখা আছে সেখানে পাহারা দিচ্ছে। সেদিন সন্ধায় আমার দলটি অতর্কিতে পুলিশদের নিরস্ত্র করে ফেলে এবং পুলিশ ও চৌকিদারদের একটি কামরায় বন্ধ করে গুদামের তালা ভেঙ্গে গুদামে প্রবেশ করে। গুদামের ভিতর ডিজেল এবং পেট্রোল ছিল। সেগুলি সব মেশিনের উপর ঢেলে দেয় এবং যেসব ফাইবার গ্লাস নৌকা প্রস্তুত ছিল তাতেও ঢেলে দেয়। এরপর অগ্নিসংযোগ করে বেরিয়ে আসে। কয়েক সেকেন্ডের ভিতর সমস্ত মেশিনে এবং ফাইবার গ্লাস নৌকাগুলিতে আগুন লেগে যায় এবং বিস্ফোরন ঘটে। এই বিস্ফোরণে শত্রুদের সমস্ত মেশিন এবং ৩০০ নৌকা ধ্বংস হয়ে যায়।

এ অপারেশনের ফলে পাক বাহিনী তাদের গতিবিধি অনেকাংশে সীমিত করতে বাধ্য হয়। অপরদিকে এই অপারেশনের ফলে মুক্তিবাহিনীর পক্ষে সূদুর গ্রামাঞ্চলে তাদের গোপন অবস্থান বিপদমুক্ত রাখা সম্ভব হয় এবং তারা সুযোগের সদ্ব্যবহার করে পাকসেনাদের আক্রমণ চালাতে থাকে।

২রা জুলাই সকাল সাড়ে ৫টার সময় একটা দল মোঃ হুমায়ুন কবিরের নেতৃত্বে শত্রুদের লাটুমুড়া অবস্থানের উপর অতর্কিত আক্রমণ চালায়। এ আক্রমণে মর্টারের সাহায্যও নেয়া হয়। আক্রমণের ফলে ১২ জন পাকসেনা নিহত ও ৪ জন আহত হয়।

কুমিল্লাতে আমাদের এ্যাকশন তীব্রতর হওয়ার জন্য পাকসেনারা কুমিল্লার উত্তরে গোমতী বাঁধের উপর তাদের অবস্থান তৈরী করে এবং এরপরে তারা তাদের কতৃত্ব আরও উত্তরে বাড়ানোর জন্য টহল দিতে শুরু করে। পাক সেনারা যাতে শহরের বাইরে তাদের কতৃত্ব পুনঃস্থাপন করতে না পারে সেজন্য আমি 'বি' কোম্পানীর দুটো প্লাটুনসহ কোটেশ্বর নামক স্থানে শক্তিশালী ঘাঁটি গড়ে তুলতে নির্দেশ দিই। পাকসেনারা ২/৩ দিন এই এলাকায় সম্মুখবর্তী জায়গায় তাদের টহল বজায় রাখে। এরপল ৪ ঠা জুলাই পাকসেনাদের একটি ভারী দল সকাল ৪ টার সময় আমাদের অবস্থানের আধামাইল পশ্চিমে কোটেশ্বর গ্রামের ভিতর পর্যন্ত অগ্রসর হয়। সকাল ৪টা ১৫ মিনিটে তারা আরো অগ্রসর হয়ে আমাদের ২০০/৩০০ গজের মধ্যে পৌঁছে। এ সময় আমাদের সৈন্যরা তাদের উপর গুলি চালায়। পাকসেনারা ২/৩ ঘন্টা প্রবল চাপ চালিয়ে যায় অগ্রসর হবার জন্য কিন্তু আমাদের গুলির মুখে বারবারই পিছু হটে যেতে বাধ্য হয়। এরপর তারা ৫০০/৬০০ গজ পিছু হটে গিয়ে আমাদের বামে 'সারিপুরের' দিকে আবার অগ্রসর হবার চেষ্টা করে। এবারও পাকসেনারা আমাদের গোলাগুলির সামনে টিকতে না পেরে সম্পুর্ন পর্যদুস্ত হয়ে পিছু হটে যেতে বাধ্য হয়। এ সংঘর্ষে পাক সেনাদের কমপক্ষে ৩০ জন হতাহত হয়। আমাদের ১ জন প্রাণ হারায়।

হোমনা থানা পাকসেনাদের জন্য সামরিক দিক দিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন স্থান ছিল। ঢাকাতে যেসব গেরিলাকে পাঠাতাম অপারেশনের জন্য, তারাও এই হোমনা দিয়ে যাতায়াত করত। সে জন্য পাকসেনারা লঞ্চে করে সব সময় দাউদকান্দি থেকে হোমনায় টহল দিতে আসত। আর হোমনার দালাল পুলিশেরা পাকসেনাদের মুক্তিবাহিনী সম্পর্কে খবরাখবর দিত। এ পুলিশ ষ্টেশনটি আমার জন্য একটা বিরাট বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সেজন্য এ থানাটিকে দখল করে নেয়ার জন্য আমি হাবিলদার গিয়াসকে নির্দেশ দিই। হাবিলদার গিয়াস তার সেনাদল ও স্থানীয় গেরিলাদের নিয়ে থানাটি আক্রমণ করার প্রস্তুত নেয়। তারা খবর নিয়ে জানতে পারে যে, থানাতে বাঙালী পুলিশ ছাড়া পশ্চিম পাকিস্তানী পুলিশও যথেষ্ট আছে। থানা রক্ষার্থে পুলিশ থানার চতুর্দিকে বাঙ্কার তৈরী করেছে এবং কয়েকটা হালকা মেশিনগানও তাদের কাছে আছে। সম্পূর্ণ খবরাখবর নিয়ে হাবিলদার গিয়াস থানা আক্রমণের একটি পরিকল্পনা নেয়। ১লা জুলাই রাত ১১টার সময় হাবিলদার গিয়াস তার গণবাহিনী ও নিয়মিত বাহিনীকে নিয়ে থানাটি অতর্কিতে আক্রমণ করে। এই আক্রমণে পশ্চিম পাকিস্তানী পুলিশেরা হালকা মেশিনগানের সাহায্যে বাধ দেয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু কিছুক্ষনের মধ্যে আক্রমণের মুখে তারা সবাই নিহত হয়। হাবিলদার গিয়াস থানাটি দখল করে নেয়। এর ফলে থানার সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র তার হস্তগত হয় এবং আমাদের ঢাকা যাবার রাস্তাও শত্রুমুক্ত হয়।

আমাদের একটি প্লাটুন মিয়াবাজার থেকে ফুলতলীতে টহল দিতে যায়। রাত ৩টার সময় তারা দেখতে পায় পাকসেনাদের ১টি জিপ এবং ২টি ট্রাক কুমিল্লা থেকে দক্ষিণের দিকে টহল দিতে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের প্লাটুনটি কুমিল্লা চট্রগ্রাম রাস্তার উপর এ্যামবুশ-এর জায়গায় তারা ১টি তারা ১টি মেশিনগান ও ৩টি হালকা মেশিনগান রাস্তার দুদিনক থেকে লাগিয়ে পাকসেনাদের জন্য অপেক্ষা করে । রাত সাড়ে ৪টায় পাকসেনাদের গাড়ীগুলি মিয়াবাজার অবস্থানে ফেরত আসে। আসার পথে গাড়ীগুলি আমাদের এ্যামবুশ-এ পড়ে যায়। এ্যামবুশ পার্টি খুব নিকটবর্তি স্থান থেক মেশিনগান এবং হালকা মেশিনগানের গুলি চালিয়ে গাড়িগুলি ক্ষতিগ্রস্ত করে দেয়। পাকসেনারা গাড়ি থেকে লাফিয়ে নিচে নামার চেষ্টা করে কিন্তু এতেও তাদের অনেক লোক মেশিনগানের গুলিতে

হতাহত হয়। পাকসেনারে কমপক্ষে ৩ জন অফিসার সহ ২১ জন আহত হয়। পরে খবর পাওয়া যায় যে নিহতদের মধ্যে ১ জন লেঃ কর্ণেলও ছিলেন। এ এ্যামবুশের সময় পাকসেনারা কুমিল্লা বিমানবন্দর হতে তাদের সাথীদের সাহায্যার্থে কামানের সাহায্যে আমাদের এ্যামবুশ অবস্থানের উপর প্রচণ্ড গোলা ছুড়তে থাকে। গোলার মুখে বেশিক্ষন টিকতে না পেরে আমাদের এ্যামবুশ পার্টি স্থানটি পরিত্যাগ করে পিছু হটে আসে।

জুলাই মাসের ১লা তারিখে পাকসেনারা আবার তাদের শালদা নদী ও কসবা অবস্থানের ভিতরে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা চালায় । সকাল ১০টার সময় শালদা নদী থেকে পাকসেনাদের একটি দল কসবার দিকে অগ্রসর হয়। এই দলটি কিছুদূর অগ্রসর হবার পর মন্দভাগের নিকট গাফফারের 'সি' কোম্পানীর সামনে উপস্থিত হয়। দুপুর ১২ টার সময় ক্যাপ্টেন গাফফারের নেতৃত্বে ৪র্থ বেঙ্গলের 'সি' কোম্পানী, পাকসেনারা যখন তাদের অবস্থানের সামনে দিয়ে কসবার দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, ঠিক সে সময়ে তাদের উপর অতর্কিত হামলা চালায়। পাকসেনারা আর অগ্রসর হতে পারেনা এবং ছত্রভঙ্গ তাদের মৃতদেহগুলি ফেলেই শালদা নদীর অবস্থানে পালিয়ে যায়। পালানোর পথে আমাদের মর্টারের গোলাও তাদের যথেষ্ট ক্ষতিসাধন করে। এ সংঘর্ষে পাকসেনাদের ৮ জন আহত ও ৩ জন নিহত হয়।

পাক সেনারা জুলাই মাসের ৩ তারিখে ফেনী থেকে দুটি কোম্পানী নিয়ে বেলুনিয়ার দিকে অগ্রসর হয়। রাস্তায় তারা ''শালদার বাজার'' নামক স্থানে সাময়িক অবস্থান নেয়। এ সংবাদ পেয়ে ক্যাপ্টেন জাফর ইমামের ১টি প্লাটুন ৩ মর্টারসহ দুপুর দুটার সময় শত্রুদের এ দলটির উপর অতর্কিত আক্রমণ চালায়। পাকসেনারা এ আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিলনা। তাদের মনোবল বেলুনিয়ার আগে থেকেই যথেষ্ট কমে গিয়েছিল। এ ছাড়া সে সময় বৃষ্টি হচ্ছিল। বৃষ্টির মধ্যে সাময়িকভাবে বানানো ট্রেঞ্চগুলোতে থাকাও বেশ অসুবিধাজনক হয়ে পড়েছিল। অতর্কিত আক্রামণের ফলে মেশিনগান এবং মর্টারের গোলাগুলিতে তাদের অসংখ্য লোক হতাহত হয়। পরে জানা যায় যে, তাদের অন্তত পক্ষে ৩০ জন নিহত ও ২০ জন আহত হয়েছে। পাকসেনারা এরপর শালদা বাজারের পার্শ্ববর্তী সাহেবনগর ও অন্যান্য গ্রামগুলি থেকে স্থানীয় লোকদের অন্য স্থানে চলে যেতে বলে। মতলববাজার এলাকাতে মুক্তিবাহিনীর একটি প্লাটুনকে লেঃ মাহবুব পাঠিয়ে দেয়। এই প্লাটুনটি মতলব বাজার এলাকায় গিয়ে তাদের ঘাঁটি স্থাপন করে। সেখানে তারা জানতে পারে মতলব থানাতে পাকিস্তানী পুলিশ এবং রেঞ্জার মোতায়েন করা হয়েছে এসব পুলিশের অত্যাচারে স্থানীয় লোকজন অতিষ্ঠ হয়ে উছেছে। পাকিস্তানী পুলিশেরা স্থানীয় দালালদের সহায়তায় শাসনকার্য আয়ত্তাধীনে আসার চেষ্টা করছে। আমাদের দলটি মুক্তিযোদ্ধা জাহাঙ্গীরের নেতৃত্বে এই থানাকে আক্রমন করার সিদ্ধান্ত নেয়। তারা থানা সম্বন্ধে সকল খবর যোগাড় করে। জুলাই মাসের ২ তারিখের রাতে গেরিলা দলটি থানার উপর আক্রমণ করে। পাকিস্তানী পুলিশ এবং রেঞ্জাররা এই আক্রমণকে প্রতিহত করার চেষ্টা করে কিন্তু তীব্র আক্রমণের মুখে ৫ জন পুলিশ নিহত এবং ৭ জন রেঞ্জার আহত হয়। ঠিক এ সময়ে গেরিলাদের নিকট যে হালকা মেশিনগানটি ছিল সেটা খারাপ হয়ে যায়। নিরুপায় হয়ে গেরিলারা আক্রমণ পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়। গেরিলাদের ১ জন নিহত হয়। কিন্তু আক্রমণের পর থেকে পাকিস্তানী পুলিশেরা আর থানার বাইরে আসার সাহস পায়নি এবং মতলব থানা এলাকা মুক্তিবাহিনীর আয়ত্বাধীনে এসে যায়।

শালদা নদীতে আমাপদের কার্যকলাপ সব সময় চালানো হচ্ছিল। মেজর সালেকের এক পেট্রোল পার্টি খবর আনে যে রেলওয়ে সড়কের পূর্ব দিক দিয়ে একটি ছোট রাস্তা পাকসেনারা তাদের শালদা নদী এবং নয়নপুর অবস্থানের মধ্যে যোগাযোগ করার জন্য ব্যবহার করে। মেজর সালেক ৫জনের একটি ডিমোলিশন পার্টি পাঠিয়ে সেই রাস্তার উপর মাইন পুঁতে দেয়। ৯ই জুলাই সাড়ে ৫ টার সময় পাকিস্তানীদের একটি প্লাটুন শালদা নদী থেকে নয়নপুর যাবার পথে এসব এন্টি-পার্সোনাল মাইনের উপর পড়ে যায়। মাইন বিস্ফোরণে ১০ জন পাকসেনা নিহত এবং আরো অনেকে আহত হয়। পাকসেনারা বিপর্যস্ত হয়ে শালদা নদীতে ফিরে আসে।

৬ই জুলাই পাকসেনারা প্রায় ১টি ব্যাটালিয়ান নিয়ে মন্দভাগ বাজার পর্যন্ত অগ্রসর হয়। সেখান থেকে তারা সামনে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করে। আমাদের ‘এ’ আমাদের ‘এ’ কোম্পানী এবং ‘সি’ কোম্পানী মেজর সালেক এবং ক্যাপ্টেন গাফফারের নেতৃত্বে পাকসেনাদের শালদা নদী এনক্লেভ-এর ভিতর অগ্রসর হতে প্রচন্ড বাধা দেয়। পাকসেনারা তাদের ফিল্ড আর্টিলারি মন্দভাগ বাজার পর্যন্ত নিয়ে আসে এবং কামানের সাহায্যে আমাদের অবস্থানের উপর এবং পার্শ্ববর্তী গ্রাম গুলোতে তীব্র গোলাবর্ষন করতে থাকে। এই গোলাবর্ষনে আমাদের ১১ জন আহত হয় এবং অন্তত ৩২ জন বেসামরিক ব্যাক্তি হতাহত হয়। পাকসেনারা তাদের আক্রমণ চালিয়ে যেতে থাকে এবং শালদা নদী এনক্লেভ দখল করার চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকে। আমাদের মুক্তিসেনারাও তাদের এ আক্রমণে তীব্র বাধা দিতে থাকে। যদিও আমাদের মর্টারের গোলা তাদের কামানের অবস্থান পর্যন্ত পোঁছতে পারেনি তবুও মর্টারের গোলা এবং মেশিনগুলিতে তাদের আক্রমণ প্রতিহত হয়ে যায়। তারা পিছু হটে মন্দভাগ বাজারে অবস্থান নিতে বাধ্য হয়। মেজর সালেক পাকসেনাদের শালদা নদীর অবস্থানের বিরুদ্ধে তাঁর কর্যকলাপ আরও তীব্রতর করার জন্য ৯ই জুলাই পাক অবস্থানের উপর ঘোরাফিরা করছিল, ঠিক সে সময় আমাদের কামানগুলি এবং মর্টার পাকসেনাদের অবস্থানের উপর প্রচন্ড গোলাবর্ষন করতে থাকে। এই গোলাবর্ষন প্রায় আধঘন্টা ধরে চলে। এই অকস্মাৎ প্রচন্ড মর্টার এবং কামানের গোলাবর্ষনে শত্রুরা হতভম্ব হয়ে পড়ে। এতে তাদের অনেক হতাহত হয়। পরে জানতে পারা যায় যে এই গোলাগুলিতে ১৯ জন পাকসেনা নিহত এবং ১১জন আহত হয়। একটি মেশিনগান বাঙ্কারসহ তিনটি বাঙ্কার ধ্বংস হয়। কামানের গোলার আঘাতে তাপদের একটি এ্যামুনিশন ডাম্প বিস্ফোরিত হয়ে ধ্বংস হয়ে যায়। এর পরদিন একটি স্পীডবোট পাকসেনাদের নিয়ে শালদা নদী হয়ে পশ্চিম দিকে যাচ্ছিল। আমাদের পেট্রোল পার্টিটি, যেটি আগে থেকেই শালদা নদীর পিছনে অবস্থান নিয়েলি, তারা পাক-বাহিনীর স্পীডবোট এ্যামবুশ করে। এ্যামবুশ-এর সময় আমাদের গুলির আঘাতে স্পীডবোট ডুবে যায়। ১২ জন পাকসেনা হয় গুলিতে না হয় পানিতে ডুবে মারা যায়। মৃতদের মধ্যে ১ জন মেজর ও ১ জন ক্যাপ্টেন ছিল এবং তাদের পদমর্যাদার ব্যাজ এ্যামবুশ পার্টি নিয়ে আসে । এ্যামবুশ পার্টি পানি থেকে ১ টি মেশিনগান, একটি অয়ারলেস সেট এবং ১ টি ম্যাপ (যাতে শত্রু অবস্থানগুলি চিহ্নিত ছিল) উদ্ধার করতে সমর্থ হয়। এরপরই পাকসেনাদের কামানের গোলা আমাদের দলের উপর পড়তে থাকে। আমাদের দল তখন বাধ্য হয়ে এ্যামবুশ স্থান পরিত্যাগ করে।

১০ই জুলাই পাকসেনারা একটি কোম্পানী নিয়ে বিকেল ৪ টার সময় পাল্টা আক্রমণ শুরু করে। পাকসেনারা শালদা নদীর উঁচু স্থান সাগরতলা স্থানটি দখল করার জন্য অগ্রসর হয়। তাদের সঙ্গে তাদের গোলন্দাজ বাহিনীও সাহায্য করে। কিন্তু সাগরতলা উঁচু অবস্থানের উপর আমাদের যে প্লাটুনটি ছিল সেটি এব রেললাইনের পশ্চিমে আমাদের আর ১টা প্লাটুন তাদেরকে প্রচন্ডভাবে বাধা দেয়। আমাদের ৩ ইঞ্চি মর্টার এবং মেশিনগানের গোলাগুলিতে পাকসেনাদের আক্রমণ পর্যদুস্ত হয়। তাদের প্রায় ৩০/৪০ জন হতাহত হয়। এরপর তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে শালদা নদীতে তাদের নিজ অবস্থানে পালিয়ে যায়।

পাকিস্তানীদের একটি দল নবীনগরে তাদের ঘাঁটি স্থাপন করে। পাকসেনাদের নবীনগরে অবস্থানের পর আমাদের নরসিংদী, ভৈরববাজার এবং কালিগঞ্জে যাতায়াতের রাস্তায় বাধার সৃষ্টি হয়। পাকসেনারা কয়েকজন স্থানীয় দালালের সহায়তায় মুক্তিবাহিনীর জন্য সমস্ত এলাকায় ত্রাসের সৃষ্টি করে। ক্যাপ্টেন আইনউদ্দিন এ এলাকাকে পুনরায় বিপদমুক্ত করার জন্য ১৬ জনের ১টি দলকে হাবিলদার আওয়ালের নেতৃত্বে নবীনগর পাঠায়। হাবিলদার আওয়াল কসবার উত্তর দিয়ে অনুপ্রবেশ করে নবীনগরের ৩ মাইল পশ্চিমে তার গোপন ঘাঁটি স্থাপন করে। এরপরা স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তায় পাকসেনাদের অবস্থান সম্পর্কে সম্পুর্ণ খাবর যোগাড় করে। এরপর ৮ই জুলাই সকাল ৬টায় পাকসেনাদের নবীনগরের অবস্থানটির উপর অতর্কিত আক্রমণ

করে। এ অতর্কিত আক্রমণের জন্য পাকসেনারা মোটেই প্রস্তুত ছিলনা। তারা হকচকিয়ে যায় এবং আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের দলটি পাকসেনাদের ৭জন ও ৫জন দালালকে নিহত করতে সক্ষম হয়। সংঘর্ষে আমাদের ১জন আহত হয়। আমি এ সময়ে ঢাকাতে আরো কয়েকটি গেরিলা পার্টি পাঠাই। এই দলগুলিও আগের প্রেরিত দলগুলিও আগের প্রেরিত দলগুলির সাথে যোগ দেয় এবং ঢাকা-নারায়নগঞ্জ এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় তাদের গেরিলা কার্যকলাপ চালিয়ে যায়। একটি দল জুলাই মাসের প্রথমেই পাকসেনাদের ছোট ১টি Ammunition Point আক্রমন করে আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত করে। এর ফলে পাকবাহিনী সমস্ত ঢাকাতে সান্ধ্য আইন জারি করে এবং ঢাকা শহরে প্রহারের ব্যবস্থা করে। ঐ দিনই দু'জন গেরিলা নিউমার্কেটের নিকট পাকসেনাদের ১টি জিপের ভিতর গ্রেনেড নিক্ষেপ করে। ফলে ১জন অফিসার ও ৩জন পাকসেনা নিহত হয়। ৫ই জুলাই নারায়নগঞ্জে দু'জন আর একটি দল গুলশান সিনেমা হলের পর্দার ভিতর ১টি গ্রোনেড নিক্ষেপ করে। ফলে পর্দাটি সম্পুর্ন পুড়ে যায় এবং নিকটবর্তী ৫জন দালালও আহত হয়। সমস্ত নারায়নঞ্জে এবং ঢাকায় আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। ৪ঠা জুলাই দুপুর ১২টার সময় ৫জন গেরিলার ১টি দল পাগলাতে বিদ্যুৎ সরবরাহ পাইলন উড়িয়ে দেয়। ১০ জনের গেরিলার ১টি দল নিউমার্কেটের নিকট পশ্চিম পাকিস্তানী পুলিশ এবং পাকসেনাদের ১টি মিলিত দলের উপর গ্রেনেড নিক্ষেপ করে। ফলে ৮জন পশ্চিম পাকিস্তানী পুলিশ ও ৪জন পাকসেনা নিহত হয়।

এদিকে ১১ই জুলাই সকাল ৮টা থেকে অকস্মাৎ পাকসেনারা ভারী কামান এবং মর্টারের সাহায্যে আমাদের শালদা নদী অবস্থানের উপর প্রচণ্ড গোলাগুলি চালাতে থাকে। এই গোলাগুলির ফলে আমাদের শালদা নদী অবস্থানে বেশ ক্ষয়ক্ষতি হয়। পাকসেনাদের গোলাগুলি সমস্ত দিন ধরে চলতে থাকে। মর্টার Splinter-এর আঘাতে ৪র্থ বেঙ্গলের হাবি''লদার তাজুল মিয়া এবং সিপাই আব্দুর রাজ্জাক মারাত্মকভাবে আহত হয়। এছাড়াও দু'জন বেসামরিক লোক নিহত ও ৮জন বেসামরিক লোক আহত হয়। কিন্তু বিকেলের দিকে গোলাগুলি বন্ধ হয়ে যায় এবং আক্রমণও হয়নি।

৯ই জুলাই পাকসেনারা আমাদের কোটেশ্বর অবস্থানের উপর সকাল ৬টায় আবার তাদের আক্রমণ শুরু করে। আমাদের কোটেশ্বর অবস্থানের সৈন্যরা মর্টার এবং কামানের সহায়তায় পাকসেনাদের এই আক্রমণের মোকাবিলা করে। পাকসোরা প্রথমে দু'টি কোম্পানী নিয়ে আক্রমণ চালায়। পরে আরও দু'টি কোম্পানীকে শক্তি বৃদ্ধির জন্য নিয়ে আসে। ৩/৪ ঘন্টা যুদ্ধের পর আমাদের কামানের গোলায় এবং মেশিনগানের গুলিতে পাকিস্তানীদের আক্রমণ ব্যাহত হয়। এ যুদ্ধে পাকসেনাদের অন্তত ২৪/২৫ জন নিহত হয়। তারা আক্রমণ বন্ধ করে পিছু হটে যায়।

আমাদের petrol পার্টি ৯ই জুলাই পাকসেনাদের কোম্পানী হেডকোয়ার্টার রেকি করে এবং অবস্থান সমন্ধে জানতে পারে। আমাদের কামানগুলি এই কোম্পানী হেডকোয়ার্টারের উপর প্রচন্ড গোলা নিক্ষেপ করতে থাকে। ফলে দু'জন পাকসেনা নিহত এবং ছ'জন আহত হয়। এর মধ্যে একজন অফিসার ও তাঁর signaller ও ছিল। স্থানীয় লোকেরা অফিসারটির কাঁধে ব্যাজ দেখে সনাক্ত করতে পেরেছিল। শত্রুদের মনোবল ভেঙ্গে গিয়েছিল ।

১০ই জুলাই রাতে ক্যাপ্টেন গাফফার ৪র্থ বেঙ্গলের 'সি' কোম্পানী থেকে দু'টি সেকশন শালদা নদীর পশ্চিমে কামালপুর এবং মাইঝখাইরের ভিতর এ্যামবুশ অবস্থানের ভিতর এসে পড়ে ঠিক সে সময় পাকসেনাদলের সম্মুখবর্তী অংশের উপর আমাদের সৈন্যরা গুলি চালাতে শুরু করে। অতর্কিত আক্রমণে পাকসেনারা হতভম্ব হয়ে যায় এবং কিছু বোঝার আগেই তাদের অনেক লোক হতাহত হয়। ছত্রভঙ্গ হয়ে তারা পেছনের দিকে পালাতে শুরু করে। এ অবস্থাতেও তাদের অনেক হতাহত হয়। সংঘর্ষে পাকসেনাদের একজন মেজর, দু'জন ক্যাপ্টেন ও ৮জন সিপাই নিহত হয়। আমাদের Ambush পার্টি ১টি MGIA মেশিনগান এবং Am-PRC-10 Wireless Set হস্তগত হয়।

হোমনাতে হাবিলদার গিয়াসের অধীনে যে মুক্তিবাহিনীর দলটি হোমনা থানায় আক্রমণ চালিয়ে অস্ত্রশস্ত্র দখল করে নেয়, সেই দলটি এ এলাকাতেই তাদের ঘাঁটি গড়ে তোলে। এ দলটির কার্যকলাপে পাকবাহিনী নিকটবর্তী সমস্ত থানাগুলিকে আরো শক্তিশালী করে তোলে। পাকসেনারা রাস্তার প্রত্যেকটি সেতুর উপর তাদের কড়া পাহাড়ার বন্দোবস্ত করে। প্রতিটি হাট বাজার এলাকাতেও তারা ক্যাম্প তৈরী করে। এছঅড়া নিকটবর্তী সমস্ত এলাকার চেয়ারম্যান ও মেম্বারদের ডেকে 'শান্তি কমিটি' গড়ার কড়া নির্দেশ দেয়। প্রতিটি এলাকার চেয়ারম্যানকে স্থানীয় লোক নিয়োগ করে পাকসেনাদের অধীনে সামরিক প্রশিক্ষ নিহেত বাধ্য করে এবং তাদের কাজ করতে বাধ্য করে। কোন স্থানীয় লোক যদি তাদের নির্দেশমত কাজ করতে অস্বীকার করত, তাদের পাকসেনারা তাদের পিতামাতা বাড়িঘরের ক্ষতি করে বা ভয় দেখিয়ে তাদের নির্দেশমত কাজ করাতে বাধ্য করত। পাকসেনারা স্থানীয় দালালদের সহযোগিতায় হাবিলদার গিয়াসের দলটির সঠিক সন্ধান পায় এবং তাদের অবস্থিতি সম্বন্ধে পাকবাহিনীর মন্তব্য আমরা নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানতে পাই। তাদের ধারণা ছিল যে হোমনা এবং দাউদকান্দি এলাকাতে কমপক্ষে আমাদের ৬ হাজারেরও বোশি লোক কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। এ জন্যে পাকসেনারা কখনও রাতে তাদের ক্যাম্পগুলির বাইরে আসতে সাহস করতো না। এছাড়া কোন সময়েই দলে ভারী না হলে ক্যাম্পের বাইরে টহলে বের হতনা। পাকসেনাদের ভীতসন্ত্রস্ত মানসিক অবস্থার জন্য আমাদের দলটির নির্বিঘ্নে কাজ চালিয়ে যেতে সুবিধা হয়। সপ্তাহে একদিন কি দু'দিন লঞ্চের সাহায্যে পাকসেনাদের এসব ক্যাম্পে রসদ যোগান হত। এ সংবাদ আমাদের দলটি জানতে পারে। ৬ই জুলাই দাউদকান্দি থানার অন্তর্গত মাসিমপুর বাজারের অর্ধমাইল পশ্চিমে জয়পুর গ্রামে শাখানদীর পাড়ে হাবিলদার গিয়াস তার দলটি নিয়ে পাকসেনাদের জন্য একটি এ্যামবুশ পাতে। সকাল ১০টার সময় পাকসেনাদের দুটি লঞ্চ দাউদকান্দির দিক থেকে গোমতী হয়ে এই শাখানদীতে আসে। লঞ্চগুলি এ্যামবুশেন সামনে এসে পড়তেই আমাদের দলটি অতর্কিতে গোলাগুলি ছুড়তে থাকে। পাকসেনারা নদীর ভিতর থেকে এ্যামবুশ দলটির উপর হামলা না করতে পারায় এবং তীরে অবস্থিত এ্যামবুশ পার্টির তীব্র গোলাগুলিতে লঞ্চগুলির যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি হওয়ায় অনেক পাকসেনা হতাহত হয়। উপায়ান্তর না দেখে লঞ্চগুলি পিছু হটে যায় এবং দাউদকান্দির দিকে পালিয়ে যায়। পরে বিভিন্ন সূত্রে আমরা খবর পেয়েছি যে অন্তত ২০/২৫ জন পাকসেনা আহত বা নিহত হয়েছে। লঞ্চগুলি এ্যামবুশের ভিতর পড়ে যাওয়া সত্বেও সম্পুর্নরুপে ধ্বংস করে দেয়া সম্ভব হয়নি, কারন এ্যামবুশ পার্টির নিকট রাইফেল এবং হালকা মেশিনগান ছাড়া বড় অস্ত্র, যেমন রকেট কিম্বা কামান ছিলনা, তবুও এ এ্যামবুশের ফলাফল ছিল আমাদের বিশাল সাফল্য। ফলে পাকসেনারা এ এলাকায় চলাফেরাও কমিয়ে দেয়। এতে আমাদের কর্তৃত্ব ও স্থানীয় লোকের মনোবল আরো বেড়ে যায়। এরপর হোমনা ও দাউদকান্দি থানার জনসাধারণ স্বতঃস্ফুর্তভাবে আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসে।

৪র্থ বেঙ্গলের 'বি' কোম্পানীর একটি প্লাটুন চৌদ্দগ্রাম এলাকায় পাকসেনাদের বিরুদ্ধে তাদের আমন্ত্রণ চালিয়ে যাচ্ছিল। পাকসেনারা কুমিল্লা-চট্রগ্রাম মহাসড়ক খোলার জন্য তাদের প্রচেষ্টা দিন দিন বাড়িয়ে যাচ্ছিল। যেসব সড়ক সেতু আমরা ধ্বংস করে দিয়েছিলাম সেগুলি পুনঃনির্মাণ করার চেষ্টা চলছিল। ৯ই জুলাই সকাল ৮টায় আমাদের প্লাটুনটি চৌদ্দগ্রামের উত্তরে সড়কের উপর বালুজুরি ভাঙ্গালপুলের নিকট এ্যামবুশ পাতে। ১১ টার সময় পাকসেনারা একটি সি আর বি ট্রাকে করে এবং দু'টি জিপে রাস্তা দিয়ে আসে এবং ভাঙ্গালপুলের নিকট থামে। পুলটি মেরামত করার কাজের প্রস্ত্তত চলতে থাকে। ঠিক সে সময় আমাদের এ্যামবুশ পার্টি তাদের উপর গোলাগুলি চালাতে থাকে। এর ফলে পাকসেনাদের মধ্যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। এ্যামবুশ পার্টির গুলিতে তাদের অনেক হতাহত হয়। পাকসেনারা পুলের নিকট থেকে পিছু হটে অবস্থান নেয় এবং পরে চৌদ্দগ্রাম থেকে আরও পাকসেনা এসে তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। এরপর পাকসেনারা আমাদের এ্যামবুশ অবস্থানের উপর আক্রমণের প্রস্ত্ততি নেয়। আমাদের দলটিও একটু পিছু হটে উচুঁ জায়গায় আরো শক্ত অবস্থান গড়ে তোলে। পাকসেনারা ৩টার সময় মর্টার,কামান, মেশিনগানের সহায়তায় আমাদের অবস্থানের উপর আক্রমণ করে। আমাদের দলটি সাহসিকতার সাথে এ আক্রমণের মোকাবিলা করে। আমাদের গুলিতে পাকসেনারা পর্যদুস্ত হয়ে ৩/4 ঘন্টা যুদ্ধের পর বিকেল ৫টায় আক্রমণ

পরিত্যাগ করে পিছু হটে যায়। যুদ্ধে পাকসেনাদের ৩০ জন নিহত ও ৬ জন আহত হয়। যুদ্ধক্ষেত্রের চারিদিকে মৃতদেহগুলি বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ফেলে রেখে তারা পালিয়ে যায় । পাকসেনারা পিছু হটার পর আমাদের দলটি অনেক অস্ত্রসস্ত্র দখল করে নেয় এবং শত্রুদের ক্ষতিগ্রস্ত ট্রাকটিও নিয়ে আসার চেষ্টা করা হয় কিন্তু ট্রাকটির এত বেশী ক্ষতি হয়েছিল যে এটা আনা সম্ভব হয়নি এবং ট্রাকটি সম্পূর্ণরুপে ধ্বংস করে দেয়া হয়। পাকসেনাদের যে দুজন দালাল যুদ্ধের সময় পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছিল, তারাও গুলিবিদ্ধ হয়। পাকসেনারা পিছু হটে যাবার পথ আমাদের দলটি তাদের ২/৩টি পেট্রোল ও পর্যবেক্ষন ঘাঁটিতে অবস্থিত পাকসেনাদের তাড়িয়ে দেয়। বিকেল সাড়ে চারটার সময় পাকসেনাদের ১টি জঙ্গি বিমান যুদ্ধক্ষেত্র পর্যবেক্ষন করে এবং আমাদের দলটিকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করে। কিন্তু আমাদের দলটি সেখান থেকে একটু দুরে সরে যাওয়াতে জঙ্গি বিমানটি কিছুক্ষন ঘোরাফিরা করে চলে যায়। এ সংঘর্ষেরুপর ১০জুলাই সন্ধ্যায় ১টি এ্যামবুশ পার্টি উক্ত অবস্থানের ১ মাইল দক্ষিণে লেঃ ইমামুজ্জামানের নেতৃত্বে আবার এ্যামবুশ পাতে। আমাদের ধারণা ছিল যে, পাকসেনারা আবার উক্ত সেতুর নিকট আসবে। ১০ই জুলাই সারাদিন পাকসেনাদের জন্য তারা অপেক্ষা করে থাকে কিন্তু আমাদের ধারণামত সেদিন না এসে ১১ই জুলাই ১১টার সময় পাকসেনাদের ১টা কোম্পানী দু'টি গাড়ীসহ আস্তে আস্তে ভাঙ্গা সেতুর দিকে মিয়াবাজারের দিকে অগ্রসর হয়। পাকসেনারা যখন এ্যামবুশ অবস্থানের ভিতর পৌঁছে ঠিক সে সময় এ্যামবুশ পার্টি তাদের উপর প্রচন্ড গোলাগুলি চালাতে থাকে। এতে শত্রুদের বেশ হতাহত হয়। তারা পিছু হটে গিয়ে পাল্টা আক্রমণ চালায় এবং উভয়পক্ষে যুদ্ধ সারাদিন ধরে চলতে থাকে। এ যুদ্ধে পাকসেনাদের ১০/১৫ জন আহত হয়। বিকেল ৩টায় পাকসেনারা যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করে আবার পিছু হটে যায়। আমাদের দলটি রাত ২ টা পর্যন্ত পুনরায় আক্রমনের অপেক্ষায় থাকে। এরপর বালুজুরির ভগ্নাবশেষ সেতুটি সম্পুর্নরুপে বিধ্বস্ত হলে লেঃ ইমামুজ্জামান তাঁর দলটি নিয়ে ঘাঁটিতে চলে আসে। আসার পথে চৌদ্দগ্রাম-লাকসাম রোডের উপর বাংগোডার পশ্চিমে এবং চৌদ্দগ্রামের উত্তরে আর একটি ভাঙ্গা ব্রীজের নিকট এন্টি-ট্যাঙ্ক এবং এন্টি পার্সোনাল মাইন পেতে রাখে। মাইন পাতার সময় আমাদের কমাণ্ডো প্লাটুনের দু'জন লোক দুর্ঘটনায় সামান্য আহত হয়।

এ সময় পাকিস্তানীরা চাঁদপুর থেকে ফেনী দিয়ে চট্রগ্রাম রেললাইন পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করে। আমার রাজনগর সাব-সেক্টর থেকে ক্যাপ্টেন জাফর ইমাম একটি প্লাটুন ও Engineer এর একটি দলকে Explosive সহ মিয়াবাজারের দক্ষিণে পাঠিয়ে দেয়। এ দলটি স্বরিসদি রেলওয়ে ব্রীজ সম্বন্ধে খবরাখবর নেয় এবং গোমতীর নিকট স্বরিসদি রেলওয়ে ব্রীজটি আক্রমণ করার জন্য বেছে নেয়। কিছুসংখ্যক স্থানীয় দালাল পাকবাহিনীর অস্ত্র দিয়ে এই ব্রীজটি পাহারা দিত। ১৩ই জুলাই রাত ১১টার সময় দলটি স্বরিসদি ব্রীজটি আক্রমণ করে। পাহারারত সশস্ত্র দালালদের কিছু নিহত এবং বাকীদের তাড়িয়ে দিয়ে তারা Demolition লাগিয়ে ব্রীজটিকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেয়। এর ফলে পাকিস্তানীরা শুধু ফেনী এবং গুনবতীর মধ্যে ট্রেন মাঝে মাঝে চলাচল চালু রাখত। অবশ্য এর আগে ট্রেন চলাচল করতে পারতো না। এ দলটি পাকিস্তানীদের নয়াপুর বি ও পি অবস্থানের উপর ৩ মর্টারের সাহায্যে আক্রমণ চালায়। এর ফলে দু'জন পাকসেনা নিহত ও ৭ জন আহত হয়।

১৩ই জুলাই রাত ১০টায় পাকসেনাদের দত্তসার দীঘি এবং আমতলা অবস্থানগুলির উপর ক্যাপ্টেন জাফর ইমামের নেতৃত্বে দুটি দল আক্রমণ চালায়। এ আক্রমণে পাকসেনাদের ১৫ জন আহত ও কিছু নিহত হয়। শালদা নদীতে পাকসেনারা আবার নতুন করে তাদের শক্তি বৃদ্ধি করতে থাকে। ১১ই জুলাই পাকসেনারা আমাদের শালদা নদী অবস্থানের দিকে মারমুখী পেট্রোলিং চালাতে থাকে। আমাদের সৈন্যরাও মেজর সালেকের নেতৃত্বে তাদের অবস্থানের সাহসের সঙ্গে পাকসেনাদের উপর লক্ষ রাখে। ১২ই জুলাই রাত ৮টায় পাকসেনারা প্রচন্ডভাবে আমাদের শালদা নদী অবস্থানের উপর আক্রমণ চালায়। আমাদের ৪র্থ বেঙ্গলের 'এ' কোম্পানী মেজর সালেকের নেতৃত্বে এ আক্রমণ মোকাবিলা করে। আমাদের সৈন্যদের গুলির আঘাতে পাকসেনাদের প্রচুর হতাহত হয়। তারা পর্যুদস্ত হয়ে আক্রমণ পরিত্যাগ করে রাত ১১টায় পিছু হটে যেতে বাধ্য হয়। সমস্ত রাত উভয় পক্ষে গোলাগুলি চলতে থাকে। ভোর ৫টায় পাকসেনারা ১টি ব্যাটালিয়ন নিয়ে আবার শালদা নদীর দক্ষিণে

গোরঙ্গলা অবস্থানের উপর নতুনভাবে আক্রমণ শুরু করে। সেই সঙ্গে তারা আমাদের আশাবাড়ি অবস্থানেও হামলা চালায়। এই দুই আক্রমণ ও আমাদের মেশিনগানের গুলি ও মর্টারের গোলার সামনে তারা পর্যদুস্ত হয়। পাকসেনাদের অসংখ্য হতাহত হয়। দিনের আলোতে আমাদের সৈন্যরা বাঙ্কার থেকে অগ্রসরমান শত্রুদেরকে হতাহত করে। পাকসেনারা তাদের আক্রমণ ভঙ্গ করে দিতে বাধ্য হয় এবং পিছু হটে যায়। আমাদের সৈন্যরা পলায়নপুর শত্রুদেরকে তাড়া করে। যুদ্ধের সময় আমাদের মর্টারের গোলাতে পাকসেনাদের 'চাপাইতে' অবস্থিত একটি এ্যামুনিশন এবং রেশন স্টোর এ বিস্ফোরণ ঘটে, ফলে ২১ জন আহত ও কিছু সংখ্যক নিহত হয়। ঐ দিনই লেঃ হুমায়ুন কবিরের একটি দল পাকসেনাদের লাটুমুড়াতে যে অবস্থান ছিল তার পিছনে আক্রমণ চালায় এবং বেশ কয়েকজন আহত এবং নিহত করে। পাকসেনাদের গোসাইস্থল' বি-ও-পি'র একটি টহলদার ক্যাপ্টেন গাফফারের ১টি দল সন্ধ্যা ৬টায় মন্দভাগ বাজারের শত্রু অবস্থানের উপর এবং নাক্তেরবাজার শত্রু অবস্থানের উপর মর্টারের সাহায্যে অতর্কিত আক্রমণ চালায়। এ আক্রমণে পাকসেনাদের ১২জন নিহত হয় এবং বেশ কয়েকটি বাঙ্কারও ধ্বংস হয়। পাকিস্তানীরা আমাদের মন্দভাগ অবস্থানের উপর কামানের সাহায্যে পাল্টা আক্রামণ চালায়। এতে আমাদের ১ জন নায়েক এবং ৩ জন সিপাই আহত হয়।

আমাদের স্পেশাল কমাণ্ডোরা জুলাই মাসে ৯,১০,১১তারিখে ঢাকা শহরে তাদের কার্যকলাপ আরো তীব্র করে। গেরিলা কমাণ্ডার হাবিবুল আলম এবং কাজীর নেতৃত্বে ১টি ইমপ্রুভাইসড টাইম বোমা ফার্মগেটের নিকট পাঞ্জাবীদের 'মাহরুফ রেষ্টুরেন্ট' স্থাপন করা হয়। এই রেষ্টুরেন্টে পাকসেনারা এবং দালালেরা সব সময় আসত। নির্ধারিত সময় অনুযায়ী বোমাটি বিস্ফোরিত হয় এবং এতে ১৬ জন পাকসেনা কয়েকজন দালালসহ হতাহত হয়। এর মধ্যে ৮ জন মারা যায় এবং ১২ জন আহত হয়। হলিক্রস কলেজ ভবনেও কিছু ক্ষতি হয়।

৪ জনের আর একটি গেরিলা দল ডি-আই-টি ভবনের নিকট ২ জন প্রহরারত পাকসেনাকে নিহত করে। এই পার্টি এরপর সিদ্দিকবাজারের নিকট ১টি টহলদার পাকসেনাদলকে এ্যামবুশ করে এবং ২/৩ জন পাকসেনা এতে নিহত হয়। মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক,স্টেট ব্যাঙ্ক, নাজ সিনেমা হল, ওয়াপদা ভবন ইত্যাদি স্থানে গ্রেনেড বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। এ সব ঘটনার ফলে সমস্ত ঢাকায় আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। পাকসেনারা ব্যাতিব্যস্ত ও সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। ঢাকার স্বাভাবিক অবস্থাও সম্পুর্ণ নষ্ট হয়ে যায় এবং এলাকাবাসীদের মনোবল আরো বেড়ে যায়।

জুন মাসে আমি যখন পাকসেনাবাহিনীর সঙ্গে সব ফ্রন্টে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিলাম, সে সময় আমি বুঝতে পারলাম যদিও আমাদের যোদ্ধাদের আঘাতে পাকসেনাদের প্রচুর ক্ষতি হচ্ছিল এবং যতই আমাদের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলছিল তবুও আমাদের চেয়ে তাদের শক্তি অনেকাংশে বেশি ছিল। বিশেষ করে যেখানে পাকসেনারা শক্তিশালী ঘাঁটি গড়ে বাঙ্কারে অবস্থান নেয় সেখান থেকে তাদেরকে বিতাড়িত করা আমাদের পক্ষে বিশেষ করে সবসময় সম্ভব হতোনা। আমি সবময়ে সংগঠিত গোলন্দাজ বাহিনীর অভাব অনুভব করতাম। বাংলাদেশে অবস্থিত পাকসেনাদের বেশ কয়েকটি গোলন্দাজ রেজিমেন্ট ছিল। এসব রেজিমেন্টে যেসব বাঙালী নিযুক্ত ছিল, ২৫শে মার্চের পর অনেককে পাকিস্তানীরা হত্যা ও বন্দী করে। আবার অনেকে পালিয়ে প্রাণ বাঁচায় এবং পরে সেসব গোলন্দাজ বাহিনীর সৈন্যরা আমাদের সেক্টরে যোগ দেয়। তাদের আমি বিভিন্ন বেঙ্গল রেজিমেন্টের সঙ্গে যুদ্ধে নিয়োগ করি। যুদ্ধে এসব সৈন্যরা যথেষ্ট সাহসেরও পরিচয় দিয়েছে। এসব সৈন্যদের নিয়ে আমি একটা গোলন্দাজ বাহিনী গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেই। এই পরিপ্রেক্ষিতে গোলন্দাজ বাহিনীর সব সৈন্যকে কোনাবনে একত্রিত করা হয়। একটি নতুন রেজিমেন্ট গড়ে তোলার জন্য যথেষ্ট কষ্টের সম্মুখিন হতে হয় এবং সেই কষ্ট নতুন রেজিমেন্টটিকেও বহন করতে হয়। এদের কোন থাকার জায়গা ছিলনা, খাওয়া এবং রান্নার কোন ব্যবস্থাও ছিলনা। রেজিমেন্টের জন্য বিভিন্ন রকমের প্রকৌশলী লোকের দরকার হয়, কিন্তু সব রকমের সৈন্য আমাদের ছিলনা। তাছাড়া সবচেয়ে বড় জিনিস কামান এবং অন্যান্য সরঞ্জামাদি, যা একটি গোলন্দাজ বাহিনীর জন্য নিতান্ত প্রয়োজন ছিল। আমি পার্শ্ববর্তী বন্ধুরাষ্ট্র ভারতের মিলিটারী অধিনায়কদের সঙ্গে গোলন্দাজ বাহিনীর প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এবং অস্ত্রের জন্য অনুরোধ জানাই। অনেক ছোটাছুটির পর তারা কয়েকটি ৩.৭ ইঞ্চি ছোট

কামান আমাদের দেয়। এই কামানগুলি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়কার ছিল এবং সম্ভবতঃ সেকেল হিসেবে পরিত্যক্ত ছিল কিন্তু তবুও এগুলি পাবার পর আমার গোলন্দাজ বাহিনীর লোকদের মধ্যে একটি নতুন সাড়া জাগে। তারা তৎক্ষণাৎ এই কামানগুলি প্রশিক্ষন নিতে শুরু করে দেয়। প্রকৌশলী লোকের অভাব থাকায় বেঙ্গল রেজিমেন্ট এবং গণবহিনী থেকে লোক ভর্তি করে তাদের ট্রেনিং দেয়া হয়। এ সময় ক্যাপ্টেন পান্না পাকিস্তান থেকে কোন রকমে সীমান্ত অতিক্রম করে পালিয়ে এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দেয়। তিনি গোলন্দাজ বাহিনীর লোক ছিলেন। ক্যাপ্টেন পান্না রাতদিন খেটে আমাদের এই গোলন্দাজ বাহিনীরকে ট্রেনিং করিয়ে শত বাধা-বিপত্তি ডিঙ্গিয়ে মোটামুটি যুদ্ধের জন্য উপযুক্ত করে তোলেন। এভাবে বাংলাদেশের প্রথম গোলন্দাজ বাহিনীর জন্ম হয়। জন্মের পর থেকে ফার্স্ট ফিল্ড রেজিমেন্ট বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে জুলাই মাস থেকে আমরা কয়েকটি সাব-সেক্টরে কমাণ্ডার অপারেশনকে ফলপ্রসু করে তোলে। বিশেস করে শালদা নদী, কোনাবনে প্রথম এই ফিল্ড রেজিমেন্ট এর সহায়তার জন্যই পাক বাহিনীর বার বার আক্রমণ ক্যাপ্টেন গাফফার এবং মেজর সালেক প্রহিতহ এবং পর্যদুস্ত করতে সক্ষম হয়। ক্যাপ্টেন পাশার নেতৃত্বে আমাদের সদদ্য ট্রেনিংপ্রাপ্ত গোলন্দাজ ব হিনীর সৈন্যরা অনেক সময় এমনভাবে পাকসেনাদের উপর আক্রমণ চালিয়েছে যে গোলন্দাজ বাহিনীর ইতিহাসে তার বিরল। পাকসেনাদের নিকট ছিল অত্যাধুনিক কামান, আর সেসব কামানের গোলা নিক্ষেপের ক্ষমতা ছিল বেশি। সব সময় পাকসেনাদের চেষ্টা ছিল তাদের কামানের গোলাতে আমাদের এই ছোট পুরাতন কামানগুলিকে বিনষ্ট করে দেয়া। সেজন্য দিনরাত আমাদের প্রথম ফিল্ড রেজিমেন্ট কোন জায়গাতেই বেশীক্ষন এক স্থানে থাকতে পারতনা। সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানীদের গোলা তাদের উপর পড়ে। তাছাড়া আমাদের পুরাতন কামানগুলির গোলা ক্ষেপণের দুরত্ব ছিল পাকিস্তানীরদের অর্ধেকের কম। সে কারণে অধিকাংশ সময় আমাদের প্রথম ফিল্ড রেজিমেন্ট-এর লোকেরা তাদের কামানগুলি মাথায় করে নিকটে বা পশ্চাতে দুর্গম রাস্তায় নিয়ে যেত এবং শত্রুদের উপর আক্রমণ করত। এসব আক্রমণের ফলে পাকসেনারা ব্যাতিব্যস্ত হয়ে পড়তো। ফার্ষ্ট ফিল্ড রেজিমেন্ট-এর কৌশল কতকটা কমাণ্ডো ধরনের। পরবর্তী পর্যায়ে প্রথম ফিল্ড রেজিমেন্ট আমাদের মুক্তিবাহিনী যখন ডিসেম্বর মাসে ফেনী, নোয়াখালি এবং চট্রগ্রামের দিকে অগ্রসর হয়, তখন ‘কে’ ফোর্সের ৪র্থ বেঙ্গল, ১০ম বেঙ্গল এবং ৯ম বেঙ্গলকে পাক বাহিনীদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সাহায্য করে। গোলন্দাজ বাহিনীর জন্য হবে এটা গৌরবের দৃষ্টান্ত।

জুলাই মাসের ১২ তারিখে লেঃ হুমায়ুন কবির সি এন্ড বি রাস্তার উপর একটি প্লাটুনের পেট্রোল পাঠায়। এই পেট্রোলটি শত্রুর গতিবিধি সম্বন্ধে খবরাখবর নেবার জন্য কুটি পর্যন্ত অগ্রসর হয়। দুপুর দু'টার সময় এই পেট্রোল পার্টি যখন কুটির নিকট দিয়ে টহল দিচ্ছিল তখন তারা দেখতে পায় অনেক গাড়ীতে কুমিল্লা থেকে পাকিস্তানীরা সৈন্য সমাবেশ করছে। কুটিতে গাড়ী থেকে নেমে ওদের একটি ব্যাটালিয়ানের মত দধল মন্দভাগ বাজারের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। আমাদের পেট্রোলটি বুঝতে পারে যে, এই পাকসেনারা নয়নপুর, মন্দভাগ বাজার এবং লাটুমুড়া টি, আলীর বাড়ির নিকট নিজট অবস্থান গলি শক্তিশালী করার জন্য যাচ্ছে। মন্দভাগ বাজারের দলটি বাজারের দিকে এসে অবস্থান নেয় এবং দোকানের ভিতর বাঙ্কার তৈরী করতে থাকে। এ ছাড়া তাদের অবস্থানের চতুর্দিকে পাট এবং ধান কেটে পরিস্কার করে ফেলে যাতে তাদের গুলি সামনে আমাদের অবস্থানে এসে পড়ে। এসব সংবাদ পেট্রোল হেডকোয়ার্টারে পৌঁছে। সংবাদ পাবার পর আমি পাকসেনাদের ঘাঁটিগুলি শক্তিশালী হয়ে ওঠার আগেই তাদের উপর আঘাত হানার সিদ্ধান্ত নেই। ক্যাপ্টেন গাফফারকে ৪র্থ বেঙ্গলের ‘সি’ কোম্পানী দিয়ে ফার্স্ট ফিল্ড রেজিমেন্টের কামানগুলি মন্দভাগ বাজারের নিকট পর্যন্ত অগ্রসর হয়। সন্ধা হবার আগেই ছোট ছোট কয়েকটি দল পাঠিয়ে বাজারটি এবং শত্রু অবস্থানটি সম্পুর্ণ খবরাখবর নেয়। সন্ধ্যায় ক্যাপ্টেন গাফফার তার কোম্পানী এবং ফার্স্ট ফিল্ড রেজিমেন্ট-এর সহায়তায় মন্দভাগ বাজারের শত্রু অবস্থানের উপর অতর্কিতে আক্রমণ চালায়। আমাদের কামানগুলি গোপনপথে নৌকাযোগে বাজারের পাশ্ববর্তী গ্রামে অবস্থান নেয়। ক্যাপ্টেন

গাফফারের আক্রমণের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে কামানগুলি থেকে অতি নিকটবর্তী শত্রু অবস্থানের বাঙ্কারগুলি এবং বাজারের ঘরগুলিকে প্রচন্ড গোলাবর্ষন করতে থাকে, ফলে অনেক বাঙ্কার এবং ঘর ধ্বংস হয়ে যায় এবং বাজারে অবস্থিত পাকসেনারা আহত ও নিহত হয়। এত নিকট থেকে অতর্কিত কামানের গোলার আক্রমণ পাকসেনারা আশা করতে পারেনি। কিছুক্ষনের মধ্যেই পাকসেনাদের অন্তত ৬০/৭০ জন লোক হতাহত হয়। পাকসেনাদের আর্তনাদ এবং চিৎকার আমাদের লোকেরাও শুনতে পায়। কিছুক্ষণের মধ্যে তাদের প্রতিরোধশক্তি ক্ষীণ হয়ে আসে এবং তারা অবস্থান ছেড়ে পালিয়ে যায়। দু'ঘন্টা যুদ্ধের পর মন্দভাগ বাজার এবং অনেক অস্ত্রসস্ত্র ক্যাপ্টেন গাফফারের দখলে আসে। এরপর মন্দভাগ দেশ স্বাধীন হওয়া পর্যন্ত আমাদের দখলে থাকে। এর পরদিন আমাদের একটি পার্টি শালদা নদীতে এ্যামবুশ পাতে। পাকসেনাদের একটি স্পীডবোট দুপুর ১টায় এ্যামবুশে পড়ে যায়। এ্যামবুশ পার্টির গুলিতে স্পীডবোটটি ধ্বংস হয়ে যায় এবং ২০জন পাকসেনা হতাহত হয়। কেউ কেউ নদীতে পড়ে ভেসে যায়। এ্যামবুশ পার্টিটি পরে নিরাপদে মন্দভাগ অবস্থানে আসে। আমাদের হেডকোয়ার্টারে খবর পাই যে, দাউদকান্দিতে পাকসেনারা ফেরীঘাটের নিকটে ঘাঁটি স্থাপন করেছে। এখানে প্রায় দু' কোম্পানীর মত পাকসেনা বাঙ্কার নির্মাণ করে ঘাঁটিটি বেশ শক্তিশালী করে তোলে। এখানে পাকসেনারা ঢাকা-কুমিল্লাগামী প্রতিটি গাড়ী দাঁড় করিয়ে অনুসন্ধান চালায়। তাছাড়া নিকটবর্তী এলাকা স্পীড বোট এ টহল দেয়। আমরা একটি প্লাটুন দাউকান্দিতে পাঠিয়ে দেই। এদের সঙ্গে আর একটি দল পাঠান হয় সৈয়দনগর অয়ারলেস স্টেশন এবং ইলিয়টগঞ্জ রাস্তার সেতু ধ্বংস করার জন্য। আমাদের দলগুলি দাউদকান্দিতে যেয়ে গৌরীপুর নামক স্থানে তাদের ঘাটি তৈরী করে। এরপর শত্রুদের গতিবিধি সম্বন্ধে খবর নেয় । ১৩ই জুলাই সন্ধ্যা ৮টার সময় প্লাটুনটি দাউদকান্দির উত্তরে গোমতী নদীতে পাকসেনাদের একটি টহলদারী স্পীডবোটকে এ্যামবুশ করে। এই এ্যামবুশে একজন লেফটেন্যান্ট এবং ২০ জন পাকসেনা নিহত হয়। অফিসারটির ব্যাঙ্কের ব্যাজ এবং অন্যান্য অস্ত্রসস্ত্র নিয়ে আসা হয়। এরপর এই দলটি পরদিন রাতে সৈয়দনগর অয়ারলেস স্টেশনটি ধ্বংস করে দেয়। দলে অপর অংশ ইলিয়টগঞ্জ নতুন সেতুটি ডেমোলিশন লাগিয়ে দুটি স্প্যান উড়িয়ে দেয়া হয়। তাদের কাজ সম্পুর্ণ করে দলগুলি নিরাপদে হেডকোয়ার্টারে ফেরত আসে।

কুমিল্লা-চাঁদপুর রাস্তায় হাজিগঞ্জের নিকট রামচন্দ্রপুরের ব্রীজ উড়িয়ে দেয়ার পর পাকসেনাদের যোগাযোগ ব্যবস্থার বেশ অসুবিধা হয়। পাকসেনারা ঔ জায়গাতে ফেরীর বন্দোবস্ত করে। এই ফেরী যোগাযোগ বিনষ্ট করার জন্য লেঃ মাহবুব একটি কোম্পানী রামচন্দ্রপুরে পাঠায়। ৬ই জুলাই ভোরে এই দলটি রামচন্দ্রপুরফেরীঘাটের নিকট এসে এ্যামবুশ পাতে। এই দলের অন্য অংশ ফেরী ঘাট থেকে আরও দক্ষিণে আর একটি এ্যামবুশ পাতে। ঐ দিনই সকাল ৭টার সময় পাকসেনাদের ১টি দল রামচন্দ্রপুর ফেরীঘাটে আসে। তাদের জিনিসপত্র তখন ফেরীঘাটে উঠছিল ঠিক সেইসময় এ্যামবুশ পার্টি তাদের উপর গুলি চালায়। এতে পাকসেনাদের ৪জন নিহত হয়। উভয়পক্ষে প্রায় ঘন্টাখানেক গোলাগুলি চলে। গোলাগুলির সংবাদ পেয়ে চাঁদপুর থেকে পাকসেনাদের প্রায় দু' কোম্পানী সৈন্য সাহায্যের জন্য আসে। পাকসেনারা ফেরীঘাটের কিছু দূরে এসে গাড়ী থেকে নামে এবং এ্যামবুশ অবস্থানে অগ্রসর হবার জন্য প্রস্তুত হয়। ছিক সেই সময়ে আমাদের অন্য এ্যামবুশ পার্টিটি তাদের উপর অতর্কিত আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণে পাকসেনারা সম্পুর্ণ ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় এবং তাদের ৩১জন নিহত এবং ৫৪ জন আহত হয়। আমাদের এনসিও এবং একজন সিপাই গুরুতরভাবে আহত হয়। এরপর আমাদের দলটি এ্যামবুশ অবস্থান পরিত্যাগ করে। আসার পথে ৮ই জুলাই মুদ্দাফরগঞ্জ সড়কসেতুটি উড়িয়ে দিয়ে আসে। এরপর পাকসেনারা সেতুটির নিকটবর্তী কয়েকটি গ্রামেমর্টারের সাহায্যে গোলাগুলি করে। সে সময়ে পাকসেনাদের অভ্যর্থনার জন্য অনেক স্থানীয় দালাল শান্তি কমিটি সভার আয়োজক এবং মিছিল করে পাকসেনাদের অভ্যর্থনার জন্য এগিয়ে যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এই মিছিলের উপর গুলি চালিয়ে অনেককে তাদের হত্যা করে।

আমাদের চাঁদপুর কোম্পানী যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করার কার্যকলাপ আরও বৃদ্ধি করে। স্থানীয় লোকদের সহায়তায় হাজীগঞ্জ এবং লাকসাম, চাঁদপুর ও কুমিল্লার সি-এন্ড-বি রাস্তা ও রেলও য় সড়কের

গজ কেটে ধ্বংস করে দেয়া হয়। এ সময়ে পাকিস্তানীরা পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ইঞ্জিনিয়ার, ইঞ্জিন ড্রাইভার এবং শ্রমিক এনে রাস্তা মেরামত করার চেষ্টা চালায়। আমাদের গেরিলারা এইসব পাকিস্তানী রেলওয়ে কর্মচারীদের মেরে সেখান থেকে তাড়িয়ে দেয়। এর ফলে রেল এবং সড়ক যোগাযোগ সম্পুর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। নিরুপায় হয়ে ২৬শে জুলাই পাক বাহিনী একটি কোম্পানীকে চাঁদপুর থেকে এই এলাকায় পাঠায়। পাকসেনাদের এই কোম্পানীটি রেলওয়ে লাইনের সঙ্গে সঙ্গে লাকসামের দিকে অগ্রসর হয়। ঠাকুরবাজারের নিকট আমাদের একটি এ্যামবুশ পার্টি আগে থেকেই অবস্থান নিয়েছিল। দুপুর ২টার সময় পাকসেনাদের এই কোম্পানীটি যখন এ্যামবুশ অবস্থানের মাঝে আসে তখন আমাদের দলটি তাদের উপর আক্রমণ চালায়। ফলে পাকসেনাদের একজন জে-সি-ওসহ ২২ জন পাকসেনা আহত হয়। পাকসেনারা ছত্রভঙ্গ হয়ে চাঁদপুর পলায়ন করে। এর পরদিন আমাদের গেরিলারা ‘মধু রেলওয়ে স্টেশনের নিকট রেলওয়ে এবং সড়কসেতু ধ্বংস করে দেয় এবং যে পাকিস্তানী ইঞ্জিনিয়ার পরিদর্শনের জন্য আসে, তাকেও আহত করে।

আমাদের ঢাকার গেরিলা দল তাদের কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছিল। বৃটিশ সরকারের একটি পার্লামেন্টারী দল বাংলাদেশের সে সময়ের পরিস্থিতি সরেজমিনে জানার জন্য ঢাকায় আসে। এই দলটি ঢাকা ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে অবস্থান করছিল। ২৪শে জুন সকাল সাড়ে সাতটায় হোটেলের ভিতরে লবীতে বসে বিমান বন্দরে যাবার অপেক্ষা করছিল। ঠিক সে সময় আমাদের ৩জন গেরিলা হোটেলের সামনে বারান্দায় দুটি গ্রেনেড বিস্ফোরণ ঘটায় এবং পরিষদীয় দলটিকে ঢাকার পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করায়। এর ক’দিন পর আমাদের গেরিলারা জানতে পারে যে নারিন্দার ‘গৌরিমা মন্দিরে’ পাকিস্তানীদের অনেক দালাল সমবেত হয়ে আলোচনার আয়োজন করছে। দালালেরা যখন আলোচনায় ব্যাস্ত, ঠিক সেইসময় আমাদের গেরিলারা আলোচনা সভায় একটি বিস্ফোরণ ঘটায়। এতে প্রায় ২০/২৫ জন পাক দালাল হতাহত হয়। ঢাকার গেরিলা দল টিএন্ডটি বিভাগের একজন পাকিস্তানী উর্ধ্বতন কর্মচারীর গাড়ীত এম-১৪ মাইন দিয়ে বুবিট্র্যাপ লাগিয়ে রাখে। ফলে পাকিস্তানী অফিসারটি গাড়ীসুদ্ধ শেষ হয়ে যায়। পাকিস্তানী অফিসাররা মাঝে মাঝে ধানমন্ডির ‘সাংহাই’ চাইনিজ রেষ্টুরেন্টে সন্ধ্যাভোজে আসত। এ সংবাদ পাবার পর আমাদের ১টি গেরিলা দল ৮ই জুলাই রাত ৯টায় পাকিস্তানী অফিসাররা সেখানে আসলে তাদের উপর গ্রেনেড ছোড়ে। ফলে২/৩ জন পাকিস্তানী অফিসার নিহত হয়। পাকিস্তানী পুলিশরা এ সময়ে রাতে ট্যাক্সিতে কিংবা জীপে ঢাকার বিভিন্ন রাস্তায় পেট্রোলিং করত। এসব টহলদার পাকিস্তানী পুলিশদের এ্যামবুশ করার জন্য ঢাকার গেরিলদল একটি পরিকল্পনা নেয়। তাদের গতিবিধি সম্বন্ধে সম্পুর্ণ খবরাখবর নেয়া হয়। ১০ই জুলাই ১টি পাকিস্তানী টহলদার পুলিশ পার্টি ধানমন্ডি রাস্তা নং ২-এর দিক যাচ্ছিল। গেরিলাদের একটি পার্টি তাদের পিছু নেয়। পুলিশদের পেট্রোলটি ২ নং রাস্তার মোড়ে যখন তাদের গতি কমিয়ে দেয়, ঠিক সে সময় গেরিলারা পুলিশের গাড়ীতে একটি গ্রেনেড নিক্ষেপ করে। সঙ্গে সঙ্গে গাড়িটি ধ্বংস হয়ে যায়। এতে একজন অফিসারসহ ৫ জন পাকিস্তানী পুলিশ নিহত হয়। আমাদের গেরিলা দলটি নিরাপদে সে স্থান পরিত্যাগ করে। এর কদিন পর আমাদের আর একটি গেরিলা দল নিউ বেইলী রোডে পাক বাহিনীর একটি জীপের উপর আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণে ৩/৪ জন পাক সেনা নিহত হয় এবং জীপটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

নারায়ণগঞ্জে অবস্থিত আমাদের গেরিলা দলটি পোস্ট অফিসের ভিতর বিস্ফোরণ ঘটায় এবং মণ্ডলপাড়া ও চৌধুরীবাড়ী ইলেক্ট্রিক সাবস্টেশনটি ১২ই জুলাই রাত সাড়ে ১০ টার সময় ধ্বংস হয়। এ ছাড়া সিদ্ধিরনগর ও আশুগঞ্জের সাথে একটি বৈদ্যুতিক পাইলন উড়িয়ে দেয়। সিদ্ধিরগঞ্জ এবং নরসিংদীর মাঝে দুটি বৈদ্যুতিক পাইলন ধ্বংস করে দেয়। এর ফলে কাঞ্চন এবং কালীগঞ্জের বেশ কয়েকটি শিল্প কারখানা বিদ্যুতের অভাবে বন্ধ হয়ে যায়। এর কিছুদিন পর ফতুল্লা এবং ঢাকার মাঝে পাগলা রেলওয়ে সেতুটি উড়িয়ে দেয়। ফলে নারায়নগঞ্জ এবং ঢাকার মাঝে ট্রেন যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। এ সময়ে আমার হেডকোয়ার্টারে খবর আসে যে, পাক সরকার পাকবাহিনীর তত্ত্বাবধানে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা নেয়ার প্রস্ততি নিচ্ছে। এই পরীক্ষাকে বানচাল করে দেয়ার জন্য আমরাও একটা পরিকল্পনা নিই।এই পরিকল্পনানুযায়ী আমার হেডকোয়ার্টার থেকে ঢাকার গেরিলা

দলগুলিকে নির্দেশ পাঠিয়ে দেয়া হয়। এই নির্দেশ অনুযায়ী পরীক্ষার দিন সিদ্ধেশ্বরী স্কুল এবং আরো অন্যান্য স্কুলে পরীক্ষার ঠিক পুর্ব মুহূর্তে গ্রেনেড বিস্ফোরণ করানো হয়। ফলে খুব কমসংখ্যক ছেলেমেয়ে পরীক্ষা দেয়ার জন্য পরীক্ষা হলে আসে। ১৫ই জুলাই রাতে একটি গেরিলা দল বকশীবাজারে অবস্থিত বোর্ড অফিস আক্রমণ করে। ডিমোলিশন দিয়ে বোর্ড ভবনের বেশ কিছু অংশ দেয়া হয়। তার ফলে বোর্ড বেশকিছু দলিল এবং কাগজপত্র ধ্বংস হয়ে যায়। এর ফলে এই পরীক্ষা প্রহসনে পরিণত হয় এবং অনেক ছাত্রছাত্রী ইচ্ছাকৃতভাবেই পরীক্ষা বর্জন করে।

হাবিলদার গিয়াসের নেতৃত্বে আমাদের মুরাদনগরের দলটি ১৬ই জুলাই রাত ১টার সময় ইলিয়টগঞ্জের দেড় মাইল পশ্চিমে পুটিয়া গ্রামের সামনে কুমিল্লা-দাউদকান্দি সড়কের উপর কয়েকটি এন্টি-ট্যাংক মাইন পুঁতে রাখে। পরদিন সকালে পাকবাহিনীর নিয়ন্ত্রনাধীনে একটি ওয়াপদা ট্রাক মাইনের উপর বিস্ফোরিত হয়। ফলে ট্রাকটি ধ্বংস হয়ে যায়। ট্রাকে অবস্থানরত একজন পাকসেনা, দুজন রাজাকার ও ড্রাইভারসহ সবাই নিহত হয়। ফলে ৫ জন পাকসেনা,১ জন পাক মেজর ও ৬জন রাজাকার নিহত হয়। এই সংবাদ পেয়ে কুমিল্লা থেকে পাকসেনারা ৩০টি গাড়ীতে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। পাকসেনাদের গাড়ীগুলি ঘটনাস্থল থেকে অনেক দূরে এসে দাঁড়ায়।

সামনের গাড়ী থেকে বেশ কিছুসংখ্যক পাকসেনা নেমে আস্তে আস্তে ঘটনাস্থলের দিকে অগ্রসর হয়। তারা রাস্তার পাশ দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল। অগ্রসর হবার সময় আমাদের পুঁতে রাখা এন্টি-পার্সোনাল মপাইনের বিস্ফোরণে তাদের ৬/৭ জন নিহত হয় এবং আরও অনেক আহত হয়। এরপর পাকসেনারা আর সম্মুখে অগ্রসর হয়নি। সমস্ত দিন পাকসেনারা মাইন ডিটেকটরের সাহায্যে ঘটনাস্থলের চতুর্দিকে তন্ন তন্ন করে তল্লাশী চালায়। সমস্ত বেসামরিক যাতায়াতও বন্ধ হয়ে যায়। এরপর পাকসেনারা পাশ্ববর্তী গ্রামগুলিতে মুক্তিবাহিনীর সন্ধানে যথেষ্ট তল্লাসী শুরু করে। হাবিলদার গিয়াসের দলের একজন নায়েক মোস্তফা কাপমাল স্থানীয় লোকদের সাথে মিশে পাকসেনাদের দুরবস্থা দেখে। দাউদকান্দি থেকে পশ্চিমে নারায়নগঞ্জে এবং দাউদকান্দি সড়কের উপর বাউসিয়ায় একটি গুরুত্বপুর্ণ সেতু ছিল। এই সেতুটি সম্পুর্ণ কংক্রিটের তৈরী এবং বেশ মজবুত। এই সেতুটি ধ্বংস করার জন্য জুলাই মাসের প্রথমে আমি মোঃ রফিক নামে একজন বিশেষ ট্রেনিংপ্রাপ্ত গেরিলাকে মনোণিত করি। তার সঙ্গে আরেকটি গেরিলাকে দিয়ে এই সেতুররেকি করার জন্য পাঠাই। মোঃ রফিক সেতুটি পুঙ্খানুপুঙ্করুপে রেকি করে এবং একটি নকশা বানিয়ে নিয়ে আসে। এরপর অধ্যাপক মুনির চৌধুরীর ছেলে ভাষণের নেতৃত্বে ১০জনের একটি ডিমোলিশন পার্টিকে রফিককে সঙ্গে দিয়ে বাউসিয়া সেতুটি ধ্বংস করার জন্য পাঠিয়ে দেই। এই দলটি প্রথম মুরাদনগরে গিয়ে তাদের স্থায়ী ঘাঁটি করে। এর পরপর তারা গোমতী নদী পার হয়ে বাউসিয়াতে পৌঁছে। সেখানে একদিন থাকার পর স্থানীয় গেরিলাদের সাহায্যে নিয়ে ১২ই জুলাই রাতে বাউসিয়া সেতুতে ডেমোলিশন লাগায় কিন্তু ডেমোলিশন বিস্ফোরণের সময় ‘ইগনিশ’ ঠিকমত কাজ করে না। ইত্যবসরে স্থানীয় দালাল চেয়ারম্যান এবং রাজাকার পাক বাহিনীদের খবর। পাকবাহিনী এবং রাজাকার অকস্মাৎ ভাষণের ডিমোলিশন পার্টির উপর আক্রমণ চালায়। আক্রমণে ভাষণের দলের ৩জন গেরিলা গুরুতর ভাবে আহত হয়। এই ৩ জনের মধ্যে ১জন স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা আবদুর রাজ্জাক কোরাইশীও ছিল। গেরিলা দলটি ইগনিশনকাজ না করার দরুন সেতু উড়িয়ে দিতে ব্যর্থ হয়ে পাক বাহিনীর আক্রমণের চাপে অবস্থান পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়। এর ফলে আমাদের যথেষ্ট ক্ষতি হয়। যদিও আহত গেরিলাদের সঙ্গে আনতে সক্ষম হয় কিন্তু যেসব বিস্ফোরক সেতুটি লাগানো হয়েছিল সেগুলি উঠিয়ে আনা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়না এবং তারা ২৬০ পাউণ্ড আই-এন-টি সেখানেই ফেলে রেখে হেডকোয়ার্টারে ফেরত আসে। এত বিরাট পরিমাণ আই এনটির শত্রুর হাতে পড়া ও নষ্ট হয়ে যাওয়া আমাদের পক্ষে একটা বিরাট ক্ষতির কারণ। ঐ সময়ে বিস্ফোরক দ্রব্যাদি আমাদের খুব কম ছিল। অনেক চেষ্টার পর হয়ত কিছু কিছু আমা যোগাড় করতে সক্ষম হতাম। ঢাকা-কুমিল্লা রাস্তা বন্ধ করে দেয়া আমার লক্ষ ছিল। সেই লক্ষে এইভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ায় আমি যথেষ্ট চিন্তিত হয়ে পড়ি এবং পরপরই আবার বিস্ফোক যোগাড়ের চেষ্টায় থাকি। ২/৩ সপ্তাহ পরে অনেক

কষ্টে আবার কিছু পরিমাণ আই-এন-টি সংগ্রহ করতে সক্ষম হই। আই-এন-টি যোগাড়ের পর আমি মোঃ রফিককে ডেকে পাঠাই। শেষ পর্যন্ত আমরা বাউসিয়ার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করতে সমর্থ হয়েছিলাম। লাটুমুড়াতে লেঃ হুমায়নের নেতৃত্বে যে কোম্পানী অবস্থান নিয়েছিল, সেই অবস্থানের উপর পাক বাহিনী তাদের চাপ অব্যাহত রাখে। লাটুমুড়ার অবস্থান থেকে আমাদেরকে বিতাড়িত করার চেষ্টা করে। লেঃ হুমায়নের কোম্পানীটি পাক বাহিনীর প্রচন্ড চাপের মুখেও তাদের অবস্থানটি সাহসের সঙ্গে ধরে রাখে। মুক্তিযোদ্ধারা এই অবস্থান থেকে প্রায়ই পাকসেনাদের উপর অতর্কিত আক্রমণ চালাতে থাকে। ১৭ই জুলাই বিকেল ৪টায় আমাদের ও-পি দেখতে পায় যে, লাটুমুড়া থেকে একটি শত্রুদল চন্দ্রপুর শত্রুঅবস্থানের দিকে এগিয়ে আসছে। লেঃ হুমায়ুন কবির তৎক্ষণাৎ একটি প্লাটুন চন্দ্রপুরের রাস্তায় পাকসেনাদের এ্যামবুশ করার জন্য পাঠিয়ে দেয়। প্লাটুনটি চন্দ্রপুর থেকে একটি দূরে অবস্থান নিয়ে পাকসেনাদের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। পাকসেনারা যখনই সেই অবস্থানে পৌঁছে, ঠিক তখনই তাদের উপর অতর্কিত আক্রমণ চালানো হয়। ফলে৪জন পাকসেনা নিহত এবং আহত হয়। পাকসেনারা এ্যামবুশ থেকে বাঁচার জন্য লাটুমুড়ায় পলায়ন করে।

২০শে জুলাই সকাল ৯টার সময় ১টি প্লাটুন পাকসেনাদের ইয়াকুবপুর, চন্দ্রপুর এবং বাগানবাড়ী অবস্থানের উপর অতর্কিত আক্রমণ করার জন্য পাঠানো হয়। এই প্লাটুনটি গোপন পথে গ্রামের ভিতর দিয়ে পাকসেনাদের অবস্থানের অতি নিকটে যেতে সমর্থ হয়। রেকি করার পর তারা দেখতে পায় যে, পাকসেনাদের কিছু লোক বিভিন্ন বাঙ্কারের উপর বসে চা পান করছে, এবং তাদের প্রহরার ব্যবস্থা বেশ শিথিল। এছাড়াও আরও ৩/৪টি দল বাঙ্কারের উপর দাড়িয়ে ছিল। তাদের একজন ও-পি গাছের উপর বসা ছিল। আমাদের প্লাটুনটি জঙ্গলের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয়ে তাদের বাঙ্কারগুলির উপর আক্রমণ চালায়। গোলাগুলিতে যেসব পাকসেনা বাঙ্কারের উপর বসে চা পানে ব্যস্ত ছিল এবং দাড়িয়েছিল. তারা সঙ্গে সঙ্গে আহত ও নিহত হল। নিকটবর্তী একটি ঘর থেকে কিছু পাকসেনা বেরিয়ে আসে এবং বাঙ্কারের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করে তারাও আহত ও নিহত হয়। এরপর পাকসেনাদের প্রতি আক্রমণ করারা আগেই আমাদের প্লাটুনটি অবস্থান ত্যাগ করে নিজেদের এলাকায় নিরাপদে ফিরে আসে। এই সংঘর্ষের ফলে ১৩ জন পাকসেনা নিহত ও ১০ জন আহত হয়। আমাদের একজন গুরুতর ভাবে আহত হয়।

শালদা নদীতে পাকসেনাদের বিরুদ্ধে ৪র্থ বেঙ্গলের ‘এ’ কোম্পানী এবং‘সি’ কোম্পানী তাদের তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। পাকসেনারা শালদা নদী রেলওয়ে ষ্টেশন থেকে নয়ানপুরের দিকে অগ্রসর হবার চেষ্টা করছিল। ১৭ ই জুলাই তাদের একটি দল রেলওয়ে ষ্টেশনের প্রায় এক হাজার গজ দক্ষিনে মনোরা রেলওয়ে ব্রীজ পর্যন্ত অগ্রসর হয়। ব্রীজের কাছে এসে পাকসেনাদের দলটি ব্রীজের চতুর্দিকে বাঙ্কার তৈরীর প্রস্তুতি নেয়। বেলা সাড়ে ১২ টার সময় ‘এ’ কোম্পানীর একটা প্লাটুন মর্টারসহ পাকসেনাদের এই দলটির উপর অতর্কিত আক্রমণ চালায়। এ আক্রমণের ফলে পাকসেনারা সম্পূর্ণ ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় এবং তাদের বেশকিছু লোক আহত ও নিহত হয়। পাকসেনারা উপায়ন্তর না দেখে আবার শালদা নদীতে পিছু হটে যায়। পরদিন সকাল ৯টার সময় শালদা নদী থেকে পাকসেনারা আবার মনোরা ব্রীজের দিকে অগ্রসর হয়। সকাল ৯টায় আমাদের সৈনিকরা আবার তাদের বাধা দেয় এবং পাকসেনাদের উপর মর্টার এবং কামানের গোলা নিক্ষেপ করে। ফলে পাকসেনাদের ৪ জন লোক নিহত এবং ১০ জন আহত হয়। পাকসেনারা আর অগ্রসর না হয়ে পিছু হটে মনোরা ব্রীজের উত্তরে অবস্থান নেয়। ১৯শে জুলাই পাকসেনারা ব্রীজের দক্ষিণে আবার অবস্থান নেয় বাঙ্কার খোঁড়ার চেষ্টা করে। এবারও পাকিস্তানীরা আমাদের মর্টার, কামান এবং মেশিনগানের গোলাগুলিতে অনেক হতাহত হয়ে পিছু হটতে বাধ্য হয়। পরে স্থানীয় লোকের কাছে জানা যায় যে, পাকসেনারা আহত ও নিহত সঙ্গীদের নৌকায় করে পিছনে নিয়ে যায়। এদের সঠিক সংখ্যা সম্বন্ধে তাৎক্ষনিকভাবে সংবাদ জানা না গেলেও পরে জানা যায় ৮ জন নিহত এবং ১৪ জন আহত হয়। ২১শে জুলাই সন্ধ্যায় ৪র্থ বেঙ্গলের ‘এ’ কোম্পানীল একটা প্লাটুন শালদা

নদীর অবস্থানের ভিতর অতর্কিত আক্রমণ চালায়। আক্রমনের ফলে ৮ জন পাকসেনা নিহত ও ৭ জন আহত হয়। দেড় ঘন্টা যুদ্ধের পর আমাদের দলটি শত্রু অবস্থান পরিত্যাগ করে নিরাপদে ঘাঁটিতে ফিরে আসে। এই আক্রমনের সাথে আমাদের ফার্স্ট ফিল্ড রেজিমেন্ট পাকসেনাদের উপর আক্রমণ চালিয়ে বহু পাকসেনাকে হতাহত করে। জুলাই মাসে কুমিল্লায় পাকসেনারা স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল এবং কিছুটা সফলও হয়েছিল। এ সময় কুমিল্লা শহরের বিভিন্ন স্থানে পাকসেনারা তাদের ক্যাম্প গড়ে তুলেছিল। এসব ক্যাম্প থেকে তারা ঘন ঘন টহল চালাত। কুমিল্লায় পাকসেনাদের এই তৎপরতা খর্ব করার জন্য আমাদের গেরিলাদের ২০ জনের একটি দল একটি ৩ ইঞ্চি মর্টারসহ কুমিল্লার উত্তরে অনুপ্রবেশ করে। ২০শে জুলাই সকাল সাড়ে ১০ টার সময় গেরিলাদের এই দলটি কুমিল্লা শহরে পাকসেনাদের বিভিন্ন অবস্থানের উপর মর্টারের সাহায্যে গোলা নিক্ষেপ করে। একটি গোলা আজাদ স্কুলে, একটি গোলা সাধনা ঔষধালয়ের নিকটে, একটি গোলা গোয়ালপট্রিতে, একটি গোলা কালিবাড়ির নিকটে এং একটি গোলা এস-ডি-ওর অফিসের নিকটে বিস্ফোরিত হয়। গোলাগুলি বিস্ফোরণের ফলে পাকসেনাদের মনোবল ভেঙ্গে যায় এবং ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে কুমিল্লা সেনানিবাসের দিকে ছোটাছুটি করতে থাকে। বিশেষ করে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সদ্য আগত সেনারা মনোবল হারিয়ে ফেলে। অনেক পাকসেনা স্থানীয় লোকদের সেনানিবাসের রাস্তা জানতে চায়। আবার অনেকে ভয়ে ব্রীজের তলায় লুকিয়ে পড়ে। আবার কুমিল্লাতে যখন গেরিলারা তাদের তৎপরতা চালাচ্ছিল ঠিক সে সময়ে গেরিলাদের আর একটি দল চাঁদপুরেও তাদের তৎপরতা বাড়িয়ে দেয়। ১৭ই জুলাই রাত ১০টায় বাবুরহাটের পুর্বে কুমিল্লা-চাঁদপুর রাস্তায় আশিকাটি গ্রামের নিকট পাকসেনাদের একটি কনভয় যখন যাচ্ছিল তখন আমাদে গেরিলারা গাড়িতে গ্রেনেড নিক্ষেপ করল। ফলে ৮ জন পাকসেনা নিহত ও আরও অনেক আহত হয়। ১০শে জুলাই দুপুর ১টার সময় বাবুরহাটে পাকসেনাদের একটি গাড়ির উপর গেরিলারা গ্রেনেড নিক্ষেপ করে। এর ফলে ৫ জন পাকসেনা নিহত ও ৭ জন আহত হয়।

১১ই জুলাই বিকেল সাড়ে ৬টায় ২ জন গেরিলা চাঁদপুর পাওয়ার স্টেশনের সামনে পাহারারত ২ জন পাকসেনা ও ২ জন পাকিস্তানি পুলিশের উপর গ্রেনেড নিক্ষেপ করে তাদের হত্যা করে।

চাঁদপুরে শান্তি কমিটির দালালদের একটি আলোচনা সভায় গ্রেনেড নিক্ষেপ করার পর ৭ জন দালাল আহত হয়। এ ছাড়াও ইলিয়টগঞ্জে পাকসেনাদের স্থানীয় এক দালালের লঞ্চে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়া হয়। এ সমস্ত কার্যকলাপের ফলে স্থানীয় লোকদের মনোবল আরো বেড়ে যায়। তাদের মুক্তিবাহিনীর উপর আস্থা আবার ফিরে আসে।

কসবার উত্তরে কাসিমনগর রেলওয়ে সেতুর নিকট পাকিস্তানীদের দুটি প্লাটুন অবস্থান নিয়ে সেতুটি প্রহরার কাজে নিযুক্ত ছিল। এই সেতুটিকে ধ্বংস করার জন্য আমি ক্যাপ্টেন আইনউদ্দিনকে নির্দেশ দেই। নির্দেশ পেয়ে ক্যাপ্টেন আইনউদ্দিন সেতুটি রেকি করার জন্য ডিমোলিশন এক্সপার্টসহ একটি রেকি পাঠায়। এই রেকি পার্টি শত্রুঅবস্থান সম্বন্ধে এবং সেতুটি সম্বন্ধে বিস্তারিত খবর দিয়ে আসে। এরপর ১৮ই জুলাই রাত ২টায় একটি রেইডিং প্লাটুন ক্যাপ্টেন আইনউদ্দিনের নেতৃত্বে কাশিমপুর সেতুর উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। রাত ৮টার সময় সেতুটির নিকটবর্তী পাক অবস্থানের উপর প্লাটুনটিআক্রমণ চালায়। আক্রমণের ফলে ১৭ জন পাকসেনা নিহত হয় এবং যারা বেঁচেছিল তারা অবস্থানটি পরিত্যাগ করে খাইরাতুল্লাতে পালিয়ে যায়। আমাদের রেইডিং পার্টি সেতুটিকে বিস্ফোরন লাগিয়ে ধ্বং করে দেয়। মুক্তিযোদ্ধারা পাকসেনাদের অবস্থান থেকে অনেক অস্ত্র উদ্ধার করে। আমি যখন কুমিল্লা ও নোয়াখালী এলাকায় যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলাম, সে সময় শত্রুদের খবরাখবর নেবার জন্য একটি ৬ ইন্টেলিজেন্স নেট স্থাপন করি। এদের দায়িত্ব ছিল শত্রুদের সম্বন্ধে বিস্তারিত খবর আমাদের নিকট প্রেরণ করা। বিশেষ করে এইসব ইন্টেলিজেন্স এ এমন কতগুলো লোক কাজ করত যাদের সম্বন্ধে কিছু কথা বলার দরকার। যেমন লাতু মিয়া। সে কুমিল্লা সেনানিবাস হাসপাতালে মালীর কাজ করত। সে আমাদের খবর পাঠায় সেনানিবাসে পাকসেনাদের দুটি ব্রিগড আছে এবং সেখানে একটি ডীপ হেডকোয়ার্টার স্থাপন করা

হয়েছে। এ ছাড়াও ৫০০-৬০০ রাজাকার এবং ৫০০ রেঞ্জার মোতায়েন করা হয়েছে। সে আরও খবর পাঠায় কুমিল্লা সেনানিবাসের প্রতিরক্ষা ব্যাবস্থা খুবই উত্তম এবং মজবুত করা হয়েছে এবং এই প্রতিরক্ষাব্যূহ বাইরে উত্তরে গোরা কবরস্থান পর্যন্ত তৈরী করা হয়েছে।

কুমিল্লা বিমানবন্দরেও একটি ব্যাটালিয়ান শক্তিশালী প্রতিরক্ষা অবস্থান তৈরী করা হয়েছে।

কুমিল্লা এবং নোয়াখালী এলাকায় পাকসেনাদের শক্তি এক ডিভিশনেরও বেশি। কিন্তু পাকসেনাদের এত শক্তি থাকা সত্তেও তাদের মনোবল বেশ কমে গেছে। সাধারন সিপাইরা এই যুদ্ধের নৈরাশ্যজনক ফলাফল সম্বন্ধে মন্তব্য করত। তাদেরকে জোর করে যুদ্ধে ব্যবহার করা হচ্ছে। সে জন্য তারা যথেষ্ট অসন্তোস প্রকাশ করত। তাদে মধ্যে পলায়নপর মনোভাব খুবই প্রবল। তারা যুদ্ধ এলাকা ছেড়ে নিরাপদ স্থানে পালিয়ে যেতে খুবই ইচ্ছুক। আমাদেরকে আরও খবর পাঠায় যে, পাকসেনাদের হতাহতের সংখ্যা খুবই বেশী। শুধু সেনানিবাস হাসপাতালেই প্রায় ৫০০-৬০০ জন আহত সৈনিক চিকিৎসাধীন আছে। হাসপাতালে স্থানের অভাবে তাঁবুর ভিতরে অনেক আহত সৈনিককে রাখা হয়েছে এবং গুরুতর আহত সৈনিকদের পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। আহতের সংখ্যা এত বেশি হওয়ার জন্য সাধারন মনোবল ভেঙ্গে পড়েছিল। কুমিল্লা শহরে আমাদের এবং পাকিস্তানীদের তৎপরতার ফলে লোকজন শহর ছেড়ে গ্রামের দিকে পালিয়ে যাচ্ছে। প্রত্যেক শহরবাসী পরিচয়পত্র ছাড়া শহরে বের হতে পারছেনা। কুমিল্লার উত্তরে পাকসেনারা আমাদের কোটেশ্বর অবস্থান পুনর্দখলের জন্য চেষ্টা চালায়। ২৪শে জুলাই পাকসেনাদের একটি কোম্পানীগোঞ্জ পার হয়ে কোটেশ্বরের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। সকাল ১০টায় পাকসেনাদের কোম্পানীটি যখন আমাদের অগ্রসর অবস্থানের সামনে পৌঁছে যায়, তখন আমাদের মুক্তিবাহিনী সৈনিকরা তাদের উপর মর্টার এবং হালকা মেশিনগানের সাহায্য তাদের অগ্রসরে বাধা দেয়। আমাদের গোলাগুলিতে পাকসেনারা প্রচুর ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবুও পাকসেনারা তাদের আক্রমণের চাপ অব্যাহত রাখে। আমাদের মুক্তিযোদ্ধারাও সাহসের সাথে তাদের আক্রমণ পরিত্যাগ করে ২ ঘন্টা পরে পিছু হটতে বাধ্য হয়। এই সংঘর্ষের ফলে পাকসেনাদের ১৫ জন হতাহত হয়। পাকসেনারা সমস্ত দিন আমাদের অবস্থানের উপর কামানের গোলা নিক্ষেপ করে।

ঐ দিনই কোটেশ্বর এং কসবা অবস্থান থেকে দুই দল গেরিলা বুড়িচং থানার নিকট একটি সড়কসেতু, তিনটি বিদ্যুৎ পাইলন এবং কসবা এবং কসবার নিকট একটি রেলসেতু উড়িয়ে দেয়। বেলুনিয়াতে আমাদের সৈন্যরা যখন পাকিস্তানীদের সঙ্গে সম্মুখসমরে লিপ্ত এবং পাকিস্তানীরা ফেনীর দিক থেকে বেলুনিয়া ব্রীজে প্রবেশ করার চেষ্টা করছিল ঠিক সেই সময় পাকসেনারাও আমাদের পেছনে ধ্বংসাত্মক চেষ্টা চালায়। তারা কিছু সংখ্যক দালালকে এই কাজে নিয়োগ করে। এইসব দালালকে মাইনসহ আমদের অবস্থানের পিছনে পাঠায়। দালালরা আমাদের লাইনের পিছনে রাস্তায় ৬টা এন্টিপার্সোনাল এবং ৯টা এন্টি-ট্যাঙ্ক মাইন লাগায়। কিন্তু স্থানীয় জনসাধারনের সতর্কতার জন্যই এন্টি-ট্যাঙ্ক মাইনগুলিতে আমাদের কোন ক্ষতি হয়নি। মাইন পোঁতার খবরটি একজন স্থানীয় লোক আমাদের বেলুনিয়া হেডকোয়ার্টারে পাঠায়। খবর পাওয়ামাত্র হেডকোয়ার্টার থেকে আমাদের ডিমোলিশন বিশেষজ্ঞ দল গাইডের সঙ্গে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে তৎক্ষনাৎ মাইনগুলি নিস্ক্রিয় করে দেয়। আমরা স্থানীয় লোকদের পাকিস্তানী ধ্বংসাত্মক তৎপরতা সম্বন্ধে সজাগ থাকতে বলি। এরপর যখনই পাকিস্তানী দালালরা এরকম ধ্বংসাত্মক কাজের জন্য আমাদের অবস্থানের পিছনে আসার চেষ্টা করেছে স্থানীয় জনগণ তাদের প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়েছে। জুলাই মাসের শেষের দিকে লেৎ মাহবুব মিয়াবাজার, চাঁদপুর, হাজীগঞ্জ ইত্যাদি এলাকাতে পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে তৎপরতা জোরদার করে। পাকসেনারা মিয়াবাজারে যে ক্যাম্প করেছিল সেখান থেকে চট্রগ্রাম-কুমিল্লা রাস্তা আবার খোলার চেষ্টা করে। লেঃ মাহবুব মিয়াবাজার শত্রুক্যাম্পটি ‘রেইড’ করার সিদ্ধান্ত নেয়। ২৩শে জুলাই লেঃ মাহবুব ১৫ জনের একটি কমাণ্ডো প্লাটুনকে মিয়াবাজারে পাকসেনাদের ক্যাম্প ‘রেইড’ করার জন্য পাঠিয়ে দেয়। এই দলটি সন্ধ্যায় মিয়াবাজারের নিকট পৌঁছে যায়। সেখান থেকে তাদের একটি ছোট রেকি দল পাকসেনাদের অবস্থান সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ খবর

সংগ্রহ করে। রাত ১২ টায় কমাণ্ডো দলটি গোপন পথে অগ্রসর হয়ে শত্রু অবস্থানের উপর অতর্কিত হামলা চালায়। এই অতর্কিত হামলার জন্য পাকিস্তানীরা মোটেই প্রস্তুত ছিলনা। তারা দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে যায়। আমাদের কমাণ্ডো দলটি এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে পাকসেনাদের বেশ কয়েকটি বাঙ্কার গ্রেনেড ছুড়ে উড়িয়ে দেয়। পাকসেনারা আক্রান্ত হয়ে ছোটাছুটি করতে থাকে এবং আমাদের সৈনিকদের গুলিতে প্রায় ২০ জ নিহত এবং ১০ জন আহত হয়। এক ঘন্টা যুদ্ধ চলার পর আমাদের কমাণ্ডো দলটি পাকসেনাদের প্রচুর ক্ষতিসাধন করে। শত্রুসেনাদের অবস্থান পরিত্যাগ করে মুক্তিযোদ্ধারা নিরাপদে চলে আসে। চাঁদপুরে পাকিস্তানীরা তাদের ঘাঁটি আরও শক্তিশালী করে তোলে। চাঁদপুরের এই ঘাঁটি থেকে তারা বিভিন্ন জায়গায় গাড়ীতে পেট্রোলিং করত। এইসব পেট্রোলিংয়ের জন ২-৩টি এবং ২-৩টি ৩ টনের ট্রাক কনভয়-এর আকারে ব্যবহার করত। এইসব পেট্রোলিং ভোরে. দুপুরে, সন্ধ্যায় এবং রাত ১২ টার পর পাকসেনারা চালাত। এবং প্রত্যেক গাড়ীর ব্যবধান ৫০ থেকে ১০০ গজের মধ্যে। এই সংবাদ স্থানীয় গেরিলারা লেঃ মাহবুবের কাছে পৌঁছে দেয়। খবর পেয়ে লেঃ মাহবুব দুটি প্লাটুন ২০শে জুলাই চাঁদপুরের পূর্বে পাঠিয়ে দেয়। প্লাটুন দুটি চাঁদপুর থানার আশিকাটির নিকট এ্যামবুশ পাতে। পরদিন ভোর ৫টায় চাঁদপুর থেকে একটি পেট্রোলকনভয় আশিকাটির দিকে অগ্রসর হয়। কনভয়টি যখন এ্যামবুশ অবস্থানের মাঝে পৌঁছে যায় ঠিক তখনই আমাদের এ্যামবুশ পার্টি মেশিনগান এবং হালকা মেশিনগানের সাহায্যে গুলি চালায়। এর ফলে কনভয়-এর প্রথম তিনটি জিপ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে রাস্তা থেকে পড়ে যায় এবং অবশিষ্ট গাড়িগুলিরও যথেষ্ট ক্ষতিসাধন হয়। পাকসেনারা গাড়ি থেকে নেমে পাল্টা আক্রমণের চেষ্টা করে। কিন্তু আমাদের এ্যামবুশ পার্টির গুলিতে তাদের অন্তত ১০ জন নিহত এবং ২৫ জন আহত হয়। পাকসেনারা গুলির মুখে টিকতে না পেরে পালিয়ে যায়। ঐ দিন আশিকাটির ৩ মাইল পশ্চিমে সন্ধ্যায় আমাদের আর একটি এ্যামবুশ পার্টি পাকসেনাদের আর একটি কনভয়কে এ্যামবুশ করে। ফলে পাকসেনাদের ৩ জন নিহত এবং ৫ জন আহত ও একটি ট্রাক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রচুর অস্ত্র ও গোলাবারুদ আমাদের এ্যামবুশ পার্টির হস্তগত হয়। এছাড়া একটি মটর সাইকেলও দখলে নেয়। এ্যামবুশের খবর পেয়ে পাকসেনারা তাদের হাজীগঞ্জ ক্যাম্প থেকে একটি শক্তিশালী কোম্পানী আমাদর এ্যামবুশ পার্টিকে আক্রমণ করার জন্য পাঠিয়ে দেয়। এই কোম্পানীটি ১ ঘন্টা পর ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। ততক্ষনে আমাদের এ্যামবুশ পার্টি সংঘর্ষ শেষে মোটামুটি প্রস্তুত হয়েই অপেক্ষা করছিল। পাকসেনারা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এ্যামবুশ পার্টি আবার তাদের উপর অতর্কিত হামলা চালায়। এর ফলে পাকসেনাদের ১২ জন নিহত ও ১০ জন আহত হয়। এরপর আমাদের দলটি অবস্থান পরিত্যাগ করে নিরাপদে নিজ ঘাঁটিতে ফিরে আসে। পাকসেনাদের একটি শক্তিশালী দল হাজীগঞ্জের নিকট নরসিংপুরে তাদের ঘাঁটি স্থাপন করে। এই ঘাঁটি থেকে পাকসেনারা ঐ এলাকার চতুর্দিকে ত্রাসের সৃষ্টি করে। এই ঘাঁটিকে আক্রমণ করার জন্য লেফটেন্যান্ট মাহবুব নিয়মিত ও গণবাহিনীর একটি সম্মিলিত কোম্পানী পাঠিয়ে দেয়। এই কোম্পানীটি ১৭ ই জুলাই তারিখে হাজীগঞ্জের দক্ষিণে তাদের অস্থায়ী গোপন অবস্থান তৈরী করে। এরপর পেট্রোল পাঠিয়ে পাকসেনাদের অবস্থান সম্বন্ধে তথ্য যোগাড় করে। ১৭ই জুলাই সন্ধ্যায় আমাদের কোম্পানীটি অতর্কিত পাকসেনাদের ঘাঁটির উপর আক্রমণ করে। আক্রমণের ফলে পাকসেনাদের ১৩ জন নিহত ও অনেক আহত হয়। এরপর আমাদের কোম্পানীটি নিরাপদে নিজ অবস্থান ফিরে আসে।

ফরিদপুরে আমাদের গেরিলা দল তাদের কার্যকলাপ জুন মাস থেকে চালিয়ে যাচ্ছিল। তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, তারা যেন বেসামরিক শাসন ব্যবস্থ কে সম্পুর্ণ অচল করে দেয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে ১২ই জুন গেরিলারা চিকা নদী তহশীল এবং মুন্সেফ অফিস ধ্বংস করে সমস্ত অফিসিয়াল কাগজপত্র জ্বালিয়ে দেয়। ১৮ই জুলাই একটি দল গোসাইরহাট থার দামুদিয়া পুলিশ ফাঁড়ির উপর আক্রমণ চালিয়ে ফাঁড়ির উপর আক্রমণ চালিয়ে ফাঁড়ি ধ্বংস করে দেয়। ফাঁড়ি থেকে ৫টি রাইফেল, প্রচুর গুলি এবং একটি অয়্যারলেস সেট দখল করে নেয়। গেরিলা দল দামুদিয়া তহশিল অফিস ও সার্কেল অফিস জ্বালিয়ে দেয়। এই ঘটনার দুদিন পর আরও একটি গেরিলা দল ভেদরগঞ্জ থানা আক্রমণ করে দুজন পশ্চিম পাকিস্তানী পুলিশকে আহত করে এবং একটি অয়ারলেস সেট

হস্তগত করে। সঙ্গে সঙ্গে তহশীল অফিস ও পালং থানার আঙ্গালিয়া বাজারে জুট গোজাউনে আগুনে লাগিয়ে ২৫হাজার মণ পাট জ্বালিয়ে দেয়া হয়।গেরিলারা আঙ্গালিয়া তহশীল অফিসও জ্বালিয়ে দেয়।এসব কার্যকলাপের ফলে মাদারীপুরের শাসনব্যবস্থা অচল হয়ে যায়।

শালদা নদীতে এবং মন্দভাগে ক্যাপ্টেন গাফফার এবং মেজর সালেক পাকবাহিনীকে বার বার আঘাত করতে থাকে। আমাদের রেকি পার্টি খবর নিয়ে আসে যে, ২৪শে জুলাই বিকেল ৩টার সময় পাকসেনারা নওগাঁও স্কুলে স্থানীয় দালালদের নিয়ে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করেছে। এই সংবাদ পেয়ে ক্যাপ্টেন গাফফার একটি প্লাটুন মর্টারসহ নওগাঁর নিকট পাঠিয়ে দেয়।বিকেল ৫টায় পাকসেনাদের ৫০-৬০জন লোক ও স্থানীয় দালালরা স্কুল প্রাঙ্গণে সমবেত হয়ে তাদের আলোচনা সভা শুরু করে। সভা শুরু হওয়ার কিছুক্ষণ পরই আমাদের প্লাটুনটি মর্টারের সাহয্যে পাকসেনাদের এই সমাবেশের উপর অতর্কিত আক্রমণ চালায়।ফলে আলোচনা সভা ভেঙ্গে যায় এবং পাকসেনারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়।পাকসেনাদের ৩০জন লোক ৭জন দালালসহ নিহত হয়।আমাদের প্লাটুনটি নিরাপদে ফিরে আসে। পাকসেনারা শালদা নদীর দক্ষিণে মনোরা ভাঙ্গা রেলওয়ে সেতুটি মেরামত করার জন্যে আবার চেষ্টা চালায়।২৬শে জুলাই সকাল ১০টায় পাকসেনাদের একটি শক্তিশালী দল তাদের শালদা নদী অবস্থান থেকে মনোরা সেতুর নিকট সমবেত হয়।এরপর সেতুর চতুর্দিকে তারা বাঙ্কার তৈরীর প্রস্ততি নেয়।সংবাদ পেয়ে মেজর সালেক মর্টারসহ একটি প্লাটুন পাকসেনাদের মনোরা সেতু থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার জন্যে পাঠিয়ে দেয়।বিকেল ৪টায় আমাদের দলটি আগরতলার নিকট অবস্থান নেয় এবং পাকসেনাদের উপর মর্টার এবং মেশিনগানের সাহায্যে অতর্কিত আক্রমণ চালায়। আমাদের গোলাগুলিতে পাকসেনারা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে এবং তাদের অনেক হতাহত হয়। মনোরা সেতু থেকে তারা পালিয়ে যায়। পরে বিশ্বস্ত সূত্রে আমরা জানতে পারলাম যে, পাকসেনাদের কমপক্ষে ৪ জন নিহত এবং অনেক আহত হয়েছে।

২৬শে জুলাই ক্যাপ্টেন আইনউদ্দিন একটা এ্যামবুশ পার্টি নওগাঁ এবং আকসিনার মাঝামাঝি রাস্তায় এ্যামবুশ পাতে। পাকসেনাদের একটি দল নওগাঁর পথে সেই এ্যামবুশে পড়ে যায়। ফলে ৭ জন পাকসেনা নিহত ও ৪ জন আহত হয়। আমাদের একজন গুরুতরভাবে আহত হয়। প্লাটুনটি ফেরার পথে কল্যাণসাগরে আবার একটি এ্যামবুশ পেতে বসে থাকে। পাকসেনাদের একটি কোম্পানী সাইদাবাদ থেকে কসবার পথে সেই এ্যামবুশ-এ পড়ে যায়। ফলে ২১ জন পাকসেনা ও ১ জন দালাল নিহত হয় এবং ৯ জন আহত হয়। পাক পেট্রোল পার্টির একটি ট্রাকও ধ্বংস হয়। ঐ দিন ক্যাপ্টেন আউনউদ্দিনের একটি কমান্ডো দল বগাবাড়িতে একটি রেলওয়ে ব্রীজ ও ২-৩টি টেলিফোন পাইলন উড়িয়ে দেয়। আমরা যেসব গেরিলাদের ঢাকা এবং কুমিল্লার পশ্চিম ও ভৈরববাজারে এলাকায় পাঠাতাম, তারা কসবার উত্তর দিক দিয়ে ছাতুরা ও নবীনগর হয়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় কার্যকলাপ সম্বন্ধে খবরাখবর নেয়ার জন্য পাকসেনারা দালালদের নিযুক্ত করে এবং আমাদের অনুপ্রবেশের রাস্তাকে বন্ধ করার জন্য রাজাকারদের রাস্তায় এবং নদীপথে পাহারায় মোতায়েন করে। এই সব দালাল এবং রাজাকাররা আমার অপরেশনের জন্য অসুবিধার সৃষ্টি করে। দালালদের ধরার জন্য এবং রাজাকারদের সমুচিত শাস্তি দেবার জন্য ক্যাপ্টেন আউনউদ্দিন ও লেঃ হারুনকে আমি নির্দেশ দিই। নির্দেশ অনুযায়ী ক্যাপ্টেন আউনউদ্দিন এবং লেঃ হারুন বিভিন্ন স্থানে তাদের লোকজনকে দালালদের বিরুদ্ধে সতর্ক করে দেয় এবং এ্যামবুশ পেতে রাখে। ২৫শে জুলাই সন্ধ্যায় নরসিংহের নিকট লেঃ হারুনের লোক পাকসেনাদের ৬ জন দালালকে এ্যামবুশ করে বন্দি করে। এদের নিকট ১৪ পাউন্ড বিস্ফোরক, তিনটি গ্রেনেড পাওয়া যায়। এর পরদিন আরও ৭ জন দালাল আমাদের এ্যামবশে ধরা পড়ে এবং তাদের কাছ থেকে দুটি রাইফেল, ৪টি হ্যান্ড গ্রেনেড, ১টি অয়্যারলেসে সেট এবং ১২০ রাউন্ড গুলি পাওয়া যায়। এর পর থেকে দালালরা আমাদের এলাকাতে আর আসার সাহস পায়নি। বন্দি দালালদের কাছ থেকে জানা যায় যে, তাদেরকে পাকিস্তানী অফিসাররা প্রশিক্ষণ দিয়েছে এবং সঙ্গে করে এনে মুক্তিবাহিনীর অবস্থানের নিকট ছেড়ে দেয়। তাদের উপর নির্দেশ ছিল মুক্তিবাহিনীর বিরুদ্ধে ধ্বংসত্মক কার্যকলাপ চালিয়ে যাওয়ার জন্য, অন্যথায় তাদের পরিবারবর্গের উপর কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এরপর রাজাকারদের শায়েস্তা করার জন্য ক্যাপ্টেন আইনউদ্দিন একটি

কোম্পানী পাঠিয়ে দেয়। এই কমাণ্ডো কোম্পানীটি ছাতুরার নিকট রাজাকার ক্যাম্পের উপর ২৫শে জুলাই অতর্কিতে হামলা চালায়। হামলার ফলে ১৬ জন রাজাকার নিহত এবং ৬ জন আহত হয়। ঐ এলাকার রাজাকাররা ভীত হয়ে সম্পূর্ণভাবে আমাদের নিকট আত্মসমর্পণ করে। তারা পরদিন তাদের নেতাকে আমাদের ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেয় এবং মুক্তিবাহিনীর সাথে সহায়তা করার অঙ্গীকার করে। এ ছাড়া অনেক রাজাকার মুক্তিবাহিনীর পক্ষে যুদ্ধ করার ইচ্ছা প্রকাশ করে। এরপর থেকে যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত এই এলাকার রাজাকারদের সক্রিয় সহায়তা মুক্তিবাহিনী সব সময় পেয়েছে। অনেক সময় রাজাকাররাই আমাদের গেরিলাদেরকে নিরাপদ রাস্তায় তাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছিয়েছে। সি-এন্ড-বি রাস্তায় যে সেতুর নিচ দিয়ে আমাদের গেরিলারা নৌকায় যাতায়াত করত রাজাকাররা সেই সেতুর উপর পাকবাহিনীর গতিবিধি সম্বন্ধে সংকেত দিত। কোন সময় যদি পাকসেনারা ঐ জায়গায় টহলে আসত তবে আগে থেকে হারিকেনের লাল আলো বা টর্চের সাহায্যে সংকেত দিয়ে আমাদের জানাতো। এর ফলে এই রাস্তাটি আমাদের জন্য সম্পূর্ণ নিরাপদ হয়ে যায়।

মেজর সালেক একচি ডিমোলিশন পার্টি ও একটি কমান্ডো প্লাটুনকে ২৮শে জুলাই রাত ২টার সময় হরিমঙ্গলে পাঠিয়ে দেয়। এই দলটি হরিমঙ্গলের নিকটে রেলওয়ে সেতুটির রেকি করে এবং সকাল সাড়ে ৬টা পর্যন্ত ডিমোলিশন বানিয়ে সেতুটিকে উড়িয়ে দেয়। বিস্ফোরণের ফলে সেতুটির মাঝখানে ৪০ ফুটের একটি গ্যাপ সৃষ্টি হয়। এ ছাড়া সেতুটি দক্ষিণ পাশে ২৭০ ফুট রেলওয়ে লাইন বারুদ লাগিয়ে নষ্ট করে দেয়া হয়। এর পরদিন এই ডিমোলিশন পার্টি বিজনা রেলওয়ে সেতুটি বারুদ লাগিয়ে উড়িয়ে দেয়। ২৮শে জুলাই সকাল ৮টায় পাকসেনাদের একটি শক্তিশালী দল বিজনা ব্রীজের নিকটে পরিদর্শনে আসে। ঠিক সেই সময় আমাদের কামান তাদের উপর গোলাগুলি করে। ফলে পাকসেনাদের ৩ জন নিহত ও ৭ জন আহত হয়। পাকসেনারা সেই অবস্থান পরিত্যাগ করে কায়েক গ্রামের দিকে পলায়ন করে। এরপর ১লা আগস্ট পাকসেনাদের একটি শক্তিশালী কোম্পানী হরিমঙ্গল সেতুর নিকট অগ্রসর হয় এবং সেখানে তাদের ঘাঁটি করার চেষ্টা করে। এবারও আমাদের সৈন্যরা তাদের অগ্রসরে বাধা দেয়। আমাদের সৈন্যদের গোলাগুলিতে পাকসেনাদের ৩০ জন হতাহত হয়। ফলে পাকসেনারা পিছু হটতে বাধ্য হয়।

কসবার টি, আলীর বাড়ীতে পাকসেনাদের যে অবস্থান ছিল, সে অবস্থান থেকে পাকসেনারা চাল পর্যন্ত প্রায়ই যাতায়াত করত। এই সংবাদ লাটুমুড়ার নিকট লেঃ হুমায়ুন কবির সংগ্রহ করে। সে আরও জানতে পারে যে কাঁচা রাস্তায় পাকসেনাদের কমপক্ষে একটি কোম্পানী যাতায়াত করে। পাকসেনাদের এই দলকে আক্রমণ করার জন্য লেঃ কবির একটি প্লাটুন পাঠিয়ে দেয়। এই প্লাটুনটি কল্যাণসাগরের নিকট ২৩শে জুলাই ভোর সোয়া ৪টায় এ্যামবুশ পড়ে যায়। আমাদের যোদ্ধাদের অতর্কিত গুলির আঘাতে পাকসেনাদের ২০ জন নিহত ও ৮ জন আহত হয়। ১ জন স্থানীয় দালাল, যে পাকসেনাদের পথনির্দেশক ছিল, সেও মারা যায়। ২-৩ ঘণ্টা যুদ্ধের পর পাকসেনারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় এবং আমাদের লোকেরা অবস্থান তুলে নিজ ঘাঁটিতে ফেরত আসে।

কসবার উত্তরে পাকসেনাদের গোসাই স্থানে একটি শক্ত ঘাঁটি ছিল। এই ঘাঁটিতে অন্তত ৪০-৫০ জন পাকসেনা অবস্থান করছিলো। আমাদের যেসব গেরিলা ঢাকার পথে যাতায়াত করতো, এই অবস্থান থাকাতে তাদের যাতায়াতের গোপন পথ বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়ায়। এই ঘাঁটিটি ধ্বংস করে দিয়ে যাতায়াতের গোপন পথ নিরাপদ করার জন্য আইনউদ্দিন ৪র্থ বেঙ্গলের 'ডি' কোম্পানীকে পাঠায়। 'ডি' কোম্পানী ৩১শে জুলাই রাত ১০টার সময় দক্ষিণ থেকে অগ্রসর হয়ে গোসাই স্থান অবস্থানের নিকটে পৌঁছে। এই অবস্থানটিচ রেকি পূর্বেই করা ছিল। পাক সেনাদের অবস্থানটির দক্ষিণ হতে 'ডি' কোম্পানী অতর্কিত আক্রমণ চালায়। আক্রমণের ফলে পাকসেনারা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে যায়। আক্রমণ ২-৩ ঘণ্টা চলে। 'ডি' কোম্পানীর সৈন্যরা বেশ কয়েকটি বাঙ্কার ধ্বংস করে দেয় এবং অন্তত ২০ জন পাকসেনাকে হতাহত করে। আক্রমণের প্রবল চাপে টিকতে না পেরে পাকসেনারা গোসাই স্থান পরিত্যাগ করে পিছনে পলায়ন করে।

শালদা নদীতে আমাদের সঙ্গে পাকসেনাদের সংঘর্ষ পুরা জুলাই মাস চলতে থাকে। ক্যাপ্টেন গাফফারের নেতৃত্বে শালদা নদীর শত্রু অবস্থানটির উত্তর দিকে ৪র্থ বেঙ্গলের 'সি' কোম্পানী মোটামুটি ঘিরে ফেলেছিল। এদিকে দক্ষিণ দিকে আগরতলা ও কাটামোড়ায় মেজর সালেক ৪র্থ বেঙ্গলের 'এ' কোম্পানী দিয়ে পাকসেনাদের শালদা নদী অবস্থানের উপর চাপ দিয়ে যাচ্ছিল। পাকসেনাদের পিছন থেকে সরবরাহের রাস্তা একমাত্র নদী ছাড়া সবই প্রায় বন্ধ হয়ে গেছিল। নদীপথেই লুকিয়ে মাঝে মাঝে পাকসেনাদের অবস্থানে রসদপত্র সরবরাহ করা হতো। এই সরবরাহ পথে পাকসেনাদের এ্যামবুশ পেতে বসে থাকে। রাত ১টার সময় ৭-৮টি নৌকায় প্রায় ১৫০ জন সৈন্য ও অন্যান্য সরবরাহসহ পাকসেনারা তাদের শালদা নদী অবস্থানের দিকে অগ্রসর হয়। নৌকাগুলি যখন এ্যামবুশ অবস্থানের ভিতরে আসে আমাদের প্লাটুনটি মেশিনগানের সাহায্যে গুলি চালাতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে চার-পাঁচটি নৌকা ডুবে যায়। পাকসেনারাও পিছন হতে পাল্টা গোলাগুলি শুরু করে। সংঘর্ষ প্রায় অর্ধ ঘণ্টা স্থায়ী থাকে। এরপর পাকসেনাদের পিছনের নৌকাগুলি ফেরত চলে যায়। এই সংঘর্ষে পাকসেনাদের প্রায় ৬০-৭০ জন হতাহত হয়, ৪-৫টি নৌকা ডুবে যায় এবং অনেক রসদ নষ্ট হয়। নৌকার আরোহী পাকসেনারা ডুবে যায়। পাকসেনাদের গুলিতে আমাদের ৪ জন নিহত ও একজন আহত হয়।

কুমিল্লার উত্তরে কালামছড়ি চা বাগানের নিকট পাকসেনাদের একটি ঘাঁটি ছিল। এখানে মাসধিককাল ধরে পাকসেনা ও মুক্তিবাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষ চলে আসছিল। মুক্তিবাহিনীর আক্রমণে অতিষ্ঠ হয়ে পাকসেনারা কালামছড়ি চা বাগান অবস্থানে বাঙ্কার তৈরী করে। ২রা আগস্ট রাত ১২টার সময় লেঃ হারুনের নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনীর একাটি ক্ষুদ্র দল শত্রুঅবস্থানের উপর হামলা চালায়। পাকসেনাদের এক কোম্পানী সৈন্য কামান এবং মর্টারের সহায়তায় শক্তিশালী অবস্থান গড়ে তুলেছিল। ২রা আগস্ট মুক্তিবাহিনীর অমর সাহসী ক্ষুদ্র দলটি হ্যান্ড গ্রেনেড ও ৩০৩ রাইফেলের সাহায্যে আক্রমণ চালায়। গ্রেনেড বিস্ফেরেণ ঘটিয়ে শত্রুদের ১০টি বাঙ্কার ধ্বংস করে দেয়। পাকসেনারা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে ৫০ জন নিহত সঙ্গীকে ফেলে পিছনে গ্রামের দিকে পালিয়ে যায়। সেখানেও গ্রামের লোক দ্বারা আক্রান্ত হয়ে অনেক পাকসেনা নিহত হয়। দুজন পাকসেনা আমাদের হাতের বন্দি হয়। এমজিআইএ ও মেশিনগানসহ অনেক অস্ত্রশস্ত্র এবং ২০-২৫ হাজার গুলি আমাদের হস্তগত হয়। এ ছাড়া অনেক খাদ্যসামগ্রী ও কাপড় আমাদের হস্তগত হয়। আমাদের পক্ষে দুজন মুক্তিসেনা নিহত হয়। জুলাই মাসে নোয়াখালীতে অপারেশনের জন্য ১৪ জন গণবাহিনীর গেরিলা গোপনপথে চৌদ্দগ্রামের আলকরা বাজার হয়ে দক্ষিণ দিকে যাচ্ছিল। রাত ১টার সময় বাজারের নিকটে শত্রুদের একটি দল অতর্কিতে গেরিলাদের উপর আক্রিমণ চালায়। আমাদের গেরিলারা সাহসের সঙ্গে আক্রমণের মোকাবিলা করে; কিন্তু শত্রুদের আক্রমণের মুখে টিকতে না পেরে ছত্রভঙ্গ হয়ে টিছু হটতে বাধ্য হয়। সংঘর্ষে আমাদের একজন গেরিলা নিহত ও কয়েকজন আহত হয় এবং বেশকিছু অস্ত্রশস্ত্র ফেলে তারা পালিয়ে আসে। হাবিলদার গিয়াসের নেতৃত্বে যে দলটি হোমনা থানায় অবস্থান করছিল, সেই দলটি ২৮শে জুলাই রাতে হোমনা থানার সাঘুটিয়া (হোমনা, বাঞ্ছারামপুর, রামচন্দ্রপুরের সঙ্গমস্থল) লঞ্চঘাটে পাকবাহিনীর টহলদার একটি লঞ্চের উপর এ্যামবুশ ফাঁদে আটকা পড়ে। পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী সুবেদার গিয়াসের দল আকস্মিকভাবে শত্রুদের উপর হামলা চালায়। ঘটনার আকস্মিকতায় প্রায় ১৫-২০ মিনিট পর্যন্ত পাকসেনারা কোন জবাব দেয় না। দুর্ভাগ্যবশত রকেট লাঞ্চার কাজ না করায় সুবেদার গিয়াসের দল লঞ্চটাকে ডুবাতে সক্ষম হয়নি। ১ ঘণ্টা ধরে উভয়পক্ষে প্রচন্ড সংঘর্ষ চলে। পাকসেনারা বিক্ষিপ্তভাবে মর্টারের গোলা ছুড়তে থাকে। সুবেদার গিয়াসের দলের এত কোন ক্ষতি হয়নি। ১ ঘণ্টা সংঘর্ষের পর পাকসেনাদের লঞ্চটি পালিয়ে যায়। আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা তাদের পিছে ধাওয়া করে। পাকসেনাদের হতাহতরে সংবাদ সম্পর্কে সঠিক তথ্যজানা না গেলেও প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে প্রকাশ, ক্ষতবিক্ষত লঞ্চটি দেড় ঘন্টা হোমনা থানার ঘাটে নোঙর করে থাকে। সেখানে বেশকিছু আহতকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয় এবং অবশেষে অনেক মৃতদেহসহ লঞ্চটি ঢাকা অভিমুখে যাত্রা করে। জুলাই মাসে পাকসেনারা চট্টগ্রাম-কুমিল্লা

রোড খুলতে চেষ্টা করে। এই সময় মাঝে মাঝে পাকসেনাদের শক্তিশালী দল এই রাস্তায় টহল দেয়ার জন্যে আসত। চৌদ্দগ্রামের উত্তরে ও দক্ষিণে ইমামুজ্জামান এইসব পাকসেনাদের টহলদারী দলগুলোকে তাড়িয়ে দিত।

৩০শে জুলাই সকাল ৭টায় ইমামুজ্জামানের একটা প্লাটুন চৌদ্দগ্রামের ৪ মাইল দক্ষিণে নানকারা নামক স্থানে এ্যামবুশ পাতে। এ্যামবুশ পার্টি সারা দিন অপেক্ষা করার পর জানতে পারে যে, জগন্নাথদিঘীর নিকট একটি জীপ টহলে বেরোবার জন্যে তৈরী হচ্ছে। এই জীপকে এ্যামবুশ করার জন্য এ্যামবুশ পার্টি তখনই তৈরী হয়ে যায়। সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার সময় পাকবাহিনীর এই জীপটি চৌদ্দগ্রামের দিকে অগ্রসর হয় এবং মুক্তিযোদ্ধাদের এ্যামবুশ অবস্থানে পৌঁছে। পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে এ্যামবুশ পার্টি জীপটির উপর মেশিনগান এবং হালকা মেশিনগান থেকে গুলি চালায়। গুলিতে ড্রাইভার আহত হয়। ৬ জন পাকসেনা জীপ থেকে লাফিয়ে নিচে নামে; কিন্তু তারাও আমাদের এ্যামবুশ পার্টির গুলিতে নিহত হয়। পরে এ্যামবুশ পার্টি একটি মৃত পাকসেনার পকেটে একটি চিঠি পায়। তা থেকে জানা যায় যে এই পাকসেনারা ২৯তম বেলুচ রেজিমেন্টের 'সি' কোম্পানীর লোক। নিহত পাকসেনাদের নিকট হতে রাইফেল এবং যথেষ্ট গোলাবারুদ উদ্ধার করা হয়। একজন আহত পাকসেনা আমাদের হাতে বন্দি হয়। এই এ্যামবুশের পর পাকসেনারা কুমল্লিা থেকে আরও সৈন্য চৌদ্দগ্রামে নিয়ে আসে এবং সারা রাত ধরে আমাদের অবস্থানের উপর মর্টার এবং কামানের গোলা নিক্ষেপ করে। আমাদের লোকেরাও শত্রুঅবস্থানের উপর মর্টারের গোলা নিক্ষেপ করে। পরদিন ৩১শে জুলাই সকালে পাকিস্তানীদের একটি কোম্পানী চৌদ্দগ্রাম থেকে ও আর একটি কোম্পানী জগন্নাথদিঘী থেকে ট্রাঙ্ক রোড হয়ে আমাদের অবস্থানের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। পাকসেনারা যখন আমাদের অবস্থানের ২০০ গজের মধ্যে পৌঁছে, তখনই আমাদের এ্যামবুশ অবস্থান থেকে তাদের উপর অতর্কিত গুলি চালান হয়। গুলির আঘাতে ২০ জন পাকসেনা রাস্তার উত্তরে এবং ৬ জন দক্ষিণে আহত ও নিহত হয়। পাকসেনারা কামানের গোলার সহায়তায় পিছনে সরে যেতে থাকে। এই সময়েও আমাদের গুলির আঘাতে আরও কিছু সৈন্য হতাহত হয়। এরপর আমাদের এ্যামবুশ পার্টি সেই অবস্থান পরিত্যাগ করে হরিশ্বরদার হাটের নিকট নতুন অবস্থান নেয়। এর দুদিন পর ২রা আগস্ট সকাল ৭টায় পাকসেনাদের একটি ব্যাটালিয়ন উত্তর, দক্ষিণ, পশ্চিম হতে হরিশ্বরদার হাটের দিকে অগ্রসর হয়। এই সময়ে আমদের অবস্থানে লেঃ ইমামুজ্জামান আরও দুটি প্লাটুন পাঠিয়ে অবস্থানটি শক্তিশালী করে। পাকসেনারা হরিদশ্বর হাটের নিকট অবস্থিত তিনটি ভাঙ্গা সে পর্যন্ত অগ্রসর হয় এবং সেখানে পিছন থেকে গোলাগুলি চালায়। আমাদের কোম্পানীটিও সাহসের সঙ্গে পাকসেনাদের আক্রমণকে প্রতিহত করতে থাকে। সমস্ত দিনের যুদ্ধ পাকসেনাদের ২৫ জন হতাহত হয়। পাকসেনারা ২রা আগস্ট রাতে প্রধান সড়কের উপর তাদের প্রতিরক্ষাব্র তৈরী করে। এর পরদিন ৩রা আগস্ট সমস্ত দিন ধরে পাকসেনাদের সাথে সংঘর্ষ চলে। ঐ দিনসন্ধ্যায় আমাদের কোম্পানীটি অবস্থান পরিত্যাগ করে তাদের ঘাটিতে ফিরে আসে।

পাকসেনাদের একটি শক্তিশালি দল নয়ানপুর রেলওয়ে স্টেশন এলাকায় সুদৃঢ় ঘাঁটি করে অবস্থান করছিল। অনেক সময় এই অবস্থানের সঙ্গে অতীতে আমাদের যথেষ্ট সংঘর্ষ হয়। পাকসেনারা এই ঘাঁটিতে আরও বাড়িয়ে শালদা নদীর অবস্থান পর্যন্ত যোগাযোগ স্থাপন করার চেষ্টা করছিল। মেজর সালেক পাকসেনাদের নয়ানপুর ঘাঁটি আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নেয়। এই ঘাঁটিতে পাকসেনাদের অন্তত এক কোম্পানীর চেয়ে বেশি সৈন্য ছিল। পাকসেনারা স্টেশন ও নিকটবর্তী রেলওয়ে গুদাম এলাকায় তাদের সুদৃঢ় বাঙ্কার তৈরী করে। মেজর সালেক পাকসেনাদের এই অবস্থানটি সম্বন্ধে বিস্তারিত খবরাখবর সংগ্রহ করে। এরপর ৪র্থ বেঙ্গলের 'এ' কোম্পানী এবং কিছুসংখ্যক গণবাহিনী নিয়ে রাত সাড়ে ১২টার সময় পাকসেনাদের অবস্থানের নিকট জমায়েত হতে থাকে। পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী রাত আড়াইটার সময় স্টেশনের ২০০ গজ উত্তরে রেললাইন পর্যন্ত প্রথম পর্যায়ে দখল করে নিতে সক্ষম হয়। এই সময়ে পাকসেনাদের গোলাগুলি ভীষণ তীব্র হতে শুরু করে এবং আমাদের সেনাদের আক্রমণ

কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়ে। মেজর সালেক অন্য প্লাটুন অর্থাৎ যারা স্টেশনের দিকে ছিল তাদের আক্রমণ আরও তীব্র করার নির্দেশ দেয়। এই প্লাটুনটি পাকসেনাদের প্রবল গুলিবৃষ্টির মধ্যে রেললাইনের পাশ দিয়ে আস্তে আস্তে অগ্রসর হতে থাকে। এই প্লাটুনের লোকেরা রেল স্টেশনের ২৫ গজের মধ্যে পৌঁছতে সক্ষম হয় এবং পাকসেনাদের প্রায় ৬-৭টি বাঙ্কার উড়িয়ে দেয়। এই সময় স্টেশনের নিকটস্থ গুদাম এলাকা তেকে আমাদের লোকদের উপর তীব্র আক্রমণ শুরু হয়। অতর্কিত এই আক্রমণে আমাদের অনেক লোক হতাহত হয়। অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটে। মেজর সালেকের পক্ষে আক্রমণ চালিয়ে যাওয়া আর সম্ভব হয় না। নিরুপায় হয়ে মেজর সালেক তাঁর আহত ও নিহত সৈনিকদের নিয়ে পশ্চাতে হটে আসতে বাধ্য হয়। এই যুদ্ধে আমাদের যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি হয়। 'এ' কোম্পানির ৭ জন নিহত ও ৯ জন গুরুতর আহত হয়। এ ছাড়াও সৈনিকদের মনোবল কিছুটা দমে যায়। পাকসেনারা তাদের অবস্থান অক্ষত রাখতে সক্ষম হয়। আমার সেক্টরে এটাই ছিল প্রথম এবং সবচেয়ে মারাত্মক বিপর্যয়- যাতে এতজন এক সাথে নিহত ও আহত হলো।

ঢাকা এবং ঢাকার চারপাশে গেরিলারা তাদের কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছিল। ২৫শে জুলাই সকাল ৬টা পূবাইলের নিকট কালসজা স্থানে রেলওয়ে লাইনের উপর বৈদ্যুতিক পদ্ধতিতে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে একটি ট্রেন উড়িয়ে দেয়া হয়। ইঞ্জিনসহ তিনটি রেলওয়ে বগি লাইনচ্যুত হয় এবং ইঞ্জিনে আগুন লেগে বিধ্বস্ত হয়। ট্রেনের আরোহী ৩০-৩৫ জন পশ্চিম পাকিস্তানী পুলিশ সেই সাথে নিহত হয়। বগিগুলি লাইনচ্যুত হয়ে পানিতে পড়ে যায়। গেরিলাদের আর একটি দল ৪ঠা আগস্ট আড়াইহাজার থানার নিকট পাঞ্চকাপি সড়কসেতু এবং দরগাঁও সড়কসেতু উড়িয়ে দেয়। এর ফলে নরসিংদী-ডেমরার মধ্যে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এদিকে ২৭শে জুলাই ৪ জনের একটি গেরিলা দল মতিঝিলের (পীরজঙ্গী মাজার) নিকট বিদ্যুৎ সরবরাহ সাবস্টেশনের উপর আক্রমণ চালায়। পশ্চিম পাকিস্তানী পুলিশ এই সাবস্টেশনটিকে পাহারা দিচ্ছিলো। গেরিলারা দুজন পশ্চিম পাকিস্তানী পুলিশকে নিহত এবং বাকিদের নিরস্ত্র করে। তারা তালা ভেঙ্গে সাবস্টেশনে প্রবেশ করে ও সাবস্টেশনটি এক্সপ্লোসিভ লাগিয়ে ধ্বংস করে দেয়। ফলে মতিঝিল, কমলাপুর স্টেশন, শাহজাহানপুর, গোপিবাগে বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। গেরিলা দলটি এরপর ফেরার পথে শাহজাহানপুরে রাজাকারদের দ্বারা আক্রান্ত হয়; কিন্তু সাহসের সঙ্গে পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে ৮-১০ জন রাজারকারকে নিহত করে নিরাপদে নিজ ঘাঁটিতে ফিরে আসে। জুলাই মাসে শেষ সপ্তাহে আর একটি গেরিলা দল সিদ্ধিরগঞ্জ এবং খিলগাঁও ও কমলাপুরের মাঝে বেশ কয়েকটি বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইনের পাইলন উড়িয়ে দেয়। ফলে টঙ্গী, কালীগঞ্জ প্রভৃতি শিল্প এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। ১৫ই জুলাই পাগলা এলাকার গেরিলা দল ফতুল্লা এবং ঢাকার মাঝে একটি রেলওয়ে সেতু এক্সপ্লোসিভ লাগিয়ে উড়িয়ে দেয়। ফলে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ রেল যোগাযোগ সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়। ফার্মগেটের নিকট পাকিস্তানীদের একটি চেকপোস্ট আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নেয়। কয়েক দিন গাড়িতে রেকি করার পর তারা দেখতে পায় যে, পাহারারত মিলিটারী পুলিশ সবসময় মোটেই সতর্ক থাকে না। একদিন সন্ধ্যায় আলম, কাজী, গাজী এবং স্বপন নামে চারজন ঢাকার গেরিলা একটি গাড়িতে ফার্মগেটে আসে। মিলিটারী চেকপোস্টের নিকটে পৌঁছার সময় তাদেরকে পাকসেনারা আসতে নির্দেশ দেয়। তারা তাদের গাড়িটি নির্দেশ অনুযায়ী দ্বিতীয় রাজধানীর দিকে মুখ করে রাস্তার পাশে দাঁড় করায়। চারজন পাকসেনা গাড়ির দিকে তল্লাশির জন্য অগ্রসর হয়। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি থেকে গেরিলারা তিনটি চায়নিজ স্টেনগান থেকে গুলি চালাতে থাকে। পাকসেনাদের অন্যান্য লোকও গাড়ির দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করে। গেরিলা দল তাদের লক্ষ্য করে গ্রেনেড ছোড়ে এবং তীব্র গতিতে গাড়ি চালিয়ে অবস্থান পরিত্যাগ করে। এ সংঘর্ষের ফলে পাকসেনাদের পাঁচজন মিলিটারী পুলিশ আহত ও ৪ জন নিহত হয়। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ফার্মগেট এবং কাওরান বাজার এলাকায় আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। ২রা আগস্ট ঢাকার গেরিলাদের আর একটি দল 'গ্যানিস' এবং 'ভোগ' নামক দুটি বড় দোকানে গ্রেনেড ছুড়ে দোকান দুটির ক্ষতি সাধন করে।

লেঃ ইমামুজ্জামানের 'রেকি' পার্টি সংবাদ নিয়ে আসে যে, পাকসেনাদের দুটি জীপকে রেশন এবং গোলাবারুদ সরবরাহের জন্য বালিয়াজুরি ভাঙ্গা ব্রীজের নিকট শত্রু অবস্থানের দিকে যেতে দেখা গেছে। লেঃ ইমামুজ্জামান তৎক্ষণাৎ একটি প্লাটুন জীপ দুটিকে এ্যামবুশ করার জন্য হরিসর্দার বালিয়াজুরি ব্রীজের নিকট পাঠিয়ে দেয়। লেঃ ইমামুজ্জামান প্লাটুনটি সঙ্গে সঙ্গে অবস্থান নিয়ে জীপের উপর রাইফেলের সাহায্যে গুলি চালাতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে পাকসেনাদের দুজন নিহত হয়। একটি জীপ মৃত সঙ্গীদের নিয়ে দ্রুত ঘুরে পালিয়ে যায়। অন্য জীপটির উপর প্লাটুনটি গুলি চালাতে থাকে। পাকসেনাদের রাস্তার পশ্চিম পার্শ্বে অবস্থান নিয়ে আমাদের প্লাটুনটির উপর গুলি চালাতে থাকে। তাদের গুলি ফুরিয়ে এলে তারা গাড়ি থেকে গুলি নেবার চেষ্টা করে -কিন্তু তাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। এ আক্রমণে তাদের ৬ জন মারা যায়। পরে পাকসেনারা আমাদের এ্যামবুশ অবস্থানের উপর প্রচন্ড গোলা ছুড়তে থাকে। বাধ্য হয়ে আমাদের প্লাটুনটি অবস্থান পরিত্যাগ করে। শত্রুদের গাড়িটি বিধ্বস্ত হয়ে যায়। এরপর পাকসেনাদের একটি শক্তিশালী দর দুপুর দেড়টার সময় আমাদের অবস্থানের দিকে অগ্রসর হয়। এই দলটি যখন আমাদের অগ্রবর্তী অবস্থানের নিকট পৌঁছে, তখন আমাদের সৈন্যরা পাকসেনাদের উপর আক্রমণ চালায়। প্রচণ্ড সংঘর্ষে ১০ জন পাকসেনা নিহত এবং আরও কয়েকজন আহত হয়। পাকসেনারা বাধ্য হয়ে তাদের আক্রমণ পরিত্যাগ করে ফেরত চলে যায়।

মেজর সালেক ১০ই আগস্ট একটি প্লাটুন নিয়ে শালদা নদীর পশ্চিমে ব্রাহ্মণবাড়িয়া -কুমিল্লা সি-এন্ড-বি রাস্তার নিকট শিলদাই গ্রামে তাঁর গোপন ঘাঁটি স্থাপন করে। পরদিন স্থানীয় লোকের নিকট খবর পায় যে, সি-এন্ড-বি রাস্তার উপর দিয়ে প্রতিদিন কুমিল্লা থেকে উজানিরশার পাক অবস্থানে ৩-৪টি জীপ যাতায়াত করে। এই সংবাদ পেয়ে মেজর সালেক পাকসেনাদের জন্য সি-এন্ড-বি রাস্তায় একটা এ্যামবুশ পাতে। সমস্ত দিন ও রাত অপেক্ষা করার পরেও পাকসেনারা সেদিন আর আসেনি। বোঝা গেল যে, হয়তো বা তাদের কোন দালাল বা রাজাকার আগে থেকেই এ্যামবুশ সম্বন্ধে সতর্ক করে দিয়ছিল। অনেক অপেক্ষা করার পর রাস্তার মাইন লাগিয়ে মেজর সালেকের দলটি তার ঘাঁটিতে রওয়ানা হয়। পথে রসুল গ্রামের নিকট একটি রাজাকার ক্যাম্পে আক্রমণ চালায়। আক্রমণের সময় ক্যাম্প ভবনের ভিতর বেশ কয়েকটি গ্রেনেড নিক্ষেপ করা হয়। এই আক্রমনের ফলে ২০ জন রাজাকার নিহত ও ৩০ জন বন্দি হয়। এরপর দলটি নিজেদের অবস্থান নিরাপদে ফিরে আসে।

শালদা নদী, মন্দভাগ এবং এর চতুর্দিকে আমাদের সৈন্যরা পাকিস্তানীদের ওপর প্রায়ই আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছিল। পাকসেনাদের হতাহতের সংখ্যাও দিন দিন আরো বেড়ে যাচ্ছিল। আমাদের আক্রমণের ফলাফল সম্বন্ধে দুটি সঠিক বিবরণ গ্রামবাসী মারফত জানতে পাই। শালদা নদীর শত্রু অবস্থানের উপর আমরা গোলন্দাজ বাহিনীর সহায়তায় গোলার আক্রমণ চালানোর ফলে আগস্টের দ্বিতীয় সপ্তাহে শত্রুপক্ষের অন্তত ৬০ জন নিহত হয়।বাধ্য হয়ে শত্রুরা স্টেশন ছেড়ে নয়ানপুর গ্রাম, শালদা নদী গোডাউন ইত্যাদি এলাকায় অবস্থান তৈরী করে। মন্দভাগেও শত্রু অবস্থানের ওপর আমাদের গোলার আক্রমণের ফলে পাকসেনাদের প্রায় ১৫০ জন হতাহত হয়। পাকসেনাদের একটি ১২০ এমএম মর্টারের মারাত্মক ক্ষতিসাধন করা হয়। সন্ত্রস্ত পাকসেনারা বাধ্য হয়ে তাদের কামানের অবস্থানের পিছু হটিয়ে ব্রাহ্মণপাড়া নিয়ে যায়। আমাদের এ্যামবুশের ফলে শালদা নদীর রাস্তা পরিত্যাগ করা নাগাইশ হয়ে ব্রাহ্মণপাড়া থেকে একটি নতুন রাস্তা খোলার চেষ্টা করে। ১১ই আগস্ট পাকসেনাদের একটি কোম্পানী এই নতুন রাস্তায় আসে। আসার পথে নাগাইশ গ্রাম থেকে একজন স্থানীয় লোককে পথপ্রদর্শক হিসেবে নিয়ে আসে। এই লোকটি পরে আমাদের জানায় যে, পাকসেনাদের মনোবল একেবারেই ভেঙ্গে গেছে। নৌকাতে আসার সময় অনেক সৈন্যই সামনে অগ্রসরে অনিচ্ছা প্রকাশ করে। তাদের কমাণ্ডারা অনেকভাবে তাদের উৎসাহিত করার চেষ্টা চালায়। এ ছাড়াও তাদের অনেককে চিন্তিত ও বিমর্ষ দেখাচ্ছিল। তারা তাদের পুরনো দাম্ভিক স্বভাব অনেকটা পরিত্যাগ করেছে। পাকসেনারা গ্রামবাসীদের সাথে মিশবার চেষ্টাও করছিল। শত্রুদের এই নতুন রাস্তার খবর পেয়ে মেজর সালেক একটি প্লাটুন পাঠিয়ে দেয়। প্লাটুনটি নাগাইশ গ্রামে পাকসেনাদের দুটি রসদ বোঝাই নৌকা ব্রাহ্মণপাড়া থেকে নয়ানপুরের দিকে যাচ্ছিল।

আমাদের প্লাটুনটি তাদের উপর অতর্কিত আক্রমণ করে এবং ১১ জন পাকসেনাকে নিহত করে নৌকাগুলি ডুবিয়ে দেয়।

কিছুক্ষণ পরে পাকসেনাদের আরও তিনটি নৌকা শালদা নদী থেকে ব্রাক্ষ্মণপাড়া দিকে যাচ্ছিল। এই নৌকাগুলিকেও আমাদের এ্যামবুশ পার্টি শশিদল গ্রামের নিকট এ্যামবুশ করে এবং এতে ১০ জন পাকসেনা নিহত হয়। পরদিন পাকসেনাদের দুটি শক্তিশালী প্লাটুন আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের দমনে নাগাইশের দিকে অগ্রসর হয়। আমাদের প্লাটুনটি সংবাদ পেয়ে সুবেদার নজরুল ও নায়েব সুবেদার মুনিরের নেতৃত্বে পাকসেনাদের এই দলটিকে নাগাইশ পৌঁছার আগেই অতর্কিত আক্রমণ করে ২৫ জন পাকসেনাকে নিহত করে। পাকসেনারা পিছু হটে যায়। ১৭ই আগস্ট ব্রাক্ষ্মণপাড়া এই নদীপথ খোলার জন্য পাকসেনাদের একটি বিরাট দল নদীর পাড় দিয়ে অগ্রসর হয়। এবং সঙ্গে সৈন্য বোঝাই তিনটি নৌকাও অগ্রসর হয়। পাকসেনাদের এই দলটিকে আমাদের সৈন্যরা আবার এ্যামবুশ করে। এ্যামবুশের ফলে নৌকার আরোহী ১৮ জন পাকসেনা নিহত হয়। পাকসেনাদের যে দলটি পাড় দিয়ে আসছিল, তাদের প্রবল চাপে বাধ্য হয়ে আমাদের সৈন্যরা পিছু হটে আসে। পাকসেনারা দুই-তিনবার এ্যামবুশে পড়ার পরও শালদা নদীর নাগাইশ-ব্রাক্ষ্মণপাড়া যোগাযোগপথ খোলার চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকে। এই খাল ছাড়া পিছন থেকে শালদা নদীতে সরবরাহের আর কোন রাস্তা ছিল না।

১৯শে আগস্ট দুপুর ১২টার সময় পাকসেনাদের তিনটি নৌকা শালদা নদী থেকে ব্রাক্ষ্মণপাড়া দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। এই নৌকাগুলি যখন ছোট নাগাইশের নিকট পৌঁছে তখন আমাদের সৈন্যরা নৌকাগুলির উপর আক্রমণ চালায়। পাকসেনারা পাল্টা গুলি চালিয়ে আমাদের আক্রমণ প্রতিহত করা চেষ্টা করে; কিন্তু আমাদের সৈন্যদের তীব্র আক্রমণের মুখে তাদের দুটি নৌকা ডুবে যায় এবং ২০ জন নিহত হয়। পিছনের নৌকাটি দ্রুত পিছনে ফিরে পাড়ে পৌঁছায়। পাকসেনারা নৌকা থেকে নেমেই আমাদের সৈন্যদের ওপর আক্রমণের চেষ্টা করে। প্রায় চার ঘণ্টা উভয় পক্ষে গোলাগুলি চলার পর পাকসেনারা পিছু হটে যায়। ঐদিনই বেলা ১টার সময় আমাদের কামানের গোলায় শালদা নদী গুদামে অবস্থিত পাকসেনাদের একটি বাঙ্কার ধ্বংস হয়। ফলে আটজন পাকসেনা ঘটনাস্থলেই নিহত হয়।

মন্দভাগেও ৪র্থ বেঙ্গলের ‘সি’ কোম্পানী অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে পাকসেনাদের চারটি বাঙ্কার ধ্বংস করে দেয়। ফলে ১১ জন নিহত ও তিনজন আহত হয়। লেঃ ইমামুজ্জামান পাকবাহিনীর হরিসর্দার হাটের অবস্থানের উপর তাঁর চাপ রেখে যাচ্ছিল। এই চাপের ফলে পাকসেনাদের মনোনল দ্রুত ভেঙ্গে পড়ছিল। এই অবস্থানটিতে বারবার অতর্কিত আক্রমণ এবং এ্যামবুশ চালানোর ফলে পাকসেনারা আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের ভয়ে সবসময় সজাগ থাকত।

শত্রুদের এই অবস্থানটি মুক্ত করার জন্য একটি পরিকল্পনা নেওয়া হয়। ভীতসন্ত্রস্ত পাকসেনাদের মনোবল সম্পূর্ণ ভেঙ্গে দেয়ার জন্য অবস্থানটির নিকটবর্তী এলাকায় গুজব ছড়িয়ে দেওয়া হয় যে, পাকসেনাদের এই অবস্থানটির ওপর মুক্তিবাহিনীর আক্রমণ অবশ্যম্ভাবী। ৪র্থ বেঙ্গল রেজিমেন্ট আক্রমণ করার জন্য অতিসত্বর হরিসর্দার হাটের দিকে উত্তর থেকে অগ্রসর হচ্ছে এবং তাদের সঙ্গে বন্ধুরাষ্ট্রের দেয়া অনেক কামানও আছে। এ ছাড়াও অনেক মুক্তিযোদ্ধা এ আক্রমণের জন্য একত্রিত হচ্ছে। এই ধরনের গুজব প্রায়ই পাকসেনাদের আমানগোণ্ডা অবস্থানের এলাকায় প্রচার করা হচ্ছিল। এর ফলে পাকসেনাদের মনেবলে আরও ভাঙ্গন ধরে। ১৪ই আগস্ট আরও গুজব ছড়িয়ে দেয়া হয় যে, পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবসেই এই আক্রমণ চালানো হবে। ১৪ই আগস্ট রাত ১০টার সময় লেঃ ইমামুজ্জামান কয়েকজন সিপাই আমানগোন্ডার নিকটে গিয়ে লাইন পিস্তল এবং ২ ইঞ্চি মর্টারের সাহায্যে ইল্যুমিনেটিং প্যারাচ্যুট বোমা ছোড়া হয় এবং কয়েক রাউন্ড গুলি চালানো হয়। এর পরদিন আমানগোণ্ডা অবস্থানের নিকট পৌঁছে দেখা গেল যে, পাকসেনারা সমস্ত প্রতিরক্ষা অবস্থান ছেড়ে রাতে ভয়ে পালিয়ে গেছে এবং এলাকাবাসী পাকসেনাদের পরিত্যক্ত জিনিসপত্র সংগ্রহ করছে।

এ ছাড়াও পরে আমরা আরো অনেক সূত্রে জানতে পারি যে, মুক্তিবাহিনীর সম্ভাব্য আক্রমণ সম্বন্ধে পাকিস্তানীরা এত বেশী সন্দিহান এবং চিন্তিত হয়ে পড়েছিল যে, ১৩ই আগস্ট ঢাকা থেকে এক ব্যাটালিয়ন সৈন্য এবং চারটি লাইট ট্যাঙ্ক কুমিল্লাতে আনা হয়। এই ব্যাটালিয়নটি বানাসিয়া থেকে গাজীপুর পর্যন্ত রেললাইনের পাশে প্রতিরক্ষা অবস্থান তৈরী করে, দুটি ট্যাঙ্ক কুমিল্লা বিমানবন্দরের নিকট মোতায়েন করে এবং বাকিগুলি কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে রাখা হয়। কুমিল্লার সামরিক প্রশাসক ব্রিগেডিয়ার মাসুদ ঘোষণা করেন যে, যদি কোন বাঙালী সামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ করে যে, মুক্তিবাহিনী তার বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে তবে তাকে সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে। এইভাবে পাকবাহিনী তাদের দোষ মুক্তিবাহিনীর ওপর চাপাবার প্রচেষ্টা চালায় এবং এইসব অভিযোগকে তাদের প্রচার কাজের ব্যবহার করার চেষ্টা করে।

পাকসেনারা হোমনা থানায় একবার আক্রান্ত হবার পর এই থানাটিতে আবার পশ্চিম পাকিস্তানী পুলিশ এবং কিছুসংখ্যক পাকসেনা মোতায়েন করে শক্তিশালী করে তোলে। থানাটিতে পাকসেনাদের অবস্থান শক্তিশালী হবার পর হোমনা এলাকায় মুক্তিবাহিনীর পক্ষে তাদের কার্যকলাপ চালিয়ে যাওয়াতে বাধার সৃষ্টি হয়। এই এলাকা আবার মুক্ত করার জন্য হাবিলদার গিয়াস থানাটিকে আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নেয়। প্রথমে থানাটির প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ খবর সংগ্রহ করে। স্থানীয় গেরিলাদেরকেও তার প্লাটুনের সঙ্গে একত্রিত করে। ১৫ই আগস্ট রাত ১২টার সময় আমাদের সম্মিলিত দলটি হোমনা থানার উপর অতর্কিত আক্রমণ করে। কিন্তু ২ ঘণ্টা তুমুল যুদ্ধের পর তারা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। যুদ্ধে তাদের ১০ জন নিহত ও ১৪ জন বন্দি হয়।

আমাদের দলটির দুজন আহত হয়। থানাতে ২৪টি রাইফেল, দুটি বন্দুক, ১৬টি বেয়োনেট, একটি অয়্যারলেস সেট, দুটি টেলিফোন সেট, ১০টি গ্রেনেড ও দেড় হাজার গুলি আমাদের হস্তগত হয়। বন্দিদের থানা হেডকোয়ার্টারে পাঠিয়ে দেয়া হয়। হোমনা থানার বিস্তৃত এলাকা আমাদের নিয়ন্ত্রণে আসে। এর দুদিন পর হোমনা পতনের খবর পেয়ে পাকসেনাদের ৩টি দল মুরাদনগর থেকে হোমনার দিকে নৌকয় অগ্রসর হয়। মুরাদনগরে অবস্থিত আমাদের গেরিলারা এই সংবাদ পেয়ে যায়। স্থানীয় গেরিলা কমাণ্ডার মুসলেউদ্দিনের নেতৃত্বে দুপুর ২টার সময় নদীর পাড়ে অগ্রসরমান পাকসেনাদের জন্য এ্যামবুশ পাতে।

মুরাদনগর থেকে ৮ মাইল দূরে সন্ধ্যা ৬টার সময় পাকসেনাদের নৌকাগুলি এ্যামবুশে পড়ে যায়। আমাদের গেরিলাদের গুলিতে দুটি নৌকা ডুবে যায়। গোলাগুলিতে ১ জন ক্যাপ্টেনসহ ২৯ জন পাকসেনা এবং পাঁচজন রাজাকার নিহত হয়। আমাদের গেরিলারা ৩টি এমজি-৪২ এবং দুটি বেল্ট বক্স (৫০০ গুলিসহ), ৫০০ চাইনিজ রাইফেলের গুলি এবং ১টি ৩০৩-রাইফেল হস্তগত করে। অবশিষ্ট অস্ত্রশস্ত্র পানিতে ডুবে যাওয়ায় উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। কুমিল্লা থেকে তিন মাইল উত্তর-পূর্বে কংসতলাতে পাকসেনারা আগস্ট মাসে তাদের একটি ঘাঁটি স্থাপন করে। এই ঘাঁটিতে পাকসেনাদের অন্তত এক কোম্পানী শক্তি ছিল। পাকসেনাদের এই ঘাঁটির সংবাদ ক্যাপ্টেন মাহবুবের নিকট পৌঁছে। তিনি একটি পেট্রোল পার্টি পাঠিয়ে এই ঘাঁটি সম্বন্ধে বিস্তারিত খবর সংগ্রহ করেন। ১৬ই আগস্ট সন্ধ্যা ৭টায় ক্যাপ্টেন মাহবুবের নেতৃত্বে দুটি প্লাটুন শত্রুঘাঁটির দিকে অগ্রসর হয়। রাত ২টার ক্যাপ্টেন মাহবুবের দলটি পাকসেনাদের ঘাঁটির উপর অতর্কিত আক্রমণ চালায়। মুক্তিবাহিনীর সৈনিকরা পাক-ঘাঁটির ভিতরে অনুপ্রবেশ করে পাকসেনাদের হকচকিত করে দেয়। তুমুল সংঘর্ষে কিংকর্তব্যবিমূঢ় পাকসেনাদের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়। পাকসেনারা পর্যুদস্ত হয়ে তাদের ঘাঁটি ছেড়ে পালিয়ে যায়। আমাদের দলটি পলায়মান পাকসেনাদের খায়েশ বাজার এবং লক্ষ্মীপুর ঘাঁটি থেকেও হটে বাধ্য করে। সমস্ত রাতের সংঘর্ষে পাকসেনাদের একজন অফিসারসহ ৩০ জন হতাহত হয়। এরপর আমাদের দলটি নিরাপদে তাদের কেন্দ্রে ফিরে আসে।

এর তিনদিন পর কুমিল্লার ১ মাইল উত্তরে আমাদের আরও একটি দল পাকসেনাদের জন্য একটি এ্যামবুশ পেতে বসে থাকে। ২০শে আগস্ট রাত ৮টায় পাকসেনাদের একটি টহলদার প্লাটুন এই এ্যামবুশের আওতায়

পড়ে যায়। পাকসেনাদের প্লাটুনটি যখন পুরোপুরি আমাদের এ্যামবুশ পার্টির সম্মুখে এসে যায় তখন আমাদের দলটি হালকা মেশিনগান এবং অন্যান্য অস্ত্রের সাহায্যে তাদের উপর গুলিবর্ষণ করে। পাকসেনারা অতর্কিত এই আক্রমণে হকচকিত হয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে পলায়ন করে। এই এ্যামবুশে ১১ জন পাকসেনা নিহত এবং তিনজন আহত হয়। আমাদের দলটি পাকসেনাদের একটি এমজিআইএ মেশিনগান ও কয়েকটি জি-৩ রাইফেল দখল করে।

পাকসেনাদের একটি শক্তিশালী দল জগন্নাথ দিঘীতে ঘাঁটি করেছিল। এই দলটি মাঝে মাঝে নিকটবর্তী চিয়ারা গ্রামে রাত্রিতে তাদের অবস্থান পরিবর্তন করতো। এই খবর আমরা পেয়ে যাই। ২৩শে আগস্ট মেজর জাফর ইমাম এই দলটিকে আক্রমণ করার জন্য দুটি প্লাটুন নিয়ে চিয়ারা গ্রামের নিকট পাকসেনাদের অপেক্ষায় অবস্থান করে। রাত সাড়ে ১২টায় জগন্নাথ দিঘী পাক অবস্থানের উপর মুক্তিযোদ্ধা একটি দল আক্রমণ চালায়। একই সঙ্গে চিয়ারা গ্রামে অবস্থিত পাকসেনাদের উপর মেজর জাফর ইমামের নেতৃত্বে আক্রমণ চালানো হয়। এই আক্রমণের ফলে চিয়ারা গ্রামে অবস্থিত পাকসেনারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় এবং ২৪ জন পাকসেনা আমাদের মুক্তিবাহিনীর হাতে নিহত হয়। কিছু শত্রুসেনা আহত অবস্থায় পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। জগন্নাথ দিঘীতেও চারটি বাঙ্কার আমাদের মুক্তিবাহিনী ধ্বংস করতে সক্ষম হয়। নয়ানপুর রেল স্টেশনে পাকসেনাদের উপর ৪র্থ বেঙ্গলের 'এ' কোম্পানী এবং 'সি' কোম্পানী তাদের চাপ আরো জোরদার করে। ২৩শে আগস্ট সকাল ১১টায় উক্ত কোম্পানী দুটি মিলিতভাবে স্টেশনের উত্তর এবং দক্ষিণ দিক থেকে মর্টার ও ১০৬-রিকয়েললেস রাইফেল নিয়ে পাক অবস্থানের উপ সাঁড়াশি আক্রমণ চালায়। ১০৬-রিকয়েললেস রাইফেলের আঘাতে পাকিস্তানীদের বেশ কটি শক্ত বাঙ্কার বিধ্বস্ত হয়। স্টেশনের কিছু দূরে একটি গুদাম ছিল। তার ভিতরেও পাকসেনারা বাঙ্কার বানিয়েছিল। গুদামটিতেও রকেট মারা হয়। ফলে গুদামে আগুন ধরে যায়। রকেটিং-এর পর মর্টার এবং মেশিনগানের সাহায্যে শত্রু অবস্থানের উপর প্রচন্ড গোলাবর্ষণ করা হয়। এই আক্রমণ এত সফল হয়েছিল যে, শত্রু অবস্থান থেকে ভীতসন্ত্রস্ত আর্তনাদ এবং চিৎকার শোনা যাচ্ছিল। পাকিস্তানীরা আমাদের আক্রমণের জবাব দেবার সুযোগ পায়নি। শত্রুদের প্রকৃত হতাহতের সংখ্যা সে সময়ে জানা যায়নি। পরে আমরা গ্রামবানী সূত্রে খবর পেয়েছি যে, আক্রমণে পাকসেনাদের যথেষ্ট হতাহত হয়েছে।

নোয়াখালী এবং বেলুনিয়াতে আমাদের সৈনিকরা এবং গেরিলা দল পাকসেনাদের নাজেহাল করে তুলেছিল। ২২শে আগস্ট পাকসেনাদের একটি দল সোনাগাজীর দিকে ট্রাকে অগ্রসর হচ্ছিল। আমাদের একটি দল রাস্তায় এন্টি-ট্যাঙ্ক মাইন পেতে ভোর ৫টায় পাকসেনাদে দলটিকে এ্যামবুশ করে। মাইনের আঘাতে পাকসেনাদের তিনটি প্রাক ধ্বংস হয় এবং সেই সঙ্গে তাদের ২০ জন সৈন্য নিহত হয়। এ ছাড়াও এ্যামবুশ পার্টির গুলিতে প্রায় ৪০ জন পাকসেনা এবং রাজাকার হতাহত হয়। প্রায় এক ঘণ্টা যুদ্ধের পর আমাদের দলটি অবস্থান পরিত্যাগ করে নিরাপদে ফিরে আসে। এই ঘটনার দুদিন পর চৌদ্দগ্রাম এবং লাকসাম সড়কের উপর আমাদের গেরিলারা মাইন পুঁতে রাখে। পাকসেনাদের একটি ডজ গাড়ি মাইনের আঘাতে বিধ্বস্ত হয়। গাড়িতে অবস্থানরত একজন অফিসার এবং একজন পাকসেনা নিহত হয়। একই সময় ফেনী থেক একটি ট্রাক পাকসেনাসহ চৌদ্দগ্রামের দিকে আসছিল। আমাদের একজন গেরিলা ট্রাকের ভিতর একটি গ্রেনেড নিক্ষেপ করে। প্রায় ২৫ জন পাকসেনা হতাহত হয়। অপর পক্ষে পাকসেনাদের গুলিতে আমাদের একজন মুক্তিযোদ্ধা কমাণ্ডার শাহজাহান শহীদ হয় এবং একজন আহত হয়। একজন মুক্তিযোদ্ধা পাকসেনার হাতে ধরা পড়ে। গেরিলারা ফেনীর কাছে গুমদন্ডী রেলওয়ে লাইন ডিমোলিশন দিয়ে উড়িয়ে দেয়। ফলে ফেনী এবং এবং কুমিল্লার মধ্যে ট্রেন যোগাযোগ সামরিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ২১শে আগস্ট সকাল সাড়ে ৭টায় আমাদের একটি পেট্রোল পার্টি পাকসেনাদের একটি দলকে কুমিল্লার উত্তরে গাজীপুর রেলওয়ে সেতুর দিকে অগ্রসর হতে দেখে। আমাদের পেট্রোল পার্টিটি পুলের নিকট এ্যামবুশ পেতে পাকসেনাদের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। পাকসেনারা এ্যামবুশ অবস্থানটির মধ্যে এসে যায় এবং আমাদের মুক্তিযোদ্ধা দ্বারা অতর্কিতভাবে আক্রান্ত হয়। এই আক্রমণে একজন লেফটেন্যান্ট সহ ছ'জন পাকসেনা নিহত হয় এবং অবশিষ্ট পাকসেনারা পালিয়ে বাঁচে। বহু অস্ত্রশস্ত্র এবং ম্যাপ আমাদের দখলে আসে।

৪র্থ বেঙ্গলের 'সি' কোম্পানী আগস্ট মাসের শেষের দিকে কুমিল্লার উত্তরে মন্দভাগ এবং সি-এন্ড-বি সড়কের উপর তাদের কার্যকলাপ জোরদার করে তোলে। ২৩শে আগস্ট রাত ১টায় ক্যাপ্টে গাফফারের নেতৃত্বে দুটি প্লাটুন মন্দভাগ বাজরের উপর অতর্কিত আক্রমণ চালায়। আক্রমণের সময় আমাদের সৈনিকরা গ্রেনেড চার্জ করে পাকসেনাদের চারটি বাঙ্কার ধ্বংস করে দেয়। এই আক্রমণে পাকসেনাদের অন্তত ২৫ জন নিহত এবং ১২ জন আহত হয়। আমাদের পক্ষে দু'জন মারাত্মকভাবে আহত এবং একজন শহীদ হন। ১ ঘণ্টা যুদ্ধের পর আমাদের যোদ্ধার শত্রু অবস্থান পরিত্যাগ করে নিরাপদে ফিরে আসে। ২৫শে আগস্ট আমাদের একটি ডিমোলিশন পার্টি সি-এন্ড-বি সড়কের কালামোড়া সেতুতে প্রহরারহ পাকসেনাদের আক্রমণ করে। সেতুটিকে আমাদের দলটি উড়িয়ে দেয়। ঐদিন ভোর ৫টায় পাকসেনাদের একটি জীপ দ্রুতগতিতে বিধ্বস্ত হয় এবং ঐ জীপের আরোহী তিনজন পাকসেনা নিহত হয়। আমাদের আরেকটি দল সি-এন্ড-বি রাস্তার উপর একটি এ্যামবুশ পেতে রাখে।

২৫শে আগস্ট সকাল ৮টার সময় পাকসেনাদের একটি ডজ গাড়ি এ্যামবুশের আওতায় এলে গাড়িটি ধ্বংস করে দেয়া হয় এবং ডজের আরোহী চারজন পাকসেনাকে (একজন হাবিলদার ও নিজন সিপাই) বন্দি করা হয়। মুক্তিযোদ্ধারা এ যান থেকে ছ'টি রাইফেল, ২২৫ রাউন্ড গুলি, দুটি পিস্তল ও তিনটি গ্রেনেড হস্তগত করে। কুমিল্লার উত্তরে কামবাড়ি ও আম্রতলী এলাকায় পাকসেনারা প্রায়ই টহল দিতে আসত। পাকসেনাদের এই দলটিকে এ্যামবুশ করার জন্য পরিকল্পনা নেয়া হয়। ২৫শে আগস্ট তারিখে আমাদের একটি প্লাটুন ক্যাপ্টেন দিদারুল আলমের নেতৃত্বে বিকেল চারটায় মর্টারসহ পাকসেনাদের টহল দেয়া রাস্তার পাশে এ্যামবুশ পেতে বসে থাকে। সন্ধ্যা ছয়টার সময় পাকসেনাদের একটি কোম্পানী গোমতী পার হয়ে জামবাড়ির দিকে অগ্রসর হয়। এ্যামবুশের নিকট পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে তাদের উপর প্রবলভাবে মর্টারের গুলিবর্ষণ করা হয়। পাকসেনারা এই আকস্মিক আক্রমণে ছত্রভঙ্গ হয়ে পালাবার চেষ্টা করে। কিন্তু আমাদের এ্যামবুশ পার্টি পলায়নপর শত্রুসেনাদের উপর মেশিনগান এবং হালকা মেশিনগানের সাহায্যে তাদের প্রতি আক্রমণ চালায়। এই এ্যামবুশ ৩০ জন পাকসেনা নিহত এবং ১০ জন আহত হয়। অবশিষ্ট পাকসেনারা রাতের আঁধারে পালিয়ে যেতে সমর্থ হয়।

পাকসেনারা শালদা নদী এবং নয়নপুরে তাদের সরবরাহ নদীপথে পাঠাতো। তাদের এই নদীপথে বন্ধ করার জন্য প্রায়ই পাকসেনাদের অবস্থানের পেছনে আমাদের এ্যামবুশ পার্টি পাঠানো হতো। ২৩শে আগস্ট আমাদের এ্যামবুশ পার্টি সেনেরবাজারে অবস্থান নিয়েছিল। সকাল এগারটায় পাকসেনাদের একটা নৌকা সেনেরবাজারের পশ্চিম পাড় ঘেঁষে আসতে থাকে। আমাদের এ্যামবুশ পার্টি দ্রুত শত্রুর নৌকার উপর গুলিবর্ষণ শুরু করে। এতে ৭ জন পাকসেনা নিহত হয়, অবশিষ্ট সৈন্যরা নৌকাটিকে তাড়াতাড়ি পশ্চিম তীরে ভিড়িয়ে নৌকা থেমে নেমে গ্রামের দিকে পালিয়ে যায়। এই ঘটনার তিন দিন পর আমাদের আরেকটি চহলদার দল ব্রাহ্মণপাড়া গ্রামের নিকট পাকসেনাদের ছ'টি নৌকা নয়ানপুরের দিকে অগ্রসর হতে দেখে। প্রত্যেকটি নৌকায় ছয় থেকে আটজন করে পাকসেনা ছিল। টহলদার দলটি হাবিলদার সৈয়দ আলী আকবরের নেতৃত্বে সেনেরবাজারের নিকট নদীর পশ্চিম তীরে এ্যামবুশ পেতে বসে থাকে। নৌকাগুলি যখন এ্যামুবশের আওতায় আসে তখন আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা নৌকাগুলোর উপর মেশিনগানের সাহায্যে গুলিবর্ষণ শুরু করে। প্রথম নৌকাটি গুলির আঘাতে উল্টে যায় এবং তিনজন পাকসেনা নিহত হয়। অবশিষ্ট তিনজন আরোহী পানিতে ঝাঁপ দিয়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করে। আমাদের আরেকটি দল সুবেদার নজরুল ইসলামের নেতৃত্বে পলায়নপর পাকসেনাদেরকে নাগাইশ গ্রামের কাছে আক্রমণ করে এবং তাদের তিনটি নৌকা ডুবিয়ে দেয়। এতে আঠারজন পাকসেনা পানিতে ডুবে মারা যায়। শুধু দুটি নৌকা থেকে পাকসেনারা রক্ষা পায় এবং নয়ানপুরের দিকে পলায়ন করে। এই সংঘর্ষে আমাদের ছাত্র গেরিলা আবদুল মতিন বুলেটবিদ্ধ হয়ে শাহাদৎ বরণ করেন।

২৭শে আগস্ট সকালে পাকসেনারা নয়ানপুরের পশ্চিম পাশে শশীদল গ্রামের নিকট তাদের সৈন্য সমাবেশ করে সেনের বাজারের দিকে অগ্রসর হয়। পাকসেনাদের এই দলটি মর্টারের গোলার সাহায্যে সেনের বাজারের উপর প্রচন্ড আক্রমণ চালায়। সমস্ত দিন মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে প্রচন্ড গুলি বিনিময় হয়। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার সময় আমাদের সেনারা পাকসেনাদের আক্রমণকে প্রতিহত করে। পাকসেনারা অগ্রসর হতে ব্যর্থ হয়ে পিছু হটে যায়। পরে জানা যায় যে, এই সংঘর্ষে ১৫ জন পাকসেনা নিহত হয়।

২৮শে আগস্ট পাক-বাহিনী ব্রাক্ষণপাড়া থেকে পাঁচটি নৌকায় শালদা নদীর দিয়ে অগ্রসর হওয়ার পথে আবার আমাদের এ্যামবুশ পার্টি দ্বারা আক্রান্ত হয়। এই এ্যামবুশে আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা শত্রুসেনাদের পাঁচটি নৌকা ডুবিয়ে দেয়। এখানে একজন ক্যাপ্টেনসহ প্রায় ৩০ জন পাকসেনা হতাহত হয়। এর ফলে পাকসেনাদের জন্য নদীপথে অগ্রবর্তী ঘাঁটিগুলোতে সরবরাহ পুরোপুরিভাবেই বন্ধ হয়ে যায়।

৪র্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টের ‘এ; কোম্পানীর একটি টহলদার দল মাধবপুর এলাকার নিকট ২৭শে আগস্ট তাদের গোপন বেইস গড়ে তোলে। এখান থেকে পাকসেনাদের বিরুদ্ধে কার্যকলাপ চালিয়ে যাবার জন্য সি-এন্ড-বি সড়কে তাদের লোক পাঠায়। ২৮ তারিখে সকাল সাতটায় খবর আসে যে, পাকসেনারা একটি জীপ ও ট্রাকে সি-এন্ড-বি সড়ক থেকে কাঁচা রাস্তায় মাধবপুরের দিকে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ চালানোর জন্য এগিয়ে আসছে। আমাদের টহলদার দলটি এই সংবাদ পেয়ে মাধবপুর গ্রামের বাইরে কাঁচা রাস্তায় যে পথে পাকসেনারা অগ্রসর হচ্ছিলো সেখানে একটি এ্যামবুশ পেতে বসে থাকে। এগারটার সময় পাকসেনাদের জীপ এবং ট্রাকটি এ্যামবুশের আওতায় আসে। আমাদের এ্যামবুশ পার্টি আক্রমণ চালিয়ে গাড়ি দুটির মারাত্মক ক্ষতিসাধন করে। এই এ্যামবুশে ৯ জন পাকসেনা নিহত এবং ৬জন আহত হয়। কিছুসংখ্যক পাকসেনা পালিয়ে যেতে সমর্থ হয়।

আগস্ট মাসের শেষের দিকে কুমিল্লার দক্ষিণে আমাদের গেরিলারা তাদের কার্যকলাপ আরো জোরদার করে। ট্রেনিংপ্রাপ্ত একটি গেরিলা দল বরুরাতে তাদের বেইস-এ যাওয়ার পথে পাকসেনা এবং রাজাকার দ্বারা আকস্মিকভাবে আক্রান্ত হয়। এই সময় ফরিদগঞ্জ, হাজীগঞ্জ, দাউদকান্দি, চাগোরা প্রভৃতি জায়গায় পাকসেনাদের সঙ্গে গেরিলাদের সংঘর্ষে ১৬ জন পাকসেনা নিহত হয়। এসব সংঘর্ষে ২০টি রাইফেল এবং প্রচুর গোলাবরুদ আমাদের হস্তগত হয়। আগস্ট মাসে ২৯ তারিখে আমাদের মিয়ার বাজার সাব-সেক্টরে খবর আসে যে, পাকসেনারা লাকসাম থানার বুটচি গ্রামে সন্ধ্যা সাতটায় শান্তি কমিটির একটি সভা করার প্রস্ততি নিয়েছে। এই সংবাদ পেয়ে ক্যাপ্টেন ইমামুজ্জামান সভাটি পন্ড করার জন্য এক প্লাটুন মুক্তিযোদ্ধা পাঠিয়ে দেয়। পাকসেনা এবং রাজাকাররা সভা শুরু করলে আমাদের প্লাটুনটি তাদের উপর অতর্কিত আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণের ফলে ৮ জন পাকসেনা, ৯ জন পশ্চিম পাকিস্তানী পুলিশ এবং ২০ জন রাজাকার হতাহত হয়। শান্তি কমিটির সভাটি আর অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা নিরাপদে নিজেদের আশ্রয়ে ফিরে আসে।

২৫শে আগস্ট সকাল ৯টার সময় পাকসেনাদের একটি প্লাটুনকে ব্রাক্ষণপাড়া থেকে ধানদইল গ্রামের দিকে অগ্রসর হতে দেখা যায়। আমাদের একটা পেট্রোল পার্টি দূর থেকে পাকসেনাদের অগ্রসর হতে দেখে ধানদাইল গ্রামে এ্যামবুশ পাতে।পাকসেনারা এ্যামবুশের ভিতর এসে গেলে তাদের উপর অতর্কিত আক্রমণ চালায়। এতে ১ জন ক্যাপ্টেনসহ ১০ জন পাকসেনা নিহত হয়। অবশিষ্ট সেনারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে যায়। পরদিন আমাদের এই টহলদার দলটি উত্তর নাগাইশ এবং ছোট নাগাইশ গ্রামের মাঝে মালদা নদীর পাড়ে এ্যামবুশ পাতে। সকাল পাঁচটায় আমাদের এ্যামবুশ দল পাকসেনাদের একটি টহলদার দলকে শালদা নদীর পূর্ব তীর ঘেঁষে অগ্রসর হতে দেখে। পাকসেনাদের এই দলটি তাদের কয়েকটা সরবরাহকারী নৌকাকে নয়ানপুর থেকে মন্দভাগের দিকে পাহারা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলো। এই দলটি আমাদের এ্যামবুশ পার্টির আওতায় আসার সঙ্গে সঙ্গে তাদের উপর আক্রমণ চালায়। সঙ্গে সঙ্গে দুটি নৌকা ধ্বংস এবং ১৪ জন লোক নিহত হয়। পাকসেনাদের অপর পাহারা দল আমাদের এ্যামবুশ পার্টির প্রতি পাল্টা গুলি চালায়। প্রায় এক ঘণ্টা উভয় পক্ষের মধ্যে গোলা বিনিময় চলতে

থাকে। নয়ানপুর থেকে আরো দুটি নৌকায় পাকসেনারা তাদের দলটিকে আরো শক্তিশালী করার জন্য অগ্রসর হয়। প্রথম নৌকাটি আমাদের গুলিতে ডুবে যায় এবং ৫ জন পাকসেনা নিহত হয়। অন্য উপায় না দেখে দ্বিতীয় নৌকার সৈন্যরা তীরে নেমে পালিয়ে যায়। এরপর পাকসেনারা সমস্ত দিন এবং রাত হরিমঙ্গল, শশীদল এবং সেনের বাজারের দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে আমাদের সেনের বাজার এবং গৌরাঙ্গল অবস্থানের উপর গোলাবর্ষণ করতে থাকে। পরের দিন সকাল ৯টায় ৩০ জন পাকসেনা দুটি নৌকায় সেনের বাজার অবস্থানের দিকে আক্রমণের জন্য অগ্রসর হয়। অগ্রসর হওয়ার পথে আমাদের মেশিনগানের গুলিতে দুটি নৌকাই ডুবে যায় এবং সকল পাকসেনাই নদীতে ডুবে মারা যায়।

আগস্ট মাসের শেষে ঢাকাতে আমাদের গেরিলাদের শক্তি ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। তারা পাকসেনাদের ঢাকায় ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। পাকসেনারা প্রায়ই রাতে ঢাকা শহরে ট্রাকে করে টহল দিতে বেরুতো। টহল দেয়ার সময় অনেক ক্ষেত্রে শহরবাসীদের উপর জঘন্য অত্যাচার চালাতো।পাকসেনাদের রাতের এই তৎপরতা সীমিত করার জন্য আমাদের গেরিলারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। যেসব রাস্তায় সাধারণত পাকসেনারা টহল দিতে গেরিলারা সেসব রাস্তার ওপর বেশ কয়েকদিন লক্ষ্য রাখে। কোন রাস্তায় কতটার সময় কতগুলো গাড়ি কত গতিতে চলে, কত ব্যবধান দুই গাড়ির ভিতর বিরাজ করে প্রভৃতি তারা সংবাদ সংগ্রহ করে। ২৭শে আগস্ট রাত সাড়ে ১১টায় গ্রীন রোডের (স্টাফ কোয়ার্টারের বিপরীত দিকে) কতগুলো নির্মাণাধীন দোকানের ছাদে আমাদের গেরিলাদল এ্যামবুশ পেতে বসে থাকে। গেরিলারা রাস্তার উপর গাড়িবিধ্বংসী মাইন পেতে রাখে। এরপর এ্যামবুশ পার্টি পাকসেনাদের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। রাত প্রায় সাড়ে বারোটায় পাকসেনাদের ৪/৫টি বেডফোর্ড গাড়ী এবং জীপ তেজগাঁর দিক থেকে গ্রীন রোড হয়ে অগ্রসর হয়। প্রথম গাড়ীটি যখন এ্যামবুশ সাইট-এর শেষপ্রান্তে পৌঁছে তখন একটি মাইন-এর আঘাতে গাড়ীটি সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়। দ্বিতীয় গাড়ীটির চালক এই অবস্থা দেখে হকচকিয়ে পাশ কাটতে গিয়ে পার্শ্ববর্তী দালানের সঙ্গে ধাক্কা মারে, ফলে এই গাড়ীটিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর পেছনে পেছনে পাকসেনাদের আরেকটি জীপ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলে মাইনের আঘাতে সেটিও উল্টে যায়। যেসব পাকসেনা ক্ষতিগ্রস্ত গাড়ীগুলোতে অক্ষত অবস্থায় ছিল তারা গাড়ী থেকে বেরুবার চেষ্টা করে এবং গুলীবর্ষণ করতে থাকে। আমাদের এ্যামবুশ পার্টির গেরিলারা ছাদ থেকে তাদের উপর গ্রেনেড আক্রমণ চালায় এবং গুলি ছুড়তে থাকে। এর ফলে অধিকাংশ পাকসেনা হতাহত হয়। পেছন থেকে আরো একটি গাড়িতে পাকসেনারা ঘটনাস্থলের দিকে অগ্রসর হয়। এবং গাড়ী থেকে নেমে আমাদের গেরিলাদের উপর আক্রমণ চালাবার চেষ্টা করে। আমাদের গেরিলারাও তাদের উপর পাল্টা আক্রমণ চালায়। পাকসেনাদের হতাহতের সংখ্যা যখন বাড়তে থাকে তখন কোন উপায় না দেখে তারা ক্যান্টমেন্টের দিকে পালিয়ে যায়। গোলাগুলির শব্দে স্থানীয় জনসাধারণ তাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে। তারা ২৪ জন পাকসেনার মৃতদেহ ও ৪১ জনকে আহত অবস্থায় এবং দুটি বিধ্বস্ত ট্রাক এবং একটি জীপ রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখে। আমাদের পক্ষে দুজন সামান্য আহত হয়। আমাদের গেরিলারা কিছুসংখ্যক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে গ্রীন রোডের পিছনে দিকের নিচু জায়গা দিয়ে নিরাপদে চলে আসতে সক্ষম হয়। পরের দিন এউ খন্ডযুদ্ধ এবং পাকিস্তানীদের দুরবস্থার কাহিনী হাজার হাজার মানুষ প্রত্যক্ষদর্শীদের মুখে জানতে পারে। এই সংবাদ সমস্ত ঢাকায় মুহূতে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে ঢাকা শহরের মুক্তিকামী জনগণের মনে আশার সঞ্চার হয়। দুদিন পরে ঢাকার গেরিলারা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা বন্ধ করার জন্য নিউ মডেল ডিগ্রি কলেজে এবং আরো কয়েকটি কলেজে আক্রমণ চালায়। তারা পরীক্ষার খাতাপত্র জ্বালিয়ে দয়ে। টঙ্গী এবং জয়দেবপুরের মাঝে দুটি বিদ্যুতের পাইলনও তারা উড়িয়ে দেয়। ২রা সেপ্টেম্বর রাতে পাকিস্তানীদের একটি জীপ যখন গ্রীন রোড দিয়ে যাচ্ছিল তখন আমাদের কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা জীপটির ভিতর গ্রেনেড নিক্ষেপ করে চারজন পাকসেনাকে নিহত করে। গ্রেনেড নিক্ষেপে জীপটির আংশিক ক্ষতি হয়।

এছাড়া ঢাকার গেরিলা দল পশ্চিম পাকিস্তানী একটি পুলিশের দলকে কলাবাগানের কাছে অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে দশজনকে নিহত করে। কালিগঞ্জ-ডেমরা এবং কালিগঞ্জ-টঙ্গীর মধ্যস্থিত বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইনের চারটি পাইলন উড়িয়ে দেয়। আমাদের আরেকটি গেরিলা দল রূপগঞ্জের নিকট নদীর পাড়ে পাকসেনাদের যাতায়াতের

রাস্তায় একটি এ্যামবুশ পেতে রাখে। ১লা সেপ্টেম্বর বিকেল ৫টায় কালিগঞ্জ থানার দারোগা, ৭০ জন পাকসেনা এবং ৭০ জন পশ্চিম পাকিস্তানী পুলিশ মুক্তিবাহিনীর সম্পর্কে তদন্তের জন্য ঢাকা থেকে কোন দূরবর্তী গ্রামে নৌকাযোগে যাচ্ছিলো। নৌকাটি যখন এ্যামবুশের আওতায় পৌঁছে তখন গেরিলারা নৌকার উপর হালকা মেশিনগান দ্বারা গুলি চালায়। গুলিতে নৌকার আরোহী পাকসেনা, পশ্চিম পাকিস্তানী এবং দারোগা নিহত হয় এবং নৌকাটি ডুবে যায়। ঢাকার আজিমপুরে গেরিলারা অতর্কিতে একটি রাজাকার দলের উপর আক্রমণ চালিয়ে চারজন রাজাকারকে নিহত এবং চারটি রাইফেল ও ৬০ রাউন্ড গুলি দখল করে। টঙ্গীতেও একটি রাজাকার ক্যাম্প আক্রমণ করে গেরিলারা কয়েকজন রাজাকারকে হত্যা করে চারটি রাইফেল দখল করে নেয়। ডেমরার নিকট আমাদের একটি গেরিলা দল ১৩ই আগস্ট বিকাল তিনটার সময় পাক বিমান বাহিনীর একটি জীপ এ্যামবুশ করে ধ্বংস করে দেয়। এ্যামবুশে ৪ জন বিমান বাহিনীর এবং সেনাবাহিনীর গোয়েন্দা সৈনিক নিহত হয়। তাদের কাছ থেকে অনেক কাগজপত্র, পরিচয়পত্র এবং কয়েকটি রিভলবার দখল করা হয়। দখলীকৃত কাগজপত্র আমাদের হেডকোয়ার্টার-এ গেরিলারা পাঠিয়ে দেয়।

আগস্ট মাসের শেষের দিকে পাকসেনাদের কোন গুপ্তচর আমাদের ঢাকার গেরিলাদের ধোলাই খাল ঘাঁটি পাকসেনাদের অবহিত করে। সংবাদ পেয়ে পাকসেনারা ২০/২৫টি ট্রাকে ধোলাই খালে আমাদের ঘাঁটিটি আক্রমণের জন্য আসে। পাকসেনাদের অতর্কিত আক্রমণে আমাদের গেরিলারা কোন উপায় না দেখে তাদের সঙ্গে সম্মুখসমরে লিপ্ত হয়। প্রায় ২ ঘণ্টা যুদ্ধ চলে। সংঘর্ষ পাকসেনাদের প্রায় ৪০-৪৫ জন হতাহত হয় বলে খবর পাওয়া যায়। অপরদিকে আমাদের দু'জন গেরিলা মারাত্মকভাবে আহত হয়। প্রবল চাপের মুখে টিকতে না পেরে আমাদের গেরিলারা সাঁতরিয়ে ধোলাইখাল পার হয়ে ধোলাইখাল অবস্থাটি পরিত্যাগ করে। পিছু হটার সময় একটি ২" মর্টার, ৩টি ম্যাগাজিন খালে ফেলে দিয়ে আসতে বাধ্য হয়। পরদিন পাকসেনারা সেগুলি উদ্ধার করে এবং তাদের প্রচারের কাজে ব্যবহার করে। এর পরদিন আমাদের গেরিলারা সূত্রাপুর থানার আক্রমণ চালিয়ে দুজন পাকসেনাকে নিহত করে। সূত্রাপুরের সার্কেল ইন্সপেক্টর এবং ওসি গুরুতরভাবে আহত হয়।

আগস্টের শেষের দিকে আমাদের ২/৩ জন গেরিলা এবজন মেজর ও দুইজন ক্যাপ্টেনকে(পাক গোলন্দাজ বাহিনীর) একটি জীপে করে আজিমপুরের নিকট এসে জীপ থেকেনেমে দূরে কোন এক বাড়িতে প্রবেশ করতে দেখে। কিছুক্ষণ পর সে বাড়ি থেকে চিৎকারের শব্দ শুনে আমাদের গেরিলারাও সেই বাড়িতে প্রবেশ করে। তারা বুঝতে পারে যে অফিসাররা ঐ বাড়ির মহিলাদের শ্লীলতাহানির চেষ্টা করছে। তৎক্ষণাৎ গেরিলারা অফিসারদেক লক্ষ্য করে গুলি চালিয়ে হত্যা করে। গেরিলারা পাক অফিসারদের মৃতদেহ দূরে অপেক্ষমাণ পাক জীপের মধ্যে রেখে দেয় এবং নিরাপদে সে স্থান পরিত্যাগ করে। পাক-পুলিশের একটি টহলদার দলকে আমাদের ধানমন্ডির গেরিলারা প্রতিদিন ধানমন্ডি সাত-মসজিদ রোড ও নিকটবর্তী রাস্তায় টহল দিতে দেখে। আমাদের গেরিলারা ২৫শে আগস্ট সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় ১৮ নং রোডের মোড়ে একটি চলন্ত গাড়ি থেকে স্টেনগানের গুলি দ্বারা ৯ জন পুলিশকে গুলি করে হত্যা করে। গুলির সংবাদ পেয়ে নিকটবর্তী টহলদারী পাকসেনারা জীপ নিয়ে গেরিলাদের পিছু ধাওয়া করে। গেরিলারা গাড়ী থেকে গুলি ছুড়ে জীপের ড্রাইভারকে নিহত করে। এ সময় দ্রুত গতিসম্পন্ন চলন্ত জীপটি আয়ত্তের বাইরে চলে যায় এবং পার্শ্ববর্তী দেয়ালে প্রচণ্ডভারে ধাক্কা খেয়ে বিধ্বস্ত হয়। এর ফলে গাড়ির আরোহী দুজন পাকসেনা নিহত এবং তিনজন আহত হয়। এই গেরিলাদের নেতৃত্ব দেয় রুমী (শহীদ, বীরবিক্রম)। পাকসেনারা পরে রুমীকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয় এবং তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করে। আগস্টের ২৯ তারিখে ছ'জনের একটি গেরিলা দল ঢাকার সৈয়দাবাদ সেতুটি এক্সপ্লোসিভ লাগিয়ে উড়িয়ে দেয়। এর ফলে ঐ সেতু দিয়ে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এসময় গেরিলারা একটি বাসে দুশো মণ পাটসহ লতিফ বাওয়ানী জুটমিলে যাওয়ার পথে বাসটিকে ধ্বংস করে দেয়। বরাইদের নিকট আরো তিন শ' মণ পাট ফসফরাস বোমা ফেলে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। গেরিলারা নারায়ণগঞ্জের জিএমসি ঘাটে পাঁচ হাজার বেল বহনকারী কামচাম ফ্ল্যাটটি ডুবিয়ে দেয়। এর-সি-এম জুটমিলের শ্রমিক (আমাদের একজন গেরিলা) ফসফরাস ৮০ গ্রেনেড নিক্ষেপ করে আর-সি-এম মিলের গুদামস্থিত প্রায় ১ লাখ মণ পাট জ্বালিয়ে দেয়। পরে জানা যায় যে,

দমকল বাহিনীর সাতটি গাড়ি ৩/৪ ঘণ্টা চেষ্টা করেও সেই জ্বলন্ত পাটের অগ্নিনির্বাপণে ব্যর্থ হয়। ফলে সমস্তপাট পুড়ে যায়।

৩০শে আগস্ট আমাদের গেলিারা আড়াই হাজার থানা অতর্কিত আক্রমণ করে থানার দারোগাকে নিহত করে। গেরিলারা থানার সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আসে। এর পরদিন গেরিলারা একজন পাক দালালের দু'লাখ টাকা মূল্যের সুতাবাহী নৌকা ডুবিয়ে দেয়। তারা থানা থেকে ৮টি রাইফেল, ৫টি শর্টগান এবং ৪০ রাউন্ড গুলি দখল করে। এই খবর পেয়ে নরসিংদী থেকে পাকসেনাদের একটি কোম্পানী ঘটনাস্থলে দিকে অগ্রসর হয়। আমাদের গেরিলারা আগে থেকেই এর জন্য প্রস্ত্তত ছিল। পুটিয়রের নিকট আমাদের একটি গেরিলা দল পাকসেনাদেরকে আক্রমনের জন্য এ্যামবুশ পাতে। পাকসেনারা এ্যামবুশের ফাঁদে পড়লে গেরিলারা গুলি চালায়। চার ঘণ্টা সংঘর্ষের পর ৩৩টি মৃতদেহ ফেলে পাকসেনারা ছত্রভঙ্গ হয়ে নরসিংদীর দিকে পালিয়ে যায়। যুদ্ধে পাকসেনাদের পাঞ্জাব রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেন সেলিমও নিহত হয়। মদৃদেহ থেকে পরিচয়পত্র অন্যান্য কাগজপত্র উদ্ধার এবং অনেক অস্ত্রশস্ত্র আমাদের গেরিলারা হস্তগত করে। গেরিলারা নরসিংদীর বিভিন্ন মিলে গ্রেনেড এবং মর্টারের সাহায্যে আক্রমণ চালিয়ে মিলের ভিতর সন্ত্রাসের সৃষ্টি করে। ফলে পাকসেনারা একে একে সব মিলগুলো বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়। পাকসেনাদের একটি দল ঝিনারদিতে (ঘোড়াশালের নিকট) তাদের ক্যাম্প স্থাপন করে। আগস্ট মাসের ১৩ তারিখে ডুপুর আড়াইটায় আমাদের একটি গেরিলা দল পাকসেনাদের এই ক্যাম্পটি অতর্কিতে আক্রমণ করে। সাতজন পাকসেনা পালিয়ে যেতে সমর্থ হয়। গেরিলারা ঝিনারদি রেল স্টেশনটিকে ধ্বংস করে দেয়। স্টেশনের টেলিফোন যোগাযোগের সেটটিও তারা ধ্বংস করে দেয়। টিকিট ও অন্যান্য কাগজপত্রও তারা জ্বালিয়ে দেয়। ক্যাম্প থেকে আমাদের গেরিলারা একটি হালকা মেশিনগান, ১১টি রাইফেল, হালকা মেশিনগানের ৪,৫০০ গুলি, ১টি স্টেনগান, ১০০ রাইন্ড স্টেনগানের গুলি, ১৪টি বেল্ট, ২৬ জোড়া বুট, ১৭ ব্যাগ আটা, ১১ পেটি দুধের টিন এবং আরো অন্যান্য জিনিসপত্র দখল করে এবং কয়েকদিন পর পাকসেনারা গোপন সূত্রে খবর পেয়ে আমাদের গেরিলা ইউনিট হেডকোয়ার্টারে দু'দিক থেকে আক্রমণ করে। আমাদের গেরিলা দুর্জয় সাহসের সঙ্গে তাদের সে আক্রমণের মোকাবিলা করে এবং আক্রমণ প্রতিহত করে। দু ঘণ্টা যুদ্ধের পর পাকসেনারা পিছু হটে যেতে বাধ্য হয়। ১৪ই আগস্ট পাকসেনাদের একটি দল ঝিনারদি স্টেশনের কাছে একটি গ্রামে লুটতরাজের উদ্দেশ্যে আসে। এই খবর পেয়ে আমাদের একটি গেরিলা দল পাকসেনাদের উপর আকমণ চালায়। পাকসেনারা তিনঘণ্টা যুদ্ধের পর ডুটি মৃতদেহ ও কয়েকটি আহত সেনাকে ফেলে নরসিংদী-তারাবো সড়কে পাঁচদোনার নিকট একটি গুরুত্বপূর্ণ সেতুতে প্রহরারত পাকসেনাদের একটি দলের উপর অতর্কিত আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণ প্রায় এক ঘণ্টা চলে। আমাদের আক্রমণ প্রবল হওয়ায় আহত পাকসেনাদের বাঁচাও বাঁচাও চিৎকার শোনা যায়। এমন সময় চার ট্রাক পাকসেনা তাদের সাহায্যে সেখানে উপস্থিত হয়। পাকসেনারা ভারী অস্ত্রের সাহায্যে আমাদের গেরিলাদের আক্রমণ প্রতিহত করে। ভারী অস্ত্রের মোকাবিলা করতে না পেরে আমাদের গেরিলারা বাধ্য হয়ে পিছু হটে আসে। পাকসেনাদেরকে পাঁচটি মৃতদেহ উঠিয়ে নিয়ে যেতে দেখা যায়। পাকসেনারা নরসিংদীর নিকটস্থ আমাদের গেরিলা অবস্থানের খবর পেয়ে আগস্টের ২১ তারিখে প্রায় এক কোম্পানী শক্তি নিয়ে আমাদের অবস্থানের দিকে অগ্রসর হয়। অগ্রসর হওয়ার পর পথিমধ্যে আমাদের একটি গেরিলা দল তাদেরকে অতর্কিতে আক্রমণ করে। প্রায় এক ঘণ্টা গোলাগুলির পর পাকসেনারা তাদের গোলাগুলি পর পাকসেনারা তাদের গোলাগুলি বন্ধ করে আমাদের অবস্থানের ২/৩ মাইল দূরে থাকতেই আর অগ্রসর না হয়ে পিছু হটে যায়।

আমাদের বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করার প্রচেষ্টা চলতে থাকে। কিন্তু পাকসেনারাও খুব দ্রুত বিদ্যুৎ সরবরাহের লাইনগুলো যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি মেরামত করে ফেলে। এর ফলে কিছুদিন বন্ধ থাকার পর শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো

সীমিত পরিমাণে বিদ্যুৎ সরবরাহ পায়। পাকসেনাদের বিদ্যুৎ সরবরাহে আরো বিঘ্ন সৃষ্টির জন্য নতুন করে আরেকটি পরিকল্পনা নেয়া হয়। পরিকল্পনা অনুযায়ী তিতাস গ্যাসের পাইপলাইনের নকশা যোগাড় করি এবং পরীক্ষা করে সিদ্ধান্তে পৌঁছে যে, গ্যাসের পাইপ কেটে দিলে সিদ্ধিরগঞ্জ এবং ঘোড়াশালের বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্রগুলো গ্যাসের অভাবে বন্ধ হয়ে যাবে। হানাদার কর্তৃপক্ষ এইসব বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্র চালাবার ব্যবস্থা করলে তাদের তেলের সংকট দেখা দেবে। পাইপলাইন উড়িয়ে দেবার জন্য নরসিংদী এবং রূপগঞ্জের গেরিলাদের নির্দেশ দেই। আমার নির্দেশ অনুযায়ী ২০শে আগস্ট রাত ১টায় নরসিংদী গেরিলা ইউনিটের ডিমোলিষর পার্টি তিতাস গ্যাস লাইন বারুদ লাগিয়ে উড়িয়ে দেয়। এই অপারেশন পুরাপুরি সফল হয়। বিস্ফোসণের ফলে প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা প্রায় ১০ মাইল দূর থেকে দেখা যায় এবং ৬/৭ মাইল দূর থেকে বিস্ফোরণের বিকট শব্দ শোনা যায়। ঘোড়াশালের উত্তরে সমস্ত এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। নরসিংদী, ঘোড়াশাল এবং পাঁচদোনাতে অবস্থানরত পাকসেনারা এই বিস্ফোরণের বিকট শ্বদ ভীষণভাবে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে এবং অনেকেই তাদের অস্ত্রশস্ত্র এবং জিনিসপত্র ফেলে ঢাকার দিকে পালিয়ে যেতে চেষ্টা করে। পরে স্থানীয় লোকজনের মুখে শোনা যায় যে, পাকসেনারা ধারণা করছিল ভারতীয় বিমান বোমা ফেলেছে। এর পরদিন আশুগঞ্জের নিকট কয়েক জায়গাতে পাইপ লাইন উড়িয়ে দেয়া হয়। এই গ্যাসের পাইপলাইন মেরামত করতে বেশ ক'দিন সময় লাগে। ততদিন শিল্প-কারখানাগুলো বন্ধ থাকে।

রূপগঞ্জের একটি গেরিলা দল ২২শে আগস্ট রাতে নরসিংদী এবং ঝিনারদি রেলস্টেশনের মাঝে রেল লাইনের নীচে মাইন পুঁতে রাখে। রাতে একটি ট্রেন দুটি বগীসহ সেখানে দিয়ে চলে যায়। ট্রেন এবং বগী দুটি চলে যাবার সাথে সাথেই মাইনটি বিস্ফোরিত হয়। এতে ট্রেনটির ক্ষতি না হলেও রেল লাইনের অনেকখানি ধ্বংস হয়। আমাদের বৈদ্যেরবাজার থানার গেরিল-দল সোনারগাঁও এবং সি-এন্ড-বি রোডের অনেক জায়গায় মাইন পুঁতে রাখে। ১৬ই আগস্ট রাতে পাকসেনাদের একটি ট্রাক মাইনের আঘাতে ধ্বংস হয় এবং সাথে সাথে ১১ জন পাকসেনা ও তিনজন রাজাকার নিহত হয়। ঢাকা-কুমিল্লা রাস্তার বাতেরচরের নিকটস্থ সড়কসেতুতে অবস্থারত পাকিস্তানীদের ওপর আমাদের গেরিলারা ৩১শে আগস্ট অতর্কিত আক্রমণ চালায়। সংঘর্ষে কয়েকজন পাকসেনা এবং রাজাকার নিহত হয়। গেরিলারা সেতুটির ৬০ ফুট লম্বা স্প্যান উড়িয়ে দেয়। তার পরদিন রাতে ঢাকা-দাউদকান্দি সড়কে বারুনিয়া এবং ভবেরচর সেতু দুটিও বিস্ফোরক লাগিয়ে উড়িয়ে দেওয়া হয়। ফলে ঢাকা-কুমিল্লা রাস্তা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায়। পাকসেনারা ভবেরচর সেতুর যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনরুদ্ধার করার জন্য ফেরীর বন্দোবস্ত করে। সেপ্টেম্বরের দু'তারিখে আমাদের গেরিলারা ফেরীঘাট আক্রমণ করে এবং ফেরীটি ধ্বংস করে দেয়। এই আক্রমণে ফেরী থেকে চারটি ব্যাটারী মুক্তিযোদ্ধারা দখল করে নেয়।

নারায়নগঞ্জ-দাউদকান্দী সড়কে গজারিয়াতে পাকসেনাদের একটি পোস্ট-চৌকী ছিল। সেপ্টেম্বরের ২ তারিখ রাত ৮টায় আমাদের গেরিলাদের একটি দল সেই চৌকি আক্রমণ করে। এক ঘন্টা যুদ্ধে তিনজন ইপিকাফ নিহত ও একজন বন্দী হয়। এখান থেকে ২০০ রাউন্ড গুলিসহ ১১ জন রাজাকার মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে আত্মসমর্পণ করে।

ঢাকার মুন্সীগঞ্জ এবং মানিকগঞ্জ মহকুমার গেরিলারাও তাদের তৎপরতা বাড়িয়ে দেয়। গেরিলাদের একটি দল হরিরামপুর থানার নিকট পাকসেনাদের একটি লঞ্চ আক্রমণ করে। লঞ্চে পাকসেনারা হরিরামপুর অবস্থান থেকে তাদের সৈনিকদের জন্য রসদ নিয়ে যাচ্ছিলো। এক ঘণ্টা গোলাগুলির পর ১১ জন পাকসেনা নিহত এবং আরো অনেকে আহত হয়। পাসেনারা আর অগ্রসর হতে না লঞ্চ নিয়ে ঢাকার দিকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। এর পরদিন হরিরামপুর থানার সেকেন্ড অফিসার এবং কয়েকজন পাকিস্তানী পুলিশ আমাদের গেরিলাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। পুলিশদের নিহত করে আমাদের গেরিলারা তিনটি রাইফেল দখল করে নেয়। ঘিওর থানাতেও পাকসেনারা একটি টহলদারী দলের উপর আমাদের গেরিলারা আক্রমণ চালিয়ে ৮ জন নিহত করে

এবং ৮টি রাইফেল দখল করে। সেপ্টেম্বর মাসের ১ তারিখে নওয়াবগঞ্জ থানা আমাদের গেরিলারা আক্রমণ করে। এই আক্রমণে সেখানকার সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র গেরিলাদের হস্তগত হয়। আগস্ট মাসের শেষ সপ্তাহে আমাদের গেরিলারা লৌহজং, শিবালয়, সিরাজদীখান এবং শ্রীনগর থানাগুলিতে অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে পাক পুলিশ হত্যা করে এবং প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র দখল করে। সেপ্টেম্বরের ১ম সপ্তাহে শিবালয় থানার গেরিলা দল পাকসেনাদের একটি প্লাটুনকে টহল দেয়ার সময় এ্যামবুশ করে। এই এ্যামবুশে ১৩ জন পাকসেনা নিহত এবং আরো অনেকে আহত হয়। পাকসেনারা ঢাকা থেকে আরো সৈন্য এনে শিবালয়ে আমাদের গেরিলা দলটির ঘাঁটিতে ১৭ই সেপ্টেম্বর আক্রমণ চালায়। কয়েক ঘণ্টা যুদ্ধের পর আমাদের গেরিলারা পাকসেনাদের পিছু হটিয়ে দিতে সক্ষম হয়। যুদ্ধে ১০ জন পাকসেনা এবং ১১ জন রাজাকার নিহত হয়।

১৯শে সেপ্টেম্বর আমাদের গেরিলারা মালোচিন বাজারে অবস্থানরত পাক পুলিশের একটি দলকে আক্রমণ করে ১৯ জন পাক পুলিশকে নিহত এবং তিনজনকে আহত করে। ঘোড়াশালের গেরিলা দল ৯ই আগস্ট রাতে আড়াইহাজার থানার নিকটে পুরিন্দা বিদ্যুৎ সরবরাহ সাবস্টেশনে আক্রমণ চালায়। এই ঘটনার দুই দিন পর সিদ্ধেশ্বরী-ঘোড়াশালের বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইনের ক্ষতিসাধন করে। গেরিলা দল মাশরেকী জুট মিলস লিমিটেডের বিদ্যুৎ সরবরাহ সাবস্টেশনটিও ধ্বংস করে দেয়। ফলে ঐ এলাকার বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় কলকারখানাগুলি সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়। আমাদের গেরিলারা রূপগঞ্জের নিকট যে গ্যাসলাইন ধ্বংস করে দিয়েছিল পাকসেনারা পশ্চিম পাকিস্তানী প্রকৌশলীদের দ্বারা তা মেরামত করে নেয়। এই সংবাদ আমার হেডকোয়ার্টারে যথাসময়ে পৌঁছে। এই গ্যাসলাইনকে পুনরায় ধ্বংস করার জন্য একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করি। পরিকল্পনা অনুযায়ী ঘোড়াশালের গেরিলাদেরকে গ্যাসলাইনটি মেঘনা নদীর মাঝে ক্ষতি করার জন্য নির্দেশ দেই। ঘোড়াশালের নিকট গ্যাসলাইনটি মেঘনা নদীর মাছ দিয়ে গেছে। নির্দেশ অনুযায়ী গেরিলারা লাইনটির পথ গোপনে অনুসন্ধান করে। ৯ই সেপ্টেম্বর রাতে নৌকার সাহায্যে নদীর মাঝামাঝি জায়গায় যায় এবং প্রায় ১৫/২০ ফুট পানির নীচে অবস্থিত গ্যাস পাইপে ডিমোলিশন দ্বারা 'ডিলে সুইচ' (বিলম্বে কার্যকরী সুইচ)-এর সাহায্যে পাইপটি উড়িয়ে দেয়। ফলে গ্যাস পাইপের ভিতর পানি ঢুকে যায়। এতে গ্যাস সরবরাহ অনেক দিনের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। আড়াইহাজার থানার গেরিলারা জানতে পারে যে, পাকসেনারা কামানদি চরে তাদের একটি ঘাঁটি স্থাপন করেছে এবং স্থানীয় লোকদের উপর অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে। তারা আরও জানতে পারে যে, পাকসেনারা নিকটস্থ গ্রাম থেকে মেয়েদের তাদের ক্যাম্পে ধরে নিয়ে অত্যাচার চালাচ্ছে। এই সংবাদ পেয়ে ২৯ জন গেরিলার একটি দল ১১ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় পাকসেনাদের ঘাঁটি আক্রমণ করে। ঘণ্টা যুদ্ধের পর পাঁচজন পাকসেনা এবং ৬ জন রাজাকার নিহত হয়। অবশিষ্ট পাকসেনারা ক্যাম্প ছেড়ে পালিয়ে যায়। গেরিলারা ক্যাম্প থেকে মেয়েদেরকে উদ্ধার করে তাদের স্ব স্ব বাড়িতে পৌঁছিয়ে দেয়।

পাকসেনারা সিরাজদীখান থানার আবদুস সালাম নামক আমাদের আকজন গেরিলাকে গ্রেফতার করে তালতলা ক্যাম্পে নিয়ে যায়। স্থানীয় প্রায় ৫০ জন গেরিলার একটি দল পরদিন রাত সাড়ে আটটায় এই ক্যাম্পটির উপর আক্রমণ চালায়। তারা প্রায় তিন ঘণ্টা যুদ্ধের পর একজন পাকিস্তানী সুবেদার-মেজরসহ কিছুসংখ্যক পাকসেনা, পাক পুলিশ ও রাজাকারকে হতাহত করে আবদুস সালামকে উদ্ধার করে আনে। এই ঘটনার এক দিন পর নওয়াবগঞ্জ থানার গেরিলারা একটি লঞ্চকে (এম এল পয়েন্টার) পাকসেনা বহন করে নওয়াবগঞ্জের দিকে অগ্রসর হতে দেখে। ২৪শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ছ'টার সময় লঞ্চটি যখন গালিমপুরের নিকট পৌঁছে তখন আমাদের গেরিলারা লঞ্চটির উপর আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণের ফলে প্রথমেই পাকসেনাদের কিছু লোক হতাহত হয়। পাকসেনারা লঞ্চটিকে পিছু হটিয়ে পাড়ে অবতরণের চেষ্টা করে। আমাদের গেরিলারা আবার তাদের উপর আক্রমণ চালায়। যুদ্ধ ২৫ তারিখ দুপুর পর্যন্ত চলে। শেষ পর্যন্ত আমাদের গেলিলারা পাকসেনাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পর্যুদস্ত করতে সক্ষম হয়। যুদ্ধে পিএসএস ৯১৩৩ ক্যাপ্টেন জাফর আলী খান, সুবেদার আবদুল্লা, ৪৪ জন পাকসেনা এবং একজন বাঙ্গালী পথপ্রদর্শক পুলিশ নিহত হয়। লঞ্চটিকে পরে ডুবিয়ে দেয়া হয়। আমাদের দু'জন গেরিলা আবদুর রহিম এবং মুহম্মদ আলী শহীদ হন। এই

খবর পেয়ে পাকসেনারা আরেকটি লঞ্চে করে বড় খাল দিয়ে নওয়াবগঞ্জের দিকে অগ্রসর হয়। আমাদের গেরিলাদের ৪০ জনের আরেকটি দল পাকসেনাদের লঞ্চটিকে ২৬ সেপ্টেম্বর সকাল ৭-৩০ টার সময় অতর্কিতে আক্রমণ করে। অতর্কিত আক্রমণের ফলে ৩ জন পাক সেনা নিহত এবং ৮ জন আহত হয়। পাকসেনারা লঞ্চটির দিক পরিবর্তন করে দ্রুত নাগালের বাইরে চলে যায়। ২৭ শে সেপ্টেম্বর দুপুর ১টায় পাকসেনাদের একটি শক্তিশালী দল নওয়াবগঞ্জের দিকে আবার অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করে। এই সংবাদ নওয়াবগঞ্জের গেরিলা হেডকোয়ার্টারে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ৫০ জনের একটি শক্তিশালী দল গালিমপুরের নিকট পাকসেনাদের জন্য একটি এ্যামবুশ পেতে অপেক্ষা করতে থাকে। পাকসেনারা গালিমপুরে এ্যামবুশের আওতায় পড়ার সঙ্গে সঙ্গে গেরিলারা তাদের উপর আক্রমন চালায়। আক্রমণে একজন ক্যাপ্টেনসহ ৩৫ জন পাকসেনা নিহত এবং অনেকে আহত হয়। অবশিষ্ট পাকসেনারা ছত্রভঙ্গ হয়ে তাদের কিছু আহত লোককে নিয়ে পালিয়ে যায়।আমাদের গেরিলারা একটি এলএমজি, ৩টি স্টেনগান, প্রচুর গুলি ও বেশকিছু রাইফেল দখল করে। এর দু'দিন পর পাকসেনারা আরো শক্তিশালী হয়ে বড় খাল এবং আড়িয়াল বিল দিয়ে আবার অগ্রসর হবার চেষ্টা করলে আমাদের গেরিলারা অতর্কিত আক্রমণ করে। গেরিলারা তাদের এই চেষ্টাকেও ব্যর্থ করে দেয়। প্রায় তিনদিন ধরে পাকসেনারা অগ্রসরের চেষ্টা চালিয়ে যায়। তিনদিনের যুদ্ধে ২০ জন পাকসেনা নিহত এবং ৩০ জন আহত হয়। অপর পক্ষে আমাদের একজন শহীদ এবং কিছুসংখ্যক গেরিলা আহত হয়। অক্টোবরের প্রথম তারিখ পর্যন্ত নওয়াবগঞ্জের সম্পূর্ণ এলাকা শত্রুমুক্ত হয় এবং মুক্তিবাহিনীর সম্পূর্ণ আয়ত্তে আসে। দোহার থানার পাকসেনারাও আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের চাপে দুর্বল হয়ে পড়ে। ২৭ শে সেপ্টেম্বর পাকসেনাদের একটি দল মাগুলা বাজার থেকে তাদের রসদ নিয়ে দোহার থানার ক্যাম্পে যাবার পথে আমাদের গেরিলাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। আক্রমণে ১৪ জন পাক সেনা নিহত এবং ৮ জন আহত হয়। পাকসেনাদের সমস্ত রসদ মুক্তিবাহিনীর দখলে আসে। এরপর দোহার থানার পাকসেনাদের ক্যাম্পের সৈনিকরা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে এবং ক্যাম্পের বাইরে আসা বন্ধ করে দেয়।

২৪ শে সেপ্টেম্বর লৌহজং থেকে নারায়ণগঞ্জগামী ১৮ হাজার মণ পাটবাহী একটি জাহাজ পদ্মা নদীতে ডুবিয়ে দেয়া হয়। অক্টোবর মাসে পাকিস্তানীরা আবার ঢাকাতে শান্তির পরিবেশ ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে এবং ঢাকা শহরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করে তোলে। পাক সামরিক জান্তা সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য বাণিজ্য এবং শিল্প ক্ষেত্রকে উৎসাহিত করে তোলার চেষ্টা করে। এ সময় আমরা ভবিষ্যতে ব্যাপক আক্রমণের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। ফলে ঢাকা শহরে আমাদের গেরিলাদের কার্যকলাপও কিছুটা শিথিল করে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু হানাদার বাহিনীর স্বাভাবিকীকরণের প্রচেষ্টার খবর পেয়ে আমরা আমাদের হেডকোয়ার্টার থেকে একটি গেরিলা দলকে একটি বিশেষ মিশনে প্রেরণ করি। আমাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী গেরিলাদল একটি গাড়ীর পেছনে ২৫ পাউন্ড এক্সপ্লোসিভ নিয়ে গাড়ীটিকে তদানীন্তন ইপিআইডিসি এবং হাবিব ব্যাংকের সামনে পার্ক করে রাখে।

সে সময় এই ব্যাঙ্কে যথেষ্ট পরিমাণ পাকিস্তানী ব্যবসায়ীর আনাগোনা ছিল। এছাড়াও এই ব্যাঙ্কটি পাকিস্তানীদের বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তানে অর্থ পাচারে সাহায্য করছিল। গেরিলারা দুপুর সাড়ে এগারটার দিকে গাড়িতে ভর্তি বিস্ফোরণের বিস্ফোরণ ঘটায়। ফলে এই গাড়ীর পার্শ্ববর্তী পার্ক করা ১০/২০ টি গাড়ি ধ্বংস হয় এবং হাবিব ব্যাঙ্কের বেশ ক্ষতি হয়। বিস্ফোরণে প্রায় ২৫ জন পাকিস্তানী ব্যবসায়ী আহত হয়। বিস্ফোরণের বিকট শব্দে এবং ধ্বংস দেখে মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকার সমস্ত জনতা ছুটে পালায় এবং সকল ব্যবসা কেন্দ্র বন্ধ হয়ে যায়। ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই গোটা এলাকা জনশূণ্য হয়ে পড়ে। পাকিস্তানী ব্যবসায়ী মহলের মধ্যেও একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। পাকিস্তান রেডিও'র ঢাকা কেন্দ্র থেকে এই বিস্ফোরণের ঘটনা স্বীকার করা হয়। হেডকোয়ার্টার থেকে দুটি ৮১ এম-এম মর্টরসহ একটি ডিটাচমেন্ট ঢাকাতে পাঠানো হয়। এই ডিটাচমেন্টকে ঢাকা বিমান বন্দর এবং ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় পাকসেনাদের ওপর এবং পাকিস্তানী বিমান বাহিনীর ঘাঁটির উপর রকেট নিক্ষেপ করার নির্দেশ দিয়ে পাঠানো হয়। আমাদের এই দলটি হেডকোয়ার্টার থেকে ঢাকার পূর্বে এসে

তাদের বেইস স্থাপন করে। এর পর একটি ছোট রেকি (অনুসন্ধানী) দল বিমান বন্দর ও ক্যাণ্টনমেণ্টের চতুর্দিকে ৩/৪ দিন অনুসন্ধান চালায়। এই সময় পাকসেনারা বিমান বন্দর এবং ক্যাণ্টনমেণ্টের নিরাপত্তার জন্য পার্শ্ববর্তী এলাকায় বাঙ্কার তৈরী করে এবং টহল দিয়ে আমাদেরকে দূরে রাখার চেষ্টা করে। যেহেতু মর্টারের রকেট চার হাজার গজ দূরত্বের বেশী নিক্ষেপ করা যায় না এবং মর্টার ফায়ার করার সময় ফ্লাশ দেখে এবং মর্টার পজিশন থেকে শব্দ শুনে পাকিস্তানী টহলদারী সৈনিকরা এর অবস্থান খুঁজে বের করতে পারে সেহেতু অনুসন্ধান চালাবার পর আমাদের দলটি বাড্ডার নিকট থেকে ৯ই অক্টোবর রাত ১টা ৪০মিনিটের সময় মর্টারের গোলা নিক্ষেপ শুর করে। ৬টি গোলা ঢাকা ক্যান্টনমেণ্টের একটি লাইনের মধ্যে পড়ে। এতে ১৪ জন পাকসেনা নিহত হয়। কয়েকটি গোলা বিমান বন্দরে নিকটে পড়ে কিন্তু কোন এয়ারক্রাফট-এর ক্ষতি সাধিত হয়নি। আরো কয়েকটি গোলা পাক টোব্যাকো কোম্পানীর ফ্যাক্টোরীতে পড়ে।এতে ফ্যাক্টরীর বেশ ক্ষতি হয়।কয়েকটি গোলা মহাখালী হাসপাতালের নিকটে রাস্তায় পড়ে। এই অতর্কিত মর্টার আক্রমণের ফলে ঢাকা ক্যাণ্টনমেণ্টে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। পরে আমাদের কাছে খবর পৌঁছে যে, পাকিস্তানীরা ভেবে ছিল মুক্তিবাহিনী ঢাকা ক্যাণ্টনমেণ্ট আক্রমণ করেছে। সঙ্গে সঙ্গ ঢাকা ক্যান্টনমেণ্টের সমস্ত পাকসেনারা চর্তুদিকে দ্রুত বেরিয়ে পড়ে- স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র এবং ট্যাংসহ গুলশান এবং ক্যান্টনমেণ্ট এলাকায় সমস্ত রাত পাগলের মত ছুটাছুটি করতে থাকে এবং সারারাত গোলাগুলি চালায়। আমাদের দলটি আরো কয়েকটি গোলা নিক্ষেপ করে পাকসেনাদেরকে আরো ব্যতিব্যস্ত করে সেখান থেকে সরে পড়ে।

১১ই অক্টোবর দুপুর ১২টায় আমাদের গেরিলারা তিতাস গ্যাস পাইপ লাইন আবার বিস্ফোরক দিয়ে উড়িয়ে দেয়। ফলে ঢাকার গ্যাস সরবরাহ পুনরায় বন্ধ হয়ে যায়।

পাকসেনাদের একটি শক্তিশালী দল পিলখানাতে অবস্থান করছিল। পিলখানার পাশের রাস্তা দিয়ে নিউ মার্কেটের দিকে পাকসেনাদের অনেক গাড়ি যাতায়াত করতো। আমাদের আজিমপুরের গেরিলা দল সেই রাস্তায় মাইন পুঁতে রাখে। ১৬ই অক্টোবর রাত সাড়ে ৯টায় পাকসেনাদের একটা জীপ এই রাস্তায় টহল দেবার সময় মাইনের আঘাতে সম্পূর্ণ ধ্বংস হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে ৪ পাকসেনা নিহত এবং দুজন গুরুতররুপে আহত হয়। এর একদিন পর দুজন পাক পুলিশ মিরপুর রোডে টহল দেবার সময় ধানমন্ডির নিকট আমাদের গেরিলাদের হাতে নিহত হয়।

ঢাকার শহরে মুক্তিবাহিনীর তৎপরতা এবং পাকসেনাদের নাজুক অবস্থা বিদেশী সংবাদ সংস্থাগুলি থেকেও ব্যাপক প্রচার করা হয়। এছাড়া এসব খবর ভয়েস অব আমেরিকা এবং বিবিসি থেকেও প্রচারিত হয়। ফলে হানাদার অধিকৃত এলাকার জনগনের মনেও মুক্তিসংগ্রামের সাফল্য সম্পর্কে নতুন আশার সৃষ্টি হয়।

৩০শে আগস্ট পাকসেনাদের একটি শক্তিশালী দল শালদা নদীর দক্ষিণ প্রান্তে সমবেত হয় এবং বিধ্বস্ত রেলওয়ে সেতুর উপর বাঙ্কার তৈরী করার প্রস্ত্ততি নেয়। আমাদের একটি পেট্রোল পার্টি তাদের উপর গুলি চালিয়ে বেশকিছু পাকসেনাকে হতাহত করে। পাকসেনারা পিছু হটে যায়। পরদিন সকাল আটটায় পাকসেনারা অগ্রসর হয়ে আবার বাঙ্কার তৈরী করার চেষ্টা করে। আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা তাদের ওপর পুনরায় আক্রমণ চালায়। আক্রমণে ৬ জন পাকসেনা নিহত এবং আরো অনেক হতাহত হয়। এরপর পাকসেনারা তাদের গোলন্দাজ বাহিনীর সহায়তায় পালিয়ে যেতে সমর্থ হয়। পাকসেনাদের ব্রাহ্মণপাড়ায় অবস্থিত কামানগুলি এরপর ৪র্থ বেঙ্গলের ‘এ’ কোম্পানীর অবস্থানের উপর ব্যাপকভাবে গোলাবর্ষণ করতে থাকে। এতে আমাদের একজন সৈনিক শহীদ এবং ২/৩জন আহত হয়। পাকসেনাদের ওপর চাপ সৃষ্টির জন্য কোনাবন থেকে ক্যাপ্টেন গাফফার ৪র্থ বেঙ্গলের ‘সি’ কোম্পানীকে চাঁদলাতে পাঠান। এই কোম্পানীটিও ৩০শে আগস্ট বিকাল ৪টায় পাকসেনাদের একটি দলের ওপর অতর্কিত আক্রমণ করে একজন ক্যাপ্টেনসহ ১৯জন পাকসেনা ও ২৪ জন রাজাকারকে নিহত করে। সংর্ঘষে অনেক পাকসেনা আহত হয়। পরে পাকসেনারা ছত্রভঙ্গ হয়ে ব্রাহ্মণপাড়ার দিকে পালিয়ে যায়। ফলে একটি হালকা মেশিনগান, ৩টি রাইফেলসহ অনেক গোলাবারুদ আমাদের সৈনিকরা

দখল করে। এর পর দিন আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা পাকসেনাদের একটি দলকে মন্দভাগ বাজারের পূর্ব পাশে শালদা নদীতে আক্রমণ করে। পাকসেনাদের এই দলটি নৌকাযোগে মন্দভাগ বাজারের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। আক্রমণে একটি নৌকা ডুবে যায় এবং ২০জন পাকসেনা নিহত ও বেশ কিছু আহত হয়। পাকসেনারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে যায়। পাকসেনারা মন্দভাগ, সেনেরহাট, চাঁদলা প্রভৃতি এলাকায় অবস্থিত আমাদের অবস্থানের ওপর তাদের চাপ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করতে থাকে। ৩০শে আগস্ট বিকাল ৪টার সময় পাকসেনারা চারটি নৌকা বোঝাই করে এসে ছোট চাঁদলার নিকট অগ্রসর হবার চেষ্টা করে।আমাদের সৈনিকরা তাদের উপর আক্রমণ চালিয়ে ১৫ জন পাকসেনাকে নিহত করে। এরপর সেনারা আমাদের অবস্থানের ওপর ব্রাহ্মণপাড়া এবং শাকুটিতে অবস্থিত মর্টার এবং কামানের সহায়তায় চড়াও হবার চেষ্টা করে। আমাদের সৈনিকরাও সাহসের সঙ্গে পাকসেনাদের এই আক্রমণ প্রতিহত করে। উল্লেখ্য যে, পাকসেনারা প্রায় তিন কোম্পানী সৈন্যশক্তি নিয়ে এই আক্রমণ পরিচালনা করে। সারা রাত ধরে আক্রমণ অব্যাহত থাকে। এই আক্রমণে একজন অফিসারসহ ৩০জন পাকসেনা নিহত এবং বেশ কিছু আহত হয়। পাকসেনারা পরে ছত্রভঙ্গ হয়ে পশ্চাদপসরণ করে। আমাদের দু'জন মুক্তিযোদ্ধা গুরুতর ভাবে এবং ৬ জন সামান্য আহত হয়। ৪ঠা সেপ্টেম্বর পাকসেনারা আমাদের চালনা ও শীতলা অবস্থানের ওপর দু'দিক থেকে আক্রমণ চালায়। সমস্ত দিন যুদ্ধের পর আমাদের সৈনিকরা পাকসেনাদের এই আক্রমণকে প্রতিহত করতে সমর্থ হয়। পাকসেনাদের পক্ষে অনেক হতাহত হয়-তবে সঠিক ক্ষতির পরিমান জানা সম্ভব হয়নি। পরাজয়ের গ্লানিতে পশ্চাদপসরণকারী পাকসেনারা মনের আক্রোশে ব্রাহ্মণপাড়া, ছোট চাঁদলা এবং পার্শ্ববতী গ্রামগুলো জ্বালিয়ে দেয় ও নিরীহ জনসাধারণকে হত্যা করে। দুই-তিন দিন বিরতির পর পাকসেনারা আবার আমাদের সেনেরহাট অবস্থানের দিকে অগ্রসর হবার চেষ্টা করে। সেনেরহাট অবস্থানটি দখল করে নেবার জন্য পাকসেনারা সেনেরহাট পশ্চিমে এবং শালদা নদী স্টেশনের পশ্চিমে বিপুল সংখ্যক সৈন্যের সমাবেশ ঘটায়। তারা দু'দিকে থেকে আক্রমণের জন্য প্রস্তুতি নেয়। পাকসেনাদের সমাবেশের কৌশল দেখে আমরা বুঝতে পারি যে, পাকসেনারা মন্দভাগের পশ্চিমে আশাবাড়ি পর্যন্ত আমাদের দখলকৃত সমস্ত এলাকা পুনরুদ্ধারের পরিকল্পনা নিয়েছে। এতে তাদের পক্ষে কসবা এবং মন্দভাগ পুনর্দখল করা সহজ হবে। পাকসেনাদের পরিকল্পনা বুঝতে পেরে আমরা সেনেরহাট অবস্থানকে আরো শক্তিশালী করে তুলি। ৮ই সেপ্টেম্বর সকালে পাকসেনারা তাদের নয়ঘরে অবস্থিত ১২০ এম এম মর্টার, ব্রাহ্মণপাড়ায় অবস্থিত কামান এবং শশীদলে অবস্থিত ৩ ইঞ্চি মর্টারের সাহায্যে আমাদের সেনেরহাট অবস্থানের ওপর প্রচন্ড গোলাবর্ষণ শুরু করে-সঙ্গে সঙ্গে পাকসেনারা সেনেরহাট অবস্থানের দিকে অগ্রসর হতে থাকে।পাকসেনাদের কামানের গোলায় আমাদের বেশকিছু লোক শহীদ ও আহত হয়। পাকসেনাদের রকেট লাঞ্চারের গোলায় আমাদের ৪টি বাঙ্কার ধ্বংস হয়ে যায়। পাকসেনারা আমাদের অবস্থানের দেড়শ গজ পর্যন্ত অগ্রসর হতে সক্ষম হয়।কিন্তু এতদসত্ত্বেও আমাদের সৈনিকরা এতটুকু মনোবল না হারিয়ে বরং দৃঢ়তার সঙ্গে পাকসেনাদের আক্রমণকে প্রতিহত করে। আমাদের সৈনিকদের গুলিতে অগ্রসরমান অনেক পাকসেনা হতাহত হয়। আমাদের মুজিব ব্যাটারী গোলন্দাজ বাহিনী পাকসেনাদের উপর গোলাবর্ষণ করে অনেক পাকসৈন্যকে হতাহত করে। পাকসেনারা সমস্ত দিন তাদের আক্রমন চালিয়ে আমাদের প্রতিরোধ ব্যূহ ভেদ করতে না পেরে এবং তাদের অনেক হতাহত হওয়াতে সন্ধ্যায় তাদের আক্রমণ বন্ধ করতে বাধ্য হয় এবং পিছু হটতে বাধ্য হয়। এর পরদিন পাকসেনারা আমাদের মন্দভাগ এবং মইনপুর অবস্থানের ওপরও আক্রমণ চালায়। সেই আক্রমনও একইভাবে প্রতিহত করা হয়। যাবার পথে পরাজয়ের আক্রোশে সকাল সাতটার সময় পাকসেনাদের প্রায় দুই কোম্পানী সৈন্য প্রবল কামানের গোলার সহায়তায় আমাদের মইনপুরের অবস্থানেরর ওপর আক্রমণ চালায়। প্রায় দু'ঘণ্টা যুদ্ধের পর পাকসেনাদের্প্রায় ৪০ জন সৈন্য হতাহত হয়। আমাদের সৈন্যরা অসীম সাহসিকতার সঙ্গে সেই আক্রমণকেও প্রতিহত করে। আমাদের পক্ষে আমাদের অবস্থানে অবস্থান করা অসম্ভব হয়ে ওঠে, ফলে বাধ্য হয়ে আমাদের সৈনিকরা সে অবস্থান পরিত্যাগ করে ৬০০ গজ পিছে বায়েকের নিকট জেলা বোর্ডের রাস্তায় নতুন অবস্থান গড়ে তোলে। পাকসেনারা এই অবস্থানের ওপরও আক্রমণ চালায়। তাদের সেই আক্রমণকে আমাদের সৈনিকরা দৃঢ়তার সঙ্গে

প্রতিহত করে। পাকসেনারা আর অগ্রসর হতে না পেরে পিছু হটে যেতে বাধ্য হয়। পাকসেনারা মনরা, বাগরা, নাগাইশ, ডুশিয়া, আরাদুয়শিরা, ধান্দুহল, সিদলাই প্রভৃতি প্রায় একুশটিচ গ্রাম জ্বালিয়ে দেয় এবং নিরীহ জনসাধারণকে হত্যা করে। ৯ই সেপ্টেম্বর রাতে ক্যাপ্টেন গাফফার একটি শক্তিশালী রেইডিং পার্টি ৩" মর্টার ও ৬৫ এমএম আর আরসহ পাকসেনাদের অবস্থানের দিকে পাঠিয়ে দেন। এই দলটি শালদা নদীর উত্তর তীর দিয়ে লক্ষ্মীপুরস্থ পাকসেনাদের অবস্থানের পেছনে অনুপ্রবেশ করে এবং দু'দিন রেকি করার পর ১১ই সেপ্টেম্বর বিকাল পাঁচটার সময় পাকসেনাদের অবস্থানের অতি নিকটে পৌঁছে গোলা নিক্ষেপ শুরু করে। এতে শত্রুদের দুটি বাঙ্কার রকেটের গোলায় ধ্বংস হয়। গোলার আঘাতে ১১ জন শত্রুসৈন্য নিহত এবং ৭ জন আহত হয়। পাকসেনারা পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলি জ্বালিয়ে দেয় এবং বিক্ষিপ্তভাবে গ্রামের মধ্যে কামানের গোলাবর্ষণ করে। এরপর আমাদের রেইডিং পার্টি ১৪ই সেপ্টেম্বর সকাল ৮টায় কায়েকপুরে পাকসেনাদের আরো দু'টি বাঙ্কার রকেটের সাহায্যে ধ্বংস করে। এতে ১৬ জন পাকসেনা নিহত এবং ৮ জন আহত হয়। ১৫ই সেপ্টেম্বর দুপুর ১২টার সময় আমাদের আরেকটি রেইডিং পার্টি লক্ষ্মীপুরের নিকট পাকসেনরাদের দুটি বাঙ্কার অতর্কিত আক্রমণ করে ধ্বংস করে দেয়। এতে ৩ জন পাকসেনা নিহত এবং ৮ন আহত হয়।১৯শে সেপ্টেম্বর সকাল ৬টায় লক্ষ্মীপুরস্থ পাকসেনাদের আরো দু'টি বাঙ্কার রকেটের গুলিতে উড়িয়ে দেওয়া হয়। এতে দু'জন পাকসেনা নিহত এবং একজন আহত হয়।

ফরিদপুরে আমাদের মুক্তিবাহিনীর গেরিলারা তাদের কর্মতৎপরতা অব্যাহত রাখে। ৩রা আগষ্ট বিকাল ৪টার সময় আমাদের গেরিলারা মাদারীপুরের ভাঙ্গা এবং মুহাফিজ সেতুগুলোতে পাহারারত শত্রুসেনাদের ওপর আক্রমণ চালায়। সে আক্রমণে তারা সেতুগুলো ধ্বংস করে দেয় ও ৭টি রাইফেল দখল করে। ১০ তারিখে মিঠাপুরের ডাকঘর এবং ইউসুফপুরের তহসীল অফিস জ্বালিয়ে দেয়। ১৪ তারিখ সকাল ৬টায় আমগ্রামের সমাদ্দার সেতু সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেয়। ঐ দিনই গেরিলাদের আরেকটি দল পাকসেনাদের একটি গাড়ী মাদারীপুর-টেকেরহাট রাস্তায় গাটমাকির নিকট এ্যামবুশ করে। গাড়ীটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এতে ৯ জন পাকসেনা আহত হয়।

২৭শে আগষ্ট আমাদের একটি টহলদার দল পরাশুরাম থানার নিকট পাকসেনাদের একটি টহলদারী দলকে এ্যামবুশ করে ৭ জন পাকসেনাকে নিহত করে। দুই ঘণ্টা সংঘর্ষের পর পাকসেনারা মর্টারের সাহায্যে আক্রমণ চালিয়ে আমাদের গেরিলাদের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে পালাতে সক্ষম হয়। আরেকটি দল ফেনী-বেলুনিয়া সড়কের ওপর হাসানপুর সেতুটি ধ্বংস করে দেয়। শালদা নদীর নিকটে আমাদের একটি টহলদার দল দু'জন পাকসেনাকে রাতে টহল দিতে দেখে এ্যামবুশ করে। এই এ্যামবুশে দু'জন পাকসেনাই নিহত হয়। নিহত পাকসেনাদের পকেট থেকে পাওয়া কাজগপত্রে তাদের নাম পাওয়া যায়। এদের একজনের নাম হাবিলদার আবদুল আজিজ এবং অপরজনের নাম ছিল হাবিলদার রহমান গুল। ২০শে সেপ্টেম্বর বিকেল ৪টায় পাকসেনাদের একটি দল আমাদের শালদা নদী অবস্থানের দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করে। ছোট পাহাড়ের উপর অবস্থিত আমাদের অবস্থানের দিকে অগ্রসর হওয়ার সময় আমাদের সৈনিকদের প্রচন্ড গোলাবর্ষণের ফলে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে যায়। ক্যাপ্টেন গাফফার একটি শক্তিশালী রেইডিং পার্টি নিয়ে ১৯শে সেপ্টেম্বর কায়েমপুরে পাকসেনাদের অবস্থানের পিছনে অনুপ্রবেশ করে। পরদিন ভোরে রেকি করার পর সকাল ১০টায় পাকসেনাদের পেছন দিকের অবস্থানের উপর অতর্কিত আক্রমণ চালায়। আক্রমণের ফলে পাকসেনারা হতভম্ব হয়ে পড়ে এবং আতঙ্কিত হয়ে ছুটাছুটি করতে থাকে। আমাদের রেইডিং পার্টির গুলিতে ৩২ জন পাকসেনা নিহত এবং ৭ জন আহত হয়। এরপর আমাদের দলটি আক্রমণ প্রত্যাহার করে শত্রু অবস্থান থেকে নিরাপদ দূরত্বে চলে আসে। পাকসেনাদের একটি দল কায়েমপুরে তাদের অবস্থানের দিকে নৌকাযোগে অগ্রসর হবার পথে আমাদের এ্যামবুশ পার্টি তাদের ওপরও অতর্কিত আক্রমণ চালায়। দুটি নৌকা আক্রমণের ফলে ধ্বংস হয়ে যায় এবং এতে ১৫ জন পাকসেনা নিহত হয়।

আমাদের সৈন্যরা পাকসেনাদের ওপর তাদের হামলা চালিয়ে যেতে থাকে। পাকসেনাদের চাপও আমাদের ওপর থেকে ধীরে ধীরে কমে যায়। পাকসেনারা তাদের বিপর্যস্ত অবস্থানগুলো বাঁচানোর জন্য ভারী তোপের সাহায্যে আমাদের মন্দভাগ কোনাবন এবং শালদা নদীর অবস্থানের ওপর প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ করে। এতে আমাদের ২ জন নন-কমিশণ্ড অফিসার ও ১ জন গোলন্দাজ বাহিনীর ও-পি শহীদ হয়। পাক সেনাদের একটি জঙ্গী বিমান ২৮শে সেপ্টেম্বর তাদের সেনাদের সাহায্যের জন্য দুপুর দুটো থেকে তিনটা পর্যন্ত আমাদের অবস্থানগুলোর ওপর ক্রমাগত আক্রমন চালায়। পাকসেনাদের অবস্থানগুলো আমাদের আক্রমণে অনেকটা দুর্বল হয়ে পড়েছে বলে আমরা বুঝতে পারি এবং তাদেরকে সম্পূর্ণভাবে এই এলাকা থেকে হটিয়ে দেয়ার জন্য ২৭ তারিখে একটি সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২৮ তারিখ সাড়ে ১০টার সময় ৪র্থ বেঙ্গলের একটা শক্তিশালী দল উত্তর দিক থেকে কায়েমপুরের শত্রুঅবস্থানের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। ৪ ঘন্টা স্থায়ী যুদ্ধের পর পাকসেনাদের ১৫ জন নিহত এবং ৩০ জন আহত হয়। আমাদের কিছুসংখ্যক যোদ্ধাও শহীদ এবং আহত হয়। আমাদের সৈন্যদের প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে টিকতে না পেরে পাকসেনারা তাদের কায়েমপুর ঘাঁটি ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। আমাদের সৈন্যরা তাদের পরিত্যক্ত অবস্থান থেকে মেশিনগান, মর্টার ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র এবং প্রচুর গোলাবারুদ দখল করে নেয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, সেপ্টেম্বর মাসের ৯ তারিখে আমাদের সৈন্যরা এইসব অবস্থানগুলো থেকে শত্রুর প্রবল চাপের মুখে পর্যাপ্ত পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্রের অভাবে পিছু হটে আসতে বাধ্য হয়। ফলে শত্রুরা এইসব জায়গা দখল করে নেয়। এর এক সপ্তাহ পরেই আমরা পুনরায় পাল্টা আক্রমণ চালাই। এই পাল্টা আক্রমণের ফলে প্রায় ২০১ জন পাকসেনা নিহত এবং ৮৩ জন আহত হয়, ৭০টি বাঙ্কার ধ্বংস করা হয় এবং অসংখ্য অস্ত্রশস্ত্র আমাদের দখলে আসে। আমাদের ক্ষয়ক্ষতি সে তুলনায় ছিল অতি অল্প-১০ জন শহীদ এবং ৬ জন আহত হয়। আমাদের সৈনিকরা পাকসেনাদের দখলকৃত কায়েমপুরা, শ্রীপুর, মইনপুর, কামালপুর, লক্ষ্মীপুর প্রভৃতি জায়গা পুনরুদ্ধার করে। এরপর সেপ্টেম্বর মাসের শেষ পর্যন্ত দাউসসহ মন্দভাগের পশ্চিমের বিস্তীর্ণ এলাকা সম্পূর্ণরূপে শত্রুমুক্ত করা হয়। এর ফলে পাকসেনাদের মন্দভাগ রেলওয়ে স্টেশন এবং তার পশ্চিমে আশাবাড়ি পর্যন্ত আমাদের দখলে থাকা এলাকা পুনরুদ্ধারের সমস্ত আশা ও পরিকল্পনা সম্পূণরূপে ব্যর্থ হয়ে পড়ে এবং তারা হতাশ হয়ে পড়ে।

কসবার পশ্চিমে টি. আলীর বাড়ির নিকট অবস্থিত পাকসেনাদের অবস্থানগুলোর ওপর আমাদের সৈনিকরা ক্রমাগত চাপ বাড়িয়ে যাচ্ছিলো। ২৮শে আগস্ট ক্যাপ্টেন আইনউদ্দিন ৪র্থ বেঙ্গলের ‘ডি’ কোম্পানী থেকে একটা প্লাটুন পাক অবস্থানের পিছনে পাঠিয়ে দেয়। আমাদের কাছে খবর ছিল পাকসেনারা তাদের অগ্রবর্তী অবস্থানগুলোতে নৌকার সাহায্যে সরবরাহ কাজ চালাচ্ছে। এই প্লাটুনটিকে পাকসেনাদের সরবরাহকারী নৌকাগুলো এ্যামবুশ করার দায়িত্ব দেয়া হয়। প্লাটুনটি ২৯ তারিখ সকালে পাকসেনাদের পেছনে জলপথের ওপরে এ্যামবুশ লাগিয়ে বসে থাকে। বেলা ২-৪০ মিঃ পাকসেনাদের দুটি নৌকা সেদিকে অগ্রসর হয়। এ্যামবুশের আওতায় আসার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সৈনিকরা তাদের ওপর আক্রমণ চালায়। প্রচণ্ড গোলাগুলির পর তাদের দু’টি নৌকাই ডুবিয়ে দেয়া হয় এবং সেই সঙ্গে ৩০ জন পাকসেনাই নিহত হয়। আমাদের একজন সৈনিক শহীদ হয়। ৪র্থ বেঙ্গলের ‘ডি’ কোম্পানীর আরও দুটি প্লাটুন সেপ্টেম্বর মাসের ৫ তারিখ থেকে ১০ তারিখ পর্যন্ত লাটুমুড়া, তাজিশ্বর, ফতেহপুর, চারনল বগাবাড়ি প্রভৃতি স্থানে পাকসেনাদের অতর্কিত আক্রমণ করে ৩৬ জন খানসেনা ও ১৭ রাজাকারকে নিহত ও আহত করে। পাকসেনারা এই এলাকায় আমাদের সৈনিকদের আক্রমণাত্মক কার্যকলাপে অতিষ্ঠ হয়ে একটি শক্তিশালী দল তাজিশ্বর ও বগাবাড়ির দিকে ১১ই সেপ্টেম্বর অগ্রসর হয়। পাকসেনাদের এই দলটির অগ্রসরের খবর আমাদের কাছে আগেই পৌঁছে যায়। ‘ডি’ কোম্পানীর দুটি প্লাটুন বাগাবাড়ির নিকট পাকসেনাদের পথে এ্যামবুশ পেতে বসে থাকে। ১১ তারিখ সকাল ৬টার সময় অগ্রগামী পাকসেনা দলটি আমাদের এ্যামবুশের আওতায় পড়ে যায়। আমাদের সৈনিকরা তাদের অতর্কিত আক্রমণ করে। প্রবল আক্রমণের মুখে পাকসেনারা টিকতে না পেরে আবার পশ্চাদপসরণ করে। এই যুদ্ধের ফলে ১৫ জন পাকসেনা নিহত এবং ২ জন আহত হয়। পাকসেনাদের এই এলাকায় বিপর্যস্ত অবস্থায় তাদের সাহায্যের জন্য ১৩ তারিখে পাকসেনাদের পাঁচটি জঙ্গী বিমান বিকেল পাঁচটার সময় আমাদের

অবস্থানগুলোর ওপর এক ঘণ্টাব্যাপী প্রচন্ড বোমাবর্ষণ করে। পাকসেনাদের বিমান হামলা আমাদের সৈনিকদের মনোবল ভাঙ্গতে পারেনি। তারা তাদের অবস্থান শত্রুর চাপের মুখেও অটল থাকে। পাকসেনাদের সংঘর্ষ উপরোল্লিখিত এলাকায় এর পরেও অব্যাহত থাকে।

পাকসেনারা এই সেক্টরে আরও সৈন্য সমাবেশ করতে থাকে। তাদের অবস্থানগুলোর দিকে পাকসেনাদের অগ্রসর হওয়ার পথে বাধা দেওয়ার জন্য ৪র্থ বেঙ্গলের 'ডি' কোম্পানী ১৬ই সেপ্টম্বর শত্রু অবস্থানের পেছন ভাগে মেহারী গ্রামে একটি এ্যামবুশ পেতে বসে থাকে। ১৭ তারিখ সকাল ৭টায় পাকসেনাদের একটি শক্তিশালী দল পশ্চিম দিক থেকে অগ্রসর হয়ে আমাদের আক্রমণের জন্য মেহারীতে আমাদের এ্যামবুশ-এর নিকট সম্মিলিত হয়। পাকসেনারা সমবেত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এ্যামবুশ পার্টি তাদের ওপর অতর্কিত আক্রমণ করে। নিজেদের অবস্থানের এত কাছে তারা আক্রান্ত হবে তা তারা ভাবতেও পারেনি। ফলে এই আকস্মিক আক্রমণে তারা দিকবিদিক হারিয়ে ফেলে এবং ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে যায়।পাক গোলন্দাজ বাহিনী কামানের গোলাতে তাদেরকে পালাতে সহায়তা করে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তাদের অনেক সৈন্য হতাহত হয়। এই অ্যামবুশে পাক সেনাদের ২১ জন নিহত এবং ৪৩ জন আহত হয়। আমাদের সৈনিকরা নিরাপদে পিছু হটে আসতে সক্ষম হয়। ঐ দিন রাত্রে আমাদের এই দলটি সায়েদাবাদের নিকট পাকসেনাদের একটা ঘাটিঁতে অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে দুটো জীপ ও ১ টি ৩ টন গাড়ী ধ্বংস করে দেয়। এর পরদিন আমাদের রেইডিং পার্টি চারগাছা বাজারের নিকট পাকসেনাদের একটা টহলদার দলকে এ্যামবুশ করে ২০ জন পাকসেনাকে হতাহত করে। পাকসেনারা এই সংবাদ পেয়ে তাদের টহলদার দলের সাহায্যার্থে একটি শক্তিশালী দল তিন নৌকা বোঝাই করে চারগাছের দিকে অগ্রসর হয়। কিন্তু পৌঁছার আগেই আমাদের সৈনিকরা তাদেরকে শিমরাইলের নিকটে এ্যামবুশ করে দুটি নৌকা ডুবিয়ে দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে দু' নৌকা ভর্তি পাকসেনাদের সবাই নিহত হয়। এই সংঘর্ষে আমাদের ১ জন সৈনিক শহীদ হন। আমাদের সৈনিকদের জন্য এই এলাকার পাকসেনাদের এহেন বিপর্যয়ের ফলে তারা পুনরায় আরো ব্যাপক ভাবে এই এলাকায় সৈন্য সমাবেশ ঘটায় এবং চাপ বৃদ্ধি করতে থাকে। এতে আমরা আরেক অসুবিধার সম্মুখীন হই। ঢাকাতে এবং ফরিদপুরে যেসব গেরিলাদের পাঠানো হতো তারা এই এলাকার ভিতর দিয়ে যাতায়াত করতো। পাকসেনাদের তৎপরতার জন্য সমস্ত অনুপ্রবেশ পথগুলো প্রায় বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হয়। ২২শে সেপ্টম্বর আমাদের ৬০ জন গেরিলার একটি দল চারটি নৌকায় অনুপ্রবেশের পথে পাকসেনাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। ফলে দু' টি নৌকা ডুবে যায়। চারজন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হয় এবং একজন আহত হয়। তিনটি স্টেনগান, চারটি রাইফেল এবং কিছু টাকা ও ১০০০ গুলি পানিতে পড়ে হারিয়ে যায়। গেরিলারা আহত ও শহীদদের নিয়ে আমাদের অবস্থানে ফিরে আসে। এই রাস্তা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আমার পক্ষে মুক্তিযোদ্ধদের বিভিন্ন জায়গায় পাঠানো বিপজ্জনক হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় আমি মেজর আইনুদ্দিনকে যে কোন উপায়ে এই এলাকাকে পুনঃমুক্ত করার জন্য নির্দেশ দেই। তাকে আরেকটি অতিরিক্ত দল দিয়ে তার শক্তি বৃদ্ধি করে কসবা থেকে নবীনগর পর্যন্ত আমাদের তৎপরতা বাড়িয়ে নেয়ার জন্য নির্দেশ দিই। তাকে আরেকটি অতিরিক্ত দল দিয়ে তার শক্তি বৃদ্ধি করে কসবা থেকে নবীনগর পর্যন্ত আমাদের তঃপরতা বাড়িয়ে নেয়ার জন্য নির্দেশ দিই। পাকসেনাদের বিভিন্ন ঘাঁটির উপর বার বার আক্রমণ করে তাদেরকে এই এলাকা থেকে বিতারিত করার জন্য সকল ব্যবস্থা নেয়া হয়। শক্তি বৃদ্ধি পাওয়াতে মেজর আইনুদ্দীন তার তৎপরতা বাড়িয়ে দেয়। ১০/১২টির মক্তিশালী রেইডিং পার্টি কসবা, সাইদাবাদ, চরগাছা প্রভৃত এলাকাতে পাঠিয়ে দেয়। এই রেইডিং পার্টিগুলো বিভিন্ন স্থানে পাকসেনাদের উপ অতর্কিতে আক্রমণ চালিয়ে ২৫ জন পাকসেনা নিহত এবং ৩০ জনকে আহত করে ও ১টি গাড়ী ধ্বংস করে। আমাদের পুনঃ পুনঃ আক্রমণের ফলে পাকসেনারা ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে। আস্তে আস্তে সমস্ত এলাকাতে আমাদের সৈন্যরা পাকসেনাদের মনে ত্রাসের সৃষ্টি করে। ২৪শ সেপ্টেম্বর সকাল ৭-৩০টার সময় পাকসেনাদের একটি শক্তিশালী দল ১৭টি নৌকায় আমতাদের একটা রেইডিং পার্টিকে আক্রমণ করার জন্য নবীনগরের দিকে অগ্রসর হয়। পাকসেনাদের নৌকাগুলো যখন বিদাকোর্ট গ্রামের নিকট পৌছায় তখন আমাদের সৈনিকরা তাদেরকে অতর্কিতে আক্রমণ করে। এই আক্রমণে পাঁচটি নৌকা ডুবে যায় এবং অন্তত ২৫ জন পাকসেনা নিহত এবং পঁয়ত্রিশজন আহত হয়। মুক্তিযোদ্ধাদের এই সকল আক্রমণে সে এলাকার সমস্ত জনসাধারণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে এবং বিপুল আনন্দে

মুক্তিযোদ্ধাদেরকে অভিনন্দিত করে। এর কয়েকদিন পর ৩রা অক্টোবর পাকসেনাদের একটি লঞ্চ, গোলাবারুদ ও রসদ নিয়ে সাইদাবাদ যাবার পথে আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের দ্বারা মলূগ্রামে আক্রান্ত হয়। আক্রমণের ফলে লঞ্চটির গোলাবারুদ আগুন লেগে ডুবে যায়। সেই সঙ্গে ১০ জন পাকসেনা নিহত ও আহত হয়। আমাদের চারজন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হয় এবং দু'জন আহত হয়। এই খবর পেয়ে পাকসেনাদের একটি শক্তিশালী দল আরেকটি লঞ্চযোগে আমাদের অবস্থানের দিকে অগ্রসর হয়। অগ্রসর হওয়ার পথে আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা তাদেরকে পরগাছার নিকট আক্রমণ করে। প্রায় ২-৩ ঘন্ট যুদ্ধের পর অনেক পাকসেনা লঞ্চ থেকে ঝাঁপিয়ে পালাবার চেষ্টা করে এবং ডুবে যায়। পাকসেনাদের ৭০/৮০ জন নিহত ও আরো অনেক আহত হয়। লঞ্চটিরও বেশ ক্ষতি হয় এবং বহু কষ্টে বাকী সৈন্যদের নিয়ে লঞ্চটি সেখান থেকে পালিয়ে যেতে সমর্থ হয়। ঐদিনই বিকেল ৫টার সময় পাকসেনাদের ২০টি নৌকা ও ৩টি স্পীডবোট আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের দ্বারা কসবার নিকট আক্রান্ত হয়। ফলে ৩য় পাঞ্জাবী রেজিমেন্টের কমাণ্ডিং অফিসার লেঃ কর্ণেল জামান ও একজন ক্যাপ্টেন সহ ১২ জন পাকসেনা নিহত হয় এবং তিনটি স্পীড বোট ও কয়েকটি নৌকা ডুবে যায়।

সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে থেকে অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহ এই এলাকায় চোট এ্যামবুশ এবং ছোট ছোট আক্রমণের ফলে পাকসেনারা ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে। ৩রা ও ৪ঠা অক্টোবরে চারগাছা, মলুগ্রাম, কসবা প্রভৃতি জায়গায় পাকসেনারদের অন্তত ২৫০ থেকে ৩০০ সৈনিক নিহত হয়। একটি লঞ্চ, তিনটি স্পীডবোট, ১০টি নৌকা ডুবে যায় এবং অন্য আরেকটি লঞ্চ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রায় লক্ষাধিক পরিমাণের গোলাবারুদ পানিতে ডুবে যায় কিংবা আমাদের দখলে আসে। একজন লেঃ কর্ণেলসহ বেশ ক'জন অফিসার নিহত হয়। এর ফলে এই এলাকায় পাকসেনাদের তৎপরতা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায় এবং তারা অনেক পিছু হটে যেতে বাধ্য হয়।

কুমিল্লার দক্ষিণে এবং নোয়াখালী এলাকাতেও আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা তাদের তৎপরতা আরো জোরদার করে তোলে। ৩০শে আগষ্ট সকাল ১০টায় লাকসাম থেকে পাকসেনাদের একটি শক্তিশালী দল চৌদ্দগামের দিকে অগ্রসর হয়। এই দলটি আমাদের অবস্থানের ২০০ গজের মধ্যে পৌঁছালে আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা তাদের ওপর আক্রমণ চালায়। উভয় পক্ষের মধ্যে সমস্ত দিন ধরে গোলাগুলি চলতে থাকে। পাকসেনারা আক্রোশে রাস্তার চতুর্দিকের সমস্ত গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়। প্রচন্ড আক্রমণ সত্ত্বেও আমাদের সৈনিকরা নিজেদের অবস্থানে অটল থাকে। সমস্ত দিনের যুদ্ধে তাদের প্রায় ২০ জন সৈন্য নিহত এবং অনেক আহত হয়। তারা অগ্রসর হতে সক্ষম না হয়ে পিছু হটে যেতে বাধ্য হয়। পরদিন ল্যান্স নায়েক লোকমান আলী ও ল্যান্স নায়েক আহসানউল্লাহর নেতৃত্বে একটি ডিমোলিশন পার্টিকে চৌদ্দগ্রাম-বাংগোড়া-লাকসাম রাস্তা দিয়ে শত্রুসৈন্যদের চলাচলে বিঘ্ন ঘটাবার জন্য রাস্তায় মাঝে মাঝে ডিমোলিশন দিয়ে ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য পাঠানো হয়। দলটি নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছানোর পর তাদের ডিমোলিশন কাজ শুরু হয়। কিন্তু স্থানীয় শান্তি কমিটি ও তাদের লোকেরা পাকসেনা কর্তৃক প্রতিশোধের ভয়ে রাস্তায় ডিমোলিশন লাগাতে বাধা দেয়। ল্যন্স নায়েক স্থানীয় লোকদেরকে দেশের বৃহত্তর স্বার্থের কথা বুঝিয়ে বলেন। বোঝানোর পর শান্তি কমিটির লোকেরা তাদের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করে। তারা নিজেরাই রাস্তা খুঁড়ে তিন জায়গাতে ৫০ পাউণ্ডেং জিলেটিন এক্সপ্লোসিভ-এর ব্যাগ লাগায় এবং ৮০ ফুট রাস্তা উড়িয়ে দেয়। এতে পার্শ্ববর্তী রাস্তার দু'পাশের পানি রাস্তার খাদে প্রবেশ করে। ফলে চৌদ্দগ্রাম-লাকসাম যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ঐদিন রাতে আমাদের আরেকটি টহলদার দল কুমিল্লার দক্ষিণ-পূর্বে আর একটি দল লাঙ্গলকোট ও লাকসামের মাঝামাঝি রেললাইনের উপর মাইন পুঁতে একটি ইঞ্জিনসহ তিনটি রেলওয়ে বগী ধ্বংস করে দেয়। কাজলপুরের নিকট আরেকটি মালবাহী ট্রেন আমাদের পোঁতা মাইনের আঘাতে লাইনচ্যুত হয়। ফেনী ও লাকসামের মাঝে নাওতি স্টেশনের নিকট ডিমোলিশন লাগিয়ে রেললাইনের ১৪ ফুট রাস্তা ধ্বংস করে দেয়া হয়। মুক্তিযোদ্ধারা কুমিল্লা-ফেনী রেললাইনের পাশে টেলিফোনের তার কয়েক জায়গায় কেটে দেয়। ৩রা সেপ্টেম্বর আমাদের আর একটি ডিমোলিশন পার্টি লালমাই ও জাঙ্গালিয়া স্টেশনের মাঝে রেলওয়ে রাস্তার উপর ডিমোলিশন লাগিয়ে রেললাইনের খানিকটা উড়িয়ে দেয় এবং জমুয়া ও বেতুরার রেভিনিউ অফিস পুড়িয়ে দেয়।

সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে বেলুনিয়াতে পাকসেনারা তাদের তৎতপরতা আরো বাড়িয়ে তোলে। ৬ই সেপ্টেম্বর পাক সামরিক জান্তা নয়ানপুরের নিকট বিপুল পরিমাণ সৈন্য সমাবেশ করতে থাকে। ঐ দিন রাত প্রায় ৩টার সময় পাকসেনাদের দুটি প্লাটুন সেলোনিয়া নদী অতিক্রম করে। আমাদের অবস্থানের দিকে অগ্রসর হবার চেষ্টা করে। পাকসেনাদের দলটি নৌকাযোগে যখন নদী পার হওয়ার চেষ্টা করে তখন আমাদের অগ্রবর্তী দল তাদের ওপর আক্রমণ চালায়। আক্রমণের ফলে ১৫ জন পাকসেনা নিহত এবং বেশ কিছুসংখ্যক আহ্‌ত হয়।অবশিষ্ট সৈন্যরা মর্টারের গোলার সহায়তায় পশ্চাদপসরণ করে। পরদিন বিকেল ৪টায় পাকসেনাদের আরেকটি শক্তিশালী দল আরো পশ্চিমে মহুরীনদী অতিক্রম করার চেষ্টা করে। এখানেও আমাদের অগ্রবর্তী অবস্থান থেকে তাদের ওপর আক্রমণ চালানো হয়। গোলাগুলিতে পাকসেনাদের একজন অফিসারসহ ১৫ জন নিহত এবং প্রায় ২০ জন আহ্‌ত হয়। পাকসেনারা তাদের আক্রমণ অব্যাহত রাখে এবং আমাদের অবস্থানগুলোর ওপর প্রচণ্ডভাবে কামানের গোলাবর্ষণ করতে থাকে। আমাদের সৈনিকরা টিকতে না পেরে অগ্রবর্তী অবস্থান পরিত্যাগ করে স্থায়ী অবস্থানে ফিরে আসে। পাকবাহিনী তাদের আক্রমণের চাপ অব্যাহত রাখে। সন্ধ্যা ছটা পর্যন্ত এই আক্রমণ চলতে থাকে। আমাদের বীর সৈনিকরা তাদের অবস্থান থেকে গোলন্দাজ বাহিনীর সহায়তায় পাকসেনাদের আক্রমণকে দেড় ঘন্টার যুদ্ধে প্রতিহত করতে সক্ষম হয়। পাকসেনাদের অনেক হতাহত হয় ও পরে আমাদের পাল্টা আক্রমণের মুখে টিকতে না পেরে পিছু হটে ছাত্রভঙ্গ হয়ে যায়। এরপর পাকসেনারা পরশুরামের নিকট সৈন্য সমাবেশ করতে থাকে। প্রায় এক ব্যাটালিয়ন সৈন্য পরশুরামে মোতায়েন করে। ৯ই সেপ্টেম্বর আমাদের খবর সংগ্রহকারী লোকেরা জানতে পারে যে পাকসেনারা বেশ কয়েকটি ১০৫ এর এমএম কামানসহ সালিয়ার নিকট অবস্থান নিচ্ছে। পাকসেনাদের তৎপরতা দেখে আমরা বুঝতে পারি যে মুহুরী নদীর পূর্ব পাড়ে তাদের অবস্থান পাকা করে নদী পার হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এছাড়া বিশ্বস্ত সূত্রে আমরা আরো জানতে পারি, যে কোন উপায়ে বেলুনিয়া এলাকা নিজেদের দখলে আনার জন্য তারা বদ্ধপরিকর। ১০ই সেপ্টেম্বর সকাল ৯টা থেকে পাকসেনারা মহুরী নদী পার হয়ে প্রচণ্ড কামানের গোলার সহায়তায় আমাদের অবস্থানের ওপর আক্রমণ চালায়। সমস্ত দিন যুদ্ধের পর পাকসেনাদের এই আক্রমণকে আমাদের যোদ্ধারা প্রতিহত করে। বিপুল ক্ষয়ক্ষতির পর আমাদের সৈনিকরা পাকসেনাদের আবার পশ্চিম তীরে পশ্চাদপসরণে বাধ্য করে। আমাদের সেনারা যখন পাকসেনাদের ওপর সম্মুখসমরে প্রতি আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছিল সে সময়ে গেরিলাদের বেশ কয়েকটি দল পাকবাহিনীর পিছনে আঘাত হেনে তাদেরকে বিপর্যস্ত করে তোলে।

মতিগঞ্জে গেরিলারা পাকসেনাদের একটি ক্যাম্পে অতর্কিতে আক্রমণ করে একজন অফিসারসহ ১১ জন পাকসেনাকে নিহত এবং ২০ জনকে আহ্‌ত করে। পাকসেনাদের ক্যাম্প থেকে প্রচুর পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র দুটি মোটরসাইকেল, তিনটি রেডিও এবং তিনটি বাক্স ঔষধ দখল করে নেয়। আমাদের একজন মুক্তিযোদ্ধা এই সংঘর্ষে শহীদ হয়। আরেকটি দল ১০ই সেপ্টেম্বর রাত ১০টায় নয়াপাড়ার শত্রুঘাঁটি আক্রমণ করে তাদেরকে সেখান থেকে বিতাড়িত করে। এখানেও আমাদের গেরিলার বেশকিছু অস্ত্রশস্ত্র দখল করে নেয়।অপর আরেকটি গেরিলা দল ফেনীর নিকট ফতেপুর রেলসেতু ডিমোলিশন লাগিয়ে উড়িয়ে দেয়। ফলে পঞ্চাশ ফুটের একটি খাদের সৃষ্টি হয় এবং এর ফলে লাকসাম-ফেনীর মধ্যে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এছাড়া ফেনী শহরে ও আমাদের গেরিলারা গ্রেনেড নিক্ষেপ করে পাকসেনাদের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করে। গেরিলারা ফেনী থেকে ফুলগাজী পর্যন্ত পাকসেনাদের টেলিফোন লাইন কেটে তাদের টেলিফোন যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করে দেয়। পাকসেনারা তাদের অগ্রবর্তী অবস্থানগুলোতে ফেনী থেকে ট্রলির সাহায্যে রসদ সরবরাহ করতো। তাদের এই সরবরাহ বন্ধ করার জন্য চিতলিয়ার নিকট ঘানিমোড় রেলসেতুটি উড়িয়ে দেয়ার জন্য আমাদের পাইওনীয়ার প্লাটুন পাঠানো হয়। এই প্লাটুনটি বিপদের ঝুঁকি নিয়ে রাতে পাকসেনাদের অবস্থানের পিছনে অনুপ্রবেশ করে। পরদিন সকালে তারা সেতুটি সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান চালিয়ে জানতে পারে পাকসেনারা সেতুটিকে কড়া প্রহরার ব্যবস্থা করেছে। অতিকষ্টে তারা মহুরী নদী সাঁতরিয়ে রাতের অন্ধকারে সেতুটির নীচে ডিমোলিশন লাগিয়ে এই গুরুত্বপূর্ণ সেতুটি উড়িয়ে দেয়। এর ফলে ফেনী এবং বেলুনিয়াতে পাকসেনাদের ট্রলির সাহায্যে সরবরাহ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায়।

শত্রুদের উপর আমাদের আক্রমণের চাপ অব্যাহত রাখা হচ্ছিল। ১১ই সেপ্টেম্বর আমাদের একটি শক্তিশালী দল কামানের সহায়তায় সন্ধ্যা সাতটায় পরশুরামের নিকট পাকঘাঁটির উপর অতর্কিত আক্রমণ করে সাতজন পাকসেনাকে নিহত এবং পনেরজনকে আহ্‌ত করে। এ পরদিন আমাদের দুটি শক্তিশালী দল সালদার এবং জগন্নাথ দীঘির শত্রুঘাঁটির উপর অতর্কিতে আক্রমণ চালিয়ে চারজন পাকসেনাকে নিহত এবং অনেককে আহ্‌ত করে। আমাদের এই পুনঃ পুনঃ আঘাতের ফলে পাকসেনারা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে এবং ফেনীর দক্ষিণে তাদের কামানের অবস্থান গড়ে তোলে। সেখান থেকে আমাদের অবস্থানের উপর প্রচণ্ড কামানের আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণের ফলে আমাদের অবস্থান বেশ কিছুটা বিপর্যয়ের মুখে পড়ে যায়। পাকসেনারা তাদের কামানের আক্রমণ অব্যাহত রাখে। তাদের এই কামানের ঘাঁটিগুলোকে ধ্বংস করে দেবার জন্য ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখের সকালে আমাদের একটি কোম্পানীকে তিনটি মর্টারসহ পাকসেনাদের অবস্থানের পেছনে পাঠানো হয়। গোপন পথে অনুপ্রবেশ করে এই দলটি ফেনী বিমান বন্দরের পশ্চিমে বিকেলে পৌঁছে এবং পাকসেনাদের ব্রিঞ্চিতে অবস্থিত কামানঘাঁটি সম্বন্ধে বিস্তারিত খবর সংগহ করে রাত ১-৩০টায় পাক অবস্থানের উপর মর্টারের সাহায্যে অতর্কিতে আক্রমণ চালায়। পাকসেনারা এই ধরনের আক্রমণের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না। আক্রমণের চাপে উপায়ান্তর না দেখে তারা ফেনীতে অবস্থিত তাদের অন্য গোলন্দাজ বাহিনীর সাহায্যের আহবান জানায়। ফেনী থেকে পাকসেনাদের কামানগুলি আমাদের অবস্থানের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। আমাদের দুর্ধর্ষ গোলন্দাজ বাহিনী পাকসেনাদের ফেনী অবস্থানের ওপর পাল্টা আক্রমণ চালায়। দু ঘন্টা যুদ্ধের পর আমাদের রেইডিং পার্টি পাকসেনাদের দশজনকে নিহত, ১৬ জনকে আহ্‌ত এবং তাদের আরো বহু ক্ষতিসাধন করে নিরাপদে নিজেদের অবস্থানে ফিরে আসে। আমাদের কামানের আক্রমণ পাকসেনাদের ঘাঁটি যতেষ্ট ক্ষতিসাধন করে এবং তারা তাদের গোলাবর্ষণ বন্ধ করতে বাধ্য হয়। পরে আমরা জানতে পারি যে, আমাদের এই আক্রমণের ফলে পাকসেনাদের গোলন্দাজ ঘাঁটিতে ১১ জন পাকসেনা নিহত এবং ২৩ জন আহ্‌ত হয়। ব্রিঞ্চিতে তিনটি জীপ ধ্বংস হয়ে যায়। একটি কামানেরও মারাত্মক ক্ষতি হয়। ফেনীতে পাকসেনাদের মনোবল অনেকটা ভেঙ্গে পড়ে। বিশেষ করে পাকসেনাদের সহকারী শান্তি কমিটির সদস্য দালালরা ভয়ে ফেনী শহর পরিত্যাগ করে অন্যত্র চলে যায়। অপরদিকে এই আক্রমনের ফলে আমাদের মুক্তিবাহিনী ও স্বাধীনতাপ্রিয় জনগণের মনোবল অরো বৃদ্ধি পায়। এর পরদিন আমাদের একটি কোম্পানী সালদার শত্রুঘাঁটি রেইডিং করার জন্য পাঠানো হয়। সমস্তদিন রেকি করার পর রাত ৮-৩০-মিনিটে আমাদের কোম্পানীটি গোলন্দাজ বাহিনী এবং ৪ মর্টারের সহায়তায় পাকসেনাদের ওপর অতর্কিত আক্রমণ চালায় এবং প্রায় এক ঘন্টা যুদ্ধের পর আমাদের সৈন্যরা পাকসেনাদের অগ্রবর্তী অবস্থানগুলো দখল করে নেয়। পাকসেনারাও তাদের গোলন্দাজ বাহিনীর সাহায্যে আমাদের অগ্রসর পথে বাধা দেবার চেষ্টা করে। কিন্তু আমাদের সৈনিকরা ক্ষিপ্রতা ও বীরত্বের সঙ্গে পাকসেনাদের অবস্থানের উপর তাদের হামলা অব্যাহত রাখে। পাকসেনাদের গোলন্দাজ বাহিনীর আক্রমনের ফলে আমাদের অগ্রসর পথে কিছুটা বাধা আসে। কিন্তু তবুও আমাদের সৈনিকরা ডানদিক থেকে তাদের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখে। সকাল পর্যন্ত সংঘর্ষে পাকসেনারা তাদের অবস্থান থেকে কিছুটা পিছু হটে যেতে বাধ্য হয়। আমাদের সৈনিকরা এই অবস্থানের পেছনে অবস্থিত একটি পেট্রোল ডাম্পও ধ্ববংস করে দিতে সক্ষম হয়। এতে প্রায় ২০/২৫ জন পাকসেনা হতাহত হয়। শালদার অবস্থান থেকে পাকসেনাদের বিতাড়িত করার পর আমারা পরশুরামের নিকট অনন্তপুর গ্রামে পাকসেনাদের অবস্থানের উপর চাপ বাড়িয়ে তুলি। প্রথমদিন এই অবস্থানে আমাদের গোলন্দাজ বাহিনী আক্রমণ চালায়। ফলে ১০ জন পাকসেনা নিহত এবং আরো বিশকিছু আহ্‌ত হয়। এর একদিন পর আবার অনন্তপুর গ্রামের অবস্থানের ওপর আমাদের গোলন্দাজ বাহিনী আক্রমণ চালায়। ফলে ১৩ জন পাকসেনা নিহত ও ২ জন আহ্‌ত হয়।

২৯শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৭টার সময় ৪র্থ বেঙ্গলের 'বি' কোম্পানী পাকসেনাদের নয়ানপুর অবস্থানের উপর অতর্কিতে আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণে আমাদের গোলন্দাজ বাহিনীও সহায়তা করে। যুদ্ধ প্রায় ৩০ তারিখ রাত দুটো পর্যন্ত চলতে থাকে। ছয় ঘন্টার যুদ্ধে আমাদের সৈনিকরা ১০ জন পাকসেনা নিহত, ১৫ জন আহ্‌ত ও ৬ জনকে বন্দী করে। তাছাড়া অনেক অস্ত্রশস্ত্রও দখল করে নেয়। পাকসেনারা মাসীরহাট থেকে আরো সৈন্য এনে

শক্তি বৃদ্ধি করে আমাদের উপর পাল্টা আক্রমণ চালায়। আমাদের সৈনিকরা সাহসিকতার সাথে পরে আক্রমণের মোকাবিলা করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাদের বাহিনী গোলাবারুদ ফুরিয়ে এলে অবস্থান পরিত্যাগ করে নিরাপদে মূল অবস্থানে ফিরে আসে। এই সংঘর্ষে আমাদের পক্ষে একজন শহীদ ও ১১ জন আহত হয়। আমাদের যুদ্ধচলাকালীন সময়ে পাকসেনাদের একটি সরবরাহবাহী ট্রলী মুন্সীরহাট থেকে বেলুনিয়ার দিকে যাওয়ার পথে আমাদের নৈসিকদের পুঁতে রাখা মাইনের আঘাতে ধ্বংস হয়। এতে তিনজন পাকসেনা নিহত ও ৬ জন আহত হয়। ট্রলিতে বোঝাই গোলাবারুদ এবং রেশনও ধ্বংস হয়ে যায়।

এই ঘটনার দু'দিন পর ১লা অক্টোবর রাত ১১টার সময় আমাদের একটি শক্তিশালী দল পাকসেনাদের মুন্সীরহাট অবস্থানের ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। মুন্সীরহাট পাকসেনাদের জন্য বেলুনিয়া সেক্টরে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি ছিল। কারণ এই ঘাঁটির মাধ্যমে বেলুনিয়ার পশ্চিম দিকে তাদের অবস্থানগুলোতে সরবরাহ অব্যাহত রেখেছিল। বস্তুত সেই জন্যই আমাদের আক্রমণকে প্রতিহত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে। কিন্তু আমাদের প্রচন্ড আক্রমণের মুখে টিকতে না পেরে তাদের অবস্থান পরিত্যাগ করে পালিয়ে যায়। এর পরদিন ২রা অক্টোবর পরশুরাম শত্রুঘাঁটির উপর আমাদের সৈনিকরা আক্রমণের চাপ বাড়াতে শুরু করে। পাকসেনারা বিপুলসংখ্যক সমাবেশ করে তাদের এই অবস্থানকে রক্ষা করার জন্য আমাদের উপরও পাল্টা আক্রমণ চালায়। আমাদের সৈনিকরা পাকসেনাদের পরশুরামের দিক থেকে এই পাল্টা আক্রমণ দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিহতকরে। এতে পাকসেনারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। পাকসেনাদের আক্রমণ প্রতিহত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অন্যান্য অবস্থান থেকে প্রায় ২/৩ কোম্পানী সৈন্য একত্রিত করে ছত্রভঙ্গ হয়ে যাওয়া পাকসেনাদের উপর পুনরায় পাল্টা আক্রমণ চালাবার জন্য নির্দেশ দেই । আমাদের সৈন্যরা পাকসেনাদেরও উপর আক্রমণ চালিয়ে তাদেরকে পিছু হটিয়ে দেয় এবং মহুরী নদী অতিক্রম করে পরশুরামের পাকসেনাদের অনেকগুলো অবস্থান দখল করে নেয়। পাকসেনারা তাদের অবস্থানের উপর অক্রমণ হওয়াতে নিজেদের গোলন্দাজ বাহিনীরক সাহয্যের জন্য অনুরোধ জানায়। আমজাদ নগরে অবস্থিত পাক গোলন্দাজ বাহিনী পরশুরামের উপর গোলাবর্ষণ শুরু করে। কিন্তু সৌভাগ্যবশত আমাদের আক্রমণের চাপ শত্রুঘাঁটির অতি নিকটবর্তী থাকা সে গোলাগুলি বেশীরভাগই তাদের নিজেদের অবস্থানের উপর আঘাত হানতে থাকে। আমাদের আক্রমণের চাপ ও তাদের নিজেদের গোলার আঘাতে পাকসেনাদের অবস্থানটি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয। প্রায় ৩০/৪০ জন পাকসেনা নিহত ও প্রচুরসংখ্যক সৈন্য আহত হয়। তারা উপায়ান্তর না দেখে তাদের পরশুরামের অবস্থানটি পরিত্যাগ করে আসেন পেছনে নতুন করে অবস্থান নেয় । কয়েকদিনের যুদ্ধে বিভিন্ন জায়গায় আমাদের সৈনিকদের কাছে বিপর্যস্ত হয়ে অনেক ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার কের বেলুনিয়া ও পরমুরামের পাকসেনাদের মনোবল সম্পূর্ণরূপে ভেঙ্গে যায়। পাকসেনাদের এহেন মোচনীয় অবস্থা দেখে আমরা তাদের উপর আমাদের চাপ অব্যাহত রাখি। ২রা অক্টোবর সন্ধ্যায় আমাদের একটি দল পাকসেনাদের শালদার অবস্থানের উপর আক্রমণ চালিয়ে ৯জন পাকসেনা নিহত করে এবং তাদের অকেনক রসদ বিনষ্ট করি দেয়। পাকসেনারা তাদের অবস্থানগুলোকে রক্ষা করার জন্য ২রা ও ৩রা অক্টোরের মধ্যবর্তী রাতে ফেনী থেকে মুন্সীরহাট ও চিতলিয়াতে আরো এক ব্যাটালিয়ন সৈন্য সমাবেশ করে। ৩ তারিখ সকাল ছয় টার সময় তাদের একটি শক্তিশালী দল আমাদের অনন্তপুর ও ধানীকুন্ডার অগ্রবর্তী অবস্থানের দিকে অগ্রসর হয়। ভারী কামান ও মর্টাররের সাহয্যে তারা আমাদের অবস্থানগুরোতে প্রচন্ড গোলাবর্ণণ করে এবং সেই সঙ্গে তাদের পদাতিক বাহিনীও আক্রমণ চালায়। পাকসেনারা যখন অবস্থানের ৪০/৫০ গজের মধ্যে পৌঁছে, তখন আমাদের সৈনিকরা তাদের উপর প্রচণ্ড গুলি চালিয়ে প্রায় ২৫/৩০ জন পাকসেনাকে নিহত করে। পাকসেনারা হামলা চালিয়ে আমাদের অনন্তপুরের অবস্থানের দক্ষিণাংশের ট্রেঞ্চগুলো দখল করে নেয়। দক্ষিণাংশে একটি হালকা মেশিনগান বাংকারের উপর কামানের গুলি লেগে ধ্বংস হয়। এই আঘাতে আমাদের কয়েকজন সৈনিক শহীদ হয়। পাকসেনাদের এই প্রবল চাপ ও প্রচন্ড কামানের গুলির মুখে প্রয়োজনীয় গোলাবারুদ ও অস্ত্রের অভাবে টিকতে না পেরে আমাদের অগ্রবর্তী ঘাঁটির সৈনিকরা পিছু হটে মুখ্য অবস্থানে আসে। পাকসেনারা তাদের আক্রমণ আমাদের মুখ্য অবস্থানের উপরও চালাতে থাকে। এই সময় আমাদের গোলন্দাজ বাহিনী এবং মর্টারের গোলাতে তাদের আক্রমণ প্রতিহত হয়ে যায়। মুখ্য অবস্থানের সামনে টিকতে

না পেরে তারা ধীরে ধীরে পিছু হটতে চেষ্টা করে। আমাদের মুখ্য অবস্থান থেকে একটি শক্তিশালী দল তাদের উপর পাল্টা আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণে টিকতে না পেরে পাকসেনারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে যায়। আমাদের পাল্টা আক্রমণকারী দলটি আরো অগ্রসর হয়ে অনন্তপুর এবং ধানীকুন্ডা পুনর্দখল করে। পাকসেনাদের প্রায় ৪০/৫০ জন অতাহত হয়। আমাদের একজন শহীদ ও ৫ জন আহত হয়। পাকসেনারা মজুমদারহাট ও চিতলিয়াতে তাদের অবস্থানগুলোতে আরো সৈন্য সমাবেশ করতে থাকে। আমরাও আমাদের চাপ অব্যাহত রাখি। ৪ঠা অক্টোবর তারিখ রাতে আমাদের একটি শক্তিশালী রেইডিং পার্টি পাকসেনাদের অবস্থানে অনুপ্রবেশ করে সকাল ছ'টা পর্যন্ত চিতলিয়ার নিকট পৌঁছে। সকাল ছ'টায় ৩'' মর্টারের সহায়তায় চিতলিয়ায় পাকসেনাদের অবস্থানের দক্ষিণে অতর্কিত আক্রমণ চালায়। আধঘন্টা পর্যন্ত আক্রমণের ফলে প্রায় ৩০ জন পাকসেনা হতাহত করে এবং একটি আর আর ধ্বংস করে দেয়। এরপর পাক অবস্থান থেকে সরে পড়ে নিরাপদে ফিরে আসে। ৬ থেকে ১০ তারিখ পর্যন্ত আমাদের গোলন্দাজ বাহিনী পরশুরাম, মজুমদারহাট, চিতলিয়া এবং নোয়াপড়ার উপর বিভিন্ন সময়ে আক্রমণ চালিয়ে প্রায় ১০ জন পাকসেনা হতাহত করে। ১১ তারিখ সন্ধ্যা ৭টায় ফাকসেনারা পরশুরাম ও মজুমদারহাটের দিকে থেকে এক ব্যাটালিয়ন শক্তিসহ গোলানস্দাজ বাহিনী ও ৩'' মর্টারের সহায়ংতায় আমাদের অননতপুর অবস্থানের উপর পুনরায় আক্রমণ চালায়। পাকসেনারা আমাদের অবস্থানের অতি নিকটে পৌঁছাতে সমর্থ হয়। কিন্তু আমাদের সৈনিকরা বীরবিক্রমে তাদের আক্রমণকে প্রতিহত করে। সমস্ত রাত আক্রমণ চালাবার পর পাকসেনাদের প্রায় ৩৫জন সৈনিক নিহত হয়। শক্তি প্রতিরোধ ব্যর্থ হয়ে এবং প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির জন্য পাকসেনারা তাদের মৃতদেহ ফেলে বোরে ছত্রভঙ্গ হয়ে পিছু হটে যায়। এই সাফল্যের ফলে আমাদের সৈনিকদের মনোবল আরো বৃদ্ধি পায়। ১৩ই এবং ১৪ই অক্টোবর পাকসেনারা আমাদের অবস্থানের সামনের এলাকায় তাদের তৎপরতা বাড়িয়ে চলে। ১৪ই অক্টোবর সালদরের নিকট পাকসেনাদের দু'টি প্লাটুন আমাদের প্রতিরক্ষা মাইনের শিকার হয়। ফলে ১৮ জন পাকসেনা নিহত হয়। ১৩ তারিখ সকাল ১০টার সময় আমাদের গোলন্দাজ বাহিনী পাকসেনাদের পরশুরাম অবস্থানের উপর গোলাবর্ষণ করে একটি মেশিনগানসহ পাঁচজন পাকসেনাকে ধ্বংস করে দেয়। পাকসেনারা ২/৩ দিন নীরব থাকার পর আবার তাদের তৎপরতা বাড়িয়ে দেয়। ১৬ই অক্টোবর আমাদের দু'টি পলাটুন বিকেল ৩-৩০ টায় পাকসেনাদের শালদার অবস্থানের উপর আবর অতর্কিত আক্রমণ চালায়। ২০ মিনিটের এই আক্রমণে মুক্তযোদ্ধারা পাঁচজন পাকসেনাকে নিহত ও ১০ জনকে আহত করে নিরাপদে ফিরে আসে। ওই দিনই সাড়ে চারটায় সময় আমারে গোলন্দাজ বাহিনী পাকসেনাদের পরশুরাম অবস্থানে হামলা চালিয়ে ১০ জনকে আহ্‌ত করে এবং একটি বাঙ্কার উড়িয়ে দেয়। পাকসেনারা ১৫ তারিখ সন্ধ্যা ৭টায় প্রায় এক ব্যাটালিয়ন সৈন্যশক্তি নিয়ে গোলন্দাজ বাহিনীর সহায়তায় আমাদের সাহেবনগর, চন্দনা এবং জঙ্গলখোলা অবস্থানগুলো উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। আমাদের গোলন্দাজ বাহিনী এই অবস্থান গুলোর সাহায্যার্থে পাকসেনাদের উপর আক্রমণ চালায়। প্রায় তিন ঘন্টা যুদ্ধে আমাদের প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে টিকতে না পেরে পাকসেনারা পিছু হটে যায়। তাদের হতাহতের সংখ্যা জানা যায়নি।

কুমিল্লা দক্ষিণে জুলাই মাসের শেষের দিকে আমরা শত শত গেরিলাকে ট্রেনিং দিয়ে ভিতরে পাঠিয়ে দিই। এইসব গেরিলা কুমিল্লা, চৌদ্দগ্রাম, লাকসাম, হাজীগঞ্জ, বতরা, চাঁদপুর, ফরিদপুর প্রভৃতি জায়গাতে প্রবেশ করে নিজ নিজ জায়গায় বেইস তৈরী করে তোলে। আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে ফরিদগঞ্জে অবস্থিত আমাদের গেরিলাদের একটি প্লাটুন পাকসেনাদের একটি টহলদারী দলকে বোয়াল নামক স্থানে এ্যামবুশ করে। এক ঘন্টা যুদ্ধের পর ১২ জন পাকসেনা নিহত ও ১৫ জন আহত হয়। বেশকিছু অস্ত্রশস্ত্র আমাদের গেরিলারা দখল করে নেয়। লাকসাম থানার সাহাপুর গ্রামে পাকসসেনাদের একটি ছোট ঘাঁটি ছিল। লাকসামের গেরিলারা ৫ই আগস্ট সন্ধ্যা ৭টার সময় এ ই ঘাঁটির উপর অতর্কিতে আক্রমণ চালায়। আক্রমণে ১০ জন পাকসেনা নিহত ও ২ জন আহত হয়। আমাদের আরেকটি গেরিলা দলের দুটি প্লাটুন মিয়াবাজারের নিকট পাকসেনাদের একটি ঘাঁটির বিস্তারিত সংবাদ পায়। তিনটি পাল্টুন- এর এই দলটি ৭ তারিখ রাত পৌনে তিনটার সময় সেই ঘাঁটিতে অতর্কিতে আক্রমণ চালায়। প্রায় আধঘন্টা যুদ্ধের ফলে ২৮ জন পাকসেনা নিহত এবং একজন অফিসরা ও জেসিওসহ ১২ জন আহত হয়। বেশ কিছুসংখ্যক বাঙ্কার উড়িয়ে দেয়।

সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে চৌদ্দগ্রামের দক্ষিণে এবং কুমিল্লার দক্ষিণে কৃষ্ঞনগর, কলাতলা, আমজাদহাট প্রভৃতি জায়গায় আমাদের গেরিলারা পাকসেনাদের উপর বিভিন্ন সময়ে আঘাত হেনে প্রায় ২০ জনকে নিহত ও ১৬ জনকে আহত কেরে। এসব সংঘর্ষে আমাদের ৩৪ জন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ এবং ৩ জন আহত হয়। সেপেটম্বরের ২০ তারিখে আমাদের একটি গেরিলা দল চট্টগ্রাম-কুমিল্লার রাস্তায় জগন্নাথ দীঘির নিকট বাজানকারা সেতুটি উড়িয়ে দিয়ে সেতু থেকে কিছু উত্তরে ১০ জন গেরিলা ও একটি নিয়মিত বাহিনীর পাকসেনাদের অপেক্ষায় এ্যামবুশ পেতে বসে। সেতুটি ধ্বংসের সংবাদ পেয়ে ফেনী থেকে পাকবাহিনীর একটি শক্তিশালী দল সেতুর দিকে অগ্রসর হয়। সেতুতে পৌঁছার আগেই পাকসেনারা আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের এ্যামবুশে পড়ে যায়। আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা তাদের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালিয়ে একজন অফিসারসহ ২৫ জন পাকসেনাকে নিহত করে। পাকসেনারা ছত্রভঙ্গ হয়ে ফেনীর দিকে পালিয়ে যায়।

পাকসেনারা লাকসামের নিকট হাসনাবাদ নামক এক জায়গায় তাদের একটি ঘাঁটি তৈরী করে। তাদের সঙ্গে বেশ কিছুসংখ্যক রাজাকারও ছিল। এই ক্যাম্প থেকে তারা চাঁদপুর-লাকসাম-কুমিল্লা রাস্তায় অনবরত টহল দিয়ে বেড়াতো। ফলে চাঁদপুরে এবং দক্ষিণ ঢাকা ও ফরিদপুরে অনুপ্রবেশকারী আমাদের গেরিলাদের জন্য মারাত্মক প্রতিবন্ধকতার দৃষ্টি হয়। এই ঘাঁটিটি ধ্বংস করে দেবার জন্য ক্যাপ্টেন মহবুবকে নির্দেশ দেয়া হয়। ক্যাপ্টেন মাহবুব এই ঘাঁটিটি সম্পর্কে পুরোপুরি সংবাদ সংগ্রহ করে। সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম দিকে ৪র্থ বেঙ্গলের ‘বি’ কোম্পানী ও গেরিলা সমন্বিত একটি শক্তিশালী দল লাকসাম এলাকায় অনুপ্রবেশ করে এবং পরদিন পাকসেনদের হাসনাবাদ ঘাঁটির উপর অতর্কিতে আক্রমণ করে। ফলে প্রায় ২৫ জন পাকসেনা ও ৩০ জন রাজাকার নিহত হয়। পাকসেনারা ক্যাম্প ছেড়ে কুমিল্লার দিকে পালিয়ে যায়। হাসনাবাদ অবস্থান থেকে অনেক অস্ত্রশস্ত্র আমাদের দখলে আসে। এই সংঘর্ষের একদিন পর আমাদের দলটি হাজীগঞ্জে অবস্থিত রাজাকারদের একটি বিরাট ট্রেনিং ক্যাম্পে আক্রমণ চালিয়ে ৩০ জন রাজকারকে নিহত করে। এর ফলে আমাদের গুরুত্বপূর্ন অনুপ্রবেশ পথটি আবার বিপদমুক্ত হয়। পাকসেনারা এ ই অঞ্চলে আমাদের ধ্বংস করার জন্য আরো সৈন্য সমাবেশ ঘটায়। তাদের একটি ব্যাটালিয়ন চৌদ্দগ্রামে মোতায়েন হয়। পাকসেনাদের ব্যাটালিয়ন হেডকোয়ার্টার একটি মাদ্রাসা বিল্ডিং-এ স্থাপন করে । এইসব সংবাদ আমাদের কাছে স্থানীয় গেরিলাদের মারফতে পৌছে। পাকসেনাদের এই নতুন ব্যাটালিয়নটিকে আসার সাথে সাথেই ব্যতিব্যস্ত করে তোলার জন্য লেঃ ইমামুজ্জামান সেপ্টেম্বর মাসের ১০ তারিখে আমাদের মর্টার পল টুন ও একটি গেরিলা দলকে চৌদ্দগ্রামে পাঠায়। আমাদের দলটি বিকেল পাঁচটায় চৌদ্ধগ্রামের নিকট উপস্থিত হয়ে পাকসেনাদের হেডকোয়ার্টাররের উপর মর্টারের গোলাবর্ষণ শুরু করে। বেশ ক’টি গোলা মাদ্রাসা ঘরের মধ্যে পড়ে। এর ফলে পাকসেনাদের প্রায় ৩০/৪০ জন হতাহত হয়। আমাদের একজন প্রত্যক্ষদর্শী স্থানীয় গেরিলা আহত দের লাকসামের দিকে নিয়ে যেতে দেখে। পাকসেনারা কামানের সাহায্যে আমাদের অবস্থানের উপর গোলাগুলি চালায়। এতে কিছু বেসামনিক লোক নিহত হয়। এর দু’দিন পর পাকসেনাদের একটি দল হরিসর্দার বাজারের নিকট স্থানীয় দালাল, শান্তি কমিটির লোকদের নিয়ে এক সভায় মিলিত হয়। এই সভা পন্ড করে দেয়ার জন্য আমাদের একটি টহলদার দল পাকসেনাদের উপর অতর্কিতে আক্রমণ চালায়। ফলে একজন জে-সি-ওসহ তিনজন পাকসেনা নিহত হয়। শান্তি কমিটির লোকেরা ভয়ে পালিয়ে যায়। পাকসেনারা সেপ্টেম্বর মাসেই চৌদ্দগ্রামের উত্তরে হরিসর্দার বাজারের নিকট পুনরায় নতুন করে তাদের ঘাঁটি তৈরী করার চেষ্টা চালায়। এই সংবাদ পেয়ে লেঃ ইমামুজ্জামান পাকনেসাদের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ খবর সংগ্রহ করার জন্য রেকি দল পাঠায়। রেকি দলটি রাত ৯টার সময় খবর সংগ্রহ করে ফেরত আসে। তারা দেখতে পায়, পাকসেনাদের প্রায় এক কোম্পানী শক্তি হরিসর্দার বাজারের উত্তরে ঘাঁটি তৈরী করার জন্য ট্রেঞ্চ খোঁড়ায় ব্যস্ত। সংবাদ পেয়ে লেঃ ইমামুজ্জামানের ৪র্থ বেঙ্গলের “বি’ কোম্পানী এবং দু’টি গেরিলা কোম্পানী নেয়ে মর্টারের সহায়তায় রাত সাড়ে ৪টার সময় পাকসেনাদের অবস্থানের উপর অতর্কিত আক্রমণ চালায়। আমাদের তীব্র আক্রমণের ফলে পাকসেনাদের দুটি হালকা মেশিনগান পোস্ট ছাড়া সম্পূর্ণ অবস্থানগুলি পর্যুদস্ত হয়ে যায়। পাকসেনারা তাদের বাঙ্কার থেকে আক্রমণেরে চাপে পালাবার চেষ্টা করলে আমাদের সৈনিকরা তাদের নিহত করে। প্রায় ২৫ জন পাকসেনা রেঞ্জারসহ নিহত হয় ও অনেকে আহত হয়। দু’ঘন্টা আক্রমণ চালাবার পর

আমাদের সৈনিকরা নিরাপদে তাদের অবস্থানে ফিরে আসে। পরে পাকসেনারা তাদের আহত সৈনিক ও নিহতদের নিয়ে জীপে করে লাকসামের দিকে পালিয়ে যায়। প্রায় ৮টার সময় পাঁচটি হেলিকপ্টারে করে পাকসেনাদের আরেকটি দল সেই অবস্থানের শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য আসে। শক্তি বৃদ্ধির পর পাকসেনারা প্রায় ১০টার দিকে আমাদের অবস্থানের আক্রমণের জন্য আগ্রসর হয়। আমাদের অবস্থানটি পাকসেনাদের এই আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল। লেঃ ইমামুজ্জামানের নেতৃত্বে পাকসেনাদের আক্রমণকে আমাদের সৈনিকরা প্রতিহত করতে থাকে। আমাদের প্রচন্ড গোলাগুলির মধ্যেও পাকসেনারা আমাদের অগ্রবর্তী অবস্থানের নিকট পর্যন্ত অগ্রসর হতে সমর্থ হয়। এ সময় আমাদের ৬'' মর্টার ও ২'' মর্টার তাদের উপর মারাত্মক আঘাত হানলে পাকসেনাদের আক্রমণ ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। শুধুমাত্র ক্ষুদ্র একটি পাকসেনা দল আমাদের ডানদিক দিয়ে যেতে সক্ষম হয়। কিন্তু লেঃ ইমামুজ্জামান সময়মত পাল্টা আক্রমণের ফলে তারাও নিহত হয়় ৫/৬ ঘন্টা যুদ্ধের পর আমাদের বীর সৈনিকরা সাফল্যের সঙ্গে তাদের আক্রমণ প্রতিহত করতে সক্ষম হয। এই যুদ্ধে একজন মেজরসহ ৩৮ জন পাকসেনা নিহত হয। মর্টারের গোলার আঘাতে পাকসেনাদের অফিসার নিহত হবার পর পাকসেনারা মনোবল হারিয়ে পশ্চিমদিকে পিছু হটে যায়। এর দু'দিন পর ১৩ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার সময় আমাদের একটি গেরিলা দল ফতেপুরের নিকট একটি রেলসেতু উড়িয়ে দেয়। এত ৫০ ফুট গ্যাপ সৃষ্টি হয়। ফলে লাকসমা-ফেনীর মধ্যে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। বাডিসা এবং গোবিন্দমানিক্যর দীঘিতে পাকসেনাদের দু'টি ঘাঁটি ছিল। লেঃ ইমামুজ্জামান ১৯শে সেপ্টেম্বর সকাল সাড়ে পাঁচটার সময় এ ই দু'টি পাক অবস্থানের উপর একযোগে অতর্কিতে আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণে ৮১ এম এম মর্টার, ১৫ এম আর আর এবং মেশিনগান ব্যবহার করা হয়। মানিক্যর দীঘিতে অবস্থিত পাকসেনারা আমাদের আক্রমাণের পূর্বাবাস পেয়ে সতর্ক হয়ে ছিল। ফলে সাতসা অবস্থানের শুধু দুটি বাঙ্কার ধ্বংস ও ৬ জন পাকসেনা আমাদের আক্রমণে নিহত হয়। আমাদের দু'জন সৈনিক আহত হয়। বাডিসা ঘাঁটির উপর আমাদের আক্রমণ সম্পূর্ণ সফল হয। আরআর- এর গুলির আঘাতে প্রায় ছ'টি বাঙ্কার ধ্বংস হয়। পাকসেনাদের ২০- জন নিহত ও ১২ জন আহত হয়। আমাদের আক্রমণকারী দলটি দু'ঘন্টা পর নিরাপদে নিজেদের অবস্থানে ফিরে আসে। এই সংঘর্ষের চারদিন পর ২৩শে সেপ্টেম্বর ভোর পাঁচটার সময় একটি প্লাটুন ও ১৬ জন গেরিলা লেঃ ইমামুজাজামানের নেতৃত্বে মর্টার এবং আরআর -এর সাহায্যে আবার গোবিন্দমানিক্য দীঘিতে অতর্কিত আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণের সময় আমাদের সৈনিকরা শত্রুর বেশকিছু বাঙ্কার আরআর-এর সাহায্যে ধ্বংস করে দিতে সক্ষম হয়। ফলে প্রায় ১৫ জন পাকসেনা নিহত ও ১০ জন আহত হয়। এক ঘন্টা যুদ্ধের পর আমাদের সৈনিকরা তাদের অবস্থানে নিরাপদে ফিরে আসে।

পাকসেনাদের একটি শক্তিশালী দল কুমিল্লার দক্ষিণে পায়েলগাছা থেকে নারায়ণপুরের দিকে অগ্রসর হয় এবং নারায়ণপুরের অনেকগুলো বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয় এবং নারী ধর্ষণ করে। ২/৩ ঘন্টা যাবৎ তাদের অত্যাচার চলে। নারায়নপুরের নিকট অবস্থিত আমাদের মাত্র ১৩ সদস্যের ছোট একটি গেরিলা দল পাকসেনাদের পাকসেনাদের নারায়ণপুরের দিকে অগ্রসর হতে দেখে। পরে এই দল পায়েলগাছায় রাস্তায় এ্যামবুশ পাতে। পাকসেনারা নারায়ণপুরে অত্যাচার চালাবার পর ফেরার পথে তাদের এ্যামবুমের আওতায় পড়লে গেরিলারা আক্রমণ চালায়। আক্রমণে ১৪ জন পাকসেনা ও ২৮ জন রাজাকার নিহত এবং ১৩ জন পাকসেনা ও ১৬ জন রাজাকার আহত হয়। আমাদের বীর যোদ্ধারা তাদের গুলি শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রাণপণে আক্রমণ চালিয়ে যায়। এই এ্যামবুশে শেষ পর্যন্ত পাঁচজন গেরিলা শহীদ হয় এবং বাকী ৮ জন ফিরে আসতে সমর্থ হয়। শক্তিশালী পাকবাহিনীর দলের সঙ্গে ক্ষুদ্র এই গেরিলা বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণ এবং আত্মত্যাগ কোনদিন ভুলে যাবার নয়।

চাঁদপুরের নিকট আকন্দহাট বাজারের নিকট আমাদের একটি কোম্পানী তাদের বেইস স্থাপন করে। স্থানীয় দালাল এবং রাজাকাররা পাকসেনাদেরকে এই বেইস সম্বন্ধে খবর দেয়। এই বাজারটির তিনদিকে পানি থাকায় আমার সৈনিকরা বেইসটিকে যথেষ্ট নিরাপদ মনে করতো। ৬ই সেপ্টেম্বর সকাল ৬টার সময় পাকসেনাদের একটি শক্তিশালী দল স্থানীয় দালালের সহযোগিতায় আমাদের এই বেইসটি আক্রমণের জন্য আসে। আক্রমণের জন্য আসে। আক্রমণের

সময় তারা নৌকার সাহয্যে খাল পার হয়ে বেইস-এ দিকে অগ্রসর হবার চেষ্টা করে। পাকসেনারা নিকটে পৌঁছলে আমাদের সৈনিকরা তাদের উপর আক্রমণ চালায়। দু'ঘন্টার যুদ্ধে ১জন মেজরসহ ৩৭ জন পাকসেনা নিহত হয়। খাল পার হতে না পেরে এবং অনেক হতাহতের ফলে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। আমাদের কোম্পানীটা পরে সেখান থেকে নিরাপদে অন্য বেইস-এ চলে আসে।

কুমিল্লার দক্ষিণে পাকসেনাদের কংসতলা ঘাঁটিটি আমাদের গেরিলা বাহিনীর যাতায়াতে বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি করছিল। এই ঘাঁটি থেকে পাকসেনাদের টহলদার দল আমাদের যাতায়াত পথে বিশেষ তৎপরতা চালাতো। এই ঘাঁটিটিকে ধ্বংস করে দেবার জন্য ক্যাপ্টেন মাহবুবকে নির্দেশ দেয়া হয়। বিশেষ তথ্য অনুসন্ধান করে ৫০ জনের একটি দল ক্যাপ্টেন মাহবুবের নেতৃত্বে ৩০ শে সেপ্টেম্বর রাত একটায় এই ঘাঁটিতে অনুপ্রবেশ করে আক্রমণ চালায়। তিন ঘন্টা যুদ্ধের পর সুবেদার শাহজামান সহ ১৬ জন পাকসেনা নিহত এবং ৮ জন আহত হয়। পাকসেনারা এই আক্রমণের ফলে এতই বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে যে, সেখান থেকে তারা তাদের অবস্থান পরিত্যাগ করে কুমিল্লায় চলে যেতে বাধ্য হয়। এর দু'দিন পর আমাদের ডিমোলিশন পার্টি পেপুলিয়া বাজারের নিকট লালমাই-সোনাজাজী সড়কের একটি সেতু বিস্ফোরক গিয়ে উড়িয়ে দেয়। পাকসেনারা এই রাস্তাটিকে ট্যাঙ্ক এবং বারী গাড়ী চলাচলের জন্য পুনঃনির্মাণের চেষ্টা করছিল। সেতুটি ধ্বংস করে দেবার পর তারা রাস্তা মেরামতের কাজ বন্ধ করে দেয়। আমাদের আরেকটি গেরিলা দল চান্দিনার নিকটে দোতুলাতে রাস্তায় মাইন পুঁতে পাকসেনাদের একটি গাড়ী ধ্বংস করে দেয়। এছাড়াও কুমিল্লার দক্ষিণে ও উত্তরে ১লা অক্টোবর থেকে ৩রা অক্টোবর আমাদের সঙ্গে বিভিন্ন সংঘর্ষে প্রাণছড়া, কোটেশ্বর, আজনাপুর, বিবিরবাজার, আম্রতলী প্রভৃতি জায়গায় ২৫ জন পাকসেনা নিহত এবং ৮ জন আহত হয়।

আমাদের ৪১ জনের একটি গেরিলা দল ১লা অক্টোবর তাদের ট্রেনিং শেষ করে রাত ৮টায় ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। কসবার দক্ষিণ দিক দিয়ে এই দুটি নৌকায় উজানের শাহ সেতুর নিকট পৌছে। পাকসেনাদের একটি টহলদারী দল রাত ১১টায় আমাদের দ্বিতীয় নৌকাটিকে দেখতে পায় এবং আক্রমণ চালায়। আক্রমণের ফলে আমাদের পাঁচজন গেরিলা শহীদ ও তিনজন আহত হয়। ১৫টি রাইফেল ও ৫টি স্টেসগান পানিতে পড়ে হারিয়ে যায়। বাকী গেরিলারা অতিকষ্টে শত্রুদের নাগালের বাইরে চলে আসতে সক্ষম হয়। এই ঘটনার তিনদিন পর লেঃ ইমামুজ্জামনের ৪ঠা অক্টোবর সকাল পাঁচটায় চৌদ্দগ্রামের ৫ মাইল উত্তরে হরিসর্দার বাজারে পাক অবস্থানের উপর ১০৬ এম এম আর আর ও ৮১ এম এম মর্টারের সাহায্যে আক্রমণ চালিয়ে শত্রুর ৭টি বাঙ্কার ধ্বংস করে ২৫ জন পাকসেনা ও ৭ জন রাজাকারকে হতাহত করে। মুক্তিযোদ্ধারা চৌদ্দগ্রামের তিন মাইল দক্ষিণে একটি সেতুও ধ্বংস করে দেয়। ৪ঠা ও ৫ই অক্টোবর কুমিল্লার উত্তরে আজনাপুর ও জামবাড়ি এলাকায় আমাদের গেরিলারা পাকসেনাদের বেশ কটি টহলদারী দলকে আক্রমণ করে ১৫ জনকে নিহত ও ২০ জনকে আহত করে। আমাদের ১ জন শহীদ ও ১ জন আহত হয় কুমিল্লাতে গোমতী বাঁধে মাইন পুঁতে পাকসেনাদের ১টি জীপ ধ্বংস করে দেয়া হয়। সেই সঙ্গে একজন অফিসারসহ তিনজন পাকসেনা নিহত হয়। এছাড়া রামচন্দ্রপুর এবং বাংগুরা ডাকঘর জ্বলিয়ে দেয়া হয়। হোমনা থাকায় অবস্থিত পাকসেনাদের একটি দলে সঙ্গে তিন তারিখ রাত সাড়ে তিনটার সময় আমাদের একটি গেরিলা দলের সংঘর্ষ হয়। ৬ ঘন্টার যুদ্ধে পাকসেনারা সম্পূর্ণরূপে পর্যুদস্ত হয়ে পালিয়ে যায়। আমাদের গেরিলারা পাকসেনাদের দ্বারা বন্দী ১৯ জন ব্যক্তিকে মুক্ত করে দেয় এবং ৯টি রাইফেল দখল করে। এরপর হোমনা এলাকা সম্পূর্ণরুপে আমাদের কর্তৃত্বে আসে। ৬ই অক্টোবর রাত ৩টার সময় পাকসেনাদের একটি দল দুর্লভপুরের নিকট আমাদের এ্যামবুশে পড়ে যায়। এই এ্যামবুশে একজন ইঞ্জিনিয়ার কোর-এর অফিসারসহ ১২ জন পাকসেনা নিহত হয়। পাকসেনারা গোমতীর উত্তরে আবার তাদের আধিপত্য পুনরুদ্ধারের জন্য তৎপরতা বাড়িয়ে দেয়। পাকসেনাদের এই তৎপরতাকে বাধা দেবার জন্য ক্যাপ্টেন দিদারুল আলম দু'টি প্লাটুন পানছাড়ার এবং মোহনপুরে পাঠায়। এই প্লাটুনগুলো পাকসেনাদের চলাচলের রাস্তায় এ্যামবুশ পেতে অপেক্ষা করতে থাকে। ৮ তারিখ রাতে পাকসেনাদের একটি শক্তিশালী দল গোমতী পার হয়ে পানছাড়ার দিকে অগ্রসর হয়। সকাল ছ'টার সময় এই দলটি আমাদের এ্যামবুশের আওতায় আসে।

ফলে ২০ জন পাকসেনা নিহত ও ১০ জন আহত হয়। পরদিন পাকসেনাদের আরেকটি ছোট দল মনোহরপুরে আমাদের এ্যামবুশের আওতায় আসে এবং এ্যামবুশে ৬জন পাকসেনা নিহত হয়। ঐদিনই আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা পাকসেনাদের আরেকটি দলকে বুড়ীচং-এর নিকট সাদেকপুরে জেরুইনে এ্যামবুশ করে। এ্যামবুশে ১জন মেজর ও ১জন ক্যাপ্টেনসহ ২০ জন পাকসেনা নহত ও ৭ জন ইপিসিএএফ নিহত হয়। নিহত একজন ক্যাপ্টেনের নাম সৈয়দ জাভেদ শাহ বলে পরে আমরা জানতে পারি। একজন পাকসেনা আমাদের হাতে বন্দীও হয়। এই সংঘর্ষে আমাদের একজন শহীদ এবং তিনজন তিনজন আহত হয়। ৭টি রাইফেল আমরা দখল করে নেই। এর দু'দিন পর ১১ই অক্টোবর সকল সাড়ে ১১টার সময় আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা কুমিল্লার সার্কিট হাউস এবং গোমতীর চাঁদপুর ফেরীতে মর্টারের গোলাবর্ষণ করে। কুমিল্লা সার্কিট হাউসে পাকসেনাদের মার্শাল ল' হেডকোয়ার্টার ছিল। এর গোলাবর্ষণের ফলে প্রায় ৩৯ জন পাকসেনা ও রাজাকার হতাহত হয়। শহরের ভিতরে বসে মর্টারের গোলাবর্ষণ করাতে পাকসেনাদের মধ্যে আতঙ্কের সুষ্টি হয়। পরে আমরা জানতে পারি যে, শহরে অবস্থিত অনেক টহলদার পাকসেনা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে তাদের অস্ত্রশস্ত্র ফেলে ময়নামতি ক্যান্টনমেন্টের দিকে পালিয়ে যায়। আমরা আরো জানতে পারি যে, সার্কিট হাউসে গোলাবর্ষণের সময় সেখানে পাকিস্তানী ৯ম পদাতিক ডিভিশনের জেনারেল অফিসার কমান্ডিং উপস্থিত ছিলেন। অল্পের জন্য তিনি আমাদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পান । পাকসেনারা কুমিল্লা শহরে প্রকাশ্য দিবালোকে মুক্তিযোদ্ধাদের দ্বারা এই আক্রমণের খবর পাকিস্তানী রেডিও থেকেও প্রচার কররে। তারা পাঁচজন সৈনিক নিহত ও ৩৯ জন আহত হওয়ার কথা স্বীকার করে। আমাদের গেরিলারা কালিরবাজার গ্রামে পাকসেনাদের একটি হেডকোয়ার্টারের সন্ধান পায়। এই সংবাদ পেয়ে লেঃ ইমামুজ্জামান একটি ৭৫-এম এম আর আর, মেশিনগান ও হালকা মেশিনগানসহ একটি প্লাটুন পাঠিয়ে দেয়। এই প্লাটুনটি পথ প্রদর্শকের সহায়তায় পাকসেনাদের হেডকোয়াটারের নিকটে রাতে পৌঁছতে সক্ষম হয়। ১২ ই অক্টোবর ভোর পাঁচটায় আমাদের এই দলটি রকেট এবং মেশিনগানের সাহায্যে পাকসেনাদের এই হেডকোয়ার্টারে আক্রমণ করে একটি বিল্ডিং -এ অবস্থিত দু'টি বাঙ্কার সম্পূর্ণভাবে উড়িয়ে দেয়। ঐ অবস্থানের আরো পাকসেনারা রকেট হামলায় ইতস্তত পালাবার চেষ্টা করে। এমতাবস্থায় তাদের প্রতি মেশিনগানের সাহায্যে গুলিবর্ষণ করে তাদের ১২ জনকে নিহত ও ৪ জনকে আহত করে। এরপর আমাদের দলটি নিরাপদে আমাদের অবস্থানে ফিরে আসে। এই ঘটনার একদিন পর বগাবাড়ী ও জাজিশ্বরে আরেকটা আক্রমণে ৭ জন পকসেনা ও ৫ জন রাজাকার নিহত হয়।

বুড়ীচং থানার রামনগর গ্রামে আমাদের গেরিলাদের একটি অবস্থান ছিল। পাকসেনারা স্থানীয় দালালদের নিকট সংবাদ পেয়ে ৮ই অক্টোবর ডুপুরে একটি শক্তিশালী দল নিয়ে সেই অবস্থানের উপর আক্রমণ চালায়। আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা বীরত্বের সঙ্গে সেই আক্রমণের মোকাবেলা করে। ডুপুর একটা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত যুদ্ধ চলে । যুদ্ধে পাকসেনাদের প্রায় ১৬ জন সৈনিক ও ১৪ জন রাজারকার নিহত হয। পাক আক্রমণের চাপ বাড়তে থাকলে আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা তাদের অবস্থান পরিত্যাগ করে জাগলপুরে নতুন করে অবস্থান নেয়। পরদিন পাকসেনাদের আরেকটি শক্তিশালী দল সেই অবস্থানের উপরও আক্রমণ চালায়। প্রায় ৪ ঘন্টা যুদ্ধ করে আমাদের যোদ্ধারা ৩৫ তদজন পাকসেনাকে হতাহত করে। এরপর সেই অবস্থান পরিত্যাগ করে প্রধান ঘাঁটিতে আসে। আসার পথে পাঁচজন পাকসেনা আমাদের হাতে বন্দী হয়। আমাদের একজন শহীদ, দু'জন আহত এবং ১ জন বন্দী হয়।

আমাদের একটি প্লাটুন ১৫ তারিখ সকাল ৮টায় কুমিল্লার দক্ষিণে পাকসেনাদের একটি অবস্থানের আধমাইল দূরে বারচর গ্রামে এ্যামবুশ পাতে। এক ঘন্টা অবস্থানের পর পাকসেনাদের একটি দল তাদের ঘাঁটিতে ফেরার পথে এই এ্যামবুশের আওয়ায় পড়ে। এ্যামবুশে ১২ জন নিহত ও ৩ জন আহত হয়। ঐ দিনই বিকেলে মনোহরের নিকট পাকসেনাদের আরেকটি দলের উপর আমাদের সৈনিকরা আক্রমণ করে। পাকসেনাদের এই দলটি নিকবর্তী একটি গ্রাম জ্বালিয়ে তাদের ঘাঁটিতে ফেরত যাচ্ছিলো। ডুদিন পর ১৮ ই অক্টোবর রমজানপুরে আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা একটি এ্যামবুশ পাতে। রাত প্রায় সাড়ে তিনটার সময় একটি টহলদারী দল এই এ্যামবুশে পড়ে যায়। উভয় পক্ষে প্রায় আধঘন্টা গোলাগুলি বিনিময় হয়। এতে ১০ জন পাকসেনা ও ১৮ জন

রাজাকার হতাহত হয়। আমাদের একজন আহত হয়। পাকসেনারা ছত্রভঙ্গ হয়ে মৃতদেহ ফেলে রেখে পালিয়ে যায়।

পাকসেনারা অক্টোবর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে মিয়াবাজারের নিকট তাদের একটি ঘাঁটি স্থাপন কের। আগস্ট মাসে এই অবস্থান থেকে আমরা পাকসেনাদের তাড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলাম। পুনরায় এই ঘাঁটি স্থাপন করায় আমরা বুঝতে পারি যে পাকসেনারা আবার চট্টগ্রাম-কুমিল্লা রাস্তা খুঁড়বার প্রস্তুতি নিচ্ছে। তাদের এই পরিকল্পনা ব্যর্থ করার জন্য প্রথম অবস্থাতেই মিয়াবাজারের শত্রুঘাঁটিটি ধ্বংস করে দেবার জন্য ক্যাপ্টেন মাহবুব একটি কোম্পানী পাকসেনাদের ঘাঁটি রেইড করার উদ্দেশ্যে তাদের নিজেরদের বেইস থেকে রওনা হয়। রাত প্রায় ১১টার সময় শত্রুঘাটির নিকট পৌঁছে অতর্কিতে আক্রমণ চালায়। প্রায় দেড় ঘন্টা যুদ্ধের পর দু'জন পাকসেনা নিহত ও পাঁচজনকে আহত করে আমাদের দলটি অবস্থান পরিত্যাগ করে। এর তিন দিন পর ২০ শে অক্টোবর ভোর চারটার সময় মিয়াবাজারের আরেকটি শত্রুঘাঁটির উপর আমাদের সৈন্যরা আক্রমণ চালায়। এই অকস্মাৎ আক্রমণে পাকসেনারা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। দু'ঘন্টা যুদ্ধের ফলে প্রায় ২১ জন পাকসেনা নিহত এবং আহত হয়। পাকসেনাদের নিহত ও আহত সৈনিকদে কে পরের দিন গাড়ীতে কুমিল্লার দিকে নিয়ে যেতে দেখা যায়। আমাদের দলটি যে রাস্তায় ফিরে আসে পাকসেনাদের ঘাঁটির কিছু দূরে সেই রাস্তার উপর মাইনের সাহয্যে এফ বুবি ট্র্যাপ লাগিয়ে আসে। পরদিন সকালে পাকসেনাদের একটি শক্তিশালী দল সেই রাস্তায় খবরাখবর নেয়ার জন্য অগ্রসর হবার পথে বুবীট্র্যাপ -এর কাছে পড়ে যায় এবং মাইন বিস্ফোরণের ফলে ১৬ জন পাকসেনা নিহত ও ৫ জন আহত হয়।

আমাদের আরেকটি দল ইমামুজ্জামানের নেতৃত্বে ২২শে অক্টোবর ভোর চারটার সময় মর্টার এবং ১০৬ আরআরএর সহায়তায় হরিসর্দার রাজাপুরের পর পাকসেনাদের আরে কটি নতুন ঘাঁটির উপর আক্রমন চালায়। প্রায় ১২ ঘন্টা যুদ্ধে আমাদের মর্টার, মেশিনগান এবং আর আর-এর রকেট পাকসেনাদের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি করে। আর আর-এর সাহায্যে বেশ ক'টি বাঙ্কার আমাদের সৈন্যরা উড়িয়ে দিতে সমর্থ হয়। তাদের প্রায় ৩৫ জন হতাহত হয়। পাকসেনারা কুমিল বিমান বন্দরে অবস্থিত কামানের সাহায্যে আমাদের আক্রমণকে প্রতিহত করে। প্রচণ্ড কামানের আক্রমণের ফলে সন্ধা ছয়টার সময় আমাদের সৈনিকরা গোলার অভাবে পিছু হটে আসতে বাধ্য হয়। আসার সময় পাকসেনারদের অবস্থানের নিকট রাস্তায় মাইন লাগিয়ে আসে। পরদিন সকালে মাইন বিস্ফোরণের ফল ৭/৮ জন পাকসেনা আহত হয়। এর একদিন পর আমাদের আরেকটি দল সকাল সাতটার সময় চৌদ্দগ্রামের এক মাইল উত্তরে পাকসেনাদের কালিরবাজার ঘাঁটির উপর মর্টার এবং আরাল-এর সহায়তায় আক্রমণ চালায়। এ আক্রমণে প্রায় ১২ জন পাকসেনা হতাহত হয়। পাকসেনারা তাদের গোলন্দাজ বাহিনীর সহায়তায় আক্রমণরকে প্রতিহত করতে সক্ষম হয়। এর কয়েকদিন পর পাকসেনাদের একটি টললদারী দল চৌদ্দগ্রাম থেকে সাড়ে চার মাইল। দক্ষিণে আমাদের বাজারের নিকট আমাদের সৈন্যদের এ্যামবুমে পড়ে যায়। ফলে ৮ জন পাকসেনা নিহত হয়। ১৮ ই অক্টোবর সন্ধ্যা ৫-৩০ এর সময় আমাদের একটি শক্তিলালী দল মর্টার এবং আর আর -এরস সহায়তায় পাকসেনাদের বডিসা ঘাঁটির উপর আক্রমণ চালায়। প্রায় দেড় ঘন্টার এই যুদ্ধে ২০ জন পাকসেনা হতাহত হয়। বাডিসা ঘাটের আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে পাকসেনাদের রাজাসার দীঘির অবস্থানের উপরও আক্রমণ চালানো হয়। এই আক্রমণের ফলে প্রায় ৬ জন নিহত এবং বেশ কা'টি বাঙ্কার আমাদের সৈন্যরা ধ্বংস করে দিতে সমর্থ হয়। আমাদের একটি ছোট দল আরিউরার নিকটি রাস্তায় মাইন পুঁতে রাখে। পাকসেনারা বাডিসা এবং রাজাসার দীঘি আক্রমণের সংবাদ পেয়ে ৪/৫ গাড়ী ভর্তি সৈন্য নিয়ে সাহায্যের জন্য সেদিকে অগ্রসর হয়। পথে পুঁতে রাখা মাইন বিস্ফোরণে একটি ট্রাক ও একটি জীপ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়। ফলে ১৮ জন পাকসেনা নিহত এবং ২ জন অফিসার সহ ৫ জন আহত হয়। এই এলাকাতে সর্বত্র আমাদের আক্রমণের তীব্রতার দরুন পাকসেনারা নাজেহাল হয়ে যায়। ফলে এই্ লোকায় পুনঃ প্রাধান্য ফিরে পাবার আশায় ২০ শে অক্টোবর বিকেল চারটার সময় তাদের একটি শক্তিশালী দল হরিসর্দার ঘাঁটি থেকে

আমাদের অবস্থানের দিকে অগ্রসর হয়। এই দলটি কামানের প্রায় দুই ঘন্টা ধরে অমাদের অবস্থানের উপর আক্রমণ চালায়। আমাদের সৈনিকরা ৩ মর্টার এবং হালকা মেশিনগানের সাহায্যে পাকসেনাদের প্রচণ্ড আক্রমনে প্রতিহত করে।আমাদের গোলাগুলিতে অনেক পাকসেনা হতাহত হয়। পাকসেনারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পিছু হটে যেতে বাধ্য হয়। এই এলাকা থেকে আমাদের বিতাড়িত করার উদ্দেশে সেই সাথে বিফল হয়ে যায়।

আগস্ট মাসের প্রথম দিকে নোয়াখালী এলাকায় আমাদের গেরিলাদেও শক্তি বৃদ্ধি পায়। অনেক গেরিলাকে প্রশিক্ষণ দিয়ে নিজ নিজ এলাকাতে পাঠানো হয়। সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রনের জন্য নোয়াখালী জেলাকে চারটি ভাগে বিভক্ত করে বেঙ্গল রেজিমেন্টের চারজন সুবেদারকে এইসব এলাকায় গেরিলা এবং নিয়মিত বাহীনির সৈনিকদের তত্ত্বাবধানের ভার দেয়া হয়। সোনাইমুড়ি, ফরিদগঞ্জ এলাকার ভার সুবেদার আলী আকবর পাটোয়ারী, নোয়াখালী সদরের ভার সুবেদার লুৎফর রহমান, দক্ষিণ ফেনীর ভার সুবেদার জববার এবং লক্ষ্মীপুর ও রামগতির ভার অন্য আরেকজন সুবেদার প্রতি আরোপিত হয়। এলাকা বিভক্তে ও পর স্থানীয় কমাণ্ডাররা পর সম্মিলিত গেরিলা ও নিয়মিত বাহিনীর পূর্ণ সহযোগীতায় তাদের তৎপরতা বৃদ্ধি করে। সুবেদার আলী আকবর পাটোয়ারীর নেতৃত্বে আগস্ট মাসের শেষের দিকে ফরিদগঞ্জ থানার রাওয়াল নামক গ্রামে পাকসেনাদের একটি দলকে অতর্কিত আক্রমন করে ১২জন পাকসেনাকে নিহত এবং ১০ জনকে আহত করে। আমাদের একজন মুক্তিযোদ্ধাও শহীদ হয়। সুবেদার লুৎফর রহমানের নেতৃত্বে আমাদের আরেকটি গেরিলা দল গুনবতী ও সরিষাদী রেলস্টেশনে আক্রমন চালিয়ে প্রায় ৩২জন পাকসেনা ও রাজাকারকে হতাহত করে। সোনাইমুড়ির উত্তরে কাদের বাজারের নিকট পাকসেনাদের ১০টি দলকে এ্যামবুশ করে ৩ জনকে নিহত ও ১০জনকে আহত করে নেয়। পাকিস্তানী রেঞ্জার ও রাজাকাররা রায়পুরের নিকট এলএম হাইস্কুলে একটি শিবির স্থাপন করে। ৬ই আগস্ট সন্ধ্যার সময় আমাদের একটি গেরিলা দল শত্রুদের এই ঘাঁটির উপর অতর্কিত আক্রমন করে। ফলে ৯জন রেঞ্জার হতাহত হয়। আমাদের এক জন আহত হয়। এর দুদিন পর আমাদের আরেকটি গেরিলা দল পাকসেনা ও রাজাকারদের একটি দলকে লক্ষ্মীপুর থানার দালাল বাজারে এ্যামবুশ করে ১৫ জন শত্রুসেনাকে হতাহত করে। ১৪ই আগস্ট কোম্পানীগঞ্জ থানায় বসুরহাটের নিকট পাক মিলিশিয়াদের এ্যামবুশ করে প্রায় ৩০জনকে হতাহত করে। তারা একটি টয়োটা জীপও ধ্বংস করে দেয়। সংঘর্ষে আমাদের একজন সিপাই নুরুন্নবী মারাত্নকভাবে আহত হয়। পাকসেনারা ৩০টি অটোমেটিক এমজি এর সাহায্যে গোলাগুলি চালায়। ১৮ই আগস্ট রামগঞ্জ থানার সেকেন্ড অফিসার এবং কয়েকজন দালালকে পাকসেনাদের ক্যাম্পে যাবার পথে নিহত করে।

পাক পুলিশ এবং রাজাকাররা লক্ষ্মীপুর থানার চন্দ্রগঞ্জ প্রতাপ হাইস্কুলে একটি ঘাঁটি তৈরি করে। ১৫ তারিখ রাত ১১টার সময় আমাদের সৈনিকরা এই ঘাঁটি আক্রমণ করে প্রায় ৪০জন পাকসেনাকে হতাহত করে। এবং সেখান হতে তাদের তাড়িয়ে দেয়। ১৬ই আগস্ট সোনাইমুড়ি রেলস্টেশনে নিকট বগাদিয়া রেলসেতু গেরিলারা উড়িয়ে দেয়। আমাদের গেরিলাদের এইসব তৎপরতায় পাকসেনারা আরো ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠে। পাকসেনাদের একটি শক্তিশালী দল বেগমগঞ্জ থানার সোনাপুর ও গোপালপুরের নিকট দালালদের কাছে আমাদের ঘাটির খবর জেনে ৩০শে আগস্ট সকালে আক্রমণের জন্য অগ্রসর হয়। পাকসেনাদের এই আক্রমণকে আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা বীরত্বের সাথে প্রতিহত করে। প্রায় ৩/4 ঘন্টা যুদ্ধের পর পাকসেনাদের ৪০ জন নিহত হয়। আমাদের সেনাদের প্রচণ্ড পাল্টা আক্রমনের মুখে টিকতে না পেরে তারা তাদের মৃতদেহগুলো ফেলেই পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। এই যুদ্ধে আমাদের সৈনিকরা ২০টি অস্ত্র দখল করে। আমাদের একজন সিপাহী শহীদ হয়। এই ঘটনার দু দিন পর আমাদের সৈনিকরা মাইন পুঁতে সোনাইমুড়ির নিকট বানোয়াইতে পাকসেনাদের একটি গাড়ী ধ্বংস করে। ফলে ১ জন পাকসেনা নিহত ও ৮ জন মারাত্মকভাবে আহত হয়।

সেপ্টেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে পাকসেনা ও রাজাকারদের একটি দল রামগঞ্জে নিকট তাদের ঘাঁটি স্থাপন করে। সুবেদার আলী আকবর পাটোয়ারীর নেতৃত্বাধীনে ২০শে সেপ্টেম্বর আমাদের একটি মুক্তিযোদ্ধা দল এই ঘাঁটির উপর আক্রমন চালায়। প্রায় দু ঘন্টা যুদ্ধে ১৪ জন পাকসেনা নিহত ও ১৭ জন আহত হয়। এর ৩ দিন পর ২৬শে সেপ্টেম্বর সকালে ২৫০ সদস্যবিশিষ্ট পাকসেনা ও রাজাকারদের একটি দল রামগঞ্জ বাজারের দিকে

অগ্রসর হচ্ছিল। আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের ৫০ সদস্যের একটি দল এই খবর পেয়ে রাজগঞ্জ বাজারের পূর্ব দিকে পাকসেনাদের জন্য একটি এ্যামবুশ পেতে রাখে। পাকসেনারা অগ্রসর হবার পথে এই এ্যামবুশে পড়ে য়ায়। ফলে ২০জন পাকসেনা ও রাজাকার নিহত ও ২৭ জন আহত হয়। আহত পাকসেনা ও রাজাকারদের মাইজদী বেসামরিক হাসপাতালে ভর্তি করে। ২৫শে সেম্পেম্বর আরো দুজন আহত পাকসেনা হাসপাতালে মারা যায়।

আমাদের অপর একটি গেরিলা দল লৌহজং থানার নিকট পদ্মানদীতে ১৮ হাজার মণ পাটসহ কয়েকটি নৌকা ডুবিয়ে দেয়। এই পাটগুলো নারায়ণগঞ্জের বিভিন্ন পাট কলে ব্যবহারের জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। ফেনীর নিকট বারদিন সেতুটি ধ্বংস করে দেয়া হয়। ফলে ফেনী ও কুমিল্লার মাঝে রাস্তার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

রাজাকারসহ পাকসেনাদের একটি দল রামগঞ্জ থেকে লক্ষ্মীপুরের রাস্তায় ১০টি গাড়ীতে ১৯শে সেপ্টেম্বর অগ্রসর হচ্ছিল। এই সংবাদ পেয়ে আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা সুবেদার আলী আকবর পাটোয়ারীর নেতৃত্বে মীরগঞ্জ এবং ফজলচাঁদ হাটের নিকট পাকসেনাদের কনভয়টিকে অর্তকিত আক্রমন চালায়। এই আকস্মিক আক্রমণের ফলে পাকসেনারা মারাত্নকভাবে ভীতসন্তস্ত হয়ে ওঠে। পাকসেনারাও গাড়ী থেকে নীচে নেমে আক্রমণ প্রতিহত করার চেষ্টা করে। উভয় পক্ষের মধ্যে সকাল ৯টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত প্রচণ্ড যুদ্ধ চলতে থাকে। এই প্রচণ্ড যুদ্ধের ফলে আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের এবং স্থানীয় জনসাধারনের মনোবল আরো সুদৃঢ় হয়। অপর পক্ষে পাকসেনাদের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। আমাদের ৬০ সদস্যর একটি গেরিলা দল ১লা অক্টোবর রায়পুরে অবস্থিত রাজাকার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উপর আক্রমণ চালিয়ে ৪০জন রাজাকারকে নিহত করে। ১০ই অক্টোবর পাকিস্তানীদের একটি রেঞ্জার দলের লক্ষ্মীপুর থেকে রামগঞ্জ যাবার পথে আমাদের গেরিলারা অর্তকিত আক্রমণ চালিয়ে রেঞ্জারদের একটি গাড়ী সম্পূর্ণ ধ্বংস করে। এতে একজন রেঞ্জার নিহত হয়। এর একদিন পর পাকিস্তানীদের একটি দল সোনাইমুড়িতে তাদের গাড়ীতে আরোহণ করার সময় সুবেদার লুৎফর রহমানের নেতৃত্বে আমাদের একটি গেরিলা দল তাদের উপর আক্রমণ চালায়। প্রায় দেড়ঘন্টা গোলাগুলির পর ৬ জন পাক সেনা নিহত হয় ও ৩ জন আহত হয়। অবশিষ্ট পাকসেনারা সোনাইমুড়ি থেকে পালিয়ে যায়। ১২ই অক্টোম্বর আমাদের গেরিলারা ফেনী থানার অন্তর্গত লেমুয়ার একজন কুখ্যাত দালালকে হত্যা করে। এই সংবাদ পেয়ে পরদিন সকালে পাকিস্তানীদের একটি শক্তিশালী দল ওই এলাকায় আসে। এবং স্থানীয় জনসাধারণের উপর নৃশংস অত্যাচার শুরু করে। আমাদের ঐ এলাকার গেরিলারা পাকসেনাদের এই অত্যাচার বন্ধ করার জন্য প্রায় ৫০জন একত্রিত হয়ে পাকসেনাদের উপর আক্রমণ চালায়। চারঘন্টা যুদ্ধের পর পাকসেনারা পলায়ন করে আত্নরক্ষা করে। প্রায় ৭জন পাকসেনা ঐ যুদ্ধে গুরুতররুপে আহত হয়। বেশকিছু অস্ত্রশস্ত্র আমাদের দখলে আসে।

জুলাই এবং আগস্ট মাসে আমাদের হেডকোয়ার্টার থেকে কয়েকশ গেরিলা ট্রেনিংপ্রাপ্ত হয়ে অপারেশনের জন্য তৈরী হয়। এইসব গেরিলাদের বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে ফরিদপুর সদর এবং মাদারীপুর মহকুমার বিভিন্ন থানায় অপারেশনের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। এইসব দল গুলোকে নবীনগর, দাউদকান্দি হয়ে নদী পথে তাদের নিজস্ব জায়গাতে পাঠানো হয়। ৩/৪ হাজার গেরিলা ছোটছোট দলে গ্রাম্যপথে এবং নদী পথে পাকসেনাদের প্রতিরক্ষা ব্যূহে অনুপ্রবেশ করে তাদের নিজ নিজ গন্তব্যস্থলে পৌছাতে সক্ষম হয়। শুধু একটি দল যাওয়ার পথে হোমনার নিকট পাকসেনাদের দ্বারা আক্তান্ত হয়। পাকসেনাদের গুলিতে একটি নৌকা ডুবে যায়। ফলে ৪ জন গেরিলা শহীদ হয় এবং ৪জন আহত হয়। ৩টি স্টেনগান ও ৫টি রাইফেল পানিতে পড়ে ডুবে যায়। নিজ নিজ জায়গায় পৌছে গেরিলা দলগুলো তাদের তৎপরতা বাড়িয়ে দেয়। এই সময় পাকসেনারা ফরিদপুর হয়ে বরিশালের রাস্তায় যাতায়াত করতো। সেপ্টেম্বরে মাদারীপুরের একটি গেরিলা দল ভুরঘাটার নিকট একটি সড়ক সেতুতে আক্রমণ চালিয়ে সেতুটি উড়িয়ে দেয়। ফলে পাকসেনাদের বরিশাল যাতায়াতের রাস্তায় অসুবিধা সৃষ্টি হয়। এরপর গেরিলাদের আরেকটি দল নড়িয়া থানা আক্রমণ করে। সেই সঙ্গে ডাকঘর ও রেজিস্ট্রি অফিস জ্বালিয়ে দেয়। ১,৫০০মণ পাটও তারা পুড়িয়ে দেয়। সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে গেরিলারা ভেদরগঞ্জ থানা

আক্রমণ করে সকল পশ্চিম পাক পুলিশকে নিহত করে। সেখানকার রেজিস্ট্রি অফিস, পোস্ট অফিস, কালেক্টরেট অফিস ইত্যাদি বন্ধ করে দেয়। এর পর কিছুদিনের মধ্যেই গেরিলারা পালং থানার রাজগঞ্জ এবং কোটালীপাড়ায় আক্রমণ চালিয়ে সমস্ত সরকারী অফিস ধ্বংস করে দেয় এবং সংগে সংগে প্রায় ৪ হাজার মণ পাট জ্বালিয়ে দেয়। পরের সপ্তাহে গেরিলাদের একটি শক্তিশালী দল জাজিরা থানার রাজস্ব অফিস এবং রেজিস্ট্রি অফিস বন্ধ করে দেয় মাদারীপুরের অন্যান্য থানা আক্রমণ হওয়ার ফলে পাকসেনারা নড়িয়া থানাতে তাদের শক্তি বৃদ্ধি করে। এই থানার পাকসেনা ও পুলিশরা নিকটস্থ গ্রামে তাদের অকথ্য অত্যাচার চালায়। স্থানীয় গেরিলারা এই থানাটির শক্তি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ খবরাখবর সংগ্রহ করে। ৬ই নসেপ্টেম্বর ৫০জনের একটি গেরিলা দল রাত ৮টার সময় এই থানার উপর অতর্কিত আক্রমণ চালায়। পাকসেনা ও পুলিশরা সব শক্তি দিয়ে থানাকে রক্ষা করার আপ্রাণ চেষ্টা করে। প্রায় তিন ঘন্টা যুদ্ধের পর আমাদের গেরিলারা থানাটি দখল করে নিতে সমর্থ হয়। প্রায় ১৭ জন পাকসেনা ও পুলিশ নিহত হয় এবং বাকীরা পালিয়ে আত্মরক্ষা করে। থানার দারোগাও এতে নিহত হয়। থানা থেকে ৩০টি রাইফেল এবং একটি বেতারযন্ত গেরিলাদের হস্তগত হয়। গেরিলারা থানাটিকে ধ্বংস করে দেয়। গেরিলাদের আরেকটি দল ঝিকরকাঠির নিকট বরিশাল- ফরিদপুর টেলিফোন লাইনের ৬শ' গজ তার নষ্ট করে দেয়। টেলিগ্রাফ বিভাগের টেকনিশিয়ানরা পাকসেনাদের পাহাড়ায় টেলিফোন লাইনটি মেরামত করতে আসার পথে গেরিলাদের বসানো মাইন বিস্ফোরনে তাদের জীপটি ধ্বংস হয়ে যায়। পাকসেনাদের আরেকটি টহলদার দল মাদারীপুরের হাওলাদার জুট মিলের নিকট গেরিলাদের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার চারজন পাকসেনা নিহত হয়। গেরিলারা মাদারীপুরের নিকট ঘাটমাঝিতে প্রায় ৩০/৪০ গজ রাস্তা কেঠে সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়। মাদারীপুরের চরমুগরিয়ায় সরকারী পাটগুদামে আগুন লাগিয়ে প্রায় ৫০ হাজার মণ জ্বালিয়ে দেয়া হয়। মাদারীপুর-ফরিদপুর রাস্তায় সমাদ্দার ফেরীঘাটে একটি ফেরী অগ্নিসংযোগে জ্বালিয়ে দেয়া হয়। একটি মটর লঞ্চও ধ্বংস করা হয়। এই মটর লঞ্চটি পাকসেনারা টহল দেয়ার কাজে ব্যবহার করতো। আমাদের গেরিলাদের এইসব ব্যাপক তৎপরতায় পাকসেনারা অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। ৬ই সেপ্টেম্বর পাকসেনাদের একটি শক্তিশালী দল লঞ্চে মাদারীপুরের দিকে তৎপরতা আরো জোরদার করার জন্য অগ্রসর হয়। এই খবর আমাদের গেরিলারা আগেই পেয়ে যায়। ২০জনের একটি নগেরিরা দল পলং থানার রাজগঞ্জে নিকট নদীর তীরে পাকসেনাদের জন্য এম্যাবুশ পেতে বসে থাকে। সকাল ১০টার সময় লঞ্চটি আমাদের গেরিলা দলের এ্যামবুশর আওতায় এলে তৎক্ষণাৎ গেরিলারা তাদের উপর আক্রমণ চালায়। ফলে১০/১২ জন পাকসেনা নিহত এবং বেশকিছু আহত হয়। উপায়ান্তর না দেখে পাক সেনাদের লঞ্চটি শেষ পর্যন্ত পালিয়ে যায়। এর কয়েকদিন পর পাকসেনারা আরো অধিক সৈন্য ফরিদপুর থেকে পালং থানায় মোতায়েন করে। ঐ এলাকার গেরিলারা পাকসেনাদের পালং থানার ঘাঁটির পুনদর্খলের পরিকল্পনা নেয়। গেরিলারা সঠিক সংবাদ নেয়ার পর জানতে পায় যে, থানাতে প্রায় এক প্লাটুন পাকসেনা ও ৫০/৬০ জন পাকপুলিশ এবং রাজাকার রয়েছে। প্রায় ২/৩ শ' গেরিলা একত্রিত হয়ে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী ২১শে সেপ্টেম্বর রাত ১১টায় পলিং থানার উপর অতর্কিত আক্রমণ চালায়। প্রায় চারঘন্টা সম্মুখযুদ্ধের পর ওই ঘাঁটি থেকে অনেকসংখ্যক পাকসেনা উপায়ন্তর না দেখে পালিয়ে যায়। গেরিলারা যুদ্ধে ৫০ জন পাকসেনা, রাজাকার ও পাকপুলিশকে নিহত করে। এর পর সম্পূর্ণ এরাকাটি আমাদের গেরিলদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে।

কুমিল্লার উত্তরে ৪র্থ বেঙ্গলের 'সি' কোম্পানী ক্যাপ্টেন গাফফারের নেতৃত্বে এবং 'এ' কোম্পানী মেজর সালেক ও মেজর আইনউদ্দিনের নেতৃত্বে মন্দভাগ ও শালদানদী এলাকার পাকসেনাদের উপর তাদের চাপ অব্যাহত রাখে। ফলে পাকসেনারা মন্দভাগ বাজার, লক্ষ্মীপুর ও সাইতসালা প্রভৃতি জায়গা সম্পূন রুপে পরিত্যগ করে চান্দলা, পানছড়া ও সেনেরহাট ইত্যাদি জায়গায় তাদের ঘাঁটি পিছিয়ে নিতে বাধ্য হয়। পাকসেনারা পুনরায় তাদের পূর্বোক্ত অবস্থানগুলি দখল করার আপ্রাণ চেষ্টা করে। কিন্তু আমাদের সৈনিকদের সুদৃঢ় প্রতিরক্ষার সামনে তাদের চেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। তাদের সঙ্গে যখন আমাদের সৈনিকদের সম্মুখযুদ্ধ তীব্রভাবে চলছিল সেই সময় আমাদের গেরিলারাও পাকসেনাদের পশ্চাদে তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছিল। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নিকট বিদ্যাকোটে আমাদের গেরিলাদের একটি দল পাকসেনাদের একটি টহলদার কোম্পানীকে এ্যামবুশ করে একজন

অফিসারসহ ৫০ জন পাকসেনাকে নিহত করে। তাদের চারটি নৌকাও ডুবিয়ে দেয়। গোসাইরহাট রেলস্টেশনের নিকট একটি রেলইঞ্জিন মাইন দিয়ে উড়িয়ে দেয়। এসব সংঘর্ষে আমাদের গেরিলারা অনেক অস্ত্রশসস্ত্র দখল করে। অক্টোবর মাসেন প্রথম সপ্তাহে পাকসেনারা কসবার পশ্চিমে প্রায় দুই কোম্পানী সৈন্য সমাবেশ করে। পাক সমাবেশ আমরা বুঝতে পারি যে, কসবাকে পুর্ণদখল করার জন্য তারা পরিকল্পনা নিয়েছে।আমরা তাদের সম্ভাব্য আক্রমণের মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুতি নেই। আমি আমাদের কসবা অবস্থানের সাহায্যর্থে আমাদের প্রথম গোলন্দাজ ব্যটারীকে অনুরুপভাবে মোতায়েন করি।

১৩ ই অক্টোবর সন্ধ্যা ৫-৩০ টায় পাকসেনারা গোলমদাজ বাহিনীর সহায়তায় আমাদের অবস্থানের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। ৪র্থ বেঙ্গলের 'ডি' কোম্পানী বিপুল সাহস ও দৃঢ় আস্থার সঙ্গে এই আক্রমণের মোকাবিলা করে।প্রায় একঘন্টা যুদ্ধের পর গোলন্দাজ বাহিনীর সহায়তায় তীব্র পাল্টা আক্রমণের মুখে পাকসেনারা টিকতে না পেরে পিছু হটে যেতে বাধ্য হয়। যুদ্ধে প্রায় ৪৫ জন পাকসেনা হতাহত হয়। ১৫টি জি ও রাইফেল, একটি ৩'' মর্টার এবং ৩৫০০টি ৭.৬২ গুলি ও ৮টি ৩'' মর্টারের গোলা আমাদের হস্তগত হয়। এছাড়াও ন'টি বাঙ্কার ধ্বংস করা হয়। এই প্রচণ্ড সংঘর্ষে আমাদের দু'জন শহীদ হয় এবং একজন আহত হয়। পরে জানা যায় যে, পাকসেনারা এই আক্রমণে পঞ্চম পাঞ্জাব রেজিমেন্টের সৈন্য নিয়োগ করেছিল। পরদিন পাকসেনারা যখন কসবার পশ্চিম দিক থেকে আরো পিছু হটে যাচ্ছিল ঠিক সেই সময় আমাদের একটি প্লাটুন তাদের একটি দলকে এ্যামবুশ করে। এ্যামবুশে প্রায় ১৫ জন পাকসেনা এবং ১৫জন রাজাকার নিহত হয়। আমাদের দু'জন সৈনিক শহীদ এবং একজন আহত হয়। আমাদের একটি হালকা মেশিনগান বিনষ্ট হয়।

এই সময় পাকসেনারা তাদের অগ্রবর্তী ঘাঁটগুলিতে লঞ্চ ও নৌকার সাহায্যে রসদ সরবরাহ করতো। নদীপথে জলযান বন্ধ করে দেয়ার জন্য আমি একটি গেরিলা দলকে বাঞ্জারাম থানার উজানচরের নিকট বিদ্যুৎ সরবরাহকারী পাইলনগুলো কেটে নদীতে ফেলে নদীপথে বাধা সৃষ্টি করার নির্দেশমত আমাদের গেরিলা দল বৈদ্যুতিক পাইলনগুলি কেটে নদীতে ফেলে দিয়ে একটু ডুরে এ্যামবুশ পেতে অপেক্ষা করতে থাকে। পাইলন কাটার সংবাদ পেয়ে ৩/৪টি লঞ্চভর্তি পাকসেনা, মুজাহিদ ও রাজাকার নদীপথের এই বাধাগুলো পরিস্কার করার জন্য আসে। পাকসেনারা যখন কজে লেগে যায় ঠিক এমন অদুরেই এ্যামবুশ পেতে অবস্থানরত আমাদের গেরিলারা তাদের উপর অতর্কিত আক্রমণ চালায়। ফলে প্রায় ৭০/৮০ জন পাকসেনা, মুজাহিদ এবং রাজাকার নিহত হয়। গেরিলাদের প্রচণ্ড গোলার মুখে অবশিষ্ট পাকসেনা লঞ্চ নিয়ে পালিয়ে আত্যরক্ষা করে।এই বিপর্যয়ের কয়েকদিন পর পাকসেনারা প্রতিশোধ নেয়ার জন্য ৫/৬ টি লঞ্চে বিপুলসংখ্যক সৈন্য বিমান বাহিনীর সহায়তায় আমাদের উজানচরের ঘাঁটির উপর আক্রমণ চালায়। আমাদের সৈনিকরা শুধু হালকা মেশিনগান, রাইফেল ও এস এল আর নিয়ে পাকসেনাদের এই বিপুল শক্তির বিরুদ্ধে সাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধ চালায়। কিন্তু বিমান হামলার বিরুদ্ধে টিকতে না পেরে অবশেষে অবস্থানটি পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়। এর তিনদিন পর ১১ই অক্টোবর বিকাল চারটায় আমাদের এই দলটি জানতে পারে যে, পাকসেনাদের একটি প্লাটুন লঞ্চযোগে বাঞ্ছারাম থানার আসাদনগর এলাকা লুট করার জন্য অগ্রসর হচ্ছে। এই খবর পেয়ে আমাদের গেরিলা দলটি পাকসেনাদের লঞ্চটিকে আসাদনগরে এ্যামবুশ করে। এ্যামবুশে ৮জন পাকসেনা নিহত হয় এবং অন্যরা পলায়ন করে প্রাণ বাচায়। আমাদের আরেকটি দল হোমনায় তাদের ওবেইস তৈরী করে। এই সময় হোমনা থানাতে পাকসেনারা পশ্চিম পাক পুলিশ মোতায়েন করে। আমাদের গেরিলা দলটি হোমনা থানাতে অতর্কিত আক্রমণ চালায়ে ৭জন পাকপুলিশকে নিহত করে এবং রাইফেল ও কয়েকশ রাউন্ড গুলি দখল করে নেয়।

পাকসেনারা কসবাতে বিপর্যস্ত হওয়ার পর কুমিল্লা থেকে চান্দলার নিকট সৈন্য সমাবেশ করে। পাকসেনাদের এই সমাবেশের মুল কারণ ছিল মন্দভাগকে পুনর্দখল করা। ৪র্থ বেঙ্গলের 'সি' কোম্পানী এই সময় মন্দভাগের প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত ছিল। ১৮ তারিখ রাত সাড়ে তিনটায় পাকসেনারা প্রায় এক কোম্পানী

শক্তি নিয়ে আমাদের প্রতিরক্ষার উপর আক্রমণ চালাতে শুরু করে। প্রায় তিনঘন্টা যুদ্ধের পর সকাল সাড়ে ছ'টা পর্যন্ত আমাদের সৈনিকরা এই আক্রমণকে প্রতিহত করতে সক্ষম হয়। পাকসেনারা প্রতিহত হয়ে আমাদের রক্ষাব্যূহের সামনে থেকে গোলাগুলি চালাতে থাকে। বেলা দশটার সময় পাকসেনারা আরো দু কোম্পানী সৈন্য নিয়ে দু'বার আক্রমণ চালায়। পাকসেনাদের এই শক্তিশালী দলগুলো গোলন্দাজ বাহিনীর সহায়তায় প্রবল বাধার মাঝেও সামনে অগ্রসর হতে থাকে। অগ্রসর হওয়ার সময় আমাদের সৈনিকদের গুলিতে তাদের অনেক হতাহত হয়। অবশেষে পাকসেনারা আমাদের প্রতিরক্ষব্যূহ ভেদ করতে সক্ষম হয়। প্রায় দু'ঘন্টা যাবৎ হাতাহাতি যুদ্ধে আমাদের দুর্ধর্ষ সৈনিকরা আমাদের প্রতিরক্ষাব্যূহে প্রবেশকারী পাকসেনাদেরকে সাফল্যের সঙ্গে সম্পুর্ণরুপে পর্যদস্ত করতে সক্ষম হয়। পাকসেনারা তাদের মৃতদেহ ফেলে রেখেই পলায়ন করতে বাধ্য হয়। আমাদের প্রতিরক্ষাব্যূহের চতুর্দিকস্থ কর্দমাক্ত নিম্ন জলাভূমি দিয়ে পালাবার পথে তারা আরো অধিকভাবে বিপর্যয়ের সন্মুখীন হয়। আমাদের সৈন্যরা এই যুদ্ধে ৩৩ তম বেলুচ রেজিমেন্টের সেকেন্ড লেঃ পারভেজ খানসহ ৮জন পাকসেনাকে বন্দী করে। এছাড়া একজন অফিসারসহ ৫০জন পাকসেনা নিহত হয়। ৬টি এমজিআইএ -৩, কুড়িটি ৭৩৬২ চায়না রাইফেল, চারটি জি-৩ রাইফেল, একটি মর্টার, একটি হালকা পিস্তল, পাঁচটি সাবমিশিনগান, ১৫ বাক্স মেশিনগানের গুলি, ৩১টি ৯৪-এলাগা গ্রেনেড, ২০টি ৩৬-এইচই গ্রেনেড, ১০টি এমএম বোমা, অনেকগুলো বেয়োনেট, বেশকিছু জি-৩ রাইফেল ম্যাগজিন, ১৫টি বিভিন্ন দলিলপত্রসহ বেশকিছু ফাইল আমাদের সৈন্যরা দখল করে নেয়। এই প্রচণ্ড যুদ্ধে আমাদের পাঁচজন সৈনিক গুরুতরভাবে আহত হয়, কেউ শহীদ হয়নি। তাদের এই বিপুল বিপর্যয়ের ফলে পর্যুদস্ত দিশেহারা পাকবাহিনী এফ -৮৬ জঙ্গীবিমান দিয়ে আমাদের অবস্থানে প্রায় ৪৫ মিনিটকাল ধরে মারাত্বকভাবে হামলা চালায়। পাকসেনার গোলন্দাজ ইউনিটর ভারী কামানের সাহায্যে শত শত গোলাবর্ষণ করতে থাকে। আমাদের এই অবস্থানটি দখল করতে না পেরে পাকসেনারা কিছু পিছনে গিয়ে পুনরায় আক্রমণের প্রস্তুতি নিতে থাকে। ২০শে অক্টোবর পাকসেনাদের একটি শক্তিশালী দল সকাল থেকে কামালপুরের নিকট আমাদের আরেকটি অবস্থানের উপর গোলন্দাজ বাহিনীর সহায়তায় আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণেও তারা আমাদের শক্তিশালী প্রতিরক্ষাব্যূহে ভেদ করতে না পেরে বিফল হয়। পাকিস্তানীদের একজন অফিসারসহ ৩০জন সৈনিক নিহত হয়। বার বার ব্যর্থ হওয়ায় পাকবাহিনী দিশেহারা হয়ে পড়ে। পাকসেনারা ৩/৪দিন ধরে আমাদের অবস্থান গুলোর দুর্বলতা সম্পর্কে অনসন্ধান চালায়। ২৫ তারিখ অপরাহ্ন ৩-৫মিনিট থেকে মন্দভাগ, মঙ্গলপুর ও শ্রীপুরস্থ আমাদের অবস্থানগুলোর উপর বিকাল ৪-১০ পর্যন্ত চারটি এফ -৮৬ জঙ্গীবিমান প্রবলভাবে হামলা চালায় এবং একই সঙ্গে গোলন্দাজ বাহিনীর সহায়তায় পাকসৈনিকরাও এইসব অবস্থানগুলোর উপর প্রবল আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণ সন্ধ্যা ৬-৩০টা পর্যন্ত চলতে থাকে।আমাদের সৈনিকরাও মনোবল না হারিয়ে পাকসেনাদের এই সম্মিলিত আক্রমণকে দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিহত করে। সংঘর্ষে পাকসেনাদেরও প্রায় ৫৮জন সৈনিক হতাহত হয়। ফলে তাদের আক্রমণ দুর্বল হয়ে পড়ে এবং বাধ্য হয়ে পিছু হটে যায়। যুদ্ধে আমাদের দু'জন সৈনিক শহীদ এবং ৯জন আহত হয়।

আমরা যখন মন্দভাগে পাকসেনাদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত এবং পাকসেনাদের প্রতিহত করার জন্য কসবার অবস্থান থেকে কিছুসংখ্যক সৈন্য মন্দভাগ নিয়ে মন্দভাগ অবস্থানকে শক্তিশালী করছিলাম ঠিক তখনই আমাদের কসবার অবস্থানের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে পাকসেনারা অগ্রসর হয়ে কসবার পুরোনো বাজার পর্যন্ত পুনর্দখল করে নেয়।

সেপ্টেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে আমার সেক্টরের সৈনিকদের পুনর্গঠনের নির্দেশ দেয়া হয়। নির্দেশ আসে কে-ফোর্স, গঠনের, আমি আগে থেকেই মনস্থ করেছিলাম যে, পাকসেনাদের উপর পুনঃ আক্রমণের পুর্বে আমার অধীনস্থ সৈনিকদের পুনর্গনের দরকার। গত ৪/৫ মাস ধরে অবিরাম যদ্ধে এবং জীবনধারনের নিতম প্রয়োজন আহারুনিদ্রা থেকে বঞ্চিত ও যুদ্ধে সামগ্রীর অপর্যাপ্ততা ইত্যাদি প্রবল প্রতিকুলতার দরুন তারা স্বাভাবিক কারনেই অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। সুতরাং পরবর্তী প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এছাড়া নতুন প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত সৈনিকদের

নিয়ে এবং ৪র্থ বেঙ্গলের পুরোনো ও অভিজ্ঞ সৈনিকদের নিয়ে আরো কয়েকটি ব্যটালিয়ন গঠন করার ইচ্ছা ছিল। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী আমি সাবসেক্টর কমাণ্ডারদের নিয়ে হেডকোয়ার্টার মেলাঘরে একটি কনফারেন্স করি। সে কনফারেন্স নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তগুলো গ্রহণ করা হয়ঃ-

(ক) ৪র্থ বেঙ্গল থেকে পুরোনো ও অভিজ্ঞ সৈনিক নিয়ে আরো দু'টি ব্যাটালিয়ন করা হবে।

(খ) ৪র্থ বেঙ্গলের 'সি' কোম্পানী ও হেডকোয়ার্টারের কিছু সৈনিক ৪র্থ বেঙ্গলেই থাকবে এবং তাদেরকে নিয়ে ৪র্থ বেঙ্গলকে পুনর্গঠন করা হবে। এই ব্যাটালিয়নটি পরিচালনার জন্য ক্যাপ্টেন গাফফারকে নিযুক্ত করা হল। এই ব্যাটালিয়নটি পুনর্গঠন এবং পুনর্বিন্যাসের জন্য কোনাবন বেইস এ একত্রিত করা হবে।

(গ) ৪র্থ বেঙ্গলের 'ডি' কোম্পানী এবং 'বি' কোম্পানীর কিছু সৈন্য নিয়ে নতুন করে ৯ম বেঙ্গল রেজিমেন্ট গঠন করা হবে। মেজর আইনউদ্দিনকে এই ব্যাটিলিয়নের অধিনায়ক নিযুক্ত করা হল। এই ব্যাটালিয়ানটিকে কসবা বেইসু-এ পুনর্গঠন ও পুনর্বিন্যাস করা হবে।

(ঘ) ৪র্থ বেঙ্গলের এ কোম্পানী এবং বি কোম্পানীর অবশিষ্ট সৈনিকদের নিয়ে ১০ম বেঙ্গল রেজিমেন্ট গঠন করা হবে। মেজর সালেককে এই ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক নিযুক্ত করা হল। মেজর সালেক এবং ৪র্থ বেঙ্গলের এ কোম্পানী শালদা নদীতে যুদ্ধে লিপ্ত থাকায় তাঁকে তাঁর সৈন্যসহ বেলুনিয়াতে যাবার নির্দেশ দেয়া হল। ১০ম বেঙ্গল রেজমিন্টকে বেলুনিয়া-রাজনগর বেইসু-এ পুনর্গঠন ও পুনর্বিন্যাস করা হবে।

(ঙ) ২নং সেক্টর অধিনস্ত সব যোদ্ধাদের তিন ভাগে বিভক্ত করা হবে। নবগঠিত ৪র্থ, ৯ম ও ১০ম রেজিমেন্ট কে নিয়ে কে ফোর্স নামে ব্রিগেড গঠন করা হলো।

(চ) নবগঠিত কে ব্রিগেডির আলাদা হেডকোর্য়াটার স্থাপন করে সেখানে স্টাফ অফিসার হিসেবে মেজর মতিন এবং ক্যাপ্টেন আনোয়ারুল আলমকে নিযুক্ত করা হল।

(ছ) গেরিলা হেডকোয়ার্টার মেলঘরেই রাখা হবে। মেজর হায়দার আমার অধীনে গেরিলা স্টাফ অফিসার নিযুক্ত হল।

(জ) ১৮টি সেক্টর কোম্পানী কোম্পানী হিসেবেই থাকবে এবং তারা কে ফোর্স হেডকোয়ার্টারের নির্দেশ মেনে চলবে।তাদেরকে সাধারণত কমাণ্ডো হিসেবে শত্রুপক্ষের পশ্চাৎভাগে (গভীরাভ্যন্তরে) ধ্বংসাত্তক তৎপরতা চালাবার কাজে নিয়োগ করা হবে।

(ঝ) গেরিলারা তাদের নিজ নিজ এলাকায় পাকসেনাদের নির্মুল করে নিজ নিজ এলাকা শত্রুমুক্ত করবে। পাকসেনাদের ছোট ছোট দলে বিচ্ছিন্ন করে তাদের শক্ত ঘাঁটিগুলিকে অনুরোধ করে আত্ন সমর্পণ করাতে বাধ্য করবে।

(ঞ) কে ফোর্স ব্রিগেডকে পাকসেনাদের শক্তিশালী ঘাঁটিগুলিকে দখল করার কাজে নিয়োগ করা হবে এবং উদ্ধারকৃত মুক্ত এলাকার প্রতিরক্ষার কাজে নিয়োজিত থাকবে।

(ট) অক্টোবর মাসের ১৪ তারিখের মধ্যেই কে ফোর্স পুনর্গঠনের কাজ শেষ করা হবে।

(ঠ) 'কে-ফোর্স পুনর্গঠনকালে পাকসেনারা যাতে তাদের হৃত মনোবল পুরুদ্ধার না করতে পারে এবং প্রাধান্য বিস্তার সক্ষম না হয় সেজন্য কোম্পানীগুলো এবং কমাণ্ডো প্লাটুনগুলো গেরিলাদের

সহায়তায় ৪র্থ বেঙ্গলের অপারেশন এলাকায় নিয়োজিত থেকে শূন্যতা পূরণ করবে এবং তাদের তৎপরতা অব্যাহত রাখবে।

(ড) অস্ত্র; গোলাবারুদ ও অন্যান্য যুদ্ধসরঞ্জাম যা কিছু আছে তা পুনরায় বিভিন্ন দলের মধ্যে সুষ্ঠুভাবে বন্টন করা হবে।

(ত) গোলন্দাজ বাহিনীর প্রথম ফিল্ড রেজিমেন্ট 'কে-ফোর্স-এর অধীনে নিযুক্ত করা হলো।

(ণ) 'কে-ফোর্স' এবং ২নং সেক্টরের অধিনায়কত্ব যৌথভাবে আমার অধীনে থাকবে। আমার অবর্তমানে এই দুটি বাহিনী বিভক্ত হবে। কে-ফোর্স-এর অধিনায়কত্ব করবেন মেজর সালেক ও ২নং সেক্টরের অধিনাকত্ব দায়িত্ব পালন করবেন।

কনফারেন্সের বর্ণিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২নং সেক্টরের পুনর্বিন্যাস ও পুনর্গঠনের কাজ শুরু করা হয়। নিয়মিত বাহিনীর 'কোর্স-ফোর্স' ব্রিগেড গঠন করার কাজে আমাদের যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। যেহেতু যুদ্ধসামগ্রীর যথেষ্ট অভাব ছিল বিশেষ করে অস্ত্রশস্ত্র; গোলাবারুদ ও পোশাকের; তবুও সংগঠনের কাজ মোটামুটি এগিয়ে চলে। সেপ্টম্বরের শেষের দিকে ৯ম বেঙ্গল রেজিমেন্ট কসবাতে; ৪র্থ বেঙ্গল রেজিমেন্ট শালদা নদীতে এবং ১০ম বেঙ্গল রেজিমেন্ট বেলুনিয়াতে সংগঠিত হয়ে পুনরায় যুদ্ধের জন্য তৈরী হয়ে যায়। যুদ্ধে পুনঃনিয়োগের আগে এইসব ইউনিটগুলোকে তিন সপ্তাহের জন্য ব্যাপকভাবে সমন্বিত প্রশিক্ষন দেয়া হয়। অক্টোবর মাসের মাঝামাঝিতে ৯ম বেঙ্গল ইউনিটকে পরীক্ষামূলকভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে পুনর্নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেই। এই সময়ে আমাদের সেক্টর ট্রুপস কসবা; মন্দভাগ প্রভৃতি এলাকায় পাকসেনাদের উপর মারাত্মকভাবে আঘাত হেনে চলছিল। ফলে পাকসেনারা এই এলাকায় ভীষণভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। আমি এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে তাদেরকে সম্পূর্নভাবে এই এলাকা থেকে বিতাড়িত করার সিদ্ধান্ত নেই। কসবার পূর্বাংশ ইতিমধ্যেই আমাদের নিয়ন্ত্রাধীন ছিল। পাকসেনারা সেখান থেকে পিছু হটে পূর্বেই পশ্চিমাংশে পুরানা বাজারের নিকট তাদের ঘাটি স্থাপন করেছিল। পাকসেনাদের এই ঘাটিটিও ৯ম বেঙ্গল রেজিমেন্টকে আক্রমণের নির্দেশ দেই। নির্দেশ অনুযায়ী মেজর আইনউদ্দিন তাঁর ব্যাটালিয়নকে লাটুমুড়ার পিছনে সমবেত করে এবং ২০শে অক্টোবর পর্যন্ত শত্রু অবস্থানের সমস্ত সংবাদ সংগ্রহ করে। শত্রু অবস্থানের তথ্য জানার পর বোঝা যায় যে; পাকসেনারা তাদের অবস্থানটি পূর্ব এবং দক্ষিনমুখী করে অধিক শক্তিশালী করে তুলেছে। আমি মেজর আইনউদ্দিনকে ৮ম বেঙ্গল রেজিমেন্টের দুই কোম্পানী দিয়ে উত্তর দিক থেকে পাক অবস্থানের উপর আক্রমন করার নির্দেশ দেই। শত্রুসেনারা মনোযোগ অন্যদিকে পরিবর্তন করার জন্য একটি কোম্পানী দিয়ে কসবার দিক থেকে অবস্থানের উপর চাপ সৃষ্টি করার নির্দেশ দেই। আরেকটি কোম্পানী রিজার্ভে থাকার আদেশ করি। ১ম ফিল্ড ব্যাটারীকে এই আক্রমণে সহায়তার জন্য মেজর আইনউদ্দিনের অধীনে দেই।

২২শে অক্টোবর ভোর সাড়ে পাঁচটার সময় পরিকল্পনা অনুযায়ী ৯ম রেজিমেন্ট পাকসেনাদের উপর আক্রমন চালায়। প্রায় ১০ মিনিট তীব্র কামানের গোলার আক্রমণের পর উত্তর দিক থেকে দুটি কোম্পানী লেঃ আজিজ ও সুবেদার মেজর শামসুল হকের নেতৃত্বে পাকসেনাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এই অতর্কিত আক্রমণের জন্য পাকসোরা প্রস্তুত ছিল না। প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে তাদের অবস্থানগুলো ভেঙ্গে পড়ে। তারা দিশেহারা হয়ে অবস্থান পরিত্যাগ করে পেছনের ককে পালিয়ে যায়। তিনঘণ্টা যুদ্ধের পর ৯ম রেজিমেন্ট পাকসেনাদের অবস্থানটি দখল করে নেয়। যুদ্ধে ২৬জন পাকসেনা নিহত ও ১৮জন আহত হয়। ১১টি এল-এম-জি ১টি পিস্তল সিগনাল; ৪০টি এইচই-৩৬ গ্রেনেড; ৩টি ৯৪-এনার্গা; ৪৪টি প্লাষ্টিক মাইন; ১টি ম্যাপ; ২টি র‍্যাঙ্কের'ব্যাজ' আমাদের হস্তগত হয়। এই যুদ্ধে আমাদের লেঃ আজিজ ও ৩ জন সৈনিক শহীদ হয় এবং '১৫জন আহত হয়। পাকনোদের একটি ছোট দল পিছনে হটে গিয়ে ছোট একটি নালার পশ্চিম তীরে পুনরায় দ্রুত অবস্থান গড়ে তোলার চেষ্টা করে। পরদিন ভোর ৪টায় সুবেদার মেজর শামসুল হকের কোম্পানী পাকসেনাদের এই অবস্থানের

উপর পুনরায় আক্রমণ চালায়। প্রচন্ড আক্রমণের ফলে প্রায় ২০ জন পাকসেনা নিহত ও ২২জন আহত হয়। বিপর্যস্ত হয়ে পাকসেনারা সম্পূর্নরুপে পশ্চাতে হটে যায়। এই আক্রমণের ফলে সম্পূর্ন কসবা আমাদের দখল আসে। পাকসেনারা পিছু হটে গিয়ে মইনপুর; কাশেপুর; কামালপুর; গুরগুইট প্রভৃতি জায়গায় তাদের নতুন অবস্থান তৈরি করে।

কসবা শত্রুমুক্ত করার পর ৯ম রেজিমেন্ট কৃশানপুর; বগাবাড়ি; ইয়াকুবপুর এলাকা জুড়ে তাদের নতুন প্রতিরক্ষা ব্যূহ তৈরি করে। এই অবস্থানগুলো থেকে পেট্রোল পার্টি ও শক্তিশালী রেইডিং পাটি পাক অবস্থানগুলোর উপর ক্রমাগত আক্রমণ চালিয়ে যেতে থাকে। ফলে ৭ই নভেম্বর পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানের সংঘর্ষে ২২জন পাকসেনা নিহত ও ৩০ জন আহম হয়।

৪র্থ রেজিমেন্ট কোনাবনে তাদের বেইস-এ পুনর্গঠিত হওয়ার পর অক্টোবর মাসে পুনরায় যুদ্ধের জন্য তৈরী হয়ে যায়। আমি এই ব্যাটালিয়নকে শালদা নদী থেকে পাকসেনাদের বিতাড়িত করার নির্দেশ দেই। শালদা এলাকার কমপ্লেক্স ট্যাকটিক্যাল একটি খারাপ এলাকা বলে তাদেরকে পুরো ব্যাটালিয়ন হিসাবে আক্রমন করার নির্দেশ প্রদানকরি। কোম্পানী এবং প্লাটুন-এ ভাগ হয়ে প্রথম তৎপরতা চালিয়ে এলাকার উপর পুরা আধিপত্য অর্জন করার নির্দেশ দেই। এই নির্দেশের পর ক্যাপ্টেন গাফফার তার মন্দভাগ অবস্থান থেকে শালদা নদীর পশ্চিমে ও উত্তরে ৪র্থ রেজিমেন্টের তৎপরতা বৃদ্ধি করে। অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি ৪র্থ রেজিমেন্টের একটি প্লাটুন কায়েমপুরের নিকট এ্যামবুশ পাতে। পাকসেনাদের প্রায় ৪০জন সৈনিক এই এ্যামবুশে আক্রান্ত হয়। ফলে ১৫ জন পাকসেনা নিহত এবং অনেক আহত হয়। এর ৩/৪ দিন পর ৪র্থ বেঙ্গলের আরেকটি রেইডিং পার্টি পাকসেনাদের চত্তরা অবস্থানের উপর অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে রকেট লাঞ্চার দ্বারা একটি বাঙ্কার উড়িয়ে দিয় এবং ১৫ জন পাকসেনাকে হতাহত করে। এর কিছুদিন পর নায়েব সুবেদার সিকদার আফজাল হোসেনের নেতৃত্বে ৪র্থ বেঙ্গলের একটি কোম্পানী পাকসেনাদের পেছনে অনুপ্রবেশ করে চাপিতলায় এ্যামবুশ পাতে। পরদিন ভোর চারটার সময় পাকসেনাদের দু'টি কোম্পানী তাদের অগ্রবর্তী ঘাঁটিগুলো শক্তিশালী করার জন্য অগ্রসর হচ্ছিলো। পাকসেনাদের এই দলটি ভোর পাঁচটায় আমাদের এ্যামবুশে এসে যায়। প্রায় চার ঘন্টা যুদ্ধ চলে। যুদ্ধে ৫০ জন পাকসেনা হতাহত হয়। এই আক্রমণের পরপরই পাকসেনারা আমাদের অবস্থানের উপর জঙ্গী বিমান দিয়ে ৯-৪৫মিঃ পর্যন্ত প্রচণ্ড আক্রমণ করে। আমাদের পক্ষে কোন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। ৪র্থ বেঙ্গল রেজিমেন্ট পাকসেনাদের কামালপুর; মইনপুর; লক্ষ্মীপুর অবস্থানগুলোর উপর তাদের চাপ আরো জোরদার করে তোলে। ১১ই নভেম্বর আমাদের একটি শক্তিশালী রেইডিং পার্টি পাকসেনাদের কামালপুরের অবস্থানের উপর অতর্কিত আক্রমণ চালায়। সাড়ে ৯টা থেকে ১২টা পর্যন্ত এই আক্রমণে পাকসেনদাদের ১৬ জন নিহত এবং ২২জন আহত হয়। এর পরদিন সকাল সাড়ে পাঁচটায় ৪র্থ বেঙ্গলের আরেকটি কোম্পানী লক্ষ্মীপুর এবং শালদা নদী ফেরী এলাকা আক্রমণ করে দখল করে নেয়। যুদ্ধে প্রায় ১০০জন পাকসেনা হতাহত হয়েছে বলে বিশ্বস্তসূত্রে জানা যায়। আমাদের একজন সৈনিক শহীদ ও সাতজন আহত হয়। শত্রুদের কাছ থেকে ১৫টি রাইফেল; ৩টি এল-এম-জি; ১২টি এল-এম-জি বাক্র দু'টি পিস্তল; একটি ৪০ এম-এম রকেট লাঞ্চার; ৭২টি ৬০টি এম-এম বোমা; ৩টি টেলিফোন সেট ৫টি অয়্যারলেস সেট ব্যাটারী; ১টি মেশিনগানের ব্যারেল এবং ৪টি ম্যাপসহ অনেক যুদ্ধ সরঞ্জাম দখল করে নেয়। শালদা নদী ফেরী এবং লক্ষ্মীপুর এলাকা আমাদের দখলে আসার পর ৪র্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টকে শালদা নদী কমপ্লেক্স দখল করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়।

শালদা নদীর যুদ্ধ

শালদা নদী এলাকায় শত্রুদের ঘাঁটিটি খুবই শক্তিশালী ছিল। এই ঘাঁটির উত্তর দিয়ে শালদা নদী প্রবাহিত হওয়ায় শত্রুদের উত্তর দিকে সম্পূর্নরুপে নিরাপদ ছিল। পূর্ব দিকে রেলওয়ে স্টেশন উঁচু রেললাইন সম্মুখবর্তী এলাকায় শত্রুদের নিরাপত্তায় প্রাধান্য বিস্তার করে। পশ্চিমের গুদামঘরের উঁচু ভুমি তাদের শক্তিশালী ঘাঁটির

নিরাপত্তায় বেশ সহায়ক ছিল। এই অবস্থানটিকে নিয়মিত প্রতায় আক্রমণ করে সফল হওয়া দুস্কর ছিল। শত্রুঘাঁটির এই সকল বৈশিষ্ট্য তাদের পক্ষে সহায়ক হওয়ায় আমরা এই ঘাঁটিটিকে নিয়মিত প্রথায় আক্রমণ না করে অনিয়মিত পদ্ধতিতে আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নেই। শত্রুদের ঘাঁটিটি পর্যবেক্ষণের পর আমরা আরো জানতে পারি যে; শালদা নদীর তীর বরারব আমাদের ঠিক সামনে তারা চজারটি বড় পরিখা খনন করেছে। শালদা নদীর গুদামঘরের পাশ দিয়েও তারা একই রকম পরিখা খানন করেছিল। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঘাঁটিটিকে তিনদিক থেকে সাঁড়াশী আক্রমণের পরিকল্পনা নেয়া হয়। পরিকল্পনা অনুযায়ী ক্যাপ্টেন গাফফার ও নায়েব সুবেদার সিরাজের নেতৃত্ব একটি প্লাটুন শালদা নদী রেলস্টেশনের পূর্বে পাহাড়ী এলাকায় অবস্থান নেয়। সুবেদার মঙ্গল মিয়ার নেতৃত্বে আরেকটি প্লাটুন শালদা নদী ও গুদামঘরের পশ্চিমে নদী অতিক্রমে করে আবস্থান নেয়। সুবেদার বেলায়েতের নেতৃত্বে আরেটি প্লাটুন শালদা নদীতে শত্রঘাটির বিপরীত দিকে অবস্থান নেয়। পাকসোরা যাতে আক্রমণের সময় আমাদের পেছনে থেকে আঘাত না হানতে পারে সেজন্য সুবেদার ওহাবের নেতৃত্বে একটি কোম্পানী মঙ্গল মিয়ার অবস্থানের পেছনে নিরাপত্তামূলক অবস্থান গ্রহন করে। এছাড়া পাকনোদের মনোযোগ অন্যদিকে আকর্ষণ করার জন্য চারটি ছোট রেইডিং পার্টিকে বড় ধুশিয়া; চান্দলা; গোবিন্দপুর; কায়েমপুর প্রভৃতি শত্রুঘাঁটির দিকে পাঠানো হয়। পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী এইসব রেইডিং পাটিগুলো ১৫ই নভেম্বর রাতে পাকসেনাদের মনোযোগ আকর্ষন করার জন্য শত্রঘাঁটির উপর হালকা আক্রমণ চালায়। সঙ্গে সঙ্গে পাকসেনারা শালদী নদী থেকে রেইডিং পার্টির উপর কামান এবং মর্টারের সাহয্যে গোলাবর্ষন করে। এই গোলাবর্ষন সমস্ত রাত ধরে চলে এবং ভোরের দিকে বন্ধ হয়ে যায়। আমাদের আক্রমণ শেষ হয়ে গেছে ভেবে পাকসেনারা পরদিন সকালে কিছুটা অসতর্ক হয়ে পড়ে এবং বিশ্রামের সুযোগ নেয়। এই সময় তাদের প্রতিরক্ষা ব্যূহগুলো রাজাকার এবং ইপকাফ-এর প্রহরাধীন ছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে; শত্রুরা সাধারণত রাতের বেলায় আমাদের সম্ভাব্য আক্রমণের জন্য যতটা সতর্ক থাকতো; দিনের বেলায় ততোটা প্রস্তুত থাকতো না।

এমতাবস্থায় আমরা তাদের এই অসতর্কতার সুযোগ নিয়ে সকাল ৮টার দিকে তাদের উপর পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রচণ্ড আক্রমণ চালাই।

সুবেদার মঙ্গল মিয়ার দলটি পশ্চিম দিক থেকে শালদা নদী গুদামঘরের পরিখায় অবস্থানরত শত্রুদের উপর এবং নায়েব সুবেদার রিয়াজ পূর্বদিকের পাহাড়ী এলাকার অবস্থান থেকে শালদা নদী রেলস্টেশন-এর পরিখায় অবস্থানরত শত্রুদের উপার আক্রমণ চালায়। সঙ্গে সঙ্গে নায়েব সুবেদার মুহাম্মদ হোসেন সুবেদার বেলায়েতের অবস্থান থেকে নদীর অপর তীরের পরিখাগুলোতে আর-আর-এর সাহায্যে শত্রুদের চারটি পরিখা ধ্বংস করে দেয়। এতে আমাদের যথেষ্ট সুবিধা হয় এবং পাকসেনারা সম্মুখবর্তী পরিখা ছেড়ে পিছু হটে যায়। সঙ্গে সঙ্গে সুবেদার বেলায়েত তাঁর সৈন্যদের নিয়ে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং সাঁতরিয়ে অপর তীরে শত্রুদের সম্মুখবর্তী পরিত্যক্ত পরিখাগুলো তখল করে নেয় এবং কিছু সৈনিক সেইসব পরিখাতে রেখে সামনের দিকে আরো অগ্রসর হয়। অগ্রসর হওয়ার পথে সুবেদার বেলায়েত শত্রুসেনা কর্তৃক অতর্কিত আক্রান্ত হয়। নিজের জীবনের মায়া ত্যাগ করে সুবেদার বেলায়েত বীরবিক্রমে সম্মুখভাগের শত্রুপরিখার উপর গ্রেনেড চার্জকরে আরো কয়েকটি শত্রু বাঙ্কার ধ্বংস করে এবং শত্রুসৈন্য নিহত করে। সুবেদার বেলায়েত ও তাঁর দলের প্রচণ্ড আক্রমণে শালদা নদী তীরবর্তী এলাকা সম্পূর্নরুপে শত্রুমুক্ত হয়ে যায়। ফলে শালদা নদী রেলস্টেশনে অবস্থানরত পাকসেনাদের সঙ্গে শালদা নদী গুদামঘরে অবস্থানরত পাকসেনাদের যোগাযোগ সম্পূর্নরুপে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এবং তারা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। পাকসেনারা আমাদের উপর কামান কিংবা মর্টারের গোলা নিক্ষেপ করার সুযোগ পাচ্ছিলো না । কেননা আমাদের সৈনিক তাদের দু'দলের মধ্যবর্তি স্থানে পৌছে যাওয়ায় তাদের গোলাবর্ষণে নিজেদেরই ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। গুদামঘরে অবস্থানরত পাকসেনারা বুঝতে পারে যে তারা দু'দিক থেকে সাঁড়াশী আক্রমণের শিকার হয়ে মূল ঘাঁটি থেখে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে এবং তাদের পক্ষে এই আক্রমণের মুখে বেশীক্ষণ টিকে থাকা সম্ভব নয়। এই সময় পাকসেনাদের একটি অয়্যারলেস ম্যাসেজ আমাদের কাছে ধরা পড়ে। এতে তারা কর্তৃপক্ষকে জানায় যে 'মুক্তি বাহিনীর একটি ব্যাটালিয়ন তাদের উপর প্রচণ্ড

আক্রমন চালাচ্ছে। তাদের পক্ষে এই ঘাঁটিতে বেশীক্ষণ টিকে থাকা সম্ভব হচ্ছে না। এই ম্যাসেজ পাওয়ার পর পাকসেনাদের দুর্বলতা সম্পূর্নভাবে বুঝতে পারি। তাদের মনোবল যে একেবারেই ভেঙ্গে পড়েছে তাবেশ বোঝা যায়। সঙ্গে সঙ্গে সুবেদার মঙ্গল মিয়াকে তার আক্রমণ আরো জোরদার করার নির্দেশদেই। এই প্রচন্ড আক্রমণে টিকতে না পেরে গুদামঘরে অবস্থানরত পাকনোরা নয়ানপুর রেলস্টেশনের দিকে পালাতে থাকে। সুবেদার মঙ্গল মিয়ার দলটি গুদামঘর এলাকা দখল করে নেয়।আরো কিছুক্ষণ যুদ্ধ চলার পর সুবেদার বেলায়েত এবং নায়েবসুবেদার সিরাজের প্রচণ্ড আক্রমণে শালদা নদীরেলস্টেশনে অবস্থানকারী পাকসেনারাও রেললাইন ধরে নয়ানপুরে দিকে পালাতে থাকে। আমাদের সৈনিকরা পলায়নপর পাকসেনাদের পাকসেনাদের উপর গুলি চালিয়ে অনেককে হতাহত করে। দুপুর নাগাদ সমস্ত শালদা নদী এলাকা শত্রুমুক্ত হয় এবং আমাদের সম্পূর্ন নিয়ান্ত্রণাধীনে আসে। পাকসেনারা যাতে এই এলাকাটি আবার দখল করে নিতে না পারে সেজন্য আমাদের অবস্থানটিকে শক্তিশালী করে তোলা হয়। পাকসেনারা নয়াপুর রেলস্টেশনের ঘাঁটি থেকে বেশ কয়েকবার এই অবস্থানের উপর মর্টার ও কামানের আক্রমণ চালায় এবং এই অবস্থানটি পুর্নদখলের জন্য শালদী নদী গুদামঘরের দক্ষিনে কিছুসংখ্যাক সৈন্য সমাবেশ করে। এই খবর পেয়ে সুবেদার বেলায়েত একটি দল নিয়ে পাকসেনাদের আক্রমণকে প্রতিহত করার জন্য গুদামঘর এলাকায় আক্রমণ চালায়। পাকসেনাদের আক্রমণ প্রতিহত হয় এবং তারা পালিয়ে যায়। কিন্তু একজন পাকসেনা আড়াল থেকে সুবেদার বেলায়েতকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে। সুবেদার বেলায়েতের মাথায় গুলি বিদ্ধ হয়। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে চিকিৎসার জন্য ২নং সেক্টরে মুক্তিবাহিনী হাসপাতালে পাঠনো হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে হাসপাতালে পৌছায় আগেই পথে সে শাহাদৎবরণ করে। তার মত বীর সৈনিকের শহীদ হওয়াতে আমরা সবাই মর্মাহত হয়ে পড়ি। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী তথা বাংলাদেশ একজন মহান বীরকে হরালো। সুবেদার বেলায়েতের কীর্তি এবং বিক্রমের কথা বাংলাদেশের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

শালদা নদী এলাকা দখল করা একটি দুঃসাহসী পকিল্পনা ছিল। এই পরিকল্পনা অত্যন্ত অপ্রচলিত কৌশলের একটি বিরাট সাফল্য। এর ফলে কুমিল্লা থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া পর্যন্ত সম্পূর্ন এলাকা শত্রুমুক্ত হয়। বাংলাদেশ সরকার ক্যাপ্টেন গাফফার এবং শহীদ বেলায়েতকে কৃতিত্বপূর্ন লড়াইয়ের জন্য বীরউত্তম উপাধিতে ভূষিত করেন। এই যুদ্ধে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র আমাদের হস্তগত হয়। এগুলোর মধ্যে ২১টা রাইফেল, ৫টা এল-এম-জি, ৩টা এম-জি-এই-৩ মেশিনগান, ৩১টা হালকা মেশিনগান ম্যাগাজিন, ৪টা রকেট লাঞ্চার (৮০টি গোলাসহ) ১টা এস-এম-জি, ১টা অয়্যারলেস সেট, ২০২৫০টি গুলি, ২০০টি ২” মর্টার বোমা, ৩টা টেলিফোন সেট ১টা জেনারেল, ২টা এম-জি ব্যারেল, অনেক রেশন কাপর -চোপর ম্যাপ ও বিভিন্ন ধরনের নথিপত্র আমাদের দখলে আসে। এইসব দলিলপত্র থেকে জানা যায় ৩০তম পাঞ্জাব জজিমেন্টের ‘বি’ কোম্পানী ও ‘ডি’ কোম্পানী পাকিস্তানীদের প্রতিরক্ষব্যূহ নিয়োজিত ছিল। এই সংঘর্ষে প্রায় ৮০/৯০ জন পাকসেনা হতাহত হয় এবং ১২জন পাকসেনা আমাদের হাতে জীবন্ত ধরা পড়ে। ভোর ৫টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত ১৬ঘন্টা যুদ্ধে আমাদের ২জন শহীদ এবং ৮ জন আহত হন।

শালদা নদী কমপ্লেক্স আমাদের হস্তগত হওয়ার পর পাকসেনারা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। এই এলাকা পুর্নদখলের জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকে। পাকসেনারা চান্দলার নিকটে অন্যান্য এলাকা থেকে প্রচুর সৈন্য এনে সমাবেশ ঘটায়। ১৬ই নভেম্বর রাত ২-১৫ মিঃ এ পাকসেনারা প্রায় দুই ব্যাটালিয়ন সৈন্যশক্তি নিয়ে আমাদের শালদা নদী, মন্দভাগ, কামালপুর, মঙ্গল প্রভৃতি অবস্থানের উপর গোলন্দাজ বাহিনী ও মর্টারের সহায়তায় প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণ প্রায় ৩/৪ ঘন্টা ধরে চলতে থাকে। ৪র্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈনিকরা অসীম সাহসিকতার সঙ্গে পাকসেনাদের এই প্রচণ্ড আক্রমণকে প্রতিহত করে। সকাল পর্যন্ত যুদ্ধে পাকসেনাদের বিপুলসংখ্যক সেনা হতাহত হয় এবং উপায়ান্তর না দেখে পাকসেনারা আক্রমণ পরিত্যাগ করে পিছু হটে যায়। এর একদিন পর আমাদের একটি ছোট দল মঙ্গলপুরের নিকট পাকসেনাদের ঘাঁটির উপর অতর্কিত আক্রমন চালিয়ে ১৭ জন পাকসেনাকে নিহত ও অনেককে আহত করে। আরেকটি রেইডিং পার্ট কাইউমপুরে পাকসেনাদের অবস্থানের

দু'টি বাঙ্কার আর-আর দিয়ে ধ্বংস করে দিয়ে ১৪জন পাসেনাকে নিহত করে। ২০শে এবং ২১শে নভেম্বর ৪র্থ বেঙ্গলের 'এ' কোম্পানী এবং 'বি' কোম্পানী মঙ্গলপুর এবং কায়েমপুরের উপর তাদের চাপ বাড়িয়ে তোলে। ২১তারিখ সকাল ৯টার সময় এই দুই কোম্পানী পাক অবস্থানের উপর অতর্কিত আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণে ১৬জন পাকসেনাকে নিহত এবং ৯জন আহত করে। ১০৬আর-আর এর সাহায্যে পাকসেনাদের বেশ কটি বাঙ্কার উড়িয়ে দেয়া হয়। আমাদের সৈনিকরা অনেক অস্ত্রশস্ত্রও দখল করে নেয়। ২৩শে নভেম্বর পাকসেনারা আমাদের মন্দভাগ অবস্থানটি পুনর্দখলের জন্য আবার তাদের সৈন্য একত্রিত করতে থাকে। দুপুর দুটোর সময় আমাদের একটি কোম্পানী পাকসেনাদের সমাবেশের উপর আক্রমণ চালায়। ফলে পাকসেনাদের শালদা নদীর নিকটে মনোরা রেলসেতুর নিকটবর্তী আমাদের অবস্থানগুলোর উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। মেশিনগান, ১০৬ আর-এর ও গোলন্দাজ বাহিনীর সহায়তা পাকসেনারা অবস্থানের একটি বাঙ্কার ধ্বংস করতে সমর্থ হয়। আমাদের সৈনিকরা পাকসেনাদের আক্রমণকে প্রতিহত করতে সমর্থ হয় এবং তাদের বহু সৈনিক হতাহত হয়। আমাদের একজন সৈনিক শহীদ এবং ৪জন আহত হয়। একটি মেশিনগান গোলন্দাজ বাহিনীর গুলিতে নষ্ট হয়ে যায়। ২৩শে নভেম্বর থেকে পাকসেনাদের সঙ্গে বেশ কটি খন্ডযুদ্ধে আমাদের সৈনিকরা শত্রুদেরকে বিতাড়িত করে সমর্থ হয়। এই এলাকায় শত্রুরা পর্যুদস্ত হয়ে বুড়ীচং এবং কুমিল্লার দিকে সরে যায়।

কয়েকদিন পর ৪র্থ বেঙ্গলকে শালদা নদী থেকে ফেনীর দিকে আক্রমণ চালানোর জন্য 'কে' ফোর্স-এর অধীনে বেলুনিয়াতে স্থানান্তরিত করা হয়। ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট কামালের অধীনে কয়েকটি সেক্টর কোম্পানী শালদা নদীতে রেখে ক্যাপ্টেন ঘাফফারের নেতৃত্বে ৪র্থ বেঙ্গল বেলুনিয়াতে কে-ফোর্স -এ যোগাযোগ করে। ১০ম বেঙ্গল রেজিমেন্ট রাজনগরে তাদের পুনর্গঠিন ও পুনর্বিন্যারে পর তাদেরকে দু' সপ্তাহের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। ব্যাপক প্রশিক্ষণের পর বেলূনিয়াতে পুনরায় তাদেরকে পুরানো প্রতিরক্ষা ঘাঁটিগুলোতে পাঠানো হয়। এবং এই সেক্টরে তৎপরতা বাড়ানোর নির্দেশ দেয়া হয়। এই সময়ে ১০ম বেঙ্গল রেজিমেন্টকে মেজর জাফর ইমাম নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। পুনরায় রণক্ষেত্রে পৌছানোর পর ১০ম বেঙ্গল রেজিমেন্ট তাদের তৎপরতা বৃদ্ধি করে। ১৫ই অক্টোবর ১০ম বেঙ্গলের অনন্তপুর প্রতিরক্ষাব্যূহের সমনে পুরশুরাম চিতলিয়া প্রভৃতি জায়গায় পাকসেনাদের ঘাটিঁগুলির উপর ছোট ছোট আক্রমণ চালিয়ে ২৪জন পাকসেনাকে নিহত এবং ৩০ জন কে আহত করে। পাকসেনাদের তিনটি বাঙ্কারও তারা ধ্বংস করে দেয় ১৮ই অক্টোবর সকাল ৬টার সময় পাকসেনাদের একটি প্লাটুন আমাদের ঘাঁটির দিকে অগ্রসর হবার পথে বেলুনিয়া নদীর পূর্ব তীরে আমাদের সৈনিকদের এ্যামবুশ-এ পড়ে। ফলে ১২জন পাকসেনা নিহত। এবং ১৪ জন আহত হয়। ফুলগাজীর নিকট ১০ম বেঙ্গলের পাইওনিয়ার প্লাটুন ঐদিনই রাস্তায় মাইন পুঁতে সকাল ১০টার সময় পাকসেনাদের একটি ট্রাক ধ্বংস করে দেয়। ৭জন পাকসেনা এতে নিহত এবং ৩জন আহত হয়। ২০শে অক্টোবর আমাদের মর্টার ডিটারমেন্ট সন্ধ্যা ৬টায় পাকসেনাদাদের অবস্থানে অনুপ্রবেশ করে চিতলিয়া অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে ১২জন পাকসেনাকে নিহত এবং ৭ জনকে আহত করে। ২৫শে অক্টোবর আমাদের গোলন্দাজ বাহিনী পাকসেনাদের চিতলিয়া ঘাটির উপর আবার আক্রমণ চালায়। ফলে দু'টি গাড়ি ধ্বংস হয়ে যায় এবং ৭ জন পাকসেনা নিহত হয়। ২৬শে অক্টোবর ভোর ৫টার সময় ফুলগাজীর নিকট আমাদের একটি প্লাটুন পাকসেনাদের টহলদারী দলকে এ্যামবুশ করে ৯জন পাকসেনা নিহত এবং ৬ জন আহত করে। এই যুদ্ধে আমাদের একজন মুক্তিযোদ্ধা কুটি মিয়া শহীদ হয়। ঐদিনই পাকসেনাদের একটি শক্তিশালী দল আমাদের ঘাঁটির সামনে এসে মাইন পোঁতার চেষ্টা করে। কিন্তু পাকসেনাদের এই দলটির সঙ্গে আমাদের একটি দলের সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে ১২জন পাকসেনা নিহত এবং ৩০জনকে আহত হয়। অবশিষ্ট পাকসেনারা আহত এবং নিহতদের ফেলে ও অস্ত্রশস্ত্র রেখেই পালিয়ে যায়। ১০ম বেঙ্গলের তৎপরতার কারণে এই এলাকায় পাকসেনাদের বিপুল সমাবেশ ঘটানো হয়। তারা ১০ম বেঙ্গলকে ধ্বংস করার জন্য প্রস্তুতি নেয়। ২৭শে অক্টবর চিতলিয়ার নিকট এক ব্যাটালিয়নের অধিক শক্তির সমাবেশ ঘটায়। সন্ধ্যা ৬টার সময় গোলন্দাজ বাহিনীর সহায়তায় পাকসেনাদের দুটো কোম্পনী অগ্রসর হয়ে আমাদের

অগ্রবর্তী ঘাঁটি নিলক্ষ্মীর উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। আমাদের সৈনিকরা সাহসে সঙ্গে পাকসেনাদের আক্রমণে বাধা দেয়। কিন্ত প্রচণ্ড আক্রমণের সামনে টিকতে না পেরে মূল ঘাটির ফিরে আসে। পাকসেনারা নিলক্ষ্মী অগ্রবর্তী ঘাটিটি দখল করে নেয়। পরদিন সকালে ১০ম বেঙ্গলের তিন কোম্পানী আমাদের গোলন্দাজ বাহিনীর সহায়তায় নিলক্ষ্মীর ওপর পাল্টা আক্রমণ চালায়। সকাল ১০টা পর্যন্ত তিনঘন্টা ধরে যুদ্ধ চলে। প্রচণ্ড চাপে পাকসেনারা টিকতে না পেরে নিলক্ষ্মী ঘাঁটি পরিত্যাগ করে পিছু হটে যায়। আমাদের সৈনিকরা নিলক্ষ্মী পুর্দখলের পর পুতিরক্ষাব্যূহ মালিবিলদ ও গাবতলী পর্যন্ত সম্প্রসারিত করে। পরদিন সন্ধ্যা ৬টায় আমাদের একটি প্লাটুন ডুবলা চাঙ্গের নিকট একটি এ্যামবুশ পেতে বসে থাকে। পাকসেনাদের একটি দল বেলুনিয়া যাবার পথে সেই এ্যামবুশ-এ পড়ে। আমাদের প্লাটুনটি পাকসেনাদের আক্রমণে চালিয়ে ১৩জন পাকসেনাকে নিহত করে এবং ২জন পাকসেনাকে জীবিত বন্দী করে। এছাড়া অনেক অস্ত্রশস্ত্র দখল করে নেয়। নিলক্ষ্মীতে পাকসেনারা পর্যুদস্ত হওয়ার পার পুনঃআক্রমণের প্রস্ততি নেয়। ২৯শে অক্টোবর ভোর ৪টার সময় পাকসেনারা শালদার নয়াপুর এবং ফুলগাজী থেকে আমাদের প্রতিরক্ষা ঘাঁটির উপর কামানের সাহায্যে প্রচন্ড গোলাবর্ষন শুরু করে। আমাদের কামানগুলিও পাকসেনাদের গোলার প্রত্যুত্তর দেয়। সকালে পাকসেনারা তিন দিক থেকে আমাদের ঘাঁটির উপর আক্রমণ চালায়। প্রায় ৫ঘন্টা যুদ্ধের পর আমাদের পাল্টা আক্রমণের মুখে পাকসেনাদের আক্রমণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। সাড়ে বারোটার সময় পাকসেনাদের আক্রমণ সম্পূর্নভাবে ব্যর্থ হয়ে পড়ে। প্রচণ্ড বাধার সামনে টিকতে না পেড়ে পাকসেনারা পিছন দিকে পালিয়ে যায়। সংঘর্ষে ৪০ জন পাকসেনা হতাহত হয়। অনেক অস্ত্রশস্ত্র আমাদের হস্তগত হয়। আমাদের দু'জন সৈনিক শহীদ হয়।

এই সময় পাকসেনাদের প্রতিরকক্ষা ঘাটি চিতলিয়া; পরশুরাম ও বেলুনিয়া থানার নিকট ছিল। এসব ঘাটিগুলোতে রেলওয়ে ট্রলির সাহয্যে পাকসেনারা ফেনী থেকে রসদ যোগাতো। ৫ই নভেম্বর রাতে আমাদের একটি রেইডিং পার্টি চিতলিয়ার দক্ষিনে রেলওয়ে লাইনের উপর এ্যামবুশ পাতে। ৬ই নভেম্বর সকাল ৭টায় পাকসেনাদের একটি ট্রলি আমাদের হেইডিং পার্টির এ্যামবুশ এর আওতায় এসে যায়। ট্রলিটিকে সম্পূর্নরুপে ধ্বংস করে দেয়া হয় এবং পাকসেনাদের একজন অফিসারসহ চারজন সৈনিক নিহত হয়। আমাদের রেইডিং পার্টি একটি হালকা মেশিনগান, ১টি রাইফেল, ১টি স্টেনগান, ১টি ব্লেনডিসাইড, ২০০০ রাউন্ড গুলি ও ১০টি ব্লেনডিসাইড গোলা হস্তগোত করেক। ১০ম বেঙ্গল পাকসোদের আক্রমণকে ব্যর্থ করার পর বেলুনিয়া থেকে পাকসেনাদের সম্পূর্ণরুপে বিতাড়িত করার জন্য পাল্টা আক্রমণের প্রস্ততি নেয়।পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রথম পর্যায়ে পরশুরাম ও চিতলিয়ার মাঝে পাকসেনাদের সরবরাহ লাইনের সড়কটি বিচ্ছিন্ন করার প্রস্ততি নেয়। ৬ই নভেম্বর ১০ম বেঙ্গলের একটি কোম্পানী গোলন্দাজ বাহিনী ও মর্টারের সহায়তায় চিতলিয়ার উত্তরাংশে পাকসেনাদের প্রতিরক্ষাব্যূহের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। প্রায় ৪ ঘন্ট যুদ্ধের পর ১০ম বেঙ্গলের কোম্পানীটি চিতলিয়ার উত্তরাংশ দখলকরে নিয়ে সালিয়া এবং ধানীকুন্ডার মাঝখানে রাস্তা বন্ধ করে দিয়ে পরশুরাম ও ফেনীর মধ্যে যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে দিতে সমর্থ হয়। এর ফলে বেলুনিয়ার উত্তরাংশের পাকসৈনিকরা অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। একজন অফিসারসহ ১২জন পাকসেনা যুদ্ধে নিহত এবং পাঁচজন বন্দী হয়। অফিসারের পকেট থেকে প্রাপ্ত এম-ও ফর্ম থেকে জানা যায় যে সে ১৫তম লেুচ জজিমেন্টের ক্যাপ্টেন এবং বেলুনিয়াতে সে সময় ১৫তম বেলুচ রেজিমেন্ট আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। এই সংঘর্ষে আমাদের মর্টার প্লাটুন কমাণ্ডার হাবিলদার ইয়ারআহমদ শহীদ হয় এবং আরো ৫ জন আহত হয়। পাকসেনাদের মনোবল সম্পূর্ণরুপে ভেঙ্গে পড়ে। পাকসেনারা চিতলিয়ার দক্ষিনে পশ্চাদপসরণ করে। বিপুল অস্ত্রশস্ত্র আমাদের হস্তগত হয়। আমাদের চিতলিয়ার অবস্থানটি পুনর্দখলের জন্য পাকসেনারা পরদিন ভোর ৫টায় দু' কোম্পানী শক্তি নিয়ে প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। আমাদের কোম্পানীটি গোলন্দাজ বাহিনীর সহায়তায় অসীম সাহসের সঙ্গে এই আক্রমণের মোকাবিলা করে। আপ্রাণ চেষ্টাসত্তেও আমাদের সৈনিকদের গুলির সামনে এবং গোলন্দাজ বাহিনীর গোলার মখে পাকসেনাদের এই আক্রমণটি ব্যর্থ হয়ে যায়। ৩৫জন পাকসেনা নিহত হয় এবং অনেক আহত হয়। কয়েকটি হালকা মেশিগানসহ অনেক অস্ত্রশস্ত্র আমাদের হস্তগত হয়। পাকসেনারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পিছু হটে যায়।

১০ম বেঙ্গল উত্তর চিতলিয়া দখলের পর তাদের তৎপরতা অব্যাহত রাখে। ৯ই নভেম্বর রাত সাড়ে ১১টার সময় আমাদের একটি পেট্রোল পার্টি পাঁচজন পাকসেনাকে বন্দী করে এবং একটি মেশিনগান ও ৪টি চায়না রাইফেল দখল করে দেয়। ১০ম বেঙ্গলের দু'টি কোম্পানী ৯ই নভেম্বর রাত সাড়ে ১১টার সময় পরশুরাম এবং বেলুনিয়া শত্রুঘাঁটির উপর অতর্কিত আক্রমণ চালায়। আক্রমণে অনেক পাকসৈন্য নিহত হয় এবং বহু অস্ত্রশস্ত্র আমাদের হস্তগত হয়। চারঘন্টা যুদ্ধের পর এই দুই ঘাঁটি আমাদের সৈনিকরা দখল করে নেয়। পাকসেনারা পরদিন আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যূহের উপর জঙ্গী বিমানের আক্রমণ চালায়। আমাদের সৈনিকরা ভারী মেশিনগানের সাহায্যে বিমান আক্রমণের পাল্টা জবাব দেয়। শত্রুদের একটি জঙ্গী বিমান আমাদের মেশিনগানের গুলিতে বিদ্ধ হয়ে শালিয়ার নিকট ভুপাতিত হয়। বিমান আক্রমণের আমাদের দু'জন সৈনিক শহীদ ও ৫ জন আহত হয়। এর পরদিন ১০ম বেঙ্গল আরো দুটি কোম্পানী সকাল ১০টায় দক্ষিন চিতলিয়ার উপর গোলন্দাজ বাহিনীর সহায়তায় আক্রমণ চালায়। ৩ ঘণ্টা যুদ্ধের পর আমাদের গোলন্দাজ বাহিনীর গোলা এবং মর্টারের গুলিতে শত্রুপক্ষের ব্যাপক ক্ষতি হয় এবং চিতলিয়া রেল স্টেশন ধ্বংস হয়ে যায়। এখানে পাকসেনাদের অনেক হতাহত হয়। আমাদের পাঁচজন শহীদ এবং ১৩ জন আহত হয়। শেষ পর্যন্ত চিতলিয়া আমাদের দখলে আসে। আমাদের সৈনিকরা শত শত অস্ত্রশস্ত্র, অয়্যারলেস সেট, পোশাক, রেশন প্রভৃতি দখল করে নেয়। ৪দিনের যুদ্ধে ৫৭ জন পাকসেনা ও ১৫জন ইপিসিএএফ আমাদের হাতে বন্দী হয় এবং আরো অনেক হতাহত হয়। পাকসেনারা চিতলিয়া থেকে পালিয়ে মুন্সীরহাটের দক্ষিনে এবং পাঠাননগরে কাছে তাদের রক্ষাব্যূহ পুরায় স্থাপন করে। তাদের মূল ঘাটি ফেনীতে পিছিয়ে নেয়। এই সময় 'ক-ফোর্স' হেডকোয়ার্টার থেকে পুনঃআক্রমণের নির্দেশ আসে। এই নির্দেশ অনুযায়ী 'কে-ফোর্স' হেডকোয়ার্টার কোনাবন অবস্থান থেকে দক্ষিন বেলুনিয়াতে স্থানান্তরিত হয় এবং বেলুনিয়া সেক্টরে ৪র্থ বেঙ্গলকেও এই যুদ্ধে নিয়োজিত করা হয়। নতুন নির্দেশ অনুযায়ী 'কে-ফোর্স' অতিস্তর ফেনী মুক্ত করার আদেশ দেয়া হয়। নতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী ৪র্থ বেঙ্গল ফেনীর দিকে অগ্রসর হয়। ৪র্থ বেঙ্গল উত্তর দিক থেকে ক্যাপ্টেন গাফফারের নেতৃত্বে ফেনীর দিকে অগ্রসর হয়। ১০ম বেঙ্গল লক্ষ্মীপুর হয়ে ছাগলনাইয়ার দিকে অগ্রসর হয়। 'কে-ফোর্স'-এর দুই ব্যাটালিয়নের প্রচণ্ড চাপে পাকসেনারা টিকতে না পেরে তাদের অগ্রবর্তী ঘাঁটি পাঠাননগর ও দক্ষিন মুন্সীরহাট ছেড়ে পেছনে দিকে পালিয়ে যায়। ডিসেম্বর মাসের প্রথম দিকে কে- ফোর্স ছাগলনাইয়া ও ফেনীর উপকণ্ঠে পাকসেনাদের উত্তর-পশ্চিম দিকে সম্পূর্নভাবে ঘিরে ফেলে এবং পাকসেনাদের অবস্থানগুলোর উপায় গোলন্দাজ বাহিনীর সাহায্যে প্রচণ্ড আক্রমণ চালায় এই প্রচণ্ড চাপে পাকসেনরা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। আমাদের আক্রমণের চাপ আরেরো বাড়িয়ে দেয়া হয়। উপায়ান্তর না দেখে ৬ই ডিসেম্বর পাকসেনারা তাদের অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ ফেলে শুভপুর সেতু হয়ে চট্রগ্রামের দিকে পালিয়ে যায়। ৬ই ডিসেম্বর দুপুরে কে-ফোর্স ফেনীকে শত্রুমুক্ত করে। ফেনীতে পাকসেনাদের অজস্র গোলাবারুদ আমাদের হস্ত গত হয়। শত্রুরা পালাবার সময় ভুভপুর সড়ক ও রেলসেতু উড়িয়ে দেয়। যার ফলে পাকসেনাদের পিছু ধাওয়া করা কে -ফোর্স-এর পক্ষে অসুবিধা হয়ে পড়ে এবং তাদের অগ্রাভিযান বাধা প্রাপ্ত হয়। শুভপুর সেতু মেরামতের জন্য দু'দিন সময় লেগে যায়। মিত্র বাহিনীর প্রকৌশলীরা একটি সেতু পুনঃনির্মান করে এবং এরপর সেতু ও নৌকার সাহায্যে চট্রগ্রামের দিকে কে-ফোর্স-এর অগ্রাভিযান পুনরায় শুরু হয়। এই সময় আমি আহত হওয়ার ফলে কে-ফোর্স-এর নেতৃত্বে মেজর সালেকের উপর ন্যাস্ত ছিল। কে-ফোর্স ফেনী থেকে করেরহাট পর্যন্ত পাকসোনাদের ছোটখাট রক্ষাব্যূহ দখল করে তাদের অগ্রাভিযান অব্যাহত রাখে এবং করেরহাট পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকা শুরু করে। করেরহাট থেকে চট্রগ্রাম অগ্রসর হওয়ার জন্য নতুন একটি পরিকল্পনা নেয়া হয়। এই পরিকল্পনা অনুসারে ৪র্থ ও ''মুজিব'' ব্যাটারীকে (বাংলাদেশ ১ম গোলন্দাজ বাহিনী) নিয়ে হিয়াকু ফটিকছড়ি নাজিরহাট হয়ে চট্রগ্রামের উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে শত্রবাহিদনীর থেকে শত্রবাহীনীর উপর আক্রমণ চালাবে এবং ১০ম বেঙ্গল ফেনী-চট্রগ্রামের প্রধান সড়কে সীতকুণ্ড হয়ে চট্রগ্রামের দিকে অগ্রসর হবে। এই দ্বিমুখী অগ্রাভিযান চট্রগ্রামের উপকণ্ঠে হয়ে চট্রগ্রামের উপকেণ্ঠে পৌছে চট্রগ্রাম শহরের উপর সাঁড়াশী আক্রমণ চালাবে। পরিকল্পনা মত ৪র্থ বেঙ্গল ''মুজিব'' ব্যাটারীসহ হিয়াকুরদিকে ৭ই ডিসেম্বর রাত ১২টায় অগ্রসর হয়। পরদিন সকাল ৬টায় হিয়াকু বাজারের নিকট পৌছার পর পাকসেনাদের একটি অগ্রবর্তী ঘাঁটির সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। পাকসেনাদের এই ঘাঁটিতে

প্রায় ৪০/৫০জন সৈনিক ছিল। তারা আমাদের বাধা দেয় কিন্তু আমারে সৈনিক এবং গোলন্দাজ বাহিনীর আক্রমণে টিকতে দনা পেরে পাকসেনারা ফটিকছড়ির দিকে পালিয়ে যায়। ফলে হিয়াকু বাজার আমরা অতি সহজেই শত্রুমুক্ত করে নিজেদের দখলে আনি। হিয়াকু থেকে চট্রগ্রামের দিকে একটি কাঁচা রাস্তা রাস্তা গেছে। রাস্তাটি খুবই খরাপ। সেই রাস্তা হয়ে পায়ে হেঁটে আমাদেরকে অগ্রসর হতে হয়। অগ্রসরের পথে নারায়ণহাটের নিকট পাকসেনাদের আরেকটি অবস্থানের সঙ্গে ৪র্থ বেঙ্গলের সংঘর্ষ হয়। পাকসেনাদের এ অবস্থানটিও আমাদের আক্রমণের চাপে টিকতে না পেরে ফটিকছড়ির দিকে পিছু হটে যায়। যাওয়ার সময় এটি কাঠের সেতু ধ্বংস করে দেয়। ৪র্থ বেঙ্গল ওই দিন রাতে নারায়ণহাটে বিশ্রাম নেয়। ধ্বংসপ্রাপ্ত সেতুটি মেরামত করার পর আমাদের অগ্রযাত্রা পুনরায় শুরু হয়। পথে কাজীরহাটে পাকসেনারা আমাদের অগ্রাভিযানে বাধা বোর জন্য পথে অনেক মাইন পুঁতে রাখে। এই মাইনগুলোতে সরিয়ে রাস্তা পরিস্কার করে আমাদেরকে অগ্রসর হতে হয়। ১০ই ডিসেম্বর ফটিকছড়ির উপকণ্ঠে ৪র্থ বেঙ্গলের অগ্রাভিযানকে পাকিস্তানের ২৪ তম ফ্রান্টিয়ার রেজিমেন্ট বাধা দেয়। ফটিকছড়িতে পাকিস্তানীদের একটি শক্তিশালী ঘাঁটি ছিল। সেজন্য ৪র্থ বেঙ্গলের অধিনায়ক ক্যাপ্টেন গাফফার পাকসেনাদের ঘাঁটিটি সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য সংগ্রহ করে। এরপর ৪র্থ বেঙ্গলকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। একটি দল ফটিকছড়ির সন্নিকটে পাহাড়ের দিকে রাস্তায় অগ্রসর হয় এবং প্রধান দলটি কাজীরহাট-ফটিকছড়ি রাস্তার দিকে অগ্রসর হয়। ১১ই ডিসেম্বর বিকাল ৪-৩০টায় এই দুটি দল সম্মিলিতভাবে দুদিক থেকে পাক অবস্থানের উপর আক্রমণ চালায়। সঙ্গে সঙ্গে মুজিব ব্যাটারী গোলন্দাজ বাহিনীও ফটিকছড়ির উপর আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণ টিকতে না পেরে রাত ১২টার পর পাকসেনারা সমস্ত অস্তশস্ত্র, গোলাবারুদ, বিছানাপত্র ফেলে পিছনেব দিকে পালিয়ে যায়, ফলে ফটিকছড়ি শত্রুমুক্ত হয়। এই যুদ্ধে আমাদের দু'জন শহীদ হয়, অপরদিকে শত্রুপক্ষের কমপক্ষে ৩০/৪০ জন হতাহত হয়। এই সময়ে খবর আসে যে পাকসেনাদের একাটি শক্তিশালী দল তাদের রামগড় অবস্থান পরিত্যাগ করে মানিকছড়ির পথে ফটিকছড়ির দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এই সংবাদ পেয়ে ৪র্থ বেঙ্গল থেকে দ'টি প্লাটুন এবং মর্টার প্লাটুন এই দলটিকে বাধা দেবার জন্য মানিকছড়ির রাস্তায় পাঠানো হয়। আমাদের প্লাটুনগুলো পাকসেনাদের মানিকছড়ির রাস্তায় সাফল্যের সঙ্গে এ্যামবুশ করতে সমর্থ হয়। পাকসেনারা অতর্কিত আক্রান্ত হয়ে নাজিরহাটের দিকে পালিয়ে যায়। ১২ই ডিসেম্বর ভোরে ফটিকছড়ি থেকে ৪র্থ বেঙ্গল চট্রগ্রামের দককে অগ্রসর হয়। ২/৩ ঘণ্টা পর প্রায় ৯/১০ টার সময় নাজিহাট নদীর পাড় থেকে পাকসেনারা আমাদের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালিয়ে আমাদের অগ্রযাত্রায় বাধা দেয়। ক্যাপ্টেন গাফফার নদীর নিকটস্থ একটি দোতলা বাড়ি থেকে পাকসেনাদের অবস্থানের তথ্য সংগ্রহ করে। খবরাখবর নিয়ে বোঝা যায় যে, পাকসেনাদের ২৪তম ফ্রন্টিয়ার ফোর্স তাদের প্রায় তিনটি কোম্পানী ও বেশ কিছুসংখ্যক ইপিসি-এএফসহ নাজিরহাট নদীর তীর বরাবর একটি শক্তিশালী অবস্থানের নিয়ে আছে। ১৩ই ডিসেম্বর পাকসেনাদের সম্বন্ধে আরো তথ্য সংগ্রহ করা হয় এবং তার পরই পাক অবস্থানের উপর গোলাবর্ষন করা হয়। কিন্তু শত্রুদের অবস্থান এত শক্তিশালী ছিল যে চার ঘণ্টা ধরে যুদ্ধ চালানোর পরও পাকসেনারা আমাদের আক্রমণকে প্রতিহত করে। সুতরাং এভাবে আক্রমণ চালিয়ে কোন লাভ নেই মনে করে অন্য পন্থা অবলম্বনের সিদ্ধান্ত সেয়া হয়। এবং সেজন্য আমাদের সৈন্যদেরকে কিছুটা পিছিয়ে নেয়া হয়। এই সময় একজন পাকসেনা আমাদের হাতে জীবিত ধরা পড়ে। মৃত সেই পাকসেনার কাছ থেকে পাকসেনাদের প্রতিরক্ষাব্যূহ সম্বন্ধে আরো সঠিক খবর জানা যায়। সেখানে জানা যায় ২৪তম ফ্রন্টিয়ার-এর মেজর আশেকএই প্রতিরক্ষাব্যূহের নেতৃত্ব দিচ্ছে। এই প্রতিরক্ষ্যব্যূহের শক্তি প্রায় এক ব্যাটালিয়নের মত। নদী বরাবর ব্যাটালিয়নটি অসংখ্যা বাঙ্কার তৈরী করে তাদের প্রতিরক্ষাব্যূহ সুদৃঢ় করেছে। কিন্তু এদের নজর ফটিকছড়ির দিকে বেশী থাকাতে পশ্চিম ভাগ বেশী শক্তিশালী নয়। অতি অল্পসংখ্যক সৈন্য দিয়ে পশ্চিমের চা বাগানের দিকে রক্ষাব্যূহ রচনা করা হয়েছে এই গুরুত্বপূর্ন তথ্য পেয়ে পশ্চিমের চা-বাগানের দিক থেকে পাকসেনাদের উপর আক্রমনের পরিকল্পনা নেয়া হয়। পরিকল্পনা অনুযায়ী লেঃ শওকতের নেতৃত্বে গণবাহিনীর একটি কোম্পানী চারঘণ্টা আগে নাজিরহাট এবং চট্রগ্রামের রেলপথের মাঝে পাকসেনাদের অবস্থানের উপর অতর্কিত আক্রমণ চালায়। এ আক্রমণে তারা এত হতভম্ব হয়ে পড়েছিল যে, আমাদের আক্রমণে বাধা পর্যন্ত দিতে পারেনি এবং শত্রুরা ঘুম থেকে উঠেই দেখতে পায় আমরা তাদেরকে

পিছন দিক থেকে আক্রমণ চালিয়েছি। উপায়ন্তর না দেখে সবকিছু ফেলে তারা চট্রগ্রামের দিকে পালাতে থাকে। পালাবার পথে আমাদের মর্টারের এবং মেশিনগানের গুলিতে অনেক পাকসৈন্য হতাহত হয়। প্রায় ৪০ জন হতাহত পাকসেনাকে আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে পাই। ৮জন পাকসেনা বন্দী হয়, ৪৯জন ইপিসিএএফ অস্ত্রশস্ত্রসহ আত্মসমর্পণ করে। প্রচুর গোলাবারুদ ও অন্যান্য জিনিসপত্র আমাদের হস্তগত হয়। রেশন বোঝাই কয়েকটি ট্রাকও আমাদের দখলে আসে। পালাবার সময় পূর্ব থেকে লেঃ শওকতের গণ-বাহিনীর কোম্পানীও পাকসেনাদের উপর আক্রমণ চালায় এবং অনেককে হতাহত করে। পাকসেনারা রাস্তা ছেড়ে গ্রামের মধ্যে দিয়ে চট্রগ্রামে পালিয়ে যেতে সমর্থ হয় ১৪ই ডিসেম্বর নাজিরহাট সম্পূর্ণরুপে শত্রুমুক্ত হয়। আমাদের একজন শহীদ ও ১জন সৈনিক আহত হয়। পাকসেনারা নাজিরহাট সড়কসেতু আগে থেকেই ধ্বংস করে দিয়েছিলো। সেজন্য নাজিরহাট থেকে চট্রগ্রামের দিকে অগ্রযাত্রা একদিন দেরি হয়ে যায়। নাজিরহাটের স্থানীয় জনগণের সাহায্যে সেই সেতুটির আংশিক পুনর্নির্মাণ করা সম্ভব হয় এবং ১৫ই ডিসেম্বর নাজিরহাট থেকে চট্রগ্রামের দিকে আমাদের অগ্রাভিযান পুনরায় শুরু হয়। সকালে হাটহাজারী পৌছার পর ১০ম বেঙ্গলের সঙ্গে যোগাযোগ হয়। ১০ম বেঙ্গল মেজর জাফর ইমামের নেতৃত্বে সীতাকুণ্ড হয়ে চট্রগ্রামের দিকে এগিয়ে আসছিল। হাটহাজারীতে যোগাযোগের পর 'কে-ফোর্স'-এর ১০ম বেঙ্গল ও ৪র্থ বেঙ্গল সম্মিলিতভাবে অগ্রসর হয়ে চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শত্রুমুক্ত করে। ১৬ই ডিসেম্বর সকালে এই সম্মিলিতবাহিনী চট্রগ্রামে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অগ্রসর হয়ে চট্রগ্রাম শহর আক্রমণের প্রস্তুতি নেয়। এই সময় বাংলাদেশ ফোর্সেস হেডকোয়পার্টার আক্রমণে স্থগিত রাখার নির্দেশ পাঠায়। আরো খবর আসে যে, পাকসেনারা ওইদিন আত্মসমর্পণ করবে। ১৬ই ডিসেম্বর বিকাল ৪-৩০ মিনিটে পাকসেনাদের এক ডিভিশন সৈন্য 'কে-ফোর্স-এর কিট অস্ত্রশস্ত্র সহ আত্মসমর্পন করে। পাকনোদেরকে ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজ, চট্রগ্রাম সেনানিবাস, নৌঘাঁটি ট্রানজিট ক্যাম্প প্রভৃতি জায়গায় বন্দী করে রাখা হয়। সমস্ত চট্রগ্রাম 'কে-ফোর্স'-এর নিয়ন্ত্রন আসে। স্বতঃস্ফুর্ত জনগণ বিজয়মাল্যে ভুষিত করে আমাদের বিজয়ী বীর সৈনিকদের নিয়ে বিজয় উল্লাসে শহর প্রদক্ষিণ করে।

১১ই এবং ১২ই নভেম্বর ৯ম বেঙ্গলের 'এ' কোম্পানী এবং 'বি' কোম্পানী কৃষ্ণপুর ও বগাবাড়ি অবস্থান থেকে পাকসেনাদের অবস্থানের উপর আক্রমণ চালিয়ে তাদেরকে কুমিল্লার দিকে আরো পিছু হটিয়ে দেয়। দু'দিনের যুদ্ধে পাকসেনাদের ১৪জন নিহত ও ৭ জন আহত হয়। আমাদের পক্ষে ২ জন শহীদ এবং একজন আহত হয়। এই সময় ৪র্থ বেঙ্গল শালদা নদীর দিক থেকে পাকসেনাদের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছিল। এই দুই ব্যাটালিয়নের আক্রমণে পাকসেনারা পরাস্ত হয়ে শালদা নদী কসরা; মন্দভাগ প্রভৃতি এলাকা সম্পূর্নরুপে পরিত্যাগ করে নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে কুমিল্লাতে আশ্রয় নেয়। ডিসেম্বর মাসের ১লা তারিখে কুমিল্লার উত্তর এলাকা সম্পূর্নরুপে শত্রু মুক্ত হওয়ার পর চারটি সেক্টর কোম্পানীকে এই এলাকা মোতায়েন রেখে ৯ম বেঙ্গলকে কুমিল্লার দক্ষিণ পূর্বে মিয়ারবাজার এলাকায় সমাবেশ করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়। ডিসেম্বর মাসের ২ তারিখে ৯ম বেঙ্গল মেজর আইনউদ্দিনের নেতৃত্বে মিয়াবাজারের দিকে অগ্রসর হয়। মিয়াবাজারে ক্যাপ্টেন মাহবুবের ছয়'টি সেক্টর কোম্পানীও তাঁর সঙ্গে যোগ দেয়। ৩রা ডিসেম্বর সকালে এই সম্মিলিত বাহিনী মিত্র বাহিনীর কামানের সহায়তায় মিয়াবাজারে পাকসেনাদের প্রতিরক্ষাব্যূহের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। পাকসেনারা এ আক্রমণের মুখে টিকতে না পেরে কুমিল্লার দিকে পিছু হটে যায়।মিয়াবাজারে শত্রুমুক্ত করার পর ৯ম বেঙ্গলের একটি দলকে লাকসামের দিকে অগ্রসর নির্দেশ দিয়ে মেজর আইনউদ্দিন কুমিল্লা আক্রমণের জন্য অগ্রসর হতে থাকে। যাত্রাপথে শত্রুর প্রতিরক্ষাব্যূহ ধ্বংস করে অগ্রাভিযানের গতি অব্যাহত রেখে ৪ঠা ডিসেম্বরের ভোরে মেজর আইনউদ্দিনের দল কুমিল্লার বিমানবন্দর এলাকা পর্যন্ত পৌছতে সমর্থ হয়। কুমিল্লা বিমানবন্দরের নিকট পাকসেনাদের একটি শক্তিশালী ঘাঁটি ছিল। ৯ম বেঙ্গল মিত্রবাহিনীর গোলন্দাজ বাহিনীর সহায়তায় এই ঘাঁটিটির উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। পাকসেনারা এই আক্রমণ পতিহত করতে না পেরে কুমিল্লা শহরের দিকে পালিয়ে যায়। দুপুর পর্যন্ত সমস্ত কুমিল্লা বন্দর এলাকা শত্রুমুক্ত হয় এবং ৯ম বেঙ্গলের দুটি কোম্পানী কুমিল্লার দক্ষিণ এবং পূর্ব দিক (রাজগঞ্জ বাজার) থেকে কুমিল্লা শহরের অভ্যান্তরে প্রবেশ

করে। ৯ই ডিসেম্বর পর্যন্ত পাকসেনাদের আরো বিতাড়িত করে ময়নামতির পথে রেলওয়ে ক্রসিং এলাকা পর্যন্ত শত্রুমুক্ত করে। ৯ম বঙ্গলের আক্রমণের মুখে টিকতে না পেরে কুমিল্লা শহরে অবস্থানরত পাকসেনা ময়নামতি সেনানিবাসের দিকে পালিয়ে যায়। এই সময়ে হাজার হাজার জনতা আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে পাকসেনাদের পেছনে অগ্রসর হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে; পাকবাহিনীর সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধে এই জেলা শহরটি সর্বপ্রথম মুক্তিবাহিনী কর্তৃক শত্রুমুক্ত হয়। ১০ই ডিসেম্বর ৯ম বেঙ্গল কুমিল্লা শহরের রেলওয়ে ক্রসিং থেকে ময়নামতি ছাউনীর দিকে অগ্রসরহতে থাকে। এই অগ্রাভিযানের সময় মিত্র বাহিনীর তিনটি ট্যাংক ৯ম বেঙ্গলের সহায়তার জন্য মেজর আইনউদ্দিনের কমাণ্ডের অধীনে দেয়া হয়। রেলওয়ে ক্রসিং থেকে দেড় মাইল পশ্চিমে অগ্রসর হওয়ার পর ৯ম বেঙ্গলের অগ্রবর্তী দলগুলি টেক্সটাইল মিল এলাকার সামনে পাকসেনাদের গোলাগুলির সম্মুখীন হয়। ৯ম বেঙ্গলের আরেকটি কোম্পানী কোর্টবাড়ির পথে ময়নামতির দক্ষিণ দিক থেকে অগ্রসর হচ্ছিলো। এই দলটি মিল এলাকায় পাকসেনাদের গোলাগুলির সম্মুখীন হলেও অগ্রবর্তী দলগলো পাকসেনাদের অবস্থানগুলো দখল করার চেষ্টা করে। কিন্তু একঘণ্টা 'রেকি' করার পর বোঝা যায়, পাকসেনারে অবস্থানগুলো খুবই শক্তিশালী। অবস্থানগুলোতে মেশিনগান এবং ১০৬ আর-আর বাঙ্কারের ভিতর রেখে কুমিল্লা-ময়নামতির রাস্তাকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিরক্ষার প্রস্তুতি নিয়েছে। এই সংবাদ আমাদের অগ্রবর্তী দলগুলো মেজর আইনউদ্দিনকে অবগত করে। মেজর আইনউদ্দিন পাকসেনাদের অবস্থানগুলোর উপর চাপ অব্যাহত রাখার নির্দেশ দিয়ে নিজে আরো সম্মুখবর্তী অবস্থানে এস পাকসেনাদের সম্বন্ধে বিস্তারিত সংবাদ সংগ্রহ করে। সংবাদ সংগ্রহের পর সম্পূর্ন ব্যাটালিয়ান দিয়ে মিত্র বাহিনীর ট্যাঙ্কের সহায়তায় আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নেয়। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরদিন ভোরে মিত্র বাহিনীর ট্যাঙ্কগুলোকে সড়কের বাঁ দিক দিয়ে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেয় এবং ৯ম বেঙ্গলকে উত্তর দিক থেকে আক্রমনের পরামর্শ দেয়। পরিকল্পনা অনুযায়ী মিত্র বাহিনী ট্যাঙ্কগুলো রাস্তার দাক্ষণ দিক দিয়ে অগ্রসর হতে থাকে। কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর পাকসেনারা ট্যাঙ্কগুলোর উপর ১০৬-আর-আর এর সাহয্যে প্রচন্ড গোলাবর্ষন করে। মিত্রবাহিনীর একটি ট্যাঙ্ক পাকবাহিনীর গোলায় বিনষ্ট হয়ে যায়। শত্রুপক্ষের প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে ট্যাঙ্কগুলির অগ্রসর হওয়া উচিত নয় ভেবে মেজর আইনউদ্দিন ট্যাঙ্কগুলোকে নিজ নিজ অবস্থানে লুক্কায়িত অবস্থান থেকে পাকসেনাদের বাঙ্কারগুলির উপর আক্রমন চালাবার নির্দেশ দেয়। অপরদিকে ৯ম বেঙ্গল তাদের আক্রমণ আরো জোরদার করে। এ সাঁড়াশী আক্রমণের মুখে পাকসেনারা দারুণভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। ১৫ই ডিসেম্বর সকালে পাকসেনাদের সর্ব বামদিকে সাদা পতাকা উড়ে দেখা যায় এবং কিছুক্ষণ পর সেই জায়গা থেকে গোলাগুলিও বন্ধ হয়। মেজর আইনউদ্দিন সাদা পতাকা দেখে আক্রমণ স্থগিত রাখার নির্দেশ দেয় এবং শত্রুসেনাদের উদ্দেশ্যে আত্মসমর্পণের আদেশ দেয়।প্রায় আধঘন্টাপর গোলগুলির স্তিমিত হয়ে এলে উত্তর দিকের পুকুর পাড়ের উঁচু বাঁধের উপর প্রায় ২৫/৩০ জন পাকসেনাকে অস্ত্রশস্ত্রসহ সাদা পতাকা হাতে সামনের দিকে অগ্রসর হতে দেখা যায়।মেজর আইনউদ্দিন তৎক্ষণাৎ সেইসব পাকসেনাদের আরো সামনে আসতে নির্দেশ দেয়। পাকসেনারা নির্দেশমত মজের আইনউদ্দিনের কাছে তাদের অস্ত্রশস্ত্র সমর্পনকরে। এই সময় হাজার হাজার স্থানীয় জনসাধারণ পাকসেনাদের ঘেরাও করে তাদেরকে বেঁধে ফেলে। বাকি পাকসেনারা যারা তখনো বাঁধ থেকে সামনের দিকে আসছিল তারা ভয়ে সামনের দিকে না এসে পেছনের দিকে পালাতে থাকে। মেজর আইনউদ্দিন তাদেরকে পুনরায় আত্মসমর্পণের আদেশ দেওয়া সত্ত্বেও পাকসেরারা নিজেদের বাঙ্কারে আশ্রয় নেয়।আত্মসমর্পণের আদেশ না মানায় মেজর আইনউদ্দিন ৯ম বেঙ্গলকে পুনরায় আক্রমণের নির্দেশ দেয়। প্রায় ৪০ঘণ্টা আক্রমণের পর শত্রুঅবস্থানটি ৯ম বেঙ্গলের হস্তগত হয়। প্রায় ১৫০ জন পাকসেনা আত্মসমর্পন করে।অবশিষ্ট পাকসেনা ময়নামতি ছাউনিতে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। অনেক অস্ত্রশস্ত্র আমাদের হস্তগত হয়। পাকবাহিনীর ৩৯তম পাঞ্জাব রেজিমেন্ট এই অবস্থান প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত ছিল। অবস্থানটি শত্রুমুক্তকরার পর ৯ম বেঙ্গল ক্ষিপ্র গতিতে অগ্রসর হয়-ময়নামতি সেনানিবাসের উপকেণ্ঠ পর্যন্ত শত্রুমুক্ত করে। ৯ম বেঙ্গল পাকসেনাদের শক্তিশালী প্রতরক্ষাব্যূহের সম্মুখীন হয়। পাকসেনারা ময়নামতি সেনানিবাসের উচু ভুমির সহায়তায় এই ঘাঁটিটিকে একটি দর্গে পরিণত করেছিল। চতুর্দিকে পরিখা খনন এবং বাঙ্কার তৈরী করে প্রতিরক্ষাকে অত্যন্ত শক্তিশালী করে তুলেছিল।

৯ম বেঙ্গল উত্তর এবং দক্ষিণ দিক থেকে ময়নামতি এলাকা সম্পূর্ণরূপে ঘিরে ফেলে। কুমিল্লার হাজার হাজার গেরিলা ৯ম বেঙ্গলের সঙ্গে যোগ দিয়ে পশ্চিম দিকে অবস্থান নিয়ে ময়নামতিকে ঢাকা থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। ১৫ তারিখ বিকেলে অবরোধ সম্পন্ন হয়। এ সময় পাকসেনাদেরকে আত্মসমর্পণের আদেশ দেয়া হয়। পাকসেনারা সেই আদেশ প্রত্যাখ্যান করে তাদের প্রতিরক্ষার কাজে অটল থাকে। ময়নামতি ছাউনীতে চূড়ান্ত আক্রমনের জন্য ৯ম বেঙ্গল গেরিলা এবং মিত্র বাহিনী প্রস্তুতি নেয়। ১৬ই ডিসেম্বর ময়নামতি গ্যারিসন কমান্ডার আত্মসমর্পণের ইচ্ছা প্রকাশ করে সংবাদ পাঠায়। সেই দিনই বিকেল চারটায় ময়নামতি গ্যারিসনে অবস্থানরত পাকসেনারা অন্যান্য জায়গার মত আনুষ্ঠানিকভাবে ৯ম বেঙ্গল এবং মিত্র বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে। আত্মসমর্পণের পর সমস্ত পাকসেনাকে বিভিন্ন জায়গাতে ৯ম বেঙ্গলের তত্ত্বাবধানে স্থানান্তরিত করা হয় এবং তাদের অস্ত্রশস্ত্র বেঙ্গল লাইনে একত্রে জমা করে। ৯ম বেঙ্গল আবার জয়ী হয়ে তাদের পুরানা বেঙ্গল লাইনে ফিরে এসে বিজয় উল্লাসে ফেটে পড়ে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ন’’মাসের পূর্বে এখান থেকে যে ৪র্থ বেঙ্গলের সৈনিকরা স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করার জন্য দেশমাতৃকার প্রতি পাণের টানে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, সেই ৪র্থ বেঙ্গলেরই অধিকাংশ সৈনিক ও নতুন রিক্রুট করা সৈনিকদের নিয়ে যুদ্ধকালীন বিপর্যস্ত সময়ে ৯ম বেঙ্গল রেজিমেন্ট গড়ে উঠেছিল।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৪। ২নং সেক্টরে সংঘটিত যুদ্ধ সম্পর্কে অন্যান্যের প্রদত্ত বিবরণ	বাংলা একাডেমীর দলিলপত্র	---------- ১৯৭১

সাক্ষাৎকারঃ মেজর আইনউদ্দিন*

॥ গোপিনাথপুর এ্যামবুশ (কসবা, কুমিল্লা) ॥

সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে খবর পেলাম যে, কুমিল্লা থেকে দুটি কোম্পানী পাকসেনা কসবা হয়ে সকাল ১০টার দিকে গঙ্গাসাগর আসবে। খবর পেয়ে মনতালি থেকে ৪৫ জন মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে ২টি মেশিনগানসহ এবং বেঙ্গল রেজিমেন্টের কিছু ছেলে নিয়ে রাতের বেলায়ই কোথায় কোথায় এ্যামবুশ করতে হবে তার স্থান নির্দিষ্ট করে দেই। স্থান হিসাবে গোপিনাথপুর গ্রামের কাছে রেললাইনের ব্রীজের উত্তর ও দক্ষিণে এ্যামবুশ করার কথা বলি। পাকবাহিনী এ্যামবুশ-এর আওতায় আসার পরপরই মুক্তিযোদ্ধারা একযোগে আঘাত হানে। পাকসেনাদের দুটি কোম্পানীর মাত্র ১০/১২ জন বেঁচে যায়। এ এ্যামবুশের জন্য কৃতিত্বের অধিকারী ছিল হাবিলদার আবুবকর। এ্যামবুশকালে সেই পাকসেনাদের কাছ থেকে ১২টি এল এম জিসহ প্রায় দেড়শ' অস্ত্র উদ্ধার করে। কিছু অস্ত্র পানিতে ডুবে যাওয়ায় উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। এই এ্যামবুশে পাকবাহিনীর একজন মেজর নিহত ও একজন ক্যাপ্টেন আহত হয়। মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে একজন আহত হয়। এই অপারেশনের পর মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবল বেড়ে যায়।

॥ চারগাছ অপারেশন (কসবা, কুমিল্লা) ॥

আমি মনতলা (আগরতলা) থেকে এক কোম্পানী মুক্তিযোদ্ধাকে কসবা, নবীনগর, বাঞ্ছারামপুর এই তিনটি থানা অপারেশন করার জন্য অস্ত্র দিয়ে পাঠালাম। সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিকে কোম্পানীতে ১৪৫ জন সৈন্য ছিল। কোম্পানী দেড় মাস ধরে উল্লিখিত থানাতে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অপারেশন করে। একদিন পাকবাহিনীর একটি দল লঞ্চযোগে চারগাছ এলাকায় আসে এবং দু'দিন সেখানে থাকে। এ সংবাদ পেয়ে মুক্তিযোদ্ধারা ওঁৎ পেতে থাকে। পাকসেনাদের ঐ লঞ্চটি যখন চাঁদপুরের দিকে অগ্রসর হতে থাকে তখন মুক্তিযোদ্ধারা লঞ্চের পিছন দিক থেকে গুলি করতে আরম্ভ করে। পাকাবাহিনী লঞ্চ দুটির গতি ঠিক করতে না পেরে এক যায়গায় আটকিয়ে ফেলে। মুক্তিযোদ্ধাদের আঘাতে পাসনোদের অধিকাংশই খতম হয়। কিছু পাকসেনা সাঁতরিয়ে অন্য গ্রামে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। ৪/৫ জন সৈন্য এসাইল বোটে করে লঞ্চ থেকে নেমে পালিয়ে যেতে চেষ্টা করে কিন্তু মক্তিযোদ্ধারা ঐ বোটটিকে গুলি করে ঘায়েল করে। পাকসেনারা প্রায় সবাই খতম হলেও একজন পাকসেনা বোটের মধ্যে লুকিয়ে ছিল। তাকে হাতেনাতে ধরার জন্য একজন মুক্তিফৌজ সাঁতরিয়ে এসাইল বেটের কাছে যেতেই পাকসেনাটি উঠে মুক্তিযোদ্ধাটিকে হত্যা করে। পরে মুক্তিযোদ্ধারা পাকসেনাটিকে হত্যা করতে সমর্থ হয়। দুটি লঞ্চের ভিতর যে সমস্ত পাকসেনা জীবিত ছিল তারা অয়ারলেসে সংবাদ পাঠায় তাদের উদ্ধার করার জন্যে। পরে পাঁচটি লঞ্চভর্তি পাকসেনা আসে তাদের উদ্ধার করার জন্য।

(অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহের ঘটনা)

* ১৯৭১ সালে এ সাক্ষাৎকার গৃহীত হয়। একাত্তরের মার্চে আইনউদ্দিন ক্যাপ্টেন হিসাবে কুমিল্লা সেনানিবাসে কর্মরত ছিলেন। বর্তমানে তিনি ব্রিগেডিয়ার পদে কর্মরত আছে।

॥ কালাছড়া চা বাগান অপারেশন (ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কুমিল্লা) ॥

লেঃ হারুন রশীদ কালাছড়া চা বাগান অপেরশন পরিচালনা করেন। এই চা বাগানটি এরপর সবসময় মুক্ত ছিল। এই মুক্তাঞ্চলটি বাংলাদেশের সেনাদের কাছে অতি প্রিয় ছিল, কারণ পরবর্তীকালে এই চা বাগানটি পাকসেনারা আর কখনই তাদের নিয়ন্ত্রণে নিতে পারেনি।

পাকসেনাদের একটি দল চা বাগানে অবস্থান করছে, লেঃ হারুনর রশীদ এ খবর পেয়ে তাদের গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য লোক নিয়োগ করেন। পাক বাহিনীর দুটি কোম্পানী ঐ বাগানে অবস্থান করছিল। লেঃ হারুনর রশীদের অধীনে দুটি কোম্পানী সৈন্য ছিল। নিয়মমাফিক পাক বাহিনীকে আক্রমণ করতে হলে দুটি ব্যাটালিয়ন দরকার। কিন্তু লেঃ হারুন সাহস করে প্রস্তুতি নিলেন। দুটি কোম্পানীর একটির কমাণ্ডার ছিলেন শহীদ হাবিলদার হালিম এবং অপর কোম্পানীর দায়িত্বে লেঃ হারুন নিজে ছিলেন। হারুন রশীদই বলতে গেলে দুটি কোম্পানীর সার্বিক দায়িত্বে ছিলেন। সে সময় অন্য কোন অফিসার না থাকায় হাবিলদার শহীদ হালিমকে একটি কোম্পানী পরিচালনার ভার দেয়া হয়।

একদিন রাতে মুক্তিযোদ্ধাদের দুটি কোম্পানী দুটি দলে ভাগ হয়ে পাক অবস্থানের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। মুক্তিযোদ্ধারা পাক অবস্থানে আঘাত হানলো। হাবিলদার হালিম যে কোম্পানী পরিচালনা করছিল ঐ কোম্পানীর একজন যোদ্ধা প্রথমেই শহীদ হওয়াতে তারা আর সামনে অগ্রসর হতে পারেনি। কিন্তু লেঃ হারুনর রশীদ তাঁর কোম্পানী নিয়ে পাকবাহিনীর ক্যাম্প আক্রমণ করে। এ আক্রমণে পাকবাহিনীর অনেক সৈন্য হতাহত হয়। শেষ পর্যন্ত পাকবাহিনীর কিছু সৈন্য বাঙ্কারে আশ্রয় নেয়। মুক্তিযোদ্ধারা বাঙ্কারে গ্রেনেড চার্জ করে অনেক পাকসেনাকে হত্যা করে। হাবিলদার হালিম তাঁর দলের একজন সেনা শহীদ হওয়ায় আর সামনে অগ্রসর হতে না পারায় লেঃ হারুনর রশীদ নিজের জায়গা দখল করে শহীদ হালিমের লক্ষ্যস্থলে অবস্থানরত পাকবাহিনীকে আক্রমণ করে এবং তাদের পর্যদস্ত করে স্থানটি দখল করে নেয়। ঐ সংঘর্ষে পাকবাহিনীর কাছ থেকে মুক্তিযোদ্ধারা এল-এম-জিসহ একশ অস্ত্র উদ্ধার করে। এই সংঘর্ষে মুক্তিযোদ্ধাদের ৭ জন আহত ও দুইজন শহীদ হয়। পাকিস্তানীরা ২৭ জন সেনার মৃতদেহ পাওয়া যায়। যুদ্ধের পরদিন সকালে ঐ স্থানের সাধারণ নাগরিকরা ঐ সমস্ত পাকবাহিনীর মৃতদেহ বহন করে আনে। পরে তাদেরকে আমার তত্ত্বাবধানে দাফন করা হয়।

(অক্টোবর মাসের শেষের দিকের ঘটনা)

॥ চন্দ্রপুর অপারেশন (কসরা স্টেশন থেকে তিন মাইল উত্তরে) ॥

১৮ই নভেম্বর তারিখে ভারতীয় ব্রিগেডিয়ার ‘তুলে’ আমাকে ডেকে বলেন যে, তারা যৌথ উদ্যোগে চন্দ্রপুর ও লাটুমুড়া হিল আক্রমণ করবে। সেখানে পাকিস্তানী সেনারা অবস্থান করছিল। আমাকে পরিকল্পনা করতে বলেন। আমি ব্রিগেডিয়ার সাহেবকেই পরিকল্পনা করার অনুরোধ জানালাম। তিনি পরিকল্পনা করলেন। কিন্তু ব্রিগ্রেডিয়ার সাহেবের পরিকল্পনা আমার মনঃপূত হলো না। কারণ চন্দ্রপুর গ্রামের সাথেই ছিল লাটুমুড়া হিল (পাহাড়)। আর চন্দ্রপুর আক্রমণ করলে লাটুমুড়া হিল থেকে পাকসেনারা আমাদের অতি সহজেই ঘায়েল করতে পারবে। কিন্তু তিনি আমার কোন কথা না মেনে বলেন, আমাদের আক্রমণে পাকবাহিনী পালিয়ে যাবে। তিনি ট্যাঙ্ক নিয়ে এসে রাত্রিতে টহল দিতেন যাতে পাকসেনারা বুঝতে পারে এলাইড ফোর্স এর প্রচুর ট্যাঙ্ক আছে। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে চন্দ্র পুর আক্রমণ করা হলো। আমি তাকে অনুরোধ করলাম আমার দলের যে ক’জন সেন্য যাবে আপনাদেরও ততজন সৈন্য যেতে হবে। ব্রিগেডিয়ার সাহেব এ প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেলেন। ভারতীয় একটি কোম্পানীর নেতৃত্বে ছিলেন একজন মেজর। বাংলাদেশ বাহিনীর কোম্পানী পরিচালনা করেন লেঃ খন্দকার আবদুল আজিজ। পরিকল্পনা মোতাবেক বাংলাদেশ বাহিনীর সেনারা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ভিতর দিয়ে এবং ভারতীয় বাহিনী ভারত সীমান্তের ভিতর দিয়ে ২২ শে নভেম্বর চন্দ্রপুর আক্রমণ করে। এই আক্রমণে বাংলাদেশ ও ভারতীয় বাহিনীর সৈন্যরাই শহীদ হয় বেশী। ভারতীয় বাহিনীর কোম্পানী কমান্ডার শিখ মেজর

এবং তিনজন জুনিয়র কমিশন অফিসারসহ সর্বমোট ৪৫ জন সেনা ঐ যুদ্ধে শহীদ হয় এবং মুক্তিবাহিনীর শহীদ হয় ২২ জন। আহত হয় ৩৪ জন সৈন্য। আমাদের অফিসার লেঃ খন্দকার আবদুল আজিজ এই যুদ্ধে শহীদ হন। ২২ তারিখ রাত্রিতে চন্দ্রপুর আক্রমণ করলে পাকবাহিনীর সাথে সারাত যুদ্ধ হয় এবং পাকবাহিনী শেষ পর্যায়ে পিছনের দিকে চলে যায়। পাকসেনা ও আমাদের যৌথ বাহিনী উভয়ই আর্টিলারীর গোলাবর্ষণ করতে থাকে। আমাদের যৌথ বাহিনী যুদ্ধ করে চন্দ্রপুর দখল করে নেয় কিমত্ম পুনরায় পাকবাহিনী চন্দ্রপুর দখল করে নেয়। ২৩ তারিখ বিকালে আমি চন্দ্রপুরে আহত ও নিহত সেনাদের আনবার জন্য কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধাকে পাঠাই। কিন্তু তাদের কয়েকজন পাকবহিনীর হাতে শহীদ হয়। মাত্র ৮ চনের মৃতদেহ নিজ এলাকায় ফিরিয়ে আনতে মুক্তিবাহিনী সক্ষম হয়।

যুদ্ধশেষে পাকবাহিনীর সেনারা মুক্তিবাহিনীর মৃতদেহগুলি আখাউড়া নিয়ে গিয়ে জনতাকে দেখান যে তারা মুক্তিবাহিনীকে হত্যা করেছে। তারা গৌরব অনুভব করে। ভারতীয় গান পজিশনে ৬ জন সৈন্য শহীদ হয়। এতে বোঝা যায় পাকবাহিনীর গোলাবর্ষণ ছিল খুব মাপের এবং দক্ষ সৈন্য দ্বারা পরিচালিত।

এই যুদ্ধের পর বাংলাদেশ বাহিনীর সোনদের মনোবল ভেঙ্গে পড়ে। কারণ এমনভাবে শহীদ আর কোন রণাঙ্গানে হয় নাই। মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবল ফিরিয়ে আনতে আমাকে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল।

(২২ শে নভেম্বরের ঘটনা)

‘DATURMAURA’ THEATRE

1. **Daturmura: -** It is about a mile from Bangladesh and Agartala Border. It is the name of small village under Quasba Police Station. In the local language any high ground surrounded by a low ground or water is called Mura. This mura I am talking of is a mura which has a village by the name Daturmura. Throughout nine months this village and its surrounding area was free from Pakistan Army as well as Mukti Bahini. Militarily this ground was not at all important. No line of communication passes through this area. A lot of families from Gopinathpur, Maniand, Nemtabad and other village migrated to this village and surrounding villages out of fear of Pakistan Army’s atrocities. During liberation war this area was just like heaven for Bengalees.

2. Sector Commander Lieutenant Colonel Khaled Musharraf was requested by a group of war reporter from London led by Mrs. Marry to arrange a theatre of shooting inside Bangladesh to project the activities of Mukti Bahini, like wise Sector Commander No. 2 sector briefed Sub-Sector Commander Major Muhammad Ainuddin to make a base of Mukti Bahini at a place where there is no enemy threat and the place is safe for the foreign war reporters. The reporters from UK who came all the way from London to record action were enthusiastic to photograph our actions but used to be discouraged by us for obvious reasons. We did not like that some civilian reporter who are national asset, should take a risk of life for the sake of their professional efficiency. As for us we had a cause to fight. This cause was at national level. Unless we, Bengali could liberate our mother land we could not get a free, homeland to stay and not survive as Bengali nation with the dignity of free citizen. In some cases individual cause was also there other than national cause. To be very frank I could get back my wife and two daughter who were detained by Pakistan army at Ispahani School in Comilla Cantonment who were everything in my life. I had to fight to drive away occupation army from the country to

rescue my family. But as for the war reporters it was their profession or hobby through which they would earn a lot of money. We, freedom fighter, could play with our life but for them it was not proper as per our opinion in those days. But the lady, Mrs. Marry and her camera man and recorder seemed to be quite determined to go on with their mission ignoring the danger of life. The more I used to discourage them about life risk, more they used to be encouraged to carry out the shooting.

3. Briefing-Sector Commander told me to make a base which should give a look of a temporary Guerilla base. The following arrangement had to be there :

a. There should be some cooking utensils so that people understand that guerillas cooked food themselves.

b. Some ammunition boxes in the base with Pakistan Ordnance Factory mark on the boxes to tell people that Mukti Bahini captured arms and ammunition from Pakistan army and caught them.

c. Some small improvised beds on which some freedom fighter sleeping who were out on some prey earlier.

d. Some trenches around the base to cater for local protection.

e. One/two men on tree top who would work as watch man. For this preparation I was given one day and one night. During the day I with escort party carried out the reconnasances and selected Daturmura as the theatre.

4. Arrangement-I deployed a company (about 150 personnel) in that village supported by two 3-inch mortar. One platoon (three platoons and company headquarter make a company) and company headquarter formed the base and base 2nd in Command was Subeder (now Subeder Major) Taher Uddin Sheikh. With mortar I put Subeder (now Subeder Major) Shamsul Haque. One platoon was deployed at (small) Rampur to the west of Daturmura to lay an ambush. Another platoon was put on the north of Daturmura. I sent another ambush party at Jagannatpur also. All the arrangements were tighten up at night. After making all arrangement I was supposed to receive Sector Commander and the reporters in my Camp in between 9 to 10 AM. I did that.

5. It was the month of September. I do not remember the date. But it was the later part of September. I was waiting for them at a ghat near Madhabpur. I saw a group approaching the ghat but I could not see any lady in that group. As they came near my boat I could see a lady but not in a European lady dress. She surprised me by her dress. She dressed with a half shirt, a Khaki trouser and with a jungle boat. The very dress gave me the impression that a female like her can work like a soldier. She shook hand with me as I was introduced by my Sector Commander and said with a smile on her face "Hallow Captain, how do you do?" "Fine, thank you" I said. Then I shook hands with other two members of her group. They were carrying a movie camera with a stand, a still Camera and a tape recorder. The movie camera itself was quite heavy. I saw them carrying these heavy load themselves. We wanted to help them in lifting these instruments, but every time they were refusing with the word "Thank you."

6. Enroute from ghat to the base she was busy in talking to Sector Commander. It was almost an interview. At times she turned round me and ask me some questions. To tell you frankly I was afraid of her, not for any other reason but her question. Before we could reach the base, one freedom fighter came hurriedly through chest deep water to inform us about probable enemy encounter. He was sent by Sub (now Subedar Major) Taher Uddin Sheikh that enemy seen at village Jagannathpur in about a company strength coming towards east. I was no more a shooting theatre. It turned as battle theatre. We were about 100 yards from the base; we beard the sound of own 3 inch mortar firing. Commander gave a smile at me and said "Shamsu in action" Commander asked Mrs. Marry "Encounter started. Do you still insist me to take you ahead?" "Oh! sure Colonel" said Mrs. Marry. Hardly she could finish that sentence; two/three artillery shells landed plus of us. I saw tape recorder in action in recording. I said "Madam, do you know who is firing?" "I understand Definitely Pakistan Artillery. You don't have any Artillery" said Mrs. Marry.

7. Enemy started firing from field guns at normal rate. We hurriedly reached the base and took cover of a house which had mud wall. By the way that was my living room where I had a bed consisting of a blanket, a bed sheet and a rubber pillow. This was originally a Hindu's hose. In one side of the house there was a statue of Kartik. There was another statue of a goose. Artillery shelling continued. While I was thinking of evacuating them (the reporters), one Sepoy came and reported me that enemy one company was trapped by us. I asked him what all he saw and knew. The Sepoy started narrating the story that enemy were in country-boats crossing a canal at a distance of half a mile from our position and out of small arms range of our platoon. Mortal observer did not want to miss the opportunity of dealing with the enemy and called mortal fire. As enemy were in boats on water; mortar firing was not that effecting. But out of chaos one of the nine boats sank and we were apprehending that all the boatmen might have died there.

8. Mrs. Marry straightway got out of the house and requested the Sepoy to accompany her in the scene. Mind you firing was still on we all accompanied her at the forward position. By this time enemy reached a mura near Daturmura at a distance of about 600 to 800 yards. I briefed Mrs Marry and her companies to take cover of jackfruit tree. Bending my head I started moving from one soldier to another soldier to boost up their morale and know about enemy. I saw Mrs. Marry all the time following me and she was followed by her companies (photographer and recorder). The moment enemy detected us enemy started bringing Artillery fire. At times from the mura MG fire started coming at us. Whenever our men saw enemy; they used to fire from Rifles and LMG though it was out of range. I asked them not to fire as it was out of range. But they got so glittery that whenever enemy fired one brust from MG our men returned the fire by Rifle. After a lot of persuation I could control our fire.

9. Whenever I asked any of my troops what he could do with enemy they replied with an exaggerated enemy casualty figure. If I would total up the figures it would be approximate double the strength actually came there. Assessment was based on the fall of enemy after fire. This can be at times like that enemy took position at firing sound.

However, it was an appropriate scene for reporter to take snap and record battle noise of Mukti Bahini and Pakistani troops. All the time Commander and I was worried about an odd shell splinter hitting these dedicated professionalist. Almighty saves them. Though initially they showed that they were battle innoculated but their movement told me that they were civilians.

10. Even after about two hours of this game I did not hear anything about the withdrawal of my troops from Jagannathpur. I was worried about them. That platoon thought that they were in trap by enemy. So they made a long detour via Gopinathpur and north Minarkot to avoid enemy ambush. Subedar (now Subedar Major) Shamsul Haque fired about 30 bombs from 3-inch mortar and literarily plastured that mura where enemy landed after crossing the canel. Casualty on enemy side could not be ascertained. It was about 3.30 PM. I heard from my intelligent personnel that enemy were sending a sizeable body of troops to extricate their troops from Daturmura. By this time the reporters got enough time to do their job and they were mighty happy then to go back. I asked my company to withdraw.

11. These area were thickly populated by locals and migrators. The moment there was exchange of fire from artillery and 3-inch mortar and small arms the civilian started running towards Agartala. I was a horrifying scene. I felt very bad but could not help it. I thought for a durable peace, the temporary inconvenience was accepted. I saw the movie cameraman taking snap of the refugee who were fleeing to India with food, cooking utencils and essentials. Even the animals like cows and dogs also took refuge at India. It was seen that the women were also carrying heavy load on their head and walked through chest deep water and ran for life.

12. For this battle shooting we took much trouble; to the extend of danger of death. But the reporter were not still satisfied. They wanted to carry out some more shooting of Mukti Bahini going on patrolling or going on to lay an ambush. Including Commander we all were demonstrating these. The lady worked as Director and at times correcting the movement of Lieutenant Colonel (now Colonel) Khaled Musharraf (Sector Commander) while leading a patrol. At about 4-30 in the evening she left us by begging leave. Actually it was not for her to beg leave after all these; I was about to beg leave from her ignoring my Commander even. Thanked Commander for having such patience. Mrs Marry with a professional smile on her leaps shook hand with me and said "Thank you Captain. Wish you best of luck. Wish you get back your family soon." She left me at Madhabpur ghat and went away with my Commander.

॥ ৯ম বেঙ্গল রেজিমেন্টের কুমিল্লা শহর দখল ॥

মনতলি (আগরতলা) ক্যাম্প থেকে দু'কোম্পানী সৈন্য নিয়ে আমি সোনামুড়া (ভারত) গেলাম। ২৩শে নভেম্বর সোনামুড়াতে যে ভারতীয় সৈন্য ডিফেন্স নিয়েছিল তাদের কাছ থেকে আমি দায়িত্ব বুঝে নিয়ে বাংলাদেশের দিকে অগ্রসর হই। বাংলাদেশের ভেতরে আরও দুটি কোম্পানী পূর্ব থেকেই অবস্থান করছিল। আমাকে ভারতীয় সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে নির্ভয়পুর (ভারতে) যেতে এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কুমিল্লা দখল করার জন্য বলা হলো। আমি ১লা ডিসেম্বর নির্ভয়পুর গেলাম। সেখানে যাওয়ার পর ব্রিগেডিয়ার টম পান্ডে

কুমিল্লা ও চট্টগ্রাম রাস্তার মাঝে ডিফেন্স নিতে বল্লেন। আমাকে ভারী অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করা হলো। আমি ব্রিগেডিয়ারের নির্দেশ মত ৩ তারিখ রাতে চিওড়া গেলাম। আমরা পৌঁছালে চিওড়া বাজারে ভারতীয় যে এক ব্যাটালিয়ন সৈন্য ডিফেন্স নিয়েছিল (পূর্ব থেকেই) তারা তখন অন্যত্র চলে গেল। পাক সৈন্যবাহিনী চিওড়া বাজারের উত্তর দিকে একটি বাজারে ডিফেন্স নিয়েছিল। চিওড়া পৌঁছানোর পর পরই পাকবাহিনী কোন রকম প্রতিরোধ না করেই পিছনের দিকে চলে গেল। ৫ই ডিসেম্বর সকালে বালুতুফা (কুমিল্লা শহরের পূর্ব পাশে) গিয়ে আমি আমার বাহিনী নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকি। আমি যখন বালুতুফা পৌঁছাই তখন সেখানে যে পাকসেনারা বাঙ্কারে ডিফেন্স নিয়েছিল তার দূরত্ব ছিল মাত্র আট মাইল। আমি ভাবলাম যে, পাকসেনারা যে পাকা বাঙ্কারে ডিফেন্স নিয়েছিল তার দূরত্ব ছিল মাত্র আট মাইল। আমি ভাবলাম যে, পাকসেনারা যে পাকা বাঙ্কারে ডিফেন্স নিয়ে আছে তাদের সরাসরি যুদ্ধ করা অল্পসংখ্যক সেনা নিয়ে সম্ভবপর নয়। তাই পাকসেনাদের পিছনের দিক দিয়ে কমিল্লা শহরে ৬ই ডিসেম্বর প্রবেশ করি। এর ফলে বালুতুফার পাকসেনারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় এবং তারপরই আমি আমার বাহিনী নিয়ে কুমিল্লা শহরে প্রবেশ করি। কুমিল্লা শহরের পূর্ব দিক থেকে ঢুকে আমার কনভয় নিয়ে কুমিল্লা শহরের পশ্চিম দিকে ৭ই ডিসেম্বর দুপুর ১২টার দিকে পৌঁছলাম। দুপুর বারোটার দিকে আমার সঙ্গে ভারতীয় শিখ জাট-এর ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডার টমসনের সঙ্গে ব্রীজের কাছে দেখা দেয়। শিখ জাট ব্যাটালিয়ন কমান্ডারের কাজ ছিল কুমিল্লা বিমানবন্দর আক্রমণ করা। শিখ জাট ব্যাটালিয়ন কামণ্ডার বিমানবন্দর আক্রমন করেছিলেন ৬ই ডিসেম্বর রাতে। এই আক্রমণে শিখ জাট সেনাদের কয়েকজন আহত ও নিহত হয়। পাকসেনারা বিমানবন্দর ছেড়ে চলে যায়। আমার কনভয় যখন কুমিল্লা শহরের পশ্চিমদিকে এগুচ্ছিল তখন শহরের হাজার হাজার জনতা আমাদেরকে স্বাগত জানাতে অগ্রসর হচ্ছিলো। আমি ভাবলাম এ সময় যদি পাকবাহিনী হঠাৎ করে আক্রমণ করে তবে আমার বাহিনীর পক্ষে ভিড়ের ভিতর সুষ্ঠুভাবে কাজ করা দুরূহ হয়ে পড়বে। এই কথা চিন্তা করে আমি কনভয়ের সামনে এসে জনতাকে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না করতে এবং সামনে না আসতে অনুরোধ করলাম। আমি আরও বললাম যে, আমরা প্রথমে শহর সম্পূর্ণ শত্রুমুক্ত করি। কিন্তু জনতা একথা প্রথমে শুনতে নারাজ হওয়াতে বাধ্য হয়েই আমাকে তাদের উপর বলপ্রয়োগ করতে হলো। জনতা শেষ পর্যন্ত ফিরে গেল। তবে জনতা আমাদের উপর একটু মনঃক্ষুন্ন হলো।

৭ই ডিসেম্বর বিকাল পাঁচটায় জেনারেল অরোরা হেলিকপ্টাযোগে কুমিল্লা বিমানবন্দরে অবতরণ করেন। ঐ সময় কুমিল্লা শহরের শিশু থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত সকল স্তরের পুরুষ ও মহিলা ফুলের মালা হাতে করে রাস্তায় নেমে গেছে ভারতীয় ও বাংলাদেশ সেনাদের মালা দেয়ার জন্য।

আমি এ সময় সাধারণ পোশাকে পরে বিমানবন্দরের গেটে এ দৃশ্য দেখছিলাম। এমন সময় জেনারেল অরোরা আমাকে ডেকে পাঠান। জেনারেল অরোরা আমাকে কুমিল্লা শহরের সম্পূর্ণ শান্তি-শৃঙ্খলা আয়ত্তে আনার দায়িত্ব দিয়ে তিনি হেলিকপ্টারে পুনরায় চলে গেলেন। এরপরই জনতা আমাকে চিনতে পারল। জনতা আমার গলায় মেলা দেয়ার জন্য ভিড় জমালো। আমি ভিড় ঠেলে বের হয়ে আসলাম। ঐদিনই ৭ই ডিসেম্বর আমি শহরে এসেই সমস্ত সোনার দোকান সীল করে দিলাম। যতদিন পর্যন্ত না বাংলাদেশ সরকার থেকে কোন রকম আদেশ না আসে ততদিন পর্যন্ত পাক আমলের এস-পি, ডি-সিকে কাজ চালিয়ে যাবার নির্দেশ দিলাম।

এ সময় কুমিল্লায় তেমন কোন পুলিশ ছিল না। এম-পিকে সাহায্য করার জন্য বাংলাদেশ সেনারা সব সময় এগিয়ে আসত। তখনও পাকসেনারা আত্মসমর্পণ করে নাই। পাকসেনারা যেকোন সময় আক্রমণ করতে পারে, সেজন্য সতর্ক থাকার জন্য নাগরিকদেরকে আমি মাইকযোগে জানিয়ে দিলাম। বিমান আক্রমণ বা অনুরূপ ধরনের আক্রমণ হলে সবার বাড়িতে পরিখা খনন করার জন্য নির্দেশ দিলাম।

৭ তারিখ থেকে আমি আমার বাহিনী নিয়ে কুমিল্লা সেনানিবাসের দক্ষিণ দিক থেকে আক্রমণ করার জন্য ডিফেন্স নিয়েছিলাম এবং আক্রমণের প্রস্তুতিও নিচ্ছিলাম। কিন্তু ১৩ই ডিসেম্বর ভারতীয় হাইকমান্ড থেকে জানানো হলো যে, কুমিল্লা সেনানিবাসে আক্রমণ করতে হবে না। জেনারেল অরোরা প্রচারপত্র বিলি করছেন এবং রেডিওতে ঘোষণা করছেন যাতে পাকবাহিনী আত্মসমর্পণ করে। এই নির্দেশের পর আমি পাকসেনানিবাস

আক্রমণ করার পরিকল্পনা বন্ধ করি। ১৬ তারিখে যখন পাকসেনারা আত্মসমর্পণ করে তখন আমি কুমিল্লা সেনানিবাসে উপস্থিত ছিলাম।

স্বাক্ষরঃ মেজর আইনউদ্দিন
২৬-১০-৭৩

সাক্ষাৎকারঃ মেজর গাফফার*

জুন মাসের শেষে শালদা এক রকম আমার নিয়ন্ত্রণেই ছিল্ আমি আমার নিজ সাবসেক্টর রেকি করে জানতে পারি, শালদা নদী গোডাউনে ৩০০০ মণের মত গম এবং চাল মজুদ আছে। খাদ্যসামগ্রীর প্রয়োজন আমাদের অতিরিক্ত ছিল। কেননা এতদিন পর্যন্ত স্থানীয় লোকের খাদ্যসামগ্রীর উপর নির্ভর করেই আমরা জীবনধারণ করছিলাম। তারা যা খেতে দিত তাই আমরা খেতাম। জনসাধারণের এ সহযোগিতা না পেলে আমরা যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারতাম না। কিন্তু জনসাধারণের খাদ্য সাহায্য পর্যাপ্ত ছিল না। অনেক সময় আমাদের ফলমূল ও পানি খেয়েই জীবনধারণ করতে হয়েছিল।

শালদা নদী গোডাউনে খাদ্যসামগ্রীর কথা আমার সেক্টর কমাণ্ডার মেজর খালেদ মোশাররফকে জানাই। তিনি আমাকে নির্দেশ দেন ৩০০০ মণ গম ও চালক যেন তাড়াতাড়ি সেক্টর হেডকোয়ার্টারে পাঠিয়ে দেয়া হয়। আমি শালদা নদী গিয়ে ৩০টা নৌকা যোগাড় করে স্থানীয় এবং আমার সৈনিকদের সাহায্যে সমস্ত খাদ্যসামগ্রী নৌকাতে বোঝাই করি। কিন্তু স্থানীয় দালালরা আমাদের এ খাদ্রসামগ্রী সরানোর খবর কুটিতে অবস্থিত শত্রুসেনাদের জানায়। শত্রুরা কুটি থেকে গোলন্দাজ বাহিনীর সাহায্যে কামান থেকে আমাদের উপর গোলাবর্ষণ করতে থাকে। এ গোলাগুলির মধ্যে আমরা সুন্দরভাবে আমাদের কাজ সম্পন্ন করি।

আমি কসবাতে দুটি কোম্পানী গঠন করি। একটি কোম্পানী ৪র্থ বেঙ্গল-এর ‘সি’ কোম্পানী নিয়ে গঠিত ছিল-অপর কোম্পানী ই-পি-আর, পুলিশ, আনসার, মুজাহিদ এবং স্থানীয় লোকদের নিয়ে। আমি তাদের একমাস ধরে ট্রেনিং দেই এবং কোম্পানীতে অন্তর্ভুক্ত করি। তাদেরকে শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য বিভিন্ন অপারেশনে পাঠাতে শুরু করি। ঐ সমস্ত গ্রামের লোকেরা শত্রুদের গতিবিধির খবর দিয়ে, খাবার দিয়ে, আশ্রয় দিয়ে, বস্ত্র দিয়ে আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করেছিল।

আমি কসবার উপর আমার নিয়ন্ত্রণ চালিয়ে যেতে থাকি। শত্রুরা যখনই প্রবেশের চেষ্টা করেছে তখনই ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে তারা পশ্চাদপসরণ করেছে। আমি ঐ এলাকার রেললাইন তুলে ফেলে, রেললাইনের সেতু ও রাস্তার সেতু ভেঙ্গে দিয়ে শত্রুদের যাতায়াতের পথ বন্ধ করে দেই। ইলেকট্রিক পাইলন, টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের থামও উড়িয়ে দেই। এ সমস্ত করার ফলে শত্রুরা নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ করতে অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হয়।

আমার কোন টেলিফোন সেট ছিল না। কিন্তু একমাসের মধ্যে শত্রুদের উপর হামলা চালিয়ে অনেক ক্যাবল ও টেলিফোন সেট দখল করি এবং তার পরই আমি বিভিন্ন কোম্পানীর মেধ্য যোগাযোগ করার জন্য টেলিফোন লাইন স্থাপন করি। এর ফলে আমার বাহিনীকে নেতৃত্ব ও নির্দেশ দেওয়া আমার পক্ষে অনেক সহজ হয়ে গিয়েছিল। বাংলাদেশের প্রধান সেনাপতি কর্নেল এম এ জি ওসমানী (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল) আমাদের উপর নির্দেশ দেন, শত্রুদের সাথে সামনাসামনি লড়াই না করে তাদের উপর আচমকা আক্রমণ চালাবার। তিনি এ্যামবুশ, রেইড ও সেতু ধ্বংস, যাতায়াতের ক্ষতিসাধন ইত্যাদির ওপর জোর দেওয়ার নির্দেশ দেন। এর ফলে শত্রুদের ক্ষতি হবে ব্যাপক এবং সে অনুপাতে আমাদের ক্ষতি হবে সামান্য। এ কৌশল খুবই

* ১৯৭৩ সালে এ সাক্ষাৎকার গৃহীত হয়। জনাব গাফফার একাত্তরের মার্চে ৪র্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টে এ্যাডজুটেন্ট হিসাবে ক্যাপ্টেন পদে ছিলেন।

উপযোগী হয়েছিল। এতে আমাদের সৈনিকদের মনোবল বেড়ে যায়। প্রতিদিন প্রতিরাতে শত্রুদের ওপর আচমকা আক্রমণ চালিয়ে তাদের অনেকেই নিহত বা আহত করছিলাম। শত্রুরা এক স্থান থেকে আরেক স্থান

গেলে আমরা এ্যামবুশ পেতে বসে থাকতাম এবং শত্রুরা এ্যামবুশের ফাঁদে পড়লে তাদের উপর আক্রমণ চালিয়ে তাদের ধবংস করতাম। আমি তাদের অবস্থানের উপর আক্রমণ চালাতাম প্রায় রাতেই। ফলে শত্রুরা রাত্রিবেলা বাঙ্কার থেকে বাইরে আসতো না। এমন কি দিনের বেলা এক প্লাটুন শক্তি ছাড়া তারা বের হতে চাইত না।

একদিন পাকসেনারা আমার ডানপাশের সাবসেক্টর মনতলির সাবসেক্টর কমাণ্ডার আইনউদ্দিনের বাহিনী দ্বারা এ্যামবুশ ফাঁদে আটকা পড়ে আক্রান্ত হয়। শত্রুদের ব্যাপক ক্ষতিসাধন হয়। তারা আহত এবং নিহত সৈন্যদের ১টা রেলওয়ে ট্রলিতে ভর্তি করে রেললাইনের ধার দিয়ে পালাতে থাকে। আমি তালতলা আড়াইবাড়ীতে এ্যামবুশ পেতে তাদের উপর আক্রমণ চালাই। আবার আক্রান্ত হবার ফলে তারা তাদের আহত ও মৃত সাথীদের ফেলে পলায়ন করে। পরবর্তী সময়ে পাকসেনারা তাদের মৃত সাথীদের কবর দেয়ার জন্যে গঙ্গাসাগরের এক কবরস্থানে জড় হয়েছে। আমার কয়েকজন গুপ্তচর এসে আমাকে এ খবর জানায়। আমরা সঙ্গে সঙ্গে অবস্থান নিয়ে দেখতে পাই সত্যিই শত্রুরা কবরস্থানে জড় হয়েছে তাদের সাথীদের কবর দেবার জন্য। আমি ৩" মর্টার এবং ভারী মেশিনগানের সাহায্যে শত্রুদের উপর আকস্মাৎ গোলাগুলি ছুড়তে থাকি। ফলে পাকসেনারা তাদের পুরাতন মৃত সাথীদের সঙ্গে আরো কয়েকজন নতুন সাথীকে কবর দেয়।

পাকসেনারা তাদের ব্যাটালিয়ন হেডকোয়ার্টার স্থাপন করে কুটি সড়কের উপরে এবং মূল ঘাঁটি স্থাপন করে আড়াইবাড়িতে টি, আলীর বাড়িতে। সে সময়ে সমগ্র শালদা নদী এলাকা নয়নপুর রেলওয়ে স্টেশন পর্যন্ত আমার নিয়ন্ত্রণে চিল। তারা শালদা নদী পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করে এবং সেজন্য এক কোম্পানী সৈন্যকে আড়াইবাড়ি থেকে জেলা বোর্ডের রাস্তা দিয়ে শালদা নদীর দিকে এগোতে থাকে। মনোলোবাগ রেলওয়ে স্টেশনের নিকট একটা প্লাটুন আগে থেকেই রেখেছিলাম। যখন শত্রুরা মনোলোবাগ রেলওয়ে স্টেশনের পাশের গ্রামে পৌঁছায়, তখন তারা আমাদের এ্যামবুশে পড়ে যায়। আমরা তাদের উপর আক্রমণ চালিয়ে একটি জীপ এম ৩৮ এআই, একটি ৩/৪ টনের ডজ ধ্বংস করে দেই। একজন অফিসারসহ ১৭জন নিহত হয় এবং ২০ জনের মত আহত হয়। আমরা গাড়ি নিয়ে আসতে পারিনি, কেননা শত্রুরা গোলন্দাজ বাহিনীর সাহায্যে আমাদের উপর গোলাবর্ষণ করছিল। ফলে গাড়িগুলি পুড়িয়ে দেয়া হয়। পরে আমরা অনেক অস্ত্রশস্ত্র, টেলিফোন সেট, টেলিফোন ক্যাবল, শত্রুদের শুকনা রেশন, গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র উদ্ধার করি। শত্রুদের বিছানাপত্র উড়িয়ে দেয়া হয়। আমরা একটা স্যুটকেস পাই গাড়ির ভিতর থেকে। স্যুটকেসটি টাকা ভর্তি ছিল কিন্তু টাকাগুলি গোলাগুলির ফলে পুড়ে গিয়েছিল। আমি সমস্ত কিছু আমার সেক্টর কমাণ্ডার মেজর খালেদ মোশাররফের হাতে তুলে দেই। ঐ টাকা ভর্তি সুটকেসটি দেখে আমাদের ধারণা হয় ঐ পাকিস্তানী অফিসারটি এসব টাকা ব্যাংক থেকে লুট করেছিল। পরে তারা বারবার চেষ্টা করেছিল শালদা নদীর অবস্থান দখল করার কিন্তু তারা বারবারই পর্যুদস্ত হয়ে ফিরে যায়।

সমগ্র কসবা ও শালদা নদী এলাকা জুলাই মাস পর্যন্ত আমার নিয়ন্ত্রণের ছিল। লাটুমুড়া পাহাড়ী জায়গাটি আমার নিয়ন্ত্রণে রাখি। শত্রুরা যদি লাটুমুড়া দখল করে নেয়, তবে ক্ষতি হবে। সেজন্য আমি একটি কোম্পানী তৈরী করে দুটি প্লাটুন সেখানে রাখি প্রতিরক্ষাব্যূহ শক্তিশালী করার জন্য। ফেনী মুন্সিরহাটে যাবার আগে কসবা সাব-সেক্টরের ভার ক্যাডেট হুমায়ুন কবিরের হাতে দিয়ে যাই।

ক্যাপ্টেন জাফর ইমামের (বর্তমানে মেজর) অধিনায়কত্বে মুন্সিরহাট ফেনী সাবসেক্টর একটা গুরুত্বপূর্ণ ও উত্তেজনাকর স্থান হয়ে দাঁড়ায়। ফেনী থেকে তিন মাইল দূরে ছাগলনাইয়া, মুন্সিরহাট ও লক্ষ্মীপুরে ১৭ মাইল লম্বা এবং ৮ মাইল প্রস্থ এই বিরাট অবস্থান জুড়ে বসে আছেন ক্যাপ্টেন জাফর ইমাম ও তাঁর বাহিনী। পাকসেনারা এ অবস্থানের উপর বিরাট শক্তি নিয়ে চাপ দিতে থাকে। ক্যাপ্টেন জাফর ইমাম তার দু'জন অফিসার ও তিনটি কোম্পানি নিয়ে শত্রুদের কামান ও ট্যাঙ্কের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। ২নং সেক্টরের অধিনায়ক মেজর খালেদ মোশাররফের কাছে ফেনী মুন্সিরহাট অবস্থান রক্ষা করা এক চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। এ মূহূর্তে এখানে

আরো শক্তির প্রয়োজন হয়ে পড়ে। রাত দু'টার সময় মেজর খালেদ আমার ক্যাম্পে আসেন। আমি তখন ক্যাম্পে ছিলাম না, অপারেশনের জন্য বাইরে ছিলাম। যখন এ্যাকশন করে ফিরে আসি তখন দেখি তিনি ফেনীর একটা ম্যাপ খুলে চিন্তিত মুখে বসে আছেন। তাঁকে খুব চিন্তিত এবং বিষন্ন দেখাচ্ছিল।

তিনি ধীরে এবং দ্রুত ফেনী অবস্থানের পরিস্থিতির কথা বলে গেলেন এবং কি করা যায় তার একটা পরামর্শ চাইলেন। একটা কোম্পানী ফেনীতে দ্রুত পাঠিয়ে দিতে তাঁকে অনুরোধ করলাম। মেজর খালেদ আমাকে একটা কোম্পানীসহ সেখানে যাবার জন্য বললেন। আমি এটা আগেই বুঝেছিলাম কিন্তু কসবার ভার কার হাতে দেয়া যায় এ নিয়ে একটু দ্বিধা ছিল। কেননা কোন নতুন অফিসারের পক্ষে কসবা নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভবপর ছিল না। যা হোক ক্যাডেট হুমায়ুন কবিরের হাতে (বর্তমানে ক্যাপ্টেন) আমার ১নং কোম্পানী ও কসবা সাবসেক্টরের ভার দিয়ে আমি সকালে একটি কোম্পানী নিয়ে ফেনীর দিকে রওনা হই। যাবার সময় আমার ২নং কোম্পানীকে সমস্ত পরিস্থিতি বুঝিয়ে বলি। আমি ক্যাডেট হুমায়ুন কবিরকেও সমস্ত পরিস্থিতি বুঝিয়ে বলি এবং লাটুমুড়া অবস্থানের গুরুত্ব সম্পর্কে তাকে বলি। এ জায়গাটা ছিল পাহাড়ের উপর। এখান থেকে সমগ্র স্থান নিয়ন্ত্রণে রাখা সহজ ছিল। পাকসেনারা এ স্থান পুনরুদ্ধারের জন্য চেষ্টা চালাবে। কেননা এর আগে তারা অনেক বার চেষ্টা চালিয়ে সফল হতে পারেনি। কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্যের ব্যাপার আমার কসবা ছেড়ে যাবার পর এক সপ্তাহের মধ্যে শত্রুরা লাটুমুড়া দখল করে নেয় এবং ১নং কোম্পানীর কয়েকজন সাহসী যোদ্ধা এতে মারা যায়। নভেম্বর মাস পর্যন্ত পাকসেনারা লাটুমুড়ার উপর কর্তৃত্ব রেখেছিল। ভারত এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর দুটি ব্যাটালিয়ন শক্তি নিয়ে নভেম্বর মাসে শত্রুদের সরিয়ে দিতে পারা যায়। শত্রুদের সরাতে ৩ জন অফিসারসহ ৪০জন সৈন্য মারা যায় এবং ৬০ জনের বেশি আহত হয়। লাটুমুড়া অবস্থানের গুরুত্ব এ হতাহতের থেকেই বুঝা যায়। শত্রুদের কতজন মারা গিয়েছিল তা আমার জানা নাই।

যাই হোক, পরের দিন সকালে ২নং কোম্পানীকে সাথে নিয়ে ফেনীর পথে রওনা দিই। ৬ই জুন সন্ধ্যা ৫টার সময় বেলুনিয়া পৌঁছি। তারপর ১৪ মাইল কাদামাটির রাস্তা ভেঙ্গে আমি এবং আমার সৈন্যরা রাত ৮টার সময় মুন্সিরহাট নুতন বাজার পৌঁছি, যা জাফর ইমামের অবস্থান থেকে ৮০০ গজ দূরে ছিল। ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে আমরা কোন বিশ্রাম নেইনি এবং পেটেও কিছু পড়েনি। আমার কোম্পানীকে আমি এখানে বিশ্রাম নিতে বলি। তারপর আমি ক্যাপ্টেন জাফর ইমামের সাথে দেখা করার জন্য তাঁর ক্যাম্পের দিকে রওনা হই। তাঁর সাথে দেখা করে অবস্থানটি দেখি। প্রতিরক্ষাব্যূহ দেখে আশ্চর্যবোধ করি। প্রতিরক্ষাব্যূহ খুব শক্তিশালী ছিল না। মূল অবস্থানের ডানদিক একেবারে ফাঁকা এবং খোলা অবস্থায় ছিল। বাঁয়ে অবস্থানরত লেঃ ইমামুজ্জামানের বাহিনীর সাথে জাফর ইমামের বাহিনীর দূরত্ব অনেক ছিল। এত দুর্বল অবস্থানের জন্য আমি ক্যাপ্টেন জাফর ইমামকে দোষ দিতে পারি না কেননা সৈনসংখ্যা ছিল সীমিত। যাহোক প্রতিরক্ষাব্যূহকে সুদৃঢ় করার জন্য আমি ক্যাপ্টেন জাফর ইমামকে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা নিতে বলি।

(ক) আমার কোম্পানী থাকবে অবস্থানের ডানদিকে। দুটি প্লাটুন উপরে এবং ১টি প্লাটুন ভিতরে।
(খ) ক্যাপ্টেন জাফর ইমামের বাহিনী তাঁর অবস্থানেই থাকবে কিন্তু সৈন্যদের আরো সংগঠিত করতে হবে। ডিফেন্স ভিতরেই নিতে হবে।
(গ) লেঃ ইমামুজ্জামান বায়ে থাকবে কিন্তু দুরত্বটা কমিয়ে আনতে হবে। ক্যাপ্টেন জাফর ইমামের বাহিনীর সাথে সংযোগ রাখতে হবে।
(ঘ) মুন্সিরহাটের নিকটে মূল অবস্থানের সাথে সংযোগ রেখে ক্যাপ্টেন শহীদের বাহিনী অবস্থান নেবে।

কিন্তু ক্যাপ্টেন জাফর ইমাম আমার পরিকল্পনা মেনে নেয় না। আমি এরপর মেজর আমিনের কাছে যাই এ ব্যাপারে পরামর্শ নেবার জন্য। মেজর আমিন তখন ঐ অঞ্চলের কমান্ডার ছিলেন। মেজর আমিন ও ক্যাপ্টেন জাফর ইমাম বুঝতে সক্ষম না হয়ে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না। মেজর খালেদ তখন সেখানে ছিলেন না।

সময় খুব সঙ্কটজনক থাকায় দেরি না করে আমি আমার একটা প্লাটুনকে ডানদিকে একিনপুরে অবস্থান নিতে বলি। ১টা প্লাটুনকে ক্যাপ্টেন জাফর ইমাম ও লেঃ ইমামের ফাঁকা স্থানে অবস্থান নিতে বলি এবং আরেকটা প্লাটুন মুন্সিরহাটে অবস্থান নেয়। পাকসেনারা যেকোন মুহূর্তে আমাদের আক্রমণ করতে পারে। এই নতুন অবস্থানের পর মোটামুটি আশ্বস্ত হই কিন্তু পুরোপুরি সন্তুষ্ট হতে পারিনি। তার উপর আমাদের কোন ভারী অস্ত্রশস্ত্র ছিল না, কেবলমাত্র ৩ইঞ্চি ৮১ এম-এম মর্টার ছাড়া। শত্রুরা প্রতিদিন আমাদের উপর ছোট ছোট আক্রমণ চালাতে থাকে এবং আমরাও এ্যামবুশ এবং আচমকা আক্রমণ চালিয়ে শত্রুদের পর্যুদস্ত করতে থাকি। শত্রুরা গোলন্দাজ বাহিনীর সাহায্যে কামান দিয়ে আমাদের উপর গোলা ছুড়তে থাকে এবং প্রতিদিন আমাদের কিছু কিছু লোক আহত হতে থাকে। শত্রুদেরও হতাহতের সংখ্যা ছিল প্রচুর। এ সময়ে মেজর খালেদ আমাদের অবস্থান দেখতে আসেন এবং আমি সমস্ত পরিস্থিতি তাঁকে খুলে বলি। আমি আমার পরিকল্পনার কথা তাঁকে বলি এবং তিনি আমার পরিকল্পনা মেনে নেন। কিন্তু এবারও ক্যাপ্টেন জাফর ইমাম পরিকল্পনা মেনে নিতে রাজী হয় না। কিন্তু ক্যাপ্টেন জাফর ইমাম স্থানীয় লোক হওয়ায় মেজর খালেদ তাকে আর চাপ দেয় না। যাই হোক, আমাকে আমার পুরাতন অবস্থানই রাখতে হলো। আমরা মেজর আমিনকে খাদ্য ও অস্ত্র সরবরাহের দিকে লক্ষ্য রাখতে বললাম। এ অবস্থানে আমরা কয়েকদিন অর্ভুক্তও ছিলাম। তখন ছিল বর্ষাকাল। রাস্তাঘাট কাদায় নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। অস্ত্রশস্ত্র ১৪ মাইল দূরে বেলুনিয়া থেকে কাঁদা ভেঙ্গে আনতে হত। এ অসুবিধা সত্ত্বেও মেজর আমিন যতখানি পেরেছেন আমার জন্য করেছেন। তিনি কাঁদার রাস্তা ভেঙ্গে যত দ্রুত অস্ত্রশস্ত্র ও খাবার পৌঁছানো যায় তার ব্যবস্থা করেছেন। ভারতীয় বাহিনীর গোলন্দাজ বাহিনীর যাতে সাহায্য পাওয়া যায় তার চেষ্টা আমরা করেছিলাম কিন্ত তা সফল হয়নি। গোলন্দাজ বাহিনীর সাহায্য না পেলেও মিত্র বাহিনীর সেনারা মর্টারের সাহায্যে তাদের উপর গোলা ছুড়েছিল। এটা আমাদের মনোবল বাড়াতে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। আমার সৈনিকরা এত উত্তেজিত হয়ে গিয়েছিল যে তারা বাঙ্কার ছেড়ে বেরিয়ে এসে বলতে থাকে, "স্যার ভারতীয় বাহিনী যদি আমাদের সাহায্য করে, তবে আমরা আজই ফেনী দখল করে নিতে পারব।" কিন্তু এটা যে সম্ভব নয় তা আমার সৈন্যদের বুঝানো মুশকিল হয়ে পড়েছিল।

আমাদের অস্ত্রশস্ত্র ছিল পুরানো আমলের এবং অতি সামান্য। সে তুলনায় শত্রুদের শক্তি ছিল একটা ব্রিগেড, এক রেজিমেন্ট আর্টিলারী ও ট্যাঙ্ক বাহিনী। এ ছাড়া ছ'টি হেলিকপ্টার ছিল শত্রুসেনাদের এক স্থান থেকে আরেক স্থানে যাবার জন্য। মর্টার ছাড়াও কিছু মেশিনগান ও হালকা মেশিনগান আমাদের সঙ্গে ছিল।

যাহোক, আমরা আচমকা আক্রমণ চালিয়ে শত্রুদের ব্যতিব্যস্ত রাখছিলাম। আমরা প্রতিদিন তাদের অনেককেই হতাহত করছিলাম। তাদের শক্তি অত্যধিক হওয়ায় তারা হতাহতের স্থান পূরণ করতে পারছিল। আমাদের হতাহতের সংখ্যা সামান্য হলেও তা পূরণ করতে আমরা সমর্থ ছিলাম না। আমরা চিন্তা করছিলাম শত্রুরা যে কোন মুহূর্তে প্রবল শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে। '৭১-এর ১৭ই জুন সকালে শত্রুরা গোলন্দাজ বাহিনীর কামানের সাহায্য নিয়ে আমাদের উপর নতুন আক্রমণ শুরু করেছিল। কামান ছাড়াও শত্রুদের আর-আর, মর্টার, মেশিনগান, চাইনিজ রাইফেল তো ছিলই। আমাদের অবস্থানের অবস্থা থেকে সহজেই বুঝা যায় এ এক অসম যুদ্ধ। পাকিস্তানী সৈন্যরা সাত ঘণ্টা ধরে স্রোতের মত এগোতে থাকে। সাত ঘণ্টা পর আমাদের হাতে চরম মার খেয়ে তার পিছু হটে যায়। এমনকি তারা তাদের অনেক মৃতদেহ ইলোনিয়া নদী ও অন্যান্য স্থানে ফেলে রেখে পালায়। মৃতদেহগুলি পরে শকুন এবং কুকুরে খায়।

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল আবদুল হামিদ খান তখন ঢাকাতে ছিলেন। ফেনীর খবর শুনে তিনি নিজে এর গুরুত্ব বুঝাবার জন্য ফেনীতে আসেন। তিনি ফেনীতে এসে ধারণা করেন মুজিবনগর আশেপাশেই আছে। সেহেতু মুন্সিরহাট দখল করার জন্য তিনি নিজে এবং দু'জন ব্রিগেডিয়ারকে নিয়ে আমাদের তিনজন ক্যাপ্টেন ও একজন লেফটেন্যান্টের বিরুদ্ধে লড়াই করে বুঝিয়ে দেন যে বঙ্গশার্দুলরা তাদের থেকেও কম নয়। এ যুদ্ধ আমাদের জন্য এক বিরাট গৌরব। এ যুদ্ধে পাকিস্তানের এক ব্যাটালিয়নের নেতৃত্ব দেন ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের মেজর আশিফ, যার সাথে আমরা একসঙ্গে কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে ছিলাম।

এ সময়ে আমাদের সেক্টর-২ এর কমাণ্ডার মেজর খালেদ মোশাররফ খবর পাঠানে যে, ভারতীয় বাহিনীর পূর্বাঞ্চলের প্রধান জেনারেল অরোরা হেলিকপারে করে আমাদের অবস্থান দেখতে আসতে পারেন। তারই হেলিকপারে গুলি না চালানোর নির্দেশ দেন। কিন্তু আমার মনে হয় পাকসেনারা এ খবর পেয়ে গিয়েছিল, ফলে তিনি আর আসতে পারেননি।

তখন ছিল বর্ষাকাল। ২০শে জুন সারাদিন সারারাত ধরে বৃষ্টি হচিছল। ২১ শে জুনের আকাশ ছিল মেঘলা এবং ঝিরি ঝিরি বৃষ্টি হচ্ছিল। আমি সকাল থেকে অস্বস্তি বোধ করছিলাম। সমস্ত যুদ্ধক্ষেত্র জুড়ে বিরাজ করছিল অস্বস্তি। আমি ক্যাপ্টেন জাফর ইমামের কাছে যাই সমস্ত পরিস্থিতি সম্বন্ধে আলোচনার জন্য। বিকেল ৫টা সময় আমি আমার অবস্থানে ফিরে আসি। আমি আমার সমস্ত কমাণ্ডারকে ডেকে পাঠাই। রাত্রে আমরা আমাদের অবস্থানে আলো জ্বালাতাম না, কেননা আলো জ্বালালেই শত্রুদের দৃষ্টিগোচর হবার সম্ভাবনা ছিল। তাই খাওয়া-দাওয়া আলো শেষ হবার আগেই সেরে ফেলতে হতো। আমার বাঙ্গারে যখন ২টা রুটি ডাল সহযোগে খেতে বসেছি তখন হেলিকপ্টারের আওয়াজ শুনতে পাই। আমার আরদালী দৌড়াতে দৌড়াতে এসে খবর দেয় দুটি হেলিকপ্টার আমার হেডকোয়ার্টারের পিছনে উড়ছে-যা পশ্চিম দিক অর্থাৎ ভারতে দিক থেকে আসছে। আমি ভাবলাম ২৪ ঘণ্টা অতিরিক্ত বৃষ্টি হবার জন্য হয়ত জেনারেল অরোরা কাল আসতে পারেননি, আজ আস্তে আস্তে বৃষ্টি হচ্ছে তাই এসেছেন। এ চিন্তা করে কিভাবে তাঁকে সম্বর্ধনা জানাবো ভেবে হেলিকপ্টারের দিকে দৃষ্টি রাখি। হেলিকপ্টার দুটি অতি নিচু দিয়ে ১৮০ ডিগ্রি যাবার পর দুটি দুদিকে যায়। ১টি হেলিকপ্টার বাঁ অবস্থানে পূর্বদিকে এবং এন্যাটি আমার হেডকোয়ার্টারের উপর দিয়ে উত্তর দিকে ১০০০ গজ পর্যন্ত যায়। সন্দেহ জাগে দুটি হেলিকপ্টার দু'জায়গায় নামছে কেন? হঠাৎ আমার মনে সন্দেহ জাগে এবং আমার বিশেষ প্লাটুনের কমাণ্ডার নায়েক সুবেদার শহীদকে ডেকে পাঠাই। ১৫ মিনিট অতিক্রান্ত হবার পর দেখি দুটি হেলিকপ্টারই ভারতীয় সীমান্তের দিকে যাচ্ছে। হঠাৎ বাঁ দিক ও পিছন দিক থেকে গুলি আসতে থাকে। তখন ছিল অন্ধকার। শত্রুরা গ্রেনেড, এম-জি ও হালকা মেশিনগানের সাহায্যে আমাদের উপর গোলাগুলি ছুড়তে থাকে। আমি সহজেই বুঝতে পারি এটা পাকিস্তানী কমাণ্ডোদের কাজ। আমি বুঝতে পারি এটা জেনারেল অরোরার হেলিকপ্টার নয়, শত্রুরা হেলিকপ্টারের সাহায্যে পেছনে অবস্থান নিয়েছে। আমি সঙ্গে সঙ্গে নায়েক সুবেদার শহীদ এবং ই-পি-আর এর সুবেদার ফরিদ আহমেদকে নির্দেশ দেই সমস্ত সৈন্যদের অতিসত্বর আমার নিকটে হাজির করার জন্য। তারা সমস্ত পরিস্থিতি বুঝতে পারে এবং ১০ মিনিটের মধ্যে এসে খবর দেয়। আমি দ্রুততার সঙ্গে নতুনভাবে আমার বাহিনীকে সজ্জিত করি। প্রধান রাস্তা এবং রেললাইনের উপর তাদের অবস্থান নিতে বলি এবং আরও বলি আমি গুলি চালালে তোমা গুলি চালাবে। এ রাত ছিল খুবই অন্ধকার এবং কোন কিছু দেখা যাচ্ছিল না। আমি আমার বাহিনীর দ্বিতীয় প্রধান (সেকেন্ড-ইন কমান্ড) সুবেদার খুরশিদ আলমকে উত্তর এবং পশ্চিম দিকের প্রতি নজর রাখতে বলি এবং আমি পূর্ভ এবং দক্ষিণ দিকে নজর রাখি। পাক কমাণ্ডোদের হামলার অপেক্ষা করতে লাগলাম। এ আমার জীবনে এক চরম পরীক্ষা ছিল। একটু ভুল করলে আমরা সবাই ধ্বংস হয়ে যাব। সে রাতের কথা মনে পড়লে আজও আমার শিরণ জাগে। এ সময়ে ক্যাপ্টেন জাফর ইমাম আমার কাছে খবর পাঠান যে তিনি এফডিএল-এর (ফরোয়ার্ড ডিফেন্ডেড লোকালিটি) পথ দিয়ে এগোচ্ছেন। পাক গোলন্দাজ বাহিনী কামান, মর্টার, আর-আর-এর সাহায্যে আমাদের উপর অবিরাম বৃষ্টির মত গোলা ছুড়তে শুরু করে দিয়েছে। বৃষ্টির মত গোলাগুলি ২ ঘণ্টা ধরে চলে। কিন্তু আমরা তাদের সামনে অগ্রসরের চেষ্টা রুদ্ধ করে দেই। ইতিমধ্যে দ্বিতীয়বারের মত হেলিকপ্টারের সাহায্যে পাকবাহিনী পিছনে আবার তাদের কমাণ্ডোদের নামিয়েছে। রাত ৯টার সময় লেঃ ইমামুজ্জামানের কাছ থেকে খবর পাই তারা পাকসেনা কর্তৃক আকান্ত হয়েছে। ইতিমধ্যে মর্টার সেকসনের কমাণ্ডার সুবেদার জববার খবর পাঠায় যে, মর্টার সহযোগিতা করা আর সম্ভব নয়, কেননা ইতিমধ্যে সমস্ত মর্টার শেষ হয়ে গেছে। সাহায্য পাবার আশা না থাকায় আমি একিনপুর থেকে অবস্থান সরিয়ে নেই। লেঃ ইমাম আমাকে ফোনে খবর পাঠায় পাক কমান্ডোরা সামনে থেকে তাদের আক্রমণ চালিয়েছে এবং পাঠাননগরের দিকে এগোচ্ছে। তার কাছে আর গোলাবারুদ নেই। আমাকে সে অনুরোধ জানায় কিছু গোলাবারুদ যেন অতি সত্বর ইমামুজ্জামানের কাছে পাঠায়। লেঃ ইমাম আমাকে আরো জানায় ছাগলনাইয়া

থেকে মুহুরী নদীতে যে প্রতিরক্ষাব্যূহ ছিল তা সন্ধ্যায় সরিয়ে নেয়া হয়েছে। যোগাযোগের অভাব হেতু সে এ খবর আগে পাঠাতে পারেনি। প্রতিরক্ষাব্যূহ ভেঙ্গে যাওয়ায় সে ফুলগাজির দিকে চলে যাচ্ছে। আমি আমার ডানপাশের বাহিনীকে অবস্থান তুলে নিয়ে মুহুরী নদী হয়ে ফুলগাজিতে অবস্থান নিতে বলি।

রাত ৯টার দিকে আমার হেডকোয়ার্টার কামাণ্ডোদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। পাঠাননগর হয়ে অগ্রসরমান শত্রুসেনারা বাঁ দিক এবং সামনের দিক দিয়ে আক্রমণ চালায়। ইতিমধ্যে ক্যাপ্টেন জাফর ইমাম আমার কাছে খবর পাঠায় ২নং সেক্টরের কমাণ্ডার মেজর খালেদ আমাদের অবস্থান তুলে নিয়ে ফুলগাজির পিছনে চিতলিয়ায় অবস্থান নিতে বলেছেন। ঠিক সময়ে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, অন্যথায় আমরা সবাই শত্রুদের হাতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতাম।

পাক কমাণ্ডো এবং অন্যান্য সৈন্যরা আস্তে আস্তে আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে থাকেন। আমি দেখতে পেলাম শত্রুরা দুটি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। প্রত্যেক গ্রুপে ২০/৩৫ জন শত্রুসেনা ছিল। বাঁ দিকের গ্রুপটি ২০/৩৫ গজ দূরে এবং অন্যটি ৩০/৪০ গজ দূরে। আমি এবং আমার সৈন্যরা সবাই একসাথে শত্রুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। তারাও আমাদের উপর গুলি চালাতে লাগল। গোলাগুলি বিনিময় আটঘন্টা ধরে চলল এবং শত্রুরা ৮টা মৃতদেহ ফেলে রেখে পিছনে সরে যেতে লাগল।

ইতিমধ্যে ক্যাপ্টেন জাফর ইমাম দু'জন গুরুতরভাবে আহত মুক্তিযোদ্ধাকে দ্রুত প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করার জন্য আমার নিকট পাঠিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু আমাদের পার্শ্ববর্তী ঘাঁটি ফুলগাজীতে পৌঁছানোর কোন দ্রুত ব্যবস্থা ছিল না। আমি তাদেরকে আরও ১২ জন আহত মুক্তিযোদ্ধার সাথে পাকে ইউনিয়ন কাউন্সিল অফিসে রেখে দেই। এরিয়া কমাণ্ডার মেজর আমিন ফুলগাজী থেকে আমার হেডকোয়ার্টারে আসেন। আমি তাঁকে আমার অবস্থানের দ্রুত অবনতির কথা জানাই। তিনি দ্রুত আহত সৈনিকদের পশ্চাৎবর্তী ঘাঁটি ফুলগাজী-চিতলিয়াতে পৌঁচানোর ব্যবস্থা করেন। আহত সৈনিকদের উপর যাতে হামলা না হয় তার জন্য তাদের সাথে একটা প্রহরা (এসকট) পার্টিও দেই।

তখন রাত সাড়ে দশটা। যুদ্ধ কিছু সময় হল থেমে আছে। যতদূর সম্ভব শত্রুরা সে সময় শক্তি সঞ্চয়ে ব্যস্ত ছিল। এ সময় ক্যাপ্টেন জাফর ইমাম তাঁর ও তাঁর বাহিনীর অবস্থান তুলে নিয়ে আমার কাছে আসেন। আমরা তাড়াতাড়ি দ্রুত পরিস্থিতি অবনতির কথা চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নিই আমি আমার অবস্থানে থাকব এবং ক্যাপ্টেন জাফর ইমাম সৈন্যদের নিয়ে পার্শ্ববর্তী ঘাঁটি ফুলগাজীতে সরে যাবেন। সেই অনুযায়ী তিনি ফুলগাজীর দিকে রওনা দিলাম। ভোর ৪ টার মধ্যে সমস্ত সৈন্য ফুলগাজীতে চলে যায় এবং আমি ভোর সাড়ে ৫টার সময় আমার অবস্থান পরিত্যাগ করে ফুলগাজীর দিকে রওনা দেই। আমাদের পার্শ্ববর্তী ঘাঁটিতে যাওয়াটা খুব সুন্দরভাবে হয়েছিল। সকালে ফুলগাজীতে মেজর খালেদ মোশাররফের সাথে দেখা হয। তিনি সেখানে অবস্থান করছিলেন। ফুলগাজী অত্যধিক ঘন বসতিপূর্ণ এলাকা হওয়ায় এখান থেকে শত্রুদের মোকাবিলা করা অসম্ভব ছিল, ফলে আমরা চিতলিয়া যাবার সিদ্ধান্ত নেই। যাবার আগে ফুলগাজীর ব্রীজ উড়িয়ে দিয়ে একটা ডিলেইং পার্টি এবং চিতলিয়া আসি এবং নতুন অবস্থান তৈরী করি। আমি আমার বাহিনী নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ জেলাবোর্ড সড়ক এবং রেললাইনের উপর অবস্থান নেই। ক্যাপ্টেন জাফর ইমাম তাঁর বাহিনী নিয়ে পরশুরাম এলাকায় অবস্থান নেন। বাঁ দিকে একটা প্লাটুনকে মোতায়েন রাখি এবং আমার বাঁ দিকে মুহুরি নদী বরাবর লেঃ ইমামুজ্জামান তাঁর বাহিনী নিয়ে প্রতিরক্ষাব্যূহ গড়ে তোলেন। এভাবে আমরা দ্রুত চিতোলিয়াতে প্রতিরক্ষাব্যূহ গড়ে তুলি।

ইতিমধ্যে পাকসেনারা ফুলগাজী ব্রীজ পর্যন্ত এগিয়ে এসেছে। পূর্বেই উল্লেখ করেছি আমি ফুলগাজী ব্রীজ শত্রুদের এগোতে বাধা দেয়ার জন্য ধ্বংস করে দিয়েছিলাম। এ ব্রীজে এসে শত্রুরা বাধা পায় এবং ২৪ ঘণ্টারও বেশী সময় পর্যন্ত তারা আর এগোতে পারেনি। ৪৮ ঘণ্টা যাবৎ শত্রুদের এগোতে বাধা দিতে থাকি, ফলে শত্রুরা অ্যধিক গোলাবর্ষণ করতে থাকে। তাতেও ব্যর্থ হয়ে তারা হেলিকপ্টার ব্যবহার করে ব্রীজের এপারে আসে। চিতলিয়া যুদ্ধের দ্বিতীয় দিনে শত্রুরা হেলিকপ্টারের সাহায্যে মুহুরী নদী পার হয়ে আসে এবং

লেঃ ইমামুজ্জামানের বাহিনীকে ঘিরে ফেলে। সে তাড়াতাড়ি তার বাহিনী পিছনে সরিয়ে নিয়ে যায়। যাবার আগে সে আমাকে জানাতে পারেনি। ডানদিকে আমার যে প্লাটুনটি ছিল, শত্রুদের গোলাগুলির মুখে তারা তাদের অবস্থান টিকিয়ে রাখতে পারে না। তারা অবস্থান ত্যাগ করে যায় এবং শত্রুরা সে অবস্থান দখল করে নেয়। ব্যাটালিয়ন হেডকোয়ার্টার থেকে জানানো হয় অন্যান্য প্রতিরক্ষাব্যূহতে আমাদের সৈন্যরা ঠিকমতই অবস্থান নিয়ে আছে।

শত্রুরা ডান এবং বাম দিক ও সম্মুখ থেকে আমার বাহিনীর উপর আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। শত্রুর অবস্থান জানাবার জন্য নায়েক সুবেদার বেলায়েত হোসেনকে ডান দিকে পাঠাই এবং আমি নায়েক সুবেদার শহীদকে নিয়ে বাঁ দিকে যাই। আমি গিয়ে দেখতে পাই শত্রুরা মাত্র ৫০০ গজ দূরে এবং আমি সঙ্গে সঙ্গে মূল ঘাঁটিতে ফিরে আসি এবং দেখতে পাই নায়েক সুবেদার বেলায়েত হোসেন আমার জন্য অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে আছে। সে জানায় আমাদের আগের অবস্থান থেকে শত্রুরা আক্রমণ চালাচ্ছে। বিকেল ৫টার দিকে শত্রুরা তিনদিক থেকে আক্রমণ শুরু করে দেয়। আমরা আক্রমণ প্রতিহত করতে থাকি। শত্রুরা আমাদের সমস্ত যোগাযোগের পথ বন্ধ করে দিয়েছিল। কিন্তু শত্রুসেনা ছাগলনাইয়া হয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে থাকে এবং আমাদের একমাত্র যোগাযোগের পথ পরশুরামের রেলওয়ে ব্রীজ ও সড়কসেতু ঘিরে রাখে।

৩৬ ঘণ্টার মধ্যে আমার বাহিনীর কারো মুখে খাদ্য জোটেনি। আমরা অভুক্ত ছিলাম এবং গোলাবারুদ নিঃশেষ হয়ে আসছিল। আমি সেক্টর-২ এর হেডকোয়ার্টারে খবর পাঠাই সত্বর খাবার এবং গোলাবারুদ পাঠানোর জন্য, কিন্তু হেডকোয়ার্টার খবর পাঠায় যে ভারতীয় বাহিনীর গোলাগুলি দেবার যে কথা ছিল তা এখনও এসে পৌঁছেনি-সেহেতু আমি আমার অবস্থান তুলে নিয়ে যেন পরশুরাম চেকপোস্টের দিকে এগিয়ে যাই।

অবস্থান তুলে নেবার নির্দেশ পেলেও শত্রুদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হবার ফলে আমি আমার বাহিনী তুলে নিতে পারছিলাম না। শত্রুরা ধীরে ধীরে আমাদের নিকটে চলে আসছিল। এ মুহূর্তে আমার বাহিনীকে জোগাড় করা মুস্কিল ছিল, কেননা শত্রুরা গোলন্দাজ বাহিনীর কামান বৃষ্টির মত আমাদের উপর গোলা ছুড়ছিল। আমার সে সময়ে গোলাবারুদ একরকম নিঃশেষ হয়ে এসেছিল। প্রতিটি রাইফেলের জন্য ১০ রাইন্ড এবং হালকা মেশিনগানের জন্য ৫০ রাউন্ডের বেশী গুলি ছিল না। আমি সব প্লাটুন কমাণ্ডারদের ডেকে পাঠাই এবং তাদেরকে রেললাইনের পূর্বদিকে সরে যাবার নির্দেশ দেই। যা হোক কোনক্রমে আমার বাহিনীকে আমি নিরাপদে পরশুরামে নিয়ে আসতে সক্ষম হই। আমি সেখানে পৌঁছে দেখি হেডকোয়ার্টারের নির্দেশ অনুযায়ী ক্যাপ্টেন জাফর ইমামও তাঁর বাহিনী সরিয়ে নেবার জন্য প্রস্তুত হচেছন।

পরশুরাম থেকে অবস্থান তুলে নেবার কাজ দ্রুতগতিতে চলতে থাকে। কিন্তু শত্রুরা আমাদের অবস্থান পরিত্যাগের কথা জানতে পারে এবং আমাদের পিছু ধাওয়া করে। শত্রুরা বৃষ্টির মত আমাদের উপর গোলাগুলি ছুড়তে থাকে। আমরা পিছু হটতে হটতে পরশুরাম খালের নিকট পৌঁছি। শত্রুরা ব্রীজের উপর থেকে গুলি চালাতে থাকে। আমরা দ্রুত খালে নেমে যাই এবং সাঁতরিয়ে ওপারে যাই এবং ভাগ্যক্রমে ইটের খোলা দেখতে পেয়ে সেখানে গিয়ে আশ্রয় নিয়ে শত্রুর গোলাগুলির হাত থেকে রক্ষা পাই। সকাল ৬টার মধ্যে আমরা নোয়াখালী হেডকোয়ার্টারে পৌঁছি।

নিদ্রাহীন এবং অভুক্ত থাকার জন্য আমার বাহিনীর অর্ধেকের মত সৈন্য অসুস্থ হয়ে পড়ে। ২৬শে জুনে সেক্টর-২-এর কমাণ্ডার মেজর খালেদ নোয়াখালী হেডকোয়ার্টারে আসেন। তিনি এখানে সব কমাণ্ডারদের নিয়ে এক সভা করেন। তিনি আমাকে আমার বাহিনী নিয়ে ১২ ঘণ্টার মধ্যে শালদা নদীর কোনাবন এলাকায় যাবার নির্দেশ দেন। সে সময়ে পাকসেনারা এ এলাকায় খুব চাপ দিচ্ছিল। মেজর খালেদ আমার এবং আমার বাহিনীর জন্য যানবাহনের ব্যবস্থা করে দেন।

২৭ শে জুন আমি আমার কসবা সাবসেক্টর হেডকোয়ার্টারে পৌঁছি। কসবাতে পৌঁছে আমি আমার বাহিনী যেটা কসবায় রেখে গিয়েছিলাম, তাদের যোগাড় করতে থাকি। কসবায় এসে দেখি পাকসেনারা গুরুত্বপূর্ণ

লাটুমুড়া পাহাড়ী এলাকাটিসহ সমগ্র কসবা এলাকা দখল করে নিয়েছে। যাহোক, আমি আমার কোম্পানী যোগাড় করে শালদা নদী-কোনাবনের দিকে অগ্রসর হই। ক্যাপ্টেন সালেক ছিলেন শালদা নদী সাবসেক্টরের কমাণ্ডার। মন্দভাগ-কোনাবনে আমাদের সৈন্যই ছিল না। শত্রুরা শালদা নদী রেলওয়ে স্টেশন, 'বায়েক', মন্দভাগ রেলওয়ে স্টেশন দখল করে রেখেছিল। যাহোক আমি আমার হেডকোয়ার্টার কোনাবনে স্থাপন করি। সে থেকে আমার সাবসেক্টর কোনাবন সাবসেক্টর বলে পরিচিত ছিল। আমার সাবসেক্টর উত্তরে কসবা-জাদেশ্বর এবং দক্ষিণে 'বায়েক' নিয়ে বিস্তৃত ছিল। পূর্ব পশ্চিমে ছিল সি-এন্ড-বি সড়ক বরাবর কোম্পানীগঞ্জ পর্যন্ত। আমি আমার সমস্ত সাবসেক্টর জুড়ে রেকি করি এবং কোম্পানী কমান্ডারদের নিয়ে কোম্পানীগুলিকে পুনর্গঠিত করে ফেলি। আমার প্রথম কর্তব্য হয়ে দাঁড়াল আমার বাহিনীকে নিয়ে একটা স্থানে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। আমি অন্যান্য সাব-সেক্টর কমান্ডারদের মত হেডকোয়ার্টার ভারতে স্থাপন করা মনঃপূত মনে করিনি। তাই আমার হেডকোয়ার্টার কোনাবনে স্থাপন করি।

৩০শে জুন সকালে শত্রুদের শক্তিশালী ঘাঁটি মন্দভাগ রেলওয়ে স্টেশন আক্রমণ করি। ৫ ঘণ্টা ধরে যুদ্ধ চলার পর বেলা সাড়ে ১২টার সময় শত্রুরা মন্দভাগ রেলওয়ে স্টেশন ছেড়ে চলে যায়। মন্দভাগ রেলওয়ে স্টেশন দখল করার পর ঐ দিনই আরও ৪/৫টা গ্রাম মুক্ত করে নেই। এভাবে আমি প্রতিরক্ষাব্যূহ ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা বরাবর গড়ে তুলি। সন্ধ্যা পর্যন্ত দু'বার শত্রুরা আমাদের উপর আক্রমণ চালায় কিন্তু তাদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। এরপর শত্রুরা অনেকবার চেষ্টা করেছিল এ এলাকা দখল করার জন্য কিন্তু পরম করুণাময় আল্লার রহমতে তাদের প্রচেষ্টা দেশ মুক্তি হবার আগে পর্যন্ত সফল হয়নি। প্রায় ৪ লক্ষের মত লোক পাকিস্তানী সৈন্যদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে বিভিন্ন এলাকা থেকে পালিয়ে এসে এখানে আশ্রয় নেয়। তাদের আত্মত্যাগের কথা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখা দরকার। তারা আমাদের মনোবল অনেকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছিল। তারা অনেক কাজে আমাদের সাহায্যও করত। পাকসেনারা মন্দভাগ রেলওয়ে স্টেশন থেকে বিতাড়িত হবার পর মন্দভাগে আশ্রয় নেয়। মন্দভাগ বাজার, আড়াইবাড়ি ও নয়নপুরে তারা সাঁজেয়া ও গোলন্দাজ বাহিনী নিয়ে আসে। আমরা কোন অপারেশন করলেই শত্রুরা গোলন্দাজ বাহিনীর সাহায্যে আমাদের এলাকায় কামানের গোলা ফেলত।

এরপর আমি মন্দভাগ রেলওয়ে স্টেশনের দক্ষিণে 'বায়েক' গ্রাম দখল করার পরিকল্পনা নেই। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, আমরা যখন বাঙ্কার থেকে উঠে আসতাম, তখন এ গ্রামে অবস্থানরত শত্রুসেনারা আমাদের উপর গুলি ও ৮২-এম-এম চাইনিজ মর্টারের সাহায্যে গোলা চালাত। ঐ গ্রাম আমি দখল করে নেই এবং শত্রুদের আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য প্রতিরক্ষাব্যূহ গড়ে তুলি।

এই দুই আক্রমণে আমার বাহিনীর বেশ হতাহত হবার ফলে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রধান কর্নেল এম, এ, জি, ওসমানী নির্দেশ পাঠান সামনাসামনি যুদ্ধ না করার। শত্রুদের ক্ষতিসাধন করার জন্য তিনি এ্যামবুশ এবং হঠাৎ করে আক্রমণ করার নির্দেশ দেন।

কর্ণেল ওসমানীর নির্দেশ পাবার পর আমি আচমকা আক্রমণের পথকেই বেছে নেই এবং এতে প্রভূত সাফল্য লাভ করি। আমি এ পরিকল্পনার জন্য 'সি' কোম্পানীর ১টা প্লাটুনকে নিয়োগ করি এবং ১টা কোম্পানী ও অন্যান্য সৈন্যদের মুক্ত এলাকায় রাখি শত্রুদের আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য। ই-পি-আর' এর সুবেদার গোলাম আম্বিয়ার নেতৃত্বে ১টা কোম্পানী ২নং সেক্টরের কমাণ্ডার মেজর খালেদ আমার নিকট পাঠান। সুবেদার গোলাম আম্বিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিল। পরে আমাকে ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল-এর নেতৃত্ব দেয়া হয়। তখন আমি ১৫ই আগস্টে 'ডি' কোম্পানী গঠন করি সুবেদার আম্বিয়ার কোম্পানীকে নিয়ে। এই দুই কোম্পানী স্বাধীনতার যুদ্ধে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিল। এই দুই কোম্পানী কসবার দক্ষিণ থেকে বায়েক পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণে রেখেছিল এবং ক্যাপ্টেন খালেকের সৈন্যরা কাটামোড়া থেকে গৌরাঙ্গতলা ও নয়নপুর রেলওয়ে স্টেশন পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণে রেখেছিল।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি গেরিলা তৎপরতার জন্য আমি ১ টা প্লাটুনকে নিয়োজিত রেখেছিলাম। বাছাই করা লোকদের এ কাজে নিয়োগ করি। এ কাজে আমি একজন অতি সাহসী জুনিয়র কমিশন অফিসারকে পাই। সে হচ্ছে সুবেদার ওহাব। তার নাম স্বাধীনতা যুদ্ধের পথপ্রদর্শক হিসেবে লিখিত থাকা উচিত। সে নিজের জীবনের মায়া, সুখ ত্যাগ করে সত্যি প্রকৃত বাঘের মত শত্রুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ত। সে কোনদিন কোন অভিযোগ আমার কাছে করে নাই। এমনকি অনেকদিন অভুক্ত অবস্থায় দিন কাটিয়েছে। তাকে যে কাজের ভার দেয়া হয়, তা সাফল্যের সাথে করে। কোন অপারেশনে সে কোনদিন বিফল হয়নি। এ প্রসঙ্গে আমি আরেক জনের নাম করব। সে হচ্ছে মর্টার সেকশনের শামসুল হক। তার নিখুঁত সাহসিকতাপূর্ণ কাজের জন্য আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল পাকসেনাদের বিপর্যস্ত করা। তার কাজের জন্যই সাবসেক্টর শত্রুদের জন্য কবরস্থানে' পরিণত হয়েছিল। আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি দেশ শত্রুমুক্ত হওয়া পর্যন্ত দীর্ঘ ৯ মাস মন্দভাগ রেলওয়ে স্টেশনে ও তার আশেপাশের এলাকা শত্রুমুক্ত রেখেছিলাম।

আমি মুক্ত এলাকাগুলি নিয়ে একটা মুক্ত সাব-ডিভিশন গঠন করি। সেখানে বাজার, স্কুল, থানা, বেসামরিক প্রশাসন চালু রাখার জন্য ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করি। মুক্ত এলাকায় বাংলাদেশের পতাকা গৌরবের সাথে উড়তে থাকে। এ মুক্ত এলাকা দেখার জন্য দেশ-বিদেশের নাম করা সংবাদপত্র, টেলিভিশন ও গণ্যমাণ্যরা দেখতে আসতে থকে। আমাদের পক্ষে অসুবিধা হয়ে পরেছিল ঐ সমস্ত গণ্যমান্য ব্যাক্তিদের সমস্ত কিছু দেখাতে এবং বুঝাতে। এ প্রসঙ্গে আমি মুক্ত এলাকার লোকের কথা স্বরন না করে পারি না এদের অনেক শত্রুদের গোলার আঘাতে মারা গেছে বা গুরুতরভাবে আহত হয়েছে। তবুও তাদেও মনোবল একটুও ভাঙ্গেনি। তারা আমাদের সর্বতোভাবে সাহায্যে করে যেতে থাকে। তারা বাঙ্কারে গোলাবারুদ পৌছিয়ে দিত, মৃত শহীদের কবরের ব্যবস্থা করতো, আহত সৈনিকদের সেবা-শুশ্রূষা করে হাসপাতালে নিয়ে যেতে সাহায্য করতো। তাদেও অনেকে নৌকায় করে বিভিন্ন স্থানে পৌছিয়ে দিত। অনেকে শত্রুদের খবরাখবর এনে দিত। এ খবরাখবর না পেলে শত্রুদের উপর ঠিকমক হামলা করতে পারতাম না। এদের সাহায্য নিয়েই আমি শত্রুসেনাদের উপর আক্রমন চালিয়ে তাদের অনেক অফিসার ও সৈনিকদের শেষ করতে সক্ষম হয়েছিলাম।

আমি শালদা নদী রেলওয়ে স্টেশনে শত্রুদের যাওয়া-আসা এবং রসদ সরবরাহের প্রতি লক্ষ্য রাখতাম। ৩৩ বেলুচ রেজিমেন্ট মন্দভাগ বাজারে ঘাটি গেরেছিল। কোম্পানীগঞ্জ থেকে স্পীডবোটের মাধ্যমে শালদা নদী হয়ে মন্দভাগ বাজার ও শালদা নদী স্টেশনে অবস্থিত শত্রুদের ঘাঁটিতে তাদের রসদ আসতো। সেদিনটি ছিল আমাদের জন্য খুব ভাল দিন। রাত দুটার সময় আমি সুবেদার ওহাব ও তার প্লাটুন নিয়ে বারদুরিয়াতে অবস্থিত শত্রুদের ঘাঁটি আক্রমন করতে গিয়েছিলাম। এ্যাকশেন শেষ করে পরের দিন সকাল ৮দিকে গুপ্তপথে আমাদেও অবস্থানে ফিরে আসছিলাম। সত্যিকথা বলতে কি আমরা খুব ক্লান্ত ছিলাম। সেজন্য একটি ঝোঁপের মধ্যে বিশ্রাম নিচিছলাম। হঠাৎ করে ৩টা স্পীডবোটের আওয়াজ শুনতে পাই যা কোম্পানীগঞ্জ থেকে আসছিল। আমি নিশ্চিত ছিলাম এই স্পীডবোটগুলি আহত সৈনিকদের নিয়ে আবার কোম্পানীগঞ্জ ফিরে যাবে। আমি এ ব্যাপারে সাহসী যোদ্ধা সুবেদার ওহাবের সাথে আলোচনা করি এবং দ্রুত শালদা নদীর একটা নির্বাচিত এলাকার ঝোঁপে গিয়ে অবস্থান নেয়ার সিদ্ধান্ত নেই। নদীর অপর পর্শ্বে অর্থাৎ পশ্চিম দিকে ওহাবের অধীনে একটা সেকশন পাঠিয়ে দেই এ্যাম্বুস পাতার জন্য এবং আমি নিজে দুটো সেকশন নিয়ে নদীর পূর্বপাড়ে দুটি ভাগে ভাগ হয়ে এ্যামবুশ পাতি। আধঘন্টার মধ্যেই মন্দভাগ থেকে স্পীডবোট আসার আওয়াজ শুনতে পাই। দুটো স্পীডবোট আমাদের ফাঁদে পা দেবার জন্য এগিয়ে আসছিল। আমি আমার সৈনিকদের নির্দশ দেই আমি গুলি না ছোড়া পর্যন্ত তারা যেন কেউ গুলি না চালায়। দুটো স্পীডবোট ১৫০ গজের ব্যবধানে এগিয়ে আসতে থাকে। স্পীডবোটগুলি ছিল খোলা এবং প্রথম স্পীডবোটে দেখি ২/৩টি ছতার নিচে লোক বসে আছে এবং পিছনেরটিতে অস্ত্রসজ্জিত হয়ে সৈন্য বোঝাই হয়ে আসছে। আমি নিশ্চিত হলাম প্রথম স্পীডবোটে ছাতার নিচে পাকসামরিক অফিসাররা বসে আছেন। নদী ছিল ৩০/৪০ গজ প্রশস্ত। দুটি স্পীডবোটেই যখন আমার ফাঁদে

পড়ে যায় তখন আমি শত্রুদের দিকে গুলি চালাই। সঙ্গে সঙ্গে আমার বাহিনীর লোকেরা শত্রুদের উপর এক সঙ্গে গুলির্বষণ করতে থাকে। এই গোলার্বষণ চলে ৫ মিনিট ধরে এবং শত্রুরা এ আক্রমণের কোন জবাব দেয়ার সময় পায়নি। শত্রুরা সবাই স্পীডবোট ছেড়ে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়। ১৪ জন শত্রুসেনার সবাই মারা যায়। আমি দেখি একজন শত্রুসেনা পানি থেকে আবার স্পীডবোটে ওঠার চেষ্টা করছে, সঙ্গে সঙ্গে গুলি করে তার সে চেষ্টা ব্যর্থ করে দেয়া হয়। এটা এক সাফল্যজনক অপারেশন ছিল। আমরা দুটি এম-জি-আর-এ-৩, ১টা চাইনিজ রাইফেল, ২টা চাইনজ স্টেনগান ১টা সমগ্র এলাকার আর্টিলারি ম্যাপ, ২টা পি-আর-সি, ১০টা অয়্যারলেস সেট এবং কিছু গোলাবারুদ উদ্ধার করি। আমরা দেখি একটা স্পীডবোটে একজন মৃত পাকিস্তানী ক্যাপ্টেন পড়ে আছে। আমরা তার ব্যাজটি ছিড়ে নেই আমরা দ্রুত অবসহান তুলে নিয়ে আমাদের ক্যাম্পে দুপুর তিনটার সময় নিরাপদে পৌঁছি। পরে এক অফিসারের কাছ থেকে জানতে পারি (তিনি অয়্যারলেসের সাহায্যে পাকিস্তানের এ ঘটনার ম্যাসেজ ধরেন) স্পীডবোটগুলিতে ৩৩ বালুচর ৫ জন অফিসার এবং অন্যান্য র‍্যাঙ্কের ৯ জন ছিল। এদের মধ্যে ১জন লেঃ কর্নেল, ১ জন মেজর, ১জন ক্যাপ্টেন ডাক্তার, ১ জন আর্টিলারি ক্যাপ্টেন, একজন লেফটেন্যান্ট ছিলেন। এরা সবাই কুমিল্লা টাউনে বাঙালিদের উপরে আত্যাচার চালিয়েছিল, মা-বোনের ইজ্জত নষ্ট করেছিল এবং ধন-সম্পদ লুষ্ঠন করেছিল। পরে স্থানীয় রাজাকার ও হেলিকপ্টারের সাহায্যে মৃতদেহগুলি নিয়ে শত্রুরা কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টর সৈন্যদের কবরস্থানে কবর দিয়েছিল। এদের মধ্যে কুখ্যাত ক্যাপ্টেন বোখারিও ছিল।

মুক্ত এলাকায় আমার যে অবস্থানগুলি ছিল সে গুলি হচ্ছে বায়েক গ্রাম, মন্দভাগ বাজার, কামালপুর, মঈনপুর, গোবিন্দপুর এবং জাদিশ্বর। শত্রুদের ঘাঁটি ছিল আমার এলাকার বিপরীতে কসবা, চাঁদলা, বড়ধুসিয়া, শালদা নদী রেলওয়ে স্টিশন ও নয়নপুর বাজারে। এসব এরাকা থেকে শত্রুরা আমাদের অবস্থানের উপর প্রায়ই গোলাগুলি চালাত। ছোট ছোট আক্রমণ, প্রতি-আক্রমণ,এ্যামবুশ ও রেইড দৈনন্দিন ব্যাপার ছিল। এতে শত্রুদের যথেষ্ট হতাহত হয়। আমাদেরও বেশ হতাহত হয়।

শত্রুসেনারা রাজাকারদের কোম্পানীগঞ্জ-কুটি প্রধান রাস্তায় পাহারায় মোতায়েন রাখে। রাজাকারের একটি দল আমার সাথে গোপনে যোগাযোগ করে। তারা জানায় তাদের জীবনের নিরাপত্তা দেয়া হলে তারা আমার নিকট আত্মসমর্পণ করবে এবং অনুমতি দিলে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেবে। কোম্পানীগঞ্জ-কুটি সড়কের মধ্যে কালামোরায় ১০৩ ফুট লম্বা ১টা ব্রীজ ছিল। রাজাকাররা সে ব্রীজ পাহারা দিত। আমি আমার এক দূতের মাধ্যমে জানাই তাদেরকে হত্যা করা হবে না এবং প্রয়োজন হলে মুক্তিবাহিনীতে নেয়া হবে। তাদের আরো জানাই কালামোরা ব্রীজ উড়ানোতে তাদের সাহায্যেও প্রয়োজন হবে।

আগস্ট মাসের এক রাতে ব্রীজ ধ্বংস করার পরিকল্পনা নেই। পরিকল্পনা অনুযায়ী শত্রুদের বিভিন্ন ঘাঁটিতে ব্যস্ত রাখার জন্য সুবেদার ওহাবের নেতৃত্বে ৫ টি এ্যাম্বুশ দল পাঁচ জায়গায় প্রেরণ করি। রাত ১২টা থেকে ভোর পর্যন্ত তারা শত্রুদের অবস্থানগুলি যথা সাহেবপারা, শালদা নদী গোডাউন, চাঁদলা প্রভৃতি জায়গায় শত্রুদের হঠাৎ করে আক্রমণ করে ব্যতিব্যস্ত রাখে। আর এদিকে পরিকল্পনা মত ই-পি-আর-এর সুবেদার আম্বিয়ার নেতৃত্বে একটি প্লাটুন কালামোরা ব্রীজে এক্সপ্লোসিভ লাগিয়ে রাত দু'টার সময় ব্রীজটি উড়িয়ে দেয়। এ কাজে রাজাকাররা আমাদের সাহায্য করে। ৭ জন রাজাকার অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আমার কাছে আত্মসমর্পণ করে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেয় এবং দেশ স্বাধীন হওয়া পর্যন্ত তারা আমার সাথেই ছিল।

শত্রুরা রসদ সরবরাহ করার জন্য এ রাস্তা দিয়ে যাবে আমরা এ ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলাম। সে জন্য এ কালামোরা ব্রীজ থেকে ১০০ গজ দূরে কোম্পানীগঞ্জের দিকে এ্যামবুশ পেতে বসে থাকি। ভোরের দিকে শত্রুদের রসদ সরবরাহকারী দুটো সৈন্যবোঝাই জীপ, দুটো ডজ, ৩টা বেসরকারী গাড়ি, একটা বাস ও দুটা তিন টনের গাড়ি এ রাস্তা দিয়ে আসছিল। ব্রীজের কাছে এসে তা ভাঙ্গা দেখে তারা আবার ফিরে যাবার জন্য প্রস্তুত হবার আমরা আকস্মাৎ রকেট লাঞ্চার, রাইফেল ও হালকা মেশিনগানের সাহায্যে শত্রুদের উপর

আক্রমণ শুরু করি। রকেট লাঞ্চারের সাহায্যে শত্রুদের পাঁচটা গাড়ি ধ্বংস করে দেয়া হয়। ১৫ জন পাকসেনা নিহত এবং কতজন আহত হয়েছিল আমার জানা নাই। ৩ জন জীবিত শত্রুসেনাকে আমরা ধরে ফেলি। এদের একজন হচ্ছে নায়েক সুবেদার বশির (সিন্ধি)। আমরা কিছু গোলাগুলি, অস্ত্রশস্ত্র এবং জরুরী কিছু কাগজপত্র উদ্ধার করি। শত্রুরা গোলন্দাজ বাহিনীর সাহায্যে গোলাবর্ষণ শুরু করলে আমরা অবস্থান পরিত্যাগ করি। জীবিত শত্রুসেনাদের আমি মেলা ঘরে পাঠিয়ে দেই। এরা ধৃত হবার ফলে মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবল বেরে যায়।

বাচ্চু নামে (ক্লাশ নাইনে পড়ত তখন) অসীমসাহসী যুবক একটা হালকা মেশিনগান নিয়ে শালদা নদীর এক স্থানে এ্যামবুশ পেতে শত্রুদের একটা নৌকা উড়িয়ে দিয়। নৌকাতে অবস্থানরত ১২ জন পাকসেনা এতে মারা যায়।

শালদা নদীর পূর্বপারে মন্দভাগ গ্রাম আমাদের দখলে ছিল। নদীর অপর পার আমাদের দখলে না থাকলেও শত্রুদের নিয়ন্ত্রনে ছিল না। নদীর ওপারে চাঁদলা গ্রামে শত্রুরা অবস্থান নিয়েছিল। শত্রুরা বারবার চাপ দিচ্ছিল মন্দভাগ দখল করে নেবার জন্য । আমরা ছোট ছোট অয়্যারলেসের মধ্য দিয়ে ধরতে পারি শত্রুরা যে কোন মুহুর্তে মন্দভাগ আক্রমন করতে পারে। ২১শে সেপ্টেম্বর শত্রুরা চাঁদলা থেকে চারটা নৌকায় করে মন্দভাগ আসছিল। মেজর দূররানির নেতৃত্বে ৩৩-বেলুচের নেতৃত্বে 'বি' এবং 'ডি' কোম্পানী এ নৌকাগুলিতে ছিল। শত্রুরা আক্রমন করতে পারে ভেবে আমি বাছাই করা একটা প্লাটুনকে সুবেদার ওহাবের নেতৃত্বে মন্দভাগ শালদা নদীর উপরে অবস্থান নিতে বলি। আর একটা সেকশনকে গ্রামের একপাশে আমার ডানদিকে এবং আরেকটা সেকশনকে বাম পাশে অবস্থান নিতে বলি। আমি অবস্থান নেই মধ্যখানে। আমি আমার বাহিনীকে নির্দেশ দেই আমি গুলি না ছোড়া পর্যন্ত যেন কেউ গুলি না চালায়। রাত্রি একটার সময় শত্রুরা মেজর দুরবানির নেতৃত্বে আমার অবস্থানের দিকে খাল দিয়ে নৌকাযোগে এগুতে থাকে। আমি তখন মন্দভাগ গ্রামে অবস্থানরত ডানপাশের বাহিনীকে নির্দেশ দেই শত্রুদের প্রতি গুলি ছোঁড়ার জন্য। শত্রুরা তখন নৌকা থেকে নেমে দুই ভাগে ব্রোকেন লাইন হয়ে এগুতে থাকে। তারপর যখন তারা আমার প্রতিরক্ষাব্যূহের ২০/২৫ গজের মধ্যে এসে গেছে, তখন আমরা সবাই তাদের উপর অবিরাম গুলিবর্ষণ করতে থাকি। এ গুলিবর্ষণের ফলে প্রথম সারির সবাই আহত-নিহত পড়ে যায় এবং পিছনের ব্রোকেন লাইনেরও অনেকে হতাহত হয়। শত্রুরা অবস্থা বেগতিক দেখে তাদের আহত সৈনিকদের ও গোলাগুলি ফেলে পালিয়ে যায়। পশ্চাঁদপসরনরত সৈনিদের লক্ষ্য করে মর্টারের সাহায্যে গোলাবর্ষণ করা হয়। ফলে শত্রুদের কিছু আহত হয়। এ যুদ্ধে শত্রুদের ৬ জন আহত সৈনিককে ধরে ফেলি। ২৬ জন মৃত শত্রুসেনাকে নিয়ে আসতে সক্ষম হই। এদের মধ্যে একজন লেফটেন্যান্ট ছিল। আমরা ৬টা এমজিআই-এ-৩ ৩৭/৩৮টা জি-৩ রাইফেল, ৫টা পিস্তল, চাইনিজ স্টেনগান ৮টা, ৩.৫ ইঞ্চি রকেট লাঞ্চার ২টা, ১টা ক্যামেরা, ১টা বাইনোকুলার, ২টা ক্যাম্পাস, ম্যাপ ও ৫/৬ হাজার গোলাগুলি দখল করে নেই। এ যুদ্ধে আমাদের ৪ জন আহত হয়। পাক গোলন্দাজ বাহিনী আমাদের গোলাবর্ষণ করতে থাকে। এ যুদ্ধে পৌনে পাঁচটা থেকে ছ'টা পর্যন্ত চলে। আমরা ধৃত ও নিহত সৈন্যদের সেক্টর-২-এর হেডকোয়ার্টার মেলাঘরে পাঠিয়ে দেই। শত্রুরা বিপর্যস্ত হবার পরপরই তাদের বিমান বাহিনীর পাঁচটা স্যাবর জেট এসে ৪৭ মিনিট ধরে আমার মুক্ত এলাকায় স্ট্র্যাপিং করতে থাকে। এতে একজন সামান্য আহত হয়।

জাদিশ্বরে আমি আমার একটা মর্টার সেকশন রাখি নায়েক সুবেদার মঈনের অধীনে। তখন ছিল রমজান মাস। আমি সুবেদার মঈনকে নির্দেশ দেই জাদিশ্বর থেকে কোন এক স্থান বেছে নিয়ে সাহেববাড়িতে অবস্থিত শত্রুসেনাদের অবস্থানে খাওয়ার সময় যেন আচমকা মর্টারের সাহায্যে হামলা চালায়। তাকে যেদিন এ কজি করতে বলা হয়, সেদিন সে ব্যর্থ হয়। পরের দিন ভোররাতে সেহরী খাওয়ার সময় জাদিশ্বর থেকে খাল পার হয়ে নায়েক সুবেদার মঈন তার ৮জন সঙ্গীকে নিয়ে যায় মর্টার হামলা করার জন্য। কিন্তু শত্রুসেনারা কোন গুপ্তচরের মাধ্যমে খবর পেয়ে আগে থেকেই এ্যাম্বুশ পেতে বসে ছিল। তারা নায়েক সুবেদার মঈন ও তাঁর বাহিনীর উপর অতর্কিত হামলা চালায়। এরা সুবেদার মঈন ও তার দুজন সঙ্গীকে ধরে ফেলে। দুজন গুলি করে সঙ্গে সঙ্গে মেরে ফেলে রেখে যায়। সুবেদার মঈনকে তারা ধরে নিয়ে যায়। সুবেদার আম্বিয়া টেলিফোন যোগে এ

বিপর্যয়ের কথা জানায়। আমি তাকে সঙ্গে সঙ্গে তার প্লাটুন নিয়ে শত্রুদের ধাওয়ার জন্য। সে আমার কথামত তাঁর প্লাটুন নিয়ে শত্রুদের ধাওয়া করে। ফলে শত্রুরা সেখানে নায়েব সুবেদার মঈনকে হাত পা বাধা অবস্থায় মেরে ফেলে পালিয়ে যায়। আমরা তাকে মুক্ত এলাকায় এনে সামরিক কায়দায় সম্মান জানিয়ে সমাহিত করি।

নায়েব সুবেদার মঈন একজন সাহসী যোদ্ধা ছিলেন। তাকে যে কাজ দেয়া হত, সে কাজ দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করতো। কোন নির্দেশ পাওয়ার পর, সে সেটা সম্পন্ন না করা পর্যন্ত শান্তি পেতনা। অসমসাহসী এ যোদ্ধার কথা বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস স্বর্ণক্ষরে লিখে রাখা উচিত। তার জন্য বাংলাদেশ গর্ব করতে পারে। মন্দভাগ গ্রাম ও রেলওয়ে স্টেশন আমাদের নিয়ন্ত্রনে অনেক আগে থেকেই ছিল। মন্দভগের পর শালদা নদী রেলওয়ে স্টেশনের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। এখান থেকেই কুমিল্লা-চট্টগ্রাম, কুমিল্লা-সিলেট ও কুমিল্লা-ঢাকা রেলপথে যেতে হয়। শালদা নদী রেলওয়ে স্টেশন ও বাজার ছিল একটা গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক এলাকা। ব্রাক্ষণবাড়িয়া, বুরিচং, কসরা এলাকায় শালদা নদী গ্রামের ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের কাঁচা রাস্তা দিয়ে যেতে হয়। ফলে শালদা নদী রেলওয়ে স্টেশন ও গ্রামের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। সেক্টর-২ এর কমাণ্ডার কর্নেল খালেদ মোশাররফ সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম দিকে আমাকে শালদা নদী সাবসেক্টরের কমাণ্ডার মেজর সালেক চৌধুরী ক্যাপ্টেন পাশা ও ক্যাপ্টেন আশরাকে নিয়ে রেলওয়ে স্টেশনে আমার হেডকোয়ার্টারে এক আলোচনা সভা ডাকেন। তিনি আমাদের বলেন, আমরা মন্দভাগ মুক্ত করেছি। শালদা নদী রেলওয়ে স্টেশন মুক্ত করতে পারলে আমাদের মুক্ত করতে পারলে আমাদের মুক্ত এলাকা বেড়ে যাবে এবং সামরিক ও অন্যান্য দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ জায়গাটি মুক্ত করতে পারলে শত্রুদের মনোবল ভেঙ্গে যাবে। সে মতে তিনি আমাদের শালদা নদী রেলওয়ে স্টেশন মুক্ত করার জন্য শত্রুদের প্রতিরক্ষা অবস্থানে হামলা চালাবার নির্দের্শ দেন এবং তিনি নিজে এ আক্রমণ পরিচালনা করেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী আমি আমার একটা কোম্পানী নিয়ে শালদা নদী রেলওয়ে স্টেশনের উত্তর দিকে বায়েক গ্রামে অবস্থান নেই। ক্যাপ্টেন আশারাফ একটা কোম্পানী নিয়ে মন্দভাগ গ্রাম থেকে এগিয়ে শত্রুদের নয়নপুর ঘাঁটির কিছু দূরে অবস্থান নেন। মেজর সালেক খাল পার হয়ে শালদা নদী পার হয়ে একটা কোম্পানী নিয়ে শালদা নদী স্টেশনের পশ্চিমে শালদা নদী গোডাউনে অবস্থান নেন। ক্যাপ্টেন পাশা বাংলাদেশের প্রথম আর্টিলারী বাহিনী নিয়ে আমার অবস্থানের পিছনে মন্দভাগ রেলওয়ে স্টেশনে অবস্থান নেন। আআদের সাহায্য করার জন্য সুবেদার জববার তার মর্টার সেকশন নিয়ে আমার অবস্থানের পিছনে মন্দভাগ রেলওয়ে স্টেশনে অবস্থান নেয়। পরিকল্পনা অনুযায়ী সকাল সাড়ে ৬টার সময় গোলন্দাজ বাহিনীর ক্যাপ্টেন পাশা প্রথম পাক অবস্থানের উপর গোলা ছুড়তে থাকে। মেজর সালেক, আশরাফ এবং আমি নিজ নিজ বাহিনী নিয়ে শত্রুদের অবস্থানের উপর নির্দিষ্ট সময়ে হামলা চালাই। শত্রুরা তাদের গোলন্দাজ ঘাঁটি বুড়িচং, কসবা, কুটি, চাঁদলা থেকে আমাদের উপর অবিরাম গোলাবর্ষণ করতে থাকে। ক্যাপ্টেন আশরাফের আক্রমনে নয়নপুর গ্রামে অবস্থানরত পাকসেনারা নয়নপুর গ্রাম ছেড়ে শালদা নদীদক্ষিণ পাড়ে চলে যায়। নয়নপুর গ্রাম আমাদের দখলে চলে আসে। আমি আমার বাহিনী নিয়ে নয়নপুর গ্রামের রেলব্রীজ পর্যন্ত এগিয়ে যাই। মেজর সালেক শালদা নদী বাজার এবং গোডাউন দখল করে নেয়। শালদা নদীর দক্ষিণ পার্শ্বের বিলে শত্রুদের দৃঢ় অবস্থানের জন্য মেজর সালেক শালদা নদী রেলওয়ে স্টেশন পর্যন্ত এগুতে পারেননি। এ যুদ্ধ চলে সকাল সাড়ে ৬টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত। শত্রুরা তাদের তিনটি গোলন্দাজ ঘাঁটি থেকে আমাদের অবস্থান ও মুক্ত এলাকাতে অবিরাম গোলাবর্ষণ করতে থাকে। আমাদেও গোলাবারুদ শেষ হয়ে যাবার ফলে মেজর সালেক তার অগ্রবর্তী অবস্থান তুলে নিয়ে মন্দভাগে চজলে আসেন। ক্যাপ্টেন আশরাফ এবং আমার দখলকৃত জায়গা আমার দখলে রাখি। মেজর সালেক এবং ক্যাপ্টেন আশরাফ তাদের বাহিনী আমার অধীনে রেখে ২নং সেক্টরের হেডকোয়ার্টারে চলে যায়। এই যুদ্ধে আমাদের নামকরা সাতারু হাবিলদার সিরাজসহ ৬জন সৈন্য পাকিস্তানী গোলাগুলির ফলে নিহত এবং আহত হয়। শত্রুদের হতাহতের সঠিক কোন খবর না পাওয়া গেলেও লোকমুখে আমরা জানতে পেরেছি নয়নপুর রেলওয়ে স্টেশন হয়ে ট্রলিযোগে অনেক আহত এবং নিহত

সৈনিকদের কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে গেছে। এটাই ছিল প্রথম সামনাসামনি যুদ্ধ। এ যুদ্ধের পর পর আমরা শত্রুদের সাথে সামনাসামনি যুদ্ধ করার পথ বেছে নেই। সৈন্য এবং গণবাহিনীর ছেলেদেও মনোবল এ যুদ্ধের পর বেড়ে যায়। গণবাহিনীর ছেলেরা যদিও এই সামনাসামনি যুদ্ধে কিছুটা ভীত হয়ে পড়েছিল, কিন্তু পরে তারা বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিল। এ যুদ্ধের পরেই মেজর সালেক এবং ক্যাপ্টেন আশরাফের কাছ থেকে শালদা নদী সাব-সেক্টরের ভার নিয়ে নেই। শেষ অবধি দেশ স্বাধীন হওয়া পর্যন্ত দুই সাবসেক্টর আমার অধীনেই ছিল। মেজর সালেক ছিলেন এক অসমসাহসী যোদ্ধা।

মন্দভাগ ও শালদা নদী সাব-সেক্টরের মধ্যে শালদা নদী রেলওয়ে স্টেশনে শত্রুদের একটা শক্তিশালী ঘাঁটি ছিল। আমি শালদা নদী সাব-সেক্টরের কমাণ্ডার মেজর সালেক ও ক্যাপ্টেন আশরাফ সেক্টর-২এর কমাণ্ডার কর্নেল খালেদ মোশাররফের নির্দেশে যৌথভাবে শালদা নদী রেলওয়ে স্টেশনে শত্রুদের ঘাঁটির উপর পূর্বেই একবার হামলা চালিয়েছিলাম। কিছুটা সাফল্য লাভ করলেও শত্রুদের শালদা নদী রেলওয়ে স্টেশন থেকে বিতারিত করা সম্ভব হয়নি।

এরপর মেজর সালেক শালদা নদী সাব-সেক্টরের ভার আমার হাতে ছেরে দিয়ে অন্যত্র চলে যান। আমি চিন্তা করতে থাকি শত্রুদের কি করে শালদা নদী রেলওয়ে স্টেশন থেকে বিতারিত করা যায়। সে উদ্দেশ্যে আমার মূল ঘাঁটি মন্দভাগ থেকে শালদা নদী রেলওয়ে স্টেশনে শত্রুদের শক্তিশালী ঘাঁটির অবস্থান পর্যবেক্ষন করার জন্য কালো শার্ট ও লুঙ্গি পড়ে কৃষকের বেশে শালদা নদীর রেলওয়ে স্টেশনের নদীর বিপরীত দিকে এক বিরাট নিম গাছের তলায় দাঁড়িয়ে শত্রুদের অবস্থান পর্যবেক্ষণ করেছিলাম। সময় ছিল ঠিক সন্ধার আগে। শত্রুরা আমাকে দেখতে পায় এবং আমার উপর গোলাগুলি ছুড়তে থাকে। নিম গাছের সামনে আমাদের একটা পরিক্ষা ছিল।কিন্তু এত ক্লান্ত ছিলাম যে গাছ ছেড়ে পরিখায় নামতে পারিনি। গাছকে আরাল করে বসে থাকি। তাদের আমার পাশ দিয়ে চলে যেতে থাকে। সন্ধার পর গোলাগুলি বন্ধ হলে আমি আমার ঘাঁটিতে ফিরে আসি।

শত্রুদের প্রতিরক্ষা অবস্থান পর্যবেক্ষণের পর বুঝতে পারি শত্রুদের অবস্থান খুবই শক্তিশালী। নদীর তীর বরাবর আমাদের অবস্থানের সামনে তারা চারটি বড় পরিখা খনন করেছে। শালদা নদী গোডাউনের পাশ দিয়েও তারা এরকম শক্তিশালী পরীখা খনন করেছে। এ অবস্থানে আমি শত্রুদের কাবু করার জন্য তিন দিক থেকে সাঁড়াশী আক্রমনের পরিকল্পনা নেই এবং নায়েক সুবেদার সিরাজের নেতৃত্বে শালদা নদী রেলওয়ে স্টেশনের পূর্বে পাহাড়ী জায়গায় একটা প্লাটুন পাঠাই। সুবেদার মঙ্গল মিয়াকে আর একটা প্লাটুন নিয়ে শালদা নদী গোডাউনের নিকটে গিয়ে অবস্থান নিতে বলি। সুবেদার বেলায়েতকে নিয়ে আর একটা প্লাটুন নিয়ে শালদা নদীতে শত্রুদের ঘাঁটির নদীর বিপরীতে অবস্থান নিতে বলি। আমাদের যাতে শত্রুরা পিছন থেকে আক্রমন করতে না পারে তার জন্য সুবেদার ওহাবের নেতৃত্বে একটা কোম্পানীকে সুবেদার মঙ্গল মিয়ার পিছনে অবস্থান নিতে বলি। সঙ্গে সঙ্গে চারটা রেইডিং পার্টিকে শত্রুদের অন্যান্য অবস্থান যথা বড়ধুসিয়া, চাঁদলা, সাহেববাড়ি, গোবিন্দপুর ও কায়েমপুরের আগের ঘাঁটিতে রাতে হঠাৎ রেইড করার নির্দেশ দেই। হঠাৎ করে চারটা ঘাঁটিতে আক্রমনের পরিকল্পনা নিয়েছিলাম এ জন্য যে, এর ফলে শালদা নদী রেলওয়ে স্টেশনে। অবস্থানরত শত্রুদের দৃষ্টি অন্যদিকে পড়বে। হঠাৎ করে চারটি ঘাঁটিতে আক্রমণ করলে তাদের ঐ চারটা অবস্থানকে রক্ষার জন্য তারা মর্টার ও কামানের গোলা আমাদের উপর নিক্ষেপ করবে। এভাবে তাদের মর্টার ও কামানের গোলা অনেক শেষ হয়ে যাবে। পরিকল্পনা মত ৭/৮ই অক্টোবর রাতে ৪টি রেইডিং পার্টি ক্রমান্বয়ে বড়ধুসিয়া, চাঁদলা, কায়েমপুর ও সাহেববাড়ি গোবিন্দপুরে হামলা চালায়। এটা চলে সারারাত ধরে। শালদা রেলওয়ে স্টেশন থেকে শত্রুরা আমাদের এ্যামবুশ পার্টিগুলির উপর মর্টার ও কামানের গোলা নিক্ষেপ করতে থাকে। ভোরের দিকে এ আক্রমন বন্ধ হয়ে যায়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, শত্রুরা রাতে আমাদের আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকত, কিন্তু দিনের বেলা তারা এতখানি প্রস্তুত থাকত না। সাধারনত দিনের বেলা ই-পি-সি-এ-এফ ও রাজাকারদের পাহারায় মোতায়েন করে তারা ঘুমাত, না হয় বিশ্রাম নিত।

৭/৮ই অক্টোবরের সকাল ৮টার সময় আমরা সম্মিলিতভাবে শত্রুদের উপরি ঝাঁপিয়ে পড়ি। সুবেদার মঙ্গল মিয়া শালদা নদী গোডাউনের পরিখায় অবস্থানরত শত্রুদের উপর গোলাগুলি চালাতে থাকে। সুবেদার বেলায়েত নদীর পার থেকে ওপারে শত্রুদের পরিখার উপর ভীষণভাবে গোলাগুলি ছুড়তে থাকে। নায়েক সুবেদার সিরাজ পাহাড়ী অবস্থান থেকে শত্রুদের উপর আক্রমণ চালাতে থাকে। উভয়পক্ষের মধ্যেই প্রচণ্ড বিনিময় হতে থাকে। আমি আগেই পরিকল্পনা নিয়েছিলাম নদীর ওপারে পরিখাগুলি নষ্ট করে দিতে পারলে শত্রুরা আর টিকতে পারবে না। সে মতে নায়েক সুবেদার মোহাম্মদ হোসেন আর-আর- এর গোলা পরিখার উপর ফেলতে থাকে এবং এতে কাজ হয়। আর-আর-এর দুটি গোলার আঘাতে নদীর পারে অবস্থিত চারটি পরিখার মধ্যে ২টি নষ্ট হয়ে যায় এবং শত্রুরা ঐ নষ্ট দুটি পরিখা ত্যাগ করে অন্য দুটিতে চলে যায়। সুবেদার বেলায়েত সঙ্গে সঙ্গে তার বাহিনীর কিছু লোক নিয়ে নদী সাঁতরিয়ে গিয়ে ভাঙ্গা পরিখায় অবস্থান নেয় এর ফলে শত্রুরা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। শালদা নদী রেলওয়ে স্টেশনের অবস্থানরত শত্রুসেনাদের সাথে গোডাউনে অবস্থানরত শত্রুসেনাদের কোন সংযোগ থাকে না। শত্রুরা আমাদের উপর মর্টার ও কামানের গোলা ফেলতে পারছিল না। এতে তাদের অনেক ক্ষতি হত, কেননা আমাদের সেন্যরা তাদের দুদলের মাঝে ঢুকে গেছে। শালদা নদী গোডাউনে অবস্থানরত বুঝতে পারে তাদের পক্ষে এঁটে ওঠা সম্ভব নয়। অন্য দিক থেকে সাহায্য না পাবার ফলে তারা গোডাউনের পার দিয়ে নয়নপুর রেলওয়ে স্টেশনে তাদেও অবস্থানে পালিয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে মঙ্গল মিয়া শালদা নদী গোডাউনটি দখল করে নেয়। দুপুর ১১টার সময় শত্রুদের একটি অয়ারলেস থেকে ম্যাসেজ আমি ধরি। তাতে তারা কতৃপক্ষকে জানায় মুক্তিবাহিনীর ১টা ব্যাটালিয়ান তাদের আক্রমণ করেছে। এ মুহূর্তে তাদেও পক্ষে আর এ ঘাঁটিতে টিকে থাকা সম্ভব হচ্ছে না।

এ ম্যাসেজ ধরার পরে আমার মনোবল বেড়ে যায়। আমি আমার শত্রুদের আরও তীব্রভাবে তাদের উপর আক্রমন করার নির্দেশ দেই। আমি বুঝতে পারছিলাম তাদের মনোবল একেবারেই ভেঙ্গে গেছে। শত্রুরা এ ঘাঁটি ছেড়ে যেতে বাধ্য হবে যদি আমরা আক্রমণ চালিয়ে যাই। কিছুক্ষণ লড়াই চলবার পর শালদা নদী রেলওয়ে স্টেশনে অবস্থানরত শত্রুসেনারা ধীরে ধীরে রেললাইন বরাবর পরিখা দিয়ে নয়নপুর রেলওয়ে স্টেশনে তাদের ঘাঁটিতে পালিয়ে যেতে থাকে। আমি এবং আমার বাহিনী পরিখাতে অবস্থান নিয়ে পলায়নপর শত্রুদের উপর গুলি চালাতে থাকি। একজন পাকসেনার কথা আমার মনে পড়ে। সে ধীরমন্থর গতীতে একটি পরিখা থেকে অন্য পরিখাতে যাচ্ছিল। আমি তার উপর গুলি চালাই। দেখি আবার কিছুক্ষণ পর উঠে ধীরমন্থর গতিতে আবার এগিয়ে যাচ্ছে, আবার গুলি চালাই। এভাবে ২/৩টি পরিখা পার হবার পর সে আর যেতে পারেনি। আমার মনে হয় আমাদের আক্রমণের সময়ই সে গুরুতরভাবে আহত হয়েছিল যার জন্য সে দ্রুতগতিতে এগিয়ে যেতে পারেনি।

এরপর আমরা সমগ্র শালদা নদী এলাকা দখল করে নিয়ে নিজেদের অবস্থানকে শক্তিশালী করে তুলতে থাকি যেন শত্রুরা আক্রমণ করে শালদা পুনর্দখল করে নিতে না পারে।

এরপর শত্রুরা নয়নপুর রেলওয়ে স্টেশন ঘাঁটি থেকে মর্টার ও কামানের গোলা বৃষ্টির মত আমাদের অবস্থানে ফেলতে থাকে। ইতিমধ্যে ভারতীয় বাহিনীর লেঃ জেনারেল সগৎ সিং আমাকে অভিনন্দন জানানোর জন্য মন্দভাগে আসেন। আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাই।

এর মধ্যে শত্রুরা আমাদেরকে আক্রমনের জন্য শালদা নদী গোডাউনের কাছে সমাবেশ হচ্ছে খবর পেয়ে সুবেদার বেলায়েত সে স্থানে যান। রেকি করার সময় একজন প্যারা-ট্রুপস এর শত্রুসেনা একটি গাছের আরাল থেকে তাকে গুলি করে গুরুতরভাবে আহত করে। জেনারেল সগৎ সিং-এর সাথে দেখা করে ফেলার পর আমি এ খবর পাই। সঙ্গে সঙ্গে তাকে চিকিৎসা করার জন্য সেক্টর-২-এর হাসপাতালে পাঠানো হয় কিন্তু পথিমধ্যে সে মারা যায়। তার মত বীর সৈনিকের মৃত্যুতে আমি মর্মাহত হয়ে পড়ি। তার মত বীরের মৃত্যুতে আমাদের বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও বাংলাদেশ একজন মহান বীরকে হারায়।

শালদা নদী রেলওয়ে স্টেশন দখল একটা সাহসী পরিকল্পনা ছিল। আমি অবশ্য আশান্বিত ছিলাম যদি তাদের ঠিকমত আঘাত করা যায় এবং মনোবল ভেঙ্গে দেয়া যায়,তবে নিশ্চয়ই জিতব। এটা অত্যন্ত শক্ত এবং দুঃসাহসী কাজ ছিল।

শালদা নদী রেলওয়ে স্টেশন দখল করার পর আমরা প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ সেখানে পাই। ২১টা ৩০৩ রাইফেল, ৫টা হালকা মেশিনগান, এম-জি-আই-এ-৩ ৩ টা ম্যাগাজিন বক্স ২টা, হালকা মেশিনগান ম্যাগাজিন ৩১টা, বেটাগান ২টা, রকেট লাঞ্চার ৪০-এম এম ১টা, অয়্যারলেস সেট পি-আর-সি-৬২ একটা, হারিকেন ৪টা, গোলাবারুদ ২০,২৫০টা, ২ ইঞ্চি মর্টার বোমা ২০০টা, ৬০-এম-এম মর্টার বোমা ৭২টা, ৩০৩ বল ১০ হাজার, ২ ইঞ্চি মর্টার বোমা ধোঁয়া ৪টা, টেলিফোন সেট ৩টা, জেনারেটর ১টা, পি-আর-সি-১০ অয়্যারলেস সেট ব্যাটারিসহ ৫টা, ট্রানজিস্টর ৩ ব্যান্ড ১টা এবং বিভিন্ন ধরনের খাদ্য রসদ ও অসংখ্য কাপর-চোপর। এছারাও ব্যারেল হোল্ডার ২টা, এম-জি স্পেয়ার ব্যারেল ২টা, ম্যাপ এবং বিভিন্ন ধরনের নথিপত্র। এসব দলিলপত্র থেকে জানতে পারি যে ৩০ পাঞ্জাবের ‘বি’ এবং ‘ডি’ কোম্পানী আখানে মোতায়েন ছিল। এ লড়াই ভোর পাঁচটা থেকে রাত সাড়ে দশটা পর্যন্ত চলে। প্রায় ১৬ ঘণ্টা ধরে দু’পক্ষে তুমুল লরাই চলে। এ যুদ্ধে আমার বাহিনীর ২ জন নিহত এবং ৮ জন আহত হয়। শত্রুদের প্রায় ১০০ জন নিহত এবং ধৃত হয়। এর মধ্যে ১২ জনকে আমরা জীবিত অবস্থায় ধরে ফেলি। শত্রুদের কতজন আহত হয়েছিল তার সঠিক সংখ্যা না জানা গেলেও এটা নিশ্চিত যে তাদের অনেকেই আহত হয়েছিল।

শালদা নদী রেলওয়ে স্টেশনে কৃতিত্বের সঙ্গে লড়াই করে শত্রুদের বিতারিত করার জন্য তৎকালীন বাংলাদেশ সরকার সেনাবাহিনীর তরফ থেকে যুদ্ধকালীন সময়ে আমাকে বীরত্বসূচক হাই অর্ডার (গ্যালানট্রি এওয়ার্ড) সম্মানে সম্মানিত করে। স্বাধীন হবার পর এর নাম দেয়া হয় বীরউত্তম। এ ছিল আমার সাবসেক্টরে কৃতিত্বপূর্ণ লড়ায়ের একটি পুরস্কার।

মন্দভাগ শালদা নদী সাবসেক্টরে যেসব সেনা শত্রুদের সাথে লড়ায়ে শহীদ হন, তাদের আমি কুলাপাতড়া নামক স্থানে সমাহিত করার ব্যাবস্থা করি। এদের স্মৃতিচিহ্ন এখনও কুলাপাতড়ায় বিরাজ করছে।

শালদা নদী থেকে শত্রুরা পরাস্ত এবং বিতাড়িত হবার পর তারা বুড়িচং এবং কুমিল্লার দিকে সরে যায়। শালদা নদী মুক্ত করার পর মুক্তিবাহিনীর একটা কোম্পানী ফ্লাইং অফিসার কামালের অধীনে রাখা হয়। এরপর বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রধান কর্নেল এম, এ, জি, ওসমানী (বর্তমান অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল) আমাকে ‘কে’ ফোর্সের ৪র্থ বেঙ্গলকে নিয়ে ফেনীর দিকে অগ্রসর হবার নির্দেশ দেন। সেই মত আমি আমার বাহিনী নিয়ে ফেনীর দিকে অগ্রসর হই। ফেনীতে অবস্থানরত শত্রুদের আক্রমণ করার জন্য আমি আমার বাহিনীকে ছাগলনাইয়া থেকে শুভপুর ব্রীজ পর্যন্ত শত্রুদের প্রতিরক্ষাব্যূহ ঘিরে অবস্থান নেবার নির্দেশ দেই। সেই মত তারা অবস্থান নেয়। ‘ ফোর্সের ১০ম বেঙ্গলের অধীনায়ক ক্যাপ্টেন জাফর ইমাম ছাগলনাইয়া থেকে লক্ষীপুর পর্যন্ত অবস্থান নেয়। ভারতীয় বাহিনীর দুটো ব্যাটালিয়ান আমাদের সাহায্য করার জন্য বিলোনিয়াতে অবস্থান নেয়। আমরা ডিসেম্বর মাসের প্রথম দিকে অবস্থান শক্তিশালী শত্রুদের উপর গোলন্দাজ বাহিনীর সাহায্যে গোলা চালাতে থাকি। শত্রুরা এতে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। শত্রুদের মনোবল তখন একেবারেই ভেঙ্গে গেছে। শত্রুরা আমাদের গোলন্দাজ বাহিনীর আক্রমণে ভীত হয়ে ৬ই ডিসেম্বর ফেনীতে তাদের যাবতীয় অস্ত্রশস্ত্র গোলাবারুদ ফেলে শুভপুর ব্রীজ হয়ে চট্টগ্রামের দিকে পালিয়ে যায়। ৬ই ডিসেম্বর ফেনী শত্রুমুক্ত হয়। ফেনীতে আমরা অজস্র গোলাবারুদ হস্তগত করি। শত্রুরা শুভপুর হয়ে চট্টগ্রামে পালাবার সময় রেলব্রীজ ও শুভপুর সড়কসেতু দুটোই ধ্বংস করে দিয়ে যায়। আমরা ফেনী দখল করার পর শত্রুদের পিছু ধাওয়া করি। কিন্তু শুভপুরের পারাপারে দুবার দুটো ব্রীজই ধ্বংস হবার ফলে আমাদের গতি বাধাপ্রাপ্ত হয়। আমরা শুভপুরে ব্রীজ মেরামতের জন্য দু’দিন অবস্থান করি।ভারতীয় বাহিনীর ইঞ্জিনিয়াররা দু’দিনের ব্রীজ পুনঃনির্মাণ করে। তারপর আমরা নৌকা করে এবং ব্রীজের সাহায্যে শুভপুর পার হয়ে চট্টগ্রামের দিকে অগ্রসর হই। করেরহাটে রাত ৮টার সময় ‘‘কে’’ ফোর্সের

কমাণ্ডার বিগ্রেডিয়ার আনন্দস্বরূপের সভাপতিত্বে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং সিদ্ধান্ত নেয়া হয় ৪র্থ বেঙ্গল এবং মুজিব ব্যাটারীকে (বাংলাদেশের প্রথম গোলন্দাজ বাহিনী) নিয়ে আমি হিয়াকু, ফটিকছড়ি, নাজিরহাট হয়ে চট্টগ্রামের দিকে যাবে এবং ১০ম বেঙ্গল ও আরও দুটো ভারতীয় ব্যাটালিয়নকে নিয়ে বিগ্রেডিয়ার আনন্দস্বরূপ সীতাকুণ্ড হয়ে চট্টগ্রামের দিকে অগ্রসর হবেন। পরিকল্পনা নেয়া হয় চট্টগ্রমে একসঙ্গে মিলিত হয়ে আমরা একসঙ্গে চট্টগ্রামে শত্রুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ব। পরিকল্পনা মত আমরা রাত ১২টার সময় রওনা দিলাম এবং সকাল সারে ৬টায় হিয়াকু বাজারে পৌছালাম। হিয়াকু বাজারে শত্রুদের একটা ডিলেয়িং প্লাটুন ছিল। তারা আমাদের বাধা দেয় কিন্তু আমাদের গোলন্দাজ বাহিনীর গোলাগুলির জন্য তারা অবস্থান তুলে নিয়ে ফটিকছড়িতে পালিয়ে যায়। আমরা হিয়াকু সহজেই শত্রুমুক্ত করি। এরপরে রাস্তা ছিল খুবই বিপদসঙ্কুল। কোন কোন সময় আমাদের গাড়ি থেকে নেমে হেঁটে অগ্রসর হতে হচ্ছিল। অগ্রসর হবার পথে বিবিরহাটের এবং হিয়াকুর মধ্যে চৌরাস্তার সামনে এক পাঞ্জাবী সেনা হাত তুলে আমাদের আসতে বলে। আমি আমার গাড়ি এ শত্রুসেনাটির উপর দিয়ে চালিয়ে দিই। এতে সে গুরুতরভাবে আহত হয় এবং চিকিৎসা করার জন্য পাঠাবার সময় পথিমধ্যে সে মারা যায়। শত্রুসেনাটি পথ হাড়িয়ে ছিল বলে আমার মনে হয়। নারায়ণহাটে শত্রুদের একটা ডিলেয়িং পার্টি ছিল। তারা আমাদের আক্রমণে পিছু হটে ফটিকছড়িতে চলে যায়। নারায়ণহাটে এক রাত থাকি এবং বাহিনীকে আরো সংগঠিত করে পরের দিন সকালে ফটিকছড়ির দিকে অগ্রসর হই। পথে কাজিরহাটে দেখি একটা কাঠের ব্রীজ শত্রুরা ভেঙ্গে দিয়েছে। ব্রীজ মেরামতের জন্য আমাদের ৫/৬ ঘণ্টা সময় লাগে। কাজিরহাটে শত্রুরা আমাদের অগ্রসরে বাধা দেবার জন্য পথে অনেক মাইন বসিয়ে রেখে গিয়েছিল। এসময়ের মধ্যে আমরা মাইনও সরিয়ে ফেলি এবং আমরা ফটিকছড়ির দিকে অগ্রসর হতে শুরু করি।

ফটিকছড়িতে শত্রুদের এক কোম্পানী ই-পি-সি-এ-পি ও ২৪তম ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের কিছু সৈন্য মোতায়েন ছিল। কাজিরহাট থেকে কিছুদূর এগিয়ে আমি আমার বাহিনীকে তিনভাগে ভাগ করে শত্রুদের অবস্থানে আক্রমণের জন্য এগিয়ে যাবার নির্দেশ দেই। একদল ফটিকছড়ির সন্নিকটে পাহাড়ের দিকের রাস্তায় অবস্থান নেয়। আর একদল মানিকছড়ি-রামগড় রাস্তার এক জায়গায় অবস্থান নেয়। প্রধান দলটি ফটিকছড়ি কাজিরহাট রাস্তার শত্রুদের অবস্থানের নিকট অবস্থান নেয়। প্রধান দলটি ফটিকছড়ি-কাজিরহাট রাস্তার শত্রুদের অবস্থানের নিকট অবস্থান নেয়। ১১ই ডিসেম্বর বিকেল ৪টা ৩০ মিনিটের সময় আমরা সম্মিলিতভাবে শত্রুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ি। শত্রুরা আমাদের গোলাগুলির সামনে টিকতে না পেরে কিছু অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র গোলাবারুদ বিছানাপত্র ফেলে পালিয়ে যায়। ফটিকছড়ি রক্ষার জন্য শক্তিশালী অবস্থান নিতে বলি। সেই প্রধান চারটি সড়কের সামনে আমরা অবস্থান নেই। ফটিকছড়ির যুদ্ধে আমাদের দুইজন আহত হয়। পাকসেনাদের কতজন মারা গিয়েছিল তা জানা না গেলেও তাদের রক্ত মাখা জামা-কাপড় অনেক ফেলে রেখে গিয়েছিল। আমি মনে করি তাদের বেশ কিছু হতাহত হয়েছিল। এরপর শত্রুরা পিছু হটে নাজিরহাট থেকে আমাদের উপর মর্টারের সাহায্যে অবিরাম গোলাবর্ষণ করতে থাকে। এর মধ্যে একজনের মারফত খবর পাই শত্রুরা রামগড়ে তাদের অবস্থান ছেড়ে দিয়ে মানিকছাড় রাস্তা দিয়ে এগিয়ে আসছে। আমি আরো দুটো প্লাটুনকে মানিকছড়ি রাস্তায় আমাদের অবস্থানকে আরো শক্তিশালী করার জন্য পাঠিয়ে দেই এবং মর্টারের সাহায্যে রামগড়ে শত্রুদের উপর গোলাবর্ষণ করতে থাকি। এতে তারা মানিকছড়ির দিকে না এগিয়ে অন্য পথে নাজিরহাটের দিকে পালিয়ে যায়।

এরপর আমি নাজিরহাটে শত্রুদের অবস্থান দেখার জন্য নাজিরহাটের দিকে যাই। নদীরপারে এক দোতলা বাড়ি থেকে শত্রুদের অবস্থান রেকি করি এবং দেখি শত্রুরা নদীর ধার বরাবর শক্তিশালী অবস্থান নিয়ে বসে আছে। মেজর আসিফের নেতৃত্বে ৩৪তম এফ-এফ-রেজিমেন্টের ২টা কোম্পানী ও বেশ কিছুসংখ্যক ই-পি-সি-এ-পি নাজিরহাটে অবস্থান নিয়েছিল। ১৩ই ডিসেম্বর সন্ধ্যার সময় থেকে আমরা নদীর পার থেকে নাজিরহাটে শত্রুদের অবস্থানের উপর গোলাগুলি চালাতে থাকি। আমাদের লক্ষ্য ছিল এ আক্রমণে শত্রুরা যদি কিছুটা দুর্বল হয়ে পরে তাহলে আমরা সাঁতরিয়ে নদী পার হয়ে শত্রুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ব। কিন্তু তাদের অবস্থান এত শক্তিশালী ছিল যে আমরা চারঘণ্টা ধরে যুদ্ধ চালাবার পরও তারা আমাদের আক্রমণ প্রতিহত করতে থাকে।

তখন বুঝতে পারি এভাবে আক্রমণ করে কোন লাভ হবে না। চারঘণ্টা আক্রমণ চালাবার পর আমি আমার বাহিনীকে উঠিয়ে নেই। এই সংঘর্ষ চলবার সময় আমরা একজন রাজাকারকে জীবিত অবস্থায় ধরে ফেলি। সে আমাকে জানায় উদালিয়া চা-বাগান থেকে শত্রুদের আক্রমণ করলে তারা এঁটে উঠতে পারবে না। সেই মত আমি উদালিয়া হয়ে শত্রুদের আক্রমণ করার পরিকল্পনা নেই। আমি লেঃ শওকতকে গণবাহিনীর ১টা কোম্পানী নিয়ে নাজিরহাট ও চট্টগ্রমের মধ্যকার একস্থানে অবস্থান নিতে বলি। সে আমার কথামত অবস্থান নেয়। আর একটা কোম্পানীকে নাজিরহাট-চট্টগ্রাম রেললাইনের মাঝে একস্থানে। অবস্থান নিতে বলি। তারাও আমার নির্দেশ মত অবস্থান নেয়। বার ঘণ্টা যুদ্ধ চালাবার পর অবস্থান তুলে নিয়ে আমি আমার লোকদের খাইয়ে নিয়ে উদালিয়ার দিকে অগ্রসর হই। রাতের মধ্যে অবস্থান ঠিক করে নিয়ে ১৪ই ডিসেম্বর ভোরে নাজিরহাটে শত্রু অবস্থানের উপর আক্রমণ করি। তারা এত হকচকিত হয়ে গিয়েছিল যে তারা আমাদের আক্রমণে বাধা পর্যন্ত দিতে পারেনি। তারা ভেবে ছিল অবস্থান তুলে নেবার পর পুনরায় শক্তি সঞ্চয়ের জন্য আমাদের কম পক্ষে ২৪ ঘণ্টা সময় লাগবে। আমরা ভোরে যখন আক্রমণ চালাই তখন অনেকেই ঘুমাচ্ছিল। শত্রুরা ঘুম থেকে উঠে যখন তাড়াতাড়ি অবস্থান তুলে নিয়ে চট্টগ্রামের দিকে পালিয়ে যাচ্ছিল, তখন পলায়নপুর পাকসেনাদের উপর মর্টারের সাহায্যে আক্রমণ চালান হয়। এতে তাদের অনেক হতাহত হয়। ২৭ জন শত্রুসেনা নিহত হয়। ৮ জন আহত সৈনিককে ধরা হয়। ৪৯ জন ই-পি-সি-এ-পি আমাদের কাছে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আত্মসমর্পণ করে। প্রচুর গোলাবারুদ, জিনিসপত্র, ১টা বেডফোর্ড ট্রাক (রেশন বোঝাই) আমাদের হস্তগত হয়। পাকসেনারা যখন পালাচ্ছিল, তখন পথে পূর্ব থেকেই অবস্থানরত লেঃ শওকতের গণবাহিনীর কোম্পানী ও রেলসড়কের কোম্পানী শত্রুদের পলায়নে বাধা দেয়। কন্তু পাকসেনারা রেললাইন ও সড়কের মধ্যে দিয়ে চট্টগ্রমে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। ১৪ই ডিসেম্বর নাজিরহাট মুক্ত হয়। এতে আমাদের একজন শহীদ ও চারজন আহত হয়। নাজিরহাটের ব্রীজটি মেরামত না করা পর্যন্ত আমি মর্টার, ভারী কামান, অস্ত্রশস্ত্র ও গাড়ি পার করতে পারছিলাম না। নাজিরহাটের বেসামরিক লোকের সাহায্যে ব্রীজটি পুনঃনির্মাণ করিয়ে মর্টার, গাড়ি পার করিয়ে নেই।

নাজিরহাট মুক্ত করার পর আমি আমার বাহিনী পুনর্গঠিত করে হাটহাজারীর দিকে অগ্রসর হই। ১৫ই ডিসেম্বরের সকালে হাটহাজারী পৌঁছে ওখানে মেজর জাফর ইমামের সাথে যোগাযোগ হয়। তিনি সিতাকুণ্ড হয়ে ব্যাটালিয়ন নিয়ে চট্টগ্রামের দিকে এগিয়ে আসছিলেন। তারপর সম্মিলিতভাবে অগ্রসর হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত এগিয়ে যায়। ১৬ই ডিসেম্বর সকালে রেকি করে শত্রুদের আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত হই। এমন সময় ‘কে’ ফোর্সের ব্রিগেডিয়ার আনন্দস্বরূপ ওয়ারলেসের মাধ্যমে নির্দেশ দেন পুনরায় নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত আক্রমণ বন্ধ রাখতে। বিকেল ৪-৩০মিনিটের সময় পাকসেনারা আমাদের কাছে আত্মসমর্পণ করে। তারা তাদের সমস্ত ব্যাজ, অস্ত্রশস্ত্র ব্রিগেডিয়ার আনন্দস্বরূপের নেতৃত্বে আমাদের কাছে আত্মসমর্পণ করে। পাকসেনাদের ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজ, চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট, নেভাল বেইস ও ট্রানজিট ক্যাম্পে বন্দী করে রাখা হয়। চট্টগ্রাম আমাদের নিয়ন্ত্রণে আসে। জনগণ আমাদের বিজয়মাল্যে ভূষিত করে এবং জয়োল্লাসে শহর ভ্রমণ করতে থাকে।

সর্বশেষে বলতে চাই তাদের কথা-যারা আমাদের বিশেষভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন। মন্দভাগ ও শালদা নদী সাবসেক্টরে আমাকে যারা সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন তারা হলেন, কর্নেল খালেদ মোশাররফ, ক্যাপ্টেন মতিন, ক্যাপ্টেন মহসীনউদ্দিন আহমেদ, লেঃ এ কে ফজলুল কবির, ক্যাপ্টেন ডাঃ আক্তার হোসেন, লেঃ মোস্তফা কামাল, সুবেদার আঃ ওহাব, নায়েব সুবেদার বেলায়েত (শহীদ), সুবেদার শহীদ, সুবেদার আম্বিয়া (বিডিয়ার), নায়েব সুবেদার আসাদ্দর আলী (বিডিয়ার) সুবেদার আবদুর রহমান, নায়েব সুবেদার মনির হোসেন, সুবেদার মেজর আঃ জববার, সুবেদার মেজর মোঃ হোলাল উদ্দিন, নায়েব সুবেদার মোঃ হোসেন, নায়েব সুবেদার মঈনুল হোসেন, (শহীদ) নায়েব সুবেদার সিরাজ, সুবেদার ফরিদউদ্দিন (বিডিয়ার), পুলিশ

ইন্সপেক্টর আবদুর রাজ্জাক, মুক্তিযোদ্ধা কাদের, মোজাম্মেল, ফিরোজ, মিজানুর, মোশাররফ, রবিউল ও আরো অনেকে। কর্নেল খালেদ মোশাররফ ছিলেন সেক্টর-২-এর অধিনায়ক। তিনি অনেক সময় আমাকে যথাযথ নির্দেশ দিয়ে আক্রমণের পরিকল্পনায় যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। সুবেদার বেলায়েত, সুবেদার মঈন বীরত্বের সাথে লড়াই করতে করতে শহীদ হন। তাদের কথা আমার চিরদিন মনে থাকবে। এ সমস্ত ব্যক্তির সাহায্য-সহযোগিতা না পেলে আমার পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভব হতো না মন্দভাগ ও শালদা নদীতে শত্রুদের পর্যুদস্ত ও পরাজিত করতে। মনে পরে আরেকজন স্থানীয় ডাক্তার জনাব জহুরুল হকের কথা- যিনি সব সময় আমার আহত সৈনিকদের চিকিৎসা করে ছিলেন। আরো মনে পরে শালদা নদী, মন্দভাগের জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সাহায্য-সহযোগিতার কথা। তারা আমাদের আশ্রয় দিয়েছেন, অনেক সময় খাদ্য দিয়ে সাহায্য করেছেন, শত্রুদের অবস্থানের কথা জানিয়েছেন এবং গোলার মুখে পড়েও তারা কোনদিন ভীত হননি। আমি এদের সবাইকে আমার কৃতিত্বপূর্ণ সংগ্রামের সাথী হিসেবে মনে করি। এদের সকলের সাহায্য-সহযোগিতার জন্য আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছিল শত্রুদের বিতাড়িত ও পর্যুদস্ত করা। আমি তাদের সবাইকে স্মরন করি এবং কৃতিত্বপূর্ণ সংগ্রামের জন্য সালাম জানাই।

স্বাক্ষরঃ মেজর আবদুর গফফার
২১-৮-৭৩

সাক্ষাৎকারঃ মেজর ইমামুজ্জামান*

জুন মাসের ৭ তারিখে পাকিস্তানীরা প্রথমবারের মত ফেনী থেকে পরশুরামের দিকে অগ্রসর হবার চেষ্টা করে কিন্তু তাদের অগ্রগতি প্রতিহত করা হয়। তাদের প্রায় ৩০০ জনের মত নিহত হয়। লাশগুলো এ্যামবুলেন্সে করে নিয়ে যাবার সময় আমরা দেখতে পাই।

জুন মাসের ২১ তারিখের মধ্যে ওরা ১৭ বার আমাদের উপর আক্রমণ চালায়। কিন্তু প্রতিবারই ওদের আক্রমণকে প্রতিহত করা হয়। ওদের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়। জুন মাসের ২১ তারিখে ৭টা হেলিকপ্টার (সৈন্য বোঝাই) আমাদের পিছনে নামানো হয়। ভোর তিনটা/চারটার দিকে পেছনের এক ব্যাটালিয়ন কমান্ডো সৈন্যএবং সামনে থেকে আক ব্রিগেডেরও অধিক সৈন্য ট্যাংক এবং গোলন্দাজ বাহিনীর সহযোগিতায় আমাদের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়।আমাদের বহু লোক হতাহত হয়। উপায়ান্তর না দেখে মুহুরী নদীর পার ঘেঁষে ঘেঁষে ওদের প্রতিরক্ষাব্যূহ ভেতর দিয়ে বহু কষ্টে বের হয়ে আসলাম, আমাদের অনেকে হতাহত হয়েছিল। বেলুনিয়া পর্যন্ত ওরা আমাদের পিছু ধাওয়া করে। আমরা বেলুনিয়া চলে যেতে বাধ্য হই।

চৌদ্দগ্রামের সীমান্তে ক্যাম্প খুললাম। সেখান থেকে গেরিলা অপারেশন শুরু করা হয়। লাকসাম থেকে ফেনী রেলওয়ে লাইন এবং লাকসাম-চাঁদপুর রেলওয়ে লাইন এলাকায় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করার জন্য রাস্তার উপর মাইন পুঁতে রাখি। এসময় ডিনামাইট দিয়ে অনেক গাড়ি উড়িয়ে দেয়া হয়। সৈন্য বোঝাই অনেক ট্রেনের ক্ষতি সাধন করা হয়। জগন্নাথদিঘী, চিওড়া, চৌদ্দগ্রম হরিসর্দার বাজারে পাকিস্তানী সৈন্যদের ঘাঁটিগুলোতে রেইড করা হয়।

অক্টোবর মাসে আমার কোম্পানী এবং মেজর জাফর ইমামের কোম্পানী নিয়ে দ্বাদশ বেঙ্গল রেজিমেন্ট গঠন করা হয়। নভেম্বর মাসের ২ তারিখে দ্বাদশ বেঙ্গল রেজিমেন্ট পেছন থেকে ভারতীয় গোলন্দাজ বাহিনীর সহযোগিতায় পরশুরামে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ঘাঁটির উপর আক্রমণ চালায়। সকালের মধ্যেই ৪ বর্গমাইল এলাকা আমরা মুক্ত করতে সক্ষম হই। ৪৪জন সৈন্য একজন ক্যাপ্টেনসহ আমাদের কাছে আত্মসমর্পণ করে।

*লেঃ কর্নেল ইমামুজ্জামান ১৯৭১ সালের মার্চে লেফটেন্যান্ট হিসাবে কুমিল্লা সেনানিবাসে ছিলেন। ইমামুজ্জামানের এ সাক্ষাৎকারটি ১৯৭৪ সালে বাংলা একাডেমির পক্ষ থেকে গ্রহণ করা হয়।

পরশুরামে আমরা ঘাঁটি স্থাপন করি। নভেম্বরের ১৯ ভারতীয় বাহিনীর সংগে মুন্সিরহাট-পাঠানগর অঞ্চলে আক্রমণ চালানো হয় এবং মুক্ত করা হয়। অনেক পাকিস্তানী সৈন্য নিহত। অধিকাংশই পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। ভারতীয় বাহিনী ঐ এলাকায় ৪টা ট্যাংক নিয়ে ঢুকেছিল।

ডিসেম্বর মাসের তিন তারিখে ফেনির উপরে আক্রমণ চালানো হয়। সকালের মধ্যে সমস্ত পাকিস্তান সেনাবাহিনী ফেনী ছেড়ে চলে যায়। ফেনী থেকে আমরা চৌমুহনীর দিকে রওয়ানা হলাম। সেখানে অনেক পাকিস্তানী সৈন্য ও রাজাকার ছিল। দু'দিন তুমুল যুদ্ধ চলে। পরে চৌমুহনী মুক্ত হয়। প্রায় একহাজার রাজাকার আত্মসমর্পণ করে। অনেক পাকিস্তানী সৈন্যও আত্মসমর্পণ করে।

৭ই ডিসেম্বর আমরা মাইজদীতে গেলাম। সেখানেও পাকিস্তানীরা বাধা দেয়। অনেক রাজাকার এবং পাকিস্তানী সৈন্য আত্মসমর্পণ করে। এই সমস্ত এলাকার দায়িত্ব মুক্তিবাহিনীর কাছে অর্পণ করে আমরা চট্টগ্রামের দিকে রওয়ানা হলাম।

ডিসেম্বর মাসের ১২ তারিখে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে পৌঁছাই। ১৪ই ডিসেম্বর হাটহাজারী থানা দখল করা হয়। ডিসেম্বরের ১৬ তারিখে খবর পাওয়া গেলো পাকিস্তান সেনাবাহিনী ভারত-বাংলাদেশ যৌথ কমাণ্ডোর কাছে আত্মসমর্পণ করবে। শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানীরা চট্টগ্রামেও আত্মসমর্পণ করলো। মুক্তিবাহিনীতে অধিকাংশ স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র যোগ দিয়েছিল। তাছাড়া গরীব এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যুবকেরা নিঃস্বার্থভাবে যুদ্ধ করেছিলো।

স্বাক্ষরঃ মেজর ইমামুজ্জামান
১০-১-৭৪

সাক্ষাৎকারঃ লেঃ কর্নেল মোস্তফা কামাল*

প্রশ্ন : আপনি ভারতে গিয়েছিলেন কবে?

উত্তর : আমি মে মাসের ১৫ তারিখে ভারত গিয়েছিলাম। আমার সঙ্গে লেঃ মালেক গিয়েছিলেন। আমাদের দু'জনকে নেয়ার জন্য আমাদের সঙ্গে গাইড ছিল।

প্রশ্ন : আপনারা বরিশাল থেকে ঢাকা এলেন এবং কিভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়া যায় সেই আন্ডারস্ট্যান্ডিং-এ আপনারা ঢাকা থেকে আগরতলা গেলেন মে মাসে। সেখান থেকে আপনারা কোথায় গেলেন?

উত্তর : আগরতলা একটা বড় জায়গা। আগরতলার একটা জায়গার নাম সোনামুড়া। সোনামুড়া বর্ডার এলাকায়। সেখানে ২নং সেক্টরের হেডকোয়ার্টার ছিল। আমরা প্রথমে সেখানে যাই এবং গিয়ে রিপোর্ট করি। আমার পরিচয় দেয়ার পর ফর্মালিটি যা করার সেগুলো হলো। খালেদ মোশাররফ ২নং সেক্টরের পুরো চার্জে ছিলেন। তাকে মাঝে মাঝে নানা জায়গায় নানা সাবসেক্টরে যেতে হতো। সেদিনও তিনি গিয়েছিলেন, ফলে তার সাথে তখন দেখা হয়নি; কিছুদিন পরে দেখা হয়েছিল। তখন ছিলেন ক্যাপ্টেন হায়দার সাহেব- পরে লেঃ কর্নেল হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন তখনকার বলা চলে সেকেন্ড-ইন- কমান্ড সেক্টর তিনি ছিলেন ট্রেনিং সেন্টারের ইনচার্জ। ২নং সেক্টর হেডকোয়ার্টারে ট্রেনিং দেয়া হতো ছাত্রদের এবং যারা আর্মি পারসন না তাদের। গেরিলা যুদ্ধের ট্রেনিং দেয়া হতো এবং তাদের অস্ত্র দিয়ে ভেতরে পাঠানো হতো।এই ট্রেনিং সেন্টারটা প্রথমে সোনামুড়ায় ছিল, পরে নানা দিক বিবেচনা করে মে মাসের শেষ সপ্তাহে সোনামুড়া থেকে মেলাঘরে স্থানান্তরিত করা হলো।

* প্রকল্প কর্তৃক ৮-১০-৭৯ তারিখে কুমিল্লা সেনানিবাসে গৃহীত সাক্ষাৎকার

প্রশ্ন : আচ্ছা আপনি তো মেলাঘরে ট্রেনিংটা সেন্টারে গিয়েছিলেন, কোন বিশেষ অস্ত্রে উপর দেয়া হতো নাকি সাধারনভাবে নানা অস্ত্রের উপর দেয়া হতো?

উত্তর : প্রথমে সময় কম থাকায় তাড়াতাড়ি ১৫/১৬ দিনের মধ্যে একটা রাইফেল ট্রেনিং দেয়া হতো। তারপর কিভাবে গ্রেনেড ছুড়তে হয়, কিভাবে প্রিকশন নিতে হয়, এবং যারা ব্রীজ ধ্বংস করবে অর্থাৎ কিভাবে ব্রীজ ডিমোলিশন করতে হবে- এসব ট্রেনিং দেয়া হতো। প্রথম দিকে খুব তাড়াতাড়ি ট্রেনিং ভিতরে পাঠানো হতো।

প্রশ্ন : আপনি এখানে কয় মাস ছিলেন?

উত্তর : আমি ২/৩ মাস ছিলাম। এরপর আমাকে সেক্টর থেকে আগরতলায় ব্রিগেড হেডকোয়ার্টারে পাঠানো হয়।

প্রশ্ন : হেডকোয়ার্টারের কাজ কি ছিল?

উত্তর : যেহেতু বাংলাদেশ ফোর্সের হেডকোয়ার্টার ছিল কলকাতায় সেহেতু ইন সাইডে অর্থাৎ ইস্টার্ন সাইডে আমাদের ব্রিগেড হেডকোয়ার্টার সাব হেডকোয়ার্টার হিসেবে কাজ করেছে- কলকাতাকে জেনারের হেডকোয়ার্টার ধরলে। এদিকের অর্থাৎ ইস্টার্ন সাইডের কো-অর্ডিনেশন করার জন্য যে সাব হেডকোয়ার্টার ছিল সেটার অবস্থান ছিল আগরতলায়। সেখানে ছিল অবসরপ্রাপ্ত লেঃ কর্নেল রব সাহেব। তিনি তখন সিলেটের এমপি ছিলেন। তিনি ছিলেন, মেজর আফতাব চৌধুরী ছিলেন, স্কোয়াড্রন লিডার শামসুল হক ছিলেন যিনি এখন ডাইরেক্টর জেনারেল, মিলিটারি সার্ভিস। তারপর একজন সিভিলিয়ান ডাক্তার ডাঃ আলী। ২নং সেক্টর থেকে আমাকে বলা হলো সেখানে যেতে হবে, তাই যেতে হয়েছিল। সেখানে জুলাই-এর শেষের দিকে কিংবা আগস্টের প্রথম দিকে গিয়েছিলাম।

প্রশ্ন : ওখানে আপনার দায়িত্ব কি ছিল?

উত্তর : যেহেতু বিডিএফ (বাংলাদেশ ফোর্সেস)-এর প্রধান কার্যালয় ছিল কলকাতাতে এবং ইস্টার্ন সাব-হেডকোয়ার্টার ছিল আগরতলায় এই দুটোর মধ্যে কো-অর্ডিনেশনের জন্য। যেমন কোন অপারেশন প্ল্যান পাঠানো হলো সেটা কার্যকরী করা, বিভিন্ন সাব সেক্টরে প্ল্যান মেসেস ফরমে পৌঁছে দেয়া, যে অপারেশন তারা করেছে, পরবর্তীতে কি অপারেশন করবে সেগুলোর প্ল্যান তৈরি এবং সেটার প্রসেসিং ইত্যাদি করা হতো আমাদের ইস্টার্ন সাব-হেডকোয়ার্টারে।সাব-হেডকোয়ার্টার আবার পরবর্তীতে এ সমস্ত মেসেস, প্ল্যান প্রোগ্রাম পৌঁছে দিতো বাংলাদেশ ফোর্সের প্রধান কার্যালয় কলকাতাতে।

প্রশ্ন : আপনারা কি ধরনের যুদ্ধ করেছিলেন?

উত্তর : প্রথম দিকে গেরিলা যুদ্ধ, পরের দিকে অর্থাৎ একদম শেষের দিকে নিয়মিত যুদ্ধ- যাকে বলে সম্মুখযুদ্ধ হয়েছিল।

প্রশ্ন : আপনি ওখানে কতদিন ছিলেন?

উত্তর : ওখানে বেশ কিছুদিন ছিলাম। ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে আমি আবার মেলাঘরে চলে আসি।

প্রশ্ন : মেলাঘরে কিসের জন্য পাঠানো হয় আপনাকে?

উত্তর : তখন অলরেডী যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। ট্রেনিং-এর কাজ প্রায় শেষ! হয়তো তখন হেডকোয়ার্টার থেকে সেক্টরে বেশি প্রয়োজন ছিল সেজন্য সেক্টরে পাঠানো হয় আমাকে যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য। কেননা, তখন পুরোপুরি যুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছি, যাকে বলে কনভেশনাল ওয়ার।

প্রশ্ন : আচ্ছা, ইন্ডিয়ান আর্মিদের সাথে আপনাদের সম্পর্ক কেমন ছিল? যেমন- কোন কোন ক্ষেত্রে ইন্ডিয়ান আর্মিরা প্ল্যান-প্রোগ্রাম করেছিল, যেসব ক্ষেত্রে বাংলাদেশ আর্মিদের মধ্যে মতান্তর ঘটেছে। আপনাদের সাথে এমন কিছু কি হয়েছিল?

উত্তর : দেখুন, কনভেশনাল ওয়ারের আগে সবটাই বাংলাদেশ আর্মি প্ল্যান-প্রোগ্রাম করেছিল। বাংলাদেশ ফোর্সের যে হেড অফিস ছিল সেখানকার নিদেশাবলী চূড়ান্ত। তবে ইন্ডিয়ান আর্মি নানান দিক থেকে সার্পোট দিয়ে, যেমন আর্মস অন্যান্য জিনিসপত্র দিয়ে সাহায্য করেছে।

প্রশ্ন : আপনাকে আরেকটা প্রশ্ন রাখি। আপনি মে মাসে এত তাড়াতাড়ি ইন্ডিয়ায় যাওয়ার চিন্তাভাবনা নিয়েছিলেন কেন? কেননা, আমরা জানি তখন পুরো বাংলাদেশে যুদ্ধ চলছে। তখনও খোলাখুলি কোথাও বাংলাদেশ ফল করেনি, আপনি আগেই যেতে চেয়েছিলেন কেন?

উত্তর : তখন খন্ড খন্ড গেরিলা যুদ্ধ হয়েছিল। অলরেডি তখন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র খোলা হয়েছিল। তখন আমরা ভাবলাম একটা কিছু করতে হলে নিয়মিত বাহিনীর পক্ষে দেশের ভেতর থেকে করা সম্ভব নয়। দ্বিতীয় পক্ষের সাহায্য দরকার। সেই দ্বিতীয় পক্ষ যে ইন্ডিয়া তা আমরা ধরে নিয়েছিলাম এবং বেতার ও অন্যান্য লোকের মারফত জানতে পেরেছিলাম। সে জন্যই ইন্ডিয়ায় যাওয়ার চিন্তা ভাবনা করি।

সাক্ষাৎকারঃ মেজর শহীদুল ইসলাম*

এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি ভারতের একিনপুর (বিএসএফ ক্যাম্প) যাই। সেখানে অনেক এমসিএ, সাধারণ লোক, ইপিআর, পুলিশ সবাইকে দেখলাম। ফেনীর উত্তর অঞ্চল এবং বিভিন্ন এলাকা থেকে লোকজন ভারতে চলে আসে। পাকবাহিনী এসব এলাকার লোকদের নৃশংসভাবে হত্যা করেছে, ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে। ওখানে ৭০/৮০ জন লোক নিয়ে ছোটখাট কোম্পানী গঠন করি। আমার সাথে ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট রউফ ছিলেন। ওখানে আমরা গেরিলা কার্যকলাপ শুরু করে দেই মে মাস পর্যন্ত। আমরা পাকবাহিনীকে অতর্কিতে আক্রমণ করতাম, আবার ঘাঁটিতে ফিরে আসতাম। এখানে-ওখানে পাকবাহিনীকে ব্যতিব্যস্ত করে তুললাম। ভারতীয় কর্নেল (৯১বিএসএফ) গুপ্ত, ক্যাপ্টেন মুখার্জী, মেজর প্রধান আমাদেরকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করেছেন। মেলাঘর-২ সেক্টরে অধীনে একিনপুর সাবসেক্টরে কাজ করতে থাকি। ইতিমধ্যে ক্যাপ্টেন জাফর ইমাম (বর্তমান মেজর) কিছু সেনা নিয়ে এসে আমাদের সাথে যোগ দেন। ফেনীর মধ্যে সরিষাদি, বন্দুরা, মুন্সীরহাট, ফুলগাজি, ফেনী জুন মাস পর্যন্ত এসব এলাকাতে ব্যাপকভাবে গেরিলা আক্রমণ চালানো হয়। জুন মাসে আমরা সাবেক বিভিন্ন ইপিআর বিওপিতে অবস্থানরত পাকসেনাদের উপর আক্রমণ চালিয়ে পাকসেনাকে হত্যা করেছি।আমরা হঠাৎ করে আক্রমণ করতাম- লোক ক্ষয় করে অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করে আবার ঘাঁটিতে ফিরে আসতাম। আমরা দু'ভাগে ভাগ হয়ে যেতাম, মাঝখানে থাকতো মর্টার। নির্দিষ্ট সময়ে মর্টার শেলিং শুরু হলে পাকবাহিনীরা পালাতে শুরু করলে আমরা গুলি শুরু করতাম। এভাবে বহু পাকসেনা মাঝে মাঝে মারা যেত। আমাদের কোন ক্ষতি ওরা করতে পারতো না। এত আকস্মিক আক্রমণ আমরা করতাম যে ওরা বুঝতেই বা ভাবতেই পারতো না। ২নং সেক্টরের প্রধান ছিলেন মেজর খালেদ মোশাররফ। তিনি আমাদের হুকুম দেন ছাগলনাইয়াতে যাবার জন্য। জুন মাসের তৃতীয় সপ্তাহে আমরা সমরগঞ্জ বিএসএফ ক্যাম্পে যাই। তারা আমাদের সাদরে অভ্যর্থনা করলো। সমরগঞ্জ থেকে ছাগলনাইয়া ৪ মাইল বাংলাদেশের ভিতরে। আমরা থানা ছাগলনাইয়ার বাঁশপারাতে (ফেনী) ঘাঁটি গাড়ি। বাঁশপাড়াতে আমরা প্রায় ১২০ জনের মতো ছিলাম। জুন মাসের শেষের দিকে আমরা ফেনীর দিকে মুখ করে শক্ত ঘাঁটি পড়লাম। প্রথম দিন যাবার দিনই পাঞ্জাবী সৈন্যের গুলি শুনতে পেলাম। পাঞ্জাবীরা ঐ পথেই এগিয়ে আসছিল গুলি করতে করতে। আমরা ভারী অস্ত্রের সাহায্যে গুলি শুরু করলে পাঞ্জাবীরা পালিয়ে যায়। আমরা নির্দিষ্ট স্থানে চলে আসি।

* ১৯৭৩ সালে বাংলা একাডেমীর পক্ষ থেকে এ সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। মেজর শহীদুল ইসলাম একাত্তর সালে ক্যাপ্টেন পদে ছিলেন।

বেসামরিক লোকেরা আমাদের সার্বিকভাবে সাহায্য করে। চাল ও অন্যান্য জিনিসপত্র তুলে আমাদের জন্য নিয়ে আসতো। তারা মৃত্যুর জন্য প্রস্ত্ততও ছিল। জুন মাসের শেষের দিকে পাকবাহিনী ১৫/১৬টি গাড়ি করে আমাদের আক্রমণ করে। আমরা আগেই খবর পেয়ে গিয়েছিলাম। আমাদের প্রায় দেড়শত সৈন্য দু'টি ভাগে ভাগ করে নেই- ডেপথ-এ মেজর জাফর ইমাম এবং আমি সামনে। আমি ভারী অস্ত্র দিয়ে আক্রমণ করি। পাকবাহিনী ৫০০ গজের মধ্যে চলে আসে। আমি সামনে থেকে ওদেরকে বেশ দেখতে পাচ্ছি। সারাদিন যুদ্ধ হবার পর পাকবাহিনী ফিরে যায়। ওদের পক্ষে ৬০/৭০ জন মরতে দেখি। অদেখা আরও মৃত্যুর সংখ্যা ছিল তবে সামরিক সূত্রে অনেক লোক মারা গেছে শুনলাম। আমাদের কোন ক্ষতি হয়নি। জুলাই মাসের প্রথমেই পাকবাহিনী প্রচণ্ড আর্টিলারী এবং বহু সেনা নিয়ে আমাদের আক্রমণ করে। আমরা তিনটি ভাগে ভাগ হয়ে থাকি। আমি আগে, তার পাশে একটি এবং আমার পিছনে একটি রাখি আমার সাহায্যের জন্য। আমরা যখন ফায়ারিং শুরু করি তখন পাকবাহিনী আমাদেরকে সামনে ব্যস্ত রেখে দুদিকে দুটো কোম্পানী ঘিরে ফেলতে থাকে। আমরা কিছুই জানতাম না। প্রায় পাশাপাশি যখন এসেছে তখন ওরা ফায়ারিং শুরু করে। আমরা আমাদের বিপদ বুঝতে পারি। সামনে দুএকজন সৈন্য সামান্য অস্ত্র রেখে বাকি সবাইকে আস্তে আস্তে পিছনে হাটতে বলি। আমরা যে পিছনে হটছি তা ওরা বুঝতে পারেনি। কারণ দু'একজন অনবরত গুলি করেই যাচ্ছিল। ইতিমধ্যে পিছনের দলটি আমাকে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসে। আমি তাকে বাধা দিয়ে পিছনে সরে যেতে বলি। আমরা পিছনে একটি ভাল জায়গা দেখে পুনরায় ঘাঁটি গাড়ি। পাকবাহিনী এগিয়ে আসে পুল অতিক্রম করে। পাকসেনারা বাঁশপাড়া, পূর্ব ও পশ্চিম ছাগলনাইয়া, বেলুনিয়া, ছাগলনাইয়া, বাজার, কুমা সমস্ত গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে পুড়িয়ে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে। বহু মানুষকে গুলি করে হত্যা করে,মারধর করে। বহুকে ধরে নিয়ে যায়। আমরা পিছনে গিয়ে সবাই একত্র হয়ে ওদের উপর আক্রমণ করি তখন ওরা আর অগ্রসর হয়নি। জুলাই মাসেই আবার পাকবাহিনী আক্রমণ করে। দু'দিন ধরে যুদ্ধ হয় সবসময়। আমরা যেতে পারিনি, এমনকি পানি খাবারও অবসর ছিল না।সবসময় ব্যাপকভাবে ফায়ারিং চলছিল। আমরা টিকতে না পেরে পিছু হটি এবং ছাগলনাইয়ার বিত্তপিতে দীঘির ধারে ঘাঁটি গাড়ি। দু'তিন দিন পর আবার সংঘর্ষ হয়। এখানেও আমরা টিকতে পারিনি, তারপর সমরগঞ্জের দ'তিন মাইল দক্ষিনে আমাদের সামরিক ছাউনি ছিল- ওখানে চলে যাই। ওখানে এক সপ্তাহ বিশ্রাম নেই। কারণ এক মাস যাবৎ গোসল ছিল না, খাওয়া দাওয়া পায় তেমনি আছে। জুলাই/আগস্ট মাসে আমরা আবার মধুগ্রামে পজিশন নেই। শুভপুর এবং ছাগলনাইয়ার মাঝামাঝি স্থান ছিল মধুগ্রাম। ১৫/১৬ দিন ওখানে ছিলাম। একদিন পাকবাহিনীর একটি টহলদার পার্টিকে যারা ট্রাকে করে এসেছিল আক্রমণ করে সম্পূর্ণ শেষ করে দেই।

ওখানে দু''তিন দিন থাকি। তারপর আর একদিন আমরা পাকবাহিনীর দ্বারা আক্রান্ত হলাম। সামনে মেজর (বর্তমান কর্নেল) জিয়ার বাহিনী, পেছনে আমার। পাকবাহিনীর সামনের দলকে সম্পূর্ন ঘিরে ফেলে এবং এই সংঘর্ষে আমাদের বহু সৈন্য শহীদ হয়। আমরা যখন খবর পাই তখন আর অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয়নি- আমরা পিছু হটে সামরিক ছাউনিতে ফিরে আসি।

আমরা আবার মধুগ্রামে অবস্থান নেই। তারপর সেখান থেকে মুন্সিরহাট। সমগ্র এলাকাটিকে কেন্দ্র করে আমরা পজিশন নেই। কুতুবপুর জাম্পপুরা বেলুনিয়া রেলওয়ে পর্যন্ত আমার দায়িত্ব ছিল। মাসটি বোধহয় আগস্ট হবে। ৩/4 দিন বাঙ্কার করতে চলে যায়। সামনে একটি সেকশন রাখি। বন্দুরা পুলের ওখানে একটি ছোট টিম রাখি। একদিন সকালে পাকসেনারা পুল অতিক্রম করে যাচ্ছিল। আমরা হঠাৎ আক্রমণ করে ১০/১২ জন পাকসেনাকে হত্যা করি। পাকসেনারা ফিরে গিয়ে অধিক শক্তি নিয়ে পুনরায় আসে। আমরা পুরো রাস্তা মাইন পুতে রেখে ছিলাম- যাতে ট্যাঙ্ক পর্যন্ত আসতে না পারে। কিন্তু তবুও পাকবাহিনী আক্রমণ চালালো। ১০টার দিকে আক্রমণ করে। পাকবাহিনী ইয়া আলী বলে অগ্রসর হচ্ছিল। আমরা সামনা সামনি ওদের দেখছিলাম। বহু পাকবাহিনী মারা যায় তবুও সামনে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা ছাড়েনি। আমাদের ৫/৬ জন শহীদ হলো। কিছু আহত হয়। ওদেরকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেই। আমার সাথে লোকমান বলে এক সিপাই ছিল

সাথে এলএমজি ছিল। বাঙ্কারের ছিদ্র দিয়ে ব্রাস্ট এসে তারা মাথা সম্পূর্ণ উড়িয়ে নিয়ে যায়। সে তৎক্ষণাৎ মৃত্যুবরণ করে। আমি বেঁচে যাই।

সেদিন পাকবাহিনী কিছুতেই সামনে অগ্রসর হতে পারেনি। বেলা ২টার দিকে ওরা ওখানেই পাকা বাঙ্কার করতে শুরু করে। বাঙ্কার করতে গেলেই আমরা গুলি শুরু করতাম। ওরা বাঙ্কার বন্ধ রাখতো। এ সময় প্রায়ই মুষল ধারে বৃষ্টি হতো। আমরা বৃষ্টির মধ্যেই যুদ্ধ করে যেতাম। একই জামা ভিজতো আবার শুকাতো। ৫০০ গজের মধ্যে পাকবাহিনী এবং আমরা সামনাসামনি ১৫/২০ দিন যুদ্ধ করি। ছোট খাট দুটো দেশের সামনাসামনি যুদ্ধ বলা যেতে পারে। পাকবাহিনী পাকা বাঙ্কার করে আমাদের উপর দিনে রাতে অন্যান্য দিক দিয়ে বিভিন্নভাবে আক্রমণ চালায় কিন্তু সমস্ত জায়গায় আমাদের সেনাবাহিনী ছিল। সবরকমের চেষ্টা করেও আমাদের ডিফেন্স ওরা ভাঙতে পারেনি।

পাকসেনা এবং আমরা সামনাসামনি থাকি। তখন পুরো বর্ষা। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। সূর্য অস্ত যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিছুই দেখা যায় না। পাকসেনারা এ অবস্থার সুযোগ নেয়। তারা দুটি নদী দিয়ে ৬/৭টি গানবোটে সৈন্য পাঠিয়ে দেয়। পর পর চারটি হেলিকপ্টারযোগে সন্ধ্যা সাড়ে ৭ থেকে ৮টার সময় আমাদের পিছনে সৈন্য নামিয়ে দেয়। সামনে তো পাকসেনা ছিলোই। আমরা বিপদে পড়লাম। কারণ আমাদের গানপয়েন্ট ফেনীর দিকে। সামনে, পিছনে, পাশে এবং গানবোট সব ঠেকানো কঠিন হয়ে পড়ে। আমরা মেসেজ পেলাম পিছু হটবার জন্য। কারণ এখানে থাকলে নিশ্চিত মৃত্যু ছিল। আমি আমার বাহিনী নিয়ে চলে আসি। আর যারা ছিল তারাও চলে আসে। আমার সংবাদ যারা সবশেষে পায় তারা আসার পথে পাকিস্তানীদের গুলিতে আমার বাহিনীর ৪/৫ জন আহত হয়, তবে কেউ মারা যায়নি। আমরা সবাই একত্রিত হয়ে পুনরায় ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা ঠিক করি। ঠিক এ সময়ই আমাদের উপর হুকুম হয় সিগনালস টিম গঠন করার জন্য। কারণ, আসলে আমি সিগনালের মানুষ। আমি চলে আসি আগরতলাতে। ভারতীয় বাহিনীর সাহায্যে আমি সিগনাল কোর গঠন করতে থাকি। সিগনালের অভাবেই অধিকাংশ যুদ্ধ ময়দানে আমরা মার খাচ্ছিলাম। পরদিন যুদ্ধ করবার জন্য পুরো ব্রিগেডের জন্য সিগনাল টিম গঠন করি। 'কে' ফোর্স, 'এস' ফোর্স এবং 'জেড' ফোর্স' নামে তিনটি ব্রিগেড গঠিত হয়। 'কে ফোর্স এবং 'এস ফোর্সের জন্য, সেই সঙ্গে 'জেড' ফোর্সের জন্যও লোকজন সংগ্রহ করা হয়। ফ্লাইং অফিসার রউফ থাকেন এস ফোর্সের সাথে। আমি থাকি 'কে' ফোর্সের সাথে। আক্রমণ চালাই একযোগে।ফেনী মুক্ত করে ফেলি। পরবর্তীকালে ১০ম বেঙ্গলে আবার অস্ত্র ধরি সেকেন্ড-ইন-কমান্ড হিসেবে। ক্রমশঃ অগ্রসর হতে থাকি। তারপর একের পর এক দখল করে চলি। চট্টগ্রমের দিকে অগ্রসর হতে থাকি। পুরো ব্রিগেড নিয়ে চলিলাম। আমাদের সাথে ভারতীয় অনেক কোম্পানী ছিল। আমরা ফৌজদারহাট পর্যন্ত যাই- তখন যুদ্ধ বন্ধ হয়ে যায় এবং পাকবাহিনী আত্মসমর্পণ করে।আমরা ওখানেই থেকে যাই। টিবি হাসপাতালের ২০ মাইলের মধ্যে চট্টগ্রাম। ওখানে পাকবাহিনীর সাথে তুমুল যুদ্ধ হয়। পাকবাহিনী তার ব্যাপক বাহিনী হারায়।

আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন স্থানে গিয়েছি। পাকবাহিনী গ্রামকে গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছে। বেসামরিক লোককে হত্যা করেছে, লুট করেছে, নারী ধ্বংস করেছে। গ্রামগুলোতে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিলো।

স্বাক্ষরঃ শহীদুল ইসলাম
২৩-৩-৭৩

সাক্ষাৎকারঃ ক্যাপ্টেন হুমায়ন কবির*

১৭ই মে আমাকে প্রথম অপারেশনে পাঠানো হয়। ক্যাপ্টেন গফফার সাহেবই আর নেতৃত্ব দেন। কসবা, কুটিবাড়ি, আড়াইবাড়ি ইত্যাদি এলাকায় পাকসেনাদের ঘাঁটি ছিল। আমরা লোক দিয়ে সমস্ত অবস্থান জেনে নিয়ে

* বাংলা একাডেমীর পক্ষ থেকে ১৯৭৩ সালে এ সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়।

তাদের উপর অতর্কিত আক্রমণের পরিকল্পনা করি। তখন ছিল মুক্তিযুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায়। আমাদের নির্দেশ ছিল হঠাৎ করে আক্রমণ করো এবং সরে এসো। আমরা দু'দলে বিভক্ত হয়ে একদলকে রক্ষণভাবে রাখি। দ্বিতীয় দল মর্টারের সাহায্যে পাকসেনাদের ঘাঁটির উপর আক্রমণ চালায়। আমি ছিলাম ক্যাপ্টেন গফফারের সাথে মর্টারের শেলিং-এ। শেলিং করে আমরা চলে আসি। চলে আসার সময় পাকসেনারা গোলন্দাজ বাহিনীর সাহায্যে আমাদের ওপর প্রচণ্ড গোলাগুলি চালায়। আমরা সবাই ক্যাম্পে ফিরে আসি। পরে খবর পেয়েছিলাম ওদের ১৫ জনের মত মারা গিয়েছিল এবং প্রচুর গোলাবারুদের ক্ষতি হয়েছিল। এটাই ছিল আমার প্রথম অপারেশন। ক্যাম্পে সমস্ত সৈনিকদের দেখি শত্রু খতম বা আক্রমণের এক নেশার মধ্যে আছে। খাওয়া-দাওয়ার অনিয়ম বা কাপড়-চোপড়ের অভাব তাদের ছিল, কিন্তু এদিকে কারও খেয়াল ছিল না। শত্রুর খোঁজ পেলে তারা তৎক্ষণাৎ আক্রমণ করার আনন্দে মেতে উঠত। তাদের দেশপ্রেম এত প্রবল হয়ে উঠছিল যে, মৃত্যুভয়ও তাদের টলাতে পারেনি। কিছুদিনের মধ্যে আমাকেও এই নেশায় পেয়ে বসল। এরপর যখন কোন খবর পেতাম শত্রুকে আক্রমণ করার, তখন আমি আমার অধীনে কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধাকে নিয়ে গিয়ে পেট্রোলিং এ্যামবুশ এবং শত্রুর ওপর হঠাৎ আক্রমণ চলাতাম। এরপর ক্যাপ্টেন গফফার আমার অধিনায়কত্বে কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার অনুমতি দিলেন।

কসবা হচ্ছে এমন একটি স্থান যার ভৌগলিক গুরুত্ব অপরিসীম। কসবা রেলওয়ে স্টেশন থেকে ভারতীয় সীমান্ত দেখা যায়। সীমান্তের পাশ দিয়ে ছোট ছোট পাহাড়। পাহাড়ে বেশ গাছপালাও আছে। মে মাসের ২২/২৩ তারিখের দিকে খবর পেলাম পাকসেনারা দুটি ট্রলি বোঝাই অস্ত্রশস্ত্র মন্দভাগ রেলওয়ে (কসবার নিকট) স্টেশন থেকে শালদা নদীর দিকে নিয়ে যাচ্ছে। রেলওয়ে ট্রলির দুই পাশ দিয়ে আক প্লাটুন পাকিস্তানী সেনা টহল দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। খবর পেয়ে দু সেকশন মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে আমি খালি গায়ে এবং লুঙ্গি পরা অবস্থায় পাহাড়ের ধার দিয়ে গাছপালার ফাঁক দিয়ে আস্তে আস্তে মন্দভাগ রেলওয়ে স্টেশনের দিকে অগ্রসর হলাম। খালি গায়ে ছিলাম এই জন্য যে, গেঞ্জি বা কোন কিছু পরে থাকলে তাদের নজর পড়ে যেতে পারে। আমরা সকাল ৯টায় এসে মন্দভাগ গ্রামে শত্রুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য এ্যামবুশ পেতে বসে থাকলাম। আধঘণ্টা পরেই দেখলাম সেনাবাহিনীর লোকেরা ট্রলির দু'পাশ দিয়ে হেঁটে পাহারা দিতে দিতে নিয়ে যাচ্ছে। ট্রলি দু'টি মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ছিল। আমরা হঠাৎ করে এলএমজি, এসএমজি'র সাহায্যে শত্রুদের উপর অতর্কিত গুলি ছুড়তে লাগলাম। কয়েকজন পাকসেনা সঙ্গে সঙ্গে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গেই পাকসেনারা ট্রলির ওপাশে গিয়ে পজিশন নিয়ে আমাদের ওপর গোলাগুলি ছুড়তে লাগল। আমরা রকেট লাঞ্চারের সাহায্যে ট্রলির উপর আঘাত হানলাম। এক্সপ্লোসিভ থাকায় লাঞ্চারের আঘাতে ট্রলির অস্ত্রশস্ত্র নষ্ট করে দেয়া হয়। তারপর পাকসেনা আর্টিলারীর সাহায্যে আমাদের উপর অবিরাম গুলিবর্ষণ করে তাদের আহত জোয়ানদের নিয়ে পালিয়ে যায়। পাকসেনারা পালিয়ে যাওয়ার পর আমি আমার কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধাকে নিয়ে ঘটনাস্থলে যাই। দেখি ভাঙ্গাচোরা অনেক অস্ত্র পড়ে আছে। এরমধ্যে কিছু ভাল অস্ত্র ছিল। আমরা ঐ সমস্ত অস্ত্র নিয়ে ক্যাম্পে ফিরে আসি। এ এক দুঃসাহসিক অভিযান ছিল, যা আমার জীবনে অন্যতম স্মরণীয় ঘটনা হয়ে থাকবে। উল্লেখযোগ্য যে, আমার বাহিনীর কেউ এ অপারেশনে মারা যায়নি। কসবা থেকে মন্দভাগ রেলওয়ের দূরত্ব মাত্র দু'মাইল।

এরপর অনেক ছোট খাটো অপারেশন করেছি যা আজ আর মনে নাই। তবে প্রায়ই অপারেশন করতাম।

জুন মাসের ৮ তারিখে ক্যাপ্টেন গফফার এক কোম্পানী সৈন্য নিয়ে বেলুনিয়া ক্যাম্পে চলে গেলেন। কসবা সাব-সেক্টরের ভার আমার উপরে পড়ল। আমার অধীনে এক কোম্পানীর বেশী মুক্তিযোদ্ধা রইল।

তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানের গভর্নর লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খান ঘোষনা করলেন- ঢাকা-চট্টগ্রাম রেললাইন পুনরায় চালু করা হবে। ট্রেন মোটামুটি ঢাকা-চট্টগ্রাম লাইনের অন্য জায়গায় চললেও আখাউড়া থেকে শালদা নদী পর্যন্ত কোন ট্রেন চলতো না। ঐ জায়গার গুরুত্বও ছিল অপরিসীম। টিক্কা খানের এ ঘোষণা শুনে সেক্টর-২-এর কমান্ডার মেজর খালেদ মোশাররফ একদিন মেলাঘরে (সেক্টর-২-এর হেডকোয়ার্টার) সাব-সেক্টর

কমাণ্ডারকে ডেকে পাঠালাম। তিনি আমাদের বললেন, টিক্কা খান যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনুরুদ্ধার করতে চাচ্ছে। এটা যেন হতে না দেওয়া হয়। আমি তাকে এ সম্পর্কে আশ্বাস দিলাম। আমি বললাম আমাদের জীবন থাকতে এটা হবে না। যদি তারা ফিরিয়ে আনতে পারে তবে আমি অস্ত্র জমা দিয়ে দেব। এ প্রতিজ্ঞা আমি রেখেছিলাম। টিক্কা খানের এ ইচ্ছা কোন দিন পূরণ হয়নি।

এরপর আমার বাহিনীর সাহায্যে শালদা নদী থেকে কসবা পর্যন্ত যত ছোট ছোট রেলওয়ে কালভার্ট, ব্রীজ ছিল, তা এক্সপ্লোসিভ দিয়ে উড়িয়ে দেয়া হয়। টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ পাইলনও অনেক উড়িয়ে দেওয়া হয়, যার জন্য পাকসেনারা অনেক সময় যোগাযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ঢাকা-চট্টগ্রাম ট্রাঙ্ক রোডের উপর ছোটখাট অনেক কালভার্টও গেরিলা বাহিনী পাঠিয়ে উড়িয়ে দেয়া হয়। খানসেনারা যখন দেশের মধ্যে সাধারণভাবে অত্যাচার চালাচ্ছিল- তখন এ দেশের কিছুসংখ্যক দালাল, রাজাকার, শান্তিবাহিনী লোকেরা যে কীর্তিকলাপ চালিয়েছে তার তুলনা নেই। পাকসেনারা অনেক আগেই এদেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে যেত-যদি না এইসব কুলাঙ্গাররা এদের সাহায্য করতো। এই লোকেরা পাকেসেনাদের মনোবল যোগাতো। পাকসেনারা এত ভীত হয়ে গিয়েছিল যে, তারা সামান্য কুকুর দেখলে পর্যন্ত ভয় পেত। তাদের ধারণা ছিল বাঙ্গালীরা যাদুবিদ্যা জানত। সেই হেতু তারা মুক্তিবাহিনীর কীর্তিকলাপকে যাদুবিদ্যার সাথে তুলনা করতো। তারা এত ভীত হয়ে গিয়েছিল যে, তাদের উপর একটি গুলি ছুঁড়লে তারা অবিরাম গুলিবর্ষণ করতো, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা ভাবত মুক্তিবাহিনী চলে গেছে। এই ঘৃণ্য দালালেরা পাকসেনাদের কাছে মেয়ে পাঠাতো তাদের লালসা চরিতার্থ করার জন্য। এই সমস্ত পশুদের অপরাধ পাকিস্তানী সেনাদের চেয়ে কমতো নয়ই, বরং বেশী। এদের কিছু কীর্তিকলাপ তুলে ধরছি। একবার এক বুড়ো পাকিস্তানীমনা লোক তার ১৬ বছরের নাতনীকে পাকিস্তানী সেনাদের কাছে বিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছিল। আমরা এ খবর পেয়ে হঠাৎ করে তার বাড়ি ঘেরাও করে মেয়েটিকে উদ্ধার এবং বুড়োকে শাস্তি প্রদান করি।

একবার দু''জন রাজাকার এক বিবাহিতা যুবতীর (সে পাকসেনাদের হাত থেকে পালিয়ে আসবার জন্য ভারতে চলে আসছিল) উপর পাশবিক অত্যাচার চালাবার জন্য তাকে ধরে ফেলে এবং তার ছ'মাসের বাচ্চা ছেলেকে পাটক্ষেতে ফেলে দেয় এবং তার উপর পাশবিক অত্যাচার চালায়। আমরা এই ঘৃণ্য অপরাধের জন্য পরে তাদের ধরে এনে শাস্তি প্রদান করি। এদের নিষ্ঠুর অত্যাচারের ফলে বাচ্চা ছেলেটি মারা যায়। এক গ্রামের দরজির তিনটি বউ ছিল। সে পাকসেনাদের আমন্ত্রণ জানাত নিজ বাড়িতে এবং বউদের অসৎ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করত। সে মুক্তিবাহিনীর খবরাখবর পাকসেনাদের নিকট জানাত। আমি এ খবর জানতে পেরে তাকে ধরে এনে শাস্তি দেই।

অনেক নিরীহ শান্তিপ্রিয় লোক ভারতে চলে যেতো পাকসেনাদের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য। কিন্তু এই দস্যুরা এই নিরীহ জনসাধারণের উপর অত্যাচার চালাত। তাদের জিনিসপত্র কেড়ে নিত। এই রকম চার দস্যুকে আমরা ধরে শাস্তি দেই এবং তাদের মধ্যে একজন হিন্দুও ছিল।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, কিছু পাকিস্তানী দালাল শরনার্থীর বেশে ভারতে আসত এবং আমাদের খবর নিয়ে যেত। আমরা এ খবর জানার পর সতর্ক হয়ে কিছু সন্দেহভাজন লোকের উপর তল্লাশি চালাই। তাতে দেখা যায়, অনেক দালাল চালের মধ্যে গ্রেনেড, বস্তার মধ্যে গ্রেনেড এবং অন্যান্য উপায়ে নানা ধরনের ধ্বংসাত্মক জিনিস নিয়ে আসত আমদের ক্ষতি করবার জন্য। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, এক মহিলার উপর তল্লাশি চালিয়ে দেখা যায় যে, সে লাউয়ের ভিতরে গ্রেনেড নিয়ে এসেছে।

এইসব ঘৃণ্য দালালদের কীর্তিকলাপ যে কত জঘন্য ছেল তা বলবার নয়। তারা পাকসেনাদের মনোবল বাড়াবার জন্য যা করেছে, তা পাকিস্তানী সেনাদের থেকেও ঘৃণ্য। অনেক রাজাকার গ্রামে গ্রামে ডাকাতি করত। আমি আমার বাহিনীর লোকেরা যাতে নিরীহ জনসাধারণের কোন ক্ষতি না করে তা লক্ষ্য রাখতাম। কেউ কোন

অপরাধ করলে শাস্তি দেওয়া হতো। একবার এক মুক্তিযোদ্ধা গ্রামে গিয়ে ডাকাতি করেছে। এ খবর শোনার পর তা পরীক্ষা করে সত্য প্রমাণিত হওয়ায় তাকে শাস্তি প্রদান করি। এ ব্যাপারে কোন ক্ষমা প্রদর্শন করা হত না।

সংগ্রামের এক প্রান্তরঃ মেজর জাফর ইমাম

[বিচিত্রা : ৮ ফেব্রুয়ারী ও ৩০ মার্চ ১৯৭৩]

৬ই নভেম্বর হেডকোয়ার্টার আমাকে ডেকে পাঠালেন। তখন বেলুনিয়া পকেটটি পুরোপুরি পাকবাহিনীর দখলে ছিল।

আমাকে ডেকে বলা হলো, বেলুনিয়া রেলওয়ে স্টেশন থেকে শুরু করে ফেনী পর্যন্ত এই পকেটটি মুক্ত করার ভার তোমার উপর দেওয়া হলো। পরশুরাম, চিতলিয়া, ফুলগাজী, বেলুনিয়া ও ফেনী এই বিশেষ স্থানগুলো তখন ছিল পাকবাহিনীর মজবুত ঘাঁটি। আমি এ জায়গাগুলো থেকে শত্রুদের পুরোপুরি বিতাড়িত করার জন্য দৃঢ়সংকল্প নিলাম। এই সংকল্পকে বাস্তবায়িত করার কাজ হতে নিলাম ৮ই নভেম্বর। এই দিনটি ছিল আমার জীবনের একটি স্মরণীয় দিন। ১০ম বেঙ্গল ও ২য় বেঙ্গলের একটি কোম্পানীর সাথে গভীর আত্মবিশ্বাস ও অসীম মনোবল নিয়ে আমি এই গুরুত্বপূর্ণ কাজের প্রস্তুতি নিতে লাগলাম। ২য় বেঙ্গল রেজিমেন্টের দলটি ছিল ক্যাপ্টেন মোরশেদের অধীনে।

পরশুরাম ও বেলুনিয়ার পকেট থেকে শত্রুদের হটানোর ব্যাপারে মিত্র বাহিনীর জেনারেল হীরা আমায় চ্যালেঞ্জ করলো। আমি দৃঢ়ভাবে এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলাম এবং অতি সুনিপুণভাবে এ অভিযানকে সফল করে তুলবোই। তাই দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় নিয়ে সামরিক কৌশলের অন্যতম কৌশল হিসাবে গোপন অনুপ্রবেশ দ্বারা শত্রুদের গোপনে অবরোধ করার সিদ্ধান্ত নিলাম।

এখানে একটা কথা উল্লেখযোগ্য যে, আমরা যে বাহিনী দ্বারা এ অভিযান শুরু করেছিলাম তারা পুরোপুরি সব দিক দিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল। এই অভিযানে ১০ বেঙ্গল ও ২য় বেঙ্গলের শতকরা ৮০ জন সৈন্য ছিল পুরনো বেঙ্গল রেজিমেন্টের এবং বাকী শতকরা ২০ জন সদস্য ট্রেনিংপ্রাপ্ত। তাছাড়া মিত্র বাহিনী আমাদের এ অভিযানে অস্ত্রসস্ত্র দিয়ে সক্রিয় সহযোগিতা করেছিল। রাতের অন্ধকারেই আমরা গোপন অনুপ্রবেশের কাজ শুরু করবো বলে সাব্যস্ত করলাম। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল রাতের মধ্যেই অনুপ্রবেশের কাজ শেষ করে ভোর হবার আগেই ওদের সাথে মোকাবিলা করার জন্য পূর্ব প্রস্তুতি নেওয়া।

নভেম্বর অন্ধকার শীতের রাত। টিপ টিপ করে হালকা বৃষ্টি পড়ছিল। হিমেল হাওয়ায় গাছের পাতায় যেন একটি অশরীরি শব্দ সৃষ্টি করছিল। মনে হচ্ছিল সমস্ত রাতটা যেন কিছুর প্রতীক্ষায় আছে। রাত আনুমানিক ১০-৩০ মিনিট। আমাদের অনুপ্রবেশের কাজ শুরু করলাম। আমরা এমন একটা এলাকা ঘেরাও করার অভিযানে নেমেছি যার তিনটা দিকই ছিল ভারত সীমান্ত দ্বারা বেষ্টিত। আমরা এই ভারতের এক প্রান্তের সীমান্ত থেকে পরশুরাম চিতলিয়ার মাঝ দিয়ে অগ্রসর হয়ে ভারত সীমান্তের অপর প্রান্ত পর্যন্ত অবরোধ করার সিদ্ধান্ত নিলাম। আমাদের এই অবরোধ যদি সফল হয় তবে শত্রুরা সহজেই ফাঁদে আটকা পড়বে।

অবরোধের কাজ শুরু হলো। অন্ধকার রাতে মুহুরী নদী ও চিলনিয়া নদীর কোথাও বুক পানি, কোথাও কোমর পানি, কোথাও বা পিচ্ছিল রাস্তার বাধা পেরিয়ে এগিয়ে চলেছি সবাই। সে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। অন্ধকার রাত। সামান্য কাছের লোককেও ভাল করে দেখা যাচ্ছিল না। কমাণ্ডার হিসেবে সবাইকে সুশৃংখলভাবে পরিচালিত করে আমাদের নির্ধারিত গন্তব্যস্থলে পৌঁছানো সত্যই কষ্টকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তবুও সব বাধাকে তুচ্ছ করে আমরা এগিয়ে চললাম এবং সাথে সাথে আমি আমার দলের অন্যান্য অফিসারদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চললাম। নিঃশব্দ হয়ে সবাই অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে পথ চলছি। কারো মুখে কোন কথা নাই। শত্রুরা ঘূর্ণাক্ষরেও জানতে পারলো না যে ওদের জালে আটকাবার জন্য আমরা এগিয়ে আসছি। শত্রুরা

যদি আমাদের এ অনুপ্রবেশ টের পায় তবে আমাদের সমস্ত পরিকল্পনাই বানচাল হয়ে যাবে, কারণ যুদ্ধক্ষেত্র গোপন অনুপ্রবেশ যদি অপর পক্ষ টের পায় তবে পরিকল্পিত অভিযান সফল করা সম্ভব হয় না। আমরা আরো অনেক পথ এগিয়ে এলাম। আমাদের এ কাজে বেশ সময় লাগছিল। কারণ অন্ধকার রাতে নির্ভুল পথে এগিয়ে যাওয়া সত্যিই বেশ সময়সাপেক্ষ ব্যাপার ছিল। এছাড়া আরো একটা ভয়ের সম্ভাবনা ছিল। শত্রুদের লোকেরা রাতে বিভিন্ন জায়গায় পেট্রোলিং-এ ছিল। তাদের খপ্পরে পড়াও বিচিত্র ছিল না। সে ভয় আমাদের অমূলক ছিল না। আমরা যখন রেলওয়ে ও কাঁচা রাস্তার কাছাকাছি এগিয়ে এলাম তক্ষুণি দেখলাম শত্রুপক্ষের ডিউটিরত একটি দল রেললাইন ধরে সামনের দিকে এগিয়ে আসছে। আমরা টুপ করে লুকিয়ে গেলাম- কেউ বা রাস্তার আড়ালে, কেউ বা জমিনের আড়ালে। ওরা কিছুই টের পেল না। নিশ্চিত মনে গল্প করতে করতে চলে গেল। বিপদ কেটে গেল। এদিকে রাত বাড়ছে। আমি তাড়াতাড়ি আমার কোম্পানীর কমাণ্ডারদের সাথে যোগাযোগ করলাম। ওরা জানালো সব ঠিক আছে। ওরা নিরাপদেই অবরোধের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। ভোর হবার বের্শ বাকী নেই। আমরা আমাদের নির্ধারিত স্থানে হাজির হলাম এবং এর ফলে শত্রুদের পরশুরাম ও চিতলিয়া ঘাঁটি পুরোপুরি আমাদের অবরোধের মাঝে আটকা পড়লো।

আমরা শত্রুদের চিতলিয়া ঘাঁটির দিক থেকে যাতে কোন প্রকার আক্রমণ না আসতে পারে তার জন্য প্রতিরোধ গড়ে তুললাম। ভোর হয়ে আসছিল। আমরা প্রতিরোধের সকল ব্যবস্থা শেষ করতে লাগলাম। বাঙ্কার খোঁড়ার কাজ শুরু হলো। এবং অন্যান্য সব ব্যবস্থাও করতে লাগলাম। পথশ্রমে ও ক্ষুধার তাড়নায় সবাই ক্লান্ত। তবুও বিশ্রামের সময় নেই। ভোরের আলো ফুটবার আগেই প্রতিরোধের কাজ শেষ করতে হবে, তাই প্রাণপণে সবাই কাজ করতে লাগলাম। ভোর হলো। আমরাও সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে গেলাম। শত্রুরা আমাদের অবরোধের মাঝে। এ সফলতার খবরটা জেনারেল হীরাকে জানাতে ইচ্ছে হলো। ওয়ারলেসে হীরাকে জানালাম যে শত্রুদের আমরা পুরোপুরি জালে আটকিয়েছি। খবরটা শুনে জেনারেল হীরা আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো। ধন্যবাদ দেবার সময় খুশিতে তার বার বার কথা আটকে যাচ্ছিল। আমি আমার চ্যালেঞ্জে জিতেছি বলে জেঃ হীরা ব্যক্তিগতভাবেও আমাকে প্রচুর ধন্যবাদ জানালো। এদিকে ভোরের আলোয় চারিদিক আলোকিত হয়ে উঠছিল। ভোরের আলোয় চারিদিকে ভাল করে দেখতে লাগলাম। তারপর বুঝতে চেষ্টা করলাম যে শত্রুরা আমাদের অনুপ্রবেশ টের পেয়েছে কিনা। কিন্তু না। তা বোঝার কোন উপায় নেই। চারিদিক নীরব। কোথাও মানুষের কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছিল না।

বেলুনিয়া থেকে রেললাইনের সাথে সমান্তরালভাবে কাঁচা রাস্তাও চলে এসেছে ফেনী পর্যন্ত। এই রাস্তার পাশেও আমাদের বেশকিছু বাঙ্কার গড়ে উঠেছে। বাঙ্কারে বসে সবাই সামনের দিকে চেয়ে আছি। বেশ কিছু সময় কেটে গেল। হঠাৎ দূর থেকে একটা ট্রলির আওয়াজ অস্পষ্ট শুনতে পেলাম। শব্দটা চিতলিয়ার দিক থেকে থেকেই আসছে বলে মনে হলো। রেললাইন ও রোডের কাছের বাঙ্কারে যারা ডিউটিতে ছিল তাদের মধ্যে নায়েব সুবেদার এয়ার আহমদ ছিল খুবই সাহসী। যুদ্ধের প্রথম থেকেই সে আমার সাথে থেকে নির্ভীকতার সঙ্গে লড়াই করে আসছিল।

ট্রলিটা এগিয়ে আসছে। সবাই প্রতীক্ষায় বসে রইল। আস্তে আস্তে ট্রলির শব্দটা আরো কাছে এগিয়ে আসছে। আমরা পরিষ্কারভাবে দেখতে পেলাম কয়েকজন সৈন্য বেশ কিছু অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ নিয়ে এগিয়ে আসছে। ওরা নিশ্চিত মনে আসছে। ওরা বুঝতেও পারেনি ওদের শত্রুএত কাছে রয়েছে।

এক, দুই, তিন...মিনিটের কাঁটা ঘুরতে লাগল। ট্রলিটা একেবারে কাছে এসে গেলো। এয়ার আহমদ ও তার সঙ্গীদের হাতের অস্ত্রগুলো একসঙ্গে গর্জে উঠলো। মুহূর্তের মধ্যে জায়গাটা ধোঁয়ায় ঢেকে গেল। অনবরত ফায়ারিং-এর শব্দে চারিদিক মুখরিত হয়ে উঠলো। শত্রুরা অনেকেই পালাতে চাইলো কিন্তু তা সম্ভব হতে আমরা দিলাম না। একজন শত্রুও প্রাণে বাঁচতে পারলো না। আনন্দে এয়ার আহমেদ ও তার সঙ্গীরা ‘জয় বাংলা’ ধ্বনি দিয়ে চিৎকার করে উঠলো। উত্তেজনায় আনন্দে ওদের সারা শরীর কাঁপছিল।

ফায়ারিং-এর শব্দ শুনে চিতলিয়া ও পরশুরাম ঘাঁটির শত্রুরা মনে করলো তাদের ট্রলিটা হয়তো বা কোন মুক্তিবাহিনীর গেরিলার দলের হাতে পড়েছে। প্রকৃত অবস্থাটা তারা কিন্তু তখনও বুঝতে পারেনি। তখন দু'দিক থেকেই শত্রুরা আক্রমণ শুরু করলো।

এদিকে এয়ার আহমদ আনন্দে বাঙ্কার ছেড়ে উঠে দৌড়ে গেল অদূরে পড়ে থাকা শত্রুদের মৃত অফিসারটির কাছে। গোলাগুলির কথা সে যেন মুহূর্তের জন্য ভুলে গেল। অফিসারের পকেট থেকে সে পিস্তলটি উঠিয়ে নিল। তারপর তাকে টেনে নিয়ে আসতে লাগলো নিজ বাঙ্কারের দিকে। ঠিক তক্ষুণি শত্রুদের চিতলিয়া ঘাঁটির দিক থেকে একটি বুলেট এসে বিঁধলো এয়ার আহমেদের মাথায়। চোখের সামনেই দেখতে পেলাম ওর শরীরটা যন্ত্রণায় কুঁকড়ে গেল। ঢলে পড়লো বাঙ্কারের মুখে। রক্তে ঢেকে গেল ওর জয়ের আনন্দে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠা মুখটা। নিজের জান দিয়ে এয়ার আহমদ শত্রুদের ঘায়েল করেছে। কিন্তু এর শেষ দেখে যাওয়া তার কপালে সইলো না।

৯ই নভেম্বর। সেদিন ওকে হারিয়ে বেদনায় মূহ্যমান হয়ে পড়েছিলাম। একজন বীরকে হারিয়ে মর্মাহত হয়ে পড়েছিলাম ঠিকই তবুও কর্তব্যের ডাকে সাড়া দিয়ে এয়ার আহমেদের রক্তের বদলা নেবার জন্য শত্রুদের হামলার যোগ্য প্রত্যুত্তর দিয়ে চললাম, শত্রুর আক্রমণের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়ে চললাম। শত্রুরা সারাদিন ধরে আমাদের বিভিন্ন পজিশনের উপর তুমুলভাবে আক্রমণ চালালো।

সারাদিন কেটে গেল। বৃষ্টির মত আর্টিলারী আর শেলিং-এর শব্দে আশেপাশের নীরব এলাকা কেঁপে উঠতে লাগলো। ক্রমে রাত হয়ে এলো। অন্ধকার রাত। শত্রুরা এবার পরশুরাম ঘাঁটি থেকে আমাদের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ শুরু করলো। আমাদের জোয়ানরা তার পাল্টা জবাব দিয়ে চললো। পরশুরাম থেকে এ আক্রমণের আকার ছিল অতি ভয়ংকর। ওরা এমনভাবে আমাদের জালে আটকা পড়েছে যে, বের হবার কোন পথই নেই। ওরা বুঝতে পারলো এটা ওদের জীবন-মরণ সমস্যা। তাই তারা প্রাণপণে লড়ে যেতে লাগলো। কিন্তু ওদেরকে আমাদের জাল ছেড়ে বের হতে দিলাম না। আমরা তাদের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ করে দিতে লাগলাম।

শত্রুদের বেলুনিয়া ও পরশুরাম ঘাঁটিতে যারা ছিল তারা শুধু সুযোগের প্রতীক্ষায় ছিল। যে করেই হোক ওরা চিতলিয়া থেকে সাহায্য ও যোগাযোগ করার চেষ্টা করতে লাগলো- কিন্তু আমরা তা ব্যর্থ করে দিলাম। ওদের এই প্রাণপণ লড়াইয়ের জবাব দিয়ে আমরা শত্রুদের পরশুরাম আক্রমণ প্রতিহত করি।

তারপর ভোর হলো। ওরা আমাদের উপর অনবরত শেলিং ও ফায়ারিং করতে লাগলো। আমরা উচিত জবাব দিয়ে চললাম।

সেদিন বেলা ৪ টার সময় হঠাৎ শত্রুরা আমাদের উপর বিমান হামলা শুরু করলো। কিন্তু ওরা এতে আমাদের বিশেষ কোন ক্ষতি করতে পারলো না। এবার আমরা আরো সতর্কতা অবলম্বন করলাম।

সেদিন গেল। তার পরের দিনও আগের দিনের মতই ফায়ারিং ও শেলিং চললো। দুপক্ষ থেকেই সমানে আক্রমণ ও প্রতিআক্রমণ চললো। ওদের শুধু একটিই উদ্দেশ্য, হয় চিতালিয়ার সাথে যোগাযোগ না হয় পালানো। কিন্তু সে মুহূর্তে পালানো ছাড়া তাদের আর কোন পথ আসলেই ছিল না। শুধু ফায়ারিং ও শেলিং-এর শব্দে মাঝে মাঝে সে এলাকার প্রকৃতি আর গাছপালা যেন কেঁপে কেঁপে উঠছিল, অনেক সময় এক মিনিটও বিরাম ছিল না। শব্দের জন্য অতি কাছের লোকেরা কথাও শোনা যেত না।

সেদিন বেলা ৩-৫০ মিনিট। হঠাৎ দেখলাম তিনটা শত্রু বিমান আমাদের এলাকায় উড়ে আসছে। এসেই ওরা সে এলাকার উপর বোম্বিং করতে শুরু করলো। অনেক ঘরবাড়ি পুড়ে যেতে লাগলো। চারিদিকে দাউ দাউ করে বাড়িঘরে আগুন জ্বলছে। ওরা বেশ নিচু হয়েই বোম্বিং করছিল। যদিও আমাদের কাছে অস্ত্রশস্ত্র বহু ছিল কিন্তু বিমান বিধ্বংসী কামান আমাদের ছিল না। আমরা তাই শেষরক্ষা হিসেবে এমএমজিকে এ কাজে ব্যবহার

করতে লাগলাম। যেহেতু ওরা জানতো আমাদের কোন বিমান বিধ্বংসী কামান নেই, তাই নিশ্চিত হয়ে নিচু দিয়ে বিমান চালাচ্ছিল।

সবাই অপেক্ষায় আছি। কখন আমাদের এমএমজি'র আওতায় বিমানগুলো আসে। আর দেরী হলো না। এমএমজি'র আওতায় এসে গেল বিমানগুলো। মুহূর্তে গর্জে উঠলো এমএমজি। দুটি বিমান উড়ে চলে গেল ওদের সীমানায়। আর একটি ফিরে যেতে পারলো না। শূন্যে ঘুরপাক খেয়ে ছিটকে পড়লো মাটিতে। জোয়ানরা চেঁচিয়ে উঠলো উল্লাসে। সেদিন ছিল নিঃসন্দেহে ১০ম ও ২য় বেঙ্গলের সংগ্রামী দিনগুলোর একটি স্মরণীয় দিন। কোন যুদ্ধের ইতিহাসে হয়তো বা এর আগে এমএমজি দিয়ে কোন বিমানকে ভূপাতিত করা হয়নি-আমরা তাই করতে পেরেছি। গর্বে সবার বুক ভরে উঠলো। এই কৃতিত্বপূর্ণ ঘটনাটা সে এলাকার জনসাধারণের মনে রেখাপাত করেছিল বেশী। তাদের মুখে মুখে ফিরতে লাগলো এ কথা। আমাদের জন্য ওরাও যেন গর্বিত।

সেদিনই মিত্রবাহিনীর জেনারেল হীরা অয়ারলেসে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানান। সেদিন রাতে আমরা মিত্রবাহিনীর সক্রিয় ও গোলন্দাজ বাহিনীর সহযোগিতায় শত্রুদের বেলুনিয়া ও পরশুরাম ঘাঁটির ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালালাম। ওরা আমাদের হামলার মুখে বেশীক্ষণ টিকতে পারলো না। ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল ওরা। শত্রুদের শতকরা ৮০ ভাগ সৈন্যই আমাদের আক্রমণে প্রাণ দিল। রাতের মধ্যেই আমরা পরশুরাম ও বেলুনিয়া দখল করতে সক্ষম হলাম।

অভাবণীয় ও অবর্ণনীয় এক দৃশ্য দেখলাম ওদের পরিত্যক্ত ঘাঁটিতে গিয়ে। চারিদিকে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়ে আছে অসংখ্য লাশ। ধানক্ষেতে, বাঙ্কারে, বাঙ্কারের অদূরে খালের পানিতে কোথাও ফাঁক নেই। যারা আহত হয়েও পালাতে চেয়েছিল তারা শরীরের অসমর্থতার জন্য পারেনি। অসহায়ভাবে কাতরাচ্ছিল বাঁচার আশায়। আহত এসব সৈন্যদের চিকিৎসা করা আমাদের কর্তব্য- তাড়াতাড়ি তার ব্যবস্থা করতে বললাম, কিন্তু ওদের মাঝে বেশীর ভাগ সৈন্য মারা গেল। মাত্র ৩/৪ জন বাচঁতে পারলো। আমরা সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় প্রচুর গোলাবারুদ ও অস্ত্রশস্ত্রসহ ৪৯ জনকে বন্দী করতে সক্ষম হয়েছিলাম। তাদের সাথে এদেরও বন্দী করা হলো।

পরশুরাম ও বেলুনিয়া ঘাঁটির এ মর্মান্তিক পরিণতিতে শত্রুরা ভেঙ্গে পড়লো। চিতলিয়া ঘাঁটির শত্রুরা মনে হলো এতে ভয়ানক নিরাশ হয়ে পড়লো। ওরা পালিয়ে গেল মুন্সীরহাটে।

আমরা আস্তে আস্তে আরো এগিয়ে আসতে লাগলাম এবং ওদের প্রকৃত অবস্থাটা বুঝে আরো কিছু কায়দা বের করতে চাইলাম। এবারে আমরা অবস্থা বুঝে পুরনো কায়দা হিসেবে গোপন অনুপ্রবেশ করার পরিকল্পনা নিলাম। আমরা নীলক্ষেতে ঘাঁটি করে ওদর ফুলগাজী ঘাঁটির উপর চাপ সৃষ্টি করবো- যাতে ওরা দুর্বল হয়ে পালাতে বাধ্য হবে হয়তো। নীলক্ষেতে আমরা মজবুত ঘাঁটি করে বসলাম। ওরা আমাদের পরিকল্পনাটা টের পেল মনে হয়। তাই তারা চিতলিয়ার ঘাঁটি ছেড়ে সবাই ফুলগাজীতে এসে মিললো। আমরা তখন সরাসরি ফুলগাজীর উপর চাপ সৃষ্টি করলাম। ওরা অবস্থা বুঝতে পারলো। ব্যাপার সুবিধের নয় ওদের জন্য। ওরা একেবারে সব ঘাঁটি ছেড়ে বান্দুরা রেল স্টেশনের কাছে এসে ঘাঁটি স্থাপন করলো।

আমরা আরো এগিয়ে আসলাম। কালিহাট ও পাঠাননগর থেকে আমরা শত্রুদের মুখোমুখি হয়ে ঘাঁটি স্থাপন করলাম। আমাদের দক্ষিণ দিকে ছিল সোনাগাজী। সেখানে আমরা আগেই গেরিলা বাহিনী পাঠিয়ে সব ঠিক করে রেখেছিলাম। ওরা এখন আমাদের দ্বারা তিনদিক দিয়েই চাপের ভিতর পড়েছে। তখন বাধ্য হয়ে সোনাগাজী দিয়ে পালাতে চাইবে, সেহেতু আমরা সে পথ ওদের জন্য ইচ্ছা করে মুক্ত রেখেছি আর গেরিলা বাহিনী রেখেছি গোপনে, যাতে তারা পালাতে গেলেই ওদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হবে। কিন্তু বাস্তবে তা হলো না। ওরা আমাদের প্রচণ্ড চাপ সহ্য করতে না পেরে নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ হয়ে লাকসামে চলে গেল এবং এতে ও ওদের অধিক সংখ্যক সেনাই পালাতে সক্ষম হলো।

৬ই ডিসেম্বরে আমরা ফেনী মুক্ত করলাম। ফেনীর এতদিনকার গুমোট ও ধোঁয়াটে আকাশে স্বাধীনতার পতাকা উড়লো। অগণিত জনতার শ্লোগানে আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে উঠলো। দীর্ঘ ৯টি মাস পরে মুক্ত বাতাসে সবাই দাঁড়িয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। ফুলের মালা আর জনতার বরণডালার আতিশয্যে আমরা সেদিন অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম। দু'চোখ শুধু বারে বারে পানিতে ভরে উঠছিল। মাথায় বাংলা মায়ের অশ্রুভেজা আর্শীবাদ নিয়ে বাংলাদেশের সবুজ সূর্য আঁকা পতাকা ছুঁয়ে শহীদ এয়ার আহমেদের মত লাখো লাখো বীর শহীদদের আমরা অবনতচিত্তে স্মরণ করলাম। কিন্তু আমাদের আরো অনেক কাজ বাকী; অভিভূত হয়ে বসে থাকার কথা নয়।

আর দেরী করলাম না। সবাই আমরা মার্চ করে নোয়াখালীর দিকে রওনা দিলাম। নোয়াখালীর সদর মুক্ত করতে যেয়ে আমরা সেদিন বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিলাম প্রচুর। কিন্তু তা যদি পাক সৈন্যদের দ্বারা হতো তবে বোধহয় সান্ত্বনা পেতাম। তারা ছিল বর্বর আর ঘৃণ্য রাজাকার আর আলবদরের দল। ওরা নানাভাবে আমাদের বাধা দিয়েছে, কিন্তু আমাদের অগ্রগতি তারা রুদ্ধ করতে পারেনি। আমরা তাদের সব বাধা ডিঙ্গিয়ে ওদের সমূলে ধ্বংস করে নোয়াখালীর সদর মুক্ত করলাম।

আমরা ক্ষমা করিনি সেই ঘৃণ্য আলবদর আল রাজাতারদের। তারা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে দেশের সাথে, নিজের মায়ের সাথে। অস্বীকার করেছে নিজের রক্তকে। তাই ওদের হত্যা করতে কারো এতটুকু বুক কাঁপেনি। কারণ ওরা ক্ষমার যোগ্য নয়। নিজের মায়ের বুকফাটা কান্নায় হৃদয় টলেনি যাদের, নিজের বোনের নির্যাতনের মানবতার সামান্য উদাহরণ দেখাতে পারেনি যারা, নিজের ভাইকে হত্যা করতে হাত কাপেনি এতটুকু ওদের। ওদের ক্ষমা করা যায় না। দেশের সাথে, নিজের অস্তিত্বের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তবুও বিবেকের দংশনে জ্বলেপুড়ে মরেনি ওরা। ওরা কি মানুষ? পলাশীর যুদ্ধে মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতার পর বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে আবার তার পুনরাবৃত্তি ঘটলো।

৯ই ডিসেম্বর আমরা নোয়াখালী মুক্ত করলাম। নোয়াখালীর মুক্ত নীল আকাশে সূর্য আঁকা পতাকায় আমরা বিশ্বের স্বাধীনতাকামী মানুষদের সালাম জানালাম। সে সময়কার আনন্দ আর অনুভূতি ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। সফলতার আনন্দে আর দেশ মুক্তির আনন্দে সবাই শুধু কেঁদেছিল। দলে দলে জনতা মালা হাতে ভিড় জমালো শুধু একনজর আমাদের দেখার আশায়। সেদিন আমরা সবাই শুধু বাঙ্গালী এই পরিচয়ে অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম।

আমি শুধু অবাক হয়ে ভাবছিলাম এই আমার দেশবাসী। এরা কত ভালবাসে আমাদের। তাইতো ওদের জন্য আমাদের জন্য দেশমুক্ত করার জন্য সংগ্রামে নেমেছি আমরা। এরা আমার ভাই আমার বাবা আমার মা-বোন, এদের আনন্দে আমরাও মিশে গেলাম তাই একান্ত হয়ে। সেদিন শুধু আমি এই জেনেছি আমার একটি পরিচয়। আমি বাঙ্গালী, এই বাংলাদেশ আমার, এরা সবাই আমার আপন। একই স্নেহ ভালবাসা একই সংস্কৃতি কৃষ্টি ও সভ্যতার বাঁধনে আমরা বন্দী। কাউকে কেউ অস্বীকার করতে পারি না। ওদের মত আমিও দেশের মাটিকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসি। ভালবাসি দেশের এই দুর্ভাগা মানুষগুলোকে।

৬ই ডিসেম্বর ফেনী মুক্ত হলো, তারপর নোয়াখালীর সদর এলাকা। শত্রুমুক্ত করলাম ৯ই ডিসেম্বর, কিন্তু বিশ্রামের অবকাশ হলো না। ইতিমধ্যে আদেশ এলো চট্টগ্রামের দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য। চট্টগ্রাম শত্রুমুক্ত করতেই হবে। আমার কাছে যখন এ আদেশ এলো তখন আমি ফেনীতে। চিটাগাং ফেনী থেকে প্রায় ৬৫ মাইল দূরে। তখন চিটাগাং এবং তার পার্শ্ববর্তী প্রায় সমস্ত এলাকাই শত্রুদের কবলে ছিল। এসব স্থানে তারা বেশ মজবুত ঘাঁটি করে বসেছিল। সংখ্যায় শক্তিতে তারা বেশ শক্তিশালী হয়েই আছে।

সেদিনই চট্টগ্রাম অভিমুখে রওনা দেবার সমস্ত কাজ শুরু করলাম। দেরী করার আর সময় ছিল না। প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ নিয়ে আমরা সেদিন দুপুর নাগাদ রওনা দিলাম চট্টগ্রাম অভিমুখে। পিচঢালা

একটানা পথ চলে গেছে সম্মুখ বরাবর। আমাদের এ অভিযানে ১০ বেঙ্গলের জোয়ানেরা ছাড়া মিত্রবাহিনী জোয়ানদের পূর্ণ ও সক্রিয় সহযোগিতা ছিল। যদিও সমস্ত কিছু পরিচালনা ও পরিকল্পনা করার দায়িত্ব আমরাই নিয়েছিলাম। অবশ্য এর কারণ ছিল যে, বাংলাদেশের সমস্ত পথঘাট ও প্রয়োজনীয় অনেক কিছু আমাদেরই জানা।

বেলা বাড়ছে। আমরা সবাই এগিয়ে যাচ্ছি। নিশ্চিন্তে চলার অবকাশ ছিল না। পথে দুশমনের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়ে অভিযানে বিলম্ব হচ্ছিল। আমরা এতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হলাম না। সব বাধা প্রতিরোধ ডিঙ্গিয়ে এগিয়ে যেতে লাগলাম গন্তব্যস্থল অভিমুখে। থেমে থাকলে চলবে না। অভিযান সফল করতেই হবে।

১৩ই ডিসেম্বর। আমরা তখনো গন্তব্যস্থলের অনেক দূরে। আর ৪ মাইল দূরেই কুমীরা। এখানেও শত্রুরা বেশ শক্তিশালী ঘাঁটি করে আছে। আমরা বেলা প্রায় ১২টায় কুমলার অদূরে এসে পৌঁছলাম। এরপর আর সামনে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হলো না। কুমীরায় অবস্থিত শত্রুদের ঘাঁটি থেকে আমাদের উপর প্রবল আক্রমণ শুরু হলো। আমরাও প্রবলভাবে ওদের এ আক্রমণের জবাব দিয়ে চললাম। কিন্তু সামনে অগ্রসর হওয়া সমীচীন মনে করলাম না। তখন মিত্রবাহিনীর বিগ্রেডিয়ার আনানস্বরূপের তরফ থেকে আমার কাছে আর একটি বিকল্প আদেশ এলো। আনানস্বরূপ আমাকে বললো, 'তুমি ১০ম বেঙ্গলের চার্লি কোম্পানী ও মিত্রবাহিনীর দলকে রেখে কুমীরা পাহাড় পার হয়ে হাটহাজারী অভিমুখে রওনা হয়ে যাও।'

আমি সেই অনুযায়ী ১০ম বেঙ্গলের চার্লি কোম্পানী লেঃ দিদারের অধীনে রেখে এবং মিত্রবাহিনীর কোন সহযোগিতা ছাড়া আমার ১০ম বেঙ্গল নিয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারেই কাজ শুরু করতে মনস্থ করলাম।

আমরা যখন ফেনী থেকে চট্টগ্রাম অভিমুখে রওনা হয়েছিলাম সে সময়েই চতুর্থ বেঙ্গলের একটি দল ক্যাপ্টেন গফফারের অধীনে পরিচালিত হয়ে চিটাগাং-রাঙ্গামাটি রোড ধরে হাটহাজারী অভিমুখে রওনা হয়ে গিয়েছিল। আমরা কুমীরা পাহাড় পার হয়ে গোপনে হাটহাজারী আক্রমণের পরিকল্পনা নিলাম। সন্ধ্যার সাথে সাথে আমরা সব ঠিক করে রওনা দিলাম। ডিসেম্বরের শীতের সন্ধ্যা। অন্ধকার হওয়ার সাথে সাথে শীতের মাত্রাও যেন বাড়ছিল। কিন্তু সেসব ভাববার অবকাশ ছিল না। এ রাতের অন্ধকারেই, শীতের সাথে মিতালী পাতিয়ে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। পাড়ি দিতে হবে অচেনা অজানা পথ। এ পথে আমরা একেবারেই নতুন। পাহাড়ী বন্ধুর পথ। কোথাও ঢালু, কোথাও উঁচু-নীচু। কোথাও বা ছোট ছোট খাল। চারিদিকে গাছগাছালির ভিড়। অন্ধকার যেন তাই আরো নিবিড় লাগছিল। সাথে আমাদের ভারী অস্ত্রশস্ত্র। নিজেদের চলতেই কষ্ট হচ্ছিল। তার উপর এসব ভারী বোঝা নিয়ে চলা বড়ই দুঃসাধ্য ব্যাপার। কিন্তু তবুও অতিক্রম করতেই হবে আমাদের।

আমরা তাই পথ চলছি। অতি কষ্টে নিঃশব্দে। ঝিঁ ঝিঁ পোকার একটানা ডাক। ঝিঁ ঝিঁ পোকার একটানা ডাক। মাঝে মাঝে পথ ভুলে যাচ্ছিলাম। আবার পিছিয়ে এসে চলছিল সঠিক পথে। এ পাহাড়ী পথে কোথাও তেমন মানুষজনের সাড়া পেলাম না। শুধু মাঝে মাঝে দু'একটা পাহাড়ী কুটিরে কিছু লোকের দেখা পেলাম। তাদের কাছ থেকে পথ নিচে নিয়ে পথ চলতে লাগলাম। ক্রমশঃ রাত বাড়ছে। ঠিক কত জানি না। ক্ষুধায়, পথশ্রমে সবাই ভীষণ ক্লান্ত। কিন্তু অন্ধকারে অচেনা, অজানা স্থানে কোথায় নেব বিশ্রাম। তাছাড়া এখন সময় নেই বিশ্রামের।

রাত শেষ হলো। চারিদিকে ভোরের আলো ফুটছে। গাছগাছালির পাতার ফাঁকে ফাঁকে ভোরের সূর্যের আলো পরশ বুলিয়ে যাচ্ছিল। ভোরের পাখীদের কলতানে বনাঞ্চল মুখরিত হয়ে উঠছিল। দিনের আলোয় সবাই যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। পথঘাট চলতে আর চিনতে কিছুটা সুবিধা হবে হয়তো এবার। তাই মিনিট দশেক সবাই একটু বিশ্রাম নিলাম।

তারপর....। আবার যাত্রা শুরু হলো। আগের পথ চলার অভিজ্ঞতাগুলো আবার ডিঙ্গিয়ে চলাম। বেলা বাড়ছে। মাথার উপর সূর্যের তাপ ক্রমশ বাড়ছে। আমরা প্রায় পাহাড়ের শেষপ্রান্তে। আর একটু এগুলোই বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা।

দুপুর ১২টা বেজে ৫ মিনিট। আমরা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় পৌঁছে গেলাম। শত্রুরা তখন হাটহাজারী পুলিশ স্টেশনে ছিল। আমরা এখানে পৌঁছেই শত্রুদের প্রকৃত অবস্থা জানতে তৎপর হলাম। ওরা কি পরিমাণে, কোথায় কোথায় কি ধরনের শক্তি নিয়ে আছে, সর্বাগ্রে তা আমাদের জানা দরকার। কিন্তু তক্ষণাৎ সেটা জানতে চেষ্টা করা ঠিক হবে না। তাই চুপচাপ নিজেদের অবস্থা সুদৃঢ় করতে লাগলাম। আমরা সেখানে বাঙ্কার করে পজিশন নিয়ে বসতে শুরু করলাম। ইতিপূর্বে চতুর্থ বেঙ্গলের যে দল চিটাগাং-রাঙ্গামাটি রোড ধরে হাটহাজারী অভিমুখে রওনা হয়েছিল তারা কোথায়, কদ্দূর অগ্রসর হয়েছে তা জানার জন্য আমি তিনজন লোকের একটা দলকে গোপনে সে রাস্তা ধরে পাঠালাম। বেশীক্ষণ লাগলো না। ওরা খবর নিয়ে এলো। ওরাও হাটহাজারীর প্রায় ৩/৪ মাইল দূরে ঘাঁটি ফেলেছে। আমি তখন ওদের সাথে যোগাযোগ করলাম এবং প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী পরস্পরের সাথে আদান-প্রদান করলাম। ক্রমে রাত হয়ে আসছিল। আমরা চুপচাপ রাতটা কাটানো মনস্থ করলাম। বুঝতে পারলাম ওরা আমাদের অবস্থা সম্বন্ধে কিছু জানতে পারেনি। চুপচাপ ১৪ ডিসেম্বরের রাত কেটে গেল। আমরা সকাল হওয়ার সাথে সাথেই শত্রুদের প্রতিউত্তর আসলো। বোঝা গেল ওরা বেশ মজবুত ভাবেই হাটহাজারীতে ঘাঁটি করেছে। আমরাও তাই দুপুর নাগাদ ওদের উপর আক্রমণ চালালাম। ওরা আমাদের আক্রমণের প্রচণ্ড চাপ সহ্য করতে না পেরে আত্মসমর্পণ করতে রাজী হলো। ২৪-এফএফএর 'বি' কোম্পানীর মেজর হাদীসহ সবাই আমাদের কাছে আত্মসমর্পণ করলো। আমরা তখন হাটহাজারী ছাড়িয়ে গিয়ে নয়াপাড়া ক্যান্টনমেন্টের উপর প্রচণ্ড চাপ দিতে লাগলাম। ইতিমধ্যে ক্যাপ্টেন গফফারের অধীনে পরিচালিত চতুর্থ বেঙ্গলের দলটিও আমাদের সাথে এসে মিলিত হলো। ওদিকে মিত্রবাহিনী ও লেঃ দিদারের অধীনে ১০ম বেঙ্গলের যে চার্লি কোম্পানী ছিল তারা ১৫ই ডিসেম্বর কুমীরার উপর প্রচন্ড হামলা চালায়। কুমীরার শত্রুরা এ আক্রমণের মুখে বেশিক্ষণ টিকতে পারলো না। তারা পালিয়ে তাদের পরবর্তী ঘাঁটি ফৌজদারহাটে গিয়ে মিলিত হলো। আমাদের চার্লি কোম্পানী ও মিত্রবাহিনী আরো এগিয়ে গেল। আমাদের মত তারাও ফৌজদারহাটের শত্রুদের উপর প্রচণ্ড চাপ দিতে থাকে। তখন সময়টা ছিল ১৫ই ডিসেম্বরের রাত। আমরা যেভাবে নয়াপাড়া ক্যান্টনমেন্টের উপর চাপ দিতে লাগলাম তেমনি কুমীরা থেকেও আমাদের চার্লি কোম্পানী ও মিত্রবাহিনী ফৌজদারহাটের উপর চাপ সৃষ্টি করতে লাগলো। বার বার তাদের আত্মসমর্পণ করার জন্য ঘোষণা করতে লাগলাম। কিন্তু তবুও আত্মসমর্পণ করতে রাজী হলো না। কিন্তু আমরা জানতাম আত্মসমর্পণ ওদের করতেই হবে। এছাড়া ওদের কোন পথই নেই।

১৬ই ডিসেম্বর সকাল। নিয়াজীকে নির্দিষ্ট সময় দেয় হলো আত্মসমর্পণের। আমরাও বার বার শত্রুদের নির্দেশ দিয়ে চললাম আত্মসমর্পণের জন্য। নির্দিষ্ট সময়ের বেশ কিছু পরে নিয়াজী আত্মসমর্পণ করলো। বাংলাদেশের প্রত্যেক রণাঙ্গনেই মিত্র ও আমাদের মুক্তিবাহিনীর অধিনায়কদের হাতে পাকসেনারা আত্মসমর্পণ করলো।

সাক্ষাৎকারঃ সুবেদার মেজর লুৎফর রহমান*

৩রা জুন : বজরার কুখ্যাত দালাল পাক সামরিক বাহিনীর অন্যতম সাহায্যকারী, নিরীহ গ্রামবাসীর ধনসম্পদ লুণ্ঠনকারী দানব সেরাজুল ইসলাম (ছেরু মিয়া-বজরা) এর অত্যাচারে জনগণ অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে। প্রকৃতপক্ষে তারই প্রভাবে এতদঞ্চলে বহু নিরীহ জনগণ রাজাকারে পরিণত হয়। তাই মেজর (বর্তমানে কর্নেল) খালেদ মোশাররফ সাহেবের নির্দেশক্রমে ৩রা জুন রাতে বজরা স্কুলের পূর্ব দিকে তার গোপন আড্ডাখানায় অতর্কিত আক্রমণ করি।

---

* ১৯৭৩ সালে বাংলা একাডেমীর পক্ষ থেকে এ সাক্ষাৎকার গৃহীত হয়।

কিন্তু সুচতুর দালার ছেরু মিয়া টের পেয়ে পূর্বেই আত্মগোপন করে । তার ৪ জন সহকারী আমাদের হাতে ধরা পড়লে তাদেরকে হত্যা করা হয়। এদের মৃত্যুর পর এতদঞ্চলে আর তেমন কোন অত্যাচার হয়নি এবং ছেরু মিয়ারও তেমন কোন সন্ধান করতে পারিনি। অবশ্য দেশ মুক্ত হবার পর এই কুখ্যাত দালাল মীরজাফর মুক্তিবাহিনীর হাতে ধরা পড়া এবং প্রকাশ্যে জনসাধারণের রায়ে তাকে হত্যা করা হয়।

৬ই জুন : বহু নিরীহ গরীব লোককে প্রলোভন দিয়ে মাইজদীতে রাজাকারে ভর্তি করিয়ে দেওয়া হতো। সিপাই শাহজাহানকে পাঠালাম মাইজদীতে রাজাকার ট্রেনিং ক্যাম্পে হাতবোমা নিক্ষেপ করার জন্য।

শাহজাহান অতি গোপনে ও কৌশলে রাজাকার ট্রেনিং ক্যাম্পে ঢুকে হাতবোমা নিক্ষেপ করে। এতে রাজাকার কমাণ্ডার ও আরও দুইজন রাজাকার নিহত হয়। সিপাই শাহজাহান তাদেরকে হত্যা করে অসীম সাহসের পরিচয় দিয়ে বীরত্বের সাথে ফিরে আসতে সক্ষম হয়।

১১ই জুন : চন্দ্রগঞ্জ রাস্তায় পাকবাহিনীর চলাফেরা অনেকাংশে বেড়ে যাওয়ায় চন্দ্রগঞ্জের পুলটি উড়িয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নেই। পুলের উভয় পাশে পাক বাহিনীর মেশিনগান মোতায়ের থাকা সত্ত্বেও পুলটি উড়িয়ে দিতে সক্ষম হই।

ইতিমধ্যে খবর পেলাম যে আমাকে ধরার জন্য নোয়াখালীর পাক সামরিক কর্তৃপক্ষ মোটা টাকার পুরস্কার ঘোষণা করেছে। গোপালপুর চৌধুরী বাড়ির নসা মিয়া যদিও পাক বাহিনীর সঙ্গে আপাতদৃষ্টিতে যোগাযোগ রক্ষা করতেন কিন্তু মূলত তিনি আমাদেরকে গোপনে গোপনে পাক হানাদার বাহিনীর সমস্ত গোপনীয় তথ্য জানাতেন। সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালীর স্বার্থেই তিনি পাঞ্জাবীদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে আমাদেরকে সাহায্য করতেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তার চতুরতা ধরে ফেলে পাক হানাদাররা। তারা গোপালপুর আক্রমণ করে তাকে জঘন্যভাবে হত্যা করে।

এই নসা মিয়ার নিকটই আমি জানতে পারি যে আমাকে ধরার জন্য পাক বাহিনী মোটা টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছে এবং অল্পদিনের মধ্যে তারা আমাদের মারাত্মকভাবে আক্রমণ করবে। আমি নসা মিয়ার নিকট এ খবর পাওয়ার পর আমিশাপাড়া ক্যাম্প তুলে নেই এবং অন্যান্য ক্যাম্প থেকেও সমস্ত সৈন্য তুলে নিয়ে সেনবাগের প্রতাপপুর নামক গ্রামে আত্মগোপন করি। অবশেষে ১৮ই জুন পাকসেনারা ১ ব্যাটালিয়ন সৈন্য নিয়ে আমাকে ও আমার দলবলকে ধরার জন্য আমিশপাড়া-বজরা সড়ক, সোনাইমুড়ি-চাটখিল রোড, চন্দ্রগ্রাম-খিলপাড়া সড়ক দিয়ে একই সময় অগ্রসর হন। অবশেষে তারা আমাদের পাত্তা না পেয়ে চলে যায়।

২১শে জুন : হাবিলদার মতিন অতর্কিতে দালালবাজার রাজাকার ক্যাম্প আক্রমণ করে একজন মিলিশিয়া সহ ১৬ জন রাজাকারকে হত্যা করে তাদের ক্যাম্প তছনছ করে দেয়।

২৩শে জুন : আপানিয়া পুলের নিকট কয়েকজন দালালসহ দু'জন পাকসেনা ইতস্তত ঘোরাফেরা করতে থাকে। সম্ভবত সতী মা-বোনদের ইজ্জত নষ্ট করার উদ্দেশ্যে ঘোরাফেরা করছিল; ঠিক সেই মুহূর্তে নায়েক সুবেদার শামসুল ও হাবিলদার মন্তাজ সেখানে উপস্থিত হয়ে পাকসেনা দু'জনকে খতম করে। অবশ্য দালালরা পালিয়ে যায়। এখানে শামসুল হক ও মন্তাজ অত্যন্ত সাহসিকতার পরিচয় দিলে স্বাধীনতকামী যোদ্ধাদের মনোবল অত্যন্ত দৃঢ় হয়।

২৪শে জুন (বগাদিয়ায় পুনরায় বিস্ফোরণ ও যুদ্ধ) : নায়েক শহীদ বগাদিয়ার নিকটে রাস্তার উপর মাইন বসিয়ে কিছুদূরে সরে থাকে। কিছুক্ষণ পর পাকবাহিনী এক প্লাটুন সৈন্য একটা ট্রাকে চলতে থাকলে মাইন বিস্ফোরণে গাড়িখানা সামান্য নষ্ট হয়। পর মুহূর্তে কয়েক ঘন্টা যুদ্ধ চলে। যুদ্ধে কোন ক্ষয়ক্ষতি তেমন হয়নি।

২৫শে জুন : রাতে হাবিলদার মতিন লক্ষ্মীপুরের বাগবাড়ি ক্যাম্প মর্টারের সাহায্যে আক্রমণ করে ও কয়েকজনকে আহত করে। ২৬শে জুন সুবেদার ওয়ালীউল্লা কাফলাতলী রাজাকার ক্যাম্প আক্রমণ করে

কয়েকজন রাজাকারকে হত্যা করে ক্যাম্পটি তছনছ করে দেয়। ইতিমধ্যে শত্রুর কয়েকজন গুপ্তচর হাতেনাতে ধরা পড়ে। অপরদিকে সুবেদার শামসুল হকের হাতে একজন রাজাকা কমাণ্ডার ধরা পড়ে।

২৭শে জুন : আমি ভারত হতে পুনরায় বিস্ফোরক দ্রব্য এবং গোলাগুলি নিয়ে আসি।

৩০শে জুন : হাবিলদার মতিনের নেতৃত্বে এবক প্লাটুন মুক্তিসেনা লক্ষ্মীপুরে থেকে কালীরবাজার অগ্রগামী খানসেনাদের প্রচণ্ড আক্রমণ করলে কয়েকজন হতাহত হয়। পাকসেনারা কালীরবাজারে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে পালিয়ে যায়।

১৭ই জুলাই : রামগঞ্জের উত্তরে নরিমপুর হতে এক কোম্পানী পাক রেঞ্জার্স ও রাজাকার দল অগ্রসর হতে থাকলে হাবিলদার জাকির হোসেনের নেতৃত্বে এক প্লাটুন মুক্তি সেনা তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। বেশ কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর শত্রুরা রাজাকারের দুটি মৃতদেহ ফেলে দৌড়ে প্রাণ বাঁচায়। পরে হাবিলদার জাকির হোসেন মৃত রাজাকারদ্বয়ের দাফনের ব্যবস্থা করে।

১৯শে জুলাই : কয়েকজন রাজাকারসহ হানাদার বাহিনীর এক কোম্পানী সৈন্য মান্দারীবাজারে ক্যাম্প করেছিল। আমি উক্ত ক্যাম্প আক্রমণ করার জন্য সুবেদার ওয়ালীউল্লাকে আদেশ করি। ওয়ালীউল্লা, হাবিলদার মতিন ও শাহাবউদ্দিন মান্দারীতে শত্রু ঘাঁটির উপর আক্রমণ করে। এ যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর দু'জন জোয়ান শহীদ হন।

২৩শে জুলাই (পুনরায় সাহেবজাদা পুল চূর্ণ-বিচূর্ণ) : পাকবাহিনী সাহেবজাদা পুল মেরামত করে পুনরায় নোয়াখালীর সাথে রেল যোগাযোগ স্থাপন করে। আমি নায়েক আবুল হোসেন ও সুবেদার শামসুল হককে নিয়ে পুলটি নষ্ট করতে যাই। সেখানে কিছু রাজাকার ও মিলিশিয়া পাহারারত ছিল। তাদেরকে আমাদের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য আমরা গোলাগুলি আরম্ভ করি। অপরদিকে নায়েক আবুল হোসেন পুলের নীচে গিয়ে বিস্ফোরক দ্রব্য লাগিয়ে সরে পড়ে। কিছুক্ষণ পরই বিরাট আওয়াজে পুলটি ধ্বংস হয়ে যায় এবং নোয়াখালীর সাথে রেল যোগাযোগ পুনরায় বিছিন্ন হয়ে পড়ে।

২৬শে জুলাই : এদিন সুবেদার ওয়ালীউল্লাকে নরিমপুর পাঠাই রেকি করার জন্য। ওয়ালীউল্ল নরিমপুর পৌঁছলে কয়েকজন পাক দালাল (অস্ত্রহীন) সুবেদার ওয়ালীউল্লাকে অতি কৌশলে ঘিরে ফেলে ও বন্দী করে। তৎক্ষণাৎ সুবেদার ওয়ালীউল্লা পিস্তল দিয়ে একজন দালালকে গুলি করে জীবন রক্ষার্থে প্রাণপণে উর্ধবশ্বাসে দৌড়াতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত পালাতে সক্ষম হয়।

১৪ই আগস্ট (বসুরহাট যুদ্ধ) : নোয়াখালী জেলার পশ্চিমাংশ থেকে পূর্বাংশে পাকবাহিনীর সৈন্যদের আনাগোণা বেশী পরিলক্ষিত হয়। এ সময় চারদিক থেকে মুক্তিসংগ্রাম অধিকতর শক্তিশালী হতে থাকে এবং মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবল অনেকগুণ বেড়ে যায়।

আমি বাছাই করা যোদ্ধাদের এক প্লাটুন মুক্তিসেনাকে নায়েক সুবেদার শামসুল হকের নেতৃত্বে পাঠাই বসুরহাটে খান সেনাদের নির্মূল করার জন্য। অদম্য সাহসী বীরযোদ্ধা শামসুল হক এখানে খান সেনাদের উপর চরম আক্রমণ করে শত্রুর একখানা জীপ নষ্ট করে দেয় এবং কয়েকজনকে হতাহত করে। এ যুদ্ধে আমার দু'জন বীরযোদ্ধা শহীদ হন এবং দু'জন গুরুতরভাবে আহত হয়। সিপাহী নূরনবীর বৃদ্ধাঙ্গুল গুলির আঘাতে উড়ে যায়।

১৬ ই আগস্ট (পুনরায় আপানিয়া পুল ধ্বংস) : পাকবাহিনীর দ্বারা নতুন মেরামত করা আপানিয়া পুলটি নায়েক শহীদ ধ্বংস করে দেয় ও লাকসাম-নোয়াখালী যোগাযোগ বিছিন্ন করে দেয়।

২৬শে আগস্ট : মিলিশিয়া ও রাজাকার বাহিনীর একটি বিরাট দল আমিনবাজার থেকে আমিশাবাজার দিকে অগ্রসর হচ্ছে এ খবর পাবার পর আমরা তাদের চতুর্দিক দিয়ে ঘেরাও করার পরিকল্পনা করি। সুবেদার

ওয়ালীউল্লাকে ত্রিমুখী আক্রমণ করার নির্দেশ দিলাম। নির্দেশক্রমে সুবেদার ওয়ালীউল্লা ত্রিমুখী আক্রমণের প্রস্তুতি নেয়। আমি নিজে এক প্লাটুন সৈন্য নিয়ে পিছন দিক থেকে আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নিলাম। শত্রুরা আমিনবাজারের দিকে অগ্রসর হওয়ার সাথে সাথে সুবেদার ওয়ালীউল্লা ত্রিমুখী শুরু করে। ফলে শত্রুরা পিছনে হটতে থাকলে আমি পিছন থেকে আক্রমণ করি। আক্রমণ চারিদিক থেকে চলতে থাকে। কাজেই শত্রুরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। এদিকে জনসাধারণও ছত্রভঙ্গ হয়ে চারিদিকে দৌড়াদৌড়ি করতে থাকে। ফলে আমাদের পক্ষে গুলি করা বিরাট প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। এ সুযোগে শত্রুরা হাতের অস্ত্র ফেলে জনসাধারণের মধ্যে মিশে যায় এবং অনেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। ছয়জন রাজাকার নিহত হয় ও কয়েকজন আহত হয়। আমরা উক্ত ছয়জন রাজাকারের লাশ কাচিহাটিতে দাফন করি। রাজাকার মওলানা মিজানুর রহমান অক্ষত অবস্থায় অস্ত্রসহ আমাদের হাতে ধরা পড়ে। তার নিকট থেকে পাক বাহিনীর অনেক গোপন তথ্য সংগ্রহ করি। পরে তাকে হত্যা করে তারও দাফনের ব্যবস্থা করি। এখানে কয়েকটি চীনা রাইফেলও আমাদের হস্তগত হয়।

১০ই সেপ্টেম্বর : রাজাকার ও পাকবাহিনী গোপালপুর সড়কে মুক্তিবাহিনীর গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য এবং সময়মত খবর দেবার জন্য ছোট একটি ছেলেকে নিয়োজিত করে। ছেলেটিকে তারা কিছু টাকা-পয়সাও দিয়েছিল। কিন্তু গোপালপুর সড়কে সন্দেহভাজনভাবে ঘোরাফেরা করতে থাকলে গোপালপুরের ডাঃ আনিস তাকে ধরে ফেলে এবং তাকে মুক্তিবাহিনীর পক্ষে কাজ করানোর জন্য বাধ্য করে।

ইতিমধ্যে আমি বন্ধুরাষ্ট্র ভারতে চলে যাই সমরাস্ত্রসংগ্রহ করতে। জনাব মেজর (বর্তমানে কর্নেল) খালেদ মোশাররফ আমাকে এ্যামুনিশন ও বিস্ফোরক দ্রব্য সরবরাহ করেন এবং বিভিন্ন সময়ে গেরিলা পদ্ধতিতে মুক্তিযুদ্ধের কলাকৌশল সম্বন্ধে অবহিত করেন।

আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে নোয়াখালী জেলায় রাজাকার আর আলবদরের সংখ্যা অনেক বেড়ে যায়। সেজন্য নোয়াখালীর পরিষদ সদস্যগণ আমাকে পরামর্শ দিলেন নোয়াখালীকে কয়েক ভাগে ভাগ করে অন্যান্যের হাতেও দায়িত্ব অর্পণ করে মুক্তিযুদ্ধকে ত্বরান্বিত করার জন্য। আমি নতুন সমরাস্ত্র নিয়ে ভারত থেকে দেশে ফিরলাম। বহু ছাত্র-শ্রমিক ট্রেনিং দেশে ফেরে। আমি সদর মহকুমাকে চার ভাগে ভাগ করি-

(ক) দক্ষিণ-পশ্চিমাংশের দায়িত্ব নিলাম আমি নিজে।

(খ) পূর্ব-দক্ষিণের দায়িত্ব দিলাম ওয়ালীউল্লাকে।

(গ) পূর্ব-উত্তরের দায়িত্ব দিলাম নায়েক সুবেদার শামসুল হককে।

(ঘ) পশ্চিম-উত্তরের দায়িত্ব দিলাম নায়েক সুবেদার ইসহাককে।

২রা অক্টোবর : ছাত্র কমাণ্ডার একরাম-এর নেতৃত্বধীন একটি গ্রুপ রামগঞ্জে রাজাকারদের আক্রমণ করে, অপরদিকে সুবেদার ইসহাক পানিয়ালা বাজার আক্রমণ করে ৪জন রাজাকার খতম করে। ৩রা অক্টোবরে কুখ্যাত রাজাকার কমাণ্ডার আবুল বাশার বিপুলাশহর থেকে বগাদিয়া যাবার সময় সুবেদার শামসুল হকের হাতে বন্দী হয়। সুবেদার শামসুল হক তার কাছ থেকে পাকবাহিনী গোপন তথ্য সংগ্রহ তাকে মেরে ফেলে।

১৮ই অক্টোবর : নায়েক সুবেদার ইসহাক শামসুন্নাহার হাই স্কুলে অবস্থানরত রাজাকার ক্যাম্পে অতর্কিত আক্রমণ করে কয়েকজন রাজাকারকে হতাহত করে ও ৫টি রাইফেল উদ্ধার করে। অপরদিকে নায়েক সুবেদার ওয়ালীউল্লা দালাল বাজার রাজাকার ক্যাম্প আক্রমণ করতে গেলে দেখতে পায় যে রাজাকারকে লুণ্ঠিত কাপড় বন্টনে ব্যস্ত। সেই অবস্থাতেই তিনি তাদেরকে চরম আঘাত হেনে কয়েকজনকে হতাহত করেন। অবশিষ্ট রাজকাররা পালিয়ে প্রাণ বাঁচায়। পরে লুণ্ঠিত কাপড় মুক্তিবাহিনীর সদস্যদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। এখানেও ৫টি রাইফেল উদ্ধার করা হয়।

মীরগঞ্জে রাজাকারের আত্মসমর্পণ : মীরগঞ্জের রাজাকাররা আত্মসমর্পণের জন্য আমার নিকট দু'খানা পত্র পাঠায়। প্রথম পত্র আমি মোটেই বিশ্বাস করতে পারিনি। দ্বিতীয় পত্রখানা পাবার পর এ্যাডভোকেট আখতারুজ্জামান সাহেবকে পাঠালাম আত্মসমপর্ণের শর্ত নির্ধারণ ও মধ্যস্থা করার জন্য। সুবেদার ওয়ালীউল্লাকে পাঠালাম সতর্কতার সহিত আত্মসমর্পণ করানোর জন্য। পূর্বশর্ত অনুযায়ী রাজাকাররা লাইন ধরে অস্ত্র রেখে দু'হাত উপরে তুলে নায়েক ওয়ালীউল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করে। সংখ্যায় ছিল মোট ৩৭ জন রাজাকার ও ২৭ জন পুলিশ। কয়েকদিন তাদের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করার পর ৫/৭ জনকে ভাগ ভাগ করে মুক্তিবাহিনীর বিভিন্ন প্লাটুনে দেয়া হয়। এদের মধ্যে দু'জন পুলিশ পুনরায় বিশ্বাসঘাতকতা করে। অবশ্য তারা পুনরায় মাইজদিতে ধরা পড়লে সেখানেই গুলি করে শেষ করে দেয় নায়েক সুবেদার ওয়ালীউল্লা।

২৩শে অক্টোবর (প্রধান দালাল ননী চেয়ারম্যান ধৃত) : লক্ষ্মীপুরের প্রধান দালাল ননী চেয়ারম্যানের অত্যাচারে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম কর। লুটতরাজ, নারীধর্ষণ, গণহত্যা, বাড়ি পোড়ানো, হানাদার বাহিনীকে মুক্তিবাহিনীর সন্ধান দেয়াই ছিল তার পেশা। অবশেষে বীর সাহসী যোদ্ধা নায়েক সুবেদার ওয়ালীউল্লা জালালের প্লাটুন নিয়ে এই কুখ্যাত দালাল বাহিনীর উপর আক্রমণ করে জীবন্ত অবস্থায় বাঙ্গালীর বিশ্বাসঘাতক দালাল ননী চেয়ারম্যানকে বন্দী করে। তার বন্দী হবার খবর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লে কয়েক হাজার লোক সেখানে উপস্থিত হয়। সমস্ত মানুষের উপস্থিতিতে তার নিজ বন্দুক দিয়ে তাকে প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যা করা হয়। ক্রুদ্ধ জনতা তার লাশ নিয়ে কয়েক ঘন্টা ধরে গ্রামে গ্রামে ঘুরে মনের রাগ মিটায়।

২৯শে অক্টোবর (সোনাইমুড়ি-চাটখীল যুদ্ধ) : পাক বাহিনীর বেলুচ রেজিমেন্ট লাকসান থেকে কামান ও রকেটের সাহায্যে ফায়ার করতে করতে সোনাইমুড়ি থেকে চাটখীল সড়কের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। এমন সময় ছাত্রদলসহ আমরা বাধা দিলে তুমুল লড়াই শুরু হয়। প্রায় ২/৩ ঘন্টা যুদ্ধ চলে। শত্রুপক্ষের কয়েকজন হতাহত হয়। শত্রুরা শেলিং করে হতাহত সৈন্যদের পার করে। হানাদার বাহিনীর শেলিং-এ একই বাড়ির ৫ জন নিরীহ লোক মারা যায়।

১০ই নভেম্বর : চন্দ্রগঞ্জের নিকটবর্তী রাস্তায় মাইন বসানো হয়। পাকবাহিনীর এক ট্রাক আটা লক্ষ্মীপুরে যাবার সময় ট্রাকটি মাইনের আঘাতে নষ্ট হয় এবং ড্রাইভার নিহত হয়।

১৩ই নভেম্বর : আমার নিজ প্লাটুন নিয়ে লক্ষ্মীপুর রাজাকার ক্যাম্পে আক্রমণ করি। এ আকস্মিক আক্রমণে বহু রাজাকার হতাহত হয়। এখানে জনসাধারণ বিশেষভাবে আমাদেরকে সাহায্য করেন।

১৭ই নভেম্বর : সুবেদার ওয়ালীউল্লা মধ্যরাতে রামগঞ্জে অতর্কিত আক্রমণ করে রামগঞ্জের রাজাকার ক্যাম্প নিশ্চিহ্ন করে দেন।

২৯শে নভেম্বর : পশুবাহিনী একখানা ভ্যানে দু'জন স্ত্রীলোককে নিয়ে যাবার সময় বগাদিয়ার নিকট হাবিলদার আউয়াল গাড়িটি আক্রমণ করে। এ সময় পিছনের দিকে শত্রুবাহিনীর আরও কিছু সৈন্য সেখানে এসে উপস্থিত হয়। আমিও আমার প্লাটুন নিয়ে আক্রমণ করি। ২/৩ ঘন্টা যুদ্ধের পর তারা স্ত্রীলোক দুজনকে রেখেই পলায়ন করে। পরে উক্ত স্ত্রীলোকদ্বয়কে তাঁদের আত্মীয়দের নিকট পৌঁছিয়ে দেওয়া হয়।

৩০শে নভেম্বর : সাহেবজাদা পুল মেরামত করার সময় পাকবাহিনীর লোকজন হাবিলদার নূর মোহাম্মদ-এর হাতে মার খেয়ে পুল মেরামত করা বাদ দিয়ে পালিয়ে যায়।

১লা ডিসেম্বর : চন্দ্রগঞ্জ বাজারের সামান্য উত্তরে হাবিলদার রুহুল, আমি ও ছাত্র কমাণ্ডার সফি আলোচনা করছি। এমন সময় আহত ছোট একটি ছেলে এসে খবর দিলো যে পাঞ্জাবী সৈন্যরা চন্দ্রগঞ্জে আসছে। হাবিলদার রুহুল আমিনকে প্রস্তুতি নিতে বললাম। ইতিমধ্যে পাক-সৈন্য পৌঁছে গেছে। হাবিলদার রুহুল আমিন শত্রুদের

উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। এ সময় আমার হাতে কোন অস্ত্র ছিল না। শুধু আমার বাহিনীকে কমাণ্ড করতে লাগলাম। শুরু হলো তুমুল যুদ্ধ। ছাত্রদলের একমাত্র কমাণ্ডার সফি ও অন্যান্য কয়েকজন ব্যতীত সবাই সরে পড়লো। এ সময় আমি, ছাত্রদলের সফি এবং আওয়ামী লীগের বিশিষ্ট কর্মী আব্দুর রব চন্দ্রগঞ্জ বাজারের উত্তর-পূর্ব দিকে দাঁড়িয়ে যুদ্ধের পরিস্থিতি দেখছিলাম! হঠাৎ শত্রুবাহিনীর কয়েকজন সৈন্য আমাদের কাছাকাছি এসে পড়ে। আমরা পিছনে সরি। তখন এল-এম-জি টার্গেট আমাদের দিকে। ছাত্রনেতা সফির হাত থেকে এল-এম-জি'টা নিয়ে আমি তৎক্ষণাৎ একটা ব্রাশ মারলাম। ব্যাপারটা ঘটে গেল খুবই দ্রুত। মুহূর্তের মধ্যে গর্জে উঠলো পাকবাহিনীর আগ্নেয়াস্ত্রগুলো। ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটতে লাগল পাকবাহিনীর বুলেট। এ সময় আমার হাতের এল-এম-জি ম্যাগাজিনশূন্য। মৃত্যু অবধারিত ভাবলাম। কিন্তু এমন সময় আমাদের জোয়ানরা শত্রুদের উপর পিছন থেকে আক্রমণ করে, ফলে শত্রুরা ইতস্তত-বিক্ষিপ্তভাবে গুলি ছুড়তে থাকে। এমন সময়ে আমরা ক্রলিং করে পলায়ন করি। এভাবে আমরা মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পাই।

৪ঠা ডিসেম্বর : ইঞ্জিনিয়ার নায়েক আবুল হোসেন-এর নেতৃত্বে একদল মুক্তিযোদ্ধাকে নির্দেশ দিলাম যে তারা যেন সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ পুলগুলি ধ্বংস করে দেয়। তাদের সাহায্যের জন্য প্রত্যেক জায়গায় এ্যামবুশ পার্টি পাঠানো হলো। রাতে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ পুলগুলি ধ্বংস করা হলে পাকবাহিনী খুবই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং কুমিল্লার দিকে পালাতে থাকে। পলায়ন পর পাকসেনাদের সঙ্গে জায়গায় জায়গায় এ্যামবুশরত মুক্তিবাহিনীর খন্ড খন্ড যুদ্ধ হয়।

৫ই ডিসেম্বর : হাবিলদার আব্দুল লতিফকে এক প্লাটুন মুক্তিফৌজ দিয়ে লাকসাম-নোয়াখালী সড়কে শত্রুদের পলায়ন রোধ করার জন্য পাঠাই। কিন্তু তিনি ফিরে এসে জানালেন যে, আক্রমণের ভয়ে পাকবাহিনী রাস্তা ছেড়ে গ্রামের ভিতর দিয়ে পলায়ন করেছে।

৬ই ডিসেম্বর : হাবিলদার আব্দুল মতিন খবর পাঠালেন যে লক্ষ্মীপুর ও রায়পুরে তুমুল যুদ্ধের পর ১০৮ জন রাজাকারকে নিহত করে লক্ষ্মীপুর সম্পূর্ণরূপে শত্রুমুক্ত করা হয়েছে এবং রায়পুরও মুক্তিবাহিনীর আয়ত্তাধীন। এ খবর পাবার পর আমার জোয়ানদের মনোবল অনেকগুণ বেড়ে যায়।

৭ই ডিসেম্বর : এইদিন নোয়াখালীর রাস্তায় রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে হাজার হাজার আবালবৃদ্ধবনিতা। সকলের মুখে শ্লোগান আর শ্লোগান। হাতে স্বাধীন বাংলার পতাকা। নতুন সূর্যের উদয় হলো নোয়াখালীতে।

৩রা ডিসেম্বরের প্রোগ্রাম অনুযায়ী ভোর ছ'টায় আমরা আক্রমণ করলাম সোনাইমুড়ি। রাজাকারদের সাথে গুলি বিনিময় হচ্ছে। এদিকে হাজার হাজার জনতা বিজয় উল্লাসে মেতে উঠেছে। অবশেষে ৬৩ জন রাজাকারকে নিহত করে সোনাইমুড়ি দখল করা হলো। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, কোন এক অসতর্ক মুহূর্তে বীর যোদ্ধা হাবিলদার নূর মোহাম্মদ এবং ছাত্রনেতা সালেহ আহমদ এ যুদ্ধে শহীদ হন। সোনাইমুড়ি মুক্ত হবার পর আমরা বজরা আক্রমণ করি এবং বজরা মুক্ত করে চৌমুহনী অভিমুখে রওনা হই। এখানেও একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন। চৌমুহনী আক্রমণের কয়েক ঘন্টা পর বহু রাজাকার নিহত হয় এবং অবশিষ্ট রাজাকার আমাদের হাতে বন্দী হয়। চৌমুহনীতে স্বাধীন বাংলার পতাকা উড়তে থাকে।এসময় নায়েক সুবেদার ওয়ালীউল্লা ও শামসুল হক এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দেন এবং চৌমুহনী আক্রমণে সাহায্য করেন। এ সময় মেজর জাফর ইমাম চৌমুহনীতে তাঁর বাহিনী নিয়ে উপস্থিত হন এবং পরে যৌথ শক্তিতে মাইজদী আক্রমণ করে তা মুক্ত করা হয়।

এ যুদ্ধে আহত হয়ে আজও নায়েক সুবেদার ইসহাক ও হাবিলদার জালাল ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। এভাবে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধ শেষ হয়। আমাদের এ যুদ্ধে জনসাধারণ যথেষ্ট সাহায্য করেন, বিভিন্ন জায়গায় আশ্রয়, খাদ্য ও অন্যান্য সাহায্য করে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামকে

ত্বরান্বিত করেন। বাংলার মুক্তিযোদ্ধারা দীর্ঘ নয় মাসের যুদ্ধে এটাই প্রমাণ করেছে যে তারা কাপুরুষ নয়। তারা সম্মুখসমরে যথেষ্ট দক্ষতার অধিকারী।

স্বাক্ষরঃ সুবেদার মেজর লুৎফর রহমান
১৮-৯-৭৩

সাক্ষাৎকারঃ সুবেদার আবদুল ওয়াহাব বীর বিক্রম*

আমি এপ্রিল মাসেই ভারতের সোনামুড়াতে চলিয়া যাই এবং সেখান হইতে ক্যাপ্টেন গফফারের নেতৃত্বে দেবীপুর আসি। তখন 'সি' কোম্পানীর কমাণ্ডার ছিলেন ক্যাপ্টেন গফফার। আমি তখন 'সি' কোম্পানীর ৭নং প্লাটুনের প্লাটুন কমান্ডার ছিলাম। এইখানে পুরা কোম্পানী লইয়া আমরা কয়েকটা অপারেশন করি। আমি আমার নিজস্ব প্লাটুন লইয়াও ছোটখাট কয়েকটা অপারেশন করি।

১২-৪-৭১ তারিখে খবর পাইলাম যে ৭ জন পাকসৈন্য রেললাইন ধরিয়া শালদা নদীর দিকে অগ্রসর হইতেছে। তখন আমি আমার প্লাটুন লইয়া সেইদিকে অগ্রসর হই। গিয়াই দেখিতে পাই তাহারা অনেক দূর আগাইয়া গিয়াছে। তখন আমি আমার প্লাটুন লইয়া মন্দভাগ রেল স্টেশনের উত্তর দিকে দীঘিরপাড় নামক স্থানে এ্যামবুশ বসাই। তাহারা যখন পুনরায় ঐ রাস্তা হইয়া ফিরিতেছিল তখন আমরা তাহাদের উপর আক্রমণ করি। আমার আক্রমণে সেখানে ১৮ জন নিহত হয়, ৯ জন আহত হয়। বাকী লোক পলায়ন করিতে সক্ষম হয়, পরে আমরা দেবীপুর চলিয়া যাই।

২৫-৪-৭১ তারিখে ২২ জন জোয়ান লইয়া বাংলাদেশে প্রবেশ করি। চালনা নামক গ্রামে আসার পর আমাদের রাত্রি হইয়া যায়। তাই সেখানকার জনগণের সহযোগিতায় সেখানেই রাত্রি যাপন করি। পরের দিন ভোর ৪টার সময় সেখান হইতে রওয়ানা হইয়া শিতলাই নামক গ্রামে যাই। সেখান হইতে আমি নিজে গিয়া সি-এন্ড-বি রোড রেকি করিয়া আসি। রাত্রিতে শালঘর নামক স্থানে সি-এন্ড-বি রাস্তায় এ্যামবুশ লাগাই। রাত্র ১১টার সময় কুমিল্লা হইতে ২৭ খানা গাড়ি লইয়া পাকসৈন্য সিলেটের দিকে অগ্রসর হইতে থাকিলে আমি আমার প্লাটুন লইয়া তাহাদের উপর হামলা চালাই। আমার এই আক্রমণে তাহাদের ১০টা গাড়ি সম্পূর্ণরূপে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ৮টি গাড়ি আংশিক ক্ষতি হয়। তাহাতে বহু পাকসৈন্য হতাহত হয়। বাকীগুলি চলিয়া যায়। পরের দিন সকাল ১০ ঘটিকার সময় পুনরায় আমি দেবীপুর চলিয়া আসি।

১৩-৫-৭১ তারিখে খবর পাই যে প্রায় ২০০ জন পাকসৈন্য রেল লাইন হইয়া গাড়িতে করিয়া শালদা নদীর দিকে অগ্রসর হইতেছে। তখন আমি আমার প্লাটুন লইয়া মন্দভাগ রেল স্টেশনে গিয়া তাহাদের উপর আক্রমণ করি। আমাদের আক্রমণে প্রায় ২৫ জন মারা যায়, বাকীগুলি তখন পজিশন নেয়। এমতাবস্থায় তাহাদের মালপত্রের গাড়িতে আগুণ লাগিয়া যায়। তখন তাহারা সেখান হইতে পলায়ন করে। এই আগুন তিনদিন পর্যন্ত জ্বলিতেছিল।

১৭-৫-৭১ তারিখে আমি আমার প্লাটুন লইয়া পৃথক হয়ে পড়ি। তখন আমার কমাণ্ডে ৫০ জন লোক ছিল। তাহাদেরকে লইয়া মন্দভাগ (কোনাবন) রেল স্টেশন এরিয়ায় ডিফেন্স করি।

২১-৫-৭১ তারিখে পাকসৈন্যরা ২টা গাড়ি লইয়া শালদা নদীর দিকে অগ্রসর হইতে থাকিলে আমি তাহাদের উপর আক্রমণ করি। তাহাতে তাহাদের ২টা গাড়ি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয় ও ৯ জন সৈন্য মারা যায়।

১৮-৬-৭১ তারিখে ৪০ জন সৈনিকের একটি পেট্রোল পার্টি তাহাদের বিজলী তার মেরামতের জন্য শালদা নদী হইতে কসবার দিকে অগ্রসর হইতে থাকিলে আমি আমার জোয়ান লইয়া তাহাদের উপর অতর্কিতভাবে

* বাংলা একাডেমীর পক্ষ থেকে এ সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়।

আক্রমণ চালাই। আমার এই অতর্কিত আক্রমণে ৯ জন পাকসৈন্য নিহত হয়। বাকী সৈন্যগণ আমাদের তীব্র আক্রমণে টিকিতে না পারিয়া পিছন হটে।

২০-৬-৭১ তারিখে আমরা আমাদের মন্দভাগ ডিফেন্স ছাড়িয়া পূর্বোল্লোখিত ডিফেন্স দেবীপুর চলিয়া যাই। তখন বর্তমান মেজর গফফার সাহেব সেখান হইতে ডিফেন্স লইয়া বেলুনিয়ার দিকে চলিয়া যান। দেবীপুর যাওয়ার পর আমার জোয়ানের সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ২০০ জন।

২৭-৬-৭১ তারিখে ১৮ জন পাকসৈন্য কসবা হইতে ইমামবাড়ির দিকে যাইতেছিল। তখন আমি আমার ১২ জন জোয়ান লইয়া কসবা রেল স্টেশনের নিকট তাহাদের উপর আক্রমণ করি। আমার এই আক্রমণে তাহাদের ১৭ জন সৈনিক নিহত হয়। মাত্র ১ জন সৈনিক বাঁচিয়া যায়। আমরা তখন তাহাদের লাশ আনিবার জন্য অগ্রসর হইলে কসবা হইতে পাকসৈন্যর আর একটি পার্টি ফায়ার করিতে করিতে অগ্রসর হইলে আমরা পিছন হটি। পরে এখান হইতে কিছু অস্ত্র উদ্ধার করি।

৮-৭-৭১ তারিখে বর্তমান মেজর গফফার সাহেব বেলুনিয়া হইতে ফিরিয়া আসিয়া কোনাবনে পুনরায় হেডকোয়ার্টার স্থাপন করে।

৯-৭-৭১ তারিখে গফফার সাহেব দেবীপুর হইতে আমার প্লাটুনকে কোনাবন লইয়া আসেন। ঐ তারিখ রাত্রিতেই আমি গফফার সাহেবকে বলি যে পাঞ্জাবীরা রেশন লইয়া প্রতি সপ্তাহে শালদা ও মন্দভাগের দিকে যায়। আমি সেখানে গিয়া তাহাদেরকে আক্রমণ করিব।

১০-৭-৭১ তারিখেই আমি ১৮ জন লোক লইয়া শালদা নদীর দিকে অগ্রসর হই। মঈনপুর নামক জায়গায় গিয়া দেখিতে পাই কয়েকখানা নৌকা ও স্পীডবোট লইয়া তাহারা মন্দভাগের দিকে অগ্রসররত। তখন আমি তাহাদের হইতে ১৩শত গজ দূরে। তাই ঐ সময় তাহাদেরকে আক্রমণ করিতে পারি নাই। পরে আমি নিজে গিয়া এ্যামবুশ লাগাইবার জায়গা রেকি করিয়া আসি। পরে আমার জোয়ানদেরকে লইয়া সেখানে এ্যামবুশ বসাই। বিকাল আড়াইটার সময় তাহারা ফিরিতেছিল। তখন আমি তাহাদের ঋপর আক্রমণ চালাই। ঐ সময় তাহারা আমার নিকট হইতে ২৫ গজ দূরে ছিল। তাহাদের স্পীডবোটে ২ জন লেঃ কর্নেল, ২ জন মেজর, ২ জন ক্যাপ্টেন, ১ জন নায়েব সুবেদার, ৩ জন সিপাই ও ১ জন অবাঙ্গালী ব্যবসায়ী। আমার তীব্র আক্রমণে তাহাদের স্পীডবোট ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়ে। ফলে সবাই নিহত হয়। এখান হইতে ১টা অতি প্রয়োজনীয় ম্যাপ, ১টা ওয়ারলেস সেট, তিনটা MG.I.A-3 সহ আরো কয়েকটি অস্ত্র উদ্ধার করি। আমরা চালিযা যাওয়ার পর পাকসৈন্য আসিয়া তাহাদের মৃতদেহ উদ্ধার করে। পরে তাহারা জানিতে পারে যে ক্যাপ্টেন বোখারীসহ অন্যান্য উচ্চপদস্থ অফিসারদিগকে আমি হত্যা করিয়াছি- তখন তাহারা ঐ এলাকায় প্রকাশ করে যে, যে লোক সুবেদার ওয়াহাব সাহেবের মৃত লাশ লইয়া আসিবে তাহাকে ৫০ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে।

১৮-৭-৭১ তারিখে নওগাঁ নামক জায়গায় পাক ডিফেন্সের ও-পি পোস্টে আক্রমণ করি। প্রকাশ থাকে যে, ঐদিন ২ জন অফিসার, ১ জন জেসিও ও তিনজন সান্ত্রী তাহাদের ওপি পোস্টে আসিয়া চারিদিক লক্ষ্য করিতেছিল। ঐ সময়ই আমি তাহাদের উপর আক্রমণ চালাই। আমার তীব্র আক্রমণে ২ জন অফিসার, ১ জন জেসিও ও ২ জন সিপাই নিহত হয়। বাকী একজন সিপাই আহত হইয়া ওপি পোস্ট-এর উপর হইতে নিচে পড়িয়া যায়।

৭-৮-৭১ তারিখে আমি আমার প্লাটুন লইয়া মন্দভাগ গ্রাম এলাকায় পাকবাহিনীর শক্ত ডিফেন্সের উপর আক্রমণ চালাই। আমার তীব্র আক্রমণে পাক বাহিনী তাহাদের প্রায় ১০০টি বাঙ্কার ছাড়িয়া পিছু হটে। যাওয়ার পথে তাহারা বহু এ্যামুনিশন ফেলিয়া যায়। আমার এই আক্রমণের সময় মেজর আজিজ পাশা তাহার মুজিব ব্যাটারী ও বর্তমান সুবেদার মেজর শামসুল হক তাহার ৩" মর্টারের সাহায্যে সর্বপ্রকার সাহায্য করেন।

২৪-৮-৭১ তারিখে আমি কয়েকজন জোয়ান লইয়া সিএন্ডবি রোডের কালামুড়া ব্রীজ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিয়া ফেলি। এখানে যত রাজাকার ছিল তাহারা আমাদের সহিত একত্রিত হয়। তাহাদেরকে কোনাবন পাঠাইয়া দিয়া আমরা কালুমুড়া ব্রীজের ২ মাইল দক্ষিণে মাধবপুর ও মীরপুরের মাঝখানে এ্যামবুশ করি। তারপর দেখা যায় পাকসৈন্য ভর্তি ২টা স্টেট বাস, তিনটা জীপ ও ২টা ডজ অগ্রসর হইতেছে। তখন আমি আমার প্লাটুন লইয়া তাহাদের উপর প্রচন্ড আক্রমণ চালাই। আমার এই তীব্র আক্রমণে ৭টা গাড়ি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইয়া যায়। তাহাদের বহু সৈনিক মারা যায়। ৪ জন পাকসৈন্যকে অস্ত্রশস্ত্রসজ জ্যান্ত ধরিয়া ফেলি। পরে রাজাকারটাকে রাখিয়া বাকী তিনজন পাকসৈন্যকে ভারতে পাঠাইয়া দেই।

২৮-৮-৭১ তারিখে কোম্পানীগঞ্জ হইতে প্রায় ১৫০ জনের মত রাজাকার ও পাকসৈন্য মহেশপুর লুটপাট করার জন্য আসে। আমি তখন তাড়াতাড়ি আমার পার্টি লইয়া গ্রামটির চারিদিকে এ্যামবুশ করিয়া তাহাদের উপর আক্রমণ চালাই। আমাদের এই আক্রমণ বিকাল ৫ ঘটিকা পর্যন্ত চলে। শেষে আমাদের আক্রমণের ৪ জন পাকসেনা নিহত হয়। বাকী সবাই লুটের মাল ফেলিয়া পলায়ন করিতে সক্ষম হয়। বিকাল ৫ ঘটিকার সময় আমরা কোনাবনের দিকে অগ্রসর হই। কিছুদূর যাওয়ার পর দেখিতে পাই মীরপুর ও মাধবপুর এলাকা পাকবাহিনী জ্বালাইয়া দিতেছে। অনেক দূর হইতে শুধু আগুনের লেলিহান শিখা ও ধোঁয়া দেখা যাইতেছিল। তখন আমরা সেইদিকে রওয়ানা হই। মাধবপুর উপস্থিত হইয়া অতি তাড়াতাড়ি এ্যামবুশ পাতিয়া তাহাদের উপর আক্রমণ চালাই। আমাদের আক্রমণে তাহারা পিছু হটে-কিছুসংখ্যক লোক সেখানে হতাহতহ হয়। রাত্রি ১০টার দিকে আমরা চালনা নামক গ্রামের এক বাড়িতে গিয়া উঠি তখন তাহারা তাড়াতাড়ি আমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করে। খাওয়া-দাওয়ার পর রাত্র ৩ ঘটিকার সময় আমাদের ডিফেন্স মন্দভাগে ফিরিয়া আসে।

৩০-৮-৭১ তারিখে খবর পাইলাম যে, চালনা গ্রামে পাক-বাহিনী প্রবেশ করিয়া ডিফেন্স করিয়াছে। এই খবর পাইয়া ঐ দিনগত রাত্রিতেই আমি আমার ৫০ জন জোয়ান লইয়া সেখানে গিয়া উপস্থিত হই। সুবেদার শামসুল হক সাহেবও তখন ২টা মর্টারসহ ১টি সেকশন লইয়া আমাকে সাহায্য করার জন্য আসেন। ভোরের দিকে আমি তাহাদের উপর গুলি শুরু করি। আমার চারিদিকের আক্রমণে ১৩ জন রাজাকার সাঁতরাইয়া পালাইয়া যায়। সারাদিন যুদ্ধ চলার পর রাত্রির অন্ধকারে কয়েকজন পাকসৈন্য পালাইয়া যায়। বাকি ১ জন ক্যাপ্টেন, ১৫ জন সিপাই, ২৯ জন রাজাকার ঘটনাস্থলেই মারা যায়। এখানে আমরা ৭টি বড় নৌকা মালসহ দখল করিয়া ফেলি। ৬টা এলএমজি, ম্যাগাজিন বাক্স ৬টা, এলএমজি ম্যাগাজিন ৭২টা, রাইফেল ১২টা, ৮১০টা বুলেট উদ্ধার করি। সাঁতরাইয়া যাওয়া রাজাকারদের ভিতর শিতলাই গ্রামের জনগণ ৬ জনকে খতম করিয়া ফেলে। বাকী রাজাকারদেরকে আবদুল হক কোনাবন পৌঁছাইয়া দেয়। শেষে আমরা চালনাতেই ডিফেন্স করি।

২-৯-৭১ তারিখে পাকসৈন্যরা নৌকাযোগে চারিদিকে জ্বালাইতে আমাদের দিকে অগ্রসর হয়। তাহারা জয়ধ্বনি দিতে দিতে আগাইয়া আসিতেছিল। তাহারা যখন আমাদের এ্যামবুশের ভিতর আসিয়া পড়ে-তখন আমরা তাহাদের উপর আক্রমণ চালাই. আমাদের তীব্র আক্রমণে তাহাদের তিনখানা নৌকা ডুবিয়া যায়। বহু পাকসৈন্য নিহত হয়। শেষে তাহারা আর্টিলারীর সাহায্যে আমাদের উপর ভীষণ ফায়ার চালায়। এই আক্রমণে আমাদের পক্ষে আজাহার আলী শহীদ ও সিপাই আবদুস সাত্তার আহত হন। সেখানে সারাদিন রাত্রি থাকার পর ৩-৯-৭১ তারিখে আমরা আমাদের ডিফেন্স তুলিয়া কোনাবন চলিয়া যাই।

১৫-১০-৭১ তারিখে আমাদের প্রায় ১ ব্যাটালিয়নের মত মুক্তিযোদ্ধা শালদা নদী পাক ডিফেন্স তোলার জন্য চেষ্টা করে কিন্তু পারে নাই। তাহাদের পিছনে তখন মুজিব ব্যাটারী ছিল। শেষে তাহারা অকৃতকার্য হইয়া পিছনের দিকে চলিয়া যায়। ঐ সময় আমার অসুখ থাকায় আমি তাহাদের সহিত যোগদান করিতে পারি নাই।

১৮-১০-৭১ তারিখে বিকালে আমি আমার প্লাটুন লইয়া মন্দভাগ বাজারের পশ্চিম দিকে দেউশ নামক জায়গায় ডিফেন্স লই। ১৮-১০-৭১ তারিখে ১ কোম্পানী পাকসৈন্য অন্যদিকে যাওয়ার পথে আমাদের ডিফেন্সের

মাঝে আটকাইয়া যায়। তখন আমি আমার প্লাটুন লইয়া তাহাদের উপর আক্রমণ চালাই। আমাদের আক্রমণে ১ জন মেজর, ১ জন লেঃ সহ প্রায় ১০০ জন পাকসৈন্য নিহত হয়। চারজন আহতকে চিকিৎসার জন্য কোনাবন পাঠাইয়া দেই। ঐ দিন আমরা পাকবাহিনীর বহু মৃত লাশ উদ্ধার করি। পাক বাহিনীর মৃত লাশ ১ দিন পর ভাসিতেও দেখা গিয়াছে। পাক-বাহিনীর মৃত লাশ হইতে আমরা বহু টাকা-পয়সা, ঘড়ি-কলম উদ্ধার করি। এগুলি আমার জোয়ানদেরকে দিয়া দেই। সেখানে আমরা ৬টি এমজিআই-এ-৩, ৭টি এলএমজি, ৭০টা জি-৩ রাইফেল, ১টা ৬০ এমএম মোটর, ৩টা ৮৩ এম-এম-বি-সি, ১টা অয়ারলেস সেট, ৩টা টেলিফোন, ৩টা ২" মর্টার, একজন হাবিলাদারের পকেট থেকে ৩শত ডলার, কয়েকটা ট্রানজিষ্টার উদ্ধার করি। পরদিন সকালে পাকবাহিনী আমাদের উপর বিমান হামলা করে। তাহাতে আমাদের কোন ক্ষয়ক্ষতি হয় নাই। এ সময়ও তাহারা আমাকে ধরিয়া দিবা জন্য ৫০ হাজার টাকা ঘোষণা দেয়। প্রকাশ থাকে যে, ১৯ তারিখেই আমাকে ৪র্থ বেঙ্গলের 'সি' কোম্পানীর কমাণ্ডারের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

২৩-১১-৭১ তারিখে আমি আমার পুরা কোম্পানী লইয়া শালদা নদীতে তিন দিক হইতে আক্রমণ করি। আমি নিজে ৮নং প্লাটুন লইয়া তাহাদের পাকা ডিফেন্সের উপর হামলা চালাই। আমি তখন একটা এলএমজি ও অয়ারলেস সেট বহন করিয়া চলিতাম। ৬০ এমএম ও ২" মর্টার বহন করার জন্য অন্য লোক ছিল। আমি নিজে আমার এই অস্ত্রের সাহায্যে তাহাদের ৫টি পাকা বাঙ্কার উড়াইয়া দেই। আমাদের এই আক্রমণের মাঝেই আমি বর্তমান মেজর গফফার সাহেবের সহিত অয়ারলেসে আলাপ করিতেছিলাম। ঐ সময় আমার অয়ারলেসে পাকসেনাদের কথা ধরিতে পারি। তখনই আমি অয়ারলেসের মাধ্যমে পাকসেনাদের গালি দিতে থাকি এবং বলি যে, তোরা আমাদেরকে জানিস না, আমরা বেঙ্গল রেজিমেন্টের লোক-তখন পাকসেনারা ভয় পাইয়া পিছনে হটিতে থাকে। এই সুযোগে আমরা তাহাদের উপর আরো প্রচণ্ড বেগে আক্রমণ চালাই। তখন তাহারা আরো তাড়াতাড়ি পিছন হটে। আমাদের এই আক্রমণে ৫০জন পাকসৈন্য নিহত হয়। ১ জন রাজাকারসহ চারজন পাকসেনাকে বন্দী করিয়া ফেলি। পাক-বাহিনী হটিয়া যাবার পর আমরা এখান হইতে বহু অস্ত্র শস্ত্র ও মালামাল উদ্ধার করি।

সাক্ষাৎকারঃ সুবেদার গোলাম আম্বিয়া

৭ই জুন এক এ্যামবুশে ৩ জন পাকসেনা নিহত হয়। ১২ই জুন সিংগারবিল এলাকায় এ্যামবুশে ১৩ জন পাকসেনা নিহত ও ২ জন আহত হয়। ১৬ই জুন এক এ্যামবুশে ৪ জন পাকসেনা নিহত হয়। ২০শে জুন আর এক এ্যামবুশে ২ জন নিহত হয়। ২৩শে জুন রাজাপুর ব্রীজ মেরামতকারী দলের উপর আমরা এ্যামবুশ করি। এতে ২/৩ জন সাধারণ নাগরিকসহ ২৭ জন মারা যায়। কয়েকজন আহত হয়। ২৪শে জুন কাশিমপুর এলাকায় এ্যামবুশে ১৭ জন নিহত হয়। ঐ তারিখে রুপা এলাকায় এ্যামবুশে২৮ জন নিহত হয়। ২৫শে জুন কালাছড়া চা বাগান এলাকায় আমরা আক্রমণ করি। এই আক্রমণে তাদের ৪৪ জন নিহত হয়। ২৬শে জুন রেইডে ঐ এলাকায় তিনজন নিহত হয়। ২৭শে জুন আর এক এ্যামবুশে ওদের ১৬ জন নিহত হয়।

২রা জুলাই রুপা গ্রাম এলাকায় এ্যামবুশে ১৯ জন নিহত হয়। ৪ঠা জুলাই সিংগারবিল ব্রীজ মেরামত করতে সাধারণ নাগরিকসহ ৩০ জন নিহত হয়। কালাছড়া চা-বাগান এলাকায় এক রেইডে ৪ জন নিহত হয়। ১২ জুলাই মেজর খালেদ মোশররফ আমাকে দুটো প্লাটুন নিয়ে কুলাপাথর যাবার নির্দেশ দেন।

শালদা নদী এলাকায় ক্যাপ্টেন গফফারের নেতৃত্বে দুটো কোম্পানী ছিল। তাদের শক্তি বৃদ্ধির জন্য আমাকে কুলাপাথরে পাঠানো হয়। চট্টগ্রাম-আখাউড়া রেলওয়ে যোগাযোগ ব্যাহত করার জন্য আমি এক প্লাটুন নিয়ে কোনাবনে আসি। চাটুয়াখোলা প্লাটুন হেডকোয়ার্টার ছিল। ক্যাপ্টেন গাফফার আমাকে পেয়ে খুব খুশী হন।

১৬ই জুলাই চাটুয়াখোলা থেকে এক এ্যামবুশে একজন ক্যাপ্টেনসহ ৭ জন পাকসেনা নিহত হয়। আমাদের হাবিলদার তৈয়ব আলী গুলির আঘাতে শহীদ হন।

৯ই আগস্ট পানিয়ারুপে এ্যামবুশে ১৪ জন পাকসেনা নিহত হয়। ১২ই আগস্ট লক্ষ্মীপুর গ্রাম এলাকায় এ্যামবুশে ৪ জন পাকসেনা নিহত হয়।

২৪শে আগস্ট কালামুড়া ব্রীজ ধ্বংস করা হয়। ৭ জন রাজাকারকে রাইফেলসহ ধরা হয়। ২৭শে আগস্ট পাক দালাল তবদীল হোসেনকে ধরা হয় এবং বিস্ফোরকের সাহায্যে উড়িয়ে দেয়া হয়। সে আশেপাশে ২৯ জন যুবতীকে পাক অফিসারদের সরবরাহ করেছিল। তাকে মেরে তার ছেলেমেয়েকে খবর দেয়া হয়েছিল। তার মেয়ে এসে আমাকে বলে যে সে আমার পিতা নয়। ২৮শে আগস্ট মাইজবার গ্রামে এক রেইডে ৩৬ জন পাকসেনাকে খতম করা হয়। ২৯শে আগস্ট একটি রাজাকারকে রাইফেলসহ ধরা হয়।

২২শে আগস্ট শ্রীপুর এলাকায় এ্যামবুশে ২ জন পাকসেনা খতম হয়। ২৫শে সেপ্টেম্বর লক্ষ্মীপুরে ২ জন খতম করা হয়। ২৭শে সেপ্টেম্বর ১ জনকে খতম করা হয়। ৯ই অক্টোবর রেইডে লক্ষ্মীপুর এলাকায় ৪ জন পাকসেনা খতম করা হয়। ১৫০০ এ্যামুনিশন, ১২টা গ্রেনেড, ৬টা চীনা রাইফেল, একটা স্টেনগান উদ্ধার করা হয়। ১০ই অক্টোবর পানিয়ারুপে, ৮ জনকে হত্যা করা হয়, রেইডে চালানো হয়। একজন সিপাহী মমতাজ শাহাদত বরণ করেন। ১৯শে অক্টোবর কামালপুর রেইডে ৪ জন নিহত হয়। ২১শে অক্টোবর কামারপুর এলাকায় একজন পাক অফিসার, একজন অপারেটরকে হত্যা করা হয়। রেইডে ২৪শে অক্টোবর কামালপুর এ্যামবুশে ৩ জনকে হত্যা করা হয়। ২৬শে অক্টোবর কামালপুর এলাকায় ৪ জনকে হত্যা করা হয়। ৩১শে অক্টোবর লক্ষ্মীপুর এলাকায় ৪ জন রাজাকারকে হত্যা করা হয়।

২রা নভেম্বর মঙ্গনপুরে ৫ জন পাকসেনা ও ৩ জন রাজাকারকে হত্যা করা হয়। ১১ই নভেম্বর মঙ্গনপুর ও কামালপুরে দুটো অপারেশনে মর্টারের সাহায্যে ১৬ জন পাকসেনা নিহত ও ১২ জন আহত হয়। ২০শে নভেম্বর লক্ষ্মীপুর ও মঙ্গনপুর রেইডে ৬ জন পাকসেনা ও ২ জন রাজাকার নিহত হয়। ২১শে নভেম্বর লক্ষ্মীপুরে মর্টারের সাহায্যে রেইডে ৭ জন পাকসেনা নিহত হয়। ১১০০ এ্যামুনিশন ও একটি চীনা রাইফেল উদ্ধার করা হয়। ঐদিনই আমাদের আর্টিলারী ফায়ারে ওদের ১১ জন নিহত হয় মঙ্গনপুর এলাকাতে। ২২শে নভেম্বর তাদের আর্টিলারী ফায়ারে তারু মিয়া আমাদের একজন ইপিআর শাহাদত বরণ করে। ২৪শে নভেম্বর পানিয়ারূপে এ্যামবুশে ১০ জন পাকসেনা নিহত হয়। ২৫শে নভেম্বর লক্ষ্মীপুর এ্যামবুশে ৩ জন নিহত হয়।

১৩ই ডিসেম্বর ধবম নামক (নাজিরহাট) জায়গায় ডিফেন্স করি। ১৪ই ডিসেম্বর নাজিরহাটে রেইড করা হয়। ১৩ জন পাকসেনা নিহত হয়। ১৬ই ডিসেম্বর নাজিরহাট দখল করি এবং পাকসেনারা আত্মসমর্পণ করে।

স্বাক্ষরঃ সুবেদার গোলাম আম্বিয়া
২০-৭-৭৬

সাক্ষাৎকারঃ মেজর দিদার আতাউর হোসেন*

অক্টোবরে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অফিসার হওয়ার পর আমাকে ‘কে’ ফোর্সের অন্তর্ভূক্ত করে যুদ্ধ এলাকায় পাঠানো হলো। নভেম্বরের ১/২ তারিখের রাতে তুমুল বৃষ্টির মধ্যে আমাদের ৩টা কোম্পানী এবং ২য় বেঙ্গলের আরও ১টা কোম্পানী নিয়ে বেলুনিয়া পকেটে যেতে হয়। পরশুরাম ও ফুলগাজীর মাঝামাঝি পাকিস্তানীদের দুটি ক্যাম্পের মধ্যে প্রায় ১২শ গজের ‘গ্যাপ’ ছিল। এই গ্যাপের মধ্য দিয়ে রাতারাতি বাঙ্কার খুঁড়ে আমরা অবস্থান নিয়ে ফেলি। ভোরবেলা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একটা পেট্রোল পার্টি এই পথে আসে। এই পেট্রোল পার্টি আসছিল ফেনী ও বেলুনিয়া রেল লাইন দিয়ে একটি ট্রলিতে করে। ট্রলি যখন ঠিক আমাদের পজিশন-এর ১০০ গজ দূরে এসে পড়ে তখনই তাদের উপর আমরা হামলা চালাই। ট্রলিতে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একজন লেফটেন্যান্ট ছিল। তার সাথে আরও দশজন ছিল। তাদের সবাইকে ওখানে আমরা ঘায়েল করি। পাকিস্তান

* প্রকল্প কর্তৃক ২০-৭-৮০ তারিখে গৃহীত সাক্ষাৎকার।

সেনাবাহিনীর পজিশন ছিল উত্তর দিকে বেলুনিয়া, দক্ষিণ দিকে ফুলগাজী এলাকা। তারা ধরে নিয়েছিল এটা বোধ হয় একটা মুক্তিবাহিনীর এ্যামবুশ। গোলাগুলির সঙ্গে সঙ্গে ফুলগাজী থেকে পাকিস্তানীদের রিইনফোর্সমেন্ট চলে আসে। প্রায় ৪০/৫০ জন পাকসৈন্য আমাদের দিকে এগুতে থাকে হামলা চালানোর জন্য। ওরা যখন আমাদের রেঞ্জ-এর মধ্যে চলে আসে তখন আমাদের সম্পূর্ণ ডিফেন্স-রেল লাইনের পূর্ব-পশ্চিম দিক এবং বেলুনিয়া ফেনী সড়ক যেটা রেল লাইনের সমান্তরাল-এই দুই পজিশন থেকে একই সঙ্গে আমরা আক্রমণ চালাই। আক্রমণে পাকিস্তানীদের ৪০ জনেরও বেশী হতাহত হয় এবং ৬/৭ জন বোধ হয় পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। এই সকল এ্যামবুশে আমাদের পিছনে যে পাকিস্তানী পজিশন ছিল তারা শঙ্কিত হয়ে পড়ে। এবং তারা আমাদের মধ্য দিয়ে 'ব্রেক থ্রো' করার চেষ্টা করে। তারা সেইদিন রাতেই পালাবার চেষ্টা করে, কিন্তু ব্যর্থ হয়। পাকিস্তানীদের বেশীর ভাগই আমাদের হাতে ধরা পড়ে এবং সেদিন রাতেই ভারতীয় গোলন্দাজ বাহিনী পাকিস্তানী পজিশন-এর উপর প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ করে। পরের দিন বেলুনিয়া থেকে পরশুরাম পর্যন্ত সম্পূর্ণ এলাকাটি হানাদার বাহিনীমুক্ত হয়। এটা ছিল নভেম্বরের ঘটনা।

প্রশ্নঃ পরবর্তীতে সব সময়ই কি এটা আপনাদের দখলে ছিল?

উত্তরঃ বস্তুতপক্ষে এর আগেও এই এলাকা আমাদের দখলে ছিল। বেলুনিয়ায় মুহুরী নদীর পশ্চিম দিক থেকে নিয়ে শালদা নামে একটা স্থান পর্যন্ত বলা যায় সব সময়ই আমদের দখলে ছিল। আর বর্তমান এলাকা দখলের পর আমাদের এলাকা প্রায় তিনগুণ বেড়ে গেল। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, এই এলাকাতে আমরা যখন তিনদিন পর্যন্ত একটানা পাকিস্তানী বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করি তখন পাকিস্তান বিমান বাহিনীর বিমান আমাদের উপর হামলা চালায়। সেই বিমান হামলায় আমাদের দশ/বার জনের মত সৈন্য শহীদ হয় এবং ১৫/১৬ জনের মত আহত হয়।

এখানে আমাদের ডিফেন্স খুব স্ট্রং ছিল এবং মনোবলও খুব দৃঢ় ছিল। সেই অটুট মনোবলের জন্যই সময়মত এবং যথাযথ খাওয়া-দাওয়া না পেলেও সৈন্যরা সাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধ করে গেছে। পরবর্তী সময়ে ইন্ডিয়ান কোর-কমান্ডার স্বগত সিং ব্যক্তিগতভাবে আমদের এলাকা পরিদর্শনে আসেন এবং কমাণ্ডিং অফিসারদের অভিনন্দন জানান।

প্রশ্নঃ খাদ্যের ব্যাপারে আপনাদের কি রকম অসুবিধা ছিল? খাবার কি ঠিকমত সরবরাহ হতো না?

উত্তরঃ আমরা খাবার পেতাম। আমদের ব্যাটালিয়নের খাবার দেওয়ার দায়িত্ব ছিল ইন্ডিয়ানদের তরফ থেকে। তবে আমাদের ব্যাটালিয়নের যত সৈন্য 'অথরাইজড্' ছিল তার দ্বিগুণ লোক আমাদের ব্যাটালিয়নে ছিল। এর কারণ ছিল। মুক্তিবাহিনীর বিভিন্ন ক্যাম্প থেকে আমরা লোকজন সংগ্রহ করতাম এবং তাদেরকে আমাদের সঙ্গে রাখতাম। ফলে আমাদের সবাইকে মাসিক যে ভাতা দেওয়া হতো সেটা এবং যে খাবার নির্দিষ্ট ছিল তা থেকে শেয়ার করতে হতো।

বেলুনিয়ায় নোয়াখালীর এমপি খাজা আহাম্মদ (আওয়ামী লীগের) এবং তাঁর লোকজনের সঙ্গে আমাদের খুব একটা সৌদার্য ছিল না। ফলে বেলুনিয়ার আওয়ামী লীগের তরফ থেকে তেমন কোন সহযোগিতা পাইনি। তবে বেলুনিয়ার স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছ থেকে সব সময় খুবই সহযোগিতা পেতাম। এ সময়ের একটা ঘটনার কথা আমার মনে পড়ে। আমাদের সৈন্যরা গিয়ে একটা এ্যামবুশ করে পাকিস্তানী পজিশনের পেছনে, সেটা ছিল অক্টোবরের শেষের দিকে। নিলকি নামে একটা গ্রাম ছিল, সেখানে পাকিস্তানীদের বিশ ক্ষতি হয়। সেই গ্রামে আমি ছিলাম, সংঘর্ষের পর আমি যখন চলে আসি, সেইদিনই অর্থাৎ পরদিন ভোরবেলা পাকিস্তান সেনাবাহিনী সেই গ্রামটা জ্বালিয়ে দেয় এবং ৪০/৫০ জন লোককে নৃশংসভাবে হত্যা করে। তার মধ্যে ১৪ বৎসরের ছেলে ও আশি বৎসরের বৃদ্ধ ছিল। এই খবরটা পাওয়ার আমি মানসিকভাবে খুব দুঃখ পাই এবং রাতের বেলা আবার ফেরত যাই সেই

গ্রামে। গ্রামবাসীরা আমাদের দেখে শোকে ভরাক্রান্ত না হয়ে তারা আমাদেরকে আরও উৎসাহিত করতে থাকে। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও তারা আমাদের সর্বপ্রকার সাহায্যের হাত বাড়িয়েছে।

সেই রাতে একজন বৃদ্ধা তিনি তার গরুর দুধ দুইয়ে আমাদেরকে দিলেন। অথচ তাঁরই নাতিকে সকালে পাকিস্তানী সৈন্যরা মেরে ফেলেছে। তিনি বলছিলেন যে, আমার নাতি গেছে তো কি হয়েছে। দেশ যদি একদিন স্বাধীন হয় তবে আমি সবাইকে ফিরে পাব। তোমাদের মাঝেই আমার নাতিকে পাব। গ্রামবাসীদের এই মনোবল আমাদেরকে শত্রুহননে আরও উৎসাহিত করে।

প্রশ্নঃ আমরা এমনও শুনেছি যে, মুক্তিবাহিনী গ্রাম থেকে আক্রমণ চালালে পরবর্তী পর্যায়ে পাকিস্তানী সৈন্য সেই গ্রামে হামলা চালাতো, সেই কারণে গ্রামবাসীরা খুব ভয়ে ভয়ে থাকতো। কিন্তু পরে যখন মুক্তিবাহিনীর বিজয় হওয়া শুরু হলো তখন গ্রামবাসীরা দ্বিগুণ উৎসাহে সাড়া দিতে লাগলো। আপনাদের এই বিজয়গুলি গ্রামবাসীদের মনে কি রকম সাড়া জাগিয়েছিল?

উত্তরঃ এই প্রশ্নে আমি শুধু বলবো, বেলুনিয়ার পর থেকে ফেনী এবং পরবর্তী পর্যায়ে চট্টগ্রাম-এর দিকে যখন আমরা অগ্রসর হই তখন কোন ট্রেঞ্চ, বাঙ্কার আমাদের লোকদের পুরোপুরিভাবে খনন করতে হয়নি, গ্রামবাসীরা কোদাল নিয়ে এসে আমাদের সহযোগিতা করতো, পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর গোলার আঘাতে গ্রামবাসীরাও হতাহত হতো কিন্তু তবু তারা এগিয়ে আসতো। তাদের মনোবল ছিল অটুট। গ্রামবাসীর মনোবল কত অটুট ছিল সে সম্পর্কে আমি এখানে একটা ঘটনার উল্লেখ করবো। ডিসেম্বর-এর প্রথম সপ্তাহে ইন্ডিয়ান একটা পেট্রোল পার্টি পাকিস্তানী পজিশন-এর পিছনে চলে যায়। পাকিস্তানীরা দেখতে পেয়ে তাদের উপর অবিরাম গোলাবর্ষণ করে। এক সময় ইন্ডিয়ান পেট্রোল পার্টির গোলাবারুদ ফুরিয়ে যাচ্ছিল, সে সময় তারা খবর পাঠায় গোলাবারুদ সরবরাহের জন্য। আমাদের গ্রামের লোকজন সেই গোলাবারুদ বহন করে নিয়ে যায় প্রায় সাত মাইল পথ অতিক্রম করে। পরে ভারতীয় পেট্রোল-এ যে অফিসার ছিল তার সঙ্গে পরে আমার দেখা হয়। তিনি তখন বলেছিলেন যে, যে দেশের লোকজনের মনোবল এত শক্ত তারা স্বাধীন না হয়ে পারে না। তিনি আরও বলেন যে, ভারতীয় বাহিনীর যে নিয়মিত সাপ্লাই কোর আছে তারাও বোধ হয় যুদ্ধক্ষেত্রে এত তাড়াতাড়ি গোলাবারুদ সরবরাহ করতে পারতো না, যতটা তাড়াতাড়ি করেছে তোমাদের গ্রামবাসীরা।

প্রশ্নঃ এই যুদ্ধের আর কোন উল্লেখযোগ্য দিক আছে কি?

উত্তরঃ উল্লেখ করার আছে। এই যুদ্ধের পরে যখন আমরা পাকিস্তানী ট্রেঞ্চ এবং বাঙ্কারে তল্লাশী চালাই তখন আমরা একটি ধর্ষিত মহিলার লাশ পাই। বাঙ্কারের পাশে মহিলার সঙ্গে একটি মৃত বাচ্চা ছিল। পাকিস্তানীরা যে কি চরম বর্বরতা দেখিয়ে গেছে সেগুলি আজ আমরা ভুলে গেছি, যার জন্য আজকাল আমরা মুক্তিযুদ্ধকে মনে করি একটি দুর্ঘটনা।

প্রশ্নঃ এছাড়া পাকিস্তানী বর্বরতার আর কোন ঘটনা মনে পড়ে কি?

উত্তরঃ আমি ঢাকায় দেখেছি ২৫শে মার্চের পরে বাঙ্গালীর মৃতদেহ কিভাবে রাস্তায় রাস্তায় পড়ে ছিল। এবং আমাদের এনকাউন্টার-এ আমরাও পাকিস্তানী লাশ এভাবে রাস্তায় ফেলে রেখে যেতাম-এটা আমাদের একটা প্রতিহিংসার বহিঃপ্রকাশ ছিল। এই সংঘর্ষের পরে পাকিস্তানীরা পুরো বেলুনিয়া ছেড়ে যেতে বাধ্য হয় এবং ফেনীতে গেয়ে পজিশন নেয়।

ফেনীতে আমরা সামনাসামনি ডিফেন্সে প্রায় দু’সপ্তাহের কিছু বেশী থাকি। এখানে প্রায়ই পেট্রোলিং হতো, গোলাগুলি হতো, মাঝে মাঝে ওরা আমাদের ডিফেন্সের উপর আক্রমণ করতো এবং পাকিস্তানীদের প্রতিটি আক্রমণই এখানে প্রতিহত করা হয়েছিল এবং ফেনী পুরোপুরি ফল্ করে

ডিসেম্বরের ৪/৫ তারিখে। সে সময় পাকিস্তানীরা ফেনী ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়। কারণ পাকিস্তানীদের পিছনের সঙ্গে সকল যোগাযোগ সব নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। আমাদের গেরিলারা সে সময় পাকিস্তানীদের খুব নাজেহাল করছিল। ৫ই ডিসেম্বরের ভোরে তারা রাতারাতি চলে যায় লাকসামের দিকে। ভোরবেলা আমরা দেখলাম পাকিস্তানী ডিফেন্স শূন্য। এর আগে আমাদের একটি পেট্রোল পার্টি গিয়েছিল। তারা ফেরার পথে পরিখায় অবস্থানরত রাজাকারদের পাকড়াও করে। তারা এখনও জানতো না যে পাকিস্তানী আর্মি ভেগে গেছে। ফেনীর মূলত সেদিনই পতন ঘটে। সেদিন সত্যিই আমাদের আনন্দের দিন ছিল। আমার মনে সব সময় একটা ইচ্ছা ছিল যে, মৃত্যুর আগে যেন অন্তত বাংলাদেশের একটি শহর মুক্ত-স্বাধীন দেখে যেতে পারি।

এরপর আমাদের নোয়াখালীর আনাচে-কানাচে যেতে হয় পাকিস্তানী সেনার কিছু অবস্থানকে মুক্ত করতে। এখানে একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল এই যে, চৌমুহনী ও মাইজদী কোর্টে রাজাকারদের রেজিসটেন্স। রাজাকারদের দুর্ভেদ্য ব্যূহ নাকি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর চাইতেও ভাল ছিল। রাজাকারদের বড় বড় নেতারা এবং কিছু হাফ ফোর্স চৌমুহনী ও মাইজদী কোর্টের দালান-কোঠায় উঠে পজিশন নিয়ে আমাদের বেশ ক্ষতি সাধন করে। তারা সহজে সারেন্ডার করেনি। শেষ পর্যন্ত আমাদেরকে বল প্রয়োগ করে সারেন্ডার করাতে হয়। এরপর আমাদের ব্যাটালিয়ান 'মুভ' করে চিটাগাং এর দিকে। চিটাগাং-এর দিকে আমরা এ্যাডভান্স করি ৯ই ডিসেম্বর থেকে।

চিটাগাং-এর দিকে যখন আমরা এ্যাডভান্স করি তখন সীতাকুণ্ডে পকিস্তানীরা আমাদের প্রতিরোধ করে।

১০ তারিখে আমরা সীতাকুণ্ডে পৌঁছাই। এরপর যখন আমরা কুমীরার কাছাকাছি আসলাম তখন আমাদের ব্যাটালিয়নকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। একটা অংশ আমাদের সিওর নেতৃত্বে তিন কোম্পানীসহ পাহাড়ের উপর দিয়ে চিটাগাং ইউনিভার্সিটির দিকে যায়। সেখানে বহু পাকিস্তানী সেনা আত্মসমর্পণ করে। আমাকে রাখা হলো ইন্ডিয়ান আর্মির সঙ্গে ঢাকা-চিটাগাং ট্রাংক রোড-এ। ভারতীয় দুটো ব্যাটালিয়ন-এর সঙ্গে আমাদের অংশগ্রহণ করতে হয়। একটা হলো কুমীরায়। সেখানে দু'দিন পাকিস্তানী আর্মি আমাদের সম্মিলিত বাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করে। তৃতীয় দিন আমরা রাতে ডান ফ্ল্যাঙ্ক দিয়ে ঢুকে পড়ি। এই গ্রুপে শুধু মুক্তিবাহিনী ছিল, অর্থাৎ আমার কোম্পানীই ছিল। আর ছিল ১নং সেক্টরের একটি কোম্পানী। আমরা পাকিস্তানী ডান ফ্ল্যাঙ্ক দিয়ে যখন চলে আসি, তখন তাদের সঙ্গে আমাদের প্রচুর গোলাগুলি হয়। এতে আমাদের বেশ হতাহত হয়। সে সময় পাকিস্তানীরা কুমীরা ছেড়ে পিছু হটতে শুরু করে এবং আমরা পাকব্যূহে ঢুকে পড়ি। এই সময় ভারতীয় গোলন্দাজ বাহিনী ভুলবশত আমাদের উপর গোলাবর্ষণ করে। আমাদের ব্যাটালিয়ন তখন খাকি ড্রেস পরতো। ভারতীয়রা মনে করেছিল পাকিস্তানী সৈন্য, আর তাই তারা গোলাবর্ষণ করেছিল। যাই হোক তারা তাড়াতাড়ি শুধরে নেয়। কারণ একজন ইন্ডিয়ান ওপি ছিলেন যাকে আমি চিনতাম। তিনি আমাকে এবং আমার লোককে চিনতে পেরেছিলেন। ফলে তেমন কোন ক্ষতি আমাদের হয়নি। দু-একটা গোলা পড়েছিল কিন্তু কোন হতাহত হয়নি। তবে হতাহত হতে পারতো যদি সেই ভারতীয় অফিসার আমাদের না চিনতেন। কুমীরার পরের রেজিস্টেন্সটা হয় এখন যেখানে তার এক মাইল উত্তরের। সেখানে ১৬ই ডিসেম্বর বিকালে যখন সারেন্ডার আরম্ভ হয়েছে-পাকিস্তান আর্মির দুইজন অফিসার সর্বপ্রথম আমার ডিফেন্সে-এ এসে সারেন্ডার করে। তখন আমি ইন্ডিয়ান আর্মিকে খবর দেই। কমাণ্ডিং অফিসার এবং একজন বিগ্রেডিয়ার আসেন। আত্মসমর্পণকারী দু'জন পাকিস্তানী অফিসারের একজন হচ্ছেন গোলন্দাজ বাহিনীর ক্যাপ্টেন ইফতেখার আর একজন লেঃ ছিলেন তার নামটা আমি ভুলে গেছি। উনি বোধ হয় ৪৬ ই-এমএর। ১৭ই ডিসেম্বর যখন ইন্ডিয়ান আর্মি 'মুভ' করলো চিটাগাং শহরে, তখন ইন্ডিয়ান আর্মি সিদ্ধান্ত নেয় যে, আমাদেরকে ঢুকতে দেবে না; আমরা পরে ঢুকবো। ইন্ডিয়ান ৩২ মাহারের সি-ও ছিলেন লেঃ কর্নেল হরদেব সিং। যেহেতু আমি তার সঙ্গে ছিলাম, তিনি বিগ্রেড

কমাণ্ডার-এর আদেশ অমান্য করে বলেন যে, আমি তার সঙ্গে যাব। এবং আমার কোম্পানী নিয়ে ১৭ তারিখেই চিটাগাং শহরে মুভ করি।

প্রশ্নঃ সেদিনই কি পাকিস্তান আর্মি সারেণ্ডার করে?

উত্তরঃ জ্বী।

প্রশ্নঃ এখানে আনুষ্ঠানিকভাবে কোন সারেণ্ডার করানো হয়নি। পাকিস্তানী সেনার যে ২৪ এফ-এফ ব্যাটালিয়ন এখানে তাদেরকে ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজে আনা হয় এবং তারা সেখানে সারেণ্ডার করে। আমি এই কলেজে পড়াশুনা করেছি, আর সেই কলেজেই পাকিস্তান আর্মি সারেণ্ডার করছে- এটা আমার কাছে খুব আনন্দের বিষয় ছিল। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, আমার সি-ও যিনি ছিলেন লেঃ কর্নেল জাফর ইমাম উনি ২৪ এফ-এফ'এ ছিলেন। তারই ব্যাটালিয়ন এখানে সারেণ্ডার করলো আমাদের কাছে, এটা বেশ আনন্দের ব্যাপার ছিল। তাকে যখন তার ব্যাটালিয়ন-এর লোকজনকে দেখতে হলো তখন অনেকেই কান্নাকাটি করলো। লেঃ কর্নেল জাফর ইমামের ব্যাটসম্যান নানা কথা জিজ্ঞাসা করতে করতে অঝোরে কাঁদতে থাকে।

প্রশ্নঃ আপনাদের ফরমেশন-এ যেসব গেরিলা বা এফ-এফ ছিল তাদের সঙ্গে কিভাবে সম্বনয় সাধন করতেন?

উত্তরঃ আমার ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডার প্রথমে সাবসেক্টর কমাণ্ডার ছিলেন। তিনি সাবসেক্টর চালাতেন। তারপর তিনি যখন ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডার হলেন তখন সাবসেক্টর কমাণ্ডার হলেন একজন সিভিলিয়ান-ক্যাপ্টেন মজিবুল হক। যিনি পরে এবং এখনও বোধ হয় ট্রেনিং কলেজ-এর প্রিন্সিপাল। তাদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক খুব ভাল ছিল। আমরা একসঙ্গে কাজে করতাম, লোকাল যারা গেরিলা ছিল তারা আমাদের অর্ডার নিয়ে কাজ করতো। কারণ মজিবুল হক আমাদের সাথে আগে কাজ করেছিল, তাই আমাদের কোন অসুবিধা হতো না। আমরা তাদের যথাযথভাবে কাজে লাগাতে পারতাম।

প্রশ্নঃ ভারতীয় সেনাবাহিনীর সঙ্গে কিভাবে সমন্বয় সাধন করা হতো ? সম্পর্ক কেমন ছিল?

উত্তরঃ এমনিতে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ভালই ছিল। তবে আমাদের সেনাবাহিনী চায় নাই যে, ৩রা ডিসেম্বর থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনী সক্রিয়ভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করুক। সেদিন আমাদের অনেক লোকই কেঁদেছিল।

প্রশ্নঃ ইতিমধ্যে, আপনার কথায় দেখতে পাচ্ছি যে, অনেকখানি জায়গা পুনঃদখল করে ভিতরে পৌছে গেছেন?

উত্তরঃ জ্বী, আমদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, আরও হয়তো দু'বছর লাগবে কিন্তু বাংলাদেশ একদিন স্বাধীন হবেই হবে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৫। ৩নং সেক্টরের ও 'এস' ফোর্সের যুদ্ধ বিবরণ	সাক্ষাৎকারঃ মেজর জেনারেল কে, এম, শফিউল্লাহ	----১৯৭১

তেলিয়াপাড়া পতনের পর সিলেটের মনতলা হতে সিংগারবিল পর্যন্ত এলাকা আমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। এ এলাকা থেকে আমরা গেরিলা ট্রেনিংপ্রাপ্ত ছেলেদের বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কিভাবে ক্ষতি করতে হবে সেভাবে টাস্ক দিয়ে পাঠাতাম।

যখন আমরা এ কাজে ব্যস্ত ছিলাম তখন আমাদের সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ওসমানী সমগ্র বাংলাদেশকে ১১টা সেক্টরে বিভক্ত করে এক নির্দেশ পাঠান। সেই নির্দেশ মোতাবেক আমার সেক্টরে নামকরণ করা হয় 'তিন নং সেক্টর'। যে এলাকার যুদ্ধ পরিচালনার ভার আমার উপর দেওয়া হয়েছিল, সে এলাকাগুলো ছিল সীমান্ত এলাকা-উত্তরের সিলেটের চূড়ামনকাঠি (শ্রীমংগলের কাছে) এবং দক্ষিণে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সিংগারবিল। অভ্যন্তরীণ যে সকল এলাকায় যুদ্ধ পরিচালনার ভার আমার উপর দেওয়া হয়েছিল সেগুলো হলো, সিলেটের মৌলভীবাজার সাবডিবিশন-এর কিয়দংশ, সম্পূর্ণ হবিগঞ্জ মহকুমা নবিনগর থানার কিছু অংশ বাদে সমস্ত ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমার এবং নারায়ণগঞ্জ মহকুমার আড়াইহাজার এবং বৈদ্যরবাজার থানা ছাড়া সমস্তটা, ঢাকা শহর ছাড়া ঢাকা নর্থের সমস্তটা, কিশোরগঞ্জ মহকুমা এবং গফরগাঁও এবং ভালুকা থানা। এইগুলি ছিল আমার অভ্যন্তরীণ সেক্টরের এলাকা। এ এলাকা ছাড়াও ঢাকা শহর এবং নারায়ণগঞ্জ শহরের বিভিন্ন গেরিলা তৎপরতায় আমি আমার গেরিলা যোদ্ধাদের পাঠিয়েছিলাম। এভাবে এলাকা ভাগ করে দেয়ার পর আমরা বাংলাদেশের ভেতর স্থানে স্থানে গেরিলা বেইস তৈরী করি। সেখানে কিছুসংখ্যক নিয়মিত বাহিনীর লোক পাঠাই যেন তারা গেরিলা ট্রেনিংপ্রাপ্ত পরিচালনা করতে পারে। আমার এলাকার যে সমস্ত জায়গাতে গেরিলা বেইস তৈরী করেছিলাম, তা ছিল সিলেটের চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ ও বানিয়াচংগে। একটাই ছিল সিলেটে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমার নাসিরনগর, সরাইল, মুকুন্দপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া এবং নবীনগরে একটি করে বেইস। কিশোরগঞ্জে যেসব বেইস তৈরী করি সেগুলো হল কুলিয়ার চর, বাজিতপুর, কটিয়াদি, পাকুন্দিয়া, হোসেনপুর এবং কিশোরগঞ্জে-প্রত্যেকটি জায়গায় একটি করে বেইস তৈরী করি। ঢাকা জেলাতে যেসব বেইস তৈরী করি তা-রায়পুরা, শীতপুর, নরসিংদী, কাপাসিয়া, মনোহরদি, কালিয়াকৈর, জয়দেবপুর এবং কালীগঞ্জ। ময়মনসিংহের গফরগাঁও এবং ভালুকাতে একটি করে গেরিলা বেইস তৈরি করি।

এসব বেইস-এ ট্রেনিং দিয়ে ছেলেদের পাঠাবার জন্য আমরা শরনার্থী ক্যাম্প থেকে ছেলেদেরকে রিক্রুট করতাম। ঢাকা-ময়মনসিংহ এবং কুমিল্লা জেলার অভ্যন্তরে যেসব বেইস তৈরী করেছিলাম যেসব বেইস-এ গেরিলা তৎপরতা চালাতে বিপুলসংখ্যক ছেলে ট্রেনিং-এর জন্য আসত। এসব জেলা থেকে যেসব তরুণ ছেলেরা ট্রেনিং নেয়ার জন্য আসত তাদের সংখ্যা এত বেশী ছিল যে, তাদের সবাইকে ট্রেনিং দেয়া আমাদের জন্য অসম্ভব হয়ে পড়ত। তাই তখন রিক্রুটমেন্ট-এ যেতাম। এতে বেশ কিছুসংখ্যক ছেলে সিলেক্ট না হতে পেয়ে নিরাশ হয়ে যেত। কিন্তু সিলেট জেলায় আমাকে বেশী সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। যখন এসব বেইসগুলোতে হাজার হাজার ট্রেনিংপ্রাপ্ত গেরিলা পৌঁছে গিয়েছিল, তখনও আমি সিলেট জেলার বেইসগুলোতে গেরিলা পাঠাবার জন্য কোন ছেলেকে রিক্রুট করতে পারিনি। দু''চারজন যারা রিক্রুট হয়েছিল তারাও জেলার অভ্যন্তরে তৎপরতা চালাবার সাহস পায়নি। অবশেষে আমরা বেইস তৈরী করার জন্য অস্ত্রের সাহায্য নিতে বাধ্য হয়েছিলাম। গেরিলা যুদ্ধে সমস্ত নীতির মধ্যে অন্যতম নীতি হল যে, গেরিলা যুদ্ধকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য জনগণের সাহায্যে একান্ত প্রয়োজন কিন্তু সিলেটে এ সমর্থনের বিশেষ অভাব ছিল। তাই প্রথম পর্যায়ে আমাদের ট্রেনিংপ্রাপ্ত গেরিলার হয়তবা পাক সেনাবাহিনী কর্তৃক ধৃত হয়েছে অথবা জনগণ দ্বারা ধৃত হয়েছে। যারা ধরা পড়েছিল তারা

* ১৯৭১-এর মার্চে ২য় রেজিমেন্টে মেজর পদে সেকেন্ড-ইন-কমান্ড হিসাবে কর্মরত ছিলেন।

কখনো ফিরে আসেনি। যেহেতু সিলেটে প্রথম দিকে গেরিলা তৎপরতা কম ছিল, সেহেতু পাকিস্তানী সৈন্যরা সিলেটে এবং নিকটবর্তী অঞ্চলে নির্ভয়ে চলাফেরা করতে পারতো।

একেবারেই যে সাহায্য পায়নি সেটা বললেও ভুল হবে। কিছুসংখ্যক লোক আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করেছে এবং যারা সাহায্য করেছে তারা মনেপ্রাণে সাহায্য করেছে, তাই জুলাই মাসের পর থেকে সিলেট জেলার ভেতরে গেরিলা বেইস তৈরী করার জন্য আমরা সাহায্য নেই। তারপর থেকে গেরিলা তৎপরতা কিছুটা প্রকাশ পায়।

আমাদের নিকট অস্ত্রশস্ত্র ছিল খুব অল্প। বন্ধুরাষ্ট্র থেকেও কখন পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য তেমন কোন অস্ত্র পাওয়া যাচ্ছিল না। তাই যেসব যুবককেই আমরা ভিতরের বেইস-এ কাজ করার জন্য পাঠাতাম তাদেরকে ১০ জনের একটা ব্যাচ করে তাদের হাতে দুটো কি তিনটা হাতিয়ার, একটা করে গ্রেনেড এবং কিছু পরিমাণ বিস্ফোরক দ্রব্য দিয়ে পাঠাতাম। এইসব অস্ত্র এবং বিস্ফোরক দ্রব্যের ব্যবহার আমার নির্দেশ এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী গণবাহিনী এবং নিয়মিত বাহিনীর সমন্বয়ে, যৌথ পরিকল্পনা ও পরামর্শে, নিয়মিত বাহিনীর কমাণ্ডারের নেতৃত্বে ব্যবহৃত হত।

আগস্ট মাস হতে বন্ধুরাষ্ট্র ভারত থেকে আমরা বেশ কিছুসংখ্যক অস্ত্রশস্ত্র পাই। তখন আমরা দশজনের দলের মধ্যে আটজনকে অস্ত্র দিতে পেরেছিলাম। তারপর থেকেই গেরিলা তৎপরতা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভীষণভাবে জোরদার হয়ে ওঠে। তখন থেকেই পাকিস্তানীদের একস্থান থেকে অন্যস্থানে চলাফেরার নিরাপত্তা যথেষ্টভাবে বিঘ্নিত হয়।

অক্টোবর-নভেম্বর পর্যন্ত আমরা যেভাবে গেরিলাদের ভেতরে ট্রেনিং দিয়ে পাঠিয়েছি, তাতে এমন কোন বাড়ি বাদ ছিল না যেখানে ট্রেনিংপ্রাপ্ত গেরিলা ছিল না।

আমি যে এলাকার যুদ্ধ পরিচালনা করেছি সে এলাকাতে প্রায় ২৫/৩০ হাজার গেরিলা নভেম্বরের শেষ পর্যন্ত কাজ করছিল। যে অস্ত্র তাদের দিয়েছিলাম সে অস্ত্র ছাড়াও পাকবাহিনী রাজাকার, আলবদর, আলশামস এবং পুলিশ স্টেশন থেকে ছিনিয়ে নেয়া অস্ত্রশস্ত্রের সংখ্যা বিশেষভাবে বেড়ে যায় এবং ছেলেদের মনোবলও সাথে সাথে বেড়ে যায়।

এমন কতগুলো জায়গা ছিল, সেগুলো পাকবাহিনী কখনো তাদের নিয়ন্ত্রণে নিতে পারেনি, যেমন- রায়পুরা, শিবপুরের উত্তরাংশ, মনোহরদী, কাপাসিয়া, বাজিতপুর, কুলিয়াচর, ভালুকা, গফরগাঁও এই সমস্ত এলাকায় আমাদের প্রশাসন ব্যবস্থাও ছিল।

যেহেতু আমরা যুবকদের ট্রেনিং দিয়ে গেরিলা যুদ্ধের জন্য ভেতরে পাঠাচ্ছিলাম এবং আমাদের কনভেনশনাল যুদ্ধ প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিল, সেহেতু মনতলা থেকে সিংগারবিল পর্যন্ত এলাকায় কনভেনশনাল পদ্ধতিতে প্রতিরক্ষা ব্যূহে তৈরী করি-কিন্তু নিয়মিত বাহিনীর সৈনিকদের দ্বারা গেরিলা অপারেশন-এর জন্য ব্রাহ্মণবাড়িয়া-সিলেট মহাসড়ক পাকবাহিনীর জন্য এক মরণফাঁদ ছিল।

তাই পাক-বাহিনী আমাদেরকে এ জায়গা থেকে সরাবার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। আমরাও আমাদের ঘাঁটিকে সুরক্ষিত করার চেষ্টা করি। কারণ এটাই ছিল আমাদের সর্বশেষ আশ্রয়ের স্থল। এ জায়গা যদি আমরা হারাই তাহলে আমাদের ভারতে আশ্রয় নেয়া ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। যদিও তখন আমাদের সমস্ত ট্রেনিং ক্যাম্প এবং হেডকোয়ার্টারের কিয়দংশ ছিল ভারতে।

এই ক্ষুদ্র জায়গাটুকু রক্ষা করার জন্য আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করি। কিন্তু পাকবাহিনীও আমাদের পিছু হটাবার জন্য বেপরোয়া আক্রমণ চালায়। কারণ আমাদের হটিয়ে দিতে না পারলে সিলেট হাইওয়ে তাদের জন্য নিরাপদ

ছিল না এবং আখাউড়া-সিলেট ট্রেন লাইন চালু করতে পারছিল না। বলা বাহুল্য, পাকবাহিনী ২৫শে মার্চের পর এই লাইনে আর কখনো গাড়ি চালাতে পারেনি।

আমাদের এই ঘাঁটির উপর পাকবাহিনী বার বার আক্রমণ করে এবং এসব আক্রমণে তাদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। প্রতিদিনই তাদের ২০ থেকে ৩০ জন সৈনিক হারাতে হোত। অবশেষে জুন মাসের ২১ তারিখে পাকবাহিনী আমাদের এই অবস্থানের উপর মারাত্মকভাবে হামলা চালায়। আমার সৈনিক সংখ্যা ছিল মাত্র তিন কোম্পানী। কিন্তু পাকবাহিনী উপর্যুপরি প্রায় চার ব্যাটালিয়ন সৈন্য নিয়ে আক্রমণ চালায়। এক ব্যাটালিয়ন সৈন্য ইটাখোলা, তেলিয়াপাড়ার দক্ষিণ দিকে মনতলার দিকে অগ্রসর হয়। এক ব্যাটালিয়ন মাধবপুর থেকে মনতলার দিকে অগ্রসর হয়। এক ব্যাটালিয়ন চানহরা থেকে হরশপুরের দিকে অগ্রসর হয়। আর এক ব্যাটালিয়ন মুকুন্দপুর থেকে হরশপুর-এর দিকে অগ্রসর হয়।

একই সময়ে চারিদিক থেকে তারা আমাদের উপর আক্রমণ শুরু করে এবং এ আক্রমণে তারা দূরপাল্লার ভারী অস্ত্র বেপরোয়াভাবে, ব্যাপকভাবে ব্যবহার করে। যখন তিন দিক থেকে তারা আমাদের উপর আক্রমণ করতে অগ্রসর হচ্ছিল তখন হেলিকপ্টারযোগে তারা পিছনে কিছু সংখ্যক কমাণ্ডো অবতরণ করায়। আমি শেষ পর্যন্ত আমার সৈনিকদের পিছনে হটে যেতে আদেশ দেই। হরশপুরের নিকট আমার যে কোম্পানী ছিল তারা পাকসৈন্যদের প্রায় ঘেরাওয়ের ভিতরে পড়ে যায়। এই কোম্পানীকে ঘেরাও থেকে উদ্ধার করতে আমার বেগ পেতে হয়েছিল। যদিও আমরা আমাদের অবস্থান থেকে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিলাম তবুও শেষ পর্যন্ত প্রায় ৪০ বর্গমাইল এলাকা আমাদের আওত্তাধীন রাখতে সমর্থ হয়েছিলাম। এই এলাকা স্বাধীনতা লাভের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত মুক্ত ছিল।

ঐদিনই ২১শে জুন আমি আমার লোকজনকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত ভারতের ভিতর চলে যেতে বাধ্য হই। ভারতে চলে যাবার পর আমরা পূর্ণোদ্যমে নবাগত তরুণদের ট্রেনিং দিতে শুরু করি, যাতে করে গণবাহিনীর সাথে সাথে নিয়মিত বাহিনীও গড়ে ওঠে। ভারতে চলে যাবার আগে থেকেই আমরা গণবাহিনী গড়ে তোলার জন্য ট্রেনিং দেয়া শুরু করি। এবং ভারতে যাবার পর ট্রেনিং আরও জোরদার করি। জুন মাস পর্যন্ত আমরা বেশ কিছু সংখ্যক যুবকদের ট্রেনিং দিয়েছিলাম।

যে সমস্ত টাস্ক দিয়ে গেরিলাদের ভিতরে পাঠাতাম, সে সমস্ত টাস্ক যাতে সুসংহত ও সুপরিকল্পিতভাবে সম্পন্ন হয়, সে ব্যাপারে আলোচনার জন্য জুলাই মাসের ৭/৮ তারিখে সমস্ত সেক্টর কমান্ডারদের মুজিব নগরে এক কনফারেন্স হয়। এই কনফারেন্স-এ প্রথম সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ। তিনি আমাদের লক্ষ্য করে যে ভাষণ দেন তার মর্ম ছিল যে- পাকিস্তানী সেনাবাহিনী আমাদের উপর যে অত্যাচার অবিচার করেছে তার পরিপ্রেক্ষিতে আজ আমরা এখানে। আমরা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যে লড়াই করছি, তা স্বাধীনতা অর্জন পর্যন্ত যেন চালিয়ে যেতে পারি। এতে আমাদের সবাইকে একই লক্ষ্য সামনে রেখে কার্য পরিচালনা করা উচিত। এ লক্ষ্যে পৌঁছাতে বিভিন্ন মহলের প্ররোচনায় আমরা যেন পথভ্রষ্ট না হই। বাংলাদেশ সরকার যথাসাধ্য সর্বপ্রকার সাহায্য করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। অস্ত্রশস্ত্র সমরসম্ভার বন্ধুরাষ্ট্র ভারত যতটুকু দেয় তা আমরা গ্রহণ করব। তাছাড়াও যদি সম্ভব হয় অন্য কোন রাষ্ট্র থেকেও আনার চেষ্টা করব। প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে আমরা অনুপ্রাণিত হই।

কিভাবে আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে হবে এ ব্যাপারে পরে কর্নেল ওসমানীর নেতৃত্বে ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করি। কনফারেন্স প্রায় দশদিন পর্যন্ত চলে। এই কনফারেন্স বাংলাদেশের ভিতরে গেরিলা পদ্ধতিতে কিভাবে লড়াই চালাতে হবে সে পরিকল্পনা নেয়া হয়, যাতে করে সমস্ত সেক্টর একই ধরনের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে পারে। যেসব পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল তার মাঝে গুরুত্বপূর্ণ গুলো হলো-

১। সেক্টরের সীমানা সঠিকভাবে চিহ্নিত করা হয়।

২। গেরিলা তৎপরতা সুষ্ঠুভাবে চালাবার জন্য ভেতরে গেরিলা ঘাঁটি তৈরী করতে হবে।

৩। গেরিলা ঘাঁটিগুলোতে শুধু গেরিলাই থাকবে না। কিছু সংখ্যক নিয়মিত বাহিনী লোকদেরও ঐ সমস্ত ঘাঁটিতে পাঠানো হবে যাতে গেরিলাদের সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে পারে।

৪। খবরাখবর আনা-নেয়ার চন্য এক ইনটেলিজেন্স চেইন তৈরী করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

৫। প্রত্যেক গেরিলা বেইস-এ একজন করে রাজনৈতিক উপদেষ্টা থাকবে। যার উপদেশে রাজনৈতিক কার্যকলাপ চালিত হবে।

৬। প্রত্যেক গেরিলা ঘাঁটিতে একটি করে মেডিকেল টিম থাকবে। যারা গেরিলাদের চিকিৎসায় দায়িত্বভার এবং ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৭। গেরিলা ওয়ারফেয়ারের সাথে সাথে সাইকোলোজিক্যাল ওয়ারফেয়ারও চালিয়ে যেতে হবে যাতে করে পাকিস্তানী সৈন্যদের মনোবল নষ্ট হয়ে যায় এবং আমাদের জনসাধারণের মন অটুট থাকে।

৮। আমাদের সামরিক পরিকল্পনা (প্যাকটিক্যাল প্লান) এ রকম হওয়া উচিত যাতে করে পাক সেনাবাহিনী আইসোলেটেড হয়ে পড়ে।

৯। তাদের (পাকিস্তানী সেনাবাহিনীকে) প্রথম আইসোলেটেড করতে হবে। এবং পরে তাদের এনিহিলেট (নিশ্চিহ্ন) করতে হবে।

১০। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অস্ত্রশস্ত্র, যানবাহন, খাদ্যদ্রব্য ইত্যাদি যাতে চলাফেরা করতে না পারে সেজন্য যোগাযোগ ব্যবস্থা বিছিন্ন করে দিতে হবে।

১১। পাকিস্তান যেন বাংলাদেশ থেকে কাঁচামাল বা ফিনিশড প্রডাক্ট রফতানী করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে না পারে সেজন্য এ দ্রব্য সামগ্রী সরকারী গুদাম ধ্বংস করতে হবে।

১২। কলকারখানা যেন চলতে না পারে সেজন্য বিদ্যুৎ এবং পেট্রোল ইত্যাদির সরবরাহ ব্যবস্থা বিধ্বস্ত করতে হবে।

১৩। গাড়ি-ঘোড়া, রেলগাড়ী, বিমান, জলযান যেন ঠিকভাবে চলাচল করতে না পারে সেজন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৪। যে সকল লোক পাক-সেনাবাহিনীর সহযোগিতা করবে তাদের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে হবে এবং চরম ব্যবস্থা নিতে হবে।

১৫। ‘‘বাংলাদেশে স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করছে”- পাকিস্তানী শাসকদের এই প্রচারণাকে মিথ্যা প্রমাণিত করার জন্য ঢাকাসহ বিভিন্ন শহরে অস্বাভাবিক পরিবেশ সৃষ্টি করার পরিকল্পনা নেয়া হয়। কনফারেন্স শেষে আমরা যার যার সেক্টরে চলে যাই। এবং সকল পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার জন্য আমাদের নিজ নিজ সেক্টরে পরিচালনা পরিকল্পনা নেই।

আমি আমার ৩নং সেক্টরকে নিন্মলিখিত দশটি সাবসেক্টরে ভাগ করি। প্রত্যেকটি সাবসেক্টর যেসব সাবসেক্টর কমান্ডারদের অধীনে ছিল তাদের নামও দেয়া হলঃ

১। আশ্রম বাড়ি, ২। বাঘাই বাড়ি (এ দুটি সাবসেক্টরের কমাণ্ডার ছিল প্রথমে ক্যাপ্টেন আজিজ তারপর ক্যাপ্টেন এজাজ), ৩। হাতকাটা-ক্যাপ্টেন মতিউর রহমান, ৪। সীমানা-ক্যাপ্টেন মতিন, ৫। পঞ্চবটি-ক্যাপ্টেন নাসিম, ৬। মনতলা, ৭। বিজয়নগর (এই দুই সাবসেক্টর-এর কমাণ্ডার ছিলেন ক্যাপ্টেন

সুবেদ আলী ভুঁইয়া), ৮। কালাছড়া-লেঃ মজুমদার, ৯। কলকলিয়া, ১০। বামুটিয়া (এ দুটি সাবসেক্টরে কমান্ডার ছিলেন লেঃ মোরশেদ এবং লেঃ সাঈদ)

এই সেক্টরগুলিতে কনভেনশনাল যুদ্ধ ছাড়া তারা গেরিলা যুদ্ধও চালাত। যুদ্ধ পরিচালনা ছাড়াও বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন বেইস-এ গেরিলাদের পাঠাবার দায়িত্বও এই সমস্ত সাবসেক্টর কমাণ্ডারদের উপর ন্যস্ত ছিল। সাবসেক্টর কমাণ্ডাররা সীমান্ত অতিক্রম করে ভেতরে পাঠিয়ে দিত। গেরিলাদের পাঠাবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করারও সাবসেক্টর কমান্ডারদের দায়িত্ব ছিল। এই নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কখনো তাদেরকে পাকবাহিনীর সাথে যুদ্ধেও লিপ্ত হতে হয়েছিল।

আমাদের প্রধান সেনাপতির নির্দেশ অনুযায়ী বাংলাদেশের অভ্যন্তরে আমরা আমাদের কর্মতৎপরতা জোরদার করি। প্রধান সেনাপতির নির্দেশের পূর্ব থেকেই আমরা বাংলাদেশের ভেতরে গেরিলা তৎপরতা বৃদ্ধির জন্য বেইস নির্মাণ শুরু করছিলাম। কিন্তু তার এই নির্দেশ মোতাবেক এ বেইসগুলোকে আরও সুসংহত করি। যাতে এক সেক্টরের গেরিলার সাথে অন্য সেক্টরের গেরিলাদের সংঘর্ষ না ঘটে সেজন্য আমাদের বেইসগুলোকে এমনভাবে তৈরী করি যেন বর্ডারিং বেইসগুলো একে অন্যের সাথে সুপরিকল্পিতভাবে পরিচালিত হতে পারে।

সেপ্টেম্বরের (১৯৭১) প্রথম দিক থেকে ডিসেম্বরের (১৯৭১) মাঝামাঝি পর্যন্ত আমাদের গেরিলা তৎপরতা এমনভাবে বেড়ে যায় যে, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নিরাপত্তা বাংলাদেশের ভিতরে ছিল না বললেই চলে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের ভিতরে নিম্নলিখিত গেরিলা অপারেশনগুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য-

রায়পুরার নিকটবর্তী বেলাবো অপারেশন-১৪ই জুলাইঃ

পাকিস্তান সেনাবাহিনী তখনো রায়পুরা, নরসিংদী, কাপাসিয়া, মনোহরদী, কুলিয়াচর, কটিয়াদী এলাকায় ১৪ই জুলাই পর্যন্ত তাদের নিয়ন্ত্রণ আনতে পারেনি। কারণ আমাদের নিয়মিত বাহিনী দ্বারা গঠিত এই ক্যাম্পগুলো যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল। তাদের এসব জায়গা থেকে উচ্ছেদ করার জন্য পাকবাহিনী লঞ্চের সাহায্যে বেলাবো অভিমুখে অগ্রসর হয়। বেলাবোতে আমার যে দল ছিল তার নেতৃত্ব করছিল সুবেদার বাশার। সে বেলাবোর নিকটবর্তী এলাকা টোকের কাছে তার লোকজন দ্বারা এক এ্যামবুশ তৈরী করে। দুর্ভাগ্যবশত সুবেদার বাশারের এ এ্যামবুশের খবর পাকবাহিনী নিশ্চয়ই কোন বিশ্বাসঘাতকের সহযোগিতায় জানতে পারি। তাই পাকিস্তানী সৈনিকরা যে মটর লঞ্চে করে আসছিল তার মধ্যে থেকে কিছুসংখ্যক পাকসৈনিক সর্বাগ্রে নৌকা করে আসে এবং নৌকার বেশ কিছু পেছনেই আসছিল একখানা খালি লঞ্চ। যেহেতু সুবেদার বাশার এবং তার সাথীরা বসেছিল লঞ্চের অপেক্ষায়, নৌকা করে যেসব পাকসেনা সর্বপ্রথম অগ্রসর হয়েছিল তা তারা টের পায়নি। এবং যেইমাত্র খালি লঞ্চ তাদের সামনে আসে তারা সে লঞ্চের উপর গোলাগুলি করে। তাদের এ গোলাগুলির সাথে সাথে পাক-বাহিনীর অগ্রগামী এবং পেছন থেকে অগ্রসরমান সৈনিকরা এ দলটিকে চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলে। আমাদের সাহসী সৈনিকগণ শত্রুর হাতে অস্ত্র সমর্পণ না করে বীরবিক্রমে লড়তে থাকে। এ লড়াই কয়েক ঘন্টা অব্যাহত থাকে। অবশেষে কিছুসংখ্যক সৈনিক পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হয়। যারা এ যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন তারা হলেন- ১। সুবেদার আবুল বাশার, ২। সিপাহী আবদুল বারী, ৩। সিপাহী নুরুল ওহাব, ৪। সিপাহী সোহরাব হোসেন, ৫। সিপাহী মমতাজ উদ্দীন, ৬। সিপাহী আবদুল হক, ৭। সিপাহী আবদুস সালাম।

সুবেদার বাশারের মৃতদেহ হলদী ক্ষেতের ভিতর থেকে উদ্ধার করা হয়, দেখা যায় তাঁর পেটের ক্ষতস্থানটি তাঁর নিজের শার্ট দিয়ে বাঁধা। এলএমজি মৃতদেটের পাশেই ছিল। মূল্যবান কাগজপত্র মৃত্যুর আগে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে তিনি পাশে ফেলে রাখেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে শহীদ সুবেদার বাশার এবং তাঁর সঙ্গীদের অবদান ভুলবার নয়। বেলাবোর জনগণ এখনো তাঁকে এবং তাঁর সঙ্গীদের শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে।

কটিয়াদী এ্যামবুশ, ৭ই আগস্ট, ১৬ আগস্টঃ

পাকিস্তান সেনাবাহিনী বেলাবোতে জয়লাভের পর এক প্রকার বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল। তারা এমনি আত্মতৃপ্তি নিয়ে চলাফেরা করত যে, তারা মনে করেছিল যে তাদের চলাফেরায় বাধা দেবার আর কেই নেই। আমাদের সৈরিকরাও চুপ করে ছিল না। তারও সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। ৭ই আগস্ট থেকে আমাদের সৈনিকরা পাকসেনাদের গতিবিধি লক্ষ্য করছিল। অবশেষে ১৬ই আগস্ট সে সুযোগ আসে। ঐদিন পাকিস্তানী সৈনিকরা কয়েকখানা মটর লঞ্চে করে কটিয়াদীর দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। আমাদের সৈনিকরাও নদীর পাড়ে তাদের অপেক্ষায় ওঁৎ পেতে বসে থাকে। সমস্ত মটর লঞ্চ যখন ঐ ফাঁদের ভিতরে চলে আসে তখন চারিদিক থেকে তাদের উপর গোলাবর্ষণ শুরু করা হয়। এই গোলাগুলিতে বেশ কয়েকখানি লঞ্চ ডুবে যায় এবং বহু শত্রুসেনা হতাহত হয়। কিছু সংখ্যক পাকিস্তানী সৈনিক পালিয়ে যেতে সক্ষম হয় এবং মনোহরদী রিইফোর্সমেন্ট এসে আহতদের উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। এই উদ্ধারকার্যের জন্য পাক সেনাবাহিনী হেলিকপ্টার ব্যবহার করতে বাধ্য হয়। পরে জানা যায় যে, ১৪৩ জন নিহত এবং বহুসংখ্যক আহত হয়েছিল। এ এ্যামবুশে নেতৃত্ব দিয়েছিল হাবিলদার আকমল আলী। আমাদের সৈনিকরা এ যুদ্ধে বিশেষ সাহসের পরিচয় দেয় এবং বেলাবোতে আমাদের যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল তার প্রতিশোধ গ্রহণ করে।

মুকুন্দপুর এ্যামবুশ-১৩ই সেপ্টেম্বরঃ

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর রেলপথে যাতায়তে বাধা সৃষ্টি করার জন্য আমরা রেলওয়ে লাইনে ট্যাংক বিধ্বংসী মাইন পুঁতে রাখতাম। এ ব্যাপারে পাকিস্তানীরা বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করে। তারা রেলগাড়ির ইঞ্জিনের আগে দুটো কি তিনটে ওয়াগণ জুড়ে দিত। এতে ঐ ওয়াগনগুলোই প্রথম বিধ্বস্ত হত এবং ট্রেনের বিশেষ কোন ক্ষয়ক্ষতি হত না।

তাদের এই ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা অন্য কৌশল অবলম্বন করি, মাইন এমনভাবে ফাটে পাতে করে ট্রেনের বিশেষ অংশ ক্ষতিগ্রস্থ হয়। তাই ট্যাংক বিধ্বংসী মাইনকে ফাটাবার জন্য আমরা বিদ্যুতের সাহায্য (ইলেকট্রিক ডেটোনেটিং সিস্টেম) আমাদের ইচ্ছামত মাইন ফাটাবার ব্যবস্থা নেই। পাকবাহিনী যখন আখাউড়া-সিলেট রেলগাড়ি চালু করার জন্য তৎপর হয়ে ওঠে, তখন আমরা কিছুদিন তাদের গতিবিধি এবং ক্রিয়াকলাপ লক্ষ্য করি। এই পদ্ধতিতে ট্রেন ধ্বংস করার জন্য মুকুন্দপুর এলাকাতে এক এ্যামবুশ তৈরী করি। এ্যামবুশ লাগানো হয়েছিল দু'খানা এন্টি ট্যাংক মাইন দিয়ে। তার সাথে বৈদ্যুতিক তার যোগ করে প্রায় ৩০০ গজ দূরে রিমোট কন্ট্রোল স্থাপন করা হয়-যেখান থেকে সুইচ টিপলে যেন মাইন ফেটে যায়। এই সুযোগ এসেছিল ১৩ই সেপ্টেম্বর। ঐ দিন পাক-বাহিনীর প্রায় এক কোম্পানী সৈন্যের ট্রেনে আখাউড়া থেকে মুকুন্দপুর হয়ে হরশপুর পর্যন্ত যাবার পরিকল্পনা ছিল। আমাদের ফাঁদ ছিল মুকুন্দপুর এবং হরশপুরের মাঝামাঝি জায়গায়, মুকুন্দপুরের নিকট ঐ ট্রেনে দু'জন পাকিস্তানী অফিসার ছিল।

ট্রেনের সম্মুখভাবে দু'খানা বালি বোঝাই ওয়াগণ লাগানো ছিল। রাত তখন প্রায় চারটা। যখন ট্রেন মুকুন্দপুর থেকে হরশপুরের দিকে যাত্রা করে তখনই আমদের এ্যামবুশ পার্টি তৎপর হয়ে ওঠে। ট্রেন আস্তে আস্তে অগ্রসর হচ্ছিল। বালি বোঝাই ওয়াগন ট্যাংক বিধ্বংসী মাইন পার হবার পর যখন ইঞ্জিন এবং সৈন্য বেঝাই ওয়াগন মাইনের ইপরে আসে তখনই সুইচ টিপে মাইনকে ফাটানো হয়। এতে ইঞ্জিনখানা সৈন্য বোঝাই ওয়াগনসহ ধ্বংস হয়। এই অপারেশনে দু'জন অফিসারসহ ২৭ জন পাকসেনা নিহত হয় বলে জনান যায়। তাছাড়া অনেক আহত হয়েছিল। এই এ্যামবুশে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন লেঃ মোরশেদ। বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়ায় (সিস্টেম) ট্রেন ধ্বংস করার পদ্ধতি বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে এটাই ছিল প্রথম।

কালেঙ্গা জঙ্গলে এ্যামবুশ-২৪শে সেপ্টেম্বরঃ

সিলেটের অভ্যন্তরে যে সমস্ত গেরিলা পাঠাতাম, তাদেরকে এই কালেঙ্গা জঙ্গলের মধ্য দিয়েই পাঠাতাম। পাক সেনাবাহিনী এ খবর পেয়ে কালেঙ্গা জঙ্গলে তাদের তৎপরতা বাড়িয়ে দেয়। তারা যাতে নিরাপদে চলাফেরা না করতে পারে সেজন্য কালেঙ্গা রেস্ট হাউসের পাশে কিছুসংখ্যক এন্টি-পারসোনাল মাইন পুঁতে রাখা হয় এবং এর প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করার জন্য লোক নিয়োগ করি। পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর কিছু সৈনিক সেপ্টেম্বর মাসের ২০/২১ তারিখে কালেঙ্গা জঙ্গলে আসে এবং কিছুক্ষণ ঘোরাফেরার পর তারা রেস্ট হাউসের দিকে ফিরে যায়। রেস্ট হাউসের দিকে ফিরে যাবার সময় তাদের পায়ের চাপে দু'খানা মাইন ফেটে যায় এবং তাতে একজন মারা যায় ও দু'তিনজন আহত হয়। পাকসেনারা সেখান থেকে সিন্দুরখানের দিকে চলে যায়। পরদিন বেশ কিছুসংখ্যক লোক আসে সে মাইন পরিষ্কার করা এবং সেখানে ঘাঁটি নির্মাণের পরিকল্পনা করার জন্য। ঐ নি যদিও আমাদের লোক সেখানে ছিল, সেদিন তাদের কোন বাধা দেয়া হয়নি। আমাদের সৈনিকরা তাদের উপর মারাত্মক আঘাত হানার প্রস্তুতি নিচ্ছিল।

২৪শে সেপ্টেম্বর আমাদের সৈনিকরা সিন্দুরখান-কালেঙ্গা রাস্তার উপর ছোট ছোট পাহাড়ের উপর এ্যামবুশ লাগিয়ে শত্রুর অপেক্ষায় ওঁৎ পেতে থাকে। ঐদিন পাকসেনারা বেশকিছু লোকসহ কালেঙ্গার দিকে আসছিল। তাদের দলের সবচেয়ে আগে ছিল প্রায় ২০/২৫ জন বাঙ্গালী রাজাকার। তাদের পেছনেই ছিল পাকিস্তানী সৈন্য। দু'দিন আগে যখন তারা এখানে ঘাঁটি নির্মাণের পরিকল্পনা করার জন্য এসেছিল তখন কোন বাধা পায়নি। তাই ২৪ তারিখে যখন তারা কালেঙ্গার দিকে আসছিল সেদিন বেপরোয়াভাবেই অগ্রসর হচ্ছিল। আমাদের সৈনিকরাও তাদের গতিবিধি লক্ষ্য করে বসেছিল। রাজাকারের দল যখন আমাদের ফাঁদের ভিতর চলে আসে তখন তাদের কিছু বলা হয়নি। আমাদের সৈনিকরা শুধু পাকসেনারা অপেক্ষায় ছিল। সে জায়গাতে আমাদের এ্যামবুশ ছিল সেখান থেকে পাকসেনাদের অগ্রসরমান সব সৈনিককেই দেখা যাচ্ছিল, তাই রাজাকারদের দল আমাদের ফাঁদের ভিতরে থেকে যখন বেরিয়ে যায় তখন তাদের কিছু করা হয়নি। যখন পাকিস্তানী সেনারা আমাদের ফাঁদের ভিতরে ঢুকে পড়ে তখনি আমাদের সৈন্যরা সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং চারদিক থেকে তাদের উপর গোলাগুলি শুরু করে। তাদের দলটি বিস্তীর্ণ এলাকার উপর দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল। এতে সকল সৈনিক আমাদের ফাঁদের ভিতর পৌঁছতে পারেনি। যারা ভিতরে প্রবেশ করেছিল, তারা প্রায় সবাই নিহত হয়। পেছনের যে সমস্ত পাকসেনা আমাদের ঘেরাওয়ের বাইরে ছিল, তারা তাদের বিপদগ্রস্থ সঙ্গীদের বাঁচাবার উদ্দেশ্যে আমাদের সৈনিকদের লক্ষ্য করে গুলি ছুড়তে থাকে। আমরা যেহেতু পরিখা খনন করে বসেছিলাম তাই শত্রুদের গোলাগুলি আমাদের কোনরূপ ক্ষতি করতে পারেনি। এমন সময় হঠাৎ নায়েক আবদুল মান্নান পরিখা থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে এবং "জয়বাংলা" বলে চীৎকার করে ওঠে এবং এই বলে সামনে অগ্রসর হয় যে জীবিত পাকসেনাকে ধরে ক্যাপ্টেন সাহেবের (ক্যাপ্টেন আজিজ) সামনে হাজির করব এবং দেখব ক্যাপ্টেন সাব আমায় গলায় মারা পরান কিনা। তার দিন ফুরিয়ে গিয়েছিল হয়ত তাই সে এরূপ বেপরোয়াভাবে পরিখা থেকে বেরিয়ে আসছিল। সে কিছুদূর অগ্রসর হবার পরই পাকসেনার মেশিনগানের গুলি তার বক্ষ এবং মস্তক ভেদ করে এবং সে সেখানেই কলেমা পড়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে।

এ যুদ্ধে পাকসেনাদের একজন অফিসারসহ ৬১ জন সৈনিক নিহত হয়। এছাড়া কিছুসংখ্যক আহত হয়েছিল। কিন্তু তারা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল।

মনোহরদী অবরোধ-২১শে অক্টোবরঃ

অক্টোবর মাস পর্যন্ত আমাদের তৎপরতা বেড়ে যাওয়াতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী তাদের ছোটখাটো দলকে (ডিটাচমেন্ট) থানা হেডকোয়ার্টার পর্যন্ত পাঠাতে বাধ্য হয়েছিল। প্রত্যেক থানা হেডকোয়ার্টারের সৈন্যসংখ্যা এক কোম্পানীর কম রাখতে সাহস পেত না। এক কোম্পানী করে সৈন্য প্রত্যেক থানাতে দেওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠছিল না। কারণ, কোন কোন স্থানে সৈন্যসংখ্যা এক ব্যাটালিয়নেরও বেশী রাখতে হত।

২৫শে মার্চ রাতে পাক সেনাবাহিনী পিলখানাস্থ ইপিআর ক্যাম্প আক্রমণ করে প্রায় ৭০০ থেকে এক হাজার ইপিআর-এর বাঙ্গালী সৈন্যকে জেলখানাতে আটকে রাখে। সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাস পর্যন্ত তাদের উপর নানারকম নির্যাতন চালায় এবং তাদের কাছ থেকে এই প্রতিশ্রুতি নেয় যে তারা কখনো পাক সরকারের বিরুদ্ধাচরণ করবে না এবং তাদের সুযোগ দেয়া হবে আনুগত্য প্রমাণ করার জন্য। এই প্রতিশ্রুতি নিয়ে কিছুসংখ্যক ইপিআর সৈনিকদের পাকিস্তানী সেনাদের নেতৃত্বাধীনে তাদের থানায় থানায় মোতায়েন করা হয়। আমাদের এলাকায় যে সমস্ত জায়গায় তাদের মোতায়েন করা হয়েছিল সেসব জায়গা হল রায়পুরা, নরসিংদী, শিবপুর, মনোহরদী, কাপাসিয়া ও কালীগঞ্জ ইত্যাদি। এসব জায়গাতে ইপিআর এবং পাক বাহিনীর লোকদের সংখ্যা প্রায় সমান সমান ছিল। আমরা যেসব গেরিলা বেইস তৈরী করেছিলাম তারা প্রায় সবাই ইপিআর-এর বাঙালী সৈনিকদের সাথে যোগাযোগ করে ই-পি-আর এর সৈনিকদের আমাদের সাথে যোগ দিয়ে যুদ্ধ করতে বললে তারা বলে যে তারা সংখ্যায় খুব কম। বেশীরভাগ এখনো জেলে আছে। তারা যদি পাকবাহিনীর কাছে আনুগত্য প্রমাণ করতে পারে তাহলে বাকী সৈনিকদেরও ছেড়ে দেওয়া হবে। এখন যদি তারা গেরিলাদের সাথে যোগ দেয়, তাহলে যে সমস্ত ইপিআর-এর লোক জেলে আছে তাদের সবাইকে মেরে ফেলা হবে। এমতাবস্থায় পাক সেনাবাহিনীর ক্যাম্প ছেড়ে আসার সময় এখনো হয়নি। তবে সময় আসলে তারা মুক্তিবাহিনীর সাথে থাকবে বলে নিশ্চয়তা দেয়।

মনোহরদীতেও ছিল অনুরূপ এক ক্যাম্প। সেখানে পাকসেনাদের সংখ্যা ছিল ৩৬ জন এবং প্রাক্তন ই-পিআর-এর লোকসংখ্যা ছিল প্রায় ৪০জন। ২১শে অক্টোবরের আগে থেকেই আমাদের গেরিলা বেইস যেটা মনোহরদীতে ছিল তাদের সাথে যোগসূত্র কায়েম হয় এবং এই প্রতিশ্রুতি নেয়া হয় যে যখন আমাদের মুক্তিবাহিনীর আক্রমণ করবে তখন তারা আমাদের সাথে পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে লড়বে। ২১শে অক্টোবর হাবিলদার আকমল প্রায় এক কোম্পানী গেরিলা নিয়ে মনোহরদীতে পাকিস্তানী বেইস অবরোধ করে। এই অবরোধের সময় ইপিআর-এর যেসব লোক পাকিস্তানীদের সাথে ছিল তারা হাবিলদার আকমলের পক্ষে চলে আসে এবং যুদ্ধ শুরু হয়।

এ যুদ্ধ প্রায় কয়েক ঘন্টা স্থায়ী হয়। অবশেষে পাকবাহিনীর প্রায় ২৫ জনের মত সৈনিক মারা যায়। বাকী ১১ জন আমাদের সৈনিকদের কাছে আত্মসমর্পণ করে। আত্মসমর্পণকারী পাকিস্তানী সৈনিদের বেঁধে আমার হেডকোয়ার্টারে নিয়ে যাবার সময় পথিমধ্যে ক্রুদ্ধ জনতা অনেককে পিটিয়ে মেরে ফেলে এবং মাত্র ৪ জনকে আমার হেডকোয়ার্টারে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল। এ যুদ্ধে হাবিলাদার আকমলের কার্যাবলী অত্যন্ত প্রশংসনীয়। এ যুদ্ধে এটাই প্রমাণিত হয়েছিল যে, বাঙালীরা যে যেখানেই ছিল আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামকে তারা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতো।

এ সমস্ত উল্লেখযোগ্য অপারেশন ছাড়া আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ অপারেশন আমার সৈনিকরা সাফল্যজনকভাবে সমাধা করেছে। তার সংখ্যা এত বেশী যেসব অপারেশনের বর্ণনা করা সম্ভব নয়। জুলাই মাসের ৭/৮ তারিখে মুজিব নগরে সেক্টর কমাণ্ডারদের যে কনফারেন্স হয়েছিল সে কনফারেন্স-এ তদানীন্তন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী এবং সেনাবাহিনীর প্রধান যেসব নির্দেশাবলী আমাদের দিয়েছিলেন সেগুলো আমরা যথাযথভাবে পালন করতে সক্ষম হই। তা নিদর্শন নিম্নে দেয়া হলঃ

গেরিলা তৎপরতা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য বাংলাদেশের অভ্যন্তরে গেরিলা ঘাঁটি তৈরী করার যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল সে পরিপ্রেক্ষিতে আমার নিয়ন্ত্রাণাধীন এলাকার মধ্যে যে গেরিলা ঘাঁটি ছিল, সেগুলো হলোঃ ১। সিলেটের চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ এবং বানিয়াচংগ, ২। ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমাতে নাসিরবগর, সরাইল, মুকুন্দপুর এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ৩। কুমিল্লাতে নবীনগর থানা, ৪। ঢাকা জেলায় রায়পুরা, শিবপুর, নরসিংদী, কাপাসিয়া, কালিয়াকৈর, মনোহরদী, জয়দেবপুর এবং কালীগঞ্জ, ৫। ময়মনসিংহে গফরগাঁও এবং ভালুকা, ৬। কিশোরগঞ্জ মহকুমাতে কিশোরগঞ্জ, কুলিয়ার চর, বাজিতপুর, কটিয়াদী, পাকুন্দিয়া এবং হোসেনপুর।

এই ঘাঁটিগুলোর প্রায় সবগুলোতেই কিছুসংখ্যক নিয়মিত বাহিনীর লোক ছিল এবং বাকি সব ট্রেনিংপ্রাপ্ত গেরিলা ছিল। এই সমস্ত ঘাঁটিগুলোর সাথে হেডকোয়ার্টারের নিয়মিত যোগযোগ রক্ষা করার জন্য লোক (রানার) নিয়োগ করা হয়েছিল। এ সমস্ত ''রানার'' ছাড়াও রায়পুরা এবং মনোহরদীতে অবস্থিত দুটো অয়ারলেস সেট-এর মাধ্যমে হেডকোয়ার্টারে খবরাখবর দেওয়া হত।

প্রত্যেকটি গেরিলা বেইস-এ দু'জন করে রাজনৈতিক উপদেষ্টা ছিল, যারা গেরিলাদের রাজনৈতিক নির্দেশাবলী দিত। এই রাজনৈতিক উপদেষ্টারা প্রত্যেক মাসেই আমার হেডকোয়ার্টারে এসে যোগাযোগ করত।

ভিতরে অবস্থিত ঘাঁটিগুলোর গেরিলা এবং নিয়মিত বাহিনীর বেতন-ভাতা রাজনৈতিক উপদেষ্টা এবং ঘাঁটির কমাণ্ডারদের মাধ্যমে পাঠানো হত। তারা প্রতি মাসে এসে বিল দিয়ে যেত এবং পরের মাসে টাকা নিয়ে যেত।

আগস্ট-সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আমাদের গেরিলা তৎপরতা এত তীব্র এবং ব্যাপক হয়ে উঠেছিল যে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর লোকেরা ছোট দলে বিভক্ত হয়ে চলাফেরা করতে সাহস পেত না। যে সকল স্থানে তাদের ঘাঁটি ছিল সে সমস্ত ঘাঁটির চারিদিকে বাঙালী রাজাকার দিয়ে প্রথম এবং দ্বিতীয় বেষ্টনী তৈরী করে রাখতো যাতে ঘাঁটি আক্রান্ত হলে প্রথমেই বাঙালীদের আক্রমণের সম্মুখীন হতে হয় এবং তারা সতর্কতা অবলম্বন করতে পারে। এতে বোঝা যায় যে, পাক সেনাবাহিনী মনোবল বেশ ভেঙ্গে পড়েছিল। তারা এমন ভীত সন্ত্রস্ত ছিল যে, ওসব ঘাঁটির নিকটবর্তী এলাকায় কোন প্রকার আওয়াজ বা শব্দ শুনলেই তারা ভয়ে আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে চিৎকার করে বলে উঠত 'মুক্তি আগেয়া'।

গাড়ি, ট্রেন, স্টীমার এবং লঞ্চ চলাচল এক রকম বন্ধই ছিল। হাট-বাজার, স্কুল-কলেজ স্বাভাবিক আকারে কখনো আসতে পারেনি। এমনকি বড় বড় শহরে, যেখানে পাকিস্তানীদের নিয়ন্ত্রণ ছিল সেখানেও স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ছিল না বললেই চলে। অপরপক্ষে যেসব এলাকা আমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল সেখানে স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় কোন বিঘ্ন সৃষ্টি হয়নি।

আগস্ট মাসের শেষের দিকে মুজিব নগর হেডকোয়ার্টার থেকে আমার কাছে এক নির্দেশ এসেছিল যে গেরিলা বাহিনীর সাথে সাথে নিয়মিত বাহিনী গড়ে তোলার জন্য যেন প্রস্ততত হই। সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম তারিখে আমি আমার সেক্টরকে (৩নং সেক্টরকে) তিন ভাগে ভাগ করি এবং আমার বাহিনীকে পুনর্গঠিত করি। ৩নং সেক্টরে যেসব লোক ছিল তাদের দ্বারাই এটা করা হয়। ৩নং সেক্টরে, ২য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট এবং ১১ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট এই দুই বাহিনীতে পরিণত করা হয়। একটি হল ৩নং সেক্টর বাহিনী যা দশটি কোম্পানী দ্বারা গঠিত। সেক্টর হেডকোয়ার্টার থাকে হেজামারাতে, আর একটি 'এস' ফোর্স হেডকোয়ার্টার স্থাপিত হয় ফটিকছড়াতে। এই 'এস' ফোর্স হেডকোয়ার্টারের অধীনে ২ এবং ১১ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ছিল।

এসব হেডকোয়ার্টার এবং ব্যাটালিয়নে নিম্নলিখিত অফিসাররা ছিলঃ

১। 'এস' ফোর্স হেডকোয়ার্টারঃ ক) কমাণ্ডার- লেঃ কর্নেল সফিউল্লাহ। খ) বি, এম, (বিগ্রেড মেজর)- ক্যাপ্টেন আজিজুর রহমান। গ) ডি, কিউ- ক্যাপ্টেন আবুল হোসেন। ঘ) সিগন্যাল অফিসার- ফ্লাইট লেঃ রউফ।

২। ২ ইস্ট বেঙ্গলঃ ক) কমান্ডিং অফিসার- মেজর মইনুল হোসেন চৌধুরী। খ) কোম্পানী কমাণ্ডারগণ হলেনঃ এ কোম্পানী- মেজর মতিউর রহমান এবং লেঃ আনিসুল হাসান, বি কোম্পানী- লেঃ বদিউজ্জামান এবং লেঃ সেলিম মোঃ কামরুল হাসান, সি কোম্পানী- লেঃ মোহাম্মদ ইব্রাহীম, ডি কোম্পানী- লেঃ গোলাম হেলাল মোরশেদ। গ) এডজুট্যান্ট- লেফটেন্যান্ট মোহাম্মদ সাঈদ। ঘ) মেডিক্যাল অফিসার- লেফটেন্যান্ট আবুল হোসেন।

৩। ১১ ইস্ট বেঙ্গলঃ ক) কমাণ্ডিং অফিসার- মেজর মোহাম্মদ নাসিম। খ) কোম্পানী কমাণ্ডারগণঃ বি কোম্পানী- মেজর সুবেদ আলী ভূঁইয়া এবং লেঃ আবুল হোসেন, ডি কোম্পানী- লেফটেন্যান্ট নাসের, সি

কোম্পানী- লেফটেন্যান্ট নজরুল ইসলাম, এ কোম্পানী- লেফটেন্যান্ট শামসুল হুদা বাচ্চু। গ) এডজুট্যান্ট- লেফটেন্যান্ট কবির। ঘ) মেডিক্যাল অফিসার- মইনুল হোসেন।

৪। ৩নং সেক্টরঃ ক) কমাণ্ডার- মেজর নুরুজ্জামান খ) সিভিলিয়ান স্টাফ অফিসার- নুরুউদ্দীন মাহমুদ ও এম. এ. মহী। গ) কোম্পানী কমাণ্ডারগণ হলেনঃ মেজর মতিন, ক্যাপ্টেন এজাজা আহমদ চৌধুরী, লেঃ সাদেক, লেঃ মজুমদার, লেঃ জাহাঙ্গীর (এরা প্রত্যেকে দুটো করে কোম্পানী পরিচালনা করত)। এ্যাসিস্ট্যান্ট সিভিলিয়ান অফিসার- আলকাস মিঞা ও আশেক হোসেন।

৩নং সেক্টরকে আমি 'এস' ফোর্স থেকে পৃথক করে দেই যাতে তারা সীমান্ত এলাকায় বহাল রাখতে পারে। 'এস' ফোর্স-কে পৃথক জায়গায় নিয়ে যাই যাতে তারা কনভেনশনাল ওয়ারফেয়ার-এর জন্য প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারে। এছাড়াও যেহেতু ব্যাটালিয়নে লোকসংখ্যা কম ছিল সেহেতু তাদের শক্তি বৃদ্ধির জন্য নতুন করে লোক নিয়োগ করা দরকার ছিল। এ ব্যাটালিয়নগুলোর শক্তি বৃদ্ধির জন্য আমি ১২০০ নতুন লোক ভর্তি করি। এ ভর্তি শেষ হয় সেপ্টম্বরের শেষের দিকে। অক্টোবর এবং নভেম্বর মাস পর্যন্ত তাদের ''নিয়মিত'' যুদ্ধ করার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

এই ট্রেনিং-এর সময় আমাকে ২ ইস্ট বেঙ্গল থেকে এক কোম্পানী সৈন্য পাঠাতে হয়েছিল বেলুনিয়ার যুদ্ধে ১০ ইস্ট বেঙ্গলের সাথে ২নং সেক্টরে যুদ্ধ করার জন্য। নভেম্বর মাসের ২১/২২ তারিখের দিকে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং বেলুনিয়া সেক্টর আমাদের হস্তগত হবার পর নভেম্বর মাসের ২৮ তারিখে আমি তাদেরকে আমার এলাকায় ফিরিয়ে আনি এবং আখাউড়া আক্রমণের পরিকল্পনা নেই।

''আখাউড়া যুদ্ধের'' জন্য আমি দুই ব্যাটালিয়ন সৈনিক নিয়োগ করেছিলাম। এক ব্যাটালিয়ন অর্থাৎ ১১ ইস্ট বেঙ্গলকে (এই ব্যাটালিয়ন-এর সৈনিকদের ১৫৭ জন ব্যতীত সবই নতুন ছিল) এ ভার দেওয়া হয় যে, তারা যেন পাকিস্তানী কোন সৈনিককে সিলেটের দিক থেকে অগ্রসর হতে না দেয়। আর ২ ইস্ট বেঙ্গলকে এ কাজ দেয়া হয় তারা যেন সিংগারবিল থেকে আখাউড়া পর্যন্ত সমস্ত এলাকা শত্রুমুক্ত করে। এ দু ব্যাটালিয়ন সৈন্য ছাড়াও আমি ৩নং সেক্টর থেকে দু কোম্পানী সৈন্য মোতায়েন করি যাতে পাকিস্তানী সৈন্যরা আগরতলা বিমানবন্দরের দিক থেকে আক্রমণ করে ২য় ইস্ট বেঙ্গলের কোনো ক্ষতি করতে না পারে।

এ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করা হয় ৩০শে নভেম্বর/১লা ডিসেম্বর রাতে। ৩০শে নভেম্বর পর্যন্ত আমার সৈন্যগণ এভাবে মোতায়েন করা হয়ঃ

১১ ইস্ট বেঙ্গল, মুকুন্দপুর, হরশপুর এলাকাগুলো তাদের নিয়ন্ত্রাধীনে আনে। এ ব্যাটালিয়নের নেতৃত্ব দেন মেজর নাসিম (বর্তমানে লেফটেন্যান্ট কর্নেল)।

তিন নং সেক্টরে যে দুটো কোম্পানী নিয়োগ করা হয়েছিল তারা আগরতলা বিমানবন্দরের উত্তর পশ্চিমাংশে খনন করে তাদের অবস্থা শক্তিশালী করে। এ কোম্পানী দুটোর নেতৃত্ব দেন মেজর মতিন।

দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট আক্রমণের জন্য তাদের স্টার্ট লাইনে তৈরী। এ ব্যাটালিয়নে যাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাঁরা হলেন ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডার মেজর মইনুল হোসেন চৌধুরী এবং কোম্পানী কমাণ্ডারের মধ্যে ছিলেন- এ কোম্পানী- মেজর মতিয়র রহমান, বি কোম্পানী- লেফটেন্যান্ট বদিউজ্জামান, সি কোম্পানী- লেফটেন্যান্ট ইব্রাহীম, ডি কোম্পানী লেফটেন্যান্ট মোরশেদ।

আক্রমণের সময় ছিল রাত ১টা। ১লা ডিসেম্বরের সকাল ৬টা পর্যন্ত ব্যাটালিয়ন যুদ্ধ করে আজমপুর রেলওয়ে স্টেশনের উত্তরাংশ পর্যন্ত দখল করে। বেলা প্রায় তিনটা পর্যন্ত আজমপুর রেলওয়ে স্টেশন এবং তার দক্ষিণাংশ আমাদের হস্তগত হয়। ১লা/২রা ডিসেম্বর রাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী আজমপুরে অবস্থানরত

আমাদের সৈনিকদের উপর আক্রমণ চালায় এবং এতে আমাদের সৈনিকদের পিছু আসতে বাধ্য হয়। ২রা ডিসেম্বর পুনরায় আক্রমণ চালিয়ে রেলওয়ে স্টেশন আমরা পুনর্দখল করি। কিন্তু রেলওয়ে স্টেশনের সম্মুখভাবে পাকিস্তানীদের বাঙ্কার এতো মজবুত ছিল যে সম্পূর্ণ এলাকা স্বল্পসংখ্যক সৈন্য এবং স্বল্প পরিমাণ ভারী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে দখল খুবই কষ্টকর ছিল। ৩রা ডিসেম্বর পর্যন্ত এভাবে আজমপুর রেলওয়ে স্টেশন আমাদের আয়ত্তাধীন থাকে এবং এখানেই দুই পক্ষের যুদ্ধ চলে। ৩রা ডিসেম্বর পাকিস্তানী ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার ৪ঠা ডিসেম্বর ভারতের ৫৭ মাউন্টেন ডিভিশন আখাউড়ার যুদ্ধে আমাদের সাথে মিলিত হয়। ভারতীয় সেনাবাহিনী আখাউড়াতে দক্ষিণ এবং পশ্চিমাংশ দিয়ে আখাউড়াকে অবরোধ করে। অবশেষে পাক বাহিনী ৫ই ডিসেম্বর আখাউড়াতে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ কমাণ্ডের নিকট আত্মসমর্পণ করে। এ যুদ্ধে আমাদের যে সব সৈনিক শহীদ হয়েছেন তাঁরা হলেন। ১। নায়েক সুবেদার আশরাফ আলী খান। ২। সিপাহী আমীর হোসেন। ৩। লেফটেন্যান্ট বদিউজ্জামান। ৪। সিপাহী রুহুল আমীন। ৫। সিপাহী শাহাব উদ্দিন। ৬। সিপাহী মুস্তাফিজুর রহমান। আখাউড়া পতনের পর কিছুসংখ্যক সৈন্য ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। পলায়নের সময় বেশ কিছূ সংখ্যক সৈন্য আমদের হাতে নিহত হয় এবং ধরা পড়ে।

এরপর ব্রাহ্মণবাড়িয়াকে অতি সত্বর আক্রমণের পরিকল্পনা নেয়া হয়। এ আক্রমণ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দুই দিক থেকে পরিচালিত হবে বলে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। একদিক হল ব্রাহ্মণবাড়িয়াকে দক্ষিণ দিক থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহর এবং অপর দিক হলো উত্তর দিক থেকে সিলেট সড়ক দিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহর পর্যন্ত । ভারতীয় সেনাবাহিনী আখাউড়া ব্রাহ্মণবাড়িয়া রেললাইন এবং উজানিস্যা ব্রাহ্মণবাড়িয়া সড়ক দিয়ে অগ্রসর হবে এবং আমার এস ফোর্স সিলেট ব্রাহ্মণবাড়িয়া সড়ক দিয়ে অগ্রসর হবে। ৫ই ডিসেম্বর আমি আমার ফোর্সকে নিম্নলিখিত নির্দেশ দেইঃ

৫ই ডিসেম্বর রাতে আমাদের যাত্রা শুরু হবে এবং বাহিনীর সামনে থাকবে ১১ ইস্ট বেঙ্গল। আর ২য় ইস্ট বেঙ্গল তাদের অনুসরণ করবে। তিন নং সেক্টরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে সে যেন তার সেক্টর কোম্পানী নিয়ে তেলিপাড়া ও মনতলা দখল করে নেয়। তাদের (১১ ইস্ট বেঙ্গলকে) যে কাজ দেয়া হয়েছিল তা হল চান্দুরার উত্তরাংশে একটি রোড ব্লক তৈরী করা যাতে সিলেট থেকে পশ্চাদপসারণকারীরা এ রাস্তায় না আসতে পারে। দ্বিতীয় কাজ হলো চান্দুরা থেকে সরাইল পর্যন্ত এলাকা শত্রুমুক্ত করা। এ নির্দেশ পালনের জন্য ব্যাটালিয়ান কমাণ্ডার নিম্নলিখিত পদক্ষেপ নেনঃ

তিনি এক কোম্পানী সৈন্য মেজর সুবেদ আলী ভুঁইয়ার নেতৃত্বে চান্দুরার উত্তরাংশে রোড ব্লাক তৈরি করার জন্য পাঠিয়ে দেন এবং বাকী ব্যাটালিয়নকে চান্দুরা থেকে সরাইল পর্যন্ত এলাকা শত্রুমুক্ত করার নির্দেশ দিয়ে অগ্রসর হবার আদেশ দেন। এ ব্যাটালিয়ন হরশপুর দিয়ে চান্দুরার দিকে অগ্রসর হয়। মেজর সুবেদ আলী ভুঁইয়ার যে কোম্পানীকে চান্দুরার উত্তরাংশে রোড ব্লক তৈরী করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। সে কোম্পনী রোড ব্লক তৈরী করে খবর পাঠায়। তখন ব্যাটালিয়নের বাকী সব লোক চান্দুরার নিকটবর্তী এলাকা পাইকপাড়াতে ছিল। রোড ব্লক তৈরীর খবর পাবার পর ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডার মেজর নাসিম ব্যাটালিয়-এর বাকী সবাইকে চান্দুরা হয়ে শাহবাজপুর সরাইল এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দিকে অগ্রসর হবার জন্য আদেশ দেন। বেলা তখন প্রায় ১২টা। অপারেশনের অগ্রগতি প্রত্যক্ষ করার জন্য আমিও তখন পাইকপাড়াতে ব্যাটালিয়ন হেড কোয়ার্টারে পৌঁছি। আমার সাথে ছিল আমার রানার। এই প্রায় এক হাজার গজ পেছনে ব্যাটালিয়ন হেড কোয়ার্টার এ কোম্পানীকে অনুসরণ করছিল। আমিও ব্যাটালিয়ন হেড কোয়ার্টারের সাথে সাথে অগ্রসর হই। চান্দুরাতে যে পুর্যন্ত পাকিস্তানী সৈন্য ছিল তারা পশ্চাদপসরণ করে শাহবাজপুরে আস্তানা তৈরী করে। ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডারকে আমি নির্দেশ দেই যে যত শীঘ্র সম্ভব শাহাবাজপুরে তিতাস নদীর উপরস্থ পুল দখল করতে, যাতে শত্রুসৈন্যরা সেটা ভেঙে দিয়ে আমাদের অগ্রগতি রোধ করতে না পারে। তাই অগ্রসরমান কোম্পানী দ্রুতগতিতে অগ্রসর হচ্ছিল। ব্যাটালিয়ন হেডকোয়ার্টারে আমিও আমার রানারসহ ৮ জন লোক ছিলাম।

এই হেডকোয়ার্টার যখন ইসলামপুরের নিকট পৌঁছে তখন পেছন থেকে একখানা ট্রাক আসতে দেখা যায়। ট্রাকখানা যে রঙ্গের ছিল সে রকম একখানা গাড়ী ১১ইস্ট বেঙ্গলেরও ছিল। ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডার গাড়ীখানা দূর থেকে দেখে আমাকে বলে ‘‘স্যার তেলিয়াপাড়া নিশ্চয়ই আমাদের হস্তগত হয়েছে এবং আমার গাড়ীও চলে আসছে।’’ এখানে বলে রাখা দরকার যে, গাড়ী একমাত্র তেলিয়াপাড়া হয়ে আসতে পারত। আমাদের গাড়ী ছাড়া অন্য কোন গাড়ী আসতে পারবে বলে আমাদের বিশ্বাস ছিল না। কেননা চান্দুরা এবং মাধবপুরের মাঝামাঝি জায়গায় আমাদের রোড ব্লক ছিল, যার কমাণ্ডার ছিল মেজর সুবেদ আলী ভুঁইয়া। গাড়ী আমাদের কাছে আসতেই ড্রাইভারকে ইশারা দিয়ে আসতে বলা হয় এবং গাড়ী থেমে যায়। আশ্চর্যের বিষয় যে গাড়ীটা আমাদের ছিল না। সে গাড়ীতে পাকিস্তানী সৈন্য বোঝাই ছিল। তারা তেলিয়াপাড়া থেকে পশ্চাদপসরণ করে আসছিল। গাড়িতে পাকিস্তানী সৈন্য দেখে তাদেরকে আত্মসমর্পণের জন্য নির্দেশ দেই। দু‘ চারজন অস্ত্র রেখে হাত উঁচু করে দাঁড়িয়ে যায় এবং তার মধ্যে থেকে দুই একজন বোধ হয় আমাদের সংখ্যা কম দেখে গোলাগুলি শুরু করে এবং গাড়ির চারিদিকে লাফিয়ে পড়ে। গাড়ীর সামনের সিটে বসা ছিল একজন সুবেদার। সেও গাড়ী থেকে লাফিয়ে পড়ে আমাকে ধরে ফেলে। বাকী সৈন্যরা গাড়ী থেকে নেমে রাস্তার অপর পাশে চলে যায়। এসব সৈনিকদের অধিকাংশই ছিল পাঠান এবং মিলিশিয়া পোশাক পরিহিত ।

আমরা ইসলামপুরের যে স্থানে ছিলাম সেখানে থেকে এক হাজার গজ দূরে শাহাবাজপুরের দিকে ছিল এক কোম্পানী সৈন্য। এবং আমাদের প্রায় মাইলখানেক পিছনে পাইকপাড়া থেকে ক্রস কানট্রি হয়ে চান্দুরার দিকে অগ্রসরমান বাকী সৈন্য । গাড়ীর দক্ষিণ পার্শ্বে এবং পেছনে আমাদের লোক অস্ত্র উঠিয়ে ছিল। গাড়ীর উত্তর পাশ দিয়ে লাফিয়ে পড়ে পাকিস্তানী সৈন্যরা গ্রামের দিকে পালিয়ে যায় এবং সেখান থেকে গোলাগুলি ছোড়ে। সুবেদার সামনের সিটে দক্ষিণ পার্শ্বে বসা ছিল। সে গাড়ী থেকে লাফিয়ে পড়ে আমাকে ধরে ফেলে। সুবেদারের কাছে ছিল পিস্তল। আমার কাছেও ছিল পিস্তল। দুইজনেরই পিস্তল ছিল ‘পাউচ’-এর মধ্যে। আমার এসএমজিটা আমার রানারের কাছে। রানার ছিল আমার পিছনে দাঁড়িয়ে। সুবেদার এবং আমার মাঝে ধস্তাধস্তি প্রচণ্ড। কেউ কারোর পিস্তল বের করার সুযোগ পাচ্ছিলাম না। ইতিমধ্যে আমার রানার কয়েকবার সুবেদারকে লক্ষ্য করে গুলি করতে চেয়েছিল। হঠাৎ আমার রানারের পায়ে গুলি লাগে এবং সে পড়ে যায়। পড়ে গিয়ে গুলি করার চেষ্টা করছিল। কিছুক্ষণের মধ্যে মেজর নাসিমও গুলিবদ্ধ হয় এবং আহত হয়ে পড়ে যায়। আমি অবশেষে জুডো কায়দায় তার বেষ্টনী থেকে মুক্তি পাই এবং আমি জোরের সাথে তার মুখের চোয়ালে এক ঘুষি মারি। তাতে সে পড়ে যায় এবং গিয়ে আমার রানারকে ধরে ফেলে এবং স্টেন দিয়েই আমাকে লক্ষ্য করে গুলি করে। তার ও আমার মাঝে ব্যবধান ছিল মাত্র খুব বেশি হলে এক গজ। গুলি যে বেরিয়ে গেছে সেটা আমি দেখেছি কিন্তু কোথায় লেগেছে তা লক্ষ্য করিনি।

সে সময় আমাদের ‘‘একজন সৈন্য সেখানে রাইফেল উঁচিয়ে গুলি করার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। আমি তার কাছ থেকে রাইফেলটা নিয়ে সে সুবেদারের মাথায় বাড়ি দেই। সুবেদার মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। আমি রাইফেল দিয়ে তার মাথায় কয়েকবার আঘাত করছিলাম। সে সময় আমাদের কোন সৈন্যই অবস্থানে ছিল না। তাদের সবার অবর্তমানে । ঐ সুবেদারকে মেরেছিলাম। আমরা যখন ধস্তাধস্তি, গোলাগুলিতে ব্যস্ত ছিলাম তখন আমাদের সম্মুখে যে কোম্পানী অগ্রসর হচ্ছিল তারা পেছনের দিকে আসে এবং যারা পেছন থেকে আসে তারাও সম্মুখে অগ্রসর হয়। ঠিক এ সময় আমি দেখি যে আর একখান গাড়ী পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। সেটা একটা বাস ছিল। সে বাস থেকে অবতরণ করছিল পাকিস্তানী সৈন্য। আমি তা দেখে রাইফেল উঁচিয়ে তাদের উপর গুলি করতে প্রস্তুতি নেই। কিন্তু দেখলাম যে রাইফেলটা ভেঙ্গে গেছে। রাইফেলটা ছুড়ে ফেলে আমি চিৎকার করে বলি আমার স্টেন কোথায়? এবং সাথে সাথে পিস্তল বের করি। পিস্তল বের করে দেখি সেটাও বিকল হয়ে গেছে। তখন বুঝতে পারলাম সুবেদার যখন আমাকে এসএমজি দিয়ে গুলি করেছিল তা পিস্তলে লেগেছিল। পিস্তলে দুটো গুলির আঘাত বিদ্যমান ছিল। পিস্তলটাকে আমি আবার পাউচ-এর ভিতর রেখে কোন উপায় না দেখে এক

ডোবার ভিতর লাফিয়ে পড়ি। আমার পরনে ছিল অলিভ গ্রীন পোশাক। ডোবায় ছিল কাদা। অলিভ গ্রীন আর কাদা মিলে দেখতে প্রায় মিলিশিয়া পোশাকের মতোই হয়ে গিয়েছিল। আমি তখন দেখছিলাম যে গাড়ী থেকে প্রায় ২০/২৫ জন লোক নেমে ঐ গ্রামের চারদিকে অবস্থান নিচ্ছে। আমি যে ডাবার মাঝে ছিলাম তা তারা দেখেছিল। বুঝতে পারলাম যে কোন মুহূর্তে তারা আমাকে গুলি করবে। ভাবছিলাম কাদাপূর্ণ ডোবার ভিতর মরার চেয়ে আর একবার চেষ্টা করে দেখা যাক। তাই আমি ডোবার মধ্য থেকে উঠেই তাদের মধ্য দিয়েই চলে যাই। এবং এক বাড়িতে ঢুকে পড়ি। ঐ বাড়িতে একটা খোলা ঘরের ভিতরে ঢুকে সেখানে বসে পড়ি এবং মৃত্যুর প্রহর গুনতে থাকি। কারণ সে বাড়ির চারিদিকেই পাকিস্তনী সৈন্য মোতায়েন ছিল। আমি যখন ঘরের ভিতর বসেছিলাম তখন আমাদের সৈন্যরা পাকিস্তানী বাহিনীর দুই দিক থেকে আক্রমণ করে। বেলা তখন প্রায় ৪টা।

এ আক্রমণে পাকিস্তানী সৈন্যদের বেশ ক্ষয়ক্ষতি হয়। আত্মরক্ষায় ব্যস্ত হয়ে পিছনে হটতে থাকে। পশ্চাদপসরণকালে সবাই ধরা পড়ে। এ খণ্ডযুদ্ধে পাকিস্তানীদের ২৫ জন মারা যায় এবং ঐ দিন ১১ জনকে জীবিত অবস্থায় ধরা হয়। পরের দিন আরো তিনজনকে ধরা হয়। আমাদের দুইজন শহীদ হয় এবং ১১জন আহত হয়। এই খণ্ডযুদ্ধে যারা সাহসের পরিচয় দিয়েছিল তারা হলঃ ১। লেফটেন্যান্ট নজরুল ইসলাম। ২। নায়েক মুস্তফা আলী। ৩। হাবিলদার আবুল কালাম। ৪। হাবিলদার রফিক (শহীদ)।

এ যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন হাবিলদার রফিক এবং সিপাহী মুজিবর রহমান। আমাদের ডাক্তার লেফটেন্যান্ট মইনুল ইসলাম আহত হন। তাই আহতদের চিকিৎসা সেখানে করতে না পারায় আমি আহতদের পাসিস্তানীদের ট্রাকে (আমাদের দ্বারা দখলকৃত) করে চান্দুরার দিকে নিয়ে যাই। সাথে কোন ড্রাইভার না থাকায় আমি নিজে গাড়ী চালিয়ে চান্দুরার দিকে নিয়ে যাই। এ ঘটনা এতো অল্প সময়ের মধ্যে ঘটেছিল যে, পেছনে থেকে যারা অগ্রসর হচ্ছিল তারা ঘটনাস্থলে তাড়াতাড়ি পৌঁছতে পারেনি। আমি যখন গাড়ী চালিয়ে চান্দুরার দিকে যাচ্ছিলাম তখন আমাদের লোক মনে করছিল যে শত্রুরা পালিয়ে যাচ্ছে। তখন তারা আমাদের উপর মেশিন গান দিয়ে গুলিবর্ষণ করে। আল্লাহ্ অপার করুণায় তাদের মধ্যে কেউ হয়ত অমাকে চিনতে পারে এবং গুলিবর্ষণ বন্ধ করে। আমি কোম্পানী লোকদের ভিতর দিয়ে গাড়ী চালিয়ে যখন চান্দুরার দিকে যাচ্ছিলাম তখন পেছনের সর্বশেষ যে কোম্পানী (আমাদের) ছিল তারা ভেবেছিল যে শত্রুএই কোম্পানীর হাত থেকেই রক্ষা পেতে সক্ষম হয়েছে। তাই তারাও আমার উপর বেপরোয়াভোবে গুলিবর্ষণ করে। এতে গাড়ীর উইণ্ড স্ক্রীন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। কিন্তু এবার খোদার অসীম কৃপায় ঠিক পূর্বের মত বেঁচে যাই। তারপর চান্দুরায় পৌঁছে আহতদের চিকিৎসা ব্যবস্থা করি। যেহেতু সবাই গুরুতরভাবে আহত হয়েছিল, তাই খুব দ্রুত তাদের হাসপাতালে পৌঁছাবার ব্যবস্থা নেই। সবাই স্ট্রেচারে করে আগরতলা পাঠিয়ে দেই।

ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডার নাসিম এ খণ্ডযুদ্ধে আহত হন। তাঁর পরবর্তী সিনিয়র সুবেদ আলী ভুঁইয়ার উপর থেকে আমার আস্থা চলে গিয়েছিল এজন্য যে, সে রোড ব্লক করা সত্বেও কিভাবে শত্রুরা আমাদের পেছনে চলে আসলো? আমার রিয়ার হেড কোয়ার্টার এর সাথে আমার কোন যোগাযোগ ছিল না। কারণ এ যুদ্ধে অয়ারলেসটাও নষ্ট হয়ে যায়। তাই আমি অন্য কোন অফিসার এনে এ ব্যাটালিয়নের কমাণ্ডার পদে নিয়োজিত করার সিদ্ধান্ত নিলাম।

এ ব্যাটালিয়নে শতকরা ৮০জন সৈনিক ছিল নতুন শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং এটাই ছিল খণ্ডযুদ্ধের মাধ্যমে তাদের প্রথম অপারেশন। যুদ্ধে ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডার আহত হওয়াতে সৈনিকদের মনোবল একটু দমে যায়। আমি আবার পাইকপাড়ার দিকে ফিরে আসার সময় লে. নাসিমকে ব্যাটালিয়ন নিয়ন্ত্রণে রাখতে নির্দেশ দিয়ে আসি এবং তাকে এও বালে আসি যে আমি অফিসার নিয়ে আসছি। পাইকপাড়ায় পৌঁছে আমি এ সিদ্ধান্ত নেই যে যত শীঘ্র হোক আমাকে পেছনে যেতে হবে এবং সেখান খেকে অফিসার আনতে হবে। আমি পেছনে না গেলে হয়তো অন্য কোন অফিসারকে আনা সম্ভব নয়। কারণ তারা কোন না কোন কমাণ্ড-এ আছে। এই অসুবিধার জন্য আমি সেদিন রাতেই রিয়ার হেডকোয়ার্টারে চলে যাই এবং সেক্টর কোম্পানী কমাণ্ডার মেজর

মতিনকে এবং আমার বিএম ক্যাপ্টেন আজিজকে এই ব্যাটালিয়নে যোগ দিতে নির্দেশ দেই। মেজর মতিনকে ব্যাটালিয়নের কমাণ্ডার হিসেবে নিয়োগ করি।

৭ই ডিসেম্বর সকালে এ দুইজন অফিসার নিয়ে আমি পাইকপাড়া ব্যাটালিয়ন হেড কোয়ার্টারের উদ্দেশ্য যাত্রা করি এবং বেলা প্রায় দুটোর দিকে ব্যাটালিয়ন হেড কোয়ার্টারে পৌঁছি।

মেজর মতিনকে নতুন ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডার নিয়োগ করে তাকে ব্যাটালিয়নের ভার গ্রহন করতে বলি এবং আমাদের অগ্রগতি যেন রোধ না হয় সে জন্য সামনে অগ্রসর হবার জন্য নির্দেশ দেই। বলা বহুল্য, ৬ই ডিসেম্বর আমরা ইসলামপুরের খণ্ডযুদ্ধে লিপ্ত থাকাতে শাহবাজপুরে তিতাস নদীর উপর সময় মত দখল করতে না পারায় পাকবাহিনী সে পুলটি ভেঙ্গে দেয়।

পুলটি ভেঙ্গে যাওয়াতে নদীর ওপারে পাকিস্তানী সৈন্যসংখ্যা কি পরিমাণ ছিল তা না জেনে অগ্রসর হওয়া সম্ভব ছিল না। তাই আমি ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডারকে আমি শিগগির পাক বাহিনীর আস্তানা সম্বন্ধে খবর নেওয়ার নির্দেশ দেই। ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডার ব্যাটালিয়নে একেবারে নতুন এবং পৌঁছেছিল প্রায় বিকেলের দিকে। তাই তাকেও খরবাখবর নেওয়ার জন্য একটু সময় দিতে হয়েছিল। ৭ই ডিসেম্বর রাতে এক কোম্পানী সৈন্য শাহবাজপুরের দিকে পাঠানো হয় এবং রাতের মধ্যেই যখন খবর পাওয়া গেল যে সেখানে সৈন্যসংখ্যা কম তখন সে কোম্পানী নদীর অপর পার দখল করে নেয়। এ সংবাদ পাওয়া গেল ৮ই ডিসেম্বর সকালে। খবর পাবার সাথে সাথে ব্যাটালিয়নের বাকী কোম্পানী শাহবাজপুরের দিকে অগ্রসর হয়।

যে কোম্পানী ৭/৮ই ডিসেম্বর রাতে শাহবাজপুর দখল করেছিল তার অধিনায়ক ছিল মেজর সুবেদ আলী ভূঁইয়া। আমি ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডারকে নির্দেশ দেই, মেজর সুবেদ আলী ভূঁইয়া যেন তার কোম্পানী নিয়ে সরাইলের দিকে অগ্রসর হয়। কোম্পানী সরাইল পর্যন্ত পাকিস্তানীদের কোন বাধা পায়নি। আমার এস ফোর্সের অগ্রভাগ যখন সরাইলে পৌঁছে তখন ভারতীয় সেনাবাহিনীর ৫৭ মাউন্টেন ডিভিশন ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে পৌঁছে গিয়েছিল। ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় শত্রু না থাকাতে কোন যুদ্ধ হয়নি। পাকবাহিনী ব্রাহ্মণবাড়িয়া এবং সরাইল ত্যাগ করে আশুগঞ্জ এবং ভৈরববজারে একত্রিত হয়। ভারতীয় সেনাবাহিনী আশুগঞ্জের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। আমি সময় নষ্ট না করে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দিকে অগ্রসর না হয়ে আমার ফোর্সকে নির্দেশ দেই আশুগঞ্জের দিকে রওনা হবার জন্য। ৮ই ডিসেম্বর বিকাল পর্যন্ত আমার ফোর্সকে আজমপুর এবং দুর্গাপুর পৌঁছে। আমার ফোর্স-এর অগ্রভাগে তখন পর্যন্ত ছিল ১১ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ঐ দিন ছিল শাহবাজপুরে।

আমার হেডকোয়ার্টার আমি তৈরী করে সরাইলে, যেখানে ১১ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ২কোম্পানী সৈন্য ছিল। ১১ ইস্ট বেঙ্গলের বাকী দুই কোম্পানী সৈন্য আজমপুর এবং দুর্গাপুরে ছিল। শাহবাজপুরে কোম্পানী নেতৃত্ব দিয়েছিল মেজর সুবেদ আলী ভুঁইয়া এবং দুর্গাপুরে লে. নাসের। আমার ফোর্স যখন আজমপুর এবং দুর্গাপুরে অবস্থান করছিল তখন ভরতীয় ৩১১ মাউন্টেন ডিভিশনের তিনটি ব্যাটালিয়ন নিম্নলিখিত স্থানে মোতায়েন ছিল ১০, বিহার রেজিমেন্ট দুর্গাপুরের দক্ষিণে, ১৮ রাজপুত রেজিমেন্ট তালশহর এবং দুর্গাপুরের মাঝামাঝি জায়গায়, ৪ গার্ড তালশহরে এবং ৭৩ মাউন্টেন ব্রিগেড ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে।

আশুগঞ্জের সন্নিকটবর্তী হবার পর আমরা সামনে অগ্রসর হতে পারছিলাম না। কারণ পাক বাহিনী ভৈরব বাজার থেকে আমাদের উপর দূরপাল্লার কামানের গোলাবর্ষণ করছিল অবিশ্রান্তভাবে। কিন্তু ভারতীয় দূর পাল্লার কামান তখন পর্যন্ত আগরতলা এবং সিঙ্গারবিলের আশপাশে ছিল। আগরতলা এবং সিংগারবিল থেকে তাদের গোলা ভৈরব পর্যন্ত পৌঁছাচ্ছিল না। তাই আমাদের অগ্রগতিতে বাধা পড়ে। ৮ই ডিসেম্বর এভাবে অতিবাহিত হয়। ৯ই ডিসেম্বর আমার সৈনিকরা আজমপুর এবং দুর্গাপুর থেকে অত্যন্ত সর্তকতার সাথে আশুগঞ্জের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। ভারতীয় ৩১১ মাউন্টেন ব্রিগেডও অনুরুপভাবে অগ্রসর হচ্ছিল। পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর

আশুগঞ্জ এবং ভৈরবের ঘাঁটি খুবই শক্তিশালী ছিল। কারণ আখাউড়া, তেলিয়াপাড়া এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া এসব স্থানে তাদের ১৪, ডিভিশন ছিল। তারা বিভিন্ন স্থান থেকে পশ্চাদপসরণ করে। সমস্ত ফোর্স ভৈরব এবং আশুগঞ্জে একত্রিত করে। যদিও তারা সংখ্যায় আমাদের চেয়ে বেশি ছিল তবুও তাদের মনোবল ছিল না বললেই চলে। ৯ই ডিসেম্বর এভাবে দূরপাল্লার কামানের গোলাগুলি চলে। ১০ই ডিসেম্বর ভোরের দিকে ১৮ রাজপুত রেজিমেন্ট আশূগঞ্জের পাকিস্তানীদের প্রতিরক্ষাব্যূহের ভিতর ঢুকে পড়ে এবং এক প্রকার পাকিস্তানী ফাঁদের ভিতর পড়ে যায়। তাই ১০ বিহার রেজিমেন্টর এবং আমার ফোর্স ১১ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট-এর দুটো কোম্পানী তাদের সে ফাঁদ থেকে মুক্ত করার জন্য দুর্গাপুরের দিক থেকে আশুগঞ্জে আক্রমণ চালায়। যখন এ আক্রমণ চলছিল তখন আমি দুর্গাপুরে। বেলা প্রায় সাড়ে দশটায় পাকিস্তানী সৈনিকরা ভৈরব পুলের আশুগঞ্জের সংলগ্ন অংশ ডিনামাইট দ্বারা উড়িয়ে দেয়। ভারতীয় এক স্কোয়াড্রন ট্যাংকও দুর্গাপুরের দিক থেকে এ আক্রমণে অংশ নেয়। যেহেতু ১৮ রাজপুত রেজিমেন্ট ফাঁদের ভিতরে ছিল, তাদের সে ফাঁদ থেকে উদ্ধার করার জন্য বেপরোয়াভাবে আক্রমণ চালাতে হয়। ভারতীয় ট্যাংকগুলিও পাকিস্তানী ট্যাংকবিধ্বংসী ফাঁদের ভিতরে পড়ে যায়। ১৮ রাজপুত রেজিমেন্ট ফাঁদ থেকে মুক্ত হবার সুযোগ পায়। কিন্তু উভয় দলেরই ভীষণ ক্ষয়ক্ষতি হয়। এ যুদ্ধে পদাতিক ছাড়াও ভারতীয় ৪টি ট্যাংক বিধ্বস্ত হয়। ১০ তারিখের এই যুদ্ধের পর আমরা আবার পিছনে ফিরে আসি এবং আশুগঞ্জ ও ভৈরব আক্রমণের জন্য পরিকল্পনা নেই। ১০/১১ ডিসেম্বর রাতে যে সব পাকিস্তানী সৈন্য আশুগঞ্জে ছিল, তারা ভৈরব চলে যায়। ১১ই ডিসেম্বর ভারতীয় ১৯ পাঞ্জাব রেজিমেন্টের দুটি কোম্পানী হেলিকপ্টারযোগে নদীর অপর পাড়ে নিয়ে যাওয়া হয়। ঐ দিনই বেলা প্রায় সারে এগারোটায় ভৈরব পুলের ভৈরব সংলগ্ন অংশ ডিনামাইট দিয়ে ভেঙ্গে দেয়া হয়। এবং তার সাথে আশুগঞ্জ আমাদের হস্তগত হয়। ভৈরব তখন অবরোধ অবস্থায় থাকে।

সম্মিলিত কমাণ্ডের হেডকোয়ার্টারে তখন এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে ভৈরব অবরোধ অবস্থাতে থাকবে। এ অবরোধ আমার এক ব্যাটালিয়ন এবং ভারতীয় ৭৩ মাউন্টেন বিগ্রেড থাকবে। আর বাকী ভরতীয় ৩১১ মাউন্টেন ব্রিগেড এবং আমার বাকী সৈন্য ভৈরবকে পাশ কাটিয়ে নরসিংদী অভিমুখে যাত্রা করবে, যাতে খুব শিগগিরই ঢাকা দখল করা যায়। নরসিংদী দখল করার জন্য ৪ গার্ড রেজিমেন্টকে নির্দেশ দেয়া হলো এবং তাদেরকে হেলিকপ্টারযোগে নরসিংদীতে অবতরণ করানো হলো। ৩১১ মাউন্টেন ব্রিগেডের বাকী ব্যাটালিয়নকে (১০, বিহার এবং ১৮ রাজপুত) পদব্রজে নরসিংদীতে রওনা হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। আমি ১১ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে ভৈরব এবং আশুগঞ্জে অবরোধের নির্দেশ দিয়ে তাদের মোতায়েন করি। ২য় ইস্ট বেঙ্গল এবং সেক্টর ট্রুপসদের নির্দেশ দেই যে তারা যেন পদব্রজে নরসিংদীর দিকে রওয়ানা হয়।

১২ই ডিসেম্বর ২য় ইস্ট বেঙ্গল ব্রাহ্মণবাড়িয়ার লালপুর হয়ে মেঘনা নদী অতিক্রম করে রায়পুরাতে পৌঁছে। আমি আমার হেডকোয়ার্টার ২য় ইস্ট বেঙ্গলের সাথে রাখি। ১২ ই ডিসেম্বর রাত আমরা রায়পুরাতে কাটাই। ১৩ই ডিসেম্বর সকালে আমরা নরসিংদী অভিমুখে রওনা হই। সেদিনই বিকেলে আমরা নরসিংদীতে পৌঁছি। নরসিংদী পৌঁছে আমরা শুনতে পেলাম যে ৪ গার্ড রেজিমেন্ট নরসিংদী দখল করেছে। তারা এখানে হেলিকপ্টারযোগে এসেছিল। ১৩ই ডিসেম্বর আমরা নরসিংদীতে অবস্থান করি। যেহেতু ৪, গার্ড রেজিমেন্ট নরসিংদীতে সর্ব প্রথম পৌঁছেছিল, তাই নরসিংদীর সমস্ত গাড়ী, যানবাহন তাদের হস্তগত হয়। ১৪ই ডিসেম্বর যখন আমরা ঢাকা অভিমুখে রওনা হই তখন আমাদের কাছে কোন যানবাহন ছিল না। তাই আবার আমরা পদব্রজে ঢাকা অভিমুখে রওনা হই। এ অভিযানে ৪, গার্ড রেজিমেন্ট সম্মুখভাগে ছিল। তারা নরসিংদী ডেমরা সড়ক দিয়ে বড় পা পর্যন্ত পৌঁছে। আমি তাদের অনুসরণ না করে ২য় ইস্ট বেঙ্গলকে নির্দেশ দিলাম যে তারা যেন তারাবোর দিকে না গিয়ে ভুলতা থেকে মুরাপাড়া রুপগঞ্জ হয়ে ঢাকার দিকে অগ্রসর হয়। ১৪ ই ডিসেম্বর আমার সমস্ত ফোর্স মুড়াপাড়া পৌঁছে যায়। এবং শীতলক্ষ্যা নদী পার হয়ে বালু নদীর পাড়ে পৌঁছে যায়। ১০ বিহার রেজিমেন্ট ঐ দিন রুপসী পৌঁছেছিল। ১৪ ডিসেম্বর আমাদের অবস্থান নিম্নরুপ ছিলঃ গার্ড এবং ১৮ রাজপুত রেজিমেন্ট ডেমরার পূর্ব পাড় তারাবোতে, ১০ বিহার রেজিমেন্ট শীতলক্ষার পূর্ব পাড়ে রুপসীতে। আমার ফোর্স-এর ২য়

ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট শীতলক্ষ্যার পশ্চিম পাড় গাঁও এবং বালু নদীর পশ্চিম পাড়ে ডেমরার পেছনে ছিল। সেক্টর ট্রুপস বাসাবোর আশপাশে। ১৪,১৫ এবং ১৬ই ডিসেম্বর যুদ্ধ হয়। ১৬ই ডিসেম্বর বেলা প্রায় ১০টা থেকে ডেমরা ঢাকা রোড আমাদের নিয়ন্ত্রণাধীনে ছিল। ডেমরাতে পাকিস্তানী সৈন্যরা প্রায় অবরোধ অবস্থায় ছিল। ১৬ই ডিসেম্বর সকাল থেকেই কথা হচ্ছিল যে পাকিস্তানী সৈন্যরা আত্মসমর্পণ করবে। কিন্তু বেলা বারোটা পর্যন্ত যুদ্ধ অব্যাহত থাকে। বেলা সাড়ে বারোটায় পাকিস্তানীরা ডেমরা-ঢাকা সড়কের উপর অস্ত্র সংবরণ করে। ডেমরা-ঢাকার যুদ্ধে পাকিস্তনীরা যদিও ফ্রেশ ট্রুপস (সীমান্ত এলাকায় সৈনিকরা ঢাকা আসার আগেই অবরোধ অবস্থায় ছিল এবং ঢাকাতে অবস্থানরত সৈনিকরা ঐ দিন পর্যন্ত কোন যুদ্ধে লিপ্ত হয় নাই, তাই যুদ্ধক্লান্ত ছিল না) । ব্যবহার করেছিল, কিন্তু তবুও তারা বিশেষ সুবিধা করতে পারেনি এ জন্য যে, তাদের নিকট দূরপাল্লায় কামান ছিল না। সে গুলোর প্রায় সবগুলোই সীমান্ত এলাকায় ছিল। কিন্তু অপরদিকে ভারতীয় ট্যাংক এবং দূরপাল্লার কামান ঢাকার আশপাশে আনতে সক্ষম হয়েছিল। আমাদের তরফ থেকে আমরা বরপার কাছে ফিল্ড গানগুলোর সাহায্যে ঢাকা শহর এবং ডেমরাতে গোলাবর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিল। এখানে বলে রাখা দরকার য়ে, আগরতলা থেকে ঢাকা শহর পর্যন্ত আমাদের অভিযানে বিশেষ করে আমার এস ফোর্স কোন যানবাহন পায়নি। তাই সমস্ত রাস্তাটুকু তাদের পায়ে হেঁটে আসতে হয়েছিল। পায়ে হেঁটে আসতে হয়েছে ঠিকই তবুও তারা ক্লান্তি অনুভব করছিল না। করণ তারা সবাই জানতো যে পাকিস্তানীদের পতন হচ্ছে এবং ঢাকার পতন অত্যাসন্ন। আমরা আগরতলা থেকে যখন অগ্রসর হই, তখন অস্ত্র শস্ত্র গোলাবারুদ ছাড়া আর কিছুই আমাদের সাথে আনিনি এবং অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ সবগুলোই জনসাধারণ ঢাকা পর্যন্ত বহন করে নিয়ে এসেছিল। শুধু আমাদেরই নয়, ভারতীয় সেনাবাহিনীর অস্ত্রশস্ত্রও এভাবে করে আনা হয়।

৬ই ডিসেম্বর থেকে ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত এ দশ দিন আমরা কোন প্রকার রসদ সাথে বহন করিনী। কিন্তু এক বেলাও না খেয়ে থাকিনি। আমাদের খাবারের ব্যবস্থা জনসাধারণ করেছিল। আমাদের খাবারের ব্যবস্থার কথা কাউকে বলতেও হয়নি। কোন কোন জায়গায় এমনও হয়েছে যে, খাবারের প্রস্তুতির দেরী দেখে আমরা সামনে অগ্রসর হয়েছি এবং জনসাধারণ পরে পেছনে থেকে মাথায় করে চার পাঁচ মাইল দূর পর্যন্ত খাবার বহন করে নিয়ে এসেছে আমাদের খাওয়ানোর জন্য।

১৬ই ডিসেম্বর বেলা প্রায় ডুটায় ডেমরাতে পাকবাহিনী আমাদের বাংলাদেশে-ভারত যৌথ কমাণ্ডের কাছে অস্ত্র সংবরণ করে। ঐ সময় আমাকে সংবাদ দেয়া হয় যে, বেলা সাড়ে তিনটায় আমি যেন ঢাকা বিমান বন্দরে উপস্থিত থাকি। কারণ সে সময় লেঃ জেনারেল অরোরা আসছেন এবং লেঃ জেনারেল নিয়াজীও সেখানে উপস্থিত থাকবেন। আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে আমি যেন উপস্থিত থাকি। যদিও ডেমরাতে পাকসেনা আত্মসমর্পণ করেছিল তবুও ডেমরা ও ঢাকার মধ্যবর্তী এলাকা মাতুয়াইলে তখনো পাকসেনারা তাদের অবস্থান রক্ষা করছিল। বেলা তখন প্রায় ২টা। আমাকে সাড়ে তিনটায় বিমানবন্দরে উপস্থিত থাকতে হবে। তাই ২য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের কমাণ্ডার মেজর মইনকে ব্যাটালিয়ন নিয়ে ঢাকা চলে আসার নির্দেশ দেই। পাকিস্তানী ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডার কর্নেল খিলজীকে বলি যে, আমাকে ঢাকা বিমানবন্দরে যেতে হবে। এবং তোমার সৈনিকরা যারা মাতুয়াইলে আছে তাদেরকে তুমি গোলাগুলি বন্ধ করতে নির্দেশ দাও। আমরা একই জীপে ডেমরা থেকে মাতুয়াইলের দিকে যাই এবং কর্নেল খিলজীকে আগে পাঠিয়ে দেই সে যেন তার সৈনিকদের নিয়ন্ত্রণে আনতে পারে। সৈনিককে নিয়ন্ত্রণে আনতে খিলজীকে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। অবশেষে সে তার সৈনিকদের আত্মসমর্পণ করাতে সক্ষম হয়।

মাতুয়াইলে আত্মসমর্পণের পর আমি এবং ডেল্টা সেক্টর কমাণ্ডার ব্রিগেডিয়ার সাবেক সিং ঢাকা বিমানবন্দর অভিমুখে রওয়ানা হই এবং সাড়ে তিনটার মধ্যে আমরা বিমানবন্দরে পৌঁছে যাই। বিমানবন্দরে পৌঁছে দেখতে পাই যে, সেখানে জেনারেল নিয়াজী এবং ভারতীয় ইস্টার্ন কমাণ্ডের জেনারেল জেকব, জেনারেল স্বাগত সিং, জেনারেল নাগ্রা ও আরো অনেকে উপস্থিত রয়েছেন। আমি বিমান বন্দরে পৌঁছে তাদের সাথে কথাবার্তা বলি

এবং জেনারেল নিয়াজীকে জিজ্ঞাসা করি, ‘‘স্যার ডু ইউ রিমেম্বার মি? আই এ্যাম এক্স-মেজর শফিউল্লাহ অব টু ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট এ্যাণ্ড নাউ কর্নেল শফিউল্লাহ অব বাংলাদেশ আর্মি।’’

জেনারেল নিয়াজীকে খুবই চিন্তিত ও বিমর্ষ দেখাচ্ছিল। তিনি আমার কোন কথার জবাব না দিয়ে শুধু মাথা নেড়ে সায় দিলেন যে তিনি আমাকে চিনেছেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই হেলিকপ্টারযোগে জেনারেল আরোরা তাঁর দলবলসহ বিমান বন্দরে পৌঁছেন। এরপর বিমানবন্দর থেকে আমরা তদানীন্তন রমনা রেসকোর্স (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) পৌঁছি। সেখানে সেদিন বহু লোকের সমাগম হয়েছিল। জেনারেল আরোরার সাথে গ্রুপ ক্যাপ্টেন (বর্তমানে এয়ার কমোডোর) খোন্দকারও এসেছিলেন বাংলাদেশের পক্ষ থেকে উপস্থিত থাকার জন্য।

বেলা প্রায় পাঁচটার দিকে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে জেনারেল নিয়াজী যৌথ কমাণ্ডের (বাংলাদেশ ভরত) নিকট আত্মসমর্পণ দলিল স্বক্ষর করেন। এ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে গ্রুপ ক্যাপ্টেন (বর্তমানে এয়ার কমোডোর) খোন্দকার এবং আমি উপস্থিত ছিলাম । ১৯৭১ সালের ২৯শে মার্চ ময়মনসিংহ বসে ঢাকা দখলের যে স্বপ্ন দেখেছিলাম তা ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে বাস্তবায়িত হয়েছিল।

ঢাকা দখলের যে গৌরব তা আমার ফোর্সের প্রথম ছিল। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর প্রায় সাড়ে পাঁচটায় আমার ফোর্স ঢাকা স্টেডিয়ামে শিবির স্থাপন করে। ১৬ই ডিসেম্বর আমার হেডকোয়ার্টার ঢাকাতে পৌঁছে যায়। প্রথম সেটা স্থাপিত হয় স্টেডিয়ামের পাবনা এম্পোরিয়ামের তেতলার এবং ১৭ই ডিসেম্বর সেটা আমি ৩৫, মিন্টু রোড-এ স্থানান্তর করি। ঢাকা সেনানিবাসে হেডকোয়ার্টার স্থানান্তরিত করার পূর্ব পর্যন্ত আমার হেডকোয়ার্টার ৩৫, মিন্টু রোডে থেকে যায়। ২য় ইস্ট বেঙ্গল তখন সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে অবস্থান করে। ভৈরবে আত্মসমর্পণের পর ১১ইস্ট বেঙ্গল ভৈরব থেকে ঢাকা চলে আসে এবং ভিকারুন্নিসা বালিকা বিদ্যালয়ে তারা প্রথম কয়েকদিন আবস্থান করে। সেক্টর ট্রুপসদের জায়গা দেওয়া হয় বিভিন্ন স্থানে যেমন বিশ্ববিদ্যালয় খেলার মাঠ, আজিমপুর ইত্যাদি স্থানে। এই সেক্টর ট্রুপস পরে ১৬ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট নামে পরিচিত।

এ স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় আমার সেক্টর যে সব যুদ্ধ সংক্রান্ত কার্যকলাপ হতো সেগুলো আমি কখনো পাবলিসিটি করতে দেইনি। করণ ৩০শে মার্চ ১৯৭১-এ আমি যখন ভৈরব ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে পৌঁছি তখন কিছু সংখ্যক বিদেশী এবং ভারতীয় সাংবাদিকদের সাথে আমার দেখা হয়। তারা আমাকে কিছু প্রশ্ন করেছিল এবং সে প্রশ্নের জবাব তার কিছুদিন পর ভারতীয় সাংবাদপত্রে দেখতে পাই। যেমন আমার ব্যাটালিয়ন কোন দিক থেকে, কোথা থেকে এসেছে? সৈন্য সংখ্যা কত ও কতজন অফিসার এবং কি করতে যাচ্ছি ? এ সমস্ত গোপন তথ্য আমি পত্রিকাতে দেখতে পেয়ে সাংবাদিকদের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলি। এবং পরবর্তীতে নয় মাসের যুদ্ধে কোন সাংবাদিককে সাক্ষাৎকার দেইনি। এতে যদিও গোপন তথ্য গোপন রাখতে পেরেছি কিন্তু আমার মনে হয় আমার সেক্টরের ছেলেরা যেভাবে কাজ করেছে তা বাংলাদেশের কেউ জানে না। কিন্তু আমার বিশ্বাস সত্য কখনো গোপন থাকে না। আমার ছেলেরা যে উত্তম কাজ করেছে তা যারা স্বচক্ষে দেখেছে, তারাই লোকদের যতোটুকু বলেছে, সেটাই আমি অনেক বেশি মনে করি। এ সেক্টরের কার্যকলাপ আমি লোকমুখে যতোটুকু শুনতে পাই তা এতটুকুও অতিরঞ্জিত নয়।

ভারতে থাকাকালীন ভারতীয় হাসপাতালের সাহায্য ছাড়াও আমি দুখানা হাসপাতাল তৈরী করেছিলাম। এর একটা ছিল আমার হেড কোয়ার্টার হেজামারাতে; সেটা ছিল ৩০ বেডের । অপরটি ছিল আশ্রম বাড়ীতে। সেটা ছিল ১০ বেডের। আমাদের সৈনিকদের এবং গণবাহিনীর চিকিৎসা ছাড়াও নিকটবর্তী গ্রামবাসীরাও এ হাসপাতালে চিকিৎসা লাভ করতো। এ নয় মাসের সংগ্রামে আমাদের প্রতিবেশী ভারত সরকার আমাদের যে ভাবে সাহায্য করেছিল তা হয়তো বাংলাদেশের অভ্যন্তরে যারা ছিল তারা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতে পারবে না । সমস্ত সীমান্ত এলাকাতে লাখ লাখ শরণার্থীদের থাকার, খাবার পরার ব্যবস্থা যে সুশৃঙ্খলভাবে করা হয়েছিল

তা কোন শরণার্থী ভুলতে পারবে না। শুধু শরণার্থী নয়, আমরা যারা সামরিক বাহিনীর লোক ছিলাম আমাদের সবাইকে টাকা-কড়ি, অস্ত্রশস্ত্র এবং রসদপত্র ইত্যাদি আমাদের প্রয়োজনুপাতে তারা দিতে চেষ্টা করেছিল। তারা যতোটুকু দিয়েছে এটা না দিলে আমাদের হয়তো খুবই অসুবিধা হতো।

আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম নয় মাসের মধ্যেই শেষ হয়েছে। তাও শুধু তাদেরই অংশগ্রহণের জন্য। যদি তারা এ সংগ্রামে শেষের দিকে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত না হত, তাহলে আমাদের আরও কিছুদিন সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হতো। আমার দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে দেশ স্বাধীন হবেই। বাংলাদেশের জনগণও দেশ স্বাধীন করার পক্ষে ছিল।

ভারতীয় সোনাবাহিনীর যুদ্ধে অংশগ্রহণে আমাদের স্বাধীনতা লাভ একটু ত্বরান্বিত হয়েছে মাত্র। যদি তা না হতো তা হলেও বাংলাদেশ স্বাধীন হত, হয়ত কিছুদিন সময় লাগতো।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৬। ৩ নং সেক্টরেরর যুদ্ধ সংক্রান্ত অন্যান্যের বিবনণ	বাংলা একাডেমীর দলিলপত্র	……..১৯৭১

সাক্ষাৎকারঃ ব্রিগেডিয়ার এম, এ, মতিন *

আমাদের হেডকোয়ার্টার তেলিয়াপাড়া থেকে তুলে ভারতীয় সীমান্ত সীমানাতে স্থানান্তরিত করা হয়। মে মাসের প্রথমে আমার কোম্পানী নিয়ে তেলিয়াপাড়াতে ঘাঁটি, সংখ্যায় ছিলাম ৮০/৮৫ জন। এপ্রিল মাসের শেষের দিকে ক্যাপ্টেন ভূঁইয়া চট্রগ্রাম থেকে এসে আমার সাথে যোগ দেন। এরপর আমরা দুজন পরামর্শ করে ডিফেন্স নেই।

মে মাসের প্রথম থেকে পাকবাহিনী ৮/১০ বার হামলা চালিয়েও আমাদের সরাতে পারেনি। ওখানে মাঝে মাঝে যুদ্ধে আমরা পাকবাহিনীর গাড়ী ও অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করেছি। প্রত্যহ হামলা করতো পাকবাহিনী। বেসামরিক লোক, ইপিআর, মুজাহিদ এরা এতো সাহসিকতার সাথে পাকবাহিনীর সাথে মোকাবিলা করে যে আমি বিস্ময় প্রকাশ করি। ইপিআরদের কথা ভোলা যায় না। এত সাহস আমি জীবনে দেখিনি। হেডকোয়ার্টার থেকে খাবার আসতো। এমনও দিন গেছে যে, ২/৩ দিন খাবার পায়নি। বৃষ্টিতে ভিজে অনাহরে যুদ্ধ করতে হয়েছে। মুজাহিদ দুলামিয়ার একটি ঘটনা বলা দরকার। মুকুন্দপুর হরশপুর (সিলেট) ওখানে পাকবাহিনীর সাথে এক যুদ্ধে দুলামিয়ার বেশ কিছু পাক বাহিনীকে খতম করে। পাক বাহিনীর চাপে অন্যান্যরা চলে যায়, দুলামিয়ার পেটে গুলি লেগে মারা যাবার মত তবুও গামছা দিয়ে পেট বেঁধে এলএমজি ফায়ার করতে থাকে। কিছুক্ষণ পরে প্রায় জ্ঞান হারায় এমন অবস্থা। কর্ণেল শফিউল্লাহ পিছন থেকে দুই কোম্পানী সৈন্য নিয়ে আক্রমণ করে দুলামিয়াকে উদ্ধার করে। দুলামিয়া প্রায় অজ্ঞান হয়ে গেলেও তার ট্রিগারে হাত ছিল। শফিউল্লাহ তাকে উদ্ধার করে উঠে আসার সাথে সাথে বলে আমার এলএমজি কোথায়। আর বলতো, স্যার আমি মরে গেলে ‘জয় বাংলা’ বলবেন।

ইপিআর নায়েক সুবেদার মালেক, নায়েক আবদুল ওহিদ, ল্যান্স নায়েক মফিজ, নায়েক সালাম, সেপাই হায়দার আলী, গোলাম মওলা, মুজাহিদ তাজুল ইসলাম, ল্যান্স নায়েক নূরুল ইসলাম এবং সিপাই কবীর- এদের নাম ভোলা যায় না। ছাত্রদের মধ্যে সেলিম এবং আনিসের দুই ভাই এবং শাহজামান মজুমদারের কথা অতুলনীয়। সেলিম মীরপুর অপারেশনে শহীদ হয় বিহারী কলোনীতে। মরার সময় সে বলেছিল যে, ‘স্যার পাকবাহিনীর হাতে মারা গেলাম না, কুত্তা বিহারীদের হাতে মারা গেলাম।’

যাহোক, ১৯শে মে পাকবাহিনীর আর্টিলারী এবং অন্যান্য ভারী অস্ত্রের সাহায্য ব্যাপক আকক্রমণ চালালে আমরা তেলিয়াপাড়া ছাড়তে বাধ্য হই। যুদ্ধে আমাদের ৮/৯ জন মারা যায়। পাকবাহিনীর অনেক সৈন্য মারা যায়। যুদ্ধ চলে সারা দিন ধরে।

২০শে মে ভোরে আমি পাল্টা আক্রমণ করি তেলিয়াপাড়াতে। সকালে আমরা ৪/৫ টা আস্কার দখল করে নেই কিন্তু পাকবাহিনীর আরও সৈন্য আসায় আমরা প্রায় ১১টার দিকে পিছু হটে আসি। আমাদের ১০ জন মারা যায়। পাকবাহিনীর ২০/২৫ জন মারা যায়। ইতিমধ্যে যুদ্ধনীতি পরিবর্তন হয়। আমার বাহিনীকে গেরিলা শিক্ষা দিই।

১৭ই মে ক্যাপ্টন মুর্শেদ কিছুদিনের জন্য তেলিয়াপাড়াতে আসে। ক্যাপ্টেন মুর্শেদ তার দল নিয়ে তেলিয়াপাড়া সিলেট রাস্তায় মাইন বসিয়ে প্রস্তত হয়ে থাকে। পাক বাহিনীর ১২টা গাড়ী ওখান দিয়ে যাচ্ছিল।

* ১৯৭১ সালে ক্যাপ্টেন পদে ছিলেন। ছুটিতে থাকাকালীন অবস্থায় মার্চ মাসে স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগ দেন।

পাকবাহিনীর গাড়ী ধ্বংস হয় এবং ৭০ জন মারা যায়। ২টি ট্রাক এবং একটি বাস, চিঠিপত্র এবং অনেক গোপন তথ্য আমাদের হস্তগত হয়।

সম্মুখযুদ্ধ ছেড়ে দিয়ে আমরা গেরিলা যুদ্ধ শুরু করি। এতে করে আমরা কৃতকার্য হতে লাগলাম। দুইবার একেবারে মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচেছি। বুলেট লুঙ্গি ও হাফহাতা জামার হাতা ভেদ করে গেছে কিন্তু আমার শরীর স্পর্শ করেনি।

ইতিমধ্যে সেনাবাহিনী পুর্নগঠিত করতে থাকি। বিভিন্ন স্থান থেকে নিয়ে এসে ট্রেনিং দিয়ে আমাদের মধ্যে কিছু কিছু নিতে থাকি এবং সার্বিক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকি। সেপ্টেম্বর মাস থেকে সম্মুখ সমরে আসতে হয়। আমাদের উপর নির্দেশ আসে শক্র ঘাঁটি আক্রমণ করে, ধ্বংস কর, অস্ত্র কাড়ো, এগিয়ে যাও। আমরা তখন দলে বেশ ভারী হয়ে চলেছি, অস্ত্রশস্ত্রও বেশ আছে। আমরা কাজ আরম্ভ করে দেই। সেপ্টেম্বর মাসেই একাদশ বেঙ্গল তৈরী হয়। পুরাতন আর্মি, মুজাহিদ, আনসার এবং ছাত্র মিলে ব্যাটালিয়ন পুরা করা হয়। কোন সময়ে আমি একা, কোন সময়ে দুই কোম্পানী মিলে, কোন সময়ে তিন কোম্পানী মিলে সম্মুখসমরে অবর্তীণ হয়েছি সেপ্টেম্বর, অক্টোবর ও নভেম্বর মাঝামাঝি পর্যন্ত। হরশপুর, মুকুন্দপুর, তেলিয়াপাড়া, মনতলা, সিলেট, সাজিবাজার, শাহপুর ইত্যাদি স্থানে পাকবাহিনীর মুখোমুখি হয়ে আমরা জয়লাভ করি। শত্রপক্ষের বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হয়। ভারতীয় বাহিনীর আর্টিলারী আমাদের মাঝে মাঝে সাহায্য করতো।

৩০শে নভেম্বর আমার উপর নির্দেশ আসে আখাউড়া দখলের জন্য। ১লা ডিসেম্বর আমি, মিত্রবাহিনী, ২য় বেঙ্গলের বাহিনী সম্মিলিতভাবে আমরা আখাউড়া শহরের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে ঘিরে ফেলি এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ে আক্রমণ চালাই। দুই পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হয়- ১লা ডিসেম্বর তারিখে শুরু হয়, ৬ই ডিসেম্বর সকালে আখাউড়া আমাদের দখলে আসে। কর্নেল শফিউল্লাহ আমাকে মাধবপুরে রওনা হয়ে যেতে বলেন। কর্নেল নিজে ১১ বেঙ্গল এবং ২য় বেঙ্গল নিয়ে ব্রহ্মণবাড়িয়ার দিকে রওনা হলেন বললেন রাস্তায় দেখা হবে। ঐ দিন ২টার দিকে আখাউড়া থেকে রওনা দেই, পুরাতন ক্যাম্প মনতলাতে রাত ১০/১১ টার দিকে পৌঁছাই। সকালে মাধবপুরের দিকে অগ্রসর হবার মনস্থ করি। ৭ই ডিসেম্বর সকাল সাতটায় মেজর নূরুজ্জামান আমার ক্যাম্পে এসে একটি দুর্ঘটনার খবর দেন এবং আমার কোম্পানীকে রেখে আমাকে একাদশ বেঙ্গলের দায়িত্ব নিতে বলেন। মেজর বলছিলেন কর্নেল শফিউল্লাহ যখন অগ্রসর হচ্ছিলেন তখন হঠাৎ করে সিলেটের রামপুরে পাকবাহিনীর ৪০/৫০ জনের একটি দল আক্রমণ চালায়। ওখানে পাঞ্জাবী সুবেদারের সাথে কর্ণেল শফিউল্লাহর হাতাহাতি হয় কিন্তু শফিউল্লাহ বুদ্ধি বলে রাইফেলের বাঁট দিয়ে সুবেদারকে আঘাত করে ধরাশায়ী করেন। ২ জন মুক্তিবাহানী মারা যায়। ১০/১২ জন আহত হয়। মেজর নাসিম গুরুতর রুপে আহত হয়। কর্নেলের পিস্তল যেখানে গুলি লেগে পিস্তলটি অকেজো হয়ে যায়। কিন্তু কর্নেল বেচেঁ যান। ১৫/১৬ জন পাঞ্জাবী মারা যায়, বাকি সব আত্মসমর্পণ করে একাদশ বেঙ্গলের কাছে।

কর্নেল সাহেবের সাথে দেখা করে একাদশে বেঙ্গলের দায়িত্ব নেই এবং তিনি ঐ রাতেই মাধবপুর, শাজবাজপুর সরাইল হয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া যাবার নির্দেশ দেন। ৭ই ডিসেম্বর রাতে পুরা ব্যাটালিয়ন নিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দিকে অগ্রসর হই। ৮ই ডিসেম্বর বিকেলে ব্রাহ্মণবাড়িয়া হস্তগত করি। পথিমধ্যে শত্রপক্ষ আক্রমণ করলেও আমাদের কোন ক্ষতিসাধন করতে পারেনি। মিত্রবাহিনীর সহযোগিতায় আশুগঞ্জ দখলের জন্য নির্দেশ দেন কর্নেল শফিউল্লাহ ১১ই ডিসেম্বর। ১১ই ডিসেম্বর আশুগঞ্জ দখল করি। ভৈরব সেতু ধ্বংস করে ভৈরব শহরে পাকবাহিনী আস্তানা গাড়ে। মিত্রবাহিনী এবং কর্নেল শফিউল্লাহ দ্বিতীয় বেঙ্গল নিয়ে নরসিংদী হয়ে ঢাকার পথে রওনা হন আমাকে আশুগঞ্জে রেখে। আমাকে নির্দেশ দিয়ে যান আমি আমার বাহিনী নিয়ে পাক বাহিনীকে ব্যস্ত রাখি, যাতে তারা ঢাকার পথে পিছন দিক থেকে গিয়ে কর্নেল শফিউল্লাহ বা মিত্রবাহিনীর কোন ক্ষতি করতে না পারে। আমরা দুই দিক থেকে পাকবাহিনীকে ব্যস্ত রাখলাম। মাঝে মধ্যে আক্রমণ করে আমরা

পাকবাহিনীর বিপুল ক্ষতি করি। ভৈরবের অপর পাড়ে যে পাক ঘাঁটি ছিল ১৭ই ডিসেম্বর তারা আমাদের কাছে আত্মসমর্পণ করে।

বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে এবং ২৫তারিখে নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রেক্ষিতে অস্ত্র ধরি। অসহযোগ আন্দোলণে পুরো সমর্থন আমাকে এগিয়ে দেয়।

স্বাক্ষরঃ মেজর, এম, এ মতিন
২৮-৩-৭৩

সাক্ষাৎকারঃ লেঃ কর্নেল হেলাল মুর্শেদ*

৪ঠা মে আমি আমার প্লাটুনসহ শাহবাজপুর পৌঁছি। ৫ই মে সকালে আমি রেকি করি এবং রাত্রে রেইড করি। ৬ই মে সকালে জনসাধারণের মুখে শুনতে পাই ৯জন পাকিস্তনী সৈন্য মারা যায়। তার ফলে পাকিস্তানী সৈন্যরা জনসাধারণের বাড়ীঘরে আগুন ধরিয়ে দেয়। আমার প্লাটুনের মাত্র ১জন আহত হয়। রেকি করে ৭ই মে আমি আহত সৈন্যসহ প্লাটুন নিয়ে বিকেলে মাধবপুর পৌঁছি। মাধবপুরে তখনো আমাদের ডিফেন্স ছিল। আমরা মাধবপুর পৌঁছার পর এবং মেজর শফিউল্লাহ তেলিয়াপাড়া থেকে মাধবপুর পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানী সৈন্যরা শাহবাজপুর থেকে মাধবপুর পৌঁছে আমাদের উপর আক্রমণ চালায় এবং গোলাগুলি করে। ঐ মূহূর্তে আমরা যদিও অত্যন্ত ক্লান্ত ছিলাম তথাপি মেজর শফিউল্লাহ আমাকে শত্রুর বাদিক দিয়ে আক্রমণ করার আদেশ করেন। আমি প্লাটুন নিয়ে শত্রুর বাদিকে অগ্রসর হই। উদ্দেশ্য ছিল শত্রুর আক্রমণকে প্রতিহত করা। ঐ সময় আমি শত্রুর উপর আক্রমণ করতে পারলাম না এ জন্য যে আমাদের চতুর্দিক দিয়ে শরণার্থী যাচ্ছিল। বিকেলে ছয়টা পর্যন্ত পাকিস্তানীদের সঙ্গে যুদ্ধ চলে। পাকিস্তানীদের চরম আক্রমণে আমাদের আলফা কোম্পানী সৈন্য তুলে নিয়ে মনতলায় নতুন করে ডিফেন্স তৈরী করে।

মনতলায় আমি তাদের সঙ্গে যোগদান করি। মনতলায় আমাদের প্রধান ঘাঁটি তৈরী করি এবং সেখান থেকে ছোট ছোট রেইড এবং এ্যামবুশ করার সিদ্ধান্ত নেই।

এসময় পাকিস্তানী সৈন্য মাধবপুর দখল করে তেলিয়াপাড়া পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছে। তেলিয়াপাড়া জঙ্গলের মধ্য দিয়ে তারা রাস্তা তৈরী করে সিলেটের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে। মাধবপুর এবং তেলিয়াপাড়া হয়ে যে রড় রাস্তা সিলেট পর্যন্ত বিস্তৃত সেই রাস্তায় পাকিস্তানী সৈন্যদের রেইড এবং এ্যামবুশ করাই শ্রেয় মনে করি এবং সেভাবে রেইড ও এ্যামবুশ করতে থাকি। কেননা ঐ রাস্তা দিয়ে পাকিস্তানী গাড়ী যাতায়াত করতো।

মনতলা থেকে আমি কয়েকবার এ্যামবুশ করি। আমি প্রথম এ্যামবুশ করি ইসলামপুর গ্রামের রাস্তায়। ঐ রাস্তায় মাইন বসিয়ে গাড়ি উড়ানোর চেষ্টা করি এবং তাদের যোগাযোগ বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেই। মাইন বসানোর ফলে আমার প্রথম এ্যামবুশে একটা জীপ, একটা ট্রাকসহ মোট ৩০জন পাকিস্তানী সৈন্য নিহত ও আহত হয়। আমাদের গুলিতেও প্রায় ২০ জন নিহত হয়। সর্বমোট প্রায় ৫০ জন পাকিস্তনী সৈন্য নিহত ও আহত হয়। মনতলায় এটাই আমার সাফল্যজনক এ্যামবুশ। পরেও কয়েকবার এ্যামবুশ করি কিন্তু তত সুবিধা করতে পারিনি।

এরপর মনতলা থেকে তেলিয়াপাড়া যাবার নির্দেশ পাই। আমি মেজর নাসিমের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তেলিয়াপাড়া চলে যাই। তেলিয়াপাড়া যে কোম্পানীটি ডিফেন্সে ছিল। তার ক্যাপ্টেন (বর্তমানে মেজর) মতিনের পরিবর্তে আমাকে দেওয়া হয়। আমাকে আমার প্লাটুনসহ উক্ত কোম্পানীর কমাণ্ডার নিযুক্ত করে। তেলিয়াপাড়া অবস্থানকালে আমার কোম্পানী নিয়ে আরও একটি এ্যামবুশ করি।

---

* ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে ২য় বেঙ্গল রেজিমেন্টে লেফটেন্যান্ট পদে কর্মরত ছিলেন। সাক্ষাৎকারটি : ১৯৭৩ গৃহিত

১৬ই মে তেলিয়াপাড়া রাস্তার ৮১ মাইল পোস্টের নিকট উক্ত এ্যামবুশ করি। ঐ এ্যামবুশ দুটি পাকিস্তানী ট্রাক ধ্বংস করতে সক্ষম হই। একটা ট্রাক দখল করি এবং প্রায় ৫০জন সৈন্য হতাহত হয়।

মে মাসের ১৫ তারিখে পাকিস্তানী সৈন্য তেলিয়াপাড়া আক্রমণ করে। সেখানে তুমুল যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে প্রায় ৪০ জন পাকিস্তানী সৈন্য নিহত হয়। আমাদের শহীদের সংখ্যা ছিল ৫জন। পাকিস্তানী সৈন্যদের আর্টিলারী ও মর্টার আক্রমণ আমরা তেলিয়াপাড়া থেকে সৈন্য তুলে নিয়ে সিমনা চলে যাই এবং সেখানে হেডকোয়ার্টারে স্থাপন করি। তেলিয়াপাড়া থেকে সৈন্য তুলে নেওয়া সত্বেও তেলিয়াপাড়া সিলেট বড় রাস্তায় আকস্মিক আক্রমণ আমরা অব্যাহত রাখি।

সিমনা থেকে ডেলটা কোম্পানী আমার অধীনে দেয়া হয় এবং এই ডেলটা কোম্পানী নিয়ে আমি শাহবাজপুর মাধপুরসহ বিভিন্ন জায়গায় অপারেশন করি এবং জুলাই মাস নাগাদ আমি ঐ সমস্ত জায়গায় যুদ্ধ করি।

১৮ই জুলাই পাকিস্তানী সৈন্যরা আমার কোম্পানী এবং ক্যাপ্টেন নাসিমের কোম্পানীর উপর আক্রমণ করে রাত প্রায় ৪টার সময়। এক ব্রিগেড পাকিস্তানী সৈন্য আমাদের দুটি কোম্পানীর উপর আক্রমণ করে। ১৯শে জুলাই বিকাল ৩টা পর্যন্ত যুদ্ধ চলতে থাকে। এখানে আমরা একটা পাকিস্তানী লঞ্চ ডুবিয়ে দিকে সক্ষম হই। আমার কোম্পানীর ১ জন শহীদ ও একজন আহত হয়। পাকিস্তানী সৈন্যও কয়েকজন নিহত হয়।

২৯শে জুলাই মুকুন্দপুর হরশপুর রেল স্টেশনে আমি আমার কোম্পানী নিয়ে পুনরায় আক্রমণ করি। তখন আমার ঘাঁটি ছিল লক্ষীপুর গ্রামসহ আর ৪টি গ্রাম নিয়ে। মাঝে মাঝেই আমরা মুকুন্দপুর হরশপুর রেল স্টেশনের চতুর্দিক থেকে আক্রমণ করি। কেননা তখন পাকিস্তানী সৈন্যদের অবস্থান ছিল মুকুন্দপুর হরশপুর রেল স্টেশনের মাঝে।

লক্ষীপুর ছিল আমার কোম্পনীর মূল ঘাঁটি। এখান থেকে আমার এক প্লাটুন সৈন্য পাঠিয়ে আমিরগঞ্জ ব্রিজ ভেঙ্গে দেই। আমিরগঞ্জ ব্রিজে পাকিস্তানী মুজহিদ বাহিনীর মুজহিদকে আক্রমণ করলে তারা পালিয়ে যায়। এবং আমার প্লাটুন, উক্ত ব্রিজ উড়িয়ে দিয়ে সেখানে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করে।

১৩ই সেপ্টেম্বর সিঙ্গারবিল এবং মুকুন্দপুর-এর মাঝখানে এক খানা ট্রেন নষ্ট করে দেই। ট্রেনে ৪টা বগী ছিল। ইঞ্জিনটা মাটিতে পড়ে যায়। ৪টা বগীর প্রায় ৭০জন পাকিস্তানী সৈন্য নিহত এবং আহত হয়। উক্ত ট্রেন ধ্বংস করে দেওয়ায় পাকিস্তানী সেনাবাহিনী মুকুন্দপুর থেকে তাদের ঘাঁটি তুলে নেয়।

সেপ্টম্বর পর্যন্ত উক্ত এলাকা আমাদের দখলে থাকে। সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিকে পাকিস্তানী সৈন্য পুনরায় মুকুন্দপুর দখলের চেষ্টা করে। শেষ পর্যন্ত তারা মুকুন্দপুর রেললাইন মেরামত করে পুনরায় দখল করে নেয়।

২৪শে সেপ্টম্বর ক্যাপ্টেন (বর্তমানে মেজর) ভুঁইয়া তাঁর কোম্পানী নিয়ে ধর্মঘর নামক জায়গায় পাকিস্তানীদের উপর চরম আক্রমণ করেন। ক্যাপ্টেন ভুঁইয়াকে সাহায্য করার জন্য আমার কোম্পানী ছিল বাঁ দিকে ফ্ল্যাস্ক প্রোটেকশনে। ক্যাপ্টন নাসিমের কোম্পানী ছিল ডান দিকের ফ্ল্যাস্ক প্রোটেকশনে। উক্ত যুদ্ধে পাকিস্তানী সৈন্যদের একজন জুনিয়র কমিশণ্ড অফিসারসহ দশজন নিহত হয়। আমদের পক্ষে কোন হতাহত হয়নি।

২রা নভেম্বর ১০ম বেঙ্গল রেজিমেন্ট ইণ্ডিয়ান আর্মির সহায়তায় বেলুনিয়াতে একটি বড় যুদ্ধের পরিকল্পনা করে এবং ২য় বেঙ্গল রেজিমেন্টকে অনুরোধ করে ১টি কোম্পনী সেখানে পাঠানোর জন্য। অনুরোধ অনুযায়ী আমাকে বেলুনিয়া পাঠান হয়। আমি আমার ডেল্টা কোম্পানী নিয়ে বেলুনিয়ায় রওনা হই এবং বিকেলে পৌঁছি। বেলুনিয়ায় আমি দশম বেঙ্গল রেজিমেন্টের সঙ্গে যোগদান করি।

১০নভেম্বর বেলুনিয়া বালুজ-এ অবস্থানরত পাকসেনাদের ছত্রভঙ্গ বা বিচ্ছিন্ন করার জন্য প্রথমে আমার কোম্পানী নিয়ে আমি শত্রুপক্ষের ভিতরে অনুপ্রবেশ করে দুই ভাগ করে দেই যে তাদের যোগাযোগ বা একত্রিত হওয়া সম্ভব না হয়। আমার কোম্পানীসহ দশম বেঙ্গল রেজিমেন্টের ৪ কোম্পানী এখানে চারদিন অবস্থান করি এবং যুদ্ধ করি। তারা ১ জন নায়েক শহীদ হন এবং ১জন নায়েক সুবেদার আহত হয়। যুদ্ধের দ্বিতীয় দিনে এবং তৃতীয় দিনে আমাদের উপর পাক বিমান বাহিনী আক্রমণ করে। এতে দুজন মুক্তিসেনা শহীদ হন এবং ১ জন মুক্তিসেনা গুরুতরভাবে আহত হন।

১৫ই নভেম্বর এভাবে অনবরত যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ১ ব্যাটালিয়ন ইণ্ডিয়ান আর্মি ঢুকে পাকসেনাদের উপর আক্রমণ করে এবং তাদেরকে ঘিরে ফেলে। ফলে প্রায় ২৫ জন পাকসেনা নিহত এবং ৫০জন ইণ্ডিয়ান আর্মির হাতে বন্দী হয়। বেলুনিয়া মুক্ত হয়। বেলুনিয়া মুক্ত হবার পর দশম বেঙ্গল রেজিমেন্টের ৪ কোম্পানীসহ আমার কোম্পানীকে ফেনী পৌঁছে প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা নিতে আদেশ করা হয়।

প্রথমে আমি আমার কোম্পানী নিয়ে ফেনীর দিকে অগ্রসর হই এবং পরপর দশম বেঙ্গল রেজিমেন্টের ৪ কোম্পানীও পৌঁছে। ২৩শে নভেম্বর এ দিন ফেনী এয়ারপোর্টের প্রায় কছাকাছি পৌঁছে আমরা ডিফেন্স বসাই। ফলে এয়ারপোর্ট থেকে পাক বাহিনী সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়।

২৬শে নভেম্বর আমার কোম্পনী তুলে নিয়ে ২য় বেঙ্গল রেজিমেন্টের যোগদান করার নির্দেশ পাই। ২৮শে নভেম্বর আমি আমার কোম্পানী তুলে নিয়ে আখাউড়া রওনা হই। এবং ২৯শে নভেম্বর আখাউড়া পৌঁছি। আখাউড়া পৌঁছে দেখতে পাই আমার ২য় বেঙ্গল রেজিমেন্ট আখাউড়া অপারেশন করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে।

১লা ডিসেম্বর পুরা ২য় বেঙ্গল রেজিমেন্ট নিয়ে রাজাপুর এবং আজমপুর গ্রামে অবস্থানকারী পাকসেনাদের উপর চরম আঘাত হানি। ১লা ডিসেম্বর থেকে ৫ই ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রচণ্ড মুখোমুখি যুদ্ধ হয়। এখানে শত্রুপক্ষের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়। অসংখ্য সৈন্য হতাহত হয়। ২৫ জন খানসেনা আমাদের হাতে বন্দী হয়। এখানে আমদের লেঃ বদিউজ্জামান ও একজন নায়েক সুবেদারসহ কয়েকজন শহীদ হন। রাজাপুর এবং আজমপুর আমরা দখল করতে সক্ষম হই।

৬ই ডিসেম্বর আমরা ডেমরার অভিমুখে রওনা হই এবং ১২ই ডিসেম্বর ডেমরা পৌঁছি। ১২ই ডিসেম্বর থেকে ১৭ই ডিসেম্বর পর্যন্ত আমাদের পরবর্তী পরিকল্পনা শুরু করি।

১৬ই ডিসেম্বর ডেমরা থেকে রওনা হয়ে যখন বালুনদী অতিক্রম করি তখন বিকেল সাড়ে চারটা। কিছুক্ষণ পরই শুনতে পেলাম পশু শক্তি বর্বর পাকহানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণের কথা। আত্মসমর্পণের কথা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে। হাজার হাজার জনতা জয়োল্লাসে ফেটে পড়ে রাস্তায় রাস্তায় "জয় বাংলা" আর "জয় মুজিব" স্লোগান আকাশ বাতাস মুখরিত করে ফেলে। আমরা সোজা ঢাকার অভিমুখে রওনা দেই। রাস্তায় একইভাবে জনসাধরণ আমাদের স্বাগত জানাতে থাকে এবং বিজয় উল্লাসে মেতে ওঠে। রাত ১২টা সময় আমরা ঢাকা স্টেডিয়ামে পৌঁছি এবং সেখানে অবস্থান করি।

ঐতিজহাসিক ঢাকা নগরীও তখন লোকে লোকারণ্যে। সারা রাত ধরে মুক্তিবাহিনীর যোদ্ধারা আনন্দে আকাশে অসংখ্য ফাঁকা গুলি ছুড়তে থাকে। দীর্ঘ নয় মাসের যুদ্ধে যে সমস্ত বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইপি আর, পুলিশ, মুক্তিবাহিনীর সদস্য ও জনসাধারণ অসীম বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে শহীদ হন তাদের নাম বাঙ্গালী জাতির ইতিহাসে স্বর্ণক্ষরে লিপিবদ্ধ হবে, এই কামনাই করি। নয় মাসের যুদ্ধে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ পাকিস্তান পদাতিক বাহিনীর চরম পরাজয়ে এটাই প্রমাণিত হয় যে, বাঙ্গালী সৈনিক, যুবক, তথা জনসাধারণ প্রকৃতপক্ষেই সৎ সাহসী, বীর সৈনিক ও রণকৌশল। এ দেশের আপামর জনসাধারণ একযোগে একবাক্যে সম্মিলিত হয়ে

শত বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হয়েও মাতৃভূমিকে হানাদার বর্বর পাক বাহিনীর হাত থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছে। এ স্বাধীনতা সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালীর স্বাধীনতা। এ স্বাধীনতা সমগ্র বাঙ্গালী জাতির স্বাধীনতা। এ স্বাধীনতাকে রক্ষা করাই আমাদের একমাত্র কর্তব্য। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

স্বাক্ষরঃ ক্যাপ্টেন গোলাম হেলাল মুর্শেদ খান

সাক্ষাৎকারঃ সিপাই আফতাব হোসেন*

১৯৭১ সালের মে মাসেই আমরা ময়মনসিংহের বাজিতপুর থানা আক্রমণ করি। পাক দালালদের অনেক ঘরবাড়ি ও দালান খতম করি। বাঙ্গালী পুলিশরা পাকসেনাদের সহযোগিতা করতো। মুসা নামে এক কুখ্যাত দালাল পাকসোনাদের মেয়ে সরবরাহ করত এবং কারফিউ দিয়ে হিন্দু-মুসলমান সবার বাড়িতে থানার বাঙ্গালী পুলিশদের নিয়ে লুটতরাজ চালাত। রাত ১১টায় আমরা থানাতে হামলা চালাই। পুলিশরা পালিয়ে যায়। মুসাসহ অনেক দালালকে হত্যা করা হয়। এখান থেকে ১৯টা রাইফেল উদ্ধার করি। ৭টি সিভিল গানসহ প্রচুর এম্যুনিশন উদ্ধার করি। আমাদের গেরিলা দলে লোক বৃদ্ধি পেতে থাকে। ছত্রভঙ্গ অনেক ইপিআর, বেঙ্গল রেজিমেন্ট, পুলিশ, আনসার, মুজাহিদ ও ছাত্র আমাদের সাথে যোগ দিতে থাকে।

১৯৭১ সালের মে মাসে ভৈরব থানা এলাকা থেকে আমরা একটা ৩ ইঞ্চি মর্টার, ২টা চীনা হালকা মেশিনগান এম্যুনিশনসহ হালকা মেশিনগানের এম্যুনিশন ভরা ৪৮টি ম্যাগাজিন উদ্ধার করি। এক ডাকাত সর্দারের বাড়ি থেকে ঢাকার বেলাবো (রায়পুরা থানার) আবদুল হাজি সাহেব আমাকে খবর দেন যে, ঐ ডাকাতের বাড়িতে উপরোল্লিখ অস্ত্রশস্ত্র আছে।

জুন মাসে আমরা কুমিল্লা জেলার নবীনগর থানার এক দালালের বাড়িতে হামলা চালাই। উক্ত কুখ্যাত দালাল (চেয়ারম্যন পেরা মিয়া) পাকসেনাদের মেয়ে সরবরাহ, লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ করতো। মুক্তিযোদ্ধাদের পাকসেনাদের কাছে ধরিয়ে দিত। সে ঢাকার চরসিন্দুরের এক মুক্তিযোদ্ধাকে (ছাত্র) পাকসেনাদের কাছে ধরিয়ে দেয়। এবং পাকসেনারা ঐ ছাত্রকে হত্যা করে। কুখ্যাত দালাল পালিয়ে যায়। তার স্ত্রী ছেলেমেয়ে বাড়িতে পাহারারত সবাইকে হত্যা করা হয়। (পেরা মিয়া বঙ্গবন্ধুর সাধারণ ক্ষমা ঘোষণায় মুক্তি পায়)।

জুলাই মাসে আমরা ঢাকা জেলার মনোহরদী থানা এলাকার রামপুর গ্রামে পাক বাহিনীর লঞ্চ ও গানবোটের উপর হামলা চালাই। এই আক্রমণে খান সেনা নিহত হয়। পাকিস্তানীরা এখানে হেলিকপ্টারের সাহায্যে লাশ নিয়ে যায়। এরপর থেকে পাকসেনারা আর কোনো দিন লঞ্চ গানবোট নিয়ে আসে নাই।

উক্ত জুলাই মাসে আমার ঢাকা জেলার কাপাসিয়া থানার নদীর মধ্যে পাক দালালদের লঞ্চ ও বালির নৌকার উপর আক্রমণ চালাই। দালালরা হাজার হাজার মণ বালি নিয়ে পাক সেনাদের দোতলা তিনতলা বাঙ্কার পাকা করে দিত বালি সিমেন্টের সাহায্যে। আক্রমণে নৌকা লঞ্চগুলো নদীতে ডুবে যায়। দালালদের খতম করা হয়।

এদিকে মেজর শফিউল্লাহ (৩ নং সেক্টর কমাণ্ডার) ও ক্যাপ্টেন নুরুজ্জামান শত শত ছাত্রকে গেরিলা প্রশিক্ষণ দিয়ে আমাদের অধীনে পাঠাতে থাকেন। তখন আমরা ময়মনসিংহের দক্ষিণাঞ্চলে। ঢাকা-ময়মনসিংহের বিস্তীর্ণ এলাকা মিলিয়ে গঠিত ৩ নং সেক্টরের অধীনে একটি সাবসেক্টর গঠন করি এবং ডিসেম্বর পর্যন্ত বিভিন্ন অপারেশনে অংশ নেই।

* ২৪-৭-১৯৭৪ তারিখে গৃহীত সাক্ষাৎকারটি বাংলা একাডেমীর দলিলপত্র থেকে সংকলিত।

সাক্ষাৎকারঃ মেজর দোস্ত মোহাম্মদ সিকদার*

আমাকে আলফা কোম্পানীতে পোস্টিং করা হলো। কোম্পানীর কমাণ্ডার ছিলেন মেজর নাসিম, যিনি এখন ব্রিগেড কমাণ্ডার। এখনো তিনিই আমার ব্রিগেড কমাণ্ডার তাঁর সাথে আমি গেলাম। আমি তাঁর কোম্পানীতে কোম্পনী অফিসার হিসাবে কাজ করতাম। একটা বড় রকমের অপারেশনের জন্য কোম্পানীগুলো প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, ঠিক তখনই আমি গিয়ে উপস্থিত হই। ব্রিগেডিয়ার নাসিম আমাকে নিয়ে কয়েক জায়গায় ঘরোঘুরি করেছেন। আমার সাথে তেমন কোন আলোচনা করেন নাই। তবে কয়েকটা মহড়া দেখেছি তার মধ্যে একটা আমার মনে পড়ে খুব ইনটেলিজেন্স মহড়া, যেটা ইণ্ডিয়ায় হয়েছিল। মানুষ কিভাবে চট করে ফক্স হোল তৈরী করে নিজেকে লুকিয়ে রেখে শত্রুপক্ষের সাথে লড়তে, এটা তারই মহড়া। তিনি বললেন, এটা সবচেয়ে ভালো পদ্ধতি তাড়াতাড়ি নিজেকে রক্ষা করার জন্য। কেননা মাটিতে ট্রেঞ্চ করতে সাধারণত বেশ সময় লাগে কিন্তু ফক্স হোল পদ্ধিতি চট করে করা যায়। তাঁরা কয়েকটা সেকশন মিলে একটা প্লাটুন তৈরী করেছিলেন আমি সেটা বুঝতেই পারিনী। এটাতে নিজেকে আত্মরক্ষা করা যায়। আবার শত্রুপক্ষকে ঘায়েল করা যায়। এসব দেখে আমি এতে যোগদান করি। আমাদের একটা টার্গেট ছিল, ঠিক সেই টার্গেটেই আমরা আক্রমণ চালাই। টার্গেট ছিল আগরতলা উত্তর দিকে ধর্মঘর বলে একটা জায়গা ছিল, তারপর বামুটিয়া। এরপর ঠিক জায়গাগুলোর নাম মনে নেই, তবে বামুটিয়া ঐ সব এলাকার কাছাকাছি।

প্রশ্নঃ ওখানে পাকিস্তানী স্ট্রেনথ কত ছিল?

উত্তরঃ ওখানে শুধু নিয়মিত আর্মি ছিল না, মিক্সড ছিল- রাজাকার মিলে ছিল। সংখ্যা এক কোম্পানী। মাসটা ছিল অক্টোবরের দিকে। আমাদের প্ল্যানে ছিল যে সেখানে কিছু আর্টিলারী বোমবার্ডমেন্ট পাব। সেকেণ্ড বেঙ্গলের আলফা কোম্পানী এবং ডেলটা কোম্পানী এই আপারেশনে অংশ নেয়। আলফা কোম্পানী কমাণ্ডার ছিলেন মেজর নাসিম এবং ডেলটা কোম্পানী কমাণ্ডার ছিলেন ক্যাপ্টেন হেলাল মুর্শেদ।

আমরা এদিক থেকে এক কোম্পানী যাই এবং আরেক দিক থেকে ক্যাপ্টেন কোম্পানী নিয়ে এলে এক সাথে মিলিত হই। মাঝখানে থেকে ইনডিয়ান আর্মি ঢুকে এডভান্স করে। ইতিপূর্বে আর্টিলারী ফায়ার হয়। আমরা পিছছে থাকি। আমরা টার্গেট থেকে ১৫০০ গজ দূরে ছিলাম। মেজর নাসিমের পরামর্শে সেখানে যে টেলিফোন লাইন ছিল সেটা কেটে দেওয়া হয়। নিশ্চয় সেটা ঠিক করবার জন্য পাকিস্তানীরা আসবে। ঠিক তাই কয়েকজন পাকসেনা (এক সেকশন মত) রাইফেল নিয়ে এদিকে আসছিল কিন্তু হঠাৎ করেই আমাদের থেকে একজন আনকন্ট্রোল হয়ে ফায়ার করে ফেলে। এটা প্রিম্যাচিউর টার্গেট হয়ে গিয়েছিল। আমরা ৬/৭ জন মারতে পেরেছিলাম আর কিছু আহত হয়েছিল, কেউ কেউ সরে পড়েছিল। সাথে সাথে বোমবার্ডমেন্ট শুরু হয়ে গেছে। আমরা মারতে চাইনি জীবিত ধরতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তা বোমবার্ডমেন্ট লিফট আপ হবার পরে আস্তে আস্তে ফর্সা হতে লাগলো। ফর্সা হবার পরে আমরা অর্ডার পেলাম আমাদের পুল আউট করতে হবে।

প্রশ্নঃ আপনারা আর চার্জ করেননি?

উত্তরঃ আমরা আর চার্জ করিনি। এ্যাটাক করিনি। আমার মনে হয় এ্যাটাকিংটা এবানডেন্ট করে ফেললো। কেননা সাধারণ কেউ তো বলে না কোন কিছুতে হেরে গেলে। যেহেতু আমরা ছিলাম বাঙ্গালী ফোর্স আর তারা ছিলেন ইনডিয়ান ফোর্স, এটা একটা লজ্জার ব্যাপার। আমরা দেখেছি আমাদের পাশ দিয়ে তারা চলে এসেছে। তাতে বোঝা যায় তারা অবজেকটিভ পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি। আমরা বুঝতে পারলাম, এই অপারেশনে তারা কৃতকার্য হয়নি। তারা যখন চলে যাচ্ছিল আমাদের পাশ দিয়ে তখন বলছিল ভাই এটা তোমাদেরই দেশ। যত রকম ঝুঁকি নেয়ার তোমরা নাও, আমরা পারবো না- এই বলে চলে যাচ্ছিল। তারা যাবার পর আমরা পুল

* ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের সেনাবাহিনীতে। সাক্ষাৎকারটি মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস লিখন ও মুদ্রণ প্রকল্প ৮-১০-১৯৭৯ তারিখে গৃহীত।

আউটের অর্ডার পেয়ে আমাদের পুরনো ছাউনি, যেখানে আমরা থাকতাম সেই পঞ্চবটিতে চলে গেলাম। এরপর আর কোন অপারেশনে আমি যাইনি। ব্যাটালিয়ন রেইজ করলো। আমি রিক্রুটমেন্টে ব্রিগেডিয়ার নাসিমকে সাহায্য করতাম। ১১ বেঙ্গল রেইজ করলো অর্থাৎ এস ফোর্সকে কমপ্লিট করার জন্য। রেগুলার ব্রিগেড তৈরী হলো।

প্রশ্নঃ আপনি কতোদিন রিক্রুটিং- এ কাজ করেছেন সেখানে?

উত্তরঃ ঠিক দিন মনে পড়বে না, তাবে মূর্তিতে যোগদান করার আগ পর্যন্ত কাজ করেছি। সেখানে সেকেণ্ড ব্যাচ ট্রেনিং শুরু হয়।

সাক্ষাকারঃ মেজর শামসুল হুদা বাচ্চু*

১৫ই-১৬ই অক্টোবর আমাকে আগরতলা নিয়ে আসা হয় 'সি' সেক্টরের হেডকোয়ার্টারে। সে সময় সেখানে দুজন অফিসারকে পাই। তার মধ্যে একজন হচ্ছেন বজলুল রশীদ। তিনি পিএমএ-তে ছিলেন। কিছুদিন আগে তিনি পাকিস্তান থেকে এসেছেন। আগরতলা আসার পর আমাকে সি সেক্টরের কাছেই একটা কোম্পানী ছিল সেখানে পাঠানো হলো। সেখান থেকে বর্ডার মাইল দু'য়েক দূরে ছিল। এই কোম্পানীতে পুলিশ, বিডিআর সবাই ছিল। তাদের নিয়ে মাঝে মধ্যে বর্ডারে যেতাম। সামনেই এটকা ডিফেন্স ছিল। সেখানে থাকা অবস্থায়ই একবার মার্চ করে মাইল পাঁচেক ভিতরে ঢুকেছিলাম কিন্তু বেশী সুবিধা করতে পারিনী। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল রেইড করা কিন্তু তা করা সম্ভব হয়নি। কারণ প্রস্তুতি তেমন ছিল এবং ট্রেনিং পাকা হয়নি। তখন সেই সময় ব্রিগেডিয়ার নাসিম ১১তম বেঙ্গল রেজিমেন্ট গড়ে তোলেন এবং আমাকে তাঁর রেজিমেন্ট নিয়ে আসেন। এই বেঙ্গলে ট্রেণ্ড লোক অনেক ছিল। মেজর নুরুদ্দিন, মেজর আবুল হোসেন এই বেঙ্গলে ছিলেন। নভেম্বরের শেষের দিকে ১১তম বেঙ্গল যখন পুরোপুরি গড়ে ওঠে তখন আমরা সেখান থেকে মার্চ করে বাংলাদেশের ভিতর প্রবেশ করি। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল ঢাকা। পুরো এক ব্যাটালিয়ন সৈন্যসহ হেঁটে যখন আমরা ভৈরব পার হই তখন পাকিস্তানী সৈন্যদের সাথে আমাদের সংঘর্ষ হয়। সেখানে আহত হন মেজর নাসিম, চারজন ভারতীয় লোক মেজর শাফায়েত জামিল ও ভারতীয় একজন ক্যাপ্টেন । শত্রুদের সাথে জেনারেল শফিউল্লাহর হাতাহাতি যুদ্ধ হয়েছিল। এ সময়টা হচ্ছে ডিসেম্বরের ৬ কি ৭ তারিখে। সেখানে যে মেজর নাসিম আহত হয়েছিলেন তার মূলে ছিল আমাদের একজন অফিসারের ভূল পরিকল্পনা। এরপর আমদের ব্যাটালিয়নকে টেক ওভার করেন মেজর মতিন। টেক-ওভার করার পর যখন আমরা আশুগঞ্জ যাই তখন পাকিস্তানীদের সাথে সংঘর্ষ হয়।

পাকিস্তান আর্মিরা সকালবেলা আশুগঞ্জে যে ব্রীজটা ছিল সেটা উড়িয়ে দিয়েছিল। তাই ইণ্ডিয়ান আর্মি মনে করেছিল যে পাকিস্তানী আর আশুগঞ্জে নেই, নদীর ওপারে ভৈরবে চলে গেছে। তখন সেখানে ১০ম বিহার ব্যাটালিয়ন ছিল। তারা দেখতে একদম কালো ছিল। তাদের সাথে ছিল ২০তম রাজপুত। আশুগঞ্জে জায়গাটা এমন যে সেখানে ৩টা কি ৪টা তিনতলা দালান ছিল এবং সামনে এক মাইলের মত জায়গা ছিল একদম ফাঁকা। ভারতীয় আর্মির ধারণা ছিল যে, সেখানে পাকিস্তনী আর্মি নেই কিন্তু আমাদের মনে হয়েছিল হয়তো পাকিস্তানী আর্মি আছে। কথা ছিল ভারতীয়দের সাথে ১১তম বেঙ্গলের একটা কোম্পানী থাকবে কিন্তু পরে এসে বললো থাক তোমাদের যেতে হবে না। তবুও আমাকে আমার কোম্পানী নিয়ে শহর থেকে আধ মাইল পরে দূরে একটু উঁচু গ্রাম ছিল, সেখানে বসে থাকার জন্য আমার এডজুটেন্ট লেঃ নাসির বললেন। তখন সেখানে আমার সাথে ছিল ১০ম বিহারের মেজর গাঙ্গুলী (কোম্পানী কমাণ্ডার)। আমার কোম্পানী নিয়ে আমি সেখানে বসে আছি, তখন দেখি ভারতীয় সৈন্যের দুটি ব্যাটালিয়ন মার্চ করে মাঠের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। তাদের সাথে ছিল ছোট চারটা

* ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে সেনাবাহিনীতে কমিশনপ্রাপ্ত। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস লিখন ও মুদ্রণ প্রকল্প কর্তৃক ১০-১০-১৯৭৯ তারিখে গৃহীত সাক্ষাৎকার।

ট্যাংক। ভারতীয়রা যখন সেই দালানগুলির মাঝমাঝি চলে এসেছিল তখন আমরা ৪/৫ মিনিট গুলির শব্দ ছাড়া আর কিছুই শুনতে পাইনি। আমরা বুঝতেই পারছিলাম না যে এই গোলাগুলির আওয়াজ কোথা থেকে হচ্ছে। তারপর দেখলাম যে ভারতীয় সৈন্যরা কেউ খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে দৌড়াচ্ছে, কাউকে টেনে নিয়ে আসা হচ্ছে, কারো শরীর দিয়ে রক্ত রেয়ে পড়ছে। ৫/১০ জন করে পিছনের দিকে আমরা যেখানে আছি সেই লাইনের দিকে সরে আসছে। সেখানে চারটা ছোট ট্যাংকের মধ্যে দুটো জ্বলে গিয়েছিল এবং দুটো ট্যাংক নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিল ভারতীয়রা। তখন আমাকে ওয়ারলেসে বলা হলো যে তোমার কোম্পানী নিয়ে তুমি তাড়াতাড়ি পিছনে চলে এসো। আমরা যেখানে ছিলাম তার থেকে ২০০গজ পিছনে আরেকটা উঁচু জায়গা ছিল এবং তারপর আধ মাইলের মতো পরিস্কার জায়গা এবং তারপরই গ্রাম শুরু হয়ে গেছে। এই সময় দেখি যে পাকিস্তানী আর্মি সামনের ঐ জায়গা দিয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ তখন পাকিস্তানী আর্মি আমাদের রেঞ্জের ভিতরে। তখন আমরা উইড্রো করে সামনের আসলাম। এর মধ্যে দৌড়াদৌড়া শুরু হয়ে গেছে। পিছনে ভারতীয় আর্মির যারা বেঁচে ছিল বা যারা চলতে পারে তারা সামনে চলে এসেছে। তখন এসে আমি জেনারেল শফিউল্লাহকে পেলাম। তিনি একটা গাছের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি বললেন, ভারতীয় আর্মি এতো বড় একটা ভুল করে ফেললো যা কল্পনা করা যায় না। আমরা দ্রুত সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। আমাদের সাথে ভারতীয় সৈন্যরাও আছে। এর মধ্যে গোলাগুলি শুরু হয়ে গেছে এবং আশপাশ অনেক লোক পড়েও গেছে। তখন আমি শফিউল্লাহকে বললাম যে স্যার দৌড় দেন। আমি আর শফিউল্লাহ দৌড়ে ঐ দূরুত্বটা পার হই এবং যখন দেখলাম যে গোলাগুলি খুব বেশী শুরু হয়ে গেছে তখন আমরা শুয়ে পড়লাম। ২/১ মিনিট শুয়ে থাকার পর আবার উঠে দৌড়ে যেখানে থেকে গ্রাম শুরু হয়েছে সেখানে একটা পুল ছিল সেটা পার হয়ে গ্রামের সীমানার মধ্যে ঢুকে গেলাম। পরে আমরা শুনলাম আমরা প্রথমে যে জায়গায় ছিলাম পাকিস্তান আর্মিরা সেই পর্যন্ত এসছিল আর এগিয়ে যায়নি। তার পরদিন সকাল বেলা অর্ডার এলো তোমরা যাও। কারণ আশুগঞ্জে থেকে পাকিস্তানী আর্মিরা চলে গেছে। তারপর আমরা আশুগঞ্জ গেলাম। গিয়ে দেখি ওরা চলে গেছে এবং জিনিসপত্র সব বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। পাকিস্তানী আর্মিরা সন্ধ্যার পরপরই নদী পার হয়ে ওপারে চলে গিয়েছিল। যে সব ভারতীয় সৈন্য মারা গিয়েছিল তাদের লাশ পাকিস্তানীরা আগেই সরিয়ে ফেলেছিল। তবে সেখানে গিয়ে আমি মেজর মুখার্জীর লাশটা দেখেছিলাম। সাদা কাপড় দিয়ে ঢাকা ছিল। এর মধ্যে ভৈরবের দিক থেকে শেলিং শুরু হয়ে গেছে। আমাদেরও কিছু আর্টলারী চলে এসেছে। ইতিমধ্যে মুজিব ব্যাটারীও এসেছে, তারাও অপারেশন করছে। ভারতীয় বাহিনীও এসে গেছে। লেঃ কর্ণেল আজিজও তখন এখানে আমাদের সাথে ছিলেন, আরও অনেক অফিসার ছিলেন। ১৬ই ডিসেম্বর যেদিন পাকিস্তানী আর্মি সারেণ্ডার করে সেদিন সরাদিন প্রচুর ফাঁকা গুলি ও ফুর্তি হয়েছে। কিন্তু পাকিস্তান আর্মির যারা ভৈরবে, ছিল তারা ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত সারেণ্ডার করেনি। ১৯শে কি ২০ শে ডিসেম্বর ভারতীয় জেনারেল গেলেন ভৈরব, তারপর তারা সারেণ্ডার করে। তারপর দুই দিন সময় লাগে পাকিস্তানীদের সরিয়ে জায়গা খালি করতে।

মেজর এস, এ ভুঁইয়া প্রতিবেদন*

॥ একটি এ্যামবুশ ও সুবেদার চান মিয়ার বীরত্ব ॥

প্রায় সাড় তিন মাসের মত আমি বি-কোম্পানীর সাথে মনতলায় ছিলাম। ঐ সময়ের মধ্যে আমরা অনেক ছোট বড় অপারেশন করছি। সবগুলোর বিবরণ লেখা সম্ভব নয় বলে আমি মাত্র কয়েকটির কথা নীচে লিখলাম।

২৭শে জুন রাত্রে আমি বি-কোম্পানীকে নিয়ে বাংলাদেশের ভিতর যাই। দিনের বেলায় গিয়ে শত্রুসৈন্যরা কোথায় আছে, কিভাবে আছে, কেমন ভাবে অবস্থান করছে তাই দেখবার জন্য ভিতরে যাই। দেখতে পাই সিপাই থানার সামনে শত্রুর দুটো ছোট ঘাঁটি আছে এবং তারা সেখানে বিনা দ্বিধায় চলাফেরা করছে। তাদের সংখ্যা

* ১৯৭১ সালের মার্চে ক্যাপ্টেন পদে কর্মরত ছিলেন। প্রতিবেদনগুলি তাঁর রচিত 'মুক্তিযুদ্ধে নয় মাস' গ্রন্থ থেকে সংকলিত।

৬০/৭০জন। সিদাই থানার পুলিশ ও ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী থেকে আমরা তাদের অবাধ চলেফেরা সম্বন্ধে নিশ্চিত হলাম। সেদিন রাত্রে সেনাদলকে দুটি ভাগে ভাগ করলাম। সুবেদার চান মিয়াকে আমি আমার একটি গ্রুপের ভার দিলাম এবং তার সহকারী হিসেবে দিলাম সুবেদার তৈয়বকে। আমি নিজে অন্য দলটা সঙ্গে নিলাম। আমার সাথে ছিলেন সুবেদার সফিউল্লাহ। রাত ৩টায় আমরা বাংলাদেশের ভিতরে ঢুকলাম। দুশমনের অগ্রবর্তী ঘাঁটি দূরে ছিল না। সুবেদার চান মিঞা গেলেন বাম দিকের অবস্থানে, আমি গেলাম ডান দিকের অবস্থানে। ভোর ৪টার দিকে শত্রুর খুব কাছে গিয়ে আমরা লুকিয়ে ওঁৎ পেতে রইলাম। যে রাস্তা দিয়ে শত্রুসৈন্য দল বেঁধে টহল দিচ্ছিল সেই রাস্তার পাশেই আমরা ওঁৎ পেতে অপেক্ষা করতে লাগলাম। চান মিয়ার দল বাড়ির আনাচে কানাচে এবং পাট ক্ষেতের ভিতরে পজিশন নিলেন। এলাকাটা ছিল সমতল এবং তার অধিকাংশ জায়গা জুড়ে ছিল ধান ক্ষেত। আর সে ধান ক্ষেতের উচ্চতা ছিল এক ফুটের মতো। অতএব লক্ষ্যবস্তু একেবারে সুপষ্টভাবে আমদের দৃষ্টিসীমার মধ্যে ছিল।

আমরা যার যার স্থানে তো অস্ত্রশস্ত্রসহ পজিশন নিয়ে ছিলামই, উপরন্তু সিদাই থানার বাম দিক থেকে শত্রুর প্রতি তাক করে রেখেছিলাম একটি রিকয়েললেস রাইফেল। রাতের অন্ধকারেই আমরা এই কাজ শেষ করি।

সকাল ৭টার দিকে শত্রুর প্রায় ৩০/৪০ জন সৈন্য নিয়ে আগের মতো সুবেদার চান মিয়ার অবস্থানের দিকে টহল দিতে বেরুল। আমরা আরও দেখতে পেলাম শত্রুবাহিনীর আর একটি দল শান্তি বাহিনীর কিছুসংখ্যক লোক নিয়ে সীমান্তের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। শত্রুরা কাছাকাছি পৌঁছামাত্র চান মিয়ার পুরো দলটাই তাদের উপর গুলিবর্ষণ শুরু করলো। তাঁর দলের হাতে ছিল ২ ইঞ্চি মর্টার আর ১৮টি বোমা। সবগুলোই তারা কাজে লাগাল। প্রায় ৩০মিনিট ধরে সংঘর্ষ হলো এবং চান মিয়াদের তীব্র গুলিবর্ষণে ভয়ার্ত হয়ে অনেকগুলো মৃত সৈনিককে পিছনে ফেলে পাক সৈন্যরা পিছু হটতে বাধ্য হলো। শত্রু পক্ষের অন্য দলটি প্রতিশোধের স্পৃহায় সুবেদার চান মিয়ার দলকে আক্রমণ করতে চাইলো। তারা কামান দিয়ে গোলাবর্ষণ শুরু করলো। শত্রুর ইচ্ছা ছিল উত্তর দিক থেকে এসে লেফট (বাম) ফ্ল্যাঙ্ক করে চান মিয়ার দলকে পিছন থেকে আক্রমণ করা। শত্রুর অগ্রগমনের পথে আমি আমার দল নিয়ে বিপুল আগ্রহে অপেক্ষা করছিলাম। যেই মাত্র তারা আমাদের কাছে এলো অমনি আমরা হালাকা মেশিন গান ও রাইফেলের সাহায্য তাদের উপর গুলিবর্ষণ করতে শুরু করলাম। আমাদের সঙ্গেও একটা ২ ইঞ্চি মর্টার ছিল। সেটারও আমরা পুরোদস্তুর সদ্ব্যবহার করলাম। ঐ দিক রিকয়েললেস রাইফেলের অবস্থান থেকে ৪টি রিকয়েললেস রাইফেলের গোলা বর্ষিত হলো শত্রুর বাঙ্কারের উপর । শত্রুর দুটি বাঙ্কার সেই গোলার আঘাতে চুরমার হয়ে গেল। এবারও শত্রুরা আমাদের ওঁৎ পেতে আক্রমণ করার ফাঁদে পড়ল। দিশেহারা হয়ে তারা আমাদের অবস্থানের উপর কামানের গোলাবর্ষণ শুরু করল। এখানেও তাদেরকে নিহত সঙ্গীদের লাশ ফেলে পিছনে হটতে বাধ্য করা হলো। আমরা শত্রু সৈন্যের কামানের গোলাবর্ষণকে অত্যন্ত ভয় করতাম। করণ তাদের নিশানা ছিল অদ্ভুত রকমের নির্ভুল। এখানেও সেই নির্ভুল নিশানার পরিচয় পেয়ে আমাদের ঐ অবস্থানে থাকা নিরাপদ মনে করলাম না। সুতরাং মর্টার থেকে শত্রুদের দিকে গোলাবর্ষণ করতে করতে তারই আড়ালে আমরা পিছনে সরে এলাম। কামানের গোলা তখন এমন অবিশ্যাম ধারায় এসে পড়ছিল যে, পিছনে হটে আসা ছাড়া আমাদের গত্যন্তর ছিল না। ঐ সময় আমাদের কোন পরিখা ছিল না। আমার কোম্পানীতে এই প্রথমবারের মতো সেদিন রিকয়েললেস রাইফেল ব্যবহার করি। তাতে চমৎকার ফল হয়। আমরা দুটো বাঙ্কার সম্পূর্ণরুপে ধ্বংস করে দিতে সক্ষম হই।

ঐ দিন আমার দলের একটি মাত্র ছেলের শরীরে গোলার টুকরো এসে আঘাত করে। অন্যান্যরা খোদার একান্ত রহমতে সক্ষম অবস্থায় ফিরে আসে। আমার রানার ও আমি এক স্থানেই ছিলাম। কামানের গোলাগুলো যখন ভীষণ শব্দ করে আমাদের আশপাশে পড়ছিল তখন মনে হচ্ছিল মৃত্যু বুঝি আমাদের ঘাড়ের উপর খঞ্জর ধরে বসে আছে । আমার কাছ থেকে মাত্র ২০ গজ দূরে একটি কামানের গোলা সশব্দে ফেটে পড়লো। লক্ষ্য করে দেখলাম আমাদের করো মুখে হাসির লেশমাত্র নেই। আমরা তখন মনে মনে আল্লাহকে ডাকতে লাগলাম। আর মুখে উচ্চারণ করতে থাকলামঃ লা ইলাহা ইল্লা আন্তা সোবহানারা ইন্নি কুনতু মিনাজজোয়লেমিন।

পাকিস্তানী রেডিও সেদিন প্রচার করা হয়েছিল যে, আমাদের মৃত্যের সংখ্যা ২০ জন। কিন্তু প্রকৃত খবর পাই ঘটনার ৫দিন পরে। শত্রুপক্ষে নিহত হয় ১৭ জন আর আহত হয় ১৯ জন। গোপন অবস্থান থেকে অতর্কিতে আক্রমণ করলে দিশেহারা শত্রু সৈন্যদের আত্মরক্ষার প্রায় উপায় থাকে না এবং তখন তাদের এমনি সীমাহীন ক্ষতি মেনে নিতে হয়। এর সাধারণ কারণ এক পক্ষের সতর্কতামূলক পূর্বপ্রস্তুতি, অন্য পক্ষের অজানা বিপদ সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং অপ্রস্তুতি। আর শত্রুপক্ষ সমরশক্তিতে যতই উন্নত পর্যায়ের হোক না কেন আকস্মিকভাবে এমনি ওঁৎ পাতা ফাঁদে পড়লে তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যায় এবং সাধারণ মনোবল হারিয়ে ফেলে। সে আক্রমণাত্মক ভূমিকায় সেই মুহূর্তে অংশ নিতে আর সাহস পায় না। ফলে পালিয়ে প্রাণ বাঁচানোটাই তার কাছে বড় হয়ে ওঠে।

যাহোক, অপূর্ব সাহস দেখিয়েছিলেন সেদিন সুবেদার চান মিয়া। ঐ দিনের যুদ্ধের পর চান মিয়ার প্রতি আমার পূর্ণ বিশ্বাস জন্মেছিল। পরে কর্তৃপক্ষ কোন এক কারণে আমার দল থেকে তাকে বদলী করতে চাইলেও আমি তাতে রাজি হইনি।

॥ আর একটি রেইড ॥

আর একটি ঘটনার কথা আমি উল্লেখ করছি। দিনটি ছিল ৮ই জুলাই। ২৭শে জুন যে স্থানটিতে আমরা এ্যামবুশ করেছিলাম, পাক সৈন্যরা সেখানে নতুন করে কতকগুলো বাঙ্কার করেছিল। নতুন করে তারা আরও অনেক সৈন্য এনে তাদের অবস্থানকে মজুবত করে তুলেছিল। আমরা প্ল্যান করলাম রেইড করে শত্রুর নবনির্মিত বাঙ্কারগুলি উড়িয়ে দেবো। ২৭ শে জুন তারিখে আমাদের হাতে প্রচণ্ড আঘাত খেয়ে পাকিস্তানী সৈন্যরা সীমান্ত এলাকার দিকে আর আসতো না অথবা অবস্থান ছেড়ে অন্য কোথাও নড়াচড়া করা তারা অর্থহীন বলে মনে করতে। ২৭শে জুন এবং ৮ জুলাই তারিখে মধ্যে আমরা বার কয়েক শত্রুঘাঁটির কাছে ওঁৎ পেতে ছিলাম কিন্তু পাকসেনারা তাদের ঘাঁটি ছেড়ে না বেরুনোর জন্য আমরা বিশেষ সুবিধা করতে পারিনী। এই সময়ের মধ্যে পাকিস্তানী সৈন্যদের অবস্থানের উপর আমরা কয়েকবার ৩ইঞ্চি মর্টার দিয়ে গুলিবর্ষণ করেছিলাম।

৮ই জুলাই তারিখে আমরা সমস্ত কোম্পানী নিয়ে দুই দিক থেকে শত্রুর এলাকায় ঢুকলাম। ভোর চারটার দিকে অগ্রসর হলাম আমরা। শত্রুর অবস্থান ভারত সীমান্ত থেকে বেশি দূর ছিল না। সিদাই থানা থেকে তাদের অবস্থানগুলো আমাদের নজরে পড়তো। আমরা শত্রুকে মাঝখানে রেখে দুই পাশ থেকে ঢুকলাম। পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী আমরা রিকয়েললেস রাইফেল ও মর্টার শত্রুর দিকে তাক করে রেখেছিলাম। আগে থেকেই সময় নির্দিষ্ট করে রেখেছিলাম যাতে একই সময়ে রিকয়েললেস রাইফেল, মর্টার রাইফেল সব কিছুর সাহায্যে আমাদের সৈন্যরা একযোগে শত্রুদের উপর আঘাত হানতে পারে। ভোর সাড়ে পাঁচটার সময় শত্রুর অবস্থানের উপর আমরা আতর্কিতে গুলিবর্ষণ শুরু করলাম। রিকয়েললেস রাইফেলের গোলার আঘাতে শত্রুদের দুটো বাঙ্কার উড়িয়ে দেয়া হলো। সবচেয়ে ভালো কাজ করলো মর্টারগুলো। আমরা পনেরো মিনিট গোলাগুলি বর্ষণ করার পর পাক সেনারা আমাদের উপর কামানের গোলাবর্ষণ শুরু করে দিল। ঐ এলাকার শত্রুর প্রতি সম্ভাব্য আক্রমণের স্থানগুলো তাদের কামানের লক্ষ্য কেন্দ্র হিসেবে পূর্বনির্দিষ্ট ছিল। জ্যামিতিক নিয়মমাফিক তাদের কয়েকটা গোলা আমাদের অবস্থানের উপর এসে পড়ে। বিপদ বুঝে ঐখান থেকে আমরা আমাদের বাহিনী সরিয়ে নিয়ে আসি। ঐ আক্রমণে পাকবাহিনীর কি পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল প্রায় এক সপ্তাহ পরে বেসামরিক লোক মরফত আমরা সে খরব পাই। পাক সেনাদের ৬ জন সৈন্য মৃত্যের তালিকা পূর্ণ করেছিল।

॥ ধর্মঘরে সুবেদার তৈয়বের কৃতিত্ব ॥

আমার সাবসেক্টরের মধ্যে ধর্মঘরে এসে অধিক পরিমাণ পাকিস্তানী সৈন্য জমায়েত হয়। ধর্মঘর ছিল সাবেক ইস্ট পাকিস্তানী রাইফেল বাহিনীর বিওপি অর্থাৎ বর্ডার অবজারভেশন পোস্ট। পাকিস্তানী সৈন্যরা সেখানে আসার পর থেকে আমি সেখানে কোন দিন অপারেশন করিনি। তারপর ঐ শত্রুঘাঁটির উপর মনোযোগ দিলাম। আমি

নিজে প্রায় ৫০জন সৈন্য নিয়ে দু' দু' বার ঐ এলাকায় গোপনে আতর্কিত আক্রমণ করার জন্য ফাঁদ পেতেছিলাম, কিন্তু শত্রুরা একবারও তার কাছে ভেড়েনি। তাই দূর থেকে কিছু করা যায় কিনা তারই ফন্দীফিকির আঁটলাম।

ঐ এলাকায় কয়েকবার মর্টারের সাহায্য আমরা গোলাবর্ষণ করি। আমাদের সঙ্গে ছিল সুবেদার তৈয়ব। মর্টারের গোলাবর্ষণে সুবেদার তৈয়ব একজন দক্ষ ওস্তাদ। যতবারই তিনি শত্রু ঘাঁটিতে মর্টারের সাহায্য গোলাবর্ষণ করেছেন ততবারই শত্রুর কিছু না কিছু ক্ষতি হয়েছে। একবার আমাদের কয়েকটি মর্টারের গোলা ধর্মঘর দীঘিতে পড়ায় দীঘির বহু মাছ মরে গিয়েছিল। সারা ধর্মঘরের লোক কয়েকদিন ধরে সেই মাছ খেয়েছিলেন।

অন্য আর একদিন আমরা দুই দিক থেকে ৪টি মর্টার দিয়ে শত্রু সৈন্যের ধর্মঘর পজিশনের উপর গোলাবর্ষণ করি। সেদিন মেজর মতিনের কোম্পানী থেকে ২টি মর্টার ধার করে এনেছিলাম। আমরা প্রায় ৬০টি মর্টারের গোলা ব্যবহার করেছিলাম। আমাদের গোলাবর্ষণ ছিল অত্যন্ত নির্ভুল। কয়েকদিন পরে আমরা জানতে পারলাম যে আমাদের গোলা সঠিক জায়গায় পড়ায় পাঞ্জাবীরা ঐ জায়গা ছেড়ে গ্রামে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল।

মতিন সাহেবের কোম্পানীতে নায়েক আজিজ নামে একজন যুবক ছিল। মর্টারের গোলাবর্ষণে যে বেশ সাফল্য অর্জন করেছিল। তার মর্টার ফায়ার সম্বন্ধে কোম্পানীতে বেশ সুনাম ছিল।

এই এলাকাতেও রাজাকারের সংখ্যা ছিল খুব বেশী। ঐ রাজাকারদের চোখে ধুলো দেওয়া খুব সহজ ব্যাপার ছিল না। তারা কেন যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সমর্থন করতো না তা বুঝতে পারিনী। সম্ভবত ঐ এলাকার মত রাজাকার বাংলাদেশের কোথাও ছিল না। তারা পাঞ্জাবী সৈন্যদের পথ দেখিয়ে ভারতের সীমানার কাছে এসে আমাদের আন্দোলনের বিরুদ্ধে পাঞ্জবীদের সহযোগিতা করতে শুরু করলো। তাদের এই ক্রিয়াকলাপে আমরা গভীর ভাবে ব্যথিত হতাম।

যাহোক, বিজয়নগর এলাকাতেও আমরা কয়েকটি গোপন আতর্কিত হামলা চালাই। কিন্তু তাতেও আমরা খুব একটা সুবিধা করতে পারিনী। মাত্র একদিন এ্যামবুশ করে কয়েকজন পাঞ্জাবীকে যমদ্বারে পাঠিয়ে দিই।

॥ বীর মুজাহিদ দুলা ॥

এ প্রসঙ্গে কয়েকজন মুজহিদের নাম করা যায় যাদের আমি তেলিয়াপাড়াতে দেখেছি। এদের মধ্যে মনে রাখার মতো দুটি নাম দুলা এবং আহাদ। দুলার বয়স ছিল ২৬ বছর। তার বাড়ি কুমিল্লা জেলার শালদা নদীর কছে। সে মুক্তিবাহিনীর প্রাক্তন পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলের কোম্পানীতে মেজর মতিনের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। সমগ্র মুক্তিবাহিনীতে দুলার মতো সাহসী যুবক আর কজন ছিল আমার জানা নেই। তেলিয়াপাড়ার যুদ্ধে সে যে সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে তার তুলনা হয় না। বৃষ্টির মতো গোলাবর্ষণের মধ্যেও এই অকুতোভয় যুবক লুকিয়ে থাকার চেষ্টা করেনি কিংবা রণক্ষেত্র ছেড়ে দূরে সরে যায়নি, আপন লোকদেরকেও সে গোলাবারুদ বিতরণ করেছিল।

২১শে জুন আমি যখন শত্রুর ত্রিমুখী প্রচণ্ড আক্রমণের দারুন মনতলা থেকে সরে আসতে বাধ্য হই সেদিন দুলা কলকলিয়ার লড়াইয়ে যে বীরত্ব দেখিয়েছিল তার কিছুটা পাঠকের সামনে তুলে ধরছি।

কলকলিয়া ছিল ক্যাপ্টেন মোর্শেদের অধীনে এবং দুলা সেই ফ্রন্টেই লড়ছিল। ২১শে জুন রাতে শত্রু বাহিনী যখন আমাদের অবস্থানের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালায় সেই একই সময়ে কলকলিয়াতেও তারা আক্রমণ চালায়। মোর্শেদের সৈন্যরা শত্রুদের সাথে সারারাত প্রচণ্ড যুদ্ধ করে। কিন্তু শত্রুর সংখ্যা বহুগুণ বেশী থাকায় মোর্শেদের দল সেখান থেকে অবশেষে পিছু হটতে বাধ্য হয়। সে সময় দুলা মিয়ার হাতে ছিল একটা হালকা মেশিন গান

সে তার হালকা মেশিন গান অনবরত গুলি ছুড়ে যাচ্ছিল এবং শত্রুর অগ্রগতিকে সারারাত ব্যাহত করে রেখেছিল। নিঃশঙ্কচিত্তে অপারবিক্রমে সে এক ভয়াবহ শত্রুর বিরুদ্ধে লড়ে যাচ্ছিল। অবস্থা প্রতিকূল দেখে যখন তার সংগীরা আত্মরক্ষা করতে পিছু হটছিল তখন ডুলা সেই পশ্চাদপসরণে অংশগ্রহণ না করে নির্ভয়ে তার হালকা মেশিন গান থেকে অবিরাম গুলি ছুড়ে যাচ্ছিল। তারই অসীম সাহসিকতা ও গুলি ছোড়ার ফলে দলের অন্যান্যরা পিছু হটার সুযোগ পেয়েছিল। কিন্তু ডুলার বড়ই দুর্ভাগ্য, সে অন্যকে বাঁচাতে গিয়ে নিজে এক মহা বিপদে আটকে পড়ে। শত্রুপক্ষের মেশিনগানের এক ঝাঁক গুলি এসে ডুলাকে বিদ্ধ করে। ডুলার পক্ষে একমাত্র ডুলার মেশিনগানই সক্রিয় ছিল এবং শত্রুদের আক্রমণের তীব্রতাকে তারই মেশিনগানটি কিছুটা বাধা দিচ্ছিল। ফলে শত্রুর একমাত্র লক্ষ্যবস্তু হয়ে উঠেছিল ডুলা। অবশেষে শত্রুরা ডুলাকে আহত করতে সক্ষম হয়ে কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। কিন্তু নিদারুণ আহত অবস্থায় ডুলা সংজ্ঞা হারায়নি এবং শেষ কর্তব্য স্থির করে সে তার হালকা মেশিনগান থেকে অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত শত্রুকে বাধা দিয়ে যাবে বলে স্থির করল। সে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে সে জান দেবে কিন্তু জীবিত অবস্থায় তার শরীরকে শত্রুহস্তে কলুষিত হতে দেবে না।

আমি যখন মনতলা থেকে সরে এসে ভারতের সিদাই থানায় (আগরতলার উত্তরে) তখন লে. কর্নেল শফিউল্লাহ আমার এখানে উপস্থিত হলেন। কিছুক্ষণ আলাপের পর তিনি আমাকে মোর্শেদের অবস্থানের কথা জানালেন এবং তারাতাড়ি কলকলিয়া চলে যেতে আমাকে নির্দেশ দিলেন। তিনি আরো বললেন, ‘‘মোর্শেদের সৈন্যরা দারুণ বিপদে আছে। তারা সবাই শত্রু দ্বারা পরিবেষ্টিত। তুমি তাড়াতাড়ি গিয়ে তাদের বিপদমুক্ত করতে সাহায্য কর।’’

এই কথা বলে তিনি কলকলিয়া চলে গেলেন এবং তাঁর পিছু পিছু আমিও কলকলিয়া পৌঁছুলাম। আমরা যাওয়ার পর দেখতে পেলাম আল্লাহর মেহেরবানীতে ক্যাপ্টেন মোর্শেদসহ তার কোম্পানীর সবাই নিরাপদ স্থানে পৌঁছে গেছে। তাদের সবাইকে দেখে আমরা আল্লাহর কাছে হাজার হাজার শুকরিয়া আদায় করলাম।

সবাই এল কিন্তু তখনো পর্যন্ত ডুলা এলো না। তখন বেলা ১১টা খবর এলো ডুলার পেটে এবং ডান পায়ে কয়েকটি গুলি লেগেছে। সে কাদা পানির মধ্যে অসহায় পড়ে আছে। ছোট্র একটা সৈন্যবাহিনী গিয়ে তাকে উদ্ধার করতে না পেরে ফিরে এসেছে। শত্রু তখন মেশিনগান বসিয়ে পজিশন নিয়ে আছে এবং কাউকে নড়তে দেখলেই গুলি ছুড়ছে। শত্রুমেশিনগান বাসিয়েছিল ছোট্র একটি টিলার উপর।

আমরা সবাই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লাম। ভারতের বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের কাছ থেকে দূরবীন নিয়ে দেখলাম শত্রুর কিছু সৈন্য পজিশন নিয়ে আছে এবং অন্যান্যরা পরিখা খনন করছে। আমরা সবাই চিন্তা করছি ডুলাকে কিভাবে শত্রুদের ঐ বেড়াজাল থেকে উদ্ধার করব। কোন একটা ফন্দি উদ্ভাবনে আমরা যখন চিন্তিত তখনই একটি ছেলে দৌড়ে এসে খবর দিল যে ডুলাকে নিয়ে আসা হচ্ছে। আহত ডুলা গুলি ছুড়তে ছুড়তে সম্পূর্ণ নিস্তেজ এবং নিশ্চুপ হয়ে গেলে শত্রুরা তাকে মৃত মনে করেছিল এবং তার দিকে আর গুলি ছোঁড়া প্রয়োজন নেই মনে করে তারাও গুলি ছোড়া বন্ধ করেছিল। এই রকম একটা সুযোগ পেয়ে আমাদের দুই সাহসী ছেলে সন্তর্পণে নালার ফাঁকে ফাঁকে গিয়ে ডুলাকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছিল।

ডুলাকে যখন আমাদের সামনে আনা হলো তখনকার দৃশ্য এত করুণ এবং বেদনাদায়ক যে তা ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। মুহূর্ষ ডুলা বাম হাত দিয়ে তার গুলিবিদ্ধ পেট চেপে ধরে আছে। কেননা ক্ষতস্থান থেকে তার নাড়িভুড়ি বের হয়ে আসার উপক্রম করছিল। ডান পায়ে গুলি লেগে ছিন্নভিন্ন মাংসগুলি কোনক্রমে পায়ের হাড়ের সংগে লেগেছিল। আর তার সমস্ত শরীর রক্তরঞ্জিত।

একটা গুলিবিদ্ধ বাঘের মত ছটফট করছিল। তখনও সে বাকশক্তি হারায়নি। আমাদের চোখের দিকে চোখ রেখে সে বলল, স্যার, আমি আর বাঁচব না, এক্ষুনি মারা যাব। আমার আফসোস রয়ে গেল স্বাধীন বাংলার মাটিতে আমি মরতে পারলাম না। স্বাধীন বাংলা দেখা আমার ভাগ্যে হয়ে উঠল না। স্যার আমাকে কথা দিন

যেভাবেই হোক স্বাধীন বাংলার মাটিতে আমাকে করব দেবেন। আজ হোক কাল হোক বাংলাদেশ স্বাধীন হবেই। তাই আমার লাশ বাংলাদেশের মাটিতে করব দেবেন।

সে আরো বললো, স্যার গুলির আঘাতে আমার পেটের নাড়িভূড়ি বের হয়ে গেছে। আমার বাঁচার কোনই সুযোগ নেই।

মুমূর্ষ ডুলার করুণ কণ্ঠ শুনে সেদিন আমরা সাবই গভীর শোকে মূহ্যমান হয়ে পড়েছিলাম। সমস্ত হৃদয় আমাদের বিষাদে ভরে গিয়েছিল। আমরা আবেগ সংযত কণ্ঠে তাকে যতই সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্ঠা করি সে তাতে শান্ত হয় না, সে তার অন্তিম মুহূর্তের আভাস পেয়ে শেষ মনের কথাটি আমাদের জানিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। সে বলতে থাকে, স্যার পাঞ্জাবী দস্যুরা যখন আমাদের বাঙ্গালীদের নির্মমভাবে, নির্বিচারে হত্যা শুরু করে তখন আমার ৮ বছরের মেয়েটি আমাকে কি বলেছিল জানেন? বলেছিল, আব্বা তুমিও মুক্তি ফৌজে যোগ দাও, পাঞ্জাবীদের বিরুদ্ধে লড়াই কর, দেশকে স্বাধীন কর। আব্বা তুমি বাড়ি থেকে কি করবে? যদি দেশ স্বাধীন না হয় আমাদের অবস্থা কি হবে? তারা ত যাকেই সামনে পাচ্ছে তাকেই গুলি করে মারছে।

আমার হাত ধরে ডুলা বলল, ‘‘স্যার আপনার বাড়ি কুমিল্লা, আপনি নিশ্চয় শালদা নদী চেনেন। সেখানে আমার বাড়ি। আমার এলাকার সবাই আমাকে চেনে। দয়া করে আমার মেয়েকে এবং সেই এলাকার কাউকে আমার মৃত্যুর খবরটা দেবেন না। আমার মৃত্যুর খবর পেলে আমার মেয়েটি বাঁচবে না। সে আমার জান। দয়া করে তার কাছে, স্যার আমার মৃত্যুর খবরটা গোপন রাখবেন। তবে আমার একটা দাবী, আমার হতভাগী মেয়েটিকে আপনি দেখবেন। স্যার আমার এই একটি কথা ভুলে যাবেন না।’’ কথা বলার মাঝে মাঝে একটা কথা সে ঘুরেফিরে বারবার বলছিল, ‘‘ জয় বাংলা দেখে যেতে পারলাম না।’’

ডুলার এই মুমূর্ষ অবস্থায় এ্যাম্বুলেন্স আসতে কিছুটা দেরী হবে মনে করে লে. কর্নেল শফিউল্লাহ তাকে নিজের জীপে করে আগরতলা পিজি হাসপাতালে নিয়ে গেলেন। আমাদের মুক্তিফৌজের ডাক্তার আবুল হোসেনও ডুলার সাথে হাসপাতালে গেলেন যাতে ডুলা তার মনের ভরসা না হারায়। হাসপাতালে যাওয়ার পর ডুলার অপারেশন করা হয় এবং যখন ডাক্তার জানালেন যে ডুলার সঙ্কটাবস্থা কেটে গেছে তখন লেঃ কর্নেল শফিউল্লাহ হাসপাতাল ত্যাগ করেন।

সেদিন ডুলার সাথে আরো কয়েকজন আহত হয়েছিল। তাদেরকেও পাঠানো হলো।

ডুলার অবস্থা দেখে সেদিন আমার মত অনেকেই ধারণা করেছিল ডুলা আর বাঁচবে না। কিন্তু আল্লার অসীম ক্ষমতা আমাদের মত ক্ষুদ্র ব্যক্তির পক্ষে নিরুপণ করা অত্যন্ত কঠিন। তাঁরই অশেষ কৃপায় এবং অত্যন্ত করুণায় ডুলা দেড় মাস পর আরোগ্য লাভ করল এবং পুনরায় ক্যাপ্টেন মোর্শেদের কোম্পানীতে যোগদান করল। পরবর্তীকালে অসীম বীরত্বের সংগে ডুলা অনেক রণক্ষেত্রে পাকবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করে বাঙালীর বীর্যবত্তার ইতিহাস সমুজ্জ্বল করে তুলেছে।

এবার বলছি আহাদের কথা। আহাদের বয়স মাত্র ১৫বছর। অতুলনীয় সাহসী ছিল এই বীর মুজাহিদ কিশোর । মুজাহিদ হিসেবে তেলিয়াপাড়া যুদ্ধে তার বীরত্ব প্রদর্শণ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে একটি নক্ষত্রোজ্জ্বল ঘটনা। ডুলা ও আহাদের বীরত্বের সম্মানস্বরুপ লেফটেন্যান্ট কর্নেল শফিউল্লাহ তাদেরকে ২৫০০ টাকা করে পুরস্কার প্রদান করেন।

এর পড়ে আসে পুলিশ প্রসঙ্গ। আমার সঙ্গে যে ৫জন পুলিশ ছিলেন তারা হলেন মিজান, সুরুয মিয়া, খোরশেদ মিয়া, তাহের এবং কানু মিয়া। আমার কোম্পানীকে এরা মর্টার ছুড়তেন। মাত্র সামান্য কয়েকদিনের শিক্ষায় এরা মর্টার চালনায় প্রায় পেশাদার সৈনিকের মত দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। স্বাধীনতা যুদ্ধে এই ৫জন পুলিশ সৈনিকের দান সামান্য নয়। অসীম বীরত্বের সঙ্গে এঁরা শত্রুসৈনিকের সাথে বারবার লড়াই করেছেন।

মেজর মতিনের কোম্পানীটি ছিল পুরোপুরি প্রাক্তন পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলের বাহিনী দ্বারা সংগঠিত। আমি এবং মেজর মতিন যখন তেলিয়াড়ায় লড়াই করেছি তখন কি রকম নিস্কম্প হৃদয়ে ঐ পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলের জোয়ানরা লড়াই করেছে। মেজর মতিনের ই-পি-আর কোম্পানী পরবর্তীকালেও বিভিন্ন ফ্রন্টে খুব সাহসের সঙ্গে লড়েছিল। তাদের এই বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধের প্রশংসা না করে আমি পারি না।

॥ চুড়ান্ত লড়াই ও আখাউড়ার যুদ্ধ ॥

নভেম্বরের ২০ তারিখের পরে যুদ্ধের তীব্রতা বেড়ে গেল। যশোরের কাছে পাকিস্তানের স্যাবর জেটগুলো ভারতীয় সীমানা অতিক্রম করায় আকাশযুদ্ধে ভারতীয় বিমান বাহিনীর বিমান আক্রমণে ৩টি পাকিস্তানী স্যাবর জেট ভূপাতিত হয়। এতে যুদ্ধের তীব্রতা মারাত্মক আকার ধারণ করে। মুক্তিবাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণে এ সময় যশোরের চৌগাছা পতন হয়। এবং তারা যশোর ক্যান্টনমেন্ট দখল করার জন্য পাকিস্তানী সৈন্যের সঙ্গে মরণপণ সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়।

নভেম্বরের এই সময়টাতে আমরা আখাউড়ার শত্রুসৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীণ হই। শত্রুর বিরুদ্ধে এবার আমরা পুরোপুরি আক্রমণাত্মক ভূমিকা গ্রহণ করি। আমাদের আক্রমণও একই রকম তীব্র এবং প্রচণ্ড। এ সময় ‘এস’ ফোর্সের অধিনায়ক লেঃ কর্নেল শফিউল্লাহর অধীনে ছিল পুরো দুই ব্যাটালিয়ন পদাতিক সৈন্য। এই দুই ব্যাটালিয়নই ছিল যাবতীয় সমরাস্ত্রে সুসজ্জিত। এ-ছাড়াও ছিল কয়েকটা কোম্পানী যাকে আমরা সেক্টর ট্রুপস বলতাম।

কর্নেল শফিউল্লাহ ‘এস’ ফোর্সের ২নং ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসার মেজর মঈন এবং ১১নং বেঙ্গল রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসার মেজর নাসিমকে এই মর্মে নির্দেশ দিলেন যে মেজর মঈনের ব্যাটালিয়ন আখাউড়ার দিকে আক্রমণাত্মক অভিযান চালাবে এবং তাদের সাথে থাকবে সেক্টর ট্রুপস, আর মেজর নাসিমের ব্যাটালিয়ন (১১ নং বেঙ্গল রেজিমেন্ট) আগরতলা উত্তর দিকে ধর্মঘরের ওখানে প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা নেবে যাতে করে সিলেট থেকে মনতলা হয়ে পাকবাহিনী পেছন থেকে আমাদের বাহিনীর উপর আক্রমণ করতে না পারে। লেঃ কর্নেল শফিউল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী আমরা ধর্মঘরের সামনে রেখে মোহনপুর-আগরতলা রোডে প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করি। এ সময় আমি একটি কোম্পানীর নেতৃত্বের ভার নেই। শত্রু যাতে মোহনপুর-আগরতলা রোড ধরে অগ্রসর হতে না পারে সে উদ্দেশ্যই আমরা আখাউড়া যুদ্ধের আগেই প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা নিয়েছিলাম। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সে সময় আমি যে কাম্পানীর পরিচালনার নেতৃত্ব নিয়েছিলাম সেটি বি-কোম্পানী।

ওদিক তখন আখাউড়ায় কি ঘটেছিল তার কিছুটা বিবরণ, আমি যা সংগ্রহ করতে পেরেছি, দেওয়া যাক। ২৭শে নভেম্বর কর্নেল শফিউল্লাহ মেজর মঈনকে মেরাসানী, নিরানসানী, সিঙ্গারবিল রেলওয়ে স্টেশনে, সিঙ্গারবিল ঘাঁটি, রাজাপুর, আজমপুর ইত্যাদি এলাকা দখল করার নির্দেশ দেন। উল্লেখযোগ্য যে, এই সব এলাকা আখাউড়া রেলওয়ে জংশনের কাছাকাছি। কর্নেল শফিউল্লাহ মেজর মঈনকে ৩০শে নভেম্বর এবং ১লা ডিসেম্বর তারিখ রাতে এই সব এলাকায় আক্রমণ চালাবার আদেশ দিয়েছিলেন।

মেজর মঈন দ্বি-ধারা আক্রমণ চালালেন। প্রথম আঘাত হানলেন নভেম্বর-ডিসেম্বর ৩০/১ তারিখ রাত ১টার সময়। প্রথম পর্যায়েই দখল করলেন সিঙ্গারবিল রেলওয়ে স্টেশন ও সিঙ্গারবিল ঘাঁটি। শুনেছি, সে রাতে লড়াই চলেছিল ভোর পাঁচটা পর্যন্ত।

এই অভিযান আমাদের পক্ষ থেকে অংশ নিয়েছিল মুক্তিফৌজের প্রায় এক ব্যাটালিয়ন। শত্রুপক্ষের সৈন্য সংখ্যা ছিল প্রায় এক ব্যাটালিয়নেরও বেশী। এই যুদ্ধে শত্রুসেনারা আর্টিলারী, মর্টার, মেশিনগান ইত্যাদি ছোটবড় সব অস্ত্রশস্ত্রই ব্যবহার করে। আমাদের পক্ষেও সেদিনকার লড়াইয়ে আর্টিলারী এবং মর্টারের সাপোর্ট ছিল। সেক্টর ট্রুপসের কাছেও ছিল মেশিনগান।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, লড়াইয়ের সে রাতগুলো ছিল খুবই অন্ধকার এবং ডিসেম্বর শীত-রাত্রির কুয়াশায় আচ্ছন্ন। কিন্তু এই অন্ধকার ও কুয়াশার বাধা আমাদের জওয়ানদের পারেনি বিন্দুমাত্র হতোদ্যম করতে। একটার পর একটা স্থান দখলে আসাতে তারা ক্রমেই মানসিক দিক থেকে আরো শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল এবং নব উন্মাদনায় দ্বিগুন শক্তিতে শত্রুদের আগাত হেনে পর্যুদস্ত করছিল। আখাউড়ার এক যুদ্ধে হতোদ্যম পাকিস্তানী সেনারা পশ্চাদপসরণে বাধ্য হয় এবং তাদের প্রচুর লোকসান স্বীকার করতে হয়। একজন শত্রুসেনা জীবিত অবস্থায় বন্দী হয় এবং ২০ জন হয় নিহত। এছাড়া মুক্তিফৌজের হস্তগত হয় হানাদার প্রচুর পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র, রেশন, পোশাক-পরিচ্ছদ, ডিফেন্স স্টোর (প্রতিরক্ষা সামান্য)। আমাদের পক্ষ থেকে পাকবাহিনীর হাতে এই যুদ্ধে ইয়াসিন খাঁ নামে মুক্তিফৌজের একজন সিপাহী শহীদ হয়। তাকে সমাহিত করা হয় সিঙ্গারবিলে। তাছাড়া এই লড়াইয়ে মুক্তিফৌজের সিপাহী আবু জাফর, সিপাহী হুমায়ন, সিপাহী আবদুল লতিফ, হাবিলদার আকতার হোসেন, হাবিলদার মুফাজ্জল হোসেন চৌধুরী, হাবিলদার নবীউল্লা এবং অপর একজন আহত হয়। পর্যুদস্ত শত্রুবাহিনী সাময়িকভাবে পিছু হটলেও ২রা ডিসেম্বরের সকালে আমাদের বাহিনীর উপর পাল্টা আক্রমণ শুরু করে এবং সারাদিন ধরে খণ্ডযুদ্ধ চলতে থাকে। শত্রুবাহিনীর প্রবল আক্রমণের মুখে আমাদের বাহিনী পিছু হটে যেতে বাধ্য হয়। আর্টিলারীর সহায়তায় মারাত্মক আক্রমণ চালিয়ে এই এলাকা শত্রুবাহিনী পুনর্দখল করে। প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির পর আমাদের বাহিনী সিঙ্গারবিলে গিয়ে জমায়েত হয়। এই যুদ্ধে শত্রুবাহিনীরও অসম্ভব ক্ষতি সাধিত হয়। মুক্তিফৌজের নায়েক সুবেদার আশরাফ আলী শত্রুর হাতে শাহাদাৎ বরণ করেন। অন্যান্য যারা আহত হন তারা হলেন সিপাহী আবদুল আউয়াল, হাবিলদার মাজু মিয়া, নায়েক নাসিরুজ্জামান, নায়েক আবদুস সালাম, সিপাহী মিজানুর রহমান।

৩রা ডিসেম্বর আমাদের বাহিনী নিজেদেরকে পুর্নগঠিত করে পাক বাহিনীর উপর পুনরায় আক্রমন চালায় এবং আজমপুর স্টেশন ও তার এক হাজার গজ অগ্রবর্তী স্থান দখল করে। এই আক্রমণে শত্রুপক্ষের এগারজন সৈন্য নিহত হয়। আমদের পক্ষে দু'জন সিপাহী ও একজন নায়েক সুবেদার শহীদ হন। আমাদের বাহিনীর যখন যুদ্ধে লিপ্ত এমনি সময়ে আমরা খবর পেলাম পাকিস্তান ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে বিমান হামলা চালিয়ে সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু করেছে। এবার আর যুদ্ধ কেবল বাংলাদেশ বাহিনী ও পাকবাহিনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকল না। পাকিস্তানী বাহিনীর সঙ্গে সংযুক্ত ভারত-বাংলাদেশ বাহিনীর যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। ডিসেম্বরের ৩/৪ তারিখ রাতে আমাদের বাহিনী পুনর্দখলকৃত এলাকাকে সুরক্ষিত করল। বলা বহুল্য, মুক্তিফৌজের অবিরাম আঘাতের পর আঘাত, দেশের অভ্যন্তরে গেরিলা মুক্তিবাহিনীর চাতুর্যপূর্ণ আতর্কিত আক্রমণে পাকিস্তান সেনাবাহিনী তখন বেসামাল হয়ে পড়েছিল। এবার তারা সমস্ত দোষ ভারতের উপর চাপিয়ে ভরত আক্রমণ করে বসল।

৩রা ডিসেম্বর যেদিন পাকিস্তান ভারত আক্রমণ করে সেদিন অপরাহ্নে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী কলকাতার এক বিশাল জনসমাবেশে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। ঐ দিন রাত্রি দ্বিপ্রহরে তিনিও ভারতের জওয়ানদের পাকিস্তানী হামলা প্রতিহত করার জন্য হুকুম দেন।

অতএব মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হল ভারতীয় সোনাবাহিনীর হাত। সম্মিলিত বাহিনী ভীমবেগে ঝাঁপিয়ে পড়ল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে, প্রচণ্ড গতিতে আক্রমণ করল অন্যায় যুদ্ধে লিপ্ত পাকিস্তানী সেনাবাহিনীকে । বাংলাদেশের সীমানার চতুর্দিক দিয়ে যৌথ কমাণ্ডের অধীনস্থ সৈন্যদল ঢুকে পড়ল বাংলাদেশের অভ্যন্তরে।

এদিকে সামরিক সরকার ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে ৪ঠা ডিসেম্বর থেকে ভারতীয় সৈন্য মিত্রবাহিনীর নাম নিয়ে আখাউড়া যুদ্ধে নেমে পড়ে। আক্রমণ চালানো হয়েছিল অতি প্রত্যুষে। উল্লেখযোগ্য যে, এই সময় আমাদের বাহিনীর পক্ষে খুব বেশি আর্টিলারী সাপোর্ট (কমানের সহায়তা) দেওয়া হয়েছিল। সেই সঙ্গে ছিল মর্টারের প্রচুর সহায়তা। এই আক্রমণ শুরু করার আগে মেজর মতিনের নেতৃত্বে সেক্টর ট্রুপসের দুই কোম্পানী দিয়ে পাশ থেকে প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়। মেজর মতিনের ই-পি-আর কোম্পানী মারাত্মক

প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হয়েও নিজের অবস্থান থেকে বিন্দুমাত্র নড়েনি। আমাদের সেক্টরে ৪ঠা ডিসেম্বর যুদ্ধে মুক্তিফৌজের যে বীর সৈন্যরা শাহাদত বরণ করেন তাঁরা হচ্ছেন- লেঃ বদিউজ্জামান, সিপাহী রুহুল আমিন, সিপাহী সিদ্দিকুর রহমান। যাঁরা আহত হন তাঁরা হচ্ছেন-সুবেদার চান মিয়া, হাবিলদার কামরুজ্জামান, কোম্পানী হাবিলদার মেজর নূরুজ্জামান এবং আরো ১৫ জন। এই লড়াইয়ে শত্রুপক্ষের বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হয়। মুক্তিফৌজ ১৩ জন শত্রুসেনাকে হত্যা করে এবং ৪ জন শত্রুসেনা তাদের হাতে বন্দী হয়। মুক্তিফৌজ ছোটবড় হাতিয়ারসহ শত্রুবাহিনীর ৩২ টি রাইফেল কবজা করে।

ডিসেম্বরের ৫ তারিখে পাকিস্তান বাহিনী আমাদের বাহিনীর উপর পাল্টা আক্রমণ চালায়। কিন্তু আমাদের তীব্র-প্রতি-আক্রমণের মুখে তারা পিছু হটে যেতে বাধ্য হয়। আখাউড়ায় তুমুল লড়াই। এই লড়াইয়ে মুক্তিবাহিনী ও সংযুক্ত মিত্রবাহিনী অপরিসীম বীরত্ব ও সাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধ করে। অবশেষে ৫ই ডিসেম্বর মুক্তি বাহিনী ও মিত্রবাহিনী আখাউড়া দখল করে। ৪/৫ ডিসেম্বরের যুদ্ধে এই এলাকায় শত্রুবাহিনীর প্রায় ১৬০ জন সৈন্য মারা যায়।

আখাউড়া রেলওয়ে স্টেশন শত্রুর অবস্থান ছিল খুবই সুদৃঢ়। ফলে এখানকার যুদ্ধ হয় ব্যাপক এবং মারাত্মক। বাংলাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে আখাউড়ার লড়াইয়ের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। এখানকার যুদ্ধে উভয় পক্ষই সর্বাধিকসংখ্যক আর্টিলারী ব্যবহার করে। কয়েকটি আক্রমণ চালিয়ে ২নং ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের প্লাটা অক্রমণের মুখে পাঞ্জাবী সৈন্যরা তাদের মনোবল হারিয়ে ফেলে। এমতাবস্থায় মিত্রবাহিনী আমাদের বাহিনীর সাথে যোগ দেবার পর সম্মিলিত আক্রমণের মুখে তারা আর দাঁড়াতে পারেনি। বলাবহুল্য, আখাউড়ার পতনের পর শত্রুবাহিনী আর কোথাও ভালোভাবে অবস্থান নিতে পারেনি।

আখাউড়ার যুদ্ধে কোম্পানী কমাণ্ডার হিসাবে যেসব অফিসার অংশগ্রহণ করেন তাঁরা হলেনঃ মেজর মতিউর রহমান, ক্যাপ্টেন মোরশেদ, লেফটেন্যাণ্ট ইব্রাহিম, লেফটেন্যাণ্ট বদিউজ্জামান ও লেফটেন্যাণ্ট সলিম (কোম্পানী অফিসার)।

এখানে আমি ২নং ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট সম্পর্কে সামান্য কিছু আলোকপাত করতে চাই। পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে ২নং ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেণ্ট ছিল বেঙ্গল রেজিমেণ্টের অন্যতম পুরনো ব্যাটালিয়ন। হানাদার পাক বাহিনী বাংলাদেশে হত্যাযজ্ঞ শুরু করার পর এই ব্যাটালিয়ন তখনকার সেকেন্ড-ইন-কমাণ্ড মেজর শফিউল্লাহর (বর্তমানে কর্নেল এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রধান) অধীনে পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। মুক্তি সংগ্রামে এই ব্যাটালিয়নের অবদান অতুলনীয়।

এখানে আখাউড়ার যুদ্ধে শাহাদাৎপ্রাপ্ত বীর সৈনিক লেফটেন্যাণ্ট বদিউজ্জামান সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করে তাঁর শহীদী আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে চাই।

লেফটেন্যাণ্ট বদিউজ্জামান রংপুর মিলিটারী কাস্টোডি থেকে পালিয়ে এসে ১৬ ই আগস্ট মনতলায় আমার সাথে যোগ দেন। আমি ১১ নং বেঙ্গল রেজিমেণ্টএ যোগদানের আগ পর্যন্ত তিনি আমার অন্যতম প্লাটুন কমাণ্ডার হিসাবে আমার সাথেই ছিলেন। তিনি আমার সাথে বহু অভিযানে অংশ গ্রহণ করেন।

লেফটেন্যাণ্ট বদিউজ্জামান ছিলেন একজন নিবেদিতপ্রাণ সাহসী সৈনিক। সদা হাসিমুখে এই অসম সাহসী যোদ্ধা যদিও মূলত ছিলেন একজন ক্যাভালরী অফিসার, তবু একজন ইনফ্যানট্রি অফিসারের চেয়ে কোন অংশেই কম ছিলেন না। যুদ্ধ চলাকালে শত্রুবাহিনীর একটি শেল তাঁকে আঘাত করে এবং সেই আঘাতে তিনি শহীদ হন। তাঁর মরদেহ আজমপুর রেলওয়ে স্টেশনে একটি মাজারের কাছে সমাহিত করা হয়। সিপাহী রুহুল আমিনের মরদেহও এরই কাছে সমাহিত করা হয়।

২১ বছরের যুবক লেফটেন্যান্ট বদিউজ্জামান ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। সদা প্রফুল্লচিত্ত নিরহংকারী বীর সৈনিক মাতৃভুমির স্বাধীনতা সংগ্রামে হাসিমুখে আত্মোৎসর্গ করেন। তাই দেশবাসী কৃতজ্ঞতার সঙ্গে চিরদিন তাঁর কথা স্মরণ করবে। আল্লাহ তাঁর আত্মাকে শান্তি দিন।

॥ আশুগঞ্জের লড়াই এবং ঢাকার পথে 'এস' ফোর্স ॥

এদিকে লেঃ কর্নেল শফিউল্লাহ তাঁর 'এস' ফোর্স নিয়ে কোন পথে অগ্রসর হচ্ছেন তার বিবরণ সংক্ষেপে দিচ্ছি। ৬ই ডিসেম্বর বিকালে লেঃ কর্নেল শফিউল্লাহ ইসলামপুর ব্রীজের কাছে এক দুর্ঘটনার সম্মুখীন হন এবং নিশ্চত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পান। তারপর এখান থেকে 'এস'-ফোর্স ৭ই ডিসেম্বর ঢাকার পথে রওনা হয়। এবং এইদিন শাহবাজপুরে তাদের সাথে আর একটি খণ্ডযুদ্ধ হয় ও পরে শত্রুরা ভেগে যায়। তারপর 'এস' ফোর্স ও মিত্রবাহিনী সরাইল পৌঁছে। আশুগঞ্জে আমরা আবার শত্রুসৈন্যের সম্মুখীন হলাম ৮ই ডিসেম্বর। আশুগঞ্জে শত্রুবাহিনী প্রতিরক্ষামূলক অবস্থান গড়েছিল। সেটা ছিল যুদ্ধকৌশল সমৃদ্ধ এবং তার ঘাঁটিগুলি ছিল অত্যন্ত মজবুত। আমাদের 'এস'-ফোর্স ও মিত্রবাহিনী প্রথম আক্রমণ চালায় ৯ই ডিসেম্বর বেলা ৩টার সময়। এই আক্রমণে আমাদের পক্ষে ছিল, তবুও তার সেই ভয়াবহ রুপ চোখে না দেখলে বিশ্বাস করাও কঠিন। সম্মিলিতভবে 'এস'-ফোর্স ও মিত্রবাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে শত্রুবাহিনীও ভীষণভাবে মারমুখী হয়ে ওঠে। একদিকে যখন আমাদের পদাতিক বাহিনী বিনা বাধায় শত্রুর উপর বোমা নিক্ষেপ করে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় শত্রুপক্ষ তাদের ভারী মেশিনগান ও বিমানবিধ্বংসী কামান দিয়ে অবিরামভাবে গুলি ছুড়ে যাচ্ছে। তাদের আর-আর (রিকয়েললেস রাইফেল) গুলোও তখন নিরস্ত ছিল না। তারাও তখন আমাদের পক্ষের ট্যাঙ্কগুলোকে লক্ষ্য করে গোলা নিক্ষেপ করে যাচ্ছিল। আমাদের পক্ষের গোলন্দাজ বাহিনীর মিডিয়াম গানগুলো শত্রুপক্ষের উপর অবিশ্রান্তভাবে গোলা নিক্ষেপ করছিল, ঠিক তার পাল্টা জবাবে শত্রুপক্ষও তখন সমভাবে আমাদের উপর গোলা নিক্ষেপ করছিল। তুমুল লড়াইয়ের পর শত্রুবাহিনীর প্রচণ্ড পাল্টা আক্রমণের মুখে 'এস'-ফোর্স ও মিত্রবাহিনীকে সাময়িকভাবে সেদিন পিছু হটতে হয়। যুদ্ধে উভয় পক্ষেরই প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়। কিন্তু তুলনামূলকভাবে তাদের ক্ষয়ক্ষতি আমাদের থেকে অনেক বেশী ছিল। ঐ দিনকার যুদ্ধে মিত্রবাহিনীর চারখানা ট্যাঙ্ক ধ্বংস হয় এবং প্রায় ৪০/৫০ জন বীর যোদ্ধা মারা যান। যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুপক্ষের প্রায় দেড় শতাধিক লোক নিহত হয়।

দ্বিতীয়বার আক্রমণের পর অবশেষে শত্রুসৈন্য ১০ই ডিসেম্বর আশুগঞ্জ থেকে পিছু হটতে বাধ্য হয় এবং ভৈরববাজারে গিয়ে আশ্রয় নেয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, শত্রুপক্ষ আশুগঞ্জ থেকে ভৈরববাজারে যাবার পূর্বে ভৈরব ব্রীজের তিনটি স্প্যান ধ্বংস করে দিয়ে যায়। যুদ্ধের গতিবেগ রক্ষা করার জন্য কোন সময় নষ্ট না করে লেঃ কর্নেল শফিউল্লাহ একাদশ বেঙ্গল রেজিমেন্টকে ভৈরববাজার ঘিরে থাকার জন্য নির্দেশ দেন এবং তিনি নিজে দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল সেক্টর ট্রুপস নিয়ে পদব্রজ নরসিংদীর দিকে রওনা হন।

তিনি নরসিংদী পৌছানোর পূর্বেই মিত্রবাহিনীর একটি ব্যাটালিয়ন হেলিকপ্টারযোগে সেখানে পৌঁছে গেছে। কিন্তু শত্রুপক্ষ সেখান থেকে পালিয়ে গেছে। ১২ই ডিসেম্বর তিনি শীতলক্ষ্যা পার হন। ইতিমধ্যে তিনি দুটি ছোটখাটো সংঘর্ষে লিপ্ত হন। এছাড়া তিনি দুটি দলকে ঢাকার দিকে পাঠিয়ে দেন। তার একটি ছিল বাসাবো এলাকার জন্য ও অপরটি ছিল ঢাকা সেনানিবাসের জন্য। ১৬ই ডিসেম্বর শত্রুপক্ষের ৩০০ জনের একটি দল ডেমরাতে তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করে।

১৩ই হইতে ১৬ ডিসেম্বর বিকাল ৪টা পর্যন্ত 'এস'- ফোর্স ডেমরা ও শহরের বিভিন্ন উপকণ্ঠে লড়াই করে। এরপর তারা ডেমরার পরবর্তী এলাকা মাতুয়াইলে একবার বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল। পরে লেঃ কর্নেল শফিউল্লাহ জোনারেল অরোরার সাথে ডিসেম্বর বেলা ৪টা ৩১ মিনিটে রেসকোর্স ময়দানে আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও সেক্টর ট্রুপস ঢাকা স্টেডিয়াম পৌঁছে যায়।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৭। ৪নং সেক্টর সংঘটিত যুদ্ধের বিবরণ	বাংলা একাডেমীর দলিলপত্র	মে-ডিসেম্বর' ১৯৭১

সাক্ষাৎকারঃ ব্রিগেডিয়ার চিত্তরঞ্জন দত্ত*

মে, ১৯৭১ সন। ভারতীয় বিভিন্ন এলাকায় খোলা হল নানা ট্রেনিং ক্যাম্প। পুরো সিলেট সেক্টরের ভার আমার উপর দেয়া হল। মোট দুটি সাব-সেক্টর খোলা হল। আমার সৈন্যদের মনোবল ভাঙ্গল না। বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে তারা কাজ করতে আরম্ভ করল। সিলেটের সব থানা থেকে লোক ভর্তি করা শুরু হল এবং প্রশিক্ষণের কাজ পুরোদমে এগিয়ে চলে। বি-ডি-আর, আনসার, মুজাহিদ ও পুলিশকে নিয়ে গড়ে উঠল 'সেক্টর ট্রুপস', আর স্কুল-কলেজের ছাত্রদের নিয়ে গড়ে উঠল 'গণবাহিনী'। সিলেট মোট ৬টি সাব-সেক্টর ছিল।

১। জামালপুর সাব-সেক্টরঃ গণবাহিনীর মাহমুদূর রব সাদী এই সাব-সেক্টর কমাণ্ড করত। অল্পবয়স্ক সুন্দর ছেলেটি বাংলাদেশকে স্বাধীন করার জন্য যে স্পৃহা নিয়ে কাজ করত, তা দেখলে সত্যি আশ্চর্য লাগত। যেখানেই তাকে পাঠানো হয়েছিল, প্রত্যেকটি অপারেশনে সে কৃতকার্য হয়েছে। এই সাব-সেক্টর থেকে অপারেশন চালানো হয়েছে-আটগ্রাম, জাকীগঞ্জ, লুবাছড়া ও কানাইঘাটি এলাকায়। নভেম্বরের শেষের দিকে সাদীকে সিলেটের ভেতরে নবীগঞ্জ এলাকায় প্রায় ৫০জন বিশ্বস্ত গণবাহিনী ছেলে দিয়ে নবীগঞ্জ এলাকা মুক্ত হরতে পাঠানো হয়েছিল।

২। বারাপুঞ্জী সাব-সেক্টরঃ এটা কমাণ্ড করত ক্যাপ্টেন রব। সাপ্লাই কোর-এর অফিসার হয়ে পদাতিক সৈন্য পরিচালনায় সে অশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে এবং সাব-সেক্টর লাটু, বিয়ানীবাজার, শারোপার, বরোগ্রাম, জাকীগঞ্জ, আটগ্রাম, কানাইঘাট, চিকনাগুল এলাকায় অসীম সাহসের সাথে যুদ্ধ পরিচালনা করেছে।

৩। আমলসিদ সাব-সেক্টরঃ বাংলাদেশ সোনাবাহিনীর লেঃ জহীর এই সাব-সেক্টর কমাণ্ডার ছিল। এই তরুণ অফিসারটি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে খুবই সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দিয়েছে। কানাইঘাট অপারেশনে তার দক্ষতার প্রশংসা না করে পারা যায় না। ডিসেম্বর প্রথম সপ্তাহে এই সাব-সেক্টরটি 'জেড'- ফোর্সের প্রথম বেঙ্গল রেজিমেণ্টর সঙ্গে সম্মিলিতভাবে কাজ করেছে।

৪। কুকিতল সাব-সেক্টরঃ এটার কমাণ্ডার ছিল ফ্লাইট লেফটেন্যাণ্ট কাদের। বিমান বাহিনীর অফিসার হয়ে এত সুষ্ঠভাবে পদাতিক বাহিনী পরিচালনা করায় তাকে প্রশংসা না করে পারা যায় না। মাঝে মাঝে সে প্রায়ই বলত, স্যার আমাকে একটা জঙ্গী বিমান এনে দেয়, আমি পাকিস্তানীদের খতম করব। আপনাদের যুদ্ধ খুব মন্থর গতিতে চলছে। আমি চাই তাড়াতাড়ি পাকিস্তানীদের শেষ করে বাংলাদেশ মুক্ত করতে।' আমি তাকে সান্তনা দিতাম 'স্লো এ্যাণ্ড স্টীডি ইউনস দি রেস'। এই সাব-সেক্টর দিলখুশ চা বাগান, কুলাউড়া, জুরী চা বাগান এলাকায় অপারেশন চালিয়ে শত্রুকে নাস্তানাবুদ করেছে। পরে এই সাব-সেক্টর ক্যাপ্টেন শরিফুল হক যোগ দিয়েছিল। এই নির্ভীক যুবক পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এসে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহন হরে। এর কৃতিত্বের কথা পরে আসবে।

৫। কৈলাশশহর সাব-সেক্টরঃ লেঃ ওয়াকিউজ্জামান এই সাব-সেক্টর কমাণ্ডার ছিল। নয় মৌজায় বাংলাদেশ পতাকা উত্তোলন ও শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এত বড় এলাকাকে মুক্ত রাখার জন্য এই তরুণ

* ১৯৭১ সালে মার্চে মেজর পদে কর্মরত ছিলেন। বর্তমানে মেজর -জেনারেল। সাক্ষাৎকারটি ২৪-৩-১৯৭৪ তারিখে গৃহীত হয়।

অফিসারকে প্রশংসা না করে পারা যায় না। এই সাব-সেক্টর ডিসেম্বরের দিকে ফেঞ্চুগঞ্জ মুক্ত করে সিলেটের দিকে গিয়েছিল। এবং ভারত যখন যুদ্ধ ঘোষণা করল তখন এই সাব-সেক্টর ভারতের ৫৯ ভারতীয় ব্রিগেডের সাঙ্গে সিলেটের প্রবেশ করেছিল।

৭। কমলাপুর সাব-সেক্টরঃ এটার কমাণ্ডার ছিল ক্যাপ্টেন এনাম। এই তরুণ অফিসার পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এসে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয় এবং এই সেক্টরের সাব-সেক্টর কমাণ্ডার হয়ে অনেক কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে। ধলাই চা বাগান এবং পার্শ্ববর্তী চা বাগানগুলো ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য এই সাব-সেক্টরকে কৃতিত্ব দেয়া যায়। ভারত যুদ্ধ ঘোষণার পর এই সাব-সেক্টর ৮১ ভারতীয় ব্রিগেডের সঙ্গে মিলিত হয়ে মৌলভীবাজারে প্রবেশ করেছিল।

লোহারবন্দ নামে এক জায়গায় সমস্ত ছেলেদের প্রশিক্ষণ দেয়া হত। রিলিফ ক্যাম্প, শরণার্থী শিবির এবং নানা জায়গা থেকে স্কুল-কলেজের ছেলেদের এবং বাংলাদেশের কর্মক্ষম নাগরিকদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেওয়া হত। প্রশিক্ষণ দেবার পর ছেলেদের পাঠিয়ে দেয়া হত বিভিন্ন সাব-সেক্টর। এই কাজের জন্য সিলেটের ফরিদ গাজী, নূরুল ইসলাম, আজিজ, তোয়াবুর রহীম, ডক্টর আলী, হাবীব রহমান, ডক্টর মালেক, লতিফ প্রমুখ লোকের নাম না করলে তাঁদের প্রতি অবিচার করা হবে। রাত-দিন কাজ করে নানা জায়গা থেকে লোক সংগ্রহ করে তাঁরা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পাঠিয়ে দিতেন, আমার সৈন্যদের সাব-সেক্টর খাওয়া-দাওয়া এবং থাকার ব্যবস্থা করতেন, তার জন্য আমি তাঁদেরকে জানাচ্ছি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

সেক্টর ট্রুপস -এর কাজ শত্রুদের ধ্বংস করা, এ্যামবুশ করা, এবং গণবাহিনীর কাজ ছিল পুল ধ্বংস করা, বিদ্যুৎ সরবারাহ বিপর্যস্ত করা, মাইন পোঁতা ও ছোটখাটো শত্রুঘাটি ধ্বংস করা। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক থেকে আমাকে দেয়া হয়েছিল যত চা-বাগান আমার এলাকায় আছে তাদের অকেজো করে দেওয়া। কাজ পুরোদমে চলতে লাগল। এদিকে একদিন সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত, বিধু দাশগুপ্ত আমার কাছে এসে বলল যে, শিলং দিয়ে সুনামগঞ্জ এলাকায় অপারেশন করা উচিত। আমি তাদেরকে সব সাহায্য দিলাম। পরে এই দুই নির্ভীক যুবক তাদের নিজ নিজ এলাকার ভিতর ঢুকে পাকিস্তানী সৈন্যদের বিপুল ক্ষতিসাধন করেছে। সুরঞ্জিত সেনগুপ্তের দিরাই অপারেশন এবং বিধু দাশগুপ্তের মাঘালকান্দী এবং আজমিরীগঞ্জ আপারেশন এলাকার সকলেরই সুবিদিত। এরা সত্যই প্রশংসার যোগ্য।

মে-জুন সেক্টর ট্রুপস এবং গণবাহিনী তাদের নিজ নিজ কাজ পুরোদমে চালিয়ে যেতে থাকে। শেওলা-সাদা খাল, বারইগ্রাম এবং কাংলী ফেরীর উপর এরা আক্রমন চালিয়ে পাকিস্তানীদের বিপর্যস্ত করতে লাগল। অনেক দালালকে মেরে ফেলা হলো। ছোট ছোট দলে সেক্টর ট্রুপস ও বাহিনীকে পাঠানো হত ফেরীগুলোকে নষ্ট করতে। এক একটা নৌকাকে নষ্ট করতে বেশ সময় এবং পরিশ্রমের দরকার। এখনও মনে পড়ে নায়েব কুতুবের কথা। আজ সে আমাদের মাঝে নেই। সাদা খাল ফেরী নষ্ট করতে হবে। সংগে আরো দুজন সিপাহী ও দুজন ছত্র। সাদাখাল তখন পানিতে ভর্তি। বেশ স্রোত। কচুরিপানা ভেসে যাচ্ছিল এখানে-ওখানে, খেয়া ছিল নদীর ওপারে, যেদিকে শত্রু ছিল। সবাই ওরা নদীতে নেমেছে খেয়াগুলিকে নষ্ট করতে। নদীর মধ্যখানে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টির মত গুলি আসতে শুরু করল। নায়েক কুতুব ডুব দিয়ে প্রায় নৌকার কাছে চলে এসেছিল। সামনে ছিল কচুরিপানা। ওগুলো মাথায় দিয়ে স্রোতের দিকে ভেসে গেল। দু দিন পর এসে আমার পায়ে প্রণাম করে বলল, বড় বেচেঁ গেছি স্যার। আমি তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলাম। চোখ দিয়ে আনন্দে জল গড়িয়ে পড়ল, কেবল বললাম, বেঁচে থাক-জয় বাংলা' চারজন ফিরে এসে যখন অবস্থার বর্ণনা দিয়েছিল তখন ভেবেছিলাম ওকে বোধ হয় আর ফিরে পাব না। যাই হোক ওকে আমার কাছে পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

পুরো জুন-জুলাই আমাদের কাজ অব্যহত থাকে। হিট এণ্ড রান কায়দায় শত্রুদের বিপর্যস্ত করাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। শত্রুদের ঘাঁটি লাটু, বড়লেখা, ফুলতলা, আটগ্রামের উপর হানা দিলাম। চা-বাগানগুলো অকেজো করতে আরম্ভ করলাম। রাজকী, ফুলতলা, শেওলা, পৃথিমপাশা, সমনভাগ, সোনারুপা,

হাসনাবাদ, চূড়ামনি, গাহেরা, সাগরনাল চা-বাগানগুলো অকেজো করা হল। বিস্ফোরক দ্রব্য বেশী ছিল না। তবুও তাই দিয়ে চা-বাগানের বড় বড় মেশিনের যন্ত্রপাতি অকেজো করা হল।

জুনের প্রথম সপ্তাহে লাঠিটিলা চা-বাগানের উপর মস্তবড় হামলা চালানো হল। জানতে পারলাম লাঠিটিলাতে শত্রুদের এক প্লাটুন সৈন্য পরিখা খনন করে আছে। এই আক্রমণে আমাকে ভারতীয় গোলন্দাজ এবং মেশিনগানের সাহায্য নিতে হয়েছিল। শত্রুদের শক্তিশালী ঘাঁটি ছিল। আমাদের কাছে যে সৈন্য এবং অস্ত্রশস্ত্র চিল তা দিয়ে শত্রুদের মোকাবেলা করা সম্ভব ছিল না বলে আমাকে ভারতীয়দের সাহায্য নিতে হয়েছিল। এই আক্রমণ ক্যাপ্টেন রবের নেতৃত্বে হয়েছিল। খুব ভোরে চারটা থেকে ভরতীয় গোলন্দাজ বাহিনী গোলাগুলি শুরু করল এবং মেশিনগান থেকে গুলি ছুড়তে শুরু করল। আর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সৈন্যরা শত্রুর দিকে অগ্রসর হতে আরম্ভ করল। বেলা প্রায় ১১টার সময় শত্রুরা আমাদের সম্মিলিত আক্রমণের মুখে টিকতে না পেরে পিছু হটে যায়। আমার সৈন্যরা তার উপর হামলা করে অনেক গোলাবারুদ এবং অস্ত্র উদ্ধার হয়েছিল। দুটো পাকিস্তানী সৈনিক আহত অবস্থায় ধরে নিয়ে আসা হয়েছিল। একদিন পর আরেকজন পাঞ্জাবী ল্যান্স নায়েককে পাতনী চা বাগানে পাওয়া গিয়েছিল।

এই যুদ্ধে নায়েক শফিকউদ্দিন আহমদেকে বীরপ্রতিক উপাধিতে ভূষিত করার জন্য সুপারিশ করা হয়েছিল। নায়েক শফিকই হাতাহাতি যুদ্ধে নিজের জীবন বিপন্ন করে গ্রেনেড ছুড়ে আহত সিপাহীটিকে ধরে আনতে সক্ষম হয়েছিল। জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত 'হিট এণ্ড রান' কৌশল অব্যাহত থাকে। বেশীরভাগ চা-বাগানগুলো অকেজো করে দেয়া হলো। এবং স্থির হলো যে গণবাহিনীর ছেলেদের সিলেটের ভেতরে ঢুকানো হবে। এদেরকে বলা হল, সিলেটের ভেতরে গিয়ে ডাকঘর, পুলিশ স্টেশন, বাণিজ্য কেন্দ্রে ইত্যাদিতে গ্রেনেড নিক্ষেপ করে স্বাভাবিক কাজকর্ম ব্যাহত করতে হবে। এদিকে ক্যাপ্টেন শরিফুল হক জুলাই মাসের মাঝামাঝি দিলখুশ ও জুবীতে অনেক অপারেশন করল এবং খরব পাওয়া গেল দিলখুশ চা বাগানে পাকিস্তানীরা পরিখা খনন করেছে এবং আমাদের জুবী যাবার রাস্তা বন্ধ করে দেবার চেষ্টা করছে। ক্যাপ্টেন শরিফুল হককে বলা হল দিলখুশে পাকিস্তানী ঘাঁটি ধ্বংস করতে। এই ঘাঁটি ধ্বংস করার জন্য আমাকে ভারতীয় গোলন্দাজ বাহিনীর সাহায্য নিতে হয়েছিল। ক্যাপ্টেন হক একজন আর্টিলারী অফিসার। টার্গেট নির্দেশ করার প্রশিক্ষণ তার ছিল। দিলখুশ আক্রমণের জন্য কি কি কাজ করতে হবে তা সৈন্যদেরকে বুঝিয়ে দেয় হল। দিলখুশ থেকে প্রায় এক মাইল দূরের একটা উঁচু লম্বা গাছ থেকে পুরো দিলখুশ এলাকাটা দেখা যায়। আক্রমণ শুরু হল। ক্যাপ্টন হক গাছে চড়ে অয়ারলেস- এর সাহায্য টার্গেট সঠিকভাবে নির্দেশ করতে আরম্ভ করলেন। আমাদের গোলাগুলি পাকিস্তানীদের উপরে পড়তে লাগল। তারা দৌড়াদৌড়া আরম্ভ করল, বুঝা গেল তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে। যুদ্ধ যখন শেষ অবস্থায় এসে পৌঁছল তখন শত্রুদের একটা ৩" মর্টরের গুলি এসে হক যে গাছে ছিল তার নিচে এসে পড়ল এবং হক আহত হয়ে পড়ে গেল। আমাদের পক্ষের গোলাগুলি এর পর থেকে ঠিক লক্ষ্যস্থানে পড়েছিল না-এমনি আমাদের উপরেই পড়তে আরম্ভ করল। আমাদের সৈন্যরা তখন পিছু হটতে বাধ্য হল। হককে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়া হল। যদিও এ আক্রমণ সফল হয়নি, তবুও পাকিস্তানীদের মনোবল অনেক ভেঙ্গে গিয়েছিল এবং বেশকিছু হতাহত হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে। এই এ্যাকশনের পর পাকিস্তানীরা দিলখুশে আর তাদের ঘাঁটি বানায়নি। এই যুদ্ধের জন্য ক্যাপ্টেন হককে বীর উত্তম উপাধির সুপারিশ করা হয়েছিল। আগস্ট মাসে লুবাছড়া, কাড়াবালা, মোকাটিলা, আমলসিদ, ন' মৌজা আমাদের মুক্ত এলাকা বলে ঘোষিত হল। পাকিস্তানীরা এই মুক্ত এলাকা দখল করার জন্য বার বার আক্রমণ চালিয়েছে কিন্তু সফল হতে পারেনি।

খবর পাওয়া গেল লাটুতে শত্রুসৈন্য (প্রায় এক কোম্পানী) পরিখা খনন করেছে এবং বড়লেখা পর্যন্ত তারা প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। লাটু এমন একটা জায়গা যেটা দখল করা আমাদের পক্ষে খুবই দরকার ছিল। কারণ লাটু দখল করলে শত্রুদের কুলাউড়া-শ্রীহট্ট রাস্তায় চলাচলে অনেক অসুবিধা হবে। মেজর রবের অধীনে প্রায় ৩০০ মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে লাটু দখলের পরিকল্পনা নিলাম। আমার পরিকল্পনা ছিল লাটু রেলওয়ে স্টেশনে

কিছুসংখ্যক সৈন্য দিয়ে আক্রমণ চালানো আর বাকি সৈন্য দ্বারা লাটুর বাঁয়ে পাহাড়ের গা ঘেঁষে লাটুর উপর পুরোপুরি আক্রমণ চালিয়ে দখল করা। লাটু- বড়লেখা রাস্তায় মাইন পুঁতে রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, যাতে পাকসেনারা বড়লেখা হতে অগ্রসর হতে না পারে এবং বাধাপ্রাপ্ত হয়। আমাদের কাছে কোন অয়ারলেস সাজসরঞ্জাম ছিল না। তাই একদলের সাথে অন্যদের যোগাযোগ ছিল না। আগস্টের শেষের দিকে ভোর চারটায় আক্রমণ শুরু হল। বেলা সাড়ে এগারটায় লাটু-বড়লেখা রাস্তায় মাইন পোঁতার জন্য যাদেরকে পাঠানো হয়েছিল তারা সাড়ে এগারটায় ফিরে আসে। দুইজন গুরুতরভাবে আহত হয়েছিল মাইন পোঁতার সময়। তাদের সবাইকে মেজর রবের কাছে পাঠিয়ে দিলাম। পাকসেনাদের উপর আক্রমণ চলতে থাকে। বেলা প্রায় দুটোর সময় দেখা গেল যে পাক সেনারা বাঙ্কার ছেড়ে পেছনে চলে যাচ্ছে। পরক্ষণেই আরম্ভ হল শত্রূসৈন্যর লাটুর উপর গোলাগুলি নিক্ষেপ। বোঝা গেল বড়লেখা থেকে শত্রুসৈন্য লাটুতে এসে যোগ দিয়েছে। শত্রূদের কাছ থেকে ৩ ইঞ্চি এমজি'র গোলাগুলি আসতে লাগল। বেলা প্রায় সাড়ে পাঁচটা। শত্রূদের প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে মুক্তিযোদ্ধারা টিকতে না পেরে পিছনে চলে আসতে শুরু করে। মনটা খারাপ হয়ে গেল। এই যুদ্ধে তিনজন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হয়েছিল।

সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে আবার আক্রমণ চালানো হল। সারোপার এবং লাটু এ দুটো জায়গা আবার দখল করার প্রচেষ্টা চালানো হয়। তুমুল যুদ্ধের পর সারোপার আমাদের হস্তগত হয়। সারোপার দখলে একটা সুবিধা হল যে শত্রূসৈন্যর এখন কুলাউড়া থেকে সিলেটে সরাসরি আসা বন্ধ হয়ে গেল। পুরো সেপ্টেম্বর মাসটা লাটু, বড়লেখা এমনি ফেঞ্চুগঞ্জ পর্যন্ত আমাদের আক্রমণ চলতে লাগল। ইতিমধ্যে মুক্তিযোদ্ধা কমাণ্ডার সাদী তার সৈন্যদের নিয়ে চা-বাগানে আক্রমণ চালায় এবং দুদিন তুমুল যুদ্ধের পর পুরো লুবাছড়া-কাড়াবালা আমাদের হস্তগত হয়। লুবাছড়া মুক্ত হবার পর পাকিস্তানীরা বার বার চেষ্টা চালিয়েছে লুবাছড়া দখল করার জন্য, কিন্তু লুবাছড়া পুনরায় দখল করতে তারা সমর্থ হয়নি। লুবাছড়া স্বাধীনতা লাভ পর্যন্ত মুক্ত ছিল। আমাদের আক্রমণের ভবিষ্যৎ কর্মসূচী লুবাছড়া থেকে নির্ধারিত হয়েছিল। এই যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধা খাজা নিজাম উদ্দীনসহ নিম্নলিখিত মুক্তিযোদ্ধারা শহীদ হয়েছিল এবং তাদের বীরত্বের জন্য লুবাছড়া আমাদের হস্তগত হয়েছিল। তাদেরকে এ ওয়ার্ড দেয়ার জন্য আমি সি-ইন-সি'র কাছে অনুরোধ করেছিলাম।

নিহতারা হলোঃ ১। খাজা নিজামুদ্দীন বীর শ্রেষ্ঠ। ২। রফিক উদ্দীন বীরোত্তম। ৩। মোহাম্মদ বশির আহম্মদ বীরপ্রতীক। ৪। মোহাম্মদ মইজুল ইসলাম বীর প্রতীক। ৫। মোহাম্মদ শাহাবউদ্দীন বীরশ্রেষ্ট। ৬। মোহাম্মদ হোসেন। ৭। আতিকুল ইসলাম বীরপ্রতিক। ৮। আশরাফুল হক বীরোত্তম। ৯। মাহমুদূর রব বীরোত্তম।

নয়টা গ্রাম নিয়ে গঠিত একটি মৌজা-নাম ন' মৌজা। এটি ভারতের কৈলাশশহের বিপরীতে অবস্থিত ছিল। লেঃ ওয়াকিউজ্জামানের নেতৃত্বে ন' মৌজায় পাকিস্তানী ঘাঁটির উপর আঘাত হানা হল এবং ন' মৌজাকে শত্রূমুক্ত হরা হল। এমনিভাবে লুবাছড়া, কাড়াবালা, মোকামটিলা, আমলসিদ, ন' মৌজা আমাদের দখলে আসে এবং পরবর্তী পর্যায়ে পাকিস্তানীদের উপর আঘাত করা হল এই সমস্ত ঘাঁটি হতে।

অক্টোবরের মাঝামাঝি মেজর জিয়া (বর্তমানে মেজর জেনারেল) ১ম এবং ৮ম বেঙ্গল রেজিমেণ্ট নিয়ে আমার সেক্টরে যোগ দেন। তাতে আমার শক্তি অনেক বেড়ে যায়। ১ম বেঙ্গল রেজিমেণ্ট জিয়াউদ্দিনের নেতৃত্বে এবং ৮ম বেঙ্গল রেজিমেণ্ট মেজর আমিনের নেতৃত্বে (বর্তমানে দুজনই লেফটেন্যাণ্ট কর্নেল) সিলেটের চা বাগানগুলোর উপরে আক্রমণ চালানো হয়। পরিকল্পনা ছিল চা বাগানগুলো শত্রূমুক্ত করে আমরা সবাই মিলে সিলেটের দিকে অগ্রসর হব। ১ম বেঙ্গল রেজিমেণ্ট প্রথমে আঘাত হানল কেজুরীছড়া চা বাগানের উপর। সঙ্গে সঙ্গে ৮ম বেঙ্গল রেজিমেণ্ট আঘাত হানল ফুলতলা- সাগরনাথ চা বাগানের উপর। এমনিভাবে সেক্টর ট্রুপস এবং 'জেড' ফোর্স পুরো সিলেট জেলার উপর একটার পর একটা আঘাত হানতে শুরু করল এবং পাকিস্তানীদের পর্যুদস্ত করতে শুরু করল। ৮ম বেঙ্গল রেজিমেণ্ট দক্ষিণগুলো চা বাগানের উপর আক্রমণ চালালো। শত্রূদের ২২

বেলুচ রেজিমেণ্ট ওখানে ছিল। পাকিস্তানীরা আনেকবার দক্ষিণগুলের উপর আক্রমণ চালিয়েছে। কিন্তু ৮ম বেঙ্গল রেজিমেণ্ট দক্ষিণগুল হাতছাড়া করেনি। আমার মনে হয়, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে এবং বাংলাদেশের ইতিহাসে এই সর্বপ্রথম দক্ষিণগুলে ১০৫ মিলিমিটার আর্টিলারী দক্ষতার সাথে এবং কার্যকরীভাবে শত্রুর বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়েছিল। দক্ষিণগুল জয়ের অন্যতম কারণগুলোর মধ্যে ১০৫ আর্টিলারীর সাফল্যজনক ব্যবহার অনেকাংশ সাহায্য করেছিল। ১০৫ মিলিমিটার আর্টিলারী ব্যবহারের প্রশিক্ষণ সিলেট সেক্টর আমারই তত্ত্বাবধানে ক্যাপ্টেন রশীদের পরিচালনায় সর্বপ্রথম হয়েছিল। আমার যতদূর মনে হয়, ১০৫ মিলিমিটার আর্টিলারীকে পরবর্তীকালে মুজিব ব্যাটারী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছিল।

নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে আট-গ্রাম-জাকীগঞ্জ দখল করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ল। কারণ জাকীগঞ্জ সিলেটের এক কোণে অবস্থিত। ভারতের করিমগঞ্জ শহরটি ঘেঁষে জাকীগঞ্জের অবস্থিতি। মাছখানে ছোট্র একটি নদীর ব্যবধান। জাকীগঞ্জ থেকে পাকিস্তানীরা শিলচর-করিমগঞ্জ রেলওয়ে লাইনের উপর রাতের অন্ধকারে মাইন পুঁতে রাখত। তার ফলে দু'দুবার মালবাহী ট্রেন দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়েছিল। এতে আমরা অত্যন্ত লজ্জাবোধ করতাম, কারণ বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তানীরা এসে বন্ধুরাষ্ট্রের ক্ষাতিসাধন করছে। তাই জাকীগঞ্জ দখল করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ল। সেক্টর ট্রুপস এবং বেঙ্গল রেজিমেণ্টকে নিয়ে হামলা চালানো হল। জাকীগঞ্জের এই যুদ্ধে ভারতের সাহায্য-সহযোগিতা কোনদিন ভুলবার নয়। তাদের সাহায্য না পেলে হয়ত জাকীগঞ্জ আটগ্রাম শত্রুমুক্ত করা সহজ বা সম্ভব হত না। প্রচণ্ড যুদ্ধের পর জাকীগঞ্জ আটগ্রাম আমাদের দখলে আসে। দখলের পর ১ম বেঙ্গল রেজিমেণ্ট আটগ্রামে অবস্থান করছিল। ভরতের ৯৯তম মাউণ্টেন রেজিমেণ্টকে জানাই আমার সালাম।

খবর আসতে লাগল শত্রুসৈন্য সমস্ত সিলেট জেলায় আমাদের আক্রমণ প্রতিহত করতে না পেরে বিপর্যস্ত হয়ে পিছু হটতে শুরু করেছে। তারা রাতে ভয়ে কোথাও বের হত না, পাকিস্তানীদের একা একা কোথাও দেখা যেত না। গেরিলা অপারেশন অত্যন্ত সাফল্যজনকভাবে পরিচালিত হচ্ছিল। পাকিস্তান সোনাবাহিনী গেরিলা অপারেশনের সফলতায় ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল। তারা তাদের ঘাঁটি থেকে বের হতে সাহস করত না। তাদের চলাফেরা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল।

সিলেট জয় করতে হলে কানাইঘাট দখল করা সবর্প্রথম প্রয়োজন। আমি সেক্টর ট্রুপস নিয়ে কানাইঘাট জয়ের জন্য লুবাছড়ার দিকে অগ্রসর হয়ে ওদিক থেকে আক্রমণের পরিকল্পনা নিলাম। আমার সঙ্গে ছিল বাংলাদেশের রাইফেলের ছেলেরা, আনসার, মোজাহিদ. পুলিশ ও স্কুল-কলেজের ছাত্ররা। সব মিলিয়ে প্রায় ৪০০ জন। লুবাছড়া পৌঁছতে পৌঁছতে বিকেল হয়ে আসল। চিন্তা করতে লাগলাম কিভাবে কানাইঘাট দখল করা যায়। আমাকে হুকুম দেয়া হয়েছিল যেভাবে হোক কানাইঘাট দখল করতে হবে।

সিলেট সেক্টর ট্রুপস কানাইঘাটের যুদ্ধ একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা। ১৯৭১ সালের ৩রা ডিসেম্বর সেক্টর ট্রুপস অগ্রসর হল। সৈন্যসংখ্যা চারশোজনকে নিয়ে চারটি কোম্পানী গঠন করা হল। একটা কোম্পানীকে লেফটেন্যাণ্ট গিয়াসের নেতৃত্বে দরবস্ত -কানাইঘাট রাস্তার মধ্যে 'কাট অফ কোম্পানী' হিসেবে কাজ করার দায়িত্ব দেয়া হল। ওর কাজ ছিল শত্রুসৈন্য দরবস্ত হতে কানাইঘাট যুদ্ধে যেন কোন সাহায্য করতে না পারে। লেফটেন্যাণ্ট জহীরকে আর একটি কোম্পানীর দায়িত্ব হতে কানাইঘাট-চোরঘাই রাস্তায় 'কাট অফ কোম্পানী' হিসেবে কাজ করার দায়িত্ব দেয়া হল। ওকে এই দায়িত্ব দেয়ার কারণ হল চোরঘাই থেকে যেন শত্রুসৈন্য কানাইঘাটে সাহায্যে এগিয়ে আসতে না পারে এবং কানাইঘাট থেকে শত্রুসৈন্য পালিয়ে চোরঘাইর দিকে না যেতে পারে। আর দুটো কোম্পানী মেজর রব (বর্তমানে লেফটেন্যাণ্ট কর্নেল)-এর অধিনায়কত্বে নদীর পাড় ও মধ্য দিয়ে শত্রুর উপর হামলা চালিয়ে কানাইঘাট দখলের দায়িত্ব দেয়া হল। রাতের অন্ধকারে কানাইঘাট যুদ্ধ জয়ের অভিযান শুরু হল। রাত দেড়টায় গোলাগুলির আওয়াজ শোনা যায়। লেফটেন্যাণ্ট গিয়াসের সঙ্গে শত্রুসৈন্যর গুলি বিনিময় হচ্ছে। লেফটেন্যাণ্ট গিয়াসের কোম্পানী জায়গায় পৌঁছতে পারছে না। ইতিমধ্যে তার

একজন সৈন্য আহত হয়। আমি তাকে বললাম যেভাবে হোক তোমার গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে হবে। লেফটেন্যান্ট জহীরের কাছ থেকে খবর আসল সে বিনা বাধায় কানাইঘাট-দরবস্ত রাস্তা পার হয়ে গন্তব্যস্থলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। রাত যত বাড়তে লাগল ততই গোলাগুলির আওয়াজ বাড়তে লাগল। রাত প্রায় দুটোর সময় লেফটেন্যাণ্ট গিয়াসের কাছ থেকে খবর পেলাম ওরা শত্রুসৈন্যকে ঘিরে ফেলেছে, তবে তার একটি ছেলে শহীদ হয়েছে এবং সে শত্রুদের উপর শেষ হামলা চালাবার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এদিকে জহীরের কাছ থেকে খবর পেলাম তার গন্তব্যস্থল প্রায় ৭০০/৮০০ গজ দূরে, তার উপর ভীষণভাবে মর্টারের গোলাবর্ষণ হচ্ছে এবং সে এগুতে পারছে না। মেজর রবের কাছ থেকে খবর পেলাম তার দুটো কোম্পানী ধীরগতিতে গন্তব্যস্থলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। তবে সে এখনও মুখোমুখি সংঘর্ষের সম্মুখীন হয়নি। লেফটেন্যন্ট গিয়াসের কাছ থেকে ৪ঠা ডিসেম্বর রাত তিনটার সময় খবর আসল শত্রুদের একটি পুলের চার কোনায় চারটি বাংকার। এবং তার ভেতর থেকে প্রচণ্ড গোলাগুলি আসছে। লেফটেন্যাণ্ট গিয়াসের সৈন্যরা বাংকারের উপর গ্রেনেডের সাহায্যে শত্রুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ভেতর থেকে বাংলায় চীৎকার করে বলল, "আমরা বাঙ্গালী, আমাদের মারবে না। দুটো পশ্চিম পাকিস্তানী রাস্তার উপর দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। আমরা আপনাদের সাহায্য করব।" রাত প্রায় সাড়ে তিনটে-চারটে হবে। লেফট্যানেণ্ট গিয়াসের কাছ থেকে খবর পেলাম ওরা ওদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেছে। বাংকারের ভেতরে ওরা যেতে পারেনি। কারণ বাংকারে অনেক মৃতদেহ পড়ে আছে। এবং ৭ জন রাজাকার বাইরে চলে এসে আত্মসমর্পণ করেছে। নয়জন পশ্চিম পাকিস্তানী গ্রেনেড ছোড়ার ফলে মারা যায়। দু'জন পশ্চিম পাকিস্তানী পালাবার সময় মুক্তিযোদ্ধারা মেরে ফেলে। ৭ জন বাঙালী রাজাকার আত্মসমর্পণ করে। লেফটেন্যাণ্ট গিয়াসকে পুরো এলাকায় প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হলো যাতে দরবস্ত থেকে শত্রুরা কানাইঘাটের দিকে আসতে না পারে। রাত বাড়তে লাগল, লেফটেন্যাণ্ট জহীরের কাছ থেকে খবর পেলাম সে এগুতে পারছে না। এদিকে মেজর রব শত্রুসৈন্যর মুখোমুখি প্রায় এসে পড়েছে। তার উপর প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ হচ্ছে। বেলা বাড়তে লাগল-মেজর রব শত্রুসৈন্যকে নদীর তীর দিয়ে প্রায় ঘিরে ফেলেছে। সে ওদের কাছ থেকে দুশো গজ দূরে আছে। তার দুটো ছেলে গুরুতরভাবে আহত হয়েছে। তার গোলাবারুদ দরকার বলে সে জানাল। ৪ঠা ডিসেম্বর সকাল ৬টায় জহীরের কাছ থেকে খবর পেলাম এম-জি এবং মর্টারের গোলাগুলিতে সে এগুতে পারছে না। তিনজন গুরুত্বরভাবে আহত হয়েছে। আরো সৈন্য এবং গোলাবারুদ চেয়ে সে অনুরোধ জানাল। আমি বললাম, সৈন্য আর পাঠাতে পারব না, তবে গোলাবারুদ পাঠিয়ে দিচ্ছি। সকাল ৭টায় মেজর রবেব কাছ থেকে খবর পেলাম নদীর ওপার থেকে ওদের উপর গোলাগুলি আসছে। আমি জানতাম আটগ্রামে ১ম বেঙ্গল রেজিমেণ্ট আছে এবং এটাও জানতাম নদীর ওপারে শত্রুসৈন্য আছে। ১ম বেঙ্গলকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল নদীর ওপার থেকে শত্রুসৈন্যদের সরিয়ে দিতে। আমার সঙ্গে ১ম বেঙ্গল রেজিমেণ্ট এবং 'জেড'-ফোর্স- এর বেতার যোগাযোগ ছিল না। মেজর রবের উপর নদীর ওপার থেকে গোলাগুলি আসতে লাগল। মেজর রবকে বললাম, ভারতের সাথে বেতার যোগযোগ করে ভারতীয় গোলন্দাজ বাহিনীর সাহায্য আমি নিচ্ছি। তুমি তোমার দায়িত্ব পালন করে যাও। ভারতের সাথে যোগাযোগ করি এবং গোলন্দাজ বাহিনীর সাহায্য পাবো বলে তারা আশ্বাস দেয়। এদিকে, যেহেতু মেজর রবের আরো সৈন্যর দারকার ছিল সেইহেতু জহীরকে মেজর ববের সাহায্য পাঠানো হল। লেফটেন্যাণ্ট গিয়াসের কাজ থেকে খবর পেলাম দরবস্ত থেকে পাকিস্তানীদের কানাইঘাটের দিকে আসার কোন পরিকল্পনা আছে বলে তার মনে হচ্ছে না। গিয়াসকে লেফটেন্যাণ্ট জহীরকে সাহায্যের জন্য পাঠানো হল। মেজর রব এবং লেফটেন্যাণ্ট জহীরের দলের উপর শত্রুর ভীষণ গোলাগুলি হচ্ছিল। আস্তে আস্তে ওরা এগুতে লাগল। বেলা প্রায় দশটায় খবর পেলাম নদীর ওপার থেকে পাকিস্তানীরা পেছনে পালাচ্ছে। এদিকে কানাইঘাট থেকেও পাকিস্তানীরা বাংকার থেকে উঠে পড়েছে। কানাইঘাটে শত্রুদের উপর মুক্তিযোদ্ধারা ঝাঁপিয়ে পড়ল। বেলা প্রায় সাড়ে দশটায় মেজর রব, লেফটেন্যাণ্ট গিয়াস ও লেফটেন্যাণ্ট জহীরের সৈন্যরা সম্মিলিতভাবে কানাইঘাটে শত্রুসৈন্যদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। এবং হাতাহাতি যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। পাকিস্তানীরা রাস্তা না পেয়ে নদীতে ঝাঁপ দিতে আরম্ভ করল এবং নিজেদের পোঁতা মাইন বিস্ফোরণে নিজেরাই মরতে আরম্ভ করল। যারা নদীতে ঝাঁপ দিয়েছিল ওরাও মুক্তিযোদ্ধাদের গুলিতে প্রাণ হারায়। নদীর পানি লাল হয়ে গিয়েছিল। অনেকে পানিতে

ডুবেও মারা যায়। ভীষণ শব্দে মাইনগুলো ফাটছিল। যারা চুরবাইর দিকে পালাতে চেষ্টা করেছিল তারাও মুক্তিযোদ্ধাদের গুলিতে প্রাণ হারায়। বেলা প্রায় এগারটায় কানাইঘাট আমাদের দখলে আসল। কানাইঘাটে শত্রুসৈন্যেও অনেক লাশ ছিল। লাশগুলোর সৎকারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। চারধারে 'জয় বাংলা ধ্বনি, ছেলেদের মুখে হাসি। মনটা গর্বে ভরে উঠল। কানাইঘাট জয়ের কথা জানানো হল। নানা জায়গা থেকে আমাদেরকে অভিনন্দন জানানো হল। জেনারেল ওসমানীর কাছ থেকেও অভিনন্দন বার্তা পেলাম। কানাইধাট যুদ্ধে পাকিস্তানীদের মৃতের সংখ্যা ছিল ৫০ জন, আহত ছিল ২০ জন। বাঙ্গালী রাজাকার ছিল বিশজন। তারা পায়ে ধরে ক্ষমা চাওয়াতে ওদেরকে মুটে-মজুরের কাজ দেয়া হয়েছিল। এই যুদ্ধে আমাদের পক্ষে শহীদ হয়েছে এগারজন। এবং আহত হয়েছিল ১৫ জন। আমার ডাক্তার ছিল সিলেটে মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র নজরুল। যেভাবে সে আহতদের চিকিৎসা করেছে তাকে ধন্যবাদ না দিয়ে পারছি না। অবাক হয়ে চেয়ে থাকতাম কখনো ব্লেড গরম করে, কখনো বেয়নেট গরম করে কাটাছেঁড়া করছে। অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে সে।

এত বড় দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পেরেছি বলে যারা ভাল কাজ করেছে তাদেরকে উপাধিতে ভূষিত করার জন্য সর্বাধিনায়কের কাছে নাম পাছিয়েছিলাম। তারা হলঃ ১। মেজর রব বীরোত্তম। ২। লেফটেন্যান্ট জহিরুল হক বীরপ্রতীক। ৩। সুবেদার মতিন বীরোত্তম। ৪। সুবেদার বাছর আলী বীরোত্তম। ৫। নায়েক সুবেদার শামসুল হক বীরোত্তম। ৬। হাবিলদার মোহাম্মদ শাহ আলম (শহীদ) বীরশ্রেষ্ঠ। ৭। হাবিলদার আবদুল জব্বার বীর প্রতীক। ৮। সিপাহী কামাল উদ্দীন বীর প্রতীক। ৯। নায়েক আলি আকবর বীর প্রতীক। ১০। এফ, এফ, নূরউদ্দীন আহমদ বীরোত্তম। ১১। এফ, এফ, নীলমণি সরকার।

কানাইঘাট জয়ের পর খবর আসল আমাকে দরবস্ত হয়ে সিলেটে যেতে হবে। দরবস্ত জায়গাটা হল তামাবিল এবং সিলেটের মধ্যে। খবর পেলাম দরবস্তে এক কোম্পানী পাকিস্তানী সৈন্য আছে। যদি দরবস্ত শত্রুমুক্ত করা না যায় তাহলে সিলেটে আমাদের পাওয়া যাবে না এবং তামাবিল ও গোয়াইনঘাট হতে আমদের যে সৈন্য আসছে ওরাও সিলেট যেতে পারবে না। তাই যেভাবে হোক দরবস্ত শত্রুমুক্ত করতে হবে। আমার এই অভিযান শুরু করার কিছুক্ষণ আগে সর্বাধিনায়কের কাছ থেকে খবর পেলাম জেড-ফোর্সকে আমার এক কোম্পানী দিতে হবে, কারণ ওর সৈন্যসংখ্যা কম। লেফটেন্যান্ট জহীরকে জেড-ফোর্সের ১ম বেঙ্গল রেজিমেন্টকে সাহায্য করার জন্য দিলাম। যতটুকু আমি জানি মেজর জিয়া ১ম বেঙ্গল রেজিমেন্ট নিয়ে এবং সেক্টর ট্রুপসের একটা কোম্পানী নিয়ে শালুটিকর বিমান ঘাঁটির দিকে যাবেন। ওদিকে ভারতের একটা ব্যাটালিয়ন সিলেটের দক্ষিণ দিকে হেলিকপ্টারে ছত্রীসেনা নামিয়ে দেবে। ভারতের ছত্রীসৈন্যের সংগে মিলিত হয়ে মেজর জিয়া তার সৈন্য নিয়ে সিলেট আক্রমণ করবে। আমার সৈন্য দরবস্ত জয় করে খাদিমনগর হয়ে সিলেটের উপর আক্রমণ করবে। ভারতের আর একটি গুর্খা ব্যাটালিয়ন মুক্তাপুরের ৫নং সেক্টরে একটা কোম্পানী নিয়ে খাদিমনগর হয়ে সিলেটের উপর আক্রমন করবে। মেজর শওকত (বর্তমানে ব্রিগেডিয়ার)-এর সৈন্যদল ও ৩য় বেঙ্গল রেজিমেন্ট গোয়াইনঘাট-ছাতক হয়ে সিলেটের পেছন দিক থেকে আক্রমণ করবে। আর একটা বাহিনী ভারতের সাহায্যে মেজর এনামের দায়িত্বে মৌলভীবাজার হয়ে সিলেট আক্রমণ করবে। আর একটা বাহিনী ভারতের সাহায্যে লেফটেন্যান্ট ওয়াকিউজ্জামান এবং ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট কাদেরর সেক্টর ট্রুপস নিয়ে ফেঞ্চুগঞ্জ হয়ে সিলেট আক্রমণ করবে। এই ছিল সিলেট যুদ্ধের পরিকল্পনা, যতটুকু আমি জানতে পেরেছিলাম।

শুরু হল দরবস্তের পথে যাত্রা। প্রায় ১৫ মাইল হাঁটতে হয়েছিল। এফ-এফ রবকে দিয়ে একটা কোম্পানী তৈরী করলাম এবং অগ্রবাহিনী হিসেবে কাজ করার নির্দেশ দিলাম। এফ এফ শুকুরের কোম্পানী রইল তার পিছনে। আমার পেছনে রইল মেজর রব ও সুবেদার ফজলুল হকের কোম্পানী। পেছনে ধরা পড়া রাজাকাররা আনল গোলাবারুদ ও খাদ্য সরঞ্জাম।

৬ই ডিসেম্বর বিকেল প্রায় পাঁচটা। সবাইকে এক জায়গায় জড় করলাম। বললাম, যেভাবে হোক দরবস্ত দখলে আনতে হবে। দরবস্তে পাকিস্তানীদের একটা কোম্পানী আছে। দরবস্ত দখল না করলে সিলেট জয় করা

খুবই মশকিল হবে। কারণ ভারত থেকে ইতিমধ্যে গুর্খা ব্যাটালিয়ন এবং এফ-এফ-দের একটা কোম্পানী নিয়ে তামাবিল দখল করে দরবস্তে আমাদের সংগে মিলে সিলেটে একসঙ্গে যাব। যদি দরবস্ত দখল করতে না পারি তাহলে তাদের পক্ষে সিলেট থাকা মুশকিল হবে। তাই আজ রাতের মধ্যেই দরবস্ত দখল করতে হবে। শুরু হল আমাদের অভিযান। গ্রামের নামটা মনে নেই, প্রায় দেড় মাইল দূরে এসেছি। বাঁয়ে সদ্য ফেলা মাটির একটা উঁচু টিলা। মনটা ভাল লাগল না। পাশেই বেশ কয়েকটা বাড়ি ছিল। একজন বুড়ো ভদ্রলোককে ডাকলাম। সে আমাকে দেখে কেঁদে উঠল। কিছুদিন আগের একটা ঘটনা। ৭/৮টা পাকিস্তানী এসেছিল ওদের গ্রামে, সঙ্গে ছিল বাঙ্গালী রাজাকার। সমস্ত গ্রামটা তছনছ করে দিয়েছিল। ওদেরকে খাবার দিতে হবে। যা অল্পবিস্তর খাবার ছিল দেয়া হয়। হালের গরুটাকেও ওরা ছাড়েনি। ওদেরই বাড়িতে রান্নাবান্না হল। খাওয়া শেষ হল। রাত ঘনিয়ে আসতে লাগল। চারিদিক অন্ধকার। ঘরের ভেতরে মেয়েছেলেরা ভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত। হঠাৎ ২/৩টা সৈন্য ভেতরে ঢুকতে চেষ্টা করল। ওরা সবাই নিষেধ করল। শুরু হল অমানুষিক মারধর। এমনিভাবে চার-পাঁচটা বাড়িতে হামলা করলো। মেয়েদের উপর অকথ্য নির্যাতন করলো। চারপাশের বেশ কয়েকজন জোয়ান ছেলেকে উঁচু জায়গায় নিয়ে গেল। ওদেরকে দিয়ে মাটি কাটানো হল। তারপর শোনা গেল বেশ কয়েকটা গুলির আওয়াজ এবং সাথে সাথে আর্তনাদ। সবশেষে ডাকা হল বাকি যারা ছিল ওদেরকে-মাটি দিয়ে গর্ত ভরতে। যারা বুড়ো ছিল চোখের পানিতে নিজের ছেলের কবর দিতে লাগল। এই হল রাস্তার পাশে ছোটটিলার ইতিহাস। চোখ ভরে পানি এল। প্রতিহিংসার তীব্র জ্বালা মনে এল। প্রতিশোধ নিতেই হবে।

দরবস্ত এখনো অনেক দূরে। দূরে গোলাগুলির আওয়াজ শুনতে পেলাম। বুঝতে পারলাম না এই গোলাগুলির আওয়াজ কিসের। আন্দাজ করলাম ভারতীয় সৈন্যদের সাথে পাকিস্তানীদের কাছাকাছি কোথাও যুদ্ধ চলছে। দেরী করলে চলবে না, আজকে রাতের মধ্যেই আমাকে দরবস্ত দখল করতে হবে। রাত প্রায় বারটা হবে। এফ-এফ রবের কাছ থেকে খরব পেলাম ওদের উপর গোলাগুলি আসছে। রবের সৈন্যদের দরবস্তকে চারদিক দিয়ে ঘিরে ফেলতে এবং এফ-এফ শুকুরকে দরবস্তের বাঁ দিকে ঘিরে ফেলতে নির্দেশ দেয়া হল। মেজর রবের কোম্পানী রাস্তার ঠিক বাঁয়ে এবং সুবেদার ফজলুল হকের কোম্পানী রাস্তার ডানদিক দিয়ে সোজা দরবস্তের উপর আক্রমণ করবে। দরবস্ত তখন প্রায় তিন মাইল দূরে। বেশ কিছুক্ষণ গোলাগুলির আওয়াজ শোনা গেল। রব এবং শুকুরের সঙ্গে আমার বেতার যোগাযোগ ছিল না। মেজর রব এবং ফজলুল হকের কাছ থেকে খবর পেলাম যে রব এবং শুকুরের সাথে তাদের কোন যোগযোগ নেই, তবে তারা দরবস্তের কাছে পৌঁছে গেছে।

৭ই ডিসেম্বর সকাল চারটা। মেজর রব এবং ফজলুল হক খবর দিল যে দরবস্ত দখল হয়ে গেছে। মেজর রব এবং সুবেদার ফজলুল হকের সৈন্যদের বিশ্রাম নিতে বললাম। যখন একটু বেলা হয়ে যাবে তখন যেন ওরা এক-একটা করে প্লাটুন পাঠিয়ে দেয় রব এবং শুকুরের সৈন্যদের খুঁজে বের করতে। সকাল প্রায় ৭টা। দেখছি, দু'ধার থেকে এফ-এফ রব এবং এফ-এফ শুকুরের সৈন্যরা এসে আমদের সাথে একত্রিত হচ্ছে। এফ-এফ রবের কাছ থেকে জানলাম ওরা যখন পাকিস্তানীদের পেছনে ধাওয়া করছিল তখন ওরা দিক হারিয়ে অনেক ডানে চলে গিয়েছিল, এবং পরে একটা গ্রামে আশ্রয় নিয়েছিল তবে কোন পাকিস্তানীকে পায়নি। এফ-এফ শুকুরের খবরে জানলাম পাকিস্তানীরা রাতের অন্ধকারে হরিপুরের দিকে দৌড়ে পালাচ্ছিল। ওদেরকে পিছু ধাওয়া করতেই ওরা অন্য পথে চলে গিয়েছিল। তারাও একটা গ্রামে আস্তানা গেড়েছিল। ওখানেও গ্রামের বাড়িতে একটা পাকিস্তানী সৈন্য লুকিয়েছিল, তাকেও শেষ করা হয়েছে। ইতিমধ্যে ভারতের গুর্খা সৈন্যরা ৫নং সেক্টরের একটি কোম্পানী নিয়ে দরবস্ত পৌঁছেছে।

৮ই ডিসেম্বর, বেলা প্রায় দশটা হবে। একদিনের জন্য দরবস্তে আমার আস্তানা গেড়েছি। ব্রিগেডিয়ার ওয়াদকে এবং ব্রিগেডিয়ার বার্নে এসে দরবস্তে পৌঁছলেন। ঠিক হল গুর্খা রেজিমেন্ট রাস্তার ডান পাশ হয়ে দরবস্ত-সিলেট যাবে এবং আমার সৈন্যরা রাস্তার বাঁদিক দিয়ে খাদেমনগর হয়ে সিলেট যাবে।

১০ই ডিসেম্বর পৌঁছলাম লামা নামক একটা গ্রামে। ব্রিগেডিয়ার ওয়াদকের সঙ্গে দেখা হল। উনি বললেন, হিমু চা বাগানের কাছে পাকিস্তানীরা শক্ত ব্যূহ রচনা করছে। একটা পুল আছে হিমুর কাছে। তার নিচে দিয়ে

একটি নদী চলে গেছে। এবং হিমুর আগে বেশকিছু উচু জায়গা আছে। আমাদের পক্ষে এগোনো অসম্ভব হয়ে পড়েছে। তাছাড়া হিমু যাবার পুলটা পাকিস্তানীরা উড়িয়ে দিয়েছে। আমাকে বলা হল হিমুর পেছন দিক থেকে শক্রসৈন্যকে আক্রমণ করতে এবং যেভাবে হোক হিমু শত্রমুক্ত করে হরিপুরের উপর আক্রমণ চালাতে।

খাওয়া-দাওয়া করে গ্রাম থেকে দ'জন গাইড নিয়ে চললাম হিমুর উদ্দেশ্যে। সারারাত নদী-খাল-বিল পার হয়ে পৌঁছলাম আটগ্রাম বলে একটি গ্রামে। সেখান থেকে হিমুর দূরত্ব প্রায় দু'মাইল। আটগ্রাম পৌঁছলাম ভোর চারটায়। গ্রামের পাশে নদী পার হতে হবে অনেক কষ্টে। দুটো নৌকা যোগাড় করা গেল। ওপারে সবাই পৌঁছলাম। ওপারে প্রায় ৭০০/৮০০ গজ দূরে খোলা মাঠ, তার উপরে অনেকগুলো উঁচু টিলা, যা পুরো আটগ্রাম গ্রামকে ঘিরে রেখেছে। সকাল হতে চলেছে। দেখলাম হিমু পর্যন্ত পুরো খোলা মাঠ। চিন্তা করলাম দিনের বেলা এই খোলা মাঠের ভেতর দিয়ে যাওয়া সমীচীন হবে না। তাই সবাইকে বললাম আজকের দিনটা আটগ্রামে কাটিয়ে দিই। সন্ধ্যার সময় হিমুর পথে যাত্রা করা যাবে। ভারতীয় গুর্খা সৈন্যদের সংগে বেতার যোগাযোগ করতে পারলাম না। যাই হোক আবার সবাই মিলে নদী পার হয়ে আটগ্রামে ফিরে আসলাম। আমার সৈন্যদের কে কোথায় জায়গা নেবে পুরো হুকুম দেবার সময় পেলাম না। বেলা প্রায় আটটা হবে। পাকিস্তানীদের দিক থেকে শুরু হল আমাদে উপর ৩ ইঞ্চি মর্টারের গোলাবর্ষণ। সঙ্গে আরম্ভ হল আমাদের উপর মেশিনগান এবং এল-এম-জি'র গোলাবর্ষণ। সৈন্যরা নিজের নিজের জায়গায় অবস্থান নিল। কিছুই করার নেই একবারে শত্রুর মুখে পড়ে গেছে। কিন্তু বুঝলাম একেবারে আচানক শত্রুর গোলাগুলিতে আমার সৈন্যরা একেবারে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছে।

আটগ্রাম ছোট গ্রাম। বৃষ্টির মত গোলাগুলি হচ্ছিল। আমাদের এমন কিছুই করবার নেই। চিন্তা করলাম যদি আটগ্রাম থাকি তাহলে আমরা সবাই মারা যাব। কারণ পাকিস্তানীরা আমাদের জায়গা জেনে ফেলেছে। তাই সবাইকে বললাম যে বেভাবে পারে পেছনে দু'তিন মাইল দূরে অন্য আর এক গ্রামে চলে যেতে। যাবার সময় আহতদের নিয়ে যাবার জন্য বলা হল। ডাক্তার নজরুলকে বললাম যারা শহীদ হয়েছে তাদের কবরের ব্যবস্থা করার জন্য। আমরা সবাই চললাম গ্রামের দিকে। সৃষ্টিকর্তার অশেষ দয়া ছিল। যখন আমরা আটগ্রাম ছেড়ে পেছনের গ্রামে যাচ্ছিলাম তখন আমাদের কেউ শহীদ বা আহত হয়নি। যদিও আমাদের উপর গোলাগুলি হচ্ছিল। একটি গুলিও আমাদের উপর লাগেনি। যখন সবাই এসে পৌঁছলাম তখন দেখলাম আমার ১১ জন ছেলে শহীদ হয়েছে এবং পাঁচজন গুরুতরভাবে আহত হয়েছে। সবার সাথে আলাপ করে বুঝলাম সবাই ঘাবড়ে গেছে। ভাবলাম একটা দিন পুরো বিশ্রাম নেয়া উচিত। গ্রামের লোকেরা আমাদের যথেষ্ট খাতির করেছে।

১২ই ডিসেম্বরে বিকেল বেলা হিমু থেকে খবর পেলাম পাকিস্তানীরা চলে গেছে চিকনাগুল চা বাগানের দিকে। সোজা চিকনাগুল চা বাগানের দিকে যাবার পরিকল্পনা নেয়া হল। চারধার থেকে গোলাগুলির আওয়াজ আসতে লাগল। বিনা বাধায় চিকনাগুলে পোঁছলাম। ভারতের গুর্খা ব্যাটালিয়নের সঙ্গে তখন পর্যন্ত আমাদের যোগাযোগ সম্ভব হয়ে ওঠেনি। পরের দিন রাস্তায় দেখা হল গুর্খা ব্যাটালিয়নের সি-ও'র এর সঙ্গে, ঠিক হল রাস্তার ডানদিক দিয়ে খাদেমনগরের উপর আক্রমণ চালাবে গুর্খা ব্যাটালিয়ন। বাঁয়ে আক্রমণ করবে আমাদের সৈন্যরা। খাদেমনগর পাকিস্তানীদের বিরাট এবং শেষ ঘাঁটি।

১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৭১ সন। চারধারে পাকিস্তানীরা মজবুত ব্যূহ রচনা করেছে। যতবড় ব্যূহই রচনা করুক বাংলাদেশের দামাল ছেলেরা শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। সিলেট আর বেশী দূর নয়। তারা এগিয়ে যাবেই। পেছনে যাবার কোন প্রশ্নই ওঠে না। ভারতের গুর্খা ব্যাটালিয়ন রাস্তার ডানে এবং আমাদের সৈন্যরা রাস্তার বাঁয়ে এগিয়ে চলেছে খাদেমনগর দখলের চেষ্টা। কিছুদূর এগিয়েছি। সামনে ইদগা এবং উঁচু টিলা থেকে মর্টার ও মেশিনগানের গোলাগুলি আসতে লাগল। কিছুক্ষণ বিরতির পর আবার শুরু হয় গোলাগুলির আওয়াজ। বেলা বাড়তে লাগল। রাস্তার ডানে এবং বাঁয়ে গোলাগুলি শুরু হয়ে গেল। ইতিমধ্যে আমার এক কোম্পানী ঈদগার প্রায় কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। একেবারে খোলা জায়গা। তবে দু-একটা টিলা ছিল। বেলা প্রায় পাঁচটা।

হাবিলদার গোলাম রসুল ছেলেটি ছিল বেশ নির্ভীক। ঈদগার উপর একা আক্রমণ করতে গিয়ে শহীদ হল। বৃষ্টির মত গোলাগুলি চলছিল। তবু সে এগিয়ে গিয়েছিল। রাত হয় হয়। ঈদগা আমাদের দখলে আসল। ই পি আর-এর এই নির্ভীক ছেলেটি ঈদগার দখল দেখে যেতে পারল না। তারই বীরত্বে ঈদগা দখল সম্ভব হয়েছিল। তাকে বীরশ্রেষ্ঠ উপাধি দেয়ার জন্য আমাদের সর্বাধিনায়কের কাছে নাম পাঠিয়েছি। সেদিন রাতে চিকনাগুলের কাছে তাকে কবর দেয়া হয়। এই যুদ্ধে একজন শহীদ ও তিনজন গুরুতররূপে আহত হয়েছিল।

পরদিন খাদেমনগরের কাছে এসে পৌঁছলাম এবং খাদেমনগর আক্রমণ করার পরিকল্পনা নিলাম। আমাদের উপর ভীষণভাবে গোলাগুলি আসছিল। আমাদের পক্ষ থেকেও ভীষণ গোলাগুলি খাদেমনগরের উপর পড়ছিল। গ্রামের লোকেরা খুব সাহায্য করেছে। ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭১ সন। সবাইর মনে আনন্দ। যারা আনন্দের দিনে আমাদের সঙ্গে নেই, যাদের রক্তের বিনিময়ে আজ আমরা স্বাধীনতা পেলাম-পরমেশ্বরের কাছে হাতজোড় করে জানালাম অজস্র প্রণাম। তাদের আত্মার সদগতি হোক। জয় বাংলা।

সিলেটের স্বাধীনতা এসেছিল ১৭ই ডিসেম্বর।

স্বাক্ষরঃ চিত্তরঞ্জন দত্ত,
ব্রিগেডিয়ার
২৪-৩-৭৪

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৮। ৪নং সেক্টরের যুদ্ধ সম্পর্কে অন্যান্যের প্রদত্ত বিবরণ	সাক্ষাৎকারঃ লেঃ কর্নেল মোহাম্মদ আবদুর রব*১৭-১২-৭৯	মে-ডিসেম্বর ১৯৭১

Things were quite different in 4 Sector Bangladesh Force (BDF). I will, however, endeavour to pen dawn in brief a real picture of the 4 Sector Bangladesh Force. Specially all the strategic battles we fought during the war of liberation. These are all my recollections and from the war diary I maintained during war.

Major Chitta Ranjan Datta (now Colonel) was the Commander of 4 Sector from the beginning to the end. So far I remember Sectors were formed sometimes in the month of May '71. The whole Bangladesh was divided into a number of Sectors for operational purposes. Sectors were again further divided into Sub-Sectors and so on. Beside the Sectors there were so many organized Bahinies like Hemayet Bahini, Kaderia Bahini etc. Although these were not very organized but aim remained the same-to eliminate oppressors from the soil of Bangladesh.

Subject matter of my writing will however remain confined to 4 Sector Bangladesh Force which was covering a big area of approximate 100 miles border of Sylhet District (East and South East). From the border of Habigunj Subdivision in the South it was extended upto Kanaighat Police Station in the north. That border belt of Sylhet was mostly hilly ground which includes Patteria hills, Shatgaon hills etc. About 100 tea gardens were there within our area of operations. From military point of view that was an wonderful area for guerrilla warfare.

Before I enter into writing of all major battles we fought in that Sector, I think it is necessary to touch upon the very early period of war in fact March and April were probably the months of chaos and confusions everywhere. Though people resisted with whatever they had it was purely in disorganized way. Our Bengal Regiments who revolted in a more or less compact shape were slightly better off than those who revolted without parent units of their own.

The whole Mukti Bahini was divided mainly into two groups, viz Niomito Bahini and Gono Bahini. Niomito Bahini comprised or regular armed forces personnels, Ex EPR, Police, Ansars and Mujahids. Besides the regulars of Army and EPR, others had very little knowledge of basic infantry weapons and their uses. They had to be given quick training in basic requirement of guerrilla as well as conventional war. The nonregulars, or course, picked up very quickly and later on produced very good result. Specially EPR persons fought very well. Their single contribution toward this Liberation war counted much. Upto the last day they never betrayed.

So far as the Gono Bahini is concerned they were the Most dedicated and the symbol of courage and the heroism. This force mostly composed of students, peasants and the

* ১৯৭১-এর মার্চে ক্যাপ্টেন পদে কর্মরত ছিলেন।

youths. 100% of them undergone training in guerrilla warfare through various training establishments of India. It was indeed a war of whole Nation. So we found people in Gono Bahini from all walks of life.

4 Sector was mostly composed of Sector troops. It has mostly Ex-EPR personnels, and regular Army personnels from all arms and services, Ansars, Mujahid and a very few number of Police personnel. The Sector had 6 Sub-Sectors. To start with Major Chitta Ranjan Datta (now Colonel) and myself (the Capt. A. Rab) were only two Officers in the Sector. Later on in the month of June, Capt. Haque (now Major), FLt/Lt Qader and Capt. Anam (now Major) joined us.

Pak army started butchering in Sylhet since 26 March ’71. There was only one battalion of Punjab Regiment (31 Punjab in Sylhet. The battalion was scattered in whole of district during the time of crack down but immediately after it they closed up to Sylhet town itself. In the first week of April we surrounded the Sylhet town from east, south and west. One company of Bengal Regiment under the command of Capt Aziz was there covering the Surma bridge in the south. About a company strength of EPR entered the town from the east. First week of April was a most critical time far Pak troops in Sylhet. If we had strength at that time then Sylhet town could have been captured very easily on 5th or 6th April '71. Enemy re-enforcement started pouring in by C-130 plane from 6th April onward.

By 8th April enemy brought about one battalion troops form Dacca and started advancing towards the outside of the town. EPR who were in the town could not stand on their way. Bengal Regiment Company resisted there on the Surma bridge for sometime and fought very bravely. During the last week of April we gave a very hard fight in Sherpur on Sylhet, -Moulvi Bazar Road. In the east one Border Security Force battalion along with our Mukti Bahini took a very strong defensive position in area Golapgonj on Sylhet Sutarkandi Road. This defence we lost to the enemy in the second half of April '71.

The flow of refugee started pouring in across the border with the increase of inhuman torture inside. The brutal Pak Forces played havoc in those areas from where Mukti Bahini gave them resistance. The reign of terror was prevailing everywhere in Sylhet. Everyday thousands of people began to cross over India from all possible vantage points. Host country India was out with all their resources to face that great influx of Refugees everyday. Over-night they constructed camps and established Refugee Reception centres. By the end of July '71 they accommodated only in Kachar District more than two lakh refugees with newly constructed huts. But still the miseries of refugees everywhere knew no bounds.

Soon after the resistance battles inside troops got so scattered that it took quite sometime to collect them. After the fall of Golapganj defence our troops fell back and finally took defence in Baragram BOP and Sutarkandi Check Post. Our strength was at that time hardly a company, consisting of Army persons, EPR and others. Luckily every body had a rifle with them plus few Light Machine Guns, 2" Mortars and one Medium Machine Gun Chinese.

This was the overall situation in the Sector till end of April '71. Hundreds of trained and untrained people wanted to join us but as we had no means to provide them arms and other facilities, we sent them to training camps. Hundreds of young people came across the border to join Mukti Bahini but the management of our leaders was so poor that most of them returned back to their homes frustrated. At that critical time our political leaders on the Sector were rather busy more in their own affairs except of course very few who really trained and succeeded in establishing some Youth Training Camps for the training of the new intakes. I may mention here the name of Mr. Dewan Farid Gazi, MCA, a sincere worker who worked day and night till the last day.

BATTLE OF SUTARKANDI
(24 May, 1971)

As I said in the preceding paragraphs that after withdrawal from Golapganj defence we took up the alternative defence in area Baragram BOP. Our main aim was to check the advancing Pak Army to cross the river Kushiara from Sheola Ghat. At that time we had been keeping the whole area of Beani Bazar and Zakiganj thanas liberated.

In the first week of May '71 one company of 31 Punjab came upto Sheola Ghat on the other side of the river. By the second week they further increased their strength. I could easily foresee that they will soon try to cross the river and launch an attack on us. My total strength at that time was about a company. In the meantime we have been harassing them and foiled their all attempts to cross the river. For quite sometime I had been asking the Sector Commander Major Datta to get some arms and ammunitions from friends but he could not succeed.

On 20 May enemy managed to cross the river Kushiara from a detour. They took up defence along the river Kushiara. Enemy was now within our sight.

It was 23 May '71 a moonlit night. There was a pindrop silence all round. I became full confident that we may have to greet them by dawn. At about 11 o'clock at night two civilians came running to me and informed that they have seen large number of enemy advancing towards us.

To our bad luck on that very evening I had sent a platoon to Shabazpur (Latu) Railway Station to raid the enemy position. I however, instructed them to return to the base by the first light at any cost which they of course did. I knew it was difficult to resist the enemy with that little force of ours but I was confident at least we will be able to bag a large of enemy. Morale of our troops was very high.

It was fine morning of 24 May '71. At about 0600 hour's enemy reached within our rifle range. Enemy could not achieve any surprise because we had been expecting them. They launched a frontal attack with two companies strength supported by artillery fire. One company attacked Sutarkandi and another company attacked Baragram BOP via village Lapsal.

It was an expected move of enemy, so they found us ready early in the morning. It was a broad day light attack and that also through open ground. We had in fact a very big area to hold with that little force.

To my utter surprise the first enemy attack was repulsed. The rate of killing enemy on the open ground was fantastic. Within half an hour time our score was about 25 lying right on the open ground. Our single Medium Machine Gun helped a lot, no enemy could dare come forward alongside the main road.

Indian BOP on the other side of the border was guarded by only 15 men on that day. Two companies of Border Security Force was kept in reserve about 3 miles away for emergency. But unfortunately that emergency for them never came thought their own BOP was completely overrun by the Pak army about 1200 hours on that day. Couple of their sepoys died and a number of their weapons were taken away by the Pak troops.

Second thrust came at about 0730 hours from front as well as from the right. Up to 1000 hours enemy could not remove us a single inch from our position. We had been running short of ammunition very rapidly. There was no source of replenishment. On request Border Security Force gave us few hundred rounds but later on they expressed their inability to give us more. By 1130 hours we completely had gone out of ammunition. Finding no other alternative I ordered my troops to pull back. Two of my men got caught in the enemy hand. Enemy continued their advance and crossed the International Boundary. Enemy's left flank had almost reached the right flank of Indian BOP. Border Security Force did not fire a single round till they were almost at the pint of charge by the enemy. They thought that Pak army will never dare cross the border. By 1200 hours Pak army overran the Indian BOP.

Though we were uprooted from our defence, we have achieved our aim in that battle. Enemy suffered 39 deaths casually. We lost only two and had few more minor injuries. We captured two Punjabis alive. Besides all these the confidence we got in that battle helped as a lot in all future confrontations.

On 1 June ’71 Commander in Chief of Bangladesh Force Col (now Gen) M A G Osmani visited our area and assured us all possible help. Our strength kept on increasing day by day. On 10 June we established our Camp of Barapunji. The Sector Headquarter also shifted along. In the meantime India had started giving us arms and ammunition and rations. Our counterpart was India Echo Sector, responsible to look after us.

We organized training and it was going on in full swing. Newly trained Gono Bahini also started coming in. by mid June the strength of my Sub-Sector rose upto 6 hundred and all of them were provided with arms. Demolition of bridges and Railway lines were our routine task. In our entire area threw was not a single bridge left untouched. On the other hand Pak army atrocities in the border belt rose to its pick. Every night almost two third of us used to remain out on raid, ambush and harassing operations. Almost every day we used to come back with Punjabis or Razakars or collaborators alive to camp. I agree, sometime I was very ruthless with them. Now I wonder how all that was possible. I think it was probably the circumstances which changes a person.

Enemy brutality crossed all its limit. One day in July two of my guerrillas got caught in their hands. They slaughtered them in open ground like goats. I remember both of them were students of Intermediate Class. In another occasion they caught three of our

men. They hanged them all up side down till they died after crying and crying for long one week. One day they caught one of my men and took out both the eyes. The boy died right on the spot. After seeing all these brutalities I think a normal man could not but take revenge on that.

LATI TILA OPERATION
(19 June ’71)

In war discipline gets top priority. There can be no compromise with discipline. Problem was not much with the Niomito Bahini but it was a great task to make the young Gono Bahini boys disciplined.

On 18 June '71 I was out on certain jobs. On the way back at about 1400 hours I was-told that there is a flash message waiting for me in the Headquarter. On arrival I was told that a company of mine would move to Kukital BOP (India) for launching a dawn attack on Pak BOP Latitilla I was simply told that all other necessary information's would be available there. I would get artillery support for the task.

However, with a company I reached Kukital at night. On arrival I was briefed by the Lt Col Deveson, Commanding Officer of 7 Raj Rif that there was a platoon strength of Pak Army defending the Latitila BOP. We shall have to assault the BOP after neutralization by the artillery fire. He also told me that two companies of his own battalion would also follow us. If required, they would give us physical support. Truly speaking, I was not at all happy to learn this. I, therefore, told him that I did not believe in follow up business. My point was either I should be given the task alone or they should do their own. He replied that he could not change the plan of his own. Then I asked him to give me some time to reccee the area but that also he disagreed. In fact, none of my troops liked that sort of hasty operation.

It was about mid night I took leave of him and wanted to take some rest somewhere. I came near the foot of a hill where I found Capt Kumar (Indian) of HQ Echo Sector lying there. He asked me about the planning of the operation. I found he was also not satisfied with that planning. So we started smoking cigarettes one after another. Then suddenly rain started to fall. In that way the night ended. At 0400 hours I gave order to my company and started moving towards the objective.

The distance was not much from the border. So by 0545 hours we surrounded the BOP from all sides and cut their telephone link with the rear. The BOP was situated on a small hill top and very strongly defended. All bunkers were shell proof. They were so beautifully camouflaged that nothing could be seen even from a distance of 100 years. From outside it appeared as if nobody was staying in the BOP.

To find out the inside position I sent four Jowans with hand grenades to go as close to the bunkers as possible. The plan was like that after confirmation of the enemy strength and position we will pass on the message to the rear. On receipt of the message artillery guns will open fire and neutralize the enemy position and then only we will charge the BOP.

All fur of my Sepoys came back and reported that there was none present in the BOP. But to be more sure this time I sent one Havildar and two more Sepoys to go right near the bunker and throw grenades inside and come back. Accordingly, they went near the bunkers and one sepoy hardly could throw a grenade enemy woke up and opened fire with all sorts of arms. All the three of my soldiers got bullet injuries but they managed to come back alive. However, within 20 minutes time approx 500 shells hit the BOP. As soon as the artillery fire stopped we charged the BOP. We made such a big sound of ‘Joy Bangla’ that enemy completely got confused and before we could reach them they started fleeing towards the nearby jungles. In their running position most of them got killed. Surprisingly enough we found a women also running out of the camp half-clothed. The poor girl could not escape from the rifle bullet. We smashed the BOP completely and secured lot of arms and ammunitions. We caught one sepoy and one Havildar of 22 Baluch alive. Our casualty was only four wounded. Indeed Pak army never went that side again during the whole liberation war.

Month of June, July and August were the pick season for us. We had our maximum score during these period. In that period a good number of Freedom Fighters were sent inside with small missions. Cooperation we received from inside Sylhet was not very encouraging, to speak the truth. Many of my inductees were caught with arms. Inductees could not do well due to the sheer lack of co-operations. Some corrupt ulemas were active inside. There were people who helped us and at least tried to help us. During the last part of war when we were deep inside, we got tremendous help from locals. They came out with their everything.

Strength of my Sub-Sector at that period exceeded thousand of Niomito Bahini excluding few hundred guerrillas who were working deep inside. The period of hit and fun operations were over at that time. It was the second phase to attack the enemy and inflict maximum casualty on them.

SHABAZPUR (LATU) RAILWAY STATION BATTLE
(10 August 1971)

For quite sometime I was thinking seriously to launch a full-fledged attack on Shahbazpur Railway Station. In the first week of August, I put up the master plan to Sector Commander Lt. Col. Chitta Ranjan Datta for approval. Brigadier Wodkey, Commander Echo Sector agreed to give me all possible help. He also promised me to give necessary artillery support.

The terrain of Shahbazpur Railway Station was hilly. The area was well defended by a company of 31 Punjab plus a platoon of scouts and armed Razakers. There was no convenient approach to the enemy defence. Achieving surprise was out of question. Still, we remained determined to launch an offensive. I, however, fixed 10 August ’71 the ‘D’ day (the day of attack). I had about 5 companies to put on the attack. After thorough reccee I found no alternative but to launch a frontal attack but in an unconventional way. I did like this plan. The company which was given the task of cutting enemy withdrawal

and re-inforcement from Beani Bazar will send a platoon from the enemy rear and open fire first. They will stop fire just after ten minutes. Then they will withdraw and simultaneously one Battery Medium guns will open up to neutralize the enemy position. Shelling will continue for 5 minutes, then 3 companies will assault the enemy from front. Another one company will cut Shahbazpur-Baralekha road and stop enemy reinforcement. Initially indeed, everything went according to plan.

A 0500 hours all of my companies reached their respective location. We had no means of inter communication in between the companies. Since I was with the assault companies, I had no contact with the other companies. The task of those other two companies was so vital that if they fail to stop the enemy re-inforcement there will be all but complete failure.

Enemy position was so dug-in that shelling with the Medium guns just proved futile. Anyway, we launched the attack with full force. In 15 minutes time enemy stated withdrawing. We almost cleared a bigger portion of the Railway Station Shahbazpur at 0700 hours. We charged the BOP where we faced maximum resistance. Pakistani flag was still hoisted there. We removed it and replaced with our Bangladesh flag.

In this very critical time troops were completely scattered. With all my efforts I was trying to reorganize them but in vain. At that time one man came running to me and told that enemy had penetrated through our left flank. The company which was supposed to stop the enemy reinforcement from Baralekha had failed. In the meantime enemy started shelling heavily our location. I passed back the information to Lt. Col Datta who ordered me to take action whatever situation permits. I found just impossible to resist the fresh enemy counter attack. So we retreated finally.

In that great battle of Shahbazpur we achieved our mission. We captured the enemy BOP, we almost captured the whole Railway Station. We found 8 enemy dead bodies. Huge number of arms and ammunition was captured, but we could not carryall due to lack of transport. Enemy carried away a large number of their casualties. It was also confirmed later that total enemy casualty was 50. Our own casualty was 5 wounded and 6 shaheed. I lost some of my very good soldiers. Ex EPR Havildar Kutub who was one of the best eleven of EPR football team and Naik Mannan who was a best athlete of Ex EPR lost their lives in that battle. Mujahid Havildar Mohd Faiz of Fenchuganj, who became famous for inventing a medicine of cuts etc. also died in that operation.

Including four tea gardens we had a total of 20 sq miles area liberated and under our possession. Enemy tried their best from various points to dislodge us but all in vain. Maximum number of our guerillas went inside during that period and did well in some places inside Sylhet. But as I said before guerillas could do much better sabotage activities if they could get local support.

I was really proud to have some real brave Gono Bahini leaders under my command. All of them just did wonder. It will not be out of the way to mention the name of some like A Matin Chowdhury, Samim, Babul, Muktadir and so many others whose name I do not remember.

On 14 Sep '71, approximate two enemy battalions launched an attack on our defended areas in Beani Bazar, Baralekah and Zakiganj Thana. Enemy lost a huge number of lives in that battle. We had total seven death casualties.

My wife joined me across the border on 13 Sept '71. It was an adventurous story. It was only possible for a brave girl like her who could bluff the enemy all the way to India.

It was probably 20 Oct '71 I received an order to close up my troops and move to Jalalpur Sub-Sector, a place opposite to Zakiganj Police Station on the right. Troops from Dharmanagar Sub-Sector, Amalshid Sub-Sector and Kukital Sub-Sector were also brought in there. All the troops were given under my command. There we spent about two weeks in giving them training in conventional attack and coordination in the battle field etc. In these days we got small range wireless sets for inter company communication. We had to give some practice on that also.

SEIZING OPERATION AT ATGRAM
(9 Nov, 1971)

Strength of Niomita Bahini and trained Gono Bahini stood at more than one thousand. We were all armed with semi-automatic rifles, light machine guns, few medium machine gun and few more heavy weapons. In a word, we prepared ourselves 100% fit for giving a hard punch to the enemy which they would not be able to return.

In Atgram Seizing Operation all together I put 4 companies. Under overall command of Lt Col Datta, we planned the operation. Two companies were under the command of Capt Anam who of course at the eleventh hour was called back and was sent to Kamalpur. Later, Second Lt Zahir was given the command of those companies whose task was to cross the river Surma and by passing the enemy at Atgram will go to enemy rear. His companies were supposed to take up defence on both sides of the road near village Chargrame-Darpanagar and the aim of these companies was to stop mainly enemy reinforcement from Sylhet side and enemy withdrawal from Atgram. One company was given under the command of Lt Ghias whose task was to clear the Atgram-Zakiganj road first and then clearing way for the rest of the company and finally take up defensive position there.

Task of the last and fourth company was to make through the cross country and reach village Gotagram and take up defence there. It may be mentioned here that during the month of April and May enemy constructed a new short cut road from Atgram to Zakiganj. Main movement of enemy was on this road. In fact if this road were blocked then enemy at Zakiganj would be completely cut off. The task of this company was much difficult. So I decided to accompany that company.

Crossing of river Surma became a problem for us. No country boats were available. Somehow we managed only two boats and that took about 4 hours for the whole troops to cross.

As per plan main objective of that operation was to seize Atgram, a very strong point of enemy from all sides and compel them to surrender ultimately. It was entirely a

planning of the higher echelon. In my opinion, it was very much a over ambitious plan. From the very beginning I was not very much confident of its success, so I argued with the planners. Any way it was an order, so I had to do it and did it. We were clearly instructed not to attack the enemy, rather allow them to attack us and kill them from our defence.

Just after sun-set on 9 Nov, we started to move completely with a new spirit. First company which was supposed to clear the road near village Kamalpur encountered enemy at 2300 hours. It took them long 30 minutes to clear that obstacle. Rest of the companies crossed through them safely. It was a very hazardous route through the paddies and lakes. We reached Gotagram village at 0500 hours. In that village there was a Razakar's camp. One of my platoon surrounded the camp and found all of them sleeping tight. They were in total 12. We caught all of them except one who managed to escape somehow and informed the Pak Bahini at Atgram. In Atgram the enemy strength was on company plus about a company strength of Razakars and the Khaiber Scouts. We could hardly dig our trenches at 0630 hours on 10 Nov '71 when the first wave of enemy attack came on us. Our enemy thought us probably a induction party of small strength. They could not think that such a large number of force can penetrate so deep in such a condition. They started advancing towards us very confidently. They were shouting and saying, "MUJIB KA BACHAY HATIAR CHHOR DAO, AGAR NATO KUE ZINDA WAPES ZAHI ZAOGAYE." They were advancing from both sides of the road. They were about a platoon strength. When they came within hundred yard, I ordered to open four light machine guns, two from each side of the road. They got a shock of their lives. Within two minutes 18 of them fell on the ground and the rest of them took shelter of a nullah and fled away. In the mean time, one three-ton truck which was coming from Zakiganj was blown off by the anti tank mine. Small attack came on other companies also but they repulsed successfully. Until evening enemy remained silent in all fronts. In the meantime they brought reinforcement from Sylhet plus a battery of 105 mm Howitzer.

Still I remember that evening of 10 Nov '71. It was about 1700 hours I could see from the Atgram side that a huge crowd of public approaching towards us. As they came closer, the whole crowd started shouting and more funny part was that we saw everybody was holding a spear sort of thing in their hands. They were in fact covering the advance of the Punjabies. As soon they came within our killing zone I ordered to open fire. Still I do not know the exact number but I am sure about 50 people died there on the spot. However civilians vanished in no times and real show started immediately.

Enemy attacked us from three sides with full artillery support. Enemy charged twice but could not remove us a single inch. Enemy pressure continued to grow stronger and stronger with the nightfall. By 2000 hours I found that we were running short of ammunitions. Replenishment at that place from the rear was out of question. I could foresee that it will be very difficult position when our ammunitions will be totally exhausted. I contacted Lt Col Datta on wireless and asked his advice. Since replenishment was not possible he ordered me to retreat to a safer place.

After two days of fighting we killed 39 Pak Army troops and secured arms and ammunitions from them. We captured 11 Razakars. We lost two with 5 other wounded.

20 Nov '71 was the Eid day. Since my wife had been Having alone at Karimganj, I had to go on that day for a while. As per planning of the joint command 20/21 night was selected as 'D' day for the last and the final decisive blow on the enemy. From that night in fact the actual war with the active support of the allied forces started. Since it was Eid day occupational army all over Banglade3sh was just in a relax mood. On asking from a POW later on it revealed that they least expected such a blow on that day.

The planning of the 'D' day in that area of Sylhet was like this. One battalion of the guards with tank and artillery support was given the task of attacking Zakiganj town. One battalion GR (Gurkha Regiment) and 1st East Bengal was given the task of clearing Atgram, a very strong point of enemy defence. On the other side of the river Surma and just opposite to Atgram enemy defence, there were two enemy posts on Salam Tilla and Raja Tilla. The task of attacking and clearing those two enemy positions was given to us. Commander of 'Z' Force Lt Col Zia (now Col) was with the 1st East Bengal. He also accompanied that battalion from Atgram to Sylhet.

By 1000 hours on 21 Nov '71, Zakiganj town was liberated. Atgram was no cleared until evening 22 Nov '71. I alongwith my troops of about a battalion strength reached the assembly area very late at night on 20/21 Nov '71. Since the area was not at all recceed by us earlier I decided not to launch the dawn attack on that day. I was given two objectives, so I divided my troops into two groups. I sent two companies under command of Lt Zahir to attack Raja Tilla and with companies under my command decided to attack Salam Tilla. We however surrounded the enemy by first light on 21 Nov '71.

After a hasty reccee of both the objectives we decided to attack simultaneously at 1500 hours on broad day light. We launched a heroic attack as per decision and charged the enemy frontally to their utter surprise. Enemy mined the area very heavily. As a result, during attack four of my soldiers lost their legs. After two hours of fierce battle enemy started retreating. Most of the enemy managed to retreat through thick jungles leaving all their arms and ammunitions behind. We captured Raja Tilla and Salam Tilla. We captured large number of arms and ammunitions including two POW.

On 23 Nov '71 I received a message from the Echo Sector HQ to report to Col Zia at some place in Atgram. At about 1200 hours I reached him and found him in a quite happy mood. He alongwith a Brigadier of allied force was sitting in a bunker. He welcomed me and offered a cigarette. He asked all about our welfare first and then gave me order to advance towards Kanaighat from the other side of the river Surma and block Kanaighat-Durbast road at any cost. With that order I came back to my area and ordered my troops to move to Luba Cherra tea garden about 10 miles away from the present position. We took up defensive posit iron in area Luba Cherra tea garden on 25/26 Nov '71.

Within this short period of 4/5 days our Mukti Bahini with the help of Indian troops liberated the whole Thana of Zakiganj and more half of Thana Kanaighat. Joys of the people in that area knew no bound. After a long captive period of mine months they felt a sigh of relief. Pak army was playing hell in that entire area. They spoiled the virginity of hundreds of girls in that area. In one of the bunker of Zakiganj town, a Pak soldier was found dead with a girl. From their bunkers we discovered lot of torn sarees and other

garments of women, Locals told us that they used to bring women by force to their bunkers and used to do inhuman torture on them. Militia troops (Scouts) were very much fond of shaking hands with the women folk.

Things were also very encouraging in all other theatres of war. Thought resisting with full energy enemy still failed miserably everywhere. Their morale went dawn to bottom. They felt totally unsecured Nature as it seemed went against them.

On 26 Nov '71 we started advancing towards our next objective. The task given to me was to cut the Kanaighat-Durbast road. Kanaighat was a very strong point of enemy. Initially it was probably the next objective of 1st East Bengal to capture it. On the night of 26/27 Nov '71 I reached a village named Barachatal which was on both the side of that pucca road. We took up defensive position in that village blocking the complete withdrawal and reinforcement of the enemy at Kanaighat. The task was indeed a very difficult one. Enemy in no way could tolerate it. They gave a quick response. They started shelling our position from two sides with 105 mm artillery guns. Shells were falling on us like rainfall.

On blocking that road what I presumed was that some attack will be launched definitely of Kanaighat from our side. Otherwise it was just meaningless to keep that road block for long. However, I kept the enemy movement completely stopped on that road till 30 Nov '71.

It was one of the largest combined successful battles of our troops in Sylhet. Fall of Kanaighat was just disastrous to the enemy. After that defeat enemy had to withdraw straightway to Chorkai on the left and Haripur on the right. That victory of ours in fact brought the fall of whole Sylhet within our sight.

On 1 Dec '71 at 1700 hours while we were still holding that road block, Lt Col Chitta Ranjan Datta came to me. After few chitchat he called me in one corner and told that we were supposed to attack Kanaighat just on the following dawn. I, of course, tried to convince him that it was absurd for us today for the following reasons: Firstly we were extremely tired. Secondly, we did not go to sleep for last three days. Third, we require replenishment of ammunitions etc. He did not however agree to my request because he said it was the order of the high Command. He also told me that some other big operations were just held up only because of Kanaighat.

With great difficulty we started advancing towards Kanaighat a about 2000 hours. The distance we had to cover was about 12 miles cross-country. We however managed to reach our assembly area at 0200 hours of 2 Dec ’71.

Kanaighat is a thana headquarter reasonably a flourished town on the bank of river Surma. Enemy strength was approx, a company plus a large number of armed Razakars. Enemy constructed all round defence of the town. Some of their bunkers were cemented. They have also mined the area very heavily. There was no approach whatsoever to their bunkers from any angle. We have no other alternative but to face them frontally. A complete battery of 120 mm mortars were in direct support of the enemy. On the other

hand we had only two 3" mortars. Troops were completely exhausted. The task ahead was very tough.

We moved out for the objective from the assembly area at 0300 hours. After clearing few enemy resistance on the way we took complete 1½ hours to reach within 500 yards from objective. It was almost dawn, by the time all my troops reached there. We found that we will have to pay very dearly if we attack such a strong enemy position in broad day light. I also saw the enemy defence from a close distance and found it absolutely difficult to attain success in that situation. I contacted Lt. Col. Datta on wireless in the rear and explained him the situation. Initially he insisted me to go for an assult but later on he realized the graveness of the situation and ordered me to pull back. I thanked to the Almighty, otherwise it would have been a complete massacre for us that day.

We took little bit of rest on that day. Continuous strain on own troops caused about 150 men unfit for battle by the evening of 2 Dec' 71. I was left with only solid three companies to launch the attack of Kanaighat.

Brigadier Watkey who was our overall Command in the Sector came to my area on that evening. We got all the latest information from him about other war fronts. We were just delighted to know about the success of Mukti Bahini every where. For last 10/15 days we did not even find any opportunity to switch on the transistor.

The name of my company commanders in that operations were (Sub) A Matin Chowdhury, Lt Zahir and Lt Ghias. All of them were brave and capable soldiers.

We were feeling slightly fresh in the evening and were completely determined to crush the enemy at Kanaighat. In the meantime I procured all possible information about enemy at Kanaighat. From the information it appeared that enemy was also very much expecting us by dawn 3 Dec' 71.

At 0400 hours on 3 Dec we reached (FUP) within three hundred yards from the enemy without giving us out to the enemy. We opened fire on the enemy just at 0530 hours. Enemy respond was very quick. They also opened up with complete battery of artillery guns. We kept on giving pressure on the enemy by encircling them from three sides. Within an hour time we met about 15 casualties. At 0700 hours enemy started retreating. At 0715 hours we charged the enemy at their bunkers. We started killing the brutal Panjabies with bayonets and grenades. Most of them left the arms and jumped in the river Surma and got killed. By the Grace of Almighty we completely liberated Kanaighat at 0830 hours and gave ok to higher commander at the rear.

Enemy met a colossal defeat at Kanaighat. Enemy left about dozen of dead bodies behind. Locals reported on the following day that they saw quite a number of dead bodies floating on the river. We also captured a huge number of arms and ammunitions left behind by the enemy.

People were once again full of joys after a long captive period of nine months. They gathered around us and started narrating their woeful stories of enemy torture.

Our loss was also quite heavy in Kanaighat but the bravery shown by our men was just unparallel. It was indeed a great single victory for us. We had 6 shaheeds and had 20 wounded. With the fall of Kanaighat enemy found themselves completely nowhere.

I hoisted the flat of Bangladesh in from of Kanaighat Duk-Banglow amongst the thunderous cheers of our men and thousands of public at 0900 hours on 3 Dec 71.

On 6 December 71 we received order to advance towards Sylhet. 1st East Bengal along with Colonel Zia, Commander 'Z' Force mad a cross country to Sylhet via Kanaighat. I also sent a company of ours under command of Lieutenant Zahir with the 1st East Bengal. On 7 Dec 71, Darbost, another stronghold of enemy on Sylhet-Shillong road fell to our own and allied troops. The enemy concentrated in Haripur around PPL (the then Pak Pet Ltd). One GR battalion with own troops made repeated attack but made very little success in Haripur.

On 10 December we made a detour from the enemy left flank and tried to reach Haripur from the rear. It was indeed a long detour and we had to carry two big country boat for a distance of about 15 miles on shoulder to cross the river. On 11 December in morning at 0500 hours we crossed the river but all on a sudden enemy encircled us. We suffered quite a heavy number of casually on that day. Five of my soldiers were just torn into pieces due to an enemy artillery shell which fell right on them. We, however, could not do anything on that day. On 12 December night we again crossed the river and attacked the enemy at Haripur from rear. Haripur fell to us actually on 13 December evening. On that road enemy gave another small resistance at Chiknagul TE. In that fight on 14 December we lost three of our very valiant fighters. Another four got severe injuries. Finally enemy withdrew to Khadem Nagar. On 15 December we along with allied forces encircled Khadem Nagar, an outskirt of Sylhet town which was their last defence on 15 December 71.

16 Dec, 71 heralded a new era in our history. The news of enemy surrender to allied forces was not at all surprising to me. We knew it was imminent. They had to do it to-day or tomorrow. Bangladesh got independence. People were shouting and shouting with enormous joy everywhere but I could not share them at all. I started recollecting those past nine months moment by moment. I then started weeping remembering those innocent faces whom I could not bring them along. Io felt as if all those immortal souls have gathered around me. We started the journey together but at the place of destination I was almost alone. Almost all of them who started the journey from the beginning are missing today I thought myself the only wretched fellow who could not accompany them. But what could I do? It is just a mere accident that I am alive till today. Death did come very near to me a number of times but went away every time saying only hallo. We are free now. Let us at least forget them not and pray for their immortal souls to be in peace in eternity.

যুদ্ধের ডায়েরীঃ লেঃ কঃ মোঃ আবদুর রব

24 May 71	Latu	Our tps raided en posn at Latu at about 0400 hrs which resulted en cas of 7 killed and 3 injured reportedly
01 Jun 71	Fakir Bazar	C-in-C visited camp at Fakir Bazar and met all ranks.
06 Jun 71	Fakir Bazar	Raided Zakigonj area at about 0200 hrs, killed 3 anti-Bengali and arrested one SI of Police of Zakigonj PS who co-operated with Pak Army against Bangladesh, damaged tele exchange of Zakigonj.
09 Jun 71	Baragram	Raided en posn st Sadnapur, Baragram and Kangli Ghat and killed 3 en soldiers.
10 Jun 71	Baragram	Our tps shifted to Barapunjee.
12 Jun 71	Baragram	40 new recruits reported, 26 students arrived in our camp. 7 men pushed into Bangladesh area on spl duty.
13 Jun 71	Baragram	20 students out of 26 left for Bangladesh on spl task. 5 more students left for Bangladesh spl task at about 1930 hrs. 8 OR left for Bangladesh with spl mission at 1700 hrs.
13 Jun 71	Kumarsail	Sub Abdul Aziz with 6 OR raided the house of Haji RAkib Ali, Kumarsail and arrested him as anti-Bangladesh and handred over to police.
14 Jun 71	Kumarsail	N/sub Motiur Rahman 11 OR, 2 cooks left for Kukital Camp. One officer arrived at 2000 hrs and left for spl task at 2330 hrs. he led a group of 5 students escorted by 15 armed OR who proceeded to Bangladesh on spl mission.
15 Jun 71	Shabazpur	A group of students escorted by OR went to Shabazpur area, demolished Dalawari Bridge with explosive on rd Latu/Juri about 1½ miles from Shabazpur Railway Station. They brought two pers who were guarding the bridge as detailed by the member of peace committee, Mr. Hazi Mokbul Ali of that area.
15 Jun 71	Shalia TE	A gp of student and 4 OR raided Shelia TE, demolished Factory with explosive at 0600 hrs, destroyed one jeep with A/TK mines and killed Manger and two others including one ex-army man.
16 Jun 71 0400 hrs	Shabazpur	N/Sub Abdul Dayan with 13 OR raided Pak army posn at Shabazpur Fly stand and killed/wounded 18 en soldiers. A batch of FF consisting 30 OR arrived from Karimgonj Transit Camp.

17 Jun 71 0200 hrs	Shabazpur	A gp of students escorted by A Quyoum alongwith 12 OR went Shabazpur area, demolished Kabira Bridge on the rds of Barigram/Juri, 2 miles west of Shabazpur Rly Sta with high explosive.
-do	-do-	A batch students returned from Sylhet Town after demolition of electric points sub sta and tel distr points at Nayar Pool with explosive at 02300 hrs.
18 Jun 71 0300 hrs	-do-	A gp of 6 students led by Mr. Tahid escorted by NK Abdul Jabbar with 10 OR went to Shabazpur area, demolished Rly Deochari Bridge near village Sujaul SQ-4552 Sheet 83 D/I, 2½ miles west of Shabazpur Rly Sta with explosive at 0300 hrs.
21 Jun 71	Karardi	A gp of students led by Ashrafuzzaman escorted by Hav Aziruddin with 70 OR went to Karardi Changar Pool on Sheola Bariagram rd 3 miles south west of Sheola Ghat at about 0300 hrs with explosive.
24 Jun 71	Pallathal	On Pak army Sep named Kajal has been brought from Pallathal TE and killed. Raided Pallatha TE and recovered 20 bags of tea and weighing scale. Raided the house of Abdur Rahman, Pak army supporter, who has been caught and brought to camp.
25 Jun 71	-do-	After interrogation the above mentioned Abdur Rahman has been handed over to BSF Mohisasan for onward handing over to police for further nec action.
26 June 71 2200 hrs	Kangli Ghat	A batch of 6 students led by Ashrafuzzaman escorted by Hav Abdul Kayum with 17 OR demolished Kangli Ghat bridge on the rd Baraigram/Juri 1½ miles west of Kangli Ghat at 0245 hrs with explosive.
29 Jun 71	Beani Bazar	Sub Abdul Aziz with 6 OR raided the House of Asaddar Ali of Beani Bazar, arrested his 2 sons, Safiquddin and Shamsuddin suspected as Pak army supported. After interrogation it was proved that they were not guilty. On their accords they were sent to transit camp, Karimgonj for onward dispatch to Trg Camp to undergo MF trg.
30 Jun 71 0300 hrs	Baragram	Own tps of str 30 raided baragram area at 0300 hrs and killed 4 Pak soldiers.
01 Jul 71	Sheola Ghat	Hav Arish with 15 OR detailed to destroy Sheola Ferry on the way near village Kakardi. They faced Pak army ambush when both sides opened firing resulting death

		of Lnk Fazal Hossain on the spot mission one LMG with 100 rds. ¾ en reported to the killed.
01 Jul 71 1900 hrs	Shabazpur	A gp of students led by Ashrafuzzaman guided by Sep Aziruddin and 2 OR went Baralekha area at 2330 hrs to lay mines on the Rly line in between Shabazpur-Baralekha Rly stn but could not complete the mission as en already covered the area with A/P mines.
02 Jul 71 2000 hrs	Jaldup	A gp of students escorted by Hav Kutubuddin along with 15 Or left for Jaldup area to lay mines on the rd Baraigram Latu but could not come out successful due to non-availability of country boat to cross the river.
02 Jul 71	Jaldup	One Abdul Miah, Pak Sepoy was arrested and handed over to BSG Mohisason.
03 Jul 71 1930 hrs	Jaldup	Demolition Party escorted by Sub Abdul Aziz with 15 OR left again for Jaldup area and laid 3 mines on the road Baraigram/Latu near Jaldup Thana Bazar. Next morning en removed the mines as reported.
04 Jul 71	Amalshid	A gp of students led by Ashrafuzzaman escorted by own tps str of 40 JCO/OR headed by Capt M A Rab went to Amalshid BOP area and demolished Rahimpur Bridge with explosive and captured two 303 rifles from the Bridge guard (Razakar) at 0300 hrs.
06 Jul 71 0500 hrs		Sub Abdul Aziz and Sep Habib Ali (both police pers) deserted from the camp.
06 Jul 71	Beani Bazaar	A batch of students escorted by 4 OR left for Beani Bazar area to lay mines on the road but could not do so due to hy en firing.
07 Jul 71 2200 hrs	Shabazpur	Demolition party guided by Hav Abdul Kayum and 4 OR went to Shabazpur area at 2200 hrs to destroy bridge but could not come out successful due to presence of Pak army.
07 Jul 71	Baragram	A gp of snipers took posn in the village Baragram, 300 yds from en posn at Baragram School at 1530 hrs. They fired and killed 3 en soldiers. No cas from our sides.
08 Jul 71 0500 hrs	Shabazpur	6 OR took posn Bailatilla about 500 yds north of en posn at Shabazpur Rly Station at 0500 hrs. They located a section str of en and opened fire. En also fired with 2" MOR/MG. Seven en killed/injure No cas on our side.

09 Jul 71 0400	Baragram	Own tps str 24 headed by Capt M A Rab raided Baragram area and killed two en soldiers at 0400 hrs.
11 Jul 71 0130 hrs	Baralekha	Demolition party escorted by own tps completely destroyed Pabnia Bridge GR 475554 of 83 D/I on Latu/Baralekha road at 0130 hrs.
11 Jul 71	Baragram	Another three party sent to Baralekha, Latu and Baragram. They fired on en with 2" MOR and SA. At Latu en replied with 3" MOR and MG and at Baragram reply came only with MG and SA. En cas is not known. No cas from our side.
10 Jul 71	Shabazpur	Demolition party escorted by 12 OR headed by Hav Moina Miah went Shabazpur to demolish Nandua bridge, ½ mile south of Shabazpur Rly station but could not come out successful due to strong protection. Own tps returned safely.
11 Jul 71	Shabazpur	A gp of students under protection of a pl str led by Capt M A Rab went to Shabazpur-Baralekha rd side. There were no en present in that loc on that day. They party returned after laying 3 mines on that road. The result was yet to come.
12 Jul 71 2300 Hrs	Baragram	A Jitter party went to Baragram area at 2300 hrs and fired 2” MOR on en posn. En replied with MMG/LMG. En cas not known.
12 Jul 71 0030	Shabazpur	Another party headed by Hav Moina Miah with a section str fired 2” MOR/upon en posn at Shabazpur Rly station gate at 0030 hrs and killed 2 Pak soldiers.
13 Jul 71 0020 hrs	Shabazpur	Demolition party led by Ashrafuzzaman was sent to Shabazpur area to lay mines on the re near village Nandua but could not do so due to adverse situation. It was reported that one en soldier died when crossing the Pabnia Bridge demolished on 11 Jul by own tps.
13 Jul 71	Shabazpur	A Party went to Shabazpur area and cut tel lines between Latu-Baralekha re and brought the cable approx length 2000 yds.
14 Jul 71 0030 hrs	Shabazpur	One Jitter party str 25 headed by Hav Arish Ali sent to Shabazpur Railway station at 0300 hrs. they fired with 2” MOR and LMG on en bunkers. Immediate reply came with 2” MOR/MMG. The also fired 5 rds 3” MOR after 5 minutes. Sta ghar was partly damaged by the fire.

15 Jul 71 0500	Shabazpur	An ambush party of one Section str headed by NK Mohd Ilias was sent to Shabazpur. At 0500 hrs in the4 morning of 15 Jul 71 they saw one pt of en coming towards their front. They were doing PT withour arms.
15 Jul 71 0500 hrs.	Shabazpur	When they reached within 200 yds opened up with LMG/Rifle. En inflicted unexpected cas (approx 20), 9 dead bodies remained lying on the spot upto sunset. Beside a number of en got various injuries seen running away with the help of others.
15 Jul 71	Shabazpur	Our 3" MOR Section went to the right flank of Kumarsail TE and opened fire on main en posn at Shabazpur Railway godown at 0830 hrs with 14 bombs. Seen hit the Rly station and smoke coming out. Damage was yet to come. En replied with 7 rds of 3" Mor bombs. Our cas nil.
16 Jul 71 0400	Baragram	One Jitter Party sent to Baragram area fired 18 rds 2" MOR and opened up with LMG at 0400 hrs. Seen en cas 3. En replied with MMG/LMG. Further result was yet to come.
16 Jul 71	Shabazpur	One Jitter Party went to Shabazpur rly station and opened fire on en posn with 2" MOR/LMG. Reply come with MMG/Rifles. En cas not known. Own cas nil.
16 Jul 71	Pallathal	An ambush party sent to Pallathal TE area. En patrol did not come on the reported place.
16 Jul 71	Pallapunjee	Demolition party went to destroy railway line between Latu-Baralekha. At 0500 hrs en located our party in area Pallapunjee and opened up with LMG/Rigles before they reach their destination. Party returned fire. Two en got injuries as reported by locals.
17 Jul 71 2300 hrs	Chanaru Ghat	Again one demolishing party went to destroy railway line with strong protection under hy en fire. Our party reached the area hear village Chargram (SQ 4655). They successfully blown up rly line in the different places and put ten plastic mines on the main Latu Baralekha road. Party returned with no cas.
17 Jul 71	Shabazpur	At about 0400 hrs two Jitter parties with 2" MOR and SMG went to Shabazpur, hit Latu BOP (Pak) successfully, fired 12 rds of 2" MOR on the BOP, Cas was yet to know.

18 Jul 71 0430 hrs	Baragram	A Jitter party went to Baragram area and opened up with 2" MOR on en posn at Baragram School/Road/Junction at 0430 hrs. Reply coming immediately with MMG/LMG. Own tps replied with LMG/Rifles, resulting of this en cas 3 seriously injured.
19 Jul 71 0930 hrs	Shabazpur	Our 3" MOR section went to Kumarsail TE and fired 24 hrs en posn at Shabazpur Railway Station at 0930 hrs. En replied with four rds of 3" MOR. In that firing 4 en killed and 2 received injury. Two small houses burnt in railway station area. Our tps returned with no cas.
20 Jul 71 0420	Baragram	A pl with 2" MOR went to raid Baragram BOP area, headed by Hav Shamsul Haque, Opened fire on en. Reply come immediately with MMG/LMG from area road junction school and dem behind BOP. The en also fired a number of rds with 120 mm Mor on our tps. En cas not known. Our cas nil.
20 Jul 71	Baragram	It was cfm through locals that 3 en tps got serious injury due to plastic mines blasted laid on 17 Jul 71.
25 Jul 71 1200	Shabazpur	On 25 Jul 71 at 1200 hrs we put an attack with five pls at Shabazpur Railway Station. Two cup up parties which were sent on Baralekha and Kangli road laid A/Tk mines and stopped the en reinforcement as well as withdrawal. We charged their BOP at 1300 hrs and brought the Pak flag. En cas approx 20. Own cas four and injured others returned safely.
27 Jul 71 1200	Shabazpur	Two Jitter Parties sent to Latu Railway Station. Our party kept on firing with intervals for whole night. Two Razakars killed while doing sentry duty in the bunkers. Party returned safely.
28 Jul 71 2130	Pallathal	An ambush party sent to Pallathal TE area. The party did not return. Our 90 men performing trg with Trainees pl sent the next fortnight.
31 Jul 71 0400 hrs	Keramat Nagar	One party of 15 FF raided Keramat Nagar TG. One building of TG was destroyed. 7 en killed. Own cas nil.
01 Aug 71	Shabazpur	A Jitter Party was sent to Shabazpur Railway Station. The party opened up with 2" MOR. En reply was very quick and intensive. They opened up with 3" MOR/MMG. Our party also replied with LMG/Rifles. En cas not known. Own cas nil.

01 Aug 71	Shabazpur	At 0900 hrs 3" MOR sec successfully fired 6 rds on Pak tps and Razakar when they were constructing bunkers in area Shabazpur BOP. They ran away lime anything and have not returned. The process was continued.
01 Aug 71	-do-	The fol parties have been sent inside: I. A party of 4 FF with explosive sent to Gota Tiker a place 2½ miles east side from Sylhet town to destroy main gas pipline leading to Fenchugonj Fertilizer Factory. 2.2 FF with gren sent to Sylhet town to throw gren on movement of Pak party at night. 3. 2 FF with gren sent to Carkai to destroy Post and Tel office. 4. 2 FF with gren sent to Golapgonj to destroy Tel exchange and post office. 5. 4 FF with Pek-1 (explosive) sent to Mongla Bazar to destroy Pillars.
02 Aug 71 0200	Pabnia Bridge	One pl with FF and MF protection was sent to destroy Pabnia Bridge (GR476554) on Baralekha and Shabazpur rd. the party destroyed the bridge completely and returned successfully. They did the job under en fire. The same bridge was destroyed once before but the Pak tps repaired it.
02 Aug 71 1000 hrs	Shabazpur	We fired 12 rds 3" MOR on Shabazpur Rly Sta. Cfm through source that one Razakar has been killed and to Pak tps and two Razakars seriously wounded.
03 Aug 71 0145 hrs	Kangli	One P1 MF went to destroy Kangali Ferry and raid Razakar guarding the ferry. At 0145 hrs we raided the place and captured one 303 Rifle. The new ferry was demolished with the help of explosive and sank. Our cas nil.
03 Aug 71 0145	Shabazpur	A Jitter party went to Shabazpur Rly sta and fired 24 rds of 2" MOR on area Godown, and sta running room. En cas not known. Own cas nil.
03 Aug 71	Beanibazar	A Jitter party sent to Beanibazar. Razakars opened fired on them before they could reach the target. The party replied and chased the Razakars.
03 Aug 71 2200	Baralekha	A party was sent to lay mines AP on Baralekha rd. they laid 16 mines and come back. Our Baralekha party raided the house of Pak supporters and arrested 5 (five). They also captured one civ gun from the house of one Pak supporter.

04 Aug 71	Pallathal	One ambush party was sent to Pallathal TE Garden road. They opened fire on in coming Pak patrol. En ran away leaving behind 3 LMG mag and 250 rd of 303 ball ammo.
05 Aug 71	Chatalekha	A Jitter party went to Chatalekha from Baralekha base. They fired on Pak tps with 2" MOR. Reply come with MMG/LMG.
07 Aug 71 0300	Shabazpur	Our 3" MOR sec fired 12 rds n Shabazpur Rly Sta. three Pak tps killed in bunkers and other two bunkers destroyed.
07 Aug 71	Pallathal	One ambush party opened fire on a batch of in-coming Pak patrol in area Pallathal TE Garden. In that firing one en got killed on the spot and injured taken by them. The en left behind four LMG mag with 80 rds 303 balls.
07 Aug 71	Pallathal	One ambush party was surrendered by Pak tps. Our reinforcement party rushed to the scene and our men got out. We gave covering firing with 3" MOR and LMG. En reply come with 3" MOR, MMG and LMG. In cas not known. Own cas two wounded.
08 Aug 71	Golapgonj	2 FF was sent to Golapgonj with grn to destroy post and tel office of Golapgonj. They destroyed the Post and Tel office. One FF got Captured by Razakar while running away from the scene.
13 Aug 71	Sutarkandi	A Jitter Party sent to Sutarkandi with str of 30 MF. Own party fired with 3" MOR. En replied with MMG/LMG. En cas not know. Own cas nil.
13 Aug 71 0001 hrs	Sutarkandi	Our 3" MOR sec sent to Baragram to shell on posn at Sujnapur/Baragram. Our 3" MOR shell on Sujnapur resulted 3 en killed, 5 injured, 4 civ wounded. Our cash nil.
13 Aug 71 2000 hrs	Kangli Ghat	A party consisting of 30 MF and 20 FF sent to Kangli Ghat to destroy ferry. Opur party reached the tgt but ferry not found on the spot instead they found two big boats being used for the purpose destroyed and come back safely.
13 Aug 71 0001 hrs	Konagaon	A party of 30 MF sent to raid the Chairman office of Konagaon. En fled away before our party reach the tgt.
14 Aug 71 2200	Rly Bridge Baralekha and Latu	A party of 30 MF and 25 sent to destroy the Rly Bridge between Baralekha and Latu. Through en fire our party reached near the tgt and charged the Razakar

		guarding the bridge. One Razakar killed. Own cas one wounded. Due to the intensive fire from all direction the demolition party could not reach the tgt.
14 Aug 71 0001 hrs	Beanibazar	A party of 30 MF sent to raid Beanibazar. One Razakar party come on the way. Our party fired upon them and killed two Razakars. Own cas nil.
14 Aug 71	Shabazpur	12 Ff sent to Shabazpur to lay A/P mines. They laid 20 M-14 mines on observing en footpath.
14 Aug 71 7100	Baralekha	7 FF sent to Baralekha with two gren each and 4 AP mines to create panic.
14 Aug 71 1700	Near Sylhet	4 FF sent to Gotatiker (near Sylhet) with 8 lbs Pck-1 explosive and gren each to blow gas pipe line.
14 Aug 71	Sylhet	3 FF sent to Sylhet to blow up electric power pylone. Party earned 8 lbs Pck and one gren each.
14 Aug 71 1800	Charkhai	2 FF sent to Charkhai to destroy post and Tel office. Party earned two gren each.
14 Aug 71	Sylhet	Another 2 FF sent to Sylhet town with 2 gren each to create panic.
17 Aug 71	Latu	A party of 120 MF/40 FF sent to demolish Chargram Rly Bridge but due to heavy en resistance party returned unsuccessfully.
18 Aug 71 2200 hrs	Chargram Rly Bridge	A party of 150 MF and 60 FF went to demolish Chargram Rly Bridge. In spite of hy en resistance our tps successfully demolished the bridge completely. No cas.
18 Aug 71 0001	Sutarkandi	A Jitter sent Sutarkandi. Our party opened fire with 2" MOR and LMG. En replied with 6 rds of 3" MOR and MMG/LMG. En cas not known. Own cas nil.
16 Aug 71 0430 hrs	Bogha	11 FF with A/P mines sent to Bogha and laid the mine by the side of a small river where the en use to come to take three sugarcane. It was cfm that the mine blasted due to which one Pak tps seriously injured.
16 Aug 71	Chatalekha TG	30 MR/FF Bail Bari made an ambush near Chatalekha TE. They opened up with LMG/Rifles on the incoming Pak tps and Razakars. Due to own fire 2 Razakars and 1 Pak tps injured. 2 Pak informer caught and killed after interrogation. En field away with injured pers.

18 Aug 71 2000 hrs	Sylhet Town	2 FF was sent to Sylhet Town to kill Pak tps at Sylhet Town. At about 2000 hrs it was found that one mil jeep was coming near Kadamtila Jalopara. They thrown 2 gren on the jeep due to which one Pak offr/2 OR and 2 collaborators killed on the spot. Our party returned safely.
19 Aug 71 0230 hrs	Chatalekha	A Jitter party with 50 MF/FF sent to Chatalekha TG. Party opened up with 2" MOR/LMG from two sides of Chatalekha TG at 0230 hrs. En got into complete panic and started firing at random on all direction. It was learn that few people got injury from their own firing.
19 Aug 71	Latu and Baralekha Rd	20 MF sent in between Latu and Baralekha to lay an ambush. En did not appear on the day.
19 Aug 71 0430 hrs	Shabazpur	A Jitter Party sent to Shabazpur Rly sta with 30 MR. Own tps fired. En replied with MMG/2" MOR.
19 Aug 71 0130	Sutarkandi	A party of 34 FF raided at village Goilapur (Sutar Kandi). Own tps raided on the right flank of en posn but en fled away before we could catch. Any how 2 Pak collaborators caught in the house and kille. One Pak tps injured. One I band transistor captured.
20 Aug 71	Latu and Baralekha Rd	A party made an ambush in between Latu and baralekha Road and opened fire on a batch of Razakars. Cas not known.
20 Aug 71	Bangladesh	48 Ff sent Bangladesh with gren and A/P mines. One party among them will try to establish a hide-out near Dacca Dakhin.
20 Aug 71 0130	Talu Khal	70 MF/FF sent to Talu Khal to cut off the Dam. Party blown off the Dam with the help of explosive. Destruction of the Dam created a havoc. At least 20-40 miles area affected due to this.
21 Aug 71 0430 hrs	Bhanja	2 pl str sent to Amalshid to help FF party at Jalalpur who reported to be given pressure by en.
22 Aug 71	Sarapar	150 MF/FF took def posn at Sarapar in the bank of river Sonai about 2 miles inside Bangladesh. One pl deployed at Bogha inside Bangladesh opposite to Mahishashan and sec kept at Atua as a cut off party to Sarapar.
23 Aug 71	Gabindapur	Another 150 MF/FF deployed to Gabin dapur and Baruda. They took def posn there. In this about 10 SQ miles have been captured by lib army. Demolition

		party detailed to lay A/P mines around the def posn. Accordingly number of A/P mines laid around the all def posn.
24 Aug 71	Sarapar	A tel installation between Sarapar and Indian Latu adv camp estb on 240900 hrs.
24 Aug 71	Sarapar	A civ at Sarapar lost his leg by blasting of A/P mine laid by us.
25 Aug 71 0230	Lakshmibar Area	A party of 22 FF/MF sent to cut off Dam near Lakshmi Bazar. Own party successfully demolished the dam with the help of explosive. No. cas.
26 Aug 71	Kanglighat	A party of 40 FF with explosive sent to Kanglighat to destroy the Ferry. Due to hy en resistance own party returned unsuccessfully.
27 Aug 71 0045	Kakardi near Sheola	A party of 20 FF sent to destroy a bridge at Kakardi near Sheola Ghat. When our party reached the bridge en (Razakars) guarding the bridge fired on our tps. Our party also fired in reply resulting 2 Razakars killed and one civ (guard) arrested with 1 Rifle and 2 rds ammo. Our party destroyed the bridge with the help of explosive. Our cas nil.
27 Aug 71	Kanglighat Ferry	Another party of 23 went to destroy Kanglighat Ferry. Dut to the hy en resistance they returned safely.
28 Aug 71	Tazpur Def	240 MF/Ff were in def posn at Tazpur. En tried to adv from Shabazpur Rly Sta via Tazpur village where own tps at adv posn engaged them and killed 4 Razakars. I Pak tps and few civ got wounded.
29 Aug 71	Tazpur Barudha	En tried to adv from Beanibazar and Shabazpur side as well but own tps repulsed their attempt.
29 Aug 71	Kumarshail	50 MF/FF sent to Kumarshail on receipt of an info that en tps had come to Kumarshail tg which is right on the border and about 500 yes away from our camp. Our tps surrounded them from behind. En str was about hundred. They returned. 5 en wounded. Own one FF seriously injured and 5 minor injured.
30 Aug 71	Defend the Liberated Land	En attacked from Bogha village and Kharampur with 2 coys str but withdrew unsuccessfully, 3 en killed due to mine blast. No cas from own side.
30 Aug 71	Kumarshail	En approached against kumarshail tg and started firing on pers engaged in digging trenches. Our MF attacked them from two flank and made them withdraw after two hrs of exchange of fire. Now the garden came

		under own posn and a pl defended it. 7 en killed. Own cas nil.
31 Aug 71	Takai Kona Sarapar	On 31 Aug 71 at 0200 hrs en put first attack from Takai Kona, Bogha and Kharampur with two coys Pak tps/Razakars. But due to hy resistance en returned unsuccessfully at 0430 hrs. 6 en killed due to mine blast. En put another attack at 1300 hrs from the same three flanks. This time en pressure was very hy but due to effective shelling with 3" MOR en had to withdraw by 1600 hrs. 7 en killed and 5 wounded due to shelling. Own 2 bullet injury and 2 shelling injury.
02 Sep 71	Konagram	45 MF/FF raided Konagram and Beanibazar but no Pak tps were there in that places. 3 Razakars and one Pak supporter killed.
02 Sep 71	Shabazpur Baralekha	Two party of 10 each sent to destroy rly bridge from two different places but returned unsuccessfully.
02 Sep 71	Kangli Ferry	En patrol came near Kangli Ferry but fled away when our patrol party opened fire on them.
03 Sep 71	Kumarsail	En put strong attack on our def at Kumarsail TG. After two hrs exchange of fire en returned. En used MMG, 2" MOR and other arms. En cas not known.
03 Sep 71	Shabazpur Baralekha	6 FF sent with A/TK mine to put on the fly line. They put charge in two places but could desrtroy line in one place. Train could not come to Shabazpur on 03 Sep 71.
04 Sep 71	Amalshid	2 pl MF defending liberated land at Amalshid. At 2000 hrs en opened up with various kinds of wpns from all flanks. En fighting continued till morning. Own 2 MF defending the bunker expired due to the en shelling and one seriously injured. En cas not known (Expired; 1 MF Abdul Khalek. S/O Abdul Karim 2. MF Akmal Aloi, S/O Nuruj Ali)
05 Sep 71	Tajpur	300 MF/FF defended the liberated land. En made two attempts to break through our defences. They came with great str but failed. In that one Pak tp and 6 Razakars killed. No cas from our side.
06 Sep 71	Bogha Kharampur	En made a full attack on our def at village: Bhoga and Kharampur with MOR support. En fired 50 rds 3" MOR on our posn. They also used parachute Bomb and other authomatic wpns. They removed dead bodies

		with great trouble. 3 Pak tps and 4 Razakars killed. Own cas nil.
06 Sep 71	Source Report	Source Report indicates "En has come with a great on of tps at Shabazpur TG, approx 2 coys regular plus Razakars. About one coy at Shabazpur TG, one pl at Rahamania TG, 2 pl at Chatalekha TG and about 2 coys at Baralekha. A full Bn (21 Panjab Regt) en str was deployed between Baralekha to beanibazar. Arty support from our def is most essential now. Kindly take nec steps."
08 Sep 71	Defending Liberated land	En made repeated attempts to break through our left flank from Bogha village. En used all types of arms incl 3" MOR. They suffered 6 cas.
09 Sep 71	Shabazpur Beanibazar	Our tps made an ambush on Pak tps (Patrol Party) on Beanibazar road. Own party opened fire while the en was quite away from them. Train was coming from last two or three days.
09 Sep 71	Shabazpur Rly Sta	One en helicopter M-1-8 flown over our def. en might have reached the area for an air attack.
11 Sep 71 0200 hrs	Shabazpur	One en plane flew over our def area at 0200 hrs. from Shabazpur towards Sutarkandi. En also fired from Shabazpur.
12 Sep 71 0230 hrs	Shabazpur TG	50 MF/FF raided the Shabazpur TG at about 0230 hrs with LMG rifles and 2" MOR. En replied after 10 minutes. 15 Pak tps and Razakars killed. Own cas nil.
13 Sep 71	Abongi	En fired to break through our def but failed against strong resistance. II Pak tps/Razakars reported killed. Own FF Mohd Younus Shaheed and two others who came from Kukital wounded.
14 Sep 71 0430 hrs	Kumarsail	En attacked Kumarsail at 0430 hrs with huge str. Own tps fought till 0930 hrs and compelled to withdraw. 2 Pak tps killed.
14 Sep 71 0400	Bhuga	Attack come at 0400 hrs with a coy str. Heavy exchange of the continued till 0900 hrs. 16 Pak tps/Razakars killed. Own cas nil.
14 Sep 71 0600	Kharampur	Attack come at 0600 hrs with approx 2 coys str but failed to penetrate. Again en attacked at 0730 hrs. Own tps fought till 1000 hrs but later compelled to withdraw. En suffered by cas approx 100 killed.
14 Sep 71 0300	Sarapar Gobindapur	En attacked the whole def posn with a Bn str at about 0300 hrs. They approached all rounds with all types of

	Barudha Astha Ghari Abhongi Tajpur	wpns. Arty shelling started from 0200 hrs on all posn. En cut our def from Sarapar they only route of our comm. And supply. Own tps fought upto last rds of ammo. Later compelled to withdraw but having no way to come out from the surrounding area own tps crossed the Sonai river by swimming resulting that they could not bring their personal wpns with them. Total 6 own tps missing. En cas as under :- Astaghari 5, Sarupa -4, Patharia para-4, Pirar Chak-6, Noagram -3, Tajpur-15, Abhongi -10, Own 5 wounded and 6 missing.
15 Sep 71	do	En started shelling with arty at 0800 hrs. total 13 bombs fired by the en out of which 9 bombs had fallen within our barapunji MF camp area. No cas.
18 Sep 71	Shabazpur TG	It was reported from sources that 4 Pak tps and 7 Razakars killed during the action by our tps on 13 Sep 71.
18 Sep 71	Shabazpur TG	A party of 60 MF/FF sent to raid Shabazpur TG (Jhingala). Own tps raided en tps with 2" MOR, LMG and Rifles, 7 Pak tps and Razakars reported killed.
18 Sep 71	Sarapar Area	A party of 10 MF/FF sent to collect the wpns from en depended area. Party recovered 2 SLR and 4 330 Rifles.
18 Sep 71	-do-	A collecting party consisting of 8 MF/FF sent to en depended ar5ea to collect wpns. Party collected one 2" MOR from Sonai river.
18 Sep 71	Sutar Kandi	A Jitter Party consisting of 60 MF/FF sent of Goilapar (opposite Sylheti para) and opened up with LMG, Rifles and 2" MOR, Immediately reply came from en. They fired with 3" MOR, MMG and LMG, 2 en killed. Own cas nil.
18 Sep 71	-do-	One en helicopter seen over our area near border boundary line. Presumably en receed the camp. En started shelling with 105 MM shells at 0100 hrs. they fired 25 rds. All of them fell on and around our camp area. Our cas nil.
18 Sep 71	Kumarsail Deotali	70 MF/FF have made an ambush at Kumarsail and Deotali. En came on that area and opened up with LMG at about 0200 hrs. Our party did not reply as en was out of area/range.
19 Sep 71	-do-	En patrol came to Kumarsail TG and heavily fired towards our camp. No cas.

20 Sep 71	Kumarsail	One Pak tps expired by blasting of a A/P mine laid by our tps.
20 Sep 71	Bogha	One Pak tps killed by blasting of mines laid by own tps.
21 Sep 71	Gobindapur	15 MF sent to Gobindapur village to put an ambush. 3 Pak tps and Razakar came by boat to Gobindapur village. Razaker came to make reccee the village where our ambush party was on ambush. Our MF cought the razakaer after firing few rounds at him. The rest fled away. One 303 Rifle also captured with the Razaker.
21 Sep 71	Pallathal TE	120 MF/FF sent to make en ambush at Pallathal TE but en did not come on that road.
22 Sep 71	Kumarsail	Info received from locals that 7 Pak tps have been killed by A/P mine blusting on 21 Sep 71 and 4 others 22 Sep 71.
23 Sep 71	Kumarsail	A pl str of MF was on ambush at Deotail, found Pak tps coming towards border side. When the en reached near Kumarsail mosque own tps opened up with LMG on them resulting 8 en tps killed and 10 other injured. Own cas nil.
23 Sep 71	Kumarsail	About one pl str en came from Kumarsail TG road. Our ambush party opened up when they reached within killing range. Own tps killed two Scouts in front. Others tried to ran away but fell on the mine field and 7 en lost their legs. Own cas nil.
24 Sep 71 1500 hrs	Kharampur	60 MF/FF were on ambush at Kharampur. About 40 en tps while coming to border, own party opened fire. en replied with MG, LMG and few rounds of 3" MOR. En inflicted 5 killed and 10 other injure. En could not carry the dead bodies till last night (24 hrs). Own cas nil.
25 Sep 71 0600 hrs	Deotoli	An ambush party consisting o 100 MF sent to Deotoli. Our party opened fire on a returning en ambush party from the borer. Hy fire came from en side. One MF wounded with 2" MOR bomb splinter. En cas not known.
26 Sep 71 1715 hrs	Kumarsail	60 MF/FF raided the en tps at Kumarsail TG. Hy exchange of fire continued for about 2½ hrs. en used 2"/3"MOR and arty. 9 en tps killed and several injured.

27 Sep 71	-do-	En stred shelling with arty on our camp area for about one hour. It caused damage to our tnts. No cas.
27 Sep 71	Borail	25 MF made an ambush at Borail. Our tps opened fire on en tps when they were c arrying food for the froward post at Borail. 2 Pak tps killed.
28 Sep 71	Induction	32 FF went to deep induction in the general area Dhaka Dakhin and Hakalaki Haor.
01 Oct 71	Kumarsail	30 MF put an ambush at kumarsail Village, Own tps opened fire when en patrol started approaching towards the dorder. Five en seen lying on the scene. Own cas nil.
01 Oct 71	Kumarsail	Another party of 45 MF made an ambush at kumarsail TG. Own tps did notfire as the en come to Kumarsail in different routes.
01 Oct 71	Kumarsail	30 FF inducted into Bangladesh with arms and ammo to the gen area Dhaka Dakhin and Hakalaki Haor.
04 Oct 71	Kumarsail	40MF sent to Kumarsail to make an ambush, En approached at 1700 hrs Won tps fired on them killing 3 Pak tps.
04 Oct 71	Borail	30 MF sent to make ambush at Borail on en tps. En seen patrollng in that village. Our tps fired on them but cas not known.
04 Oct 71	Induction	51 FF inducted inside Banglasesh in the area Dhaka Dakhin and Hakalaki Haor.
05 Oct 71	kumarsail	20 MF made an ambush at Kumarsail village. About a pl str of Pak tps came at Kumarsail TG. Our ambush party opened fire on them killing 5 en tps. En used 3" MOR to collct dead bddy till evening.
05 Oct 71	Atua	30 MF sent to Atua village to make ambush but en not found.
06 Oct 71 1430 hrs	Kumarsail	25 MF laid am ambush at Kumarsail village, When en partol Party came to that villae own tps fired on them killing 4 en tps. One MF Got enjury with splinter of bomb.
07 Oct 71	Atua	22 MF sent to lay ambush on en tps but on en found.
08 Oct 71	Kumarsail	20 MF laid en ambush at Krmarsail village. En fired with MMG from BHairage Tilla. No cas.
10 Oct 71	Kalachara camp	60 MF raided at kalachara camp in the night of 10 Oct 71 at 0400 hrs, before en opened fire assaulted the

		Camp killing 5 en and captured two Razakars with on 303 rifle. Own cas nil.
12 Oct 71	Kumarsail	30 MF sent to Kumarsail village to make an ambush. The made ambush for the day but en not found in that posn.
13 Oct 71	Pallathal TG	About 50 A/P mines laid in different routes of Pallathal TG.
14 Oct 71 1600 hrs	Kalikapur TG	A party of 60 MF made an ambush at Kalikapur TG. About a co str of en tps came to that area and opened fire on own tps. Our tps replied with LMG/2" Mor and rifles killing one Razakar and two other Panjabis injured. Own cas nil.
16 Oct 71	Kumarsail	A Jitter party of MF sent to Kumarsail. Own party fired with LMG and rifles on en ambush (Bunker). En started shelling with 3" MOR from Shabazpur and used MMG from Bairagi Tilla. Own tps retreated after exchange of hy fire. Cas not known.
18 Oct 71	Deep Ibduction in BD	67 MF/FF in three parties inducted inside Bangladesh in Baralekha, Fenchugonj and Beanibazar.
19 Oct 71	-do-	A party of 23 MF/FF inducted in Golapgonj area.
19 Oct 71	Pallathal	Report received that two en tps got injured due to mine blast laid by own tps at Pallathal TG.
20 Oct 71	Induction	Another 44 MF/FF in different groups inducted into Bangladesh. Total no of induction out from the camp for Bangladesh area are 144. About 100 have already entered into Bangladesh.
21 Oct 71	Shabazpur	A Jitter party of 50 MF sent to Shabazpur. En str about 90 tried to approach towards the border but our ambush party attacked from two side. En ran away but hy firing came form their def Bogha and Shabazpur.
20 Oct 71	Bogha	Own 3" Mor shelled on en posn at Bogha destroying two en bunkers. En replied with 2"/3" MOR and shelled 23 rounds. Own cas nil. En cas not known.
23 Oct 71	Rly Track Shabazpur Baralekha	One rly trolly was blown off due to mine blast laid by inductees between Baralekha and Shabazpur. As a result 4 Razakars were killed.
24 Oct 71	Killing Pak Supporter	Mr. Abdul Aziz renowned Pak Collaborator and Chairman of Teradorong PS, Baralekha seriously injured by our inductees.

25 Oct 71	Attack on en posn	An attack on en posn at shabazpur killing 3 Razakars and 4 other injured. Own cas nil.
28 Oct 71		Info received that there was a clash between en tps and our inductees at Amura near Beanibazar. On 25 Oct. 71 at 1500 hrs. 8 Razakars and two Panjabis killed.
29 Oct 71	Kumarsail	A Jitter Party sent to kumarsail village. They fired on en posn and immediately reply came from en with LMG. Cas not known.
01 Nov 71	Latu Baralekha	Rly track between Baralekha and Latu blown off with explosive by own tps.
03 Nov 71		One en helper killed by blast of mine laid by our tps at Kumarsail village.
08 Nov 71		166 FF joined from Trg Centre.
10 Nov 71	Atgram	En attacked our liberated area at Balla and Gotagram where won MF defending with str of a coy at 6900 hrs but own tps bravely repulsed the en. Again en launched an attack at 0430 hrs with a str of 300 Pak tps but were compelled to retreat with by cas. About 300/400 locals with deadly wpns approached by Pak tps. Own tps were compelled to fire on them resulting by cas on en/publec side. Own tps returned for tactical reason. One MF died (Amalshid coy and two other injured) En injured 100 casualty.
10 Nov 71	Sadinapur	En increased their str to 150 regular Tps at Sadinapur.
12 Nov 71	Gajukata	Own Induction have killed two Razakars and captured one 303 Rifle at Gajukata area on 10 Nov. 71.
20 Nov 71	Atgram	Inspite of hy resistance by en own tps captured Salam Tilla and Monipur Tilla. 2 ps MF deployed at Salam Tilla nd I pl at Monipur Tilla. En was inflicted hy cas and field away leaving behind their arms /ammo. Allied tps eith own MF occupied Zakigonj killing many en tps and captured 3 Panjabies and 23 Razakars. One Baluch arrested in injured condition and evacuated to Karimgonj thsp. Own Have syed Emdadul Haque and Jonab ali lost one leg by A/P mine blasting. About 100 public died by the en fire.
22 Nov 71	Raja tilla	Own tps str about a coy Liberate the Raza Tilla inlfiction by cas on en side. En fled away in the dark of noght. Own cas nil.
23 Nov 71		Own tps advanced towards Dowkargal to raid en posn at kanai Ghat and liberated Dowkargal and Lobachara

		on 25 Nov 71. En reported to be reinforced at Kangli Ghat.
28 Nov 71	Barachatal Darbost	Own tps str of a coy rieged the barachatal and Darbast road the only route of Kanaighat. En tried to repulse us but failed. En shelled with arty but on cas on our side. 2 Razakars so far captured. About a coy Pak regular tps which were brought to counterattack our Bengal Regt but were compelled to retreat sustaining hy cas. About 300 Razakars gathered at Kanaighat. 2 own al placed at area uttar Lakshmi Prasad to stop en movement on the road alongwith the river side.
30 Nov 71	Barachatal	En tps attacked own posn covering the arty shelling Own tps changed posn to Naya Gram about 3 miles from kanaighat. En reinforced one coy of regular forces and Razakars.
05 Dec 71	Birdol	There was an encounter with en at birdol near Kanaighat while a pl str of MF were on patrol duty there. Cas nil.
05 Dec 71	Kanaighat	Own tps strengtened the def all rounds.
07 Dec 71	kanaighat	Own tps with allied tps are in advance towards Darbost liberating kanaighat on 04 Dec. 71.
08 Dec 71	Darbost	Own tps with allied tps attacked the en posn at Darbost. Inspite of hy en resistance by the arty and other by gun, own tps easily occupied Darbost inflictiong hy cas on en side. Col Dutta and Major Rab orgainsed the attack. One allied offr (Capt) killed in the attack and three MF received serious injury. About 20 Razakars surrendered to the liberation armyh. En took alternative posn at Haripur ppl. en used 3 arty guns.
09 Dec 71	Haripur	Own tps with allied tps adv towards Haripur and took posn near ppl. En destroyed ne bridge at Hemu. En being surrendered by the liberation army in all respect.
10 Dec 71	Hemu	Due to the hy pressure from all flanks to the en at Hemu exchange of fire from bothe sides continued till mornig. 2 en bombs fell on our posn resulting 9 MF killed on the spot. Dead body could not be collected. One local pious man was given Rs. 200/00 to burry the shaheed. En have been driven our from the pl.
11 Dec 71 2000 hrs	Chiknagul	Lt Col Dutta left towards Chiknagul with 500 MF/FF and took def posn there.

12 Dec 71 1600 hrs	Darbast	Comd 8 Mtn Div visited the Darbast at 1600 hrs. Brig watke accompanied him.
13 Dec 71 1400 hrs	Haripur	Own tps with allied tps captured haripur ppl. at 1400 hrs. En fled away towards MC College, 2 Pak tps arrested and many other sustained cas, En left behind huge qty of ammo with 2 Chinese MG. Own 5 tps got minor injury.
13 Dec 71 1600	Chiknagul	Own tps advancing towards MC College where en reported to have been concentrated.
14 Dec 71 2300	Chiknagul	Hy exchange of fire continued with en throughout the night of 13/14 Dec. 71 near Chiknagul TE and in the morning of 14 Dec 71 when own tps were advancing toward en posn one of our MF died buy arty shelling. Two other MF also killed by MMG bullet and four other received injuries. En retreated to Khadem nagar. many Razakars surrendered with their arms to liberation army.
15 Dec 71 0730 Hrs	khademnagar	En took strong def posn at Khademagar (their Hq) from where en shelled with hy arty guns. Our tps with allied tps continued to adv towards Khademnagar. Extensive fighting continued for the whole day. Own tps with allied tps cordoned the en allround. Our Bengal Regt entered into Sylhet town. An appeal by the allied comd to the en sent to surrender before liberation army.
16 Dec 71	Khademnagar	En accepted the proposal of combined tps comd and surrendered before Indian Army.
17 Dec 71 1200	MC College	En Concentrated their tps at MC College with arms and ammo and handed over to the allied comd at 1400 hrs on 17 Dec 71.

সাক্ষাৎকারঃ মেজর ওয়াকিউজ্জামান*

আমার পিতা ছিলেন এক্স-আর্মি ম্যান। ২৪ তারিখের দিকে পাকিস্তান আর্মি আমাদের বাড়িতে আসে। সিলেটের বাসায় আমরা ছিলাম না, অন্য বাসায় ছিলাম। তারা বাসা তছনছ করে চলে গেল। তাদের উদ্দেশ্য হলো আমার পিতাকে হত্যা করা এবং অমাদের উপর প্রতিশোধ নেওয়া। এরপর আমার এমন ঘৃণা জন্মে যে, আমি তাড়াতাড়ি মুক্তিবাহিনীর সাথে যোগ দেই এবং তারপর ইণ্ডিয়া চলে যাই।

প্রশ্নঃ ইণ্ডিয়া আপনি কবে গেলেন?

উত্তরঃ ইণ্ডিয়া আমি ক্রস করেছি ৩০ শে মার্চের দিকে।

প্রশ্নঃ ৩০ শে মার্চে আপনি ইণ্ডিয়া গেলেন। ইণ্ডিয়ার আপনি কোথায় গেলেন?

উত্তরঃ প্রথমে করিমগঞ্জে।

প্রশ্নঃ করিমগঞ্জে তো ফোর সেক্টর হেডকোয়ার্টার ছিল।

উত্তরঃ প্রথমে ছিল। যেখানে আমাদের রিক্রুটমেন্ট করা হয়েছিল ওটা ছিল সেটেলমেন্ট অফিস। ওর কাছে একটি স্কুল ছিল, সেখান থেকে আমরা ট্রেনিং নিয়েছিলাম। প্রথমে আমাদের যখন সিলেকশান করা হলো সেটেলমেন্টে, ওখান থেকে আমাদের কলকলিঘাট নামক একটি জায়গা আছে সেখানে কিছুদিন ট্রেনিং চলে। যে ট্রেনিংটা হয়েছিল ওটা আমাদের বি-এস-এফ দিয়েছিল। আমাদের ভালো ট্রেনিং-এর জন্য পরে ইণ্ডিয়ান আর্মির কাছে পাঠানো হয়েছিল, সেটা ইন্দ্রনগরে ছিল।

প্রশ্নঃ ওটা কতদিনের ট্রেনিং ছিল?

উত্তরঃ ওখানে আমি এক মাস ছিলাম। কিন্তু আমি তিন সপ্তাহ ট্রেনিং করারপর আমাকে সিলেক শান করে নিয়ে আসলো ইন্টেলিজেন্সীর জন্য । আমাকে এক সপ্তাহ ট্রেনিং দেওয়া হয় ইন্টেলিজেন্সীর উপর এবং তারপর আমাকে সিলেটে পাঠানো হয় বিভিন্ন সংবাদ সংগ্রহের জন্য।

প্রশ্নঃআপনি এ রকম কটা টাস্ক করেছেন?

উত্তরঃ প্রথমবার একটাই অপারেশন, এ রকম একটা টাস্ক করতে এসেছি সিলেটে। আমার কাজটা ছিল কোন জায়গায় কি ধরনের ফোর্সেস আছে সে সম্বন্ধে জানানো। সে ইনফরমেশনটা আমি দিয়ে দেই এবং দেয়ার পর উনারা আমাকে একটা টাস্ক দেন। আমার সাথে কুমিল্লার দু'জন ছেলে ছিল, সিলেট টাউনের ভেতরে একটা এক্সপ্লোশন করার জন্য। কারণ সিলেট টাউনটা আমি যখন দেখেছি তখন সিলেট টাউনটা একেবারে নরমাল ছিল। দেখলে মনে হতো না যে বাংলাদেশের লোক স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করছে বা সংগ্রহ করছে। এ রকম কোন পরিস্থিতি সিলেট টাউনে ছিল না।

প্রশ্নঃ ওটা কোন মাসে?

উত্তরঃ ওটা ছিল মে-এর দিকে। আমি গিয়ে যখন এ কথাটা বললাম, পরে আমাকে ইণ্ডিয়ান ইকো সেক্টরের সেক্টর কমাণ্ডার ছিলেন ব্রিগেডিয়ার ওয়াটকে, তিনি আমাকে একটা মিশনের জন্য সিলেট পাঠালেন- তুমি গিয়ে একটা এক্সপ্লোশন কর তখন লোকে বুঝবে যে সংগ্রাম হচ্ছে এবং বাংলাদেশ স্বাধীন হবে যাতে আরো লোক আমাদের দিকে আসে এবং পাকিস্তান আর্মি এতো ফ্রিলি যাতে মুভ করতে না পারে। যেদিন উনি বললেন তার পরের দিন আমরা রওনা হলাম।

---

* ১৯৭১ সালের অক্টোবর মাসে আংলাধেম সেনাবহিনীর কমিশনপ্রাপ্ত। সাক্ষাৎকারটি প্রকল্প কর্তৃক ১৯৭৯ সালের ১০ এপ্রিল তারিখে গৃহীত।

প্রশ্নঃ আপনার ক'জন রওনা হলেন?

উত্তরঃ আমরা চারজন ছিলাম। তিনজন কুমিল্লার ছেলে ছিল আর আমি একা সিলেটের ছেলে ছিলাম। আমরা সিলেট টাউনে আসলাম তিনদিন হাঁটার পর।

প্রশ্নঃ আপনার সঙ্গে কে কে ছিল?

উত্তরঃ আমার সঙ্গে কুমিল্লার একজন ছেলে ছিল রেবতী নাম, আর একটা ছেলে ছিল? ওর নাম হলো সিদ্দিক, আর একজন ছিলেন উনি মারা ঘেছেন, উনার নাম ছিল হাফিজ।

প্রশ্নঃ আপনাদের সাথে আর্মস কি ছিল?

উত্তরঃ আমাদের সাথে শুধু গ্রোনড ও এক্সপ্লোসিভ ছিল। সিলেট টাউনে আমি তিন দিন হাঁটার পর। সিলেটে একদিন ছিলাম। সিলেট টাউনে আমাদের বাড়িটা খালি ছিল। ওটাতেই এক রাত্রি আমরা কাটালাম।

প্রশ্নঃ কোন লোক জানতে পারেনি?

উত্তরঃ না, জানতে পারেনি। সিলেটের কয়েকজন লোক আমাকে দেখেছে, কিন্তু দেখে সন্দেহ করেনি। কারণ আমি কোন পলিটিক্যাল পার্টি বা কোন স্টুডেন্ট অরগানাইজেশনের মেম্বার ছিলাম না। এই জন্য ওরা আমাকে সন্দেহ করেনি। যেদিন পৌছলাম সেদিন রাত্রে আমরা সিলেট টাউনটা রেকি করলাম। এর পরের দিন রাত্রি আনুমানিক একটার সময় সিলেট টাউনের সেন্টারে- সিলেট টাউনে নাইয়ার পুল নামক একটা জায়গায় আছে রামকৃষ্ণ মিশন। রামকৃষ্ণ মিশনের সামনে একটি ট্রান্সফরমার ছিল এবং টেলিফোনের একটি জংশন বক্স ছিল। ওই দুটা আমি সিলেক্ট করি। আমি দেখলাম টাউনের বাইরে করলে খুব একটা এ্যাফেক্ট হবে না, এটা টাউনের হার্ট, এখানে করা উচিত - তখন আমরা ওইখানে-

প্রশ্নঃ আচ্ছা, ওখানে কোন গার্ড ছিল না?

উত্তরঃ ওখানে যখন আমরা প্রথম গেলাম তখন রাস্তায় আমাদের সাথে পুলিশের দেখা হলো। পুলিশ টর্চলাইট মেরে আমাদেরকে দেখে যখন পিছে সরে চলে গেল তখন ওই রাস্তাটা বাদ দিয়ে অন্য রাস্তায় আসলাম। একটি পুকুর ছিল, পুকুরটার সাইডে কচুরিপানার ভিতর দিয়ে আসলাম এবং ওখানে গার্ড ছিল। গার্ডও ওখান থেকে ৫০/৬০ গজ দূরে একটি দোকানের আড়ালে ছিল। ওরা খেয়াল করেনি। তখন হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হলো। বৃষ্টির মধ্যে আমরা আমাদের এক্সপ্লোসিভ বাঁধলাম। আমরা চারজন ছিলাম। দু'জন টেলিফোনে বাঁধলাম আর দু'জন ট্রান্সফরমারে বাঁধলাম। টেলিফোনেরটা আমরা কমপ্লিট করতে পেরেছিলাম, ট্রান্সফরমারটায় করেছিলাম একটু তাড়াহুড়ার ভিতরে, ওটার এয়ার-টাইট হতে পারেনি, এদিকে গাড়ির পেট্রোল আসছিল, সেহেতু ওটা তাড়াতাড়ি আমাদের এক্সপ্লোশান করতে হলো ট্রান্সফরমার যেটা ছিল ওটা এক্সপ্লোশান হয়নি। টেলিফোনটা এক্সপ্লোশান হয়েছিল। আমার টোটাল সময় ছিলাম ৩৬/৩৭ মিনিট। ওটা এক্সপ্লোশান হওয়ার পর সঙ্গে সঙ্গে আমরা উইথড্র করে বেরিয়ে আসি এবং সিলেট টাউনের কুশিয়ারা নদীর পার হয়ে আসি। ওরা আমাদের পারসু করেছিল কিন্তু ধরতে পারেনি। ঐদিন আমরা পুরা দিন হাঁটি। সন্ধ্যার দিক আমরা বর্ডারের কাছে এসে পৌঁছি। সন্ধ্যার দিকে বর্ডারে ফিরে একটি গ্রামে আমরা রাত্রে থাকি। পরের দিন সকালে আমরা রওনা দিই। রওনা দেয়ার সময় আমাদেরকে কিছু লোক ধরে ফেলেছিল। ওখানে কিছু লোক সন্দেহ করে এবং আমাদেরকে একটি ঘরে বন্ধ করা হয়েছিল। বন্ধ করে পাকিস্তান আর্মিকে খবর দেয়া হয়েছিল। আমরা চারজন ছিলাম। আমি ওদেরকে বললাম যে এখন পাকিস্তান আর্মি আসলেও আমরা মারা যাবো আর এভাবেও আমরা মারা যাবো। কিন্তু এখান থেকে বর্ডার মাত্র পাচঁ মাইল, আমরা শেষ চেষ্টা করি। তখন

আমরা একটু হৈ চৈ করলাম। ওদের একটা লোক আসলো। তখন আমি বললাম, দেখ আমাদের কাছে এখন ২৪টা গ্রেনেড আছে। আমরা যদি দু'টা গ্রেনেড মারি তখন তোমাদের এখানে কিছু থাকবে না, বেশী ঝামেলা করো না। এই কথা বলে আমি একটি গ্রেনেড বাইরে থ্রো করলাম, থ্রো করতেই লোকজন সরে গেল। ওই সুযোগেই আমরা বলতে গেলে পাঁচ মাইল দৌড়ে চলে এসেছি।

প্রশ্নঃ ওটাই কি সিলেট শহরে ফার্স্ট এক্সপ্লোশান ?

উত্তরঃ ওটাই সিলেটের ফার্স্ট এক্সপ্লোশান, বলতে গেলে ওটাই লাস্ট এক্সপ্লোশান। এরপর কোন এক্সপ্লোশান সিলেট শহরে হয়নি। তিনদিনের মত লেগেছিল সেক্টর হেডকোয়ার্টারে পৌঁছাতে। তার আগে সিলেট টাউন থেকে লোক পালায়, বর্ডার ক্রস করে। যখন আমরা বর্ডারে পৌছাই করিমগঞ্জে, তখন আমরা পৌছার সঙ্গে সঙ্গে সিভিলিয়ানরা যারা ছিল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বা মুক্তিযোদ্ধারা, ওরা আমাদেরকে বলছিল তোমাদের একসঙ্গে অনেক লোক আসছে, আমরা জানি তোমরা অমুক জায়গায় অপারেশন করছো।। যে জায়গায় আমরা পৌছেছি সে জায়গাটার নামটা বলছিল। তখন 'বাংলাদেশ' নামে একটা পেপার বের হতো। পেপারে দেখলাম খবরটা ফলাও করে প্রচার করা হয়েছে। হেডকোয়ার্টারে পৌছানোর পর আমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করলেন এবং পরে জেনারেল দলও জিজ্ঞাসাবাদ করলেন- কেমনে কি করলাম, কোথায় থাকা হলো।

প্রশ্নঃনেক্সট টাস্ক আপনাকে কবে দেয়া হলো?

উত্তরঃ এরপর আমি টাস্ক করতে পারিনি। কারণ যেদিন পৌছলাম তার একদিন পর কমিশনের ইন্টারভিউর জন্য ডাকলো।

প্রশ্নঃআচ্ছা, তারপর আপনি চলে গেলেন ট্রেনিং-এ -মূর্তিতে। ওখানে কতদিন ট্রেনিং নেন?

উত্তরঃ ওখানে তিন থেকে সাড়ে তিন মাসের মতো ট্রেনিং দেয়া হয়।

প্রশ্নঃকমিশন পাওয়ার পর কোথায় আসলেন?

উত্তরঃ আমি আবার ফোর সেক্টরে চলে আসি। এখানে আসার পর আমাদের আবার এক সপ্তাহের ট্রেনিং-এ ইন্দ্রনগরে পাঠানো হলো, যেখানে আমরা এফ-এফ হিসাবে ট্রেনিং করেছিলাম। ওই জায়গায় আমাদের পাঠানো হলো এবং ওই জায়গায় আমাদের টাস্ক দেওয়া হলো, মহড়া হিসেবে। আমাদের সেক্টর কমাণ্ডার কতটুকু ট্রেনিং নিচ্ছে এবং কার কতটুকু ক্যাপাবিলিটি আছে সেটা জানার জন্য উনি কিছু টাস্ক নেন। ওই টাস্কটা নেওয়ার পর আমরা আবার শিলচর চলে আসলাম। শিলচরে চলে আসার পর আমরা বিভিন্ন যে অফিসার চার-পাঁচজন ছিলাম, আমাদেরকে বিভিন্ন জায়গায় পাঠানো হলো। আমাকে দেয়া হলো কৈলাশ শহর সাব-সেক্টরে সাব-সেক্টর কমাণ্ডার হিসেবে। কারণ আমার আগে যিনি ছিলেন উনি একজন ইণ্ডিয়ান অফিসার ছিলেন। উনার নাম ছিল ক্যাপ্টেন হামিদ।

প্রশ্নঃ ওই সাব-সেক্টরে জয়েন করার পর আপনার প্রথম টাস্ক কি ছিল?

উত্তরঃ এই সাব-সেক্টরে জয়েন করার পর, ওখানে কিছু এলাকা ছিল আমাদের ছেলেরা দখল করে মানে ডিফেন্স লাগায়। আমাকে টাস্ক দেওয়া ওই ডিফেন্সে প্রায়ই এ্যাটাক আসতো পাকিস্তান আর্মির। কারণ আমাদের জায়গাটা ছিল একটা খালের পাড়ে।

প্রশ্নঃ ওটা কি বাংলাদেশের মধ্যেই ?

উত্তরঃ বাংলাদেশের মধ্যেই।

প্রশ্নঃ কৈলাশ শহর জায়গায়টা কি বাংলাদেশের মধ্যেই?

উত্তরঃ না, কৈলাশ শহরটি একটি ইণ্ডিয়ান টাউন। টাউনটার ঠিক বর্ডারটা হলো বাংলাদেশের সাথে। এটা ঠিক শমশেরনগরের অপোজিটে। আর আমাদের ঠিক অপোজিটে পাহাড়ের উপরে ছিল চাতলাপুর বিওপি।

প্রশ্নঃ আচ্ছা, আপনি যখন সাব-সেক্টরে আসলেন তখন সাব সেক্টরের স্ট্রেনথ কত ছিল?

উত্তরঃ তখন আমার কছে ৬টা কোম্পানী ছিল। আমাকে প্রথম টাস্ক দেওয়া হলো ডিফেন্সটা অরগানাইজ করতে। কারণ বার বার ওর উপরে পাকিস্তান আর্মির এ্যাটাক আসছে। একবার ওর আবার নিয়েও গিয়েছিল। তারপর আবার রিক্যাপচার করা হয়েছিল। আমি ডিফেন্সটা রিঅরগানাইজ করলাম। কারণ এটাই আমাদের বলতে গেলে বাংলাদেশের একমাত্র জায়গা ছিল, তখনকার দিনে সিলেট সেক্টরে বাংলাদেশের আর কোন জায়গা ছিল না। আমার সেক্টর কমাণ্ডার পার্সোনেলি আমাকে বলতেন তুমি এই জায়গাটা কোনক্রমেই ছাড়বে না। ওটা আমার দায়িত্ব ছিল। এছাড়া বিভিন্ন অপারেশন করার জন্য মৌলভীবাজারের দিকে আমাকে দায়িত্ব দেওয়া হলো। আমি প্রথম অপারেশন করি ওখান থেকে একটু আগে একটি জায়গা আছে তার নাম হলো মনু ব্রীজ, তার কাছে একটি স্কুল আছে, ঐ স্কুলের ওখানে আমরা পেট্রোলিং বসালাম।

প্রশ্নঃ ওটা কোন মাসে ?

উত্তরঃ ওটা হলো অক্টোবরের লাস্টের দিকে। পেট্রোলিং-এ গেলাম। ট্রেনিং থেকে আসার সময় আমি কিছু এক্সপ্লোসিভ নিয়েছিলাম। আমি আসার সময় ঐ এক্সপ্লোসিভ ও একটা বাংলাদেশের ফ্ল্যাগ নিয়ে গিয়েছিলাম। ফ্ল্যাগ উপরে লাগালাম, নীচে বাঁশের ভিতরে এক্সপ্লোসিভ দিয়ে বাঁশের নীচে রিলিজ সুইচ দিয়ে ওখানে লাগিয়ে আসছিলাম। ভাবলাম সকালে যদি ওরা আসে বাংলাদেশের ফ্ল্যাগ দেখলেই ওরা উঠাতে আসবে। উঠাতে আসলে আমার রিলিজ সুইচটা যদি রিলিজ হয়ে যায় ওখানে একটা এক্সপ্লোশান হবে এবং হয়েছিলও। পরের দিন যখন ওদের পেট্রোল এসে ফ্ল্যাগটা নামাতে গেছে তখন এক্সপ্লোশান হয়। এটা ছিল আমার ফার্স্ট অপারেশন।

এর পরে আমাকে দেয়া হলো একটি জিটারিং অপারেশন। এটা হবে অক্টোবরের ৩০ তারিখ। আমাদের সামনে ওদের যে ডিফেন্সটা ছিল ওদের এই ডিফেন্স থেকে খুব বেশী ফায়ারিং আসতো।

প্রশ্নঃডিফেন্সটা কোথায়?

উত্তরঃ চাতলাপুর বি-ও-পি। ওখান থেকে খুব বেশী ফায়ারিং আসতো, আমাদের কোন মুভমেন্ট হলে ফায়ারিং হতো। ওদেরকে শায়েস্তা করার জন্য আমাকে জিটারিং অপারেশনে পাঠানো হলো। আমার স্ট্রেনথ ছিল প্রায় এক প্লাটুন। এবং আর্টিলারী সাপোর্ট নিয়ে ওটা আমি রেইড করেছিলাম। ওদের দুই নম্বর এবং তিন নম্বর প্লাটুন থেকে যে ফায়ার আসছিল ঐ ফায়ারের জন্য আমরা বেশীক্ষণ টিকতে পারিনি। ১৫ থেকে ২০ মিনিটের ভিতর ঐ জায়গাটা ছেড়ে দিতে হয়েছে। এরপরে আমরা বিভিন্ন পেট্রোলিং ও ছোটখাটো এ্যামবুশ করেছি রাজাকারদের উপরে। শমশেরনগর থেকে মনুর দিকে কুলাউড়ার দিকে যেতে যে রেললাইনটা পড়ে ওর ভিতরে একটা দুইটা এ্যমবুশ করেছি। লাষ্টে আমাকে টাস্ক দেওয়া হয় নভেম্বরের ২৯ তারিখে। শমশেরনগরে এ্যাটাক হবে, সেই এ্যাটাকের জন্য শমশেরনগর এবং মৌলভীবাজরের ভিতরে রাস্তাটা ব্লক করতে হবে। শমশেরনগর স্টেশন থেকে প্রায় চার-পাঁচ মাইল আগে একটা দীঘি আছে রাস্তার উপরে, ওই দীঘির উপরে আমাকে পজিশন নিতে বলা হলো। আমার সাথে ছিল ইণ্ডিয়ান আর্মির একটা কোম্পানী। আমরা ২টা পর্যন্ত ওখানে পজিশন নিলাম। এবং পুরো দিন রোডটা কাট অফ করে রাখলাম। সকালের দিকে আমাদের অপারেশন ভালোই ছিল। সন্ধার দিকে

আমাদের ওপর এতো বেশী আর্টিলারী ফায়ারিং আসছিল যে, আমার লেফটে যে ইণ্ডিয়ান কোম্পানী ছিল সে কোম্পানীটা উইথড্র করে চলে গেল। এবং সে আর্টিলারী শেলিং-এ পড়ে খুব বেশী ক্যাজুয়েলটি হয়েছিল।

প্রশ্নঃ ওটা কোন জায়গায় এ্যাটাক করেছিলেন?

উত্তরঃ ওটা এ্যাটাক না, আমাদেরকে ডিফেন্স নিতে বলা হয়েচিল যাতে রোডটা কাট অফ করে দেওয়া হয়, রোডটা যাতে ওরা ইউস না করতে পারে। মৌলভীবাজার থেকে যাতে কোন রিফোর্সমেন্ট শমশেরনগরের দিকে যেতে না পারে। আমরা ওখানে ছিলাম, সকালের দিকে আমরা অপারেশন করেছিলাম। ওদের একটি গাড়ী রিফোর্সমেন্ট আসছিল। আমাদের শেলিং-এ ঐ গাড়ীটি নষ্ট হয়ে যায় এবং প্রায় ৩০ জনের মতো লোক মারা যায়। এরপরে শমশেরনগর থেকে যে সমস্ত লোক আমাদের দিকে আসতে চেষ্টা করেছিল তাদের উপর ফায়ার ওপেন করলে প্রায় ৬/৭ জন মারা যায়। এরপরও ওরা ঐদিনের মতো স্টপ করে এবং বিকেলের দিকে ওরা আমাদের উপর এতো বেশী আর্টিলারী ফায়ারিং এবং মর্টার ফায়ারিং, হেভি মর্টার ফায়ারিং শুরু করেছিল যে আমার বামদিকে ইণ্ডিয়ান যে কোম্পানীটা ছিল তাদের পক্ষে থাকা সম্ভব হচ্ছিল না। তারা সেখান থেকে উইথড্র করে। কারণ তাদের সেখানে খুব বেশী ক্যাজুয়েলটি হয়েছিল। ঐদিন প্রায় ৩০/৪০ জনের মতো ক্যাজুয়েলটি হয়েছিল। এর মধ্যে দু'জন অফিসারও ছিল।

কৈলাশ শহরে আসার পর পরের দিন ২০ তারিখ সন্ধ্যার দিকে আমাকে পাঠানো হলো মনুতে যাওয়ার জন্য। মনুতে পাকিস্তানী আর্মির একটা ঘাঁটি ছিল। মনু একটি রেলস্টেশন। মনু রিভারের উপর দুটো ব্রীজ আছে। একটা রেলওয়ে ব্রীজ আর একটা রবোর্ডে ব্রীজ। যেটার সাথে শমশেরনগরের লিংক আছে কুলাগড়ের, আর কুলাগড়ের লিংক আছে মৌলভীবাজারের সাথে।

প্রথম দিন গেলাম রাতে, আমরা পৌঁছুলাম ১২টার দিকে। তিনটার দিকে ওদের পজিশন দেখতে গেলাম। পজিশন ঠিক বোঝা যাচ্ছিলা না। দুই পাড়েই পজিশন ছিল।

প্রশ্নঃ ওটা কত তারিখে ?

উত্তরঃ ওটা ডিসেম্বরের প্রথম তারিখে। ডিসেম্বরের ১ তারিখ রাতে আমরা এ্যাটাক করি, আমরা মনু ক্যাপচার করি। আমাকে তারপর বলা হলো, মনু রিভার ফলো করে মৌলভীবাজারের দিকে যেতে এবং যাওয়ার সময় যাতে রাজনগর থানা এলাকা দেখে যাই। আমি ওখান থেকে মনু রিভার ফলো করে করে রাজনগর থানা এলাকায় গেলাম।

প্রশ্নঃ আপনি সমস্ত ট্রুপস নিয়ে চলে গেলেন?

উত্তরঃ সমস্ত ট্রুপস নিয়ে রাজনগর এলাকায় গেলাম। রাজনগর এলাকা আমরা মার্চ করলাম। দেখি ওদিকে কোন ফোর্স নাই। তারপর আমরা ওদিকে মৌলভীবাজার আসলাম, মৌলভীবাজার থেকে আমি ফেঞ্চুগঞ্জ পর্যন্ত আসছিলাম। এর ভিতরে আমার সাথে আর কোন ফোর্সের দেখা হয়নি। ইন দি মিন টাইম সারেণ্ডার হয়ে যায়।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৯। ৫নং সেক্টরে সংঘটিত যুদ্ধ সম্পর্কে বিবরণ	একাত্তুরের রণাঙ্গন'-শামসুল হুদা চৌধুরী	.১৯৭১

সাক্ষাৎকারঃ লেঃ জেনারেল (অবঃ) মীর শওকত আলী *

প্রশ্নঃ একজন সেক্টর কমাণ্ডার হিসেবে আপনি কখন কিভাবে কাজ শুরু করলেন?

উত্তরঃ প্রথমে আমি জেনারেল জিয়া (তৎকালীন মেজর)-এর সাথে এক নম্বর সেক্টরে সেকেণ্ড-ইন কমাণ্ড অর্থাৎ দুই নম্বর হিসেবে কাজ শুরু করি। ৩০শে মার্চ , '৭১-এর পর জেনারেল জিয়া আমার সাথে আর ছিলেন না। তিনি রামগড় হয়ে সীমান্তের ওপারে চলে গিয়েছিলেন। কাজেই ৩০শে মার্চের পর থেকে উল্লিখিত সেক্টরের পুরো বাহিনীর কমাণ্ড আমার হাতে এসে পড়ে। আমি, বিডিআর, ছাত্র-জনতা এবং আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবক দল নিয়ে গঠিত বাহিনী নিয়ে ২রা মে, '৭১ বিকেলে আমরা সীমান্তের ওপারে চলে গিয়েছিলাম। কিছুদিন পর জেনারেল ওসমানী সাহেব আমাকে ডেকে বললেন, 'সিলেট এলাকায় আমাদের কোনও সেক্টর খোলা হয়নি এবং সিলেটের সুনামগঞ্জ, ছাতক এবং সালুটিকর- এইসব এলাকায় অনেক বিডিআর এবং সৈন্য বিশৃংখল অবস্থায় আছেন। কাজেই তিনি আমাকে অবিলম্বে শিলং চলে যেতে বললেন। তিনি নির্দেশ দিলেন ওখান থেকে আমি ছাতক এবং সুনামগঞ্জ এলাকায় গিয়ে যেন যুদ্ধ সংগঠন করি।

প্রশ্নঃ আপনার আনুষ্ঠানিক নিযুক্তি এবং সেক্টর সম্পর্কে ব্যাখ্যা দান করুণ।

উত্তরঃ সরকার গঠিত হওয়ার পর আমাকে পাঁচ নম্বর সেক্টরের কমাণ্ডার নিযুক্ত করা হলো। এলাকা দেয়া হলো ডাউকী থেকে সুনামগঞ্জের বাঁ দিকে বড়ছড়া নামক স্থান পর্যন্ত। এক কথায় বলা যায় ডাউক থেকে ময়মনসিংহের সীমান্ত পর্যন্ত ছিল আমার সেক্টর সীমানা। সিলেট গিয়ে আমি দেখলাম আমাদের লোকজন খুব বিশৃংখল অবস্থায় আছেন। তাদের জন্য ওখানে না ছিল কোনও রসদপত্র, না ছিল কোনও যুদ্ধ সংগঠন।

আমি আমার এলাকটিকে পাঁচটি সাব-সেক্টরে ভাগ করে দিয়েছিলাম। এই সাব-সেক্টরগুলি ছিল ডাউকী, ভোলাগঞ্জ, শেলা, বালাত এবং বড়ছড়া, আমি বুঝলাম যে বিদেশের মাটিতে বসে দেশে যুদ্ধ করা যায় না। কাজেই সবদিকে আক্রমণ চালিয়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে জায়গা করে নেয়াই আমি আমার প্রধান কর্তব্য মনে করলাম। এরই প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সীমান্তের দশ মাইল অভ্যন্তরে আক্রমণ পরিচালনা করলাম এবং আমরা সফল হলাম। এক পর্যায়ে আমরা সুরমা নদীর উত্তর ভাগে পুরা অংশ আমাদের দখলে নিয়ে এলাম। আমরা আমাদের হেডকোয়ার্টার স্থাপন করলাম বাঁশতলায় (ছাতকের উত্তরে বাংলাদেশেরই একটি এলাকা)। সিলেট থেকে নদীপথে যেসব ছোট ছোট বার্জ এবং ছোট ছোট জাহাজ রসদপত্র নিয়ে ঢাকার দিকে যেতো সেগুলিকে আমরা পথে ধরতাম এবং রসদপত্রাদি কেড়ে নিয়ে কিছু আমাদের কাজে লাগাতাম এবং কিছু বাংলাদেশ হেডকোয়ার্টারে পাঠিয়ে দিতাম। সেখান থেকে এসব রসদপত্র অন্য সব সেক্টরে চলে যেতো।

প্রশ্নঃ আপনার এই সংগঠন পর্যায় কোন মাস থেকে শুরু হয়েছিল?

উত্তরঃ হুবহু দিন-তারিখ আমার মনে নেই, তবে যে-জুন কিংবা অনুরূপ সময় হতে পারে।

---

* ১৯৭১ সালের মার্চে মেজর পদে কর্মরত ছিলেন।

প্রশ্নঃ শুরুতে আপনার সৈন্যসংখ্যা কতজন ছিল? তখন নতুনদের প্রশিক্ষণের কি ব্যবস্থা নিয়েছিলেন?

উত্তরঃ প্রথমে ইস্ট বেমঙ্গল রেজিমেন্ট, বিডিআর, পুলিশ এবং মুক্তিযুদ্ধে উৎসাহী কিছু ছাত্র-জনতাসহ প্রায় চারশত লোক পেলাম। বর্ডারের ওপারে এবং বাঁশতলায় আমরা ট্রেনিং ক্যাম্প করলাম। ভারত থেকে দু'একজন জেনারেল এসেছিলেন, তারাও কয়েকটি ট্রেনিং ক্যাম্প সংগঠন করলেন। দেশের অভ্যন্তর থেকে যারা ওখানে গিয়েছিলেন তাদের মধ্য থেকে শক্ত সমর্থদের বেছে নিয়ে ট্রেনিং দেয়া হলো। আস্তে আস্তে বাড়তে বাড়তে এক পর্যায়ে এই সংখ্যা প্রায় বার হাজারে গিয়ে দাঁড়ালা।

প্রশ্নঃ সরকার গঠিত হওয়ার পরের কথা বলুন।

উত্তরঃ সরকার গঠিত হওয়ার পর আমাকে সিলেট পাঠানো হলো ৫নং সেক্টরের কমাণ্ডার হিসেবে। এলাকাটি ছিল দুর্গম। গাড়ী চলাচল করতে সুবিধা হতো। সবটাই ছিল হাওর এবং বিল এলাকা। সুনামগঞ্জ-ছাতক এলাকায় হয় নৌকায় নতুবা পায়ে হেঁটে, সাঁতার কেটে এদিক ওদিক চলাচল করতে হতো। এসব জায়গায় সাংবাদিকও তেমন আসতেন না। সরকারের পক্ষ থেকে ও লোকজন তেমন আসতেন না। একবার একজন কর্মকর্তা এসেছিলেন। তিনি হলেন নূরুল কাদের খান, যুদ্ধকালীন গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংস্থাপন সচিব। তিনি শিলং পর্যন্ত এসেছিলেন এবং ওখানেই তাঁর সাথে আমার দেখা হয়েছিল। জেনারেল ওসমানী সাহেব দু'বার এসেছিলেন এবং আমার সাথে রনাঙ্গন পরিস্থিতি নিয়ে আলাপ-আলোচনা করেছিলেন। তিনি পায়ে হেঁটে আমার এলাকার গুরুত্বপূর্ণ রণাঙ্গনসমুহ পরিদর্শন করেছেন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন আহমদ সাহেবও একবার এসে আমাকে দেখে গিয়েছিলেন। তিনিও পায়ে হেঁটে আমার সেক্টরের বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করেছিলেন।

প্রঃ সেক্টর বলতে কোন পর্যন্ত বুজাচ্ছেন?

উঃ বাংলাদেশর ভিতর বাঁশতলা বলে একটি জায়গা আছে। তাজউদ্দীন সাহেব ওখানে এসেছিলেন।

প্রঃ মুক্তিযোদ্ধাদের আপনি কোথায় এবং কিভাবে পশিক্ষণ দিয়েছিলেন?

উঃ বাংলাদেশের ভিতরে আমাদের অনেকগুলি ক্যাম্প ছিল। সেসব ক্যাম্পে আমাদের সৈন্যরা মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ দিতেন। আবার ভারতের অভ্যন্তরে সীমান্তের কাছাকছি এলাকায়ও কিছু প্রশিক্ষণ ক্যাম্প ছিল। সেসব ক্যাম্পে ভারতীয় সৈন্যরা প্রশিক্ষণ দিতেন।

কাজেই মুক্তিবাহিনীর প্রশিক্ষণের দু'টি উৎস ছিল। একটি ছিল সেটা আমি নিজে সংগঠন করে বাংলাদেশ থেকে এনে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতাম। আর একটি ছিল ভারতীয় সেনাবাহিনীর মাধ্যমে আমাদের সরকার সরাসরি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে মুক্তিযোদ্ধাদের পৃথক পৃথকভাবে আমাদের কাছে পাঠাতেন।

প্রঃ জেনারেল আতাউল গনি ওসমানীকে কমাণ্ডার-ইন-চীফ হিবেবে ঘোষণা করার পর আপনি কিভাবে তার সাথে সম্পর্ক চালিয়ে গিয়েছিলেন?

উঃ আগেই বলেছি জেনারেল ওসমানী সাহেবের সাথে সর্বপ্রথম আমার দেখা হয়েছিল রামগড়ে। তবে এর আগেও অয়ারলেসে দু'একবার তাঁর নির্দেশ আমি পেয়েছি মহলছড়িতে পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায়। তখন আমি বড় রকমের একটি যুদ্ধে লিপ্ত ছিলাম। সে সময় তিনি আমাকে রামগড়ে চলে আসতে বলেছিলেন। আমি তাঁকে জানিয়েছিলামঃ পুরো পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকা আমার দখলে আছে। কাজেই আপনারা কেন পার্বত্য এলাকায় চলে আসছেন না? তিনি পরামর্শ দিলেনঃ এটা ঠিক হবে না। আমরা সবাই মিলে আবার নতুনভাবে সংগঠন করে যুদ্ধ চালিয়ে যাবো। জেনারেল ওসমানী সাহেবের নির্দেশনুযায়ী মহালছড়ির যুদ্ধের পর আমি রামগড়ে চলে

গেলাম। জেনারেল ওসমানী ওপার থেকে রামগড়ে এলেন। সেখানেই বাংলাদেশের মাটিতে তার সাথে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল। জেঃ ওসমানী আমাকে খুব প্রশংসা করলেন এবং বললেনঃ আরো দু'দিন রামগড় আটকে রাখতে হবে।' তারিখটি ছিল ৩০শে এপ্রিল, ১৯৭১। আগেই বলেছি, ২রা মে বিকেলে আমরা ভারতীয় এলাকায় চলে গিয়েছিলাম। রামগড়কে আরো দু'দিন আটকিয়ে রাখতে বলার কারণ ছিল আমাদের মুক্তিবাহিনী যেসব রসদপত্র নিয়ে ছিলেন সেগুলি পার করার জন্য এবং সীমান্তে আটকে পড়া নিরীহ জনগণকে নিরাপদে ভারতে পার করে যাওয়ার জন্য দু'দিন সময়ের প্রয়োজন ছিল।

প্রঃ মুক্তিযুদ্ধে যে আপনারা জয়ী হচ্ছিলেন, এটা কখন বুঝতে পেরেছিলেন?

উঃ অক্টোবর-নভেম্বরের দিকে। একটা সময় খুব খারাপ এসেছিল জুন-জুলাই মাসে। তখন অনেকে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। এমনকি আমাদের এমএনএগণ পর্যন্ত বলতে শুরু করেছিলেনঃ 'ভাই আর কি দেশে ফিরে যাওয়া যাবে?' কিন্তু আমরা হতাশায় ছিলাম না। আমরা সব সময় আশাবাদী ছিলাম। কারণ, এতে জড়িত ছিল বাঁচামরার প্রশ্ন। হয় দেশ উদ্ধার করতে হবে, নইলে দেশ-জাতি সবই গেল। তবে সেপ্টেম্বর-অক্টোবরের দিকে আমরা বুঝতে পেরেছিলাম যে আমরা জয়ের দিকে যাচ্ছি এবং আমরা জিতবই- দু'মাস লাগতে পারে, ছয়মাস লাগতে পারে, আমরা আমাদের নিজেদের শক্তিতে জিতব। এজন্য ভারতীয় সৈন্যের প্রয়োজন হবে না।

প্রঃ পাকিস্তানী বাহিনীর তুলনায় আপনাদের সৈন্যবল তো খুব কম ছিল, অস্ত্রও ছিল খুবই সীমিত। আপনাদের প্রধান রণকৌশল সর্ম্পকে কিছু বলুন।

উঃ রণকৌশল যা সাধারণ হওয়া উচিত, তাই ছিল। শুরুর দিকে যেহেতু আমরা ছোট ছোট দলে গিয়েছিলাম, তাই তখন গেরিলা রণকৌশলকে আমরা প্রধান অবলম্বন হিসাবে বেছে নিয়েছিলাম। কারণ যুদ্ধের নিয়মই হলো যখন কোন বড় শত্রুর সাথে আপনি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে চান, তখন আপনি যদি চিরাচরিত যুদ্ধনীতি ভঙ্গ করে যুদ্ধ করতে হবে, অর্থাৎ গেরিলা যুদ্ধ করতে হবে। এই পদ্ধতিতে আমরা শত্রুদের বড় বড় বাহিনীর ওপর আচমকিতে গুলি চালিয়ে পালিয়ে যেতাম। তাতে শত্রুপক্ষের হতাহতের সংখ্যা অনেক বেশী হতো, অপরপক্ষে আমাদের কিছু হতো না। আমাদের মূল রণকৌশলই ছিল, এই গেরিলা পদ্ধতিতে পাকিস্তান বাহিনীকে রোজ একটু একটু আঘাত করে ওদের শক্তি কমিয়ে দেয়া এবং ওদের অসংগঠিত করে দেয়া, ওদের রসদপত্র নষ্ট করে দেয়া ইত্যাদি। আমরা জানতাম যে একটা সময় আসবে যখন আমরা নিয়মিত বাহিনী গঠন করে ওদের আক্রমণ করে আমাদের দেশ পুনরুদ্ধার করতে পারব।

প্রঃ শত্রুবাহিনী থেকে আপনারা কি পরিমান অস্ত্রশস্ত্র ছিনিয়ে নিয়েছিলেন?

উঃ প্রচুর। শুরুর দিকে আমাদের যা কিছু অস্ত্রশস্ত্র ছিল তাই দিয়ে যুদ্ধ করতাম। পরের দিকে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে আমরা অনেক অস্ত্রশস্ত্র এবং গোলাবারুদ ছিনিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছিলাম। যখন আমরা আকস্মিক আক্রমণ চালাতাম কথন তারা পালিয়ে যেতো। তারা পালিয়ে যাওয়ার পর যা অস্ত্রশস্ত্র পড়ে থাকতো সব আমরা নিয়ে নিতাম।

প্রঃ ৩রা ডিসেম্বর '৭১ পাকিস্তান এবং হিন্দুস্তানের সাথে আনুষ্ঠানিক যুদ্ধ ঘোষণার পর আপনার রণকৌশলের কোনও পরিবর্তন হয়েছিল কি?

উঃ হ্যাঁ। তখন আমরা চিরাচরিত যুদ্ধে (কনভেনশনাল ওয়ার) লিপ্ত হয়ে গেলাম। ৩রা ডিসেম্বরের পর প্রথম আমরা দখল করলাম টেংরা টিলা। তারপর দখল করলাম ছাতক, তারপর সুনামগঞ্জ। তারপর আমরা

সমস্ত বাহিনী সুরমা নদীর এপারে পার করে সোজা সিলেটের দিকে ধাবিত হলাম। আমরা লামাকাজি পর্যন্ত দখল করলাম। তখনই পাকিস্তান বাহিনীর আত্মসমর্পণের কথা ঘোষিত হয়ে গেল।

প্রঃ জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরাকে ইস্টার্ন কমাণ্ডের প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করার পর মুক্তিবাহিনীর প্রদান সেনাপতি জেনারেল ওসমানীর ভূমিকা কি হয়েছিল?

উঃ জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরাকে কমাণ্ডে দেয়ার পর জেনারেল ওসমানীই আমাদের জানালেন যে এখন জেনারেল আরোরার নেতৃত্বে যৌথ কমাণ্ড হচ্ছে। কাজেই আমাদের এলাকায় নিযুক্ত ভারতীয় জেনারেলগণের সাথে ঐ সময় থেকে সংযোগ রক্ষা করে যুদ্ধ করার জন্য তিনি আমাদের পরামর্শ দিলেন।

প্রঃ জেনারেল ওসমানী সাহেব আর কমাণ্ড করতেন না?

উঃ করতেন। তবে সরাসরিভাবে আমাদের এমন কোনও বেতারযন্ত্র ছিল না সব সময় যোগযোগ রক্ষা করে চলার জন্য।

প্রঃ সম্মিলিত মিত্র ও মুক্তিবাহিনী মিলে ৩রা ডিসেম্বর থেকে ১৬ই ডিসেম্বর অর্থাৎ বিজয়ের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত আপনারা কিভাবে যুদ্ধ করলেন এবং কিভাবে ঢাকা প্রবেশ করলেন?

উঃ যুদ্ধনীতির কথা তো ইতিমধ্যেই বল্লাম। ঢাকার এলাকায় প্রবেশকালে কোন কোন এলাকায় মুক্তিবাহিনী ছিলেন। আবার অনেকগুলো জায়গায় ছিল যেখানে ভারতীয় বাহিনী ছিলেন না, শুধু মুক্তিবাহিনীই ছিলেন। আমার সেক্টরের একমাত্র ডাউকি সাব- সেক্টরে ভারতীয় বাহিনীর একটি ব্যাটালিয়ন গিয়েছিলেন। এছাড়া মূল সিলেট এলাকায় ভারতীয় বাহিনী তাদের ব্যাটালিয়ন নিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু সুনামগঞ্জ, টেংরাটিলা, ছাতক এসব এলাকাতে একমাত্র মুক্তিবাহিনীই এককভাবে প্রবেশ নিয়েছিলেন।

প্রঃ ঢাকার দিকে কারা এগিয়েছিলেন ?

উঃ ঢাকার দিকে মেজর হায়দার ছিলেন। যেহেতু আমি সিলেট সেক্টরে ছিলাম কাজেই এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানা নেই।

প্রঃ আপনার বিহিনীতে মোট মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা কত ছিল?

উঃ শেষের দিকে ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ পর্যন্ত বিশ-পঁচিশ হাজার হয়েছিল।

প্রঃ তালিকাভুক্ত মুক্তিযোদ্ধা কতজন ছিল বলে অপনার ধারণা?

উঃ দশ-বার হাজার, বাকী দশ-বারো হাজার ছিল তালিকার বাইরে।

প্রঃ ভারতের মাটিতে আপনি জেনারেল (তৎকালীন মেজর) জিয়াসহ এক সাথে কতদিন যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন?

উঃ প্রায় মাসাধিক কাল। ২রা মে থেকে জুনের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত।

প্রঃ মেজর জিয়া কোথায় গেলেন?

উঃ জেনারেল ওসমানী সাহেব তাকে 'জেড' ফোর্স সংগঠনের ভার দিলেন। জিয়া সাহেব ময়মনসিংহের উত্তরে তুরা নামক স্থানে স্থাপন করেছিলেন তার জেড ফোর্স-এর প্রধান কেন্দ্রস্থল।

প্রঃ এবার রণাঙ্গনের দু'একটি অভিজ্ঞতা সম্পর্কে জানতে চাই। আপনারা ঘুমাতেন কি করে?

উঃ মাটিতে। কখনো গাছতলায়, কখনো বাঁশের খাঁচায়, এমনি মাচাং বানিয়ে ওপরে খড় দিয়ে ঢেকে দিতাম। সাধারণত রাতে ঘুমানো সম্ভব হতো না। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে দু'টি অপারেশন-এর ফাঁকে দিনের বেলায় কিছু সময় ঘুমিয়ে নিতাম। সাধরণতঃ সৈনিকের পোশাকেই ঘুমিয়ে পড়তাম। সৈনিকের পোশাক বলতে একটি খাঁকি হাফপ্যান্ট এবং একজোড়া বুটই আমার পরনে থাকত। এ প্রসঙ্গে আপনাকে একটি ঘটনা বলি। আমি রামগড় থেকে সীমান্ত অতিক্রম করার পর (২রা মে, '৭১ থেকে জুন, ৭১-এর মাঝামাঝি সময়ে) জেনারেল ওসমানী সাহেব ওখানে গিয়েছিলেন আমাদের দেখতে। আমি তখন অপারেশনে ব্যস্ত। আমার পরনে শুধু একটি খাঁকি হাফপ্যান্ট এবং পায়ে একজোড়া বুট ছিল। গায়ে কোন গেঞ্জি পর্যন্ত ছিল না। মাথা থেকে সমস্ত শরীর ছিল ধুলাময়। খবর পেয়ে ঐ অবস্থায়ই জেনারেল সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করেছিলাম। এই একটি মাত্র ঘটনা থেকেই অনুমান করতে পারেন কি অবস্থায় আমরা যুদ্ধ করেছি।

প্রঃ রণাঙ্গনে একনাগাড়ে কত সময় পর্যন্ত না ঘুমিয়ে কাটিয়েছিলেন?

উঃ তিনদিন তিনরাত।

প্রঃ কোথায় ?

উঃ রামগড়ের উল্টা দিকে সাবরুম নামক স্থানে। মে,'৭১ থেকে জুন '৭১-এর মাঝামাঝি সময়ে।

প্রঃ সবচাইতে ভয়াবহ যুদ্ধ আপনি কোথায় করেছেন?

উঃ সবগুলিই ভয়াবহ, সবগুলিই লোমহর্ষক।

প্রঃ আপনি অত্যন্ত কঠিন বিপদের সম্মুখীন হয়েছিলেন এবং আশ্চর্যজনকভাবে বেঁচে গিয়েছেন, এমন দু'একটি ঘটনা জানতে চাই।

উঃ এটা একবার হয়নি। বহুবার হয়েছে। এটা বলে শেষ করা যাবে না। বহুবার পাকিস্তানী সৈন্যরা আমার নাকের ডগা দিয়ে অতিক্রম করে গিয়েছে, ধানক্ষেতে আমি শুয়ে রয়েছি, হামাগুড়ি দিয়ে কিংবা বুকে ভর দিয়ে আমাকে বের হয়ে আসতে হয়েছে। বহুবার ঘেরাওর ভিতর পড়ে গিয়েছিলাম, আবার বের হয়ে গিয়েছি। এই যুদ্ধে একটা বিরাট প্রমাণ, বিরাট বিশ্বাস আল্লাহর ওপর আমার বেড়ে গিয়েছে; আমি দেখলাম যে যার মৃত্যু নেই, সে মরতে পারে না- সে যেমন অবস্থায় থাকুক না কেন বেঁচে আসবে। অনেক সময় দেখা গিয়েছে সম্মুখের লোক মারা যায়নি, অথচ পেছনের লোক বেশী মারা গিয়েছে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১০। ৫নং সেক্টরে সংঘটিত যুদ্ধ সম্পর্কে অন্যান্যের বিবরণ	....	মে-ডিসেম্বর ১৯৭১

সাক্ষাৎকারঃ মেজর তাহেরউদ্দিন আখঞ্জি*

১৯৭১-এর ৯ই অক্টোবরে আমি কমিশন পেলাম। ৯ই অক্টোবরে কমিশন পাওয়ার পরে সেখান থেকে আমাদেরকে পোস্টিং করা হলো বিভিন্ন সেক্টর, সাব-সেক্টর এবং ব্যাটালিয়নে এবং সে অনুসারে আমাকেও পোস্টিং করা হলো ৫ নম্বর সেক্টরে। আমার সাথে ছিলেন মেজর খালেদ, তখন ছিলেন লেফটেন্যান্ট আমরা দু'জন ৫ নম্বর সেক্টরে আসার জন্য আমাদেরকে মুভমেন্ট অর্ডার দেওয়া হলো। আর বলা হলো আমাদের ১১ তারিখ চলে যেতে।

৫নং সেক্টর বলতে ছিল একটি রেস্ট হাউস। ওটার সামনে আমদেরকে নামিয়ে দিয়ে বলা হলো যে, এটা আপনাদের ৫নং সেক্টর। আমরা সেখানে গেলাম। একটা দরজায় নক করলাম। এক ভদ্রলোক দরজা খুলে দিলেন। তার সাথে পরিচয় হলো। তিনি বাংলাদেশের একজন এমপি- নামটা ভুলে গেছি। তিনি সিলেট এলাকার একজন এমপি। ঐ রুমের মধ্যে আরো তিনজন এমপি ছিলেন। তাদের সাথে পরিচয় হলো। আমাদের পরিচয় দেওয়ার পরে তারা আঙ্গুল দিয়ে পাশের রুম দেখিয়ে দিলেন। পাশের রুমে দরজায় নক করার পরে এক ভদ্রমহিলা বের হলো এবং পরিচয় দিলেন যে, উনি মীসেস শওকত। আমরা আমাদের পরিচয় দিলাম। ৫নং সেক্টর কমাণ্ডার তখন অবশ্য ছিলেন না। ছাতকে একটি অপারেশনে গিয়েছেন। মিসেস শওকত আমাদেরকে রিসিভ করলেন। এবং সেখানে আমাদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা হলো। প্রায় ৫ দিন থাকার পরে আমরা রাতের বেলা দেখলাম জেনারেল (তখন লেফটেন্যান্ট কর্নেল) শওকত আসছেন। তার পরনে একটি হাফপ্যান্ট আর জীনসের কালো একটা হাফশার্ট। মুখে বেশ লম্বা দাড়ি হয়ে গেছে। যাই হোক, তার সাথে মিসেস শওকত আমাদেরকে পরিচয় করিয়ে দিলেন। পরের দিন সকালে তিনি একটা গাড়ীতে করে আমাদের দু'জনকে একটা সাবসেক্টরে নিয়ে গেলেন। ঐ সাব-সেক্টরের নাম ছিল শেলা সাব-সেক্টর। শেলা সাব-সেক্টর পর্যন্ত গাড়ী যেতো। সেখানে থেকে আমাদেরকে পদব্রজে তিনি নিয়ে আসলেন ভোলাগঞ্জ সাব-সেক্টরে। আসার পর বললেন, এটা তোমাদের সাব-সেক্টর। এখানে তোমরা দু'জন থাকবে। এই সাব-সেক্টরে দেখলাম প্রায় দেড় হাজারছেলে। এবং এই দেড় হাজার ছেলের তখন কোন কাজ নাই। একটা কোম্পানী ছিল প্রায় ১০০ জন লোকের। আর বাকী সব ছিল এফ-এফ, একজন সিভিল অফিসারের অধীনে, নাম আলমগীর। তিনি সিএণ্ডবি'র একজন ইঞ্জিনিয়ার। তার কাছ থেকে আমাকে চার্জ বুঝে নেয়ার জন্য বলা হলো। নাম্বারে আমি সিনিয়র ছিলাম মেজর খালেদের (তখন লেফটেন্যান্ট) চেয়ে। তাই সাব-সেক্টর কমাণ্ডার হিসেবে চার্জ দেওয়া হয়। আমি আমগীরের কাছ থেকে সাব-সেক্টর কমাণ্ডার হিসাবে চার্জ নিলাম। চার্জ নিয়ে অরগানাইজ করলাম। অরগানাইজ করার পর জেনারেল শওকত আমাদের এই সাব-সেক্টরে তিন দিন ছিলেন। এখানে হলো পাঁচটি কোম্পানী আলফা কোম্পানী, গ্রেকো কোম্পানী, চার্লি কোম্পানী, ডেলটা কোম্পানী, ইকো কোম্পানী। আর একটা কোম্পানী ছিল এল এফ কোম্পানী মোট ছয়টি কোম্পানীর চার্জ নিলাম আমি। অপারেশন এরিয়া সম্বন্ধে জেনারেল শওকত আমাকে ব্রিফ করে দিলেন। অপারেশন এরিয়াটা ছিল বিরাট, যার জন্য উনি একটা সাব জোন ভাগ করলেন। সাব জোন এর মধ্যে তিনি তিনটা কোম্পানী দিয়ে মেজর খালেদকে ইনচার্জ করে তার দায়িত্ব দিলেন। আর বাকী কোম্পানীগুলোর দায়িত্ব আমাকে দিলেন। রেশন, সাপ্লাই ইত্যাদি কাজের জন্য রইলেন আলমগীর আগে যিনি সাব সেক্টর কমাণ্ডার হিসাবে কাজ করতেন। এরপর জেনারেল শওকত চলে

* ১৯৭১ সালের অক্টোবরে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে কমিশনপ্রাপ্ত। সাক্ষাৎকারটি ১০-১-৮০ তারিখে প্রকল্প কর্তৃক গৃহীত।

আসলেন এবং আমরা সপ্তাহখানেক পর্যন্ত ট্রেনিং পরিচালনা করলাম। আর পুরো এলাকাটা যতটুকু সম্ভব 'রেকি' করলাম। আমাদের ক্যাম্পটি ছিল ভোলাগঞ্জ সাব-সেক্টরে। এটা বাংলাদেশের ভেতরেই ছিল ইণ্ডিয়ার বর্ডার থেকে প্রায় ৭ মাইল ভিতরে। ঐ এলাকাটাতে পাকিস্তান আর্মি তখনো আসে নাই।

গৌরী নগর গ্রামে অবস্থান নেওয়ার উদ্দেশ্যে ১৮ই অক্টোবর রাতে দুই কোম্পানী সৈন্য নিয়ে ২৫টি দেশী নৌকাযোগে গৌরীনগরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। আগের দিনই ঐ গ্রাম রেকি করে এসেছিলাম। কিন্তু রেকি করে আসার পরই পাকসেনারা যে ঐ গ্রামে অবস্থান নিয়েছিল, সে খবর জানা ছিল না।

১৮ই অক্টোবর নৌকাযোগে গৌরীনগরের কাছাকাছি হতেই পাকসেনারা বেপরোয়াভাবে গৌরীনগর থেকে আমাদের লক্ষ্য করে গুলি চালাতে থাকে। অকস্মাৎ এই আক্রমণের জন্য আমরা আদৌ প্রস্তুত ছিলাম না। ২৫টি নৌকাভর্তি আমাদের বাহিনী নদীপথে রাতের দিক হারিয়ে ফেললো। এ অবস্থায় অনেক চেষ্টার পর আমি আমার বাহিনী নিয়ে সরে এসে বর্নি নামক স্থানে অবস্থান নিলাম। গৌরী নগর গ্রামে পাকিস্তানীদের প্রচণ্ড গোলার মুখে একজন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ এবং ৬ জন গুরুতররূপে আহত হয়।

বর্নিতে সুবেদার মোশাররফ এবং এফ-এফ মাহবুবের কমাণ্ডে কোম্পানী দু'টি রেখে আমি হেডকোয়ার্টারে ফিরে গেলাম। বর্নিতে অবস্থানরত মুক্তিবাহিনীর উপর আক্রমণের মুখে সুবেদার মোশাররফ এবং এফ-এফ মাহবুব তার বাহিনী নিয়ে টিকে থাকার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন। শেষ পর্যন্ত মুক্তিবাহিনী পিছু সরে ডাকাতের বাড়ি এবং দলিরগাঁও-এ পুনরায় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলে। বর্নির সংঘর্ষে পাকসেনাদের হাতে বন্দী এবং বেশকিছুসংখ্যক যোদ্ধা আহত হয়। মুক্তিবাহিনীর এই বিপর্যয়ে ২২/২৩শে অক্টোবর আমি সেক্টর কমাণ্ডার শওকতের নির্দেশে ২০০ জনের মত মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে ভোর পাঁচটায় বর্নিতে পাক অবস্থানের ওপর আক্রমণ চালাই। বাঁদিক থেকে আমার বাহিনী এবং ডানদিক থেকে সুবেদার মোশাররফের বাহিনী তীব্রভাবে আক্রমণ করে। আমাদের বাহিনী বর্নিতে ঢুকে পড়ে। পাকসেনারা ফ্রন্ট লাইন ছেড়ে পিছনে সরে পাল্টা আক্রমণের প্রস্তুতি নেয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই পাকিস্তানীরা বিপর্যয় অবস্থা কাটিয়ে পাল্টা আক্রমণ করে। তাদের তীব্র আক্রমণের মুখে আমাদের বাহিনী পিছু হটতে শুরু করে। এই সময় আমি সেক্টর কমাণ্ডারের কাছে অয়ারলেসযোগে বার বার সাহায্য প্রার্থনা করি। এই বার্তা পেয়ে সেক্টর কমাণ্ডার শওকত মুক্তিবাহিনীর একটি প্লাটুনকে অস্ত্র, গোলাবারুদ দিয়ে পাঠালেন। এই প্লাটুনটি পৌছানোর ফলে আমাদের মনোবল অনেক বেড়ে যায় এবং পাকিস্তানীদের উপর তীব্রভবে আক্রমণ চালাতে থাকি। বেলা ৪টা পর্যন্ত রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে শেষ পর্যন্ত পাকসেনারা চরম ক্ষতি স্বীকার করে বর্নি ছেড়ে গৌরীনগরে পালিয়ে যায়। আমাদের বাহিনী বর্নিতে দৃঢ় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলে।

এরপর মুক্তিবাহিনী বর্নি থেকে আমার কমাণ্ডে অগ্রসর হয়ে ৩০শে অক্টেবর পাক ঘাঁটি গৌরীনগর আক্রমণ করে। এফ-এফ মাহবুবও তার বাহিনী নিয়ে এলেন। সংঘর্ষে ১৭৫ জন মুক্তিযোদ্ধা অংশ নিলো। সেক্টর কমাণ্ডার মীর শওকত স্বয়ং ১২০ মিলিমিটার মর্টার দ্বারা সাহায্য করলেন। আমাদের বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে পাকবাহিনীর প্লাটুনটি এবং রাজাকার বাহিনীর একটি কোম্পানী পেছনে সরে যেতে বাধ্য হয়। মুক্তিবাহিনী গৌরীনগর পৌছে যায়। গোলাগুলির শব্দে সালুটিকার থেকে পাকিস্তানীদের একটি সাহায্যকারী শক্তিশালী দল চলে আসে এবং আমাদের উপর প্রচণ্ডভাবে পাল্টা আক্রমণে আমাদের গৌরীনগর ছেড়ে দিতে হয়। এই ব্যাপক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে ২ জন আহত হয়। অপরদিকে পাকসেনাদের ১১ জন হতাহত হয় বলে জানা যায়।

নভেম্বরের শেষের দিকে লামনিগাঁও-এর সংঘর্ষে লেঃ হোসেন ৩য় বেঙ্গলের একটি প্লাটুন নিয়ে বেশ বিপদে পড়ে যান। পাকিস্তানীরা লামনিগাঁও-এ লেঃ হোসেনকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলার চেষ্টা করছিল। এই সংবাদ পৌছলে আমি তৎক্ষণাৎ আমার বাহিনী নিয়ে লামনিগাঁও-এর দিকে অগ্রসর হই। পথে পাকিস্তানীরা এ্যামবুশ করে। কিছুক্ষণের সংঘর্ষে পাকিস্তানীদের পক্ষে ২ রাজাকার বন্দী এবং কয়েকজন হতাহত হয় এবং বাকী

সৈন্যরা পালিয়ে যায়। আমি দ্রুত লামনিগাঁও পৌছে পাকিস্তানীদের উপর আক্রমণ করি। এই আক্রমণে পাকিস্তানীরা লামনিগাঁও ছাড়তে বাধ্য হয়। লেঃ হোসেন এবং এলাকায় আমাদের কতৃত্ব বজায় রেখেছিলাম।

এরপর আমার বাহিনী নিয়ে গোরীনগর দখল করে বিমান বন্দরের দিকে অগ্রসর হতে আরম্ভ করি। শেলা সাব-সেক্টর ট্রুপসও ছাতকের উপর আক্রমণ শুরু করে। বালাঠ সাব-সেক্টর বাহিনী সুনামগঞ্জ শহরের উপর চাপ সৃষ্টি করে চলে। বড়ছড়া সাব-সেক্টর বাহিনীও ইতিমধ্যে সাচনা থেকে ধীরাই পর্যন্ত মুক্ত করে ফেলে।

৪ঠা ডিসেম্বর মিত্রবাহিনীর এক ডিভিশন সৈন্য সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়ে করিমগঞ্জ থেকে মৌলভীবাজার হয়ে পূর্বদিক থেকে সিলেটের পথে অগ্রসর হতে থাকে। অপরদিকে উত্তর এবং পশ্চিম দিক থেকে ৫নং সেক্টর ট্রুপস সিলেটের পথে অগ্রসর হতে থাকে। বালাট সাব-সেক্টর ট্রুপস ৬ই ডিসেম্বর সুনামগঞ্জ শহর দখল করে নেয়। ঐ দিন মুক্তিবাহিনী ছাতকের উপরও তীব্রভাবে আক্রমণ চালায়। সেক্টর কমাণ্ডার লেঃ কর্নেল শওকত ৩য় বেঙ্গলের ২টি কোম্পানী এবং শেলা সাব-সেক্টর ট্রুপস নিয়ে ছাতক আক্রমণ করেন। ৭ই ডিসেম্বর ৮টায় ছাতক শহর মুক্ত হয়। পাকসেনারা পালিয়ে গোবিন্দগঞ্জে আশ্রয় নেয়। অন্যদিকে মেজর সাফায়াত জামিল ৩য় বেঙ্গলের ২টি কোম্পানী নিয়ে ডাউকি সাব-সেক্টর ট্রুপস সহ রাধানগর নিয়ন্ত্রণে এনে গোয়াইনঘাট হয়ে সা লুটিকর বিমান বন্দরের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন।

৯ই ডিসেম্বর সেক্টর কমাণ্ডার লেঃ কর্নেল শওকত গোবিন্দগঞ্জ আক্রমণ করলেন। পাকসেনারা গোবিন্দগঞ্জ ছেড়ে নদী পেরিয়ে লামাকাজীতে প্রতিরক্ষাবূহ্য গড়ে তোলে। কর্নেল শওকত মিত্রবাহিনীর জেনারেল গিলের কাছে বিমান সাহায্য চান। ১২ই ডিসেম্বর ভারতীয় ৪টি মিগ বিমান লামাকাজীতে পাক অবস্থানের উপর বোমাবর্ষণ করে। এর কয়েকদিন পরই সিলেটে পাকসেনারা যৌথ কমাণ্ডের কাছে আত্মসমর্পণ করে।

সাক্ষাৎকারঃ মেজর এস এম খালেদ

১০ই অক্টোবর তারিখ থেকে বিভিন্ন সেক্টরে আমাদের ডেসপ্যাচ করা শুরু হয়। আমাকে দেয়া হলো সেক্টর নং পাঁচ-এ। কমাণ্ডার ছিলেন তৎকারীন কর্নেল মীর শওকত আলী- এখন মেজর জেনারেল মীর শওকত আলী বীরোত্তম পিএসসি। অক্টোবরের চৌদ্দ কি পনেরো তারিখ আমি পাঁচ নং সেক্টরে হাজির হলাম। ছাতক আগেই দখল করা হয়েছিল, তৃতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের নেতৃত্বে দুটো ফ্রিডম ফাইটার ও রেগুলার ফাইটার কোম্পানী নিয়ে সম্ভবত। পাকিস্তানী সৈন্য এক ব্রিগেড গিয়ে ঘেরাও করে ফেলায় ছাতক থেকে উইথড্র করতে হয়েছে। ঠিক সেই সময়টায় আমি সাব-সেক্টরে জয়েন করি। আমার সঙ্গে আরও কয়েকজন অফিসার ছিলেন- লেঃ রউফ ও লেঃ মাহবুব। আমরা এই তিনজন একত্রেই সম্ভবত শিলংয়ে গিয়েছিলাম। শিলং থেকে জেনারেল শওকত আমাদের রিসিভ করে নিয়ে গেলেন পাথরঘাটা। সেখানে তৃতীয় ইস্ট বেঙ্গল কোম্পানী তখন একটা অপারেশন করছিল। এরপর আমাকে পাঠিয়ে দেয়া হয় সাব-সেক্টর ভোলাগঞ্জে সেখানে তখন ছিলেন অনারারি লেফটেন্যান্ট এম এ এম আলমগীর। তিনি একজন ইঞ্জিনিয়ার। সাব-সেক্টরের এডমিনিস্ট্রেশন দেখার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল তাকে। আমি আলমগীর সাহেবের কাছ থেকে অপারেশন কমাণ্ড নিয়ে নিলাম। পরবর্তী পর্যায়ে ৩১ তারিখে তাহেরউদ্দিন আখঞ্জি এলেন। সাব-সেক্টরকে তখন দু'ভাগে ভাগ করা হয়-ইস্টার্ন এবং ওয়েস্টার্ন। বাউণ্ডারী রাখা হয়েছিল গৌরীনগর রোডটাকে-সেটার পূর্বদিক আমার নেতৃত্বে ও পশ্চিমদিক তাহেরউদ্দিন আখঞ্জির। তখন পূর্বদিকটায় ডিসকিবাড়ি বলে জায়গায় একটা প্লাটুন ছিল, সেখানে জয়েন করে প্লাটুনটাকে আরো পূর্বে ভেদেরগাঁও-এ নিয়ে গেলাম। ওখানে বসে ছোট ছোট অপারেশনের কাজ করতাম, যেমন রাজাকারদের আক্রমণ করা ও পাকসেনাদের যাতায়াত পথে এ্যামবুশ করা। স্বল্পসংখ্যক সৈন্যের জন্যে আমার অপারেশন ছিল সীমাবদ্ধ।

---

* ১৯৭১ সালের অক্টোবরে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে কমিশনপ্রাপ্ত। সাক্ষাৎকারটি ১৪-১-৮০ তারিখে প্রকল্প কর্তৃক গৃহীত।

নভেম্বরের দিকে আমার স্ট্রেনথ আরো বেড়ে গেলো। চার্লি ও ডেল্টা নামক দুটো কোম্পানী এসে মিলিত হওয়ায় তখন আমি শওকত সাহেবের নির্দেশে চার্লি এবং ডেল্টা কোম্পানী নিয়ে আদারপাড়ে চলে গেলাম। ওদের নেতৃত্বের অভাব ছিল। এলাকায় আমি যাওয়ার আগে কোন প্রতিরোধব্যুহ ছিল না। আমি গিয়ে পাটনিগাঙ পর্যন্ত প্রতিরোধব্যুহ রচনা করলাম। সে সময় আমার সামনে ছিল ২৫ বালুচের একটি কোম্পানী, একটি স্কাউট ও আজাদ কাশ্মীর ট্রুপস।

নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত এ্যামবুশ, রেইড করেছি-পাকিস্তান রাজাকারদের বিভিন্নাবস্থানের উপর, বিভিন্ন পেট্রোল পার্টির উপর। নভেম্বরের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত অপারেশনে ৩৪ জন নিয়মিত পাকসেনা, প্রায় এক কোম্পানী রাজাকার নিহত এবং আহত হয়। আমার পক্ষের দু'জন শহীদ এবং ৮ জন আহত হয়।

খাইরাই স্কুলে শত্রুর হেডকোয়ার্টার ছিল। ৫ই ডিসেম্বর নোয়া পাড়ায় সর্বপ্রথম এনেমি ডিলেইন ফেইস করি। সেখানে শত্রুরা এল-এমজি ফায়ার করে। এল-এমজি ফায়ারের সঙ্গে সঙ্গে আমার ছেলেরা বসে গেল। রেগুলার ট্রেইণ্ড ছেলে ছিল না কেউ, কাজেই এদের বোঝাতে আমার বহু সময় লাগলো যে এটা পাকিস্তান আর্মির ডেলিইন পজিশন। ওরা ভেবেছিল পাকিস্তান আর্মি এসে গেছে। তারপর যখন আমি ডেলিইন পজিশনের ওপর বিশজন ছেলে নিয়ে চার্জ করি, তখন পকিস্তান সেনাবাহিনী উইথড্র করে চলে গেছে। তারপর আমার কথা ওদের কাছে সত্য মনে হলো এবং মনোবল ফিরে এলো। যখন দেখলো আমি চার্জ করে উঠে দাড়িয়েছি এবং কোন কিছু হচ্ছে না তখন তারা বুঝতে পারলো যে পাকিস্তান আর্মি ডিফেন্সে নেই। তারা ব্যাক করছে, পালাচ্ছে।

তারপর ওখানে রিঅরগানাইজ করে এগুতে শুরু করলাম। শেষ পর্যন্ত খাইরাই পৌছে গেলাম। শত্রুর হেডকোয়ার্টারের পাঁচশ গজ দূরে একটা এলাকায় পৌছলাম। এবং ডিগিং শুরু করে সামনের দিকে যখন রেকি করতে শুরু করলাম তখন পাকসেনা সন্ধ্যায় আবছা আঁধারে আমাদের ওপর মর্টার দিয়ে ফায়ার করলো-কিন্তু আমাদের পজিশন ঠিক বুঝতে না পারায় আমাদের ঠিক লাগছিল না। আমার ছেলেরা অত্যন্ত ক্লান্ত ছিল বলে তখন আক্রমণ করে খাইরাই দখল করা সম্ভব ছিলনা। তাই ডিশকিবাড়ি ভেদেরগাঁও এলাকায় আমার একটা কোম্পানী ছিল, রাতে তাদের মুভ করিয়ে দিলাম, ওরা রাতারাতি খাইরাইর পেছনে এসে গেল। তখন রাত সাড়ে চারটা (৬ তারিখ)- খাইরাইর ওপর ফায়ার করলো। এটা ঠিক আক্রমণ নয়, এটা হচ্ছে পলায়নপর সৈনিকদের মনোবল ভেঙ্গে দেবার এক কৌশল।

পাকসেনারা তখন সালুটিকর থেকে আর্টিলারী সাপোর্ট চাইলো, প্রায় পাঁচটার দিকে আর্টিলারী শেল এসে পড়তে শুরু করলো, খাইরাইর আগে এবং চারদিক সার্কেল করে। এই সেলের কভারে পাকিস্তান সেনাবাহিনী উইথড্র করতে শুরু করলো। আমাদের সামনের ও পেছনের গোলাগুলিতে ওদের সর্বমোট পঁচিশজন মারা গিয়েছিল। আমরা কয়েকটা লাশ পেয়েছিলাম। ভোর ছ'টায় আমি খাইরাইর পাকসেনাদের ডিফেন্সে উঠে যাই। আমার আটটা ক্যাজুয়েলিটি হয়-দু'জন সিভিলিয়ানও মারা যায়। পাকসেনাদের ডিফেন্সে প্রায় ছ'হাজার এম্যুনিশন, ছ'টা রাইফেল, ফিল্ড টেলিফোন এবং প্রচুর পরিমাণ মেশিন ও আর কিছু মর্টারের রাউণ্ড পেলাম।

সকাল আটটায় রওনা হলাম। তোয়াকিবাজারে কোম্পানী হেডকোয়ার্টার স্থাপন করে এডভান্স করলাম পাইকরাজ, জাঙ্গাইলের দিকে। পাইকরাজ ও জাঙ্গাইলের মাঝামাঝি জায়গা থেকে শত্রুরা আমাদের ওপর গুলি চালালো। আমরা তৎক্ষণাৎ ওখানে হল্ট করে গেলাম- শত্রুকে সামনাসামনি রেখে জমির নালায় পজিশন নিয়ে গুলি বিনিময় শুরু করলাম বিকেল প্রায় ৪টা পর্যন্ত। সাড়ে চারটার দিকে আমরা চার্জ করে শত্রুর বাঙ্কারে উঠে গেলাম। সেখানে রাজাকারও ছিল। যারা বেঁচে ছিল তাদের ধরা হল এবং ওরা মারা যাবার আগে ওদের খবর পেলাম ওদের তেরোজন ও রাজাকার দশজন মারা গেছে।

সামনে এগোনো শুরু হলো আবার। দশই ডিসেম্বরের মধ্যে পুনাছাগাঁও, বীরকুলি এবং নোয়াগাঁওয়ের শত্রুর অবস্থান মুক্ত করে আঙ্গারজোরে আমার হেডকোয়ার্টার করলাম। বি-এস-এফের মেজর রাও এলেন আমার

সহযোগিতার জন্য। ১১ তারিখ থেকে ১৪ তারিখ পর্যন্ত আঙ্গারগাঁও থেকে সালুটিকর বাজার মুক্ত করলাম। ১৫ তারিখ মেসেজ পেলাম যে, কোন অবস্থাতেই যেন শত্রুর ওপরে যেন ফায়ার না করি, যদি তারা ফায়ার না করে। এটা সম্ভবত সারেণ্ডারের ব্যাপারে করা হয়েছিল। এই মেসেজ নিয়ে মতানৈক্য দেখা দিয়েছিল। পাকিস্তানের অবস্থা তখন শেষ ধাপে। আমাদের সম্মিলিত বাহিনী তখন ঢাকার কাছে বিভিন্ন জায়গায় পৌছে গেছে। পাকিস্তান সেনাবাহিনী তখন নির্জীব, তবুও আমাদের ওপর ফায়ার করছে এবং করলে পাল্টা আমরাও করছি।

সতেরো কি আঠারো ডিসেম্বর। সালুটিকর নদীর অপর পারে পাকসেনা ছিল, তারা খবর দিলো তারা সারেণ্ডার করবে, তাদের ওপর যেন ফায়ার না করা হয়।

সে সময় আমি চলে গিয়েছিলাম পশ্চিম দিকে, যেখানে তাহেরউদ্দিন আখঞ্জি গোবিন্দগঞ্জ পর্যন্ত পৌছে গেছে সিলেট শহরে ঢোকার চেষ্টা চালাতে। সেখান থেকে আমি ওয়াকিটকিতে মেসেজটা পাই এবং গিয়ে হাজির হই। আমাদের সালুটিকর নদীর ও পারে যেতে দেয়া হয়নি সারেণ্ডার অনুষ্ঠানে আমার সঙ্গের ছেলেরা গণ্ডগোল করতে পারে এই আশংকায়। আমিই শুধু গিয়েছিলাম।

আমি সেক্টর হেডকোয়ার্টারে নির্দেশ পেলাম আমার ছেলেরা ভেতরে যাতে ঢুকতে না পারে। কারণ তখন সম্ভবনা ছিল আত্মসমর্পিত পাকসেনাকে পেলে ছেলেরা হয়তো মেরেই ফেলবে। আমি তখন আমার তিনটা কোম্পানীকে আঙ্গারজোরে ক্লোজডোর করে রাখলাম।

তার সাতদিন পর গোটা ট্রুপস নিয়ে আমি সিলেট শহরে ঢুকি।

সাক্ষাৎকারঃ মোঃ রফিকুল আলম

২রা সেপ্টেম্বর শিলং থেকে আমাদেরকে ট্রেনিং সেন্টারে পাঠানো হয়। শিলং থেকে ৮২ কিলোমিটার দূরে খাসিয়া জয়ন্তিকা হিলে পৌছার পর। এরপর আমরা ই-২ সেক্টরের ফরম পূরণ করি। তার পরই শুরু হয় ট্রেনিং। ৯ই সেপ্টেম্বর ট্রেনিং মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য তামাবিল চেকপোষ্টে (সিলেট জেলায়) আমার পোস্টিং হয়। ঐ দিনই আমি তামাবিল পৌছি এবং একটি প্লাটুনের দায়িত্ব গ্রহণ করি।

আমি ছিলাম জুনিয়র কমিশন অফিসার- সেনাবাহিনীর সুবেদার র‍্যাঙ্ক-এর সমতুল্য। তামাবিলে অবস্থানকালেই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ মুজিবনগর সরকার আমাকে একটি বিশেষ দায়িত্ব দেন। কিন্তু সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে লিপ্ত থাকায় তামাবিল সাব-সেক্টর থেকে আমাকে রিলিজ সার্টিফিকেট দেয়া হয়নি। ফলে ঐ সময় আমি স্টাফ ইন্টেলিজেন্স পোস্টে যোগদান করতে পারিনি।

১১ই সেপ্টেম্বর রাতে একদল মুক্তিফৌজ নিয়ে পাকিস্তানী সৈন্যদের অবস্থানের উপর আমরা আক্রমণ চালাই। এই আক্রমণে গুলি বিনিময়ের সময় সাবেক সেনাবাহিনীর সিপাহী অফিসার বুলেটবিদ্ধ হন। পাকিস্তানী সৈন্যদের চারজন নিহত ও ছয়জন রাজাকার আহত হয়। সংঘর্ষের পর স্টেনগান, একটি ৩০৩ রাইফেল ও ঝুড়িভর্তি মাছ উদ্ধার করা হয়।

১৮ই সেপ্টেম্বর জৈন্তাপুর পাকসৈন্যদের অবস্থানের উপর আক্রমণ চালানো হয়। ক্যাপ্টেন ফারুক ও সুবেদার খোরশেদ আলম এই অভিযানে আমাদের সাথে ছিলেন। তীব্র সংঘর্ষের মধ্যে একটি অয়ারলেস সেট ফেলেই আমরা চলে আসি।

---

* সাক্ষাৎকারটি ২২-৭-৭৮ তারিখে প্রকল্প কর্তৃক গৃহীত

১৯শে সেপ্টেম্বর ক্যাপ্টেন ফারুকের নেতৃত্বে রাধানগরে পাকসেনাদের অবস্থানে আক্রমণ চালানো হয়। ২০শে সেপ্টেম্বর পাকসেনাদের উক্ত অবস্থানে এক কোম্পানী মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে আমরা পুনরায় আক্রমণ চালাই।

২৩শে সেপ্টেম্বর আমরা নয়াবস্তি নামক স্থানে ডিফেন্স দেই। ২৫শে সেপ্টেম্বর আমাকে তামাবিল সাব-সেক্টরে ডেকে পাঠানো হয় এবং ব্রেভো কোম্পানীর কমাণ্ডার নিযুক্ত করা হয়। ২৬শে সেপ্টেম্বর আমি কোম্পানীর দায়িত্ব গ্রহণ করি।

১লা অক্টোবর ২০/২২ জন গেরিলা মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে মুবাবস্তি নামক স্থানে পাকিস্তানী সৈন্যদের বাঙ্কার আক্রমণ করি। এই আক্রমণে বেশ কয়েকজন সৈন্য হতাহত হয়। আমাদের পক্ষে আহত হয়েছিল দু'জন। আমাদের অয়ারলেস সেটটি খারাপ হয়ে যাওয়ার ফলে আমরা দ্রুত সরে আসি।

২রা অক্টোবর ভারতীয় মেজর মিত্র সস্ত্রীক আমাদের ক্যাম্পে আসেন (বাউরভাগ ক্যাম্প)। উক্ত ক্যাম্পে অবস্থানকালে আমরা পাঞ্জাবী সৈন্যদের প্রবল চাপের সম্মুখীন হয়েছিলাম। যার ফলে রাতে আমরা কেউ ঘুমাতে পারতাম না। মুক্তারপুর ক্যাম্প থেকে আরও ৭৫ জন মুক্তিযোদ্ধা পাঠিয়ে আমাদের শক্তি বৃদ্ধি করা হয়েছিল। ঐদিনই ভারতীয় বার্মাশেল ও ই-এস এস-ওর কিছু অফিসার এবং পাংতুং থেকে মিস লিণ্ডা নামে একজন লেডী ডাক্তার আমাদের ক্যাম্পে এসে খোঁজখবর নিয়ে যান।

৭ই অক্টোবর ইয়োথ ক্যাম্প থেকে জনৈক মিঃ ঘোষ ক্যাপ্টেন বি, এস রাওয়ের সাথে আমাদের ক্যাম্পে আসেন।

৮ই অক্টোবর পাকিস্তানী সৈন্যরা ৪নং ব্রীজের পাশ থেকে আমাদের উপর প্রবল গুলিবর্ষণ শুরু করে। সারারাত আমরা জেগে থাকি।

১১ই অক্টোবর মাত্র পনেরজন গেরিলা মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে আমি কাপুরা নামক স্থানে পাকসৈন্যদের অবস্থানের উপর আক্রমণ চালাই। এই সংঘর্ষের পর বিএসএফ-এর একজন লেঃ কর্নেল এবং স্টেটসম্যান পত্রিকার একজন সাংবাদিক আমার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন।

১৮ই অক্টোবর আমি লামহাদার পাড়ায় যাই। টুনু মিয়া চেয়ারম্যানের বাড়ি আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। তখন তার বাড়িতে পঁয়ত্রিশজন থেকে চল্লিশজন রাজাকারসহ ৫ জন পাঞ্জাবী অয়ারলেস সেট ও মেশিনগানে সজ্জিত হয়ে পাহারা দিচ্ছিল। যাই হোক পরে টুনু মিয়া চেয়ারম্যানের বাড়ি অপারেশন করা হয়নি।

২০শে অক্টোবর খবর পাই ১০/১২ জন পাঞ্জাবী সৈন্য গোরকচি গ্রামে এসে জনসভা করার পর বেশ কিছুসংখ্যক গ্রামবাসীকে বাঙ্কার খননের জন্য রাধানগর নিয়ে গেছে। ঐদিন আমরা মুক্তিযোদ্ধারা রাজাকার সন্দেহে ৪ ব্যক্তিকে ধরে নিয় এসে, তাদেরকে স্থানীয় লিবারেশন কমিটির চেয়ারম্যান বশির সাহেবের নিকট সোপর্দ করা হয়।

২৫শে অক্টোবর সারিগোয়াইন রাস্তার উপর নির্মিত সেতু (১নং ব্রীজ নামে অভিহিত) উড়িয়ে দেবার জন্য নির্দেশ পাই। এই কাজের জন্য আমাকে এক প্লাটুন গেরিলা যোদ্ধা দেয়া হয়। ইতিপূর্বে সেতুটি উড়িয়ে দেবার জন্য গেরিলা যোদ্ধারা তিনবার চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হয়। ২জন পুলিশ, ২১ জন রাজাকার ও অপর ১৬ জন বেসামরিক ব্যক্তি সেতুটির পাহারায় নিয়োজিত ছিল। পুরা প্লাটুন আমরা তাদের অবস্থানের উপর আক্রমণ চালাই। ৫ জন রাজাকার সংঘর্ষ স্থানেই নিহত হয়। অন্যান্য রক্ষীরা ১টি ৩০৩ রাইফেল, ইউনিফরম, ব্যাজ, বেল্ট ও তাদের কাপড়-চোপড় রেখেই পালিয়ে যায়। আমরা সাফল্যের সাথে সেতুটি উড়িয়ে দিতে সক্ষম হই।

১লা নভেম্বর আমরা পাকিস্তানী সৈন্যদের অবস্থান কাপুরা আক্রমণ করি।

২রা নভেম্বর ঐ একই অবস্থানে আমরা আক্রমণ চালাই। ঐদিন পাকিস্তানী সৈন্যদের অবস্থানে আক্রমণকালে সুবেদার সালাম ও তার পার্টি, এ এস আই হাবিবুর রহমান, ইণ্ডিয়ান বিএসএফ-এর খড়ক বাহাদূর থাপা (হাবিলদার) ও ক্যাপ্টেন ফারুক আমাদের সাথে ছিলেন।

৩রা নভেম্বর বারোপনে নামক গ্রাম অপারেশন করি। সে স্থানে পাক সৈন্যদের সাথে গোলাগুলি বিনিময় হয়। ইণ্ডিয়ান মেজর সৎপতি আমাদের দেখে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে যান।

২০শে নভেম্বর বড়হাট নামক স্থানে সারিগোয়াইন রাস্তার উপর, ২৪শে নভেম্বর আটলু নামক স্থানে সারিগোয়াইন রাস্তার উপর এবং ২৬শে নভেম্বর মুকাম নামক স্থানে সারিগোয়াইন রাস্তার উপর মাইন বসাই। ঐ রাস্তাটি তখন পাকসেনাদের দখলে ছিল। রাস্তাটির বিভিন্ন স্থানে সৈন্য ও রাজাকার পাহারা থাকত। বড়হাট নামক স্থানে বসানো মাইনের বিস্ফোরণে শত্রূসৈন্যের একটি জীপ বিধ্বস্ত হয়। ফলে ২জন নিয়মিত পাকসৈন্য নিহত হয়। মুকাম নামক স্থানে বসানো মাইনের বিস্ফোরণে শত্রূসমর্থিত একজন বেসামরিক ব্যক্তি নিহত এবং অপর দুই ব্যক্তি আহত হয়। পর পর এই ঘটনার পর শত্রূসৈন্যরা রাস্তাটির ব্যবহার বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়।

২৮শে নভেম্বর দুই প্লাটুন গেরিলা মুক্তিযোদ্ধা, ভারতীয় বি এস এফ-এর একটি সেকশনসহ আমি সারিগোয়াইন রাস্তার নিকটবর্তী গুয়াখারা নামক স্থানে শত্রূসৈন্যদের প্রত্যাশায় এ্যামবুশ করি। ২৯শে নভেম্বর ১-৪৫ ঘটিকায় সারিগোয়াইন রাস্তার উপর টুকেরবাজার ব্রীজটি আমরা উড়িয়ে দিই। এই স্থানে প্রহরারত রক্ষীদের সাথে সংঘর্ষে একটি ৩০৩ রাইফেলসহ চারজন রাজাকার আটক করি। কিন্তু ফেরার পথে আমাদের দলটি পাকিস্তানী সৈন্যদের এ্যামবুশ-এর আওতায় পড়ে যায়। পাকিস্তানী সৈন্যদের মধ্যে আজাদ কাশ্মীর রিজার্ভ ফোর্স ছিল। এরা আমাদের দলটির উপর এইচ-এম-জি ও অন্যান্য স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে আক্রমণ চালায়। শত্রূসৈন্যরা চারদিকে ঘিরে ফেলেছিল। এই অবরুদ্ধ এবং পচণ্ড গোলাগুলির মাঝেও অসীম সাহস, উন্নত কৌশল ও উপস্থিত বুদ্ধির জোরে শত্রূবেষ্টনী ভেদ করে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হই। আজাদ কাশ্মীর রিজার্ভ ফোর্সের মোট ১১ জন আমাদের হাতে নিহত এবং ৪ জন রাজাকার আহত হয়। আমাদেরও খুব ক্ষতি হয়। ইণ্ডিয়ান বিএসএফ-এর একজন সুবেদারসহ তিনজন, একজন পুলিশের এএসআই ও কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা মারা যান।

১৬ই ডিসেম্বর যুদ্ধবিরতি ঘোষণার প্রাক্কালে আমরা সালুটিকর বিমান বন্দর (সিলেট) পর্যন্ত পৌছি। ঐদিন দুইজন রাজাকার আমাদের কাছে অস্ত্রসহ আত্মসমর্পণ করে। তারা হলো: (১) মোঃ আলী- খাস মৌজা বারহলি, ৩০৩ রাইফেল মার্ক নং ৩, নং ৪৯৬২। (২) মনোহর আলী- ফুড়পুর, কুপনাখাই, রাইফেল নং পি এফ ১৬১২৮৫ নং ৪,মার্ক-১।

সাক্ষর : মোঃ রফিকুল আলম
২২-৭-৭৮

॥ একটি অপারেশন-এর রিপোর্ট ॥

To
The sub-Sector Commander,
Tamabil M. F. (Dawki)

Sub : **Report on the occurance of 28th Nov. `71 night.**

Sir,

I beg to report that on 25.11.71 at about 15.00 hrs (3.00 p.m) I met with Major B. S Rao and I was ordered to (a) deny Sari-Goain road completely to enemy (b) lay mines (c)

lay ambushes and (d) dig down near the road and not to leave until or unless we were attacked by pak army. Prior to this, I was given a B.S.F section and I was ordered that wherever I will go for task the BSF boys will accompany me. I talked with him regarding my plan for destroying a bridge on Sari-Goain road. Earlier the lace has been receed and it was ascertained that there is no enemy nearby. The nearest enemy position was at Sarighat ($2\frac{1}{4}$ miles on the east from the P. O) Lapnaout ($1\frac{1}{4}$ mile on the west from P.O.) However, on returning tom my base HQ. the place has been recceed again. There worked with us for the last 7/8 month and as such I had confidence on them. Before going to the task I call my commanders including the BSF, SI, and discussed all points and left for the place of occurrence about 1915 hrs(7-15p.m) on 28.11.71.On reaching village 'Guakhoa' we laid and ambush by the side of Sari-Goain road' about 250 yds away on the north. We waited there up to 01:30 hrs dated 29.11.71 but during that period nothing came to our notice. Then I along with all my forces left for destroying one bridge known as Tukoir Bazar Bridge I briefed the commanders properly and the setting of platoons were as follows. B/3 platoon under the command of A. SI. Habibur Rahman was given the task to clear the bridge, D/I platoon under the command of Have. Soab Ali was given the task to the 'Sari-Goain road' facing west (towards Goainghat) and tackle the enemies if any one dared to approach through that side. BSF section was given the task to search the bridge after it was cleared completely. I along with Hav. KB Thapa and Nk. Sharma of BSF went with B/3 platoon. We charged and cleared t he bridge in about 15 minute's time and got one enemy Rifle. Then the bridge was blown up very nicely. It was broken into pieces. It was a pucca bridge measuring 60 X 12 feet approximately.

After that I ordered all of my men to follow me and we headed for collecting D/I platoon. There I found that Hav. Soab Ali arrested 4 Rajakars. They were properly tied and ordered my men including BSF boys to leave hurriedly to reach the R. V. at village Rajbari Kandi. We were then guided by Tunu Mia. We were marching on single file. The guide led us on different route and assured us that the route is safe and shorter. There was no reason to disbelieve him. So we marched on. But when we have crossed about ¾ furlongs from P.O. then we heard some enemy firing from behind. Soon after that we heard shots from front. There was no way out to go back. So we decided to charge the enemy's position. There was exchanges of fire. The BSF boys gave nice performance, but very soon we were gheraoed by the enemies. They were all in ambush. Nk. Sukur Ali of D/I platoon fought courageously and he doing so he caught hold of the barrel of one of the LMG of enemies and faced a brush and lost at least 2 fingers. By this time guide Tunu Mia fled away and then after much difficulty we managed to come out from the enemies ambush position.

Then I came back to my R. V. at village Rajbari Kandi. I counted my men and BSF boys, and found 4 BSF boys and 10 of my boys including 2 guides are missing. I personally went out with a search party and ultimately found one injured BSF boy and two of the MF boys. These two boys were caught by the enemies but some how manage to escape. I learnt from them that the lost men are being killed. I made all possible

attempts to take back the dead bodies. But found it impossible to the reach the P. O. The dead bodies have been removed earlier and the enemies by then made a pucca defence there.

I reported all these facts to Major BS. Rao on 29.11.71 at about 15.00 hrs (3.p.m) the total loss of men was 3 boys of BSF including one S.I of BSF and 6 M.F. boys including one A. S.I. and 2 guides. All of them were supposed to be killed by the enemies.

At least 10/11 regulars were killed and 4 Rajakars and 6 public (enemies) from our shots.

This is for favour of your kind information and necessary action.

Y.O.S
(Md. Rafiqul Alam)
Lieutenant
30.11.71

সাক্ষাৎকারঃ নাজমুল আহসান মহিউদ্দিন আলমগীর*

ভারতের বিহার রাজ্যের চাকুলিয়ায় তিন সপ্তাহের প্রশিক্ষণ হয়। সি-কিউ-বি অস্ত্র পাতি এবং স্মল আর্মস-এর ব্যবহার ও বিস্ফোরোকের ব্যবহার, বিভিন্ন ক্যালিবারের মর্টার ও রকেট লাঞ্চারের ব্যাবহার, বিভিন্ন ফর্মেশান, ম্যাপ রিডিং ও সেনাবাহিনী ফিল্ড সেটআপ ও ম্যানেজমেন্টের উপর প্রমিক্ষণ হয়। ৭ই সেপ্টেম্বর ৫নং সেক্টরে তৎকালীন কমাণ্ডার মীর শওকত আলীর নিকট তিনটি এফ এফ কোম্পানীসহ ভোলাগঞ্জ সাব-সেক্টরের সাব-সেক্টর কমাণ্ডার হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করি এবং ৭১ সালের ডিসেম্বর মাসের আগেই সিঙ্গার খালের উত্তর উপকূল পর্যন্ত মুক্ত করি।

ঘটনাবলীর বিবরণঃ-

(1) বাংলাদেশের মাটিতে ভোলাগঞ্জ রেলওয়ে টারমিনালে হেডকোয়ার্টার স্থানান্তর। কোনরুপ প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়নি, ধল্লা নদীর এই চরটিতে তখন কোন লোকজন ছিল না। তবে টারমিনালটি অত্যন্ত বিধ্বস্তাবস্থায় ছিল। যন্ত্রপাতি, ঘরের দরজা-জানালা এমনকি জায়গায় জায়গায় টিনের চালও ছিল না।

(2) পাড়ুয়ায় বর্ডার আউটপোস্ট দখল, সামান্য প্রতিরোধ ছিল। পাকিস্তানী বাহিনীর লোকজন ৫টি ৩০৩ রাইফেল ফেলে রেখে চলে যায়।

(3) টোকের বাজারে এডভান্স পোস্ট বসাতে কোন প্রতিরোধ পাইনি।

(4) কোম্পানীগঞ্জে এডভান্স পোস্ট বসাতে গিয়ে মাঝারি ধরণের প্রতিরোধ সম্মুখীন হই। প্রথম দিন আমাদের একটি ছেলে শহীদ হয় এবং আমাদের একটি ২ মর্টার ছেড়ে আসতে হয়। পরদিন আমরা চৌকি দখল করতে সক্ষম হই। বিপক্ষের ফেলে যাওয়া অস্ত্রপাতির সঙ্গে আমাদের হারানো ২ মর্টারটি ফেরত পাই। শত্রুপক্ষ দুটি মৃতদেহ ছেড়ে যায়।

---

* গণপূর্ত বিভাগে নির্বাহী প্রকৌশলী থাকাকালে স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগ দেন। সাক্ষাৎকারটি ১৪-৩-৮৩ তারিখে প্রকল্প কর্তৃক গৃহীত।

(৫) পরপর তিনদিন ক্রমাগত আক্রমণ করে তেলিখাল চৌকি দখল করি। কাটাখাল এলাকায় আমাদের কাট-অফ ছিল। তেলিখাল চৌকিতে বিপক্ষের ফেলে যাওয়া দুটি ৩০৩ রাইফেল ও ১টি ২’’ মর্টার হাতে আসে। এই পর্যায়ে পূর্ব কুরাখোলা, কান্দিগাঁও এবং গোরকি আর পশ্চিমে পারকুল ও শিবপুর বেইস স্থাপন করি। পিয়াইন গাংয়ের উত্তর পাড় পর্যন্ত সম্পূর্ণ আমাদের দখলে আসে এবং সদস্য জনাব নুরুল হক টোকের বাজারে জনসভা করেন।

(৬) অপারেশন জ্যাকপটঃ পর পর তিনদিন ক্রমাগত যুদ্ধ করে বিলাজুর ও বার্নি দখল করি। এতে আমার সঙ্গে তিনটি এফএফ কোম্পানী অংশ নেয় ও আমাদের ৩ জন ছেলে শহীদ হয়।

(৭) অপারেশন স্লেজ হ্যামারঃ সেক্টর কমাণ্ডার মীর শওকত আলী শেলা সাব-সেক্টর কমাণ্ডার ক্যাপ্টেন হেলালকে নিয়ে ছাতক আক্রমণ করেন। আমার আর ক্যাপ্টেন নূরনবরি উপর ছাতক গোবিন্দগঞ্জ সড়কে রিইনফোর্সিং কলাম কাট-অফ করার দায়িত্ব ছিল। আমরা সন্ধ্যা ৭ টা পর্যন্ত সফলতার সঙ্গে সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন রাখি এবং আমাদের হাতে বিপক্ষের একজন মেজর নিহত হয়।

(৮) অপারেশন লোনরেঞ্জারঃ নভেম্বরের প্রথম ভাগে সেক্টর কমাণ্ডার নিজে গৌরীনগর চৌকি আক্রমণ করেন। পশ্চিমের ফ্ল্যাঙ্কে একটি এফ এফ কোম্পানীসহ বার্নিতে ছিলাম আমি, পূর্বের ফ্ল্যাঙ্কে তিনটি এফ-এফ কোম্পানীসহ ছিলেন লেফটেন্যান্ট সাইফুদ্দিন খালেদ ও লেফটেন্যান্ট তাহেরউদ্দিন আখঞ্জি। দুইটি কোম্পানীসহ কোম্পানী কমাণ্ডার কাজী আবদুল কাদের ও কোম্পানী কমাণ্ডার ফকরুদ্দিন চৌধুরী কাগাইল ও গৌরীনগরের মাঝামাঝি জায়গায় কাট-অফ লে করেন। সকাল ৪ টায় আক্রমণ শুরু হয়। এই যুদ্ধে আমার সঙ্গের ৫ জন ছেলে শহীদ হয়। আমরা একটি ৮১ মিঃ মিঃ মর্টার ও কিছু গোলাবারুদ ও অস্ত্রপাতি দখল করি।

(৯) এই পর্যায়ে সামান্য প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে আমরা ১০ই ডিসেম্বর নাগাদ সিংগারখালের উত্তর পার বরাবর কুরিরগাঁও, বাদাঘাট, মিতিমহল, নোয়াগাঁও, চালতাবাড়ি প্রভৃতি অঞ্চল মুক্ত করি। (৭ই ডিসেম্বর ভারতীয় বাহিনীর কর্নেল রাজ সিং এই সাব -সেক্টরের মধ্য দিয়ে সিঙ্গারখাল পার হয়ে আরও দক্ষিণে অগ্রসর হন) বিভিন্ন সময়ের বেইস স্থাপন ও চৌকি দখলকালে মোট ৬১ জন রাজাকার আমাদের হাতে বন্দী হয়, যারা পরবর্তী পর্যায়ে সিলেট জেলা কর্তৃপক্ষের হাতে সমর্পিত হয়।

(১০) দেশ স্বাধীন হওয়ার পর আমরা দশটি এফ-এফ কোম্পানী ও ৩টি এম-এফ কোম্পানীসহ সিলেট মাদ্রাসায় ক্যাম্প স্থাপন করি।

আমাদের সঙ্গের ১৭ জন শহীদ সহযোদ্ধাকে টোকেরবাজারে কবর দেওয়া হয়। প্রথম পর্যায়ে আমাদের গোলাবারুদ ও অস্ত্রশস্ত্রের অত্যন্ত অভাব ছিল।

পরে প্রতিপক্ষের চৌকিগুলো দখলের ফলে আমাদের গোলাবারুদের অভাব কিছুটা পূর্ণ হয়। আমাদের সমস্ত রেশন, অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ আসত শেলা হয়ে আসত ভারতের ১০১ কমাণ্ড এরিয়া থেকে। সব সময়ই খাদ্যদ্রব্য, শীতবস্ত্র, ঔষধপত্র ইত্যাদির প্রচণ্ড অভাব ছিল। আমরা যে সমস্ত অস্ত্রপাতি ব্যাবহার করতাম তা হলোঃ ৩০৩ রাইফেল, ৩০৩ এল-এমজি, ৭.৬২ সি সি এস এল আর, ৯ মিঃ মিঃ এস এম সি। পরবর্তীতে পাকিস্তানীদের হাত থেকে চীনা রাইফেল, চীনা স্টেন, ৭২ মিঃ মিঃ মর্টার ও তিনটি ৩০৩ মেশিনগান ও বেশকিছু জি-২ রাইফেল আমাদের হস্তগত হয়।

স্বাক্ষরঃ ন, আ, ম আলমগীর
ই-এস-এস,৪০৭৫
১৪-৩-৮৩

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১১। ৬নং সেক্টরের যুদ্ধ বর্ণনা ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক কথা	বাংলা একাডেমীর দলিলপত্র	জুন-ডিসেম্বর ১৯৭১

সাক্ষাৎকারঃ এয়ার ভাইস মার্শাল এম কে বাশার*
১৫-৫-১৯৭৩

১৪ই মে আমরা কুমিল্লা হয়ে সোনামুড়ার নিকটবর্তী শিবেরবাজারে রাত্রিযাপন করি। স্থানীয় জনসাধারণ আমাদের যথেষ্ট আদর-যত্ন করে এবং তারাই পরের দিন আমাদেরকে সোনামুড়ায় পৌছায়। সোনামুড়া বি-এস-এফ ক্যাম্পে আমরা নিজেদেরকে ব্যাসায়ী বলে পরিচয় দেই। সেখানে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের একজন অফিসার মুক্তিযোদ্ধাদের রিক্রুট করছিলেন। আমরা তার কাছে গিয়ে নিজেদের পরিচয় দেই। আমার সাথে ছিলেন তৎকালীন গ্রুপ ক্যাপ্টেন খোন্দকার, স্কোয়াড্রন লিডার সদরুদ্দীন, ফ্লাইট লেঃ বদরুল আলম, ফ্লাইট লেঃ কাদের, এক্স ফ্লাইট লেঃ রেজা। এখান থেকে আমাদেরকে মুজিবনগরে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে জেনারেল ওসমানী আমাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। আমরা ওনাকে বিমান বাহিনী হ্ঠন করার প্রস্তাব করেছিলাম। কিন্তু সে সময় এটা সম্ভব ছিল না। তারপর আমরা স্থলযুদ্ধে অংশগ্রহণ করার সংকল্প জানালাম। সেখানে আমাকে ৬নং সেক্টর কমাণ্ডারের দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়ে দেয়া হয়।

৬নং সেক্টরে রংপুরে একটা মুক্তিবাহিনী মেজর নওয়াজেশের অধীনে ভূরুঙ্গামারীর কাছে সংঙ্গবদ্ধ হয়েছিল এবং আর একটা বাহিনী দিনাজপুর-ঠাকুরগাঁও হয়ে মেজর নজমুলের অধীনে ভজনপুরে নদীর উপরে একটা পুল উড়িয়ে নদীর উত্তর পারে প্রতিরক্ষাবুহ্য তৈরী করে। দুটো জায়গাই বাংলাদেশের ভিতরে ছিল এবং এখান থেকে কখনো আমরা পিছু হটিনি, বরং এগিয়ে গিয়েছিলাম। মেজর নওয়াজেশের একটা দল সুবেদার বোরহান উদ্দীনের (ই-পি-আর) নেতৃত্বে রংপুরের রুহুমারী এলাকায় প্রতিরক্ষা বুহ্য তৈরি করে এবং এ জায়গা বাংলাদেশের স্বাধীনতাপ্রাপ্তি পর্যন্ত মুক্ত ছিল। এলাকা পরবর্তীকালে ১১নং সেক্টরকে দিয়ে দেয়া হয়।

রংপুরে পাটগ্রাম থানাও মুক্ত এলাকা ছিল। এখানেও মেজর নওয়াজেশের একটা দল প্রতিরক্ষা বুহ্য তৈরি করেছিল। মেজর নওয়াজেশের এবং মেজর নজমুলের দুটো বাহিনী (ই-পি-আর আনসার, মোজাহেদ, পুলিশ, ছাত্র, শ্রমিক, ড্রাইভার) মিলিয়ে ৭০০ জন ছিল। অস্ত্র বলতে ছিল শুধুমাত্র রাইফেল সামান্য ক'টা, এল-এম জি, মর্টার এবং একটা মেশিনগান। গোলাবারুদও খুব কম ছিল।

আমার দুটো সমস্যা ছিল। প্রথমত আমি বাহিনীর অফিসার-ঐ এলাকায় সৈনিক, অফিসার এবং জনগণ আমাকে ঠিকভাবে গ্রহণ করবে কিনা সে প্রশ্ন, এবং দ্বিতীয়তঃ সৈনিকদের সংঘবদ্ধ করা এবং সংগঠিত করা। আমাদের অস্ত্রশস্ত্র গোলাবারুদও কম ছিল। কিভাবে আরও বেশী অস্ত্র সংগ্রহ করতে হবে সেটাও একটা প্রধান সমস্যা ছিল। ভারত থেকে কিভাবে অস্ত্রশস্ত্র-গোলাবারুদ সংগ্রহ করতে হবে সেটাও একটা সমস্যা। রিক্রুটমেন্ট এবং ট্রেনিং সমস্যা ছিল। তাছাড়া হাসপাতালও ছিল না, ঔষধপত্র ও ডাক্তারের অভাব ছিল। রেশন আমরা ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী থেকে পেতাম কিন্তু খাদ্য সরবরাহ নিয়মিত ছিল না। যে সমস্ত মুক্তিযোদ্ধা তাদের পরিবার নিয়ে এসেছিল তাদেরকে রেশন সরবরাহ করা কষ্টকর ছিল। মুক্তিযোদ্ধাদের কোন পোশাক ছিল না। লুঙ্গী এবং গেঞ্জী পরেই তারা যুদ্ধ করছিল। তাদের কোন বিছানাপত্র ছিল না। তাদেরকে খোলা মাঠে থাকতে হত। টাকা-পয়সারও যথেষ্ট অভাব ছিল।

---

* ১৯৭১ সালে উইং কমাণ্ডার হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

এখানে বলে রাখা ভাল যে, যে সমস্ত টাকা-পয়সা কুড়িগ্রাম এবং ঠাকুরগাঁও ব্যাঙ্ক থেকে মুক্তিযোদ্ধারা নিয়ে এসেছিল সে সমস্ত টাকা সীলমোহর করা বাক্সে মুজিবনগরে বাংলাদেশের সরকারের কাছে অর্পণ করা হয়েছিল। সে টাকা কিভাবে খরচ করা হয়েছে তা বলতে পারছি না। তখন পর্যন্ত ভারতীয় সেনাবাহিনী মুক্তিবাহিনীতে শরনার্থী শিবির থেকে নিয়োগ করত এবং ট্রেনিং দিচ্ছিল। শরনার্থী শিবিরগুলোতে অধিকাংশ হিন্দু ছিল। তারা তাদেরকে অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে ট্রেনিং-এর জন্য পাঠাত। এ ব্যাপারে আমাদের কোন কর্তৃত্ব ছিল না। কিন্তু সেক্টর কমাণ্ডারের দায়িত্ব গ্রহণ করার পর আমি এ ব্যাপারে ওদের সাথে আলাপ-আলোচনা করি এবং তাদেরকে বলি যে রিক্রুটমেন্ট আমরা করব। আপনারা আমাদেরকে অস্ত্রশস্ত্র এবং ট্রেনিং এর ব্যাবস্থা করবেন। অপারেশনে পাঠানোর দায়িত্ব আমাদের থাকবে। অনেক বাকবিতণ্ডার পর ভারতীয় সেনাবাহিনীকে সম্মত করানো হয়। সৌভাগ্যবশত ভারতে আমাদের যে ট্রেনিং ক্যাম্প ছিল (মূর্তি টি এস্টেট) সেখানকার কমাণ্ডার লেঃ কর্নেল সেনগুপ্ত ছিলেন একজন বাঙ্গালী হিন্দু। তিনি আমাদেরকে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। ব্রিগেডিয়ার জোসীও আমাদেরকে যথেষ্ট সাহায্য এবং সহানুভূতি দেখিয়েছেন।

সেনগুপ্ত ট্রেনিং-এর চার্জে ছিলেন। সীমান্ত এলাকায়, যারা বাংলাদেশের ভেতর থেকে ট্রেনিং-এর জন্য আসত তাদেরকে প্রথমে হোল্ডিং ক্যাম্পে রাখা হত, তারপর কেন্দ্রীয় একটা ক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে ৩ সপ্তাহের গেরিলা ট্রেনিং দেয়া হতো। পরে এদেরকে আমার কাছে পাঠানো হত বিভিন্ন অপারেশনে পাঠানোর জন্য। এবং আমার মনে হয় সমস্ত সেক্টরে এ নিয়ম অনুসরণ করা হয়েছিল।

তিন সপ্তাহের ট্রেনিং যথেষ্ট ছিল না। তাই ঠিক করা হল গেরিলাদের নিয়মিত বাহিনীর সাথে আরো ১৫ দিন রাখার এবং যুদ্ধের কলাকৌশল সম্পর্কে ট্রেনিং দেয়ার। এ সময়ের মধ্যে আমরা কাকে কোন দলের নেতৃত্ব দেয়া যায় তা ঠিক করতে পারতাম। তারপর বিভিন্ন এলাকার স্থানীয় ছেলেদের বিভিন্ন দলে ভাগ করে ভিতরে পাঠিয়ে দেয়া হত শত্রুর অবস্তানের কাছে গিয়ে রেকি করার জন্য। তারপর তাদেরকে অপারেশন চালানোর নির্দেশ দেয়া হত।

শত্রুর অবস্থানের আশেপাশে আমাদের গেরিলা বেইসগুলো ছিল। আমার সেক্টরে প্রায় ১২০টার মতো গেরিলা বেইস ছিল। প্রত্যেকটি গেরিলা বেইস থেকে কুরিয়াররা প্রতি সপ্তাহে এসে আমাদের কাছে অপারেশন-এর খবর এবং পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিভিন্ন খবরাখবর দিয়ে যেত। কোন কোন সময় নিয়মিত বাহিনী নিয়েও শত্রুর অবস্থানগুলোতে আক্রমণ চালাতে হত। ভারতীয় সেনাবাহিনী থেকে আমরা গোলন্দাজ বাহিনীর সাহায্য নিতাম।

মেজর নওয়াজেশ সাব-সেক্টর কমাণ্ডার (রংপুর) ছিলেন-ভূরুঙ্গামারী থেকে পাটগ্রাম পর্যন্ত। ক্যাপ্টেন দেলোয়ার ছিলেন মোগলহাটে। ক্যাপ্টেন মতিউর ছিলেন বাউরাতে। চিলাহাটিতে ছিলেন ফ্লাইট লেঃ ইকবাল। ক্যাপ্টেন নজরুল ছিলেন হলদীবাড়িতে। সুবেদার মেজর ওসমান গনি (ই-পি-আর), স্কোয়াড্রন লিডার সদরুদ্দীন-ইনডাকশন ট্রেনিং শেষ হবার পর বিভিন্ন অপারেশনে পাঠানো এদের দায়িত্ব ছিল।

দিনাজপুর জেলার ঠাকুরগাঁও মহকুমার অমরখান নামক জায়গায় আমাদের প্রতিরক্ষা বুহ্য ছিল। রংপুর জেলার বড়খাতায় আমাদের প্রতিরক্ষা বুহ্য ছিল। ভূরুঙ্গামারীর নিকটে আমাদের আর একটা প্রতিরক্ষা বুহ্য ছিল। এখানে মেজর নওয়াজেশ ছিলেন। বড়খাতায় ছিলেন ক্যাপ্টেন মতিউর রহমান। অমরখানে ছিলেন ক্যাপ্টেন শাহরিয়ার। আমাদের সেক্টর হেডকোয়ার্টার ছিল পাটগ্রামের কাছে বুড়িমারী নামক জায়গায় (বাংলাদেশের অভ্যন্তরে)। আমাদের নিয়মিত বাহিনী নিতান্ত নগণ্য ছিল, সুতরাং আমাদেরকে হ্যারাসিং ফায়ার, রেইড, এ্যামবুশ, মাইন পুঁতে রাখা এগুলোর উপর জোর দিতে হয়েছিল।

প্রধান আক্রমণ যে সমস্ত জায়গায় চালানো হয়েছিল সেগুলো হলঃ ভূরুঙ্গামারী (রংপুর), মোগলহাট (রংপুর), অমরখান (দিনাজপুর), বড়খাতা (তেঁতুলিয়া), এবং পাটগ্রাম। আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের পরিবারবর্গের থাকার জন্য দুটো ক্যাম্প তৈরি করা হয়েছিল। আমাদের পুরো সেক্টরের জন্য দুজন এমবিবিএস ডাক্তার ছিলেন। তেঁতুলিয়াতে ৫০ বেডের একটা হাসপাতাল স্থাপন করা হয়েছিল। ডাক্তার আতিয়ার রহমান (পঁচাগড় চিনিকলের ডাক্তার) তেঁতুলিয়া হাসপাতালের দায়িত্বে ছিলেন। বুড়িমারীতে ২৫ বেডের একটা হাসপাতাল স্থাপন করা হয়েছিল। ক্যাপ্টেন হোসেন এখানে ছিলেন। দুজন ছাত্র ফ্রন্টে ছিল। আহত মুক্তিযোদ্ধাদের প্রথম এদের কাছে পাঠানো হত। এরা ছোটখাট অস্ত্রোপচার করত এবং প্রাথমিক চিকিৎসার পর হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়া হত। রংপুর কলেজের কয়েকজন ছাত্রী হাসপাতালে নার্সিং ডিউটি করার জন্য তাদের ভলান্টিয়ার করে। মারাত্মকভাবে আহত মুক্তিযোদ্ধাদের বাগডোগরা কম্বাইণ্ড মিলিটারী হাসপাতালে এবং জলপাইগুড়ি বেসামরিক হাসপাতালে পাঠানো হত। ঔষধপত্র যন্ত্রপাতি ভারতীয় সামরিক বাহিনী থেকে পাওয়া গিয়েছিল। বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন সূত্রে যোগাড় করেছিলেন। স্থানীয় ভারতীয়রাও সাহায্য করেছিলেন। জুলাই-আগষ্ট থেকে খাদ্যদ্রব্য, কাপড়চোপড়, ঔষধপত্র, অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ আগের থেকে নিয়মিত ছিল। যদিও পর্যাপ্ত পরিমাণে ছিল না, তবুও মুক্তিযুদ্ধের গতি বৃদ্ধি পেতে থাকল। ট্রেনিং ক্যাম্প থেকেও ট্রেনিং প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধারা নিয়মিতভাবে আসতে থাকল। এই সময় বিভিন্ন সেক্টরে অফিসারদের স্বল্পতা দেখা দিয়েছিল। বাংলাদেশ সরকার মূর্তিতে অফিসারদের ট্রেনিংয়ের জন্য ক্যাম্প স্থাপন করেন। এখানে প্রথম ব্যাচে প্রায় ৬৪ জন অফিসার ট্রেনিংপ্রাপ্ত হন। এখানে পাসিং আউট প্যারেডে সালাম গ্রহণ করেছিলেন তৎকালীন অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট জনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম। অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কর্নেল ওসমানী, প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন আহমদ। এই পাসিং আউট প্যারেড-এর খবর পাকিস্তানে গোয়েন্দা বাহিনীর মাধ্যমে চলে গিয়েছিল।

এই সময় বাংলাদেশের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন আহমদ আমার সেক্টরে পরিদর্শনে গিয়েছিলেন, এবং চারদিন পর্যন্ত বাংলাদেশের অভ্যন্তরে আমাদের বিভিন্ন অবস্থান ঘুরে ঘুরে দেখেন। তিনি তেঁতুলিয়া, ভজনপুর, পাটগ্রামে জনসভায়ও ভাষণ দিয়েছিলেন এবং বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন। জনাব কামরুজ্জামান যখন আমাদের সেক্টর পরিদর্শনে আসেন তখন তিনি তার মন্ত্রণালয় পাটগ্রামে স্থানান্তরিত করার সিধান্ত নিয়েছিলেন। সমস্ত সেক্টরে নিয়মিত বাহিনীর লোকেরা ৭৫ টাকা করে মাসিক পকেট খরচ এবং খাদ্য, কাপড়-চোপড় পেতো। অফিসাররা ২০০ টাকা করে পেতো এবং গেরিলারা পেত ৫০ টাকা করে পকেট খরচ এবং ফ্রি রেশন এবং অথবা দু'টাকা করে প্রত্যহ রেশন মানি।

অমরখানাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর শক্তিশালী ঘাঁটি ছিল- তাদের ফ্রন্টিয়ার ফোর্স এবং মিলিশিয়া বাহিনী মিলে প্রায় দুই কোম্পানী সৈন্য ছিল। জুলাই মাসে টাস্ক ফোর্স দুই কোম্পানী এবং এক কোম্পানী ফ্রিডম ফাইটার নিয়ে শত্রুঘাঁটি আক্রমণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। শত্রুবাহিনীর পেছনে গেরিলাদের অনুপ্রবেশ করানো হয় ক্যাপ্টেন শাহরিয়ারের নেতৃত্বে । দুই কোম্পানী ই-পি-আর সৈনিকদের সাহায্যে প্রধান আক্রমণ চালানো হয়। এই আক্রমণে ভারতীয় গোলন্দাজ বাহিনীরও সাহায্য নেয়া হয়েছিল। যদিও শত্রুঘাঁটি আমরা দখল করতে সক্ষম হয়েছিলাম কিন্তু পাকিস্তান গোলন্দাজ বাহিনীর আক্রমণের ফলে আমাদেরকে ঐ স্থান ত্যাগ করতে হয়।

এই ব্যর্থতা থেকে আমরা কতগুলো শিক্ষা গ্রহণ করেছিলাম। আক্রমণের পূর্বে শত্রুবাহিনীর শক্তি সম্পর্কে জানতে হবে। রেডিও বা অয়ারলেসে যোগাযোগের মাধ্যমে আমাদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে। সৈনিকদেরকেও ভালভাবে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। আর যদি পূর্বাহ্নেই পাকিস্তান গোলন্দাজ বাহিনীর অবস্থান জানতে পারতাম তাহলে ঐ অবস্থানের উপর শেলিং করা যেত।

ক্যাপ্টেন মতিউর রহমানের নেতৃত্বে ই-পি-আর এবং আনসার, মুজাহিদ, ছাত্র নিয়ে বড়খাতায় (রংপুর) জুলাই মাসে অপারেশন চালানো হয়। এখানে ভারতীয় গোলন্দাজ বাহিনীর সাহায্য নেয়া হয়েছিল। অবশ্য এই আক্রমণে আমরা সফলতা অর্জন করতে পারিনি। আমাদের পক্ষে অনেকেই হতাহত হয়। আমাদের সৈন্যদের ভাল প্রশিক্ষণ ছিল না। ভারী অস্ত্রশস্ত্র ছিল না। এই সমস্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে আমাদের সৈন্যদের সুশিক্ষত এবং সুসজ্জিত সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হয়েছে।

প্রাথমিক পর্যায়ে বিভিন্ন অপারেশনে আমাদের ব্যর্থতা আমাদেরকে অনেক শিক্ষা দিয়েছিল। আমাদের নিজেদের দোষত্রূটি শোধরাতে পেরেছিলাম। যার ফলে বিভিন্ন আক্রমণে আমরা সফলতা অর্জন করতে পেরেছিলাম।

অক্টোবর মাস থেকেই আমাদের বিজয় শুরু হয়। অক্টোবর মাসে বড়খাতা, ভুরুঙ্গামারী অমরখানা দখল করতে সমর্থ হই।

মেজর নওয়াজেশের নেতৃত্বে তিন কোম্পানীর সৈন্য ভূরুঙ্গামারীতে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ঘাঁটি আক্রমণ করা হয় (জুলাই-আগষ্ট মাসে)। এর আগে ভূরুঙ্গামারীতে রেইড, এ্যামবুশ ইত্যাদি চালিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। কিন্তু এই আক্রমণে আমরা সফলতা অর্জন করতে পারিনি।

এই তিনটি বৃহৎ আক্রমণের ফলে শত্রুবাহিনী বুঝতে পারে যে মুক্তিযোদ্ধারা যে কোন বড় আক্রমণ করতে পারে। তাই তারা আরও সৈন্য এবং অস্ত্রশস্ত্র আনতে শুরু করে। এ্যামবুশ রেইড এতে আরো বেড়ে যায়। এইসব আক্রমণের ফলে আমরা বুঝতে পারি সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ সংগ্রহ করতে হবে।

অক্টোবরের মাঝামাঝি ভূরুঙ্গামারীর উপর আবার আক্রমণ চালানো হয় মেজর নওয়াজেশের নেতৃত্বে। তিন কোম্পানী সৈন্য দিয়ে এই আক্রমণ চালানো হয়েছিল। ১৮ ঘন্টা প্রচণ্ড যুদ্ধের পর পাকিস্তানী সেনাবাহিনী ভূরুঙ্গামারী ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়। এই আক্রমণে ভারতীয় গোলন্দাজ বাহিনীর সাহায্য নেয়া হয়েছিল। এই যুদ্ধে আমাদের পক্ষে অনেকেই হতাহত হয়। শত্রুবাহিনীকে আমরা পিছু ধাওয়া করি। শত্রুবাহিনীর সাথে আবার যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে লেফটেন্যোন্ট সামাদসহ অনেকেই শহীদ হন। লেফটেন্যোন্ট সামাদের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। জয়মনিরহাটে মসজিদের সামনে তাকে সমাহিত করা হয়। জয়মনিরহাটকে সামাদনগর নামকরণ করা হয়। সামাদের মৃতদেহ উদ্ধার করতে গিয়ে মুক্তিযোদ্ধা দু'ভাই মৃত্যুবরণ করেন। এদেরকেও সামাদের সাথে সমাহিত করা হয়।

ভূরুঙ্গামারীতে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কোম্পানী-হেডকোয়ার্টার ছিল। ঐ বিল্ডিংয়ের এক কক্ষে ১৫ জন যুবতীকে বন্দী অবস্থায় পাওয়া যায়। কাছাকাছি এক স্কুলের বিল্ডিংয়ে নারী, পুরুষ এবং ছেলেমেয়ে প্রায় ২০০ জনকে বন্দী অবস্থায় পাওয়া যায়। পাকিস্তান সেনাবাহিনী তাদের জোর করে খাটিয়ে নিত। অনেককে ভোগের সামগ্রী হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল।

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অনেকের মৃতদেহ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। ভূরুঙ্গামারীর আশেপাশের সমস্ত বাড়িঘর সম্পূর্ণরূপে জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছিল। চাষাবাদ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ ছিল। জনমানবের কোন চিহ্নই পাওয়া যায় নাই। চারিদিকে শুধু ধ্বংসের চিহ্ন। সমস্ত এলাকাকে একটা ভুতুরে বাড়ির মত মনে হচ্ছিল। ভূরুঙ্গামারীতে বাঙ্কারের মধ্যে অনেক যুবতীর লাশ পাওয়া যায়। পাকিস্তান সেনাবাহিনী বাঙ্কারের মধ্যে এসব মেয়েদের উপর পাশবিক অত্যাচার চালিয়েছিল।

এর পরপরই অমরখানা এবং বড়খাতাতে আক্রমণ চালানো হয়। দুই জায়গা থেকেই পাকিস্তান সেনাবাহিনী পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। বড়খাতার পতনের পর পাক সেনাবাহিনীর মনোবল একেবারে ভেঙ্গে যায়। তাদের বিভিন্ন ঘাঁটির দ্রুত পতন ঘটতে থাকে। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মনোবল পুরোপুরি ভেঙ্গে গিয়েছিল। অমরখানা থেকে মুক্তিযোদ্ধারা পঁচাগড়, বোদা দখল করে ঠাকুরগাঁর দিকে অগ্রসর হয়। এ দলটার নেতৃত্ব দেন ক্যাপ্টেন শাহরিয়ার ও স্কোয়াড্রন লিডার সদরুদ্দীন। দলটি হাতিবান্ধা আক্রমণ করছিল। হাতিবান্ধা পতনের পর তারা ক্যাপ্টেন মতিউর রহমানের নেতৃত্বে লালমনিরহাটের দিকে অগ্রসর হয়।

ভূরুঙ্গামারী পতনের পর মেজর নওয়াজেশের এই বাহিনীটি নাগেশ্বরী দখল করে এবং ধরলা নদীর উত্তর পাশে পৌঁছায়।

এ ছাড়াও আরও দুটি গেরিলা বাহিনীর দুটো কলাম ফ্লাইট লেঃ ইকবালের নেতৃত্ব চিলাহাটি দিয়ে ডোমার, ডিমলা এগুলো দখল করে নিলফামারীর দিকে অগ্রসর হয়। মোগণহাট থেকে আর একটি কলাম ক্যাপ্টেন দেলোয়ারের নেতৃত্বে লালমনিরহাটের দিকে অগ্রসর হয়।

রংপুর, সৈয়দপুর সেনানিবাস ছাড়াও ৬নং সেক্টরের সমস্ত এলাকা ১৬ই ডিসেম্বরের আগে মুক্ত হয়।

স্বাঃ খাদেমুল বাশার
১৫-৫-১৯৭৩

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১২। ৬নং সেক্টরের যুদ্ধ সম্পর্কে অন্যান্যের প্রদত্ত বিবরণ ও তথ্যাদি	বাংলা একাডেমীর দলিলপত্র	..... ১৯৭১

সাক্ষাৎকারঃ লেঃ কর্নেল দেলোয়ার হোসেন*
১৬-১০-১৯৭৪

২২মে আগষ্ট আমাকে ৬নং সেক্টরে (রংপুর-দিনাজপুর), ক্যাপ্টেন আজিজ পাশাকে ২নং সেক্টরে এবং ক্যাপ্টেন শাহজাহানকে ৯নং সেক্টরে পোস্টিং দেয়া হয়। ২৩শে আগস্ট রাতে আমি শিলিগুড়ি পৌঁছি এবং প্রথমে ৬নং সেক্টরে কর্তব্যরত ক্যাপ্টেন নজমুল হকের (বর্তমান মেজর) সাথে দেখা করি।

বাংলাদেশের মুক্ত এলাকায় এসে নিজেকে গৌরবান্বিত করি। আমার এত আনন্দ হয়েছিল যা আজ আমি আর প্রকাশ করতে পারব না। শীঘ্রই আমি ৬নং সেক্টরে কর্তব্যরত স্কোয়াড্রন লিডার সদরুদ্দীনের সাথে দেখা করি। এরপর আমি আমাদের সাহায্যে নিয়োজিত ভারতীয় সেনাবাহিনীর অফিসারদের সাথে সাক্ষাৎ করি। আমি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলাম-কবে আমি অর্গবর্তী ঘাঁটিতে যাব এবং শত্রুদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাব। যদিও আমার রংপুর ও দিনাজপুর এলাকা সম্বন্ধে ধারণা খুব কম ছিল, তবুও দেশকে শত্রুমুক্ত করার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে যাবার জন্য প্রস্তুত ছিলাম। এই সময় আমি শত্রুদের বিরুদ্ধে প্রথম অপারেশন শুরু করি। আমি শত্রুদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়ে তাদের ৫ জনকে নিহত ও ১২ জনকে আহত করি । আমার সাথে যারা ছিল তারা সবাই নতুন শিক্ষাপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা। আমাদের ১ জন সামান্য আহত হয়। আমরা হালকা মেশিনগান, এসএমজি, ৩০৩ রাইফেল ও ২ ইঞ্চি মর্টারের সাহায্যে শত্রুদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়েছিলাম। আমাদের ডিফেন্স পজিশন থেকে ৩ ইঞ্চি মর্টারের সাহায্য দেয়া হয়।

অমরখানা সাব-সেক্টর কমাণ্ডার ক্যাপ্টেন শাহরিয়ারের শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করার কথা আমি জীবনে কোনদিন ভুলতে পারব না। তার মত সাহসী যোদ্ধার কথা ইতিহাসে লেখা থাকবে বলে আমি মনে করি। ক্যাপ্টেন শাহরিয়ার শত্রুদের যথেষ্ট ক্ষতিসাধন করেছিল। পাকসেনাদের কাছ থেকে সে ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাকে একটানা কয়েকদিন ও রাত না ঘুমিয়ে থাকতে দেখেছি। ৬নং সেক্টরের অন্যান্য অফিসারদের তার মত এত কৃতিত্বের দাবীদার আর কেউ নয়। আমি ক্যাপ্টেন শাহরিয়ারকে কোন সময়ে বিমর্ষ দেখিনি। দেশপ্রেমিক ও প্রকৃত যোদ্ধার মত তিনি শত্রুদের মোকাবিলা করেছিলেন।

৬নং সেক্টরের উইং কমাণ্ডার মিঃ বাশারের (বর্তমান গ্রুপ ক্যাপ্টেন) সাথে আমার তখনও পরিচয় হয়নি। একদিন তিনি আমাকে তাঁর সাথে দেখা করার জন্য বলে পাঠালেন। আমি তাঁর নির্দেশ মত দেখা করি। একজন এয়ার ফোর্সের অফিসার হওয়া সত্ত্বেও তিনি ৬নং সেক্টরের যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন তা যে কোন দক্ষ পদাতিক অফিসারের সাথে তুলনা করা চলে। তিনি নিপুণতার সাথে ৬নং সেক্টর পরিচালনা করেন। দীর্ঘ ৯ মাস তিনি সুদক্ষভাবে ৬নং সেক্টরে শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়েছেন। ৬নং সেক্টর রংপুর-দিনাজপুর জেলা নিয়ে গঠিত হয়েছিল। অনেক সময় তিনি আমাকে যথাযথ নির্দেশ দিয়ে অপারেশনে বহু সাহায্য করেছেন।

আমাদের সেক্টর ৬-এর সদর দফতর বুড়িমারীতে স্থাপন করা হয়। বাংলাদেশের অন্যান্য সেক্টরগুলির তুলনায় একমাত্র আমাদের সেক্টরেই বহু মুক্ত এলাকা ছিল। আমাদের সেক্টর সদর দপ্তর ও সাব সেক্টর দপ্তর

* ১৯৭১ সালে ক্যাপ্টেন পদে কর্মরত ছিলেন।

বাংলাদেশের অভ্যন্তরেই স্থাপন করা হয়েছিল। ক্যাপ্টেন নওয়াজেশের (বর্তমান মেজর) উপর ন্যস্ত ছিল সাহেবগঞ্জ সাব-সেক্টর। তাঁর নিয়ন্ত্রণে কিছু নিয়মিত ও ই পি আর বাহিনীর সৈন্য ছিল। সাহেবগঞ্জের বিস্তীর্ণ এলাকা ক্যাপ্টেন নওয়াজেশ অনেক আগেই শত্রুদের হাত থেকে মুক্ত করেছিলেন। পাটগ্রাম সাব-সেক্টর পরিচালনার ভার ছিল ক্যাপ্টেন মতিউর রহমানের উপর। তিনি অনেক স্থান শত্রুমুক্ত করে রেখেছিলেন। দিনাজপুরের তেঁতুলিয়া সাব-সেক্টর পরিচালনার ভার ছিল স্কোয়াড্রন লীডার সদরুদ্দীনের (বর্তমান উইং কমাণ্ডার) উপর। এখানেও অনেক এলাকা মুক্ত ছিল।

মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য সেক্টর ৬-এর বিভিন্ন স্থানে ক্যাম্প করা হয়েছিল। ঠাকুরবাড়ি, কোটগাছ, হিমকুমারী শীতলকুচি, গিতলদহ, সোনাহাট প্রভৃতি স্থানে মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্প ছিল। সেই সময়ে সামরিক অফিসারের অভাবে ঠাকুরবাড়ি এবং কোটগাছ ক্যাম্পে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া যাচ্ছিল না। সেক্টর কমাণ্ডার বাশার আমাকে মুক্তিযোদ্ধাদের ঠাকুরবাড়ি এবং কোডগাছ ক্যাম্প পরিচালনার ভার দেন এবং মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং দিতে নির্দেশ দেন। তাঁর নির্দেশমত ঠাকুরবাড়ি ও কোটগাছ ক্যাম্পে মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং দিতে থাকি। শত শত শিক্ষিত ও অশিক্ষত যুবককে সামরিক ট্রেনিং দিতে থাকি। এরা প্রায় সকলেই সামরিক ট্রেনিং-এ অনভিজ্ঞ ছিল। সহযেই বুঝতে পারা যায় যে অনভিজ্ঞ যুবকদের কত কষ্টে সামরিক শিক্ষা দিতে হয়েছে। কিন্তু আমার অধীনে শিক্ষা প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের সামরিক ট্রেনিং ও জ্ঞান অর্জনে যথেষ্ট উৎসাহ ছিল। তারা কোনদিন কোন অসুবিধার কথা আমাকে জানায়নি। তাদের যাকে যা কাজ দেওয়া হত তারা তা ভালভাবেই সম্পন্ন বা কর্তব্য পালন করার চেষ্টা করত। মুক্তিযোদ্ধাদের বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পাঠিয়ে দেয়া হত। সেই জন্য মুক্তিযোদ্ধাদের কোম্পানী, প্লাটুন ও সেকশনে ভাগ করা হয়। মুক্তিযোদ্ধাদের ভিতরে পাঠাবার পূর্বে সেই স্থান ভালভাবে রেকী করা হত এবং আমি নিজেই অনেক স্থান রেকী করে তাদের পাঠিয়েছি।

প্রথমে আমি যেসব এলাকায় মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রবেশ করাই সে এলাকাগুলো হল দিনাজপুর জেলার বালিয়াডাঙ্গি, রুহিয়া, লেহেরী এবং আটাওয়ারী। এসব এলাকায আমিই রেকী পরিচালনা করেছিলাম। রেকী করা কালে অনেক সময় ইপিকাফ, রাজাকার এবং পাকিস্তানী রেঞ্জারদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলাম। এই রকম একটি ঘটনা ঘটে ৫ই সেপ্টেম্বরে। রেকী করার জন্য যাই। আমার সাথে ১২/১৩ জন মুক্তিযোদ্ধা ছিল, আর সঙ্গে ২টা এল এম জি, একটি ২ ইঞ্চি মর্টার, স্টেনগান ও ৩০৩ রাইফেল ছিল। একটি স্কুলে পাকসেনাদের শক্তিশালী প্রতিরক্ষা অবস্থান ছিল। সেখানে পাকসেনাদের ২টা প্লাটুন ছাড়াও ইপিকাফ ও বিহারী রাজাকারও ছিল। আমাদের রেকী করার খবর কিছু দালাল পাকসেনাদের জানায়। আমি সাধারণত গেরিলা যুদ্ধ চালাতাম। শত্রুদের অকস্মাৎ আক্রমণ করে দ্রুত সরে পড়াই আমাদের লক্ষ্য ছিল। শত্রুরা আমাদের উপর আক্রমণ শুরু করে দেয়। তিন ঘন্টা ধরে যুদ্ধ চলার পর আমি আমার দল নিয়ে পালিয়ে আসতে সক্ষম হই। এ যুদ্ধে আমার ২ জন মুক্তিযোদ্ধা আহত হয়। এই ঘটনার পর আমি মুক্তিযোদ্ধাদের বাংলাদেশের ভিতরে অনুপ্রবেশ করানোর জন্য সীমান্তের নিকটবর্তী কয়েক স্থানে বেইস স্থাপন করি। পরে এই স্থানগুলি দিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রবেশ করানো হয়। ৫০০ মুক্তিযোদ্ধাকে প্রতিষ্ঠিত বেইস দিয়ে ঠাকুরগাঁও, রানীসংকৈল, বোদা, পঁচাগড় ইত্যাদি স্থানে পাঠানো হয়। এইভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের ভিতরে অনুপ্রবেশের ব্যবস্থা সম্পন্ন হলে সেক্টর কমাণ্ডার উইং কমাণ্ডার বাশার আমাকে রংপুরের গীতলদহ ও শীতলকুচিতে মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্প পরিচালনার ভার নিতে নির্দেশ দেন। তখন পর্যন্ত এই এলাকার মুক্তিযোদ্ধারা বিশেষ কোন কৃতিত্ব দেখাতে পারেনি। গীতলদহ ক্যাম্পে ২ হাজার এবং শীতলকুচি ক্যাম্পে ৫০০ মুক্তিযোদ্ধা ট্রেনিং নিচ্ছিল। আমার দায়িত্ব ছিল নিম্নরূপঃ

(ক) ট্রেনিং থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের গ্রহণ করা।

(খ) মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্ন অপারেশনে পাঠাবার ব্যবস্থা করা। তাদের এ্যামবুশ, রেইড, আক্রমণ, রেল ও সড়ক সেতু (যেগুলি শত্রুদের যাতায়াতে সাহায্য করত) উড়িয়ে দেয়া ইত্যাদি কাজ সম্পন্ন করার নির্দেশ প্রদান।

(গ) মুক্তিযোদ্ধাদের ঐ এলাকার রাস্তাঘাট ও অন্যান্য বিষয়ে জানানো।

(ঘ) মুক্তিযোদ্ধাদের ঐ এলাকার জনগণের সাথে মিশে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সম্বন্ধে জানানোর ব্যবস্থা করা,

(ঙ) সর্বোপরি পাকসেনাদের অধিকৃত এলাকার ভিতরে মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রবেশের ব্যবস্থা করা।

আমি এই দুইটি গুরুত্বপূর্ণ মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্প পরিচালনার ভার নিয়ে প্রথমে তাদের পরীক্ষা করে দেখি। তাদের বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ব্যাপারে কিছু জানা নাই এবং সামরিক কৌশল সম্বন্ধে ধারণা নাই। সামরিক অফিসারের অভাব থাকার জন্যই তাদের পক্ষে সামরিক কৌশল জানা সম্ভব হয়নি। সেই জন্য ক্যাম্প দুটির মুক্তিযোদ্ধাদের ঠিকমত পরিচালনা করা সম্ভব হয়নি। আমি তাদের সুস্পষ্টভাবে সামরিক কৌশল শিখিয়ে অপারেশনে পাঠানোর জন্য তৈরী করি। তাদেরকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য কোম্পানী, প্লাটুন ও সেকশনে বিভক্ত করি। তাদের সংগঠিত করে পাকসেনাদের উপর দিনে কমপক্ষে পাঁচবার হামলা করতে থাকি। এর ফলে তারা এত ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে যে পাকসেনারা দিনেও বাংকার থেকে বেরিয়ে আসতে সাহস করত না। আমি অনেক অপারেশনে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে যেতাম এবং এইভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবল বাড়িয়ে তুলি। আমার ব্যক্তিগত অংশগ্রহণের ফলে মুক্তিযোদ্ধারা আমার নির্দেশ মেনে চলার চেষ্টা চালায়। আমি মুক্তিযোদ্ধাদের পাকসেনাদের এ্যামবুশ ও রেইড করা এবং রেল ও সড়কসেতু ধ্বংস করে দেয়ার নির্দেশ দেই। তাদেরকে অধিকৃত অঞ্চলে বেইস গড়ে তোলার জন্য নির্দেশ দেই। অনেককে ভেতরে পাঠিয়ে দেই পাকসেনাদের এ্যামবুশ ও রেইড করে পর্যুদস্ত করার জন্য।

যেসব মুক্তিযোদ্ধা নতুন ট্রেনিং নিয়ে আসত, তাদেরকে প্রথমে শত্রুদের বিরুদ্ধে এ্যামবুশ ও রেইড করার নির্দেশ দিতাম। রেল ও সড়কসেতু ধ্বংস করে পাকসেনাদের যাতায়াতে বাধার সৃষ্টি করার জন্য পাঠাতাম। ছোটখাটো অপারেশনের দায়িত্ব দিয়ে তাদেরকে যুদ্ধকৌশলে পারদর্শী করে তোলা হত।

একটি অপারেশনের কথা আমার মনে পড়ছে। লালমনিরহাট থেকে মোগলহাটে অবস্থানরত পাকসেনাদের জন্য প্রতিদিন সকালে ট্রেনে করে রসদ ও সৈন্য আসত। এই সাব সেক্টরের দায়িত্ব ছিল অসমসাহসী যোদ্ধা ক্যাপ্টেন নওয়াজেশের উপর। তিনি আমাকে এই অপারেশন পরিচালনার ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য করেন। তিনি পিছনে অবস্থানরত প্লাটুনের সাহায্যে শত্রুট্রেনের উপর মর্টার চালাবার নির্দেশ দেন। দিনটি ছিল যতদূর সম্ভব ৬ই সেপ্টেম্বর। ভোর ৫টার সময় ৩০ জন মুক্তিযোদ্ধাকে নিয়ে মোগলহাট রেললাইনের নিকট অবস্থান নেই। রেললাইনের উপর এ্যান্টি ট্যাংক মাইন বসানো হয়। গ্যালাটিন ও পি-ই-কে ঠিকমত বসিয়ে দূরে সুইচ লাগিয়ে শত্রুট্রেন আসার অপেক্ষায় অবস্থান নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকি। ঠিক সময়মত ট্রেনটি সামনের কয়েকটি বগীতে বালি এবং অন্যান্য জিনিস ভর্তি করে পিছনের বগীগুলিতে আসে। আমাদের এ্যান্টি-ট্রাঙ্ক মাইনের আঘাতে ইঞ্জিনসহ সামনের কয়েকটি বগী বিধ্বস্ত হয়। পাক-সেনারা সঙ্গে সঙ্গে তাদের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আমাদের গোলাগুলির জবাব দিতে শুরু করে। তারা ট্রেন থেকে নেমে তিনদিক থেকে আমাদের ঘিরে ফেলে। অবস্থা বেগতিক দেখে মুক্তিযোদ্ধাদের আমি পেছনে সরে যেতে নির্দেশ দেই। আমার কাছে ১টা হালকা মেশিনগান ছিল। সেই মারণাস্ত্র দিয়ে আমি শত্রুসেনাদের উপর আক্রমণ চালিয়ে যাই এবং এর মধ্যে মুক্তিযোদ্ধারা নিরাপদে পিছনে সরে যেতে সক্ষম হয়। এই অপারেশনে ২ জন সাহসী মুক্তিযোদ্ধা নিহত ও ৪ জন আহত হয়। আমিও বাঁ হাতে সামান্য আঘাত পাই। শত্রুদের ৫ জন নিহত ও অনেক আহত হয়। এই অপারেশন পরিচালনার জন্য পরবর্তীকালে বাংলাদেশ সরকার আমাকে বীরপ্রতীক উপাধিতে ভূষিত করেন। এই অপারেশনের খবরটি স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে প্রচারিত হয়। এ ছাড়া আমি যেসব অপারেশনে অংশগ্রহণ করি সেগুলো হলঃ মোগলহাট পাক অবস্থানের উপর অকস্মাৎ আক্রমণ, নাগেশ্বরী পাক-কোম্পানী হেডকোয়ার্টার আক্রমণ, কম্বলপুর ব্রীজ অপারেশন, কুলাঘাট শত্রু অবস্থানের উপর হামলা, দোরাকুটি পাক অবস্থানের উপর হামলা, নুমেরী পাক

অবস্থানে আক্রমণ, পাটেশ্বরী শত্রু গোলন্দাজ অবস্থানের উপর হামলা, ভাতমারী শত্রু কোম্পানী অবস্থানের উপর হামলা, কালীগঞ্জ পাক-অবস্তান আক্রমণ, তুষভাণ্ডা শত্রু প্লাটুনের উপর অকস্মাৎ আক্রমণ, হাতিবান্ধা শত্রুকোম্পানীর উপর আক্রমণ ইত্যাদি।

বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সীমান্তবর্তী থানাগুলিতে আক্রমণ চালানোর জন্য আমি কয়েকটা বেইস গড়ে তুলি। ফুলবাড়িতে ঘাঁটি স্থাপন করা হয় । লালমনিরহাট থানার ইমানগঞ্জ হাট ও কর্নারহাট এলাকায় আমাদের ঘাঁটি স্থাপন করা হয়। কালীগঞ্জ থানায় দাইখোয়া ও চালতায় বেইস গড়ে তোলা হয়। এসব স্থান তেকে মুক্তিবাহিনীর ছেলেরা বিভিন্ন পাক অবস্তানের উপর এ্যামবুশ ও রেইড করত। তারা রেল ও সড়কসেতু উড়িয়ে দিয়ে পাকসেনাদের যাতায়াতে বাধার সৃষ্টি করত।

এসব সীমান্ত এলাকায় ঘাঁটি স্থাপন করার পর রংপুর জেলার ভিতরে মুক্তিযোদ্ধাদের কিভাবে অনুপ্রবেশ করানো যায়, সে চিন্তা করতে থাকি। সীমান্তবর্তী এলাকায় অবস্থানরত মুক্তিযোদ্ধারা ইতিমধ্যে পাকসেনাদের উপর আক্রমণ চালিয়ে ক্ষতিসাধন করতে থাকে। পাকসেনারা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে, এমনকি দিনের বেলাতেও পাকসেনারা বাঙ্কার থেকে বেরিয়ে আসতে সাহস করত না। পাক-সেনাদের গতিবিধি অনেক কমে যায়। আমাদের কার্যকলাপ বৃদ্ধি পাবার ফলে পাকসেনারা গ্রামে যাওয়া বন্ধ করে দেয়। এর পূর্বে পাকসেনারা গ্রামে গ্রামে গিয়ে লুটতরাজ, নারীধর্ষণ, বাড়িঘর পুড়িয়ে দেয়া এবং গ্রামবাসীদের উপর অত্যাচার চালাত। আমাদের কার্যকলাপের ফলে গ্রামবাসীরা অনেক স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। তারা আমাদের শত্রুপক্ষের অনেক গোপন তথ্য জানিয়ে সাহায্য করত। আমার পক্ষে সব বেইস এলাকায় থাকা সম্ভব ছিল না। তাই মাঝে-মধ্যে প্রায় সব ক'টি বেইস এলাকায় গিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে শত্রুদের বিরুদ্ধে অনেক অপারেশনে অংশগ্রহন করতাম। এতে মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবল অনেক বেড়ে যায়। আমি ভিতরে অনেক লোককে নিয়োগ করি শত্রুপক্ষের গোপন তথ্যাদি ও গতিবিধি সম্বন্ধে খবর দেবার জন্য। তারা আমাকে ঠিকমত খবরাখবর দিয়ে অপারেশনে সাহায্য করত।

মুক্তিযোদ্ধারা প্রতি রাতেই তাদের অবস্থান বদল করত। এক স্থানে অবস্থান নিয়ে বসে থাকত না। আমি নিম্নলিখিত এলাকায় বেইস তৈরী করি। এগুলো হলঃ লালমনিরহাট থানার কস্তুরীহাট, কাউনিয়া থানার তেপাহাটা, গংগাচরা থানার গংগাচরা, লালমনিরহাট থানার শিবরাম ও পাঁচ গ্রাম কাউনিয়া থানার সারাই ও নাজিরদহ, পীরগাছা থানার জিগাবড়ি ও বাজে মশকুর, কাউনিয়া থানার তেপামধুপুর, মিঠাপুকুর থানার রাজপুকুর, জলঢাকা থানার খৈলমারী ইত্যাদি।

এসব এলাকায় বেইস তৈরী করার পর আমি প্রতি এলাকর জন্য ১০ থেকে ২০ জন মুক্তিযোদ্ধার পার্টি নিয়োগ করি শত্রুদের বিরুদ্ধে অপারেশন চালানোর জন্য। তিনদিন অন্তর তাদের প্রত্যেক পার্টিকে ভাগাভাগি করে অপারেশনের দায়িত্ব দিতাম। সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিকে প্রায় সব কটি বেইস এলাকায় তারা যথাযথ দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হয়। অক্টোবর মাসের শেষদিকে প্রায় প্রতি বেইসে ১৫০ জন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাকে নিয়োগ করতে সক্ষম হই। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে ৭০ মাইল ভিতরেও বেইস তৈরী করতে সক্ষম হই। এক বেইস এলাকার সাথে অন্য বেইস এলাকার যোগাযোগ রাখা হত। এইভাবে তারা এক অন্যের সাহায্য করে এবং আমার সাথে চেইন হিসেবে যোগাযোগ রাখে। প্রতি বেইস এলাকা থেকেই তারা সিচুয়েশন রিপোর্ট পাঠাত। আমি কোম্পানী কমাণ্ডারদের কাছে নির্দেশ পাঠাতাম এবং সপ্তাহ অন্তর কোম্পানী কমাণ্ডাররা তাদের রিপোর্ট পাঠাত। দূরবর্তী কোম্পানী কমাণ্ডারদের এক সপ্তাহের কাজ দিতাম। তাদের প্রতি নির্দেশ ছিল শত্রুদের সামনে থেকে আক্রমণ না করে এ্যামবুশ ও রেইড করে ব্যতিব্যস্ত রাখার জন্য এবং যোগাযোগ ও যাতায়াত বন্ধ করে দেয়ার জন্য, সড়ক ও রেলসেতু ধ্বংস ও উড়িয়ে দেওয়ার জন্য। মুক্তিযোদ্ধাদের উপর আরও নির্দেশ ছিল গ্রামবাসী ও এলাকাবাসীদের সাথে মিশে তাদের সাহায্য নিয়ে অপারেশন করার জন্য। কিন্তু আবার এই সময় রাজকার, আলবদর, আল-শামস, মুসলীম লীগ ও জামায়াতে

ইসলামীর দালালরা ও বিহারীরা আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের কার্যকলাপে বাধা সৃষ্টি করত। কিন্তু আবার অনেক রাজাকার এমনকি শান্তি কমিটির অনেক সদস্য গোপনে শত্রুদের অনেক খবর আমাদেরকে দিত। লালমনিরহাট থানার বাবোবাড়ি ইউনিয়ন শান্তি কমিটির সদস্য আবুল কাসেমের বাড়িতে মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্প প্রতিষ্ঠিত দেখতে পাওয়ায় পাকসেনারা নির্মমভাবে আবুল কাসেমকে হত্যা করে। আবুল কাসেমের স্বাধীনতা সংগামে অবদান কম নয়।

নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে পাকসেনারা কোণঠাসা হয়ে পড়ে। প্রতি রাতেই তাদের উপর হামলা চালান হত। রংপুরের সিনেমা হলে গ্রেনেড বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। ১০ জনের মুক্তিবাহিনীর একটা পার্টিকে এ কাজের জন্য পাঠানো হয়েছিল। লালমনিরহাট, কালীগঞ্জ, ভোতমারী, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম, তিস্তাঘাট, কাউনিয়া, পীরগাছা , গঙ্গাচরা, মিঠাপুকুর ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ পাক অবস্থানে গ্রেনেড বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। এমনকি রংপুর শহরেও আমাদের কার্যকলাপ শুরু হয় যায়। এর মধ্যে আমাদের কার্যকলাপ গ্রাম ছাড়িয়ে শহর ও সামরিক দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে শুরু হয়। পাকসেনারা এরপর আরও কোণঠাসা হয়ে পড়ে। তারা প্রায়ই সবসময় বাঙ্কার আর ছাউনি ছেড়ে বাইরে যেত না। কোন অপারেশনে গেলে তারা রাজাকারদের সামনে এগিয়ে দিত এবং নিজেরা ডিফেন্স পজিশনে থাকত।

ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে আমরা অনেক এলাকা পাকসেনাদের হাত থেকে মুক্ত করে ফেলি। পীরগাছা, মিঠাপুকুর, গঙ্গাচরা ও কাউনিয় থানা এলাকা আমাদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। ২রা ডিসেম্বরে সেক্টর কমাণ্ডার বাশার আমাকে মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে ১টা ব্যাটালিয়ন তৈরী করে লালমনিরহাট ও তিস্তাঘাট হয়ে রংপুরের দিকে অগ্রসর হবার নির্দেশ দেন। তাঁর নির্দেশসহ আমি মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত করে লালমনিরহাটের দিকে অগ্রসর হই। পাটগ্রাম সাব সেক্টরের কমাণ্ডার ক্যাপ্টেন মতিউর রহমান বারখাতা, হাতিবান্ধা কালিগঞ্জ হয়ে লালমনিরহাটের দিকে এগিয়ে আসেন। অন্যদিকে সাহেবগঞ্জ সাব-সেক্টরের কমাণ্ডার ক্যাপ্টেন নওয়াজেশ ভূরুঙ্গামারী, নাগেশ্বরী, পাটেশ্বরী, কুড়িগ্রাম হয়ে রংপুরের দিকে অগ্রসর হন। নীলফামারী মুক্ত করে আমরা তিস্তা ঘাটে একত্রিত হয়ে রংপুর শহরের দিকে অগ্রসর হই। ১৫ই ডিসেম্বর অনেক বাধাবিপত্তির পর রংপুর শহরে পৌছাতে সক্ষম হই। আমরা তাদের উপর ক্রমাগত চাপ দিয়ে শহর থেকে সরে ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় যেতে বাধ্য করি। ১৬ই ডিসেম্বর পাকসেনারা মিত্রবাহনী ও আমাদের কাছে আত্মসমর্পণ করে।

পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ মহকুমার ১০০ জন মুক্তিযোদ্ধা আমার কাছে প্রশিক্ষণ নিয়ে অভ্যন্তরে চলে যায়। এসব মুক্তিযোদ্ধারা অসমসাহসী ছিল। তারা পাকসেনাদের বারবার আচমকা আক্রমণ চালিয়ে নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছিল। আগস্টের শেয়ে প্রাক্তন এমসি-এ কে, বি, এম, আবু হেনা এদেরকে নিয়ে সিরাজগঞ্জে চলে যান। জনাব হেনা স্বাধীনতা সংগ্রামে নিজেকে আত্মোৎসর্গ করেছিলেন। তার মত সাহসী এম সি এ ও মুক্তিযোদ্ধা আমি খুব কমই দেখেছি। দেশকে মুক্ত করার জন্যে তিনি নিজের জীবন বিসর্জন দিতে পর্যন্ত প্রস্তুত ছিলেন। সিরাজগঞ্জের ১০০ জন মুক্তিযোদ্ধার মধ্যে আবু হেনাকে কোম্পানী কমাণ্ডার, মিঃ সাইদুর রহমানকে সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড, মিঃ আমির হোসেন, বেলায়েত হোসেন ও বজলুর রহমানকে প্লাটুন কমাণ্ডার করে আবু হেনার নেতৃত্বাধীনে সিরাজগঞ্জ এলাকায় পাঠিয়ে দেই।

মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ন্ত্রণ ও সুশৃংখলা বজায় রাখার জন্য তাদের মধ্য থেকে কোম্পানী কমাণ্ডার, প্লাটুন কমাণ্ডার ও সেকশন কমাণ্ডার নিয়োগ করি। মুক্তিবাহিনীকে কোম্পানী, প্লাটুন ও সেকশনে ভাগ করি শত্রুদের উপর সুষ্ঠুভাবে আক্রমণ পরিচালনার জন্য। আমার কয়েকজন সাহসী শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান মুক্তিযোদ্ধার নাম নিম্নে প্রদান করছিঃ

১। বদরুজ্জামান, কোম্পানী কমাণ্ডার; ২। সিরাজুল ইসলাম, কোম্পানী সেকেণ্ড-ইন কমাণ্ড; ৩। মজাহার আলী, প্লাটুন কমাণ্ডার সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড, ৪। একরামুল হক, প্লাটুন সেকেণ্ড-ইন কমাণ্ড; ৫। নূরুল আলম

খোকন, প্লাটুন কমাণ্ডার; ৬। শহীদুর রহমান প্লাটুন সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড; ৭। ওয়াদুর রহমান, প্লাটুন কমাণ্ডার; ৮। আব্দুল করিম, প্লাটুন সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড, ৯। মোঃ তাজিব উদ্দিন, কোম্পানী কমাণ্ডার; ১০। গোলজার হোসেন, কোম্পানী সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড; ১১। ইমান-আলী, প্লাটুন কমাণ্ডার; ১২। রবিউল আলম, প্লাটুন সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড, ১৩। শফিকুল ইসলাম, প্লাটুন কমাণ্ডার; ১৪। আব্দুস সালাম, প্লাটুন সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড; ১৫। মোজাফফর হোসেন, প্লাটুন কমাণ্ডার; ১৬। খোরশেদ আলম, প্লাটুন সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড; ১৭। মাহতাব আলী সরকার, কোম্পানী কমাণ্ডার; ১৮। নুরুল আজিজ, কোম্পানী সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড; ১৯। শামসুল আলম, প্লাটুন কমাণ্ডার; ২০। আবুদর রশিদ, প্লাটুন সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড; ২১। আশরাফ আলী, প্লাটুন কমাণ্ডার; ২২। জমির আলী আহমেদ, সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড; ২৩। ওয়ারেশ আলী, প্লাটুন কমাণ্ডার; ২৪। আতিয়ার রহমান, সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড; ২৫। আবদুর রউফ, কোম্পানী কমাণ্ডার; ২৬। মোঃ ইলিয়াস, কোম্পানী সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড; ২৭। জয়দেব রায়, প্লাটুন কমাণ্ডার; ২৮। দীনেশ রায়, প্লাটুন সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড; ২৯। নুরুদ্দিন, প্লাটুন কমাণ্ডার; ৩০। যোগেশ সরকার, প্লাটুন সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড; ৩১। মজিবর রহমান, প্লাটুন কমাণ্ডার; ৩২। মোঃ আজাদ, প্লাটুন সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড; ৩৩। সিরাজুল হক, কোম্পানী কমাণ্ডার; ৩৪। লুৎফর রহমান, কোম্পানী সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড; ৩৫। কলিমমুদ্দিন, প্লাটুন কমাণ্ডার, ৩৬। ওসমান গনি, প্লাটুন সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড; ৩৭। মোস্তাফিজুর রহমান, প্লাটুন কমাণ্ডার; ৩৮। খাইরুজ্জামান, প্লাটুন সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড; ৩৯। ফরিদ হোসেন, প্লাটুন কমাণ্ডার; ৪০। জুলহাস হোসেন, প্লাটুন সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড; ৪১। মোখলেসুর রহমান, কোম্পানী কমাণ্ডার; ৪২। কফিলউদ্দীন, প্লাটুন সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড; ৪৩। আবুল হোসেন, প্লাটুন কমাণ্ডার; ৪৪। মোহাম্মদ আলী, প্লাটুন সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড; ৪৫। আবদুস সামাদ, প্লাটুন কমাণ্ডার; ৪৬। আবদুস সামাদ (২), প্লাটুন সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড; ৪৭। এ, কে, এম, আবদুর রশিদ, প্লাটুন কমাণ্ডার, ৪৮। বেলাল হোসেন, প্লাটুন সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড, ৪৯। মফিজুল হক, কোম্পানী কমাণ্ডার; ৫০। সাবের আল, কোম্পানী সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড; ৫১। আয়ুব আলী, প্লাটুন কমাণ্ডার; ৫২। মোঃ আবু সিদ্দিক, প্লাটুন সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড; ৫৩। মজিবর রহমান, প্লাটুন কমাণ্ডার; ৫৪। আজিজুল হক, প্লাটুন সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড; ৫৫। জহুরুল হক প্রধান, প্লাটুন কমাণ্ডার; ৫৬। আবুদর রাজ্জাক, প্লাটুন সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড; ৫৭। আজহারুল ইসলাম, কোম্পানী কমাণ্ডার; ৫৮। বেলায়েত হোসেন, কোম্পানী সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড; ৫৯। মোঃ শাজাহান, প্লাটুন কমাণ্ডার; ৬০। আনিসুর রহমান, প্লাটুন সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড; ৬১। মুসলিম উদ্দিন, প্লাটুন কমাণ্ডার; ৬২। ওয়াজেদ আলী, প্লাটুন সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড; ৬৩। সিরাজুল ইসলাম, প্লাটুন কমাণ্ডার; ৬৪। দেলোয়ার হোসেন, প্লাটুন সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড; ৬৫। খাইরুজ্জামান, কোম্পানী কমাণ্ডার; ৬৬। মোঃ শামসুল- আলম, কোম্পানী সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড; ৬৭। এম আর প্রধান, প্লাটুন কমাণ্ডার; ৬৮। রফিউল আলম, প্লাটুন সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড; ৬৯। আকবর আলী, প্লাটুন কমাণ্ডার; ৭০। খুরশিদ আলম, প্লাটুন সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড; ৭১। মেসবাহউদ্দিন, প্লাটুন কমাণ্ডার; ৭২। আতিয়ার রহমান, প্লাটুন সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড; ৭৩। শমসের আলী, প্লাটুন কমাণ্ডার এবং ৭৪। শামসুল হক, প্লাটুন সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড।

এ ছাড়া আমি কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ অপারেশন পরিচালনা করি। নীচে সেসব অপারেশনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হলঃ

প্রথম অপারেশনঃ লালমনিরহাট এবং মোগলহাটের মধ্যবর্তী রেললাইন ও ইঞ্জিনসহ উড়িয়ে দেওয়া হয়। প্রকাশ যে, মোগলহাটে পাকবহিনীর একটি শক্ত ঘাঁটি ছিল। এই ঘাঁটিতে প্রত্যেক দিন সকাল সন্ধ্যায় পাকসেনারা একদলকে রেখে ডিউটিরত দলকে অন্যত্র নিয়ে যেতো। ১৫ই সেপ্টেম্বর ভোর রাতে দুরাকুটি নামক জায়গাতে মাইন এবং বিস্ফোরক পদার্থ সহযোগে পাক-সেনাবাহিনীর রেলগাড়ী উড়িয়ে দেওয়া হয়। এই অপারেশনে অন্ততপক্ষে ২৭ জন পাকসেনার মৃত্যু ঘটে এবং ১০/১২ জন মারাত্মকভাবে আহত হয়। এই অপারেশনের খবর স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকেও প্রচার করা হয়। এই অপারেশনে মুক্তিযোদ্ধারা অংশগ্রহণ করে। এই অপারেশনে আমি নিজে আহত হই এবং আমাদের মুক্তিযোদ্ধা একজন শহীদ হন এবং ৪ জন মারাত্মকভাবে আহত হয়।

দ্বিতীয় অপারেশনঃ রংপুরের ভূরুঙ্গামারী জয়মনিরহাট রায়গঞ্জ অপারেশন। যুদ্ধকালীন সময়ে যাতে করে পাকবহিনী কুড়িগ্রাম থেকে ধবলানদী অতিক্রম করে রসদ, গোলাবরুদ এবং সৈন্য পাটেশ্বরী, নাগেশ্বরী এবং ভুরুঙ্গামারীর দিকে সরবরাহ না করতে পারে সে জন্য এই অপারেশন চালানো হয়। এই অপারেশনে ভুরুঙ্গামারীতে মেজর নওয়াজেশ তার দল নিয়ে আক্রমণ করেন আর আমার দলের দুটো গ্রুপের একটা ছিল পাটেশ্বরী এবং অপরটি ছিল নাগেশ্বরীতে। নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ঈদের রাতে এই অপারেশন চলে। এই অপারেশনে আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের প্রায় ১০/১২ জন সদস্য শহীদ হন, অপরদিকে পাকসেনাদের কমপক্ষে সোয়শ' সেনা নিহত হয়। এই অপারেশনেও আমরা সাফল্য অর্জন করি। এই অপারেশনে ১ জন অফিসারসহ ১০ থেকে ১৫ জন পাকসেনা ধরা পড়ে এবং ২ জন অফিসার নিহত হয়।

৩য় অপারেশনঃ লালমনিরহাট এবং তিস্তাঘাটের মধ্যবর্তী বড়বাড়ি ইউনিয়নে পাকবাহিনীর আরেকটি ঘাঁটি ছিল। নভেম্বরের ১০ তারিখের সন্ধ্যায় এই ঘাঁটি আক্রমণ করা হয়। আমার বাহিনীর মাত্র ৬০ জন সদস্য নিয়ে আমি নিজে এই ঘাঁটি আক্রমণ করি। আমাদের তীব্র আক্রমণের ফলে ৫ জন পাকসেনা নিহত এবং বাকীরা পালিয়ে যায়। আমরা ওদের রান্নার কাজে সহযোগিতাসহ আমাদের খবর সরবরাহকারী তাদের পাচক এবং সেই ক্যাম্পে যে মহিলাকে নিয়ে পাকসেনারা রাত কাটাতো তাকেও ধরে নিয়ে আসি। এই অপারেশনে আমাদের ৪/৫ জন মুক্তিযোদ্ধা মারাত্মক ভাবে আহত হয়। পূর্বোল্লিখিত আমার বাহিনীর ২-এম দল তিস্তাঘাট এবং তার আশেপাশে ডিসেম্বরের প্রথম দিকেই পাক-সেনাদের অবস্থানগুলোয় আক্রমন চালায় এবং তাদের সফল আক্রমণের মুখে হানাদার বাহিনী টিকতে না পেরে তারা রংপুর হেডকোয়ার্টারে কেন্দ্রীভূত হয়। এছাড়া ২-এম দলও পীরগাছা থানা এবং তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় পাকবাহিনীর অবস্থানগুলোর উর চোরাগোপ্তা আক্রমণ চালায়। তাদের সে আক্রমণের মুখে পাকবাহিনী কুলাতে না পেরে পীরগাছা ছেড়ে রংপুরে গিয়ে আশ্রয় নেয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এইসব আক্রমণে প্রচুর পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র পাকবাহিনী এবং রাজাকারদের কাছ থেকে উদ্ধার করতে আমরা সক্ষম হই। এসব আক্রমণে বিপুলসংখ্যক রাজাকারও নিহত হয়। প্রসঙ্গতক্রমে আরো উল্লেখ্য যে, এরা ছিল পাকবাহিনী অধিকৃত বাংলাদেশের অভ্যন্তরস্থ এলাকার আক্রমণকারী।

সীমান্ত এলাকা থেকে দীর্ঘ ৬৫ মাইল ভিতরে আমার বাহিনীর ১-পি দল মিঠাপুকুর থানার রানীপুকুরে শত্রুবাহিনীর উপর সফল আক্রমণ পরিচালনা করে। তারাও ডিসেম্বরের প্রথম থেকেই শত্রুবাহিনীকে সন্ত্রস্ত করে তোলে এবং তাদের বিপুল ক্ষয়ক্ষতি সাধন করে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করে। তাদের হাতেও অনেক রাজাকার নিহত হয় এবং আত্মসমর্পণ করে। এর ফলে ১০ই ডিসেম্বরের মধ্যে এই সমস্ত এলাকা শত্রুমুক্ত হয়। এরপরে ক্যাপ্টেন মতিউর রহামন পাটগ্রাম থেকে রংপুরের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন এবং নওয়াজেশ ভূরুঙ্গামারী, কুড়িগ্রাম হয়ে রংপুরের দিকে অগ্রসর হন এবং আমি আমার বাহিনী নিয়ে লালমনিরহাট হয়ে রংপুরের দিকে অগ্রসর হতে থাকি। ডিসেম্বরের ১১/১২ তারিখের দিকে আমরা তিনজন নিজ নিজ দলসহ লালমনিরহাটে মিলিত হয়ে সম্মিলিতভাবে রংপুরের দিকে অগ্রসর হতে থাকি এবং ১৪ই ডিসেম্বরে রংপুর শহরে পৌঁছে রংপুর ক্যান্টনমেন্ট আক্রমণের প্রস্তুতি নিতে থাকি। বিকেলে মিত্রবহিনীও রংপুর পৌঁছে এবং তারা আমাদেরকে ক্যান্টনমেন্টে আক্রমণ স্থগিত রাখার অনুরোধ জানান। তাঁরা ইতিমধ্যে মেসেজ পেয়েছিলেন যে রংপুরস্থ পাকবাহিনী আত্মসমর্পণ করবে এবং সেজন্য তারা প্রস্তুতি নিচ্ছে। এ সংবাদ পেয়ে আমরা তাদেরকে আক্রমণ থেকে বিরত হই। আমাদের রংপুর পৌঁছার খবর পেয়ে সেখানকার জনগণ ও আশেপাশের গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে আগত সাধারণ মানুষ আমাদেরকে এবং মিত্রবাহিনীকে বীরোচিত সংবর্ধনা দেন। তাদের বিজয়োল্লাস এবং আমাদের প্রতি তাঁদের অকৃত্রিম ও প্রাণবন্ত সংবর্ধনায় আমরা মুগ্ধ হয়ে পড়ি।

স্বাক্ষরঃ এম, দেলোয়ার হোসেন
১৬-১০-৭৪

সাক্ষাৎকারঃ মেজর সুলতান শাহরিয়ার রশীদ

আমাকে দেওয়া হয় ৬নং সেক্টরের ১নং সাব-সেক্টর কমাণ্ডারের দায়িত্ব। ১৩ই জুলাই বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রধান কার্যালয় থেকে পরিচয়পত্র নিয়ে ৬নং সেক্টরের নিয়ন্ত্রণাধীনে দিনাজপুর জেলার তেতুলিয়া নামক স্থানে ১৭ই জুলাই দায়িত্বভার গ্রহণ করি।

প্রথম সপ্তাহে আমার সাব-সেক্টরের মুক্ত এলাকা রেকি করা হয় ও পরিচয় হই। সেই সময় উক্ত এলাকায় মুক্তিযোদ্ধারা ছত্রভঙ্গ অবস্থায় ছিল। জুলাই মাসের ২৯ তারিখে তেঁতুলিয়া থানা উন্নয়ন কেন্দ্রে সকল মুক্তিযোদ্ধাদেরকে একত্রিত করার চেষ্টা করি। সেখানে তৎকালীন ই-পি-আর, আনসার মুজাহিদ ও ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের জোয়ানরা একত্রিত হই। তার মধ্যে তৎকালীন ৯নং ই-পি-আর উইং-এর জোনের সংখ্যাই বেশী ছিল। এখানে তিনটি কোম্পানী গঠন করা হয়-।

‘এ’ কোম্পানী কমাণ্ডার সুবেদার আহমেদ হোসেন, প্রাক্তন ই-পি-আর,

‘বি’ কোম্পানী কমাণ্ডার সুবেদার খালেক, প্রাক্তন ই-পি, আর;

‘সি’ কোম্পানী কমাণ্ডার সুবেদার আবুল হোসেন, প্রাক্তন ই-পি-আর।

আগষ্ট মাসের ২ তারিখে ভজনপুরে ব্যাটালিয়ন হেডকোয়ার্টার স্থাপন করা হয়। ৪ঠা আগষ্ট ভজনপুর থেকে কোম্পানী দেবনগরে ডিফেন্স নেয়। সেখানে অবস্থানকালে ময়নাগুড়ি, কামারপাড়া, বিলখাঁজুদ, ফকিরপাড়া, নয়াপাড়া গ্রামসহ সাত-আট মাইল জায়গা দখল করে নেয়া হয়। সেখানে পাকবাহিনীর পোস্ট হিসাবে ছিল। এইসব এলাকা আগষ্ট মাসের প্রথম সপ্তাহের ভিতরেই আমাদের দখলে চলে আসে। আগষ্ট মাসের ২য় সপ্তাহের মধ্যে সম্মুখের দিকে ১ মাইল জায়গা আমরা দখল করে নেই। প্রশস্ত ছিল ৭ মাইল। সেখানে জাবরী দেয়ার, গোয়ালঝার, বানিয়াপাড়া, ডাঙ্গাপাড়া, বামনগাঁও, কামাদা ও ভেলুকা পাড়া গ্রাম দখল করে নেই। সেখানে পাক বাহিনীর প্রতিরক্ষা বূহ্য ছিল। এই সময় পাকবাহিনী আমাদের উপর ভেলূকাপাড়া, গোয়ালঝাড় ও জারীদোয়ার গ্রামে আক্রমণ করে। এই আক্রমণে প্রথমে আমাদের কোম্পানী ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। সেই সময় আমার অনুরোধে ভারতীয় আর্টিলারী রেজিমেন্ট পাকবাহিনীর উপর শেলিং করে। এই সুযোগে আমরাও তাদের ওপর পাল্টা আক্রমণ চালাই, ফলে পাকবাহনী উক্ত গ্রামগুলি ছেড়ে পিছনে চলে যায়। এই যুদ্ধে আমাদের ২৭ জন বীর মুক্তিযোদ্ধা বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে শাহাদৎবরণ করে ও কয়েকজন আহত হয়। আগষ্ট মাসের শেষের দিকে আর এক কোম্পানী গঠন করা হয় ছাত্র, যুবক ও কিছু সামরিক জোয়ান দিয়ে। এই কোম্পানী কমাণ্ডার নিযুক্ত হয় সুবেদার আবুল হোসেন। সে সময় আমাদের মোট শক্তি চার কোম্পানীর মত। সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে চুই নদীর পশ্চিম পাড়ে চকরমারী গ্রাম, ফকিরপাড়া, খইপাড়, ডাঙ্গাপাড়া, পাথিলগাঁও, জুতরারপাড়া, খাসপাড়া, বালিয়াপাড়া ও প্রধানপাড়া আমরা দখল করে নেই। এই এলাকা দখলে আনতে আমাদের সঙ্গে পাকবাহিনীর সঙ্গে কয়েকবার সম্মুখ যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং সমস্ত চুই নদীর পশ্চিম পারে পাক-বাহিনীর মুখোমুখি ডিফেন্স নেওয়া হয়। সেই সময় ভারতীয় বি-এস-এফ বাহিনীর দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার সময় সাহায্য করে। চুই নদীর পশিম পারে চার কোম্পানী মুক্তিযোদ্ধা ডিফেন্স লাগিয়েছিল। সে সময় আমাদের অপর কোম্পানী ও আমাদের ব্যাটালিয়ন হেডকোয়ার্টারের সঙ্গে টেলিফোন যোগাযোগ স্থাপন করা হয়।

সেপ্টেম্বর মাসের ৩য় সপ্তাহে পাকবাহিনীর পাক্কা ঘাঁটি অমরখানা তিন কোম্পানী নিয়ে আক্রমণ করি। অমরখাণায় পাকবাহিনীর সঙ্গে আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের প্রচণ্ড যুদ্ধ হয় কিন্তু পাকবাহিনীর তীব্র আক্রমণের মুখে টিকতে না পেরে আমরা পুনরায় চুই নদীর পশ্চিম পারে আমাদের ডিফেন্সে চলে আসি। সেপ্টেম্বর মাসের শেষের

দিকে জগদলহাটে পাকবাহিনীর ঘাঁটির উপরে আক্রমণ চালাই। জগদলহাটেও পাকবাহিনীর সঙ্গে আমাদের ভীষণ যুদ্ধ হয় কিন্তু তাদের তীব্র আক্রমণের মুখে টিকতে না পেরে চুইনদীর পশ্চিম পারে চলে আসি।

অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে অমরখানা ও জগদলহাটে পুনরায় আক্রমণ করা হয়। কিন্তু পাক-বাহিনীকে প্রতিহত করা যায় নাই। অক্টোবর মাসের ২য় সপ্তাহে বাংলাদেশের প্রথম কমিশনপ্রাপ্ত ২য় লেঃ এ, মতিন চৌধুরী ও ২য় লেঃ মাসুদুর রহমান আমার সাব-সেক্টরে যোগদান করে। ইতিমধ্যে বাংলাদেশের ভিতরে পচাগড়, পুটিমারী, বোদা, ঠাকুরগাঁও ও বীরগঞ্জে এবং দিনাজপরের এফ এফ বাহিনীকে হালকা অস্ত্র ও গ্রেনেড দিয়ে পাঠান হয়। সেই সময় পাকবাহিনী-রাজাকারদের ডিফেন্সের উপর আমাদের কোম্পানী মুক্তিযোদ্ধাগণ সেকশন ভিত্তিতে ভাগ হয়ে পাকবাহিনীর গতিপথে রেইড ও এ্যামবুশ করে। আমাদের এ্যামবুশে পাকবাহিনীর বহু সৈন্য হতাহত হয়। এইভাবে নভেম্বর মাসের ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত পাকবাহিনীর উপর হামলা, রেইড ও এ্যামবুশ চলতে থাকে।

২২শে নভেম্বর রাতে আমার তিন কোম্পানী নিয়ে পুনরায় অমরখানা আক্রমণ করি। এই যুদ্ধে ভারতীয় আর্টিলারী পাকবাহিনীর ঘাঁটির উপরে খুব শেলিং করে। তীব্র আক্রমণের মুখে পাকবাহিনী হটে যায়। আমরা অমরখানা দখল করি। এই যুদ্ধে বি-এস-এফ বাহিনী আমাদেরকে কভারিং ফায়ার দিয়ে যথেষ্ট সাহায্য করে। সেই দিনই ভারতীয় ১২-রাজপুতানা রাইফেলস রেজিমেন্ট অমরখানার সম্মুখে অবস্থান নেয়। নভেম্বর মাসের ২৩ তারিখে চুই নদীর পশ্চিম পারে আমদের ডিফেন্সের পিছনে ভারতীয় ৭নং মারাঠা রেজিমেন্ট অবস্থান নেয়। মুক্তিযুদ্ধের মোড় পরিবর্তন হয়ে যায়।

২৩শে নভেম্বর রাতে ভারতীয় বাহিনীর সহযোগিতায় আমরা জগদলহাট আক্রমণ করি। উভয়পক্ষে ভীষণ গুলি বিনিময় ও আর্টিলারী শেলিং হয় কিন্তু সেদিন জগদলহাটে আমাদের সাফল্য লাভ হলো না। আমাদের পক্ষে সেই যুদ্ধে ৩০ জন মুক্তিযোদ্ধা হতাহত হয় । ২৪শে নভেম্বর পুনরায় জগদলহাট আক্রমণ করি। আমাদের আক্রমণে পাক বাহিনী জগদলহাট ডিফেন্স ছেড়ে দিয়ে পচাগড় অভিমুখে পশ্চাদপসরণ করে। জগদলহাট আক্রমণে ভারতীয় ১২-রাজপুতানা রাইফেলস রেজিমেন্টের ‘এ’ কোম্পানী আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে যুদ্ধ করে। জগদলহাট দখলে আমাদের ২ জন মুক্তিযোদ্ধা শাহাদাৎবরণ করে। তার মধ্যে হাওলাদার সকিমউদ্দিন বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে শাহাদাৎবরণ করে। কয়েকজন আহত হয়।

এই সময়ে চুই নদীর পশ্চিম পারে অমরখানা ও জগদলহাটে বরাবর ভারতীয় সেনাবাহিনীর সৈন্যগণ পজিশন নেয়। ২৪শে নভেম্বর সম্মিলিত বাহিনী জগদলহাট থেকে পচাগড় অভিমুখে রওনা হয় । পথে পচাগড় থেকে ১ মাইল দূরে থাকতে পাকবাহিনী আমাদের উপর বিক্ষিপ্তভাবে শেলিং ও গুলি করতে থাকে। ফলে সেখানে ডিফেন্স নিতে হয়। উক্ত জায়গায় আমাদের তিনজন মুক্তিযোদ্ধা শাহাদাৎবরণ করে ও সাতজন আহত হয়। তার মধ্যে ২য় লেঃ এম, মতিন চৌধুরীও গুরুতরভাবে আহত হয়।

পঁচাগড়ে পাকবাহিনীর খুব মজবুত ঘাঁটি ছিল। এখানে পাকবাহিনীর প্রায় তিন ব্যাটালিয়ন সৈন্য নিয়োজিত ছিল। পাকবাহিনীর পচাগড়ের চতুর্দিকে পাক্কা বাংকার ও মজবুত ট্রেঞ্চ ছিল।

২৬ শে নভেম্বর রাতে আমাদের মুক্তিবাহিনীর ১ ব্যাটালিয়ন ও ভারতীয় সেনাবাহিনীর ২ ব্যাটালিয়ন যৌথভাবে পাক-বাহিনীর পাকা ঘাঁটি পচাগড় আক্রমণ করে। সারারাত যুদ্ধ চলে কিন্তু পাকবাহিনী পচাগড় ডিফেন্সে থাকতে সমর্থ হয়। এই রাতে ভারতীয় বাহিনীর ১০০ জনের মতো জোয়ান ও ২২ জন মুক্তিবহিনী হতাহত হয়। ২৭ তারিখ সারা দিনরাত যুদ্ধ চলে। সেদিন ভারতীয় বিমান বাহিনী পঁচাগড়ে পাকবাহিনীর উপর বিমান হামলা চালায় এবং ২৮ তারিখ দিনেও আক্রমণ অব্যাহত থাকে। ২৮ তারিখ রাতে পুনরায় ভারতীয় বাহিনীর তিন ব্যাটালিয়ন ও মুক্তিযোদ্ধা ১ ব্যাটালিয়ন ও ৩ শত এফএফ তাদের উপর আক্রমণ চালায়। সেই রাতে ভারতীয় আর্টিলারী রেজিমেন্ট ৬০টি গান থেকে একসাথে শেলিং করে। উক্ত রাতে ৬ হাজার গোলা পাক

ডিফেন্সের উপর নিক্ষিপ্ত হয়। পাক-বাহিনী ২৮ তারিখ রাতে পঁচাগড় ছেড়ে ময়দান দিঘীতে ডিফেন্স নেয়। ঐ রাতের যুদ্ধে আমাদের সম্মিলিত বাহিনীর ২৫০ জনের মত হতাহত হয়। এখানে পাক বাহিনীর ২শত জনের মত হতাহত হয়। ২৭ জন পাক-সেনাকে জীবন্ত ধরে ফেলা হয়। প্রচুর অস্ত্র, গোলাবারুদ ও ৮টি গাড়ী উদ্ধার করা হয়। পঁচাগড় যুদ্ধ মিত্রবাহিনী ও মুক্তিবহিনীর বাংলাদেশের ভিতরে বৃহৎ যুদ্ধগুলির মধ্যে অন্যতম।

৩০ তারিখ দিনের বেলায় বোদা থানার উদ্দেশ্যে রওনা হই। বেলা তিনটার সময় পুটিমারী নামক স্থানে দুশমন আমাদের অগ্রগতি প্রতিহত করে। ফলে আমরা সেখানে ডিফেন্স নিতে বাধ্য হই।

৩১ তারিখ ১২টায় আমরা পাকবাহিনীর উপর আক্রমন চালাই। এই আক্রমণে মুক্তিবাহিনীর ৫ জন ও ভারতীয় বাহিনীর ৫৫ জন হতাহত হয়। পরে আমরা ময়দানদীঘি দখল করে ফেলি। বিকালে আমরা বোদার উদ্দেশ্যে রওনা হই। পাকবাহিনী বোদাতে আমাদের উপর আক্রমণ চালায়। আমরা বাধ্য হয়ে বোদা থানার ১ মাইল দূরে ডিফেন্স নেই। বিকালে বোদা হেডকোয়ার্টার আক্রমণ করি। এখানে পাকবাহিনীর সহিত আমাদের ভীষণ যুদ্ধ হয়। এখানে ভারতীয় আর্টিলারীর ক্যাপ্টেন সুধীর নিহত হয়। সন্ধ্যায় বোদা থানা আমাদের দখলে আসে। পাকবাহিনীর ৬০/৭০ জন হতাহত হয়। ভারতীয় বাহিনী বোদাতে এসে বিশাম নেয় কিন্তু মুক্তিবাহিনী বোদা থেকে তিন মাইল সম্মুখে ঠাকুরগাঁয়ের পথে ডিফেন্স নেয়। সেদিন রাতে ভুলে মিস ফায়ার হয়। তাতে ভারতীয় ২০/২৫ জন জোয়ান হতাহত হয় এবং আমাদের খাদ্য ও রান্না বহনকারী পার্টির ৪/৫ জন নিহত হয়। এ রাতেই ভারতীয় কোম্পানীর সহিত মুক্তিবাহিনীর ৪০ জন জোয়ানকে পাঠাই। তারা ভুলিরপুলের নিকটে গেলে পাকবাহিনী তাদের উপর আক্রমণ চালায়। তখন ভারতীয় বাহিনীও তাদের পাল্টা জবাব দেয়। পাক সৈন্যরা ভারতীয় বাহিনীর আক্রমণে টিকতে না পেরে তাহারা ভুলির ব্রীজ নষ্ট করে পিছনে হটে। ১লা ডিসেম্বর আমরা ব্রীজ থেকে ২ মাইল দূরে অগ্রসর হয়ে ডিফেন্স নিয়ে থাকি। ভারতীয় বাহিনী তখন ব্রীজ মেরামত করে।

৩রা ডিসেম্বর আমরা সম্মিলিত বাহিনী ঠাকুরগাঁও দিকে অগ্রসর হই। এই সময় পাকবাহিনী ঠাকুরগাঁ ত্যাগ করে। ঠাকুরগাঁতে পাকবাহিনীর সহিত আমাদের কোন সংঘর্ষ হয় নাই। ঐ দিনই আমরা ঠাকুরগাঁও দখল করে ঠাকুরগাঁও থেকে আরো তিন মাইল সম্মুখে অগ্রসর হই। ৪ তারিখে আমরা বটতলী নামক স্থানে ডিফেন্স করি। ৫ তারিখ সারাদিন পাকবাহিনীর পুতে রাখা মাইন উঠাই। ৬ তারিখে আমরা বীরগঞ্জ আক্রমণ করি। পাকবাহিনীর সহিত আমাদের বহু সময় যুদ্ধ চলে। শেষে পাকবাহিনী বীরগঞ্জ ছেড়ে পিছনে হটে। এখানে ভারতীয় বাহিনীর ১০/১২ জন জোয়ান নিহত হয়। ৭ তারিখে আমরা সম্মিলিত বাহিনী ভাতগাঁও ব্রীজের দিকে রওনা হই। পাকবাহিনী তখন ভাতগাঁও ব্রীজ নষ্ট করে রাস্তার দু পাশে মাইন পুঁতে রেখে পিছনের দিকে অগ্রসর হয়। আমরা তখন ভাতগাঁও ব্রীজের চারপাশ থেকে মাইন তুলতে শুরু করি।

৯ তারিখে আমাদের দুটি কোম্পানী ও ভারতীয় দুটি ব্যাটালিয়ন দিনাজপুর আক্রমণ করতে অগ্রসর হয়। দিনাজপুরের নিকটে গিয়ে কাঞ্চন নদী পাড় হয়ে আমরাও দিনাজপুর আক্রমণ করি। এখানে পাকবাহিনীর সহিত আমাদের অনেকক্ষন যুদ্ধ চলে। এই যুদ্ধে আমাদের সম্মিলিত বাহিনীর ৩০/৩৫ জন নিহত ও ১০/১২ জন নিখোঁজ হয়। পরে আমরা সেখান থেকে পিছনে হটি। ফেরার পথে দশ মাঙ্গল নামক স্থানে পাকবাহিনীর আর একটি ডিফেন্সের উপর আক্রমণ করি। এখানে আমরা ২৩ জন পাকসৈন্যকে জীবন্ত ধরে ফেলি এবং প্রচুর অস্ত্র উদ্ধার করে তাড়াতাড়ি সরে পড়ি। কারণ পাকবাহিনীর কয়েকটি ট্যাংক পিছন থেকে আসছিল।

১০ তারিখে ভারতীয় দুটি ব্যাটালিয়ন সৈন্য পাকবাহিনীকে আক্রমণ করে, কিন্তু এখানে পাকবাহিনীর তীব্র আক্রমণে তারা আর সামনের দিকে অগ্রসর হতে পারেনি। এই যুদ্ধে ভারতীয় বাহিনীর প্রায় ১৫০ জন জোয়ান মারা যায়। পরে পাকবাহিনী পিছনে হটে। তখনও আমাদের হেডকোয়ার্টার বীরগঞ্জেই ছিল। ইতিমধ্যেই হিলি থেকে আমাদের বাহিনী ও ভারতীয় বাহিনী হিলি দখল করে দিনাজপুরের নিকট এসে পড়ে।

১২ই ডিসেম্বর আমরা দিনের বেলায় খানসামা আক্রমণ করি। আমাদের সঙ্গে ভারতীয় বাহিনীও ছিল। এই আক্রমণে ভারতীয় বাহিনীর ১৫ জনের মত ক্ষয়ক্ষতি হয়। এবং আমাদের ৭ জন মারা যায় । এখানে আমরা মেজর খুরশিদসহ ১৯ জনকে জীবন্ত ধরে ফেলি। ঐ দিনই আমরা সামনের দিকে অগ্রসর হই এবং নীলফামারী দখল করে ফেলি।

১৩ তারিখে আমরা সৈয়দপুরের দিকে অগ্রসর হই। সৈয়দপুর থেকে ৫ মাইল দূরে পাক ট্যাঙ্কের সহিত আমাদের ট্যাঙ্কের সংঘর্ষ হয়। তাতে ভারতীয় বাহিনীর দুটি ট্যাঙ্ক ও পাকবাহিনীর তিনটি ট্যাঙ্ক সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে যায়। ১৩ তারিখ বিকালে ৪৮ পাঞ্জাব রেজিমেন্টের অধিনায়ক ও একজন অফিসারসহ প্রায় ১০৭ জন পাকসৈন্য আমাদের সম্মিলিত বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করে।

১৫ই ডিসেম্বর রাতে পাক ব্রিগেড কমাণ্ডার সাইফুল্লাহ যুদ্ধ স্থগিত রাখবার জন্য অনুরোধ করেন। কিছুক্ষন পর তিনি কয়েজন গার্ডসহ আমাদের সম্মিলিত ক্যাম্পে আসেন। তার সঙ্গে আমাদের অনেক সময় ধরে আলাপ-আলোচনা হয়। পরে পাক ব্রিগেড কমাণ্ডার চলে যান।

১৭ তারিখ সকালে সেখানে অবস্থানরত সকল পাকসৈন্য মিত্রবাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করে।

স্বাক্ষরঃ মেজর সুলতান শাহরিয়ার রশীদ
কুমিল্লা সেনানিবাস
১৪-১০-৭৩

সাক্ষাৎকারঃ সৈয়দ মনসুর আলী

১৯৭১-এর ২রা নভেম্বর ক্যাপ্টেন নওয়াজেশ সাহেব আমাকে মুক্তিবাহনীর দুটি এলাকার (বুড়াবুড়ি এবং যাত্রাপুর) কোম্পানী কমাণ্ডার করে পাঠান। প্রথমে নগেশ্বরী থানার মাদারগঞ্জে করা হয় ক্যাম্প এবং সেখান থেকে যাত্রাপুর অপারেশন করা হয়। একদিন যাত্রাপুর বাজারে তিনজন পাকসেনা এবং ৯ জন রাজাকার আসলে তাদের আক্রমণ করি এবং ৩ জন পাকসেনা এবং ৯ জন রাজাকার সংঘর্ষে নিহত হয়। জনগণের সহায়তায় ১৫০ জন রাজাকারকে আত্মসমর্পণ করাতে বাধ্য করা হয় (৯ই নভেম্বর, ১৯৭১)। ৯ই নভেম্বর স্বাধীন বাংলায় প্রথম পতাকা উত্তোলন করা হয়। এ সংঘর্ষের খবর পেয়ে কুড়িগ্রাম থানায় ঘোগাদেহ ইউনিয়নের ৩০০ রাজাকার স্বেচ্ছায় তাদের হাতিয়ারসহ যাত্রাপুরে আমার নিকট আত্মসমর্পণ করে। এই আত্মসমর্পণের খবর বিভিন্ন স্থানের রাজাকরাদের মনে বিরাট প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। তারা কুড়িগ্রাম মহকুমার বিভিন্ন স্থান থেকে যেমন নুনখাওয়া বুড়াবুড়ি, মোগলবাছা ইত্যাদি ইউনিয়ন থেকে স্বেচ্ছায় মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে থাকে। কুড়িগ্রাম শহরের পাকসৈন্যের ঘাঁটি থেকে বহু রাজাকার তাদের হাতিয়ারসহ পালিয়ে গিয়ে বিভিন্ন স্থানে মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে আত্মসমর্পণ করে।

কুড়িগ্রাম শহরের নিকটবর্তী মোগলবাছা ইউনিয়নে হানাদার বাহিনীর ঘাঁটি ছিল আমি মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে তিনবার পাক ঘাঁটি আক্রমণ করি। তৃতীয়বারের সংঘর্ষে উনিপুরগামী ট্রেনের দুটি বগী বিচ্ছিন্ন করি ডিনামাইট দিয়ে। এত প্রায় ৩৫ জন পাকসৈন্য হতাহত হয়। মোগলবাছা ইউনিয়নের অর্জুনমালায় রেলসেতুর লাইনের নীচে ডিনামাইট রাখা হয়েছিল। পাকবাহিনীর ট্রেন অতিক্রমের সময় ডিনামাইটটি বিস্ফোরিত হয়। কার্যরত সময়ে বিস্ফোরণে মীর নামে একজন মুক্তিযোদ্ধা নিহত হয়।

৭ই ডিসেম্বর ভারতীয় সেনাবাহিনীর ব্রিগেডিয়ার যোশীর নির্দেশে মুক্তিবাহিনী এবং ভারতীয় মিত্র বহিনী যৌথভাবে কুড়িগ্রাম শহরে বর্বর পাক বাহিনীর অবস্থানে ভারী ও দূরপাল্লার কামান দিয়ে আক্রমণ করে। পাক বাহিনী তেমন মোকাবিলা না করেই কুড়িগ্রাম থেকে সরে পড়ে।

মিত্র ও মুক্তিবাহিনী ১০ই ডিসেম্বর কুড়িগ্রাম শহরে প্রবেশ করে। মুক্তিযোদ্ধারা কুড়িগ্রাম নতুন শহরে উঁচু পানির ট্যাংকে প্রথম স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন করে। পাকবাহিনীর অবস্থান ঘাঁটিসমূহ ছিলঃ (১) রিভারভিউ হাইস্কুল (ইঞ্জিনিয়ারিং গ্রুপ এবং গোলন্দাজ গ্রুপ) (২) কুড়িগ্রাম ধরলা নদীর ঘাট; (৩)কুড়িগ্রাম সি-এণ্ড-বি অফিস গোডাউন; (৪) নূতন টাউন কোর্ট বিল্ডিং; (৫) শান্তি কমিটি ও রাজাকার ট্রেনিং কেন্দ্র (সঞ্জীব করঞ্জাইয়ের গোডাউন ও কুড়িগ্রাম কলেজ)।

স্বাক্ষরঃ সৈয়দ মনসুর আলী টিংকু
২৭-৭-৭৩

সাক্ষাৎকারঃ সুবেদার মেজর মোঃ কাজিমউদ্দীন

জুন মাসের শেষের দিকে উইং কমাণ্ডার মোহাম্মদ খাদেমুল বাশার আমাদের সেক্টরের অধিনায়ক নিযুক্ত হইয়া আসিলেন এবং তেঁতুলিয়ায় তাঁহার দপ্তর স্থাপন করিলেন। তিনি পাক বিমান বাহিনীর অফিসার। সদ্য মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিয়েছেন। স্থলযুদ্ধের অভিজ্ঞতা তাঁহার সীমাবদ্ধ বৈকি! তবু তাহাকে পাইয়া আমরা আরও উৎসাহিত হই এবং আমাদের মনোবল বাড়িয়া যায়। তিনিও অল্পদিনের মধ্যে বিশেষ নিপুণতার পরিচয় দিয়া আমাদেরকে চমৎকৃত করিলেন। রংপুর ও ঠাকুরগাঁও এলাকা নিয়া সেক্টর গঠিত ছিল। তেতুলিয়ায় থাকিয়া কিছুদিন পর্যন্ত কাজ করার পর স্কোয়াড্রন লীডার সদরউদ্দিন সাহেব আসিলেন। ৬নং সেক্টরকে ২টি সাব সেক্টরে ভাগ করা হইল। ঠকুরগাঁ এলাকা নিয়া সাব সেক্টর ৬-এ এবং রংপুর এলাকা নিয়া সাব সেক্টর ৬-বি। সদরউদ্দিন সাহেব ৬-এ সাব সেক্টর কমাণ্ডার এবং ক্যাপ্টেন নওয়াজেশ সাহেব সাব সেক্টর ৬-বি এর কমাণ্ডার নিযুক্ত হইলেন। তখন ক্যাপ্টেন নজরুল হক সহ-সেক্টর কমাণ্ডার নিযুক্ত হইলেন। জুলাই মাসের প্রথম দিকে নজরুল হক সাহেব অসুস্থ হওয়ায় আমাকেই পুনরায় কমাণ্ড নিতে হইল, কেনন সদরউদ্দিন সাহেবও উপস্থিত ছিলেন না। আমাদের কাজ চলিতে থাকে। প্রারম্ভ হইতে এই সময় পর্যন্ত আমরা স্বাধীন এলাকার জনসাধারণের সাহায্য-সহানুভূতি পাইয়াছি প্রচুর। সমর্থন ও ভালবাসা পাইয়াঠি অফুরন্ত। এই দুর্দিনে এদের মধ্যে এককভাবে যিনি আগাগোড়া আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসিতেন, এমনকি অনেক সময় সামরিক অফিসারের ভূমিকা নিয়া কাজ করিতেন তিনি হইলেন পঞ্চগড় ময়দানদীঘির স্বনামধন্য এডভোকেট জনাব সিরাজুল ইসলাম এম-সি-এ।

যাই হউক, ইতিমধ্যে আমরা নূতন সেক্টর কমাণ্ডারের নির্দেশ ও প্রেরণায় এবং পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার প্রয়াস পাইতেছি। দুশমনকে অনেকটা ঘেরাও করিয়া তাহার নিকটবর্তী হওয়ার চেষ্টায় আছি। ভজনপুর ডিফেন্স হইতে কোম্পানীগুলিকে উঠাইয়া এলাকার পরিপ্রেক্ষিতে ৩-৬ মাইল আগে বাড়াইয়া অগ্রবর্তী ঘাঁটিতে লাগানো হইল। কাজেই দুশমনের সঙ্গে ছোটখাটো সংঘর্ষ আমাদের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল। বন্ধুরাষ্ট্রের সাহায্যে আমরাও দুশমনকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলাম। দিনে দিনে নূতন মুক্তিসেনার দল ট্রেনিং শেষে বাহিনীতে আসিয়া যোগ দিতে লাগিল, আর পরিকল্পনা অনুসারে আমরা তাহাদিগকে দখলকৃত এলাকায় পাঠাইতে আরম্ভ করিলাম। এই সময় আমরা ফিল্ড হেডকোয়ার্টার ভজনপুর হইতে ৫ মাইল সামনে দেবনগর নামক স্থানে স্থাপন করিলাম এবং সাব-সেক্টর হেডকোয়ার্টার তেঁতুলিয়া হইতে ভজনপুর নিয়ে আসা হইল। তখন কোম্পানীগুলোর পজিশন ছিল-সুবেদার হাফিজের 'এ' কোম্পানী পঞ্চগড়ের পিছনে কাগপাড়া-ওমরখানা, নায়েক সুবেদার আবদুল খালেকের 'বি' কোম্পানী সাহেবজুত-বেরাজুত এবং নায়েক সুবেদার মুরাদ আলীর 'সি' কোম্পানী নছুয়াপাড়া এলাকা। সন্দেহ নাই, পূর্বের বিধ্বস্ত অবস্থা কাটাইয়া আমরা তখন অনেকটা সংগঠিত ও সুবিন্যস্ত। তবু যেন একটা বিরাট শূন্যতা সব সময় আমরা অনুভব করিতে লাগিলাম। মঙ্গলময়ের ইচ্ছায় এমনি সময় জুলাই মাসের ১৫ তারিখে আঞ্চলিক অধিনায়ক উইং কমাণ্ডার বাশার একজন নূতন অফিসার নিয় দেবনগর আসিলেন কনফারেন্স করিতে। তথায় উপস্থিতদের মধ্যে সুবেদার মেজর

কাজিমউদ্দিন, সুবেদার মুহাম্মদ আবদুল হাফিজ, নায়েক সুবেদার হাজী মুরাদ আলী এবং নয়িক সুবেদার আব্দুল খালেকের নাম উল্লেখযোগ্য। সি-ও সাহেব বলিলেন, “আমাদের মুক্তিবাহিনী পুরোপুরি সংগঠিত হইতে যাইতেছে এবং ভবিষ্যতে আমাদেরে যুদ্ধের অসুবিধা অনেক ক্ষেত্রেই লাঘব হইবে।” তারপর তিনি সঙ্গে আসা সেই নতুন অফিসারকে পরিচয় করাইয়া দিলেন এবং তাহাকে আমাদের সাব-সেক্টরের ফিল্ড অফিসার হিসাবে নিযুক্ত দিলেন। অন্যান্য অফিসারের অনুপস্থিতিতে সাময়িকভাবে তিনি সাব-সেক্টর কমাণ্ডার পদেও অধিষ্ঠিত হইলেন। আমি আবার সহকারী হিসেবে কাজ করিতে লাগিলাম।

নূতন ফিল্ড অফিসার পাইয়া আমরা ভারী খুশী। তাহার সঙ্গে অনেক কথাবার্তা হইল। খুব হাসিখুশী, চটপটে আর ছোট্ট গড়নের মানুষটি তিনি, কিন্তু তেজোদিপ্ত চেহারা। পাক পদাতিক বাহিনীর ক্যাপ্টেন তিনি। নাম সুলতান শাহরিয়ার রশীদ খান। কুমিল্লার অধিবাসী। বর্তমান বসতি চাটগাঁ। '৬৮তে কমিশন পাইয়াছেন- শুরুতে ১১-বালুচ ও পরে ৩১-এফ-এফ রেজিমেন্টে চাকুরী করিয়াছেন। সেখান হইতে ন্যাশনাল সার্ভিস ক্যাডেট কোরে চলিয়া যান এবং পলায়ন পূর্বপর্যন্ত লাহোর রৈস্যাবারে পি-টি-এস-ও এবং প্রশিক্ষণদাতার পদে বহাল ছিলেন। কার্য উপলক্ষে আজাদ কাশ্মীর, ঝিলাম, মংলা, শিয়ালকোট প্রভৃতি স্থান ঘুরিয়া অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করেন তিনি। '৭১ সালের ৩রা জুলাই কোন এক সুযোগে (পশ্চিম) পাকিস্তান হইতে পালাইয়া আসেন তিনি মুক্তিবাহিনীতে যোগদান করিতে। শুধু নিজেই আসেন নাই সঙ্গে নিয়া আসিয়াছেন আরও তিনজন অফিসার। যাই হউক, অতঃপর কনফারেন্স শেষে অফিসাররা চলিয়া গেলেন সেদিনকার মত।

১৮ই জুলাই ক্যাপ্টেন শাহরিয়ার আমাদের অধিনায়ক পদে যোগদান করিলেন দেবনগরে। দেখিলাম আমাদের প্রথম দর্শনের অনুমান মিথ্যা নয়। তাহার উপস্থিতিতে আমাদের মুক্তিসংগ্রাম অভূতপূর্ব এক নিহত মোড় নিল। তাহার যাদুস্পর্শে যেন সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল সুপ্ত সাব-সেক্টর, অকুতোভয় অপারাজেয় মনোবলের অধিকারী আর নিবেদিতপ্রাণ খাঁটি বাংলা মায়ের সন্তান তিনি। নিমেষে খাপ খাওয়াইয়া নিলেন নিজেকে বাংলার কাদামাটির সঙ্গে। নিখুঁত বীর, মর্দে মোজাহিদ তিনি। মুক্ত এলাকার জনসাধারণ এবং আমরা তাহার কাজে মুগ্ধ হইয়া আদর করিয়া তাহাকে বাংলার বিচ্ছু বলিয়া ডাকিতাম। অনেকের মত নাক সিটকাইয়া ভ্রূ কুচকাইয়া ভড়ং দেখান না। তিনি আসিয়াই সমস্ত ডিফেন্স এরিয়া ঘুরিয়া প্রত্যেকটি সৈনিকের সঙ্গে দেখা করিলেন এবং তাহাদিগকে বিভিন্নভাবে সান্ত্বনা ও উৎসাহ দান করিলেন। সৈনিকেরা তাঁহার পরশে আবার যেন নতুন করিয়া আশার আলো দেখিতে পাইল। তাহাদের এতদিনের শূন্যতা ঘুচিয়া একটা মুখ্য অভাব পূরণ হইল। কারণ ক্যাপ্টেন ছিলেন পদাতিক বাহিনীর লোক। তাই নবম শাখার অভাব-অসুবিধা সম্বন্ধে অবগত হইতে এবং খুটিনাটি খুঁজিয়া বাহির করিতে তাঁহার বেশী সময়ের প্রয়োজন হয় নাই। অবশ্য মানসিক ও দৈহিক পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল যথেষ্ট। সবচেয়ে বড় অসুবিধা ছিল রেশন ও গোলাবারুদ সরবরাহ ও সংগ্রহ নিয়া। এক সপ্তাহের মধ্যে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ ও এজেন্সীর সাথে যোগাযোগ করিয়া আন্তরিক সম্পর্কের মাধ্যম সংগ্রহ ও সরবরাহ ব্যবস্থা স্বাভাবিক করিয়া আনিলেন তিনি। তারপর ডিফেনসিভ পজিশন ও যুদ্ধের অন্যান্য জরুরী ব্যাপারগুলির খুটিনাটি খুঁজিয়া বাহির করিয়া কিছুটা ঠিক করিলেন। যে সমস্ত সৈন্য নানাভাবে বিভিন্ন সময়ে ছত্রভঙ্গ হইয়া বিভিন্ন জায়গায় আশ্রয় নিয়াছিল তাহাদিগকে খবর পাঠানো হইল। কোন কোন স্থানে লোকও পাঠানো হইল যাহাতে তাহারা নিজেদের ইউনিটে যোগদান করে। ক্রমে সৈন্যসংখ্যা বাড়িতে লাগিল এবং তাহারা মাসিক ভাতা ও অন্যান্য সুবিধা পাইতে শুরু করিল। সৈন্যদের মনোবল ক্রমাগত দৃঢ় হইতে লাগিল এবং সঙ্গে সঙ্গে পাকবাহিনী বিভিন্ন অপারেশনের মাধ্যমে বুঝিতে পারিল এই এলাকায় মুক্তিবাহিনীর শক্তি ও রণনৈপুণ্য দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। তাই তাহারাও তাহাদের শক্তি ও সংখ্যা বাড়াইতে লাগিল। এইদিকে নবম শাখার কিছু লোক, পুলিশ ও আনসার তেঁতুলিয়া, বাংলাবান্ধা ও অন্যান্য স্থানে বিশ্রামে রত ছিল। ক্যাপ্টেন শাহরিয়ার সেই দিকেও খেয়াল করিলেন। ইতিমধ্যে আমাদের পুরাতন তিনটি কোম্পানী পঞ্চগড়ের দিকে আরও দুই মাইল অগ্রসর হইয়া পজিশন নিল। পাকিস্তানীদের শক্তি এবং সংখ্যাও দিন দিন বাড়িতে লাগিল। তাই তেঁতুলিয়া ও অন্যান্য স্থানের বিশ্রামরত লোকদেরকে ক্যাপ্টেন নিজে গিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়া আসিলেন এবং তাহাদিগকে নিয়া নতুন কোম্পানী খাড়া

করিলেন । কোম্পানীর নাম দেওয়া হইল 'ডি' এবং সুবেদার আবুল হাশেমকে সেই কোম্পানীর অধিনায়ক নিযুক্ত করা হইল। নূতন কোম্পানীর কিছু প্রশিক্ষণের প্রয়োজন ছিল, তাই কয়েকদিন তাহারা ডিফেন্সের পিছনে থাকিয়া তা সমাপ্ত করিল। ইতিমধ্যে পাকবাহিনীর কর্মতৎপরতা বাড়িয়া উঠিল। তাহাদের সাথে আমাদের ছোটখাটে সংঘর্ষ হইল। এরপর প্রধানপাড়া, ডাঙ্গাপাড়া ও নুনিয়াপাড়া নামক গ্রামে তাহারা হঠাৎ আমাদের উপর বড় রকমের আক্রমণ চালায়। ইহাতে আমাদের কিছু লোক আহত ও শহীদ হইলেন। 'এ' কোম্পানী যেটা উক্ত এলাকায় ছিল প্রায় ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। কিন্তু তাহার সুযোগ্য অধিনায়ক সুবেদার হাফিজ একদিনের মধ্যেই সমস্ত কোম্পানীকে একত্র করতঃ আরও শক্ত করিয়া ডিফেন্স নিলেন। তারিখটি ছিল ২৮শে জুলাই। দিন কয়েক পর পাকিস্তানীদের কয়েকটি অগ্রবর্তী ঘাঁটি- যাহা চাওই নদীর তীরে ছিল- তাহাতে আমরা প্রচণ্ড আঘাত হানি। তাহাদের অনেক হতাহত হয়। আমরা কিছু হাতিয়ার ও গোলাবারুদ কব্জা করি। এরপর ঘন ঘন ছোটখাটো আক্রমণ-প্রতিআক্রমণ বেশ কয়েক দফা হইয়া গেল। আমাদের নিয়মিত ফাইটিং পেট্রল পাকসেনাদের উপর আক্রমণ চালাইয়া বহু হতাহত করিতে লাগিল। এমন একটি দিন ও রাত বাকী থাকিত না যে, পাকিস্তানীরা আহত ও মৃত সৈন্য নিবার জন্য পাল্টা আক্রমণ ও কভারিং ফায়ার না করিত। এইদিকে আমাদের নবগঠিত 'ডি' কোম্পানীও পজিশনে আসিল এবং সবাই মিলে আরও এক মাইল অগ্রসর হইয়া পজিশন নিল। পাকিস্তানীদের বিতৃষ্ণার সীমা রহিল না কিন্তু সংখ্যা তাহাদের পূরণ হইতে থাকিত পিছনে হইতে নিয়মিত সৈন্য আমদানী করিয়া। এই পর্যায়ে একদিন প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন আহমদ দ্বিতীয়বারের মত আমাদের সাব সেক্টরে যান এবং ফিল্ড হেডকোয়ার্টার দেবনগরে শুভাগমন করতঃ বিভিন্ন অগ্রবর্তী ঘাঁটি পরিদর্শন করিয়া আমাদের জোয়ানদেরকে উৎসাহিত করেন।

আমাদের কর্মতৎপরতা দেখিয়া কর্তারা খুশী হইলেন এবং গোলাবরুদ ও গোলন্দাজ সাহায্য নিয়মিতভাবে দিতে লাগিলেন। এইদিকে আমাদের মর্টার প্লাটুনও গোলাবারুদ পাইয়া গুরুত্বপূর্ণ পাকিস্তানী অবস্থানসমূহের উপর সুযোগমত বার বার গোলাবর্ষণ করিয়া তাহাদের মনে ভীতির সঞ্চার করিয়া দিল। আমাদের সাব-সেক্টরের সৈন্যসংখ্যা বাড়িল, হাতিয়ার বাড়িল, গোলাবরুদ বাড়িল, শক্তি এবং মনোবল আরও দৃঢ় হইল, কর্মতৎপরতা এবং রণনৈপুণ্যে পাকিস্তানীরা পরাজিত হইতে লাগিল, কিন্তু পূর্ণতার জন্য আরো কিছু প্রয়োজন ছিল, আরও প্রশিক্ষণ ও কলাকৌশল দরকার ছিল। তাই ক্যাপ্টেন শাহরিয়ার একখানা ছোট বই ছাপাইয়া তাহার কপি সবাইকে দিলেন। তাহাতে সব নূতন-পুরাতন হাতিয়ারের যাবতীয় বিবরণ ও ব্যবহার পদ্ধতি সুন্দরভাবে লিখা ছিল। তাহাতে আরও ছিল বিভিন্ন ধরনের খবরাখবর ও উৎসাহের কথা, যাহা যুদ্ধের প্রয়োজনে জানা নেহায়েত দরকার। এইভাবে কাজের ও যুদ্ধের ফাঁকে অসুবিধা সত্ত্বেও চারিদিকে প্রশিক্ষণ চলিতে লাগিল। আমাদের ক্যাপ্টেন শ-খানেক উৎসাহী গ্রাম্য ছেলে ভর্তি করিলেন, যারা ছিল অত্র এলাকার বাসিন্দা। তাহাদের একমাস প্রশিক্ষণ দিবার পর চারটি কোম্পানীতে ভাগ করিয়া দেওয়া হইল, যাহাতে রাজাকার ও অন্যান্য দালাল ধরিয়া দিতে অসুবিধা না হয়। অধিকিন্তু এলাকা ও দুশমন সম্বন্ধে যেন সঠিক খবর পাওয়া যায়। এইসব নতুন লোক ভর্তি ও বিভিন্ন প্রশিক্ষণের বদৌলতে ইতিমধ্যে সাব-সেক্টরে একটি সুসংগঠিত পদাতিক ব্যাটালিয়নে পরিণত হইল।

সেপ্টেম্বর মাসের ৭ তারিখ একবার জগদলহাট অধিকার করা হইল কিন্তু পাকসেনাদের গোলন্দাজ ও জীপে বসানো মেশিনগানের গোলাগুলিতে টিকিয়া থাকা মুশকিল হইল। তাহারা পাল্টা আক্রমণ করে। আমাদের বাহিনী পশ্চাদপসরণে বাধ্য হয়। ঐ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ হইতে পাকিস্তানীরা রীতিমত ভড়কাইয়া গেল, কারণ, তখন হইতে হাতেকলমে সামরিক শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভের জন্য সদ্য ও স্বল্প প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা প্রতি সপ্তাহে গড়ে ২/৩ শত করিয়া আমাদের কাছে আসিতে লাগিল। তাহারা সপ্তাহ দুই-একের জন্য আসিত এবং অভিজ্ঞতা অর্জনের পর নিজ নিজ অঞ্চলে গেরিলা যুদ্ধের জন্য চলিয়া যাইত। ইহাতে আমাদের সরবরাহ ও ব্যবস্থাপনার অনেক অসুবিধা হইত বটে কিন্তু যুদ্ধের ব্যাপারে সুবিধও ছিল অনেক। আমাদের ক্লান্ত সৈন্যরা মাঝে মাঝে স্বস্তিতে বিশ্রাম করিতে পারিত।

জগদলহাটের আক্রমণটা কিন্তু আমাদের চূড়ান্ত যুদ্ধের মহড়া ছিল। এ ধরনের মহড়া আমরা প্রায়ই করিতাম। ভীত ও নিরাশ পাকিস্তানীরা বহু হতাহতের দরুন হাঁপাইয়া উঠিল। সুযোগ বুঝিয়া আমরা আরও দুই মাইল অগ্রসর হইলাম এবং চাওই নদী আমাদের নিয়ন্ত্রণে নিয়া আসিলাম। তাহাতে অবশ্য আমাদেরও কিছু হতাহত হইল। এ পর্যায়ে ৯ই অক্টোবর স্বাধীন বাংলার কমিশন প্রাপ্ত প্রথম ক্যাডেট দলের সদ্য পাশ করা তরুণ সেঃ লেফটেন্যান্ট আব্দল মতিন চৌধুরী ও সেঃ লেফটেন্যান্ট মাসুদুর রহমান আমাদের সাব-সেক্টরে যোগদান করিলেন। অফিসারের নিতান্তই অভাব ছিল, তাই নতুন হইলেও এতে আমরা যথেষ্ট উপকৃত হইলাম।

এরপর পাকিস্তানীদের চলাচল একেবারে সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িল, কারণ আমরা অগ্রসর হওয়াতে অমরখানা-পঞ্চগড় রাস্তা আমাদের পেট্রল ও প্রতিরক্ষা হাতিয়ারের আঘাত ক্ষমতার আওতায় আসিয়া গেল। আমরা তাহাদের পক্ষে সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিকর রক্ষাব্যূহ রচনা শুরু করিলাম। গড়ে বিভিন্ন অপারেশনে প্রতিদিন পাকিস্তানীদের পাঁচ/ছয়জন করিয়া হতাহত হইতে লাগিল। ২০/২৫ দিন এমনতর চলিল। পাকিস্তানীরা সৈন্য পরিবর্তন ও পরিপূরণ করিতে লাগিল।

তারপর আমরা দুশমনদের সুদূরবিস্তৃত ঘাঁটিগুলি এমনভাবে ঘেরাও করিয়া বিভিন্ন হাতিয়ারের সাহায্যে আক্রমণ চালাইতে লাগিলাম যাহাতে তাহারা অগ্রবর্তী ঘাঁটিগুলি ছাড়িয়া পিছে হটিতে শুরু করিল। এই সূত্র ধরিয়া ২১শে নভেম্বর বিকাল ৪ ঘটিকায় আমাদের প্রথম অগ্রাভিযান শুরু হয় তেঁতুলিয়া-ঠাকুরগাঁ-সৈয়দপুর পাকা রাস্তাকে অক্ষরেখা ধরিয়া। দুশমন পালাইতেছে আর আমরা পিছনে ধাওয়া করিয়া চলিয়াছি। ২২ তারিখ অমরখানা দখল করিয়া জগদলের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। লাল স্কুলের কিছু আগে দুশমনের আভাস পাওয়া গেল। রাত তখন ১১টা। পিছনে বহু কিছু বাকী ভাবিয়া ক্যাপ্টেন শাহরিয়ার অগ্রগমন বন্ধ করিয়া আত্মরক্ষামূলক পজিশন নিতে বলিলেন। অগ্রাভিযানের অক্ষে ছিল 'বি' ও 'সি' কোম্পানী। 'বি' কোম্পানীর অধিনায়ক ছিলেন সুবেদার আব্দুল খালেক আর 'সি' কোম্পানীতে ছিলেন লেফটেন্যান্ট আব্দুল মতিন এবং সুবেদার হাজী মুরাদ আলী। আবার তাহাদের ডাইনে-বামে ছিল যথাক্রমে সুবেদার আহমদ হোসেনের 'এ' কোম্পানী ও সুবেদার আবু হাশেমের 'ডি' কোম্পানী। তাহারা সকলে নিজ নিজ কোম্পানীর জিম্মাদারী এলাকা বুঝিয়া নিলেন ক্যাপ্টেনের কাছ হইতে।

পরদিন সকাল হইতে শুরু হইল আমাদের অগ্রাভিযান। আমরা এখন দলে ভারী। আমাদের চার কোম্পানী ছাড়াও ৫/৭ শত মুক্তিযোদ্ধা আমাদের সাথে যোগ দিয়েছে। গোলাবারুদ সাজসরঞ্জামেরও কমতি নাই। কাজেই দুশমনের উপর দিলাম ভীষণ চাপ। দুশমনদের পা এখন শূন্যে। তাহারা বহুদিনের পুরাতন রক্ষাব্যূহসমূহ ছাড়িয়া দিয়া আর পা মাটিতে লাগাইতে পারিতেছে না। তাহাদের ভাব এখন পালাই পালাই, প্রাণ বাঁচাই। আমাদের ভাব মার-মার। তাহারা ভীতসন্ত্রস্ত সদাচকিত পলায়নপর। আর আমরা মহাপ্রাপ্তির বিজয়ের নেশায় আরও শতগুণে উৎসাহিত ও মাতোয়ারা দিগ্বিজয়ী বীরের বেশে অগ্রসরমান। এ যেন অনেকটা নেকড়ে আর মেষের মোকাবিলা। তবু জগদলের নিকট বেশ কয়েকজন আহত ছাড়াও আমার সাব-সেক্টরের সর্বশ্রেষ্ঠ বীর বেঙ্গল রেজিমেন্টের লেঃ নায়েক শকিলউদ্দিন শহীদ হন। আমাদের আগে বাড়ার পালা চলিতে লাগিল। কোথাও তুমুল সংঘর্ষ, কোথাও মামুলি, আবার কোথাও একবারে না।

২৭শে নভেম্বর। পঞ্চগড় শহর মুক্ত হইল। আগাইয়া চলিলাম। বোদা পৌঁছিলাম। যুদ্ধের সাধারণ বাধাবিপত্তি কাটাইয়া (কোথাও দুশমন কর্তৃক পুল উড়াইয়া দেওয়া, কোথাও বা মাইন পুঁতিয়া রাখা) অগ্রাভিযান জারি থাকিল। ৩রা ডিসেম্বর ঠাকুরগাঁ শহর কব্জা হইল। ৪ঠা ডিসেম্বর সমাগত। এক্ষণে মিত্রবাহিনী সাঁজোয়া ও গোলন্দাজ ইউনিটসহ আমাদের সঙ্গে আসিয়া যোগ দিলেন। কেননা পকিস্তান ততক্ষণে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে এবং মহান ভারতও তাহার চ্যালেঞ্জ গ্রহন করিয়া প্রত্যক্ষ সমরে নামিয়াছে। বাস। আমাদের পায়াভারী। আরও নির্ভয় ও বেপরোয়া হইয়া উঠিলাম- আগে বাড়িয়া চলিলাম। বিরাম নাই। আগে বাড়িতে বাড়িতে একেবারে বীরগঞ্জ-ভাতগাঁও ব্রীজ। এ অগ্রভিযানে ইতিমধ্যে বোদা, বীরগঞ্জ ও অন্যান্য স্থানে বহু দুশমন হইয়াছে আহত

আর বন্দী। প্রচুর হাতিয়ার ও গোলাবারুদ, রেশন ও অন্যান্য সরঞ্জাম হইয়াছে আমাদের হস্তগত। রাজাকার এবং দালালের তো কথাই নাই। কুড়ি-কুড়ি শ-শ প্রতিদিন আত্মসমর্পণ করিতেছে আর অজস্র হাতিয়ার-গোলাবারুদ দিয়া যাইতেছে জমা।

৯ অথবা ১০ই ডিসেম্বর। স্থান ভাতগাঁও ব্রীজ আর তার আশপাশ এলাকা। দুশমনদের নিকট হইতে আসিল ভীষণ বাধা। দুইটি ট্যাঙ্ক ধ্বংসসহ বহু মিত্র সৈন্য হতাহত হইল, যাহা এই এলাকায় এর আগে হয় নাই কখনো। অগত্যা একনাগাড়ে কয়েকদিন ওখানে থাকিতে হইল, মিত্রবাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করা হইল। সম্মুখের দিকে একেবারে চুপ থাকিয়া বাম হাতে খানসামা হইয়া হঠাৎ প্রবল আক্রমণ চালান হইল- যাহাতে অংশ নিল মিত্রবাহিনীর ছয়টি মাঝারিসহ ৬০টি কামান, একখানা হেলিকপ্টার, দুইটি ফাইটার ও একটি ট্যাঙ্ক বহর। মূহুর্তে বহু দুশমন সেনা হতাহত হইল, ধ্বংস হইল ৬ খানা ট্যাঙ্ক, বাকী দুশমন সৈন্য ঘাঁটি ছাড়িয়া লেজ গুটাইয়া নীলফামারীর দিকে দিল ছুট। ফলে প্রধান অংশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অবরুদ্ধ হওয়ার নিশ্চিত আশঙ্কায় দুশমনরা ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাহারা ভাতগাঁওয়ের বিখাত ও গুরুত্বপূর্ণ মজবুত পুলটিকে একবারে ধ্বংস করিয়া আমাদের জন্য একটি বিরাট বাধা সৃষ্টি করতঃ সে এলাকায় হইতেও পাততাড়ি গুটাইল একেবারে সৈয়দপুরে। আমাদের তরফ হইতেও দুইমুখী পশ্চাদ্ধাবন চলিতে লাগিল নাছোড়বান্দা হইয়া। সৈয়দপুর প্রায় ঘেরাও। হঠাৎ দেখা গেল পাকবাহিনীর হাতে সাদা নিশান-শান্তির প্রতীক-আত্মসমর্পণের চিহ্ন। জেনেভা কনভেশন- নমস্য। তাই আমাদের অস্ত্র সংবরণ করিতে হইল- লড়াইয়ে দিতে হইল ইতি। দিনটি ছিল ১৬ই ডিসেম্বর।

স্বাক্ষরঃ মোঃ কাজিমউদ্দিন
ডি-এ-ডি
১২-৬-১৯৭৪

সাক্ষাৎকারঃ মোঃ নূরুজ্জামান*

২৭শে মে ভোরবেলা সেক্টর কমান্ডিং প্রধান ক্যাপ্টেন নওয়াজেশ সাহেব, সুবেদার গোলাম মোস্তফা এবং আমি থানা হেডকোয়ার্টারে বসে ছিলাম। এমন সময় উলিপুর (থানা) নিবাসী বলে পরিচয়দানকারী দু'জন মৌলভী সাহেব পাকিস্তানী সৈন্যরা ধরলা নদী অতিক্রম করে নাই বলে জানায় এবং মুক্তিযোদ্ধাদেরকে পুনরায় পাটেশ্বরী ডিফেন্সে পাঠাতে অনুরোধ করে। হানাদার সৈন্যরা ধরলা নদী অতিক্রম করে নাই এই মর্মে তারা শপথ করে। উক্ত শপথের উপর ভিত্তি করে একটি ট্রাক, একটি পিকআপ গাড়ী ও একটি জীপগাড়ী বোঝাই প্রায় ১০০জন গেরিলাকে ঐ দিনই পুনরায় পাটেশ্বরী ডিফেন্সে পাঠানো হয়। গেরিলদের বহনকারী গাড়ী তিনটি পাটেশ্বরী ডিফেন্সের কাছাকাছি পৌছাতেই এ্যামবুশরত পাকিস্তানী সৈন্যরা তাদের ঘিরে ফেলে। ফলে গেরিলারা দিশেহারা হয়ে লাফিয়ে নিচে নেমে হানাদার সৈন্যদের সাথে খণ্ডযুদ্ধে লিপ্ত হয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই গেরিলারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে এবং বেশ কিছুসংখ্যক মুক্তিযোদ্ধা হানাদার সৈন্যদের গুলিতে নিহত হন। গেরিলা যোদ্ধাদের অন্যতম প্রধান কমাণ্ডার মোজাহিদ ক্যাপ্টেন শত্রুসৈন্যদের অজস্র গুলির মুখেও সংঘর্ষস্থল পরিত্যাগ করে নাই। বেশ কিছুসংখ্যক হানাদার সৈন্যকে খতম করে তিনি বীরের ন্যায় মৃত্যুবরণ করেন। এই সংঘর্ষে নিহত মুক্তিযোদ্ধারা হলেনঃ ১। সিপাহী আবুল কালাম, সাবেক ই-পি-আর নং ১৯৩৭৭; ২। সিপাহী আবুল কাশেম, সাবেক ই-পি-আর নং- ৫৫৩৪; ৩। সিপাহী সেকেন্দার আলী, সাবেক ই-পি-আর নং- ১৪২৮০; ৪। এম এপ, দেলওয়ার হোসেন; ৫। এম, এফ ড্রাইভার আফজাল হোসেন; ৬। এম, এফ ড্রাইভার গোলাম রব্বানী; ৭। আতিকুর রহমান (কুক); ৮। সিপাহী আবুদল আলী, সাবেক ই-পি-আর; ৯। মোজাম্মেল হক (কুক); ১০। এম, এফ রবীজউদ্দিন ভুইয়া (ছাত্র); ১১। এম, এফ, আবুল কাশেম (ছাত্র); ১২।এম, এফ, আসাদুল্লা (ছাত্র); ১৩। এফ, এম, আব্দুল ওহাব (ছাত্র)।

* সাক্ষাৎকারটি প্রকল্প কর্তৃক ১৫-৭-৭৮ তারিখে গৃহীত।

এই ঘটনার পর পাটেশ্বরী প্রতিরোধ ঘাঁটি ভেঙ্গে যায়। পাকিস্তানী সৈন্যরা নাগেশ্বরী থানা বাজারে ঢুকে সমগ্র বাজারে আগুন ধরিয়ে দেয়। বাজারে অবস্থানরত একজন পাগলকে দেখামাত্র সৈন্যরা তাকে গুলিবিদ্ধ করে হত্যা করে। হানাদার সৈন্যরা নাগেশ্বরী বাজারে প্রবেশের পরপরই রায়গঞ্জ সেতুর নিকট ডিফেন্সরত মুক্তিযোদ্ধাদেরকে সরিয়ে নেয়া হয়। ভূরুঙ্গামারী থানার সাথে যোগাযোগ রক্ষাকারী রায়গঞ্জ বাজার সংলগ্ন বৃহৎ সেতুটি মুক্তিযোদ্ধারা ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেয়।

নাগেশ্বরী থানায় অবস্থান পাকাপোক্ত করার পর হানাদার সৈন্যরা ভূরুঙ্গামারী থানার দিকে অগ্রসর হতে শুরু করে। ইতিমধ্যে ভূরুঙ্গামারী থানা সদরে অবস্থিত গেরিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বন্ধ করে দেয়া হয় এবং গেরিলা দফতর সীমান্তের ওপারে পশ্চিম বাংলার কুচবিহার জেলার সাহেবগঞ্জ বাজারে সরিয়ে নেয়া হয়। সেখানেই দ্রুত কয়েকটি অস্থায়ী গেরিলা ঘাঁটি গড়ে তোলা হয়। পরে গেরিলা যোদ্ধারা এই অস্থায়ী ঘাঁটিগুলো থেকে ভূরুঙ্গামারী থানা সদরে পার্শ্ববর্তী স্থানে অবস্থানরত হানাদার সৈন্যদের উপর অতর্কিত আক্রমণ শুরু করে।

সুবেদার বোরহান তাঁর অধীনস্থ মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে ভূরুঙ্গামারী থানার অন্তর্গত সাবেক রেলওয়ে স্টেশন সোনাহাটে চলে যান। পাকিস্তানী সৈন্যরা ভূরুঙ্গামারী থেকে সাবেক পাটেশ্বরী রেলওয়ে স্টেশনের নিকটবর্তী দুধকুমার নদীর উপর অবস্থিত পাটেশ্বরী রেলওয়ে ব্রীজ অতিক্রম করে সোনাহাটে যাতে পৌছতে না পারে সেজন্য পাটেশ্বরী ব্রীজের পূর্বতীরে মুক্তিযোদ্ধাদেরকে মোতায়েন করা হয়।

১৫ই জুন সাহেবগঞ্জ অস্থায়ী ঘাঁটির গেরিলারা ভূরুঙ্গামারীর অদূরে বাংলাদেশ সীমান্তে অবস্থিত ই-পি-আর ফাঁড়িতে অবস্থানরত পাকসৈন্যদের উপর আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণে বেশ কয়েকজন পাকসৈন্য নিহত হয়। গেরিলাদের পক্ষে মোট তিনজন নিহত হন। নিহত গেরিলারা হলেনঃ (১) সিপাহী আব্দুস সোবহান, ই-পি-আর নং-১৬০৭৪; (২) সিপাহী মনসুর আহমদ, ই-পি-আর নং-৫৮০৪; (৩) কুক আবু কালাম (ই-পি-আর)।

২৯শে জুন মুক্তিযোদ্ধাদের একটি দল মোগলহাটে অবস্থানরত পাকসৈন্যদের উপর হঠাৎ হামলা চালিয়ে বেশ কয়েকজনকে হতাহত করে। এখানে মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল বারী নিহত হন। মুক্তিযোদ্ধারা হানাদার সৈন্যদের বেশ কিছু অস্ত্র দখল করতে সক্ষম হন।

১৪ই জুলাই বড়খাতায় অবস্থানরত পাকসৈন্যদের উপর অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে গেরিলারা ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে। মুক্তিযোদ্ধা সিপাহী মুহাম্মদ আলী (ই-পি-আর নং ৭২৯৬) হানাদার সৈন্যদের গুলিতে নিহত হন। বড়খাতায় হানাদার সৈন্যদের অবস্থানে মুক্তিযোদ্ধাদের অপর আর একটি দল আক্রমণ চালায় ২৩শে জুলাই। সিপাহী আনোয়ার হোসেন, ই-পি-আর এই সংঘর্ষে নিহত হন।

ভূরুঙ্গামারী থানা সদরে প্রবেশের পর পাকসৈন্যরা বাজার সংলগ্ন ভূরুঙ্গামারী কলেজে তাদের অবস্থান সুদৃঢ় করেছিল। মুক্তিযোদ্ধাদের একটি বিরাট দল ভারী অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ২রা আগস্ট হানাদার সৈন্যদের উক্ত অবস্থানের উপর প্রচণ্ড আঘাত হানে। এই সংঘর্ষে উভয় পক্ষই মেশিনগান ও কামান ব্যবহার করে। মুহুর্মুহু প্রচণ্ড কামানের শব্দে চারদিক প্রকম্পিত হতে থাকে। হানাদার সৈন্যরা তাদের অবস্থান থেকে সরে না গেলেও বহু হতাহত হয়। এই প্রচণ্ড যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধা আনসার আলী নিহত এবং বেশকিছুসংখ্যক আহত হন। মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানী সৈন্যদের উপর চাপ অব্যাহত রাখেন। ১৩ই আগস্ট পুনরায় বুরুঙ্গামারী বাজারের সন্নিকট থেকে হানাদার সৈন্যদের উপর আক্রমণ চালানো হয়। এই আক্রমণ অল্প সময়ের মধ্যেই প্রচণ্ড সংঘর্ষের রূপ নেয়। সৈন্যরা ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে। মুক্তিযোদ্ধা সিপাহী কবির আহমদ, ই-পি-আর নিহত হন। এর পর থেকে আমাদের গেরিলা যোদ্ধাদের আক্রমণ ক্ষমতা বেড়ে যায়। ভারত থেকে আমরা পর্যাপ্ত গোলাবারুদ পাচ্ছিলাম। ভারী অস্ত্র চালনায় গেরিলা যোদ্ধারা বেশ দক্ষ হয়ে উঠছিল।

২৫শে আগস্ট কুড়িগ্রাম শহরে অবস্থানরত পাকিস্তানী সৈন্যদের প্রেরিত গেরিলা লীডার সিপাহী মকবুল হোসেনকে (ইপকাপ নং ২৯১২৭) কুড়িগ্রাম থেকে ৫ কিলোমিটার দূরে প্রতাপ গ্রামে ছদ্মবেশে তৎপর থাকাকালীন আমাদের গেরিলারা গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়। পাকিস্তানী সৈন্যদের প্রেরিত গেরিলা লীডার মকবুল নারীর ছদ্মবেশে উক্ত গ্রামে খবর সংগ্রহের জন্য ঘোরাফেরা করছিল।

৬ই নভেম্বর প্রত্যুষে প্রায় আড়াই হাজার মুক্তিযোদ্ধা এম-এফ/এফ-এফ ৪ থেকে ৫ ব্যাটেলিয়ান ভারতীয় সৈন্যদের সহযোগিতায় ভূরুঙ্গামারী থানার জয়মনিরহাটে (মহাযুদ্ধকালীন বৃটিশরাজ নির্মিত রেলওয়ে স্টেশন) পাকিস্তানী সৈন্যদের শক্তিশালী অবস্থান ঘাঁটির উপর প্রচণ্ড আঘাত হেনে দখল করে নেয়। এই প্রচণ্ড সংঘর্ষে বহুসংখ্যক পাকিস্তানী সৈন্য হতাহত হয়। পাকিস্তানীদের বিপুলসংখ্যক আধুনিক মারণাস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা ও ভারতীয় বাহিনী হস্তগত করে। ভারতীয় বাহিনীর কিছুসংখ্যক জোয়ান সংঘর্ষকালীন নিহত হয়। অথচ মুক্তিযোদ্ধাদের এম-এফ/এফ-এফ'দের মধ্যে মাত্র কয়েকজন নিহত হন।

১৩ই নভেম্বর ভূরুঙ্গামারী থানার ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। এইদিন মুক্তিযোদ্ধা ও ভারতীয় সহায়ক সৈন্যদের সম্মিলিত বিরাট বাহিনীর বীরযোদ্ধারা হানাদার সৈন্যদের দখল থেকে ভূরুঙ্গামারী মুক্তি করেন। এই অভিযানে ভারতীয় সহায়ক বাহিনীর নেতৃত্ব দেন ব্রিগেডিয়ার যোশী এবং মুক্তিযোদ্ধাদেরকে পরিচালনা করেন সাবেক বিমান বাহিনীর উইং কমাণ্ডার ও যুদ্ধকালীন সেক্টর কমাণ্ডার কে, এম, বাশার ও সাব-সেক্টর কমাণ্ডার মেজর নওয়াজেশ। ১৩ই নভেম্বরের এই সম্মিলিত আক্রমণে ৩ জন পাঞ্জাবী সৈন্যকে জীবন্ত ধরা হয়। কোন পথেই পাকিস্তানীরা পালাতে না পেরে বহু মারা পড়ে। সৈন্যদের পরিত্যক্ত বিপুল সমরসম্ভার সম্মিলিত বাহিনীর হস্তগত হয়। ভূরুঙ্গামারী দখলের পরপরই বেশ কিছুসংখ্যক বাঙ্গালী শিক্ষিতা মহিলাকে স্থানীয় সার্কেল অফিসার উন্নয়ন অফিসে বন্দী অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। মহিলাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ছিলেন। বর্বর সৈন্যরা এদেরকে বিভিন্ন স্থান থেকে অপহরণ করে এখানে এনে রেখেছিল।

২২শে নভেম্বর রংপুর জেলার অন্তর্গত বড়খাতায় হানাদার বাহিনীদের সাথে মুক্তিযোদ্ধাদের এক প্রচণ্ড সংঘর্ষে কোম্পানী কমাণ্ডার মুক্তিযোদ্ধা ফজলুর রহমান (নং ০৫৯৩) শহীদ হন। এছাড়া আরো দুজন মুক্তিযোদ্ধা সংঘর্ষকালে শহীদ হন। সংঘর্ষে পাকিস্তানীরা গোলন্দাজ বাহিনী ব্যবহার করে। শহীদ মুক্তিযোদ্ধারা হলেনঃ হাবিলদার রঙ্গু মিয়া (নং ৭০২১২৪৭) ও এম-এফ নাসির আহমেদ। (এম-এফ নাসির আহমদ ঐ সময় মেজর পদে উন্নীত হয়েছিলেন)।

২০শে নভেম্বর বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে কমিশনপ্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ ছাত্র লেঃ সামাদ কুড়িগ্রাম মহকুমার অন্তর্গত রায়গঞ্জ সি এণ্ড বি পুলের দুই পার্শ্বে অবস্থানরত হানাদার বাহিনীর শক্তিশালী ঘাঁটির উপর আক্রমণ চালান। তাঁকে ভারতীয় সহায়ক বাহিনী দিয়ে সাহায্য করে ভারতীয় ব্রিগেডিয়ার যোশী। প্রচণ্ড সংঘর্ষে এক পর্যায়ে যখন হানাদার সৈন্যদের সাথে মুক্তিযোদ্ধাদের হাতাহাতি সংঘর্ষ শুরু হয় তখন দুঃসাহসী সামাদ মুক্তিযোদ্ধাদেরকে পরিচালনা করছিলেন বীরবিক্রমে। হঠাৎ হানাদার বাহিনীর গুলির আঘাতে তিনি আহত হয়ে সংঘর্ষে ক্ষেত্রেই মৃত্যুবরণ করেন। এই ভয়াবহ সংঘর্ষে নিহত অপর মুক্তিযোদ্ধা হলেন ই-পি-আর সিপাহী কবীর আহমদ (৫০১৬৫) এবং আবদুল আজিজ। তীব্র মুখোমুখি যুদ্ধের পর মুক্তিযোদ্ধাগণ শত্রুদের রায়গঞ্জ ও আন্ধারীঝাড় অবস্থান দখল করেন। বহুসংখ্যক পাকিস্থানী সৈন্য হতাহত হয় এবং বিপুল পরিমাণ সমরাস্ত্র সম্মিলিত বাহিনীর হাতে আসে।

২৪শে নভেম্বর মুক্তিবাহিনীর যোদ্ধারা নাগেশ্বরী থানাও পাটেশ্বরীতে অবস্থানরত সৈন্যদের ঘেরাও করে। ঐ দিনের সংঘর্ষে সাইদুর রহমান এফ-এফ ৯০/৩৫, সেরাজুল হক এফ-এফ ১১৮/২০ এবং সোহরাব আলী এফ-এফ ১১৮/৩৬ নিহত হন।

২৮শে নভেম্বর সম্মিলিত বাহিনী নাগেশ্বরী ও বেপারীহাট মুক্ত করে। বেপারীহাট সংঘর্ষে সিপাহী এম-এফ আলী আকবর (৫০৭১২) এবং সিপাহী এম-এফ আবুল হোসেন (৫০৮৫৩) নিহত হন। এর পর পরই ধরলা নদীর উত্তর তীরের বিস্তীর্ণ অঞ্চল হানাদার বাহিনীর কবলমুক্ত হয়।

মোঃ নূরুজ্জামান
বাংলাদেশ রাইফেলস
১০ম শাখা, রংপুর
১৫-৭-৭৮

সাক্ষাৎকারঃ লেঃ কর্নেল মতিউর রহমান*

আমরা দিল্লী থেকে কলকাতাতে ফ্লাই করি মে মাসে। তারপর আমরা বাংলাদেশের ফোর্সেস হেডকোয়ার্টারে আসি। সেখানে নুরকে নিযুক্ত করা হলো এ-ডি-সি টু সি-ইন-সি। আমি এবং ডালিম-দু'জনকেই সি-ইন-সি'র গেরিলা এডভাইজার হিসাবে এ্যাপয়েন্টমেন্ট দেয়া হয়। আমি ছিলাম ৬নং সেক্টরের জন্য ডালিম ছিল যশোর এরিয়ার অর্থাৎ ৮নং সেক্টরের জন্য। আমরা জেনারেল ওসমানীর সাথে দিল্লী থেকে কলকাতা এলাম। যদিও আমি আমার ইউনিটে অর্থাৎ ৩য় ইস্ট বেঙ্গলে যোগদান করতে চেয়েছিলাম কিন্তু জেনারেল ওসমানী তাতে মত দিলেন না। তিনি আমাকে নিয়ে এলেন ৬নং সেক্টর এলাকায়। তখনও ৬নং সেক্টর হয়নি। ওখানে তখন ক্যাপ্টেন নওয়াজেশ ছিলেন। তাঁর কাছে আমাকে রেখে দেন। আমাকে ইনস্ট্রাকশন দেয়া হয় আমি যেন বাংলাদেশের ভেতরে না ঢুকি। কেন আমাকে এই ইনস্ট্রাকশন দেয়া হলো আমি বুঝতে পারিনি। ইন্ডিয়ানদেরকেও বলে দেয়া হয় আমাকে যেন বাংলাদেশের ভিতরে ঢোকার অনুমতি দেয়া না হয়। আমি কর্নেল নওয়াজেশের সাথে থাকতে থাকতে বোর ফিল করি। কোন কাজ নেই একমাত্র এ্যাসেসমেন্ট ছাড়া। আমি আস্তে আস্তে বি-ডি-আর ট্রুপস নিয়ে ছোটখাটো রেইড, এ্যামবুশ করতে থাকি। কর্নেল নওয়াজেশ ভুরুঙ্গামারী এলাকায় থাকতেন।

একবার মনে আছে, ইন্ডিয়ানরা খবর দেয় যে ভূরুঙ্গামারীতে ৩০/৩৫ জন পাকসেনা আছে। ৩৫ জন লোক খুব কমই। তখন আমি একটা প্লাটুন এবং কর্নেল নওয়াজেশ একটা প্লাটুন নিয়ে ভূরুঙ্গামারী রেইড করতে যাই। ম্যাপ অনুযায়ী আমাকে শুধু একটা নদী পার হতে হবে। আমার কাছে পাকিস্তানী সৈন্যের বুলেটকে যত না ভয় ছিল তার থেকে পানি পার হওয়া বেশী ভয়ের ব্যাপার ছিল। যাই হোক, তারা আমাকে দুটো কলাগাছ একসাথে করে ভেলা বনিয়ে তার উপর শুইয়ে টেনেটেনে পার করায়। এই নদীই রাতে আমাকে চারবার পার হতে হয়েছে। আমাকে ফাঁকি দেয়ার জন্য তারা একবার এপারে আবার ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে ওপারে এভাবে চারবার পার করিয়েছে। যে সময়ের মধ্যে আমাদের ভূরুঙ্গামারী যাবার কথা সেই সময় পার হয়ে যায়। ম্যাপ অনুযায়ী আমি বুঝতে পারছিলাম না কোথায় যাচ্ছি, কেননা পানিতে আমি পুরোপুরি অন্য লোকের উপর নির্ভর করতাম। যখন ভোর হয়ে আসে তখন আমি ওদের চালাকি বুঝতে পারি। আমরা ফেরত আসি। তখন ইন্ডিয়ান যে ব্রিগেডিয়ার ছিলেন তিনি খুব তচ্ছিল্যের সাথে আমাকে বলেছিলেন যে আমার জন্যই রেইডটা সফল হয়নি, আমার সাহস নেই এইসব। এতে আমার খুব রাগ ধরে। ব্রিগেডিয়ার সাহেবকে দেখাবার জন্যে, সম্ভবতঃ জুলাই মাস হবে, পরের রাতে আমিও আমার ব্যাটম্যান এবং আরেকটা লোক আমরা তিনজনে ভূরুঙ্গামারী যাই। সেখানে আসলে একটা কোম্পানী ছিল। এই কোম্পানীর ৪ মাইল দূরে আরেকটা প্লাটুন ছিল। কোম্পানী কমাণ্ডার সন্ধ্যার সময় প্রায়ই বলতে গেলে রোজই, ঐ প্লাটুন থেকে মূল কোম্পানীতে চলে যেতো। আমরা প্ল্যান করি পথের মধ্যে ঐ কোম্পানী কমাণ্ডারকে এ্যামবুশ করবো। আমরা দুপুরে খাওয়ার পরে রওনা হলাম। আমরা বর্ডার ক্রস করে ভিতরে ঢুকি। জায়গায় পৌছে রাস্তা থেকে ৩০০/৪০০ গজ দূরে থাকতে কোম্পানী কমাণ্ডারের জীপ আমাদেরকে

---

* সাক্ষাৎকারটি প্রকল্প কর্তৃক ১৮-১-১৯৮০ তারিখে গৃহীত।

ক্রস করে চলে যায়। ফলে তাকে এ্যামবুশ করা সেদিনের মত হয়নি। কিন্তু তাকে ধরবার জন্য খোলা মাঠের উপর দিয়ে আমরা পিছনে পিছনে দৌড়ে যাই, হঠাৎ দেখি সামনে সাদা বিল্ডিং। আমি শুনেছিলাম যে, ভূরুঙ্গামারী কলেজে পাকিস্তান আর্মি থাকে। ভূরুঙ্গামারীর একমাত্র সাদা বিল্ডিং হচ্ছে ঐ ভুরুঙ্গামারী কলেজ। আমরা দৌড়াতে দৌড়াতে ঐ সাদা বিল্ডিং-এর প্রায় ৩০ গজ দূরে চলে গিয়েছিলাম। যখন বাঁশঝাড় থেকে বের হই তখনই দেখি সাদা বিল্ডিং এবং সঙ্গে সঙ্গে আমরা থেমে যাই। আবার বাঁশ ঝাড়ের ভিতর চলে যাই। কেননা, এখানেই পাকিস্তান আর্মি থাকে। আমরা তখন ওদের কথাবার্তা শুনছি। বাঁশঝাড় থেকে কলেজ খুব বেশী হলে ৫০ গজ। সামনে ছোট ছোট পাটগাছ। সন্ধ্যা হয়ে গেছে, চাঁদ ছিল, তাই পরিষ্কার সবকিছু দেখা যায়। কলেজের পাশ দিয়ে পাকিস্তানী সেন্ট্রীগুলো হাঁটছে, আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম। ইন্ডিয়ান ব্রিগেডিয়ার যে কমেন্ট করেছিলো সেটা আমার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিলো। আমার মাথায় চিন্তা ছিল কিছু একটা করতে হবে। সেজন্য আমি অপেক্ষা করতে থাকি। আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি যেন বৃষ্টি আসে। অন্ততঃ মেঘ আসুক যাতে চাঁদ না থাকে, অন্ধকার হয়ে যায়। এ রকম অপেক্ষা করতে করতে রাত যখন দেড়টা-দুইটা তখন ঠিকই মেঘ আসলো এবং ঝির ঝির করে বৃষ্টি পড়তে শুরু করলো। রাত সাড়ে দশটার দিকে পাকিস্তানী আর্মি দিনের ডিউটি শেষ করে ঘুমাতে যায়, সেনট্রী বাদে। আমরা সেনট্রীদের দেখতে পাচ্ছিলাম। হাঁটাচলা করছে। আমি এবং আমার ব্যাটম্যানের হাতে দুটা করে গ্রেনেড। আমাদের সাথে যে আরেকটি লোক ছিল ও হাতে এল-এম-জি ছিল। তাকে আমরা পাশে রেখেছিলাম। তাকে অর্ডার দিয়েছিলাম যে, গ্রেনেডের চারটা এক্সপ্লোশন হওয়ার পরে সে ফায়ার করতে থাকবে যেন আমরা উইথড্র করতে পারি। বৃষ্টির ভিতর আমরা পাটক্ষেতের মধ্য দিয়ে ক্রস করতে করতে বিল্ডিং-এর কাছে পৌছাই এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি বিল্ডিং-এর বারান্দায় চৌকীর উপরে পাকিস্তানী আর্মিরা শুয়ে আছে। পাকিস্তানী সেনট্রীটা যখন হেঁটে আমাদের ক্রস করে চলে যায় তখন আমরা দুজন দৌড়ে আমাদের গ্রেনেড ফেলে দিয়ে ফেরত চলে আসি। তখনও আমরা জানতাম না পাকিস্তানীদের কি ক্ষয়ক্ষতি হলো। আমরা দৌড়ে ফেরত আসছি, ততক্ষণে পাকিস্তানীরা গুলি করতে শুরু করেছে। হঠাৎ আমি আছাড় খেয়ে পড়ে যাই। মনে হলো আমার পায়ে কিছু একটা লেগেছে। পরে দেখি আমার ডান পাটা অবশ হয়ে গেছে, আমি আর উঠতে পারছি না। আমার ব্যাটম্যান এবং আমার সাথের লোকটি দু'জনে ধরে আমাকে উঠায়। তখন দেখি যে আমার পায়ে একটা গুলি লেগেছে। গুলিটা বেশী ভেদ করে যেতে পারেনি, কেননা আমরা বেশ দূরে ছিলাম ওরা তাড়াতাড়ি ঘাড়ে করে আমাকে নিয়ে আসে। এবং আমরা আবার ইন্ডিয়াতে ফেরত আসি। সেখানে আমাদের ডাক্তার ছিল, সে গুলি বের করে ব্যান্ডেজ করে দেয়। আমি সতিদিন পরেই ঠিক হয়ে যাই। পরে আমরা জানতে পারি যে, সেদিনের গ্রেনেড বিস্ফোরণের ফলে ৭ জন পাক আর্মি নিহত এবং ১৫ জন আহত হয়েছে।

কয়েকদিন পর ভূরুঙ্গামারীতে দুই কোম্পানী নিয়ে আক্রমণ করার প্ল্যান করা হয়। খুব সম্ভব জুলাই/আগস্টের দিকে। সেখানে পাকিস্তানীদের এক কোম্পানী ছিল। ঐ জায়গাটা দখল করার জন্য আক্রমণের প্ল্যান করা হয়। ইন্ডিয়ানরা আমাদের আর্টিলারী সাপোর্ট দেবে। আমরা দুই কোম্পানী সারারাত হাঁটার পরে ভোরবেলা ঐ কলেজের কাছে পৌছাই। ভোর হচ্ছে হচ্ছে এমন সময় জয়বাংলা বলে আক্রমণ করি। মোট দুটি কোম্পানী ছিল। দুটিরই ফিল্ড কমাণ্ডার আমি ছিলাম। কর্নেল নওয়াজেশ অবশ্য কোম্পানী কমাণ্ডারের কাজ করেননি, তিনি ব্যাটালিয়ান কমাণ্ডারের কাজ করেছেন। তিনি যুদ্ধকে ডাইরেকক্ট করছিলেন পিছন থেকে। এছাড়াও আরো ৮০জন গিয়েছিল, সেটা লেঃ ফারুকের অধীনে ছিল। তাদের কাজ ছিল নাগেশ্বরী থেকে যে রোড এসেছে ভূরুঙ্গামারীতে সেই রোডের উপর এ্যামবুশ করা, যাতে পাকিস্তানীরা রিইনফোর্সমেন্ট না আনতে পারে। এজন্য সে প্রায় সাড়ে তিন মাইল দূরে জয়মনিরহাট রেলওয়ে স্টেশনের কাছে এ্যামবুশ পাতে এবং আমরা ৫০ গজ দূর থেকে জয়বাংলা বলে আক্রমণ শুরু করি। পাকিস্তানীরা প্রথমেই গুলি করে। তাদের সম্মুখে যে বাঙ্কারগুলো ছিল সেগুলো থেকে উইথড্র করে তারা পিছনে সরে যায়। আমাদের লোকেরা সবাই পাকিস্তানীদের গুলি আসার সাথে সাথে মাটিতে শুয়ে পড়ে। আমি অনেক চেষ্টা করেও তাদের মাটি থেকে উঠাতে পারিনি। তবে আমি কিছু লোক নিয়ে কলেজ বিল্ডিং-এর দিকে এগিয়ে যাই। ইতিমধ্যে ইন্ডিয়ানরা যে আমাদের আর্টিলারী সাপোর্ট দিচ্ছিলো সেটা ভুল হওয়াতে আমাদের গোলাই আমাদের উপর এসে পড়তে শুরু করে, যার ফলে আমাদের ৪/৫ জন মারা

যায়। আমরা দেখছিলাম যে পাকিস্তানীরা পালিয়ে যাচ্ছিলো। আমরা তাদের উপর গুলি করছিলাম। এবং কলেজ বিল্ডিং-এ তাদের যা কিছু ছিল তাতে আমরা আগেই আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলাম। এভাবে প্রায় সাড়ে আটটা বেজে যায়। ইতিমধ্যে পেছন দিক থেকে লেঃ ফারুক যে রোডের উপর এ্যামবুশ করেছিল শত্রুরা সেই এ্যামবুশের উপর দিয়ে তাদেরকে ক্রস করে আমাদের পিছনের দিকে চলে আসে। সুতরাং আমাদের সামনেও পাকিস্তানীরা ছিল, পিছন দিকেও পাকিস্তানীরা ছিল। যদিও কর্নেল নওয়াজেশ আমাকে আক্রমণ চালিয়ে যাবার জন্য উৎসাহ দিচ্ছিলেন কিন্তু আমি বুঝতে পারছিলাম যে আক্রমণ চালিয়ে যাওয়া মানে আমার দলের অনেক লোক হতাহত হওয়া। কারণ আমার দলের লোকদের ভাল ট্রেনিং নেই। পাকিস্তানীরা মর্টার ছোড়া শুরু করেছিল। ওখানে থাকা মানে আমাদের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হওয়া। এই জন্য আমি ওখান থেকে আমার লোকজন নিয়ে উইথড্র করে আবার ইন্ডিয়াতে ফেরত চলে আসি। এই ব্যাপারটা নিয়ে কর্নেল নওয়াজেশের সাথে আমার বেশ গণ্ডগোল হয়, যার ফলে তখন আমাদের সেক্টর কমাণ্ডার নিযুক্ত হয়েছিলেন এম, কে, বাশার। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে, আমাকে একটা আলাদা সাব-সেক্টর দেয়া হবে। সেটা হচ্ছে পাটগ্রাম। পাকিস্তান আর্মি তখনও পাটগ্রামে আসেনি।

পাটগ্রাম এমন একটা জায়গা যেটা লম্বায় প্রায় ২২ মাইল, চওড়ায় দু'পাশে ইন্ডিয়া, অনেকটা লাউয়ের মত। লাউয়ের গলাটা আড়াই মাইল। আড়াই মাইল জমি বাংলাদেশের, দু'পাশে ইন্ডিয়া। মধ্যখান দিয়ে একটা রেলওয়ে লাইন চলে গেছে। এজন্যই হয়তো সেই এলাকায় পাকিস্তান আর্মি আসেনি বা আসতে সাহস করেনি। আমাকে বি-ডি-আর মুক্তিফৌজের একটা কোম্পানী দিয়ে বলা হলো যে পাটগ্রাম এলাকাকে যে কোভাবে মুক্ত রাখতে হবে। আমি ঐ এক কোম্পানী নিয়ে সোজা চলে যাই পাটগ্রাম এলাকাতে। এবং লাউয়ের গলার মাঝখানটা অর্থাৎ যেখানটায় সবচেয়ে কম জায়গা সেখানে একটা ডেফেন্স নেই এবং এক কোম্পানী দিয়ে পাটগ্রামের ডিফেন্সের আয়োজন করি। এটা খব সম্ভব আগস্টের শেষের দিকে হবে। পরে অবশ্য আমাকে পাটগ্রাম ডিফেন্সের জন্য ৫টা কোম্পানী দেয়া হয় ৫টা মুক্তিফৌজ কোম্পানী। বাওরা বলে একটা জায়গা আছে, সেখানে আমরা ডিফেন্স নেই। ইতিমধ্যে, খুব মজার ব্যাপার, পাকিস্তানীরা হাতীবান্ধায় চলে এসেছে। হাতীবান্ধা ও বাওরার মধ্যে পার্ধক্য তিন থেকে সাড়ে তিন মাইল। পাকিস্তানীরা হাতীবান্ধায় এসে ডিফেন্স নিয়েছে আর আমি বাওরায় একটা ডিফেন্স খুলেছি। তখন বর্ষাকাল ছিল বলে রেললাইনের উপর ছাড়া কোন যানবাহন চলতে পারতো না। আমি চিন্তা করলাম রেলাইনটা যদি কাট করা যায় তাহলে পাকিস্থানীরা আর আসতে পারবে না। আমার সাথে ৯০ জন লোক, হাতে কোন মেশিনগান ছিল না। কিন্তু আমি তখনকার ইপিআরদের দেখে বুঝতে পারছিলাম যে তাদের পক্ষে পাকিস্তানীদের আক্রমণের মুখে সবসময় একজায়গা ধরে রাখা সম্ভব নয়। সেজন্য আমি রেলওয়ে লাইনের আশে-পাশে যে সকল গ্রাম ছিল প্রত্যেক গ্রামে ডিফেন্স করে রেখেছিলাম। আমি ভাবছিলাম যদি পাকিস্তানীরা একটা গ্রামে আক্রমণ চালায় তাহলে তারা যেন সেই জায়গা ছেড়ে পরবর্তী গ্রামে গিয়ে বসতে পারে। পাকস্তানীরা সাধারণতঃ এক এক রাতে এক এক গ্রামে আক্রমণ চালাতো। আমাদের লোকেরা পরবর্তী গ্রামে গিয়ে ডিফেন্স নিতো। ডিফেন্স খোলা ছিল। পাকিস্তানীরা আমাদের জায়গায় এসে কিছুক্ষণ থাকার পরে ভোর হওয়ার আগেই তাদের মেইন ডিফেন্স হাতীবান্ধায় চলে যেতো। আমরা আবার সকালবেলায় আমাদের পুরনো জায়গায় গিয়ে বসতাম। এ রকম খেলা চলতে লাগলো প্রায় এক মাসের মত। পাকিস্তানীদের এক কোম্পানী ছিল হাতীবান্ধায়। এভাবে আগস্ট মাস পার হয়ে যায়। এর মধ্যে আমি আরেকটা কোম্পানী পাই। তখন রেললাইনের দু'পাশে দুটো কোম্পানী লাগিয়ে একটা পার্মানেন্ট ডিফেন্স নিযুক্ত করি। পাকিস্তানীদেরও তখন শক্তি বেড়েছে। সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আমার ৫টা কোম্পানী গড়ে ওঠে। আমাদের উপর বার বার আক্রমণ হওয়ার ফলে আমাদের বেশ ক্যাজুয়েলটি হতো। ফলে আমাদের সেক্টর কমাণ্ডার মনে করলেন যে জায়গাটা ধরে রাখতে হবে, জায়গাটা গুরুত্বপূর্ণ। সেজন্য তিনি আমাকে আরো ৫টা কোম্পানী পরে দেন। আমার পিছনে বি-এস-এফ-এর এটা ব্যাটালিয়ন ছিল, তার পরে ইন্ডিয়ান আর্মির একটা ব্যাটালিয়ন ছিল। আমাদের সাপোর্টে তিনটা ট্যাঙ্ক ছিল এবং ইন্ডিয়ান আর্টিলারীর ব্যাটারী ছিল। আমাদের ডিফেন্স খুব শক্তিসম্পন্ন হয়ে গেছে। পাকিস্তানীদেরও আর্টিলারী ব্যাটারী ছিল। মোট কথা, ডিফেন্সিভ যুদ্ধ দুই পাশ থেকেই চলতে থাকে। কিন্তু আমাদের ইচ্ছা ছিল আমরা ক্রমাগত আস্তে আস্তে সামনের দিকে এগিয়ে যাবো। কেননা আমাদের সামনের

গ্রামে যদি আর্মিরা না থাকতো তখন আমরা ঐ গ্রামে গিয়ে বসে থাকতাম। এভাবে এগোতে এগোতে আমরা সেপ্টেম্বর মাসে পাকিস্তানীদের থেকে ৪০০ গজ দূরে এসে ডিফেন্স নিলাম। মধ্যখানে ধানক্ষেত। এপাশে আমরা, ওপাশে ওরা। সে সময় আমাদের মরাল খুবই ডাউন ছিল। কেননা এ পর্যন্ত আমরা কোন কিছুতেই তেমন সফলকাম হতে পারিনি। পাকিস্তানী ডিফেন্সের বিপরীতেও আমরা আক্রমণ চালাই কিন্তু তাদের ডিফেন্স এত শক্ত ছিল যে, আমার লোকজনের তেমন ভাল ট্রেনিং না থাকায় অনেক সময় আমরা তাদের বাঙ্কারের উপর উঠে বসে থাকতাম। তারা বাঙ্কারের ভিতরে কিন্তু আমরা তাদেরকে মারতে পারতাম না। ফলে আমরা হতাহত হয়ে পিছনে হটতাম। এবং তারা যে মাইন বসাতো তাতে আমাদের অনেক লোক হতাহত হতো। সুতরাং আমি দেখলাম যে এভাবে আমাদের কোন সাকসেস হবে না, অন্যভাবে হয়তো হবে। আমার ডানপাশে ছিল তিস্তা নদী। তিস্তা নদীর ওপাশে পাকিস্তানীদের অবাধ গতি। রৌমারী থানার অন্তর্গত সুঠিবাড়ী এলাকা বলে একটা জায়গা ছিল। আমরা খবর পেতাম সেখানে পাকিস্তানীদের একটা প্লাটুন আছে এবং সাথে ইপিকাফের আরো একটি প্লাটুন। আমি সিদ্ধান্ত নিলাম মুক্তিযোদ্ধাদের কোম্পানী নিয়ে ঐ জায়গাটি রেইড করবো। আমার বিশ্বাস ছিল সাফল্য আমাদের আসবে। এবং এ সাফল্যে আমার ট্রুপসের মনোবল বেড়ে যাবে।

আমি এক কোম্পানী নিয়ে বাওরা থোকে দুটি নৌকাযোগে তিস্তা নদী পার হই। সে রাতে প্রচুর ঝড়বৃষ্টি হচ্ছিল। নদীর মাঝখানে পৌছে মনে হয়েছিল আমারে নৌকা বুঝি ডুবে যাবে এবং আমরা সবাই ডুবে মারা যাব কারণ নদীতে ছিল প্রচণ্ড স্রোত। নদী পার হয়ে গাইডের সাহায্যে আমরা সুঠিবাড়ী- যেখানে একটা বিল্ডিং ছিল, সম্ভবতঃ কৃষি দফতরের ভবন- প্রায় পৌছে যাই। বিল্ডিং-এর সামনে প্রায় ৫০ গজ চওড়া একটা ছোট ক্যানেল ছিল। আমাদের আক্রমণ করতে হলে ক্যানেলটি পার হতে হবে। তখন প্রায় ভোর হয় হয়। আমি আমার কোম্পানীকে দু'ভাগে ভাগ করলাম। একটি দল ইতিমধ্যে ক্যানেল ক্রস করে রৌমারীর দিকের যে রাস্তা সেই রাস্তায় এ্যামবুশ করে বসেছে। প্ল্যান ছিল আমি আক্রমণ চালালে পাক ফৌজ পালিয়ে যেন রৌমারীর পথে যেতে না পারে। অপরদিকে রৌমারী থেকেও যেন পাকসেনারা সাহায্যে এখানে আসতে না পারে। আমি ক্যানেলটির পার থেকে পাকসেনাদের মুভমেন্ট দেখতে পাচ্ছিলাম। কিন্তু আমি নিজে ক্যানেল ক্রস করতে পারছিলাম না। দ্রুত সময় পার হচ্ছিলো। ক্রমশঃ আমার মনে দ্বিধা জন্মাচ্ছিলো আক্রমণ করবো কিনা। সিদ্ধান্ত নিলাম আক্রমণ করবোই। আমি আমার মর্টার দিয়ে প্রথম ফায়ার ওপেন করলাম। পাকসেনারা কিছুক্ষণ বিচলিত হয়ে পরক্ষণেই পাল্টা আক্রমণ চালায়। আমি একসময় নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ি। আমার কোমরে দড়ি বাঁধা থাকতো। আমার ঝাঁপ দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার ব্যাটম্যানও নদীতে ঝাঁপ দেয়। দড়ির বাকি অংশ তার হাতেই ছিল। ব্যাটম্যান টেনে আমাকে ক্যানেলের অপর পাড়ে নিয়ে যায়। আমার সঙ্গের সবাই ক্যানেল পার হয়ে বিল্ডিং-এর উপর চড়াও হয়। পাকিস্তানীরা তখন পালাবার চেষ্টা করতে থাকে। এই আক্রমণে ১৫ জন পাকিস্তানী সেনা নিহত হয়। ১৫ জনের ৭ জন ছিল পাক সেনাবাহিনীর এবং ৮ জন ছিল ইপিকাফ। আহত হয় প্রচুর। ঐ সংঘর্ষ আগস্টের শেষের দিকে অথবা সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ঘটে। ঠিক তারিখ আজ আর মনে নেই। ভারতীয়রা বলতো প্রমাণ স্বরূপ যুদ্ধে নিহত পাকসেনাদের মাথা কেটে নিয়ে আসতে হবে। আমরা ১৫টি মাথা কেটে এবং তাদের ইউনিফর্ম নিয়ে আমাদের গন্তব্যে রওয়ানা হই। এই সংঘর্ষে আমাদের একজন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন এবং তিনজন গুরুতররূপে আহত হন। এই আক্রমণের জন্যেই পরবর্তীতে আমাকে বীরবিক্রম উপাধি দেয়া হয়। সংঘর্ষে আমার ছেলেদের মনোবল সাংঘাতিকভাবে বেড়ে যায়। পাকসেনারা যখন অস্ত্র ফেলে পালাচ্ছিলো, তখন আমার ছেলেরা পিছু ধাওয়া করে তাদের হত্যা করছিলো। আমার ছেলেদের সাহসিকতা দেখে বিস্মিত হয়েছিলাম আমি সেদিন। এই অপারেশনে আমার সাব-সেক্টরে ভীষণ মরাল ইফেক্ট হয়েছিল- যার ফলে আমার রেইডিং পার্টি পরবর্তীতে সৈয়দপুর পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে রেইড করতো। এবং প্রতিটি রেইডই সাকসেসফুল হয়েছে।

বয়রাতে আমাদের ডিফেন্স ছিল। আমরা লম্বালম্বি নিয়েছিলাম। আমাদের সামনে ৪০০/৫০০ গজ দূরে পাকসেনারা ডিফেন্সে ছিল। পাকিস্তানীরা প্রায়ই আমাদের উপর আক্রমণ চালিয়ে আমাদের ডিফেন্স দখল করার

চেষ্টা করতো কিন্তু আমাদের ডিফেন্স এত মজবুত ছিল যে তারা বারবারই পিছু হটতে বাধ্য হয়েছে। আমরাও চেষ্টা করতাম তাদেরকে পিছু হটাতে।

একটি অপারেশনের কথা আমার মনে আছে। পাকিস্তানীদের ডিফেন্সের সামনে মাইনফিল্ড ছিল। আমাদের এ্যাটাকিং ফোর্স লেঃ ফারুকের কমান্ডে মাইন ফিল্ড অতিক্রম করে পাকসেনাদের বাঙ্কারের উপর চলে গিয়েছিল-কিন্তু আমাদের ছেলেরা যুদ্ধের সকল বিষয় ওয়াকিবহাল না হওয়ায় যথাযথ আক্রমণে ব্যর্থ হয় এবং মাইনে আমাদের বেশ হতাহত হয়।

পাটগ্রাম থানা স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশেই চলতো আমাদের প্রশাসন ছিল এবং আমরা পুরো থানা নিয়ন্ত্রণ করতাম। পাটগ্রামের পিছনে বুড়িগ্রামে আমাদের সেক্টর হেডকোয়ার্টার ছিল। হেডকোয়ার্টারে আমাদের সেক্টর কমাণ্ডার এম, কে, বাশার থাকতেন। তিনি দিনাজপুর থেকে রংপুর পর্যন্ত কমাণ্ড করতেন। তাঁর সম্পর্কে দু'একটি কথা বলতে হয়। যদিও তিনি বিমান বাহিনীর অফিসার ছিলেন তথাপি তিনি অতি সাফল্যের সঙ্গে আমাদের প্রায় ৩০০ মাইল সেক্টর এরিয়া দেখতেন। তাঁকে কোন সময় রাতে বিছানায় শুতে দেখিনি। জীপে জীপেই একটু-আদটু ঘুমাতেন। কারণ সারারাতই তাঁকে এক সাব-সেক্টর থেকে অন্য সাব-সেক্টরে ঘুরতে হতো। তাঁর প্রেরণা ছিল অফুরন্ত- আমাদের পাথেয়।

আমাদের হাতীবান্ধা অপারেশন ছিল ভয়াবহ। হাতীবান্ধাতে পাকিস্তানীদের একটি কোম্পানী ছিল। আমি ইতিপূর্বে কয়েকবার চেষ্টা করেছি- হাতীবান্ধা দাখল করতে ব্যর্থ হয়েছি। নভেম্বর ২০/২১ হবে। ঈদের দিন ছিল। আমরা ঈদের সুযোগ নিয়ে ঠিক সকাল ৮টায় হাতীবান্ধা আক্রমণ করি যদিও দিনের আলোতে ঐ সময় আক্রমণের উপযোগী ছিল না। আমরা অবশ্য ভেবেছিলাম ঈদের দিন পাকসেনারা হয়তো একটু রিলাক্স করবে এবং ঐ সময় অন্যান্য কাজে ব্যস্ত থাকবে। আমরা চারটি কোম্পানী নিয়ে দুদিক থেকে আক্রমণ করি। আমাদের সৌভাগ্য ছিল বলতে হবে। কারণ পাকসেনাদের একটি কোম্পানী বদলী হচ্ছিলো এবং নতুন দল সে স্থান দখল করছিল, কিছু সৈন্য রওয়ানা হয়েছে, কিছু হচ্ছে- কিছু নতুন সৈন্য পজিশনে গেছে, ঠিক এমনি সময়ে আমরা আক্রমণ করে বসি। আমাদের প্রথম আক্রমণেই পাক অফিসার কোম্পানী কমাণ্ডার নিহত হয়। কমাণ্ডার নিহত হওয়ায় পাকসেনারা পিছু পালাতে থাকে। তারা প্রায় ১০০০ গজের মত পিছু হটে একটি গ্রামে পৌছে ডিফেন্স নেয়। সেখানে তাদের আর্টিলারী পজিশন ছিল। আমরা সামনে অগ্রসর হয়ে ডিফেন্স নেই। এই আক্রমণে ভারতীয় আর্টিলারী অবশ্য খুব সাহায্য করে। পরবর্তীতে সকল আক্রমণেই ভারতীয় বাহিনীর আর্টিলারী প্রভূত সাহায্য করে। আমরা ক্রমশঃ আঘাত হেনে পাকিস্তানীদের পিছু হটিয়ে অগ্রসর হতে থাকি। আমার সাব-সেক্টর ট্রুপস নিয়ে ১০ই ডিসেম্বর লাঙ্গলেরহাটে পৌছাই। ইতিপূর্বে হাতীবান্ধা ছাড়া এমন কোন গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ আর হয়নি। পাকসেনারা লাঙ্গলহাটি ব্রিজ উড়িয়ে দিয়ে তিস্তার অপর পারে চলে যায়। আমরা ১৩ই ডিসেম্বর হারাগাছা এলাকা দিয়ে তিস্তা নদী অতিক্রম করি। সেখানে কোন পাকসেনা ছিল না। হারাগাছার এই স্থান থেকে রংপুরের দূরত্ব ৮ মাইল হওয়া সত্ত্বেও রংপুর পৌছাতে আমাদের সময় লাগে তিনদিন। কারণ পথে অনেক জায়গায়ই পাকসেনা ছিল। রংপুর এলাকাতে পৌছাই ১৫ই ডিসেম্বর। ১৬ই ডিসেম্বর ঢাকায় পাকসেনারা আত্মসমর্পণ করলেও রংপুরে পাকসেনারা আমাদের কাছে আত্মসমর্পণ করেনি। হিলির দিক থেকে আগত ভারতীয় সেনাবহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে। ইতিমধ্যে কর্নেল নওয়াজেশের সাব-সেক্টর ট্রুপসও চলে আসে। আমাদের দুই সাব-সেক্টর ট্রুপস এক হয়ে গিয়েছিল। আমরা আমাদের ট্রুপস নিয়ে রংপুরে থাকি। ভারতীয় বাহিনী রংপুর সেনানিবাসে অবস্থান নেয়।

প্রশ্নঃ সমগ্র যুদ্ধকালীন সময়ে আপনার এমন একজন সহকর্মীর কথা বলুন যিনি যুদ্ধক্ষেত্রে সাহসিকতা দেখিয়েছেন।

উত্তরঃ আমি ফারুকের কথা বলবো। ফারুককে লেফটেন্যান্ট বলা হলেও যে কারণেই হোক পাকিস্তানে সে কমিশন পায়নি। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়ার জন্যে সে আমার সাব-সেক্টরে যোগদার করে। সে সময়

আমার সাব-সেক্টরে আমিই একমাত্র অফিসার ছিলাম। আর একজন অফিসারের অভাব আমি বিশেষভাবে উপলব্ধি করছিলাম। ফারুককে পেয়ে আমি ভীষণভাবে খুশী হই। বস্ততঃ তাঁর মত সাহসী ছেলে আমি খুব কম দেখেছি। হাতীবান্ধা আক্রমণের পর আমি একটি বি-ও-পি থেকে অয়ারলেসযোগে পাকিস্তানীদের উপর আঘাত হানার জন্যে আর্টিলারী ডাইরেক্ট করছিলাম। সেক্টর কমাণ্ডার বাশার আমার প্রায় ৬০০ গজ পিছনে ছিলেন। আমি আর ফারুক পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। পাকিস্তানীরা আমাদের উপর আর্টিলারীর গোলা ছুড়ছিলো। গোলা যখন পড়ে তখন লক্ষ্যবস্তুর আশেপাশে পড়ার পরই লক্ষ্যবস্তুর উপর ফেলা হয়। আমাদের আশেপাশে গোলা পড়ছিলো এবং বুঝতে পারছিলাম এখনই আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেখানে পড়বে। ফারুককে বললাম কভার নিতে কিন্তু সে কভার না নিয়ে আমার কাছে সরে আসে। পাকিস্তানী কামানের গোলা তখন ১৫/১৬ গজ দূরে এস পড়ে। সৌভাগ্যই বলতে হবে, ডিপ্রেসন থাকায় গোলা তেমন কাজে আসে না। আমি গ্রাউন্ডে গেলাম। আমি উঠেই তার খোঁজ করলাম, দেখি সে হাসছে। আমি বললাম চলো কভারে যাই। সে বললো, স্যার এখানে আর শেল পড়বে না। আমরা দু'জন যেখানে গোলা পড়েছিল সেই গর্তে গিয়ে দাঁড়ালাম। তেমনি ছোট ছোট অনেক ঘটনার মধ্যদিয়েই লেঃ ফারুকের সাহসিকতার পরিচয় পেয়েছি।

আমি সেক্টর কমাণ্ডারের কথা বলবো। তাঁর সকল অপারেশনে যাওয়ার কথা নয়- কিন্তু তিনি মেজর অপারেশনের প্রতিটিতেই স্বয়ং থাকতেন, তদারক করতেন। এতে ট্রুপস- এর মনোবল বৃদ্ধি পেত।

আর একজন বি-ডি-আর হাবিলদার রাঙ্গু মিয়ার কথা বলবে। তার চেহারা দেখতে মনে হতো যেন সে একটা ডাকাত। হাতীবান্ধা অপারেশনে রাঙ্গু মিয়া (শহীদ) বীরবিক্রম এবং নায়েব সুবেদার সম্ভবতঃ লুৎফর (শহীদ) বীরবিক্রমের কথা না বললেই নয়। তখন বেলা সাড়ে আটটা। পাকিস্তানীদের ডানদিকের পজিশন ফল করছে। কিন্তু বামদিকের অবস্থান চিল একটি বি-ও-পিতে। বেশ উঁচুতে। আমাদের উচিত ছিল আগে বামদিকের পজিশন দখল করা। পরে ডানদিকের পজিশনে আঘাত হানা। আমার প্ল্যানিং-এ ভুল হওয়ায় আমি প্রথমে ডান ও পরে বামদিকে আক্রমণ চালাই। কিন্তু ডানদিকে আক্রমণ চালিয়েই আমি আমার ভুল বুঝতে পারি এবং বামদিকে দখল না করতে পারলে যে আমরা এখানে থাকতে পারবো না তাও বুঝতে পারলাম। দুটি কোম্পানীর একটির কমাণ্ডার ছিলেন বি-ডি-আর নায়েক সুবেদার লুৎফর আর তাঁরাই সঙ্গে ছিল হাবিলদার রাঙ্গু মিয়া। আমরা এ্যাটাকিং পজিশন থেকে ৩০০/৪০০ গজ দূরে একটা বাঁশছাড় থেকে এগুচ্ছি বামদিকে। সময় তখন বেলা সাড়ে দশটা। আমরা অগ্রসর হওয়ার সাথে সাথে পাক আর্টিলারী গোলা (এয়ার ব্রাস্ট) এসে পড়তে লাগলো। এই গোলা শূন্যেই ফাটে এবং এত ক্ষয়ক্ষতি হয় বেশী। এরই মধ্য দিয়ে এই দু'জন বিডিআর সৈনিক নির্ভয়ে পাকিস্তানীদের বাঙ্কার চার্জ করে এবং দখল করে। এদের সাহস ও আত্মত্যাগ তুলনাহীন। জাতির দুর্ভাগ্য, দু'জনই সংঘর্ষে পাকিস্তানী বাঙ্কার চার্জ করতে গিয়ে শহীদ হন।

প্রায় বাইশ মাইল লম্বা এবং চওড়া ন্যূনতম ৩ মাইল, কোথাও ১৮ মাইল আমার সাব-সেক্টর মুক্ত ছিল। বলতে গেলে পুরো পাটগ্রাম থানাটাই আমরা মুক্ত রেখেছিলাম আমার সাব-সেক্টরে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ একবার আসেন। স্থানীয় এম-পি মতিউর রহমান মাঝে মাঝে আসতেন অন্য আর কেউ তেমন আসতেন না। সি-ইন-সি কোনদিন আসেননি। বিদেশী সাংবাদিক আসেননি, তবে ভারতীয় সাংবাদিকরা আসতেন।

সাক্ষাৎকারঃ মেজর মোঃ আবদুস সালাম*

জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে আমি ফুলবাড়িতে যে ক্যাম্প দেখে এসেছিলাম সেখানে যোগদান করি। শুরু থেকে আমার গেরিলা জীবনের শেষ পর্যন্ত এখানেই ছিলাম, অর্থাৎ নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত এখান থেকেই

* সাক্ষাৎকারটি প্রকল্প কর্তৃক ২২-১-১৯৮৯০ তারিখে গৃহীত।

ছোটখাটো অনেক অপারেশনে গিয়েছি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল বোয়ালিয়া ব্রীজ অপারেশন। আমরা বড় পুল বলতাম। এখানে রাজাকাররা পাহারায় ছিল। আমাদের পরিকল্পনা ছিল এই ব্রীজে গ্রেনেড নিক্ষেপ করা। আমরা এ পরিকল্পনায় বেরিয়েছিলাম। ঔদিনই সম্ভবতঃ কুড়িগ্রাম থেকে একটা দল ট্রেনে করে তিস্তার দিকে যাচ্ছিলো। এই ব্রীজের আরেকটু দূরে আরেকটা দল বি-ডি-আর এর নায়েক সুবেদার ওহাবের নেতৃত্বে তাদের উপর আক্রমণ শুরু করে। পরে আমরাও যোগ দেই সেই আক্রমণে, এবং আশেপাশের অনেক লোক, আনসারদের মধ্যে যারা ছিল তারা সবাই যোগ দেয়। পরবর্তী পর্যায়ে হানাদারদেরকে ওখান থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য করা হয়। আমরা সেখানে গিয়ে অনেক রক্তের দাগ দেখতে পাই এবং পরে জেনেছিলাম তাদের অনেক হতাহত হয়েছে। তারপর রেললাইনের নীচু দিয়ে অপর পাশের কভার দিয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। এই ঘটনাটা একটা পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল।

প্রঃ কোন পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল?

উত্তরঃ এটা 'আনন্দবাজার' পত্রিকায় ছাপা হয়। ঐ সময়ে প্রাথমিক পর্যায়ে গেরিলা তৎপরতার একটা উল্লেখযোগ্য সাফল্যের খবর ছিল এটা।

দ্বিতীয় ঘটনাটা তবে সম্ভবতঃ জুলাইয়ের শেষের দিকে বা আগষ্টের প্রথম দিকে। আমি এই ঘটনায় প্রথমে ছিলাম না, পরে জড়িয়ে পড়ি। ঘটনাটা আমাদেরই এলাকায়। পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর একজন সদস্য মেয়েলোকের পোশকে ঐ এলাকায় আসে। মকবুল খান তার নাম ছিল। মহিলা সেজে অন্য মেয়েলোক ধরতে অসুবিধা হবে না এই রকম একটা মোটিভ নিয়ে সে এসেছিল। আমরা গ্রামের মধ্যে 'আর্লি ওয়ানিং' সিস্টেম রেখেছিলাম। গ্রামের কোণে কোণে আমাদের যুবকরা পাহারা দিত। গ্রামের মধ্যে কেউ ঢুকলে ওরা তাড়াতাড়ি খবর দিত। একজন এসে বললো যে একটা মেয়েলোক গ্রামের দিকে আসছে, সে দেখতে অস্বাভাবিক। আমাদের দেশের মেয়েলোক সাধারণতঃ এই রকম দীর্ঘকায় মোটাসোটা হয়না। তাই সবার মনেই একটা সন্দেহ হলো। সে গ্রামে ঢুকেছে, মেয়েলোকদের ধরার চেষ্টা করেছে, পারেনি এবং এক জায়গায় একটা মেয়েকে ধরেছিল, সে চীৎকার করে পালিয়ে গেছে। এই খবরটা কিছুদূর পর্যন্ত পৌছে যায়। এক পর্যায়ে যুবক দলের মধ্যে আবদুর রহমান নামে একটি সাহসী ছেলে লোকটিকে ধরে ফেলে। লোকটির কাছে বোধহয় একটা হুইসেল ছিল অথবা তার ঠোঁট দিয়ে সে খুব জোরে একটা হুইসেল দেয়। হুইসেল দেয়ার ফলে সেই বোয়ালিয় ব্রীজ থেকে গুলি গুরু হয়। সেখানে পোষ্ট ছিল। সেখানকার লোক এসে তাকে উদ্ধার করতে পারেনি। ছেলেদের সেই দল মকবুল খানকে ধরে নিয়ে ধরলা নদী পার হয়ে ফুলবাড়িতে চলে আসে। সেদিনই আমরা যাচ্ছিলাম একটা অপারেশনে। ধরলার পারে ওদের দেখা পেলাম। মকবুল খানকে ফুলবাড়ি ক্যাম্পে নিয়ে আসি। পরে তাকে সাহেবগঞ্জে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে আমাদের সাব-সেক্টর হেডকোয়ার্টার ছিল ক্যাপ্টেন নওয়াজেশের নেতৃত্বে। তার কাছ থেকে অনেক কথা জানা যায় । সে ছিল পাঞ্জাবী। তার উদ্দেশ্য ছিল ঐ একটাই- গ্রামে এসে মেয়ে ধরে নিয়ে যাওয়া। এটা একটা চমকপ্রদ ঘটনা বলতে হবে।

তারপর ডাইরেক্ট কোন সংঘর্ষ আর হয়নি। তবে একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে। তখন আমরা ফুলবাড়ি ডিফেন্সে ছিলাম। লালমনিরহাট থেকে ফুলবাড়ির দিকে একটা রাস্তা গেছে। লালমনিরহাট এবং ফুলবাড়ি মধ্যে ধরলা নদী। ফেরীর ওপারে অর্থাৎ ফুলবাড়ির দিকে আমাদের এফ-এফ কোম্পানী ডিফেন্স ছিল এবং ডানদিকে এম-এফ কোম্পানীর ডিফেন্স ছিল। এম-এফ কোম্পানী ছিল মোবাইল। তারা ঐ এলাকায় যেতো, পেট্রোলিং করে আবার ফিরে আসতো। কিন্তু এফ-এফ কোম্পানী পার্মানেন্টলি ওখানে থাকতো। একবার আমরা ওখানে গিয়েছিলাম। সারারাত ওখানে পেট্রোলিং করেছি। আমার জীবনে এই প্রথম সেদিন গুলি ছুড়ি। আমাকে সেখানে শিক্ষা দেয়া হয় কিভাবে গুলি ছড়তে হয়। সারারাত খাওয়া হয়নি। ত্রপুরবেলা খাবার কিছু পাইনি। স্থানীয় এক বাড়িতে বসে আমরা জাউ খাচ্ছিলাম। এমন সময় আমাদের উপর মেশিনগানের ফায়ার। নাদীর এপার ওপার। মাঝখানে নদীর দূরত্ব ৫০০/৬০০ গজ। আমরা যে বাড়িতে খাচ্ছিলাম সে বাড়ির কলাগাছে এবং টিনের চালে খুব গুলি পড়ছে। আমরা তাড়াতাড়ি করে দৌড়ে গিয়ে পজিশন নিলাম। প্রশিক্ষণ তখনও কিছু নেই। তবে একটা

রাইফেল হাতে কেবল নিয়েছি, দৌড়ে কিভাবে গুলি করতে হয় সেটা শিখেছিলাম। ওরা সবাই দৌড়ে গিয়ে রাইফেল হাতে তাড়াতাড়ি পজিশন নিয়েছে। আমিও নিয়েছি, তবে তত তাড়াতাড়ি না পারায় ১০/১৫ হাত পিছনে পজিশন নিয়েছি। ওরা সেখান থেকে ফায়ার করছে, পাল্টা জবাব দিচ্ছে। আমিও অনুমান ১০/১৫ হাত পিছনে একপাশ থেকে পাল্টা জবাব দিচ্ছি। আনসারের একজন লোক ছিল, সে আমাকে যেভাবে গালি দিচ্ছিলো, সে গালির কথা আমি কখনও ভুলবোনা। খুব মজার গালি- 'সামনে, সামনে এসে ফায়ার কর, নইলে তোকে মেরে ফেলবে।' ও শেখাচ্ছিলো যেন আমি আমার নিজের জীবন বাঁচাতে পারি। এবং একই সময় আমি আমার বন্ধুর জীবনকেও যেন রক্ষা করতে পারি। তারপর সামনে গিয়ে বেশ কিছুক্ষণ ফায়ার করলাম। ২" মর্টার ছিল আমাদের কাছে। এক সময় ফায়ার বন্ধ করি। পরে জানতে পেরেছিলাম ওদের উদ্দেশ্য ছিল নদী পার হয়ে আসা। কলাগাছ দিয়ে ভেলা তৈরী করেছিল তারা। পাকসেনারা লং- রেঞ্জে ফায়ার করে দেখতে চেয়েছিল আমরা এপারে কেউ আছি কিনা। পরে আমাদের পাল্টা জবাব পেয়ে তারা আর নদী পার হবার সাহস পায়নি। এটা আগস্টের ঘটনা হবে। তারপর সেখান থেকে আমরা চলে যাই বাগভাণ্ডার বি-ও-পি তে। বাগভাণ্ডারে বি-ডি-আর' এর সুবেদার মেজর আরব আলী ছিল। তার একটি কোম্পানী ছিল এবং আমি সেই কোম্পানীর একজন সাধারণ সৈনিক ছিলাম। সুবেদার আরব আলীই সেই কোম্পানীর কমাণ্ডার ছিলেন। সাহেবগঞ্জ সাব-সেক্টর অধীন বাগভাণ্ডার ডিফেন্সই আমি বেশ কিছুদিন ছিলাম ওখানে থাকাকালীন আমাদের কটা উল্লেখযোগ্য অপারেশন হয়েছিল অক্টোবরের শেষের দিকে। লেঃ সামাদ, যিনি শহীদ হয়েছেন জয়মনিরহাটে এবং লেঃ আবদুল্লাহ এরা কেবল কমিশন পেয়ে এসেছেন আর আমরা সেকেণ্ড ব্যাচের জন্য সিলেক্ট হয়েছি যাবো। এরা যখন প্রথম আসলো তখন এদেরকে নিয়ে একটা অপারেশন করা হলো, জয়মনিরহাটে। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একটা কোম্পানী সেখানে ছিল। আমরা তা জানতে পেরেছিলাম। এই রেইডের পরিকল্পনা করেন ক্যাপ্টেন নওয়াজেশ, আমি সেদিন তাঁর সাথেই ছিলাম। আমি ছিলাম তাঁর সিগনাল অপারেটর, অয়ারলেস সেট নিয়ে একটা তেঁতুল গাছের উপরে মাচা তৈরী করে উনি ছিলেন আর আমি তেঁতুল গাছের নীচে অয়ারলেস সেট নিয়ে ছিলাম। সেখান থেকে তিনি পাক ক্যাম্পের উপর ডাইরেক্ট করছিলেন আক্রমণ। আমার কোম্পানী, অর্থাৎ যেটা সুবেদার আরব আলীর কোম্পানী এবং ডানদিকে একটা এফ-এফ কোম্পানী ছিল সুবেদার শামসুল হকের নেতৃত্বে- এই দুটো কোম্পানীর একটি দেওয়া হল লেঃ সামাদের নেতৃত্বে এবং অপরটা লেঃ আবদুল্লাহর নেতৃত্বে। এই দুটো কোম্পানী নিয়ে ভূরুঙ্গামারী আক্রমণ করি, সন্ধ্যের পর। পরিকল্পনা মোতাবেক দুটি কোম্পানী প্রায় ভূরুঙ্গামারীর কাছে পৌছে যায়। বাঁ দিকে সোনারহাটে যে কোম্পানী ছিল তাদেরকে রাস্তার উপর ব্লক করতে বলা হলো যাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ঐ দিকে পালিয়ে যেতে না পারে। তাদের একটাই পথ খোলা রাখা হয়েছিল, সেটা হলো নাগেশ্বরীর দিকে। কিন্তু ঐ কোম্পানী ঠিকমত এ্যাকশন নিতে পারেনি, ফলে পাকস্তানীরা ভুরুঙ্গামারী ছেড়ে সোনাহাটা দিয়ে ভিতরে ঢোকে এবং উল্টা দিক দিয়ে আমাদের দিকে ফায়ার করতে শুরু করে। আমরা জানতে পাই যে ওটা আমাদের এফ-এফ কোম্পানীর দল না। ওটা পাকিস্তানীরা বিতাড়িত হয়ে উল্টা দিক দিয়ে ভিতরে এসে আমাদের ওপর আঘাত হানছে, এজন্যে সেখানে বেশীক্ষণ থাকা সম্ভব হয়নি। সব কিছু তছনছ করে, বাঙ্কার ভেঙ্গে দিয়ে আমরা রাতের অন্ধকারেই ওখান থেকে ফিরে আসি। রেইড হিসাবে এটিকে আমরা সফল রেইড বলতে পারি, তবে আক্রমণ হিসাবে এটা সফল ছিল না। কেননা, পরবর্তীতে পাকিস্তানীরা আবার সেখানে ডিফেন্স গড়ে তুলেছিল।

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি*

॥ রায়গঞ্জ দখলের লড়াই ॥

লেঃ সামাদ আর লেঃ আবদুল্লাহ ২৫ মাইল রেঞ্জের অয়ারলেস হাতে দুই গ্রুপ কমান্ডো নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলো ১৯শে নভেম্বর পাকিস্তানীদের শক্ত ঘাঁটি রায়গঞ্জ দখলের জন্যে। সবার হাতে একটা করে স্টেন আর

* দৈনিক 'সংবাদ'- এর ১৫ ও ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৮১ সংখ্যায় প্রকাশিত মুসা সাদিক রচিত প্রতিবেদন থেকে সংকলিত।

কিছু গ্রেনেড। প্রতিজ্ঞা নিয়ে তারা বেরুলো রায়গঞ্জ দখলের। লেঃ সামাদের গ্রুপে ছিলো কমান্ডো মাহবুব, কাসেম ও অন্যরা এবং লেঃ আবদুল্লাহর গ্রুপে ছিল ১৫জন শক্তিশালী কমান্ডো। দুই গ্রুপ রায়গঞ্জে অবস্থিত ২৫- পাঞ্জাব রেজিমেন্টকে লক্ষ্য করে দুই দিক থেকে যাত্রা শুরু করে। ঠিক হয় ৫০০ গজের মধ্যে গিয়ে অয়ারলেসে সামাদ ও আবদুল্লাহ দু'জনের পজিশন জানিয়ে দেবে। জাঙ্গল-শু পরে, চাদর গায়ে জড়িয়ে মুক্তিযোদ্ধারা রাত ন'টায় নিঃশব্দে বেরিয়ে পড়ে ৬নং সাবসেক্টর ভুরুঙ্গামারী থেকে ঈদের আগের রাতে। সোয়া ঘন্টা যাত্রার পর রায়গঞ্জ ব্রীজের সন্নিকটে পৌছে লেঃ সামাদ সহসা দেখলেন তার গ্রুপের সবাই ২৫-পাঞ্জাব রেজিমেন্টের ট্র্যাপে পড়ে গেছেন। তিনি বুঝলেন ভুল রেকি হয়েছে। রায়গঞ্জ ব্রীজের নিচে ২৫ পাঞ্জাবের এল-এম-জিসহ বাঙ্কার রয়েছে এ খবর তিনি পাননি। ছোট শিস-এর সংকেতে তিনি সবাইকে শুয়ে পড়তে বললেন। অয়ারলেস সেট ওপেন করে 'হ্যালো আবদুল্লাহ' বলতেই শুরু হয়ে গেল ক্রস ফায়ারিং- সেই সাথে পাকিস্তানীরা তাদের ওপর আর্টিলারী গান ও ৩" ইঞ্চি মর্টার চালাতে লাগলো। বীর সামাদ বললেনঃ "কেউ এক ইঞ্চি পিছু হটবে না, মরলে সবাই মরবো, বাঁচলে একসাথেই বাঁচবো।" শুরু হয়ে গেল মুক্তিযোদ্ধাদের জীবনমৃত্যু পাঞ্জা লড়াই। অনেক শক্তিশালী ও দক্ষ এবং অনেকগুণ ভারী অস্ত্রে সজ্জিত ২৫-পাঞ্জাব বাহিনীর ঘেরাও এর মধ্যে পড়ে বাংলার তরুন বীরেরা সেদিন ফুলের মত ঝরে ঝরে পড়তে লাগলো। কিন্তু কেউ সামাদের আদেশ অমান্য করেনি। নিশ্চিত মৃত্যুমুখে থেকে, মুহুর্মুহু মর্টার শেল ও বুলেটের মুখে পড়ে মুক্তিযোদ্ধারা কেউ এতটুকু দমেনি। নিজের শেষ বুলেটটি শত্রুর প্রতি নিক্ষেপ করেছে, তারপর নিজে শহীদ হয়েছে। আমাদের ১৫/২০ জন বীর মুক্তিযোদ্ধা সেদিন এক ব্যাটালিয়ন ২৫-পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে যে অসম সাহস ও বীরত্ব নিয়ে লড়াই করেছে পৃথিবীর যে কোন বীরত্বব্যঞ্জক লড়াই-এ সাথে তার তুলনা হতে পারে।

অপরদিকে লেঃ আবদুল্লাহ হেডকোয়ার্টারকে ডেভলপমেন্ট জানিয়ে দিল। ৬নং সেক্টর কমাণ্ডার উইং কমাণ্ডার বাশারের নেতৃত্বে মূল বাহিনী এগিয়ে এলো। ১৯ তারিখ ভোর থেকে ২০ তারিখ সন্ধ্যা পর্যন্ত কামান ও আর্টিলারী দিয়ে তিনি আঘাত হানলেন ২৫-পাঞ্জাব রেজিমেন্টের উপর। গ্রাম থেকে লোক এসে বললো খান সেনারা ভেগে যাচ্ছে। ২১শে নভেম্বর সকালে সেই শক্তিশালী ট্রেইণ্ড ২৫-পাঞ্জাব রেজিমেন্ট বিধ্বস্ত হয়ে রিট্রিট করলো ৫ মাইল দূরে নাগেশ্বরীতে।

এই যুদ্ধে ২৫-পাঞ্জাবের কমপক্ষে সাড়ে তিনশ থেকে পাঁচশ জন নিহত অথবা আহত হয়েছে। রণাঙ্গনেই পড়ে ছিল ৩০/৩৫ জনের মৃতদেহ। লেঃ সামাদের গ্রুপে মাহবুব ও কাশেম (অন্য রণাঙ্গনে তিনি পরে শহীদ হন) ফিরে আসতে পেরেছিল। এই যুদ্ধ ছিল আমাদের একটা বড় বিজয় এবং পাকিস্তানী ফোর্সের জন্য একটি আঘাত। কেননা ২৫-পাঞ্জাব রেজিমেন্ট ছিল তাদের গর্ব। কিন্তু এই যুদ্ধে যেসব মুক্তিযোদ্ধাকে আমরা হারিয়েছিলাম তাদের প্রত্যেকেই ছিলেন বীর। এবং সেই যুদ্ধে প্রত্যেকেই বীরের মৃত্যুবরণ করেছিলেন। আমরা তাদের সবাইকে সালাম জানাই। সালাম জানাই সেই নির্ভীক যোদ্ধা লেঃ সামাদকে। ২১ তারিখ ভোরে রায়গঞ্জ ব্রীজের কাছে খোঁচা খোঁচা দাড়ি মুখে, প্যান্টের ভিতর হাফশার্ট ঢোকানো, মাটির উপর মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা অবস্থায় লেঃ সামাদকে সবাই দেখলো- জীবনে যেমন সে বীরবিক্রমে লড়াই করেছে, মরণেও তেমনি বীরবিক্রমে মাতৃভূমিকে আলিঙ্গন করে শুয়ে রয়েছে। উইং কমাণ্ডার বাশার সামরিক কায়দায় ডান হাত কপালে তুলে সেল্যুট করলেন তাকে। সেল্যুট করলো সবাই। জয়মনিরহাট মসজিদের পাশে তাকে কবর দেয়ার ব্যবস্থা করা হলো। কিন্তু জানাজা পড়ার জন্য মৌলভী পাওয়া গেল না। সীমান্তের ওপার থেকে এক মসজিদের ইমামকে আনা হলো জানাজার জন্য । ৪১ বার গান সেল্যুটের সাথে সাথে রণাঙ্গনে বেজে উঠল লাস্ট পোস্ট। সব শহীদের জানাজা ও দাফন সম্পন্ন করে সবাই চললো ফ্রন্টের দিকে, হাতে ইস্পাতের চকচকে অস্ত্র, চোখে পানি। উইং কমাণ্ডার বাশার অন্যদের চোখ মুছিয়ে দিচ্ছিলেন। নিজে কাঁদছিলেন। ফ্রন্টে ফ্রন্টে বিজয় হয়েছে, সেই সাথে বেদনার সুর বেজেছে। অশ্রুজলে সবাই সিক্ত হয়েছে।

॥ বড়খাতা ব্রীজঃ ব্রীজ অন রিভার তিস্তা ॥

রাজধানী ঢাকার প্রেক্ষাগৃহে বসে যারা 'ব্রীজ অন রিবার কাউয়াই' দেখে আতংকে ভয়ে শিউরে ওঠেন, তাদের কেউ জানলেন না কোনদিন যে, একাত্তরে সারা বাংলার বুক জুড়ে 'ব্রীজ কাউয়াই' এর চেয়ে লোমহর্ষক বহু অপারেশন করেছিল আমাদের বীর মুক্তিযোদ্ধারা।

'বড়খাতা ব্রীজ' অপারেশন তার একটি । এই ব্রীজটি উড়ানোর জন্য মুক্তিযোদ্ধারা প্ল্যান করে মে মাসে। এই ব্রীজটি পাক হানাদারদের জন্য ছিল অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ। কেনন, এই ব্রীজের ওপর দিয়ে চলে গেছে রেললাইন। যার সাথে রংপুরের সমগ্র এলাকা যুক্ত রেখে পাকবাহিনী ভারী রসদ ও সমরাস্ত্র সরবরাহ অটুট রেখেছে। এই ব্রীজ খতম করতে পারলে সরাসরি রংপুরের যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করা যায় এবং পুরোপুরি মুক্ত হতে পারে হাতীবান্দা, বড়খাতাসহ ২২ মাইল এলাকা।

৬নং সেক্টর কমাণ্ডার উইং কমাণ্ডার খাদেমুল বাদশার সিদ্ধান্ত নিলেন হানাদারদের রেললাইন বিচ্ছিন্ন করে ওদের কাবু করতে হবে এবং এই বড়খাতা ব্রীজ উড়িয়ে দিতে হবে। মে মাসের শেষ সপ্তাহে একটা কমান্ডো গ্রুপ পাঠালেন তিনি। বড়খাতা ব্রীজের ওপর পাক-পাঞ্জাবীর বাহিনী ছিল প্রস্তুত। কোন সুযোগই ছিল না মুক্তিবাহিনীর কমান্ডো গ্রুপটাকে কাছে ভিড়বার। ফিরে এলো তারা।

জুলাই মাসের মাঝামাঝি আরেক কমান্ডো গ্রুপকে পাঠালেন। দুর্ভেদ্য সে অঞ্চল। পিঁপড়ের মত ছেয়ে আছে পাকফৌজ ব্রীজের ওপরে। নীচে। ডাইনে ও বামে। ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলো তারা।

আগস্ট মাসের ৪ তারিখ। তৃতীয়বারের মত একটা গ্রুপ গেল সাথে প্রাক্তন ই-টি-আর বাহিনী বাঙ্গালী জোয়ান। ব্রীজের কাছাকাছি প্রায় পৌঁছেছিল তারা। কিন্তু না। হানাদার বাহিনী শকুনের চোখ মেলে প্রস্তুত ছিল। ফায়ার ওপেন করে দিল আমাদের কমান্ডো গ্রুপটার ওপর। ক্যাজুয়েলটিসহ ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলো তারা।

বসলেন কমাণ্ডার খাদেমুল বাশার। হেডেকোয়ার্টারে ডাকলেন ঐ এলাকার সাব-সেক্টর কমাণ্ডার ক্যাপ্টেন মতিউর রহমানকে (বীরবিক্রম), ডাকলেন কোম্পানী কমাণ্ডার হারেসউদ্দিন সরকারকে (বীরপ্রতীক)। চুলচেরা বিশ্লেষণ হয়ে গেল হাতীবান্দার ম্যাপ নিয়ে। পথঘাট এঁকে দিয়ে দিলেন তিনি ক্যাপ্টেন মতিউর ও হারেসউদ্দিনের কাছে।

পাকিস্তানের পাঞ্জাব রেজিমেন্টের ১ কোম্পানী ফোর্স ছিল এই ব্রীজ রক্ষায়। এতেই অনুমান কারা যায় এই ব্রীজের গুরুত্ব তাদের জন্য কত অপরিসীম ছিল। পাকিস্তানীদের পজিশন ছিল বড়খাতা ২ নং ব্রীজের ওপর ও দুই সাইড। রেলওয়ে স্টেশন ও গড্ডিমারির সংযোগ এই ব্রীজটি ছিল তিস্তা নদীর ওপর।

তিন-তিনবার ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসার পর এই গুরুত্বপূর্ণ 'এ্যাসাইনমেন্ট' ঘাড়ে তুলে নিলেন বাংলার দুই বীর মুক্তিযোদ্ধা মতিউর ও হারেস। তৃতীয় ব্যর্থতার ৮ দিন পর ১২ই আগস্ট, রাত ৮ টা। এক কোম্পানী শক্তিশালী পাঞ্জাবী আর্মির সামনে কতজন বাঙ্গালী বীর গেলেন? ১২ জন। হ্যাঁ, মাত্র ১২ জন বাঙ্গালী বুকে দেশপ্রেমের মন্ত্র নিয়ে, মুখে কলেমা শাহাদাত 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহু' পড়তে পড়তে বাউরা রেলস্টেশন থেকে যাত্রা করলো ক্যাপ্টেন মতিউর রহমান (বীরবিক্রম), কোম্পানী কমাণ্ডার হারেসউদ্দিন সরকার (বীরপ্রতীক), মুক্তিযোদ্ধা আফজাল হোসেন (পরে যিনি পাটগ্রামে হানাদারদের হাতে শহীদ হন), নজরুল ইসলাম, মনসুর আলী, শওকত আলী প্রমুখ। হাতে তাদের এক্সপ্লোসিভস, ডেটনেট, এল-এম-জি, স্টেনগান ও ৩ ইঞ্চি মর্টার। তাদের পেছনে প্রয়োজনমত কভারিং দেয়ার জন্য লেঃ মেজবাহউদ্দিনের (বীরবিক্রম) ও সুবেদার আবদুল মালেকের নেতৃত্বে ২টা এফ-এফ কোম্পানী থাকলো। মুক্তিযোদ্ধারা যখন বাউড়া থেকে জীপে যাত্রা শুরু করে তখন পাক-পজিশন ছিল ৫ মাইল দূরে 'বড়খাতা ব্রীজ'। পাকবাহিনীর পজিশনে দুই মাইল দূরে গিয়ে জীপ যখন থামলো রাত তখন পৌনে বারোটা। জীপ থেকে সবাই নামলো। এবার হাঁটার পালা। পায়ের তলায় শুকনো পাতা ও যেন না পড়ে এমন

সতর্কতায় পা ফেলে চলেছে ১২ জন বঙ্গ-জননীর বীর সন্তান। সামনে লক্ষ্য শুধু ব্রীজ বড়খাতা। তিন-তিনবার ফিরে গেছে মুক্তিবাহিনী। এবার তারা জীবন দেবে, তবু ব্রীজ অক্ষত রেখে যাবে না। কদম কদম পা ফেলে যখন তারা এগুচ্ছে, এলো আল্লাহর আর্শীবাদ, মূষলধারে বৃষ্টি। সেই বৃষ্টিকে সাথী করে গায়ের জামা খুলে 'এক্সপ্লোসিভ' গুলোকে জড়িয়ে নিয়ে এগিয়ে চললো ব্রীজ 'বড়খাতার' দিকে। আকাশ ঘনিয়ে এলা অন্ধকারে। বৃষ্টির গতি গেল বেড়ে। ব্রীজ বড়খাতার ওপর চোখ পড়লো মুক্তিবাহিনীর। বৃষ্টিতে মুখ বুজে আছে পাকিস্তানীদের বাঙ্কারগুলো। ব্রীজের দুই মুখে পৌছে গেল হারেসউদ্দিন, মতিউর রহমান ও অন্য সাথীরা। রাত তখন দেড়টা হবে। পাঞ্জাবীরা বৃষ্টির মুখে বাঙ্কারে ঢুকে বসে আছে। তলায় ততক্ষণে ত্রস্ত হাতে ক্ষিপ্রগতিতে এগিয়ে চলেছে মুক্তিবাহিনী অপারেশন। ব্রীজের তিন জায়গায় এক্সপ্লোসিভ বাঁধা হলো। মূল প্লানে ছিল দুই জায়গায়। কিন্তু বৃষ্টির জন্য পাক-হানাদাররা যখন "ওয়াচ" করতে পারছে না কিছুই তখন মতিউর রহমান সেই সুযোগটা কাজে লাগালেন। মাত্র ২৫ মিনিটে 'এক্সপ্লোসিভস' লাগানোর কাজ শেষ হয়, যেটার জন্য সময় দেয়া ছিল ৩০ মিনিট। এটা সম্ভব হলো কেননা মুক্তিবাহিনীর যেসব ছেলেদের তিস্তার পাড়ে গার্ড থাকার কথা ছিল তারা বরং ব্রীজের তলায় কাজ করে। বৃষ্টির সুবিধাটার জন্য সিদ্ধান্তটা অন দি স্পট চেঞ্জ করা হয়। এক কোম্পানী পাঞ্জাবী হানাদার ব্রীজের ওপর, ডানে-বামে দুর্ভেদ্য বাঙ্কারে বসে বসে যখন বৃষ্টির শব্দ শুনেছে, ততক্ষণে তাদের মৃত্যুঘন্টা বেজে গেছে তিস্তা নদীর স্রোতের ওপর।

অত্যন্ত সন্তর্পণে ধীরে ধীরে ক্যাপ্টেন মতিউর তিস্তার ওপর থেকে তুলে আনলেন তাঁর বারজন সাথীকে। গুনে গুনে নিলেন তিনি। হ্যাঁ, এবার পেছনে চলো সবাই। ৬০০ গজ দূরে এসে থামলেন তারা। সেই মুষলধারে বৃষ্টির মধ্যে রাত পৌনে দুটার দিকে ডেটনেটে আগুন ধরালেন তারা। প্রচণ্ড শব্দে, সেই বৃষ্টিপাতের মধ্যে মনে হলো আকাশ ভেঙ্গে রাশি রাশি বজ্রপাত হচ্ছে "ব্রীজ বড়খাতার" ওপর। তিস্তার বুকে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ভেঙ্গে পড়ছে হানাদারদের বাঙ্কার, ভেঙ্গে পড়ছে হানাদারদের শরীর। 'জয় বাংলা' ধ্বনি দিয়ে এল-এম-জি'র ফায়ার ওপেন করে দিল মতিউর হারেসরা। পেছন থেকে কভারিং ফায়ার এলো লেঃ মেজবাহউদ্দীনের কাছ থেকে। ছুটছে হানাদাররা, ব্রীজের চারপাশের বাঙ্কার ছেড়ে ভাগছে প্রাণভয়ে, উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে যাচ্ছে পেছন পানে। আক্রমণের আকস্মিকতায় ভীতসন্ত্রস্ত হানাদারদের ওপর বৃষ্টির ধারার মত গুলিবর্ষণ করে চলেছে বীর মতিউর, বীর হারেসরা। বাংলার দুশমনরা পেছনে ১৫টি ডেডবডি ফেলে রিট্রিট করলো। ব্রীজ বড়খাতার ওপারে উড়লো মুক্তির পতাকা। তিস্তার ওপাশ মুক্ত হয়ে গেল চিরতরে। যে ব্রীজের জন্য পাঞ্জাবীরা র্গব করে বেড়াত, তাদের দালালরা যে ''বড়খাতা ব্রীজের'' কথা বলে মুক্তিবাহিনীর পরাজয়ের প্রমাণ খাড়া করতো সেই বড়খাতা ব্রীজের বিজয় যখন সম্পন্ন হলো আনন্দে আবেগে কাঁদলো ক্যাপ্টেন মতিউর, কাঁদলো হারেসরা। এক অপরকে জড়িয়ে ধরলো বুকে।

যুদ্ধের ইতিহাসে "ব্রীজ রিভার অন কাউয়াই" এর নাম যদি থাকে, থাকবে আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বের গাঁথা নিয়ে ''ব্রীজ রিভার অন তিস্তা''র নাম।

॥ চার রাত্রির কাহিনী ॥

ক'জন জানেন যে, আমাদের ৩১৫ জন মুক্তিযোদ্ধা ৪ দিন আটকা পড়ে শুধু বিস্কিট আর পানি খেয়ে বেঁচে ছিল? ৬নং এইচ-কিউ-তে বসে সেক্টর কমাণ্ডার খাদেমুল বাশার সাহেব পর্যন্ত প্রায় ধরে নিয়েছিলেন তারা মারা গেছে।

সেই 'দুঃখের চার রাত' ছিল ৩রা সেপ্টেম্বর থেকে ৭ই সেপ্টেম্বরের রাত। এই রাতের শুরু হয়েছিল আরো আগে তিস্তার গা বেয়ে শঠিবাড়ি বন্দরের বুকে।

মুক্তিবাহিনীর পজিশন ছিল শঠিবাড়ির উত্তর ও পূর্ব দিকে। তাদের এক মাইল পেছনে তিস্তা নদী বয়ে চলেছে। তিস্তা নদীর অপর পাড়ে পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে এফ-এফ কোম্পানী নং ৭-এর কমাণ্ডার হারেসউদ্দিন

সরকার ৩৫০ জন এফ-এফ নিয়ে প্রস্তুত হচ্ছেন। হানাদার পাকিস্তানীদের ডিফেন্স হচ্ছে শঠিবাড়ি বন্দরের দক্ষিণ এবং পশ্চিম সাইডে। এক কোম্পানী ফোর্স নিয়ে সিমেন্টের মজবুত বাঙ্কারে মেজর হায়াত শক্তিশালী ডিফেন্স নিয়ে দীর্ঘ ছয় মাস বসে আছে। তাদের সাথে আছে ই-পি-কাফ (ই-পি-আর-এর ধরনে সে সময় পাক ফোর্সদের গঠিত একটি বাহিনী) এর ১ কোম্পানী, রাজাকার ছিল শ'তিনেক। তার ওপর পেছনে ছিল আর্টিলারী। হেভি মেশিনগান, ছয় ইঞ্চি মর্টার, এল-এম-জি, ১টা তিন ইঞ্চি মর্টার, কিছু স্টেনগান আর বাকী সব থ্রি-নট-থ্রি।

সেক্টর কমাণ্ডার খাদেমুল বাশার সাহেবের নিকট থেকে ৭নং কোম্পানী কমাণ্ডার নির্দেশ পান শঠিবাড়ির হানাদারদের ওপর চাপ সৃষ্টি করার জন্য । প্রথম দিকে মুক্তিযোদ্ধারা ‘‘হিট এণ্ড রান’’ পদ্ধতি অনুসরণ করে পুরা আগষ্ট মাস। সেপ্টেম্বর মাসের ২ তারিখ পর্যন্ত তাদেরকে ব্যস্ত রাখে। ইতিমধ্যে মুক্তিযোদ্ধারা গড়ে তোলে পাকা বাঙ্কার। শঠিবাড়ি বন্দরের পূর্ব ও উত্তর দিকে পাক হানাদারদের এক হাজার গজ দূরে এই সব বাঙ্কার তৈরী করে মুক্তিযোদ্ধারা মনোবল বাড়িয়ে তোলে। এবং এই সময় মুক্তিযোদ্ধা ও পাক হানাদারা যার যার পজিশন থেকে গোলাগুলি বিনিময় করতো।

সেপ্টেম্বরের ২ তারিখ। কোম্পানী কমাণ্ডার হারেসউদ্দিন সরকারের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধারা পাক হানাদারদের ৬০০ গজ দূরত্বের মধ্যে চলে আসে। ২রা সেপ্টেম্বর রাত ৩টায় কমাণ্ডার নিজে এস-এল-আর নিয়ে হানাদার পজিশনে ফায়ার ওপেন করে দেন। শুরু হয় মরণযুদ্ধ। হারেসের ছেলেরা প্রতিজ্ঞা করে শঠিবাড়ি বন্দর দখল না করে তারা পিছু ফিরবে না।

শঠিবাড়ি হাইস্কুলের ভেতরে নির্মিত দুর্ভেদ্য ঘাঁটি থেকে শেল বর্ষণ করে খান সেনারা। শুরু হলো তুমুল যুদ্ধ। খান সৈন্যদের মুহুর্মুহু শেল ও রকেটের আঘাত এস পড়ছে মুক্তিবাহিনীর ওপর। ভাঙ্গছে বাঙ্কার, আহত হচ্ছে মুক্তিসেনা। ধরাধরি করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাকে পিছনে। সামনে এগুচ্ছে আরেকজন মুক্তিসেনানী, করছে আঘাত শত্রুর বাঙ্কারে, পজিশনে গোলা-গুলি আর আর্তনাদে ভরে উঠলো ডিমলা থানার শঠিবাড়ি বন্দর। সমান গতিতে যুদ্ধ চলছে। ঘন্টার পর ঘন্টা। কেউ এক ইঞ্চি পিছু হটছে না। সমানে সমানে যুজে যাচ্ছে একে অপরকে একদিকে কমাণ্ড করছেন হানাদার বাহিনীর দুর্ধর্ষ মেজর হায়াত, অন্যদিকে শ্যামল বাংলার এক তরুণ বীর হারেসউদ্দিন সরকার। এক বাহিনী ছুড়ছে কামানের গোলা, রকেট ও শেল। অন্য বাহিনী দুয়েকটি এল-এম-জি আর থ্রি-নট-থ্রি দিয়ে তার জবাব দিচ্ছে।

ঘন্টার পর ঘন্টা হয়ে যাচ্ছে। ৪ তারিখ সকাল থেকে যুদ্ধের তীব্রতা বেড়ে গেল। হারেস উদ্দিন সরকার কয়েকজন সাহসী সাথীকে নিয়ে পর পর কয়েকটি সম্মুখের বাঙ্কার পার হায়ে এ্যাডভান্স করে গেল সম্মুখপানে। হানলো এ-এম-জি'র নিখুঁত আঘাত হানাদার বাহিনীর মেইন পজিশন শাঠিবাড়ি স্কুলের ভেতরের বাঙ্কারে। দুপুর বারোটার দিকে চাঞ্চল্য দেখা গেল হানাদারদের বাঙ্কারে ও ডিফেন্স পজিশনে। দ্বিগুণ শক্তিতে হারেসের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধারা ছুটে যেতে লাগলো সম্মুখপানে। সে এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত। শঠিবাড়ি বন্দর আর কয়েক মিনিটের মধ্যে মুক্তিযোদ্ধাদের করায়ত্ত হবে। প্রতিটি বাঙ্কারের মুক্তিযোদ্ধারা বৃষ্টির ঝাঁকের মত গুলি ছুড়ছে। হানাদার বাহিনী তাদের ডিফেন্স লাইন ছেড়ে পিছনে হটে যাচ্ছে বীর হারেস, বীর তার বাহিনী, বুকে থ্রি-নট-থ্রি চেপে ধরে সম্মুখপানে গড়িয়ে গড়িয়ে দখল করছে সামনের ভুমি। মরিয়া হয়ে টিপে যাচ্ছে থ্রি-নট-থ্রি ট্রিগার। জয় তারা ছিনিয়ে আনবেই। হানাদারকে পালাতে হবে শঠিবাড়ি থেকে। ট্রেণ্ড পাকিস্তানী বাহিনী তাজ্জব বনে গেল। এক তরুণ মুক্তিযোদ্ধার কমান্ডে এগিয়ে আসছে থ্রি-নট-থ্রি হাতে বাঙালী তরুণ বালক। অব্যর্থ গুলি ছুড়ছে তাদের বাঙ্কারে। ছেড়ে যেতে হচ্ছে তাদের ডিফেন্স পজিশন।

কোম্পানী কমাণ্ডার হারেসউদ্দিন ঘোষণা কর দিল ৪ঠা সেপ্টেম্বর সূর্য ডোবার আগেই শঠিবাড়ি বন্দর মুক্ত হয়ে যাবে। তিনশ' মুক্তিযোদ্ধা দম ধরে গুলি চালিয়ে যাচ্ছে হানাদারদের প্রত্যেকটা বাঙ্কারে। শঠিবাড়ি বন্দরের জয় অত্যাসন্ন। আক্রমণের মুখে আর দাঁড়াতে পারছে না হানাদাররা। আর কয়েক মিনিটের মধ্যে পতন হয়ে যাবে। মুক্তিযোদ্ধারা পতাকা তুলে ধরে ‘জয় বাংলা’ বলে চীৎকার করছে। এমন সময় হানাদার এলো আকাশ

পথে। ৪ঠা সেপ্টেম্বরের শঠিবাড়ি বন্দরে যখন মুক্তিযোদ্ধারা স্বাধীনতা পতাকা উত্তোলনের জন্য উদ্যোগ নিচ্ছে, পশ্চিম গগনে সূর্য যখন ঢলে পড়েছে, ঠিক তেমন সময় গর্জন করতে করতে এলো দুটি হেলিকপ্টার। হারেসউদ্দিন ও তার বাহিনীর বাঙ্কারের পজিশনে বৃষ্টির মত বোমা ফেলল তারা। আক্রোশে ক্ষোভে মুক্তিযোদ্ধারা এল-এম-জি'র ফায়ার করলো। হেলিকপ্টার দুটো চলে গেল প্রায় বিশ মিনিট ধরে মুক্তিযোদ্ধারা বিভিন্ন পজিশনে বোমা বর্ষণ করে। ডান পায়ে, ডান হাতে এবং কপালে বোমার আঘাতে আহত হলেন সেই বীর তরুণ, যিনি ছিলেন সেই তিনশ' মুক্তিযোদ্ধার বীর নায়ক। আহত হলো আরো অনেকে। এক নিমিষেই নিভে গেল সেই মুক্তিযোদ্ধাদের জয়ের আশা। রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত আহতদের ব্যান্ডেজ ও ফার্স্ট এইড শুরু হলো। বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল ৬নং এইচ-কিউ'এর সাথে সকল যোগাযোগ। খাবার ও অন্যান্য সামগ্রীর উপর বোমা পড়ায় সবকিছু ধ্বংস হয়ে গেল যদিও অস্ত্র ও গোলাবারুদের তেমন কোন ক্ষতি হয়নি মুক্তিযোদ্ধাদের বাঙ্কার এবং ডিফেন্স থেকে গুলি বন্ধ হওয়ায় হানাদার বাহিনী শুরু করলো নতুন উদ্যমে গুলি-গোলা বর্ষণ।

সেই অসহায় অবস্থায় ৪ঠা সেপ্টেম্বর রাত্রে অনেক মুক্তিযোদ্ধা যখন হতাশ হয়ে পড়েছিল তখন রক্তাপ্লুত কোম্পানী কমাণ্ডার চীৎকার করে বললেনঃ "যুদ্ধ চলবে, মৃত্যু পর্যন্ত যুদ্ধ চলবে, কেউ এক ইঞ্চি পিছু হটবে না। কাউকে যদি পিছনে তাকাতে দেখি, এই আহত অবস্থায় তার উপরে আমি গুলি চালাব। জন্মভূমির বুকে বীরের মত লড়ে প্রাণ দাও সবাই। হেডকোয়ার্টার থেকে আমরা তিনশ' জন বিচ্ছিন্ন, বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন। ধরে নাও আমরা সবাই মরে গেছি।" তিনি সবাইকে অনুরোধ করে বললেন, "মৃত্যুর আগে একবার শেষ লড়াই লড়ে যাও।"

মুক্তিযোদ্ধারা প্রাণ ফিরে পেল। আবার ফিরে গেল বাঙ্কারে। হাতে তুলে নিল থ্রি-নট-থ্রি। এমনভাবে পার হয়ে গেল ৪ তারিখ রাত। পাঁচ তারিখ সারাদিন যুদ্ধ চললো-সন্ধ্যায় দু'পক্ষেই ফায়ার বন্ধ হলো। সারারাত আহতদের সেবা শুশ্রূষা হলো। ছয় তারিখ ভোরে হানাদার বাহিনী ছয় ইঞ্চি মর্টার ও রকেট লাঞ্চার দিয়ে তুমুল আক্রমণ শুরু করলো।

একদিকে খাবার নেই। আড়াই দিন পার হয়ে যাচ্ছে। বিস্কুট এবং পানি খেয়ে বেঁচে আছে তিনশ' মুক্তিযোদ্ধা। শুধু ব্যান্ডেজ বেঁধে আহতরা পড়ে আছে বাঙ্কারে। সামনের দিক থেকে ছুটে আসছে পাকিস্তানী কামানের গোলা, মেশিনগানের গুলি। সবকিছু অনিশ্চিত। সবদিক দিয়ে বিচ্ছিন্ন। তবু মুক্তিযোদ্ধারা লড়াই চালিয়ে গেল। সবকিছু অনিশ্চিত জেনেও দাঁতে দাঁতে কামড়ে জীবন বাজি ধরে লড়ে গেল শঠিবাড়ি বন্দরে। ছয় তারিখ রাত আটটায় শঠিবাড়ির ডানদিকে মুক্তিযোদ্ধারা আকস্মিকভাবে তিনশ' গজ ছুটে গিয়ে হানাদারদের কয়েকটি ডিফেন্স পজিশন দখল করে নেয়। এটা ছিল একটি আত্মঘাতী পদক্ষেপ। সেই ডিফেন্স লাইনে ছিল প্রায় দেড়শ' রাজাকার। তারা অস্ত্রসহ আত্মসমর্পণ করে। আহত কোম্পানী কমাণ্ডারের নির্দেশ মোতাবেক মুক্তিযোদ্ধাদের ফ্রন্ট লাইনে বসিয়ে হানাদারদের বিরুদ্ধে গুলি চালাবার আদেশ দেয়া হয়। ধৃত রাজাকাররা সে আদেশ পালন করে। এর ফলে মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবল বেড়ে যায় । চাঙ্গা হয়ে ওঠে তারা। ৬ই সেপ্টেম্বর সারারাত গুলি আর পাল্টা গুলি চলতে থাকে। ৭ই সেপ্টেম্বর ভোর বেলা পাকবাহিনী অবস্থান ত্যাগ করে নীলফামারীর দিকে পালিয়ে যায়। ৭ই সেপ্টেম্বর সকাল ৭টা ২০ মিনিটে শঠিবাড়ি বন্দরের বুকে উড়লো মুক্তির পতাকা।

শিরোনাম	সুত্র	তারিখ
১৩। ৭নং সেক্টরে সংগটিত যুদ্ধের বিবরণ	....	মে-ডিসেম্বর ১৯৭১

যুদ্ধের ঘটনাপঞ্জীঃ ব্রিগেডিয়ার গিয়াসউদ্দীন চৌধুরী*

৩০-১০-১৯৭৯

Date	Events	Casualties
1. 04-05-71	Own FF consists of 4 pers launched at Rajshahi for a special mission.	One peace committee chairman injured.
2. 10-5-71	N/Sub Mubsharul Islalm along with party raided Charghat PS.	10 Militia/Pak Army killed & 7 injured.
3. 13-5-71	Hav Kh a Matin along with one section raided PTC Sardah.	6 Pak Army killed
4. 14-5-71	Own party raided Mirgonj BOP.	7 Pak Army killed & 7 injured.
5. 14-5-71	L/Nk Shariqur Rahman along-with party raided Mukhtarpur.	3 Pak agent killed.
6. 14-5-71	Own FF launched at Rajshahi.	6 Pak agent killed.
7. 14-5-71	Own FF raided the house of Nakimuddin, member of the Peace committee of Mirgonj.	1 Peace Committee member killed.
8. 15-5-71	Hav Kawsaruddin alongwith party raided the house of Chairman, Muslim League of Alatali.	Chairman ML Killed.
9. 15-5-71	Hav Amiruzzaman alongwith 10 OR launched at Sardah PTC.	Electric Pylon of Bheramara blown off.
10. 16-5-71	N/Sub Mohd Ismail along with one section raided Godagari en posn.	3 non-Bengali guard killed.
11. 16-5-71	Hav Amiruzzaman alongwith 5 OR raided the house of Peace Committee of Alaipur.	1 Peace Committee member killed.
12. 16-5-71	Own Mor sec shelled at Rajshahi Police line.	17 Pak Army killed and 25 wounded.

* ১৯৭১ সালের মার্চে ক্যাপ্টেন পদে কর্মরত ছিলেন। বিবরণটি প্রকল্প সংগৃহীত দলিলপত্র থেকে সংকলিত।

13. 16-5-71	Have Majibur Rahman alongwith 12 OR sent to blow off the Bidipur Rd bridge.	Bidipur Rd bridge blown off.
14. 17-5-71	Mjd Minurul Islam alongwith party raided the house of one Pak agent at Bagdani.	One Pak agent killed.
15. 18-5-71	Nk Ekrm Ali with 5 OR raided the house of Pak agent Abdus Sattar of Kharchakka.	One Pak agent killed.
16. 24-5-71	Hav Azizur Rahman along with 15 OR raided the village Basudebpur.	25 Pak agent killed. Our one MF killed.
17. 04-6-71	En attacked our liberation area Poladanga.	Our tps fought with en and en fled away leaving several dead bodies. 17 Pak army killed, 25 injured & 25 Pak agent killed. Our Hav Matin and one const. injured.
18. 19-6-71	Hav/CIK M Humayun Kabir alongwith 10 OR raided the house of Pak agent Malek Sarnakar of Premtali.	Malek Sarnakar killed and Tel line between Godagari Nawabgonj disrupted.
19. 21-6-71	Own party raided the house of Chairman Peace Committee.	Chairman killed.
20. 24-6-71	Own MF raided the house of Meser Biswas a Pak agent of Godagari.	Meser Biswas killed.
21. 24-6-71	Hav Kawasaruddin with 5 OR raided the house of Peace Committee of Basudebpur.	Peace Committee member killed.
22. 25-6-71	A group of FF raided the Rajshahi Tele exchange.	One militia guard killed.
23. 25-6-71	Own MF raided the Natore Rajshahi Rd rly crossing.	One rly guard killed & one injured.
24. 25-6-71	Own FF raided the house of Peace Committee of Beneswar under PS Charghat.	One Peace Committee member killed.
25. 26-6-71	Own demolition party went to demolish rd bridge of Katakhali. 4x3- in Mor Bomb were shelled on the en gun/mor posn near Rajshahi University.	Katakhali rd bridge blown off. 2 civ guard killed. Electric pylon near Sardah also blown off.

26. 27-6-71	Elec station and 4 Transformer were damaged by LIRAT at Katakhali.	3 Militia killed.
27. 27-6-71	Own MF raided the house of member of Peace Committee at Talaimari.	House of the member of Peace Committee damaged.
28. 30-6-71	Own demolition party went to blow off rly bridge near PTC Sardah.	7 Pak army killed.
29. 30-6-71	Own MF raided the house of the Peace Committee Bahar of Panikamri, Charghat.	Peace Committee member killed.
30. 30-6-71	Own MF raided the house of the Peace Committee member Pak Agent at Nawhata, Rajshahi.	2 Peace Committee members killed.
31. 03-7-71	A gp of FF launched at Rajshahi for operation.	One student killed by en while crossing the river after operation and another injured and evacuated to Barrakpur hospital.
32. 01-7-71	Own MF raided Kuthipara en posn.	2 Pak army killed.
33. 30-7-71	Own FF ambushed to en jeep.	Grenade thrown to jeep.
34. 30-7-71	Own FF raided Rajshahi power house.	Two militia guard killed and several injured.
35. 01-7-71	Own FF raided Shaheb bazar, Rajshahi.	4 Pak agen killed.
36. 01-7-71	2 FF gps was trying to capture by some civilian at Jhaikra PS Charghat.	One civilian killed.
37. 01-7-71	Own FF raided the house of Peace Committee member at Sujapur undedr P.S Paba.	Peace Committee member killed.
38. 01-7-71	Own FF raided the house of Peace Commitee member at Khandakatar PS Paba.	2 Pak agent killed.
39. 01-7-71	Own FF raided house of Peace Committee member and Pak army agent at Betkuri PS Paba.	1 Pak agent killed.
40. 01-7-71	Own FF raided house of Jamat-e-Islami at Palpur.	1 Pak agent killed.
41. 01-7-71	Own FF raided Nouhata Airport.	6 Pak agent killed.
42. 01-7-71	Own FF/FF M raided the Rajshahi town.	5 non-Bangalees killed.

43.	01-07-71	Own FF/FM raided Pak army posn at Kuthipara. PS Charghat Rajshahi	2 Pak Army & 1 agent killed.
44.	02-07-71	Own MF raided the house of one Pak agent at Damkura, Rajshahi	1 Pak agent killed
45.	02-07-71	Own MF/FF raided the Telephone Exchange, Rajshahi	1 Pak agent killed & one injured
46.	02-07-71	Own FF/FM raided the house of Peace Committee member at Durgapur, Rajshahi.	1 Pak agent & one Peace Committee member killed.
47.	02-07-71	Own FF raided the Durgapur Tahsil Office	Tahsil office burnt into ashes and tel line between Durgapur Sardah cut off.
48.	03-07-71	Own FF raided the house of Alauddin, Behari coloney, Rajshahi.	He and his wife along with baby killed.
49.	03-07-71	Own FF raided the house of Peace Committee member.	Peace Committee member killed.
50.	06-07-71	Own FF launched at Ishurdi.	Disrupted the tell link between Paksey Bheramara.
51.	07-07-71	Own FF raided the house of Peace Committee at Rustampur.	One Peace Committee member killed.
52.	07-07-71	Own party raided Arani Rly Sta	Dislocated all tel comm from Arani. all other stas.
53.	14-07-71	Own FF raided Rajshahi town	3 non--Bengali killed and 3 injured.
54.	14-07-71	Own FF raided Nouhata army pons.	4 military, 2 Pak agent killed and 2 injured
55.	14-07-71	Own FF raided Harian sugar mill and grenade thrown to mill compound	
56.	16-07-71	Own FF launched at area Gopalpur and Lalpur	One Pak agent killed and one injured.
57.	16-07-71	Own FF raided the guard of Atrai Bridge	One Rajakar killed and 2 militia injured.
58.	16-07-71	Own FF raided Rajshahi Ari port	One Pak agent killed.
59.	17-07-71	Own party raided the house of peace Committee of Charghat PS	Injured two Peace Committee members through grenade.

60.	19-07-71	PTC Pilot School was raided by party.	Sentry of pilot school killed.
61.	19-07-71	Own party raided the house of Pak agent Azimuddin of Rajshahi	He was stabbed and killed
62.	19-07-71	Own party raided the house of Peace Committee of Binodpur	He was killed through grenade charge
63.	20-07-71	One en patrol party was ambushed at Fudkipara, Rajshahi town.	4 Militia killed
64.	20-07-71	Own party raided Lalpur PS	7 Non-Bengali Police killed
65.	22-07-71	N/sub Mobasharul alongwith 2 sec raided Mirganj Razaker post.	5 Rajaker killed and tel link between Charghat Mirganj cut off
66.	24-07-71	Own party blown off 3 elec pylon of Bheramara Rajshahi line near Bagha.	
67.	24-07-71	Own party raided Lalpur PS by 2" Mor.	One Pak army jeep destroyed.
68.	31-07-71	2 Telephone pillars between Nawabgonj and Rajshahi destroyed.	
69.	03-08-71	Own party consists of 7 pers ambushed en patrol in 15 area Tahirpur.	15 en drowned in Tahirpur river
70.	04-08-71	Own party consists of 6 pers raided Tahirpur school	8 militia killed and 2 injured
71.	04-08-71	Own party ambushed mil jeep	2 Pak army killed
72.	04-08-71	Own party consists of 2 pers raided Katakhali sentry post	One en killed and 3 wounded
73.	05-08-71	Own demolition party launched Sitlai	Sitlai Rly bridge blown off.
74.	05-08-71	Own Mor sec shelled and raided one of the Razakar posn and Militia coy posn at Godagori PS High School.	3 Rajakar/Militia killed and 4 injured.
75.	10-08-71	Own party ambushed Pak mil van and planted A/P mine at PTI trg ground.	8 Rajakar killed and one injured.
76.	15-08-71	Own party headed by sub-sector comd raided Rajakar posn at Haripur bridge and also mortared at Nawabgonj EPCAF line, Police line and court areas from 200 yds.	9 Rajakar captured and Haripur bridge completely blown off.

77.	15-08-71	Own party consists of 8 pers entered Atrai PS under Natore Sub-Division.	8 Rajakar killed
78.	20-08-71	Own party consists of one section raided Durgapur PS area Dist Rajshahi	11 Rajakar killed and 12 injured. 1 Peace Committee member killed
79.	20-08-71	One section MF launched at Durgapur PS	9 Rajakar killed, 12 injured, 2 captured
80.	23-08-71	Own party consists of 45 pers mixed with FF and MF led by sub-sector comd went to raid and demolish AVOYA br.	
81.	23-08-71	Rajshahi-Nawabgonj rd about 20 miles from Rajshahi town	Fire exchanged, 2 en boats were seen sinking with occupants. 1 own killed & 2 injured.
82.	25-08-71	Own MF raided Afipara PS Paba en posn	6 Rajakar & 1 Pak army killed.
83.	03-09-71	Own party raided en posn at Bajubaka	34 Rajakar killed & 24 injured.
84.	06-09-71	Own party consists of 2 section raided army posn at Premtoli.	2 Pak army & 2 Rajakar killed & 7 insured
85.	13-09-71	Own MF consists of 1 P1 raided Ramchandrapur hat Pak army posn.	20 Pak army & 12 Rajakar killed & 13 Pak army injured. 1 Own MF killed, 2 MF injured.
86.	16-09-71	Own Mor section shelled at PTC Sardah	30 Rajakar / Army killed and 50 injured.
87.	20-09-71	Own MF raided the house of Peace Committee secretary of Charghat	Peace Committee secretary killed.
88.	22-09-71	Own raided the UC of Islampur while Jamate Islami were in meeting	2 Peace Committee member were arrested.
89.	22-09-71	Own MF of a sec str raided Katakhali power house. 24 bombs of 3" mor shelled on Katakhali power station.	2 Pak army killed & 10 injured.
90.	22-09-71	Hav Shafiqul Islam with 15 Or raided Rajakars posn at Rustompur hat.	2 Rajakar killed
91.	24-09-71	Own party raided the house of Pak agent.	1 Pak agent killed
92.	26-09-71	Hav Mojibur Rahman alongwith 2 sec raided Muktarpur behind Ayub Cadet College	2 Elec pylon of Muktarpur blown off.

93.	27-09-71	Own MF Mor sec shelled at Ramchandrapur hat under Nawabgonj PS on the en posn.	7 Pak army killed
94.	03-10-71	Hav Shafiqul Islam alongwith P1 str raided Dakra Bazar Rajakars posn.	1 Pak army & 20 Rajakars & 1 pak agent killed & 1 Rajakar injured.
95.	03-10-71	Own FF raided Belbaria Rajakar/ Mujahid posn.	15 Rajakar killed & 4 injured.
96.	10-10-71	Own MF and FF launched at Rajakars & Nawabgonj and planted mines to rly lines	1 Pak army train blown off & 25 Pak army killed.
97.	10-10-71	En attacked own posn Islampur	20 Pak army killed during the encounter. 1 own MF injured.
98.	11-10-71	2 sec own MF led by sub-Sector Comd fired 46X3" Mor bombs to the en posn at Godagari & Sultanpur	
99.	12-10-71	En advancing stopped by own troops with the help of 3" Mor.	50 En killed and 30 injured. I own MF injured.
100	10-10-71	Own MF/FF blew off with mine another special train carrying reinforcement to en tps Amnura from Rajshahi	30 Pak army killed / injured.
101	27-10-71	Own MF raided Rajakar / Militia base at Bagdani, Rajshahi.	5 Militia / Rajakars killed. Rajakars / Militia camp Completely damaged.
102	01-10-71	Own mixed gp of MF/FF attacked one patrol party of Rajakars.	3 Rajakar killed, 4 Rajakars arrested.
103	09-10-71	En fired 30 rds of shells in the liberated area Badkantapur and Sundarpur	
104	13-10-71	En fired approx 50 rds of 3" Mor bombs at own posn at Joyandipur.	
105	14-10-71	en shelled at our own base at Bakerrali and own tps also replied with 3" Mor.	
106	15-10-71	One pl Rajakars with the help of a local police attacked own FF boys in area Lalpur. Fire exchanged between Rajakar and own FF.	20 Rajakar killed. 1 FF boy killed

107.	21-10-71	Special mission of gps of MF & Ff of 15 each launched to Farhadpur bridge. En had 4 hunkers around both the bridge and well-protected by Rajakars guard.	Farhadpur bridge completely blown off.
108.	25-10-71	Own MF 1 X 25 at Lalpur PS	8 Rajakars of Bulmaria under PS Lalpur surrendered.
109.	30-10-71	Own MF raided army posn at Sundarpur	En fled away.
110.	30-10-71	Jamat-E-Islam attacked liberated area and own MF opened fire.	2 Jamat-E-Islam killed
111.	30-10-71	Own party of MF and FF launched to demolish Kumarpur bridge saw one en convoy approaching towards the bridge site. Own party laid a hasty ambush.	Damage two Jeeps
112.	06-11-71	Own one fighting party of a Plstr raided one of the army posn at Pebinagar, after exchange of fire en ran away.	2 Pak army killed.
113.	07-11-71	Two gps of own MF/FF consists of 2 PL raided Islampur, Joyandipur en posns.	
114.	08-11-71	Punjabi came down to vill Zahurpur to burn / loot houses of Pro-Bangladesh people. Own MF rushed to the spot and laid and ambush.	5 militia killed and one dead body brought back to base.
115.	07-11-71	Own MF raided Shahpur BOP, Rajshahi.	3 Rajakar killed
116.	11-11-71	En fired 2rds of 3" Mor and one fighting patrol opened up with aut wpn on won def at Narendrapur. Own pers replied with automatics.	
117.	12-11-71	Own tps of I pL raided Joyandipur and dislodged them out of bunkers and strong pts. PL IC of own injured one sec plus raided Bararahia.	Arrested 5 Rajakars & Peace Committee member. 2 Rajakar killed.
118.	13-11-71	En burnt 12 Rashia and Bagdanga.	

119.	12-11-71	Own MF 2 coys supported by section Mor of BSF attacked en posns. at Rajarampur.	1 Offr, 9 Pak army, 60 Rajakar/CAF killed and 12 Rajakars arrested. 4 own MF and 3 FF killed.
120.	24-11-71	En concentrated tps in area Islampur Chataidubi and Program.	
121.	25-11-71	Own FF/MF launched at Doari and Bagdani.	Doari bridge blown off. 6 Pak army killed. 2 FF killed.
122.	17-11-71	Own Mor shelled on en posn at Mirarpara	12 Pak army killed
123.	28-11-71	Own MF raided the house of one Pak agent at Charghat.	2 Pak agent and one Rajakar killed. House burnt into ashes.
124.	28-11-71	Rajakars attempted to drive away cattle from the liberated area near Narendrapur with the support of 3" Mor shelling. Own patrol party opened fire towards Rajakar while they were taking away cattle. Rajakars fled away leaving the cattle.	
125.	16-12-71	En holding Nawabgonj with 2 regular coys and 1 CAF supported by bty x 120 mm Mor and p1 82 mm Mor. Own tps of 3 coy attacked Nawabganj at 0600 hrs.	

স্বাঃ গিয়াসউদ্দীন চৌধুরী
৩০-১০-৭০

RE-ORGANISATION OF TROOPS AT RAJSHAHI

(From the diary of Brig. Gyas Uddin Chowdhury, BB, Psc (Retd.) then Maj. Gyas the Comd of Rajshahi Sub-sector)

I received a message on 22 April saying that Col. Osmain (later General) asked me to see him at a place opposite Patitola at Rajshahi. On 25 April 1971 I had to travel via India in a BSF jeep provided by a BSF battalion upto that place. There Col. Osmani came at a rest house and I met him there at about 0900 hrs. There I also met Capt. Anwar (now Brig.) who was commanding some elements of 3 East Bengal who got disorganised from Sayedpur Cantt. and followed him through.

I although carried a map with me and briefed him about my last operation. He had no knowledge about the surplus weapon I carried with me after withdrawal, i.e. 3000 rifles, 98 Bretta Guns, 6 medium morters, 3 lacs 303 ammunitions, 1400 mortar shells etc. He was very excited and requested me to wait for his order for the disposal of these weapons. He made me in-charge of a Sector covering Rajshahi district and part of Kushtia and Dinajpur district and also to organize the freedom fighters who will be withdrawing in the district of Maldaha and Murhsidabad in India.

In the month of May and June there was total frustration in the minds of freedom. I organized 3 camps initially. One came at a liberated area at Faridpur BOP and char area between river Padma and Mahananda mostly of trained armed personnel of BDR, Army and Ansrs / Mujahids. Another camp of trained armed personnel placed under command Maj. Rashid at a char area, within Bangladesh opposite Sardah police Academy. Third camp was organized at famous historical place at Lalgola area. This camp was organized to get the volunteers for joining the liberation war. With a short time this camp really started swelling with dedicated young boys mostly students community. These boys were picking up the guerilla training so fast that I was totally amazed. With 2 to 3 weeks training we started reinforcing our operational camps with these boys at Faridpur and Charghat / Sardah defence battle camp area.

We had enough arms-ammunitions and also food to sustain initial problems.

During the middle of June Ltd. Gen. Aurora GOC in C Eastern Command came to pay a visit to 19-Maratha Regiment at Baharampur, the district Head Quarter of Murshidabad. This battalion was earlier moved up there for election duty. Hearing about our success at Rajshahi he sent one of the officer of 19-Maratha Regt. to me and requested me to meet him. I was driving an open jeep of CJ-5 where Major Rashid (Later Col.) was sitting next to me. From Lalgola to Murshidabad the distance was over 30 miles and we were in a hurry. While trying to save a running cow my jeep skidded off from the road I met with a serious accident and broke my mandible. I had to remain in hospital for 10 weeks and during my absence Maj. Rashid was temporary holding the charge of my sector.

After I came out from hospital I went to meet Col. Osmani at Mujibnagar. He told me to take at least 2 months rest as advised by the doctor as I had still paralysis in my face and to take over a new sector as he has already nominated Maj. Zaman (Later Lt. Col) as sector comd. of my sector as 7 sector. I told him that I would prefer to go to my own Head Quarter first at Faridpur BOP and look after the operational aspect of Rajshahi sector. Moreover I will not like to have any rest / convalescence and prefer to carry on with the operation. He reluctantly agreed as Mr. Quamruzzaman the then Minister from Rajshahi also wanted me to be in that area. I was given charge of an independent sub-sector known as 4 sub-sector. I was supposed to get administrative support from Lt. Col. Manzur and co-ordinate operation with 7 sector under Lt. Col. Zaman. I started reconsolidation our training activities, organization and operational plans etc, Maj. Rashid was there with me and few young officers were placed under my command.

I had following types of Freedom fighters under my command.

(a) Regular Forces :	(a) A battalion at Faridpur BOP area facing Nawabgonj Town. of Niamita bahini
	(b) Less than a battalion under command Maj. Rashid opposite Sardah Police Station.
(b) Guerilla Forces :	(a) Approx, 6000 of them. They used to be located opposite Lalgola/ Bhagabangola area. They had group leaders thana leaders and special task force leaders. They used to go deep inside and carry out sabotage activities mainly and after 15 days / month or so exfiltrate through main defence to their camp in liberated areas. After rest / refit and taking ammunition etc. They used to go back to their own areas of operation Particularly in the areas where they came from.
(c) Informers / Motivators :	We trained large number of young boys to act as our informer. Their job was to collect information from inside and pass it on to us about enemy's disposition, defence layout, movement, state of morale etc. They used to contact the guerillas inside the country side and help them also to carry ammunition etc. for them, by acting as guide. They also used to motivate the local people not to cooperate with occupation army.

I organized my unconventional operation with the help of regular forces by changing the technique. We used to concentrate at a particular sector of my area of operation. After engaging the enemy frontally we used to go for sabotage activities behind the line particularly by disrupting the communication, like blowing the bridges, electric lines, electrical sub-stations, telephone poles, and some other key point installations.

After some time to divert attention we went all over the place for organized ambush. In some places we came out successful. Once or twice in a week we used to get engaged in a pitch battle with them face to face and again pull back to play on their morale and nerve. All through we carried out so many small scale operations which is very difficult to enumerate here. However, I will like to give the run down of two very successful operation during my command of the sector. Although here also I could not give the name of the place as was given in the map.

OPERATION 'KABZAKARA'

On 10 November I was requested by Lt. Col. Q. N. Zaman to plan an attach at Sonamasjid area on road Maldah-Nawabganj. Occupation army was putting up a very

strong defence with more than a battalion with the help of regular CAF and Rajakars. There was a deep canal approx. 75 ft. wide running north and south parallel to the International Boundary approximately 7/8 miles inside Bangladesh territory. In a number of occasion attacks were launched by forces commanded by Capt. Jahangir under wham there were 3 more companies, commanded by Lt. Qayum, Ltd. Rashid and Lt. Kaisar. Every time they went for frontal confrontation they had a very heavy casualty.

Due to heavy losses of own forces in the hands of the enemy in the same place the morale of the forces were very low as they could never had a success Inspite of losing their comrades. The takes given to me is to clear up a tactically important ground around that defence which was dominating all the movements towards Nawabganj. After getting initial briefing from Lt. Col. Zaman and about the task I straight away went out for reconnaissance of the area. What I observed that the enemy had communication trenches all along the canal, approximately of a length of more than one mile. They had beautifully built bunkers prepared with the help of local people where they used local resources like bamboos, local timber/trees etc.

Every likely crossing point was covered by LMGs or MGs. They also had observation posts located either on the top of tree or on the, top of tall building. Morters were deployed to shell all the likely approaches.

It took good 2 days to carry out detail reconnaissance of the area. It was a challenge to me to make my mission a success. Every enemy platoon/coy position was identified including their automatic weapons. The enlarged sketch gave a clear pictures of the area to a person at the very glimpse. Four companies were selected by me for the purpose. We had 3x81mm morters (medium range) with us. We also had the support of 75/24 field artillery guns with us in direct support. I prepared an order for all the coy comds and gave a detail operation order on 13 Nov. at 0900 hrs. On the cloth model. All the doubts were clarified to each and every commander and leader.

All the troops were briefed about the layout of the land only where we were going for operation. Each and everyone was very much excited and was so happy to see and know in a picturesque model of an operation which very few of them have seen or heard. I could see the sign of confidence and a very high state of morale in each and everyone down to ladder. We decided to go for night attack which was a very difficult task to carry out with semi-trained forces. But I had no other choice other than this as they enemy had better weapons and properly dug in trenches/ bunkers and was in a formidable defence. The H-hour was selected 0400 hrs. On 14 Nov, 1971. Lt. Col. Zaman was also present, when I was giving the operational order. Lt. Col. Zaman who used to be an ace gunner officer in Pakistan army volunteered to act as MFC (Mobile Fire Controller) during operation. In the same evening myself and Lt. Col. Zaman drove to some distance and walked down to a vantage point for registration of target. Just before dusk we carried out the registration. There was a 2-storied building down there, from where we could see the whole enemy area. I was very much impressed by the gunnery knowledge of Lt. Col. Zaman. With 4/5 artillery shots he could bring the artillery rounds into the target. After registration of targets we moved back to our near assembly area. 4 cays and task force HQ with support weapons like 81 mm morters etc. were asked to assemble approximately

2500 yds away from the target in a forward assembly area at 0100 hrs. Our troops were supposed to start crossing of the canal at 0200 hrs and to be in FUP (Forming up Place) which was on the flank of enemy main position. I had to guide all these coys upto canal bank and come back upto a vantage point where I was conducting the operation. To deceive the enemy and make him imagine that attack is coming from front I made a diversionary attach from the front with the help of a platoon. The platoon went very close to enemy position to the left side and opened up intermittently with their automatic weapons and other platoon weapons. Artillery shells of 75/24 also continued to shell their position at a slow rate of fire from 0300 hrs. This gave an impression to enemy that the attack is coming from the left while our crossing was going on from the right flank. Our troops were supposed to be a FUP at 0400 hrs. and attach to be carried out accordingly. For this 2 crossing points were selected. 4 small country boats for each crossing area was selected, for carrying out the crossing. In each side 2 cays to cross on the other side. Crossing site was selected at a flank where enemy neither had any troops, nor they could expect a crossing. Pre-H hour bombardment was very well planned to keep enemy's hand down and to deceive him. Wireless silence was supposed to be maintained till they come close to enemy's small arms firing range i.e. expected to be broken at 0415 hrs. I guided them upto canal site and after splitting the 2 groups each of 2 coys I moved with my Head Quarter to a central location at a vantage point from where I could control the battle. Lt. Col. Zaman was left behind near the canal site opposite central position of enemy's defence from where we registered the target with the artillery guns. He called the artillery fire. Our medium morters (81mm) were brought as close to canal as possible so that they could fire at enemy effectively.

The night was unexpectedly foggy on that day and one could not see a person even 5 yds away properly. This lack of visibility really retarded the movement of our troops. We expected our troops to reach the objective in time and open up with their weapon when they reach within small arms range of enemy and that was 0415 hrs. It was already 0430 hrs and even became 0500 hrs. One of the task force i.e. A & B coys was Capt. Jahangir who was supposed to come from behind by enveloping the enemy. Other two coys C & B as a task force was supposed to be commanded by Lt. Qayum. As I was not hearing anything from them till 0400 hrs which was first to be broken by task force comd. I broke the wireless silence at 0430 hrs and started calling them by code name. There was no response at all. At 0510 hrs. I got Lt. Qayum in the wireless from whom what I gathered was that they were just moving from FUP to objective behind schedule by one hour and 10 minutes. The delay was due to sinking of 2 boats who could not take the freedom fighters across due to poor quality and the lack of knowledge on the part of troops about assault canal crossing. When I asked about the other task force in code word he could not give my any due about them. However, I had some sigh of relief when I could get one group in the wireless set. He moved quite fast as the twilight was there, but the visibility remained very very poor. Firing opened up at enemy at about 0530 hrs from the right flank. Enemy got quite perplexed as they were expecting an attach from the left at night. They came to forward position of the enemy at 0545 hrs and fought through. The enemy was so much surprised that they literally left the trenches and bunkers without giving

much of fight. I could bear the battle cry of 'Ya Ali and the troops were charging through one after another position. By 0700 hrs. Lt. Qayum's task force captured the objective.

At about 0600 hrs I got Capt. Jahangir in the radio set. His radio set got soaked in canal water as the boat in which his wireless operator was there capsized during crossing. He had to clean the set and again put it into operation. I could not hear anything clearly as the voice was fading. But I could make out that it was his voice. He launched the attack at 0630 hrs. on to the enemy position. Enemy gave a stiff resistance as the Head Quarter the main defence was located in that area. It was launched rather on their withdrawal route. After about an hour's battle enemy left their position leaving behind huge quantity of arms and ammunition. All the positions were totally cleared by 0800 hrs. Own troops reorganized. Enemy lost 11 of their soldiers including one Captain and we captured 5 of their injured. We had no dead except 7 injured. What surprised me was that Inspite of having very well dug trenches and bunkers all along the canal and communication trenches of 6 ft height, where one could comfortably walk heads up without being observed by our troops they left the position without giving much of resistance. My feeling was that their state of morale was very low and they had no will to fight.

Instead, the morale of our troops were sky high and they were bolstering about their achievement. Although all these boys had to undergo terrible hard time during move upto FUP there, again during attack which took more than expected time yet I could not see any sign of fatigue and tiredness. In their joy and excitement they were moving from bunker to bunker and were collecting ammunition and arms.

In that operation one thing that become very clear to me was that blessings of Almightily God should be there for any success. If the day was not foggy upto 0900 hrs next day we could have a very heavy casualty and may not have been successful in that operation. The fog acted as a smoke screen to our assaulting troops during crossing of canal and also during attack. Lastly, I must say 'God help those who help themselves'.

*   *   *   *

সাক্ষাৎকারঃ মেজর (অবঃ) রফিকুল ইসলাম*

লেঃ কর্নেল কাজী নূরুজ্জামান ছিলেন সাত নম্বর সেক্টরের কমাণ্ডার। এই সেক্টরটিকে কয়েকটি সাব-সেক্টরে ভাগ করা হয়ঃ

একঃ লালগোলা সাব-সেক্টর-
ক্যাপ্টেন গিয়াসউদ্দিন চৌধুরী এই সাব-সেক্টরের কমাণ্ডার ছিলেন।

* ১৯৭১ সালের অক্টোবর মাসে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে কমিশনপ্রাপ্ত। সাক্ষাৎকারটি প্রকল্প সংগৃহীত দলিলপত্র থেকে সংকলিত

দুইঃ মেহেদীপুর সাব-সেক্টর-

বীরশ্রেষ্ঠ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর ছিলেন সাব-সেক্টর কমাণ্ডার।

তিনঃ হামজাপুর সাব-সেক্টর

ক্যাপ্টেন ইদ্রিস সাব-সেক্টর কমাণ্ডার ছিলেন।

চারঃ শেখপাড়া সাব-সেক্টর-

ক্যাপ্টেন রশিদ সাব-সেক্টর কমাণ্ডার নিযুক্ত হন।

পাঁচঃ ভোলাহাট সাব-সেক্টর-

লেঃ রফিকুল ইসলাম এই সাব-সেক্টর কমাণ্ডার ছিলেন।

ছয়ঃ মালন সাব-সেক্টর-

প্রথম দিকে ক্যাপ্টেন মহিউদ্দন জাহাঙ্গীর সাব-সেক্টর কমাণ্ডার ছিলেন। পরে একজন সুবেদার এই সাব-সেক্টরের কমাণ্ডার করেছেন।

সাতঃ তপন সাব-সেক্টর-

মেজর নজমুল হক প্রথম দিকে কমাণ্ডারের দায়িত্ব পালন করেন। পরে একজন সুবেদার সাব-সেক্টর কমাণ্ডার ছিলেন।

আটঃ ঠোকরাবাড়ী সাব-সেক্টর-

সুবেদার মোয়াজ্জেম সাব-সেক্টরের কমাণ্ডার ছিলেন।

নয়ঃ আংগিনাবাদ সাব-সেক্টর-

গণবাহিনীর জনৈক সদস্য মিত্রবাহিনীর তত্ত্বাবধানে কমাণ্ড করেছেন।

সেক্টরের প্রতিটি সাব-সেক্টর এলাকায় প্রচণ্ড যুদ্ধ চলে। অতর্কিত আক্রমণ অ্যামবুশ ও সেতু ধ্বংস করে মুক্তিবাহিনী এক অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করে। মে মাসে খঞ্জনপুর, পত্নীতলা, ধামহাট, গোদাগাড়ী, চারঘাট, সারদা পুলিশ একাডেমী, পুটিয়া দুর্গাপুর ও কাঁটাখালী বিদ্যুৎ কেন্দ্রে বার বার আক্রমণ করা হয়। পাকবাহিনীর মনোবল দারুণভাবে ভেঙ্গে পড়ে।

দিনাজপুরের ঠনঠনিয়াপাড়ায় একটি বড় রকমের যুদ্ধ হয় ১৮ই জুন। মেজর নজমুল হক নিজে এই যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন। ঠনঠনিয়াপাড়া মুক্তিবাহিনীর দখলে আসে এবং ১৪জন পাকসেনা নিহত হয়। একজন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন ও ২ জন আহত হন।

জুলাই মাসের ৪ তারিখে মেজর নজমুল হক কাঞ্চন সেতুর উপরে পাক ঘাঁটি আক্রমণ করেন। এই আক্রমণ যদিও সফল হয়নি তবু পাকসেনাদের কলাবাড়ি ছেড়ে কানসাটে পলায়ন করে।

ক্যাপ্টেন ইদ্রিস ও সুবেদার মেজর মজিদ ২৩শে আগস্ট কানসাট আক্রমন করেন। এই ভয়াবহ যুদ্ধ চার ঘন্টা স্থায়ী হয়। প্রচুর পাকসেনা হতাহত হয়। চাঁপাই নওয়াবগঞ্জ থেকে অনেক পাকসেনা সাহায্যে এগিয়ে আসে।

কানসাটে ২৬শে আগস্ট শুরু হয় আবার যুদ্ধ। নদী পার হয়ে ক্যাপ্টেন ইদ্রিস ও সুবেদার মেজর মজিদের দল কানসাট আক্রমণ করে। পাকসেনারা কানসাট ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়। কিন্তু অল্প সময় পরেই পাকসেনারা পাল্টা আক্রমণ করে। মুক্তিবাহিনী এই আক্রমণের মুখে পিছনে সরে আসে।

৩রা আগস্ট তাহেরপুর পাকঘাঁটি আক্রমণ করেন ক্যাপ্টেন রশিদ। সীমান্ত থেকে ২৫ মাইল ভেতরে পুঠিয়া থানার ঝলমলিয়া ব্রিজে হাবিলদার শফিকুর রহমানের দলের সাথে সংঘর্ষ বাধে। অক্ষত অবস্থায় মুক্তিবাহিনী ফিরে আসে।

৪ঠা আগস্ট পাকিস্তানী দল নদীপথে তাহেরপুরের দিকে আসছিলো। হাবিলদার শফিক পাকসেনাদের এ্যামবুশ করেন। এতে ১৮ জন পাকসেনা নিহত হয়।

দুর্গাপুরে ২৬শে আগস্ট হাবিলদার শফিক অতর্কিতভাবে পাকসেনা কর্তৃক আক্রান্ত হন। মুক্তিযোদ্ধা ২" মর্টার ও হালকা মেশিনগানের গোলা নিক্ষেপ করে নিরাপদে ফিরে আসে।

সারদা পুলিশ একাডেমীতে অবস্থানরত পাকিস্তানী কোম্পানীর উপরে অতর্কিত আক্রমণ করা হয় ১৭ই আগস্ট। এই দুঃসাহসিক অভিযানে ১ জন ছাড়া সকলেই শহীদ হন।

মীরগঞ্জে ২২শ আগস্ট সুবেদার মেবোসসারুল ইসলাম চারঘাট থানার মীরগঞ্জ বি-ও-পি আক্রমণ করেন। নিদ্রামগ্ন পাকসেনারা সকলেই নিহত হয়।

১৪ই অক্টোবর মুক্তিবাহিনী শেখপাড়া সাব-সেক্টর কমাণ্ডারের নির্দেশে দুর্গাপুর থানার গলহরি যান। পাকসেনারা জানতে পেরে আক্রমণ করে। বাঁশের সেতুর উপর দিয়ে যখন পাকসেনা আসা শুরু করে তখন মুক্তিবাহিনী গুলিবর্ষণ শুরু করে। এখানে ৭৩ জন পাকসেনা ও ২ জন অফিসার নিহত হয়।

লালগোলা সাব-সেক্টরে মেজর গিয়াসের নেতৃত্বে অমিতবিক্রমে যুদ্ধ চলে। রাধাকান্তপুরের যুদ্ধ ও ইসলামপুরে অবস্থিত পাকঘাঁটি আক্রমণ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। পাকসেনারা নবাবগঞ্জে পশ্চাপসরণ করতে বাধ্য হয়।

হামজাপুর সাব-সেক্টরে ১৩/১৪ই নভেম্বর ঘনেপুর বি-ও-পি আক্রমণ করে ৩০ জন পাকসেনাকে হত্যা করে। সাতাশে নভেম্বর মেজর গিয়াস পাঁচ কোম্পানী মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে পোড়াগ্রাম আক্রমণ করেন। এই ভয়াবহ যুদ্ধে ৩০ জন পাকসেনা ও ৫০ জন রাজাকার নিহত হয়।

ভোলাহাট সাব-সেক্টর মকরমপুর আলীনগরস্থ পাকঘাঁটিতে লেঃ রফিকের নেতৃত্বে অতর্কিত হামলা করা হয় ৭ই নভেম্বর। পাঁচজন পাকসেনা নিহত হয এবং মহানন্দা নদী পার হয়ে পাকসেনারা পালিয়ে যায়। ভোলাহাট থেকে রহনপুর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ১০০ বর্গমাইল এলাকা ছিল সম্পূর্ণ মুক্ত। সাব-সেক্টর হেডকোয়ার্টার ছিলো দলদলিতে। মহানন্দা নদীর দু'পাশে আলীনগর থেকে শাহপুর গড় পর্যন্ত দীর্ঘ ৭ মাইল মুক্তিবাহিনীর ডিফেন্স ছিলো। ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীরের সার্বিক তত্ত্বাবধানে আলমপুর আম্রকাননে অবস্থিত পাকঘাঁটি আক্রমণ করা হয়েছিল ১৮ই নভেম্বর। এই যুদ্ধে লেঃ রফিক ও লেঃ কাইউম ২ কোম্পানী সৈন্যা নিয়ে সম্মুখযুদ্ধে অবর্তীণ হয়েছিলেন। প্রচণ্ড যুদ্ধের পর আলমপুর দখল হয়েছিল কিন্তু আকস্মিকভাবে পিছন দিক থেকে শত্রুর গুলি আসতে থাকে। পেছনের বাঙ্কারে শত্রুজীবিত অবস্থায় লুকিয়ে ছিল, অগ্রসরমান মুক্তিযোদ্ধারা কেউই তা খেয়াল করেনি। মুক্তিযোদ্ধারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে এবং পাকসেনারা আলমপুর পুনর্দখল করে।

নভেম্বরের শেষের দিকে সংঘটিত হয় শাহপুর গড়ের যুদ্ধ। পাকসেনার একটি ব্যাটালিয়ন শাহপুর গড় আক্রমণ করে। সারাদিন যুদ্ধ চলে। রাত দেড়টার সময় মুক্তিবাহিনী আক্রমণ করে। এই আক্রমণে রণাঙ্গনে উপস্থিত থেকে নেতৃত্ব দেন স্বয়ং সেক্টর কমাণ্ডার লেঃ কর্নেল নূরুজ্জামান।

বীরশ্রেষ্ঠ জাহাঙ্গীর কলাবাড়ি, ছোবরা, কানসাট ও বারঘরিয়ার যুদ্ধে বীর নায়ক হয়ে আছেন। একটি মানুষ যে কত সাহসী ও তেজস্বী হতে পারে জাহাঙ্গীর ছিলেন তার দৃষ্টান্ত। প্রতিটি যুদ্ধে সবার আগে থেকে তিনি নেতৃত্ব দিতেন।

এ ছাড়া ক্যাপ্টেন ইদ্রিসের বীরত্ব ও সাহসের বর্ণনা করা একটি অসম্ভব ব্যাপার। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে তিনি যে শৌর্যবীর্যের পরিচয় দিয়েছেন তা সমগ্র বাঙ্গালী জাতির জন্য গর্ব ও অহংকারের ব্যাপার। বিরলের যুদ্ধ এখন ঐ অঞ্চলের মানুষের মুখে শোনা যায়। এই যুদ্ধে ক্যাপ্টেন ইদ্রিস আহত হন। তিনদিন পর লেঃ সাইফুল্লাহ গুলিবিদ্ধ হন। লেঃ কায়সার ও আমিন এই যুদ্ধে বিশেষ বীরত্বের পরিচয় দেন।

সাক্ষরঃ রফিকুল ইসলাম
২৪-০৮-৮৩

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৪। ৭নং সেক্টরে সংঘটিত যুদ্ধের আরও বিবরণ	....	.........১৯৭১

একটি অপারেশন*: ডাঃ মাহবুবুল আলম, এমবিবিএস, বিপি

৩০-১০-১৯৭৯

১৪ই আগস্ট, ১৯৭১ সন। রাজশাহীর দক্ষিণাঞ্চল বন্যাকবলিত। পদ্মা নদীর দুই কূল ভেসে গেছে। যেদিকে চোখ যায় মনে হয় যেন একটা সাগর, তারই মাঝে চোখে পড়ে দু-একটি গ্রাম। বহু গৃহপালিত পশু ভেসে যাচ্ছে আর নদীর দু'পাশের লোকজন প্রকৃতির সাথে সংগ্রাম করে ঠাঁই পেতে চেষ্টা করছে তারই ঘরের চালে বসে অনাহারে-উপবাসে। সেই দিনটিতেই পাকবাহিনী ঢাকঢোল পিটিয়ে উদযাপন করতে চাইছে ১৪ই আগস্ট, স্বাধীনতা দিবস। আর তার সাথে যোগ দিয়েছে তাদেরই পদলেহনকারী কিছু সংখ্যক আলবদর বাহিনীর লোক। চাঁপাইনওয়াবগঞ্জ শহরের লোকজনকে জড়ো করা হয়েছে পাকসেনাদের মহত্ত্বের প্রশংসা করতে, বিকেলে টাউন হলে সম্বর্ধনা সভা ডেকে। আর্মি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক প্রধান অতিথি। জাঁকজমক পরিবেশে সবকিছুর পূর্ব প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। এদিকে ফরিদপুর বি-ও-পি তে সকাল ৭টায় সেদিন প্রায় এক কোম্পানী মুক্তিযোদ্ধা একত্রিত করেছেন মেজর গিয়াস (বর্তমানে ব্রিগেডিয়ার)। পদ্মা ও মহানন্দা নদীর মাঝামাঝি এ বি-ও-পিসহ আরও চারটি বি-ও-পি জুড়ে প্রায় দুইশত বর্গমাইল এলাকা ২৬শে মার্চের পর থেকেই মুক্ত ছিল। পাকবাহিনী বহু চেষ্টার পরও এর কোনটি অধিকার করতে পারেনি স্বাধীনতার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত। ৮৬জন মুক্তিযোদ্ধাকে মনোনীত করা হল অপারেশনের জন্য। বি-ও-পি'র ভিতরে পাকা মেঝেতে সুন্দর একটা নকশা পূর্ব থেকে বানান ছিল-যার আশেপাশে সকলকে বসানো হল। সেদিন প্রত্যেকটি মুক্তিযোদ্ধার চোখেমুখে ছিল জিঘাংসা আর দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের চিহ্ন।

নকশনার উপর শত্রুর ঘাঁটি আর অবস্থান সম্বন্ধে একে একে বুঝিয়ে দিলেন মেজর গিয়াস। শত্রুর অবস্থান ছিল তখন নিম্নরূপঃ

ক) একটি ইনফ্যানট্রি ব্যাটালিয়ন হেডকোয়ার্টার নওয়াবগঞ্জ ও তার সাথে একটি কোম্পানী, যারা নওয়াবগঞ্জ শহরের প্রতিরক্ষার দায়িত্বে সি-এ-এফ'র সাথে নিয়োজিত ছিল।

খ) হরিপুর পুলের উপর দুই সেকশনের কিছু বেশী লোক পাহারা দিচ্ছিল। ২২০ ফুট লম্বা এ ব্রিজটি নওয়াবগঞ্জ থেকে দুই হাজার গজের কিছু বেশী দূরে রাজশাহী-নওয়াবগঞ্জ রাজপথের উপর অবস্থিত।

গ) আমনুরা রেলওয়ে স্টেশনে ছিল সেনাবাহিনীর একটা প্লাটুন, আর এক প্ল্যাটুন ছিল নওয়াবগঞ্জ স্টেশনে। এই প্লাটুনদ্বয়ের কাছে একটা ইঞ্জিন ও দুটি করে বগি থাকত এবং বিশেষ করে রাত্রে তারা আমনুরা ও নওয়াবগঞ্জের সাথে পেট্রোলিং করে বেড়াত।

এছাড়া এক প্লাটুন আর্মি ও সি-এ-এফ'এর গার্ডও ছিল, যারা নওয়াবগঞ্জের অদূরে নওয়াবগঞ্জ-আমনুরা রেললাইনের উপর দুটি পুল বিদিলপুর নামক জায়গায় পাহারা দিচ্ছিল।

এই ৮৬জন মুক্তিযোদ্ধাকে বাছাই করলেন মেজর গিয়াস নিজে। তিনি তাদের তিনটি ভাগে ভাগ করলেন।ঘোষণা করলেন যে তিনি নিজে সেই অপারেশন পরিচালনা করবেন। কিংবদন্তীর নায়ক মেজর গিয়াসের নাম

* প্রকল্প সংগৃহীত দলিলপত্র থেকে সংকলিত।

রাজশাহীর লোকের মুখে মুখে। তিনি নিজে অপারেশন পরিচালনা করেছেন শুনে সকলে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো।

ক) এক নম্বর গ্রুপে বিশজন লোক দেওয়া হলো-যার কমাণ্ডার সুবেদার ইসমাইলকে করা হয়। তার কাছে দেওয়া হল তিনটি মাঝারি মর্টার আর ৯০টি বোমা। কাজ দেওয়া হল নওয়াবগঞ্জ শহরে ১৪ই আগস্ট রাত দশটা হতে এগারটা পর্যন্ত গোলাবর্ষণ করা।

খ) দুই নম্বর গ্রপে ৩৫ জন মুক্তিযোদ্ধাকে দেওয়া হল। কমাণ্ডার নিযুক্ত হলেন সুবেদার আমিরুজ্জামান। মেজর স্বয়ং এই গ্রুপের সাথে রইলেন-তিন গ্রুপের পরিচালনা করবেন অয়ারলেসের সাহায্যে। কাজ দেওয়া হল হরিপুর পুলের উপর হামলা করা এবং প্রহরারত হানাদার বাহিনীর লোকদেরকে হত্যা অথবা বন্দী করে পুলটিকে উড়িয়ে দেওয়া, যাতে করে নওয়াবগঞ্জ আর রাজশাহীর মধ্যেকার একমাত্র সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

গ) তৃতীয় গ্রুপের কমাণ্ডার ছিলেন নায়েক সুবেদার আমানউল্লাহ, যাকে দেওয়া হয়েছিল ৩১ জন মুক্তিযোদ্ধা। কাজ দেওয়া হয়েছিল বিদিলপুর রেলওয়ে পুলটি উড়িয়ে দেওয়ার।

ছয়খানা নৌকা যোগাড় করা হয়েছিল আগে থেকে। আমাদের নৌকার কাণ্ডারী ৫৯ বছর বয়স্ক হুরমত আলী। সাদা ধবধবে লম্বা দাড়ি-চুলের অধিকারী এই বৃদ্ধের মাথায় ছিল গোল একখানি টুপি। কপালে দেখা যাচ্ছিল সুস্পষ্ট কাল দাগ, এবাদতের চিহ্ন। ছয়টি নৌকায় সকলে গিয়ে উঠলাম। মনে হচ্ছিল যেন আমরা সাগর পাড়ি দিচ্ছি অথৈ জলের মাঝে। হুরমত আলী রওনা হওয়ার আগে কি যেন বিড় বিড় করে পড়ল, তারপর মোনাজাত করল। সকাল নটার সময় আমরা গন্তব্যস্থানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলাম। হুরমত আলীর নৌকা সকলের আগে ছিল, তাতে ছিলেন মেজর গিয়াস নিজে। সব মিলে ১৭ মাইল রাস্তা অতিক্রম করতে হবে। নৌকার পাল উঠাতেই নৌকার গতিবেগ চার থেকে পাঁচ মাইলে পৌছাল।

সন্ধ্যা হতে না হতেই টারগেটের দু'মাইলের মধ্যে পৌছান গেল। কিন্তু সবচেয়ে বন্ধুর আর ভয়াবহ হয়ে দাঁড়িয়েছে এই দুই মাইল রাস্তা। যেতে হচ্ছে মহানন্দার ছোট্ট উপনদী-শাখানদী ধরে। আগে থেকে জানা ছিল মীরজাফরের বংশধরদের বেশকিছু লোক এ অঞ্চলে এসেছে, যারা আলবদর আর রাজাকারের মুখোশ পরে এতদঞ্চলে অবস্থান করছে। বহু কষ্টে আরও এক মাইল পথ অতিক্রম করতে আরও দেড় ঘণ্টা সময় লেগে গেল। এক মাইল রাস্তা আরও যেতে হবে। রাত তখন সাড়ে সাতটা। সাড়ে দশ ঘণ্টা কেটে গেছে নৌকায়। হঠাৎ হুরমত আলী ইশারা দিল সকলকে থাতমে। আমার কাছে এসে ফিস ফিস করে বলল যে, সে রাস্তাটা যেন হারিয়ে ফেলেছে। সব কটা নৌকায় হঠাৎ ফিসফিস শব্দ বেড়ে উঠল আর নীরব গুঞ্জন ভেসে এল। পাশের একটা গ্রামে কিছু হারিকেনের আলো চোখে পড়ল। মেজর গিয়াস হুরমত আলীকে নিয়ে সেই গ্রামে উঠলেন এবং সেখান থেকে একটা ছেলেকে নিয়ে পুনরায় গন্তব্য স্থানের দিকে দৃষ্টি রেখে রওনা হলেন। ভীত সন্ত্রস্ত গ্রাম থেকে উঠানো ছেলেটি নৌকায় উঠে সেদিন এতগুলি মুক্তিযোদ্ধাকে দেখে কেঁদে ফেলেছিল। ভেবেছিল বুঝিবা তার জীবনের অবসান ঘটাবার জন্য তাকে নেওয়া হচ্ছিল।

হরিপুরের পুল থেকে ছয়শত গজ পেছনে রাত ৯টায় রাজশাহী-নওয়াবগঞ্জ সড়কের উপর এক নম্বর ও দুই নম্বর গ্রুপকে অবতরণ করতে আদেশ দিলেন মেজর গিয়াস। তিন নম্বর গ্রুপকে পাঠান হল বিদিলপুর রেলওয়ে পুলের উদ্দেশ্যে দুটো নৌকা করে। বন্যায় ডুবন্ত রাস্তার উপর দিয়েই নৌকা দুটি অতিক্রম করে গেল। এক নম্বর গ্রুপকে অবতরণ ক্ষেত্রে ডিফেন্স লাগাতে বলে দুই নম্বর গ্রুপ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পুলের দিকে অগ্রসর হল সড়কের ডান ও বাঁয়ের কিনারা ধরে। আকাশে চাঁদ ছিল না তবে তারকারাশির মিটিমিটি আলো বন্যার পানিতে পড়ে পরিবেশকে বেশ আলোকিত করে তুলেছিল। প্রায় একশত গজের মধ্যে পোঁছাতেই আধো আলো আর ছায়ার মাঝে মনে হল কারা যেন তড়িৎ গতিতে পুলের পাশে পজিশন নিচ্ছে। আর একটু অগ্রসর হতেই

শত্রুপক্ষের একজন চেঁচিয়ে উঠল 'হল্ট' 'হ্যাণ্ডস আপ'। নায়েক মিহনাজউদ্দিন, সম্মুখবর্তী সেকশন-এর কমাণ্ডার, তারাই জবাবে আমগাছের আড়াল থেকে উচ্চস্বরে চেঁচিয়ে উঠল, ''তেরা বাপ আয়া, শালা সারেণ্ডার কর'। একথা শেষ হতে না হতেই শত্রুপক্ষ পুলের উপর থেকে একটা এল-এম-জি ও তিন-চারটা রাইফেল থেকে গুলি চালালো আমাদের প্লাটুনের উপর কালবিলম্ব না করে। আমাদের প্লাটুন ঝাঁপিয়ে পড়ল দুশমনদের উপর। পেছন থেকে আমাদের মেশিনগান সহায়তা করে চলল। পুল দখলে এসে গেল কয়েক মিনিটের মধ্যে, দুশমন অনুধাবন করার আগেই দু'জন শত্রুসেনা মারা গেল। দু'জন ঝাঁপ দিয়ে নদীতে পড়ে পালিয়ে গেল। একজন আহত হল এবং বাকী ১১ জনকে বন্দী করা হল। আমাদের পক্ষে একজন নিহত ও একজন আহত হয়।

পুল কব্জা করার সাথে এক নম্বর প্লাটুনটি পুলের উপর দিয়ে নওয়াবগঞ্জের দিকে দ্রুত ধাবিত হল। নওয়াবগঞ্জ শহর থেকে মাত্র এক হাজার গজ দূরে রাস্তার পাশেই তারা মর্টারের জন্য স্থান বেছে নিল আর শহরের উপর শুরু হল গোলাবর্ষণ। শত্রুপক্ষ কোনদিন এত নিকটে আমাদেরকে আশা করেনি। হানাদার বাহিনীর জন্য মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে নাকি সে সময় বেশ জমে উঠেছিল টাউন হলে আলবদর বাহিনীর বদৌলতে। প্রথম গোলা টাউন হলের নিকটে পড়ার সাথে সাথে প্রধান অতিথিসহ তাদের চেলা-চামুণ্ডা হলঘর ছেড়ে দে ছুট- এই বুঝি শহর মুক্তিবাহিনীর কবলে গেল। যখন এদিক থেকে গোলাবর্ষণ চলছিল তখন সব কয়েকটি দুশমনের অবস্থান থেকে গোলাগুলি আসছিল। তৃতীয় গ্রুপটি তাদের অবস্থান পর্যন্ত পৌঁছবার আগেই দুশমন তাদের মেশিনগান আর রইফেল থেকে গুলি ছোড়া শুরু করল। তৃতীয় গ্রুপটি পুল দখল করতে পারেনি। এদিকে দু'নম্বর গ্রুপটি পুল উড়াবার কাজ করেই চলছে। 'ডিপ মাইন' ও প্রেশার চার্জ দিতে হবে। পুলের গোড়ার অংশ ৫ ফুট পরিমাণ খুঁড়তে হল 'ডিপ মাইন' চার্জ বসাবার জন্য। আমাদের প্রয়োজন ছিল সাড়ে চারশত পাউণ্ড এক্সপ্লোসিভের। আমাদের কাছে ছিল যে সময় তিনশত পাউণ্ড জিলাটিন এক্সপ্লোসিভ যেগুলো সাধারণত খনিজ পদার্থের মাইন। ফিল্ডে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ছয়টি পুরাতন ধরনের ব্রিটিশ এ্যান্টি ট্যাংক মাইন সাথে আনতে বলেছিলেন মেজর সাহেব। সেগুলো জুড়ে দিয়ে পুলের এবেটমেন্ট উড়াবার জন্য চার্জ তৈরী করতে বললেন মোট ২৪০ পাউণ্ড এক্সপ্লোসিভ দিয়ে। উপরে অনুমান একশত দশ পাউণ্ড এক্সপ্লোসিভ দিয়ে প্রেশার চার্জ লাগান হল। মাটি ভরে দিয়ে ডিপ মাইন চার্জ আর পুলের উপর প্রেশার চার্জ লাগিয়ে রিং মেন সার্কিট বানান হল কর্ডেক্স-এর সাহায্যে। এদিকে মর্টার প্লাটুনের কয়েকজন ফেরৎ এসে পড়েছে। পুলের উপর উঠে পুলটা শেষবারের মত দেখে নিলেন আমাদের অধিনায়ক মেজর গিয়াস। বন্যার পানি পুলের উপর ছুঁই ছুঁই করছে, আর স্রোতের গতিবেগ জোরে বয়ে যাচ্ছিল। নওয়াবগঞ্জের দিক থেকে কিছু মর্টার আর মেশিনগানের গুলি পুলের দিকে আসছিল। এক সময় আমরা সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলাম যখন দু'তিনটি গাড়ীর বগী রাজশাহীর দিকে থেকে আসতে দেখতে পেলাম রাজপথ ধরে, কিন্তু কিছু দূর আসতেই যেন গাড়ীর বাতিগুলি থেমে গেল। তারপর বুঝতে পেলাম যে রাস্তা এক মাইল পেছনে জলমগ্ন হয়ে আছে যার ফলে গাড়ী আর বেশীদূর এগুতে পারেনি। ওরা রাস্তার পেট্রোলিং-এ বেরিয়েছিল সম্ভবত।

রাত ঠিক বারটা বেজে পাঁচ মিনিট। সকলকে প্রায় ছয় শত গজ দূরে নৌকায় বসতে হল কানে হাত চেপে। ফিউজে আগুন লাগাতে বললেন অধিনায়ক। পেছনে দৌড়িয়ে এসে ৫০০ গজ দূরে রাস্তার পাশে বসে পড়লাম, মেজর গিয়াস ও সুবেদার আমিরুজ্জামান। গগনবিদারী আওয়াজে যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। সেই আওয়াজের সাথে সাথে বেশ কয়েকটি গ্রামের লোক ঘুম থেকে চীৎকার করে উঠল, ভাবল হয়ত কেয়ামত এল বুঝি। বেশ কয়েক সেকেণ্ড লেগে গেল আকাশে উত্থিত ইট, কংকর, পাথর নেমে আসতে। আনন্দে উচ্ছ্বাসে সকলে দৌড়িয়ে গেল পুলের অবস্থা দেখতে। পুল আর দেখা যাচ্ছে না-দেখা যাচ্ছিল অপর অংশের অর্ধেকটা দূরে কাত হয়ে পড়া অবস্থায়। স্রোতের টানে ইত্যবসরে ছোট নদীটার এপারের অংশ পুলের ভিত্তিপ্রস্তর থেকে আরও ১০/১৫ ফুট বেড়ে গেছে। আমরা নৌকায় উঠে আরও একটু পেছনে চলে এলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে

রেলওয়ে পুল উড়াবার তৃতীয় গ্রুপও আমাদের সাথে যোগ দিল। তারা কৃতকার্য হতে পারেনি তাদের উদ্দেশ্যে। কিন্তু শত্রুর যে ক্ষতি করতে পেরেছে তা আরেক মজার কাহিনী।

শত্রুর যে দুটি প্লাটুন একটা আমনুরা ও অপরটি নওয়াবগঞ্জে ছিল, সে দুটি প্লাটুনই গোলাগুলির আওয়াজ শুনতেই ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে রেলের ইঞ্জিন আর বগি নিয়ে রওয়ানা দিল, তাদের পেট্রোল করার রাস্তায়। পুলের কাছে আমনুরা হতে আগত পেট্রোলটি পৌঁছাতেই কিছু গুলির আওয়াজ পেল। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় ইঞ্জিনও এসে পৌঁছাল। শত্রুপক্ষ মনে করছিল হয়ত বা নওয়াবগঞ্জ মুক্তিবাহিনী দখল করে নিয়েছে আর তাদেরই লোকজন সম্ভবতঃ সম্মুখের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। নিজেদের মধ্যে গোলাগুলি বেশ কিছুক্ষণ চললো। সুযোগ বুঝে সেই ফাঁকে কেটে পড়ল আমাদের তৃতীয় গ্রুপটি। নিজেদের গুলিতে সেইদিন দুশমনের ৬ জন নিহত হয় আর ৭ জন আহত হয় সেই স্থানেই।

সেই অপারেশনে আমরা আমাদের একজন প্রিয় সিপাইকে হারাই ও দুজন মুক্তিযোদ্ধা গুরুতররূপে আহত হয়। যুদও অতি সাধারণ কিন্তু দুর্গম শত্রুর এলাকার ভিতর অপারেশন করা সহজসাধ্য ব্যাপার ছিল না। এটাও সম্ভব হত না যদি না জাতি হিসাবে বেঁচে থাকার অদম্য স্পৃহা আর জাগ্রত মনুষ্যত্ববোধ, আত্মবিশ্বাস আর অপরাজয়কে জয় করে প্রমাণ করার অভিলাষ থাকতো।

সাক্ষাৎকার*: নায়েক মোঃ আমিনউল্লাহ
১২-৬-১৯৭৩

৩০শে মে আমি ৩০ জন মুক্তিযোদ্ধা নিয়া মহিসকুন্তি (কুষ্টিয়া জেলা) হামলা করিতে রওয়ানা হই। শত্রুর সংখ্যা খুব বেশী জানিতে পারিয়া মাঝ পথে আমার কিছু মুক্তিযোদ্ধা পিছনে পালাইয়া যায়। আমি মাত্র ১৪ জন মুক্তিযোদ্ধা নিয়া পাক বাহিনীর এক কোম্পানী সৈন্যের উপর বেলা ৩টার সময় অতর্কিত আক্রমণ চালাই। ফলে পাক সৈন্য ৩২ জনের মৃত্যু হয় এবং ৩৫ জন আহত হয়, যাহা স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র হইতে প্রচার করা হইয়াছিল।

১৫ই জুন আমাকে বেতার যোগাযোগের জন্য আবার লালগোলা ডাকা হয়। আমি পুরা সাব-সেক্টর ৪ নং এর বেতার পরিচালনা করি এবং কোয়ার্টার মাস্টারের কাজও পরিচালনা করিয়া থাকি।

২০শে সেপ্টেম্বর মেজর সাহেব আমাকে নিয়া স্পেশাল অপারেশনের জন্য সাব-সেক্টর ৩ ও ৭ নং সেক্টর মেহেদীপুর যান এবং এখানে আমাদের নেতৃত্বে সোনা মসজিদ (রাজশাহী) এলাকায় দুটি বড় অপারেশন সমাধা হয়। এতে মিত্রবাহিনী আমাদিগকে আর্টিলার দ্বারা সাহায্য করে যার ফলে আমরা ধোবড়া পর্যন্ত দখল করি। এই সময় বহু পাকসৈন্য হতাহত হয় এবং বাদবাকী ছত্রভঙ্গ হয়ে পলায়ন করে। এখানে উল্লেখ থাকে যে, ১৫ই সেপ্টেম্বর আমার কাজে মুগ্ধ হইয়া মেজর সাহেব আমাকে হাবিলদার হইতে নায়েক সুবেদারে পদোন্নতি দেন।

১লা অক্টোবর আমাকে সম্মুখযুদ্ধের জন্য এক প্লাটুনের পরিচালনভার দেওয়া হয় এবং আমি হাকিমপুর ঘাট হইতে আস্তে আস্তে অগ্রসর হইতে থাকি। এতে বহু বড় বড় অপারেশন করিয়াছি এবং শত্রুকে পিছনে হটিতে বাধ্য করিয়াছে।

১০ই অক্টোবর আমাকে ৪ নং সাব-সেক্টরে 'বি' কোম্পানী পরিচালনার ভার দেওয়া হয়।

---

* বাংলা একাডেমির দলিলপত্র খেকে সংকলিত।

১২ই নভেম্বর আমি ইসলামপুর পাক ঘাঁটিতে হামলা করি। এতে বহু রাজাকার ও পাক সৈন্য হতাহত হয় এবং দুর্ভাগ্যবশতঃ আমার সহকর্মী হাবিলদার জামান সাহেব শত্রুর গুলিতে বাগডাঙ্গায় আহত হন। আমি আমার বেতারে খবর পাইয়া দৌড়াইয়া গিয়া তিন মাইল দূর হইতে তাহাকে উদ্ধার করিয়া আনিতে সক্ষম হই। প্রকাশ থাকে যে, তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে আমাকে বন্ধুর মত সাহায্য করিয়াছেন।

১২ই ডিসেম্বর যুদ্ধ পুরাদমে শুরু হয়ে যায়। আমি আমার ঘাঁটি (হাকিমপুর) হইতে নবাবগঞ্জের দিকে অগ্রসর হইতে থাকি। পথে পোড়াগ্রামে শত্রুর ঘাঁটির সম্মুখীন হই এবং তাদের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ হয়। শত্রুরা বহু মৃতদেহ ও অস্ত্রশস্ত্র ফেলিয়া পলায়ন করিয়া বাহারমপুর গ্রামে ঘাঁটি স্থাপন করে।

১৩ই ডিসেম্বর আমি ও আমার দল শত্রুর এলাকায় গিয়া এ্যামবুশ পাতি। দুইখানা সৈন্যবাহী গাড়ীসহ অগ্রসররত বহু শত্রুকে সমূলে ধবংশ করি। শহীদ সিপাহী নজীরউদ্দিনের কবর ঐ স্থানেই বিরাজমান।

১৪ই ডিসেম্বর আমরা নবাবগঞ্জ দখলের উদ্দেশ্যে নবাবগঞ্জ পাকঘাঁটির উপর হামলা চালাই। সারাদিন যুদ্ধ চলে এবং এতে বহু পাক সৈন্য হতাহত হয়। দুঃখের বিষয় আমাদের ৬ জন মুক্তযোদ্ধা এখানে শহীদ হন। আমরা নবাবগঞ্জ শহরে উঠিয়া পড়ি। বিকাল বেলা রাজশাহী হইতে ৫০/৬০ গাড়ী পাক সৈন্য নবাবগঞ্জ ঢুকিয়া পড়ে যাহার জন্য আমাকে একটু পিছু হটিয়া যাইতে হয়। রাত্রি ১২টার সময় তাহারা তাহাদের ১৪০ জন মৃতদেহসহ পাকা রাস্তার ওভারপুল উড়াইয়া রাজশাহীর দিকে পলায়ন করে।

১৫ই ডিসেম্বর আমরা নবাবগঞ্জ দখল করিয়া দেখিতে পাই বহু পাঞ্জাবীর মৃত দেহ ই-পি-আর লাইনের বাগানে পড়িয়া আছে। এবং অনেকেই মরিচার ভিতরে দাফন করিয়া রাখিয়াছে। তারপর আমরা রাজশাহীর দিকে অগ্রসর হইতে থাকি কিন্তু অভয়া পুল ভাঙ্গা থাকায় পার হইতে দেরি হয়।

১৬ই ডিসেম্বর আমি গোদাগাড়ীতে ১৪০ জন রাজাকারকে অস্ত্রশস্ত্রশহ আত্মসমর্পণ করাইতে সক্ষম হই এবং শত্রুর পিছন পিছন ধাওয়া করি।

ঐদিন সন্ধ্যা ৭ টার সময় রাজশাহী দখল করি। কিন্তু দুঃখের বিষয় শত্রুদের আর পাওয়া যায়না। তারা নাটোর গিয়া আত্মসমর্পণ করিবে বলিয়া খবর পাঠায়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ঐদিনই আমাদের বিজয় দিবস-১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭১।

সাক্ষাৎকার*: হাবিলদার মোঃ ফসিউদ্দিন আহমদ
২-৫-১৯৭৪

ভারতের সহযোগিতায় আমাদের পুনর্গঠন শুরু হয়। গেরিলা যুদ্ধ বাংলাদেশের ভেতরে চলতে থাকে।

ক্যাপ্টেন গিয়াসের নেতৃত্বে পোলাডাঙ্গা এবং সাহেবনগর চরে মুক্তিযোদ্ধারা এপ্রিল মাসের শেষের দিকে ডিফেন্স নেয়। চর এলাকাকে নিজেদের আয়ত্তে রাখার জন্য মে মাসের প্রথম দিকে পাকিস্তানীরা আমাদের উপর আক্রমণ চালায়। আমাদের কিছুসংখ্যক লোক হতাহত হয়। পাকিস্তানীদেরও ক্ষয়ক্ষতি হওয়ায় চর ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়।

মে মাসের শেষের দিকে ক্যাপ্টেন গিয়াসের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধারা পদ্মা নদী পার হয়ে ফরিদপুরে ডিফেন্স তৈরি করে। ডিফেন্স মজবুত করা হয়। সেখান থেকে প্রায়ই গেরিলা অপারেশন চালানো হতো। জুলাই মাস পর্যন্ত আমরা পোড়াগাঁও, হাকিমপুর, বাঘের আলী এলাকা আমাদের দখলে আনি। পোড়াগাঁওতে আমাদের

* বাংলা একাডেমীর দলিলপত্র থেকে সংকলিত।

উপর পাকিস্তানীরা আক্রমণ চালায়। উভয়পক্ষে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির পর আমরা পোড়াগাঁও এলাকা ছাড়তে বাধ্য হই। ভারতের লালগোলা এবং বাংলাদেশের ভেতরে ফরিদপুর থেকে বিভিন্ন গেরিলা দলকে রাজশাহী শহর, নওয়াবগঞ্জ, পাবনা এবং বগুড়াতে গেরিলা অপারেশন চালানোর জন্য পাঠাতে হত।

অক্টোবর মাসে আমরা আবার পোড়াগাঁও পর্যন্ত দখল করে নেই। ডিসেম্বর মাস থেকে আমাদের সাথে সম্মুখযুদ্ধ শুরু হয়। ডিসেম্বরে আমরা নওয়াবগঞ্জ দখল করে নেই। নওয়াবগঞ্জের দিকে অগ্রসর হবার সময় আমাদের ও পাকিস্তানীদের বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হয়। ক্যাপ্টেন জাহাঙ্গীর নওয়াবগঞ্জ দখলের সময় শহীদ হন। নওয়াবগঞ্জ দখলের পূর্বদিন আমাদের সাথে ভারতীয় এক রেজিমেন্ট বি-এস-এফ দেয়া হয়। দুই-তিন মিনিট যুদ্ধের পর তাদের বহু আহত হয়। এবং মর্টার, মেশিনগান এবং গোলাবারুদ ফেলে তারা পলায়ন করে। নওয়াবগঞ্জ দখলের সময় কোন ভারতীয় সৈন্যের সাহায্যের প্রয়োজন পড়ে নাই।

১২ই ডিসেম্বর রাতে মুক্তিযোদ্ধারা নওয়াবগঞ্জ থেকে রাজশাহীর দিকে অগ্রসর হয়। পাকিস্তানী সৈন্যরা রাজশাহী ছেড়ে মুক্তিযোদ্ধাদের ভয়ে নাটোরে আশ্রয় গ্রহণ করে।

স্বাক্ষরঃ মোঃ ফসিউদ্দিন
২-৫-১৯৭১

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি*

॥ সে পথ দিয়ে পাকসেনারা ফিরলো না আর ॥

অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে ক্যাপ্টেন ইদ্রিস আকস্মিকভাবে একটি সিক্রেট ইনফরমেশন পেয়ে গেলেন। ধেয়ে চললেন তিনি তার মুক্তিবাহিনী নিয়ে। হাতে তাদের থ্রি-নট-থ্রি, গ্রেনেড আর দুটি এল-এম-জি। হানাদার পাক বাহিনী সেদিন দিনাজপুর শহর থেকে স্কুলপাড়া হয়ে বর্ডার সাইডে আসছিল যে রুটে সেই রুটে পৌঁছে গেল ক্যাপ্টেন ইদ্রিস, খানসেনারা পৌঁছানোর আগেই । বিকেল তিনটা। খানদের ট্রাকের আওয়াজ পাওয়া গেল। দিনাজপুরের স্কুলপাড়ার রাস্তার পাশে, ঝোঁপঝাঁড়ে, গাছের ফাঁকে, আমগাছের ওপর, বাঁশঝাড়ের ফাঁকে প্রস্তুত লেঃ সাইদুল্লাহ, লেঃ আমিন, লেঃ কায়সার, সুবেদার এস এ রহমান, সুবেদার ইয়াসিন, হাবিলদার হাসান, হাবিলদার আজিজ, প্লাটুন কমাণ্ডার দেলওয়ার হোসেন, এফ-এফ- বাবলু, আবদুল লতিফ, আদুর রাজ্জাক, নূর মোহাম্মদসহ দেড়শ' মুক্তিবাহিনীর বীর সেনানী। এগিয়ে আসছে হানাদার ট্রাক দুটো স্কুলবাড়ির সন্নিকটে। ক্যাপ্টেন ইদ্রিস পর পর দুটো শিস দিলেন। ফায়ারিং-এর সংকেত আসবে শুধু একটা শিস। সবাই প্রস্তুত। থ্রি-নট-থ্রি'র ট্রিগারে আঙ্গুল নিশপিশ করছে। দম ধরে মুক্তিযোদ্ধারা গুণে যাচ্ছে প্রতিটি সেকেণ্ড। মুক্তিবাহিনীর এ্যামবুশের ভেতরে ঢুকেছে হানাদারদের প্রথম ট্রাক। ট্রাকের ওপর ২০/৩০ জন জোয়ান, হাতে তাদের অটোমেটিক চায়নিজ অস্ত্র । ট্রাকের ওপর এল-এম-জি ধরে দাঁড়িয়ে আছে তাগড়া দুজন, সামনের ট্রাক এ্যামবুশ পার হয়ে যাচ্ছে প্রায়। ক্যাপ্টেন ইদ্রিস সংকেত দিচ্ছেন না। সবাই হতভম্ব হয়ে যাচ্ছে। কি হচ্ছে। কিন্তু ক্যাপ্টেনের লক্ষ্য তখন পেছনে। আরও ভারী অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ঢুকছে আরেক ট্রাক পেছনে, সেটাকে এ্যামবুশের মধ্যে এনে না ফেলে তিনি পারেন না। সামনের ট্রাকে ফায়ার ওপেন করার নির্দেশ দিলেন।

---

* দৈনিক 'সংবাদ' ১৬ ডিসেম্বর ১৯৮১ সংখ্যায় প্রকাশিত মুসা সাদিক রচিত প্রতিবেদন থেকে সংকলিত।

সৌভাগ্য খানদের। পেছনের ট্রাক প্রায় ১৫০ গজ ব্যবধানে এলো এবং এ্যামবুশের এলাকায় এক ইঞ্চি ঢোকা মাত্র ক্যাপ্টেনের শিস সাথে ফায়ার। বজ্র কড় কড় আওয়াজের মত ভেংগে পড়লো মুক্তিবাহিনী হানাদারদের ওপর। এমন হাতের মুঠোয় বহুদিন পায়নি খানদের। সম্পূর্ণ নিরাপদে দাঁড়িয়ে অকস্মাৎ বজ্রপাতের মত ঝাঁপিয়ে পড়লো মুক্তিবাহিনীর জোয়ানরা। পেছনের ট্রাক, সামনের ট্রাক-দুই ট্রাকের ওপরেই চলছে বৃষ্টির মত থ্রি-নট-থ্রি আর এল-এম-জি'র ফায়ার। সম্বিত ফিরে পাবার আগেই পেছনের ট্রাক শেষ, এ্যামবুশের যেখানে ঢুকেছিল, সেখানেই দাঁড়িয়ে। খুনী ৩২ জন হানাদারদের ছিন্নভিন্ন দেহ সেখানেই লুটিয়ে। কোনটা ট্রাকের ওপর। বাকীগুলি পাশে, রাস্তায়, নীচের খানায়। কিন্তু না, সামনের ট্রাককে ততখানি কাবু করা গেল না। মাত্র দুটো ডেডবডি পেছনে ফেলে ট্রাকটি গোঁ গোঁ করতে করতে ছুটে বেরিয়ে গেল ক্যাপ্টেন ইদ্রিসের কব্জা থেকে- যদিও ট্রাকটি পালাবার আগেই গাছের ওপর থেকে মুক্তিবাহিনীর ছেলেরা ফায়ার করে কয়েকজনকে আহত ও নিহত করে। পাওয়া যায় বহু গোলাবারুদ, এক ইঞ্চি মর্টার, কয়েকটি এল-এম-জি, দুই ইঞ্চি মর্টার এবং চায়নিজ অটোমেটিক রাইফেল কিছু। ৩রা অক্টোবর সেই সাফল্যের পর এ্যামবুশে হানাদারকে খতম করার পরিকল্পনা ক্যাপ্টেন ইদ্রিস বাড়িয়ে দেন এবং বহু এভাবে খানসেনারা ঐ সেক্টরে হতাহত হতে থাকে এবং গেরিলা যুদ্ধের এই কৌশলের ও সাফল্যের প্রোগ্রাম সকল সেক্টরে জানিয়ে দেয়া হয়। এর ফলে সব স্থানে অনুপ্রেরণার সৃষ্টি হতে থাকে। ৪ঠা অক্টোবর সেই আম-জাম-বাঁশঝাড়ে ঢাকা স্কুলপাড়া দেখতে যায় হামজাপুরের সকল মুক্তিযোদ্ধা। খানদের চরমভাবে পরাজিত ও খতম করে দেয়ার সেই পবিত্র ভূমিতে গিয়ে মুক্তিযোদ্ধারা স্কুলপাড়ার মাটি কপালে ছুঁইয়ে যাত্রা করে ফ্রন্টের দিকে। ১৪ই ডিসেম্বর যুদ্ধে লেঃ সাইডুল্লাহ'র একটা হাতের সমস্ত মাংস কাঁধের নীচ থেকে উড়ে যায়। শত্রুর ব্রাশ ফায়ারে। কিন্তু হাড় ভাঙ্গেনি। দিনাজপুরের রণাঙ্গনে যে বীর বহুবার পাঞ্জা লড়েছে হানাদারদের সাথে বিজয়ের দু'দিন আগে তিনি আহত হন। দুর্ধর্ষ ক্যাপ্টেন ইদ্রিসও আহত হন অন্য যুদ্ধে এবং তার কোমরের নীচ দিয়ে ব্রাশ ফায়ার লেগে হিপের মাংস ধসে যায়।

৭নং সেক্টর আওতাধীন বগুড়া জেলায় মুক্তিবাহিনীর তৎপরতা*

পশ্চিমবঙ্গ হইতে সামরিক ট্রেনিং লইয়া সাইফুল ইসলাম বগুড়া জেলার পূর্বাঞ্চলে ফিরিয়া আসে। সাইফুলের নেতৃত্বে পরিচালিত গেরিলা দল জুলাই মাসে ধুনট থানা আক্রমণ করে। থানাতে বেশ কিছুসংখ্যক পাঞ্জাবী পুলিশ ছিল। এই অতর্কিত হামলায় ৭ জন পাঞ্জাবী পুলিশ নিহত হয় এবং গেরিলা দল পূর্ব বগুড়ার কয়েকটি সামরিক কনভয় এবং হানাদার সৈন্য বোঝাই ট্রেনের উপর আক্রমণ চালায়।

জুলাই মাসে গেরিলা বাহিনীর কমাণ্ডার হারুনুর রশিদের দল ভেলুরপাড়া রেল স্টেশনে সিচারপাড়ার উত্তর ধারে মাইন বিস্ফোরণ ঘটাইয়া একটি মিলিটারী স্পেশাল ট্রেন বিধ্বস্ত করার ফলে চারজন অফিসারসহ সাতাশ জন পাকসৈন্য নিহত হয়।

৭ই আগস্ট সকাল ৮টা ৩০ মিনিটের সময় ৭ নম্বর সেক্টরের গেরিলা প্রধান আহসান হাবিব (ওয়ালেস)-এর নেতৃত্বে তাহার দল সাবগ্রামে একটি মাইন বিস্ফোরণ ঘটাইয়া একটি মিলিটারী লরী সম্পূর্ণরুপে বিধ্বস্ত করে। ঘটনাস্থলেই তিনজন পাকসৈন্য নিহত ও একজন আহত হয়। পুনরায় ৯ই আগস্ট তারিখে বেলা ১১ টার সময় পাকসৈন্যরা বিধ্বস্ত লরীটি উদ্ধার করিতে যায়। ঐ দিনই মাইন বিস্ফোরণের ফলে ৫ জন পাকসৈন্য নিহত ও ৬ জন আহত হয়।

বগুড়া শহরের ওয়াপদা পাওয়ার হাউস সাব-সেকশন উড়ইয়া দেওয়ার অভিপ্রায়ে সাইফুল ইসলাম মত্র দুইজন সঙ্গী লইয়া ১১ই আগস্ট হাটসেরপুর হইতে বগুড়া শহরের দিকে রওনা দেয়। তাহারা ৯ ঘটিকায়

* এ, জে এম শামসুদ্দিন তরফদার-রচিত 'দুই শতাব্দির বুকে' বগুড়া, ১৯৭৬ থেকে সংকলিত।

মাদলার ঘাটে আসিয়া পৌঁছে। তখন কোন নৌকা না থাকায় কলাগাছের ভেলা তৈয়ারী করিয়া ৩ জন সূর্যসৈনিক করতোয়া নদী পার হয়। পরিকল্পিত পথে মালগ্রামের ভিতর রাতের অন্ধকারে অগ্রসর হইতে থাকে। হানাদার বাহিনী প্রহরীরা তাহাদিকে চিনিয়া ফেলে। আত্মরক্ষার কোন পথ নাই জানিয়া সাইফুলেরা হানাদার বাহিনীর দিকে গ্রেনেড ছুড়িয়া মারে। হানাদারদের রাইফেল তখন গর্জিয়া ওঠে। তিনজনই অন্ধকারের মধ্যে তিনদিকে দৌড় দেয়। খানসেনাদের এলোপাতাড়ি গুলি আসিয়া সাইফুলের মাথায় লাগে। সাইফুল তৎক্ষণাৎ মাটিতে লুটাইয়া পড়ে। অর্ধমৃত অবস্থায় হানাদার বাহিনী সাইফুলকে ধরিয়া ফেলে।

আগস্ট মাসের মধ্যভাগে একদিন রাত্রি তিন ঘটিকার সময় গেরিলা বাহিনী কর্তৃক বগুড়া- সারিয়াকান্দি রাস্তায় লাঠিমাররঘোন গ্রামের নিকটবর্তী ব্রীজটি ডিনামাইট দ্বারা উড়াইয়া দেয় এবং ব্রীজের দুই ধারে ৫০/৬০ গজ দূরে মাইন মাটির নীচে পুঁতিয়া রাখিয়া তাহারা চলিয়া যায়। পরের দিন সকালে ব্রীজের দুই ধারে পশ্চিম দিকের মাইনটি পাকসেনারা সন্ধান পাইয়া তুলিয়া নিয়ে যায় কিন্তু পূর্ব দিকের মাইনটির সন্ধান পায় নাই। তার পরের দিন ভোরে কয়েকটি গরুর গাড়ী পাট লইয়া গাবতলী বন্দরে যাইতেছিল। একটি গরুর গাড়ীর চাপ মাইনের উপর পড়িলে মাইনটি বিস্ফোরণ ঘটে। ফলে গাড়ীটি ছিন্নভিন্ন হইয়া উড়িয়া যায়। একজন গাড়োয়ান সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যবরণ করে। আর একজন গুরুতররুপে আহত হয়। এর পরের দিন সারিয়াকান্দি ক্যাম্প হইতে পাকসেনারা আসিয়া ব্রীজের অবস্থাদৃষ্টে লাঠিমাররঘোন গ্রামে প্রবেশ করিয়া গ্রামের লোদিগকে অমানুষিকভাবে মারপিট করে এবং কয়েকটি বাড়িতে আগুন লাগাইয়া পোড়াইয়া ফেলে। তৎপর তাহারা কালূডাঙ্গা, শাহবাজপুর এবং সাতটিকরি গ্রামে প্রবেশ করিয়া কতকগুলি বাড়ি আগুন লাগাইয়া ভস্মীভূত করে। এই ব্রিজ ভাঙ্গাকে কেন্দ্র করিয়া বর্বর পাক বাহিনী লাঠিমারঘোন গ্রামে পর পর তিনবার প্রবেশ করিয়া বাড়িঘর লুটপাট করে।

১৬ই আগস্ট সৈয়দ ফজলুর আহসান দিপুর দল সারিয়াকান্দি থানার নিকটবর্তী রামচন্দ্রপুর গ্রামে পাক বাহিনীর সহিত এক ভীষণ সংগ্রামে লিপ্ত হয়। প্রচুর গোলাগুলির পর ময়নুল হক নামে সারিয়াকান্দি থানার এক দারোগা, ৫ জন পাকসৈন্য ও কয়েকজন রাজাকার নিহত হয়।

আগস্ট মাসের মধ্যভাগে কমাণ্ডার আবুল হোসেন (বালুরঘাট), মোস্তফা রেজানুর (দিনাজপুর), এস, এম, ফারুক (বগুড়া), প্রভৃতির দ্বারা হিলিতে ট্রেন অপারেশন হয়। ইহার ফলে বহুসংখ্যক এবং কিছুসংখ্যক অবাঙ্গালী নিহত হয়। লাইন অপারেশনের সময় আবুল হোসেন নামে একজন মুক্তিযোদ্ধা আহত হয়।

আগস্ট মাসের তৃতীয় সপ্তাহে মীর মঞ্জুরুল হক সুফীর নেতৃত্বে গেরিলা দল বগুড়া-সারিয়াকান্দি রাস্তার একটি ব্রীজে এক্সপ্লোসিভ লাগাইয়া সম্পূর্ণ ধ্বংস করে এবং ব্রীজের এক মাইল দূরে রাস্তায় মাইন পুঁতিয়া রাখে। পরে মাইন বিস্ফোরণে একটি মিলিটারী জীপগাড়ী ধ্বংস হওয়ার ফলে একজন অফিসারসহ ৬ জন পাকসৈন্য নিহত হয়।

২০শে আগস্ট মাসুদ হোসেন আলমগীর নবেলের দল সারিয়াকান্দি থানার আওলাকান্দী গ্রামের পূর্বে যমুনা নদীতে একটি মিলিটারী লঞ্চ রকেট দ্বারা বিধ্বস্ত করে।

২রা সেপ্টেম্বর বর্বর পাকবাহিনী গাবতলী থানার জাত হলিদা গ্রামে অতর্কিত আক্রমণ করে। তখন সৈয়দ আহসান হাবিব দিপুর দল পাল্টা গুলিবর্ষণ করার ফলে একজন পাকসৈন্য নিহত হয়। পাকসৈন্যরা নিরীহ ৫ জন গ্রামবাসীকে হত্যা করে। পরে সমস্ত গ্রামটাই আগুন জ্বালাইয়া পোড়াইয়া দেয়।

৪ঠা সেপ্টেম্বর ৬ জন পাক পুলিশ খাদ্য লইয়া বগুড়া হইতে সারিয়াকান্দি যাইতেছিল। পথে পাক পুলিশেরা যখন ফুলবাড়ি ঘাটে খেয়া নৌকায় উঠে তখন মুজিববাহিনীর মোফাজ্জল হোসেন (লাঠিমারঘোন), গোলাম জাকেরিয়া রেজা (ধাওয়া), সাইদুল ইসলাম, (বাইগুলি), মন্টু (হুমাকুয়া) এবং গেরিলাবাহিনীর সৈয়দ আহসান

হাবিব দিপুর নেতৃত্বে নৌকা মাঝনদীতে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে তাহারা রাইফেল, মেশিনগান দ্বারা গুলিবর্ষণ করিতে থাকে। ফলে দুইজন পুলিশ নিহত হয়। আর ৪ জন জীবন্ত অবস্থায় দৌড়াইয়া পালাইয়া যাইবার কালে ধরা পড়ে। জনগণ তাহাদিগকে লাঠিসোটার দ্বারা পিটাইয়া হত্যা করে। পাক পুলিশদের রাইফেল ও কিছু খাদ্যসামগ্রী মুক্তিযোদ্ধাদের হস্তগত হয়।

গেরিলা বাহিনী কমাণ্ডার মীর মঞ্জুরুল হক সুফীর নেতৃত্বে সেপ্টেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ৭ নং সেক্টর হেডকোয়ার্টার থেকে অস্ত্র গোলাবারুদ নৌকা পথে আনিবার কালে বাহাদুরাবাদ ঘাটের নিকট সশস্ত্র সংঘর্ষে শত্রুদের একটি টহলদার গানবোট সম্পূর্ণ ধ্বংস করিয়া দেয়।

১৮ই সেপ্টেম্বর ই-পি-আর কমাণ্ডার সালেক (বগুড়া), বেঙ্গল রেজিমেন্টের মান্নান, ঢাকা পুলিশের হাবিলদার রজব আলী এবং ছাত্র রঞ্জিত কুমার মহন্ত, প্রদীপ কুমার কর (গোবিন্দগঞ্জ) প্রভৃতির নেতৃত্বে হিলির পাশ্ববর্তী স্থানে পাকবাহিনীর সহিত ভীষণ সংঘর্ষ বাধে। এই সংঘর্ষে পাকবাহিনীর বহু সৈন্য হতাহত হয়। ঘোড়াঘাটের ফিলিপস-এর (সাঁওতালী) নেতৃত্বে মাইন বিস্ফোরণে পাকসেনাদের একটি বেডফোর্ড মটর কার ভীষণভবে ধ্বংস হয়।

গেরিলা বাহিনীর কমাণ্ডার মীর মঞ্জুরুল হক সুফীর নেতৃত্বে ১৯শে সেপ্টেম্বর সারিয়াকান্দি থানার তাজুরপাড়া গ্রামে অনুপ্রবেশকারী একদল পাকবাহিনীকে ঘেরাও করা হয়। প্রচণ্ড গোলাগুলির পর ঘটনাস্থলে শত্রুপক্ষের কতক সেনা নিহত ও বাকী সেনা পলায়ন করিতে বাধ্য হয়।

২৪শে সেপ্টেম্বর আহসান হাবিব ওয়ালেসের নেতৃত্বে বেলা দুপুর সাড়ে বারোটার সময় হ্যাণ্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করিলে সুখানপুকুর রেলস্টেশন গৃহে আগুন ধরিয়া যায় এবং তাহাতে টেলিফোন লাইন নষ্ট হয়। একটি রাইফেল ও কিছু গুলি, সাত জোড়া পাকসেনার পোশাক উদ্ধার করা হয়। কিছু সৈন্য ও রাজাকার পালাইতে সক্ষম হয়।

২৭শে সেপ্টেম্বর কমাণ্ডার মোত্তালিব এবং কমাণ্ডার এস, এম ফারুকের নেতৃত্বে হিলিতে পাকবাহিনীর সহিত প্রচণ্ড যুদ্ধ সংঘটিত হয়। আড়াই ঘন্টা যাবৎ যুদ্ধ চলিতে থাকে। কমাণ্ডার মোত্তালির মর্টারের গুলিতে আহত হয় এবং ৪ জন পাকসৈন্য নিহত হয়। ঐ সময় বগুড়ার একটি ১৪ বৎসরের অসমসাহসী ছেলে সাইদুর রহমান (চুটকু) হিলি ষ্টেশনে রেললাইনের মাইন বিস্ফোরণ ধ্বংস করিয়া দেয়। সেইদিন রেল চলাচল সম্পূর্নরুপে বন্ধ হইয়া যায়। এই ঘটনায় একজন মুক্তিযোদ্ধা আহত হয়। এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন আসাম রেজিমেন্ট ও বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স।

সেপ্টেম্বর মাসের শেষভাগে মুক্তিবাহিনী নশরতপুর রেলস্টেশনের পশ্চিম ধারে একটি এন্টি-ট্যাঙ্ক মাইন পুঁতিয়া রাখে। তাহার বিস্ফোরণে একটি মিলিটারী ট্রেন আক্রান্ত হয়। ফলে হানাদার পাকবাহিনী ক্ষিপ্ত হইয়া লাইনের ধারের লক্ষীপুর, পূর্ব ডালম্বা, কোটকুরী ও শিতলাই গ্রামে আক্রমণ চালায় এবং কফিরউদ্দিন মিস্ত্রী, আবেদ আকন্দ, আজিজ প্রাং (লক্ষীপুর), মহীরউদ্দিন প্রাং (পূর্ব ডালম্বা) ভোলা প্রাং, কোরবান আলী (কোচকুরী) শরিফউদ্দিন সরকার (শিতলাই) প্রভৃতি লোকদিগকে লাইন করিয়া গুলি করিয়া হত্যা করে।

অক্টোবর মাসের প্রথম ভাগে গাবতলী থানার শিহিপুর গ্রামে সরকার-বাড়িতে মুক্তিবাহিনী ঘাঁটি ছিল। মুক্তিবাহিনী রাত্রি নয় ঘটিকায় সরকার বাড়ির পিছনে রেললাইনে একটি মাইন পুঁতিয়া রাখে। কারণ মুক্তিবাহিনী জানিতে পারে যে সৈয়দপুর হইতে বোনারপাড়া জংশন হইয়া একটি সৈন্যবাহী ট্রেন আসিতেছে। সেই ট্রেনটি ধ্বংসই তাহাদের লক্ষ্য ছিল কিন্তু ১৫ মিনিট পূর্বেই মাইনটির বিস্ফোরণ ঘটে। সেই সৈন্যবাহী ট্রেনটি ঐদিন আর আসে না।

পরের দিন রাত্রি ১১টার সময় সৈন্যবাহী ট্রেনটি সুখানপুকুর ষ্টেশন অতিক্রম করিবে জানিতে পারিয়া মুক্তিবাহিনী সরকার-বাড়ির অর্ধ মাইল দক্ষিণে মাইন পুঁতিয়া রাখে। মাইন বিস্ফোরণে সৈন্যবাহী ট্রেনটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ফলে ৪ জন পাক ইঞ্জিনিয়ারসহ ১৪৬ জন পাকসেনা নিহত হয়।

অক্টোবর মাসের মধ্যভাগে ওয়াপদার নিকট কৈচোর রেললাইনের ব্রীজের দুই পাশে মাসুদ হোসেন আলমগীর (নবেল) মাত্র ৬ জন সঙ্গী লইয়া পাকবাহিনীর উপর আক্রমণ চালায়। বহু গুলি বিনিময়ের পর ৬ জন খানসেনা ও ১০ জন রাজাকার নিহত হয় এবং কতকগুলি পাকসৈন্য অস্ত্রশস্ত্র ফেলিয়া কাহালুর দিকে পালাইতে বাধ্য হয়।

অক্টোবর মাসের মধ্যভাগে মুক্তিবাহিনীর দল গাবতলী থানার জয়ভোগা গ্রামের নিকটস্থ সারিয়াকান্দি রোডের উপর মাইন পুঁতিয়া রাখিয়া যায়। পরে তাহা বিস্ফোরণ ঘটিয়া ৫ জন পাকসৈন্যের মধ্যে ৩ জন নিহত ও ২ জন আহত হয়।

১৮ই অক্টোবর বগুড়া শহরের পশু ডাক্তার থানার নিকটস্থ ট্রান্সমিটারটি গ্রেনেড দ্বারা ধ্বংস করিবার জন্য গ্রেনেড নিক্ষেপ করা হয়। ফলে ট্রান্সমিটার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পার্শবর্তী দোকানদার মুন্সী নজরুল ইসলামকে বর্বর হানাদারবাহিনী ধরিয়া ক্যাম্পে লইয়া যায়। ৪ দিন অমানুষিক নির্যাতন করার পর মুক্তি দেয়।

২০শে অক্টোবর নারচী ও পার্শববর্তী গণকপাড়া গ্রামে পাকসৈন্যদের সহিত গেরিলা বাহিনীর চারটি দলের এক ভীষণ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে সকাল ৭টা হইতে পরের দিন সকাল ৭ পর্যন্ত চলে। এইসব দলের মধ্যে তোফাজ্জল হোসেন মকবুল (চরহরিন), সৈয়দ ফজলুল আহসান দিপু, শোকরানা (রানা), আবদুস সালাম (বুলবুল), রেজাউল বাকী, গোলাম মোস্তফা (গাবতলী), কামাল পাশা (বৃন্দাবনপাড়া), রিজাউল হক মঞ্জু (ধাওয়া), স্বপন এবং হুয়াকুয়ার রেজাউল করিম মন্টু, আখতার হোসেন বুলু, আতোয়ার হোসেন গামা, আবদুর রাজ্জাক হানজু, আবদুল বারী ও আরও অন্যান্য গেরিলাদের সহিত পাকবাহিনীর প্রচণ্ড গোলাগুলি বিনিময় হয়। সেই সময় গ্রামের নারী-পুরুষ নির্বিশেষে জীবনের ভয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে গ্রাম ছাড়িয়া পালাইতে থাকে, তখন এলোপাতাড়ি গুলি চলিতে থাকে। পাকসেনার দল দিপুর দলকে ঘিরিয়া ফেলে। উপায়ান্তর না দেখিয়া দিপুর দল গ্রেনেড নিক্ষেপ করিয়া ধূম্রজাল সৃষ্টি করিতে বাধ্য হয়। তৎপর গণকপাড়া ঈদগাহ মাঠে গেরিলাবাহিনী পজিশন লইয়া তুমুল গোলাগুলি বর্ষণ করিতে থাকে। পাকসৈন্যরা আধুনিক যুদ্ধাস্ত্র দ্বারা প্রবল আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণে গেরিলা বাহিনী টিকতে না পারিয়া অবস্থান পরিবর্তন করিতে বাধ্য হয়। এমতাবস্থায় বহু বাড়ি জ্বালাইয়া-পোড়াইয়া দেয়। এদিকে শোকরানা রানার দল ও অন্যান্য দলের ৫০/৬০ জন গেরিলা যোদ্ধা টিউরপাড়া গ্রামের দিকে অগ্রসর হইয়া পজিশন নেয়। হানাদারবাহিনীর সহিত গেরিলাবাহিনীর পাল্টা গোলাগুলি চলিতে থাকে। ঐ সময় হানাদারবাহিনীর টিউরপাড়া গ্রামের ১২ জন গ্রামবাসীকে গুলি করিয়া হত্যা করে। গেরিলাবাহিনীর গোলাগুলিতে পাকবাহিনীর একজন ক্যাপ্টেনসহ ৯ জন নিহত হয়। তৎপর সারা রাত্রি পাকবাহিনীর সহিত গেরিলাবাহিনী বাঁশগাড়ি ও নারচীতে প্রচণ্ড গোলাগুলি চলার পর ভোরবেলা পাকবাহিনী ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করে। এই ঘটনার দুই দিন পরে তিন দিক হইতে পাকসেনা নারচী গ্রামে প্রবেশ করিয়া গ্রামের বহু বাড়িঘর পুড়িয়া ভস্মীভূত করে।

১০ই নভেম্বর নারচীর আবদুল হাসিম বাবলুর দল বগুড়া সারিয়াকান্দি রোডের বাইগুনী গ্রামে মাইন বিস্ফোরণ ঘটাইয়া কর্নেলসহ ৫ জন পাকসৈন্য নিহত করে। ঐ দিন গেরিলাবাহিনীর কমাণ্ডার মীর মঞ্জুরুল হক সূফীর নেতৃত্বে বগুড়া শহরের নিশিন্দারায় ১১ হাজার কিলোওয়াট ভোল্টের ট্রান্সমিটার ধ্বংস করা হয়।

১২ই নভেম্বর ইন্ডিয়ান মারহাট্টা রেজিমেন্ট, আসাম রেজিমেন্ট ও মুক্তিযোদ্ধারা হিলি সীমান্তে পাকবাহিনীর সহিত মোকাবিলা করার জন্য উপস্থিত হয়। হিলিতে পাকবাহিনী তখন ঘোড়াঘাট হইতে ফ্রন্টিয়ার ফোর্স আনিয়া।

পাল্টা আক্রমণ করিবার প্রস্তুতি নেয়। তখন ৬নং আসাম রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেন রায়সিং ডোগরা ও মুক্তিযোদ্ধাদের এস, এম ফারুক (বগুড়া), আবুল কাশেম (জয়পুরহাট), মোজাহার (গাবতলী), মোস্তফা রেজানুর (দিনাজপুর) দলের নেতৃত্বে পাকবাহিনীর সহিত প্রবল যুদ্ধ সংগঠিত হয়। এই যুদ্ধে বহু পাকসৈন্য ও কিছুসংখ্যক মুক্তিযোদ্ধা নিহত হয়। পাকসৈন্যদের সঙ্গে মেশিনগান, ভারী কামান, ট্যাঙ্ক এবং বিমানবিধ্বংসী কামান ছিল। মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে স্টেনগান টমিগান, রাইফেল প্রভৃতির দ্বারা যুদ্ধ চলে। ঐ দিন বিমান হইতে প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ হয়।

১৩ই নভেম্বর মহিমাগঞ্জের দুলুর নেতৃত্বে ও সিহিপুরের বাবলু, খালেক, হামিদ, খলিল, নূরুল, শুকু ফিনু, জগলু, হাল্লু, লিন্টু ও আরও অনেকের সহযোগিতায় সুখানপুকুর রেল স্টেশনের ধারে শিহিপুরের নিকট একটি পাকসৈন্যবাহী স্পেশাল ট্রেন ডিনামাইট দ্বারা ধ্বংস করিয়া দেয়। ফলে প্রায় দেড়শত পাকসৈন্য মৃত্যুবরণ করে।

১৫ই নভেম্বর গেরিলা বাহিনী কমাণ্ডার মীর মঞ্জুরুল হক সুফীর নেতৃত্বে সুখানপুকুর রেলস্টেশনে শত্রুদের খাদ্যবাহী একটি ট্রেন মাইন বিস্ফোরণ ঘটাইয়া ধ্বংস করে।

২৫শে নভেম্বর গাবতলীর নিকটস্থ জয়ভোগ গ্রামের রেলওয়ে ব্রীজ পাকবাহিনীর নিকট হইতে দখল করিবার জন্য একদল মুক্তিযোদ্ধা পাকসৈন্যদিগকে আক্রমণ করিয়া গুলি বিনিময় করিতে থাকে। ফলে পাকসৈন্যরা গাবতলী থানাস্থ ক্যাম্পের দিকে পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। দুই ঘন্টা পর পাকসৈন্য বোঝাই একটি ট্রেন গাবতলী স্টেশনে থামিলে পাকসৈন্যরা ট্রেন হইতে নামিয়া জয়ভোগা ও বইগুনী গ্রামের দিকে গুলীবর্ষণ করিতে করিতে অগ্রসর হয়। ফলে বাইগুনী গ্রামের আবুল হোসেনসহ কয়েকজন গ্রামবাসী গুলির আঘাতে নিহত হয়। পরে নেপালতলী গ্রামের দিক হইতে গেরিলাবাহিনীর একটি দল আসিয়া পাল্টা আক্রমণ করিবার ফলে পাকসৈন্যরা গাবতলী ক্যাম্পে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হয়।

২৮শে নভেম্বর সারিকান্দি থানা আক্রমণ করা হয়। এই আক্রমণের নেতৃত্ব দেয় নারচীর আবদুল হাসিম বাবলু, আবদুর রশিদ, চরহরিণার তোফাজ্জেল হোসেন মকবুল, হুয়াকুয়ার আবদুর রাজ্জাক, রামচন্দ্রপুরের মহসিন। মৌরের চরের সরুজ্জামান। ৭নং সেক্টরে মুক্তিযোদ্ধা দল ও গেরিলাবাহিনী প্রবল গোলাবর্ষণ করে। পাকবাহিনী পাল্টা আক্রমণ চালাইবার ফলে দুইজন পাকসৈন্য নিহত হয়। গেরিলাবাহিনী অদম্য সাহসে মাতৃভূমির পবিত্র মাটি থেকে বর্বর পাকবাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করার দৃপ্ত পণ লইয়া যুদ্ধ করিতে থাকে। বেলা ১১টার সময় ব্রাশফায়ারে কয়েকজন পাকসৈন্য মাটিতে পড়িয়া যায়।

পরের দিন সকাল ৮টায় গেরিলা বাহিনী সারিয়াকান্দী থানা পুনঃ আক্রমণ করিয়া ৪৪ জন রাজাকারকে নিহত করে। থানার অফিসার ইনচার্জসহ ১৮জন পাকসৈন্য নিহত হয়। এই প্রচণ্ড গোলাগুলির ফলে গেরিলা বাহিনীর ৩ জন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হয়। সমস্ত দিবারাত্রি প্রচণ্ড গোলাগুলি চলিতে থাকে।

গেরিলা বাহিনীর খাদ্য ও পানীয় সরবরাহে কোন অসুবিধা হয় নাই। পার্শববর্তী গ্রামের জনসাধারণ স্বতঃর্ফূত হইয়া খাদ্যদি সরবরাহ করিতে থাকে। পরিশেষে রাজাকার ও পুলিশেরা আত্মসমর্পন করে। কিছুসংখ্যক পুলিশ অন্ধকারে গ্রামের দিকে পলাইয়া প্রাণ রক্ষা করে। গেরিলা বাহিনীর যে ৩ জন শহীদ হয় তাহারা হইতেছেন বালিয়ার তাইরের মমতাজ উদ্দীন, সাত বেকীর মোজাম্মেল হক ও আর একজন। এই প্রচণ্ড যুদ্ধে সারিয়াকান্দি থানা দখল হয়। গেরিলা বাহিনী কর্তৃক ৫৩ জন রাজাকার ও ১৯ জন পুলিশ বন্দী হয়। ১৯জন রাজাকারকে গুলী করিয়া হত্যা করে। গেরিলা বাহিনী ১১৮ টি রাইফেল, ৪২টি এলএমজি, ১টি রিভলবার, ১টি গ্রেনেড ও বিপুল পরিমাণ গোলাবারুদ উদ্ধার করে। ঐদিন বিমান আক্রমণ হয়, তাহার ফলে কয়েকজন জনসাধারণ নিহত হয়। জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি মমতাজ উদ্দীনের দল এই সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে।

নভেম্বর মাসের শেষভাগে পাকসৈন্যরা ভেরুরপাড়া রেলস্টেশনে যাইবার কালে পথিমধ্যে ট্রেন থামাইয়া জোড়গাছা গ্রামের কতকগুলি বাড়ীতে আগুন জ্বালাইয়া দেয়। সংবাদ পাইয়া পার্শ্ববর্তী গ্রাম হইতে মুক্তিযোদ্ধা দল আসিয়া হানাদার বাহিনীকে ঘিরিয়া ফেলিয়া গোলাগুলিবর্ষণ করিতে থাকে। পাক সৈন্যরা ভীতসন্ত্রস্ত হইয়া দৌড়াইয়া ভেলুরপাড়া স্টেশনে বাঙ্কার আশ্রয় লয়। মুক্তিযোদ্ধাগণ সেখানেও তাহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিয়া গুলিবর্ষণ করিতে থাকে। ফলে ৪ জন পাক সৈন্য নিহত হয়।

পরের দিন মুক্তিবাহিনীর কমাণ্ডার হুয়াকুয়ার রেজাউল করিম মন্টুর নেতৃত্বে আব্দুস সালাম, আতোয়ার হোসেন প্রভৃতি এবং স্থানীয় গেরিলা বাহিনী ও জনসাধারণ রেল স্টেশনটি পোড়াইয়া দেয়। পরে চকচকে ব্রীজে সম্পূর্ণরুপে ধ্বংস করিয়া ফেলে। তৎপর রেলওয়ে স্লিপার উঠাইয়া রেল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়।

ডিসেম্বর মাসের প্রথমভাগে রংপুর পলাশ বাড়ী হইতে পলাতক একদল শত্রুসৈন্য গাবতলী থানার রামেশ্বরপুর গ্রামে প্রবেশ করিয়া গ্রামবাসীর উপর অত্যাচার শুরু করে। পার্শ্ববর্তী গ্রাম জাগুলির প্রাক্তন সৈনিক গোলাম ছারওয়ার খানের নেতৃত্বে তাহার দল প্রতিরোধ আক্রমণ চালায়। ইহাতে প্রচুর গোলাগুলির বিনিময় হয়। ফলে ২ জন শত্রুসৈন্য নিহত, ২ জন শত্রুসৈন্য আহত ও ১২ জন পাক সৈন্য আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয়। এই ঘটনার পূর্ব দিন সকাল বেলা পীরগাছা মিলিটারী ক্যাম্প হইতে একটি সৈনিক প্রাণের ভয়ে পালাইয়া আসিলে লস্করী পাড়ার নিকটস্থ জেলা বোর্ডের রাস্তার ব্রীজের নিকট শফিউল আলম স্টেনগানের গুলীতে তাহাকে নিহত করে। ঐদিন মহাস্থান হইতে ৫ জন হানাদার সৈন্য পালাইয়া আসিবার কালে গাবতলী থানার কদমতলী গ্রামে প্রবেশ করিবার সময় ৭ জন গ্রামবাসীকে গুলি করিয়া হত্যা করে। ঐ সময় চরহরিণার তোফাজ্জল হোসেন মকবুল ও তাহার দল ৫ জন পাক সৈন্যকে ধরিয়া ঘটনাস্থলেই গুলি করিয়া হত্যা করে।

৪ঠা ডিসেম্বর মুক্তিবাহিনীর কমাণ্ডার জাহেদুর রহমান (বাদল) ও আরও অনেকে রংপুর জেলার ভরতখালি বাঁধের পার্শ্বে পাকসৈন্যদের সহিত এক সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। ফলে রাজাকারসহ ৭ জন পাকসেনা নিহত হয়। মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে জাহেদুর রহমানসহ ৫ জন শহীদ হয়। এই ৫ জনের লাশ ভরতখালী স্কুল প্রাঙ্গণে কবরস্থ করা হয়।

৬ই ডিসেম্বর মুক্তিবাহিনীর কামণ্ডার আবুল হোসেন (কলসা)-এর নেতৃত্বে তাহার দল পাকহানাদার বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে। তুমুল লড়াইয়ের পর পাক সৈন্যরা নঁওগা অভিমুখে পশ্চাদপসরণ করে। কিছুসংখ্যক পাকসৈন্য হতাহত হয়।

১০ই ডিসেম্বর মিত্রবাহিনী সম্মিলিত বিমান আক্রমণে সান্তাহার রেলওয়ে জংশন পাওয়ার হাউস মেকানিক্যাল ওয়ার্কস ও রেলওয়ে জংশন লোকোশেডের উপর বোমাবর্ষণ করে। ফলে কিছু পাকসৈন্য হতাহত হয়। মুক্তিবাহিনীর আনসার আলী নামে একজন বিমান কর্মচারী আহত হন।

১২ই ডিসেম্বর ভারতীয় মিত্রবাহিনী রংপুরের পলাশবাড়ী অতিক্রম করার পর পাকসৈন্য ভীতসন্ত্রস্ত হইয়া দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়ে। তাহারা বগুড়া শহরের এতিমখানা হইতে অনবরত শেলবর্ষণ করিতে থাকে। তাহার ফলে পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহের বহু লোক হতাহত হয়। উপর হইতে ভারতীয় বিমান বাহিনী ঘন ঘন বোমাবর্ষণ করিতে থাকে। তখন পাক সৈন্যরা বাঙ্কারে লুকাইয়া পড়ে। কিছু পাকসৈন্য পালাইয়া গ্রামের দিকে ধাবিত হয়। গ্রামবাসী তাহাদিগকে ধরিয়া যে যেখানে পারে হত্যা করে।

১৩ই ডিসেম্বর কিছুসংখ্যক সৈন্য জয়পুরহাট হইতে পালাইয়া আসিয়া সদর থানার সরলপুর গ্রামের পাঁচ পীরের দরগায় আশ্রয় নেয়। মুক্তিফৌজের কমাণ্ডার আবদুস সোবহান খান বাবুল ও তাহার দল জানিতে পারিয়া তাহাদিগকে ঘেরাও করিয়া ফেলে। মুক্তিফৌজের সহিত প্রচণ্ড গোলাগুলিতে দুইজন মুক্তিসেনা ঘটনাস্থলে শহীদ হন। তন্মধ্যে ছিলেন মুক্তিফৌজের কমাণ্ডার আবদুস সোবহান খান বাবুল। পার্শ্ববর্তী গ্রামের লোকজন দা, কুড়াল খন্তা প্রভৃতি অস্ত্র লইয়া আসিয়া পাক বাহিনীর সমস্ত সৈন্যকে হত্যা করে।

ঐদিন গাবতলী থানার কদমতলী গ্রামে পীরগাছা মিলিটারী ক্যাম্প হইতে কয়েকজন পাকসৈন্য পালাইয়া আসিবার সময় কদমতলী গ্রামের রহিমউদ্দিন প্রামানিক নামে একজন লোক ভিটার মধ্যে মিলিটারীর ভয়ে হামাগুড়ি দিয়া লুকাইয়া থাকে। তখন একজন মিলিটারী তাহার পিঠে গুলি করে। তাহার পাশেই গোবর্ধন রবিদাস নামে একজন মুচিকে গুলি করিয়া হত্যা করে। নিকটস্থ গেরিলা বাহিনী আসিয়া তাহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলে।

প্রচণ্ড গোলাগুলি হওয়ার পর পাকসৈন্যদের একজন নিহত হয়। বাকী পাক সৈন্যরা একটি গর্তের মধ্যে লুকাইয়া পড়ে। পরে তাহারা সন্ধ্যার পর পালাইয়া যায়। ঘটনাস্থলে সারিয়াকান্দি থানার বোহালী গ্রামের রফিক নামে একজন মুক্তিসেনা শহীদ হন। এই প্রচণ্ড লড়াইয়ে হাট ফুলবাড়ী, জাতহলিদা, বাইগুলি ও নারচী গ্রামের গেরিলা বাহিনী অংশ নেয়। পাক সেনারা মৃতদেহটি পরে নারচীর গেরিলা দল মহিষের গাড়ী করিয়া লইয়া যাইয়া নারচীর সমুখস্থ বাঙ্গালী নদীতে ফেলিয়া দেয়। দীঘলকান্দির চান্দ কশাই ও চরকাধিকার একজন গ্রামবাসী পাক বাহিনীর গুলিতে মৃত্যবরণ করে।

১৩ই ডিসেম্বর বর্বর পাক বাহিনীর সহিত মিত্রবাহিনী এবং মুক্তিবাহিনীর সহিত হিলি সীমান্তে এক তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হয। মিত্রবাহিনীর সঙ্গে ছিল মেশিনগান, ভারী কামান, ট্যাঙ্ক এবং বিমানবিধ্বংসী কামান ও বোমা। আমাদের বাংলাদেশের কতকগুলি দামাল ছেলের সঙ্গে ছিল, সামান্য স্টেনগান এসএলআর রাইফেল, এলএমজি আর পাক হানাদার বাহিনীর সঙ্গে ছিল কতকগুলি মানব হত্যার মারণাস্ত্র।

এই যুদ্ধে মিত্রবাহিনীর সঙ্গে মিলিত হইয়াছিল আলম বাহিনী, সেলিম বাহিনী এবং এবাদ বাহিনী। প্রথম মিত্রবাহিনী পাকসৈন্যদের উপর বিমান থেকে গুলি বর্ষণ করিতে থাকে। তারপর শুরু হয় এক ঐতিহাসিক তুমুল যুদ্ধ। পৃথিবী থাকিবে, বাংলাদেশ থাকিবে, তাহার সহিত এই হিলির যুদ্ধ চিরদিন বাংলার ইতিহাসের পাতায় লিখা থাকিবে। এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে পাকহানাদার বাহিনীর সাতশত সৈন্য নিহত এবং কতকগুলি অস্ত্রশস্ত্র, ট্যাঙ্ক, মেশিনগানসহ আড়াইশত পাক সৈন্য আত্মসমর্পণ করে। মিত্র ও মুক্তিবাহিনীর অল্পসংখ্যক যোদ্ধা হতাহত হয়। হিলি দখল করার পর বিবরঘাঁটি থেকে তিনশত নির্যাতিত নারীকে উদ্ধার করা হয়।

ঐদিন বগুড়ার পুলিশ লাইন হইতে অহরহ শেলবর্ষণ হইতে থাকে। শহরের এবং কলোনীর বিহারীরা ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া যেখানে পারে নিরাপদ আশ্রয় গ্রহণ করে। পাকসৈন্যরা পরাজিত মনে করিয়া তাহারা করতোয়া রেলওয়ে ব্রীজ ও ফতেআলী ব্রীজ ধ্বংস করিবার উদ্দেশ্য ডিনামাইট পুঁতিয়া রাখে। ঐদিন মিত্র বাহিনীর একশত সাতাশটি ভারতীয় ট্যাঙ্ক ত্রিমুখী সাঁড়াশী আক্রমণ করিবার জন্য গাবতলী হইয়া মাদলার পথে এবং মহাস্থান ও দুপচাচিয়া হইয়া বগুড়া শহরের উপকণ্ঠে আসিয়া পৌঁছে। তুমুল ট্যাঙ্ক যুদ্ধ ও বোমা বিস্ফোরণে সমস্ত শহর প্রকম্পিত হয় এবং আগুনের লেলিহান শিখা দৃষ্ট হইতে থাকে। দুই একটি বোমার আঘাতে পার্শ্ববর্তী গ্রামের কিছুসংখ্যক লোক হত ও বাড়ীঘর বিধ্বস্ত হয়।

১৪ই ডিসেম্বর বগুড়া শহর হইতে পলাতক দুইজন পাকসৈন্য সদর থানার সাবরুল ইস্কুলের মাঠ দিয়া পালাইয়া যাইতেছিল। ঐ সময় গেরিলা বাহিনীর আনোয়ার হোসেন, রফিক ও আরও অনেকে এবং গ্রামবাসী লাঠিসোটা এবং বর্শা প্রভৃতি লইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করে। তাহাদিগকে ধরিয়া মারপিট করিয়া হত্যা করে।

১৫ই ডিসেম্বর পলাতক পাকবাহিনী ও কিছু অবাঙ্গালী বগুড়া শহর হইতে পালাইয়া যাইবার সময় গোলাগুলি বর্ষণ করিতে থাকে। তাহারা শহর হইতে একটি লরী লইয়া যাইতেছিল। লরীটি বিকল হইয়া গেলে তাহারা মার্চ করিতে পদব্রজে অগ্রসর হইতে থাকে। ইতিমধ্যে বিভিন্ন গ্রাম হইতে মুক্তিবাহিনীর দল আসিয়া পাল্টা গুলিবর্ষণ করিতে থাকে। ফলে মুক্তিবাহিনীর একজন শহীদ ও দুইজন আহত হয়। জানা যায়। ঘটনার কয়েকদিন পূর্বে পাকসৈন্যরা ডেমাজানী আসিয়া আকস্মিক গুলিবর্ষণ করিতে থাকে। ফলে কমলরাজভর নামে একজন নিহত

হয়। পরে পাকসেনারা ফিরিয়া যাইবার পথে আড়িয়ার বাজারে ডঃ ফনিন্দ্রনাথ দেব, সুরেশচন্দ্র পাল, শিরিষচন্দ্র পাল, খোকা বৈরাগী, তপেন্দ্রনাথ পাল ও আরও কয়েকজনকে গুলি করে।

ঐদিন বৈকালে আনুমানিক ৪ ঘটিকার সময় ডিনামাইট বিস্ফোরণে করতোয়া রেলওয়ে ব্রীজ ও ফতেআলী ব্রীজ ধ্বংস হইয়া যায়। ঐদিন মিত্রবাহিনীর সহিত পাকসৈন্যদের তুমুল যুদ্ধ চলিতে থাকে। ফলে বহুসংখ্যাক পাকসেনা হতাহত হয়। ঐ সময় ভারতীয় বিমান হইতে কয়েকটি ভারী বোমাবর্ষণ হলে এতিমখানার নিকটস্থ স্থানের ঘরবাড়ি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং দুটি বৃহদাকার গর্তের সৃষ্টি হয়। পরের দিন ১৬ই ডিসেম্বর আনুমানিক তিন হাজার পাকসেনাসহ উচ্চপদস্থ অফিসারেরা মিত্রবাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয়।

OPERATION AVOYA BRIDGE: MR. BADIUZZAMAN*

The successful operation at Rajshahi-Nawabgonj road in the night of 14/15 August has really put up the morale of freedom fighters so high that they have been too much excited to go for another operation around that area. Under the leadership of Maj. Gyas everyone at the camp was very keen to go for another operation. On the night of 14/15 August one of the most strategic bridge named as Haripur Bridge of 120 ft. length over capturing 12 mixed guards of Rajakars and Pak army personnel. This had already snapped the communication link between Rajshahi- Nawabgonj highways. In the same night another group of crack morter detachment went within shell range of Nawabgonj town with 3" morter and for good one hour shelled the town thus disrupting and sheltering the celebration of Independence Day and that of morale of Pak army and local collaborators.

After returning from the above mentioned operation Maj. Gays took one day to overcome the fatigue of that operation and started preparing for another another operation. I was his Staff Officer working very closely with him. He only told me to prepare 6 persons out of informer group to go inside the enemy defence and bring back some information. We had some freedom fighters trained for this purpose. He briefed each and everyone separately and after their return by 20 August collected enough information. What I found out from him on 20 August that he was preparing for an operation at `Avoya bridge' one of the most strategic bridge on road leading from Sonamasjid-Nawabgonj-Rajshahi. The reason he told me that after demolition of Haripur Bridge they could not yet build that bridge. If we can demolish Avoya bridge the 2 battalion worth of regular and para-military forces who are located around Nawabgonj town will be isolated. An area of approx. 50 miles from Rajshahi town will remain under command of FF. Incidentally already an area of approx. 200 squire miles around river Mahananda and Padilla was under command domuration of freedom fighters commanded by Maj. Gyas

He selected 45 persons from amongst the freedom fighters and regular forces and in his own technique and style on 22 August made them sit around a big model of cloth, after making sketch of whole area. Amongst the group I was one of the fortunate one to

* বিবরণটি প্রকল্প সংগৃহীত দলিলপত্র থেকে সংকলিত। ১৯৭১ সালে মেজর গিয়াস উদ্দীন চৌধুরী (পরবর্তীতে ব্রিগেডিয়ার)-এর অধীনে স্টাফ অফিসার হিসাবে কর্মরত ছিলেন।

be selected. Dr. Alam, a final year student of Rajshahi Medical College was also amongst those. We were given a thorough briefing by Maj. Gyas about his plan of operation. Those were the days of heavy flood around Rajshahi-Nawabgonj area. The strategic bridge was located 19 miles away from Rajshahi Town. We set out in 3 large carrier boats (meant for carrying paddy) for out target by 11.00 a.m. in 3 groups. Major weapon we carried were one 2"x Vicar machine guns, 2x2" morters, 8 LMGs, 8 stens, 20 rifles, one grenade with each one of us also with us we also with us we had 450 kg of explosive. As we had paucity of explosives our leaders carried 250 kg of Gelatine explosives and 20 numbers of anti-tank mines of 10 1bs of explosives each one of them having Haripur bridge was demolished a week before with similar type of combination in explosives.

The R V from where we started was Faridpur BOP of Ex BDR which remained throughout in possession of regular forces of Bangladesh Niamita Bahini under Maj. Gyas. We also had 6 more BOPs under our command throughout the war of liberation all along river Padma and Mahananda. We expected to reach the destination although in rowing sail boats in 12 hours time. We carried with us haversack lunch. When we reached near our target we lost our direction as the area was totally submerged with flood water and dark. However we managed to get the direction with the help of a local person and reached to our assembly area of the target at 0010 hrs approx 2 hours later than schedule time. We got ourselves unboarded approx. 1000 yards away from boat. We started making in diamond head information. When we moved about 200 yds we found that the road was submerged which was leading towards Avoya bridge. We continued to move very slowly in a keen -deep water. We came slowly upto 100 yds, and we could see the high bridge in the twilight of the sky, and it was already 0100 hrs almost 50 minutes after we got down from the boat. We kept on moving, and the morale of out boys were very high. When we came within 40-50 yds from the bridge suddenly 5/6 LMGs opened fire on us. A big shower of bullets flew over our head. We all were perplexed and never expected such a surprise. Suddenly I heard Maj. Gyas shouting at the top of his voice `get dispersed and take position.' Most of our people tried to get off the main road but they could not go much further from the knee-deep water. Most of the freedom fighters got into neck-deep water and around some submerged houses. For about 4/5 minutes there was complete confusion as the machine gun fire was showering over our head. I found Major Gyas standing in the middle of the road and I was next to him and during that period of first 2 minutes immediately after shouting for position, he opened up with his favorite Chinese sub-machine gun which he always carried during the operations. He exhausted 2 more magazines. Meanwhile the Vicar machine guns which were mounted up at the enemy position.

Now the exchange of fire from both the sides continued. I saw our leader moving towards the ambush site and whole lot of freedom fighters started following him blindly shouting. In knee to neck-deep water we continued fighting and tried to capture the bridge. Enemy also continued with their resistance to retain the bridge and gave a stiff resistance. After about 3 hrs of fighting we saw enemy getting out of the bridge by 3 boats tied on the side of the bridge. Later we realised that the road on the other side of the

bridge was submerged and no vehicle could come there and they had to resort to boat for their withdrawal.

Finding them escaping we continued to fire with automatic weapons at those people on the boats. The firing from the bridge site was almost diminishing except one LMG which kept on firing. When our LMGs and MGs were at the boat we could hear the shouting of some people saying 'Bachao' 'Bachao' with the reflection of starlight we could see one of the boats going down onto water due to impact of firing. When we captured the bridge it was 4-30 a.m. We ran short of ammunition and whole lot of freedom fighters were totally exhausted although their morale was sky high. Now the question of demolition of bridge camp up. But should we take a risk at this stage as in the morning we expected some re-inforcement from enemy. We decided to pull block to our camp. As the preparation of deep mine charges which could be used for placing there on the embankment after digging hole, at least would need 2 hours time. Moreover our chordite, tonators meant for making ring man circuit were spoiled during fighting. More, we lost one of our valiant fighter L/Nk Mohar Ali who had a bullet in his chest and 2 of the FFs got seriously injured, who needed immediate surgery to save their lives.

I must say the mission was partially successful. Although we could not demolish the bridge but we killed 2 Pak army soldier and 6 Rajakars. Their dead bodies were recovered from the river water 2 days later. We confirmed later that more than a dozen of Pak army and Rajakars were seriously injured in that operation. This action has really put the morale of Pak army down to their knee.

Two successful operation during the month of August did ensure the movement of troops confined only during the day time in minimum of 2 vehicles with adequate strength. More regular troops were deployed for guarding the bridges and culverts thus depleting the finishing strength. A large body of trained personal i.e. regular army was used for patrolling in the main line of communication i.e. road Rajshahi-Nawabgonj which could have been done entirely by paramilitia. This particular operation really opened my eyes about the need of leadership during any army operation as to how a body of armed personnel could be led successfully even against the odds.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৫। ৮নং সেক্টরে সংঘটিত যুদ্ধের বিবরণ	বাংলা একাডেমীর দলিলপত্র	মে-ডিসেম্বর ১৯৭১

সাক্ষাৎকারঃ লেঃ কর্নেল এম এ ওসমান চৌধুরী*
৩১-১-৭৪

খুলনা ও যশোরের ছিন্নমূল ও বিক্ষিপ্ত অনেক ইপিআর এবং কিছুসংখ্যক নিয়মিত বাহিনীর সৈন্য এবং পুলিশ আমার সাথে যোগদান করে। আমি আমার সমস্ত বাহিনীকে পুনঃসংগঠিত করে ৭টি কোম্পানীতে বিভক্ত করে ৭ জায়গায় ৭ জন কোম্পানী কমাণ্ডারের অধীনে ৭ টি বিভিন্ন সীমান্তবর্তী এলাকায় নিয়োগ করিঃ (১) প্রথম কোম্পানী উত্তরে মহেশকুণ্ড বিওপি এলাকায় লেফ্টন্যান্ট জাহাঙ্গীরের (বর্তমানে ক্যাপ্টেন) অধীনে। (২) দ্বিতীয় কোম্পানী তার দক্ষিণে জীবননগর বিওপি এলাকায় ক্যাপ্টেন মুস্তাফিজুর রহমানের অধীনে। (৪) ৪র্থ কোম্পানী কাশিপুর/মুকুন্দপুর বিওপি এলাকায় ক্যাপ্টেন খন্দকার নজমুল হুদার (বর্তমানে লেঃ কর্নেল) অধীনে। (৫) ৫ম কোম্পানী বেনাপোল কাস্টম চেকপোষ্ট এলাকায় ক্যাপ্টেন আবদুল হালিমের অধীনে। (অবশ্য এই কোম্পানীর কমাণ্ডার কয়েকবার পরিবর্তিত হয়। ক্যাপ্টেন তৌফিকও কিছুকাল এই কোম্পানীর কমাণ্ডার ছিলেন।) (৬) ৬ষ্ঠ কোম্পানী আরও দক্ষিণে বাকশা/কাকডাঙ্গা বেনাপোল থানাধীন এলাকায় ক্যাপ্টেন শফিউল্লার অধীনে (৭) ৭ম কোম্পানী ভোমরা এলাকায় ক্যাপ্টেন (বর্তমান মেজর) সালাউদ্দিনের অধীনে। মে মাসের শেষদিকে ক্যাপ্টেন সালাউদ্দিন হেডকোয়ার্টার 'মুজিবনগরে' বদলি হলে ক্যাপ্টেন মাহবুবউদ্দিনকে এই কোম্পানীর ভার দেয়া হয়।

আমার বাহিনীর পুনঃসংগঠিত হওয়ার পর আমি সম্মুখসমর পরিহার করে যথাসম্ভব গেরিলা পদ্ধতিতে শত্রুর মোকাবিলা করার জন্য নির্দেশ দেই। মে মাসের প্রথমার্ধে মুজিবনগরে বাংলাদেশ ফোর্সেস হেডকোয়ার্টার সংগঠিত হয়। ঐ মাসেরই শেষার্ধে গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধ করার পুরাপুরি সিদ্ধান্ত নেয়া এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ নিয়ম সহকারে সমস্ত সেক্টরে নির্দেশ প্রচার করা হয়। আমার সেক্টর হেডকোয়ার্টার স্থাপন করি বেনাপোলের সীমান্তবর্তী এলাকায়। ওখান থেকে সময়ে সময়ে যেসব বিদেশী গুরুত্বপূর্ণ লোকজন অথবা সাংবাদিক ও টেলিভিশন রিপোর্টাররা যুদ্ধের প্রত্যক্ষ রিপোর্ট নিতে আসতেন, তাঁদেরকে বাংলাদেশের ভিতরে নিয়ে যেতাম। মে মাসের শেষার্ধে খবর আসল যে, ইংল্যান্ড থেকে মাননীয় জন স্টোনহাউস এমপি ও মিঃ চেসওয়ার্থ মুক্তিবাহিনীর দ্বারা মুক্ত এলাকা সত্যি বাংলাদেশের এলাকা কিনা, সেই তথ্য পর্যবেক্ষণ করতে বাংলাদেশে আসবেন। আমার নির্দেশমত ব্যবস্থা হল ভারতের বয়রা এলাকা দিয়ে তাঁরা বাংলাদেশে ঢুকবেন। সব ব্যবস্থা করে আমি সীমান্তের একটা সীমান্ত খুঁটির কাছে মহামান্য অতিথিদের অপেক্ষায় রইলাম। অতিথিদের আগমনের সাথে সাথেই আমি তাঁদেরকে সীমান্ত খুঁটি দেখিয়ে বললাম-`This is the border survey-post and the moment you have crossed this post, you are on the Bangladesh soil. Sir let us have a photograph here as a mark of identification between the two lands." ওখানে ফটো তোলার জন্য তাঁদেরকে ভিতরে নিয়ে গেলাম। গাছের উপর, বাড়ির ছাদে তাঁরা বাংলাদেশের পতাকা জন্য দেখতে পেলেন। পরিদর্শন করলেন আমার সেখানকার কোম্পানী হেডকোয়ার্টার। দেখতে পেলেন মুক্তিবাহিনীর আনাগোনা, কর্তব্য পালন, পাহারা ও ডিউটি পরিবর্তন ইত্যাদি। খুশী হলেন, আমাদের সাথে মোরগের মাংস দিয়ে দুপুরের খাওয়া খেলেন। আমাদের অধিকৃত চীনা হাতিয়ার হাতে নিয়ে বাংলাদেশের পতাকাকে পিছনে রেখে ছবি তুললেন। মুক্ত এলাকা পরিদর্শন

* ১৯৭১ সালে মেজর পদে কর্মরত ছিলেন।

করলেন। সবশেষে বিদায় নেবার পূর্বে মাননীয় স্টোনহাউসের আন্তর্জাতিক পাসপোর্ট আমি আমার স্বাক্ষর ও সেক্টর হেডকোয়ার্টার মোহর দিয়ে লিখে দিলাম- ‘‘Admitted into Bangladesh and allowed to visit liberal area."

১৫ই মে থেকে নিয়মিতভাবে প্রত্যেক কোম্পানীকে সাপ্তাহিক অপারেশনাল ট্যাস্ক দিতে থাকলাম এবং সেগুলোর বাস্তবায়ন সিচুয়েশন রিপোর্ট নিয়মিতভাবে বিডিএফ হেডকোয়ার্টারে পাঠাতে থাকলাম। সেক্টর কমাণ্ডার হিসাবে আমি প্রতিনিয়তই কোম্পানী থেকে কোম্পানী এলাকা ভ্রমণ, পরিদর্শন ও অপারেশনাল কাজকর্মগুলো সমন্বয় করতে থাকলাম।

একটা কথা বলতে ভুলে গেছি যে, মে মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রাক্তন ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট জামালুদ্দিন চৌধুরী এমপি-এ ও ক্যাপ্টেন আবদুল ওহাব এবং লেফটেন্যান্ট ইনামুল হক (বর্তমান ক্যাপ্টেন ও প্রেসিডেন্ট এডিসি) আমার হেডকোয়ার্টারে যোগদান করেন। ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট জামালুদ্দিন চৌধূরীকে আমার সেক্টর সদর দপ্তরে স্টাফ ক্যাপ্টেন পদে নিয়োগ করি। সমস্ত অপারেশনের পরিকল্পনা নিয়ন্ত্রণ ও নির্দেশনার ভার ছিল তার উপর, যা তিনি অতি সুষ্ঠু সমর পরিচালকের মত সম্পন্ন করেন।

প্রায় প্রত্যেক অপারেশন টাস্ক সম্পূর্ণ করতে গিয়ে কিছু না কিছু পাকসেনা হতাহত এবং অস্ত্রশস্ত্র হস্তগত করা হত। মাঝে মাঝে শত্রুসেনা বন্দীও করা হত। রাজাকার আত্মসমর্পণ, দালাল নিধন ইত্যাদি ছিল প্রায় নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ হয় ৭ম কোম্পানী এলাকায় ক্যাপ্টেন সালাউদ্দিনের অধীনে। সেদিন ছিল ২৭শে মে, ১৯৭১ সাল। আমাদের অবস্থান ছিল সীমান্তবর্তী একটা বাঁধের উপরে ও তার পিছনটায়। আমাদেরই এই উঁচু পজিশনের জন্য পাকিস্তানীরা কাছে ঘেঁষতে পারত না। দূর থেকেই তাদের আমরা তাড়িয়ে দিতে পারতাম। এই পজিশনটাকে ভাইটাল মনে করে পাকিস্তানীরা ২৭শে মে ভোর ৪টার দিকে ২ কোম্পানী সৈন্য দিয়ে আমাদেরকে আক্রমণ করে। তীব্র যুদ্ধের পর তাদের ঐ আক্রমণ প্রতিহত করা হয়। ২ ঘন্টা পর আবার তারা ২ কোম্পানী সৈন্য নিয়ে আমাদের অবস্থানকে আক্রমণ করে। এবারও তাদের আক্রমণ ব্যর্থ করা হয়। এভাবে পর পর ৬ বার তারা ২ কোম্পানী এবং ১ ব্যাটালিয়ান দিয়ে আলাদা আলাদাভাবে আমাদের উপর আক্রমণ চালায় কিন্তু প্রত্যেকবারেই ক্ষয়ক্ষতির পর তারা পিছপা হতে বাধ্য হয়। এই যুদ্ধ ১৪ ঘন্টাকাল স্থায়ী হয় এবং তাদের আনুমানিক ৩০০ সৈন্য হতাহত হয়। এর মধ্যে তাদের ব্যাটালিয়ান কমাণ্ডার আহত হয় এবং ব্যাটালিয়নের ২য় কমাণ্ডার ও ১ জন ক্যাপ্টেন মারা যায়। উৎসাহভরে এই ক্যাপ্টেনের লাশ নিজ এলাকায় দ্বিতীয়বারের চেষ্টায় ঐ ক্যাপ্টেনের লাশ আনতে সক্ষম হয়। ঐ চেষ্টায় প্রথমত ১ জন জওয়ান মারা যায়। দ্বিতীয়বারের চেষ্টায় ঐ ক্যাপ্টেনের লাশ আনতে সক্ষম হয়। এছাড়া আরও ৫ টি পাকসেনার লাশ উদ্ধার করে অপর বাংলায় জনসাধারণকে দেখানোর জন্য পাঠান হয়। ভারতীয় জনসাধারণ বাঙ্গালীদের বীরত্বের ভূয়সী প্রশংসা করে। এভাবে চলতে থাকে আমাদের দৈনন্দিন মুক্তিযুদ্ধ এবং শত্রুহনন অভিযান। হিসাব করে দেখা গেছে এই সেক্টরে গড়ে প্রতিমাসে ৭০০ শত্রুসেনা নিধন হয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, ১৯৭১ সনের জুন অথবা জুলাই মাসে বাংলাদেশের সেনাপতি ও ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের কধ্যে একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, বাংলাদেশের সেক্টরগুলিতে কিছুসংখ্যক ভারী ও হালকা হাতিয়ার বন্ধুরাষ্ট্র ভারত আমাদেরকে দেবে। সেই অনুযায়ী আমি বারবার ভারতীয় কমাণ্ডারদের কাছ থেকে চেয়েও ঐ হাতিয়ার গুলি পাইনি। সময়মত ঐ অস্ত্রশস্ত্র না পাওয়ায় আমাদের যুদ্ধ চালাতে যথেষ্ট অসুবিধা হয়।

১৯৭১ সনের জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে বাংলাদেশ ফোর্সেস হেডকোয়ার্টার মুজিবনগরে সেক্টর কমাণ্ডারদের কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। এই কনফারেন্সের উদ্বোধনী দিনে সাধারণভাবে বাংলাদেশ বাহিনীর সেনাপতি কর্নেল ওসমানীরই ভাষণ দেবার কথা, কিন্তু উদ্বোধনী ভাষণ শুরু করলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী মাননীয় তাজউদ্দীন আহমদ। ব্যবস্থানুযায়ী তা যদিওবা হ'ল তবুও কর্নেল ওসমানীর উপস্থিতি সেখানে ছিল অপরিহার্য। কিন্তু তিনি নেই দেখেই ব্যাপারটা অস্বাভাবিক মনে হল। যাই হোক লম্বা-চওড়া উদ্বোধনী বক্তৃতার পর প্রধানমন্ত্রী

সাহেব যা বললেন তার অর্থ হল- এই যে সেক্টর কমাণ্ডারদের অনাস্থাবশতঃ কর্নেল ওসমানী পদত্যাগপত্র দাখিল করেছেন। তিনি অনুরোধ করলেন যে, ঐ সঙ্কট মুহূর্তে সেনাপতির পরিবর্তন আন্তর্জাতিক দৃষ্টিতে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের অগভীরতা ও অনৈক্যেরই পরিচালক হবে। ব্যাপারটার গুরুত্ব উপলব্ধি করে আমরা সমস্ত সেক্টর কমাণ্ডারই কর্নেল ওসমানীর সেনাপতিত্বে আস্থা প্রকাশ করি।

প্রাসঙ্গিকভাবে একটা কথা বলতে চাই যে, কর্নেল ওসমানীর আদেশক্রমে আমার সেক্টর-এর ইপিআর বাহিনী থেকে ভাল ভাল যুবক সৈনিকদের একএক করে ছিন্নমূল প্রথম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে পুনঃসংগঠিত করি এবং আমরাই পাকসেনাদের কাছ থেকে দখলকৃত ভারী ও হালকা অস্ত্রশস্ত্র গোলাবারুদ দিয়ে ওদেরকে সম্পূর্ণরুপে সজ্জিত করি। মে মাসের শেষদিকে এই পুনঃসংগঠিত ব্যাটালিয়নকে উত্তর-পূর্ব রণাঙ্গনে নিয়ে যাওয়া হয়। সেনাপতির কাছে নিবেদন করেছিলাম যে, আমার বাহিনীর 'ক্রিম অব সোলজারস' নিয়ে গেলে আমার সেক্টর- এর সমর ক্ষমতা বহুলাংশে কমে যাবে। তিনি বলেছিলেন যে, আমাকে নতুন নতুন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সৈন্য দেওয়া হবে। নতুন নতুন প্রশিক্ষিত সৈন্য আমি ঠিকই পেয়েছিলাম কিন্তু তারা ছিল গেরিলা ট্রেনিংপ্রাপ্ত অনিয়মিত বাহিনীর সদস্য-যাদেরকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত করে অস্ত্রশস্ত্র- গোলাবারুদ ও সামান্য টাকা-পয়সা দিয়ে ভিতরে পাঠিয়ে দিতে হয়েছে। আমার সেক্টর নিয়মিত বাহিনীর যে 'ত্রিম অব সোলজারস' চলে গেল, তার আর কোনদিন রিপ্লেসমেন্ট হয়নি। সময়ে সময়ে পাকিস্তান থেকে যেসব নিয়মিত বাহিনীর সৈন্যরা এসেছিল, তাদেরকেও উত্তর-পূর্ব রণাঙ্গনেই পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এতদসত্ত্বেও এই সেক্টরের সাফল্য প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অন্য কোন সেক্টর-এর তুলনায় যে কম ছিল না, আন্তর্জাতিক দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক পত্রিকা এবং টেলিভিশন ও রেডিও রীলগুলি স্টাডি করলেই বোঝা যাবে।

সপ্তাহকাল কোম্পানী এলাকাগুলো পরিভ্রমণ ও পরিদর্শনের পর ১৫ই আগস্ট বিকেল ৬টায় আমার সেক্টর সদর দপ্তরে পৌঁছে দেখতে পেলাম ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের মেজর এম এ মঞ্জুর (বর্তমানে কর্নেল) আমার অফিসে বসে আছেন। জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম যে, তিনি 'প্রপার মুভমেন্ট' অর্ডার নিয়ে আমার থেকে সেক্টর-এর কর্মভার গ্রহণ করার জন্য এসেছেন। শুনে অবশ্য আশ্চার্যবোধ করলাম যে, আমাকে না জানিয়ে এটা কেমন করে সম্ভব! টেলিফোন করে জানতে পারলাম যে, মুক্তিবাহিনীর সদর দপ্তর মুজিবনগরে এসিস্ট্যান্ট চীফ অব স্টাফ (লজিস্টিকস) এই দপ্তরের সংগঠন ও দায়িত্ব পরিচালনার জন্য আমার ওখানে যাওয়া একান্ত প্রয়োজন। এই সংবাদে সেক্টর-এর নিয়মিত বাহিনী অত্যন্ত বিক্ষুদ্ধ হয়ে পড়ে। আমিও কমাণ্ড পরিবর্তনকে আমার উপর ইনসালট বলে মনে করি। এতদত্ত্বেও সেনাপতির প্রতি আনুগত্য দেখিয়ে ১৮ই আগস্ট বিকেলে সেক্টর- এর কর্মভার হস্তান্তর করে আমি মুক্তিবাহিনীর সদর দপ্তরে হাজির হই।

সাক্ষাৎকারঃ লেঃ কর্নেল এম এ মঞ্জুর *
২৯-৩-১৯৭৩

মানসিক দিক থেকে প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেবার জন্যে। পালাবার পথ খুঁজেছিলাম। অবশেষে সে সুযোগ হয় ২৬শে জুলাই। ইতিপূর্বে আলাপ-আলোচনা, পরিকল্পনা করেই রেখেছিলাম। মেজর জিয়াউদ্দিন, মেজর তাহের, ক্যাপ্টেন পাটোয়ারী, আমার পরিবার এবং আরদালীসহ বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ি। আরও আগে বেরোবার চেষ্টা করেছি কিন্তু সুযোগ হয়নি, তাছাড়া আমার শিশুসন্তান তখন মাত্র কয়েকদিন ছিল।

অনেক পথ পেরিয়ে ৭ই আগস্ট আমি কলকাতা আসি। তারপর ১১ই আগস্ট আমাকে ৮নং সেক্টরের দায়িত্ব দেওয়া হয়। ৯ নং সেক্টরের কমাণ্ডার ছিলেন মেজর এম এ জলিল। তবুও যুদ্ধ সংক্রান্ত ব্যাপারে এই সেক্টরের দায়িত্বও আমাকে দেওয়া হয়েছিল।

* মেজর হিসাবে কর্মরত অবস্থায় মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেন। পরবর্তীতে মেজর জেনারেল পদে উন্নীত হন।

আসার পর পরই আমি পেট্রাপোলে আমার এলাকা পরিদর্শনের জন্যে যাই। সেখানে শুনলাম ছয়জন রাজাকারকে গণবাহিনীরা ধরে নিয়ে এসেছে এবং মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। আমি জিজ্ঞাসাবাদ করে তাদেরকে মুক্তি দেই এবং গ্রামে ফিরে গিয়ে দেশের জন্য কাজ করতে বলি। পরে শুনেছিলাম দুইজন অনুশোচনায় অপ্রকৃতিস্থ হয়ে গেছে, অপর চারজন বাংলাদেশের জন্য মরণপণ লড়াই করেছে। ফিরে এসে এ বিষয়ে গভীরভাবে ভাবতে থাকি এবং কতকগুলি অবস্থা লক্ষ্য করলাম।

গণবাহিনী নিয়মিত বাহিনী থেকে সম্পূর্ণভাবে পৃথক। তারা অন্য কমান্ডের আওতায় কাজে-চিন্তায় নিয়মিত বাহিনী থেকে আলাদা। বস্তুতঃ পক্ষে গণবাহিনী এবং নিয়মিত বাহিনী পৃথক রাজ্যে বাস করতো।

গণবাহিনী বাংলাদেশের অভ্যন্তরে মাঝে মাঝে গেলেও পাকবাহিনী আসছে শুনলে সে গ্রাম বা গৃহ থেকে পালিয়ে যেত। এতে কোন মুক্তিবাহিনীর প্রতি জনসাধারণের আস্থা ক্রমশঃ হারাতে থাকে। অপরদিকে নিয়মিত বাহিনী ভারতীয় সীমান্তের কাছাকাছি বিভিন্ন ‘পকেটে’ থাকতো। তারা বিস্তৃত পরিসবে ঘুরতো না। বস্তুতঃ তাদের কাজ অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। আরও দেখলাম, গণবাহিনীর প্রধানতঃ কাজ ছিল রাজাকারদের বিরুদ্ধে। গণবাহিনী কোন কোন সময় জোর করেও কোন কোন বাড়িতে থেকেছে, এতেও বিরুপ প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করলাম। ‘আঘাত কর এবং পালাও’ এই নীতির ফলে পরে পাকবাহিনী এসে গ্রামকে গ্রাম জ্বালিয়ে দিত, হত্যা করতো লুণ্ঠন সন্ত্রাসও বাদ যেত না। অপরদিকে যেসব রাজাকারদের ধরে সবদিক বিচার না করে হত্যা করতো সেইসব পরিবারের গোটা লোককে পাকিস্তানের পক্ষে কাজ করতে দেখলাম। এমনিভাবে তারা বাংলার মানুষের সহযোগিতা হারাতে বসেছিল। এছাড়া গণবাহিনী মাঝেঁ মাঝে দেশের অভ্যন্তরে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতো। অপরদিকে একজন নিয়মিত সৈনিক হিসাবে তাদের কাছে যা পাওয়া উচিত তার প্রায় কিছুই পাওয়া যাচ্ছিল না। আমি বুঝলাম গণবাহিনীকে যদি আমার অধীনে নিয়ে আসতে না পারি তাহলে কাজ করা কঠিন হয়ে পড়বে। শুধু কতকগুলি সিদ্ধান্ত নেই। (১) সেক্টরটিকে পুরাপুরি পুনঃগঠিত করি। এবং পুনরায় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করি। (২) গণবাহিনীকে সম্পূর্ণ আমার আওতায় নিয়ে আসি। (৩) আমার এলাকাকে বিভিন্নস্থানে বিশেষ বিশেষ এলাকায় ভাগ করি এবং সেখানকার জন্য একজন কমাণ্ডার নিযুক্ত করি। সবাই দেশের অভ্যন্তরে থাকবে, যাবতীয় সরবরাহ আমরা করবো-এ সিদ্ধান্তও নিই। (৪) গণবাহিনীর মধ্যে শৃঙ্খলা, দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করবার জন্যে রাজনৈতিক উপদেষ্টা পাঠাই। (৫) রাজাকারদের প্রশ্নেও বিশেষ নির্দেশ দিয়েছিলাম।

আমি আসার পর গণবাহিনীতে ভর্তি বাড়িয়ে দেই। ট্রেনিং-এর সময় কমিয়ে তিন সপ্তাহ করি। প্রতিমাসে তিন হাজর করে গণবাহিনী তৈরী করে দেশের অভ্যন্তরে পাঠাবার ব্যবস্থা করি। ভিতরে পাঠাবার সময় প্রত্যেকের খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি বাবদ রাহাখরচ ৮০টাকা করে দেবার ব্যবস্থা করেছিলাম। এর আরেকটি দিক ছিল তা হলো দেশের ভিতরে এইভাবে সবাই টাকা ব্যয় করলে অন্যেরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উপকৃত হলে আমাদের প্রতি সহানুভূতি সৃষ্টি হবে।

গণবাহিনী ভিতরে পাঠাবার পর প্রত্যেক গ্রুপের মাত্র একজন সীমান্ত নিকটবর্তী অথবা তার যে কোন নিকটবর্তী আমাদের স্থায়ী ‘পকেটে’ এসে সবার জন্য টাকা, অস্ত্র এবং অন্যান্য জিনিস নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করি। সেপ্টেম্বরের মধ্যে পুনর্গঠনের কাজ হয়ে যায়।

পরবর্তী পর্যায়ে নিয়মিত বাহিনীও ভিতরে এগিয়ে যায়। মোটামুটিভাবে নিয়মিত বাহিনী এবং গণবাহিনীকে একটি বিশেষ ‘চেইনে’ নিয়ে আসি। এতে করে ভাল ফল হতে লাগলো। এই বাহিনী ভিতরে প্রবেশ করলে আমি এদেরকে ‘ট্রাঙ্ক’ দেই-যেমন রেললাইন উড়িয়ে দেওয়া, সেতু ধ্বংস করা, বিদ্যুৎ ব্যবস্থা ধ্বংস করা ইত্যাদি। এসব শুরু হলে পাকবাহিনী ভীষণ বিপদের মুখে পড়ে যায়। আমরা সাফল্যের পথে এগিয়ে যাই। শুধু তাই নয়,

আওতাভুক্ত এলাকাতে যাতে প্রশাসনযন্ত্র চালু হয় এবং সুষ্ঠুভাবে চলে তার নির্দেশ দেই। এতে করে ভাল ফল পাওয়া গেল। ত্বরিত যোগাযোগের জন্য বিভিন্ন স্থানে অয়ারলেস সেট পাঠাই এবং এ বিষয়ে একটি দলকে প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা করি। দেশের ভিতরে গিয়ে বুদ্ধিমান এবং সাহসী ছেলে বেছে এনে 'ইনটেলিজেন্স' বিভাগ খুলি। এর ফলে যাবতীয় খবরাখবর আমরা অতি সহজে পেতে লাগলাম। আমাদের অগ্রগতি এগিয়ে চলে।

অপরদিকে আমি লক্ষ্য করেছিলাম যে শুধুমাত্র পাকবাহিনীকে হত্যা বা তাড়ানোর ব্যবস্থা করলেই চলবে না, তাতে করে পুরা প্রশাসন ভেঙ্গে পড়ে সেদিকেও নজর দিতে হবে। এ কাজের প্রাথমিক দিক হিসাবে আমি প্রথমে পুলিশ থানাগুলি দখল করতে বলি। অপরদিকে চালনা এবং মঙ্গলা পোর্ট যাতে অকেজো হয়ে যায় তার নির্দেশ দেই। সঙ্গে সঙ্গে কাজ হয়-নৌবাহিনীর একটি দল বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেয়।

এইভাবে কাজ করে যেতে আমরা একের পর এক জয়ের পথে এগিয়ে গেলাম। গণবাহিনী ও নিয়মিত বাহিনী অত্যন্ত দক্ষতার সাথে কাজ করতে লাগলো। মুক্তিযুদ্ধের সবচাইতে যেটি প্রয়োজন, জনসাধারণের সমর্থন, তা পেতে লাগলাম। আমরা সাফল্যের পথে এগিয়ে গেলাম।

এরপর নভেম্বরের ২০ তারিখে থেকে মিত্রবাহিনী আমাদের সাথে আসে। এবং মিত্রবাহিনী ও আমাদের বাহিনী মিলিতভাবে শত্রুদের উপর আক্রমণ চালিয়ে একের পর এক এলাকা জয় করে চললো। অবশেষে ১৬ই ডিসেম্বর সম্পূর্ণভাবে বাংলাদেশ মুক্ত হয়।

আলবদর বা আলশামসদের ক্ষেত্রে অন্য কথা হলেও রাজাকার প্রশ্নে বলা যায় যে, তারা সবাই সমান ছিল না। এদের অনেকেই আমাদের পক্ষে কাজ করেছে, যদিও মানুষ এদের ঘৃণা করতো।

সত্যিকার অর্থে যশোর সেনানিবাসটাকেই গণকবরস্থান বলা যেতে পারে। কারণ বিভিন্ন স্থানে ঘটনা বিক্ষিপ্তভাবে যা পাওয়া গেছে, শোনা গেছে, দেখা গেছে, তা অবর্ণনীয়। যাবার পথে পাকবাহিনী সেনানিবাসের বহু ব্যারাক ও স্টোরে আগুন লাগিয়ে দিয়ে গেছে। সেনানিবাসের ভিতরে মডেল প্রাইমারী বিদ্যালয়, দাউদ বিদ্যালয় ইত্যাদি স্থান ছিল চাপ চাপ রক্তে ভরা। অনেক মানুষকে রশি দিয়ে গাছে টাঙ্গিয়ে হত্যা করা হতো। আরও শুনলাম কিভাবে মেয়েদের উপর অত্যাচার করা হয়েছে। হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করেছে নৃশংসভাবে, তার পরিচয় পাওয়া গেল।

ডিসেম্বর পুরামাত্রায় যুদ্ধ বেধে গেলে বাংলার মানুষ আনন্দিত হয়ে উঠে। তারা উন্মুখ হয়ে থাকে মিত্র আর মুক্তিবাহিনীর অপেক্ষায়।

মুক্তিবাহিনী এবং মিত্রবাহিনীকে বাংলার মানুষ প্রাণঢালা সংবর্ধনা জানায়। শিশু, বৃদ্ধ, যুবক, নারী, সবাই যে যা পেয়েছে তাই দিয়ে অভ্যর্থনা জানিয়েছে। স্বাধীনতার পর জনমনে সাড়া পড়ে যায়। বাংলার আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে উঠে 'জয় বাংলা' ধ্বনিতে।

স্বাক্ষরঃ মঞ্জুর
২৯-৩-৭৩

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৬। ৮নং সেক্টরে সংঘটিত যুদ্ধ সম্পর্কে অন্যান্যের বিবরণ	বাংলা একাডেমির দলিলপত্র	মে-ডিসেম্বর ১৯৭১

সাক্ষাৎকারঃ লেঃ কর্নেল মোস্তাফিজুর রহমান*
৬-১০-১৯৭৩

বেতাই, বানপুর, বয়রা, বনগাঁ, গোজাডাঙ্গা ইত্যাদি স্থানে মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্প করা হয়ঃ ১। বেতাই ক্যাম্পের কোম্পানী কমাণ্ডার ছিলেন ক্যাপ্টেন আজম চৌধুরী। ২। বানপুরে ছিলেন ক্যাপ্টেন মোস্তাফিজুর রহমান। ৩। বয়রায় ছিলেন ক্রাপ্টেন কে, এন, হুদা ৪। বনগাঁয় ছিলেন ক্যাপ্টেন তৌফিক-ই-এলাহী চৌধুরী। ৫। গোজাডাঙ্গায় ছিলেন ক্যাপ্টেন সালাউদ্দিন এবং পরে ক্যাপ্টেন মাহবুব উদ্দিন।

আমাকে বানপুর ক্যাম্পে রাখার উদ্দেশ্য ছিল, আমি ছিলাম প্রকৌশলী অফিসার। যশোর, ঈশ্বরদী, কুষ্টিয়াতে যে সমস্ত রেল চলাচল করত কৌশলে যাতে ঐ সমস্ত রেল চলাচল ব্যাহত করতে পারা যায় তার জন্য বিশেষভাবে আমাকে ক্যাম্পে নিয়োগ করা হয়।

মে মাসঃ মে মাসের ১২/১৩ তারিখে কুষ্টিয়া জেলার জীবননগর বিওপিতে এ্যামবুশ করে পাক আর্মিদের কাছ থেকে একটি জীপ দখল করা হয়। পাক আর্মি মাঝে মাঝে বিওপিতে আসত। তারা মুক্তিবাহিনীর হামলায় জীপটি রেখে চলে যায়। মুক্তিবাহিনী সর্বপ্রথম ঐ জীপটি পাকবাহিনী থেকে উদ্ধার করে। ঐ জীপের ভিতর থেকে পাক আর্মির চারখানা ব্যাক্তিগত চিঠি উদ্ধার করা হয়। চিঠিগুলির মধ্যে একটিতে উর্দুতে এক সৈন্য তার বাবার কাছে লিখছে যে, "তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে যে সমস্ত ঘটনা ঘটছে পশ্চিম পাকিস্তানে বসে শুনছেন, তার চেয়ে বহুগুণ সব ঘটছে।" ২য় পত্রে জনৈক সৈনিক তার বন্ধুর কাছে লিখছেঃ 'একটি কমান্ডো ব্যাটালিয়নের চট্টগ্রাম যুদ্ধে আমরা ৪/৫ জন ছাড়া আর সবাই মারা গেছে। আমাদের অন্য ব্যাটালিয়নের সাথে থেকে যুদ্ধ করতে হচ্ছে।

এভাবে যুদ্ধ করতে করতে মে মাস কেটে গেল। মে মাসের ২১/২২ তারিখে দর্শনা ও জীবননগরের রাস্তার মাঝামাঝি স্থানে শিয়ালমারী নামে একটি জায়গা আছে। ঐ রাস্তায় মুক্তিযোদ্ধারা ৪ খানা ট্যাঙ্ক বিধ্বংসী মাইন লাগায়। সেখানে ব্রীজ না থাকার জন্য একটি ডাইভারশন সড়ক ছিল। এই মাইন লাগানোর ফলে পাকবাহিনীর একটি ট্রাক উল্টে যায়। এর ফলে ৮/১০ জন পাকসেনা মারা যায় এবং কিছু আহত হয়। মাইন বিস্ফোরণের সময় পাকবাহিনী বুঝতে পারেনি যে মাইন ফেটেছে। তারা মনে করেছিল মুক্তিযোদ্ধারা আক্রমণ করেছে। ঐ রাস্তা দিয়ে একই সঙ্গে দুটি ট্রাক ও একটি জীপ যাচ্ছিল। প্রথমে জীপটি রাস্তা পার হয়ে চলে যায়। পরে ট্রাকটি ধ্বংস হয় এবং সবার পিছনের ট্রাকটি রক্ষা পায়। পাকবাহিনী ওখানে ২/৪ গ্রামবাসীকে গুলি করে হত্যা করে ও এলোপাতাড়ি গুলি ছুঁড়তে থাকে।

মে মাসের ১৫ তারিখের দিকে নায়েক বাশার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের (অনার্স) একজন ছাত্র বাবলু ও অপর তিনজন মুক্তিযোদ্ধাকে এক্সপ্লোসিভ দিয়ে দর্শনা থেকে ২ মাইল উত্তরে দুতপাতিলা নামক স্থানে রেলব্রীজ উড়িয়ে দেয়ার জন্য পাঠান হয়। তাদের কাজ ছিল, ঐ দিন রাত্রিতে যে ট্রেনটি আসবে এবং তা যখন ব্রীজের উপর দিয়ে যাবে তখন তাকে এক্সপ্লোসিভ দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া। দুঃখের বিষয়, ঐ দিন সারারাত আর কোন ট্রেন আসেনি। মুক্তিযোদ্ধারা এক্সপ্লোসিভ তার নিয়ে পাশের আখক্ষেতে অপেক্ষা করছিল। ভোরবেলায় একজন

---

* ১৯৭১ সালে ক্যাপ্টেন পদে কর্মরত ছিলেন।

কৃষক জমি চাষ করার জন্য ঐ পথ দিয়ে আসছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের ছাত্র মনে করেছিল যদি কৃষকের লাঙ্গলে এক্সপ্লোসিভের তার লাগে তবে তারটি উপরের দিকে উঠে যাবে। তাই ভেবে, কৃষকটি তারের কাছে আসার পূর্বেই, সে এক্সপ্লোসিভ ফাটিয়ে দেয়, এর ফলে প্রচণ্ড আওয়াজ করে ব্রীজটি ধ্বংস হয়। এ আওয়াজ পেয়ে গ্রামবাসীরা যার যার ঘর থেকে বের হয়ে আসে। ঐ মুক্তিযোদ্ধারা আখক্ষেতে থেকে পালিয়ে যাওয়ার সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বাবুল ও নায়েক বাশার গ্রামবাসীর হাতে ধরা পড়ে যায়। কিন্তু গ্রামের মুসলিম লীগ দালালের খপ্পরে পড়ার ফলে মুসলিম লীগের দালালরা তাদেরকে দর্শনা পাকফৌজ ক্যাম্পে চালান করে দেয়। এরপর তাদের দুজনকে যশোর ও পরে ঢাকা নিয়ে যাওয়া হয়। ঢাকা বেতার থেকে তাদের বিবরণী প্রচার করা হয়েছিল। তাদের প্রহার করে কিছু কিছু গোপন সংবাদও তাদের মুখ থেকে বের করা হয়েছিল।

জুন মাসে তেমন কোন অপারেশন হয়নি। বিভিন্ন জায়গায় মাইন পোঁতা হয়েছিল, কিন্তু তাতে কোন কাজ হয়নি। বিভিন্ন স্থানে মুক্তিযোদ্ধাদেরকে গ্রেনেড দিয়ে পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু মুক্তিযোদ্ধারাও কোন অপারেশন করতে পারে নাই।

জুলাই ১৯৭১: ১৩ই জুলাই দর্শনা পাকবাহিনীর ক্যাম্পে ভারতীয় বাহিনীর সাথে মুক্তিযোদ্ধারা যৌথ উদ্যোগে রেইড করার ফলে ১২/১৪ জন পাকসেনা মারা যায়।

দর্শনা-ঝিনাইদহ রাস্তার ডিঙ্গাসহ ও জালসুক ব্রীজ দুটি এক্সপ্লোসিভ দিয়ে উড়িয়ে দেয়া হয়। এর ফলে পাকবাহিনীর চলাচলে বিঘ্ন ঘটে।

জুন, জুলাই ও আগস্ট মাসে মুক্তিযোদ্ধারা দর্শনা, জীবননগর, হাঁসদহ, খালিশপুর, কোটচাঁদপুর, কাপাশডাঙ্গা, দত্তনগর, কালিগঞ্জ ইত্যাদি স্থানে সড়ক ও রেলব্রীজের উপর এত বেশী মাইন পাতে যে, শেষ পর্যন্ত পাকবাহিনী ট্রেনের ইঞ্জিনের সামনে বালির গাড়ী লাগিয়ে চলাচল করত, যাতে মাইনের আঘাতে ইঞ্জিন নষ্ট না হয়। এমনকি তারা গ্রামের লোকদের হাতে লণ্ঠন দিয়ে রাত্রে পাহারা দেয়ার ব্যবস্থা করে, যাতে মুক্তিযোদ্ধারা মাইন লাগাতে না পারে। কিন্তু এত বাধাবিপত্তির ভিতরও মুক্তিযোদ্ধারা মাইন লাগাত। সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসগুলিতে যে সমস্ত মুক্তিযোদ্ধা ভারতে ট্রেনিং নিয়ে আমার ক্যাম্পে আসত, তাদেরকে ভিতরে বেইস গড়ার জন্য পাঠাতে থাকি। এ বেইসগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, ক্যাপ্টেন ওহাব সাহেবের নেতৃত্বে যশোর জেলার মাগুরাতে এবং কুষ্টিয়া জেলার হরিণাকুন্ডুতে আবদুর রহমান নামে একজন প্রাক্তণ সৈনিকের নেতৃত্বে ক্যাম্প খোলা হয়। ক্যাপ্টেন ওহাবের সাথে ছিলেন সহকারী লেঃ মোস্তফা এবং ৭০ জন নিয়মিত বাহিনীর লোক। ক্যাপ্টেন ওহাব মাত্র ৭০ জন সৈনিক নিয়ে মাগুরাতে যান। এ সংবাদ পাকসেনারা জানতে পায়। কিন্তু গুজব রটে যে একজন ক্যাপ্টেনের নেতৃত্বে ৭/৮ হাজার মুক্তিযোদ্ধা মাগুরাতে অপারেশন করতে আসছে। এ সংবাদ জেনে পাকবাহিনীর সৈন্যরা মনোবল হারিয়ে ফেলে। শেষ পর্যন্ত পাক বাহিনী ডিসেম্বর মাসে যুদ্ধের সময় মাগুরা থেকে ফরিদপুর চলে যায়। ক্যাপ্টেন ওহাব একটি গোপন সংবাদ যৌথ সেনাবাহিনীর কাছে পৌঁছায় যে, মাগুরাতে পাকসেনাদের পেট্রোল ডিপো আছে। ডিসেম্বর মাসে ভারতীয় বিমান বাহিনীর আক্রমণে পেট্রোল ডিপোটি ধ্বংস হয়ে যায়। অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাহে হরিণাকুন্ডু ক্যাম্পের আবদুর রহমানের দল হরিণাকুন্ডু থানা আক্রমণ করে। এর ফলে একজন পাকিস্তানী ডিএসপি মারা যায় এবং ডিএসপি’র পোশাক হেড অফিসে পাঠিয়ে দেয়া হয় এবং ঐ থানা আক্রমণে কয়েকজন পুলিশ মারা যায়।

নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে ভারতীয় সৈন্যরা তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানের ভিতরে প্রবেশ করতে থাকে। দর্শনা সীমান্তের বাঁ দিকে মদনাতে ভারতীয় বাহিনীর ৪১ পার্বত্য ব্রিগেডের কিছু অংশ ঐ সমস্ত স্থানে মুক্তিবাহিনীকে সঙ্গে করে ডিফেন্স নিতে আরম্ভ করে। ভারতীয় বাহিনীর উপর একটি ব্রিগেড দর্শনার ডানদিকে (ভারত থেকে ডান দিকে) জীবননগর, দত্তনগর কৃষিখামার, ধোপাখালি এলাকায় রেকি করতে থাকে। ১২ই নভেম্বর রাত্রিতে একটি ভারতীয় প্লাটুন মুক্তিবাহিনীর সাথে মেজর ভার্মার নেতৃত্বে এবং ২ জন ভারতীয় ক্যাপ্টেনের সাথে আমি ধোপাখালী বিওপি রেইড করতে যাই। এই রেইড করার ফলে পাকসেনাদের ১৫/২০ জন

সৈন্য নিহত হয়। এ যুদ্ধে আমার পেটে গুলি লাগে। অয়ারলেস অপারেটর নায়েক মোহাববতের সহায়তায় ক্যাম্পে ফিরে যেতে সক্ষম হই। ঐ গুলি লাগে ২টার সময় এবং মেজর ভার্মা পায়ে ও হাতে আঘাত পান। আমাকে চিকিৎসার কোর ফিল্ড হাসপাতালে পাঠান হয়।

পাকিস্তানী সৈন্যরা বিগত কয়েক মাস যাবৎ যুদ্ধে কোনদিন আর্টিলারী ব্যবহার করেনি। কিন্তু ঐ দিনের অপারেশনে পাকিস্তানীরা তাদের সব রকম অস্ত্র ব্যবহার করে। কিন্তু এ সমস্ত অস্ত্র ব্যবহার না করার ফলে মুক্তিযোদ্ধারা ও ভারতীয় বাহিনী জানতো না যে পাকিস্তানীদের কি কি অস্ত্র এবং কোন কোন স্থানে আছে। পাকবাহিনী তা ব্যবহারের পরে সমস্ত কিছু জানা গেল। মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় বাহিনী ধোপাখালী (কুষ্টিয়া) বিওপি ব্যাপকভাবে আক্রমণ করে যার ফলে পাকবাহিনী আর্টিলার ব্যবহার করতে বাধ্য হয়। এই অপারেশনে মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় বাহিনীর কোন ক্ষতি হয়নি।

সাক্ষাৎকারঃ তৌফিক-ই -এলাহী চৌধুরী*

শেষবারের মত এপ্রিলের শেষে যশোরের বেনাপোল থেকে ভারতে পশ্চাদপসরণ করার সময় আমাদের দুঃখ-কষ্ট সীমাহীন ছিল। বর্ষার আগমনে প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছিল এবং আমাদের সঙ্গীদের শোয়া দূরে থাক, মাথা গোঁজার ঠাঁইটুকুও ছিল না। অবিরাম বৃষ্টি, অর্ধাহার, অনাহার, তার উপর আপাতদৃষ্টিতে পরাজয়ের গ্লানি, সব মিলিয়ে আমরা অনেকটা দিশেহারা হয়ে পড়েছিলাম। এই রকম অবস্থায় বাংলার মাটিকে ছেড়ে বিদেশে বিতাড়িত হওয়া যে কি মানসিক যন্ত্রণা-সেটা যারা কোনদিন এ রকম অবস্থায় পড়েনি তাদের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। প্রতিটি মুক্তিযোদ্ধা ভাইয়ের মানসপটে ভেসে উঠেছিল তাদের ফেলে আসা গ্রাম, ঘরবাড়ি, বাবা মা-স্ত্রী-পুত্র পরিজন। তাদের কাছ থেকে কতদিনের বিদায় নিয়ে যাচ্ছিল তারা জানত না। এই বেদনাবিধূর বিদায়লগ্ন আমাদের কেউ কোন দিন ভুলাতে পারবে না।

এই সময়ে ভারতীয় সামরিক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আমাদের কথাবার্তা শুরু হয়। আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে তাদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রাথমিকভাবে কিছুদিন বিএসএফ এবং তারপর ভারতীয় সেনাবাহিনী আমাদের রেশন, গোলাবারুদ এবং সরবরাহের দায়িত্ব নেন। খুব সম্ভবতঃ ১৮ বিএসএফ-এর ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডার লেফটেন্যান্ট কর্নেল মেঈ সিং-এর অবদান বিশেষভাবে স্মরণীয়। ১৯৬৫ সনের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে ‘বীরচক্র’ পাওয়া এই সামরিক অফিসারটি আমাদের এই চরম দুর্দিনে বাণী শুনিয়েছিলেন। এই সময় আমরা পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নতুনভাবে সংগঠন শুরু করি এবং সময়সূচি গ্রহণ করি। আমাদের সমস্ত ইপিআর, আনসার, মুজাহিদ এবং অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধাদের এবং প্রথম বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈন্যদের কয়েকটি কোম্পানীতে ভাগ করে দেয়া হয়। প্রায় ৩৫০ মাইল সীমান্তে (কুষ্টিয়ার উত্তর থেকে খুলনার দক্ষিণাংশে পর্যন্ত) আমাদের স্ট্রাটেজিক দায়িত্ব ছিল কয়েকটিঃ

১। শত্রুর প্রতিরক্ষা বূহ্যগুলিতে শত্রুকে হয়রানি করা। ২। শত্রুর উপর অতর্কিত রেইড চালিয়ে কুষ্টিয়া জেলার উত্তর মাথা থেকে দক্ষিণে খুলনার সাতক্ষীরা-কলারোয়া রাস্তা অবধি কতগুলো বিশেষ সামরিক দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় মুক্তিযোদ্ধাদের মোতায়েন করা। এফ কোম্পানী কুষ্টিয়ার প্রাগপুর বিওপি’র বিপরীতে কমাণ্ডার প্রথমে ছিলেন লেফটেনেন্ট জাহাঙ্গীর এবং আমি। ৩। শত্রুদের যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিঘ্ন সৃষ্টি করা, ব্যাহত করা এবং সম্ভব হলে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া ৪। শত্রুদের ছোট ছোট দলগুলোর পেট্রল পার্টির উপর এ্যামবুশ করা ইত্যাদি। মোটামুটিভাবে শত্রুর দুর্বল জায়গাগুলোতে অতর্কিত হামলা চালিয়ে সরে পড়াই আমাদের দায়িত্ব ছিল। যেসব জায়গায় সম্ভব হচ্ছিল আমরা বাংলাদেশের কিছু ভিতরে সামরিক প্রতিরক্ষা বূহ্যও গড়ে তুলছিলাম।

সি কোম্পানীঃ মেহেরপুর শহরের বিপরীতে কমাণ্ডার ছিলেন ক্যাপ্টেন আজম চৌধুরী।

---

* কুষ্টিয়ার মেহেরপুরে এসডিও থাকাকালীন অবস্থায় মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন।

বি কোম্পানীঃ দর্শনার বিপরীতে, কমাণ্ডার ছিলেন তদানীন্তন ক্যাপ্টেন মুস্তাফিজুর রহমান।

ডি কোম্পানীঃ চৌগাছার বিপরীতে, কমাণ্ডার ছিলেন ক্যাপ্টেন হুদা।

এ কোম্পানী ছিল খুলনার ভোমরা বিওপি'র বিপরীতে, কমাণ্ডার ছিলেন প্রথমে ক্যাপ্টেন সালাউদ্দিন এবং পরে ক্যাপ্টেন মাহবুবউদ্দিন আহমদ।

এইচ কোম্পানী ছিল বেনাপোলের বিপরীতে, প্রথমে ক্যাপ্টেন হাফিজের নেতৃত্বে আর কমাণ্ডার ছিলাম আমি নিজে। সর্বদক্ষিণে জি কোম্পানী। সাতক্ষীরা-কলারোয়া রাস্তার বিপরীতে এই কোম্পানী মোতায়েন ছিল। কমাণ্ডার ছিলেন ক্যাপ্টেন শফিউল্লাহ। এই সময় আমাদের হেডকোয়ার্টারে মুন্সিগঞ্জের এসিএ ফ্লাইট লেঃ জামাল যোগ দেন।

এইরকম একটা সামরিক প্রতিরক্ষা বূহ্য, যেটা এ কোম্পানী ভোমরা বিওপি'র আশেপাশে গড়ে তুলেছিল, তার উপর পাকিস্তান সেনাবাহিনী আক্রমণ চালিয়েছিল ৩০শে মে তারিখে। প্রায় ১৭ঘন্টা যুদ্ধ চলে। এই যুদ্ধে পাকিস্তান সেনাবাহিনী তাদের গোলন্দাজ বাহিনীকে ব্যবহার করে। মুক্তিযোদ্ধারা এই দৃষ্টান্তমূলক সাহস ও সংকল্পের পরিচয় দেয়। ক্যাপ্টেন সালাউদ্দিন এবং ক্যাপ্টেন মাহবুব এই যুদ্ধ দক্ষতার সাথে পরিচালনা করেন। প্রায় তিন শতাধিক শত্রুসৈন্য একজন অফিসারসহ এই যুদ্ধে হতাহত হয়। ক্যাপ্টেন সালাউদ্দিন শত্রুর কয়েকটি মৃতদেহ আমাদের কৃষ্ণনগর হেডকোয়ার্টারে পাঠিয়ে দিতে সক্ষম হন। সেদিন কৃষ্ণনগরের জনসাধারণ এই লাশ দেখার জন্য হেডকোয়ার্টারে ভেঙ্গে পড়েছিল এবং ভারতীয় সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরা মৃতদেহ দেখতে এসেছিল।

এই সময় আমাদের মূল সাংগঠনিক কাজ চলতে থাকে। আর্মি হেডকোয়ার্টার থেকে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় প্রথম বেঙ্গল রেজিমেন্টকে পূর্ণ শক্তিতে বলীয়ান করে তোলার। সমস্ত মুক্তিবাহিনীকে ২টা ক্যাটিগরিতে ভাগ করা হয়। ১। নিয়মিত বাহিনী (ক) সেক্টর ট্রুপস (খ) রেগুলার ট্রুপস ২। অনিয়মিত বাহিনী-গণবাহিনী।

॥ বেনাপোল পতাকা ॥

পশ্চিম রণাঙ্গনে আমাদের সংগ্রাম এবং গৌরবের প্রতীক হিসেবে মুক্তিযুদ্ধের পুরো নয় মাস পর্যন্ত বেনাপোল চেকপোস্টে বাংলাদেশের পতাকা উড্ডীয়মান ছিল। এই পতাকার পেছনে ছোট ইতিহাস আছে।

এপ্রিলের শেষের দিকে যখন আমাদের জনশক্তি সীমান্তের অপর চলে যায় তখনো বেনাপোল সীমান্ত উড্ডীয়মান পতাকাকে আমরা অসহায়ভাবে ফেলে যাইনি। মে মাসের প্রথমার্ধে যখন মুক্তিবাহিনীর সংগঠন এবং পুনর্বিন্যাস চলছিল তখন এই পতাকার সংরক্ষণের ভার নিয়েছিলেন ১৮-বিএসএফ-এর কমাণ্ডার লেঃ কর্নেল মেঈ সিং (বীরচক্র)। বাংলাদেশের পতাকার প্রতি এতদূর শ্রদ্ধা এবং সম্মান ও অনুরাগ আমি আর কোন ভারতীয়দের মধ্যে দেখিনি। এই রাজপুত অফিসারটি আমাদের পতাকাকে সম্মান দিয়ে সমস্ত বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছিলেন এবং তিনি বার বার এই কথাই বলতেন। ১৮-বিএসএফ তাদের মেশিনগান দিয়ে এই পতাকাকে কভার করে রেখেছিল। মনে হয় একটা কাকপক্ষীও তার পাশে ভিড়তে পারেনি। সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা বা গভীর রাতে মেশিনগান গর্জে উঠত, যদি তার আশেপাশে সামান্যতম গতিবিধি পরিলক্ষিত হত। মেশিনগানের আওয়াজ শুনলে আমরা বুঝতে পারতাম মেঈ সিং-এর লোকজন তৎপর হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশের এই পতাকার আশপাশ দিয়ে না জানি কত হাজার হাজার গোলাবর্ষণ হয়েছে। পতাকাকে ধ্বংস করার জন্য পাকিস্তানীদের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। পাকিস্তানীদের এই অপচেষ্টাকে কেন্দ্র করে কতজন যে হতাহত হয়েছে তা সঠিক বলা মুশকিল। এই পতাকা নিয়ে সীমান্ত সব সময় সরগরম থাকত। এ ছিল আমাদের অনাগত দিনের বিজয়ের প্রতীক। প্রসংগত উল্লেযোগ্য যে যশোর সেনানিবাসে যখন প্রথমে বেঙ্গল রেজিমেন্ট আক্রান্ত হয় (আনুমানিক এপ্রিলের প্রথমার্ধে) মেঈ সিং তার ১৮-বিএসএফ ব্যাটালিয়নকে নিয়ে

বাংলাদেশের ভিতরে স্বীয় অনুপ্রেরণায় ঢুকে পড়েন এবং ঝিকরগাছার কাছে তার বাহিনীর সাথে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সংঘর্ষ হয়। এই সংঘর্ষে বিএসএফ-এর কিছুসংখ্যক হতাহত হয় এবং কিছুসংখ্যক পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাতে ধরা পড়ে। মেঈ সিং বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ঢোকার এই সিদ্ধান্ত নিজে নিয়েছিলেন বিধায় ভারত সরকারের হাতে তাকে নাজেহাল হতে হয়েছিল। শুধু তাই নয়, এই সময় তিনি একবার গোপনীয়ভাবে ক্যাপ্টেন হাফিজের সাথে আমাদের চুয়াডাঙ্গা সদর দফতরও দেখতে আসেন। মেঈ সিং-এর এই একগুঁয়েমি বেনাপোল চেকপোস্টে পরে মোতায়েনরত ভারতীয় সেনাবাহিনীর ৭-পাঞ্জাব ব্যাটালিয়ন সহ্য করতে পারত না। তারা কয়েকবার প্রস্তাবও করেছিল যে বাংলাদেশের পতাকা নিয়ে গোলাগুলি বিনিময় বন্ধ করা হোক। কিন্তু মেঈ সিং এই প্রস্তাব কোনদিন মেনে নেননি। পরে তাঁর ব্যাটালিয়নকে এখান থেকে অন্যত্র সরিয়ে নেয়া হয়। কর্নেল মেঈ-এর পরে প্রথম বেঙ্গল রেজিমেন্ট এই পতাকা সংরক্ষণের দায়িত্ব নেন।

জুন-জুলাই মাসে প্রথম বেঙ্গল রেজিমেন্ট বেনাপোল সীমান্ত থেকে 'জেড' ফোর্সে যোগদান করার জন্য বাংলাদেশের উত্তর সীমান্তে চলে যায়। এই সময় বাংলাদেশের পতাকাটি বেনাপোলে সীমান্তে একটা স্বীকৃত সত্য হয়ে গিয়েছিল। এরপর ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং আমার কোম্পানী মিলে এইচ কোম্পানী যৌথভাবে এই পতাকা সংরক্ষণের দায়িত্ব নেই। এবং বেনাপোল সীমান্ত থেকে প্রায় ৭০০/৮০০ গজ জায়গা 'নো-মানস্ ল্যাণ্ড'-এ পরিণত হয়। আমার মনে আছে 'ওমেগা' রিলিফ দল যেদিন এই সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে তখন আমিও ২/৩ জন মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে রাস্তার পাশ দিয়ে বড় গাছগুলোর আড়াল নিয়ে ক্রল করে এগুচ্ছিলাম। চার/পাঁচ গজ দূরে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর লোকজন এদের জন্য অপেক্ষা করছিল। রাস্তার পাশ থেকে এদেরকে আমাদের পতাকা দেখাই এবং বলি যে আমরা এই এলাকা দখল করে আছি। 'ওমেগা' দল ভয়ে ডান, বাঁয়ে তাকাতে সাহস পায়নি। এইভাবে দীর্ঘ নয় মাস আমরা বেনাপোলের পতাকাকে রক্ষা করেছিলাম এবং পাকিস্তান সেনাবাহিনীর শত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কোনদিন এই পতাকা ধ্বংস করা সম্ভব হয়নি। পতাকা যেখানে উড্ডীয়মান ছিল তার আশেপাশে পেট্রল পার্টি পাঠানো হত এবং তাদের সাথে পাক-বাহিনীর প্রতিদিন গোলাগুলি বিনিময় হত। মে মাসে এই পতাকাকে সামনে রেখে বিবিসি'র প্রতিনিধিরা ক্যাপ্টেন হাফিজ এবং মেজর ওসমানের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন।

স্বাক্ষরঃ তৌফিক-ই-এলাহী চৌধুরী
১৪-১০-৭৩

সাক্ষাৎকারঃ মেজর আব্দুল হালিম
২২-১১-১৯৭৩

মুক্তিযুদ্ধকে অব্যাহত রাখার জন্য মে মাসের শেষদিকে ভারতীয় সীমান্তের বিভিন্ন স্থানে শিবির স্থাপন করা হয়। আমাকে ৩রা জুন ১৯৭১ সালে দক্ষিণ পশ্চিম সেক্টরের কমাণ্ডার হিসাবে নিযুক্ত করেন। শিকারপুর সাবসেক্টর কমাণ্ডার নিযুক্ত হওয়ার পর আমাকে ১ কোম্পানী ইপিআর ও মুজাহিদ দেওয়া হয়। আমার সহ-অধিনায়ক হিসাবে কাজ করেন ইপিআর বাহিনীর সুবেদার মজিদ।

(১) শিকারপুর সীমান্ত দিয়ে প্রথম অপারেশন করা হয় বাংলাদেশের ভিতরে সাহেবনগর নামক স্থানে। সেখানে পাক-বাহিনী ও রাজাকাররা স্থানীয় মানুষের ঘরবাড়িতে অগ্নিসংযোগ ও পাশবিক অত্যাচার করছিল। এই সংবাদ পেয়ে গভীর রাতে ২ প্লাটুন নিয়ে তাদের উপর আক্রমণ করি। আমাদের আক্রমণে পাক বাহিনীর রাজাকারসহ ২৬ জন নিহত হয়। সেখান থেকে কিছু গোলাবারুদ নিয়ে রাত্রেই সীমান্ত অতিক্রম করে শিকারপুর চলে যাই।

(২) কাজীপুরে পাকবাহিনী কর্তৃক আমাদের ডিফেন্স আক্রমণঃ কাজীপুরে সুবেদার মজিদের নেতৃত্বে আমাদের যে এক প্লাটুন ইপিআর ছিল পাকবাহিনী তাদেরকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলে। এই সংবাদ পেয়ে আমরা আরও ২ প্লাটুন নিয়ে তাদেরকে সাহায্য করার জন্য যাই। সেখানে আমাদের পরবর্তী ২ প্লাটুন পাকবাহিনীর অবস্থানের উল্টা দিক থেকে তাদের উপর তীব্র আক্রমণ করে। পাক-বাহিনীর সাথে এই যুদ্ধে রাজাকার বাহিনীও অংশগ্রহণ করে, কিন্তু আমাদের চতুর্দিক থেকে আক্রমণের মুখেও রাজাকার বাহিনী ও পাকবাহিনী মর্টার থেকে অনবরত গোলা নিক্ষেপ করে। আমাদের সাথে পাকবাহিনীর সারারাত যুদ্ধ হয়। পাকবাহিনী কাজীপুর ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। বহু খানসেনা নিহত হয়। বহু অস্ত্র ও গোলাবারুদ আমরা দখল করি। তাছাড়া বাংলাদেশের ভিতরে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পথে সেতু ও কাঠের পুল নষ্ট করে দেই ও রাজাকারদের পেট্রোলিং পার্টির উপর রেইড করি।

জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে আমাকে শিকারপুর সাবসেক্টর থেকে বনগাঁও সাবসেক্টর কমাণ্ডার নিযুক্ত করা হয়। শিকারপুরের কমাণ্ডার নিযুক্ত হন লেঃ জাহাঙ্গীর সাহেব।

বনগাঁও সাব-সেক্টরে আমার থাকাকালীন সময়ে প্রথম অপারেশন হয় রঘুনাথপুরে। পাকবাহিনীর পেট্রোলিং পার্টির উপর এ্যামবুশ করে ২৫ জন খানসেনাকে হত্যা করা হয় ও তাদের হাতিয়ার নিয়ে আসা হয়। সেই সময়ে এই সংবাদ বাংলাদেশ রেডিও হতে প্রচার করা হয়।

১২শে আগস্ট ধোপাখালী বিওপি'তে পাক বাহিনীর ঘাঁটি আক্রমণ করা হয়। উক্ত আক্রমণে পাকবাহিনী বিওপি ছেড়ে পালিয়ে যায়। আমরা সেখানে ডিফেন্স স্থাপন করি এবং শেষ পর্যন্ত পোটখালী বিওপি আমাদের দখলে থাকে।

৩১শে আগস্ট ধোপাখালী বিওপি থেকে কয়েক মাইল ভিতরে বাঘছড়া থানা হেড কোয়ার্টারে রাজাকার বাহিনীর ডিফেন্স আক্রমণ করি। কিন্তু রাজাকাররা আমাদের সংবাদ পূর্বেই পেয়ে পালিয়ে যায়। আমরা তাদের মালপত্র ও রেশনে অগ্নিসংযোগ করি। তাছাড়া ৪টি সরকারি পাটগুদামেও অগ্নিসংযোগ করি। পথে একজন শান্তি কমিটির সদস্যের বাড়ি থেকে ৪ টি বন্দুকসহ চারজন রাজাকারকে ধরে নিয়ে আসি।

সাক্ষাৎকারঃ মেজর অলীক কুমার গুপ্ত*

কর্নেল মঞ্জুর সাহেব ১১ই অক্টোবর তারিখে বাংলাদেশের ম্যাপ দেখালেন এবং কোথায় কোথায় অপারেশন করতে হবে তা নির্দেশ দিলেন। ১৪ই অক্টোবর কর্নেল মঞ্জুর সাহেব অপারেশনের জন্য ৩৮৫ জন গণবাহিনীর যুবককে তাঁদের সেক্টরে পৌঁছে দেয়ার ভার দিলেন আমার উপরে। এদের নিয়ে বয়রা সাবসেক্টরে এসে মেজর নজমুল হুদার নিকট রিপোর্ট করি। ১৫ই অক্টোবর বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে মুক্তিবাহিনীর অবস্থান ও পাক বাহিনীর অবস্থান পর্যবেক্ষণ করি এবং সিদ্ধান্ত নিই যে, ভারতের মধ্যে না থেকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে থাকাই শ্রেয়। আমি কাশীপুরে হেডকোয়ার্টার স্থাপন করি এবং আমার এলাকা ছিল দক্ষিণ বেনাপোল রোড, বামে মহেশপুর থানা, জীবননগর থানা। ঝিকরগাছা থেকে বামে রাধানগরে আমার মেইন বেইস ছিল। ভারতীয় সীমান্ত থেকে চার মাইল দীর্ঘ পথ গণবাহিনীর সাহায্যে মুক্ত করি এবং সেখানে জার্মান রাষ্ট্রদূত আসেন এবং বাংলাদেশের মন্ত্রী মহোদয়গণও এসে দেখে যেতেন। অক্টোবর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে মধুখালী গ্রামের নিকট এই দলটি পাক বাহিনীর এ্যামবুশে পড়ে যায়। সেখানে ৩ জন আহত হয়। গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে পিছনে চলে গিয়ে কোন রকমে জীবন রক্ষা করি। অক্টোবর মাসের শেষের দিকে পাক বাহিনীর ডিফেন্স দোষদিনাতে সন্ধ্যার দিকে আক্রমণ করি। এই যুদ্ধে গণবাহিনীর ১৫ জন গেরিলা অংশগ্রহণ করেন। এই আক্রমণে ৫টা চাইনিজ রাইফেল ও কিছু হেলমেট এবং খাদ্য দখলে আসে। জনসাধারণের মুখে পরে জানা যায় যে, প্রায় ১০

* ১৯৭১-এর অক্টোবর মাসে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে কমিশনপ্রাপ্ত।

জন খানসেনা নিহত হয়েছিল। মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে ১ জন গেরিলা আহত হন। এই যুদ্ধে সেকেণ্ড কমাণ্ডার ছিলেন আবদুল জলিল (সাবেক ইপিআর)।

অক্টোবরের শেষে ঝিকরগাছার ২ মাইল দূরে শিমুলিয়া সাহেববাড়িতে পাক বাহিনীসহ ২০ জন রাজাকার ঘাঁটি করে অবস্থান করছিল। সেই ঘাঁটি থেকে পেট্রোল ডিউটিতে আসে ১০ জন পাকসেনাসহ রাজাকার। এই দলের উপর আমরা আক্রমণ চালাই এবং ৩ জন খানসেনা, ১ জন বিহারী রাজাকার নিহত হয় এবং একজন রাজাকার আহত ও তিনজন জীবন্ত অবস্থায় ধরা পড়ে। পরে উক্ত তিনজন রাজাকার মুক্তিবাহিনীর সাথে কাজ করে। এই আক্রমণের ফলে পাকসেনারা ঐ মিশন ছেড়ে পালিয়ে যায়। পরে নভেম্বর মাসের দিকে পাকসেনারা ভারী অস্ত্রশস্ত্র পুনরায় ঐ গ্রামে আক্রমণ করে এবং তিন ব্যক্তিকে হত্যা করে ও বাড়ি ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়। পাক সেনারা সাবেক ইপিআর আবদুল জলিল ভ্রমে উক্ত তিনজনেক হত্যা করেছিল। তার পূর্বে উক্ত এলাকা থেকে আমাদের দল চলে যায়।

৩রা নভেম্বর ১২ জন গণবাহিনী ও সাবেকে ইপিআর ৩০ জনকে নিয়ে ভোরের দিকে চৌগাছার বিওপির সামনে এ্যামবুশ পেতে রাখি। সেই সময় উক্ত বিওপি পাকসেনাদের দখলে ছিল। পাকসেনাদের একটা পেট্রোল পার্টির সাথে সংঘর্ষ শুরু হয় সকাল ৯টা থেকে। যখন পেট্রোল পার্টি ধ্বংস হয়ে যায়, তখন তাদের সাহায্যের জন্য উক্ত বি-ওপি ক্যাম্প থেকে বহু পাকসেনা এসে আমাদের দলটিকে ঘিরে ফেলে এবং যুদ্ধ চলতে থাকে। নিরুপায় হয়ে তখন আমি ও আমার দলবল বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করতে থাকি। এই সংবাদ পেয়ে সাবেক মেজর নজমুল হুদা মুক্তিফৌজ ক্যাম্প থেকে যুবকদের নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে আসেন এবং আমাদের সাহায্য করেন। ভারতীয় সৈন্যরা দূর থেকে ৩ ইঞ্চি মর্টার দিয়ে মুক্তিফৌজকে সাহায্য করে। যদিও এ্যামবুশ করে আমাদের ফিরে যাবার ইচ্ছা ছিলো কিন্তু তা সম্ভব না হওয়াতে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। এর ফলে পাকসেনারা উক্ত বিওপি ছেড়ে পালিয়ে যায়। এই যুদ্ধে প্রায় ১৮/১৯ জন মৃত পাকসেনার লাশ নিয়ে যেতে সক্ষম হই। পরে জনসাধারণের আরো প্রায় ২০ জন পাকসেনারা লাশ বিভিন্ন এলাকা থেকে উদ্ধার করে। স্টেনগান, চায়নিজ রাইফেল, এলএমজি ও একটা ছোট অয়ারলেসও উদ্ধার করি। এই যুদ্ধে একজন সাবেক ইপিআর ল্যান্স নায়েক আহত হন। পরে হাত কেটে ফেলে তাকে বাঁচানো হয়।

১২ই নভেম্বর সন্ধ্যার সময় চৌহগাছা চোরামনকাটির মাঝামাঝি রোডে একটি গাড়ীসহ রোডের ব্রীজ উড়িয়ে দিই আমি ও আমার তিনসঙ্গী।

গুলবাগপুর গোয়ালহাট নামক স্থানে পাকসেনারা আমার দলের উপর ঈদের দিন আক্রমণ করে তা দখল করে নেয়। এই যুদ্ধে ৯ জন মুক্তিযোদ্ধা আহত হন এবং ৩ জন গণবাহিনীসহ ৩ জন সাধারণ মানুষও শহীদ হন। জনসাধারণ আহত মুক্তিযোদ্ধাদের নিরাপদ স্থানে নিয়ে যায়। জনসাধারণ সেই সময় এই এলাকাতে সব সময় কাজ করেন মুক্তিবাহিনীর পক্ষে। সেই দিন কর্নেল মঞ্জুর ৬/৭ ঘন্টার মধ্যে উক্ত হৃত এলাকা পুনরুদ্ধার করার হুকুম দেন। আমার আক্রমণকালে পাক বিমান আক্রমণ করে। পরে ভারতীয় সৈনিকের সাহায্যে উক্ত এলাকা পুনরায় দখল করি। এরপর আমি মিত্রবাহিনীর সাথে কাজ করতে থাকি। ভারতীয় বাহিনীর আগে এবং পাক বাহিনীর সামনে থেকে মিত্র বাহিনীকে সাহায্য করি।

২৪শে নভেম্বর গরীবপুর গ্রামে মিত্রবাহিনীর সাথে ট্যাংকযুদ্ধ হয়। সেই সময় পাকিস্তানী ১৪টি ট্যাংক ছিল। এই যুদ্ধে ৫টি ভারতীয় ট্যাংক নষ্ট হয়ে যায়। পাকিস্তানী সমস্ত ট্যাংক নষ্ট হয়ে যায়। ১৪টি ট্যাংকের মধ্যে ৮টিকে ভারতে নিয়ে গিয়ে ছবি তোলা হয়। ২৬শে নভেম্বর চৌগাছা মুক্তিবাহিনীর দখলে আসে।

৩রা ডিসেম্বর আমি কামাল ও তৌফিক সাহেব মিলে নাভারন ও ঝিকরগাছা রোডের মধ্যবর্তী স্থানে একটি জীপগাড়ী উড়িয়ে দিই। ২ জন খানসেনা নিহত হয়।

৭ই ডিসেম্বর যশোর মুক্ত হয়। ৩ ইঞ্চি মর্টার বাহিনী নিয়ে আমি নড়াইল যাই। সেখানে ১৫০ জন পাকসেনা আত্মসমর্পণ করে।

স্বাক্ষরঃ অলীক কুমার গুপ্ত
যশোর সেনানিবাস
২৮-৩-৭৩

সাক্ষাৎকারঃ সুবেদার মেজর তবারক উল্লাহ
২৮-৬-১৯৭৪

সেপ্টেম্বর মাসের ১৬ তারিখ রাত বারটার সময় আমি এবং ক্যাপ্টেন শফিক উল্লাহ এক কোম্পানী মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে বোয়ালিয়া বাজারের কাছে বেলেডাঙ্গার পশ্চিম দিকে পাকবাহিনীর একটি প্রতিরক্ষাব্যূহে আক্রমণ চালাই। চারদিন পর্যন্ত তুমুল লড়াই চলে। এই যুদ্ধে আমাদের পক্ষে সিপাহী মতিয়ুর রহমান, ল্যান্স নায়েক আবুল হাশেম, ল্যান্স নায়েক শফিকউদ্দিন চৌধুরী, শাহাদাতবরণ করেন। কয়েকজন বেসামরিক ব্যক্তিও শাহাদাতবরণ করেন। পাকিস্তানীদের পক্ষেও অনেকে হতাহত হয়। আমাদের একটি কোম্পানীর উপর শত্রুদের ৪টি কোম্পানী আক্রমণ চালায়। ক্যাপ্টেন শফিকউল্লাহ এই যুদ্ধে আহত হন।

সাক্ষাৎকারঃ নায়েক সুবেদার আবদুল মতিন পাটোয়ারী

মুজিবনগর গার্ড অব অনার দেওয়ার পর আমার ক্যাম্পে ফিরে যাই এবং সেখান থেকে আবার যুদ্ধে অংশ নেই। ২০শে মে তারিখে আমি আমার পেট্রোল নিয়ে মুজিবনগরে ছিলাম। খবর পেলাম পাকসেনাদের একটি প্লাটুন বল্লভপুর মিশনারী চার্চে এসেছে লুটতরাজ করতে। আমি আমার প্লাটুনকে ২টি ভাগে ভাগ করে একটিকে নিয়ে আমি নিজে বাগুয়ানে এ্যামবুশ করে থাকি, অপর দলটিকে বল্লভপুর রোড জংশনে বসিয়ে রাখি। বেলা দেড়টার সময় পাকসেনারা ফিরছিল। আমি আক্রমণ করে বসি। প্রায় একঘন্টা যুদ্ধ হয়। পাকবাহিনীর ১৭ জন নিহত ও ৫ জন আহত হয় এবং ১টি গাড়িসহ বহু অস্ত্র উদ্ধার করি।

আমি মুজিবনগরে পাক্কা ঘাঁটি করে থাকতাম। ৩রা জুন তারিখে পাকবাহিনীর ৫০০/৬০০ সৈন্য ভারী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ব্যাপকভাবে আক্রমণ করে বেলা ৪টার সময়। আমাদের মোট সৈন্য সংখ্য ছিল মাত্র ৪০ জন। একটি দল ছিল আমার নেতৃত্বে। অপরটি ছিল নায়েক সুবেদার তফাজ্জল হোসেনের নেতৃত্বে। পাকসেনারা সারিবদ্ধভাবে বাগুয়ানে কিছু প্রস্তুতি রেখে আমাদের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। পাকসেনাদের আক্রমণে আমরা টিকতে ব্যর্থ হই। পিছু হটতে থাকি। এক সময় পাকসেনারা আমাদের ঘাঁটি দখল করে নেয়। আমাদের ঘাঁটি দখলের পর পাকসেনারা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে আমাদের ঘরদুয়ারে আগুন লাগিয়ে দেয় আমরা তা দেখতে পাচ্ছিলাম। আমি পুনরায় কিছু জওয়ান নিয়ে পিছন দিক থেকে আখক্ষেতে বসে সামরিক কায়দায় বড় রকমের আক্রমণের কমাণ্ড দেই। উদ্দেশ্য ছিল এটা বোঝানো যে আমরা বহু সৈন্য আছি। সাথে সাথে এলএমজি ব্রাশ চালাতে থাকি। এতে বহু পাকসেনা খতম হয়। বাকিরা সব পালাতে থাকে। পাকসেনারা পজিশন নেবার সুযোগ পায় না। আমরা আবার ঘাঁটি দখল করে নেই। পাকসেনা খতম হয় ২৮ জন, ২০ জন আহত হয়। আমার পক্ষের কেউ হতাহত হয়নি। তারপর ১৪ই জুন, ২০শে জুন ও ২১শে জুন তারিখে পাকবাহিনীর সাথে আমাদের সম্মুখযুদ্ধ হয়। একদিনের যুদ্ধে আমাদের কোন হতাহত হয়নি। পাকবাহিনী বেশকিছু ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে।

১৭ই জুলাই তারিখের ঘটনা। আমাদের ইনফরমার ছিল ভাদু মণ্ডল। গোপাল নগরে সে পাকসেনাদের সাথে থাকতো। তারা যখন যা চাইতো সব দিতে হতো। ভুাদুমণ্ডল লোক মারফত খবর পাঠায় যে, ২৭শে জুলাই

তারিখে ১০/১৫ জন পাকসেনা তার গরুরগাড়ী করে রেশন নিয়ে মানিকনগরে যাবে নাটোদা থেকে। ভাতুমণ্ডল বলে পাঠায় তার গাড়োয়ান যেন না মরে। আমি ১৫ জন নিয়ে একজন সিভিল গাইডের সহায়তায় অগ্রসর হয়ে বাগুয়ান এবং রতনপুর ঘাটের নিকটে এ্যামবুশ করে বসে থাকি। গাইডও আমাদের সাথে ছিল। ভোর ৬টায় আমরা রেশন নিয়ে যাওয়া পার্টির উপর আক্রমণ করি। যুদ্ধ ১ ঘন্টা স্থায়ী হয়। মানিকনগরে ও নাটোদা হাইস্কুলে পাকবাহিনীর ঘাঁটি ছিল। গোলাগুলির শব্দে দুইদিক থেকে পাকবাহিনীর দুটি পার্টি এসে আমাকে ঘিরে ফেলে। মানিকনগরে অবস্থিত পাকবাহিনীর উপর অপর দল আক্রমণ চালিয়ে পাকবাহিনীকে ব্যস্ত রাখে। আমাদেরকে হ্যাণ্ডস-আপ করতে বলে। আমি বলি, ক্ষমতা থাকে তো এসে ধর। সামনাসামনি গোলাগালি চলছে, ফায়ার করছি আর পিছু হাটছি। আমাদের গাইড পিছনে পড়ে যায় এবং তাকে ধরে ফেলে। ঐ দিন বিকেলে ঐ অঞ্চলের সব লোকজন ডেকে নাটোদা স্কুলে দুহাত বেঁধে সবার সামনে বেয়োনেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তাকে অত্যন্ত নৃশংসভাবে হত্যা করে। পাকবাহিনীরা ঘোষণা করে মুক্তিবাহিনীকে সাহায্য করলে এমনিভাবে শাস্তি দেওয়া হবে। আমরা সবাই মূল ঘাঁটিতে আসতে সমর্থ হই।

২০শে জুলাই থেকে ৩০শে জুলাই পর্যন্ত আমি দল নিয়ে মানিকনগরে পাকবাহিনীর ঘাঁটি আক্রমণ করি। রাতে এই অপারেশনগুলোতে বেসামরিক লোক যারা ছিল তাদের সাহসিকতায় আমি ও আমার অফিসাররা চমকিত হয়েছিলাম। দিনের বেলায় মেহেরপুরে ঢুকে বিভিন্ন লক্ষ্যবস্তুর উপর সার্থক অপারেশন চালিয়ে তারা ভরানদী সাঁতরে ফিরে এসেছে, পাক আর্মির বাঙ্কারে ঢুকে বিভিন্ন গ্রেনেড ছুঁড়ছে। এদের ত্যাগ-সাহসিকতা মনে রাখার মতো। লোকগুলো ছিলঃ (১) মোঃ সারি (২) রবীমণ্ডল, (৩) মফিজ উদ্দিন (৪) রওশন আলী (৫) বরকত আলী (৬) জামান আলী (৭) নায়েক আলী। আরও অনেকের নাম এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না। একেক রাতে ৩/৪ বার করে অপারেশন করেছি। এই কয়েকদিনের অপারেশনে ৭০ পাকসেনা খতম হয়।

৩রা আগস্ট তারিখে পাকসেনারা মানিকগঞ্জ ঘাঁটি ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়। পাকসেনারা মোনাখালী ঘাটে এসে আবার ঘাঁটি গাড়ে। আমরা মানিকগঞ্জ ঘাঁটি দখল করি। বহু মাইন ও অন্যান্য গোলাবারুদ উদ্ধার করি।

১৩রা আগস্ট তারিখে পাকবাহিনীর একটি দল তাদের প্রতিরক্ষা মজবুত করা এবং গ্রেনেডের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কাঁটাতার নিয়ে যাচ্ছিল। আমি আমার পার্টি নিয়ে আক্রমণ করে বেশ কিছু হতাহত করি।

২৪শে আগস্ট তারিখে পাকবাহিনীর একটি কোম্পানী নাটোদা থেকে মুজিবনগরের পথে অগ্রসর হয়। আমি একটি পার্টি নিয়ে বাগুয়ানে এবং অপরটি মানিকনগরে। সকাল দশটার সময় ওরা আমাদের আওতায় চলে আসে। আমরা ফায়ার ওপেন করি। যুদ্ধ প্রায় আড়াই ঘন্টা হয় পাকসেনারা ৯ জন নিহত ও বেশ কিছু আহত হয়ে পিছু হটে। আমাদের একজন এলএমজি ম্যান আহত হয়। যুদ্ধ চলা অবস্থায় ওখানকার ছোট ছোট ছেলেরা গোলাবারুদ মাথায় করে আমাদের সাপ্লাই দিত। অঞ্জলি নামে একজন খৃষ্টান নার্স সব সময় আমাদের সেবা শুশ্রুষা করতো। সে আগে গ্রাম রেকি করে আমাদের খবর দিত। সব সময় প্রথম সারিতে থাকতো।

এরপর ৯নং সেক্টরকে সাহায্য করার জন্য ক্যাপ্টেন এ আর আযম চৌধুরীর নেতৃত্বে একটি কোম্পানী নিয়ে সেপ্টেম্বর মাসে খুলনা যাই। ওখানে ৮/১০ দিন বিভিন্ন অপারেশনে অংশ নেই। সেপ্টেম্বর মাসেই আমি মুজিব নগরে ফিরে আসি। তারপর ৩রা নভেম্বর মানিকনগর, ৬ই নভেম্বর রশিপুর ঘাট, ১২ নভেম্বর মোনাখালী ঘাট, ১৮ই নভেম্বর রশিপুর ঘাটে, ১৯শে নভেম্বর মানিকনগর ঘাটে, ২৬শে নভেম্বর রশিপুর ঘাট, ৩০ নভেম্বর রাজাপুর ঘাট, ১লা ডিসেম্বর রাজাপুর, ৩রা ডিসেম্বর রাজাপুর প্রভৃতি স্থানে আমার নিজের কমান্ডে যুদ্ধ করেছি। তারপর যৌথ অপারেশনে অংশ নেই।

স্বাক্ষারঃ আবঃ মতিন পাটোয়ারী

২১-১০-৭৪

সাক্ষাৎকারঃ ক্যাপ্টেন আবদুল গনি*

৮-১০-৭৯

একটি রেইডঃ ৪ঠা ডিসেম্বর হরিণাকুণ্ড থানার উপর তারা যখন রেইড করে তখন তাদের সাথে আমি ছিলাম। রেইড করার পর তারা যখন সেখানে বসে যায় তখন আমাকে তারা বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসে।

প্রশ্নঃ সেখানে কি নিয়মিত বাহিনী ছিল, না রাজাকার ছিল? কি জন্য রেইড করেছিল?

উত্তরঃ সেখানে কোন নিয়মিত বাহিনী ছিল না। সেখানে ২০/৩০ জন রাজাকার এবং কিছু পুলিশ ছিল। এদের মধ্যে কয়েকজন রাজাকার ধরা পড়েছিল। পুলিশদের ধরা যায়নি, তারা পালিয়ে গিয়েছিল এবং যে কজন রাজাকার ধরা পড়েছে তাদের ফায়ারিং স্কোয়াডে গুলি করে মেরে ফেলা হয়।

প্রশ্নঃ কতক্ষণ গুলি বিনিময় হয়?

উত্তরঃ সেদিন হাটবার ছিল। সন্ধ্যার পর যখন ভেঙ্গে গেছে তখন সাধারণ লোকের মাঝে মিশে গিয়ে পুরো থানাকে ঘিরে ফেলি। কমাণ্ডার প্রাক্তন হাবিলদার আবদুর রহমানের নির্দেশ ছিল তিনি প্রথমে গুলি করলে তারপর চারদিক থেকে গুলি করা শুরু হবে। রাত ৯টার সময় সাধারণ লোকজনও বাইরে ছিল না। তখন আমরা পজিশন নিয়ে ফেলেছিলাম। আমরা সেখানে ৭০ জন ছিলাম। রাত ৯টার সময় কমাণ্ডার প্রথম ফায়ার করেন, তারপর আমরা চারদিক থেকে ফায়ার শুরু করি। প্রায় আধা ঘন্টা এই ফায়ার চলতে থাকে। তারপর আমাদের পক্ষ থেকে যখন অটোমেটিক গান চালানো শুরু হয় তখন তারা আর না পেরে ফায়ার বন্ধ করে যে যেদিকে পেরেছে পালিয়ে গেছে। কিন্তু চারজন রাজাকার আর পালাতে না পেরে আমাদের কাছে ধরা দিয়েছে।

প্রশ্নঃ অটোমেটিক আর্মসের মধ্যে কি কি ছিল আপনাদের কাছে?

উত্তরঃ অটোমেটিক আর্মসের মধ্যে একটা লাইট মেশিনগান এবং কয়েকটা ইন্ডিয়ান এলএমজি ছিল, সেমি অটোমেটিক ছিল, এসএলআর ছিল। রাজাকারদের কাছে শুধু রাইফেল ছিল, অটোমেটিক কিছু পাওয়া যায় নাই।

প্রশ্নঃ থানা কি ক্যাপচার করে ফেলেন?

উত্তরঃ জ্বী হ্যাঁ, পুরো থানাটা ক্যাপচার করে ফেলি। ওদের অস্ত্রাগারে যাই। ভেঙ্গে সব আর্মস এম্যুনিশন আমাদের ওখানে নিয়ে আসা হয়।

প্রশ্নঃ গ্রামের লোকজন আপনাদেরকে খুব সহযোগিতা করেছে?

উত্তরঃ আমাদেরকে পুরো থানার লোকজন খুব সহযোগিতা করেছে। তারা নানা ধরনের তথ্য সংগ্রহ করে- যেমন আর্মিরা কোথায় আছে, রাজাকাররা আর্মিদের সাথে কোথায় যাচ্ছে এই খবর সংগ্রহ করে আমাদের কমাণ্ডার আবদুর রহমানের কাছে গিয়ে জানাতো। কমাণ্ডার সেই মত কাজ করতেন- কবে, কিভাবে, কোথায় রেইড করতে হবে।

---

* প্রকল্প-গৃহীত সাক্ষাৎকার থেকে সংকলিত।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৭। ৯নং সেক্টরে সংঘটিত যুদ্ধের বিবরণ	মেজর (অবঃ) এম এ জলিল রচিত 'সীমাহীন সমর' (১৯৭৪)	১৯৭১

বরিশালের রণাঙ্গন

১০ই এপ্রিল স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে বরিশাল, পটুয়াখালি, ফরিদপুর ও খুলনা এই চারটি জেলার জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে আমাকে সেক্টর কমাণ্ডার ঘোষণা করা হয়। ঘোষণায় আরও উল্লেখ করা হয় যে, যুদ্ধ পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর কমাণ্ডার-ইন-চীফ কর্নেল এম এ জি ওসমানীর তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশকে ৬ টি সেক্টরে ভাগ করা হয়েছে। মিঃ তাজউদ্দিন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী ও সৈয়দ নজরুল ইসলামকে অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট করে চার সদস্যের একটি অস্থায়ী সরকার 'মুজিব নগরে' গঠন করার কথাও স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে ঘোষণা করা হয়। ব্যাপার যাই হোক না কেন, এই ঘোষণার ফলে বাংলার জনগণ ও মুক্তিযোদ্ধারা সংগ্রাম চালিয়ে যাবার জন্য অন্ততঃ একটা ভিত খুঁজে পেল। শুরু হলো পাকিস্তানী নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ। ইতিমধ্যে ১৭ই এপ্রিল একজন পাকিস্তানী গোয়েন্দা বরিশালে গ্রেফতার হয়। আমাদের অবস্থানগুলো ও প্রস্তুতির খবরাখবর সংগ্রহ করার জন্য পাক-সামরিক বাহিনীর লেঃ কর্নেল শামস উক্ত গোয়েন্দাকে খুলনা থেকে বরিশালে পাঠায়। উক্ত গোয়েন্দাকে যে পুরস্কার দিতে পেরেছিলাম সেটা হলো কঠিন মৃত্যু। বরিশাল স্টেডিয়ামে জনতার সামনে প্রকাশ্যে তাকে গুলি করে হত্যা করা হল। তার অপরাধ ছিল ক্ষমার অযোগ্য।

বোধ হয় ১৭ই এপ্রিলের ঘটনার ফলশ্রুতিস্বরুপ পাক-বিমান বাহিনীর দু'খানা স্যাবর-জেট ফাইটারকে বরিশালের আকাশ দেখা গেল। এই প্রথমবারের মতো হিংস্র সামরিক জান্তা আমাদের যুদ্ধ প্রস্তুতির উপর আঘাত হানার সাহস পেল। ওই জঙ্গী বিমানগুলোকে ঠেকাবার মতো আমাদের হাতে কিছু ছিল না। তবুও আমাদের সাহসী মুক্তিযোদ্ধারা সামান্য রাইফেল দিয়ে গুলি করার অনেক চেষ্টা করলো। শহরের বিভিন্ন বেসামরিক অবস্থানের ওপর নির্বিচারে গোলাবর্ষণ করলো। বেলস পার্কের উত্তর দিকে ইংরেজ আমলের একটি উঁচু কাঠের ঘরে হেডকোয়ার্টার। এই ঘর ও বেলস পার্কের উপর প্রচণ্ড গোলা এসে পড়তে লাগলো। এই পার্কের মধ্যেই ছেলেরা ট্রেনিং নিত। ছেলেরা ট্রেঞ্চের ভিতরে ঢুকে আত্মরক্ষা করলো। দু'একটি ছোটখাট আঘাত ছাড়া আমাদের তেমন বিশেষ কোন ক্ষতি হয়নি। জঙ্গী বিমান দুটো যখন ঘুরপাক খেয়ে গুলিবর্ষণ করার জন্য নিচে নেমে আসে তখন বেসামরিক লোকজন বাইরে লাফিয়ে এসে মজা দেখতে থাকে। এই সরল মানুষগুলো এর আগে কখনও ভাবতে পারেনি যে, ওই সুন্দর সুন্দর বিমানগুলো এমন নির্মমভাবে দংশন করতে পারে। অজ্ঞতা ও সরলতার জন্য ওরা অনেক ভুগছে। বেসামরিক ডাক্তাররা ভয়ে এদিক ওদিক ছুটাছুটি করতে লাগলো। মুহূর্তের ভেতরে গ্রামের দিকে ছুটে চললো মানুষের কাফেলা। ভয়ে সব ফেলে শহর খালি করে উন্মাদের মত দৌড়াতে লাগলো শহরতলীর দিকে। কি মর্মান্তিক দৃশ্য।

১৮ই এপ্রিল রাত্রে বিষাদের কালোছায়া শহরের সারা আকাশটা গুমোট করে ফেললো। শহরের রাস্তাগুলো জনমানবশূন্য। ভীষণ নীরব। কোথাও জীবনের স্পন্দন নেই। যেন ঘুমন্ত প্রেতপুরী। রাতে ভয়ানক অস্বস্তিবোধ করলাম। মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে একটা বেশ বড় বাহিনী তৈরী করলাম। কিন্তু সামান্য কিছু রাইফেল ছাড়া আমার কোন ভারী অস্ত্রপাতি ছিল না। প্রথমাবস্থায় বরিশালের পুলিশ অস্ত্রাগার ভেঙ্গে কিছু রাইফেল জোগাড় করেছিলাম। এসব হালকা অস্ত্র দিয়ে শুধু আত্মরক্ষা করা চলে। যা হোক, এপ্রিল মাসের ২২ তারিখে মিঃ মঞ্জু সুন্দরবনের গোপন পথ দিয়ে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে ভারত হতে কিছু অস্ত্রপাতি নিয়ে এলেন। তিনি জানালেন যে, আরো ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমাকে গিয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনীর কাছ থেকে ওগুলো নিয়ে

আসতে হবে। সংবাদটা শুনে খুবই উত্তেজিত হয়ে উঠলাম। এই সুযোগে সুন্দরবন, বঙ্গোপসাগর হয়ে ভারত থেকে অস্ত্র নিয়ে আসা সম্ভব হবে। এই দুর্যোগময় মুহূর্তেও আমার ছোট্ট মনটি অপার উৎসাহে চোখ ফাঁকি দিয়ে অস্ত্র নিয়ে আসবো। লেফটেন্যান্ট মেহেদী, লেঃ জিয়া এবং লেঃ নাসেরকে যথাক্রমে পটুয়াখালী, বরিশাল ও খুলনায় যুদ্ধ চালিয়ে যাবার নির্দেশ দিয়ে ক্যাপ্টেন হুদাকে সাথে নিয়ে ভারত রওনা হলাম।

গুপ্ত পথে যাত্রা

সুন্দরবন বাংলাদেশের বিখ্যাত অরণ্যানি। এই সুন্দরবনের গোপন পথ ধরেই আমার ভারত যাত্রা শুরু হলো। রয়েল বেঙ্গল টাইগার, চিতাবাঘ, হরিণ ও অজগরে সুন্দরবন ভরপুর। জানা-অজানা অনেক শংকা ও বিপদের ঝুঁকি দিয়ে ছোট একটি লঞ্চ, পথের জন্য সপ্তাহের কিছু রেশন ও অন্যান্য জিনিসপত্র আমরা যাত্রা শুরু করলাম। সবাই মিলে লঞ্চে আমরা বিশজন নাবিক ছিলাম। এদের মধ্যে দু'জন প্রকৃত যুদ্ধ করার মত। পনের থেকে বিশের মধ্যে এদের বয়স। আগে সেনাবাহিনীতে ছিল। নাম সিদ্দিক ও জববার। আমাদের বলা হয়েছিল সুন্দরবনের চারপাশে পাকিস্তানী হানাদাররা 'গানবোট' নিয়ে পাহারা দিচ্ছে। আর বাংলাদেশের নিরীহ গ্রামবাসীদের উপর বর্বরের মতো নির্বিচারে গোলাবষর্ণ করে ভয়ানক সন্ত্রাসের সৃষ্টি করছে। সন্ধ্যার দিকে অনেক দূরে 'পশুর' ও শিপ্সা' নদীর মোহনায় হঠাৎ করে একটা গানবোট চোখে পড়লো। এই বিরাট নদী দুটো অতিক্রম করে আমাদের নিরাপদ জায়গায় যেতে হবে। সামনেই দিগন্তবিস্তৃত বঙ্গোপসাগর। 'পশুর ও 'শিপ্সা' এই বঙ্গোপসাগরে গিয়ে পড়েছে। অন্ধকারে বিশাল জলরাশির দৃশ্য ভয়ংকর ও ভীতিপ্রদ। একটা প্রেতপুরীর মতো। দলের অধিনায়ক হিসেবে আসন্ন বিপদের ভয়কে চেপে গিয়ে আত্মবিশ্বাসকে ঘা দিয়ে চাংগা করে তুললাম। আমাদের লঞ্চের প্রধান পাইলট কিছুদিন আগেও একজন কুখ্যাত চোরাচালানী ছিল। জংগলের সব গোপন রাস্তা তার নখদর্পণে। তাকে বললাম যদি কোন বিকল্প পথ থেকে থাকে তাহলে লঞ্চের গতি সেই দিকেই ঘোরাতে। সে আমার আদেশ মানলো। আমি আত্মবিশ্বাস ফিরে পেলাম। পরদিন ভারতের সীমান্তবর্তী চৌকি 'পারগোমতী' এসে পৌঁছলাম। ভারতের সীমান্তরক্ষীরা আগেই আমাদের আসার খবর পেয়েছিল। তারা আমাদের আসার বৈধতা পরীক্ষা করে সামনে এগুবার অনুমতি দিল।

২৪শে এপ্রিল ভোরে 'পারগোমতি'র একটা জায়গায় ভারতীয় সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনীর ইন্সপেক্টর মিঃ পি কে ঘোষ আমাদেরকে বিদায় সম্ভাষণ জানালেন এবং অগ্রবর্তী ঘাঁটিতে যোগাযোগের পর ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনীর সতর্ক পাহারায় ক্যাপ্টেন হুদা ও আমাকে সামনে এগুবার অনুমতি দিলেন। এই সময় আমরা 'হিংগুলগঞ্জ' নামক অপর একটি ভারতীয় সীমান্ত চৌকির দিকে অগ্রসর হচ্ছিলাম। সিদ্দিকসহ লঞ্চের অন্যান্য সাথীদের লঞ্চসহ এখানেই ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনীর তত্ত্বাবধানে রেখে গেলাম।

নিরাপদ স্থানে পৌঁছার জন্য ভারতের সীমান্ত ধরে আমরা এগুতে লাগলাম। কারণ, নদীর ওপারেই পাকিস্তানী হানাদাররা ওঁৎ পেতে বসেছিল। ওপারের দূরত্ব এক হাজার গজের বেশী নয়। বর্বর পাকিস্তানী হানাদারদের মেশিনগানগুলো যে কোন সময় গর্জে উঠতে পারে। এই ভয়ে আমরা সতর্ক ও সচেতন ছিলাম। দেখতে পেলাম ওপারে পাকিস্তানী সৈন্যরা ট্রিগারে হাত দিয়ে আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। নদীর ঢেউগুলো স্পীডবোটের কাঠের দেহটাকে হাপরের মতে পিটাচ্ছিল। ভয় হলো ওর দেহটা না টুকরো টুকরো হয়ে যায়।

ঢেউয়ের বুক চিরে ক্ষুদে দৈত্যের মতো স্পীডবোটটা আমাদের নিয়ে দ্রুতগতিতে ছুটে চললো গন্তব্যস্থানের দিকে। মুখ ঘুরাতেই সামনে দেখতে পেলাম নদীর তীর বরাবর ভারতীয় সীমান্তে বেশ বড় বড় কতকগুলো বাড়ি। উপর দিকটা লাল, এমন কতকগুলো সেনানিবাস এই বাড়িগুলো চারদিক দিয়ে ঘিরে রেখেছে। বহু আকাংক্ষিত স্থানে নিরাপদে পৌঁছাতে পেরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লাম। নতুন করে ইস্পাত কঠিন সংকল্প ও শক্তি সঞ্চয়

করলাম। ওই দিনই অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ফিরে পাকিস্তানী পশুগুলোর উপর বর্বরতার সমুচিত জবাব দেবার জন্য মনটা আমার কঠিন হয়ে উঠলো। হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধা আমার নিরাপদ প্রত্যাবর্তনের জন্য অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছিল। যাতে করে সাড়ে সাত কোটি অগ্নিদগ্ধ আত্মার শান্তির জন্য হিংস্র জানোয়ারদের উপর চরম আঘাত হানা যায়।

আমরা হিংগুলগঞ্জে নামলাম এবং সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনীর অধিনায়ক ক্যাপ্টেন পান্ডের অফিসে হেঁটে গেলাম। তিনি তাঁর অফিসে আমাদের স্বাগত জানাবার জন্য প্রতীক্ষা করছিলেন। ক্যাপ্টেন পান্ডে সুঠামদেহী, সুন্দর ও বেশ লম্বা। অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে স্বাগত জানালেন। আমি যা আশা করেছিলাম তার চাইতে বেশী।

এক কাপ গরম কফির পর আমাকে আবার এখনই ছুটতে হবে প্রথমে হাসনাবাদ, পরে ব্যারাকপুর। প্রথম ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক মিঃ মুখার্জী সেখানে আমাদের জন্য অপেক্ষায় ছিলেন। ১৯৭৪ সালের দেশ ভাগের সময় ক্যাপ্টেন পান্ডে শরণার্থী হয়ে ভারত চলে আসেন। আমাকে স্বাগত জানাতে পেরে তিনি খুব আনন্দবোধ করলেন। তার চোখের কোণে আশা ও প্রত্যয়ের ছাপ দেখলাম।

আমাদের অনেক রাস্তা যেতে হবে। সুতরাং সময় নষ্ট না করে ওদের সেনাবাহিনীর পাহারায় আমরা তিনচাকার একটা গাড়ীতে চেপে পড়লাম। এই গাড়ীটির বন্দোবস্ত করেছিলেন মিঃ পান্ডে। তিনি হাসনাবাদে আমাদের আগমন বার্তা অনেক আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন। সহকারী অধিনায়ক ক্যাপ্টেন বিশ্রাম সিং সেখানে আমাদের জন্য অপেক্ষায় ছিলেন।

হিংগুলগঞ্জ থেকে হাসনাবাদের দূরত্ব ১২ মাইল। কিন্তু মাঝপথে আমাদের দুটো খেয়া পার হতে হবে। এই তিনচাকা গাড়ীটা দেখতে বেশ অদ্ভুত লাগে। এটার নাম টেম্পো।

বেশ কষ্টকর ভ্রমণের পর আমরা হাসনাবাদ পৌঁছে গেলাম। গণপরিষদ সদস্য মিঃ নূরুল ইসলাম মঞ্জুর কাছ থেকে ক্যাপ্টেন বিশ্রাম সিং আমার সম্বন্ধে অনেক কথা আগেই শুনেছেন। মিঃ মঞ্জুর সাথে আগে থেকেই এদের জানাশুনা হয়েছিল। ক্যাপ্টেন সিং কোমল হৃদয়ের অধিকারী, সুন্দর ব্যক্তিত্বসপন্ন মানুষ। আমাদের সবার কাছেই খুব প্রাণখোলা মনে হলো। সামনে এসে মিসেস সিংও আমাদের খোশ আমদেদ জানালেন। এই ভদ্রমহিলা আর এক মধুর ব্যক্তিত্ব। দীর্ঘাংগী, সুন্দরী। তারা আমাদের সাথে অতি পরিচিত বন্ধুর মত ব্যবহার করলেন। বেশ কয়েক রকম সুস্বাদু খাবার খাওয়ার পর আমরা ব্যারাকপুর যাত্রা করলাম। এখান থেকে ব্যরারাকপুর প্রায় সত্তর মাইল সামনে। এবার স্বয়ং ক্যাপ্টেন ক্যাপ্টেন বিশ্রাম সিং-এর পাহারায় রওনা হলাম। হঠাৎ করে ঝড় ও অবিরাম বর্ষণ শুরু হলো। কিন্তু সামরিক গাড়ীগুলোর আশ্রয় পেয়ে কতটা নিরাপদ হলাম। দীর্ঘ দু’ঘন্টা ভ্রমণের পর গাড়ীটা একটা দালানের কাছে থামলো। ওর গায়ে লেখা ছিল ‘অফিসার মেস’, ৭২নং বিএসএফ (বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সে)। এটাই আমাদের সামরিক গন্তব্য স্থান। বৃষ্টি থেমে গিয়ে আকাশে তারাগুলো উঁকি মারলো। বাইরে কিছুক্ষণ কাটানোর পর আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো ওদের অফিসার মেসে। আমাদের ৭২ নং বিএসএফ অফিসার মেসে। পথের ক্লান্তিতে বিশ্রাম নিতে ইচ্ছা করলাম। সুতরাং শিগগিরই পানীয় এলো। সঙ্গে সঙ্গে উল্লাসের ধ্বনি ছড়িয়ে এক ঝলক হাসি মুখে নিয়ে উপস্থিত হলেন একজন নতুন যুবক। ইনি হচ্ছেন ক্যাপ্টেন সরকার। ভাই ও বন্ধুর চেয়েও বেশী অমায়িক ব্যবহার পেয়েছিলাম এই ভদ্রলোক ও তার স্ত্রীর কাছ থেকে। পরে আমরা আত্মীয়র চাইতে বেশী আপন হয়েছিলাম। এই ৭২ বিএসএফ বাহিনীর এডজুট্যান্ট ছিলেন তিনি। মিত্রবাহিনীর বন্ধুদের উল্লাসের ধ্বনিতে আমি স্বস্তি অনুভব করতে লাগলাম। বাস্তবিক পক্ষে আমরা খুব সুখে ছিলাম। এই সময় অধিনায়ক মিঃ মুখার্জী এসে পৌঁছালেন। অধিনায়কের সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দেয়া হলো। বয়সী লোক। ধূসর চুল, মুখাবয়বে অভিজ্ঞতার ছাপ। আমরা খুব আস্তে আস্তে কথা বললাম।

ভেতরটা তার বড্ড নরম, বড্ড কোমল। পরবর্তি পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধে যে সফলতা এসেছে সেটা সম্ভব হয়েছিল তার সুষ্ঠ নির্দেশনা ও ব্যক্তিত্বের জন্য। তাকে ভুলব না।

সুন্দরবনে প্রেতাত্মা

কোন কোন লোকের কতকগুলো চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন আমি দেখেছি যখনই তারা তাদের ইপ্সিত কোন কিছু সমাধা করতে ব্যর্থ হয়েছে, তখনই বশ্যতা স্বীকার বা মাথা নোয়াবার পরিবর্তে ওই কাজটাকে সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করার জন্য দ্বিগুন উৎসাহে বার বার চেষ্টা করেছে। নিরাশ হয়নি বা আশা ছেড়ে দেয়নি। এইসব লোকদের আমি ঈর্ষা করতাম, তাদের পদাংক অনুসরণ করার জন্য স্থিরপ্রতিজ্ঞ হতাম। একবার দৃঢ় আত্মপ্রত্যায়ে বলীয়ান হলে পরাজয়ের গ্লানিটুকু অকিঞ্চিতকর মনে হয়। বাংলাদেশের সীমান্ত অতিক্রম করে যখন আমি ভারতে আসি, তখন মুক্তিসংগ্রাম চলাকালে এ রকম একটা অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিলাম। শেষবারের মতো আমি ৭২নং ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনীর অধিনায়ক মিঃ মুখার্জীর বাসভবনে থামলাম। অস্ত্রশস্ত্র যোগাতে তিনি আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। শৈভোজের পর তিনি আমাদের গাড়ীতে করে কোলকাতায় নিয়ে গিয়ে তাঁর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা নিরাপত্তা বাহিনীর ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল মিঃ মজুমদারের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়ে তাঁকে জানালেন যে, অধিনায়ক হিসেবে মুক্তি সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে দেশের জন্য আমি অনেক কাজ করতে পারবো। আমার কি কি অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োজন মিঃ মজুমদারকে জানালাম। তিনি বেশ ধৈর্যের সাথে কথাগুলো শুনে আমাকে আশ্বাস দিয়ে ভদ্রভাবে বললেন যে, তার সামর্থ্যমত প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র যুগিয়ে দিতে চেষ্টার ত্রুটি করবেন না। মিঃ মজুমদারের ব্যবহারে মুগ্ধ হলাম। বেশী আশ্চর্য হলাম তার সুন্দর ভদ্রতাবোধ দেখে এবং আশ্বাস বাণী শুনে।

ওই দিনই সন্ধ্যায় কোলকাতার আসাম হাউজে নিরাপত্তা বাহিনীর সর্বাধিনায়ক মিঃ রুস্তমজীর সাথে সাক্ষাৎ করতে হলো। মিঃ মুখার্জীকে নিয়ে তাঁর সাথে দেখা করলাম। আমার প্রতি যে আন্তরিকতা ও ভদ্রতা দেখিয়ে তিনি আমাকে সাদরে গ্রহন করেছিলেন তাতে সত্যিই মুগ্ধ হয়েছিলাম। বেশ আকর্ষণীয় চেহারার অধিকারী সিনিয়র অফিসার। তার সাথে কথাবার্তায় আমার দৃঢ় বিশ্বাস হলো যে, বেশ অল্পদিনের ভেতরেই আমরা অস্ত্রশস্ত্র পেয়ে যাব। অস্ত্র যোগাড় করাটাই আমার আসল উদ্দেশ্য। আমার চলাফেরার সময় মিঃ মুখার্জী ও তার অফিসের কর্মচারীরা আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। তাদের ব্যবহার অত্যন্ত অমায়িক ও বন্ধুসুলভ।

১৯৭১ সালের ২৪শে এপ্রিল মিঃ মুখার্জির গাড়ীতে করে আমাকে মেজর উসমানের কাছে নিয়ে গেলেন। তিনি মুক্তিসংগ্রামের আর একজন অধিনায়ক। পাক দখলদার বাহিনীর সাথে তাঁর ক্ষুদ্র শক্তি নিয়ে পর পর কয়েকটা যুদ্ধ করে উত্তর বাংলার পট্রাপোলে তিনি ঘাঁটি গেড়েছেন। মেজর উসমান পাক আমলে ইপিআর-এ চাকরি করতেন। তিনি অনেক হালকা অস্ত্রশস্ত্র যোগাড় করে রেখেছিলেন তার ঘাঁটিতে। প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র জমা দেখে আমার লোভ হলো। কারণ, পৃথিবীর যে কোন জিনিসের চাইতে এই প্রয়োজনের সময় যুদ্ধক্ষেত্রে একজন সৈনিকের কাছে একটি মাত্র রাইফেল সবচেয়ে বেশী মূল্যবান। কেননা, অস্ত্র ছাড়া একজন সৈনিকের গর্ব ভূলুণ্ঠিত হতে বাধ্য। যাহোক অনেক কষ্টে অনেক বলা-কওয়ার পর মেজর উসমানকে বুঝতে সক্ষম হলাম যে আমিও তাঁর মত দেশের জন্য যুদ্ধ করতে যাচ্ছি। কিছুটা অনিচ্ছা সত্ত্বেও মেজর উসমান রাজী হলেন। অন্ধকারের ভিতর আশার আলো দেখতে পেলাম। সমস্ত কৃতিত্বই অধিনায়ক মিঃ মুখার্জীর। তিনি নিজে মেজর উসমানকে ব্যাপারটা গুরুত্ব বুঝিয়ে রাজী করিয়েছিলেন। সুতরাং এক ট্রাক বোঝাই হালকা অস্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম নিয়ে আমি হাসনাবাদ ফিরে এলাম। এখানে এগুলো লঞ্চে বোঝাই করার বন্দোবস্ত করতে হবে। মেজর উসমানের সাথে আলাপ-আলোচনার সময় আমার সহকারী ক্যাপ্টেন হুদা বেশ ধৈর্য ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেল। তার উপরে প্রশাসনিক দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে আমি মিঃ মুখার্জীর সাথে ফোর্ট উইলিয়াম ও পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের সদর দপ্তরে রওয়ানা হয়ে গেলাম।

প্রথমে ইস্টার্ন কমান্ডের ইনটেলিজেন্স অফিসার কর্নেল খেরার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। তিনি আমাকে অনেক প্রশ্ন করলেনঃ পাকিস্তান সামরিক বাহিনীতে থাকাকালীন আমি কোথায় কোথায় ছিলাম। কি কি করেছি ইত্যাদি। তিনি যা প্রশ্ন করলেন সবগুলোরই উত্তর দিতে হলো আমাকে। একটা লোক তাঁর কানে কানে কি বলতেই আমাকে পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের সদর দপ্তরে নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানে পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের সর্বাধিনায়ক লেঃ জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার সাক্ষাৎ পেলাম। তাঁর স্মিত হাসি ও আন্তরিক ভদ্রতা আমাদের ভেতর 'পদের' বাধা মুছে ফেললো। আমার মনে ভরসা এলো। তাই কোন সংশয় না করে বা কোন কথা গোপন না করে তার কাছে মনের কথা সব কিছু খুলে বললাম। এর ফলে আমার উদ্দেশ্য পুরোপুরি সফল হলো। একটা মানচিত্র তুলে ধরে বাংলাদেশের কোথায় আমার গেরিলা ঘাঁটি আছে তাঁকে দেখালাম। দেখে মৃদু হাসলেন এবং বললেন, খুব ভাল। সাথে কর্নেল খেরাকে নির্দেশ দিলেন আমাকে প্রয়োজনীয় সব রকম সাহায্য করতে। এখানে কর্নেল খেরার সাথে আমাকে পুরো তিনটা দিন থাকতে হয়। সামরিক বাহিনীতে অন্যান্য গোয়েন্দা অফিসারের মত তাঁর অনুসন্ধিৎসু মনটা আমার সম্বন্ধে খুব উৎসুক হয়ে উঠলো। বিশেষ গোয়েন্দা বিভাগের লোক হিসেবে খুব সতর্কতার সাথে কথা বললেন, নানা রকম প্রশ্ন করে নিশ্চিত হতে চাইলেন যে, আমি সত্যিকারের মুক্তিযোদ্ধা কিনা। আমার পরিকল্পিত কাজের বিলম্ব হওয়াতে এই কয়টা দিন আমি ভয়ানক অস্থিরতার ভেতর কটিয়েছিলাম। যাহোক, আমর বিরক্তি সত্ত্বেও তাঁর ধৈর্য, বুদ্ধিমত্তা ও দেশের জন্য নিরাপত্তা বোধের আন্তরিক প্রশংসা না করে পারছি না। এখানেই তার কাছে প্রথম শুনলাম, ২৫শে এপ্রিল পাকিস্তানী দস্যুদের হাতে বরিশাল-ফরিদপুরের পতন হয়েছে। হতাশায় মনটা ভেঙ্গে পড়লো। এই জিলাগুলিকে রক্ষা করার পূর্ব পরিকল্পনা আমার সাময়িকভাবে ব্যাহত হওয়া সত্ত্বেও কঠিন সংকল্প নিলাম যে, যেভাবেই হোক এইসব অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতেই হবে। অস্ত্র তুলে দিতে হবে মুক্তিসংগ্রামীদের হাতে। আমার আশায় অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে ওরা। আমার বিলম্ব হবার আরও একটা কারণ হলোঃ সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনীর ঊর্ধ্বতন কতৃপক্ষের কাছ থেকে খবর পেয়েছিলাম যে, কর্নেল এম এ জি ওসমানী যেভাবেই হোক আমার সাথে কোলকাতায় সাক্ষাৎ করতে চান।

৫ই মে পর্যন্ত আমি তাঁর অপেক্ষায় ছিলাম। কিন্তু তাঁর ফিরে আসার কোন লক্ষণই দেখলাম না। কেউ বলতে পারলো না কখন তিনি ফিরে আসবেন। তিনি তখন সীমান্তবর্তী অন্যান্য সেক্টর কমাণ্ডারদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য কঠোর চেষ্টা করছিলেন। এই বিলম্বে ভয়ানক চিন্তান্বিত হয়ে স্থির করলাম আরদ্ধ কাজ সমাধা করার জন্য আমাকে এখনই রওয়ানা হয়ে যেতে হবে। ঠিক এই সময় মিঃ নূরুল ইসলাম মঞ্জু, লেঃ নাসের ও ক্যাপ্টেন হুদা পরিবার-পরিজন নিয়ে হাসনাবাদে পৌছলো। বরিশালের পতন হওয়াতে তারা চলে এসেছে।

ক্যাপ্টেন হুদাকে নির্দেশ দিলাম যে, যখন আমি বাংলাদেশের অভ্যন্তরে থাকবো, তখন যেন বাহকেরমাধ্যমে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। পরিস্থিতি অনুকূল মনে হলে সরবরাহ ব্যবস্থা যেন অব্যাহত রাখে। আমাদের ক্যাম্পের দিকেও লক্ষ্য রাখতে বললাম। এই ক্যাম্পে মিঃ মঞ্জু, লেঃ নাসের ও ক্যাপ্টেন হুদার পরিবার-পরিজনও থাকতো।

সবাই মিলে মোট চল্লিশজন লোক দুটো লঞ্চে করে যাত্রা করলাম। আমাদের ভেতর চারজন নিয়মিত সেনাবাহিনীর লোক ছিল। বাকী সব ছাত্র। আমাদের গন্তব্যস্থানের রাস্তাঘাট আমার নিজেরও জানা ছিল না। লঞ্চে এরকম একটা দুঃসাহসিক যাত্রায় মোটেই ভরসা পাচ্ছিলাম না। যে কোন সময় বিপর্যয় আসতে পারে। যেহেতু যাওয়ার পথে শত্রুরা চারদিকে ওঁৎ পেতে বসেছিল, আমরা সবাই লঞ্চের পাইলটের উপর নির্ভর করলাম। পাইলটরা তাদের অনেক বছরে অভিজ্ঞতার বড়াই করে আশ্বাস দিল যে, তারা আমাদের নিরাপদে পৌছে দেবে। ওদের দুঃসাহসিক কথাবার্তা ও আত্মবিশ্বাসের জোর দেখে স্বভাবতই আমি আদেশ করা থেকে বিরত রইলাম, যেহেতু যাওয়ার প্রকৃত রাস্তাঘাট সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ অপরিচিত। রাস্তা সম্পর্কে আমার ম্যাপ দেখা অস্পষ্ট ধারণা ছিল মাত্র। তৎসত্ত্বেও একটা সংক্ষিপ্ত 'অপারেশন প্ল্যান' তৈরী' করলাম। প্রাথমিক পর্যায়ে

বুঝিয়ে বললাম কিভাবে দুটো লঞ্চে অস্ত্রশস্ত্র ভাগাভাগি করে নিতে হবে এবং শত্রুর সাক্ষাৎ পেলে নাগরিকরা কি করবে।

যাত্র শুরু করার হুকুম দিলাম। একটা লঞ্চে মিঃ মঞ্জু, লেঃ নাসের এবং আরও কয়েকজন লোক আগে আগে চললো। আমার লঞ্চটা আগেরটার পিছু পিছু রওয়ানা হলো। কারণ, আমার লঞ্চে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ও অনেক অস্ত্রশস্ত্র বোঝাই ছিল। সামনের লঞ্চটায় মিঃ মঞ্জু ও লেঃ নাসেরকে অধিনায়কের দায়িত্ব পালন করার ভারদিলাম। পথের নিরাপত্তা সম্বন্ধে তাঁরা দু'জনেই বেশ আশ্বস্ত ছিলেন। কারণ মাত্র দু'দিন আগেই তাঁরা এই পথে হাসনাবাদ এসেছেন। ভারতের সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনীর পেট্রোল বোট 'চিত্রাঙ্গদা' আমাদেরকে শামশেরনগর পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেল। এখান থেকেই আমরা যাত্রা শুরু করবো। শামশেরনগর ভারতের শেষ সীমান্ত ঘাঁটি। রাত ৯টা। শুরু হলো যাত্রা। আশা-নিরাশার দোদুল দোলায় সারা দেহ-মনে চাপা উত্তেজনা। যাত্রার লগ্নে দূরে বহু দূরে দেখতে পেলাম গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি ছাড়াও রাত্রের গুমোট অন্ধকার। গত কয়েক দিনের ক্লান্তিতে আমার চোখ দুটো জড়িয়ে এলো। ঘুম পেল আমার। ইঞ্জিনের কর্কশ শব্দের মাঝেও আমি গভীর ঘুমে গা এলিয়েদিলাম। হঠাৎ একটা ধাক্কা খেয়ে ঘুম থেকে লাফিয়ে উঠে দেখি কে যেন চাপা গলায় ডাকছেঃ 'গানবোট, গানবোট স্যার'।

হ্যাঁ, সত্যিই তো গানবেট। ভূত দেখার মত উপরতলার ক্যাবিন থেকে ঝড়ের বেগে চীনা 'কার্বাইন'টা' হাতে নিয়ে বেরিয়ে এলাম। ইঞ্জিন কক্ষে ঢোকা মাত্রই দু'দিক থেকে প্রচণ্ড সার্চলাইটের আলো আর মেশিনগানের গুলি আসতে লাগলো। ভেতরটা আমার অসম্ভব রকমের ঝাঁকুনি দিয়ে উঠলো। বুঝতে পারলাম, পাকিস্তানী গানবোট ওঁৎ পেতে আমাদের ঘিরে ফেলেছে। রাতটা ভয়ানক বিক্ষুব্ধ। ঝড়ের দাপাদাপি। তার উপর চারদিক সূচীভেদ্য অন্ধকার আর মেশিনগানের অবিরাম গুলিবর্ষণ। সার্চলাইট দিয়ে এই বৃষ্টির মধ্যে হানাদাররা তন্নতন্ন করে আমাদেরকে খোঁজ করতে লাগলো। একটা গুলি এসে লঞ্চের পিছন দিকটায় আঘাত করলো। শত্রুপক্ষকে বিভ্রান্ত করার জন্য আমার সাথের চার জন্য সৈনিক সিদ্দিক, হাবিলদার জববার মোখছেদ ও ইউসুফকে প্রথমে রাইফেলের গুলি করতে বললাম। যেন শত্রুপক্ষ মনে করে আমাদের শক্তি খুব কম। আশ্চর্যজনকভাবে আমার এই পরিকল্পনাটা কাজে এলো। দেখতে পেলাম আমাদের বাঁ দিকের গানবোটটা পুরো সার্চলাইট জ্বালিয়ে বৃষ্টি ও বিক্ষিপ্ত ঢেউগুলোর ভেতর দিয়ে এগিয়ে আসছে। আমাদের লঞ্চটার পিছন দিকটায় আরও কয়েকটি গুলি এসে লাগলো। বাইরে প্রবল বৃষ্টিপাত ও বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দে গুলির আওয়াজ অস্পষ্টভাবে আসছিল। সার্চলাইটের আলোকিত পথটুকুই শুধু চোখে পড়লো। পৃথিবীর আর সব কিছুই দৃষ্টির বাইরে। কোন পথই খুঁজে পাচ্ছিলাম না। সমস্ত ব্যাপারটা এলোমেলো হওয়া সত্ত্বেও অল্প সময়ের ভেতর পাল্টা আক্রমণ করার প্রস্তুতি নিলাম। ইতিমধ্যে যে গানবোট আমাদের দিকে এগিয়ে আসছিল। সেটা প্রায় লঞ্চের কাছাকাছি এসে গেল। বলতে ভুলে গিয়েছি যে, আমাদের লঞ্চটা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। কিন্তু এটা নদীর তীরে, না মাঝখানে অন্ধকারে ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না।

দু'জনকে মেশিনগান, দু'জনকে 'এনারগা গ্রেনেড' সজ্জিত রাইফেল দিয়ে বাম দিকে বসিয়ে দিলাম। আমি নিজে একটা মেশিনগান ডানদিকের গানবোটটাকে লক্ষ্য করে প্রস্তুত হয়ে রইলাম। নির্দেশ দেয়ার সাথে সাথেই চারজনে ওই গানবোটটাকে লক্ষ্য করে প্রচণ্ডভাবে গোলাবর্ষণ শুরু করলো। এই সময় গানবোটটা আমাদের বেশ আওতার মধ্যে এসে গিয়েছিল। এই অতর্কিত আক্রমণে শত্রুরা ভয়ানক ঘাবড়ে গেল এবং ওদের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হলো। ওদের হৈ চৈ শুরু হলে এব গানবোট থেকে বিরাট একটা আগুনের গোলা ছিটকে পড়লে বুঝতে পারলাম, আমাদের নিক্ষিপ্ত রকেট ঠিক জায়গায় আঘাত করেছে। বামদিকের গানবোটটাকে চিরদিনের জন্য নিস্তব্ধ করে দিয়ে ডানদিকের গানবোটটাকে আক্রমণের উদ্দেশ্য ঘুরে বসলাম। কিন্তু ওটা বিপদের আশংকা করে মেশিনগানের আওতার বাইরে পালিয়ে গেল। যাহোক, শত্রুপক্ষকে ভীতসন্ত্রস্ত রাখার জন্য গুলিবর্ষণ অব্যাহত রইলো। এই সুযোগ অন্য দু'জন লোককে আমাদের আগের লঞ্চটার খোঁজ নিতে বললাম। কিন্তু মনটা

ভীষনভাবে দমে গেল যখন দেখলাম আগের লঞ্চটা ঠিক আমাদের বামদিকে চড়ার উপর বিধ্বস্ত অবস্থায় পড়ে আছে এবং ওর ভেতরের লোকজন আগেই পালিয়ে গিয়েছে।

সাথের বেশীর ভাগ লোকজন পালিয়ে গিয়েছে দেখে মনটা ভয়ানক দুর্বল হয়ে পড়লো। এমন সময় পালিয়ে গেল যখন তাদের প্রয়োজন ছিল সবচেয়ে বেশী। অযথা চিন্তায় সময় নষ্ট না করে আমাদের সাথের চারজনের প্রত্যেককে এক-একটা ডাল, আমরা তীরের কাছাকাছি ছিলাম। অনিশ্চয়তা, নিরাশা ও ভয়ের আশংকা। আমরা তাড়াতাড়ি লঞ্চ থেকে লাফিয়ে পড়লাম। পায়ের নিচে আঠালো কাদা। কোমর পরিমাণ জলের ভেতর দিয়ে অনেক কষ্টে নদীর তীরে পৌছালাম। তীরটা আমার কাছে উঁচু বাঁধের মত লাগলো। নদী থেকে অনেক উঁচুতে বাঁধের উপর তাড়াতাড়ী ঘাঁটি গেড়ে বসলাম। সামনে থেকে যত আক্রমণই করা হোক না কেন আমরা এখানে পুরোপুরি নিরাপদ। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। অচেনা, অজানা পথ। জীবনে কোনদিন এখানে আসিনি। এসব চিন্তা করে নিজেকে বড় অসহায় মনে হলো। শত্রুর উপস্থিতি, ঝড়ের বিলাপ, কুচকুচে কালো আঁধার-সব মিলে রাতটাকে একটা প্রেতাত্মার ছায়ার মত মনে হলো। হঠাৎ দেখতে পেলাম বাঁধের পিছন দিকে মানুষের একটা অস্পষ্ট ছায়া মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। শংকিত পদে ভয়ে ভয়ে কাছে গিয়ে দেখলাম একটা লোক পালাবার জন্য প্রানপণ চেষ্টা করছে। এত ভীত যে মনে হলো পৃথিবীটা খুঁড়ে তার ভেতরে গিয়ে লুকাবে। মৃদুভাবে তাকে স্পর্শ করতেই এমন জোরে চিৎকার করতেই জোরে চিৎকার শুরু করলো যে, ভয়ে আমার শরীর কাঁপতে লাগলো। তাকে সান্ত্বনা দেয়া সত্ত্বেও সে এমন বিলাপ করে চিৎকার আরম্ভ করলো যে, উপর দিকে একবার চাইবারও সাহস পেল না। গরীব বেচারা। প্রায় বিকারগ্রস্ত। অনেক চেষ্টার পর সে শান্ত হলো। এই লোকটা হচ্ছে সেইসব পাইলটদের একজন যারা লম্বা লম্বা গালভরা কথা বলেছিল। অবশ্য তার কোন দোষ নেই। কারণ সে কোনদিন গুলির শব্দ শোনেনি। যাহোক এই লোকটা আমার অনেক উপকার এ্যালো। আমি কোন জায়গায় আছি এটা সে নির্ভুলভাবে বলে দিল। এসব ব্যাপার এই ক্ষুদে 'সাহসী' লোকটির স্মৃতিশক্তির বেশ জোর আছে। এই জায়গাটার নাম 'গাবুরা'। জায়গাটার পরিবেশ ও অবস্থানের কথা চিন্তা করে সংশয় জাগলো যে, ভোর হওয়া পর্যন্ত যদি আমরা এখানে থাকি তাহলে শত্রুপক্ষ হয়তো বা আমাদের মত লোভনীয় বস্তুগুলোর উপর হাওয়াই হামলা চালিয়ে ওদের করেই বসে তাহলে কিছুতেই রুখতে পারবো না। এই অত্যাসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাবার একমাত্র উপায় হচ্ছে, কোন রকমে 'ক্রলিং' করে গ্রামের অভ্যন্তরে চলে যাওয়া।

আমাদের পিছন দিকে এই গ্রামগুলো প্রায় এক মাইল দূরে। ইতিমধ্যে শত্রুপক্ষের গানবোটটা অনেক দূরে পিছিয়ে গিয়ে বাঁধের উপর আমাদের অবস্থান ও নদীর তীরে পরিত্যক্ত লঞ্চ দুটোকে লক্ষ্য করে ভীষণভাবে মেশিনগান ও রকেটের গোলাবর্ষণ শুরু করলো। ওদের অবিরাম গোলাবর্ষণে আমাদের দুটো লঞ্চেই আগুন ধরে গেল। বর্তমান অবস্থানে থাকাটা অযৌক্তিক ভেবে আমরা ক্রলিং করে কোন রকমে বাঁধের নিচের দিকে চলে গেলাম আর খোদাকে স্মরণ করতে লাগলাম। কারণ এ দুঃসময়ে এক খোদা ছাড়া আর কেউ শত্রুর হাত থেকে আমাদের বাঁচাতে পারবে না। কারণ আমাদের কাছে পর্যাপ্ত গোলাবারুদ ছিল না। ঠিক এই সময় আমার সঙ্গের চারজন সৈনিক এদিক-ওদিক সরে পড়লো। সম্ভবত তারা গ্রামের দিকে পালিয়ে যাচ্ছিল। পাইলট ছাড়া আর কাউকে আমার চারপাশে দেখলাম না। মেশিনগানের গর্জন আর রকেটের প্রচণ্ড আওয়াজ শুনে পাইলট আধমরার মতো আমার কাছে পড়ে রইল। গোলার ভয়ংকর আগুন আমাদের লঞ্চ দুটোকে নির্দয়ভাবে গ্রাস করলো। পরাজিত মন ও ক্লান্ত দেহটা বাঁধের পিছন দিকে এলিয়ে দিয়ে হতাশার গ্লানি নিয়ে চেয়ে রইলাম লেলিহান বহ্নিশিখার দিকে। গোলার প্রচণ্ড শব্দ, রকেট বিস্ফোরণের বিকট আওয়াজ। উৎকট গন্ধে ভরপুর সমস্ত আকাশটা ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন- পরাজয়ের কালিমায় কিছুটা মলিন। পূর্ব দিকটা সামান্য হালকা হতেই পাইলটকে টেনে নিয়ে কোন রকমে গ্রামের ভেতরে ঢুকে সাহস করে সেখানে এক হাজী সাহেবের বাড়িতে আশ্রয় নিলাম। আমাদের প্রতি সহৃদয় হবার জন্য ইঙ্গিতে তাকে অনুরোধ জানালাম। যখন তাকে খোদার চাইতেও জেনারেল ইয়াহিয়ার উপর বেশী অনুগত দেখলাম তখন যুগপৎ ভয় ও বিস্ময়ে মনটা বিচলিত হলো। গ্রামের অধিকাংশ লোককেই

দেখলাম বর্বর ইয়াহিয়ার প্রতি অনুগত ও ভক্ত। আমাদের প্রতি ভয়ানক বিরূপ মনোভাবাপন্ন মনে হলো। প্রকৃতপক্ষে এখানকার স্থানীয় লোকজনই আমাদের সাথের লেঃ নাসের, গণপরিষদ সদস্য মিঃ মহিউদ্দিন ও আরো ছাবিবশজন লোককে ধরে তাদের উপর অকথ্য অত্যাচার চালায় এবং সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর হাতে তুলে দেয়। আমিও এই রকম একটা গন্ধ পেলাম যে হাজী সাহেব আমাদেরকে পাকিস্তানী হানাদারদের হাতে তুলে দেবার জন্য গোপনে প্রস্তুতি নিচ্ছে। আমাদের চারদিকে অনেক লোকের ভীর। তারা আমাদেরকে উৎসুক দৃষ্টিতে দেখছে। আমরা দু'টি যেন অদ্ভুত জীব। আমাদের এরকম দুরবস্থা দেখে ওদের মধ্যে কেউ কেউ দুঃখও প্রকাশ করলো। এ অবস্থা দেখে হাজী সাহেবেরও বোধ হয় দয়া হলো। তিনি আমাদের কিছু ভাত ও মধু দিলেন। এটা সুন্দর বনাঞ্চলের লোকদের একটা বিশেষ খাদ্য। খাবার দেখা মাত্র আমার চোখ দুটো বড় হতে লাগলো। কেননা আমি ও আমার সঙ্গের পাইলট উভয়েই ভয়ানক ক্ষুধার্ত ও ক্লান্ত ছিলাম। গত রাতের ভয়ংকর পরিবেশ আমি ওর সাথে বড্ড একাত্ম ও আপন হয়ে গিয়েছিলাম। যখনই এই অনির্ধারিত খাবার শেষ করে ফেলেছি, ঠিক সেই সময় হাজী সাহেব হাতে করে রাইফেলের 'ছেরেফ' একটা 'বোল্ট' নিয়ে হাজির হলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন যে, এটা কি? কেননা তার ধারণা ছিলো এটা কোন কাজে আসে না। তার চোখের কোণে ভীতির চিহ্ন।

এই দালাল শিরোমণিকে নিয়ে কিছু মজা করবো স্থির করলাম। তার হাতে বোল্টটা দেখেই ভীতিজড়িত কণ্ঠে চিৎকার দিয়ে উঠলাম এবং হাজী সাহেবকে বললাম যে, তাঁর হাতের জিনিসটা খুব মারাত্মক ডিনামইট। মাটিতে যেন কোনরকমে না পড়ে তাহলে সবাই মারা যাবে। শুনে হাজী সাহেব ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেলেন। এইবার হাজী সাহেবকে হাতের মুঠোয় পেলাম। আমার কথায় তার কাঁপন শুরু হলো। তার চক্ষু স্থির, রক্তহীনের মত বিবর্ণ। আপাদমস্তক ভয়ে কাঁপতে লাগলো। আমার হুঁশিয়ারী স্মরণ করে তিনি বোল্টটাকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার মত সৎ সাহসও দেখাতে পারছিলেন না। তাঁর শোচনীয় অবস্থা দেখে আমি বললাম যে, ডিনামাইডটের হাত থেকে রক্ষা পাবার একমাত্র উপায় হচ্ছে, ওটাকে পানির মধ্যে ফেলে দেয়া। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো আমার কথা খুব আস্তে আস্তে আঙ্গুল টিপে টিপে বোল্টটার দিকে অপলক দৃষ্টি মেলে হাজী সাহেব পুকুরের দিকে রওনা হলেন। এই দুরবস্থার মধ্যেও আমার ভয়ানক হাসি পেল। যখনই এই মজার ব্যাপারটা ঘটছিল তখন হঠাৎ গানবোট থেকে হাজী সাহেবের বাড়ির দিকে আবার গোলাবর্ষন শুরু হলো। হাজী সাহেবের বাড়ীটা বড় একটা দালান। বহু দূর থেকে দেখা যায়। এই আকস্মিক ঘটনায় গ্রামের লোকজন যে যেদিকে পারল ছিটকে পড়লো। এটা আমাদের পালানোর জন্য আশীর্বাদস্বরুপ দেখা দিল। আমার সাথের পাইলটটি মাত্র নদীর পথ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিল। সে সাহচর্য ছাড়া আর কোন প্রয়োজন আসলো না। যাহোক, একটা গর্তের মধ্যে লুকিয়ে থেকে দিনটা কোন রকমে কাটিয়ে দিলাম। সন্ধ্যার সাথে সাথে আরম্ভ হলো গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দ। হাজী সাহেবের ছেলে আমাদের প্রতি খুব সদয় ছিল। হাজী সাহেবের ব্যবহারে আশ্বাস ও স্বস্তির রেশটুকু খুঁজে না পেলেও আমাদের প্রতি তার ছেলের মমত্ববোধ দেখে এই দুঃসময়েও বাঁচার ক্ষীণ আশায় বুক বাঁধলাম। হাজী সাহেবের ছেলে আমাদের খুঁজে বের করলো। তাকে দেখে ভরসা পেলাম। সে আমাদের আশ্বাস দিল যে, খুব ভোরে একটা নিরাপদ জায়গায় পৌছে দেবে। তার সহানুভুতিশীল মনের পরিচয় পেয়ে যেখান থেকে পালিয়ে এসেছিলাম- আবার সেখানে ফিরেগিয়ে সযত্নে প্রহরায় নির্বিঘ্নে রাত কাটিয়ে দিলাম। প্রতিশ্রুতিমত হাজী সাহেবের ছেলে রাস্তার সব খবরাখবর আমাদেরকে খুলে বললো এবং খুব ভোরে একটা নিরাপদ জায়গায় পৌছিয়ে দিয়ে গেল। খেয়া পার হবার জন্য সে আমাদের কিছু টাকা-পয়সাও দিল। কেননা রাস্তায় অনেক নদী ও খাল পার হতে হবে। পথটা অত্যন্ত বিপদসংকুল। তাছারা সমস্ত অঞ্চলটা পাক দালালে ভর্তি। প্রাণটা হাতে নিয়ে অনেক কষ্টে আমরা প্রায় আধ মাইল পথ অতিক্রম করলাম। কখনো হেঁটে, কখনো নৌকায় এইভাবে ভারতে সীমান্তবর্তী ঘাঁটি হিংগলগঞ্জ এসে পৌছালাম। হিংগলগঞ্জের ঠিক উল্টোদিকে পাকিস্তানী সীমান্ত ঘাঁটি বসন্তপুর। পাকিস্তানী সৈন্যরা আমাদের ফেরার খবর আগে থেকেই পেয়ে ওঁৎ পেতে আমাদের ধরার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। কিন্তু ওদের চোখে ধুলো দিয়ে আমরা নিরাপদ জায়গায় পৌছে গেলাম। ২৬ জন ছাড়া সঙ্গের অন্যান্য সবাইও পৌঁছে গেল।

আমরা যে বেঁচে গিয়েছিলাম এটা ভাগ্য নয়। এটা একটা চরম পরাজয়। আর এজন্য আমি দায়ী। কেননা অধিনায়ক হিসেবে রাস্তাঘাটের সাথে পরিচিত ছিলাম না। তারপর অধীনস্থ লোকদের উপর নির্ভরশীল হয়ে নিজের বিবেককে করেছিলাম খর্ব, তাই হারিয়ে ফেলেছিলাম নির্দেশ দেয়ার শক্তি। কিন্তু এক অর্থে এই পরাজয়ের গ্লানি একটা বিরাট বিজয়। কেননা, এটা একটা সাহসী পদক্ষেপ মাত্র। ভবিষ্যত যাতে চরমভাবে আঘাত হানতে পারি তার জন্য নতুন করে শপথ নিলাম।

সর্বাধিনায়কের দরবার

জুলাই মাসের মাঝামাঝি কোন এক সময়ে আমাদের সর্বাধিনায়ক সব আঞ্চলিক অধিনায়কদের নিয়ে প্রথমবারের মত একট বৈঠক বসেন এবং উপরোক্ত ৬টি অঞ্চলকে নয়টি উপ-অঞ্চলে বিভক্ত করেন। কিন্তু সত্য কথা বলতে কি, এর আগ পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ছিল নিষ্প্রভ। এটা অবশ্য ভাল পদক্ষেপ। কিন্তু বেতারযন্ত্রের অভাবে নদীবহুল বাংলাদেশের এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলের উপর সুষ্ঠভাবে নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ছিল। এক-একটা অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত ছিল কমপক্ষে দু' থেকে তিনটি জেলা। অন্যান্য সেক্টর কমাণ্ডারদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে আমি কোন মতামত প্রকাশ করব না। তারা হয়তো তাদের অধীনস্থ নিয়মিত সেনাবাহিনী নিয়ে ভিন্ন রকম অবস্থার মোকাবেলা করেছিলেন। কিন্তু আমার ব্যাপারটা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমার শক্তির প্রধান উৎস মুক্তিযোদ্ধা এবং নগণ্য সংখ্যক সশস্ত্রবাহিনী ও পুলিশ বাহিনীর লোক। যাহোক এই সময় আমার অবস্থা ছিল খুব নাজুক ও অস্বস্তিকর। কেনা সৈন্যবাহিনী বা অস্ত্রশস্ত্র ছাড়াই আমি অধিনায়ক হয়েছিলাম। সর্বাধিনায়ক কর্নেল ওসমানী সাহেব পরিস্কারভাবে জবাব দিলেন যে, আমাকে কোন অস্ত্রশস্ত্র দেয়া হবে না। এমন কি যে অস্ত্রশস্ত্রগুলো পাক হানাদারদের সাথে মোকাবেলার সময় সুন্দরবনে খোয়া গিয়েছিল সেগুলো উদ্ধার করার জন্য আমাকে চেষ্টা করার উপদেশ দিলেন। আমি তার কথাগুলো সন্তুষ্ট চিত্তে হজম করিনি এবং এটাকে আমি একটা চ্যালেঞ্জ হিসাবে গ্রহণ করলাম। মেজর ওসমানীকে অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে কিছু হালকা অস্ত্রপাতি দেয়ার জন্য তাকে রাজী করালাম। এইভাবে কাছ থেকে কিছু অস্ত্রশস্ত্র এবং অধিনায়ক মুখার্জীর বদান্যতায় আরও কিছু অস্ত্রপাতি যোগাড় করে পাকবাহিনীর ঘাঁটি বসন্তপুরের ঠিক অপর দিকে হিংগলগঞ্জে ক্যাপ্টেন হুদার নেতৃত্বে একটা আক্রমণ পরিচালনার ঘাঁটি স্থাপন করবো বলে সিদ্ধান্ত নিলাম। এবং বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ক্যাপ্টেন মেহদী ও লেঃ জিয়ার সাথে যোগাযোগ স্থাপন করার জন্য চিন্তা করতে লাগলাম। কোন সহ-অধিনায়কের সাথে আমার কোন যোগাযোগের ব্যবস্থা না থাকায় আমার অধীনস্ত অঞ্চল থেকে অস্পষ্ট ও অতিরঞ্জিত খবর আমার কানে এসে পৌঁছতে লাগলো। যাহোক নির্ভরযোগ্য সূত্রে খবর পেলাম যে, বরিশালে হাবিলদার হেমায়েত, পটুয়াখালীতে ক্যাপ্টেন মেহদী এবং সুন্দরবন এলাকায় লেঃ জিয় হানাদার বাহিনীর সাথে প্রচণ্ড যুদ্ধ করছে, কিন্তু অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাগুলির অপ্রতুলতা একটা বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এই সময় ভারতের সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনীর লোকেরাই মুক্তিযুদ্ধে প্রধান সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করছিলেন। সর্বশেষ পরিস্থিতি জানাবার জন্য আমি অধিনায়ক মুখার্জীর কাছে ছুটে গেলাম। তিনি তার স্বভাবসিদ্ধ নম্র ব্যবহারে আমাকে মুগ্ধ করলেন এবং সর্বরকমের সাহায্যের আশ্বাস দিলেন। একবার যদি বাংলদেশের অভ্যন্তরে কমাণ্ডারদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে গোলাবারুদ ও অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করা যায়, তাহলে আমার অধীনস্থ সেক্টরের ভবিষ্যৎ কি হবে আমে যেন দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পেলাম। সমস্ত আগ্রহ ও ঔৎসুক্য নিয়ে ক্যাপ্টেন হুদাকে সাথে করে বিভিন্ন ঘাঁটি পরিদর্শন ও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সংগ্রহের আশায় দিনরাত অবিশ্রান্ত ভাবে ছুটতে লাগলাম। করণ প্রথম ব্যর্থতার বেঝাটা আমি যেখানেই যেতাম সেখানেই আমাকে ধাওয়া করতো। যতক্ষণ না বর্বর পশুগুলোর উপর একটার পর একটার পর একটা প্রতিহিংসা নিতে পারলাম ততক্ষণ পর্যন্ত ওই ব্যর্থতার গ্লানিকর ছায়াটা ভয়ানক দুঃস্বপ্ন হয়ে আমার কাঁধ চেপে রইল। সর্বক্ষণ আমি চলার উপর ছিলাম। জুন মাসের আগ পর্যন্ত আমার কোন সদর দপ্তর ছিল না।

মৃত্যুঞ্জয়ী কাফেলা

যদিও কোন করুন দৃশ্য আমি খুবই বিচলিত হয়ে পড়তাম এবং আমার উপরে এর প্রভাব ছিল ভয়ানক প্রবল, তবুও নৃশংস পাক-হানাদার বাহিনীর অত্যাচার আমার মনে জমা হতে লাগলো চরম প্রতিহিংসা ও জিয়াংসার আগুন। বর্বর পশুগুলো হাজার হাজার নিরীহ নিরপরাধ বাঙ্গালীকে গরু-ছাগলের মত ঘরছাড়া করে নিক্ষেপ করেছে দুঃখের অথৈ সাগরে। এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে আমাদের যা কিছু সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র ছিল, তাই নিয়ে ক্যাপ্টেন হুদাকে হিংগলগঞ্জে একটা আক্রমণ ঘাঁটি স্থাপন করার জন্য নির্দেশ দিলাম।

হিংগলগঞ্জ হাসনাবাদ থেকে বারো মাইল দক্ষিণে। পথের মাঝখানে দুটো নদী। ১৯৭১ সালের জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে ক্যাপ্টেন হুদা ৩৫ জন মুক্তিযোদ্ধা ও ২০টি রাইফেল নিয়ে হিংগলগঞ্জের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। হাসনাবাদ ও হিংগলগঞ্জ মধ্যে যাতায়াতের ব্যবস্থা ছিল তিন চাকা বিশিষ্ট টেম্পো নামে এক প্রকার গাড়ী আর নৌকা। ইছামতী নদী নৌকায় করে পার হতে হতো। কিন্তু এই নদীটা পার হওয়া খুব একটা নিরাপদ ছিল না। কারণ ওপারে নদীর তীর বরাবর পাকবাহিনী অসংখ্য বাঙ্কার ও ট্রেঞ্চ খনন করে ওদের ঘাঁটি সুদৃঢ় করে নিয়েছিল। এই ঘাঁটিগুলো ভারতের সীমান্তবর্তী অঞ্চল থেকে একজন পথিকেরও চোখে পড়তো। হিংগলগঞ্জে ভারতের ৭২নং সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনীর একটা স্থায়ী ফাঁড়ি আছে। ক্যাপ্টেন পান্ডে এর অধিনায়ক। তিনি তার ফাঁড়ির এক মাইল দক্ষিণে একটি ঘাঁটি বানাতে ক্যাপ্টেন হুদাকে সবরকম সাহায্য করলেন। এ ঘাঁটিটা ইছামতী নদীর তীর থেকে আধ মাইল ভিতরে। এর ঠিক উল্টো পারে পাক-হানাদারের সুদৃঢ় পর্যবেক্ষণ ফাঁড়ি। এখানে ঘাঁটি স্থাপন করা কত কষ্টসাধ্য ক্যাপ্টেন হুদার তা ভালভাবেই জানা ছিল। আমারও ভাবনার অন্ত ছিল না। কেননা, অধিনায়ক হিসাবে তার চাহিদা মত তাঁবু, খাদ্য, অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ, টাকা-পয়সা এবং যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সৈন্যবাহিনীর মঙ্গলামঙ্গল ও অগ্রগতির জন্য অত্যাবশ্যকীয় জিনিসপত্র পাঠাতে ব্যর্থ হয়েছিলাম। কারণ তাদের জন্য গভীর সহানুভূতি ছাড়া আমার কাছে তহবিল ছিল না। এর জন্য দুয়ারে দুয়ারে আমি পাগলের মত ঘুরেছি। শীগগীরই আমরা জীবনকে কঠিনভাবে উপলব্ধি করতে শিখলাম এবং গভীর পারস্পরি সমঝোতার মাধ্যমে সব বিপদ, সব প্রতিকূল অবস্থাকে রুখে দাঁড়াবার নতুন শক্তিতে উদ্বুদ্ধ হলাম।

বসন্তপুর ইছামতী নদীর পূর্ব তীরে। কেউ শুনে বা বইয়ে পড়ে দুঃখের কাহিনী হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে না। ভারতের সীমান্তে হিংগলগঞ্জে দাঁড়িয়ে দৃষ্টি মেলে দিলে দেখা যাবে ওপারে বসন্তপুর। মাঝখানে ছোট্ট ইছামতী। দুর্নিবার ইচ্ছা, ভাবাসা ও আসক্তি সত্ত্বেও ওই রূপসী বাংলার কোলে ফিরে যাওয়া আমার পক্ষে ভয়ানক কষ্টসাধ্য। কেননা, ওপারে মারণাস্ত্র নিয়ে অপেক্ষা করছিল মানবতার জঘন্যতম শত্রু। আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না। ওই অসভ্য বর্বরদের হাত থেকে আমার মা-বোনদের বাঁচিয়ে আনার উদগ্র বাসনায় উত্তেজিত হয়ে উঠলাম। ছটফট করতে লাগলাম। কিন্তু কি দিয়ে আমি তাদের বাঁচাবো? মাত্র ৩৫ জন মুক্তিযোদ্ধা আর ২০টা রাইফেল নিয়ে? হ্যাঁ, এই অসম্ভব কাজেও আমরা জীবনকে বাজী রেখে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম এবং সফল হয়েছিলাম।

১৯৭১ সালের জুন মাসের ১২ তারিখ। সকাল থেকে ভয়ানক ঝড়। ভিতরে আমার ভয়ানক অস্বস্তি। কারণ, আমি জানতাম যে, ক্যাপ্টেন হুদার সাথের ছেলেরা এই ঝড়ের মধ্যে ছেঁড়া তাঁবুতে বসে বৃষ্টির জলে অসহায়ের মত ভিজছে। তা ছাড়াও আমি ভাবলাম শত্রুর উপর অতর্কিত আঘাত আনার এটাই সবচেয়ে উপযুক্ত সময়। ভাবনাটা মাথায় আসতেই আমি উত্তেজিত হয়ে উঠলাম। বলিষ্ঠ যুবক ডাক্তার শাহজাহানকে তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে আমার সাথে আসতে বললাম। প্রাণ-প্রাচুর্যের জীবন্ত এই ডাক্তার সাহেব। সকাল ৮টায় আমরা দু'জনে দুটো ওভারকোট নিয়ে হাসনাবাদ থেকে বেরিয়ে পড়লাম। ইছামতী পার হতে পুরো এক ঘণ্টা সময় লাগলো। হিংলগঞ্জে যাওয়ার পথে এটাই প্রথম নদী। বাত্যাবিক্ষুব্ধ ছোট্ট ইছামতী আজ ভয়ংকর রূপ ধারণ করেছে। এছাড়া খেয়ার মাঝি এই দুর্যোগময় মুহূর্তে খেয়া ছাড়তেও অস্বিকার করলো। টাকায় সবকিছু সম্ভব। তাই সেই হাড্ডিসার রোগা খেয়াঘাটের মাঝি টাকার লোভ সংবরণ করে আমাদের প্রস্তাব উপেক্ষা করতে পারলো না। খুব

কষ্টে নদী পার হলাম। কিন্তু বড় বিপদে পড়লাম। কেননা, কোনো টেম্পো গাড়ীওয়ালা এই দুর্যোগ ঝড়ের মধ্যে গাড়ী ছারতে সাহস পেল না। এই দুঃসাহসিক কাজে ওদের রাজী করাবার জন্য বেশ খানিকটা সময় কেটে গেল। শেষ পর্যন্ত তিনগুণ ভাড়ায় পৌছে দিতে ওরা সম্মত হলো। বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে আমরা বরুনহাট নামক একটা জায়গায় নদীর পাড়ে পৌছলাম। খুলনা জেলার সাতক্ষীরা মহকুমার সাথে দুটো প্রধান স্থলপথে বসন্তপুরের যোগাযোগ ব্যবস্থা- একটা পারুলিয়া হতে কালিগঞ্জ ও নাজিমগঞ্জ হয়ে, অন্যটা সাতক্ষীরা- শ্যামনগর রোড। পারুলিয়া থেকে যে রাস্তাটা গিয়েছে সেটা বেশ প্রশস্ত। সিএণ্ডবি'র রাস্তা। ভারী সামরিক যানবাহন এর উপর দিয়ে অনায়াসে যাতায়াত করতে পারে। কিন্তু পরেরটা বিশেষ সুবিধাজনক নয়। তবুও পাকিস্তানী শত্রুবাহিনী প্রায়ই এই রাস্তায় চলাফেরা করতো। তাই সৈন্য চলাচল ও আক্রমণ পরিচালনার জন্য সামরিক দিক দিয়ে বসন্তপুর ভয়ানক গুরুত্বপূর্ণ। বসন্তপুর অধিকার করে উপরোক্ত রাস্তা দুটোর উপর প্রভাব বিস্তার করার অর্থ একশ' বর্গমাইল মুক্ত এলাকা হাতের মধ্যে আসা এবং এই সংকটময় দিগুলোতে এটা একটা সাংঘাতিক ব্যাপার।

ইছামতী নদীর চাইতে বরুনহাটের এই নদীটি পাশে ছোট। কিন্তু দেখতে ভয়ংকর দৈত্যের মতো। এই অবস্থায় খেয়া পার হওয়া সাংঘাতিক বিপজ্জনক। অযথা সময় নষ্ট না করে সুযোগসন্ধানী এক নৌকার মাঝিকে বেশী টাকা দিয়ে নদী পার হলাম। কোন যানবাহন ছিল না। দীর্ঘ পাঁচ মাইল রাস্তা হেঁটে হিংগলগঞ্জে ক্যাপ্টেন হুদার আস্তানায় পৌছতে হবে। ভয়ানক শীত। তার উপরে বৃষ্টিতে সারা শরীর ভিজে গিয়েছিল। হাঁটু পরিমাণ কাদা ভেঙ্গে ক্যাপ্টেন হুদার ঘাঁটিতে পৌছালাম। সামান্য একটু উচু জায়গায় তাঁবু খাটিয়ে ক্যাপ্টেন হুদা আস্তানা গেড়েছিল। তাঁবু ভেদ করে বৃষ্টির পানি পড়ছে। ক্যাপ্টেন হুদাকে বড় বিষন্ন মনে হলো। উঁচু জায়গাটার চারদিকে বৃষ্টির পানি জমে সমুদ্রের মত মনে হলো। প্রবল বৃষ্টির মধ্যে আমাকে আসতে দেখে হুদা যেন নতুন প্রাণ ফিরে পেল। মুখে তার দৃঢ়প্রত্যয়ের হাসি। কাছে গিয়ে কুশলাদি জিজ্ঞেস করলাম। 'জয় বাংলা' বলতেই সবাই বৃষ্টি মধ্যে লাফিয়ে পড়ে 'জয় বাংলা' ও 'শেখ মুজিব জিন্দাবাদ' ধ্বনি তুলে আমাদের স্বাগত জানালো। এই দৃশ্য অভূতপূর্ব। ইত প্রাণচাঞ্চল্য আমি আর আগে কখনও দেখিনি। ওদের সেই প্রাণচাঞ্চল্যে খুঁজে পেলাম আগামী দিনের বিজয়োৎসবের গোপন সংকেত। ওদের মনেভাবের উত্তপ্ততা লক্ষ্য করে আমি চিৎকার করে প্রশ্ন করলামঃ 'আজ রাতেই তোমরা কি সবাই যুদ্ধ করতে রাজী আছো?' ৩৫ জন মুক্তিযোদ্ধা ৩৫শত লোকের মত চিৎকার দিয়ে উত্তর দিলঃ 'হ্যা স্যার, আমরা সবাই প্রস্তুত।'' ওদের উচু মানসিক শক্তির পরিচয় পেয়ে আমি খুব ভরসা পেলাম। আগ্রহী কণ্ঠ বললাম, ওকে। এই বলে ওদের বিদায় দিয়ে হুদার তাঁবুতে ফিরে গেলাম এবং আমরা ম্যাপের উপর ঝুঁকে পড়ে কোথায় আক্রমণ চালাতে হবে সবাইকে বুঝিয়ে দিলাম। এ ব্যাপেরে সোবহান নামে একজন হাবিলদার অনেক সাহায্য করেছিল। পাকিস্তানী আক্রমণের আগে সোবহান বসন্তপুর গোয়েন্দার কাজ করেছে। কাজেই সেখানকার সব খবরই তার জানা ছিল। ক্যাপ্টেন হুদার নেতৃত্বে এই অভিযান পরিচালনার ব্যাপেরে সে অত্যন্ত বিশ্বস্ততার পরিচয় দিয়েছিল।

রাত একটায় শত্রুপক্ষের বাঙ্কারে ঝটিকা আক্রমণের পরিকল্পনা। উদ্দেশ্যে, ওদের বাঙ্কারে নিক্ষেপ করে কাবু করা এবং পরিত্যক্ত অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তাড়াতাড়ি পালিয়ে আসা। পরিকল্পনাটার শুনতে মধুর ও উত্তেজনাকর লাগলেও- এই ঝড়ের রাতে এই দুঃসাহসিক কাজটা সমাধান করা ছেলেখেলা নয় তবু তারা, বা প্রথম অভিযানের অধিনায়ক ক্যাপ্টেন হুদা, মোটেই দমলো না। খুব জেরে ঝড় বইছিল। একবার ভালাম ঝড়ের রাতে এই বিক্ষুব্দ নদীটা পার হওয়া সম্ভব হবে না। কিন্তু মন থেকে এই নৈরাশ্যকে দূরীভূত করলাম। করলাম কেননা আমাদের বিজয় সম্বন্ধে আমি খুবই আশাবাদী ছিলাম। জানতাম সবাইকে বিস্মিত করে অভিযান সফল হবেই। ব্যাস্তসমস্ত হয়ে সবাই সামান্য খাবার খেয়ে নিলাম। শৌখিন পাচকেরা এসব পাক করেছিল। তারাও অভিযানে শরিক হলো। যখন আমি হুদার কাছে আমার উদ্দেশ্যের কারণ ব্যাখ্যা করছিলাম, তখন হঠাৎ করে আমার মাথায় একটা ধারণা এলো যে, একই সঙ্গে টাউন শ্রীপুরে পাক হানাদারদের অপর একটি ঘাঁটি আক্রমন করব। ভারতের সীমান্তবর্তী শহর 'টাকি'র অপর দিকেই টাউন শ্রীপুর। সেখানে শাজাহান নামে একটা স্কুল শিক্ষকের অধীনে

অনেক ট্রেণ্ড মোজাহিদ আছে। মিঃ শাজাহান বুদ্ধিমান, হাসিখুশী এবং উৎসর্গীকৃত প্রাণ। তিনি টাউন শ্রীপুরের বাসিন্দা ছিলেন এবং প্রশিক্ষণ দিয়ে হালকা অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত একটি মোজাহিদ বাহিনীও গড়ে তুলেছিলেন। তারা টাউন শ্রীপুরের বাসিন্দা হওয়ায় ওখানকার পাকিস্তানী ঘাঁটির সঠিক অবস্থান, রাস্তাঘাট ও অন্যান্য খুটিনাটি সম্বন্ধে বেশ ওয়াকেবহাল ছিল। সুতরাং দুর্যোগময় রাতটার তাৎপর্য আমার কাছে দ্বিগুণ হয়ে উঠলো।

ক্যাপ্টেন হুদাকে বিদায় জানিয়ে আমি ও ডাক্তার শাহজাহান দু'মাইল রাস্তা হেঁটে 'টাকি' এলাম এবং মিঃ শাজাহানের সাথে আলাপ-আলেচানা করলাম। তিনি সন্তুষ্ট চিত্তে আমার অধীনে কাজ করতে রাজী হলেন। মিঃ শাজাহানের অধীনে লেঃ মুখার্জী নামে একজন অসম সাহসী যুবক কাজ করতো। সে পূর্বে যশোরের অধিবাসী ছিল এবং দাবী করতো যে, সে ভারতীয় সামরীক বাহিনীর একজন ভূতপূর্ব অফিসার। বয়স পঁচিশের কাছাকাছি। বেশ শক্তিশালী। অন্য দু'দজন মোজাহি সেকশন লিডার মিঃ মণ্ডল ও সোবহানের সাথে লেঃ মুখার্জী একত্রে ট্রেনিং নিয়েছ। টাউন শ্রীপুরে পাক-হানাদারদের ঘাঁটি আক্রমণ করবো শুনে মুখার্জী উত্তেজিত হয়ে উঠলো। বসন্তপুর অভিযানের মতো এখানেও এদের ইছামতী পার হয়ে যেতে হবে। ইছামতী আরও উত্তরে গোজাডাঙ্গা পর্যন্ত গিয়ে গঙ্গায় পড়েছে। ভারতীয় সীমান্তবর্তী ঘাঁটিগুলোর ঠিক অপর দিকে পাকিস্তানী পর্যবেক্ষণ ঘাঁটি। আমার সেক্টরে ইছামতী নদীর তীর বরাবর দু'তিন মাইল অন্তর পাকিস্তানী ঘাঁটিগুলোর অবস্থান। সর্ব উত্তরে 'শংকরা'। সেখান থেকে দক্ষিণ দিকে টাউন শ্রীপুর, দেবহাটা, খানজী, বসন্তপুর, উখসা ও সর্বশেষ কৈখালি। এসমস্ত পাকিস্তানী ঘাঁটিগুলোর শক্তি বিভিন্ন রকমের। ভাবলাম, আমার প্রথম কাজ হলো, রাতের অন্ধকারে এবং গোপনে ক্রমাগত আক্রমণ চালিয়ে এই বিক্ষিপ্ত পাকিস্তানী ঘাঁটিগুলো আবিস্কার করা। এতে করে গেরিলাদের জন্য কতকগুলো গোপন অবস্থানের পরিকল্পনা করা আমার পক্ষে সুবিধাজনক হবে। যার ফলে একটা মুক্তাঞ্চলে গড়ে তোলা যায়। বাস্তবিক পক্ষে প্রথম অবস্থায় আমার পরিকল্পনা ছিল ভারতীয় সীমান্তে টাকি, হিংগলগঞ্জ ও শমসেরনগর এই তিন জায়গায় আক্রমণ ঘাঁটি করে এর ঠিক বিপরিত দিকে পাকিস্তানী ঘাঁটি টাউন শ্রীপুর, বসন্ত পুর ও কৈখালি অধিকার করা। কিন্তু অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের অপ্রতুলতা হেতু আমার আশা সফল হয়নি। তবুও আমার কল্পনার উদ্দাম গতি থামেনি। যারা নিজেদের ভাগ্য গড়তে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, আল্লাহ তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসেন। এ কথার সত্যতা প্রমাণীত হলো ১৩ই জুন-যখন ক্যাপ্টেন হুদা বাহকের মারফত খবর পাঠালো যে, সেই দুর্যোগময় রাত্রে মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানী ঘাঁটি আক্রমণ করে ২০ জন হানাদারকে খতম এবং ৫০টি রাইফেল, দু'টি এল-এম-জি, অনেক অসশস্ত্র, গোলাবরুদ, গ্রেনেড ও বিস্ফোরক দ্রব্য হস্তগত করেছে। মুক্তিযোদ্ধারা ঘুমন্ত শত্রুদের ঘুমন্ত শত্রুদের উপর হামলা চালিয়েছিল। শত্রুপক্ষের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের গুলিতে আমাদের একজন যুবক সামান্য আহত হয় মাত্র। শত দুঃখের মাঝেও বিজয়গর্বে বুক ফুলে উঠলো। লেঃ মুখার্জি, মিঃ মণ্ডল, সোবহান ও মিঃ শাজাহান আমার সদর দপ্তরে এসে খবর দিল যে, তাদের আক্রমণও সফল হয়েছে। ওদের সবার মুখেই বিজয়ের হাসি। বিজয়োল্লাসে মিঃ শাজাহান আমাকে অভিনন্দন জানালো। আমিও আন্তরিকভাবে ওদেরকে স্বাগত জানালাম। আমার সুন্দরবনের ব্যর্থতার গ্লানি আজ যেন কিছুটা লাঘব হলো। পরক্ষণেই প্রতিহিংসার দাবানল আমার ভেতর আবার দ্বিগুণভাবে জ্বলে উঠলো। মিঃ শাজাহানের নেতৃত্বাধীন মুক্তিযোদ্ধারা ৩৫টি রাইফেল ও প্রচুর পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র অধিকার করেছিল। এই বাড়তি অস্ত্রশস্ত্র হাতে আসায় আমার আক্রমণ পরিচালনা ঘাঁটির পরিধি আরও প্রসারিত করতে মনস্থ করলাম। ওই দিনই মিঃ শাজাহানের সহায়তায় টাকিতে আমার অন্তর্বর্তীকালীন ঘাঁটি স্থাপিত হলো। আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত পাকিস্তানী দক্ষ সৈন্যর উপর দুর্যোগের মধ্যে হামলা চালিয়ে এই বিরাট সফলতা অর্জন করার জন্য আমি ক্যাপ্টেন হুদা, মিঃ শাজাহান, লেঃ মুখার্জী ও মিঃ মণ্ডলকে অভিনন্দন জানালাম। একই সঙ্গে খুব অল্প সময়ের ভেতর সীমান্তবর্তী সমস্ত পাকিস্তনী ঘাঁটিগুলো আক্রমণ করার ইচ্ছা ওদের কাছে প্রকাশ করলাম। এ ছাড়াও আর একটা জিনিসের উপর জোর দিলাম যে, সীমান্তের ওপারের ছেলেদের জোগাড় করে এই মুহূর্তেই ওদের ট্রেনিং দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। এই জন্য টাকি থেকে দুই মাইল দুরে 'টকিপুরে' একটি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলার পরিকল্পনা নিলাম। সীমান্তের ওপার থেকে ছেলে জোগাড় করার দায়িত্ব মিঃ শাজাহানকে দিলাম। বসন্তপুর ও টাউন শ্রীপুরে আমাদের সফলতার খবর

সর্বাধিনায়কের কানে শিগগিরই পৌঁছে গেল। ভবিষ্যতে আরও এরকম সফলতা আশা করে তিনি স্বাগত জানালেন।

ইতিমধ্যে সামরিক বাহিনীর অনেক লোক ও স্কুল-কলেজের ছাত্র সীমান্ত পার হয়ে এপারে চলে এলো। ছাত্রদের টাকিপুর যুবকেন্দ্রে ট্রেনিং-এর জন্য এবং সামরিক বাহিনীর লোকদের হুদার ঘাঁটিতে পাঠিয়ে দিলাম। ওদের সাথে বরিশাল থেকে এম, এ, বেগ নামে একজন লোক এসে পৌঁছলো। যুবক, শিক্ষিত ও চটপটে। গায়ের রং কালো, সারা মুখমণ্ডলে প্রতিভা ও চাঞ্চল্যের স্বক্ষর। সে পাকিস্তান সৈন্যবাহিনীতে একজন দক্ষ প্যারাসুট সৈনিক ও একজন ফ্রগম্যান হিসেবে অনেক দুঃসাহসিক কাজে নিযুক্ত ছিল। এই কাজে ওর সমতুল্য বড় একটা কেউ ছিল না। পশ্চিম পাকিস্তনের চেরাটে’ দীর্ঘ আট বছরের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পর পাকিস্তানের নৌবাহিনীতে ’মিডশীপম্যান’ হিসেবে প্রশিক্ষণ নেয়। ওখান থেকে১৯৭১ সালের মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে সে বাংলাদেশে পালিয়ে আসে। এ রোমঞ্চকর জীবন ছেড়ে পালিয়ে আসার কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে উত্তর দিলঃ ‘বাংলাদেশ’।

আরোও দুটো সাহসী ছেলেকে সাথে নিয়ে বেগ জুন মাসের তৃতীয় সপ্তাহে হাসনাবাদ পৌঁছলো। বরিশাল জেলার স্বরূপকাঠি থানার কুড়িগ্রাম নামক একটা গ্রামে পাক হানাদারদের সাথে সংঘর্ষের এক চমকপ্রদ কাহিনী শুনালো সে। জায়গাটা স্বরূপকাঠি থানার অনেক ভেতরে। এখানে সারি সারি অনেক পেয়ারা বাগান আছে। দুটো সারির মাঝখানটা নালার মত। সেখানে যে কেউ অনায়াসে আত্মগোপন করে থাকতে পারে। বেগ প্রায় একশ’ ঝানু মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে দিনের বেলায় এই নালার মধ্যে লুকিয়ে থাকতো এবং রাতের অন্ধকারে ওখান থেকে বেরিয়ে এসে হানাদারদের উপর আঘাত হানতো। সবার কাছে আগ্নেয়াস্ত্র ছিল না। কারো কারো কাছে মান্ধাতার আমলের তীর-ধনুক, বর্শা ইত্যাদী থাকতো। বেগ-এর বাহিনীর অবিরাম আক্রমণে বিধ্বস্ত ও বিপর্যস্ত পাক-হানাদারর একদিন, এক দালালের কাছে খবর পেয়ে দিনের বেলায়ই ওদের উপর আক্রমণ চালাবার জন্য অগ্রসর হলো। বেগও ঠিক সময়মত বাহকের মারফত হানাদারদের অগ্রসর হবার সংবাদ জেনে গেল এবং হাতের কাছে যে সমস্ত আগ্নেয়াস্ত্র ও পুরনো আমলের তীর-ধুনক পাওয়া গেল-তাই নিয়েই ওর লোকজনদের প্রধান প্রধান জায়গায় বসিয়ে দিল। একদিকে নগণ্য অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত বাংলার দুর্জয় মুক্তিবাহিনী, অন্যদিকে আধুনিকতম অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত পৃথিবীর অন্যতম দুর্ধর্ষ পাকিস্তানী সৈন্য। সবাই প্রস্তুত। কিন্তু প্রাচিন রোম নগরী বা অন্য কোন ইতিহাসপ্রসিদ্ধ যুদ্ধের মত এখানে বেজে উঠলো না কোন রণদামামা। উত্তেজনা চরমে উঠলো যখন দালালরা প্রায় ৫০ জন হানাদারকে সাথে নিয়ে এস পেয়ারা বাগানের ভেতর তল্লাশী চালাতে বললো। হানাদাররা বাগানে ঢুকে খুব সতর্কতার সাথে বাগানের গভীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করলো। দক্ষ শিকারীর মত বেগ তার দুঃসাহসিক মুক্তিবাহিনী নিয়ে অসম্ভব রকমের চুপচাপ। কোন সাড়াশব্দ নেই। ওরা অপেক্ষায় ছিল কতক্ষণে শত্রুপক্ষ বন্দুকের নলের আওতায় আসবে। পাক হানাদাররা মুক্তিযোদ্ধাদের ‘মুক্তি’ বলে ডাকতো। অনেক তল্লাশী চালিয়ে কোন ‘মুক্তির’ খোজ না পেয়ে হানাদাররা পাকা পেয়ারায় ভর্তি একটা গাছের উপর বিশ্রাম নিতে লাগলো। আর কি! চতুর্দিক থেকে আচমকা ছুটে আসতে লাগলো বন্দুকে গুলি, তীর, বর্শা ইত্যাদি। হতভম্ব হয়ে হানাদাররা চিৎকার করতে করতে এদিক-ওদিক ছুট দিল। ঘটনাস্থলেই ২০ জন হানাদার খতম হলো। বাদবাকিগুলো জীবনের মায়ায় পেয়ারা গাছের ভেতর দিয়ে দৌড়াতে লাগলো। ওদের পলায়নের পালাটাও খুব আরামে কাটলো না। বাগানের বোলতা ও মৌমাছি ভয়ানকভাবে ওদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে হাতেমুখে হুল ফুটাতে লাগলো।

পরে শুনেছি, পেয়ারা বাগানের এই পরাজয় হানাদারদের মনোবল ভেঙে দিয়েছিল। এই বোকগুলো শেষ পর্যন্ত স্থানীয় লোকজন দ্বারা সম্পূর্ণ পেয়ারা বাগান কেটে ফেলে আগুন ধরিয়ে দেয় যাতে করে ভবিষ্যতে ওরা নিরাপদ হতে পারে। এই ঘটনার পর বেগ তার গোপন আড্ডা দিয়ে অন্য আর একটি জায়গায় গিয়ে ‘যাদু’ দেখাবার আয়োজন করছিল। ঠিক এই সময় গোলাগুলির অভাব দেখা দিল। তাই ওকে বাধ্য হয়ে সুন্দরবনের গোপন পথ ধরে হাসনাবাদ আসতে হয়েছে। এই সময় বেগের মত একজন দক্ষ লোকের সাহায্য ও

সহযোগিতার খুবই প্রয়োজন ছিল। কেননা, সে নতুন মুক্তিযোদ্ধাদের গেরিলা পদ্ধতি ও কলাকৌশল সম্বন্ধে প্রশিক্ষণ দিতে পারবে। তার ইচ্ছা ছিল বাংলাদেশের অভ্যন্তরে গিয়ে শত্রুদের উপর আঘাত হানবে। কিন্তু ওকে আমি যেতে দিলাম না। প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে ওকে ক্যাপ্টেন হুদার কাছে পাঠালাম। বেগকে পেয়ে ক্যাপ্টেন হুদা ওর কাঁদেও কিছুটা দায়িত্ব চাপিয়ে দিল।

বসন্তপুর ঘাঁটি ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে আক্রমণ পরিচালনা করার দায়িত্ব ওদের একলার উপর ছেড়ে দিয়ে আমার দৃষ্টি আরও দক্ষিণে শমসেরনগরে দিকে নিবদ্ধ করলাম। হাসনাবাদ থেকে শমসেরনগরের দূরত্ব চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ মাইল। আক্রমণ পরিচালনার জন্য কৌশলগত কতকগুলো মূল অসুবিধা ছিল। প্রথমতঃ জায়গাটা আমাদের আওতা থেকে অনেক দূরে। যাতায়াত ব্যবস্থা একমাত্র নদীপথ। দ্বিতীয়তঃ যদিও ভারতীয় সীমান্তবর্তী ফাঁড়িতে একটা বেতার ব্যবস্থা ছিল, তবুও আমাদের নিজস্ব কোন বেতারযন্ত্র না থাকায় এতদূর নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করা আমাদের পক্ষে কষ্টসাধ্য। তাছাড়াও নতুন আক্রমণ ঘাঁটি স্থাপন করার আগে জনশক্তিও প্রয়োজন উপকরণ সামগ্রীর স্বল্পতার কথা চিন্তা করতে হবে। এই সমস্ত সমস্যা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও নতুন করে কোন কিছু করতে যাব কিনা এ বিষয়ে নিজে নিজে ভাবছিলাম। সৌভাগ্যবশতঃ একদিন ভোরে ২০০ ট্রেনিংপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা বিহার প্রদেশের 'চাকুলিয়া' থেকে এসে হাজির হলো। এইসব যুবক মুক্তিযোদ্ধারা বাংলাদেশ সরকারের অনুরোধে ভারতীয় সামরিক বাহিনীর তত্ত্বাবধানে 'ক্রাশ প্রোগ্রামে' ট্রেনিং লাভ করে। প্রয়োজনের সময় ওদের পেয়ে খুব স্বস্তি অনুভব করলাম। সংবাদ বাহকে মাধ্যমে আমাদের সর্বাধিনায়কের কাছ থেকে একখানা চিঠি পেয়ে আরও খুশি হলাম। তাতে লেখা ছিলঃ ''ব্যারাকপুরে চার্লি সেক্টর থেকে এই দু'শো' মুক্তিযোদ্ধারা জন্য শীগগীরই অস্ত্রশস্ত্র পেয়ে যাবেন।'' সংবাদটা দ্বিগুণ জোরে আমার কানে বাজতে লাগলো দু'শো' রাইফেল।

সংবাদটা পাওয়ার পরেই মোজাহিদ ক্যাপ্টেন মিঃ শাজাহানকে ডেকে টাকির কাছাকাছি কোথাও একটা ঘাঁটি স্থাপন করার জন্যে স্থান নির্বাচন করতে বললাম। নিরাপত্তার খাতিরে আমি চাইনে যে, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধারা অদক্ষ মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে টাকিপুর যুদ্ধক্ষেত্রে এক হয়ে মিশে থাক। আমার দপ্তরে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে মিঃ খুরশীদকে নিয়ে জীপে চাপলাম। খুরশীদ তথাকথিত আগরতলা মামলার একজন আসামীও ছিলো। সে সাধারণতঃ লেঃ খুরশীদ নামেই পরিচিত। জীবনের মূল্যবান অংশটা সে পাকিস্তান নৌবাহিনীতে কাটিয়েছে। একথা সে আমাকে প্রায়ই স্মরণ করিয়ে দিত। মিঃ খুরশীদ খুব সরল, সৎ ও দেশপ্রেমিক। মুখে সবসময় হাসি। এই ভদ্রলোকটি বন্ধুবান্ধবের জন্য যে কোন সময় নিজের জীবনকে বিলিয়ে দিতে পারতো। একমুখ দাড়ি-প্রশস্ত দৃষ্টিভঙ্গী। খুরশীদকে একজন পাক্কা গোয়েন্দার মত লাগতো। জন্ম থেকেই সে আশাবাদী। ভয়ানক দুঃসময়ে ওকে আমি হাসতে দেখেছি। তার সাহচর্য পেয়ে খুব আশ্বস্ত হলাম এবং তাকে নিয়ে আমাদের সর্বাধিনায়কের সাথে দেখা করার জন্য তাঁর সদর দপ্তরে রওনা হলাম। কি আর বলবো- তিনি এমন একটা জায়গায় সদর দপ্তর স্থাপন করেছিলেন, যার নাম নিরাপত্তার (!) খাতিরে প্রকাশ করা যায় না। যা হোক, কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে তাঁর সাথে সাক্ষাৎপর্ব শেষ করলাম। কারণ, তিনি স্বল্পভাষী। বেশী কথাবার্তা বলে তাঁর সাথে সাক্ষাৎপর্ব শেষ করলাম। কারণ, তিনি স্বল্পভাষী। বেশী কথাবার্তা পছন্দ করতেন না। কোলকাতাতেই মিঃ খুরশীদ, সুলতান আহমেদ নামে চটপটে এক ভদ্রলোককে আমার সাথে পরিচয় করিয়ে দিল। আলাপ পরিচয়ে বুঝতে পারলাম মিঃ সুলতান আহমেদ বেগের একজন প্রশিক্ষণ-গুরু। এই সংবাদে শুধু সাহসই পেলাম না, রীতিমত উত্তেজিত হয়ে উঠলাম। কেনা, এতে করে আমার নতুন আখড়ায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছেলেদের আরও উন্নত প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়ার সুযোগ এস গেল। আর এ জন্য মিঃ সুলতানের তত্ত্বাবধানে কাজ করার জন্য বেগকে নির্দেশও দিলাম।

সুলতান ও খুরশীদকে সংগে করে কর্মচঞ্চল কোলকাতার রাস্তা দিয়ে ব্যারাকপুরের দিকে ছুটলাম। চার্লি সেক্টর খুঁজে বের করতে বেশ সময় লেগে গেল। কেননা, এটা একটা নতুন সংস্থা। আমার ও মেজর ওসমানের সেক্টর থেকে আক্রমণ পরিচালনায় সমন্বয় সাধনের জন্য ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী এই সংস্থা স্থাপন করেছে। সংক্ষেপে চার্লি সেক্টরের পরিচয় হলো- এর অধিনায়ক একজন ব্রিগেডিয়ার, তাঁর অধীনে দু'জন মেজর, দুজন

ক্যাপ্টেন এবং কয়েকজন কেরানী। ব্রিগেডিয়ার জানালেন যে, ভবিষ্যৎ আক্রমণ পরিচালনার জন্য সম্ভাব্য সব রকমের সাহায্যের জন্য তিনিই দায়ী। সব সময় তাঁর ও স্টাফেল সক্রিয় সহযোগিতা পাব বলে আশ্বাস দিলেন। দুর্যোগময় চারটি মাসের ব্যথা-বেদনা, হতাশা ও অনিশ্চয়তার মাঝে এই প্রথমবারের মত সক্রিয় আশ্বাসের বাণী শুনলাম। এই প্রতিশ্রুতি আমাকে ভরসা দিল, সাহস যোগালো। আমর ঝিমিয়ে পড়া মনটাকে আবার আশা- আনন্দের নতুন উদ্দীপনায় সজীব করে আরও কঠিনভাবে শত্রুপক্ষের উপর আঘাত হানার জন্য ফিরে এলাম আমার সদর দপ্তরে হাসানাবাদে।

এক এক দলে ছ'জন করে মোট ষাটজন মুক্তিযোদ্ধাকে জুলাই মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে খুলনা পাঠিয়ে দিলাম। উদ্দেশ্য, শহরের ভেতরে ও চতুর্দিকে গেরিলা ঘাঁটি স্থাপন করা। মুক্তিযোদ্ধাদের বলে দিলাম, প্রাথমিক কাজ সমাধা করার পর যারা পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে, তাদেরকে আমার ঘাঁটিতে ফেরৎ পাঠিয়ে দিতে- যাতে করে ওরা চেনা গোপন পথ ধরে পরপর গেরিলা দলকে বাংলাদেশের ভেতরে নিয়ে যেতে পারে। এই গিরিলা পদ্ধতি প্রবর্তন করার প্রথম উদ্দেশ্য হলো বিকল্প গোপন পথ খুঁজে বের করা। দ্বিতীয়তঃ নির্ভরযোগ্য স্থানীয় লোকদের সহায়তায় শহরের ভেতরে ও তার চতুর্দিকে গোপন ঘাঁটি স্থাপন করা। তৃতীয়তঃ পথপ্রদর্শকদের ফেরত পাঠিয়ে খবরাখবর আদান-প্রদান কর। তখনকার দিনে এই কাজগুলো সমাধা করা খুবই কষ্টসাধ্য ছিল। কেননা, পাকিস্তানী পশুগুলোর হিংস থাবা গ্রামবাংলার সব জায়গায় তখন ছড়িয়ে পড়েছে। তবুও অকুতোভয় মুক্তিযোদ্ধারা কঠিন আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান। ওদের ভেতর কোন রকম অনিচ্ছা বা বিষাদের ভাব খুঁজে পেলাম না। এমন কি ওদের তীব্র চোখেমুখে দেখতে পেলাম চরম উত্তেজনা ও প্রতিহিংসার দুর্বার আগুন। ওদের এই আত্মবিশ্বাসের দুটো কারন হতে পারে। প্রথমতঃ খুলনার অধিবাসী দ্বিতীয়তঃ পাকিস্তানী হানাদাররা নারকীয় ধ্বংসযজ্ঞে মেতে উঠলেও ভেতরের জনসাধারণের আওয়ামী লীগের উপর আস্থা ছিল। গেরিলাদের কাছে ছিল স্টেনগান গ্রেনেড ও চাকু। ওদের নিরাপত্তা ও পথে যদি ওরা হঠাৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে অথবা শত্রুর সামনে পড়ে তাহলে ওদের মোকাবেলা করার জন্য কিছু হালকা ধরনের বিস্ফোরক দ্রব্যও সাথে দিয়ে দিলাম। প্রাণঢালা আশীর্বাদ করে আগের নির্দেশানুযায়ী ওদের বিভিন্ন রাস্তায় পাঠিয়ে দিলাম।

সময়টা ছিল ১৪ই জুলাইয়ের রাত্রি। শত্রুপক্ষের সামরিক যন্ত্রটাকে স্তব্ধ করার জন্য শিল্প এলাকায় আমার দ্বিতীয় পর্বের আক্রমণ শুরু হলো। শিল্প এলাকাগুলোর কার্যক্ষমতা অচল করে দিরতে পারলে সামরিক যন্ত্রটাকে বাঁচিয়ে রাখার মত হানাদারদের অর্থের অনটন ঘটবে। এই কাজটা খুবই মর্মান্তিক। কেউই চায় না তার নিজের দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো ক্ষতিসাধন বা ধ্বংসপ্রাপ্ত হোক। এছাড়া কোন উপায় ছিল না। কেননা, আমাদের সামগ্রিক সাফল্য অর্জনের জন্য এ কাজটা ভয়ানক প্রভাব বিস্তার করবে এবং সেই সঙ্গে শত্রুপক্ষের আক্রমণধারাও পংগু করে দেবে। ইতিমধ্যে ক্যাপ্টেন হুদাও তার ঘাঁটি থেকে আক্রমণের গতি বেশ সন্তোষজনকভাবে বাড়িয়ে দিল। জুলাই মাসের শেষ নাগাদ ৩৫ জনের ছোট্ট বাহিনীটি বাড়তে বাড়তে ৩৩০ জনে এসে দাঁড়ালো। শত্রুপক্ষের উপর রীতিমত আক্রমণ চালিয়ে তারা বেশ কিছুটা সাফল্য অর্জন করলো। বেগের অক্লান্ত সহযোগিতায় হুদা পাকবাহিনীর তিনটি সীমান্ত ঘাঁটি ধ্বংস করে দেয়। এর ভেতর ছিল দক্ষিণে উকসা, বসন্তপুরের উত্তরে দেবহাটা ও খানজী সীমান্ত ফাঁড়ি। মাইন, ডিনামাইট ও গ্রেনেড বিস্ফোরণে ওই ফাঁড়িগুলো সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। উকসা অঞ্চলে পাকিস্তানী সৈন্যরা পাহারায় বেরুলে মুক্তিযোদ্ধারা কিভাবে ওদের কাবু করেছিল, সে সম্বন্ধে হুদা আমাকে একটি চমকপ্রদ কাহিনী শোনালো। ওঁৎ পেতে পাকিস্তানী সৈন্যদের উপর আঘাত হানার জন্য জুলাই মাসের ২৮ তারিখ ক্যাপ্টেন হুদা ১৫ জন মুক্তিযোদ্ধার একটি দল নিয়ে ইছামতি পার হলো। পাকিস্তানী সৈন্যরা উকসা ঘাঁটিতে খুব ভোরে পাহারায় বেরুতো। হুদা ও তার সাথের লোকের একটা খুঁটির সাথে 'জয় বাংলা' পতাকা লটকিয়ে তার চারিদিকে 'এন্টিপার সনাল' মাইন পুঁতে রেখে নিকটবর্তী একটা ধানক্ষেতের মধ্যে লুকিয়ে থাকে। হঠাৎ করে ওরা ফিস ফিস শব্দে শুনতে পেল। পাকিস্তানী সৈন্যরা তাদের দিকে এগিয়ে আসছে। তখনও গাছের ফাঁকে ফাঁকে কিছু কিছু আবছা অন্ধকার। হুদা ও তার সাথের লোকজন জলভর্তি ধানক্ষেতের মধ্যে চুপচাপ প্রস্তুত হয়ে রইলো। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ হানাদাররা

এদিকে আসলো না। উড়ন্ত 'জয় বাংলা' পতাকাটা চোখে পড়তেই মাথাভারী কুত্তার দল তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলো এবং ওটাকে নামিয়ে পুড়িয়ে ফেলার জন্য বিশ্রী ভাষায় গালিগালাজ করতে করতে ছুটে আসলো। আর যায় কোথায়? সমস্ত পৃথিবীটাকে কাঁপিয়ে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। হাতির মত পাকিস্তানী দৈত্যগুলো টুকরো টুকরো হয়ে ছিটকে পড়লো এবং হুদা তার লোকজন ও শত্রুদের পরিত্যক্ত অস্ত্র নিয়ে নিরাপদে ঘাঁটিতে ফিরে এলো।

আমার মনে পড়ে, 'ভট্টাচার্য' নামক দশ বছরের একটি ছেলে বেগের বিশেষ 'বাহিনীতে' যোগ দেয়। এই বিশেষ বাহিনীটির নাম 'হার্ড কোর অব সার্জেন্টস'। এর বিশেষত্ব ছিল বারো বছরের উর্দ্ধে কোন বালককে এই বাহিনীতে নেয়া হতো না। নতুন এসেও, ভট্রাচার্য কঠিন পরিশ্রমের বলে সার্জেন্ট মেজরের পদে উন্নতী হলো। সে নিজে অনেক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। উপরন্তু, চারদিকে শত্রুথাকা সত্ত্বেও তাদের অবস্থান, শক্তি, সাতক্ষীরা- কালিগঞ্জ রাস্তায় পারুলিয়া ব্রীজের খুঁটিনাটি-সব মূল্যবান সংবাদ সংগ্রহের জন্য তার ক্ষুদে বাহিনীকে যোগ্যতার সাথে পরিচালনা করেছি। পারুলিয়া ব্রীজটা লম্বায় প্রায় ১৫০ ফুট। এই ব্রীজের উপর দিয়েই হানাদাররা তাদের রসদসম্ভার, অস্ত্রশস্ত্র কালিগঞ্জ ও বসন্তপুরের নিয়ে যেত। ব্রীজটার উপর হামলা চালানোর দিন ভট্রাচার্য রাতের অন্ধকারের মধ্যে হামাগুড়ি দিয়ে ব্রীজের এক প্রান্তে পাহারারত সান্ত্রীদের কয়েক গজের মধ্যে গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো। আর এদিকে বেগ ব্রীজের নিচে বিস্ফোরক দ্রব্য রেখে দিল। সংকেত দিতেই এই দশ বছরের সার্জেন্ট মেজরটি ঝোপের আড়াল থেকে শত্রুর দিকে গ্রেনেড ছুড়ে মারলে কোনদিক থেকে গ্রেনেড ছুঁড়েছে টের পাবার আগে সান্ত্রীরা মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। তারপর সার্জেন্ট মেজরটি তার ছোট্ট কনুইয়ের উপর ভর করে হামাগুড়ি দিয়ে পূর্বনির্ধারিত স্থানে বেগের সাথে এসে মিলিত হলো এবং নীরব অপেক্ষা করতে লাগলো কখন বিস্ফোরণের ভয়ানক গর্জনটা কানে ভেসে আসবে। দীর্ঘমেয়াদী বিস্ফোরক দ্রব্য বুকে নিয়ে ব্রীজটা অসম্ভব সকমের নীরব ও শান্ত। মগজহীন হানাদার সান্ত্রীরা ভারী বুট পায়ে ব্রীজের অপর প্রান্তে পায়চারি করছিলো। বেগ হাতঘড়িটার দিকে তাকালো। সময় আসন্ন। উহ কি ভয়ানক উত্তেজনা। প্রচণ্ড শব্দ করে ব্রীজের বেশীর ভাগ অংশ উড়ে গেল। আর পোশাক পর পাকিস্তানী পশুগুলো চিরদিনের জন্য ভেসে গেল স্রোতের জলে।

আমাদের উপর্যুপরি সাফল্যে একদিন যেমন মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবল উন্নত হলো, অন্যদিকে অনেকগুলো অসুবিধাও দেখা দিল। কেননা, মুক্তিযোদ্ধারা ঘন ঘন আক্রমণ করায় পাক হানাদাররা ক্ষেপে গিয়ে সীমান্ত অঞ্চলের লোকজনের উপর চরম অত্যাচার আরম্ভ করলো। ওদের অকথ্য অত্যাচারের ফলে স্থানীয় লোকজন আমাদের উপর কিছুটা বিরূপ মনোভাবাপন্ন হয়ে উঠলো। এর ফলে আমাদের গেরিলা কৌশল অনেকটা ব্যাহত হলো। বেসামরিক জনসাধারণ আমাদেরকে শত্রুমনে করতো না। কোন অঞ্চল মুক্ত হলে সেখানে আমরা অবস্থান করি, এটা তারা মনে মনে সব সময় কামনা করতো। কিন্তু নানান অসুবিধার জন্য আমরা মুক্তাঞ্চলে থাকতাম না। প্রথমতঃ প্রকৃতপক্ষে কোন জায়গা দখলে রাখা আমাদের উদ্দেশ্য ছিল না, দ্বিতীয়তঃ আমাদের ছেলেরা আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত নয়। তৃতীয়তঃ লোকসংখ্যা ও অস্ত্রশস্ত্রের দিক দিয়ে ওরা আমাদের চাইতে অনেক উন্নত। খণ্ডযুদ্ধ চালাবার মত শক্তি আমাদের ছিল না। সুতরাং একমাত্র কৌশল আমাদের সামনে যা খোলা ছিল, সেটা হলো সেই পুরানো কায়দা-'আক্রমণ করো এবং পালিয়ে এসো।' এই কৌশল আবলম্বন করায় যুদ্ধক্ষেত্রের চারদিকের নিরীহ লোকদের জীবনে নেমে আসলো অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট। কিন্তু আমাদের কোন বিকল্প পন্থাও ছিল না।

শাসনকার্য পরিচালনার জন্য কিছু লোক হিংগলগঞ্জ রেখে ক্যাপ্টেন হুদা ইতিমধ্যেই তার দপ্তর উকসা নিয়ে এসেছে। উকসায় তাঁকে পর্বতপ্রমাণ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কেননা, নদীর তীর বরাবর উঁচু বাধ ছাড়া আর কোন জায়গা ছিল না, যেখানে মুক্তিযোদ্ধারা শত্রুর মোকাবেলা করার জন্য ঘাঁটি গেড়ে বসতে পারে। বাঁধের নীচে যতদূর চোখ যায় শুধু কর্দমাক্ত ধানক্ষেত। অন্য কোন উপায় না থাকায় বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচার জন্য গর্ত খুঁড়ে তার মধ্যে মাথা গুঁজতে হতো। তাড়াতাড়িতে খোঁড়া এই ব্যুহগুলো প্রবল বৃষ্টির ঝাপটা সহ্য করতে পারতো না। এই মুক্তিযোদ্ধারা অনেক সময় বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে ভিজতো। বেশীর ভাগ সময়আধপেটাখেয়েদিন কাটাতো। কেননা, রান্নাবান্না করার অনেক অসুবিধাও ছিল। যুদ্ধে পাঠিয়ে দিয়ে হুদা ওদের মনোবল বাঁচিয়ে

রেখেছিল। ভাবতে অবাক লাগে, মুক্তিযোদ্ধাদের খাওয়ার চাইতে যুদ্ধের দিকে আসক্তি ছিল বেশী। শত্রুর উপর হামলা করার জন্য ক্যাপ্টেন হুদা ও সহ-অধিনায়ক বেগ দুশো মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে একদিন রাতে শ্যামনগরের দিকে অগ্রসর হলো। সময়টা এমনভাবে নির্ধারিত করা হয়েছিল যে রাত্রে রওনা হয়ে ভোর হওয়ার কিছু আগেই শ্যমনগর পৌছে যায়-যাতে করে মুক্তিযোদ্ধাদের ছোট ছোট দলে ভাগ করে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বসিয়ে দেয়ার জন্য যথেষ্ট সময় হাতে পাওয়া যায়।

ছোট ছোট ছেলেদের পক্ষে ধানক্ষেতের মধ্য এই দীর্ঘ পথ হেঁটে যাওয়া খুব আরামদায়ক ছিল না। নিচে পায়ে কাঁটার আঘাত, উপরে ঠাণ্ডা বাতাস আর বৃষ্টি মাথায় নিয়ে ওরা অন্ধকারের ভেতর এগিয়ে চললো শ্যামনগরের দিকে। পথের সাময়িক বাধাকে ওরা ভ্রূক্ষেপই করলো না। কেননা ওদের অন্তরে ছিল বাংলার সোনালী ভবিষ্যৎ আর শত্রুর প্রতি হিংসার চরম আগুন। সারাদিন তীব্র সংঘর্ষের পর সন্ধ্যা নামতেই শত্রুপক্ষের কামান, মর্টার, মেশিনগান স্তব্ধ হয়ে গেল এবং হানাদাররা চরম পরাজয় বরণ করলো। যুদ্ধক্ষেত্রের কিছু পেছনে শত্রুপক্ষের পঞ্চাশজনের একটা দল বেতারযন্ত্র ও ভারি অস্ত্রপাতি নিয়ে আবস্থান করছিল। ওদের মর্টার ও কামানের গুলি শ্যামল-শস্যক্ষেত পুড়িয়ে ছারখার করে দিল। কিন্তু আমাদের বিশেষ ক্ষতি করতে পারলো না। শত্রুপক্ষের লোকজন পালিয়ে যাবার সময় পথে গোপন স্থানে লুকিয়ে থাকা আমাদের ছেলেরা অতর্কিত ওদের উপর হামলা চালিয়ে খতম করে দেয়।

শ্যামনগর থেকে পালাবার দুটো মাত্র পথ খোলা ছিল। একটা ভেটখালির দিকে, অন্যটা বসন্তপুরের দিকে। এই দুটো রাস্তাতেই হাবিলদার সোবহান ও মুক্তিযোদ্ধা লিয়াকতের অধীনে আমাদের ছেলেরা ওঁৎ পেতে বসে ছিল। লিয়াকত দুর্দান্ত সাহসী। নবেম্বর মাসের কোন সময়ে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীতে অফিসার পদের প্রশিক্ষণের জন্য চলে যায়। শ্যামনগরের উপরে এই আক্রমণ আমার সেক্টরে একটা বিরাট বিজয়। এই বিজয়ে জনসাধারণেরও মনোবল অনেকাংশে বেড়ে গেল। শত্রুপক্ষের ক্ষতির তুলনায় আমাদের তেমন বিশেষ ক্ষতি হয়নি। ওদের অনেক লোকজন মারা যায়। আমাদের চারটি ছেলের মধ্যে মারাত্মকভাবে দু'জন জখম হয়। আর দু'জন সামান্য আঘাত পায়।

শ্যামনগর মুক্ত হওয়ায় জনগণের চক্ষু খুলে গেল। ওরা এই প্রথমবারে মত মুক্তিবাহিনীর শক্তির পরিচয় পেল। হুদার কাছে খবর পাঠালাম, যেভাবেই হোক একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত শ্যামনগর আমাদের দখলে রাখতেই হবে। কেননা, আমার ইচ্ছা দখলক্রত রাস্তা ধরে খুলনা, মংলা ও চালনা পোর্টে মুক্তিবাহিনী পাঠিয়ে দিয়ে শত্রুর উপর আঘাত হানবো। আমার নির্দেশমত হুদা ও বেগের উপর শ্যামনগরের সমস্ত দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে কালিগঞ্জ-বসন্তপুর অঞ্চলে শত্রুপক্ষের উপর হামলা জোরদার করার জন্য সে নিজেই হিংগলগঞ্জে ছুটে এলো।

পদাতিক বাহিনীর দ্বারা সাহায্যপুষ্ট শত্রুপক্ষের একদল সৈন্য এই অঞ্চলে ঘাঁটি গেড়ে বসেছিল। ওরা নদীপথে ইছমতী দিয়ে যাতায়াত করতে পারতো না। কিন্তু ওদের গানবোটগুলো কালিগঞ্জ বরাবর যমুনা নদী দিয়ে দক্ষিণে পাইকগাছা পর্যন্ত পাহারা দিত। যাতায়াত ও সরবরাহ ব্যবস্থা অব্যাহত রাখার এটাই প্রধান রাস্তা। শত্রুদের সরবরাহ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করার জন্য উত্তর-পূর্বদিকে যমুনার তীর বরাবর গেরিলা ঘাঁটি স্থাপন করার জন্য ক্যাপ্টেন হুদাকে একটা পরিকল্পনা তৈরী করে দিলাম। যখন খবর পাওয়া গেল যে, পাকিস্তানী গানবোটগুলো যমুনায় পাহারা দিয়ে বেড়াচ্ছে, তখন ভারতীয় সেসাবাহিনীর একটা দল 'রিকয়েললেস' রাইফেল নিয়ে হিংলগঞ্জ এসে ঘাঁটি গাড়লো। এই দূরপাল্লার রাইফেল দিয়ে গানবোটগুলোকে সহজেই আঘাত করা যায়। সেন বর্মা নামে একজন অল্পবয়স্ক লেফটেন্যান্ট এই বাহিনীর অধিনায়ক। ভারতের প্রধান নির্বাচনী কমিশনার মিঃ সে বার্মার পুত্র। পূর্বে বরিশাল জেলার অধিবাসি ছিলেন। এ সময় ভারতীয় সৈন্যরা সরাসরী মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতো না। প্রয়োজনবোধে মুক্তিযোদ্ধারা কোন সাহায্য চাইলে ভারতীয় সৈন্যরা পিছন থেকে শত্রুপক্ষের উপর গোলাবর্ষণ করতো। কিন্তু প্রতিভাদীপ্ত যুবক এই সেন বর্মাকে বাধা দেবে? সে ক্যাপ্টেন হুদার ইছামতী

পার হয়ে হানাদারদের উপর ক্ষিপ্রগতিতে আক্রমণ চালিয়ে আবার এপারে ফিরে আসতো। ক্যাপ্টেন হুদা লেঃ সেন বর্মাকে সহযোগী হিসাবে পেয়ে খুবই খুশী হলো।

আক্রমণ পরিচালনায় হুদার যোগ্যতার উপর সম্পূর্ণ আস্থা রেখে আমি ফ্লাইট সার্জেন্ট সলিমুল্লাহকে নিয়ে শমসেরনগরে যুদ্ধ পরিচালনা ঘাঁটি স্থাপন করার পাকাপোক্ত সিদ্যান্ত নিলাম। সলিমুল্লাহ শক্তিশালী ও সাহসী। তখনকার পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য তাকেই উপযুক্ত মনে করলাম। হাসনাবাদে আমার যে লঞ্চটি ছিল তাকে করে ত্রিশজন মুক্তিযোদ্ধাকে সলিমুল্লাহর অধীনে শমসেনগর পাঠিয়ে দিলাম। শমসেরনগর অনেক দূরে রায়মংগল নদীর তীরে অবস্থিত। এই জায়গাটার অনেক রকমের অসুবিধা ছিল। কিন্তু আমার সার্বিক যুদ্ধ পরিচালনার জন্য স্থানটার গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। প্রথমতঃ আমি চাচ্ছিলাম সমগ্র সুন্দর বনাঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করে বাংলাদেশের অভ্যান্তরে গেরিলা ঘাঁটিগুলোতে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরবরাহের জন্য একটা নিরাপদ রাস্তা। দ্বিতীয়তঃ আমি ভাবছিলাম বাংলাদেশের অভ্যান্তরে একটা আক্রমলকারী দল পাঠিয়ে বরিশাল, পটুয়াখালী ও গোপালগঞ্জে যেসব বিক্ষিপ্ত মুক্তিবাহিনী শত্রপক্ষের উপর আক্রমণ পরিচালনা করে তাদের সাথে একটা সুষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন করা। মুক্তিযোদ্ধাদের কোন তাঁবু, রেশন ও পোশাক না থাকা সত্ত্বেও সলিমুল্লাহ হৃষ্টচিত্তে শুধুমাত্র সাহসের উপর ভর করে আগস্ট মাসের শেষদিকে শমসেরনগরে ঘাঁটি স্থাপন করতে উঠে পড়ে লেগে গেলো। বর্ষা ঋতুতেই সে ঘাঁটি বানাবার মনস্থ করলো। শমসেরনগরে ভারতীয় সীমান্তবর্তী ফাঁড়ির আধ মাইল দক্ষিণে নদীর তীরে বাঁশ দিয়ে একটা ঘাঁটির মত তৈরী করা হলো। এর চতুর্দিকে কাদাপানি। ওকে যে কাজের ঘাঁটিটার চারদিক জলকাদা। আসলে সলিমুল্লাহ সাহেব একজন কেতাদুরস্ত লোক। বর্ষা ও কাদামাটির ভেতর যখন মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে বেরিয়ে পড়তো, তখন ফ্লাইট সার্জেন্ট সলিমুল্লাহকে খুবই খুশী মনে করত। বিশেষভাবে তাগিদ দেয়ায় তার ছেলেদের জন্য বর্ষাতি পাঠিয়ে দিলাম। সপ্তাহ শেষে প্রয়োজনীয় রেশনপত্র পাঠিয়ে দিতাম। সলিমুল্লাহর তেমন আর কোন অভিযোগ ছিল না। শুধু প্রধান লঞ্চচালক মোশাররফ মিয়া মাঝে মাঝে অস্ত্রশস্ত্রের একটা বড় তালিকা নিয়ে হাজির হতো।

শমসেরনগর যাবার কিছুদিন পরেই কৈখালিতে পাক বাহিনীর উপর উপর্যুপরি কয়েকবার হামলা চালিয়ে সীমান্তবর্তী ঘাঁটিটা অধিকার করি এবং সরাসরি এপারে সলিমুল্লাহ আর একটা ঘাঁটি স্থাপন করে। ইতমধ্যে সুন্দরবনের 'রাজা' নওয়াবদীর সাথে তার পরিচয় হয়। সুন্দরবন এলাকায় এই নওয়াবদী রূপকথার সেই কালো দৈত্যটার মত। বেশ বড় মুখমণ্ডল। সারামুখ ভর্তি দাড়ি। প্রায় ছ'ফুট লম্বা। দেহগঠন অত্যান্ত সুদৃঢ়। সারা সুন্দরবন এলাকায় সে একটা ভয়ানক ত্রাস। তার একমাত্র ব্যবসা চোরাচালানি। পূর্বের কুকীর্তি সত্ত্বেও, যখন আমি সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে তার সাথে দেখা করলাম তখন আমার কাছে সে অত্যান্ত লাজুক, ভদ্র ও অতিথিপরায়ণ বলে মনে হলো। হ্যাঁ, মনে পড়ছে, তারিখটা ৩রা সেপ্টেম্বর।

আমার সেক্টরের একটা লঞ্চে করে যাচ্ছিলাম। আমার অধীনস্থ লঞ্চগুলো শীগগীরই 'বাংলাদেশ নেভি' নামে পরিচিত হলো। সেপ্টেম্বরের শেষদিক আমার নৌ-বাহিনীতে ৬ টা মটর লঞ্চ যোগাড় করা হয়। এগুলো শত্রবাহিনীর কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছিল। শুধুমাত্র যাতায়াত ব্যবস্থার জন্য নিয়োজিত রাখার চাইতে আমি ভাবলাম, এগুলোকে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করে গানবোটের কায়দায় ব্যবহার করা ভাল। সর্বধিনায়ক কর্নেল ওসমানীর কাছে আমি আমার পরিকল্পনার কথা জানাতেই তৎক্ষণাৎ রাজী হয়ে গেলেন। তারপর অধিনায়ক মুখার্জীর আন্তরিক প্রচেষ্টায় ভারতীয় বাহিনীকে অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে আমার ছ'টি লঞ্চের জন্য ৫০টি ব্রাউনিং বিমানবিধ্বংসী মেশিনগান নিয়ে এলাম। হালকা মেশিনগান ও ছোট ধরনের অস্ত্রশস্ত্র চালাবার জন্য এক একটি লঞ্চে দশজন করে নাবিক মোতায়েন করলাম। আমার ভাগ্য ভাল যে, আমি সব নৌ-বাহিনীর লোকজন পেয়ে গিয়েছিলাম। আগে তারা পাকিস্তান নৌ-বাহিনীতে চাকরিরত ছিল। বদরে আলম নামে একজন বেশ অভিজ্ঞ লোকের অধীনে নৌ-বাহিনীর এইসব লোকজনকে একত্র করলাম। যুদ্ধের সময় বদরে আলমকে সম্মানসূচক লেফটেন্যান্ট পদে ভূষিত করা হয়। লেঃ খুরশীদ এই নৌ-বাহিনী গড়তে আমাকে সাহায্য করেছে। এইসব

লোকদের যোগাড় করার জন্য সে একসেক্টর থেকে আর এক সেক্টরে অক্লান্তভাবে ঘুরে বেরিয়েছে। ছেলেরা মানের মত কাজ পাওয়ায় ওর উপর খুব কৃতজ্ঞ হলো। আমার এই সংস্থাটি পরে 'বাংলাদেশ নৌবাহিনী' নামে পরিচিত হয়ে ভয়ানক উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল। এই বাহিনীর উপর প্রথম কাজ দেয়া হলো, সুন্দরবনের অভ্যন্তরে গেরিলা ঘাঁটিগুলোতে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র রীতিমত সরবরাহ করা। দ্বিতীয়তঃ নদীতে আক্রমণাত্বক পাহারা দেয়া। তৃতীয়তঃ নৌ-সংক্রান্ত কাজকর্ম সুসমাধা করা। নৌ-সংক্রান্ত কাজকর্ম বলতে বুঝায়-মুক্তিযোদ্ধাদের একটি নির্দিষ্ট ঘাঁটিতে নামিয়ে দেয়া। তারপর কাজ সমাধা হলে আবার তাদের ফিরিয়ে নিয়ে আসা।

সেপ্টেম্বরের ৩ তারিখ রাত্রে যার সাথে দেখা হয়েছিল, সুন্দরবনের 'রাজা' সেই নওয়াবদী প্রসঙ্গে ফিরে আসি। হাসনাবাদ থেকে দীর্ঘ পাঁচ ঘণ্টা লঞ্চে থাকার পর শমসেরনগর পৌছলাম। তখন রাত গাঢ় অন্ধকার। মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছিল। এত অন্ধকার যে দু'গজ সামনে পর্যন্ত দেখা যায় না। চালকের পক্ষে লঞ্চ চালনা করা বেশ কষ্টকর হয়ে উঠলো। সার্চলাইটের আলোতে বেশীদুর দেখা যায় না। প্রমত্তা রায়মঙ্গল এর উপর ভেসে বেড়াচ্ছি। হঠাৎ তীর থেকে আমাদের উপর টর্চলাইটের আলো এসে পড়লো। অনুসন্ধানে জানতে পারলাম যে, ওটা ভারতের সীমান্ত ফাঁড়ির আলো। ওই ফাঁড়ির লোকেরা সলিমুল্লাহর আস্তানায় পৌছতে আমাদেরকে যথেষ্ট সাহায্য করলো। এই সময় বৃষ্টির মধ্যে দেখতে পেয়ে সলিমুল্লাহ আনন্দে আত্মহারা। ওখানকার সব ছেলের সাথে আমি দেখা করলাম। বৃষ্টির ঝাপটা এসে বাঁশের ঘরের মধ্যে ঢুকছিল। এই বর্ষার রাত্রেই সুন্দরবনের 'রাজা' নওয়াবদীর সাথে আমার দেখা হয়। পাক-বর্বরদের নৃশংস অত্যাচারে টিকতে না পেরে সুন্দরবনের হরিনগর গ্রামের তার পৈতৃক ভিটামাটির মায়া ত্যাগ করে ঝড়ের মধ্যেই পরিবারের সবাইকে তিনটি নৌকায় নিয়ে নওয়াবদী বেরিয়ে পড়ে। সুন্দরবনের রাজার চোখে জল। সে স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি যে, তার জীবনে এমন দুঃখের দিন কখনো আসবে এবং পিতৃপুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে চলে যেতে হবে। হারিকেনের আবছা আলোতে দেখতে পেলাম তার চোখে প্রতিহিংসার আগুন। চপলমতি ছোট্ট বালকের মত হঠাৎ সেই শক্ত মানুষটা ডুকরে কেঁদে উঠলো। সে আমাকে জানালো যে, মাত্র চারটা রাইফেল পেলে আজ রাত্রেই তার পরিবারের লোকজন নিয়ে সে গ্রামে ফিরে যাবে। তক্ষুনি তাকে চারটা রাইফেল দিয়ে দিলাম। নিকষ কালো লোকটা প্রচণ্ড উল্লাসে সাদা দাঁতগুলো বের করে দুরন্ত বাতাসের সাথে দৈত্যের মত অন্তর্হিত হলো। এর ফলে শীগগীরই সে সুন্দরবনের গভীরে আমাদের গেরিলা ঘাঁটি প্রসারিত করতে নিষ্ঠার সাথে সাহায্য করেছিল।

বেগের একটি 'যুদ্ধবাহিনী' ছিল। তারা সবাই স্বেচ্ছাসেবী। বাংলাদেশের যে কোন জায়গায় যে কোন ঝুঁকি নিতে তারা সর্বদা প্রস্তুত থাকেতো। সংখ্যায় সব মিলিয়ে দুশো হবে। সবাই যুদ্ধ করার মত উপযুক্ত। যা কল্পনা করেছিলাম- সেই প্রস্তুতি, সেই উৎকর্ষতা ওদের মাঝে দেখতে পেয়ে আমি সুন্দরবনের গভীরে গেরিলা ঘাঁটি স্থাপন করার লোভ সামলাতে পারলাম না। সুন্দরবনটা দেখতে প্রায় ভিয়েতনামের হো চি মিন সড়কের মতো। কোন কারণে যুদ্ধ বিলম্বিত হলে, প্রাকৃতিক গুপ্তস্থানে ভরপুর এই সুন্দর বনাঞ্চল ছাড়া বাংলার আর কোন জায়গা এতটা সুবিধাজনক নয়। ব্যূহ রচনার কৌশলাদি ঠিকমত নিরূপণ করে এই অঞ্চলে যদি ঘাঁটি স্থাপন করা যায় তাহলে মুক্তিযুদ্ধ যে কোনভাবে যে কোন সময়সীমা পর্যন্ত চালিয়ে নেয়া সম্ভব হবে। এই পরিকল্পনা মনে রেখে কৈখালিতে সলিমুল্লাহর জায়গায় বেগকে বসিয়ে দেয়ায় আমি তাকে শ্যামনগর থেকে নিয়ে এলাম। কাজ শুরু করার প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবে বেগকে বুড়ি গোয়ালিনী, হরিনগর ও মুন্সিগঞ্জে ঘাঁটি স্থাপন করার দায়িত্ব দিলাম। ফ্লাইট সার্জেন্ট সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে রাতের বেলায় অতর্কিত হামলা চালিয়ে দু'জন পাকিস্তানী সৈন্য ও কয়েকজন রাজাকার খতম করে এক সপ্তাহ আগে এই 'বুড়ি গোয়ালিনী' অধিকার করা হয়। বুড়ি গোয়ালিনীতে বন বিভাগের অফিস ও একটা শক্তিশালী ট্রান্সমিটার ছিলো।

দুঃসাহসিক কাজের জন্য সলিমুল্লাহকে সম্মানসূচক লেফটেন্যান্ট পদে উন্নীত করা হয়। এই বুড়ি গোয়ালিনী অধিকার করা আমাদের পক্ষে একটা বিরাট সফলতা। কেননা, এখান থেকেই পাক সৈন্যরা সুন্দরবনের ভেতরে ও অগ্রভাগে আমাদের চলাচলের উপর নজর রাখতো এবং খবর সংগ্রহ করতো। উল্লেখ করা যেতে পারে যে,

এই ট্রান্সমিটারটাই আমার যাত্রার উদ্দেশ্যটা ব্যর্থতার পর্যবসিত করেছিল। সলিমুল্লার কাছ থেকে দায়িত্ব নেওয়ার পর বেগ ও তার বাহিনী শত্রুপক্ষের হামলা করার জন্য অস্থির হয়ে উঠলো। গানবোটগুলির উপর আঘাত করার জন্য বেগ সবসময় ওঁৎ পেতে প্রস্তুত হয়ে থাকতো। বুড়ি গোয়ালিনি পতনের পর পাক হানাদাররা মাঝে মাঝে আমাদের ঘাঁটির নিম্নাঞ্চল গানবোট নিয়ে পাহারায় বেরুতো। অক্লান্ত পরিশ্রম করে ও উপর্যুপরি কয়েকবার আক্রমণ চালিয়ে হরিনগর ও মুন্সিগঞ্জ থেকে হানাদার বাহিনী বিতাড়িত করে বেগ সেখানে গোপন ঘাঁটি স্থাপন করলো। এইসব ঘাঁটি থেকে বিতাড়িত হবার পর পাক হানাদাররা সহসা পাল্টা আক্রমণ করতো না। কোন কারণে তারা যেন নরম হয়ে গেল। আমরা কখনও আক্রমণ করলে হানাদাররা খুবই ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে উঠতো। বোধ হয় ওদের ভয় ধরেছিল যে, আমরা ওদের চারদিক দিয়ে ঘিরে ফেলেছি। কেননা একদিকে সুন্দরবনের উপরিভাগ থেকে বেগ ও তার দুঃসাহসী যোদ্ধারা শত্রুদের উপর ক্রমাগত আক্রমণ চালাচ্ছিল, আর অন্যদিকে দক্ষিণ শরণখোলা থেকে কঠিন আঘাত হানছিল ক্যাপ্টেন জিয়া।

মাত্র সীমান্ত পরিধির ভেতর সীমাবদ্ধ এই যুদ্ধে আমি খুশী ছিলাম না। কেননা, সীমান্ত এলাকা থেকে মাত্র কয়েক মাইল জুড়ে আমাদের মুক্তাঞ্চল গড়ে উঠেছে এবং পাকিস্তানের সুশিক্ষিত সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে সার্বিক বিজয় অর্জন করতে আমাদের বহু বছর লাগতে পারে। কারন ওরা বৃত্তাকারে সুদৃঢ় ব্যূহ রচনা করে দীর্ঘসূত্রতার কৌশল অবলম্বন করছে এবং যতই সময় যাচ্ছে, ওরা নিজেদের অবস্থার খুবই মজবুত করে নিচ্ছে। যদিও পাকিস্তানী হানাদাররা বৃত্তাকার যুদ্ধে লিপ্ত ছিল, তবুও তারা মানসিক দিক দিয়ে একদম ভেঙ্গে পড়েছিল। তৎসত্ত্বেও ওদের উপর বড় রকমের আঘাত হানার মত অবস্থান আমাদের ছিল না। তাছাড়া, মুক্তিযোদ্ধারা গেরিলা যুদ্ধ পদ্ধতি সম্বন্ধেও খুব বেশী পারদর্শী নয়। তাড়াতাড়িতে যেটুকু প্রশিক্ষণ পেয়েছিল, তাতে কোন কোন খন্ডযুদ্ধে সবাইকে একত্রে জড় হয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে দেখা গেছে। এটা আমাদের পক্ষে আত্মঘাতী স্বরুপ। যখনই আমাদের বড় রকমের একটা বিপর্যয় এসেছে, তখনই দেখা গেছে যে, এটা ওদের একত্রে জড় হবার চিরাচরিত অভ্যাসের পরিণত। যা হোক, সময়ে যুদ্ধ করে সফলতা আমরা অর্জন করেছি, তা থেকে পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছি যে, যুদ্ধকৌশল নয়-আক্রমণের গতিধারা ও আক্রমণাত্মক মনোভাবটাকে যদি বাঁচিয়ে রাখতে পারি, তাহলে ভবিষ্যতে আমাদের সফলতা আসবেই।

এই রুপরেখাটা মনে রেখে বিশদভাবে পরিকল্পনা তৈরী করলাম যে, দেশের প্রতি আনাচে-কানাচে মুক্তিযোদ্ধাদের ছড়িয়ে দিতে হবে ও আক্রমণের ক্ষেত্রকে প্রসারিত করতে হবে প্রতি থানায়। থানা থেকে গ্রামে। গ্রাম থেকে ঘরে ঘরে- যেন শত্রুরা পিছনে দেখতে 'আজরাইল' ওদের সামনে। যে হারে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধারা আমার নতুন ক্যাম্প 'বাকুনদিয়া' এসে জড় হচ্ছিল, তাতে ওদের জন্য যদি প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র যোগাড় করা যায়, তাহলে এই পরিকল্পনার রূপায়ণ মোটেই কষ্টকর নয়। বাকুদিয়া বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ব্যস্ততম ও বৃহত্তম পাদপীঠ- যেখানে মুক্তিগামী মানুষের এই মৃত্যুঞ্জয়ী কাফেলা প্রবল প্রাণোদ্দামে ভরপুর হয়ে এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হতে উল্কার মতো ছুটে গিয়েছিল ঐ মানুষখেকো বাঘ ও হিংস্র জন্তুর অবাধ লীলাক্ষেত্র সুন্দরবনের গভীর অভ্যন্তরে এবং বাংলার মাঠে-ঘাটে, প্রতিটি গ্রামে ও গঞ্জে।

গেরিলা অভিযান

৯ নং সেক্টর আমার অধীনে সর্বসাকুল্যে তিনখানা জীপ, একটি বাস ও একটি ট্রাক ছিল। এর ভেতরে মেজর ওসমানের কাছ থেকে নেয়া টয়োটা জীপটাও আছে। আমি ভাগ্যবান যে, গেরিলা পদ্ধতি প্রবর্তনের সময় এই যানবাহনগুলো পেয়েছিলাম। গাড়ী ও ট্রাকগুলো বৃষ্টির মধ্যে অনেক সময় চলতে পারতো না। এই গাড়িগুলোর অবস্থা খুবই শোচনীয় ছিল। কোননা মুক্তিযুদ্ধের প্রথম দিকে এই গাড়ীগুলো বাংলাদেশ থেকে নিয়ে আসা হয়। তারপর থেকে এর কোন রক্ষণাবেক্ষণই হয়নি। অবশ্য শেষের দিকে ১৯৭১ সালের আগস্ট মাসের কোন এক সময়ে ব্যারাকপুরের চার্লি সেক্টর পশ্চিম রণাঙ্গনের 'জয়বাংলা' গাড়ীগুলোর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নেয়।

এ কাহিনীর একটা দিক মাত্র। নৌকায় খালবিল দিয়ে গেরিলা পাঠানোর চেয়ে স্থলপথে পাঠানোর অনেকটা কম সমস্যা- সংকুল। স্থলপথে যারা যাবে তাদের শুধু রেশনের টাকা দিয়ে দিলেই সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। কিন্তু যারা জলপথে যাবে, তাদের জন্য চাই পথঘাট ভাল চেনে এইরকম উপযুক্ত মাঝি। এইমসয় ওই রকম মাঝি যোগাড় কারা খুবই দুষ্কর ছিল। ভাগ্য ভাল, এ ব্যাপারে আদম সন্তান পাচার করে এই রকম একজন চোরাচালানীর সাক্ষাত পেয়ে গেলাম। সারাজীবন সুন্দর বনের খাল বিল দিয়ে সে চোরাকারবার করেছে। সুতরাং মানচিত্রের চাইতেও সুন্দরবনের গোপন পথঘাটের খবর তার কাছে সঠিকভাবে পাওয়া যেত। সে প্রাণ দিয়ে কাজ করছে এবং কয়েক হাজার মুক্তিযোদ্ধাকে পথ দেখিয়ে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে বরিশাল, ভোলা ও পটুয়াখালীতে নিরাপদে পোঁছে দিয়েছে। তার নাম রইজুদ্দিন। এক সময়ের কোটিপতি। আজ তার সর্বস্ব পাকহানাদাররা কেড়ে নিয়েছে। বয়স পঞ্চাশের মাঝামাঝি, পতলা, কালো। এই রইজুদ্দিন ভয়ানক ধূর্ত ও চটপটে একদিন সে গর্ব করে বললো, ‘‘স্যার, হানাদারদের বাপের সাধ্য নেই আমাকে ধরে। কোননা, এই দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর ওদের চোখে ধুলো দিয়ে ‘কাম’ করে আসছি। কিন্তু খোদাকে বিশ্বাস করি। তিনি নারাজ হলে যে কোন মুহূর্তে আমি ধরা পড়তে পারি।

জুলাই মাসে ৬০ জন লোকের একদল মুক্তিযোদ্ধা খুলনার উদ্দেশ্য যাত্রা করেছিল। আরও দল, পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার পথপ্রদর্শকদের আগষ্ট মাসের শেষ সপ্তাহে ফেরত পাঠিয়ে দেবার কথা ছিল। কিন্তু ওরা মাত্র চারজন ফিরে এসে খবর দিল যে, রাজাকারদের জন্য খুলনায় থাকা খুবই কষ্টকর হয়ে উঠেছে। মুসলিম লীগের পান্ডরা বাঙ্গালীদের দিয়ে এই রাজাকার বাহিনী গঠন করেছে। জুন মাস থেকেই রাজাকার বাহিনীতে লোক ভর্তি বেড়ে যায়। কেননা, ওই সময়ে বেশীভাগ জোয়ান ছেলেরা প্রশিক্ষণের জন্য সীমান্ত পার হয়ে ভারতে চলে আসে। তখন থেকে আগষ্ট মাসের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত বাংলাদেশের অভ্যন্তরে একটা থমথমে ভাব। এই সময়ে রাজাকারদের ঘৃণ্য সহযোগিতায় পাক-বর্বররা নৃশংস হত্যাযজ্ঞের মাত্রা বহুলাংশে বাড়িয়ে দেয়। এর উপর এই সময়ে বিহারী মুসলমানদের নিয়ে গঠিত আর একটা বাহিনী দেশব্যাপী লুণ্ঠন, ধর্ষণ ও নারকীয় হত্যাযজ্ঞে মেতে উঠলো। এমনকি, ওদের প্রভুদের পশুপ্রবৃত্তিকে খুশি করার জন্য এই পা-চাটা কুকুরের দল নারী হরণ পর্যন্ত করতে এতটুকু সংকোচ বা দ্বিধা করলো না। এইসব হৃদয়বিদারক খবর শুনে আমরা যে কিরূপ মর্মাহত হয়েছিলাম, তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। সেই সঙ্গে প্রতিহিংসার অনির্বাণ শিখা প্রতিটি মুক্তিযোদ্ধার অন্তরে দাউ দাউ করে জ্বলতে লাগলো। সারা জুলাই মাস ধরে পুরো বর্ষা। দপ্তরে দপ্তরে প্রতিটি মুক্তিযোদ্ধা, অধিনায়ক এখনই এই মুহূতে শত্রুবাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুত। সবাই যুদ্ধংদেহী চিৎকারে ফেটে পড়লো। বর্ষাকালেই শত্রুর বিষদাঁত ভেঙ্গে ফেলে বাংলার পবিত্র মাটিতে যুদ্ধ করার চিরদিনের জন্য স্তব্ধ করে দিতে হবে। মোট কথা জুলাই, আগস্ট- এই দু'মাস মুক্তিযোদ্ধা ও রাজনীতিবিদ উভয়ের কাছেই ভয়ানক উত্তেজনাপূর্ণ। জাতির এই ক্রান্তিলগ্নে সবচেয়ে জরুরী কাজ হলো- বৃত্তাকার যুদ্ধে, শক্তি কেন্দ্রীভূত না করে বেশী সংখ্যায় দেশের অভ্যন্তরে মুক্তিযোদ্ধা পাঠিয়ে রাজাকার ও অন্যান্য গজিয়ে ওঠা সহায্যকারী সংগঠনগুলোর প্রসার এখনই স্তব্ধ করে দেয়া। আমাদের সর্বাধিনায়ক যে পরিকল্পনা তৈরী করেছিলেন, তাতেও এই গেরিলা বাহিনী প্রবর্তনের উপর বেশী জোর দেয়া হয়েছিল। তাই আমিও গেরিলা বাহিনী প্রবর্তনের জন্য একটা বিশদ পরিকল্পনা তৈরী করলাম। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী ফরিদপুর, বরিশাল, খুলনা ও পটুয়াখালী এই চারটি জেলাকে ১৯ টি অঞ্চলে বিভক্ত করা হলো। আগের কার্যক্রম অনুযায়ী এক একটি অঞ্চলে দু' একটি থেকে তিনটি থানা থাকবে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে আগে হতেই যেসব গেরিলা ঘাঁটি ছিল-তা সর্বমোট ৮৩টি। প্রতিটি জেলা, প্রতিটি অঞ্চল, প্রতিটি থানার দায়িত্ব যথাক্রমে একজন সামরিক অফিসার, একজন জুনিয়ার কমিশন অফিসার, অথবা অভিজ্ঞ নন-কমিশন অফিসার এবং বাছাই করা একজন ছাত্রের উপর ন্যস্ত থাকবে। সকল পর্যায়ে এদের সাথে থাকবে একজন করে সহ- অধিনায়ক।

আরও স্থির করলাম যে, উপরের সংখ্যানুযায়ী একই অনুপাতে রাজনৈতিক নেতারাও তাদের সহকারীদের নিয়ে এ ঘাঁটিতে থাকবেন-যেন গেরিলারা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সহযোগিতায় কার্যকরীভাবে আক্রমণের

তীব্রতা বৃদ্ধি করতে পারে। কেননা, আমি জানি যে, বাংলাদেশের অভ্যন্তরে রাজনৈতিক শক্তি সঞ্চয় ব্যতিরেকে, শুধুমাত্র সামরিক আক্রমণ পরিচালনা করেই আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবো না। রাজনৈতিক শক্তি এসে যোগ না দিলে যে কোন রকম সামরিক সফলতা, ঐক্যবদ্ধ, সমঝোতা ও সমন্বয়ের অভাবে চরম লক্ষ্যে পৌঁছা যাবে না। যা হোক, আমাদের সর্বাধিনায়ক এবং চার্লি সেক্টরের অধিনায়ক ব্রিগেডিয়ার এন. এ. সালিক আমার পরিকল্পনাটা অনুমোদন করলেন এবং তাড়াতাড়ি এর বাস্তবায়নের জন্য নির্দেশও দিলেন।

বিভিন্ন কেন্দ্রে গেরিলাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হত। আমি চারটি কেন্দ্রের খবর জানতাম। সেগুলো হলো, চাকুলিয়া ও মূর্তি বিহার প্রদেশে, একটি মেঘালয়ে ও অপরটি বীরভূম জেলায়। বিভিন্ন কেন্দ্রের ছেলেদের নিকটবর্তী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেওয়া হতো। বাংলাদেশের সাহায্য ও পুর্নবাসন মন্ত্রী জনাব কামরুজ্জামান ভারতীয় সাহায্য ও পুর্নবাসন মন্ত্রীর সহযোগীতায় এই যুব এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো পরিচালনা করতেন। বাংলাদেশ সরকার ভারত সরকারের সাথে আলোচনা করে সাধারন নীতিমালা গ্রহন করেন যে, পঞ্চাশ হাজার লোককে গেরিলা ও বিশ হাজার লোককে নিয়মিত সামরিক ট্রেনিং দিতে হবে। জুলাই মাসে সব সেক্টর কমান্ডারের যে আলোচনা সভা ডাকা হয়, তাতে মিঃ তাজউদ্দীন আহমদ (তখনকার প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী) একথা প্রকাশ করেন। আমাদের কেউ কেউ গেরিলা ও সৈন্য সংখ্যা এই নির্দিষ্ট অংকে সীমাবদ্ধ রাখার কারন জিজ্ঞেস করলেন। কেননা আমরা মনে করতাম যে, নূন্যতম সংখ্যার হয়তো সীমারেখা বেঁধে দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু উর্ধ্বতম সংখ্যার কোন সীমারেখা থাকা উচিত নয়। মনে হল এর কারন তিনি নিজেও জানতেন না। কাজেই অত্যন্ত দুঃখজনকভাবে এর কারন ব্যাখ্যা করতে তিনি ব্যর্থ হলেন। ভাবতে এখনও আশ্চর্য লাগে যে, মাত্র এই দুটো বাহিনীর উপর নির্ভর করে এত তাড়াতাড়ি তিনি বিজয়ের আশা করেছিলেন কোন আশ্বাসের উপর ভর করে?

যাহোক, এ সমস্যাটা গেরিলা যুদ্বের অগ্রগতিকে কোনক্রমেই ব্যহত করতে পারলো না। একজন বা দ'জন ছাড়া আমার সাথে কোন অভিজ্ঞ গেরিলা নেতা ছিলনা। যে দু'একজন ছিল তারা কাজকর্ম ভালই জানতো। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গেরিলারা, যারা সময় সময় আমার ক্যাম্পে আসতো-তাদের ভিতর দিয়ে দলের নেতা হবার যোগ্যতা যাদের আছে- তাদেরকেই বেছে নিতে হলো। আমার পরিকল্পনা অনুযায়ী বিভিন্ন জেলার মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয় সাধন ও যুদ্ধ পরিচালনার জন্য চারটি জেলায় চারজন সামরিক অফিসার পাঠানো প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। আগে থেকেই মুক্তিবাহিনীকে নির্দেশ দেবার জন্য খুলনা-বরিশালে ক্যাপ্টেন জিয়া এবং পটুয়াখালীতে লেঃ মেহদী ছিল। কিন্তু ফরিদপুরে কেউ না থাকায় মিঃ নুর মোহাম্মাদ নামে একজন অভিজ্ঞ নৌবাহিনীর গেরিলা শিক্ষককে সেখানে পাঠিয়ে দিলাম। চারটি জেলার জন্য চারজন সামরিক অফিসার পাওয়া যাওয়ায় তাদের নির্দেশ দিলাম সৎ লোকদের ভেতর দিয়ে কমান্ডার নির্বাচন করে প্রতিটি অঞ্চল ও থানায় পাঠিয়ে দিতে। পাকিস্তানী সামরিক তৎপরতার পর থেকেই যারা নিজেদের উৎসাহে ও উদ্যোগে বাংলাদেশের ভিতরে শত্রুহননের কাজে নিয়জিত আছে-তাদের সাথে যাতে করে কোন মতবিরোধ না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখার জন্য ওদের আমি প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিলাম।

জুলাই থেকে নভেম্বর পর্যন্ত সর্বাত্মক গেরিলা আক্রমণ চালানো হয়। আক্রমণ পরিচলনার জন্য আমি তিনটি জায়গা ঠিক করেছিলাম, পশ্চিম বঙ্গের উত্তর দিকের বনগাঁর নিকট বাগদাতে একটা হাসনাবাদের দক্ষিনে শমসের নগরে একটা এবং আর একটা টাকিতে। এই তিনটি ঘাঁটির ভিতর বাগদাই সবচেয়ে ব্যস্ততম। এর কারন মুক্তিযোদ্ধারা এই পথেই সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে আসতো এবং এই দিকের পথ-ঘাট ওদের ভাল জানা ছিল। শমসেরনগর ঘাঁটি থেকে বরিশাল, পটুয়াখালী ও ভোলায় গেরিলাদের পরিচালনা ও নির্দেশ দেওয়া হতো। খুলনা জেলার গেরিলারা নদীপথে টাকির সাথে যোগাযোগ রেখে কাজ করত। শত্রুপক্ষের অবস্থানের পরিবর্তনের সাথে আক্রমনের গতিপদ্ধতিও পরিবর্তিত হত। পাঁচ মাসে, অর্থ্যাৎ জুলাই থেকে নভেম্বর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে সরকারী হিসাবমতে আট হাজার গেরিলা আমার সেক্টর থেকে হাল্কা অস্ত্রপাতি ও বিস্ফোরক দ্রব্যসহ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পাঠিয়েছিলাম। শতকরা পঞ্চাশজন গেরিলাকে অস্ত্র দেওয়া সম্ভব হয়েছিল। বাকী সবাই

কেউ গোলাবারুদ, কেউ অন্যান্য জিনিসপত্র নিয়ে যেত। সেপ্টেম্বর মাসে অবস্থার পরিবর্তন হল। তখন থেকেই সবাই হাতে অস্ত্র পেল। তাছাড়াও রাজাকার, পুলিশ ও পাক হানাদারদের কাছ থেকে ছিনিয়ে আনা অস্ত্রপাতি দিয়ে বেশী সংখ্যায় মুক্তিযোদ্ধা ভেতরে পাঠিয়ে দিলাম। এমন একটা সময় এলো যখন আমার সেক্টরে মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা দাড়ালো প্রায় বিশ হাজার। মুক্তাঞ্চলে স্থানীয় অধিনায়কেরা প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করায় মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা আরো বাড়তে লাগলো। আমার মতে, এতে ছেলেদের কষ্ট অনেকটা লাঘব হতো। কেননা, বিপদসংকুল দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে ভারতে আসার কষ্ট থেকে ওরা বেঁচে যেত। মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা দিন দিন বাড়তে থাকলেও সফলতার পরিমাণ আশানুরুপভাবে বৃদ্ধি পায়নি। সময়ে সময়ে বাহকের মারফৎ যেসব খবর পেতাম, তা থেকে এটা পরিস্কার হয়ে উঠলো যে, মুক্তিযোদ্ধারা প্রধানতঃ রাজাকার ও পুলিশদের উপর আক্রমণ চালিয়ে সফলতা অর্জন করছে-পাক সৈন্যর বিরুদ্ধে খুব কমসংখ্যক আক্রমণই পরিচালিত হতো। এর কারন, গেরিলারা যে পাক-হানাদারদের ভয় করত তা নয়। অল্প সময়ের প্রশিক্ষণে ওরা শুধু আক্রমণ করে শত্রুকে কিভাবে খতম করতে হয়, তাই শিখেছিল। আক্রমণ করে কিভাবে পলায়ন করতে হয়, সে কৌশল ওদের ভাল করে জানা ছিল না। যদিও গেরিলা যুদ্ধের নীতি- 'আঘাত করো ও পালিয়ে যাও' এ সম্বন্ধে তাদের একটা মোটামুটি ধারনাও ছিল, তবুও আমার কাছে মনে হল, ওরা যেন কম আঘাত করে বেশী করে পালিয়ে আসতো। আমার এ ধারনা অনেকাংশে সত্যি। তা না হলে যদি গেরিলারা নির্দেশ মোতাবেক তাদের দায়িত্ব পুরাপুরি পালন করতো, তাহলে বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনীর সেক্টর থেকে যে পরিমাণ গেরিলা ভিতরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, তাতে পাক সামরিক যন্ত্রটাকে মাত্র দ'মাসের ভেতরেই বিকল করে দেওয়া সম্ভব হতো।

খুলনা জেলার তেরখাদা, মোল্লারহাট, মোড়লগঞ্জ, বাগেরহাট, সুন্দরবন, পাইকগাছা এবং ভোলা, পটুয়াখালী ও বরিশাল শত্রুপক্ষের সাথে অবিরাম সংঘর্ষের ফলে উত্তেজনায় সর্বদা উত্তপ্ত থাকতো। বস্তুতপক্ষে গতিশীল নেতৃত্বের জন্যই উপরোক্ত জায়গা গুলি মুক্তিসংগ্রামে ভাল অবদান রাখতে পেরেছিল। দেশের ভিতরের এতসব ঘটনার কথা আমাদের কাছে পৌঁছতো না। কারন বাহকের মাধ্যমে সংবাদ আদান-প্রদান করা ছাড়া আর কোন ব্যবস্থা ছিল না। অনেক বাহক আমাদের সদর দফতর পর্যন্ত পৌঁছতে পারতো না। পথেই কঠিন মৃত্যুর কোলে ঘুমিয়ে পড়তো। যখন দেশের আনাচে-কানাচে হানাদারেরা জাল পেতে বসে আছে, তখন বাহকের কাজটা খুব আরামদায়ক নয়। বর্ষাকালে রাত্রের অন্ধকারে বুক পরিমাণ জলের ভিতর দিয়ে হেঁটে সংবাদ নিয়ে আসাটা কতটা কষ্টসাধ্য তা সহজেই অনুমেয়। মনে পড়ছে পনের বছর বয়স্ক পাতলা গড়ন প্রবেশিকা পরিক্ষার্থী আলমের কাছ থেকে শোনা একটা লোমহর্ষক কাহিনীর কথা। বরিশাল জেলার গৌরনদী থানার একজন অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসারের ছেলে আলম। শত শত গেরিলাকে পথ দেখিয়ে সে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে নিয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, বরিশাল থেকে সুদূর পশ্চিম বঙ্গ পর্যন্ত সংবাদ নিয়ে ফিরে আসে। একজন পথপ্রদর্শক ও সংবাদ বাহক হিসাবে আলম নিজেকে যোগ্য ব্যক্তি হিসেবে প্রমানিত করেছিল। দেখতে খুবই বেমানান এই ছেলেটি, জলন্ত দেশপ্রেমে উদ্ভুদ্ধ হয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শত শত গেরিলাকে শুধু পথ দেখিয়েই ভিতরে নিয়ে যায়নি, ভিতর থেকে শত শত অদক্ষ যুবককে ভারতে প্রশিক্ষনের জন্য নিয়ে এসেছে। এই ছেলেটি চতুর ও বুদ্ধিদীপ্ত। অনেকবার সে পাক হানাদারদের হাতে ধরা পড়েছে। তার চেহারার ভিতর একটা সরল মাধুর্য আছে। সে এত ভাল উর্দু বলতে পারতো যে, মাথাভারী দেহসর্বস্ব পাকিস্তানী সৈন্যরা তাকে বিহারী মুসলমান বলে ভূল করে ছেড়ে দিয়েছে। জুলাই মাসে সীমান্তবর্তী বাগদা থেকে আলমই সর্বপ্রথম গেরিলাদের বরিশাল ও ফরিদপুর নিয়ে আসে।

জুলাই ও আগষ্ট মাসের সেই বর্ষণমুখর রাতগুলোর কথা আজো আমার মনে পড়ছে। প্রতি রাত্রে বর্ষা মাথায় করে বাংলার অতন্দ্র প্রহরী এই গেরিলারা বাগদার সীমান্ত অতিক্রম করে ভিতরে চলে যেত। প্রমত্তা ইছামতি ছুটে চলেছে। দ'কুল তার বহু দুর পর্যন্ত প্লাবিত। এরই ভিতর কত রাত দেখেছি বাংলার এই অগ্নিসন্তান গেরিলারা ভয়কে দূরে ছুড়ে ফেলে দিয়ে কোন রকম ওজর আপত্তি না করে অন্ধকারে অস্ত্র হাতে নিয়ে পানি কাদার মধ্যে শান্তভাবে হেঁটে যাচ্ছে। শুধু সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। কারো মুখে কোন কথা নেই। রাইফেলটায় যাতে পানির স্পর্শ না লাগে, সে জন্য ওটাকে উপর দিকে তুলে ধরতো। কি অভূতপুর্ব দেশপ্রেম।

নিজেকে অভিশাপ দিতাম, কেন ওদের সাথী না হয়ে অধিনায়ক হলাম। কেন ওদের পাশে থেকে যুদ্ধ করে ওদের মুখের হাসিকে বাঁচিয়ে রাখতে পারলাম না। ওদের রক্তের সাগরে দাড়িয়ে মুক্তির আনন্দকে আজ বড্ড বিস্বাদ লাগলো।

কিছুক্ষণের 'জয় বাংলা' তোমার নেতা আমার নেতা শেখ মুজিব-শেখ মুজিব' এই ধ্বনিই তো ওদের অনুপ্রানিত করেছিল অনিশ্চয়তার আধার ও চরম বিপদের মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়তে। কোন পুরস্কার বা প্রতিশ্রুতির লোভে ওরা এ কাজ করেনি। দেশ ও নেতার প্রতি অপরিসীম ভালবাসা ওদের যাদুমন্ত্রে ওদের উদ্দীপ্ত করেছিল- এই মৃত্যু ভয় কে জয় করতে। আত্মোৎসর্গের কঠিন ব্রতে দীক্ষা নিয়ে বাংলার এই গেরিলারা স্বাধীনতার জন্য অবিরাম সংগ্রাম করে চলছে। বর্ষার ঔদ্ধত্যকে সংকল্পের দৃঢ়তায় ছিন্নভিন্ন করে ওরা এগিয়ে চললো। অন্ধকারের মাঝে ওদের এগিয়ে যাওয়া আমি নিরীক্ষণ করতে লাগলাম। দিব্য দৃষ্টিতে দেখতে পেলাম, যুদ্ধ না করেই বজ্রকঠিন শপথের আগুনে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে হানাদারদের কব্জা থেকে মুক্তির আলো একদিন এই সুর্যসন্তানেরা ছিনিয়ে আনবেই। ঘটেছিলও তাই। পাক-হানাদাররা ক্রমাগত থানা ছেড়ে দিয়ে পিছিয়ে যেতে লাগলো। গ্রামে যেখানেই গেরিলাদের সাথে ওদের মোকাবেলা হয়েছে, সেখানেই ওরা পুনর্বার যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। এরপর হানাদাররা থানা ছেড়ে জমা হতে থাকে সামরিক ছাউনিতে এবং রাজাকারদের ওরা পুরো সুযোগ দিতে লাগলো গ্রামের উপর প্রভুত্ব চালাতে। দুর্জয় গেরিলাদের হাতে চরম মার খেয়ে রাজাকাররা তাদের রাজত্ব চালাতে চরম অসুবিধায় পড়েছিল। ওদের জঘন্য কার্যকলাপের জন্য গেরিলারা নির্মমভাবে রাজাকারদের নিশ্চিহ্ন করে দিত। আমার কাছে খবর আসলো যে, গেরিলারা পুরোদমে আক্রমণ চলিয়ে শত শত রাজাকার খতম করছে। এতে সুফল হলো-যারা একদিন রাজাকারদের বর্বরতার শিকার হয়েছিল, সেই নিঃস্ব গ্রামবাসী আবার মনোবল ফিরে পেল। বাঙালী রাজাকারদের হত্যা করাটা আমি যেন পছন্দ করতে পারলাম না-কারন, আমি জানতাম যে এই হত্যার দ্বারা শুধু অনাথ ও বিধবার সংখ্যাই বেড়ে গিয়ে দেশের সমস্যা আরো জটিল করে তুলবে। একবার আমি নির্দেশও পাঠিয়েছিলাম যে, রাজাকারদের মধ্যে মানসিক পরিবর্তন এনে অস্ত্রশস্ত্রসহ আত্মসমর্পন করতে বাধ্য করতে হবে। এই মর্মে কিছু প্রচারপত্র বিলি করা হলো। দেখা গেছে, এর ফলে অনেক রাজাকার অস্ত্রশস্ত্রসহ স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পন করেছে। গেরিলা পদ্বতির প্রবর্তনের ফলে দুটো সুফল পাওয়া গেল। প্রথমতঃ গ্রামবাসী রাজাকার ও পাক-বর্বরদের অত্যাচারের হাত থেকে অনেকটাই রেহাই পেল। দ্বিতীয়তঃ হানাদাররা নিজেদের প্রাণ বাঁচানোর জন্য গোপন আস্তানায় ঢুকে আত্মসমর্পন করতে লাগলো। তাছাড়াও রাজাকারদের ভিতর অর্ন্তদ্বন্ধ , অসন্তোস ও বিভেদ সৃষ্টি করতে সফল হলাম। এর ফলে হানাদারদের পরিকল্পনায় সহজেই ফাটল ধরলো।

আর কোন পথ খোলা না দেখে পাক-বর্বররা গানবোটের সাহয্যে আক্রমনের মাত্রা বাড়িয়ে দিল। রাজাকার ও পাকিস্তানী সৈন্যরা গানবোটে চেপে নদীর পথ ধরে চলতে থাকলো, আর মেশিনগান ও রকেট দিয়ে নির্বিচারে গোলাবর্ষণ করে নদীর তীরবর্তী গ্রামগুলো জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দিতে লাগলো। পাকিস্তানী গান-বোট গুলোর এরুপ আকস্মিক হামলায় ক্ষেতখামারে কর্মরত শত-শত কৃষক, জেলে মর্মান্তিকভাবে মৃত্যুবরণ করলো। বাংলাদেশের নদীপথ দিয়ে গান-বোট গুলো চালিয়ে নেওয়ার সময় হানাদারেরা যাদেরই সামনে পেত- তাদের উপরই পৈশাচিক উল্লাসে মেশিন গানের গুলি ছুড়তে থাকতো। মনের অবস্থা যখন ভাল থাকতো না তখন হানাদাররা নদীর তীরে কোন গ্রামের কাছে গান-বোট ভিড়িয়ে অসভ্য তাতারের মত গ্রাম থেকে সুন্দরী যুবতী মেয়েদের ছিনিয়ে আনতো। যারা আপত্তি করতো, তাদের খতম করে দিত।

যদিও আমাদের গেরিলারা প্রাণপণ চেষ্টা করছে এই গানবোট গুলো কাবু করার জন্য, কিন্তু ওদের কাছে নিম্নমানের অস্ত্রপাতি থাকায় গানবোটগুলোর মোকাবেলায় পেরে উঠতো না। এভাবে নৃশংস অত্যাচার চালিয়ে গানবোটগুলো গ্রামের লোকদের ভিতরে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করলো। গানবোট কাবু করার জন্য ভারী অস্ত্রপাতি চেয়ে গেরিলারা আমার কাছে খবর পাঠালো। আমরা যদি জনগণকে এই অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করতে না পারি, তাহলে যত রকমের সফলতাই আমরা অর্জন করিনা কেন, জনগন অচিরেই তা ভূলে

গিয়ে আমাদের প্রতি সহযোগীতার হাত বন্ধ করে দিবে। বিশেষ করে আমার ৯ নং সেক্টর নদীনালায় ভর্তি। পাকবাহিনী গোপালগঞ্জ , বরিশাল, পটুয়াখালী ও খুলনার হাজার হাজার গ্রাম জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিতে লাগলো। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে আসলে যে কি ঘটছে-আমি জানতাম। গানবোট ধ্বংস করার উপায়ও আমার জানা ছিল। কিন্তু আমার কাছ থেকে বারবার তাগিদ যাওয়া সত্ত্বেও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার সেসব নতুন অস্ত্র শস্ত্র যোগাবার জন্য কোন আন্তরীক প্রচেষ্টাই করেনি। গানবোট কাবু করতে সামনে কয়েকটা রকেট লাঞ্চারই যথেষ্ট। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা সেগুলোও পাইনি। বস্ততপক্ষেঃ , গানবাট কাবু করতে যায় এ সম্বন্ধে আমি একটা রিপোর্ট তদানীন্তন অস্থায়ী রাষ্টপ্রধান সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও প্রধানমন্ত্রী মিঃ তাজউদ্দীন আহমদকে দেখিয়েছিলাম। তখন তাঁরা ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝতে পেরেছিলেন। কিন্তু তাদের আশ্বাস সত্ত্বেও এ রকম একটা গুরুত্বপূর্ন ব্যাপার অর্ধমীমাংসিতই রয়ে গেল । তাদের এই নির্লিপ্ততায় আমি খুব ব্যথা পেলাম; পাগলের মত ছুটে গেলাম চার্লি সেক্টরের অধিনায়কের কাছে । তিনি তাঁর নিজের প্রচেষ্টায় আমাকে গোটা দুয়েক রকেট লাঞ্চার যুগিয়ে দিলেন। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় ও গুলো খুবই অপর্যাপ্ত। যাহোক, সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে চার্লি সেক্টরের অধিনায়ক ব্রিগেডিয়ার এন, এ সালিক মংলা পোর্টের কাছাকাছি একটা গেরিলা ঘাঁটি স্থাপন করতে ও কিছু পথপ্রদর্শক প্রস্তত রাখতে বললেন। তার কথামত পঞ্চাশজন মুক্তিযোদ্ধাসহ আফজাল নামক ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের একজন হাবিলদারকে সেখানে পাঠিয়ে দিলাম। এ ছাড়াও আগে থেকেই মিঃ খিজিরের অধীনে সেখানে একশ’ গেরিলা ছিল। মিঃ খিজির খুলনার একজন মেকানিক। হাবিলদার আফজালের যোগ্যতা ও শক্তির পরিচয় পেয়ে মিঃ খিজির উদ্দীপনা পেল এবং ‘বানীশান্ত’ নামক একটি জায়গায় আর একটি ঘাঁটি স্থাপন করলো। এখান থেকেই মংলা বন্দরে হানাদারদের গতিবিধি, সামরিক, শক্তি, জাহাজগুলোকে রক্ষা করার জন্য ওর কতটা সতর্কতা অবলম্বন করেছে ইত্যাদি বিষয়ে আমাদের কাছে খবরাখবর এসে পৌঁছতে লাগলো।

এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো ‘ফ্রগম্যান’ পাঠানো । আগষ্টের শেষ সপ্তাহে লেঃ জিয়া ছ’খানা নৌকা নিয়ে অস্ত্রশস্ত্র- গোলাবারুদ সংগ্রহের আশায় ভারতে এসে পৌঁছালো। সুন্দরবনের একটা বৃহত্তম গেরিলা ঘাঁটির অধিনায়ক লেঃ জিয়া। তার কাছে যেসব অস্ত্রপাতি ও গোলাবারুদ ছিল, তা খুবই অপ্রতুল। বাংলাদেশের অভ্যন্তরের খবরাখবর সে সবিস্তারে আমার কাছে খুলে বললো। কথার মাঝখানে বারবার সে গানবোট ধবংসকারী অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিতে লাগলো। সে জানালো যে পাক হানাদারদের মনোবল একদম ভেঙ্গে গিয়েছে। এখন একমাত্র গানবোটের সাহায্যেই আক্রমণ অব্যাহত রাখছে। আগষ্টের দ্বিতীয় সপ্তাহে ক্যাপ্টেন শাহাজাহানকে বরিশাল জেলায় আক্রমণ পরিচালনা করার জন্য পাঠিয়েছিলাম। তার উপর বিশ্বাস রেখে জিয়া জানালো যে, শাজাহান ভাল কাজই করছে। ক্যাপ্টেন ওমর-এই ছদ্মনামে শাহজাহনকে ডাকতাম। ক্যাপ্টেন শাজাহান পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীর সিগনাল ব্রাঞ্চের একজন অফিসার। সে দুঃসাহস করে পাকিস্তান থেকে পালিয়ে রাজস্থানের মরুভূমি পার হয়ে একশো মাইল পথ পায়ে হেঁটে বাংলাদেশে আসে। সে আমার সেক্টরে যোগ দেয়ার আগে সে গেরিলা বাহিনীতে দীর্ঘ ছ’মাস প্রশিক্ষণ নিয়েছে। ভালই হলো। একটা গেরিলা বাহিনী তার অধীনে পাঠিয়ে দিলাম। জিয়ার কাছে থেকে এসব খবর পেয়ে আংশিকভাবে খুশী হলাম। পরিচয় করিয়ে দেয়ার জন্য তাকে আমাদের সর্বাধিনায়কের সদর দফতরে নিয়ে গেলাম। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, ওর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করার জন্য সর্বাধিনায়ক সাহেব কোন ঔৎসুক্যই দেখালেন না। যা হোক, কোনরকম বুঝিয়ে-সুঝিয়ে সর্বাধিনায়ক সাহেবকে জিয়ার সাথে একটিবার দেখা করার জন্য কতকটা বাধ্য করলাম।

ভয়ানকভাবে সমস্যা- পীড়িত সর্বাধিনায়ক সাহেব শেষ পর্যন্ত অনেক নিয়ম-কানুন পালনের পর জিয়াকে ডেকে পাঠালেন। অসংখ্য ধন্যবাদ- কয়েক মিনিটের মধ্যেই এ সাক্ষাৎ পর্ব শেষ হলো। এরপর ব্রিগেডিয়ার এন, এ, সালিকের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়ার জন্য জিয়াকে নিয়ে আমি ব্যারাকপুর গেলাম। এটা সেপ্টম্বরের প্রথম সপ্তাহ। ব্রিগেডিয়ার সাকিল খুব ধৈর্য সহকারে লেঃ জিয়ার কথাবার্তা শুনলেন এবং তাকে আশ্বাস দিলেন যে,

ভারতীয় ৯ নং ডিভিশনের অধিনায়কের আলাপ-আলোচনা করে তিনি শিগগিরই যতটা সম্ভব রকেট লাঞ্চার ও অন্যান্য ভারী অস্ত্রপাতি সরবরাহ করবার চেষ্টা করবেন।

'ফ্রগম্যানদের সম্বন্ধে একটা কথা বলে রাখছি। এই ফ্রগম্যানদের দেশের বাইরে থেকে আমদানী করা হয়নি। তারা দেশেরই সরল নিরীহ যুব সম্প্রদায়। বেশীর ভাগই ছাত্র। জুনের শেষ সপ্তাহে বিভিন্ন যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে ওদের যোগাড় করা হয় এবং নবাব সিরাজুদৌল্লার ঐতিহাসিক মুর্শিদাবাদের পলাশী নগরে ভারতীয় নৌ-বাহিনীর তত্ত্বাবধানে এইসব ছেলেকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ভারতীয় নৌবাহিনীর লেঃ কমান্ডার মার্টিস ও লেঃ দাসির সহযোগিতায় প্রশংসনীয়ভাবে মাত্র দু'মাসের ভেতর এ সমস্ত কচি গ্রাম্য ছেলেরা দক্ষ ফ্রগম্যানশীপ ট্রেনিং নিয়ে বেরিয়ে আসে। যে কোন মূল্যায়নে মিঃ মার্টিন ও মিঃ দাসের এই আন্তরিক প্রচেষ্টা প্রশংসার যোগ্য।

আর একদল লোক পলাশীতে এই ফ্রগম্যানশীপ প্রশিক্ষণের উন্নতির জন্য যথাসাধ্য সাহায্য করেছিল। তারা পাকিস্তান নৌবাহিনীর সাবমেরিনে কাজ করতো। ফ্রান্সে যখন একটি বিশেষ কাজে ওদের পাঠানো হয়, তখন সেখান থেকে মুক্তিসংগ্রামের প্রাক্কালে ওর পালিয়ে লন্ডনে আসে। সেখান থেকে ভারতীয় হাইকমিশনের সহয়তায় দিল্লী পৌঁছে। সংখ্যায় তারা আটজন। খুলনা জেলার অধিবাসী মিঃ রহমতউল্লাহ ওদের অধিনায়ক হয়ে নিয়ে আসে। সত্যিকারভাবে রহমতউল্লহ একজন দেশপ্রেমিক। ফ্রগম্যানশীপের কলাকৌশল সম্বন্ধে সে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে গড়ে তুলেছে।

৯ই সেপ্টম্বর। পারিকল্পনা মাফিক বাংলার ফ্রগম্যানরা সবাই যখন, তখন নৌকাগুলো কি আর পিছনে পড়ে থাকতে পারে। ত্রিকোনা আক্রমণ করার জন্য লেঃ জিয়ার আটজন ফ্রগম্যানসহ আগেই যাত্রা করার কথা। তাকে দুটো রকেট লাঞ্চার, কিন্তু এলএমজি এবং অভ্যন্তরের মুক্তিবাহিনীর জন্য প্রচুর পরিমাণ গোলাবারুদ ও অস্ত্রশস্ত্র দেয়া হরো। নির্ধারিত তারিখমত লেঃ জিয়া কোলকাতার উত্তর-পশ্চিম দিকে বাসন্তী নামক একটা বন্দরনগরী থেকে রওনা হলো।

বর্ষার মাতামাতি। আবহাওয়া ভয়ানক বিক্ষুব্ধ। নধীগুলো যেন এক-একটা দৈত্যের মত রাগে ফুলছে। বুকে তার পচন্ড আক্রোশে ফেটে-পড়া বিদ্রোহী তরংগমালা। ফ্রগম্যানদের গোপন ঘাঁটি থেকে নৌকায় করে শমসেরনগর পৌঁছতে হবে। ফ্রান্স থেকে পালিয়ে আসা মিঃ আসাদুল্লাহর নেতৃত্বে তিনটি নৌকায় ত্রিশজন ফ্রগম্যান 'লিম্পেট মাইন' নিয়ে ১৫ই সেপ্টেম্বর মংলা এবং চালনা বন্দরের পাকিস্তানী বাণিজ্যিক ও নৌবাহিনীর জাহাজগুলো আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে ছিল। ওদের বিদায় দেবার জন্য ১০ই সেপ্টম্বর লেঃ কমান্ডার মার্টিস, মেজর রায় চৌধুরী এবং আমি বাংলাদেশ নৌবাহিনীর একটা লঞ্চে করে শমসেরনগর পৌঁছে একটা বাঁকের কাছে অপেক্ষা করতে লাগলাম। এখানে হয়েই জিয়ার নৌকাগুলো যাওয়ার কথা।

সকাল বেলা- ভয়ানক ঝড়, উথাল পাতাল ঢেউয়ের বুক চিরে নৌকা চালানো খুবই কষ্টকর। বেলা তিনটা পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করলাম। কিন্তু ওদের আসার কোন হদিস পেলাম না। দেরী হবার অবশ্য অনিবার্য কারণ ছিল, কিন্তু ওদের পৌঁছতে বিলম্ব দেখে আমরা খুবই চিন্তিত ও অধৈর্য হয়ে উঠলাম। বিকাল প্রায় সাড়ে চারটার সময় প্রথম নৌকা এসে বাঁকের কাছে পৌঁছলো। কেউ তাদের শিক্ষিত বা মুক্তিবাহিনীর লোক বলে চিনতে পারলো না। কেননা, ওরা বুদ্ধিমত্তার সাথে সাধারণ মাঝি ও জেলের বেশ ধরে আত্মগোপন করে ছিল। পরনে ছিল লুংগী ও ছেঁড়া শার্ট। বৃষ্টির জলে ওদের জামাকাপড় সব ভিজে গিয়েছিল। কেউ কেউ চা বা অন্যকিছু গরম করার জন্য আগুন জ্বালাতে খুব চেষ্টা করতে লাগলো। যা হোক আমাদের অপেক্ষা করতে দেখে ওরা খুবই উল্লসিত হলো। ইতিমধ্যে দেখা গেল, আরো দুটো নৌকা বিক্ষুব্ধ ঢেউগুলোর সাথে যুদ্ধ করতে করতে আমাদের দিকে দ্রুত এগিয়ে আসছে। নৌকাগুলো সব এক জায়গায় হলে,মুক্তিযোদ্ধাদের সবাইকে আমাদের লঞ্চে এনে গরম চায়ে আপ্যায়িত করলাম।ছেলেদের মনোবল খুবই উঁচু বলে মনে হলো।

একজন লিডার নিয়ে চারজনসহ এক একটা দল। লিডারদের আমরা ক্যাবিনের ভিতর ডেকে নিয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশ ও কিছু টাকা পয়সা দিলাম- যেন পথে ওরা খাদ্যের জন্য কষ্ট না পায়। সবই প্রস্তুত। কিন্তু ঝড়ের দাপট প্রশমিত হবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। এই ঝড়ের মধ্যে ওদের কে পাঠানো আমি সমীচীন মনে করলাম না। কাজেই কাজটা রাত্রের মত স্থগিত রইল এবং ১১ তারিখ খুব ভোরে ওদের যাত্রা করতে দিলাম। এই মোশাররফ পথ দেখিয়ে আমাকে ভারতে পৌঁছে দেয়। সে সুন্দরবন এলাকার মুন্সিগঞ্জের স্থায়ী বাসিন্দা। সবার মুখেই হাসি। সবাই খুশী। শেষ বারের মত সবাইকে উপদেশ দিয়ে এবং ওদের মংগল কামনা করে ওই রাত্রেই আমরা হাসনাবাদ রওনা হলাম। আল্লাহকে অসংখ্য ধন্যবাদ, ঠিক তিনদিন পরেই অর্থাৎ ১৪ই সেপ্টেম্বর ভোরে ওরা নিরাপদে ঠিকমত জায়গায় পৌঁছে গেল।

১৫ই সেপ্টেম্বর সামনে। শত্রুর উপর চরম আঘাত হানার মাহেন্দ্রক্ষণ। যে জায়গা থেকে আক্রমণ পরিচালনা করা হবে তার সাথে সংযোগ সাধন, আক্রমণের পর যেখানে গিয়ে সবাই জমা হতে হবে সেখানে গেরিলাদের ঠিকমত জায়গায় রাখা, উদ্দেশ্য সমাধা করার পর সবাইকে নিয়ে নিরাপদ জায়গায় রাখা, উদ্দেশ্যে সমাধা করার পর সবাইকে নিয়ে নিরাপদ জায়গায় সরে পড়া- ইত্যাদি প্রাথমিক কাজকর্ম সম্পন্ন করার জন্য হাতে খুব কম সময়ই আছে। ১৪ তারিখ ভোর থেকে ১৫ তারিখ সন্ধ্যা পর্যন্ত ওদের প্রস্তুতি নিতে কেটে গেল। হাবিলদার আফজাল ও খিজিরের স্থল- গেরিলারা ওদের যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। মুক্তিযোদ্ধারা লোভাতুর চোখে চেয়ে দেখলো আটটি বানিজ্যিক জাহাজ চালনা বন্দরে দাঁড়িয়ে আছে। পশুর নদীর মাঝখানে সবগুলো নোংগর করা। ঠিক হলো 'জোড়া পদ্ধতিতে' আক্রমণ চালাতে হবে- অথাৎ দু'জন ফ্রগম্যান এক-একটি জাহাজকে আঘাত করার জন্য এক-একজন ফ্রগম্যানের কাছে চারটি করে, দু'জনার কাছে মোট আটটি লিম্পেট মাইন' থাকবে। লিম্পেট মাইন পানিতে ভাসে। সুতরাং ওদের পক্ষে এতগুলো মাইন এক সংগে বয়ে নিয়ে যাওয়া খুব সহজ হলো। ঘাঁটি থেকে প্রায় পনেরশ' গজ দূরে জাহাজগুলো এলোমেলো অবস্থায় নোংগর করা। ১৫ই সেপ্টেম্বরের সারাটা দিন কেটে গেল ওদের সবকিছু বুঝিয়ে দিতে। এক-একটা জাহাজ আক্রমণ করার ভার এক একটা দলের উপর ন্যস্ত করা হলো।

ষোলজন ফ্রগম্যান নিয়ে আটটি দল। ওরা আক্রমণ করার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত। প্রথম অভিযান ব্যর্থ হলে বাকী চৌদ্দজনকে পরবর্তী পর্যায়ে আক্রমণ পরিচালনা করার জন্য রিজার্ভ রাখা হলো। আঘাত করার সময় নির্ধারিত হলো রাত সাড়ে চারটা। সাধারণতঃ এই সময়েই পাক হানাদাররা বিরক্তি ও ক্লান্তিতে ঝিমিয়ে পড়ে। আর যারা ঘুমিয়ে থাকে, একই সঙ্গে তারা আরও বেঘোরে ঘুমাতে থাকে। স্থির হলো একই সংগে আটটি জাহাজের উপর হামলা চালাতে হবে।

রাত আড়াইটা। খুব আন্ধকার। বাইরে ঝড়ের দাপাদাপি। দমকা বাতাসের চাবুক খেয়ে পিছন দিকের অরণ্যটা আর্তনাদ করে উঠলো। অধিনায়ক মিঃ আসাদুল্লাহ ছেলেদের কানে কানে বললো, আঘাত করার এইতো উপযুক্ত সময়। সতর্কতার সাথে শেষবারের মত আবার সে সবাইকে পরীক্ষা করে নিলো। এখন থেকে মাত্র দু'ঘন্টা পরে সমস্ত নদীর বুক জুড়ে তরংগায়িত হবে বলে টকটকে উত্তপ্ত রক্তস্রোত। নদীর অপর পাড়ে শত্রুপক্ষ নিশ্চিন্ত। কেননা ওরা ভাবতেই পারেনি অলস বাঙ্গালীরা ওদের পায়ের তলায় কোনদিন আঘাত হানতে পারবে। নদীতে হিংস্র জীবজন্তু আছে জেনেও দুর্যোগময় এই ঝড়ের মাঝরাতে প্রমত্তা নদীর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়া খুব একটা সহজ কাজ নয়। মৃত্যুভয়কে দূরে ঠেলে দেশপ্রেমের জলন্ত বহ্নিশিখা বুকে নিয়ে ওরা ষোলজন সবাই একসংগে দুটো পঁয়ত্রিশ মিনিটের সময় নদীর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লো। মুখে লেশমাত্র ভীতির চিহ্ন নেই। আত্মপ্রত্যয়ের মহান আদর্শে উদ্ভাসিত। বেয়াড়া প্রকৃতির রক্তচক্ষুকে ভয় না করে মুক্তিযোদ্ধারা নদীর বুক চিরে আস্তে আস্তে এগিয়ে চললো লক্ষ্যবস্তুর দিকে। ওদের কোমল ডানাগুলো ক্লান্তিতে ঝিমিয়ে পড়লো। কিন্তু জলের উপর ভেসে ভেসে ঢেউয়ের কোলে মাথা রেখে ওরা লক্ষ্যবস্তুতে গিয়ে পৌঁছলো। সাড়ে চারটা বাজতে এখনও পাঁচ মিনিট বাকি।

অর্ধ- আবৃত তারপলিনের নীচে আবছা আলোতে ওরা সন্ত্রাসীদের দেখতে পেলো। হঠাৎ আকাশটা কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো। ভয়ানক বৃষ্টি। আঘাত করার সময় এসে গেল। ঠিক চারটা ত্রিশ মিনিট। যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করে ওরা লিম্পেট মাইনগুলো জাহাজের তলায় লাগিয়ে দিল। এই মাইনগুলোর উপরের দিকে চুম্বক লাগানো। লোহার সংস্পর্শে এলে গায়ে লেগে থাকে। তারপর ওরা সাঁতরিয়ে ঘাঁটির দিকে ফিরে চললো। এই সময় ওরা খুব তাড়াতড়ি সাঁতরাতে লাগলো। ওরা জানতো যে, মাইন লাগানোর এক ঘন্টা পরে, এই সুন্দর জাহাজগুলো বিকট শব্দে বিদীর্ণ হয়ে প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার বহ্ন্যুৎসবে দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকবে। মাইনগুলো বিস্ফোরণের জন্য 'ফিউজে' একঘন্টা সময় বেধেঁ দেয়া হয়েছিল- যেন ওরা নিরাপদ ঘাঁটিতে ফিরে আসতে পারে। আবেগ ও উত্তেজনায় উদ্বেলিত হয়ে দ্বিগুণ উৎসাহে ওরা ষোলজন সবাই তীরে ফিরলো। যারা তীরে সাগ্রহে প্রতিক্ষায় ছিল, তারা সবাই ওদেরকে বুকে জড়িয়ে ধরে আনন্দে চুমু খেতে লাগলো। শুয়ে পড়ে মুক্তিযোদ্ধারা অধীর আগ্রহে জাহাজগুলোর দিকে চেয়ে রইল- কখন সাড়ে পাঁচটা বাজবে। হ্যাঁ, চরম লগ্নটি এলো। সমস্ত পৃথিবীটাকে প্রচন্ডভাবে নাড়া দিয়ে বিকট শব্দে মাইনগুলো বিস্ফোরিত হলো। আটটি জাহাজের মধ্যে সাতটি ডুবে গেল। আমাদের উদ্দেশ্য সার্থক ও সফল হলো। এই ঘটনার পর বন্দরের শ্রমিকরা কাজ ছেড়ে দিয়ে যে যেদিকে পারলো পালিয়ে গেল। বেশ কিছুদিনের জন্য চালনা ও মংলা বন্দর জনশূন্য হয়ে পড়ে রইল।

শমসেরনগরে ফিরে আসার সময় মৃত্যুঞ্জয়ী মুক্তিসেনারা একটা ফরেস্ট অফিসে হামলা চালিয়ে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ ও অন্যান্য মুল্যবান জিনিসপত্র অধিকার করে। এর মধ্যে 'বনবালা' ও 'বনমৃগী' এই দুটো লঞ্চও ছিল। এই লঞ্চে চেপে বিজয়ের উত্তেজনায় আত্মহারা মুক্তিযোদ্ধারা শমসেরনগরে ফিরে এলো। পাকিস্তানী ঘাঁটির অবস্থানের অনিশ্চয়তার জন্য লেঃ জিয়ার ত্রিকোণা অভিযান স্থগিত রাখা হলো। তাছাড়া আবহাওয়াও খুব অনুকুলে ছিল না। সব রকমের সতর্কতামুলক ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও গেরিলাদের ভেতর আসা বন্ধ করতে না পারায় পাক- হানাদাররা ভয়ানকভাবে ক্ষেপে গিয়েছিল। সুতরাং ওরা সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে চালনা পোতাশ্রয়ের বিপরীত দিকে সুন্দরবনে আগুন ধরিয়ে দিল এবং গানবোট নিয়ে পাহারায় বেরিয়ে সন্দরবনের সমস্ত পথঘাট একদম বন্ধ করে দেয়ার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলো।

সেপ্টেম্বরের শেষদিকে হানাদাররা শ্যামনগর ঘাঁটির গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারলো। আমাদের হাতেই কিছুদিন আগে এই ঘাঁটির পতন ঘটে। এবার শ্যামনগর ঘাঁটি পুনরুদ্ধার করার জন্য হানাদাররা গানবোট ও পদাতিক বাহিনী নিয়ে ভীষণভাবে আমদেরকে আক্রমণ করলো। তিনদিন তীব্র যুদ্ধ চালাবার পর, হানাদারদের চরম ক্ষতি করে, সমর-কৌশলের দিক দিয়ে খুঁব গুরুত্বপূর্ন এরকম অন্য একটা অন্য একটা জায়গায় আমরা সরে গেলাম। এই যুদ্ধে আমরা পাঁচজন মুক্তিযোদ্ধকে হারিয়েছিলাম। এর মধ্যে সুবেদার মোহাম্মদ ইলিয়াস মেশিনগানের গুলিতে ঘটনাস্থলেই মারা যায়। আর চারজন নতুন- ভর্তি মুক্তিযোদ্ধাকে হানাদাররা বন্দী করে। শ্যামনগর পুনরুদ্ধার করে ও হানাদাররা গেরিলাদের ভেতরে যাওয়া বন্ধ করতে পারলো না।

এক মাস পরে ঠিক একই উপায়ে ফ্রগম্যানরা আবার মংলা ও চালনা বন্দর আক্রমণ করলো। ১৬ই অক্টোবর আলম নামে পাক-নৌবাহিনী থেকে পালিয়ে আসা একজন সৈন্যের অধীনে দ্বিতীয় দলটি শ্যামনগরের অনেক দক্ষিণ দিক দিয়ে হেঁটে ভেতরে গেল। এবারেও আমরা সফল হলাম। এই আক্রমণে শত্রপক্ষে চারটি জাহাজ ডুবে গিয়েছিল। একটির নাম 'লাইটনিং' এবং অপরটার নাম 'আল-মুরতজা'। অন্যগুলো চীনা জাহাজ বলে শনাক্ত করা হয়। আমাদের এই দ্বিতীয়বারের আক্রমণ চালনা ও মংলা বন্দরকে সম্পুর্ণ অকেজো করে দিল। এর উপরও নভেম্বর মাসে রহমতউল্লাহর নেতৃত্বে খুলনায় আক্রমণ চালিয়ে সাফল্য অর্জন করা হয়। বাংলাদেশ সশস্ত্র-বাহিনীর অন্যান্য সেক্টরের নির্দেশ অনুযায়ী চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ এবং চাঁদপুরেও শত্রু জাহাজের উপর আক্রমণ চালানো হয়।

এই আক্রমণের মোটামুটি ফল হলো- এইসব জায়গায় শ্রমিকরা সবাই পালিয়ে জান বাঁচলো। ডিসেম্বরে দেশ মুক্ত হবার আগ পর্যন্ত ওরা আর ফিরে এলোনা । এই ঘটনার পর,এমনকি কোন বিদেশী জাহাজও বন্দরে নোংগর করতে রাজী হতো না। আমরা এটাই চেয়েছিলাম ।

বিজয় অভিযান

বিজয় অভিযানে মুক্তিযোদ্ধারা শুধুমাত্র নীরব দর্শকই ছিল না। তাদের একটা নির্দিষ্ট ও উদ্দেশ্যমূলক তৎপরতা অবলম্বন করতে হয়েছিল। এই তৎপরতা নভেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। এরপর টাকি থেকে একশো পঞ্চাশ মাইল দূরে কৃষ্ণনগরে চার্লি সেক্টরে একটা কনফারেন্সে যোগদান করার জন্য আমাকে ডাকা হয়। চার্লি সেক্টর এই সময় ব্যারাকপুর থেকে কৃষ্ণনগরে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। ব্রিগেডিয়ার এন, এ,সাকিলও ওই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। ভারত জরুরী অবস্থা ঘোষণা করলে কিভাবে আমাকে সামনে অগ্রসর হতে হবে, এ ব্যাপারে তিনি মোটামুটি একটা ধারণা দিলেন। মিত্রবাহিনীর পরিকল্পনার কথা গোপন রেখে সাতক্ষীরা- দৌলতপুর রোডে এবং আরও দক্ষিণে আমার লোকজন নিয়ে যে -কোন সময় আগ্রসর হবার জন্য তিনি আমাকে প্রস্ত্তত ও সতর্ক থাকতে বললেন। পরিকল্পনার কথা আমাকে না জানালেও আমি অনুমান করলাম যে, সাতক্ষীরার বাঁ দিক থেকে একটা সৈন্যবাহিনী পাঠিয়ে সাতক্ষীরা-দৌলতপুর বরাবর শত্রু ঘাঁটিগুলো নিশ্চিহ্ন করার জন্য যশোরের উত্তর দিক থেকে প্রধান আক্রমণ পরিচালনা করা হবে। তাছাড়া, আমারা মুক্তিযোদ্ধারা পাক-বাহিনী ও মিত্রবাহিনীর গোলাবর্ষণের মাঝখানে পড়ে যাতে বিপর্যস্ত না হয়, সেই জন্য মিত্রবাহিনীর আগে আমার সৈন্যবাহিনী পাঠাতে বারন করা হলো। আমাকে জানানো হলো যে, মিত্রবাহিনী বাংলাদেশে প্রবেশ করার পর মুক্তিবাহিনীর উদ্দেশ্য হবে এইরূপঃ প্রথমত, সময়মত মিত্রবাহিনীকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার জন্য প্রয়োজনীয় লোকজন দেয়া। দ্বিতীয়ত,বাংলাদেশে প্রবেশ করার পর মিত্রবাহিনী কোন প্রশাসনিক অসুবিধার সম্মুখীন হলে তা দূর করার জন্য তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসা। তৃতীয়ত, ঘনিষ্ঠভাবে মিত্রবাহিনীকে অনুসরণ করা এবং তাদের সংস্পর্শে থাকা। আমাকে বলা হলো যে, যেহেতু ‘বাংলা অঞ্চল’(বেঙ্গল এরিয়া-ভারতীয় সেনাবাহিনীর ঘাঁটি) আমার নিকটবর্তী, সেই জন্য আমার সেক্টর এখন থেকে বাংলা অঞ্চলের প্রশাসনিক আওতাধীনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তাছাড়া দক্ষিণ সুন্দরবন এলাকার সম্পূর্ণ জলপথ বাংলা অঞ্চলের অধীনে এনে,এর দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয় জেনারেল পি, কে,রায় চৌধুরীর উপর।

সেক্টরে ফিরে আমি আমার নিজস্ব পরিকল্পনা তৈরী করলাম। আবার দুই হাজার গেরিলা সৈন্য ছিল। কিন্তু অস্ত্রশস্ত্র খুবই অপ্রতুল। তবুও আমি মনে করলাম যে, বাংলাদেশের অভ্যন্তরে গেরিলাদের উপস্থিতিই অনেকটা প্রভাব কিস্তার করবে। কেননা, বিজয় অভিযানের সময় সম্ভাব্য রাহাজানি, ধর্ষণ ও অন্যান্য অপ্রীতিকর ঘটনা যাতে ঘটতে না পারে সেদিকে আমার লোকজন সতর্ক দৃষ্টি রাখতে পারবে। কাজেই, পরপর দুরাত্রিতে আঠারোশো গেরিলা সৈন্যকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পাঠিয়ে দেয়া হলো। বাদবাকী গেরিলাদের বিজয় অভিযানের সময় অগ্রসর হওয়ার জন্য অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত করে রাখা হলো। সদর দপ্তরে ও আমার সেক্টরের অন্যান্য জায়গায় আমার নিয়ন্ত্রণাধীনে যেসব সৈন্য মোতায়েন ছিল, তাদের সদা সতর্ক থাকতে বলেছিলাম। আমার সেক্টর সদর দপ্তরের বিস্তৃতি অনেক দূর পর্যন্ত । অল্প সময়ের নোটিশে এটা গুটিয়ে আনা সম্ভব নয়। আমি ফ্লাইট সার্জেন্ট ফজলুল হককে বুঝিয়ে বললাম যে , যে সমস্ত আর্মিরা নির্ধারিত সময়ের পূর্বে হাজির হতে পারবে না, তারা যেন দেশ মুক্ত হওয়ার পরই খুলনায় আমার সাথে মিলিত হয়। হিসাবপত্র ঠিক রাখা এবং মুক্তিদ্ধোদের প্রতি যত্ন নেয়ার জন্যও সার্জেন্ট ফজলুল হককে নির্দেশ দিলাম। কেননা, আমরা চলে গেলে যেসব মুক্তিযোদ্ধা ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অন্যান্য যুবক এখানে এসে হাজির হবে তারা নিতান্ত অসুবিধায় পড়বে।

সৌভাগ্যক্রমে দ্বিতীয়বারের মত লেঃ জিয়া এসে গেল। সুন্দরবন এলাকায় সে পাকিস্তানী গানবোটের সামনে শত্রুপক্ষের সাথে প্রচন্ড যুদ্ধ করে তার অঞ্চলকে সম্পুর্ণরূপে মুক্ত করেছে হানাদাররা নদী বরাবর তাদের

ঘাঁটিগুলো ছেড়ে দিয়ে খুলনার দিকে হেঁটে গিয়ে জড়ো হয়েছে। আমি স্থির করলাম যেসব গেরিলা খুলনার সীমান্ত বরাবর শত্রুহননে লিপ্ত, তাদেরকে খুলনা শহরের চারিদিকে সমাবেশ করে হানাদারদের পিছু হটার রাস্তা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেব। মিত্র-বাহিনীর সার্বিক পরিকল্পনা মনে রেখে মাসের ১৫ তারিখে সাব-এরিয়া কমান্ডারদের নিয়ে আমাদের দপ্তরে একটা সম্মেলনে মিলিত হয়ে তাদের নিজ নিজ দায়িত্ব সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিলাম। খুলনা শহরের নিকট রূপসা নদীর পশ্চিম তীরে। আক্রমণব্যূহ তৈরী করার জন্য লেঃ জিয়াকে সুন্দরবন অঞ্চল থেকে ঘাঁটি গুটিয়ে ফেলার জন্য প্রয়োজনীয় আদেশ দিলাম। বাগেরহাটে সুবেদার তাজুল ইসলামের অধীনে যে সমস্ত সৈন্য ছিল তাদেরও লেঃ জিয়ার নিয়ন্ত্রণে কাজ করার জন্য নির্দেশ দিলাম। শত্রুপক্ষ যাতে নৌ- পথে ব্যবহার করতে না পারে, সে জন্য জৈনক মিঃ নোমানউল্লাহকে তেরখাদা ও মোল্লাহাটে যে সমস্ত মুক্তিযোদ্ধা ছিল, তাঁদের সাথে সমন্বয় স্থাপন করে খুলনার উত্তর-পূর্ব দিক থেকে এসে এক জায়গায় জড়ো হয়ে পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য সতর্ক থাকতে বললাম। আরও যেন পরবর্তী নির্দেশের অপেক্ষায় সর্বদা প্রস্ত্তত থাকে। খুলনার দক্ষিণে পাইকগাছা, তালা ও আশাশুনি অঞ্চলে সেকেন্ড লেঃ আরেফিন গেরিলাদের হিসাবে কর্মরত ছিল। তাকে বললাম, সে যেন গেরিলাদের সঙ্গে নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে খুলনা শহরের কাছাকাছি কোথাও প্রস্ত্তত হয়ে থাকে।

ক্যাপ্টেন হুদার অধীনে দুই ব্যাটালিয়নের বেশী যোদ্ধা ছিল। তাকেও সামনের দিকে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দিলাম। বসন্তপুরে শত্রুপক্ষের অবস্থান খুবই সুদৃঢ়। বসন্তপুর আমাদের খুবই নিকটে। একান থেকে হানাদারদের বিতাড়িত করে গুরুত্বপূর্ণ সাতক্ষীরা-দৌলতপর সড়কে শত্রুমুক্ত করে আধিপত্য বিস্তার করার জন্য ক্যাপ্টেন হুদাকে দায়িত্ব দিলাম। খুলনা শহরের চারিদিকে মুক্তিযোদ্ধাদের জড়ো করে রাখার প্রধান উদ্দেশ্য হলো, দকরদার আমলে বিহারীরা বাঙালী মুসলমানদের উপর যে অমানুষিক নির্যাতন চালিয়েছিল তারই প্রতিহিংসা নিতে গিয়ে অনিবার্য পরিণতি স্বরূপ ব্যাপক হারে বিহারী নিধন আরম্ভ হবে এবং সারাদেশ জুড়ে নেমে আসবে বিশৃংখলা। এই আশংকা করেই উপরোক্ত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল। উল্লিখিত পরিকল্পনা ছাড়াও আমি দুটো দলকে প্রস্ত্তত করে বেগের নেতৃত্বাদনে বরিশালের দিকে নৌকায় পাঠিয়ে নিলাম। প্রথম দলটি ক্যাপ্টেন ওমরের সাথে সংযোগ স্থাপন করে বরিশালের উদ্ভূত পরিস্থিতির মোকাবেলা করবে আর দ্বিতীয় দলটিকে সেকেন্ড লেঃ মুয়িনের নেতৃত্বে পটুয়াখালী পৌঁছানো হলো । কথা প্রসংগে বলতে হয় সেকেন্ড লেঃ মুয়িন মিত্র বাহিনীর অধনে বিহার প্রবেশের ‘মুর্তিহতে বাংলাদেশের ক্রাম ট্রেনিং কোর্স সমাপ্ত করে আরও চারজন তরুণ অফিসারসহ প্রথম দলে অক্টোবর মাসে আমার কাছে আসে। তারা তিনমাসের ক্রাশ ট্রেনিং প্রোগ্রাম অনুযায়ী শিক্ষা গ্রহণ করে। এই তিনজন অফিসার হলো- সেকেন্ড লেঃ মোহাম্মদ অলি, আহসানউল্লাহ এবং শচীন্দ্র। তাদের সবাইকে ক্যাপ্টেন হুদার বাহিনীতে কাজ করার জন্য দেয়া হলো। বয়সে সবাই নবীন, কর্মক্ষম ও কষ্টসহিষ্ণু। যাহোক, নির্দেশ মোতাবেক লেঃ জিয়া, নোমান ও আরেফিন স্ব-স্ব গন্তব্যস্থলের দিকে রওনা হয়ে গেল। বসন্তপুরের উপর যে কোন সময় আঘাত হানার জন্য ক্যাপ্টেন হুদা প্রস্ত্তত হয়ে রইল।এই সময়ে লেঃ জিয়াকে একটা বেতারযন্ত্র যোগাড় করে দিলাম। ওদের সবাইকে পাঠিয়ে দিয়ে মনের গভীরে একটা প্রশ্ন উকি দিলে নিজেই বিস্মিত হলাম- এইবার কি সত্যিই আমরা খুলনা যাচ্ছি?

ওদের যে সমস্ত আদেশ দিয়েছিলাম তা আমরা কানে অবিশ্বাস্য রকমের প্রতিধ্বনি হতে লাগলো। স্বপ্নাবিষ্টের মত মনে হলো, ওগুলো যেন আমাকেই উল্টে পরিহাস করছে। কেননা, দালালও হানাদার পরিবেষ্টিত খুলনার মত বিপজ্জনক শহরে এত শীগগীর প্রবেশ করতে পারবো- একথা কল্পনাও করতে পারিনি। যদিও স্থানীয় প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত অনেক মুক্তিযোদ্ধা ছাড়াও কমপক্ষে পাঁচ হাজার গেরিলা খুলনা শহরকে চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছিল, তবুও হানাদারদের প্রকৃত শক্তি সম্পর্কে আমরা ছিলাম সন্দিহান।

সমস্ত শংকা, সমস্ত ভয় উবে গেল। চরম লগ্নটি সমাগত। পবিত্র ঈদের দিন সকালবেলা, ১৯৭১ সালের ২০শে নভেম্বর-ক্রিং ক্রিং করে টেলিফোনে কয়েকবার শব্দ হতেই রিসিভারটা কানের কাছে নিলামঃ অত্যন্ত সুখবর। প্রসংশনীয় তৎপরতা। অবস্থান মজবুত করে টিকিয়ে রাখো । কুত্তাগুলোকে পিছু পিছু ধাওয়া করো।’

আনন্দ-উত্তেজনায় এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে ফেললাম। ক্যাপ্টেন হুদা মুক্তিযোদ্ধদের নিয়ে বসন্তপুর, কালিগঞ্জ ও নাজিমগঞ্জে শত্রুর অবস্থানের উপর চরম আঘাত হেনে এই ঘাঁটিগুলো আমাদের কব্জায় এনেছে। কি ভয়ংকর উত্তেজনা। ক্যাপ্টেন হুদা কথা বলতে পারছিল না। তার বাক রুদ্ধ হয়ে এলো। উত্তেজনা ও চাঞ্চল্যের অফুরন্ত আনন্দে আমরা সবই বিস্ময়াভিভূত, হতবাক। হুদা ও তার সাথের মুক্তিসেনাদের প্রাণঢালা অভিনন্দন জানালাম। বললাম যে, শত্রুর উপর আঘাতের ক্ষিপ্রতা ও তার গতিবেগ যেন পুরোপুরি রক্ষা করা হয়। আনন্দ ও উত্তেজনায় এতটা আত্মহারা যে কি করবো ভেবে পাচ্ছিলাম না। এই পবিত্র দিনটিতে বহু প্রতীক্ষিত বিজয় অভিযান শুরু হলো। স্কুল শিক্ষক মিঃ শাহজাহানকে পারুলিয়া রোডের দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য নির্দেশ দিলাম। কেননা বসন্তপুর ও কালিগঞ্জ ঘাঁটি থেকে শত্রুবাহিনীকে এই পথ দিয়েই পালাতে হবে এবং এটাই একমাত্র পাকা রাস্তা। একই সংগে মিঃ চৌধুরীর নেতৃত্বে ষাটজন মুক্তিযোদ্ধার একটি দলকে পারুলিয়া ব্রীজটা অক্ষত অবস্থায় অধিকার করার জন্য পাঠিয়ে দিলাম। মিঃ চৌধুরী পাকিস্তান নৌবাহিনীর একজন অভিজ্ঞ নাবিক। বেশ হাসিখুশী। কঠোর প্রকৃতির এই মানুষটি আমার পরিকল্পনায় খুশী হয়ে যাত্রার জন্য প্রস্তুতি নিলো।

প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেয়ার পর আমি মোস্তফাকে নিয়ে স্থানটা স্বচক্ষে দেখার জন্য বসন্তপুরের দিকে রওনা হলাম। দীর্ঘ ন'মাস যাবৎ ইছামতির ওপার থেকে বসন্তপুর আমাদের কতবার ইশারায় আহবান জানিয়েছে। এক ঘন্টা পরে হিংগলগঞ্জে পৌঁছে দু'জন স্পীডবোট নদী পার হয়ে তীরে নামলাম। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার আজ কোন মেশিনগান গর্জে উঠলো না। আগে অবশ্যই কোন অতিথির পদার্পণ মাত্র মেশিনগানগুলো মুহূর্তে এক ঝলক আগুন ছুড়ে গর্জে উঠতো।

রক্তলাল সূর্যটাকে বুকে নিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীন পতাকা যখন পত্ পত্ করে উড্ডীন দেখলাম, তখন কি যে উত্তেজনা! ওই সূর্যটাকে স্বাগত জানাতে কত না রক্ত ঢালতে হয়েছে এই ইছামতির তীরে। সমুন্নত পতাকার নিচে দু'থেকে তিনজন মুক্তিযোদ্ধা নীরবে দন্ডায়মান। শত্রুর কোন চিহ্ন নেই। বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ, রেশন এবং চারিদিকে কুৎসিৎ ধবংসাবশেষ রেখে হানাদাররা পালিয়েছে।

স্বাধীন বাংলার পতাকা উড়াবার জন্য আত্মাহুতি দিতে হয়েছিল অনেক মুক্তিপাগল তরুণকে। ওদের মহান আত্মত্যাগের জন্যই আজ স্বাধীন বাংলার পতাকা সমুন্নত শিরে উড্ডীন রয়েছে। পরিত্যক্ত অস্ত্রশস্ত্র দেখে আজ আর আমি উত্তেজিত হই না। আগে মাত্র একটা রাইফেল দেখে চঞ্চল হয়ে উঠতাম। এখন এটা আমার কাছে অস্বস্তিকর লাগলো।

বসন্তপুর অধিকার করে আনন্দ ও উত্তেজনার পরিবর্তে মন আমার বেদনাভরাক্রান্ত হয়ে উঠলো। নভেম্বরের শীতল বাতাসে উচুঁ বাঁধটার উপর দাঁড়িয়ে মানুষের এই বীভৎস কংকাল গুলোর দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম। কি মর্মান্তিক! ওরা রক্ত দিয়েছে, আমরা ও রক্ত দিয়েছি। সাক্ষী রয়েছে ওদের কংকালগুলো। স্বাধীনতা-পাগল আমার মুক্তিযোদ্ধাদের কংকালও ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে এখানে-ওখানে।

এই মিশ্র অনুভূতি সম্বল করে কালিগঞ্জ ও নাজিমগঞ্জ পরিদর্শন করলাম। এই জায়গাগুলো কিছু ভাল বলে মনে হলো। কিছুটা প্রাণের স্পন্দন এখনও যেন বেঁচে আছে।

এখানে কিছু লোকজন দেখলাম। অনেক বাড়িঘর ধবংস্তুপের মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। আবার অনেকগুলো নারকীয় অগ্ন্যুৎসবের বিকলাংগ চেহারা নিয়ে বীভৎসতার সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এত দুঃখের মাঝেও যে ক'জন লোক আমরা এখানে পেয়েছিলাম, তারা আমাদের স্বাগত জানাতে কার্পণ্য করলো না। স্থানীয় লোকজন বললো, গত রাত থেকেই হানাদাররা সাততাড়াতাড়িতে পালাতে শুরু করেছিল পলায়নপর হানাদারদের স্থানীয় লোকজন যখন জিজ্ঞেস করেছে' আপনারা কোথায় যাচ্ছেন? তখন ওরা কম্পিত স্বরে জবাব দিয়েছিল, মুক্তিরা আমাদের চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে, ওপরওয়ালাদের হুকুমমত তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছি।'

ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে হানাদাররা যে ভাবে পালিয়ে গিয়েছিল, তার বর্ণনা দিতে গিয়ে স্থানীয় লোকজন হাসিতে ফেটে পড়লো। অনেক দামী ও লোভনীয় জিনিস রেখে যাওয়া ছাড়াও হানাদাররা প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ। অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নদীতে ফেলে দেয়।

ক্যাপ্টেন হুদা রাতে বসন্তপুরের উপর আক্রমণ চালায়। জবাবে সারা রাত ধরে হানাদাররাও প্রচন্ড গোলাবর্ষণ করে। আর এই গোলাবর্ষণের আড়ালে রাতের আধাঁরে গা-ঢাকা দিয়ে শত্রুরা পালিয়ে যায়। ভোরে অবস্থা অত্যন্ত শান্ত ভাব ধারণ করায় হুদা, মুক্তিযোদ্বার একটি ছোট দলকে গ্রামের অভ্যন্তরে পাঠিয়ে, যারা আমদের গোপনে সংবাদ সরবরাহ করতো, তাদের কাছ থেকে প্রথমে জানতে পারলো যে, হানাদাররা পালিয়ে গেছে।

সংবাদ পেয়ে হুদা এক কোম্পানী সৈন্য নিয়ে কালিগঞ্জ-সাতক্ষীরা রাস্তা ধরে একরকম দৌঁড়ে বসন্ত পুরের দিকে অগ্রসর হতে লাগলো। একটা ভাঙ্গা জীপ ছাড়া তার সাথে আর কোন যানবাহন ছিল না। জীপটা কিছুদিন আগে হানাদারদের কাছ থেকে অধিকার করা হয়। হানাদাররা তখনও পালাচ্ছিল। প্রশংসনীয় উদ্যম ও মনোবল নিয়ে ক্যাপ্টন হুদা দীর্ঘ বারো মাইল পথ হেঁটে তার বাহিনীসহ মিঃ শাজাহানের লোকদের কাছে পৌঁছে হানাদারদের সম্মুখ থেকে আঘাত হানলো, তখন ওরা দিশেহারা হয়ে পারুলিয়ার দিকে পালাতে শুরু করে। ওদিকে মিঃ শাজাহানের নেতৃত্বে টাকি থেকে যে সৈন্যদলটি এসেছিল, তারা পলায়নপর হানাদার বাহিনীর একটি দলকে মাঝপথে অবরোধ করে ফেললো। এদিকে হুদা জানতে পারলো যে, হানাদাররা পারুলিয়া সেতু উড়িয়ে দিয়ে ওপারে আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা নিয়েছে। সেতুর চার মাইল দুরে অবস্থান নিয়ে ক্যাপ্টেন হুদা দ্রুত মিঃ চৌধুরী ও শাজাহানের নেতৃত্বাধীন মুক্তিবাহিনীকে তার লোক জনদের একত্র করে পুনর্বিন্যাস করলো।

সমস্ত মুক্তিযোদ্ধাকে আটটি কোম্পানীতে বিভক্ত করে লেঃ মোহাম্মদ আলী, লে আহসানউল্লাহ, লেঃ শচীন্দ্র ও মিঃ চৌধুরীকে দায়িত্ব দিয়ে রাতের অন্ধকারে ব্রীজের দিকে অগ্রসর হতে লাগলো। হানাদাররা পালাবার আগেই ব্রীজের ওপারে তাদের অবস্থান সুদৃঢ় করে নিয়েছিল তাছাড়াও ব্রীজের চার মাইল পিছনে আলিপুর নামক একটি জায়গায় তাদের একটি শক্তিশালী আর্টিলারী রেজিমেন্ট ছিল।

ওই রাতেই আমি অগ্রবর্তী এলাকা পরিদর্শন করলাম। তখন পাক-হানাদার ও আমাদের মধ্যে প্রচন্ড গুলি বিনিময় হচ্ছিল। আমাদের বাঁ- দিকে মিঃ মাহবুবের নেতৃত্বাধীন ৮নং সেক্টরের সৈন্যদের নিয়োগ করা হয়েছিল। মিঃমাহবুব একজন পি-এস-পি অফিসার। কর্মদক্ষতার জন্য তাকে মেজর পদে উন্নীত করা হয়। তিনি সাহসী ও বুদ্ধিমান। আঘাততের পর আঘাত হেনে শত্রপক্ষকে সর্বদা ব্যস্ত রাখতেন। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মিত্রবাহিনীর তরফ থেকে আমরা কোন সাহায্যকারী সৈন্য পাইনি।

৭২নং সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনীর সৈন্যরা আমাদের অধিকৃত জায়গাগুলো, যেমন বসন্তপুর ও কালিগঞ্জের উপরে তাদারকী করতো। আর তাদের সাহায্য করতো পিছনে আবস্থানরত আমাদের মুক্তিবাহিনী। সুবেদার মেজর এ. জলিল ও লস্করের অধীনে মুক্তিবাহিনী এখানে কাজ করেছে। আমাদের সাথে মর্টার সজ্জিত মুক্তিবাহিনীর একটি দল ছিল। তারা শুধু হানাদারদের গোলাবর্ষণের জবাবে পাল্টা গুলি ছুড়তো। সুবেদার গফুর নামে একজন আভিজ্ঞ মর্টার শিক্ষক পাক-হানাদারদের গুলির জবাবে দক্ষতার সাথে পাল্টা গোলাবর্ষণ করে প্রত্যেকবারই শত্রুদের প্রভুত ক্ষতি সাধন করতো। ভয়ানকভাবে কোণঠাসা হয়ে হানাদারদের মেশিনগানগুলো সব সময় গর্জন করতে লাগলো। যেহেতু আমাদের অবস্থানের চতুর্দিক হানাদারদের দৃষ্টির আওতায় সেজন্য রাত্রে বা দিনে পাহারায় বেরুনোর খুবই কষ্টকর ছিল। কিছুক্ষণর জন্য যুদ্ধ দানবটা দম নিয়ে পুর্নবার আক্রমণ করার জন্য। প্রস্ত্তিত নিতো।

২৩শে নভেম্বর পারুলিয়া থেকে চার মাইল দূরে আর একটা ব্রীজের পেছনে হানাদাররা সরে গেল। সরে যাবার আগে ওরাই এবার নৃশংসতার স্বাক্ষর রেখে গেল। এদিকে আমাদের সৈন্যরা সামনের দিকে আগ্রসর হতে

লাগলো। স্পষ্ট বোঝা গেল যে হানাদাররা প্রথমে সাতক্ষীরায় ও পরে খুলনার দিকে পালাবার জন্য যুদ্ধে দীর্ঘসূত্রতার কৌশল অবলম্বন করেছে। এই ব্রীজের কাছ এসে উভয় পক্ষই মাঝে-মধ্যে মেশিনগানের ব্রাশ ফায়ার করে গুলি বিনিময় করতো। এখানে মূর্তজা নামে একজন মুক্তিযোদ্ধ কে হারাতে হয়। সে অত্যন্ত সাহসী এবং অনেক যুদ্ধে সক্রিয় অংশ নিয়েছিল। মাথায় বুলেটের আঘাত লাগার পর তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু ওকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। কেননা, বুলেটের আঘাতে ওর মগজ বের হয়ে গিয়েচিল। যাহোক, আমরা সব সময় আত্মরক্ষামুলক আবস্থান থেকে শত্রুর প্রতিটি গতিবিধির প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতাম।

হানাদাররা যে সমস্ত জায়গা ছেড়ে পালিয়ে গেছে, তার খবরটা কোলকাতার জনগণের কাছ খুব দ্রুত পৌঁছে গেল। মুক্তাঞ্চল পরিদর্শন করার জন্য সাংবাদিক,টিভি ক্যামরাম্যান এবং আরও অনেক সম্মানিত ব্যক্তি আসতে লাগলেন।ইছামতীর পশ্চিম তীর লোকে লোকারণ্য, মনে হলো কোন জনাকীর্ণ মেলা। পরিদর্শনকারী দু'একটি দলকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনারা এখানে ঘোরাঘুরি করছেন কেন? উত্তর এলো, মুক্তির আনন্দ, মেজর সাহেব- মুক্তির আনন্দ'।

মুক্তির আনন্দই যেন বৈধ পাসপোর্ট। শিগগিরই মুক্ত-অঞ্চল লোকের আগমনে সরগরম হয়ে উঠলো। কোলকাতা থেকে শরণার্থীরা দলে দলে তাদের পরিত্যক্ত বাড়িঘরে ফিরে আসতে লাগলো। আবার নতুন করে ঘর বাঁধার প্রবল ইচ্ছা।

এবার সর্বাধিনায়ক কর্নেল ওসমানী সাহেব মুক্তাঞ্চল সফর করতে এলেন। তাঁকে আমি রণাঙ্গনের অগ্রবর্তী এলাকায় নিয়ে গেলাম। কতকগুলো অসুবিধার জন্য সাতক্ষীরা থেকে আট মাইল দূরে আমাদের থামতে হয়েছিল।কি করে এই অসুবিধাগুলো দূর করা যায়, তাঁকে বুঝিয়ে বললাম। আমার পরিকল্পনা ছিল, সাতক্ষীরার পিছনে দু'দিক থেকে সৈন্য পঠিয়ে হানাদারদের পালানোর পথ বন্ধ করে দেয়া এবং যাতে নতুন সৈন্য আমদানী করে শক্তি বৃদ্ধিকরতে না পারে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা। দু'টো প্রধান রাস্তা দিয়ে সাতক্ষীরার সাথে চলাচল ব্যবস্থার সংযোগ সাধন করা হতো। একটা হলো, যশোর থেকে কদমতলা হয়ে- অপরটা হলো কালিগঞ্জ থেকে যে পথ ধরে আমরা অগ্রসর হচ্ছিলাম, সেই পথ। এ রাস্তাটা সাতক্ষীরার ভেতর দিয়ে দৌলতপুর-খুলনা পৌঁছেছে। স্থির করলাম, প্রত্যেকটি রাস্তায় বাধা সৃষ্টি করবো।

২৯শে নভেম্বর, হাবিলদার আফজালের নেতৃত্বে দু'শো মুক্তিযোদ্ধার একটি দল সাতক্ষীরার পথে পাঠিয়ে দিলাম। কিন্তু যেভাবে তাকে নির্দেশ দিয়েছিলাম সেইমত কাজ করতে ব্যর্থ হলো। তারপর লেঃ আহসানউল্লাহর সেতৃত্বে দু'শো মুক্তিযোদ্ধার একটি দলকে ওই একই পথে পাঠানো হলো। আহসানইল্লাহ অত্যন্ত সাহসী যুবক। তার যোগ্যতা ও সামর্থ্য সম্বন্ধে আমি নিশ্চিত ছিলাম। এগিয়ে যাবার প্রচন্ড শক্তি তার মধ্যে। ডানদিক থেকে একশো মুক্তিযোদ্ধার আর একটি দলকে মিঃ শাজাহানের নেতৃত্বে সাতক্ষীরা-দৌলতপুর রাস্তায় ওঁৎ পেতে শত্রুকে আঘাত করার জন্য পাঠিয়ে দিলাম। ক্যাপ্টেন হুদাকে বললাম যে, রাতের বেলায় আক্রমণাত্মক পাহারা দিয়ে শত্রুদের উপর চাপ সৃষ্টি করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সাতক্ষীরা অধিকার এবং সৈন্যদের দ্রুত পুনর্গঠিত করে পলায়নের পর শত্রুদের পিছু ধাওয়া করতে হবে।

ইতিমধ্যে প্রশাসনিক ব্যবস্থার বৃহদাংশ নদীর ওপার থেকে দেবহাটায় স্থানান্তরিত করা হয়েছে। এখানে ভূতপূর্ব সি-এস-পি অফিসার মিঃ আতাউর রহমানের তত্বাবধানে পাঁচশো তরুণ যুবক নিয়ে একটা ট্রেনিং ক্যাম্প খুলে দিলাম। মিঃ আতাউর রহমান যুবক, কর্তব্যপরায়ণ। মুক্তিযুদ্ধে তিনি সর্বান্তকরণে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। এই যুদ্ধে তার দান অপরিসীম। শীগগীরই ক্যাম্পের কার্যাকলাপ সাংবাদিক ও চলচ্চিত্র প্রযোজকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। সব মতাদর্শের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ক্যাম্প পরিদর্শনে আসতে লাগলেন। অনেক গণ্যমান্য লোকজন সাথে নিয়ে ও পুনর্বাসন মন্ত্রী মেঃ কামরুজ্জামান এই ক্যাম্প পরিদর্শন করে অত্যন্ত খুশী হলেন। ছেলেরা' জয় বাংলা' ধ্বনি তুলে মন্ত্রী মহোদয়কে স্বাগত জানালে তিনি অভিভূত হয়ে পড়লেন। কিন্তু এই সৌজন্যমুলক

পরিদর্শনে আমি খুশী হতে পারিনি। কেননা, সামনে এখনও অনেক দুস্তর পথ আমাদের অতিক্রম করতে হবে। ২রা ডিসেম্বর পর্যন্ত লেঃ আহসানইল্লাহর কাছ থেকে কোন ফলপ্রসূ খবর পাইনি। রাস্তায় ট্যাংকবিধবংসী মাইন পুঁতে শত্রুদের একটিমাত্র জীপ সে উড়িয়ে দিয়েছিল। রাস্তার ধার দিয়ে একটা সুদৃঢ় বাংকার তৈরী করে শত্রুপক্ষ অবস্থান নেয়ায় আহসানউল্লাহ ওদের কাছ ঘেঁষতে পারেনি। শত্রুদের অবস্থান থেকে দু'দিকে প্রায় দু'শো গজ পর্যন্ত উন্মুক্ত ধানক্ষেতও জলাশয়। সবকিছুই ভালভাবে দৃষ্টিগোচর হতো না। ডানদিকে মিঃ শাজাহনের বেলায় সঠিক একই অসুবিধা। তাছাড়াও, রাজাকারদের কাছ থেকে তাকে তীব্র প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

অবস্থার কোন উন্নতি হলো না। যেমন ছিল তেমনই রয়ে গেল। শত্রুদের পরিকল্পনা ছিল রাজাকার দ্বারা প্রতিরোধ তৈরী করে রাতের অন্ধকারে আস্তে আস্তে সরে পড়া । সাতক্ষীরা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার প্রায় শতকরা পঁচাশি জন লোক সামরিক চক্রের দালাল হিসাবে হানাদারদের সক্রিয় মদত যুগিয়েছে। তার ফলে সবকিছুই মন্থর গতিতে চলতে থাকে। কিন্তু ইতিহাসের ক্রমবিকাশ ও চিরন্তন গতিকে কে রুখতে পারে? পুর্ব রণাঙ্গনেই শুধু পাকিস্তানী জেনরেলরা বিভ্রান্ত ও দিশেহারা হলো না, পশ্চিম রণাঙ্গনেও রীতিমত হিমশিম খেয়ে উঠলো। ১৯৬৭ সালে ইসরাইল যে রকম ব্লীসৎক্রীগ' কায়দায় আরবদের উপর অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে, ঠিক একই কয়দায় পাক- সামরিক জান্তা তাদের বিমান বাহিনীর মিরেজ ও মিগ নিয়ে ডিসেম্বর মাসের ৩ তারিখ রাত্রে ভারতের উপর হহামলা চালায়। ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দ্রিরা গান্ধীও খুব সতর্ক ছিলেন। তিনি ওই রাত্রেই জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে পাক হামলার সমীচীন জবাব দিলেন। সুরায় বিভোর জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান মনে করেছিল রাজনীতি সচেতন বাঙালীকে চিরদিনের জন্য দাবিয়ে রাখতে পারবে এবং এই হীন উদ্দেশ্যেই সে ভারত আক্রমণ করে সমস্যাটার উপর আন্তর্জাতিক রং চাপিয়ে ভারতের সাথে একটা রাজনৈতিক মীমাংসায় আসতে চেয়েছিল। কিন্তু সে চরমভাবে ব্যর্থ হলো।

৬ই ডিসেম্বর। বেলা ১১টার সময় 'অল ইন্ডিয়া রেডিও' মারফত ঘোষণা করা হলো যে, ভারত বাংলাদেশকে সার্বভৌম রাষ্ট্র বলে স্বীকৃতি দিয়েছে। দীর্ঘ ন'মাস যাবৎ সাড়ে সাত কোটি বাঙালী অধীর আগ্রহে দিনটির জন্য প্রতীক্ষায় ছিল। সংবাদটা শুনে মন থেকে চিন্তা ও উত্তেজনা দূরীভূত হলো। হঠাৎ স্বীকৃতির এই ঘোষণা শুনে সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর এই বিধস্ত অন্তর গর্বে ফুলে উঠলো। স্বীকৃতি শুধু ফাইলের ভেতরেই সীমাবদ্ধ রইল না বা বাতাসে মিলিয়ে গেল না। মিত্রবাহিনী মুক্তিবাহিনীর কাঁদে কাঁদ মিলিয়ে প্রথম তিনদিনেই যশোর ক্যান্টনমেন্ট অধিকার করে নিলো। সুদৃঢ় অবস্থান ছেড়ে দিয়ে পাক হানাদাররা উর্ধ্বশ্বাসে পালাতে শুরু করলো। প্রত্যেকেই আশা করেছিল যে, পাক বাহিনী যশোরে আমাদের প্রচন্ড বাধা দেবে। কেননা, যশোর ক্যান্টনমেন্ট দুর্ভেদ্য বলে মনে করা হতো । কিন্তু হানাদাররা তেমন কোন বাধা দিতে না পারায় মিত্রবাহিনী ও আমরা নিরাশ হয়ে পড়লাম। অথচ মিত্রবাহিনীর কমান্ডাররা প্রথমে, মনে করেছিল যে, পাকিস্তানীদের উৎখাত করতে কমপক্ষে ১৫দিন সময় লাগবে।

অপর দিকে আমদের মুক্তিবাহিনী ডিসেম্বর মাসের ৩ তারিখে সাতক্ষীরা অধিকার করে সাতক্ষীরা দৌলতপুর রোড ধরে অগ্রসর হতে লাগলো। সাতক্ষীরা অধিকার করে যে পরিমান অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ, জ্বালানী তেল, রেশন ও অন্যান্য মুল্যবান জিনিসপত্র আমাদের হাতে এসেছিল, তা দিয়ে পুরো এক বছর যুদ্ধ করা যেতো। কিন্তু এই সময় অধিকৃত জিনিসপত্রের প্রতি আমাদের কোন মোহ ছিল না। আমাদের একমাত্র মোহ, একমাত্র উত্তেজনা শুধু সামনের দিকে অগ্রসর হওয়া। ফেছনে মুক্তিবাহিনীর উপর ওইসব পরিত্যক্ত জিনিসের হেফাজতের ভার দিয়ে ক্যাপ্টেন হুদা তার বাহিনীর লোকজন নিয়ে মাইলের পর মাইল পায়ে হেঁটে অগ্রসর হতে লাগলো।

হানাদাররা পালাবার সময় প্রধান সেতুগুলো ধ্বংস করে দিয়েছিলো। এর ফলে আমরা খুবই অসুবিধার সম্মুখীন হলাম। দু'একটা জীপ ছাড়া আমাদের কাছে কোন যানবাহন ছিল না। এই জীপগুলো নানা উপায়ে পার

করা হতো। মিঃ ফজলুল হক ও সুলতানউদ্দীন আহমেদ যথাক্রমে সদর দপ্তর ও গেরিলা ক্যাম্পের সামরিক দায়িত্বে নিযুক্ত ছিল। তাদের শেষ নির্দেশ দেয়ার জন্য আমি ফিরে গেলাম।

চার্লি সেক্টর থেকে সর্বশেষ যে নির্দেশ পেলাম, তা হলো-অস্ত্রপাতি ছাড়া মুক্তিযোদ্ধদের বিদায় দিতে। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো, বিভিন্ন যুবকেন্দ্রের ম্যানেজাররা এম সি এ'রা স্বাধীনতার উল্লাসে আত্মহারা হয়ে ছেলেদের ফেলে রেখে যে যার মত আগেই চলে যায়। আর ছেলেরা পড়ে মহাসংকটে। বাংলাদেশে ফিরে যাবার মত কোন সম্বলই ছিল না তাদের। তারা আমার হেডকোয়ার্টরের চারিদিকে এসে ভীড় করলো এবং অনুরোধ জানালো যে তাদের জন্য যেন কোন বন্দোবস্ত করে দেই। আমার এক বন্ধুর সাথে যোগাযোগ করে ছেলেদের যাবার বন্দোবস্ত করার জন্য সুলতান ও হককে বলে দিলাম।

দিনটা ডিসেম্বরের ৯ তারিখ। সবকিছুই এলোমেলো। কারুর দিকে কারুর দৃষ্টি নেই। কাজকর্ম ফেলে রেখে সবই বাংলাদেশের ভেতরে চলে যেতে চায়। আমি তাদের মানসিক অবস্থা উপলব্ধি করতে পারি। কিন্তু পিছনের কাজকর্ম গুছিয়ে দেয়ার জন্য কাউকে অন্ততঃ এখানে থাকতে হবে। পরিকল্পনা মোতাবেক বেগকে তার দলবলসহ গণ-পরিষদ সদস্য মিঃ নূরুল ইসলাম মঞ্জুর সাথে বরিশালে পাঠিয়ে দিলাম।

টাকি ও হাসনাবাদের দিকে চেয়ে মনটা কেঁদে উঠলো। মনে হলো, ওরা আজ বড্ড শূন্য, বড্ড নিঃসংগ। দীর্ঘ ন'মাস যাবৎ অসংখ্য মুক্তিযেদ্ধা ও শরণার্থীর ভীড়ে কর্মচঞ্চল হাসনাবাদ ও টাকি আজ নীরব। যেন ফুঁপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদছে আমি ভয়ানক অন্তর্জ্বালা অনুভব করলাম। শেষবারের মত ইছামতী ও আমার হেডকোয়ার্টারের দিকে অশ্রুসজল চোখ দুটো বুলিয়ে মোস্তফাকে আমার জীপে উঠতে বললাম। অন্যমনস্কভাবে কিছুক্ষন তাকিয়ে রইলাম, হক ও অন্যান্য সাথীদের দিকে। পরে খুলনায় এসে আমার সাথে যোগ দেয়ার জন্য ওদের নির্দেশ দিলাম এবং আমাদের অগ্রবর্তী বাহিনীর সাথে যোগ দেয়ার জন্য আমি এগিয়ে চললাম। পিছনে পড়ে রইল স্মৃতিবিজড়িত হামসাবাদ, টাকি-চেনা-অচেনা মুখ ও হাসিকান্নার অনেক গল্প।

বিজয়ের আনন্দে আমার গাড়ী চাকাগুলো অসম্ভব দ্রুতবেগে ঘুরতে লাগলো। আমি দৌলতপুর থেকে ১০ মাইল দূরে একটি স্কুলের কাছে আমার লোকজনদের সংগে মিলিত হলাম। এই জায়গাটার নাম শাহপুর। এখান থেকে একটি রাস্তা বের হয়ে যশোরর- খুলনার বড় রাস্তার সাথে ফুলতলার কাছে এসে মিশেছে।

ডিসেম্বরের ৯ তারিখের রাত। স্কুল থেকে অগবর্তী এলাকায় মিত্রবাহিনী ও মুক্তিবাহিনী মাত্র এক মাইল দূরে। শত্রুপক্ষের অবস্থানের হাজার গজের মধ্যে মিলে এক কোম্পানী সৈন্য মোতায়েন করা হয়েছিল। ৯ তারিখ রাত্রেই আমি ওদের কাছে যেতে চাইলাম। কিন্তু ওদের কাছে, পৌছানো দুঃসাধ্য ছিল। কেননা, ওরা তখন সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। সুতরাং স্থির করলাম, ১০ তারিখে ভোরে ওদের সাথে মিলিত হবো। রাতটা ভয়ানক রকমের অশান্ত। সারারাত ধরে দ'পক্ষের কামানগুলো অবিশ্রান্ত গর্জন করছিল। স্কুলের ছাদে উঠে আমি, মোস্তফা, ডাঃ শাজাহান ও হুদা দেখতে পেলাম সারা আকাশটা লালে লাল। কামানের গর্জনে স্কুলের ছাদটা থরথর করে কাঁপছে। খুবই উত্তেজক সন্দেহ নেই। কিন্তু বড় করুণ, বড় নির্মম। কেননা, শত্রু মিত্র অনেক মানুষের জীবন প্রদীপ নিভে গেছে হিংস্র কামানের গোলায়। সমস্ত রাত শুধু কামানের গর্জন আর গর্জন।

১০ই ডিসেম্বর থেকে ১৭ই ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়টা অতিবাহিত হলো অহেতুক উদ্দীপনা, উত্তেজনা ও এক রকম বিশ্রামের মধ্য দিয়ে। মুক্তিসংগ্রামের শেষ পর্ব। দুঃখ ও আনন্দে আবহাওয়া ভারাক্রান্ত। স্থানীয় লোকজন বিজয়ের আনন্দে আত্মহারা। নানাভাবে আতিথ্য দেখিয়ে জনগণ আমাদের মুগ্ধ করলো। যেন আমরা সবাই একই সংসারের লোক, একই সুখ দুঃখের ভাগী। রাস্তার পার্শ্বে সেই স্কুলটায় যে সপ্তাহটা কাটিয়েছিলাম, তার পূর্ণাংগ চিত্র তুলে ধরার জন্য রণাংগনের ডাইরীর কিয়দংশ তুলে ধরছিঃ

১০ই ডিসেম্বর,১৯৭১ সালঃ গত রাতে ঘুমাতে পারিনি। কামানগুলো ঝিমিয়ে পড়েছে। গুহায় আহত সিংহের মত কামানগুলো তবুও মাঝে মাঝে গোঙাতে লাগলো। ভোরে ঘুম থেকে উঠে এক মগ চা দিয়ে গলাটা ভিজিয়ে অগ্রবর্তী ঘাটিতে যুদ্ধরত সৈন্যদের কাছে গেলাম। এটা আমাদের দ্বিতীয় অবস্থান। সাতক্ষীরা দৌলতপুর রাস্তায় প্রায় একহাজার গজ সামনে মেজর ঠাকুরের নেতৃত্ব ১৩নং 'ডোগরা' পদাতিক বাহিনী অবস্থান নিয়েছিল। অগ্রবর্তীদলের মর্টার সজ্জিত সৈন্য দলটিও এখানে অবস্থান নেয়। রাস্তার দু'দিকে খোলা জলাশয়, সব কিছুই চোখে পড়ে। রাস্তায় কোন রকম চলাচল করলেই শত্রুপক্ষের মেশিনগানগুলি গর্জে ওঠে। রাস্তাটা খুব উঁচু। খুলনায় অয়ারলেস স্টেশনের টাওয়ার ও দৌলতপুর পানির ট্যাংক ভালভাবে দেখা যায়। এত কাছে তবু সোজাসুজি যেতে পারছি না। খুলনাকে দেখে আমি খুবই তৃষ্ণার্ত ও উত্তেজিত হয়ে উঠলাম। যেহেতু পিছন দিক থেকে অনেকটা পথ ঘুরে আসতে হয়, সেজন্য আমাদের সৈন্যরা দু'দিক থেকে অগ্রসর হতে লাগলো। তাছাড়া মিত্রবাহিনীর আগে আমাদের যাবার কথা নয়। কাজেই আমাদের পিছনে থেকে যুদ্ধের গতিবিধি লক্ষ্য করা ছাড়া কোন উপায় ছিল না। মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে কথা বললাম। ওদের অধিকাংশই খুলনার লোক। দেখলাম, ওদের মনোবল খুবই উঁচু। ওদের ঘরদোরের করুন দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে উঠলো। স্কুলে ফিরে এসে আমাদের যা কিছু আছে সব একত্র করার জন্য হুদাকে বললাম।সম্ভাব্য বিপদের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য ট্রেঞ্চ খনন করে তার ভেতরে আমরা আশ্রয় নিলাম। কেননা, এই জায়গায় শত্রুপক্ষের কামানোর আওতায়। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সতর্ক হয়ে প্রস্ত্তত রইলাম। আকাঙ্ক্ষিত চরম লক্ষ্যবস্ত্তর কত কাছে আমরা-তবু কত দূরে।

১১ই ডিসেম্বর,১৯৭১ সালঃ যে দৃশ্য দেখেছি, তা জীবনের অন্যতম স্মরণীয় ঘটনা হয়ে থাকবে। দেখলাম, সাতক্ষীরা-দৌলতপুর রোড লোকে লোকারণ্য। বিভিন্ন যুবকেন্দ্র থেকে ওরা দলে দলে ফিরে আসছে। যতদূর চোখ যায় শুধু লোক আর লোক। কাঁধে ছোট ছোট বোঝা। রিক্ত, নিঃস্ব, সম্বলহীন। ক্লান্ত পায়ে এগিয়ে আসছে মানুষের কাফেলা। আল্লাহর অসীম অনুগ্রহ, আমরা ওই রাস্তার উপরই ছিলাম, নইলে ওই রিক্ত মানুষগুলো হিংস্র শত্রুদের খপ্পরে পড়ে যেতো। সামনে অগ্রসর হতে বারণ ওদের থামিয়ে দিলাম।

একটা দোতলা দালান থাকার জন্য ঠিক করা হলো। ওদের খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্ত করতে হবে। ভয়ানক চিন্তায় পড়ে গেলাম। ওরা প্রত্যেকেই এসে অভিযোগের সুরে বললো, 'স্যার, আমাদের সাথে কোন টাকা-পয়সা নেই। এম-এন-এ, এম-পি-এ'রা আমাদের ফেলে পালিয়ে গেছে।' মুখগুলো শুষ্ক, কুঞ্চিত। কেননা, পঞ্চাশ মাইল পথ ওদের পায়ে হেঁটে আসতে হয়েছে। মনটা আমার কেঁদে উঠলো। ওদের সান্ত্বনা দিয়ে একটা বড় লংগরখানা খোলার জন্য চৌধুরীকে বললাম। খুলনা মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত মুক্তিযোদ্ধাদের এখানেই থাকতে নির্দেশ দিলাম। চৌধুরীকে লংগরখানা দেখাশুনার ভার দিয়ে আমি হেডকোয়ার্টারের দিকে রওনা হয়ে গেলাম এবং ফুলতলা পৌঁছে ৯নং পদাতিক ডিভিশনের হেডকোয়ার্টারের সাথে যোগাযোগ করলাম। মেজর জেনারেল দলবীর সিং এই ডিভিশনের কমান্ডার।

ফুলতলা থেকে কিছু সামনে খুলনার দিকে যে রাস্তাটা গিয়েছে তার ডানপাশে একটি কৃষি কলেজের মধ্যে হেডকোয়ার্টারের অফিসাদি। মেজর জেনারেল সিং-এর দেখা না পেয়ে তাঁর স্টাফ অফিসারের সংগে দেখা করলাম। এই ডিভিশনের একটি ব্রিগেড হেডকোয়ার্টার থেকে তিন মাইল সামনে অবস্থান নিয়েছিল।

পাক হানাদাররা এখানে তীব্র প্রতিরোধ দিয়ে খুলনা-যশোর উপর মিত্রবাহিনী অগ্রগতি বন্ধ করে দিল। অবিরাম গোলাবর্ষণ চলতে লাগলো। মনে হলো, খুলনার শত্রুপক্ষ সুদৃঢ় ঘাঁটি গেড়েছে। সীমান্ত ও যশোর ক্যান্টনমেন্ট ছেড়ে পাকিস্তানী সৈন্যরা জড়ো হয়েছে খুলনায়। কেননা, মুক্তিবাহিনী চতুর্দিক থেকে ওদের ঘিরে রেখেছে। হানাদাররা মিত্রবাহিনীর চাইতে মুক্তিযোদ্ধাদের বেশী ভয় করতো ।

১৩ই ডিসেম্বর,১৯৭১ সালঃ আমাদের আত্মরক্ষামূলক অবস্থানের সামনে শত্রুঘাঁটির উপর বিমান হামলা পর্যবেক্ষণ করার জন্য আমি, ৯নং ডিভিশনের স্টাফ অফিসার মেজর ভট্টাচার্য, ভারতীয় বিমান বাহিনীর ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট দত্ত আমাদের দ্বিতীয় অবস্থানে বসে সারা দিন অপেক্ষা করলাম। মিঃ দত্তের নির্দেশে এই বিমান

হামলা পরিচালিত হচ্ছিল। বায়ুস্তর ভেদ করে বিমানগুলো উড়ে আসতেই মিঃ দত্ত বেতার যন্ত্র মারফত পাইলটদের সাথে যোগাযোগ করলেন এবং সঠিক লক্ষ্যস্থলের বর্ণনা দিয়ে আঘাত হানার নির্দেশ দিলেন। পাইলটদের ঠিকমত নির্ভূলভাবে লক্ষ্যবস্তু চিনে বারবার বিমান নিয়ে 'ড্রাইভ' দিতে লাগলো। হানাদারদের কোন বিমান বা বিমানধ্বংসী কামান না থাকায় তারা এই বিমান আক্রমণের কোন প্রত্যুত্তর দিতে পারল না। অসহায়ের মত শুধু মার খেতে লাগলো।

১৪ই ডিসেম্বর, ১৯৭১ সালঃ মেজর জেনারেল দলবীর সিং-সাথে তাঁর হেডকোয়ার্টারে সাক্ষাৎ করলাম। দেখলাম গাড়ীর ভেতর তিনি একটি ম্যাপ দেখছেন এবং খুবই ব্যস্ত। তাঁকে ভয়ানক বিরক্ত ও রাগান্বিত মনে হলো। কেননা, প্রচন্ড গোলাবর্ষণ করার পরও তিনি এগুতে পারছিলেন না। তার অগ্রগতি থেমে গিয়েছেল।

ভারতের সর্বাধিনায়ক জেনারেল মানেকশ' অল ইন্ডিয়া রেডিও মারফত ঘোষণা করলেন যে, আত্মসমর্পনকারী সৈন্যদের জীবনের নিরাপত্তা দেয়া হবে। তৎসত্ত্বেও শত্রুপক্ষের আত্মসমর্পণ করার কোন লক্ষণ দেখা গেল না।

জেনারেল দলবীর সিং তাঁর একটি বাহিনীকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার কাছে আমার কাছে কয়েকজন দক্ষ লোক চাইলেন। উদ্দেশ্য, শত্রুদের বাঁদিক থেকে আক্রমণ করে বিভ্রান্ত করে ফেলা। তাড়াতাড়ি হেডকোয়ার্টারে ফিরে গিয়ে খুলনার পথ-ঘাট যাদের ভাল জানা আছে এ-রকম পাঁচজন আমি নির্বাচিত করলাম।

১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৭১ সালঃ গতরাতে মুষলধারে বৃষ্টি থাকার মিত্র-বাহিনী সামনে এগুতে পারলো না। আজকে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো হবে। এদিকে লেঃ দত্তের তত্ত্বাবধানে দৌলতপুর ও খুলনার কয়েকটা নির্দিষ্ট জায়গায় বিমান হামলা চালানো হলো। বারবার বিমান হামলায় খুলনা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে দেখে মনে ব্যথা অনুভব করলাম এবং পাক হানাদাররা এখনও আত্মসমর্পণ না করায় মনে মনে ওদের অভিশাপ দিতে লাগলাম। আজকে একটা মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে গেল। আমাদের একজন মুক্তিযোদ্ধা বুলেটের আঘাতে প্রাণ হারায়। ক্যাম্পর আর একজন মুক্তিযোদ্ধা রাইফেলের ম্যাগাজিন খালি ভেবে ট্রিগারে টিপ দেয়, যার ফলে এই মর্মান্তিক দৃশ্যের অবতারনা হয়। মুক্তিযোদ্ধাটি একজন এস-এস-সি পরীক্ষার্থী। মুকড়া স্কুল প্রাঙ্গণে ওকে সমাহিত করা হয়েছিল। স্থানীয় স্কুল কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করলাম, তারা যেন শহীদ মুক্তিযোদ্ধার স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য তার নামে স্কুলটির নামকরণ করে।

১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭১ সালঃ দিনটা মেঘাচ্ছন্ন। কিছুটা ক্লান্তিও বিষণ্ণ বোধ করতে লাগলাম। গতরাত্রের পরিকল্পনামাফিক মিত্র বাহিনীর এক'স্কোয়াড্রন ট্যাংক' খুলানার দিকে অগ্রসর হলো। কিন্তু ফলাফলের কোন খবর পেলাম না।

সকাল দশটা। শাহপুর স্কুলে কতকগুলো ছেলের দাঁড়িয়ে সাথে ছিলাম। ক্যাপ্টেন হুদার জীপ এসে থামতেই সে একটা দুষ্ট ছেলের মত লাফিয়ে পড়ে গভীর আবেগে আমাকে জড়িয়ে ধরলো।এ-রকম করতে আগে তাকে কখনও দেখিনি। তার এই ব্যবহার দেখে খবই বিস্মিত হলাম। সে এক রকম কাঁপতে কাঁপতে বললো, 'অত্যন্ত সুখবর স্যার, পাক সৈন্যরা আত্মসমর্পণ করেছে এবং ভারতের সশস্ত্র বাহিনীর জেনারেল জ্যাকপ ইতিমধ্যে ঢাকায় অবতরণ করেছেন।'

সংবাদটা অবিশ্বাস্য মনে হলো। কেননা, কল্পনাও করতে পারিনি যে, ওই হিংস্র পশুগুলো এত তাড়াতাড়ি আত্মসমর্পণ করবে। তবুও এ সংবাদটা শুনে আমার সারা দেহে তপ্ত রক্তস্রোত বইতে লাগলো। চিৎকার করে ছেলেদের উদ্দেশ্য বললাম, 'আমরা যুদ্ধে বিজয়ী হয়েছি।'

আমার জীবনে সবচেয়ে আনন্দঘন মুহূর্ত। ছেলেরা সবাই আনন্দে আত্মহারা হয়ে চিৎকার করতে লাগলো। ওদের মধ্যে কেউ কেউ ডিগবাজি খেয়ে ঘাসের উপর গড়াগড়ি করতে লাগলো। সবাই এক সঙ্গে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠলো, 'তোমার নেতা, আমার নেতা-শেখ মুজিব।'

আমি এবং হুদা মিত্রবাহিনীর ৯নং ডিভিশনের সদর দপ্তরে গিয়ে মেজর জেনারেল দলবীর সিংহকে তাঁর বাহিনীর অপর দু'জন অধিনায়কসহ খোশ মেজাজে বসা দেখলাম। আমাদের দেখে তাঁরা সবাই উল্লসিত হলেন এবং আমাদের স্বাগত জানালেন।

সময় বেলা ১২টা। কামানগুলো নীরব। আমরা একটা ট্রানজিস্টারের কাছে বসে ঢাকার খবরাখবর শুনতে লাগলাম। শুনলাম পাকিস্তান সশস্ত্রবাহিনীর অধিনায়ক লেঃ জেনারেল নিয়াজী তাঁর অধীনস্থ সমস্ত সৈন্য নিয়ে সকাল সাতটায় মিত্র-বাহিনীর লেঃ জেনারেল অরোরার নিকট আত্মসমর্পণ করেছেন।একদিকে আমাদের ঐতিহাসিক বিজয়ের আনন্দ, অপরদিকে ওদের অপমানজনক পরাজয়ের তীব্র গ্লানি।

যাহোক, এদিকে খুলনাকে নিয়ে বড্ড দুর্ভাবনায় পড়লাম। তখন পর্যন্ত এখানকার শত্রুপক্ষের আত্মসমর্পণ করার কোনই লক্ষণ দেখা গেল না। উত্তেজনায় জেনারেল দলবীর সিং টেবিল ধাপড়ে বললেন, 'যদি ওই শয়তানগুলো এখন আত্মসমর্পণ না করে, তাহলে আমার নিকট যে গোলন্দাজ বাহিনী আছে, তা পাঠিয়ে দিয়ে ওদের মাটির সাথে মিশিয়ে দেব।'

সময়ের চাকাটা ঠিকমতই চলতে লাগলো। কিন্তু আমাদের সামনে যে শত্রু রয়েছে, তারা যেন স্থবির। সবাই আমরা বসে। প্রতি মুহূর্তে আশা করছি এইবার বুঝি হানাদাররা আত্মসমর্পণ করবে। সূর্য ডুবে গেল, কিন্তু আত্মসমর্পণের কোন আভাস পাওয়া গেল না। আজ ঢাকার শত্রুপক্ষ আত্মসর্পণ করলো। কিন্তু খুলনায় আত্মসমর্পণ করতে ওরা অস্বীকৃতি জানালো। মনে হলো, খুলনায় শত্রুপক্ষের কমান্ডার অত্যন্ত শক্ত লোক। আমি আমার হেডকোয়ার্টারে ফিরে গেলাম।

রাতটা ভয়ানক অস্বস্তিতে কাটলো। আমরা কেউ ঘুমাতে পারলাম না। মিত্রবাহিনীর কামানগুলো আবার সক্রিয় হয়ে উঠলো। মাঝে মাঝে প্রত্যুত্তরে শত্রুপক্ষের কাছ থেকেও জবাব আসছিল। ওদের গোলাবারুদ হয়তো শেষ হয়ে আসছে। আমি আশাবাদী ছিলাম যে, আগামীকালই আমরা বিজয়ীর বেশে খুলনায় প্রবেশ করতে পারবো। বিগত ন'মাসের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে আজ আমার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো।

১৭ই ডিসেম্বর,১৯৭১ সালঃ গত রাতে ক্যাপ্টেন হুদার সাথে পরামর্শ করে ঠিক করলাম যে, মুক্তিবাহিনীর অধিকাংশ লোককে লেঃ মোহাম্মদ আলির তত্ত্বাবধানে দৌলতপুর রোড দিয়ে খুলনায় পাঠিয়ে দিতে হবে। ওদের ভেতর ষাটজন মুক্তিযোদ্ধাকে গাড়িতে চাপিয়ে প্রস্ত্তত করে রাখলাম, যেন ওরা নির্দেশ পাওয়া মাত্র আমাদের সাথে খুলনার উদ্দেশ্যে রওনা হতে পারে। সকাল বেলা সবাই প্রস্ত্তত। চরম বিজয়ের অভিযানের উত্তেজনায় সবাই কাপঁছে। ক্যাপ্টেন হুদা, ডাঃ শাজাহান ও মোস্তাফাকে সাথে নিয়ে সকাল সাতটার মিত্রবাহিনীর হেডকোয়ার্টারে গিয়ে পৌঁছালাম। গাড়ীতে যেসব মুক্তিযোদ্ধা প্রস্ত্তত করে রাখা হয়েছিল তারা আমাদের পিছে পিছে রওনা হলো। রাস্তায় শত শত গাড়ীর ভীড়। অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে কখন মিত্রবাহিনীর সদর দপ্তর থেকে গাড়ী ছাড়ার সংকেত সবুজ বাতি জ্বলে উঠবে এবং খুলনার দিকে অগ্রসর হবে। মিলিটারী পুলিশ স্ট্যান্ডের নিকট সবার আগে আমাদের গাড়ী দাঁড় করালাম। ৯নং মুক্তিবাহিনীর অধিনায়ক হিসাবে আমাকে স্বীকৃতি দেয়ায় মিত্র বাহিনী আমাকে গাড়ী পার্ক করার অনুমতি দিল। অন্যথায় কোন বেসামরিক লোককে মিলিটারী পোস্টের একশো গজের মধ্যে গাড়ী পার্ক করার অনুমতি দেয়া হতো না। পিছন দিকে চেয়ে দেখলাম অসংখ্য দেশী-বিদেশী সাংবাদিক, ফটোগ্রাফার গাড়ীর চারদিকে ভিড় করে আছে। আমি হেডকোয়ার্টার পর্যন্ত হেঁটে গেলাম।কারও উপর কারো নিয়ন্ত্রন ছিল না। সবাই ব্যস্ত-সমস্ত। বিজয়ের লগ্নটা আজ কত না প্রাণবন্ত। প্রতিটি মুহূর্ত

উত্তেজনাময়-ঐতিহাসিক।প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাস বিজয়ের আনন্দে মুখর। বহু প্রতীক্ষিত স্বপ্নের ফলশ্রুতি। সবাইকে খুশী মনে হলো।কিন্তু অন্তর খুলে কেউ হাসতে পারলো না। মনের অস্থিরতায় সবাই আড়ষ্ট হয়ে এলো।

জেনারেল দলবীর সিং-এর সাক্ষাৎ করলাম। তিনি অধীর আগ্রগে অপেক্ষা করছেন। কেননা, প্রধান স্টাফ অফিসার, আত্মসমর্পণকারী পাকিস্তানী কমান্ডার নিয়ে ইতিমধ্যেই রওনা হয়েছেন। এখনও এসে পৌঁছাননি। সময় অতি মন্থর গতিতে চলতে লাগলো। এক-একটি মুহূর্ত যেন এক-একটি ঘণ্টা। মিত্রবাহিনীর ৯নং ডিভিশনের স্টাফ অফিসার কর্নেল দেশ পান্ডে জেনারেল দলবীর সিংকে বললেন, 'ব্রিগেডিয়ার হায়াত খান ও তাঁর সাথের সাতজন লেঃ কর্নেল এসে পৌঁছে গেছেন।'

উত্তেজনার চরম মুহূর্ত। জেনারেল দলবীর সিং গভীর স্বরে হুকুম দিলেন, 'ওদের এখানে নিয়ে আসুন।' আমরা হেডকোয়ার্টার বিল্ডিং-এর উপর তলায় বসা ছিলাম। নিচের দিকে চাইতেই দেখলাম সাংঘাতিক অবস্থা।সামরিক বাহিনী ফটোগ্রাফাররা আত্মসমর্পণকারী পাকিস্তানী কমান্ডারদের ফটো নেয়ার জন্য, ওরা গাড়ী থেকে নামার সাথে সাথে ঘিরে ধরলো। এত ভীড় যে, নিয়ন্ত্রণ করা কিছুতেই সম্ভব নয়। উৎসাহী সাংবাদিক ও ফটোগ্রাফাররা এতদিন ধরে পাগলের মত অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল।

যাহোক, পাকিস্তানী কমান্ডারদের নিয়ে আসা হলো। আমি চারিদিকে তাকাচ্ছিলাম ওদের ভেতর আমার চেনা কেউ আছে কিনা। হ্যাঁ, ওদের ভেতর আমার চেনা দু'জন ছিল। একজনের নাম লেঃ কর্নেল ইমতিয়াজ ভয়ায়েচ। পাকিস্তানী মিলিটারী একাডেমীতে যখন আমি ক্যাডেট ছিলাম তখন ওখানে তিনি ক্যাপ্টেন ছিলেন। অপরজন লেঃ কর্নেল শামস্। তার সাথে আম জানা শোনা ছিল। ব্রিগেডিয়ার হায়াতকেও একবার কি দু'বার পশ্চিম পাকিস্তানে দেখেছি। তখন তাঁদের মনে হতো খুব ভদ্র, বিনয়ী। কিন্তু বাংলাদেশে তাঁরাই অভদ্র, অযোগ্য প্রমাণিত হয়েছে। বসতে তাঁদের চেয়ারে দেয়া হলো। জেনারেল দলবীর সিং অত্যন্ত সৌজন্যমূলক ব্যবহার করলেন তাদের সাথে। বিজয়ী ও বিজিতের কোন সামঞ্জস্য রাখলেন না। তিনি ওদের চা-পানে আপ্যায়িত করলেন। জেনারেল দলবীর সিং-এর মার্জিত রুচিবোধ ও ব্যবহার দেখে সত্যিই আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। ব্রিগেডিয়ার হায়াতের সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, 'এই যে ইনি হচ্ছেন মুক্তি-কমান্ডার। আগে আপনাদেরই একজন ছিলেন।'

আত্মসমর্পণের খুঁটিনাটি বিষয় সমাপ্ত হলো। ব্রিগেডিয়ার হায়াত খান তার ব্রিগেড মেজরকে ডেকে বললেন, মেজর ফিরোজ, তুমি এখনই চলে যাও এবং সৈন্যদের হুকুম শুনিয়ে দাও, যে যেখানে আছে সেখানেই অস্ত্র সম্বরণ করতে। ওদের বলে দিও আমরা আত্মসমর্পণ করেছি।'

শেষের কথাগুলো যখন তিনি উচ্চারণ করলেন, তখন তাঁর সারা মুখমন্ডলে বেদনা ও গ্লানির উৎকট রেখাগুলো প্রকট হয়ে উঠলো। বেলা এগারটার সময় মেজর ফিরোজ তার সাথের অন্যান্য অফিসারদের নিয়ে জীপে করে খুলনার দিকে রওনা হলেন। ঠিক তাঁর পিছনেই ব্রিগেডিয়ার হায়াত খান। তাঁর পিছনে ৯নং ডিভিশনের একটা জীপে আমি ও লেঃ কর্নেল দত্ত পাশাপাশি বসা। মিঃ দত্তকে বেসামরিক গণসংযোগ অফিসারের দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছেন। আমাদের জীপের পিছনে ক্যাপ্টেন হুদা, মোস্তাফা ও ডাঃ শাজাহান।

আত্মসমর্পণকারী পাক-সৈন্যরা রাস্তার দু'ধারে অবস্থান গেড়ে বসেছিল। এই রক্তপিপাসু নরখাদকরা আজ বন্দী। অবনত মস্তকে মন্থর গতিতে হেঁটে চলেছে।দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে আত্মসমর্পণকারী ইতালীয় সৈন্যের মত হানাদাররা দীর্ঘ লাইন দিয়ে চলতে লাগলো। ধীরে ধীরে আমরা খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলের ভেতর ঢুকলাম। এখানে ব্রিগেডিয়ার হায়াত খানের হেডকোয়ার্টার। চারিদিক শান্ত,নীবর। মিত্রবাহিনীর একজন ব্রিগেডিয়ারের তত্তাবধানে আত্মসমর্পণকারী সৈন্যদল মার্চ করে এগিয়ে এলো। চেয়ারে বসে ব্রিগেডিয়ার হায়াত খান দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'ভদ্রমহোদয়গণ, পূর্ব পাকিস্তানে বসে শেষবারের মত এক কাপ চা দিয়ে আপ্যায়ন করা ছাড়া দেবার মত আমার কিছুই নেই।'

'মৃত পূর্ব পাকিস্তানের পরিবর্তে বাংলাদেশ বলবেন কি? আমি একথা বলতেই ব্রিগেডিয়ার হায়াত অসহায়ের মত আমার দিকে চেয়ে রইলেন। উপায়ন্তর না দেখে নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও তিনি তাঁর ভুল সংশোধন করে নিলেন। চা খেয়ে আমরা সবাই সার্কিট হাউসে যাবার জন্য প্রস্তুত হলাম। এই যাত্রাটা খুবই আনন্দকর। আমরা খুলনা শহরের কাছাকাছি আসতেই রাস্তার দু'পাশের লোকজন গগনবিদায়ী চিৎকারে আমাদের স্বাগত জানালো। 'জয়বাংলা' ধ্বনিতে চারিদিক মুখরিত। আজ মনে হলো 'জয় বাংলা' বাস্তব সত্য। প্রত্যেক বাড়ির চূড়ায়, দোকানে বাংলাদেশের পতাকা। প্রতিটি নারী-পুরুষ ও শিশুর হাতেই বাংলাদেশের পতাকা। হাত নেড়ে উল্লসিত জনতার অভিনন্দনের জবাব দিলাম। সবার মুখেই হাসি। শিগগিরই আমরা সার্কিট হাউজে পোঁছালাম। আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা দলে দলে এদিকে আসতে লাগলো। সার্কিট হাউসের উপরে বাংলাদেশের পতাকা শোভা পাচ্ছে। বুকটা গর্বে ফুলে উঠলো। সমুন্নত পতাকার দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম। হাজার হাজার উৎসুক মানুষ সার্কিট হাউস ঘিড়ে রয়েছে এবং সবাই সামনে আসার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে।

যে পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দীরা নিরীহ বাঙালীদের উপর এতদিন অমানুষিক নির্যাতন চালিয়েছে, তাদের একনজর দেখার জন্য জনতা বাঁধভাঙা স্রোতের মত ছুটে আসতে চাইলো। জনতার অসম্ভব ভীড় নিয়ন্ত্রণ করার জন্য মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়োগ করা হয়েছে।কিন্তু জনতার চাপ এত বেশী যে, মুক্তিযোদ্ধারা কিছুতেই ওদের সামলাতে পারছে না। সার্কিট হাউজের দরজায় নামতেই এত ভীড়ের মধ্যেও পিষ্ট হতে হতে জনতা আমাদের দেখার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলো। কেউ আনন্দে হাততালি দেয়, কেউ গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে, কেউবা পাগলের মত ছুটে এসে চুমু খায়। কি অপূর্ব দৃশ্য! মানবতার কি মহান বহিঃপ্রকাশ। সব হারাবার দুর্বিষহ জ্বালা ভুলে গিয়ে নতুন দিনের নতুন সূর্যকে কত আপন করে কাছে নিতে চায়। মহামানবের তীর্থসলিলে অবগাহন করে অবহেলিত জনতা আজ যেন নতুন প্রাণের সন্ধান পেয়ে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। ওরা আজ মুক্ত, ওরা আজ স্বাধীন। প্রতিটি জিনিস আজ নিজস্ব। ইতিমধ্যেই একটা হেলিকপ্টার জেনারেল দলবীর সিংকে নিয়ে সার্কিট হাউজে অবতরণ করলো। লম্বা, উন্নত চেহারার অধিকারী জেনারেল দলবীর সিং সার্কিট হাউজ পর্যন্ত হেঁটে আসলেন এবং আত্মসমর্পণের পর্বের খুঁটিনাটি বিষয় ঠিক না করা পর্যন্ত তিনি অপেক্ষা করলেন। সবুজ ঘাসের উপর লাল কার্পেট বিছানো। তার উপর একটি টেবিল ও একটা চেয়ার।

ঐতিহাসিক মুহূর্তটি সমাগত। সুশিক্ষিত আট হাজার পাকিস্তানী সৈন্য ও তাদের কমান্ডারদের আত্মসমর্পণ। যে দাম্ভিক পাকিস্তানী সৈন্যরা হিংস্র কুকুরের মত ঘেউ ঘেউ করতো, তারা আজ নিরীহ মেষশাবকের মত আত্মসমর্পণ করলো। জেনারেল দলবীর সিং চেয়ারে উপবিষ্ট। ব্রিগেডিয়ার হায়াত খান তার সাথের আটজন কর্নেল নিয়ে মার্চ করে তাঁর সামনে এসে থামলেন। পাকিস্তানী কমান্ডাররা যখন সার্কিট হাউস থেকে বেরিয়ে মার্চ করে আসছিল, তখন বাইরে আপেক্ষমাণ হাজার লোক আনন্দে ফেটে পড়লো। কেউ হাততালি দেয়। কেউবা শিস দেয়। কি গ্লানিকর পরাজয়! কত বড় শাস্তিমূলক অনুষ্ঠান। জেনারেল দলবীর সিং-এর পাশে দাঁড়িয়ে দেখলাম, পাকিস্তানী অপরাধীগুলো এটেনশান হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অনুষ্ঠান খুবই সাদাসিধা। জেনারেল দলবীর সিং আত্মসমর্পণের দলিল পাঠ করলেন এবং পা-বাহিনীর পরাজিত কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার হায়াত খান মাথা নুইয়ে কম্পিত হাতে দলিলে স্বাক্ষর দিলেন। সোজা হয়ে ব্রিগেডিয়ার হায়াত খান ও তাঁর সাথের অন্যান্য অফিসাররা কোমরের বেল্ট খুলে মিত্রবাহিনীর কাছে অর্পণ করলেন। এই সময় সমস্ত ফটোগ্রাফার ফটো নেয়ার জন্য উঠে-পড়ে লেগে গেল। দেখে মনে হলো যেন একটা বিয়ের পর্ব। ঊর্ধ্বতন সামরিক অফিসারদের পক্ষে এই রকম গ্লানিকর আত্মসমর্পণ আমি আর কখনও দেখিনি। অত্যন্ত অপমানজনক পরাজয়।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৮। ৯নং সেক্টরে সংঘটিত যুদ্ধের অন্যান্যের বিবরণ	বাংলা একাডেমী দলিলপত্র	১৯৭১

সাক্ষাৎকারঃ মেজর মেহেদী আলী ইমাম*
১৫-১০-১৯৭৪

নয় নম্বর সেক্টর গঠন করা হয় খুলনায় কিছু অংশ, ফরিদপুরের কিছু অংশ এবং পুরো বরিশাল ও পটুয়াখালী জেলা নিয়ে। এই সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার ছিলেন মেজর এম,এ,জলিল। স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথমার্ধে মে মাসের শেষ পর্যন্ত এই সমস্ত এলাকায় আমি, লেঃ নাসির, ক্যাপ্টেন হুদা, লেঃ জিয়া যুদ্ধ পরিচালনা করছিলাম। মে থেকে জুলাই পর্যন্ত বরিশাল ও পটুয়াখালী আর্মি খুলনার সুন্দরবন এলাকায় লেঃ জিয়া এবং সীমান্তবর্তী এলাকায় ক্যাপ্টেন হুদা ছিলেন। জুলাইয়ের পর থেকে নয় নম্বর সেক্টর পুনরায় সংগঠিত করা হয় এবং বরিশাল জেলার দায়িত্ব পাকিস্তান থেকে পালিয়ে আসা ক্যাপ্টেন শাহজাহানকে (ওমর), পটুয়াখালী আমাকে, সুন্দরবন ও খুলনার কিছু অংশ লেঃ জিয়াকে দেয়া হয়। পিরোজপুর ও বাগেরহাট এলাকা সুবেদার তাজুল ইসলামকে এবং ক্যাপ্টেন হুদাকে খুলনার সীমান্তবর্তী অঞ্চলের দায়িত্ব দেয়া হয়। সেক্টর হেডকোয়ার্টার টাকীতে ছিলেন মেজর জলিল। এর এডজুট্যান্ট ছিলেন ফ্লাইট সার্জেন্ট ফজলুল হক ও মফিজ। এদের সাথে ছিল ক্যাপ্টেন আরেফিন। নয় নম্বর সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধাদের প্রধান প্রশিক্ষণ শিবিরের প্রধান ছিলেন সুবেদার গোলাম আজম। নয় নম্বর সেক্টরের নৌবাহিনীর দায়িত্বে ছিলেন চীফ পেটি অফিসার এম, ইউ, আলম। সুন্দরবনে লেঃ জিয়ার অধীনে ছিলেন ফুল মিয়া ও মধু।

জুলাই মাসের মাঝামাঝি সময়ে আমি পটুয়াখালী জেলার ১০টা থানা এলাকার লোকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করি এবং প্রশিক্ষণ দিতে থাকি। কিন্তু আমাদের অস্ত্রের খুবই অভাব ছিল। তাই স্থির হল স্থানীয় এলাকার লোকদের যাদের বন্দুক আছে তা যোগাড় করতে হবে। বন্দুক বেশীর ভাগ মুসলিম লীগারদের হাতে ছিল, তাই বাধ্য হয়ে রাতে আক্রমণ চালিয়ে বন্দুক ছিনিয়ে নিতে থাকি। অস্ত্রশস্ত্র ছাড়াও আমাদের খাদ্যেরও অভাব ছিল। তাই বড় বড় মহহাজনদের বাধ্য করি খাদ্যশস্য দিতে। মুক্তিযুদ্ধের জন্য লোক ভর্তি করা হতে থাকে। প্রথমে আমাদের কার্যকলাপ তিনটি থানার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। থানা তিনটি ছিল মঠবাড়িয়া, বেতাগী ও বামনা।এসময় আমার বাহিনীর হাতে ১৫/২০টা রাইফেল ও ৩০/৪০টা বন্দুক ছিল। কিন্তু গোলাবারুদের খুবই অভাব ছিল। আমরা এ সময় মাঝে মাঝে থানা আক্রমণ করে গোলাবারুদ ও অস্ত্রশস্ত্র ছিনিয়ে নিতে থাকি।

ইতিমধ্যে এক শ্রেণীর দুষ্কৃতকারী মুক্তিযোদ্ধাদের নাম করে গ্রামে গ্রামে ডাকাতি শুরু করে দেয়। ফলে জনমনে মুক্তিযুদ্ধের প্রতি বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি হয়। জনগণ সে সময় মুক্তিযোদ্ধাদের নাম শুনলে ভয় পেয়ে যেত। আমি বুঝতে পারলাম জনগণকে দুষ্কৃতকারীদের হাত থেকে বাঁচাতে না পারলে আমাদের সংগ্রাম ও চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবে। জনসমর্থন ছাড়া মুক্তিযুদ্ধ চালানো সম্ভব নয়।

পটুয়াখালী জেলার ১০টি থানার প্রতি দুটি থানা মিলিয়ে একটি করে জোন গঠন করি। পটুয়াখালীর যোগাযোগ ব্যবস্থা খুব খারাপ। এক থানা থেকে আর এক থানার বেশ দূরত্ব ছিল।তাই এই সময় পটুয়াখালী জেলার মোট ৫টা জোন ছিল ও শুধু মঠবাড়িয়া থানার একটা জোন করা হয়। এক-একটা জোনে ১০/১৫টা বন্দুক ও ৪/৫টা রাইফেল দিয়ে বেশ কিছু মুক্তিযোদ্ধা পাঠিয়ে দিই। তাদের কাজ ছিল কোন এলাকায় ডাকাতি আরম্ভ হলে সঙ্গে সঙ্গে সেখানে ডাকাতদের দমন করতে হবে। মুক্তিযোদ্ধারা কোন এলাকায় ডাকাতি হবে শুনলে

* ১৯৭১ সালে ক্যাপ্টেন হিসাবে কর্মরত ছিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে অনেক নৌকা নিয়ে সেখানে চলে যেত। ডাকাতদের পিছু ধাওয়া করা হত। এভাবে জনগনের মনোবল ফিরিয়ে আনা হয়। মুক্তিযোদ্ধারা যে এলাকা দিয়ে যেত, সেখানে 'জয়বাংলা' বঙ্গবন্ধু 'জিন্দাবাদ' ইত্যাদি শ্লোগান দিত। এসব শ্লোগান এবং অনেক নৌকা দেখে জনগনের মনে ধারনা হত এখানে অনেক মুক্তিযোদ্ধা এসে গেছে। এভাবে জনগনের মনে মুক্তিযোদ্ধাদের সম্পর্কে শ্রদ্ধার ভাব জাগানো হয়। ইতিমধ্যে থানাতে থানাতে আওয়ামী লীগ ও অন্যান্য স্বাধীনতাকামী জনগণের নিয়ে থানা সংগ্রাম পরিষদ পুনরায় গঠন করা হয়েছে।

ইতিমধ্যে আমি খবর পাই মেজর জলিল প্রাণে বেঁচে আবার পশ্চিম বাংলার গেছেন এবং সেখানে অস্ত্রশস্ত্র যোগাড়ের চেষ্টায় আছেন। খুলনা, বরিশাল, ফরিদপুরের কিয়দংশ এবং পটুয়াখালীকে নিয়ে একটা সেক্টর গঠন করা হয়েছে। এই সেক্টর ৯ নম্বর সেক্টর হিসাবে পরিচিত। এবং কমান্ডার হয়েছেন মেজর জলিল। আমি মেজর জলিলের কাছে লোক পাঠাই কিছু অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ পাওয়ার জন্য। কেননা, এ সময়ে আমার হাতে সামান্য কিছু রাইফেল ও বন্দুক ছিল কিছু কিন্তু গোলাবারুদ একেবারেই ছিল না। আমাদের অনেক সময় ৫০০ টাকা দিয়ে অনেক লোকের কাছ থেকে রাইফেল ও বেশকিছু টাকা দিয়ে গোলাবারুদ যোগাড় করতে হয়। তিনি আমাকে খবর পাঠান এ ব্যাপারে চেষ্টা চালাচ্ছেন। তিনি আরও নির্দেশ দিয়ে পাঠান মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত ও প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য।

আমি কোন সময়ে ব্যক্তিগতভাবে পটুয়াখালী ও বরিশাল ছেড়ে যাওয়া পছন্দ করিনি। আমার বিশ্বাস ছিল, এলাকার জনগনের সাথে ঠিকমত কাজ করলে এখানে থেকেই আমি মুক্তিযুদ্ধ চালিয়ে যেতে পাবর। জনগনই হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত শক্তি। তাদেরকে নিয়ে সংগঠন গড়ে তুলতে পারলে আমরা শত্রুদের পর্যুদস্ত করতে সক্ষম হব। বার বার শত্রুকে আঘাত করে দুর্বল করে দিতে পারলেই আমাদের লক্ষ্যে আমরা সহজেই পৌঁছতে পারব। ৯ মাস মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে আমি এলাকার জনগণকে ছেড়ে ভারতে যাইনি। তাদের মধ্যে থেকেই শত্রুদের আঘাত করে পর্যুদস্ত করতে সক্ষম হয়েছিলাম।

মেজর জলিলের নির্দেশ পাবার পর আমি সমগ্র পটুয়াখালী জেলাকে ৫টি এলাকায় ভাগ করি এবং ৫ জনকে এর নেতৃত্ব দিই। বামনা-পাথরঘাটা থানার দায়িত্ব দিই আলমগীরের হাতে। বেতাগী ও বরগুনা থানার দায়িত্ব থাকে হাবিলদার জলফু মিয়ার কাছে। আমতলী খেপুপাড়ার দায়িত্ব দিই নায়েব সুবেদার হাতেমের হাতে। গলাচিপা ও পটুয়াখালী ভার দিই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র হুদার হাতে। মির্জাগঞ্জ ও বাউফলের দায়িত্ব দিই আলতাফ হায়দার ও হাবিলদার বাকেরের কাছে। এদের আমি নিজ নিজ এলাকায় গিয়ে সমগ্র এলাকায় রেকি করে ঘাঁটি গড়ে তোলার নির্দেশ দেই। কেননা নিজেদের ঘাঁটি না গড়ে তুলতে পারলে পাকসেনাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা যাবে না, এটা বুঝেছিলাম। আমার নির্দেশমত তারা নিজ নিজ এলাকায় চলে যায়। তাদের আমি বলি অস্ত্রশস্ত্র পেলেই তাদের পৌঁছে দিব। মঠবাড়িয়ার ও বামনা থানার কিছু অংশ নিয়ে বুকাবুনিয়াতে সদর দপ্তর স্থাপন করি, যেখানে আমার অধীনে সামরিক বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত মজিদ ছিল। এছাড়াও বুকাবুনিয়াতে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ট্রেনিং ক্যাম্প গঠন করি। স্বাধীনতা সংগ্রামের পুরো নয় মাসই এখানে পটুয়াখালী জেলার উৎসাহী যুবকদের প্রশিক্ষণ দেয়া হত এবং ক্যাম্পকে একটা স্থায়ী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে রূপান্তরিত করা হয়। যুদ্ধ চলাকালীন এই ক্যাম্প চারবার পাকসেনাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। বুকাবুনিয়া ক্যাম্পের প্রশিক্ষণের দায়িত্বভার দিই সুবেদার আনসার আলীর হাতে। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে এখানে ছেলেদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। পাকসেনারা বুকাবুনিয়া ক্যাম্প আক্রমণ করার সাহস পায়নি। এছাড়াও পরবর্তীকালে মঠবাড়িয়া থানার রাজার হাট, বেতাগী থানার করুনায় মুক্তিযোদ্ধাদের দুটি ট্রেনিং ক্যাম্প খোলা হয়। এই দুটি ক্যাম্প পরিচালনার দায়িত্ব ছিল যথাক্রমে নায়েক আজিজ ও হাবিলদার গোলাম মাওলার কাছে। পটুয়াখালী জেলার বিভিন্ন স্থানে আমার মুক্তিযোদ্ধারা প্রায় প্রতিদিনই গেরিলা পদ্ধতিতে আক্রমণ চালিয়ে রাজাকার, পুলিশ ও পাকসেনাদের কাছ থেকে কিছু অস্ত্র ছিনিয়ে নিতে শুরু করে।

ইতিমধ্যেই আমি খবর পাই লেঃ জিয়া সুন্দরবনে আছেন এবং মেজর জলিল তার কাছে আমার জন্য অস্ত্রশস্ত্র পাঠিয়েছেন। অস্ত্রশস্ত্র যোগাড়ের জন্য রুহুল আমিনকে নিয়ে আমি লেঃ জিয়ার কাছে সুন্দরবনে যাই। সুন্দরবনের বগীতে ফুল মিয়া একটা ঘাঁটি গেড়েছেন। সেখানে রুহুল আমিন নিয়ে আমি ফুল মিয়ার সাথে দেখা করি। জানতে পারি লেঃ জিয়া সুন্দরবনের অন্য ক্যাম্প মধুর ওখানে গেছেন।দুইদিন পর লেঃ জিয়া বগীতে ফিরে এলে তাঁকে আমার প্রয়োজনীয় কথা জানাই। লেঃ জিয়া আমাকে ৭টা এস-এল-আর, ২০টা ৩০৩ রাইফেল, ২টা এনারগা গ্রেনেড ও গোলাবারুদ দেন। এসব অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বুকাবুনিতে ফিরে আসি। ৬টি এলাকার দায়িত্ব যাদের দিয়েছিলাম, তারা তাদের নিজ নিজ এলাকায় রেকি করে বুকাবুনিয়ায় এসেছিল। তাদের প্রত্যেককে আমি ১টা করে এস-এল-আর ও ৬টা করে রাইফেল, গ্রেনেড ও গোলাবারুদ ভাগ করে দিই। তাদের আমি পাকবাহিনীর সাথে সরাসরি আক্রমণ যেতে নিষেধ করি। কেননা, সে সময়ে আমাদের শক্তি খুবই কম ছিল। পাকবাহিনীর পিছন দিক থেকে আক্রমণ করে ব্যস্ত রাখতে বলি। আমি তাদের আরও নির্দেশ দিই রাজাকার-আলবদরদের উপর হামলা করার জন্য। রাজাকার-আলবদররা আমাদের কার্যকলাপে বেশ বাধার সৃষ্টি করছিল এবং জনগনের উপর অত্যাচার করত। জনগনের সমর্থন পাবার জন্য আমাদের এসব কার্যকলাপের প্রয়োজন ছিল। আমি তাদের থানা আক্রমণ করার নির্দেশ দিই শত্রুদের ভীতসন্ত্রস্ত করার জন্য।

জুলাই মাসের মাঝামাঝি আমি প্রথম গুরুত্বপর্ণ অপারেশন চালাই। বুকাবুনিয়ার ভৌগোলিক গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। পটুয়াখালী ও বরিশাল সীমান্তের মধ্যে পটুয়াখালীর বামনা ও বরিশালের মঠবাড়িয়া ও কাঁঠালিয়া থানার সীমান্তের মধ্যে অবস্থিত। বিশখালী নদী হয়ে কাঠাঁলিয়া ও বামনা হয়ে বুকাবুনিয়া আসা যায়। বুকাবুনিয়া থেকে ১ মাইল দূরে রাজারহাট অবস্থিত। রাজারহাটে দালালদের প্রতিপত্তি ছিল খুব। আমি বুঝতে পারলাম। এদের উপর হামলা না করলে আমরা নিশ্চিন্তে কার্যকলাপ চালিয়ে যেতে পারব না। এইসব দালাল অনেক নিরীহ হিন্দুদের উপর অত্যাচার চালিয়ে হত্যা করেছিল। তাই একদিন আমরা অকস্মাৎ রাতে তাদের ঘাঁটিতে হামলা চালাই। আমাদের আক্রমণে তাদের ২ জন মারা যায় এবং ১৫ জনকে বন্দী করা হয়। এর ২/৩ দিন পর মঠবাড়িয়া থানা থেকে পুলিশ আসে। তারা কিছুদিন থেকে রাজারহাট ছেড়ে পালিয়ে যায়। এ আক্রমণের পর রাজারহাট আমাদের নিয়ন্ত্রণে আসে। দালালদের কার্যকলাপ বন্ধ হয়ে যায়। আমাদের বুকাবুনিয়া ক্যাম্পও নিরাপদ হয়।

মুক্তিযোদ্ধাদের এই প্রতিরোধের ফলে বুকাবুনিয়াতে মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবল বেড়ে যায় এবং জনগণের মনোবলও বেড়ে যায়। আগে যে একটা গুজব ছিল যে বুকাবুনিয়াতে প্রায় ৪০০/৫০০ সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা আছে সেটা এখন সত্য বলে প্রমানিত হয়। আশপাশের থানার পুলিশরা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। বুকাবুনিয়ার মুক্তিবাহিনী সদর দফতরের গুরুত্ব অনেক বেড়ে যায়।

বামনা থানা থেকে পুলিশ পাকিস্তান সেনাবাহিনীর লোকজন ও রাজাকাররা এক সাথে বামনা বাজারে যেত। তারা নিরীহ জনগনের উপর অত্যাচার চালাত। দোকানে মিষ্টি ও চা খেয়ে পয়সা দিত না। এ খবর পাবার পর আমি তাদের শাস্তি দিবার জন্য বামনা থানা ও বাজারের মধ্যে আগষ্টের প্রথম দিকের কোন একদিনে এ্যামবুশ পড়ে যায়। আমাদের আক্রমণে ওদের ৭/৮ জন নিহত ও কয়েকজন আহত হয়। ৫টা রাইফেল আমাদের হস্তগত হয়। এতে বামনা বাজারের লোকদের মনোবল অনেক বেড়ে যায়।

কাঁঠালিয়া থেকে ৩ মাইল দূর আমুয়াবাজার একটা গুরুত্বপূর্ণ বন্দর। হাটের দিন পাকসেনারা কয়েকজন রাজাকারকে নিয়ে বাজরের লোকদের মাইকে বলে যে মুক্তিযোদ্ধাদের যেন সহযোগিতা করা না হয়। তাদেরকে আক্রমণ করার জন্য কাঁঠালিয়া-আমুয়াবাজারের মধ্যে এক সেতুর নিকটে এ্যামবুশ পাতা হয়। এ ঘটনাটি ঘটে জুলাই মাসের শেষে। সেদিন ৫ জন পাকসেনা ১০জন রাজাকারকে সঙ্গে নিয়ে সেতুর উপর উঠলে আমাদের এ্যামবুশ পড়ে যায়। এর ফলে ২ জন পাকসেনাসহ ৪জন নিহত হয়। আমরা ৪টা রাইফেল দখল করি। এই

আক্রমণের পর কাঁঠালিয়া থানার রাজাকার এবং শান্তি কমিটির লোকদের মধ্যে ভীতির সঞ্চয় হয়। শান্তি কমিটির লোকেরা কাঁঠালিয়া ছেড়ে পালিয়ে যায়। ৪০ জন রাজাকার কাঁঠালিয়া ছেড়ে যায়। ৫ জন রাজাকার আমাদের সঙ্গে যোগ দেয়।

পটুয়াখালী থেকে পাকসেনারা পায়রা নদী দিয়ে বামনা-বরগুনা না গিয়ে অনেক ঘুর-পথে মির্জাগঞ্জের পাশ দিয়ে খালের মধ্যে দিয়ে লঞ্চে যেত। আগষ্টের প্রথম আমরা তাদের গতিবিধিতে বাধা দেবার জন্য মির্জাগঞ্জের নিকটে খালের দু'ধারে এ্যামবুশ পাতি। ১টি লঞ্চ করে যখন পাকসেনারা যাচ্ছিল তখন মির্জাগঞ্জের নিকটে আমাদের এ্যামবুশ পড়ে যায়। লঞ্চটি আমাদের হামলায় খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সঠিক হতাহতের সংখ্যা জানা না গেলেও পরে লোকমুখে জানা যায় যে, পাকসেনাদের ১০ জন নিহত হয়েছে।

বিশখালী নদীতে পাকসেনারা গানবোটে করে পাহারা দিত। রাতে তারা পাহারা দিত বলে আমাদের গতিবিধির জন্য অসুবিধার সৃষ্টি হয়। দিনের বেলার তারা থানার থানার নামত এবং এলাকার অবস্থা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করত। নদী খুব বড় থাকায় তারা আমাদের রাইফেলের আওতায় বাইরে থাকতো, গুলিতে কিছু হত না। সেজন্য আগষ্টের শেষে পরিকল্পনা নিই দিনের বেলা যখন গানবোট থানার নিকট যাবে তখন আমরা নিকটে থেকে হামলা চালাব। সেইমত আমরা আগে থেকেই বামনা থানার নিকটে অবস্থান নিয়ে তৈরী থাকি। বিকেল ৫টার সময় যখন গানবোট তীরে আসে তখন আমরা শত্রুর গানবোটের উপর আচমকা গুলি চালাতে থাকি। এই গুলির জন্য তারা প্রস্তুত ছিল না। গানবোটের সারেং ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। ফলে গানবোটটি নদীর পাড়ে ধাক্কা খেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তারা বামনায় না থেমে কাঁঠালিয়ার দিকে যায়। সেখানেও তারা এই ঘটনার সম্মুখীন হয়। এরপর শত্রুরা বন্দরে বা থানার নামা বন্ধ করে দেয়, কিন্তু দিনেও রাতে নদীর মধ্যে দিয়ে চলাচল করতে থাকি।

আগষ্ট মাসের শেষ সপ্তাহে সমগ্র পটুয়াখালী এলাকায় আমরা আমাদের তৎপরতা বাড়িয়ে তুলি এবং পাকসেনাদের গতিবিধি অনেক কমে যায়। আগষ্টের শেষে মেজর জলিল ৫০ জন ট্রেইন্ড যুববকে আমার এলাকায় পাঠিয়ে দেন। তারা তাদের সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ নিয়ে আসে। তারা ২টা এল-এম-জিও নিয়ে আসে। ইতিমধ্যে আমার অস্ত্রের সংখ্যা ২০০-তে দাঁড়ায় ও গোলাবারুদ অভাব কিছুটা পূরণ হয়। এই সময় আমি পটুয়াখালী জেলার ডুই শহরে পটুয়াখালী ও বরগুনাতে মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রবেশ করাই এবং তারা শহরে তাদের কার্যকলাপ শুরু করে। বরগুনা শহরের আশপাশের খাল দিয়ে বিশেষভাবে তৈরী সামরিক উদ্দেশ্যে ব্যবহারপযোগী গানবোট চলাচল করত। আমরা তার উপর হামলা চালাতাম এবং প্রয়োজন হলে বরগুনায় ঢুকে আক্রমণ চালাতাম। পাকসেনাদের আমরা সমানাসামনি আক্রমণ না চালিয়ে গেরিলা কায়দায় আক্রমণ চালাতাম।

আগষ্টের শেষের দিকে পাকসেনারা আমাদের মহিষপুর ক্যাম্পে আকস্মিকভাবে হামলা চালায়। মহিষপুর ছিল তালতলী বন্দরের নিকটে অবস্থিত। এখান থেকে মুক্তিযোদ্ধারা আমতলী ও কুয়াকাটা থানায় হামলা চালাত। এ মহিষপুর থেকে বঙ্গোপসাগরের দূরত্ব ছিল খুবই কম। মহিষপুরের পিছনে জঙ্গলে ভর্তি ছিল। পাকসেনারা দালালদের কাছ থেকে আমাদের মহিষপুর অবস্থানের খবর পেয়ে পটুয়াখালী থেকে লঞ্চে ও গানবোটে করে মহিষপুরে আসে। পাকসেনারা ১টি দল মহিষপুর থেকে ৬/৭ মাইল দূরে নেমে হেঁটে আমাদের অবস্থানের দিকে এগিয়ে আসতে থাকে। অন্যান্য সৈন্যরা গানবোটে করে নদী হয়ে মহিষপুরের সামনে এসে আমাদের উপর আক্রমণ চালায়। সকাল টার সময় পাকসেনারা তিনদিক থেকে আক্রমণ চালায়। আমরা এ আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। নদীর ধার থেকে আক্রমণ হতে পারে এ আশংকা আমাদের ছিল কিন্তু স্থলপথে আক্রমণ হবে এ আমাদের কল্পনাতীত ছিল। তাদের আমাদের আক্রমণে হতবুদ্ধি হয়ে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে শত্রুদের মোকাবিলা করি। বরিশাল ও পটুয়াখালী এলাকা সম্বন্ধে পাকসেনাদের জ্ঞান ছিল খুবই কম এবং এ জন্যে তারা এখানে খুব ভীতি ছিল। হামলা মোকাবিলার করার সঙ্গে সঙ্গে পাশ্ববর্তী গ্রাম থেকে আমাদের সমর্থনে জনগণ চিৎকার শুরু করে দেয়। এতে শত্রুরা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে মহিষপুর এলাকা পালাতে শুরু করে। এ যুদ্ধে ১১ জন পাকসেনা ও ১১ জন রাজাকার নিহত ও অনেক আহত হয়। তারা অস্ত্রশস্ত্র ও প্রচুর গোলাবারুদ ফেলে পালিয়ে যায়।

আমাদের দুজন শহীদ হন। যে দুজন শহীদ হয়েছিলেন তারা কৃষক। আকস্মিক আক্রমণে তারা হতবুদ্ধি হয়ে যান। মহিষপুর থেকে অবস্থান তুলে নিয়ে আমরা অন্যত্র চলে যাই। পাকসেনারা পরে এসে মহিষপুরের পার্শ্ববর্তী গ্রামটি জ্বালিয়ে দেয়।

আগষ্টের শেষে ১৬ বছরের এক মুক্তিযোদ্ধা পটুয়াখালী সার্কিট হাউসে অবস্থানরত পাকসেনাদের লক্ষ্য করে ২টি গ্রেনেড নিক্ষেপ করে। এতে তাদের কেই মারা না গেলেও বেশ কয়েকজন আহত হয়।

সেপ্টম্বরের প্রথম সপ্তাহে পাকসেনারা পটুয়াখালীর নিকটবর্তী গ্রামে প্রবেশ করে ৫/৭ জন যুবক-বৃদ্ধকে মুক্তিযোদ্ধা সন্দেহে গ্রেপ্তার করে এবং তাদের মেরে ফেলবার জন্য নদীর পাড়ে নিয়ে যায়। মুক্তিযোদ্ধারা এ খবর পেয়ে দ্রুত সে অবস্থানে গিয়ে পাকসেনাদের উপর গুলি চালায়। পাকসেনারা এতে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে বন্দীদের ছেড়ে পালিয়ে যায়। যাদের বন্দী করা হয়েছিল তাদের মধ্যে একজন নিহত হয়। এর ফলে জনগণের মনে মুক্তিযোদ্ধাদের উপর আস্থা বেড়ে যায়।

সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবল বেড়ে যায় এবং তাদের গ্রুপগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায় কারা কত ভাল অপারেশন করছে তাই নিয়ে। দালালরা গ্রাম ছেড়ে শহরে আশ্রয় নেয়। পাকসেনাদের গতিবিধি অনেক কমে যায়। পাকসেনাদের গ্রামে দেখলেই মুক্তিযোদ্ধারা তাদের উপর হামলা চালাত। পটুয়াখালী, বরগুনা ও ৮টি থানা সদর এলাকা ছাড়া সমগ্র পটুয়াখালী এলাকা ছাড়া সমগ্র পটুয়াখালী এলাকা আমাদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে।

বস্ততঃপক্ষে এই সময় পটুয়াখালী জেলার সমস্ত থানা দপ্তর ছাড়া বাকি সমগ্র এলাকা মুক্তিযোদ্ধারা নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। সারা সেপ্টেম্বর মাসই দুর্জয় মুক্তিফৌজ ক্রমাগত শত্রুর উপর ছোটখাটো হামলা চালায়। বস্ততঃপক্ষে শহর ছাড়া সমস্ত এলাকায় শত্রুর গতিবিধি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেয়। এই সময় সমস্ত মুক্তিফৌজের মধ্যে একটা চর্মরোগ দেখা দেয়ায় মুক্তিযোদ্ধারা অবরুদ্ধ শত্রুর ঘাঁটির উপর আক্রমণ চালাতে পারেনি। তথাপি এই মাসে মুক্তিফৌজ প্রায় শ'খানেক অস্ত্র শত্রুর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছিল।

সেপ্টেম্বরের শেষার্ধ থেকে মুক্তিযোদ্ধারা তাদের আক্রমণ আবার জোরদার করতে শুরু করে। মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবল ভেঙ্গে গেছে, অস্ত্র নেই-পাকসেনারা এটা মনে করে আবার গ্রামের দিকে ঢুকতে ব্যর্থ প্রয়াস চালায়। এই সময় পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ জনগনের মধ্যে বিভ্রান্তি এবং ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি জন্য প্রচারণা চালাতে থাকে যে, 'তথাকথিত মুক্তিযোদ্ধারা' প্রকৃতপক্ষে ভারতের সৈন্য এবং হিন্দু। এরা মুসলমান ধর্ম, কৃষ্টি সমাজ ব্যবস্থা ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। এই প্রচারণায় জনগণ মোটেই বিভ্রান্ত হয়নি। কারন, মুক্তিযোদ্ধারা তাদেরই পরিচিত লোক।

মুক্তিযোদ্ধারা সর্বদা ভাবতো জয় তাদের সুনিশ্চিত। কারন পাকিস্তান সেনাবাহিনী কোণঠাসা হয়ে গেছে। তাই এই সময় মুক্তিযোদ্ধারা আগের মত অতটা সতর্ক থাকত না। এর পরিণতিতে অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি বরগুনার দক্ষিণে কুয়াকাটা কাছাকাছি একদল মুক্তিযোদ্ধা পাকিস্তানী সৈন্যদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। মুক্তিযোদ্ধারা বরগুনার দিকে আসছিল। চারটা নৌকায় করে অতর্কিতে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর তাদের উপর প্রচন্ড গোলাবর্ষণ শুরু করে। আক্রান্ত হয়ে বাধ্য হয়ে মুক্তিযোদ্ধারা জঙ্গলের ভেতর ঢুকে পড়ে। পাকবাহিনীর প্রায় আড়াই দিন ধরে গুলি ছুঁড়তে থাকে। সেই গোলাগুলির সময় আমাদের কিছু অস্ত্রশস্ত্র নদীতে ডুবে যায়। সেখানে থাকাকালীন মুক্তিযোদ্ধাদের খাবার-দাবারের ভীষণ অসুবিধা হয়।

সেখান থেকে আমরা বরগুনা শহরের দিকে অগ্রসর হতে থাকি। বরগুনা থেকে আড়াই মাইল দূরে পাকিস্তানী চেকপোস্টের উপর মুক্তিযোদ্ধারা হামলা চালায়। চেকপোস্টের ১২ জন পাকিস্তানী সৈন্য ছিল। স্থানীয় জনগণ ও মুক্তিযোদ্ধারা ঐ চেকপোস্টের ঘিড়ে ফেলে। রাত বারটার দিকে তাদের উপর আচমকা হামলা চালানো হয়। মাত্র দেড় ঘণ্টার যুদ্ধে ঐ চেকপোস্ট মুক্তিযোদ্ধারা দখল করে ফেলে। এখানে মুক্তিযোদ্ধারা ২৮ জনকে

বন্দী করতে সক্ষম হয়-যার মধ্যে ৬ জন পাকসেনা ছিল, বাকি ছিল রাজাকার। এখানে একটা এল-এম-জি, ৭টা চাইনিজ ও ৩০৩ রাইফেল, প্রচুর গুলি ও হ্যান্ড গ্রেনেড আমরা দখল করতে সক্ষম হই। বরগুনার শহরের নিকটে এত বড় একটা ক্যাম্প পতনের পর পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মধ্যে ত্রাহি ভাব সৃষ্টি হয়। পাকসেনারা খুব ভীতসন্ত্রস্ত হেয় পড়ে। উদাহরণস্বরূপ, পটুয়াখালী থেকে একজন সুবেদার পালিয়ে ঢাকা যেতে চেষ্টা করে। কিন্তু পথে সে ধরা পড়ে।

অক্টোবরের শেষ সপ্তাহে মেজর জলিল আমাকে ভারত যেতে বললেন। মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবল বৃদ্ধির জন্য তিনি বেশ কিছুসংখ্যক মুক্তিযোদ্ধা এবং অস্ত্রশস্ত্র পাঠিয়ে দেন। ব্যক্তিগতভাবে আমি ভারতে যাবার পক্ষপাতি ছিলাম না। আমি মনে করতাম যে আমাদের সত্যিকার আক্রমণাত্মক অভিযান শুরু হওয়ার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত বাংলাদেশের অভ্যন্তরে গেরিলা কায়দায় তৎপরতা চালিয়ে পাকসেনাবাহিনীকে ভীতসন্ত্রস্ত রাখাটাই বেশী প্রয়োজন। যাই হোক, হেডকোয়ার্টারের নির্দেশে নভেম্বরের প্রথম দিকে আমি ভারত যেতে মনস্থির করে ফেললাম। যদিও আমার মুক্তিযোদ্ধারা মানসিক দিক হাতাশ হয়ে পড়ছিল। তথাপি সমস্ত বেইস কমান্ডাদেরকে ডেকে প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলী লিখিতভাবে সবাইকে দিয়ে দিই এবং নভেম্বর মাসের প্রথম দিকে আমি দুবার আবহাওয়া দরুন যাওয়া স্থগিত রাখি। আমার ট্রেনিং ক্যাম্পে প্রায় ৭০০ মুক্তিযোদ্ধা ছিল। আমি ৩৫০ জন মুক্তিযোদ্ধাকে সামান্য অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে প্রায় দুহাজার নৌকাযোগে ভারতে পাঠিয়ে দিই। ৫/৭ দিন পর বাকি ৫০ জন মুক্তিযোদ্ধা এবং প্রায় ৮০০ শরণার্থী নিয়ে আমি ঈদুল ফিতরের দিনে ভারতে রওনা হই। নভেম্বরের শেষ নাগাদ। এই দুর্গম পথের মাঝে মাঝে ছিল পাকসেনাবাহিনীর গানবোটের পাহারা। এই অবস্থার মধ্য দিয়ে অর্ধাহারে-অনাহারে চলতে চলতে নভেম্বরের শেষ সপ্তাহ ভারতের হাসনাবাদ গিয়ে পৌঁছি।

স্বাক্ষরঃ মেহেদী আলী ইমাম

সাক্ষাৎকারঃ লেঃ শামসুল আরেফিন*
২৮-৩-১৯৭৩

মুজিবনগরে বাংলাদেশ সেনানিবাসে হাজির হই ১১ ই মে। সেখানে থেকে ফিল্ড কমিশন নিয়ে ৯ নং সেক্টরে পাঠিয়ে দেয়। খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালী ৯ নম্বরের অধীনে ছিল। প্রথম হিঙ্গলগঞ্জ অপারেশন ক্যাম্পে আসি। এখানে দেড় মাস থাকি।

১৩ ই মে থেকে ৬ ই জুলাই পর্যন্ত আমি ক্যাপ্টেন হুদার নেতৃত্বে ৪টি অপারেশন যান-খাঞ্জিয়া বি-ও-পি, বসন্তপুর বি-ও-পি, কালিগঞ্জ থানা হেডকোয়ার্টার এবং উকশা বি-ও-পি (খুলনা)।

৭ই জুলাই খুলনা জেলার প্রধান হিসাবে আসি এবং খুলনা জেলার আশাশুনি থানার বড়দল এলাকায় (বাংলাদেশ) আমার ঘাঁটি স্থাপন করি। আমার সঙ্গে ১০০ জন এফ-এফ এবং ১৫ জন নিয়মিত বাহিনীর সদস্য ছিল। ১১ই জুলাই পাইকগাছা থানার কপিলমুনির রাজাকার ঘাঁটি আক্রমণ করি। সারারাত যুদ্ধ করে আমরা ফিরে আসি। বড়দলে একটি ট্রেনিং সেন্টার খুলি এবং লোক ভর্তি করতে থাকি।

জুলাই মাসের শেষের দিকে আমার উপর নির্দেশ আসে মঙ্গলা পোর্ট আক্রমণ করবার জন্যে। ইতিমধ্যে ১০ জন ন্যাভাল কমান্ডোসহ একজন লিডিং সীম্যান (ফ্রান্স থেকে পালিয়ে এসেছিল), এম,বি, আলকে অস্ত্রসহ আমার কাছে পাঠানো হয়। ন্যাভাল ১১ জন সহ আমরা ২১ জন মিলে মঙ্গলা পোর্টে রওনা হই। আমি কমান্ডিং অফিসার ছিলাম। সুন্দরবনের ভিতর লাওতাড়াতে ঘাঁটিতে আসি, যেখানে পূবেই আমার কিছু বাহিনী ছিল। ৯ই

---

* পাকিস্তানী মিলিটারী একাডেমীতে জেন্টেলম্যান ক্যাডেটরূপে প্রশিক্ষণ গ্রহনকালে সেখানে থেকে পালিয়ে এসে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন।

আগস্ট রাত ১২/১ টার সাঁতা দিয়ে বাহিনী চলে আসে মঙ্গলা পোর্টে দিকে। সাঁতার গিয়ে চুম্বক মাইন লাগিয়ে চলে আসে তিনটি জাহাজে। আধঘণ্টা পরে মাইন বিস্ফোরিত হয়, আমরা সঙ্গে সঙ্গে ফায়ার ওপেন করি। আমরা সবাই নিরাপদে আসি। জাহাজ তিনটি ডুবে যায়। ১১ ই আগষ্ট তারা পুনরায় যায়। সেদিন দুটি জাহাজ আমরা ধ্বংস করি। ঐ দিন গফুর নামে একজন ন্যাভালকে হারাই। তবে দু'দিন পরে সে আমাদের ক্যাম্পে ফিরে আসে।

১২ ই আগষ্ট ভোরে পাক নেভী দু'দিক থেকে আমাদের ঘাঁটির উপর আক্রমণ চালায়। আমরা ওখান থেকে পিছু হটতে বাধ্য হই। আমরা মূল ঘাঁটিতে ফিরে আসি। মূল ঘাঁটিতে এসে প্রত্যেক থানাতে একটি করে ঘাঁটি তৈরীর জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ি। রাজনৈতিক কর্মীসহ মুক্তিবাহিনী গঠন করে খুলনার দিকে অগ্রসর হতে থাকি। আমাকে সহায়তা করতেন এম-সি-এ গফুর।

আগষ্ট মাসের শেষের দিকে খুলনা জেলার আশাশুনি থানাতে রাজাকার ও পাকিস্তানী ডেককোয়ার্টার আক্রমণ করি। একদিন অবরোধ করার পর দ্বিতীয় দিনে সাতক্ষীরা থেকে পাকবাহিনীর এবং খুলনা থেকে নেভী এসে আমাদের উপর আক্রমণ চালায়। ১২/১৪ ঘণ্টা ধরে যুদ্ধ হয় ওদের সঙ্গে। পাকবাহিনী ২ জনকে ধরে ফেলে এবং মনোরঞ্জন হালদার নামে একজন মুক্তিসেনা মারা যায়। আমরা ৩ জন মিলিশিয়াসহ ১৬ জন রাজাকারকে হত্যা করে ২৬ টি অস্ত্র উদ্ধার করি। পাকসেনারা পিছু হটে চলে যায়।

সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম দিকে পাইকগাছা থানার বাকাঘাঁটি পাকবাহিনী অতর্কিতে আক্রমণ করে। ওখানে আমাদের দলের দুজনকে ধরে নিয়ে যায়। একজন মারা যায় এবং ১ জন আহত হয়। আমরা বাকাঘাঁটি ছেড়ে অন্যত্র চলে যাই। ৭ দিন পর বাকাঘাঁটি পুনরায় দখল করি। এসময়ে প্রধান উপদেষ্টা এবং সহকারী ছিলেন জনাব বার্বর আলী (বর্তমানে জাতীয় পরিষদ সদস্য)।

এরপর ক্রমশ ঘাঁটির সংখ্যা বাড়াতে থাকি। হেডকোয়ার্টার বড়দল থেকে বদলী করে পাইকগাছা থানার হাতিয়ারডাঙ্গাতে নিয়ে আসি এবং ৪টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খুলি। মুক্তিবাহিনী এবং নেভী দুটোরই ট্রেনিং হতো। সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিকে পাইকগাছা গরুইখালী গ্রামে থেকে অস্ত্রসহ ২২ জন রাজাকারকে ধরে নিয়ে আসে ঐ মাসেই পাইকগাছা থানা আক্রমণ করি এবং থানা স্টাফসহ ৬/৭ রাজাকারকে ধরে নিয়ে আসি।

অক্টোবর মাসের প্রথমে দুটো দল দু'দিকে পাঠাই-একটি দাকোপ থানায়, অন্যটি তালা থানাতে। দাকোপ থানার খাটালি গ্রাম থেকে ১৭ জন রাজাকারকে অস্ত্রসহ ধরে নিয়ে আমার বাহিনী তালা থানার দল ১৮ মাইল রাস্তার মোড়ে পাকবাহিনীর মুখোমুখি হয়। যশোর-পাটকেলঘাটা রাস্তা নষ্ট করে দেয়। যাবতীয় যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করে দেয়। অক্টোবরের মাঝামাঝি সময়ে নির্দেশ আসে সুন্দরবনের ভিতর নিউজপ্রিন্ট মিল আক্রমণ করার জন্যে। ঐ ঘাঁটিতে বোট এবং শিপ ছিল 'লালশেরা'। আমরা ঐগুলি ডুবিয়ে দিই মাইন দিয়ে। এখানে আমার ভাই আয়ুবআলী গাজী প্রধান সহকারী ছিল। ভাই পরবর্তীকালে মারা যায়।

অক্টোবরের শেষের দিকে আবার মঙ্গলা পাট আক্রমণ করি। এবার তিনটি শিপ ডুবিয়ে দিই। এসময় বাজুয়াতে আমাদের সাথে ভীষণ যুদ্ধ হয়। আমাদের কোন ক্ষতি হয়নি। পাক পক্ষ বাজুয়া ঘাঁটি ছেড়ে চলে যায়। বাজুয়াতে আমাদের ঘাঁটি স্থাপন করে খুলনাতে অস্ত্রশস্ত্র পাঠিয়ে দিই আমাদের লোকের কাছে।

১৯ শে নভেম্বর পাকবাহিনীর ক্যাম্প কালিগঞ্জ থানা আমরা আক্রমণ করি। দিনটি ছিল ঈদের দিন। পাকবাহিনী বহু অস্ত্রশস্ত্র ফেলে পালিয়ে যায়। এ যুদ্ধে কমান্ডিং অফিসার ছিলেন ক্যাপ্টেন হুদা।

২৫শে নভেম্বর কপিলমুনি পাইকগাছা থানা আমরা আক্রমণ করি। এখানে আমার প্রধান সহকারী ছিলেন মিঃ রহমতুল্লাহ (নেভী), কামরুজ্জামান (টুকু) এবং বাবর আলী। তিনদিন যুদ্ধের পর ৩৫০টি রাইফেল উদ্ধারসহ ১০৭ জনকে গ্রেফতার করি। আমার ২ জন শহীদ হন ল্যান্সনায়েক গাজী ও আনোয়ার। ২ জন আহত হন। এই

সময় আমার আর একটি দল আশাসুনি থানা হেডকোয়ার্টার আক্রমণ করে। থানা স্টাফসহ দেড়শ' রাইফেল, ২ জন পাঞ্জাবী পুলিশ, ৫৭ জন রাজাকার ধরে নিয়ে আসে। আশাসুনি থানার ব্যাঙদোহাতে আমার একটি দল আক্রমণ চালিয়ে ৩ জন পাঞ্জাবী পুলিশ ২ জন মিলিশিয়া এবং দেড়শ' রাইফেলসহ ১০০ রাজাকার গ্রেফতার করা হয়।

২০ শে নভেম্বর আমার হেডকোয়ার্টার বৈঠাঘাটাতে স্থানারিত করি। এসময় চালনা বাজারের সব রাজাকার আত্মসমর্পণ করে। ২৮শে ডুমুরিয়া থানার বার আড়িয়া বাজার আক্রমণ করি। আজিজ সহ আমাদের ৩ জন মারা যায়। বিপুল অস্ত্রশস্ত্রসহ ১৬ জন রাজাকার আমরা ধরে নিয়ে আসি।

৮ই ডিসেম্বর মেজর জয়নাল আবেদীন ইঞ্জিনিয়ার আমার সাথে যোগ দেন। ১০ই ডিসেম্বর খুলনা বেতার ভবন আক্রমণ করি। সারারাত যুদ্ধ করি, কিন্তু জোয়ারের পানি আসার জন্যে আমরা ফিরে আসি। আমাদের ২ জন আহত হয়। এ সময় অয়ারলেস মারফত কর্নেল মঞ্জুর সাহেবের সাথে আমার যোগাযোগ হয় এবং তিনি খুলনা আক্রমণের পরিকল্পনা দেন। ১৫ই ডিসেম্বর ভোরবেলা খুলনা আক্রমণ করি। দু'ভাবে আক্রমণ করি-একটি জলপথে, অপরটি স্থলপথে। নদীপথে কমান্ডার ছিলাম আমি এবং স্থলপথে ছিলেন মেজর জয়নাল আবেদীন, বাবর আলী নেভী রহমতুল্লাহ। সকাল ৬টার দিকে খুলনা জেলা জয় করি এবং বাংলাদেশের পতাকা তুলে দিই ১৬ ই ডিসেম্বর। আমার বাহিনীর কিছু সেনা (৫ জন) মারা যায়।

বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে পাঞ্জাবী শোষণ থেকে মুক্তি লাভের জন্যে অস্ত্র ধরি।

স্বাক্ষরঃ এম, আরেফিন
২৮-৩-৭৩

সাক্ষাৎকারঃ মোঃ নুরুল হুদা
১৮-৯-১৯৭৩

২৬শে এপ্রিল পাকবাহিনী পটুয়াখালী দখল করে ও নানা স্থানে তারা ব্যাপক আক্রমণ ও অত্যাচার আরম্ভ করে। নগন্য অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ওখানে অবস্থান করা আর সম্ভব হলো না। তাই অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ ও প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের জন্য ভারতচলে গেলাম। পটুয়াখালী থেকে সুন্দরবন হয়ে ভারত যেতে আমাকে ও অপর দুজন সঙ্গী আতাহার ও ইউসুফকে অতিক্রম করতে হয়েছিল এক বিপদসঙ্কুল সুদীর্ঘ পথ। ভারত গিয়ে আমরা প্রথমে দেখা করলাম মেজর জলিল ও ক্যাপ্টেন হুদার সঙ্গে। তাঁরা তখন হাসনাবাদে। মে মাসের শেষের দিকে আমাদের ভর্তি করে দেয়া হলো ৯ নং সেক্টরের তকীপুর ক্যাম্পে। তখন তকীপুর ক্যাম্প ছিল ৯ নং সেক্টরের একমাত্র ক্যাম্প। ঐ অভ্যর্থনা ক্যাম্পে আমাদের নিয়ে মোট সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ৭০ জনে। কিছুদিন ওখানে থাকার পরে জুনের শেষের দিকে আমাদের পাঠানো হলো বিহারের চাকুলিয়া প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে। ওখানে আমাদের গেরিলা প্রশিক্ষণ দেয়া হলো। ৬ সপ্তাহের গেরিলা প্রশিক্ষণ শেষ করে ফিরে এলাম ৯ নং সেক্টরে।

আগষ্ট মাসের এক রাত্রে আমরা বরিশাল সাব- সেক্টরের জন্য নিযুক্ত কমান্ডার ক্যাপ্টেন ওমরের (শাজাহান) নেতৃত্বে বাগদা বর্ডার দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করলাম। আমরা বরিশালের বানারিপাড়া থানার বাড়াকুঠা স্কুলে শিবির স্থাপন করলাম। আসার পথে যশোরের একস্থানে আমরা পাকবাহিনীর বাধার সম্মুখীন হই। সংঘর্ষে লিপ্ত না হয়ে আমরা অন্য পথে অগ্রসর হই। আমরা যখন ফরিদপুরের হুলারহাটের কাছাকাছি, তখন আমরা একটি বিমান ও একটি গানবোট দ্বারা অনুসৃত হই। কিন্তু ক্যাপ্টেন ওমরের বিচক্ষণতার জন্য আমরা ওদের চোখে ধুলো দিয়ে বরিশালের দিকে অগ্রসর হতে সক্ষম হই। যেহেতু আমাদের সমস্ত তৎপরতা প্রধানতঃ বরিশাল জেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, সে জন্য আমরা পথিমধ্যের সমস্ত সংঘর্ষ এড়িয়ে যাই।

আমরা জেলায় প্রবেশ করার পরের দিনই পাতারহাটের অনতিদূরে ক্যাপ্টেন ওমরের নেতৃত্বে পাকবাহিনীর একটি গানবোট ও দুটো লঞ্চ আক্রমণ করি এবং প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে লিপ্ত হই। এই সংঘর্ষে বেশ কয়েকজন পাকসৈন হতাহত হয়। ক্রমে ক্রমে আমাদের তৎপরতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। বরিশালের মুক্তিবাহিনীর ছোট ছোট দলগুলো একে একে ক্যাপ্টেন ওমরের একক নেতৃত্বে আমাদের সাথে যোগ দিল। আমাদের শক্তি আরও বেড়ে গেল। একে একে জয়শ্রী , উজিরপুর, বানারিপাড়া প্রভৃতি স্থানে সাফল্যজনক অপারেশর চালানো হয়।

প্রথম দু'টি স্থানে আমি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলাম না। গেরিলা কমান্ডো জামালের নেতৃত্বে আমি, নুরু, ওদুদ, হাকিম, ইসমাইল, সাখাওয়াত, আলতাফসহ ৮০ জনের একটি দল সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি বানারিপাড়ায় অপারেশন চালাই। ৪ ঘণ্টা যুদ্ধের পরে আমি, সাখাওয়াত, আলতাফ উইথড্রয়াল সংকেত পাওয়ার পর থানার ঘাট থেকে থানার একটি লঞ্চ নিয়ে শিবিরে চলে আসি। এখানে বিপক্ষ দলের কয়েকজন হতাহত হয়। ওখানে কিছুদিন থাকার পর ক্যাপ্টেন ওমরের কতগুলি যুদ্ধ সম্বন্ধীয় তথ্য ও গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্ট নিয়ে সেক্টর হেডকোয়ার্টারে চলে আসি। এখানে একজন লোকের কথা উল্লেখ না করলেই নয়। তার সাহায্য না পেলে দুর্গম ও বিপদসঙ্কুল অরণ্য সুন্দরবনের ভিতর দিয়ে হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধাদের চলাচল ও তৎপরতা চালানো হয়ত অসম্ভব না হলেও অতটা সহজসাধ্য হোত না। এই লোকটির নাম রয়জদ্দিন-শিক্ষক আলোক থেকে বঞ্চিত। এই লোকের কাছে আসি উজ্জ্বল দেশপ্রেমের নিদর্শন পেয়েছি। সুন্দরবন এলাকায় পাকবাহিনীর অবস্থান ও সম্ভাব্য আনাগোনা ছিল তার নখদর্পণে। সুন্দরবনের দুর্গম ও অজ্ঞাত পথ দিয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সে মুক্তিবাহিনীর পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করতো। সুন্দরবন দিয়ে আসা-যাওয়ার শতাধিক পথ তার জানা ছিল। আমি এবং আমার তিনজন সঙ্গী কবীর, খালেক ও নওশের এই রয়জদ্দিন মাঝির সাহায্যে ভারত এস পোঁছাই। ভারতে এসে মেজর জলিল সঙ্গে দেখা করি। তিনি তখন থাকতেন টাকি সেক্টর হেডকোয়ার্টারে। গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্রগুলি পেয়ে উনি খুশি হলেন। ঐদিনই উনি আমাকে একটা দল নিয়ে পটুয়াখালী জেলার আসার জন্য প্রস্তুত হতে বলেন।

আমি ৬০ জনের একটি দল সংগঠন করলাম। সেপ্টেম্বর মাসের একরাতে আরও অন্যান্য দলসহ প্রায় ৪০০ মুক্তিযোদ্ধা রয়জদ্দিন মাঝির সাহায্যে সুন্দরবন দিয়ে সুন্দরবনের একটি ঘাঁটি বগীর দিকে অগ্রসর হই। বগী পোঁছাতে প্রায় ৮/১০ দিন লেগে যায়। আমাদের অভ্যর্থনা জানায় সুন্দরবন এলাকার কমান্ডার ক্যাপ্টেন জিয়া। বগী থেকে যার যার নির্দেশিত এলাকায় যাবার প্রস্তুতি নিতে থাকি। পাকবাহিনীটের পায় আমাদের অবস্থান। গানবোট আক্রমণ চালায় আমাদের ক্যাম্পে। মর্টার সেলিং চালাতে থাকে অনবরত। কিন্তু আমাদের কাছে লং-রেইঞ্জ ফায়ারিং অস্ত্রশস্ত্র না থাকায় এল-এম-জি-আর,৩০৩ রাইফেল নিয়ে নদীর কূলে পজিশন নিয়ে থাকি। ওরা প্রায় ২ মাইল দূর থেকে শেলিং করে। কাছে আসতে সাহস না পেয়ে ছ'ঘণ্টা অনবরত শেলিং করার পর গানবোট নিয়ে চলে যায়। রাতে আমরা আমাদের অবস্থান সুন্দরবনের আরো একটু ভেতরের দিকে সরিয়ে নিই। পরের দিন সকালে আবার গানবোট আক্রমণ চালায় এবং সকাল ১১ টার দিকে ওরা চলে যায়। সাত মাইল প্রশস্ত বগী নদীতে সন্ধ্যা ৭ টার দিকে পাড়ি শুরু করে রাত ১০ টার ওপারে চলে আসি। যার যার দল নিয়ে এবং পথপ্রদর্শক নিয়ে আমরা আমাদের নির্দেশিত এলাকার দিকে পায়ে হেঁটে রওনা দিই।

সেক্টর হেডকোয়ার্টার থেকে প্রয়োজনীয় কতকগুলো কাগজপত্র দিয়ে মেজর জলিল আমাকে পটুয়াখালী জেলার সাব-সেক্টর কমান্ডার ক্যাপ্টেন মেহেদীর সাথে দেখা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। ক্যাপ্টেন মেহেদী আলী ইমাম তখন ধামুরাহাটের কাছাকাছি বুকাবুনিয়ায় থাকতেন। তার ছদ্মনাম ছিল ক্যাপ্টেন কুমার। আমার তারিখটা ঠিক মনে নেই, তবে সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম দিকে আমি আমার দল নিয়ে তাঁর সাথে দেখা করি। আমাদের পেয়ে তিনি খুশী হলেন। সাথে সাথে তিনি সকল এলাকা থেকে ছোট ছোট দলগুলোকে তার হেডকোয়ার্টারে ডেকে পাঠালেন। সমস্ত জেলার ১০টা থানাকে তিনি মোট পাঁচটা ভাগে ভাগ করলেন। প্রতিটি জোনের জন্য একজন করে জোনাল কমান্ডার ঠিক করে দিলেন।

পটুয়াখালী ও গলাচিপা থানা নিয়ে জোন গঠন করা হয় তার দেয়া হয়েছিল আমার উপর। সবকিছু ঠিকঠাক হওয়ার পরে আমি আমার দল নিয়ে আমার নির্দেশিত জায়গায় চলে আসি। আমার সাথে যারা ছিল তাদের সকলের নাম আমার মনে নেই। তবে যাদের নাম মনে আছে তাদের নাম এখানে উল্লেখ করছিঃ মোঃ নুরুল হুদা (কমান্ডার), হাবিবুর রহমান (শওকত) (সেকেন্ড-ইন-কমান্ড), খলীফা, মস্তফা, রবীন, ইউসুফ, সুলতান, হাবিব, শাজাহান, কুন্ড, গোমেস, ভূদেব, মান্নান, শরীফ, আবুল, জাহাঙ্গীর, ফোরকান, সুনীল, কাওসার; মন্মথন, লতিফ, আলম এবং আরো অনেকে। মস্তফা এবং কাওসার বুকাবুনিয়া থেকে আমাদের পথপ্রদর্শন করছিল।

ভারত থেকে আবদুল বারেক এম-সি-এ (পটুয়াখালী) আমাদের মুক্তিবাহিনীর হিতাকাঙ্ক্ষী অনেকের নাম দিয়েছিলেন। সেই অনুসারে একদিন পানপট্টির মিঃ রবদের বাড়ি এসে উঠলাম আমি এবং মস্তফা। রব সাহেব বিপুল উৎসাহ আমাদের সাথে সহযোগিতা করলেন। পানপট্টির একটি সাইকেনান শেলটারে আমরা শিবির স্থাপন করলাম। ওখানে বসে পাক বাহিনীর বিভিন্ন ঘাঁটির উপর আক্রমণ চালাবার পরিকল্পনা করতে থাকলাম। পটুয়াখালী জেলার পাক জান্তা প্রধান তখন মেজর ইয়ামীন। আমাদের অবস্থান তার কানে গেল। আমরা গলাচিলা থানা আক্রমণ করার সমস্ত পরিকল্পনা এবং মানচিত্র ঠিক করে ফেলেছি। ৪০ জনের একটি দল নিয়ে আমি গলাচিপা থানা আক্রমণে রওনা হলাম। কিন্তু বাস্তব এবং প্রতিকূল অবস্থান পরিপ্রেক্ষিতে সে রাতে গলাচিপা থানা আক্রমণ করা হল না। এখানে উল্লেখ্য যে, আমরা আমদের অপারেশনগুলো বেশীর ভাগই রাতের দিকে করতাম।

পানপট্টির যুদ্ধঃ তাঁবুতে ফিরে এসেছি রাত তিনটায় ৫/৬ জন সেনট্রি রেখে, বাকী সকালে ঘুমিয়ে নিচ্ছি। ঐ দিন রাত ৪টায় (১৮-১১-৭১) গলাচিপা বন্দরের ৫ বৎসরের বাবলুর ঘুম ভেঙ্গে গেল। তার বাসার সম্মুখ থেকে অনেকগুলো বুটের শব্দ তার কানে এলো। ধড়মড়িয়ে উঠে বসল বাবলু। সাবধানে জানালাটা খুলে দেখল পাকদস্যুর এক বাহিনী বিপুল অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে হেঁটে যাচ্ছে। একটু পরেই কয়েকটা রাজাকারের চাপা আলোচনা থেকে সে বুঝতে পারল পাকদস্যুরা আমাদের ক্যাম্প আক্রমণ করতে পানপট্টি যাচ্ছে। বাবলু ছিল গলাচিপা বন্দরে আমাদের একজন গুপ্তচর। আর তো বাবলুর বসে থাকা চলে না। পিছনের দরজা দিয়ে বাবলু দৌড় আরম্ভ করল। এক নাগাড়ে ছয় মাইল দৌড়ে আমাদের শিবিরের উত্তর পাশের নদীটির পারে ছুটে চলে এলো। দুর্ভাগ্য! ঘাটে খেয়া নেই। কিন্তু তাতে কি। বাবলু ঝাঁপিয়ে পড়ল নভেম্বরের ঠান্ডা নদীতে। সাঁতরিয়ে চলে এলো এপার। আর একটা দৌড়। তারপরই আমাদের শিবির। আমাকে যখন বাবলু খবরটা দিল তখন সকাল ৬-৩০মিঃ। অন্য সকলে ঘুমে। শওকত ও উঠে গেল। ফল-ইন এর বাঁশি বাজিয়ে দিল শওকত। সবাই ছুটে এল ফল-ইন-এ। সংক্ষেপে বুঝানো হল ব্যাপারটা। শওকতকে পাঠালাম সাইক্লোন শেলটারের ছাদে। সেটা ছিল আমাদের ও-পি। বাইনোকুলার লাগিয়ে শওকত পাকবাহিনীর গতিবিধি সব বলে দিতে লাগল। আমি সে অনুসারে ঢেলে সাজালাম আমার দলের সবাইকে। আগে থেকেই আমাদের বাঙ্কার করা ছিল। আবুল ছিল প্রথম এল-এম-জি ম্যান। ভূদেব, সুনীল ও শরীফ ছিল ওর গার্ড এবং সহকারী। সাইক্লোন শেলটারটা ছিল দোতলা দালান। দক্ষিণ দিক থেকে একটা কাঁচা রাস্তা শেলটারের পশ্চিম পাশ ঘেঁষে সোজা উত্তর দিকে গলাচিপার দিকে চলে গেছে। এই রাস্তা ধরে কিছুদূর আসলে পানপট্টির সেই ছোট নদীটা সমনে পড়বে। নদী পার হয়ে রাস্তা ধরে চলে গেলে একেবারে গলাচিপা পৌঁছা যায়। শেল্টারটার সামনে একটা টিনের স্কুল, তারপর একটা খালের কূলে কূলে কয়েকটা বাড়ি এবং ঠিক পশ্চিম পার্শ্বের বাড়িগুলো লতাপাতায় ঘেরা-যা আমাদেরকে আড়াল করে রেখেছিল। উত্তর দিকের সেই রাস্তাটার দু'পাশে একটু দূরে দু'একটা বাড়ি। পূর্ব দিকটার অনেকখানি জুড়ে ধানের মাঠ। দক্ষিণ- পশ্চিম কোণে কাছাকাছি কোন বাড়ি নেই।

ও-পি থেকে শওকতের অবজারভেশন অনুযায়ী পশ্চিম দিকের শক্তি বাড়িয়ে দিলাম। রবিন, কুন্ড, মস্তফা, কাওসার, গোমেস ওদেরকে রাখলাম পশ্চিম দিকের একটা বাড়ির পশ্চিম পাশে ৫০ গজ ব্যবধানে কভার করে। শওকতের তথ্য অনুযায়ী পাকসেনারা পশ্চিম দিক দিয়ে আমাদের সেন্টারের দিকে মার্চ করতে পারে। রবিনদের

একটু দূরেই একটা বাঁধ। আমাদের ক্যাম্পের দিকে পশ্চিম থেকে যদি খানসেনাদের আসতে হয় তবে ঐ বাঁধ পেরিয়ে আসতে হবে। শওকত দেখল খানসেনাদের একটা দল উত্তর দিকের রাস্তার পাশে পজিশন নিয়ে শুয়ে আছে। বাকী তিনটা দলের একটা আমাদের সেন্টারের পশ্চিম পাশ দিয়ে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হচ্ছে। আর বাকী দুটো দল পশ্চিম দিক থেকে আমাদের ক্যাম্পের দিকে আসছে। এই দুটোর একটা দল পশ্চিম দিকের একটা বাড়ির মধ্যে আত্মগোপন করে রইল। বাকীটা ২৫/৩০ জনে বিভক্ত হয়ে আগে-পাছে আমাদের ক্যাম্পের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। ওদের এই চতুর্থ দলে সর্বমোট প্রায় ৭০/৮০ জন খানসেনা ও দালাল সেনা।

শওকতের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য নিয়ে সকল পজিশনে আমাদের প্লানটা জানিয়ে দিলাম। এস-এল-আর, ৩০৩ রাইফেল, ৩৬-এইচ-ই গ্রেনেড নিয়ে সবাই মাটির সাথে লতাপাতার সাথে এক হয়ে গেছি আর এক দুই করে আসল সময়ের অপেক্ষা করছি। শওকতের কথাই ঠিক হলো, রবিনদের সামনের সেই বাঁধটার দিকে পাকসেনারা অগ্রসর হচ্ছে। প্রথম ব্যাচে ২৫/৩০ জন। ১৫/২০ জন পশ্চিমা খান আর বাকীগুলো রাজাকার, পুলিশ। রবিনরা তাক করে শুয়ে আছে। অতি সতর্কতার সাথে খানদের দল বাঁধের উপর উঠে এসেছে। ৩/4 জন বাঁধ পার হয়ে গেছে। অমনি রতনদের দল ট্রিগার টিপল। গুড়ুম গুড়ুম কয়েকটা শব্দ এবং সাথে সাথে গোমেজ ছুড়ে মারল গ্রেনেড। ২টা পুলিশ ও ৬টা খানসেনা লুটিয়ে পড়ল। ছিটকিয়ে গেল খানদের দল। পুলিশ রাজাকারদের সামলাতে তাদের বন্দুক উঁচিয়ে রাখতে হল। খানদের দল পিছিয়ে গেল খানিকটা। এটা ঘটল সকাল ৮ টার দিকে। আমরা চুপচাপ। শওকত আবার চলে গেল ওপিতে-দেখল ওদের গতিবিধি। পাকা তিন ঘণ্টা ধরে ওরা ওদের ছিটকিয়ে পড়া সাথীদের পশ্চিমে একটা বাড়ির আড়ালে একত্রিত করল। এর মধ্যেই খবর এল ৩৭৫ জনের এই দলটি পরিচালনা করছেন পটুয়াখালী জেলার পাক জান্তা প্রধান মেজর ইয়ামিন নিজে। আমরা দলে ছিলাম ৬০ জন মাত্র। অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে একটা এল-এম-জি, এস-এল, আর, ৬টা স্টেনগান, ৩৫টা ৩০৩ রাইফেল। ওদের কাছে ২টা ২" মর্টার, ৭/৮ টা এল-এম-জি, চাইনিজ স্বয়ংক্রিয় রাইফেলসহ বহু আধুনিক হালকা অস্ত্রশস্ত্র। আমাকে খবরটা দিয়েছিল ওদেরই দলের একটা পুলিশ। প্রথমবারের গোলাগুলির সুযোগে পালিয়ে এসে আমাকে খবরটা দিয়ে সে আবার চলে গেল। একটু ঘাবড়ে গেলাম। কিন্তু মনের দুর্বলতা কাউকে টের পেতে দিলাম না। সকলকে সাহস দিয়ে চাঙ্গা রাখলাম। প্রথম দফায় খানদের হটিয়ে দিয়ে এবং ৮ জনকে খতম করে প্রত্যেকের মনেই আনন্দ লেগেছে।

আনুমানিক বেলা ১ টার দিকে ওরা আবার আমাদেরকে তিনদিক দিয়ে ঘিরে ফেলল। দক্ষিণ দিকটা খোলা রেখে পশ্চিম-উত্তর ও পূর্ব দিক থেকে ওরা আক্রমণ চালাল। পূর্বদিক দিয়ে ওরা আমাদের ক্যাম্পে আসতে পারবে না, এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম। কারণ ঐ দিকটার ছিল অনেকখানি ধানের মাঠ। বহু দূরে থেকেই ওদেরকে দেখা যাবে। ভয় হল উত্তর এবং পশ্চিম দিকটা নিয়ে। এই দুটো দিক শক্তিশালী করলাম। সব ধরনের ঝংকার তুলে বেপরোয়া হয়ে খানদের দল এগিয়ে আসতে লাগল। আমরাও মরীয়া হয়ে পাল্টা জবাব দিলাম। সুবিধা ছিল ধান খেতের মধ্যে পালিয়ে পালিয়ে আসলেও আমরা ওদের গতিবিধি দেখতে পাই। কিন্তু ওরা আমাদের টিকিটিরও সন্ধান পায় না। ওদের দল থেকে আর্তনাদের শব্দ আমরা যতই শুনছি সাহস আমাদের ততই বাড়ছে। তবুও ওরা থামে না। কয়েকটা ২" মর্টারের শেল আমাদের ট্রেঞ্চের আশেপাশে পড়ল। মাটি নরম থাকায় বাস্ট করল না সেগুলো।

ঠিক এমনি সংকটের সময়ে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিল আমাদের এল-এম-জি গ্রুপ। এল-এম-জি'টা নিয়ে দাঁড়িয়ে গেল আবুল। চোরা গলিপথ দিয়ে বিভিন্ন কোণে আরম্ভ করল ফায়ার। একবার পশ্চিম দিকের বাড়িগুলো উপর, আবার একটা দৌড়ে সেখান থেকে সরে এসে উত্তর দিকে ওদের পজিশন বরাবর, আবার তার পর মুহূর্তে পূর্ব দিকে ওদের পজিশনের দিকে মুখ রেখে। ওদেকে এস-এল-আর, স্টেনের স্বয়ংক্রিয় ফায়ারিং তো চলছেই। রাইফেল বসে নাই। গ্রেনেডও ফুটছে দুটো একটা। সে এক গগনবিদারী শব্দতান্ডব। খানদের পজিশন থেকে চেঁচামেচি-কান্নাকাটি আরও বাড়ল। পুলিশ-রাজাকারদের রাইফেল পয়েন্ট রাখাও আর সম্ভব হল না। রাইফেল ফেলে যে যেদিকে পারলো পালালো। অল্প কয়েকজন পা-চাটা বাঙ্গালী দালাল, তখনও মেজর

ইয়ামিনের চারদিকে ঘুরছে। আমি ছিলাম পশ্চিম পার্শ্বে আমাদের পজিশনের সবচেয়ে সামনের লাইনে। সিভিল ড্রেসে চীনা রাইফেল হাতে লম্বা একটা লোক নজরে পড়ল। তার সাথে কয়েকটি খানসেনা। প্রায় এক হাজার গজ দূরে ছিল ওরা। তাক করে টিপলাম এস-এল-আরের ট্রিগার। শুয়ে পড়ল সিভিল ড্রেসধারী। ভাবলাম শেষ। কিন্তু শেষ হয় নাই। শুনেছি তিনিই ছিলেন মেজর ইয়ামিন। ঐ যে শুলেন আর উঠলেন গিয়ে ১ মাইল দূরে একটা নদীর পাড়ে, যেখানে তার জন্য স্পীডবোট তৈরী ছিল- অর্থাৎ প্রায় ১ মাইল পথ তিনি কখনও রোলিং কখনও ক্রলিং করে কোন রকমে কাদামাখা হয়ে স্পীডবোটে উঠে এক চম্পটে পটুয়াখালী।

ওদের আক্রমণের দ্বিতীয় পর্যায়ে আমরা প্রধম দিকে ওদের কয়েকজনকে খতম করি এবং তার পরে পূর্বে পরিকল্পনা অনুসারে তিনদিকে সমানে গুলি ছোড়া আরম্ভ করি, তার উপরে ছিল আবুলের এল-এম-জি চালানোর কৌশল। এতে করে ওরা আমাদের বিরাট বাহিনী ভেঙ্গে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। মোটামুটি বিকেল ৪ টার দিকে অপর পক্ষের আর কোন সাড়া শব্দ পেলাম না। যে যেখান দিয়ে পেরেছে পালিয়ে বেঁচেছে। ৩০/৩৫ টা লাশ রেখে “মুক্তি বহুত হারামী হায়” বলে মামা আপন প্রাণ বাঁচা সার বলে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করল।

আমাদের দলের রবিনের ডানহাতে একটা গুলি লেগেছিল। কিন্তু কাউকে না জানিয়ে গামছা দিয়ে বেঁধে সে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করেছে। আমার দলের অর্ধেকের বয়েস ছিল বিশের নীচে এবং কারো বয়সই ২৮-এর উপরে ছিল না। একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি যে, ২০-এর নীচের কচি ছেলেগুলো সবচেয়ে নয়, আমি যে ক’টা যুদ্ধের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলাম তার প্রায় সব যুদ্ধের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে এ কথা বলা যায়।

পল্লীর পর্ণকুটিরের আধা-শিক্ষিত অশিক্ষিত মানুষদের দেশপ্রেমের কথা কোনদিন ভুলতে পারব না। ওরা বন্দুক চালাতে পারে না। আধুনিক অস্ত্রের সামনে তারা তাই নিরূপায়। কিন্তু প্রাণের যে আবেগের পরিচয় তারা বিশেষ করে ঐ পানপট্টির যুদ্ধের দিনে দেখিয়েছিল তার মর্যাদা দেবার মত যোগ্যতা আমার নেই। গ্রামবাসীরা জানত, আমরা সকালে কিছু মুখে দিতে পারি নাই। পাক হানাদারদের রেইঞ্জের দূরের গ্রামে আমাদের জন্য মুড়ি, চিড়ে, গুড়, শতে শতে ডাব কেটে বালতি ভরে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে লোকেরা পৌঁছিয়ে দিয়েছিল। ছোট ছোট জঙ্গলের বাঁকে বাঁকে তারা আটার রুটি ,গুড় এসব যে যেখান থেকে পেরেছে পাঠিয়ে দিয়েছিল- নিয়ে এসেছিল। বিকেল ৫ টার সময় আসা আরম্ভ করল ভাত, তরকারি, ডাল ইত্যাদি। এসকল খাদ্যসামগ্রী এত বেশী হারে এসে জমা হল যে আমরা ১৫ দিন বসে খেয়েও শেষ করতে পারতাম না।

গলাচিপা আক্রমণঃ ৩/৪ দিন পরে ঠিক করলাম ওদের ঘাটি আক্রমণ করতে হবে। শওকতকে প্রধান করে জাহাঙ্গীর, মোস্তফা, হাবিবসহ ৩৫ জনের একটা দল পাঠালাম গলাচিপা আক্রমণ করতে। ওরা ঠিক পরিকল্পনা মত আক্রমণ করল। মারা গেল বিপক্ষের কয়েকজন। দিন শেষ হয়ে গেল। ওরা ফিরে এল শিবিরে। আবার পরিকল্পনা করল সেই রাতেই আক্রমণ করার। কিন্তু রাত আর আসতে পারল না। দুপুরের দিকে সদলবলে থানা ছেড়ে পটুয়াখালীর দিকে চম্পট। খবরটা পেলাম রাতে। শওকত লাফিয়ে পড়ল। তখনই ১০ জনের একটা দল নিয়ে সে চলে গেল গলাচিপায়। পরের দিন বাকী সকলকে নিয়ে আমিও গিয়ে পৌঁছলাম। পটুয়াখালী থেকে জাতিসংঘের একটা ছোট জাহাজে কয়েকজন পুলিশ দিয়ে মেজর ইয়ামিন একটা দল পাঠালেন পর্যবেক্ষণ করতে, অর্থাৎ গলাচিপার খবরাখবর সংগ্রহ করতে।

শব্দ শুনে রেডি হলাম। কিছুক্ষণ পর চোখে পড়ল জাতিসংঘের জাহাজটা গলাচিপা বন্দরের দিকে এগিয়ে আসছে। আমরা ওঁৎ পেতে থাকলাম। আওতার মধ্যে আসার সাথে সাথে আক্রমণ চালালাম। প্রায় ১ মাইল এলাকা নিয়ে আমরা পজিশন নিয়েছিলাম। বাঙালি পুলিশগুলো তাদের হাতের অস্ত্রশস্ত্র সব নদীতে ফেলে দিল। শেষ পর্যন্ত কূলে ভিড়লো জাহাজটি। চেষ্টা করেছিল কাটিয়ে যেতে, কিন্তু পারল না। দখল করলাম জাহাজটি। ওটার নাম ছিল ‘ বাট্টি-মে-বি’। মালয়েশিয়ার লোক ছিল ক্রু। তাদের কাছ থেকে আমাদের এয়ার ফোর্স-এর

শাজাহান, মজিদ, মিজান শিখে নিল জাহাজটি চালাবার পদ্ধতি। মালয়েশিয়ানদের সসম্মানে জাহাজ থেকে উঠিয়ে যত্ন সহকারে তাদেরকে রাখলাম গলাচিপার একটি হোটেলে। জাহাজটাকে আমরা আমাদের যুদ্ধের কাজে ব্যবহার করলাম।

ডিসেম্বরের পাঁচ তারিখ। হাতেম আলী, আলমগীর, আজাদ, বারেক, ওদের সকলের নিকট ব্যক্তিগত চিঠি পাঠালাম পটুয়াখালী আক্রমণ করার প্ল্যান দিয়ে।

ডিসেম্বরের ১০ তারিখ। রাত ১০ টার সময় বারেক তার দল নিয়ে পটুয়াখালীর উত্তর পার দিয়ে, আমি লোহালয়া অর্থাৎ পটুয়াখালীর পূর্ব দিক দিয়ে, হাতেম আলী ও আলমগীর দক্ষিণ দিক দিয়ে এবং আজাদ পটুয়াখালীর পশ্চিম পার দিয়ে আক্রমণ চালাবে। পাঁচ কমান্ডারের একটা বৈঠক আহ্বান করলাম বগাবন্দরে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বগাবন্দর বাউফল থানার অন্তর্গত এবং পঞ্চম আলীর দল বাউফল থানা দখল করে নিয়েছিল। তখন পর্যন্ত গলাচিপা, বাউফল, বামনা ও বেগাতী থানা মুক্তিবাহিনীর দখলে।

খেপুপাড়া আক্রমণঃ ৬ই ডিসেম্বর আমরা খেপুপাড়া আক্রমণ করার পরিকল্পনা করলাম। জাহাজ এবং আরও একটা লঞ্চ নিয়ে রওয়ানা হলাম। খেপুপাড়ার ২ মাইল দূরে তিনটা দলে বিভক্ত হলাম। শাজাহান (এয়ার ফোর্স-এর) যাবে জাহাজে। লঞ্চটা ওখানেই থাকবে। শাজাহানের সাথে থাকবে এল-এম-জিসহ ১৫ জন রাইফেলধারী। সে খেপুপাড়ার থানার ঘাটে জাহাজ ভিড়াবে স্বাভাবিক ভাবে। অন্যরা পজিশন নিয়ে থাকবে। থানার শত্রুপক্ষ ভাববে তাদেরই গানবোট। জাহাজটা অনেকটা গানবোটের মতই দেখতে। বিশেষ করে রাত্রে। পরিষ্কার উর্দুতে শাজাহান থানার দারোগাকে ডাকবে এবং সকলকে জাহাজে উঠে আসার নির্দেশ দেবে। শাজানের দেহাকৃতি পাঞ্জাবীদের মতই ছিল। শাজাহান পাকিস্তান আর্মির ক্যাপ্টেনের অভিনয় করবে। জাহাজের সামনে ওরা এসে শাজাহের নির্দেশ মতো ফল-ইন করবে। সাথে সাথে জাহাজ থেকে এলমে-জি এবং রাইফেলের গুলিতে শেষ করা হবে সবগুলোকে। আমরা এর আগেই দুটো দল নিয়ে থানা ঘিরে ফেলব এবং থানার দিকে এলোপাতাড়ি গুলি করে থানায় ঢুকে পড়ব। পরিকল্পনাটা ছিল এমনি সুন্দর। শওকতকে একটা ছোট খালের পুল পার হয়ে থানার উত্তর দিক দিয়ে পজিশন নিতে পাঠালাম। আমি একটা দল নিয়ে থানার পূর্ব দিক দিক দিয়ে একটা ছোট খালের পুল পার হয়ে থানার ৫০ গজের মধ্যে প্রস্ত্তত থাকব। শওকতের সাথে ইউসুফ, দেলোয়ার সহ ২৫ জনের একটা দল এবং আমার সাথে বাবুদা, হাবীব, রবীনসহ ২৫ জনের একটা দল। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, সরদার জাহাঙ্গীর একটা দল নিয়ে গলাচিপা এসেছিল। তার দলের সদ্য ছিল ৯ জন। তারা আমার দলে যোগ দিয়ে দলকে শক্তিশালী করল। ক্যাপ্টেন মেহেদীর নির্দেশক্রমে গলাচিপা ও পটুয়াখালী থানার মুক্তিবাহিনীর অন্যান্য ছোট দলগুলিও আমার একক নেতৃত্ব মেনে নিয়ে কাজ করা শুরু করেছিল।

হাবীব খেপুপাড়ার ছেলে। সে সকলের সামনে, তার পিছনে আমি, আমার পিছনে বাবুদা। খেপুপাড়ায় কোনদিন যাইনি। হাবীব ছিল একমাত্র পথ-ঘাট চেনা ছেলে। পুলের উপর উঠতে যাব, অমনি শত্রুর পক্ষের পেট্রোল পার্টির সামনে পড়ে গেলাম। ওরা আমাদের উপর গুলি করল। কিন্তু আমাদের কারও গায়ে গুলি লঅগাতে পারে নাই। তার পরই আরম্ভ হল থানা থেকে গুলি করা। আমরা আর পুল পার হতে পারলাম না। ওদিকে আমাদের জাহাজ থেকে পরিকল্পনা কার্যকরী হবার আগে গোলাগুলির শব্দ পেয়ে ওরাও থানার দিখে গুলি ছুড়লো । আমরা সারারাত থানা ঘিরে রাখলাম। সকালে আমি চলে এলাম। শওকতের উপর সমস্ত ভার দিয়ে সমস্ত দল ওখান থেকে সরিয়ে আনলাম। চলে এলাম বগাবন্দর। আমার সাথে আনলাম বাবুদা, মাস্টার সাহেব,লতিফ, বাবুল, ফোরকান, দেলোয়ার এদের কয়েকজনকে।

বগাবন্দর থেকে পাক জলযানের উপর আক্রমণঃ বগা এসে পৌছালাম ৮তারিখ রাত আটটার সময়। পটুয়াখালী থেকে বগাতে টেলিফোন এলো যে পাক বাহিনী পালিয়ে যাচ্ছে। বগা তখন মুক্ত এলাকা। ওখানে পঞ্চম আলীর দলের ১৫/১৬ জনের ঘাঁটি ছিল। আমাকে পেয়ে ওরা খুশী হল। বগা পোস্ট অফিসে গিয়ে

পটুয়াখালীর সাথে যোগাযোগ করলাম। রাত নয়টার সময় দুটো লঞ্চে পাক জান্তার দল ও দালালদের দল পালিয়ে আসল পটুয়াখালী থেকে। কিন্তু তাদের যেতে হবে বগাবন্দরের নদী দিয়ে। বাউফলে ফোনে জানালাম সবকিছু। ফোন পেয়ে বাউফল থেকে একটা দল রওনা হল বগার দিকে। দুরত্ব ৮ মাইল। পটুয়াখালী থেকে যথারীতি আমরা খবর পেতে থাকলাম। পটুয়াখালীর তখনকার ডি-সি আব্দুল আউয়ালের সাথে যোগাযোগ করলাম এবয় খবরের সত্যতা প্রমাণ করলাম।

আমরা ২০ জনের মত লোক রাইফেল হাতে বগা নদীর কূলে পজিশন নিলাম। রাত দশটার সময় লঞ্চ দুটো আমাদের রেইঞ্জের মধ্যে এমে গেল। গুলি ছুড়লাম। ওরাও ছুড়ল ৩/4 টা এল-এম-জির ব্রাশ। লঞ্চ দুটো রাখতে পারলাম না। ফুল স্পীড-এ চালিয়ে রেইঞ্জের বাইরে চলে গেল।

৯ তারিখ সকাল ৮ টার সময় ভারতীয় বিমান বোম্বিং করল পটুয়াখালীতে। আমরা পটুয়াখালী চলে গেলাম। খবর পেয়ে অন্যান্য দলের কিছু কিছু মুক্তিবাহিনী চলে এসেছিল। থানা, পুলিশ ক্যাম্প সব দখলে নিয়ে নিলাম এবং প্রত্যেক পজিশন পয়েন্টে পড়া গার্ড মোতায়েন করলাম। ওদিকে শওকত পরের বারে খেপুপাড়া আক্রমণ করে এবং থানার সমস্ত অস্ত্রশস্ত্রসহ খেপুপাড়া থানা দখল করে নেয়। ৯ই ডিসেম্বরের মধ্যে আমরা পটুয়াখালীর সমস্ত থানা সহ পটুয়াখালী কে মুক্ত ঘোষণা করলাম। তখন আমার কমান্ডে প্রায় ১৫০০ মুক্তিবাহিনী।

সাক্ষাৎকারঃ শামসুল আলম তালুকদার

মে মাসের প্রথম সপ্তাহে মুক্তিবাহিনী ক্যাপ্টেন জিয়ার নেতৃত্বে শরণখোলা থানা আক্রমণ করলে পুলিশবাহিনী সাথে সাথে অস্ত্র দিয়ে দেয়-৩২ টি রাইফেল এবং আরও অনেক গোলাগুলি পাওয়া গিয়েছিল। ওখান থেকে ক্যাপ্টেন জিয়া কিছু অস্ত্র আমাকে দেন এবং বেঙ্গল রেজিমেন্টের হাবিলদার আজিজকে (ফুলমিয়া) দেন।

আমি আমার কিছু লোক ,খাবার এবং অস্ত্র নিয়ে সুন্দরবনের ভোলা নদীর পশ্চিম পাড়ে শরণখোলা এবং চানপায়ে রেঞ্জ অফিসের মধ্যবর্তী স্থান ধানসাগর নামক অফিসের বিতরে প্রথম ঘাঁটি গাড়ি। পরিকল্পনা নিই গ্রাম আক্রান্ত হলে সবাইকে এই ঘাঁটিতে নিয়ে এসে পরবর্তীতে পাক বাহিনীর উপর গেরিলা আক্রমণ চালাবো।

শরণখোলা থানা এবং মোড়লগঞ্জ থানার অঞ্চল অধিকাংশ হিন্দুগ্রাম। মওলানা ইউসুফের নেতৃত্বে জামাতে ইসলাম, মুসলিম লীগ এবং অন্যান্য পাকিস্তান পন্থীরা ঐ এলাকায় লুটপাট শুরু করে। আমার দলের লোকজন দিয়ে প্রায় ১০টি গ্রুপ করে কিছু অস্ত্র দিয়ে পাহারার ব্যবস্থা করি । মাওলানা ইউসুফের দল শুধু লুট নয় নারীধর্ষণও শুরু করে। আমরা প্রতিরোধ দিলে অবস্থা কিছুটা আয়ত্তে আসে। জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে শরণখোলা থানাতে রাজাকার বাহিনী তৈরী হয় পাক রাজস্ব মন্ত্রী মনসুরের নেতৃত্বে। মে মাসের মাঝামাঝি নায়েক সুবেদার মধু তার নিজস্ব দল নিয়ে মোড়লগঞ্জ থানায় যায়। মধু থানাতে পৌঁছুলে আমি এবং মধু যৌথভাবে কাজ শুরু করি। ৪০ জন রাজাকার ইতিমধ্যে মোড়লগঞ্জ থানাতে আসে।

২ রা জুন আমরা যৌথভাবে মোড়লগঞ্জ থানা আক্রমণ করি। ওখানে ভাসানী ন্যাপের সাংগঠনিক সম্পাদক আবু বকর শহীদ হলেন। রাজাকার ৩ জন খতম হয়। ভোর হয়েগেলে আমরা পিছু হটি। তারপর রাজাকাররা বাগেরহাট পালিয়ে যায়। প্রাথমিক অবস্থায় বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্নজন অস্ত্র নিয়ে গিয়েছিল। তার ফলে মোড়লগঞ্জ থানার সোনাখালী, ফুলহাতা, হ্যামড়া, পাঁচগাঁও, ঢুলিগাতি, গজারিয়া ইত্যাদি অঞ্চলে ডাকাতি শুরু হয় ব্যাপকভাবে। হিন্দুবাড়ি লুটপাট, নারীধর্ষণ করে তার সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিলো। ক্যাপ্টেন জিয়া জুন মাসের মাঝামাঝি আমাদের সাথে যোগ দেন। তিনি তখন দক্ষিণ অঞ্চলের সর্বাধিনায়ক হন। আমি,

হাবিলদার মধু এবং ক্যাপ্টেন জিয়া মিলে ১০০ জন মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে ঐসব গ্রামে গিয়ে ৮ জন ডাকাত খতম করি এবং অস্ত্র উদ্ধার করি।

জুন মাসের ২০/২২ তারিখ হবে। পাঁচখানা গানবোট ও ২টি জাহাজে করে প্রায় ৫০০ পাকসেনা এবং ৪০০ রাজাকার মোড়লগঞ্জে উপস্থিত হয়।মোড়লগঞ্জে আমাদের যে ঘাঁটি ছিল সেখান থেকে যাতীয় অস্ত্র এবং সব বাহিনী নিয়ে আমি সুন্দরবনের পুরানো ঘাঁটিতে নিরাপদে চলে যাই। পাকসেনা এবং রাজাকাররা ওখানে গিয়ে আমাদের ক্যাম্প সহ বহু ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয় এবং অসংখ্য লোককে হত্যা করে। পরে রাজাকারদের রেখে পাকসেনারা চলে যায়। এরপরে আমরা সুন্দরবনের বিভিন্ন স্থানে ক্যাম্প করা শুরু করি। ক্যাপ্টেন জিয়া এখান থেকে বিভিন্ন অঞ্চলে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে যোগাযোগ আরম্ভ করেন। শরণখোলা দক্ষিণ অঞ্চল সুন্দরবনের ববিতে সুবেদার আনোয়ার এবং হাবিলদার আজিজ (ফুলমিয়া) ২০০-এর উপরে মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। তাদের সাথে তিনি যোগাযোগ করেন এবং জুন মাসের শেষের দিকে রায়েন্দা থানা আক্রমণ করেন সুবেদার আজিজের নেতৃত্বে। ওখানে আনোয়ার সহ আরও ক'জন শহীদ হন। ঐ মাসেই ক্যাপ্টেন জিয়া ভারতে চলে যান অস্ত্রের জন্য।

শরণখোলা, মোড়লগঞ্জ থানাতে রাজাকাররা ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করতে থাকে। হিন্দুসহ ন্যাপ এবং আওয়ামী লীগের সমর্থকদের বাড়িঘর ভোগদখল এবং নারীদের উপর অত্যাচার করতে থাকে। লোকজন ধরে হত্যা শুরু করে। এই অবস্থায় আমাদের বাহিনী নিয়ে গেরিলা কায়দায় মাঝে মাঝে আক্রমণ চালাতে থাকি এবং বিক্ষিপ্তভাবে রাজাকারদের খতম করতে থাকি। ইতিমধ্যে হাজার হাজার লোক ঘরবাড়ি মান-ইজ্জত হারিয়ে সুন্দরবনে আশ্রয় নিতে থাকে ভারত যাবার জন্য।

ক্যাপ্টেন জিয়া ১৩ ই আগস্টে ভারত থেকে প্রচুর অস্ত্র নিয়ে আমাদের এখানে আসেন। সেই সাথে ৫০ জন ট্রেনিংপ্রাপ্ত গেরিলা এবং ন্যাভাল কমান্ডো নিয়ে আসেন। ১৪ ই আগস্ট সুন্দরবন এলাকাতে তিনি সকল মুক্তিযোদ্ধার কনফারেন্স ডাকেন। ওখানে তিনি বাংলাদেশে সরকারের নিয়োগপত্র দেখান। সেখানে ৪ টি জেলার গেরিলা কমান্ডিং অফিসার হিসেবে নিয়োগ ছিল। সভায় ১০০০-এর মত মুক্তিযোদ্ধা উপস্থিত ছিল। তিনি এই সভাতে সম্পূর্ণ যুদ্ধ পরিচালনার জন্যে কতকগুলি বিভাগ এবং উপবিভাগ খোলেন এবং মুক্তিযোদ্ধাদের একটি শৃংখলায় নিয়ে আসেন। বিভাগগুলি ছিলঃ (১) অপারেশন বিভাগ (২) খাদ্যের বিভাগ (৩) অর্থ সংগ্রহ বিভাগ (৪) যোগাযোগ বিভাগ (৫) বেতন বিভাগ (৬) হাসপাতাল বা চিকিৎসা বিভাগ (৭) ভারতের সাথে যোগাযোগ বিভাগ (৮)শরণার্থী দেখাশোনা এবং পাঠানোর জন্য বিভাগ (৯) ট্রেনিং বিভাগ (১০) রিক্রুটিং বিভাগ। খুলনা জেলায় যুদ্ধ পরিচালনার জন্য সামরিক সাব- কমিটিও গঠন করা হয়। নিম্নলিখিত লোক নিয়ে কমিটি গঠিত হয় (১) ক্যাপ্টেন জিয়া- কমান্ডিং অফিসার (২) সেকেন্ড- ইন- কমান্ড- শামসুল আলম তালুকদার (৩) আবুল কালাম মহিউদ্দিন- সিকিউরিটি অফিসার (৪) আবুল আসাদ- অপারেশন অফিসার (৫) শহীদুল আলম বাদল- অস্ত্রাগারের দায়িত্ব (৬) নূর মোহাম্মদ হাওলাদার- কনস্ট্রাকশন বিভাগ (৭) মোস্তফা হেলাল- খাদ্যের ভারপ্রাপ্ত। বাগেরহাট মহকুমার জন্যঃ (১) নায়েক সুবেদার মধু-কমান্ডিং অফিসার (২) সাতকক্ষীরার আফজাল (৩) মোড়লগঞ্জ থানার জন্য আলী, (৪) শরণখোলা থানার জন্য হাবিলদার আজিজ (ফুলু)। এছাড়া বাগেরহাটের উত্তর অঞ্চলে এবং খুলনার উত্তর অঞ্চলে যোগাযোগের জন্য লোক নিযুক্ত করা হয়। বরিশালে ক্যাপ্টেন শাজাহান (ওমর) পটুয়াখালীতে ক্যাপ্টেন মেহেদীর সাথে যোগাযোগের জন্য লোক নিযুক্ত করেন। ক্যাপ্টেন জিয়া হাবিলদার মধূ এবং আজিজকে অস্ত্র ভাগ করে দেন এবং বাকি অস্ত্র নিজের কাছে রাখেন।

সুন্দরবনের ঘাঁটিকে খুলনা বিভাগের সামরিক হেডকোয়ার্টার ঘোষণা করা হয়। ঐ সভাতেই ১৩ ই আগস্টে মোড়লগঞ্জ থানা আক্রমণ করা হবে বলে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ১৫ ই আগস্ট সন্ধ্যায় ক্যাপ্টেন জিয়া নিজেই ১০০-এর মত মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে মোড়লগঞ্জের উদ্দেশে রওনা হন, মোড়লগঞ্জের পশ্চিমে টাউন হাইস্কুল নামক স্থানে রাত ৩ টায় এসে পৌঁছান। ১০০ লোককে পাঁচটি দলে বিভক্ত করা হয়। কুটিবাড়ি রাজাকার ঘাঁটি দখল করার

জন্য এডজুট্যান্ট খোকনের উপর দায়িত্ব দেয়া হয়। কবিরাজ বিল্ডিং রাজাকার ঘাঁটি দখল করার জন্য নায়েক সুবেদার মধুর উপর ভার দেয়া হয়। সুকুমার বাবুর দালানে রাজাকার ঘাঁটি দখলের জন্য সুবেদার আজিজকে ভার দেওয়া হয় এবং অম্বিকা চরণ হাইস্কুলে রাজাকার ঘাঁটি দখল করার জন্য মোতাহারকে পাঠানো হয়। ক্যাপ্টেন জিয়া এবং আমি ২০ জন নিয়ে রিজার্ভে থাকি। ভোর ৪ টা একই সাথে আক্রমণ চালানো হয়। সকাল ৯ টা পর্যন্ত যুদ্ধ চলে, কিন্তু কোন ঘাঁটি দখল করা সম্ভব হয় না। ইতিমধ্যে রায়েন্দা থানা থেকে এক লঞ্চ রাজাকার আসে মোড়লগঞ্জে। ক্যাপ্টেন জিয়া প্রতিরোধ করেন, রাজাকাররা পিছু হটে। ৯ টার পর ক্যাপ্টেন জিয়া নিজেই আমাকে সহ অম্বিকা হাইস্কুলে আক্রমণ চালান।ওখানে গ্রেনেড ছুড়তে গেলে মুকুল (স্পেশাল গেরিলা কমান্ডো) এবং মোহরাবের হাত-পা ভেঙ্গে যায় রাজাকারদের গুলিতে। ক্যাপ্টেন জিয়া নিজে কাধেঁ করে তাদেরকে মোড়লগঞ্জ কলেজে রেখে যান। আমি নিজে পশ্চিম দিকে এবং ক্যাপ্টেন জিয়া উত্তর দিক থেকে এল-এম-জি ব্রাশ চালিয়ে জানালা ভেঙ্গে ফেলি। আসাদ এবং হেলালকে বিল্ডিংয়ে উঠিয়ে দেওয়া হয়। ভেনটিলেটরের ভিতর দিয়ে ২ জন গ্রেনেড ছুড়তে থাকে। গ্রেনেড ব্রাস্ট হলে বহু রাজাকার মরতে থাকে, তবু তারা আত্নসমর্পণ করেনি। পরবর্তীকালে ক্রমাগত ১০ টি গ্রেনেড ফেলা হয়। রাজাকাররা চিৎকার শুরু করে। ক্যাপ্টেন জিয়া উত্তর দিকের জনালা দিয়ে লাফিয়ে ঘরের ভিতর পড়ে স্টেনগান দিয়ে ব্রাশ ফায়ার শুরু করে। ৫ জনের সাথে সাথে মৃত্যু ঘটে। ২২ জনকে হ্যান্ডস আপ করিয়ে বাইরে নিয়ে আসেন। বাইরে আরও ২ জনের মৃতদেহ পাওয়া যায়। স্কুলে তখন ম্যাট্রিক পরীক্ষা হচ্ছিলো। ৮০০ ছেলেকে বাইরে বের করে দেওয়া হয়। যাবতীয় কাগজপত্র পানিতে ফেলে দেয়া হয়। আমি এবং ক্যাপ্টেন জিয়া ছেলেদের সামনে ভাষণ দেই এবং বাংলাদেশের পক্ষে কাজ করার জন্য উপদেশ দেই । ছেলেরা সবাই 'জয় বাংলা' শ্লোগান দিয়ে বাড়িতে চলে যায়। ওখানে জিয়া ৪ জন শিক্ষককে গ্রেফতার করে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য। পথে আমি এবং ক্যাপ্টেন জিয়া এক স্থানে বিশ্রাম নেবার অবসরে ব্যক্তিগত শত্রুতা তাকায় নায়েক সুবেদার মধুর নির্দেশে ৪ জন শিক্ষক সহ ২২জন রাজাকারকে মধুর সহকারী অধিনায়ক আমজাদ মল্লিক গলা কেটে হত্যা করে। ক্যাপ্টেন জিয়া মধুকে কারণ দর্শাও নোটিশ দেন। এই নিয়ে মধুর সাথে আমাদের বেশ কথাকাটাকাটি হয়। ফেরার পথে কুটিবাড়ি থেকে ২জন রাজাকার উলঙ্গ অবস্থায় পালাচ্ছিল, কিন্তু মাঠে কৃষকরা ধরে গরুর জোয়াল দিয়ে পিটিয়ে হত্যা করে পানিতে ফেলে দেয়। বেলা ১২ টার দিকে আমরা সবাই সুন্দরবনে যাত্রা করি। যাবার পথে প্রতিটি গ্রামের মানুষ আমাদের শুভেচ্ছা জানায় এবং চাল, ডাল, মুরগী, খাসি, দিয়ে আমাদের নৌকা ভর্তি করে দেয়। পথের মাঝে শুনলাম পাকসেনারা এসে গোলাগুলি চালাচ্ছে মোড়লগঞ্জে। একটি ক্যাম্প আমরা দখল করি এবং ৪৪ টি রাইফেল উদ্ধার করি।

১৭ ই আগস্ট আমরা শুনলাম আওয়ামী লীগ নেতা ডাঃ আব্দুল মজিদ, বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি মারুফ হোসেন, ভাসানী ন্যাপের থানা সহ-সভাপতি সাহের আলীকে পাকসেনারা ধরে এনে হত্যা করেছে। এছাড়া গ্রামের নিরীহ আরও বহুজনকে হত্যা করেছে ও ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে। ঐ ক্যাম্পে জিয়া মুক্তিযোদ্ধাদের কনফারেন্স ডাকেন এবং বরিশাল জেলার কয়েকটি থানা আক্রমণ করার জন্য কয়েকটি দল গঠন করেন। সুবেদার আজিজ এবং লতিফের নেতৃত্বে ২০ জনের একটি দল ভান্ডারিয়া থানার জন্য, কমান্ডার হাবিবের নেতৃত্বে ২০ জনের একটি দল কাউখালী থানার জন্য, সুবেদার রুস্তমের নেতৃত্বে ২০ জনের একটি দল রাজাপুর থানার জন্য পাঠান হয়। এছাড়া ক্যাপ্টেন জিয়ার নেতৃত্বে ৫০ জনের একটি দল মঠবাড়িয়া থানা দখলের জন্য শরণখোলা রেঞ্জ অফিসে রওনা হয়। ভোরবেলায় পৌঁছাতেই গানবোটের শব্দ পাওয়া যায়। শরণখোলা রেঞ্জ অফিসে সুবেদার ফুলুর নেতৃত্বে ১০০জনের মত মুক্তিযোদ্ধা ছিল।

১৮ ই আগস্ট ভোরে ভোলা নদীর দু'পাড়ে মাত্র ১০ জন করে ২০ জন রেখে জিয়া সবাইকে সুন্দরবনের ভিতরে যাবার নির্দেশ দেন। কিছুক্ষণের মধ্যে ৭টি গানবোট ফরেস্ট অফিসের উত্তর দিকে এসে পড়ে। মোড়লগঞ্জে পাকসেনা এবং রাজাকাররা চরমভাবে মার খেলে তার প্রতিশোধ নেবার জন্য গানবোটগুলি পাঠানো হয়েছিল। ৪ খানা গানবোট শরণখোলা রেঞ্জ অফিস অতিক্রম করে উত্তর দিকে যাবার পরে পরবর্তীতে ৩ খানা গানবোটের উপর ভোলা নদীর দুই পার থেকে মুক্তিযোদ্ধারা গুলিবর্ষণ করে। সুবেদার গফফার রকেট লাঞ্চার

থেকে গোলা নিক্ষেপ করে একটা গানবোট বিধ্বস্ত করে। গানবোটটি গুলি খেয়ে দক্ষিণ দিকে ৩ মাইল পর্যন্ত গিয়ে ডুবে যায়। পরবর্তীকালে পাঞ্জাবীদের ৪ টি মরা লাশ নদীতে ভাসতে দেখা যায়। বাদবাকি ৬ টি গানবোট থেকে খানসেনারা মর্টার, আর-আর, হেভী মেশিনগান, লাইট মেশিনগান থেকে আমাদের উপর প্রবলভাবে গোলাবর্ষণ করে এবং মুক্তিযোদ্ধারা তার পাল্টা জবাব দিতে থাকে। এমনি করে ভোর থেকে বিকেল ৪ টা পর্যন্ত ভীষণভাবে গোলাগুলি করেও পাড়ে উঠতে ব্যর্থ হয়ে তারা যে পথে এসেছিল সে পথে ফিরে চলে যায়। মুক্তিযোদ্ধারা ত্যারাব্যাকা হাট নামক স্থানে একত্রিত হয় এবং কাজার থেকে চিড়া মুড়ি কিনে খাওয়া-দাওয়া করে। ক্যাপ্টেন জিয়া এবং আমি শরণখোলা রেঞ্জ অফিস এবং বগি ফরেষ্ট অফিস ও শরণখোলা থানার দক্ষিণ অঞ্চলে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার জন্য ৫০জন সাহসী মুক্তিযোদ্ধাকে সশস্ত্রভাবে রেখে আমাদেরকে গন্তব্যস্থান ধানসাগরে চলে যাই। এই সময় তারা যেন কোন আক্রমণ না করে। পরবর্তীকালে বরিশাল জেলার বিভিন্ন থানাতে অপারেশন করার জন্য তাদের পাঠান হয়েছিল। তারা বীরত্বের সাথে সেসব জায়গায় অপারেশন করে এবং বহু রাজাকার ও খানসেনাকে হত্যা করে অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করতে সক্ষম হয়।

ক্যাপ্টেন জিয়া পরবর্তীকালে মুক্তিযোদ্ধাদের একটা কনফারেন্স ডাকেন এবং সেখানে এই সিদ্ধান্ত হয় যে খুলনা, পটুয়াখালী, বরিশালের কলেজ এবং স্কুলে যেসব যুবক ছেলে আছে তাদেরকে সুন্দরবনে নিয়ে নতুন করে মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিং দিতে হবে। সেই অনুযায়ী ওখান থেকে ২০ মাইল দক্ষিণে হেলা নদী থেকে তাম্বল নদীতে ঢুকে তেতুলবাড়িয়া খাল দিয়ে উত্তর দিকে ঢুকে ছোট্ট খালের দুই পাশে সুন্দরী কাঠদিয়ে গোলপাতার ঘর করি। প্রতম অবস্থায় খুলনা জেলার মুক্তিযোদ্ধাদের হেডকোর্য়াটার এখানেই করা হয়।

পরবর্তীকালে শরণখোলা থানার মুক্তিযোদ্ধাদের কমান্ডার নিযুক্ত করা হয় সুবেদার আজিজের পরিবর্তে সুবেদার গফফারকে। কারণ আজিজ (ফুলুমিয়া) ছিল অত্যন্ত অত্যাচারী। বিনা অন্যায়ে নিজের ইচ্ছামত অনেক মুক্তিযোদ্ধাকে গুলি করে মেরেছে এবং সাধারণ মানুষের উপর অনেক অন্যায়-অত্যাচার করেছে। ক্যাপ্টেন জিয়া সুবেদার আজিজকে বন্দী করে ভারত পাঠিয়ে দেন। অন্যদিকে ক্যাপ্টেন জিয়া তাম্বুলবুনিয়া নদীর দুই পার্শ্বে ছোট খালগুলির মধ্যে অনেক ঘর তৈরী করার নির্দেশ দিলেন। এক এক গ্রুপের জন্য এক এক জায়গায় ব্যবস্থা করলেন। তাম্বুলবুনিয়া খালের পূর্বদিকে একটি খালে তিনি ছাত্রদের জন্য একটি ক্যাম্প তৈরী করেন। সেখানে অনেক জায়গা নিয়ে ট্রেনিং দেবার জন্য সুন্দরীগাছ কেটে একটি খোলা মাঠ তৈরী করলেন। সেই মাঠে বাংলাদেশী জাতীয় পতাকা তোলা হতো এবং যুবকদের রীতিমত সামরিক কায়দায় ট্রেনিং দেয়া হত। উক্ত ছাত্রদের ক্যাম্পের দায়িত্ব হয়েছিল পরিতোষ কুমার ও লিয়াকত আলী খানের উপরে। একদিকে শারীরিক পরিশ্রম করে ট্রেনিং দেয়া হত, অন্যদিকে গেরিলা যুদ্ধ সম্পর্কে ক্লাস নেয়া হতো। সময় সময় সামরিক কায়দায় শারীরিক পানিশমেন্ট দেয়া হতো। উক্ত ছাত্রদের ক্যাম্পের সুন্দরী গাছ কেটে অনেক জায়গা নিয়ে পুকুর কাটা হয়েছে। টিনের দোচালা ঘর করা হয়েছিল। আসামীদের রাখার জন্য জেলখানা রাখা হয়েছে। খাদ্য রাখার জন্য গোডাউন ঘর করা হয়েছিল। আসামীদের দেখাশুনার জন্য জেলের কর্মকর্তা এবং স্টাফ নিযুক্ত করা হয়েছিল। ছাত্রদের ক্যাম্পে বিশ খানার মত বড় এবং ছোট নৌকা রাখা হয়েছিল। মাঝে মাঝে ক্যাপ্টেন জিয়া এবং আমি অতর্কিতে দেখাশুনার জন্য ক্যাম্প ভিজিট করতাম। তাম্বুলবুনিয়া নদীর পার্শ্বে তেতুলবাড়িয়া হতে হেডকোয়ার্টার নিয়ে আসা হয়। সেখানে নানা প্রকার ঘর করা হলোঃ

(ক) খুলনা জেলা কমান্ডিং অফিসের জন্য অফিস ঘর তৈরী করা হলো। সেখানে সামরিক কায়দায় সব প্রস্তুতি নেয়া হল।

(খ) সহকারী অধিনায়কের জন্য অফিস করা হলে এবং টাইপিস্ট ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হলো।

(গ) প্যারেড মাঠ তৈরী করা হলো। সেখানে যোদ্ধাদের একত্রিত করা এবং অপারেশন যাবার পূর্বে সব ফল-ইন- করিয়ে চারদিকে পাঠান হতো।

(ঘ) মুক্তিযোদ্ধাদের খাওয়ার জন্য আলাদা ক্যাম্প করা হয়েছিল। রান্না করার জন্য আলাদা লোক নিয়োগ করা হয়েছিল। আলাদা আলাদা গ্রুপ করে খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। রান্না পরিদর্শনের জন্য আলাদা লোক ছিল।

(ঙ) হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধার খাওয়ার জন্য একদল লোক নিযুক্ত করা হয়েছিল, যারা মাছ ধরে খাওয়াবে এবং অন্য আর এক দল ছিল, যারা হরিণ শিকার করে আনবে।

(চ) মুক্তিযোদ্ধাদের রোগ বা দুর্ঘটনাজনিত আঘাত নিরাময়ের জন্য ৪ জন বিজ্ঞ ডাক্তার ছিল এবং হাসপাতালও খোলা হয়েছিল। হাসপাতালে নানা ধরণের ঔষধ ছিল।

(ছ) সমস্ত মুক্তিযোদ্ধাদের নানাবিধ সুবিধা দেয়ার জন্য গুদাম ছিল। গুদামে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ছিল, যা প্রয়োজন অনুযায়ী ওখান থেকে দেয়া হতো।

(জ) বিভিন্ন স্থান থেকে নানা ধরণের জিনিসপত্র রাখার জন্য আলাদা একটি ঘর তৈরী করা হয়েছিল। তার মান ছিল ইমার্জেন্সী স্টোর। ওখানে নানা ধরণের জিনিস জমা রাখা হয়েছিল। উক্ত মালপত্র দেয়ার জন্য ৫ জনকে নিয়ে একটি ইমার্জেন্সী কমিটি গঠন করা হয়েছিল এবং একজন ইমার্জেন্সী অফিসার নিযুক্ত করা হয়েছিল।

(ঝ) মহিলাদের জন্য আলাদা ক্যাম্প ছিল। সেখানে মহিলারা ট্রেনিং নিত। মহিলাদের কমান্ডার ছিল খুরশিদ জানে আলম তালুকদার। মহিলারা প্রতিদিন প্রায় এক হাজারের মত রুটি তৈরী করত। তারা কাপড়ও সেলাই করত। তাদেরকে ৩০৩ রাইফেল, এস-এল-আর, এস-এম-জি, এল-এম-জি চালানোর প্রশিক্ষণ দেয়া হোত। নিজেরা নৌকা চালাতো।

(ঞ) ভারত হতে যে সমস্ত নেভাল কমান্ডো আসত তাদের জন্য আলাদা ক্যাম্প ছিল। তাদের প্রতি ক্যাম্পের পক্ষ থেকে স্পেশাল কেয়ার নেওয়া হতো।

(ট) হেডকোয়ার্টার সমস্ত অস্ত্র ক্যাম্পে ক্যাম্পে যদিও ভাগ করে দিয়েছিল তবুও বিরাট অস্ত্রাগার ছিল। অস্ত্র দেখাশুনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য আলাদা ডিপার্টমেন্ট ছিল।

গেরিলা ক্যাম্পঃ সুন্দরবনে দুই প্রকার ট্রেনিং দেয়া হতো। একদল ডাইরেক্ট ফাইট করবে। আর এক দল গেরিলা কায়দায় যুদ্ধ পরিচালনা করবে। তাই গেরিলাদের জন্য একটি আলাদা ক্যাম্প তৈরী করা হয়েছিল। তার কমান্ডার ছিল শহীদ আলী। সেখানে কমান্ডিং অফিসারের জন্য অফিস ছিল। প্যারেড গ্রাউন্ড ছিল। কোত ছিল। গুদাম ছিল। খোনে প্রায় ৫ শত গেরিলা যোদ্ধা ছিল। অপারেশনে যাবার পূর্বে তারা হেডকোয়ার্টারে আসত এবং সেখান থেকে যাত্রা করত।

প্রত্যক্ষ সৈন্যদের ক্যাম্পঃ তাম্বুলবুনিয়া নদীর পূর্ব পার্শ্বে একটি খালের মধ্যে রীতিমত সামরিক বাহিনীর ক্যাম্প করা হলো। তার দায়িত্ব দেওয়া হলো বাংলাদেশের সি-এন-সি কর্নেল ওসমানীর স্পেশালিষ্ট আলতাফকে। তার অধীনে এক হাজারের মত সৈন্য ছিল। তারা অত্যন্ত সাহসী যোদ্ধা ছিল।

রেকি পার্টিঃ রেকি পার্টির কমান্ডার পরিতোষ কুমার পালকে করা হলো। হেডকোয়ার্টার থেকে ১৫ মাইল দক্ষিণে তাম্বুলকুনিয়ার পূর্ব পাশে পাঙ্গাশিয়া নামক খালের মধ্যে তাদের ক্যাম্প করা হলো। সেখান হতে গানবোট, লঞ্চ বা জাহাজের গতিবিধি লক্ষ্য করে প্রতিদিন হেডকোয়ার্টারে রিপোর্ট পাঠানো হতো। মূলতঃ তার উপর দায়িত্ব ছিল খুলনা এবং বরিশালের শত্রুদের যোগাযোগ পর্যবেক্ষণ করা। হেডকোয়ার্টারে তৈরী করার পর এক মাসের মত সময় লেগেছিল সব ঠিক করে নিতে। তারপর যুদ্ধের পালা শুরু হলো।

বগিঃ বরিশাল-খুলনা জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে বলেশ্বর নদী। এই নদী ৬ মাইলের মত প্রশস্ত। বগি শরণখোলা থানার দক্ষিণ অঞ্চলে জনবহুল এলাকা সংলগ সুন্দরবন ফরেস্ট অফিস। বলেশ্বর নদীর পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত এই বগিতে আমাদের যোগাযোগের প্রধান ঘাঁটি করা। বগিতে আমাদের মজবুত সৈন্য বাহিনী ছিল। গানবোটের সাথে প্রতিদিন যুদ্ধ চলত। শত চেষ্টা করেও গানবোট হতে পাক সেনারা তীরে উঠতে পারেনি।

বগির যুদ্ধঃ আগস্ট মাসের দিকে বরিশাল-পটুয়াখালী-ফরিদপুর থেকে প্রায় এক লক্ষ শরণার্থী খানসেনা ও রাজাকারদের অত্যাচারে বগিতে আশ্রয় নিল। এমনি এক সময়ে হঠাৎ ৫ খানা গানবোট বগিতে আমাদের ক্যাম্পের উপর গুলি চালায়। তারা বলেশ্বর নদী হতে সব স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র দিয়ে গুলি করে। মর্টার ও আর-আরের গুলিতে মাটি কেপেঁ উঠেছিল। তখন আমাদের মাত্র ২০ জন মুক্তিযোদ্ধা ৫ খানা গানবোটের মোকাবেলা করে। যখন গানবোট তীরের দিকে আসতে থাকে তখন মুক্তিযোদ্ধারা চুপচাপ। গানবোট যখন নদীর কিনারে আসে এবং খানসেনারা তীরে উঠবার জন্য গানবোটের উপরে ওঠে, ঠিক এমনি সময়ে মুক্তিবাহিনী এল-এম-জির ব্রাশ ফায়ার করে- অনেক খানসেনারা মারা যায়। দুইদিন যাবৎ যুদ্ধ চলে, কিন্তু তারা তীরে উঠতে পারেনি।

এদিকে গানবোটের ভয়ে শরণার্থীরা গ্রাম ছেড়ে বগি নদী পার হয়ে সুন্দরবনের মধ্যে প্রবেশ করে। ৪জন শরণার্থী মারা যায় মর্টারের গুলিতে। অনেক ছোট ছেলেমেয়ে হারিয়ে যায়। পরবর্তীকালে ক্যাপ্টেন জিয়া ও আমি ২৫ জন লোক নিয়ে একটি কমিটি গঠন করি এবং তাদের ভারতে পাঠাবার ব্যবস্থা করি।

ভারত থেকে ৯নং সেক্টরের কমান্ডার মেজর জলিল ১৫/২০ দিন অন্তর শত শত মুক্তিযোদ্ধাকে বগিতে পাঠাতেন এবং অস্ত্র পাঠাতেন। আমরা তাদের বরিশাল জেলায় কমান্ডিং অফিসার ক্যাপ্টেন শাজাহান ও পটুয়াখালী জেলায় কমান্ডিং অফিসার ক্যাপ্টেন মেহেদীর নিকট কাঠকাটা নৌকায় অতি সাবধানে পাঠাতাম। যুদ্ধের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এরূপ চলত।

শরণখোলা রেঞ্জ অফিসঃ এটাও মুক্তিযোদ্ধাদের একটি ঘাঁটি ছিল। এটাকে বলা হতো পশ্চাৎভূমি। হেডকোয়ার্টার হতে এসে প্রথম এখানে স্থান নেয়া হতো, তারপর নির্দেশ অনুসারে যাত্রা করা হতো। এখানে স্থানীয় জনসাধারণ মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য পাঠাতো। শরণখোলা রেঞ্জ অফিস হতে উত্তর দিকে গিয়ে মুক্তিযোদ্ধারা রাজাকার ধরে আনতো এবং বিচার-আচার করা হতো।

পাকিস্তান হাটের যুদ্ধঃ একদিন শোনা গেল ‘পাকিস্তান’ নামক একটি হাট রয়েছে শরণখোলা থানায়। সেখানে রাজাকাররা জনসাধারণের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে। তখন শহীদ আসাদ মাত্র ১০ জন মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে আক্রমণ করে। দেড়শত রাজাকার রয়েছে ওখানে। দুইঘন্টা যুদ্ধ চলে। মুক্তিযোদ্ধারা রাজাকারদের হটিয়ে দিয়ে ৩ জনকে বন্দী করে নিয়ে আসে এবং দুটি রাইফেল পায়।

তাফালবাড়িতে যুদ্ধঃ তাফালবাড়িতে আমাদের একটি ক্যাম্প ছিল। রাজাকার এবং পাঞ্জাবী পুলিশরা হঠাৎ ক্যাম্পে আক্রমণ করে এবং ক্যাম্পের চারদিক ঘিরে ফেলে। দীর্ঘ তিন ঘন্টা যুদ্ধ চলে। ইতিমধ্যে বগি ক্যাম্প হতে ২০ জন নিয়ে যখন পিছন হতে আক্রমণ চালানো হয়, তখনি পাকসেনারা ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। ৪জন রাজাকার মারা যায়। ১০ টি রাইফেল উদ্ধার করাহয়।

বরিশালের মাপলাজাড়ঃ বরিশাল জেলায় মাঠবাড়িয়া থানায় মাপলাজাড় নামক স্থানে ব্যাপক অত্যাচার করে এবং সেখানকার জনসাধারণ খুব অসুবিধা ভোগ করে। বগি ক্যাম্প হতে ১৫ জন মুক্তিযোদ্ধা রাত্রে গোপনে এক বাড়িতে আশ্রয় নেয়। বেলা ১০ টার সময় পাঞ্জাবী পুলিশ এবং রাজাকার ৫০ জন গ্রামে এসে ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিতে থাকে। মাত্র ১৫ জন মুক্তিযোদ্ধা গেরিলা কায়দায় আক্রমণ করে। সেখানে ১০ জন শত্রু

প্রাণ হারায় এবং বাকীরা পালিয়ে যায়। ৫ জনকে বন্দী করে নিয়ে আসা হয় এবং ১২ টি রাইফেল উদ্ধার করা হয়।

সাক্ষাৎকারঃ ডাঃ মোহাম্মদ শাহজাহান

মেজর জলিলকে ৯ নং সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার নিযুক্ত করা হয় এবং হাসনাবাদ ৯ নং সেক্টরের হেডকোয়ার্টার স্থাপন করা হয়। তারপর হাসনাবাদ থেকে টাকীতে হেডকোয়ার্টার স্থানান্তরিত করা হয় এবং স্বাধীনতার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত সেখানে হেডকোয়ার্টার ছিল।

টাকীর নিকটবর্তী তাকিপুরে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ ক্যাম্প খোলা হয়। শাহ জাহান মাস্টার টাউন শ্রীপুর হাইস্কুলের হেড মাস্টার ছিলেন। তিনি তার এলাকার মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত করেন। সে এলাকার ছেলে এবং যারা আমাদের সাথে ছিল সবাইকে নিয়ে প্রথম তাকিপুরে ট্রেনিং শুরু হয়।

প্রথম দিকে আমাদের খাবার সমস্যা প্রকট ছিল। সেখানে প্রায় ১৮২ জন মুক্তিযোদ্ধা ট্রেনিং নিচ্ছিল। ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী প্রথম অবস্থায় আমাদের অনেক সাহায্য করেছে। ৭২ ব্যাটালিয়ন বি-এস-এফ'র কমান্ডার মুখার্জীর সহযোগিতার কথা অবিস্মরণীয়।

খারাপ খাদ্য, পানীয় এবং খারাপ অবস্থায় থাকার জন্য অধিকাংশ মুক্তিযোদ্ধার জ্বর এবং নানারকম পেটের অসুখ শুরু হয়। এদের চিকিৎসার জন্য বি-এস-এফ থেকে (৭২ ব্যাটালিয়ন) ঔষধ সাহায্য দেয়া হয়। আমি নিজে সে মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসার ভার নিয়েছিলাম।

দিন দিন মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা বাড়তে লাগল। জুন মাসে প্রথম ভারতে মুক্তিযোদ্ধাদের গেরিলা ট্রেনিং শুরু হয় বিহারে। আমরা প্রথম বেইস বিহারে পাঠাই তাকিপুর থেকে। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত গেরিলারা বিহার থেকে ফিরে আসলে আমাদের তৃতীয় ক্যাম্প বাকুন্দিয়াতে খোলা হয়। এখানে কেবল ট্রেনিংপ্রাপ্ত গেরিলাদের রাখা হত।

আমাদরে দ্বিতীয় ক্যাম্প ছিল হিংগলগঞ্জে। এটা খোলা হয় জুন মাসে। এখান থেকেই ১২ জন মুক্তিযোদ্ধা সর্বপ্রথম খুলনার কালীগঞ্জ থানা আক্রমণ করে (জুন) এবং সফলতা অর্জন করে। তারপর মাঝে মাঝে এখান থেকে ভিতরে গিয়ে ছোটখাট অপারেশন চালাত।

আমার সাথে কয়েকজন মেডিক্যালের ছাত্র ছিল। তাদের মধ্যে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র জাহিদ, মুজিবর এবং চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র সরল এবং মৃণাল এদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্রথমদিকে প্রত্যেকটা ক্যাম্পের সাথে একটি করে আউটডোর ছিল। কয়েকটা স্পেশাল বেড রাখা হতো কেবলমাত্র গুরুতরভাবে আহত রোগীদের জন্য। এখান থেকে পরে আমরা ভারতীয় হাসপাতালে পাঠিয়ে দিতাম। তারা এ ব্যাপারে আমাদেরকে যথেষ্ট সাহায্য-সহযোগিতা করেছে। উল্লিখিত চারজন ছেলে চারটি ক্যাম্পের মেডিক্যাল অফিসার হিসেবে কাজ করছিল। আমি প্রত্যেকটি ক্যাম্প মাঝে মাঝে গিয়ে সুপারভাইজ করে আসতাম। অধিকাংশ গেরিলা অপারেশন হিংগলগঞ্জ ক্যাম্প থেকেই পরিচালনা করা হত। তাই প্রায়ই আমাকে সেখানে যেতে হতো।

সেপ্টেম্বর মাসে টাকীতে সর্বপ্রথম ১৫ বেডের হাসপাতাল খোলা হয়। এখানে অস্ত্রোপচারের কোন ব্যবস্থা ছিল না। প্রকৃতপক্ষে একটা ট্রানজিট হসপিটাল এর কাজ করত- আহত মুক্তিযোদ্ধাদের। এখানে রাখা হত ফার্স্ট এইড দেয়ার জন্য এবং পরে ভারতীয় হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়া হত। ২২ শে নভেম্বর কালীগঞ্জ থানা

মুক্তিযোদ্ধারা দখল করে। একই সাথে শ্যামনগরও দখল করা হয়। হিংগলগঞ্জ থেকে সমস্ত মুক্তিযোদ্ধা শ্যামনগর ও কালীগঞ্জে ঘাঁটি স্থাপন করে।

২৩/২৪ সেপ্টেম্বর বাকুন্দিয়া থেকে মুক্তিযোদ্ধারা সাতক্ষীরার দিকে অগ্রসর হয়। সাতক্ষীরার প্রায় ১১ মাইল দূরে কুলিয়াতে পাকিস্তানী সৈন্যদের সাথে যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধ ৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত চলে।

২৪শে নভেম্বর কালীঞ্জ থেকে মুক্তিযোদ্ধারা কুলিয়ায় মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্যে এগিয়ে আসে। কুলিয়ার যুদ্ধে একজন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন এবং ছয়জন আহত হন। ৬ই ডিসেম্বর মেজর জয়নাল আবেদীন আমাদের সেক্টরে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তান সেনাবাহিনী পিছু হটতে শুরু করে এবং খুলনার দিকে চলে যায়।

৩ রা ডিসেম্বর থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনী বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে বিভিন্ন এলাকা মুক্ত করতে থাকে।

৬ ই ডিসেম্বর একটি লঞ্চ এবং একটা গানবোট নিয়ে জনাব নূরুল ইসলাম মঞ্জুর ৪০০ মুক্তিযোদ্ধা সমভিব্যহারে বরিশালের দিকে রওনা হয়ে যান। ১০/১১ই ডিসেম্বর তারা বরিশাল পৌঁছেন। ইতিমধ্যে বরিশালের সাবসেক্টর কমান্ডার ক্যাপ্টেন ওমর বরিশাল দখল করে নিয়েছিলেন।

খুলনা শত্রুমুক্ত হয় ১৭ই ডিসেম্বর। খুলনাতে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন ব্রিগেডিয়ার হায়াত খান। তিনি ১৭ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ-ভারত যৌথ কমান্ডের কাছে আত্নসমর্পণ করেন।

সাক্ষাৎকারঃ রাজিনা আনসারী

নভেম্বর মাসে আমি বুকাবুনিয়া পৌছি। জনাব আলমগীর বুকাবুনিয়ায় এক হিন্দুবাড়িতে থাকার ব্যবস্থা করে দেন। ট্রেনিং শেষ হবার পর আমি আলমগীর সাহেবের সাথে কয়েকটি অপারেশনে অংশগ্রহণ করি। তাঁর নেতৃত্বাধীনে আমি পটুয়াখালী, আমতলী, পাথরঘাটা ইত্যাদি স্থানে পাকসেনাদের সাথে সম্মুখসমরে অবতীর্ণ হই।

আমতলী থানা অপারেশনঃ আমতলী থানা অপারেশনের কথা আমার আজও মনে আছে। ৫০ জনের একটি দল নৌকায় করে আলমগীরের নেতৃত্বে বুকাবুনিয়া থেকে আমতলী থানা আক্রমণ করার জন্য ভারতের দিকে রওনা দেয়।আমিও ঐ দলের সদস্য ছিলাম। পরদিন রাত ৮ টায় বুকাবুনিয়া থেকে ২৪/২৫ মাইল দুরে আমতলীতে পৌঁছি। আমতলী এলাকার আরও ৫০ জন মুক্তিযোদ্ধা আমাদের সাথে অংশগ্রহণ করেন। আমরা ১০০ জন মিলে রাত ১ টার সময় আমতলী থানা আক্রমণ করি। আমাদের সাথে ছিল ২ টা হালকা মেশিনগান ও রাইফেল। আমতলী থানায় পাকসেনা, রাজাকার ও পুলিশ মিলে ছিল ১৫০ জনের মত। ওরা আমাদের প্রচন্ডভাবে বাধা দেয়। আড়াই ঘন্টা ধরে উভয়পক্ষের মধ্যে প্রচন্ড গোলাগুলি চলে। আমি আমার মুক্তিযোদ্ধা ভাইদের যুদ্ধের সময় মনোবল বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করি। এ যুদ্ধে পাকসেনাদের ২০ জন নিহত এবং অনেক আহত হয়। এরপর আমরা নিরাপদে আমতলী অবস্থান পরিত্যাগ করে বুকাবুনিয়া চলে আসি। আমাদের কেউ এ যুদ্ধে নিহত হননি।

এছাড়া আমি আহত মুক্তিযোদ্ধাদের সেবা-শুশ্রুষা করি। ক্লান্ত মুক্তিযোদ্ধাদের সেবাযত্ন ছাড়াও তাদের থাকা- খাওয়ার সুবন্দোবস্ত করার দায়িত্ব আমার উপর ছিল। স্বাধীন হবার পর ক্যাপ্টেন মেহেদী আমাকে আমার বাবা-মার কাছে পাঠিয়ে দেন।

স্বাক্ষরঃ রাজিনা আনসারী

সাক্ষাৎকারঃ স, ম, বাবর আলী
২৪-৬-১৯৭৩

১৫ই মে খুলনা জেলার সাতক্ষীরা মহকুমার ভোমরা বর্ডারে কাস্টমস হাউসে আমরা বাঙালী ই-পি-আর ও পুলিশদের নিয়ে একটি শিবির খুলি।

মে মাসের প্রথম দিকে পাক-মিলিটারী অতর্কিতে বেলা ১০টার দিকে এই শিবির আক্রমণ করে। কিন্তু পাক-মিলিটারী ১ ঘন্টা যুদ্ধ চলার পর পিছু হটতে বাধ্য হয়।

তার পরের দিন পাক-মিলিটারী পুনরায় উক্ত ঘাঁটি আক্রমণ করে। ঐ আক্রমণ অত্যন্ত প্রবল হওয়ায় আমরা উক্ত শিবির পরিত্যাগ করে ভারতে ইটিন্ডিয়া নামক স্থানে এসে উঠি এবং একটা শিবির স্থাপন করি। এই যুদ্ধে আমাদের কোন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। কিছুদিন পরে পাক-মিলিটারী ভোমরা ক্যাম্প পরিত্যাগ করায় আমরা পুনরায় ভোমরা ক্যাম্পে আসি।

১৯৭১-এর ১৮ ই মে পাক-সেনারা বিপুল বিক্রমে আমাদের ভোমরা শিবির দখল করার জন্য আসে। গভীর রাত্রে তারা আমাদের শিবির আক্রমণ করে। বৈকাল ৫ টার সময় মিলিটারীরা হটে যাওয়ার পর এই যুদ্ধ শেষ হয়। এই যুদ্ধে পাক-মিলিটারীর বহু অফিসার ও সৈন্য নিহত হয়। আমরা পাকসেনার ২ জন ক্যাপ্টেন ও একজন সৈনিকের লাশ আনতে সক্ষম হই। আমাদের পক্ষেও ২ জন শহীদ হন।

১৯৭১-এর জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে ১১জনের একটা দল নিয়ে মাত্র ৪ টি রাইফেল, ১১টা গ্রেনেড ও কয়েকটি বেয়োনেট নিয়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ঢুকি। জুনের ১০ তারিখে টাকী ক্যাম্পে ফিরে যাই।

১৯৭১-এর ১২ই জুন গভীর রাতে ইছামতী নদী পার হয়ে দেবহাটা থানার টাউন শ্রীপুর গ্রামের মিলিটারী ঘাঁটি আক্রমণ করতে যাই, কিন্তু গিয়ে দেখি ঐ ঘাঁটিতে কোন মিলিটারী নেই। রাত্রে আমরা ঐ গ্রামেই অবস্থান করার সিদ্ধান্ত নিই। কিন্তু শান্তি কমিটির লোকেরা খবর পেয়ে ভোর না হতেই আমাদেরকে ঘেরাও করে ফেলে। মৃত্যু ছাড়া কোন গতি না দেখে মিলিটারীর সাথে গুলি বিনিময় শুরু করি। প্রায় ৫ ঘন্টাকাল যুদ্ধ চলার পর ১৯ জন মিলিটারীর লাশ ফেলে রেখে মিলিটারীরা পিছু হটে যায়। আমাদের পক্ষে কাজল, নাজমুল ও নারায়ণসহ ৭ জন নিহত ও ১০/১৫ জন আহত হয়। ইছামতী নদী সাঁতরিয়ে আমরা টাকীতে ফিরে আসি। এ যুদ্ধ হয় ১৩ ই জুন।

এর কয়েকদিন পর প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বাংলাদেশের ভিতরে ঢুকি এবং আশাশুনি থানার বড়দল নামক স্থানে শহীদ কাজলের নামানুসারে কাজলনগর শিবির খুলি।

বড়দলের এই শিবির পাকসেনারা সন্ধান পেয়ে আক্রমণ করে। পাকসেনারা প্রচুর অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত থাকায় এবং আমাদের কাছে আক্রমণ প্রতিহত করার মত অস্ত্র না থাকায় পালিয়ে যাই।

জুলাই মাসে গড়ুইখালীতে রাজাকার ক্যাম্প আক্রমণ করি এবং প্রচুর ৩০৩ রাইফেল ও গুলি উদ্ধার করি। এই মাসের শেষের দিকে পাইকগাছা থানা আক্রমণ করি। পুলিশ বিনাশর্তে আমাদের কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং আমরা তাদের যাবতীয় অস্ত্রশস্ত্র দখল করি।

আশাশুনি থানার কেয়ারগাতি নামক স্থানে আমরা আর একটা নতুন শিবির স্থাপন করি। শিবির স্থাপনের কয়েকদিন পরেই গানবোটসহ পাকসেনারা শিবির দখল করার চেষ্টা করলে সেখানে বিপুল সংঘর্ষ হয়। অবশেষে আমরা পিছু হটতে বাধ্য হই। পাকসেনারা ও রাজাকাররা কেয়ারগাতি, জামালনগর, গোয়ালডাঙ্গা, ফকরাবাদ এই কয়টি গ্রাম সম্পূর্ণরূপে পুড়িয়ে দেয়। ইতিমধ্যে বিশ্বকবি শিবির, বঙ্গবন্ধু শিবির, শহীদ নারায়ণ শিবির, কবি নজরুল শিবির, শেরেবাংলা শিবির, সোহরাওয়ার্দী শিবির, শহীদ নাজমুল শিবির প্রভৃতি শিবির স্থাপন করি এবং

এ সকল শিবিরে ছেলেদের অস্ত্র প্রশিক্ষণ দিতে থাকি। এই সময় মুজিব বাহিনীর হাই কমান্ডের নির্দেশে ভারতের দেরাদুনে মুজিব বাহিনীর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি। তারপর প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বাংলাদেশের ভিতরে প্রবেশ করি।

১৯৭১-এর আগস্ট মাস থেকে আমরা চালনা ও মংলা বন্দরে বিদেশী শিপ, গানবোট ও খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলের লালশিরা জাহাজসহ কয়েকটা বার্জ ডুবিয়ে দিতে সক্ষম হই।

১৫ই সেপ্টেম্বর পাইকগাছা থানার রাড়ুলী ইউনিয়নের বাঁকা গ্রামে পাকসেনা ও রাজাকাররা মিলিতভাবে কয়েকটি গানবোটসহ আমাদের শিবির আক্রমণ করে। তারা অতি সন্তর্পণে এই আক্রমণ চালায়। দুই ঘন্টা গুলিবিনিময়ের পর আমরা পিছু হটি। এই যুদ্ধে কামরুল(খোকন), মালেক, এনায়েত, আইনুদ্দীন, শঙ্কর শহীদ হয়। অপর পক্ষে পাকসেনা ও রাজাকারদের বহু সৈন্য ও রাজাকার নিহত হয়।

১৭ই সেপ্টেম্বর আশাশুনি থানার গোয়ালডাঙ্গা নামক স্থানে রাজাকার ও প্যারামিলিশিয়া বাহিনীর সাথে এক সম্মুখসমর হয়। এই যুদ্ধে প্রায় ৪০/৫০ জন রাজাকার ও প্যারামিলিশিয়া নিহত হয় এবং আমরা ৭০/৭৫টি রাইফেল উদ্ধার করি। আমাদের পক্ষে এই যুদ্ধে মনোরঞ্জন শহীদ হয়।

খুলনা জেলার আশাশুনি থানার চাপড়ায় রাজাকারদের একটা শক্তিশালী ঘাঁটি ছিল। প্রত্যেক সপ্তাহে ১/২ বার আমরা এই ঘাঁটিতে আক্রমণ চালাতাম ও অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করতাম।

১৯৭১-এর অক্টোবরের মাঝামাঝিতে খুলনা জেলার তালা থানার মাগুরাতে একটা শিবির স্থাপন করি। ঐ মাসের শেষদিকে সূর্যাস্তের একটু আগে কয়েক গাড়ী মিলিটারী অতি সন্তর্পণে এসে আমাদের শিবির ঘেরাও করে। আমরা মিলিটারীর আক্রমণ প্রহিত করার চেষ্টা করলে তা ব্যাহত হয়। ফলে আমরা পিছু হটি। এই যুদ্ধে সুশীল, আকবর, বক্কার শহীদ হয়। পাকসেনারা চলে গেলে মাগুরায় এক কবরে ৩টি লাশ সমহিত করা হয়।

খুলনা জেলার পাইকগাছা থানার কপিলমুনিতে রাজাকার ও প্যারামিলিশিয়াদের একটা মজবুত ঘাঁটি ছিল। ইতিপূর্বে আমরা এই ঘাঁটি আক্রমণ করে ব্যর্থ হই। নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে আমাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করে ঐ ঘাঁটি আক্রমণ করি। ৭২ ঘন্টা দিবারাত্রি সমানে যুদ্ধ চলার পর উক্ত ঘাঁটির পতন হয়। এই যুদ্ধে মোট ১৫২ জন প্যারামিলিশিয়া, রাজাকার ও খানসেনা নিহত হয়। আমাদের পক্ষে গাজী, আনোয়ার (আনু) শহীদ হয় এবং খালেক, তোরাবসহ কয়েকজন আহত হয়।

ডিসেম্বরের ১২ তারিখে আমরা খুলনা শহরের ১০ মাইলের ভিতরে পৌঁছাই এবং ২/১ জন করে শহরের ভিতরে খোঁজখবরের জন্য ঢুকিয়ে দেই। ১৪ই ডিসেম্বর তারিখে খুলনা বেতারের মিলিটারী ঘাঁটির ওপর আক্রমণ চালাই। ইতিমধ্যে যশোর ক্যান্টনমেন্টের পতন হয় এবং সেখানকার যাবতীয় মিলিটারী খুলনায় এসে আশ্রয় নেয়। ইতিমধ্যে আমরা বেশ কয়েকবার খুলনা ঢুকতে গিয়ে ব্যর্থ হই।

১৬ই ডিসেম্বর সারারাত যুদ্ধ করার পর ১৭ই ডিসেম্বর সকাল নয়টায় আমরা খুলনা শহরে প্রবেশ করতে সক্ষম হই এবং খুলনা শহীদ হাদিস পার্কে আনুষ্ঠানিকভাবে আমি প্রথম স্বাধীন বাংলার পতাকা তুলে মুক্তিবাহিনীর অভিবাদন গ্রহণ করি।

স্বাক্ষরঃ স, ম, বাবর আলী
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সদস্য
২৪-৬-৭৩

সাক্ষাৎকারঃ ক্যাপ্টেন (অবঃ) নূরুল হুদা

মেজর জলিলকে ৯ নং সেক্টরের দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রাথমিক পর্যায়ে পাক ঘাঁটি শ্রীপুর,বসন্তপুর এবং কৈখালী দখলের জন্য তার বিপরীতে টাকী, হিঙ্গলগঞ্জ এবং শমসের নগরে মুক্তিবাহিনীর ঘাঁটি নির্মাণের পরিকল্পনা

নিলেন। তিনি প্রথমে টাকীতে হেডকোয়ার্টার স্থাপন করে পরে হিঙ্গলগঞ্জে আমার নেতৃত্বাধীন প্রথম বেইস ক্যাম্প স্থাপন করেন। পাকসেনাদের শক্ত ঘাঁটি ছিলো শংকরা শ্রীপুর, দেবহাটা, খানজী, উকসা এবং কৈখালী। আমি বসন্তপুর পাক ঘাঁটি আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিই। একই সময়ে টাকী বেইস থেকে শ্রীপুর পাক ঘাঁটি আক্রমনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। হাবিলদার সোবহান ইছামতী পেরিয়ে 'রেকী' করে সকল তথ্য সংগ্রহ করলেন।

১২/১৩ ই জুন রাতে আমি মুক্তিবাহিনীর একটি প্লাটুন নিয়ে পাক ঘাঁটির দিকে অগ্রসর হই। অপরদিকে ইছামতী পেরিয়ে হাবিলদার সোবহান এবং শাজাহানের নেতৃত্বে একটি করে প্লাটুন শ্রীপুর পাক ঘাঁটির দিকে অগ্রসর হয়। আমাদের এই দুটো দলই রাত ১২ টার পর অকস্মাৎ পাক ঘাঁটি আক্রমণ করে বসে। পাকসেনারা এই আক্রমণের জন্যে মোটেও প্রস্তুত ছিল না। তারা ভাবতেও পারেনি, এই দুর্যোগের রাতে প্রমত্তা ইছামতী নদী পেরিয়ে আমরা তাদেরকে আক্রমণ করতে পারি। আমার তীব্র আক্রমণের মুখে পাকিস্তানীরা চরমভাবে মার খায়। সংঘর্ষে ২০ জন পাকসেনা নিহত এবং কয়েকজন আহত হয়। আমরা ৫০টি রাইফেল, দুটি এল-এ-জি এবং বেশকিছু গোলাবারুদ উদ্ধার করি। অপরদিকে জনাব শাজাহানের নেতৃত্বে শ্রীপুরেও মুক্তিবাহিনীর আক্রমণ সফল হয়। পাকসেনাদের হতাহতের সংখ্যা জানা না গেলেও মুক্তিবাহিনী ৩৫ টি রাইফেল এবং বেশকিছু গোলাবারুদ উদ্ধার করে। দু'টি অপারেশনের কোন ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াই আমরা ভোর বেলা মূল ঘাঁটিতে ফিরে আসি।

জুলাই মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে আমি মুক্তিবাহিনীর ১৬০জন লোক নিয়ে পাক ঘাঁটি খাঞ্জি বি-ও-পি, আক্রমণ করি। রাত ১০টায় আমি আমার বাহিনী নিয়ে লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হই। আমার বাহিনীকে তিনটি কলামে বিভক্ত করি। ডান দিকে এটি কলাম নিয়ে আমি নিজে রইলাম। বামদিকের কলামটিতে লেঃ বেগ এবং হাবিলদার সোবহান রইলেন। অপর কলামটি 'কাটআফ' পার্টি হিসেবে থাকলো। বি-ও-পিতে পাকসেনাদের শক্তি ছিলো দুই প্লাটুন। আমাদের তিনটি কলামই যথাযথ স্থানে পৌঁছে গেলো। প্রথমে নায়েব সুবেদার গুফর ৩" মর্টারের সাহায্যে পাকিস্তানী অবস্থানের উপর গোলা নিক্ষেপ শুরু করেন। উভয় পক্ষের ব্যাপক সংঘর্ষ ৩০মিনিট স্থায়ী হয়। আমাদের তীব্র আক্রমণের মুখে পাকসেনারা পালিয়ে সাতক্ষীরা এবং দেবহাটার মধ্যস্থলে পারুলিয়া নামক স্থানে আশ্রয় নেয়। আহত অবস্থায় ৪ জন পাকসেনা বন্দী হয়। নিহতের সংখ্যা সঠিক জানা যায়নি। আমরা পাকসেনাদের কাছ থেকে ২" মর্টার,এস-এম-জি,৭৬২ চায়নিজ রাইফেল এবং বেশকিছু গোলাবারুদ ও রেশন-সামগ্রী উদ্ধার করি। এই বিজয়ে মুক্তিবাহিনীর সদস্যদের মনোবল বহু গুণে বৃদ্ধি পায়।

আমি হিঙ্গলগঞ্জে ঘাঁটি স্থাপনের কিছুদিনের মধ্যেই উকসা পর্যন্ত আমার ঘাঁটি বিস্তৃত করি। আগস্ট মাসের শেষের দিকে পাকসেনারা উকসা ঘাঁটি আক্রমণ করে। আমরাও প্রস্তুত ছিলাম। ফলে শেষ পর্যন্ত পাকসেনারা দারুণ ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। এই অপারেশন সম্পর্কে বাংলার মুক্ত এলাকা থেকে প্রকাশিত 'বিপ্লবী বাংলাদেশ' পত্রিকায় 'উকসা-গোবিন্দপুরে নয় ঘন্টা যুদ্ধ-গোবিন্দপুর মুক্ত' শিরোনামে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল।

২০ শে আগস্ট তারিখে আমি ১৫০ জন মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে শ্যামনগরে আক্রমনের জন্যে অগ্রসর হই। লেঃ বেগ, সুবেদার ইলিয়াস, নায়েব সুবেদার গফুর, হাবিলদার সোবহান, হাবিলদার আবদুল হক প্রমুখ মুক্তিযোদ্ধাগণও আমার সাথে ছিলেন। উকসা হেডকোয়ার্টার থেকে রওয়ানা হয়ে রাত দু'টায় আমরা শ্যামনগর শত্রুব্যূহের কাছাকাছি পৌঁছে যাই। শ্যামনগর ওয়াপদা কলোনীতে অবস্থানরত পাকসেনাদের একটি প্লাটুন ছিলো। পাকসেনাদের প্রতিরক্ষা অত্যন্ত সুদৃঢ়। আমি আমার বাহিনীকে তিনটি কলামে ভাগ করি এবং একটি কলামে আমি নিজে থাকি। সড়কের অপর পাশে একটি কলামের সঙ্গে রইলেন লেঃ বেগ। নায়েব সুবেদার আবদুল গফুর ও হাবিলদার সোবহান রইলেন অপর কলামে। আমাদের অস্ত্র ছিলো ৮টি এল-এম-জি এস, এম-জি ১২টি , ২" মর্টার ৩টি এবং অবশিষ্ট এস-এল-আর ও রাইফেল।

রাত দুটোর পরই নায়েব সুবেদার গফুর ২" মর্টার নিয়ে প্রথম পাক অবস্থানের উপর আঘাত হানতে শুরু করেন। এদিকে পাকসেনাদের প্রচন্ড বাধা অতিক্রম করে আমি ও লেঃ বেগ কিছুতেই সামনের দিকে অগ্রসর হতে পারছিলাম না। রাত ৪টার দিকে কালিগঞ্জ থেকে পাকসেনাদের আর একটি প্লাটুন নির্বিবাদে শ্যামনগর চলে আসে। উভয়পক্ষে প্রচন্ড সংঘর্ষ চলতে থাকে। দু'পক্ষেরই মারাত্নক ক্ষয়ক্ষতি হয়। শেষ পর্যন্ত আমাদের ত্রিমুখী আক্রমণের মুখে পাকসেনারা চরমভাবে মার খেয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। সকাল ৯ টায় শ্যামনগর আমাদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। সংঘর্ষে ৪ জন পাকসেনা নিহত এবং ৪ জন আহত অবস্থায় আমাদের হাতে বন্দী হয়। এই সংঘর্ষের পর শ্যামনগর থানা আমাদের নিয়ন্ত্রণে এলেও সুবেদার ইলিয়াসসহ ৮ জন মুক্তিযোদ্ধা এই যুদ্ধে শহীদ হন এবং ৬ জ কে পাকসেনারা ধরে নিয়ে যায়। ঐ দিন সকালে ২৫ জন রাজাকার আত্নসমর্পণ করে। আমরা শ্যামনগর থানায় স্বাধীন বায়লার পতাকা উত্তোলন করি। স্বাধীন বাংলা থেকে প্রকাশিত 'জয়বাংলা' পত্রিকার ২১ আগস্ট ১৯৭১-এর সংখ্যায় এ সম্পর্কিত সংবাদ পরিবেশন করা হয়েছিল।

ফ্রগম্যানের তৎপরতাঃ ৯ নং সেক্টরের ফ্রগম্যানরা নদীপথে তৎপরতা চালিয়ে বেশ সাফল্য অর্জন করতে থাকে। এইসব দক্ষ ফ্রগম্যানরা ভারতীয় তত্ত্বাবধানে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

ফ্রগম্যানদের ৩০ জনের একটি দলকে আসাদুল্লাহর নেতৃত্বে শমসেরনগর পাঠানো হয়। উক্ত দলটি মঙ্গলা ও চালনা বন্দরে পাকিস্তানী বাণিজ্যিক নৌকাহিনীর উপর হামলা চালানোর জন্যে প্রস্তুতি নিতে থাকে। অপর দল ক্যাপ্টেন জিয়ার নেতৃত্বে ত্রিকোণ দ্বীপে যেখানে পাকিস্তানীদের গোপন ঘাঁটি আছে বলে মনে করা হচ্ছিলো সেখানে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। প্রতিকূল আবহাওয়া এবং অন্যান্য বাস্তব অসুবিধার জন্যে 'ত্রিকোণ' দ্বীপে হামলা চালানো সম্ভব না হলেও, প্রথম দল চালনা এবং মঙ্গলাতে পরিকল্পনা অনুসারে সাফল্যের সথে আক্রমণ চালায়। এরপর সিদ্ধান্ত হলো, ১৬ই সেপ্টেম্বর হামলা চালানো হবে। চালনা বন্দরে তখন ৮ টি জাহাজ এলোমেলোভাবে নোঙ্গর করা ছিলো। এটি জাহাজের জন্যে দু'জন করে ফ্রগম্যান নির্দিষ্ট করা হলো এবং চারটি করে মোট আটটি 'লিম্পেট মাইন' প্রতি দলে দেয়া হলো।

সেপ্টেম্বরের ১৫/১৭ তারিখ ২টা ৩০ মিনিটে ১৬ জন ফ্রগম্যান পশুর নদীতে নেমে পড়ে। ১৪ জন ফ্রগম্যানকে রিজার্ভে রাখা হলো।রাত তখন ৪টা বেজে ৩০ মিনিট। দ্রুতগতিতে ১৬ জন ফ্রগম্যান ৮টি জাহাজে 'লিম্পেট মাইন' লাগিয়ে চলে আসে। ভোর ৫টা বেজে ৩০ মিনিট চালনা বন্দর থেকে গগনবিদারী আওয়াজ শোনা যায় অত্যন্ত সফল ঐ অভিযানে ৮টি জাহাজের মধ্যে সেদিন ৭টি জাহাজই ধ্বংস হয়েছিলো।

১৬ই অক্টোবর নৌবাহিনীর আলমের নেতৃত্বে চালনা বন্দরে আর এক বড় রকমের অভিযান চালানো হয়। এই অভিযানে ফ্রগম্যানরা চারটি জাহাজ ধ্বংস করেছিলো। জাহাজ চারটির মধ্যে বিশেষ করে 'লাইটনিং' এবং 'আল-মুরতজা'র ধ্বংসের কথা উল্লেখযোগ্য। এই অপারেশনে ফ্রগম্যান আনোয়ারের সাহসিকতা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়।

নৌবাহিনীর রহমতুল্লাহর নেতৃত্বে ফ্রগম্যানের অপর দল নভেম্বর মাসেও অত্যন্ত সফল অভিযান চালায়। রহমতুল্লাহ নৌবাহিনীর একজন দক্ষণ অফিসার।তাঁর আত্নত্যাগ, সাহসিকতা, নিরলস নিষ্ঠা এ দেশের মানুষ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে।

অক্টোবর মাসে ৯ নং সেক্টরের বেশ কয়েকটি তরুণ অফিসার যোগদান করেন। লেঃ মোহাম্মদ আলী, লেঃ আহসান উল্লাহ এবং লেঃ শচীন্দ্রের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। অফিসার তিনজন আমার নেতৃত্বে কালিগঞ্জ, পারুলিয়া প্রভৃতি স্থানের অভিযানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

কালিগঞ্জ অপারেশনঃ নভেম্বরের ২০ তারিখে কালিগঞ্জে পাকবাহিনীর সাথে একটি সংঘর্ষ হয়। কালিগঞ্জ ওয়াপদা কলোনীতে পাকসেনাদের একটি কোম্পানী অবস্থান করছিলো। এছাড়া ছিলো পশ্চিমা রেঞ্জার এবং বেশ

কিছু রাজাকার। আমি আমার বাহিনী নিয়ে হেডকোয়ার্টার উকসা থেকে রওনা হয়ে লক্ষ্যস্থলের নিকট এসে পৌঁছি। এই সময়ে একটি কলাম নিয়ে লেঃ আহসান উল্লাহ এবং নায়েব সুবেদার সোবহান শত্রুঘাঁটির কাছাকাছি এসে পড়েন। সাথে ছিলো মাত্র দু'টি প্লাটুন। ২০/২১ শে নভেম্বর ভোর ৫ টায় আমরা পাকসেনাদের উপর হামলা চালাই। মিত্রবাহিনীর ৩য় রাজপুত হিঙ্গলগঞ্জ থেকে আমাদেরকে আর্টিলারী সাপোর্ট দেয়। ভোর ৫টা থেকে সকাল ৭টা পর্যন্ত উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ চলে। এই দু'ঘন্টা স্থায়ী সংঘর্ষে কোন পক্ষেরই কোন হতাহতের সংবাদ পাওয়া যায়নি। তবে প্রায় ৪০ জন পাকসেনা মুক্তিবাহিনীর হাতে ধরা পড়ে। লেঃ আহসানউল্লাহ নিজেই ২২ জন পাকসেনাকে বন্দী করেন। নায়েব সুবেদার গফুর ও ৬জন খানসেনাকে বন্দী করেন। কালিগঞ্জ শত্রুমুক্ত হয়।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৯। ১১নং সেক্টরে সংঘটিত যুদ্ধের বিবরণ	বাংলা একাডেমীর দলিলপত্র	..........১৯৭১

সাক্ষাৎকারঃ লেঃকর্নেল(অবঃ) আবু তাহের
১০-৬-১৯৭৫

জুলাই মাসের ২৫ তারিখে বাংলাদেশের পথে ভারতে রওনা হই। আমার সঙ্গে মেজর জিয়াউদ্দিন. ক্যাপ্টেন পাটোয়ারী, মেজর মঞ্জুর ও তার স্ত্রী-ছেলেমেয়ে এবং ব্যাটম্যান রওনা হন। পথে নানা বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে আমরা ২৭শে জুলাই দিল্লী এবং আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে মুজিবনগর পৌঁছাই।

আগস্ট মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল এম, এম,জি, ওসমানী মেঘালয় ও তৎসংলগ্ন এলাকায় সরেজমিন যুদ্ধের অবস্থা অবলোকনের জন্য পাঠালেন।

পাকিস্তান থেকে আমরা যাঁরা পালিয়ে এলাম তাঁদের মধ্যে মেজর জিয়াউদ্দিনকে ১ম বেঙ্গল রেজিমেন্ট, মেজর মঞ্জুরকে ৮নং সেক্টরের, ক্যাপ্টেন পাটোয়ারীকে ১ম বেঙ্গল রেজিমেন্টের একটি কোম্পানী এবং আমাকে ১১নং সেক্টরের পরিচালনা ভার দেওয়া হয়।

সেনাবাহিনী প্রধানের নির্দেশে আমি আগস্টের ১২তারিখে মেঘালয় এসে পৌঁছাই। এই এলাকার মুক্তিবাহিনীর ছেলেরা ভারতীয় বাহিনীর কমান্ডে ইতিপূর্বেই যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিলো। কামালপুর ছিল পাকিস্তানী সেনাদের মস্ত ঘাঁটি।সিদ্ধান্ত নিলাম কামালপুর আক্রমনের।

১৫ই আগস্ট আমি নিজে মাত্র ১৫০ জন মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে সন্ধ্যার দিকে কামালপুর পাক ঘাঁটি আক্রমণ করি। আমাদের অস্ত্র বলতে ছিল এল-এম-জি, রাইফেল এবং কিছু স্টেনগান। আমাদের আক্রমণ দু'ঘন্টা স্থায়ী হয়।আমাদের আক্রমণে ১৫/১৬ জন পাকিস্তানী নিহত হয়। অপরদিকে মুক্তিযোদ্ধা আহত হলো ১৫ জন।

আমার আক্রমণের পূর্বে এই এলাকা কোন সেক্টরের আওতায় ছিল না। আমি সেনাবাহিনীর সদর দফতরে এই এলাকাকে একটি সেক্টরে পরিণত করার আবেদন করলে আবেদন মঞ্জুর হয়। আমার সেক্টরের নাম হলো ১১নং সেক্টর। কমাণ্ড আমাকেই দেয়া হলো।

ময়মনসিংহ এবং টাঙ্গাইল জেলা নিয়ে আমার সেক্টর গঠিত হয়। সেক্টরের দায়িত্ব নেবার পর সমগ্র এলাকাকে কয়েকটি সাবসেক্টরে বিভক্ত করি। সাবসেক্টরগুলো হলোঃ (১) মানকার চর (২) মহেন্দ্রগঞ্জ (৩) পুরাকাশিয়া (৪) ডালু (৫) বাগমারা (৬) শিববাড়ি (৭) রংড়া এবং (৮) মহেশখালী।

সমগ্র এলাকাতে অফিসারের তীব্র অভাব অনুভব করলাম। সেপ্টেম্বর মাসে আমাকে দু'জন অফিসার দেয়া হলো- (১) স্কোয়াড্রন লীডার হামিদুল্লাহ এবং (২) লেঃ মান্নান। এই সময় মেজর জিয়াউর রহমান তাঁর ব্রিগেড নিয়ে সিলেট এলাকাতে চলে যান। অফিসার দু'জনকে আমি দু'টি সাব-সেক্টরের দায়িত্ব দিলাম। মানকার চর সাব-সেক্টরের দায়িত্ব দায়িত্ব দিলাম স্কোয়াড্রন লীডার হামিদুল্লাহকে এবং মহেশগঞ্জ সাব-সেক্টরের দায়িত্ব দিলাম লেঃ মান্নানকে।

* পাকিস্তান স্পেশাল সার্ভিসেস-এ মেজর পদে কর্মরত থাকাকালে সেখান থেকে পালিয়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন।

সেক্টরের দয়িত্ব নেবার পর পরই প্রাথমিক পর্যায়ে মানকারচর থেকে ডালু পর্যন্ত সরাসরি আমার নিয়ন্ত্রনে নিয়ে আসি। অবশিষ্ট এলাকা ভারতীয় বাহিনীর ব্রিগেডিয়ার সান্ত সিংহের কমান্ডে থাকে। ব্রিগেডিয়ার সান্ত সিংহের হেডকোয়ার্টার ছিল তুরাতে। ট্রেনিং ক্যাম্পের প্রধান ও ছিলেন তিনি। সেক্টরে এসে লক্ষ করলাম মুক্তিযোদ্ধারা বিভিন্ন পাক পয়েন্টে বি-এস-এফ বাহিনীর নির্দেশে সরাসরি আক্রমণ পরিচালনা করছে। তৃতীয়তঃ বাহিনী বিশৃঙ্খল, বিপর্যস্ত। মুক্তিবাহিনীকে পুরোপুরি বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য এবং দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের জন্য বাহিনীকে পুনর্গঠিত করতে শুরু করলাম। সম্মুখসমর বাদ দিয়ে গেরিলা পদ্ধতিতে আক্রণ চালাবার নির্দেশ দিলাম। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে হত্যা না করে বন্দী করে নিয়ে আসা এবং মুক্তিবাহিনীর বি- এস- এফ ক্যাম্পে দমন নিষিদ্ধ ঘোষণা করলাম এবং যুদ্ধনীতির সাথে সাথে ছেলেদেরকে রাজনীতি- সচেতন ও করে তুলতে শুরু করলাম।

সেপ্টেম্বর মাসে পর্যন্ত আমার সে রে প্রায় বিশ হাজারের মত মুক্তিযোদ্ধা কাজ করছিল। সর্বমোট বাহিনীর মধ্যে তিন হাজার নিয়মিত এবং ১৭ হাজারের মত গণবাহিনী ছিল।

মুক্তক্ষেত্রে আমি নিয়মিত ও গণবাহিনীকে একত্রে অপারেশনে পাঠিয়েছি। অপারেশনের দৃষ্টিকোণ থেকে আমি মনে করি নিয়মিত ও গণবাহিনীকে একত্রে অপারেশনের দৃষ্টিকোণ থেকে আমি মনে করি নিয়মিত আবং গণবাহিনীকে পৃথক করে ফিল্ড অপারেশনে পাঠানো ঠিক নয়। যারা অল্প দিনের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছিল তাদেরকে পৃথকভাবে ফিল্ডে পাঠালে নিয়মিত বাহিনীর সঙ্গে থাকলে অভিজ্ঞতা তারা লাভ করতো সে অভিজ্ঞতা থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছিলো- আমি ঐ সব কারণে একটি মাত্র ফোর্স করলাম। আমি আরও সিদ্ধান্ত নিলাম নিয়মিত বাহিনী পুরোপুরি গড়ে না ওঠা পর্যন্ত গেরিলা পদ্ধতিতেই যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার।

সামরিক দিক থেকে ময়মনসিংহের চাইতে টাংগাইল অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ময়মনসিংহ রেখে টাংঙ্গাইল- জামালপুর হয়ে ঢাকা পৌঁছানো বেশী গুরুত্বপূর্ণ মনে করলাম। রংপুর এবং বগুড়া ৭নং সেক্টরের অধিনে থাকলেও যোগাযোগের সুবিধার জন্য ঐ সেক্টরের অনেক অপরেশন আমার মাধ্যমেই হয়েছে। আগষ্ট মাসেই টাঙ্গাইলের কাদের সিদ্দিকী আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং আমার মাধ্যমেই হয়েছে। আগষ্ট মাসেই টাঙ্গাইলের কাদের সিদ্দিকী আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং আমার সেক্টরের অধীনে আমার কমান্ডে থাকেন। ময়মনসিংহের ভালুকা এলাকাতে অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক মেজর অফিসারের দেশপ্রেম, সাহস ও কর্মনিষ্ঠা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণযোগ্য। সেপ্টেম্বর মাসেই ভারতীয় বাহিনীর ৯২ মাউন্টের ব্রিগেড আমার সাহায্যে আসে। ব্রিগেডের কমান্ডার ছিলেন ব্রিগেডিয়ার ক্লেয়ার। এই ব্রিগেডে তিনটি ইসফ্যান্টি এবং ২টি আর্টিলারী রেজিমেন্ট ছিল। এই বাহিনীতে কর্নেল শোডি একটি ব্যাটালিয়ন কমাণ্ড করতেন। এই ব্রিগেডটি আসায় আমার এবং আমার বাহিনীর সাহস, উদ্দীপনা ব্যাপকভাবে বেড়ে যায়। ভারতীয় অফিসারবৃন্দের সাহস, কর্মতৎপরতা এবং অমায়িক ব্যবহার আমাকে মুগ্ধ করে।

আমার আওতায় রৌমারী থানা বরাবরের জন্য মুক্ত ছিল। এখানে একটি মুক্তিবাহিনীর ট্রেনিং ক্যাম্প খুলি এবং ট্রেনিং দেওয়ার শুরু করি। নভেম্বর মাস পর্যন্ত সকলের হাতে অস্ত্র দেওয়া না গেলেও দশ হাজারের মত মুক্তিযোদ্ধা প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত হয়েছিল। এই থানাতে প্রশাসন ব্যবস্থা পুরোপুরি চালু হওয়ারও নির্দেশ দিয়েছিলাম। কিন্তু রাজনৈতিক নেতৃবর্গের কাদা ছোড়াছুড়ির ফলে পূর্ণ প্রশাসন ব্যাবস্হা চালু করা সম্ভব হয়নি।

মেজর জিয়াউর রহমান তাঁর ব্রিগেড নিয়ে চলে গেলে রৌমারী থানাকে মুক্ত রাখা বেশ মুশকিল হয়ে পড়ছিল। কারল পাক ঘাঁটি চিলমারী থেকে পাকিস্তানীরা যে কোন সময় এসে রৌমারীর উপর হামলা চালাতে পারে। আর তাই চিলমারী শত্রুমুক্ত করার পরিকল্পনা গ্রহন করলাম।

চিলমারী যুদ্ধঃ সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিকে প্রায় দুই ব্যাটালিয়ন মুক্তিযোদ্ধা এবং ভারতীয় মাউন্টেন ব্রিগেডের একটি সেকশন সঙ্গে নিয়ে অতর্কিত চিলমারী আক্রমণ করলাম। এখানে পাকিস্তানীদের দুটি কোম্পানী

ছিল-একটি বেলুচ রেজিমেন্টের, অপরটি মিলিশিয়া বাহিনীর। ব্যাপকভাবে উভয় পক্ষের সংঘর্ষে উভয় পক্ষের বেশ ক্ষয়ক্ষতি হয়। মুক্তিবাহিনীর ৪ জন নিহত এবং বেশকিছু আহত হয়। পাকিস্তানীদের ১০০ জন নিহত হয়।

অক্টোবর মাসের প্রাথমদিকে আরও পাঁচজন অফিসার পেলাম । তারা হলেন ৯১০ লেঃ কামাল (২) লেঃ আলিম (৩) লেঃ তাহের (৪) লেঃ মিজান এবং (৫) লেঃ হাশেম । লেঃ কামাল এবং লেঃ তাহেরকে ডালু সাবসেক্টরে, লেঃ হাশেমকে পুরাকাশিয়াতে এবং লেঃ মিজানকে মহেন্দ্রগঞ্জ সাবসেক্টরে কাজ করতে বলা হলো।

আমার হেডকোয়র্টারে কেবলমাত্র গরীব কৃষকদের নিয়ে একটি ট্রেনিং ক্যাম্প খুলি। প্রাথমিক পর্যায়ে ২৫০ জন কৃষক নিয়ে কাজ শুরু করি। এইসব কৃষক পরবর্তীতে যুদ্ধের ময়দানে ব্যাপকভাবে যে কোন সামরিক ট্রেইণ্ড সৈনিকের চাইতে দক্ষতা প্রদর্শন করেছিল। তার কারণ বোধ হয় কৃষকের অধিকাংশই ছিল পাকিস্তানীদের দ্বারা অত্যাচারিত। আর তাই তাদের বুকে জ্বলছিল প্রতিহিংসার আগুন।

অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি ডালুর বিপরীতে হালুয়াঘাটের দক্ষিণে পাকসেনাদের একটি শক্ত ঘাঁটি ভারতীয় আর্টিলারীর সাহায্যে আক্রমণ করা হয়। মুক্তিবাহিনীর তিনটি কোম্পানী যথাক্রমে লেঃ হাশেম, লেঃ কামাল এবং লেঃ তাহের, অপরদিকে ভারতীয় দুটি কোম্পানীর (রাজপুত বাহিনী) সহযোগিতায় আক্রমণে করা হলো। পাকিস্তানীরা একটি কোম্পানী নিয়ে পূর্ণ সামরিক সম্ভারে প্রস্তুত ছিল। আমাদের বাহিনী পাক ঘাঁটি দখল করলেও বেশীক্ষণ অধিকার করে থাকতে পারেনি। পিছন দিক থেকে পাকিস্তানীদের একটি ব্যাটালিয়ান তীব্রভবে আক্রমণ চালালে মুক্তি বাহিনী ‘পকেট’ ছড়ে চলে আসতে বাধ্য হয়।

অক্টোবর মাসের শেষের দিকে নেত্রকোনা এবং কিশোরগঞ্জের বিস্তীর্ণ হাওড় অঞ্চল আমাদের নিয়ন্ত্রনে চলে আসে। আমি চিন্তা করলাম যদি মূল হিসাবে কামালপুর, জামালপুর, টাঙ্গাইল এবং ঢাকাকে টারগেট করি, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই ময়মনসিংহের পতন হতে বাধ্য। তাই ঐ টারগেটকে সামনে রেখে আমার সামরিক তৎপরতা অব্যাহত রাখলাম।

অক্টোবর মাসের শেষের মাঝামাঝি থেকে কামালপুর, জামালপুর, বাহাদুরাবাদ ঘাট, বক্সীগঞ্জ এবং চিলমারীতে আক্রমণের তীব্রতা বাড়িয়ে দিই। পাকসেনারাও বিভিন্ন স্থান থেকে সৈন্য নিয়ে এসে ঐসব ঘাঁটিতে মোতায়েন করে প্রতিরক্ষা জোরদার করতে থাকে।

নভেম্বর মাসে মুক্তিবাহিনীর শক্তি সম্পর্কে আমি বেশ আশাবাদী হলাম। ভারতীয় সেনাবাহিনীর পর্যায়ে নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নিলাম। আমার ভাবনা অনুযায়ী নিয়মিত বাহিনীর একটি ব্রিগেড গঠনের অনুমতি চেয়ে সেনা দফতরে একটি আবেদন পাঠালাম। সেনাবাহিনী প্রধান আমার আবেদন প্রত্যাখ্যান করলেন। অথচ এই সময় গেরিলা বাহিনীকে নিয়মিত বাহিনীতে রূপান্তরিত করার উপযুক্ত সময় এসেছিল।

১৩/১৪ নভেম্বর ৫টি কোম্পানী নিয়ে ভোর ৩টা কামালপুর আক্রমণ করা হয়। মুক্তিবাহিনীর লেঃ মিজান, ক্যাপ্টেন মান্নান এবং মুক্তিযোদ্ধা সাঈদের তিনটি কোম্পানী এবং ভারতীয় বাহিনীর দুটি কোম্পানী মিলে আক্রমণ পরিচালনা করা হয়। ভারতীয় আর্টিলারী আমাদের সাহায্যে করে। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল কামালপুর আক্রমণ করে পাকিস্তানীদের হত্যা করা- কামালপুর নয়। আমাদের তীব্র আক্রমণে পাকসেনাদের ২টি কোম্পানী একজন মেজরসহ নিশ্চিহ্ন হয়। আমরা জয়ের আনন্দে অধীর। তখন সময় সকাল ৯টা। গুলির। আঘাতে আমি গুরুতররূপে আহত হই। আমার একটি পা নষ্ট হয়ে যায়। আমাকে সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এবং ভারতের বিভিন্ন হাসপাতালে দীর্ঘদিনের চিকিৎসায় আমি সুস্থ হয়ে উঠি। আমার চিকিৎসার ক্ষেত্রে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের আন্তরিকতা- সাহায্য- সহানুভূতি কোনদিন ভূলবার নয়। এমনকি ভারতের প্রধানমন্ত্রী ভারতরত্ন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী পুনা হাসপাতালে আমাকে দেখে নানা কুশল জিজ্ঞাসা করেন। বাংলাদেশ মুক্ত হওয়া পর্যন্ত আমি সেক্টরে ফিরে যেতে পারিনি। আমার অনুপস্থিতিতে স্কোয়াড্রন লীডার হামিদুল্লাহ সেক্টরের দায়িত্ব হাতে নেন।

বাংলাদেশের অভ্যন্তরের আমার এলাকায় সম্পূর্ণ নিজের প্রচেষ্টায় ভালুকা এলাকাতে মেজর আফসার, রৌমারী এলাকাতে সুবেদার আলতাফ এবং টাঙ্গাইল এলাকায় কাদের সিদ্দিকী প্রচুর নিজস্ব বাহিনী গড়ে তুলে পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে অপারেশন চালান।

বাংলাদেশের সামগ্রিক যুদ্ধকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়।

(১) সশস্ত্র গণঅভ্যুত্থানঃ যেখানে বাঙ্গালী ট্রপস যোগ দিয়েছিল- মার্চ, এপ্রিল। (২) দ্বিতীয় স্তরঃ গেরিলা যুদ্ধ শুরুর প্রস্তুতি- মে. জুন, জুলাই (৩) তৃতীয় স্তর: গেরিলা যুদ্ধ অব্যাহত থাকে। আমাদের গেরিলা ফোর্সকে নিয়মিত বাহিনীতে নিয়ে যাবার যে পর্যায় এসেছিল তা কাজে লাগানো হয়নি।

কয়েকটি অপারেশনের বর্ণনা

॥ চিলমারীঃ যুদ্ধের ইতিহাসে একটি বিস্ময় ॥

বিশাল ব্রহ্মপুত্রের অপর তীরে অবস্থিত চিলমারীর দুর্ভেদ্য শত্রুব্যূহে এক প্রচন্ড হানা দিয়ে আমরা শত্রুর বিপুল ক্ষতিসাধন করি। এই আক্রমণের মুক্তিবাহিনীর মূল আক্রমণ ভেবে সে এলাকায় বৃহৎ আকারের শত্রু সমাবেশ ঘটে। এধরনের আক্রমণ কে শুধুমাত্র দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন মিত্রবাহিনীর ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমণের কয়েকটি ঘটনার সঙ্গে তুলনীয়। এক্ষেত্রে সুশিক্ষিত কয়েক ডিভিশন ছাত্রীসেনা এবং স্পেশাল ফোর্স অংশগ্রহণ করেছিলেন। সে যুদ্ধের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়নে কয়েক ডজন জেনারেল অংশগ্রহণ করেছিলেন।

যুদ্ধের ইতিহাসে চিলমারী বন্দর আক্রমণ একটি উজ্জল ঘটনা। এই যুদ্ধ বাংলার সোনার ছেলেদের নিয়ে গঠিত আমার সেক্টরের প্রাইভেট আর্মি দ্বারা সংঘটিত হয়।

রৌমারীর মুক্তাঞ্চলে মাত্র ১৫ দিনের অনুশীলনপ্রাপ্ত এ সমস্ত ছেলের নিয়মিত খাবারের সরবরাহ ছিল না, হাতখরচ ব্যবস্থা ছিল না এবং শুধুমাত্র দখলীকৃত অস্ত্রের উপরই তাদের নির্ভর করতে হতো। কোন অনুমোদিত ট্রেনিং ক্যাম্পে অনুশীলনপ্রাপ্ত না হওয়ায় এসমস্ত মুক্তিযোদ্ধারা সেক্টর কমান্ডারের প্রাইভেট আর্মি হিসেবে পরিচিত ছিল। তাদের চিলমারী আক্রমণ পরিকল্পনায় দক্ষতা এবং সাহস ও নৈপুণ্যের সাথে তার বাস্তবায়নের বিষয় যুদ্ধবিদ্যার ছাত্রদের কাছে অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকে।

১১নং সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার হিসেবে যখন আমি দায়িত্ব গ্রহন করি তখন বেশ অনেকগুলো চরের সমন্বয়ে গঠিত বিশাল রৌমারী এলাকা মুক্ত ছিল। এর প্রতিরক্ষা আমাদের জন্য একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে দাড়িয়েছিলো, কারণ মুজিব নগর থেকে অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারকে আমরা সেখানে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলাম। মেজর জিয়ার (বর্তমানে মেজর জেনারেল) ব্রিগেডের দুটো বেঙ্গল রেজিমেন্ট এই মুক্তাঞ্চল প্রতিরক্ষার কাজে নিয়োজিত ছিল। শুধুমাত্র কোদালকাঠী চর ছাড়া ব্রহ্মপুত্রের পূর্বপারের সকল এলাকা মুক্ত ছিল। কোদালকাঠিতে শত্রুসৈন্যের অবস্থান স্থানীয় গ্রামবাসীদের জন্য ত্রাসের কারণ হয়ে দাড়িয়েছিলো। এ সকল শত্রুসৈন্য প্রায়ই পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোতে ঢুকে পড়ে গ্রামবাসীদের উপর অত্যাচার চালাতো।

ব্রহ্মপুত্রের পূর্বাঞ্চলকে সম্পূর্ণ শত্রুমুক্ত করার জন্য সুবেদার আফতাবের নেতৃত্বে দুই কোম্পানী মুক্তিযোদ্ধা সেপ্টেম্বরের প্রথম দিকের এক রাতে গোপনে কোদালকাঠিতে অনুপ্রবেশ করে এবং শত্রুব্যূহের মাত্র কয়েকশত গজ দূরবর্তী ঝাউবনে ট্রেঞ্চ খনন করে তাতে অবস্থান করতে থাকে। মুক্তিযোদ্ধাদের পরিখাগুলোর সামনেই শত্রুনিধনের উপযোগী বিস্তৃত খোলা জায়গা ছিল। আমাদের কৌশলের মূল উদ্দেশ্য ছিল, এই মক্তিযোদ্ধদের পরিখাগুলোতে উপস্থিতি টের পেয়ে যখন শত্রুসৈন্য তাদেরকে উৎখাত করার জন্য আক্রমণ চালাবে, তখন আক্রমণোদ্যত শত্রুসেনাদেরকে খোলা জায়গায় পেয়ে আমরা তাদের নিশ্চিহ্ন করবো।

পরের দিন ভোরে আমাদের প্রত্যাশা অনুযায়ী শত্রুর প্রচন্ড আক্রমণ ঘটে এবং তা ত্বরিতগতিতে প্রতিহত করা হয়। শীঘ্রই সেনাবাহিনীর দ্বিতীয় এবং তারপর তৃতীয় আক্রমণ ঘটে- সেগুলোও সাহসের সংগে মোকাবেলা করা হয়। নিধন এলাকা শত্রুসৈন্যের মৃতদেহ ভরে ওঠে। যে কজন শত্রুসৈন্য পরিখা পর্যন্ত এগুতে পেরেছিলো তাদের বয়নেট চার্জ করে হত্যা করা হয়। আমাদের অবস্থানের দুপ্রান্তে স্থাপিত মেশিনগান দুটি সেদিন আমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেন। মেশিনগান দুটি আড়াআড়ি গুলিবর্ষণে বেশির ভাগ শত্রুসৈন্য মারা পড়েছিল তৃতীয় আক্রমণে প্রতিহত করার পর মুক্তিযোদ্ধারা তাদের পরিখা থেকে বেরিয়ে আসে এবং শত্রুদের উপর মরণ আঘাত হানার জন্য এগিয়ে যায়। খুব অল্পসংখ্যক শত্রুসৈন্য অপেক্ষমাণ গানবোট পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

কোদালকাঠী আমাদের হস্তগত হলো। গ্রামবাসীদের মধ্যে দারুণ উল্লাসের সৃষ্টি হয় এবং মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্ব ও দক্ষতার উপর তাদের আস্থা বহুলাংশে বেড়ে যায়। যদিও তাদের সামর্থ্য ছিল সামান্য, তবুও মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য তারা রান্না করা খাবার এবং মিষ্টান্ন নিয়ে আসেন।

সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি মেজর জিয়া তার ব্রিগেড নিয়ে সিলেটের পথে ১১ নং সেক্টর ত্যাগ করেন। সেদিন আমরা সবাই বিষন্ন বোধ করছিলাম। সে সময় আমরা জামালপুর এবং টাংগাইল হয়ে ঢাকার পথে এগিয়ে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। শুধু যে আমাদের রণনীতি পাল্টাতে হলো তা নয়, রৌমারীর বিরাট মুক্তাঞ্চল রক্ষার দায়িত্ব আমাকে বিচলিত করে তুললো। আমার সেক্টরে কোন নিয়মিত বাহিনী রইলনা। আমাকে রৌমারীতে ১৫ দিনের শিক্ষাপ্রাপ্ত ছেলেদের উপর নির্ভর করতে হলো। এদের মধ্যে শতকরা মাত্র ২৫ জন অস্ত্রে সজ্জিত ছিলো। রৌমারীর প্রতিরক্ষার কাজে ভারতীয় বাহিনী পাঠাবার প্রস্তাব করেছিলেন ভারতীয় কমান্ডার। তার সে প্রস্তাব আমি বিনয়ের সাথে প্রত্যাখ্যান করি। বাংলার মাটি রক্ষা করবে বাংলার বীর ছেলেরাই- রৌমারীর প্রতিরক্ষাব্যূহ আবার ঢেলে সাজাতে হবে। নেতৃত্বের পুরো ভার পড়ল সুবেদার আফতাবের উপর। চওড়া কাঁধ আর লম্বা কোঁকড়ানো চুলের অধিকারী এই নির্ভীক জে-সি-ও সব সময়ই বীরত্ব এবং দৃঢ়তার প্রতীক ছিলো। আমি যখন পুরো পারিস্থিতি তাকে বুঝিয়ে বললাম সে উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে স্যালুট করলো এবং বললো, স্যার, পাকিস্তানীরা শুধুমাত্র সুবেদার আফতাবের মৃতদেহের উপর দিয়েই রৌমারীতে প্রবেশ করতে পারে। কিন্তু জেনে রাখবেন সুবেদার আফতাব মরবে না। এই বিপ্লবী নেতার মনোবল যে কত উপরে ছিল তা এই উক্তি থেকে বোঝা যায়। তখন থেকেই পরবর্তীকালের বিভিন্ন সময়ে দক্ষ সৈনিক, অস্ত্র এবং গোলাবারুদের অভাব পূরণের জন্য আমাকে যুদ্ধে কৌশলের আশ্রয় নিতে হয়েছে। ইতিমধ্যে পাকিস্তানীরা চিলমারী বন্দর থেকে গানবোটের সাহায্যে রৌমারীর মুক্ত অঞ্চলে প্রায়ই থাবা দিতে শুরু করেছে। কিন্তু শত্রুরা কোন সময়ই সদাজাগ্রত মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরক্ষাব্যূহ ভেদ করতে সক্ষম হয়নি। রৌমারীর মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্রে সজ্জিত করাটা আমাদের আশু কর্তব্য হয়ে দাঁড়ালো এবং আমি সব সময় চাইতাম তারা শত্রুঅস্ত্রে সজ্জিত হোক এবং অস্ত্র দখলের জন্য আমার চিলমারী বন্দরকে বেছে নিলাম।

চিলমারী আক্রমণের পেছনে আরো কারণ ছিল নেতা আবুল কাশেম এবং তার সহযোগীদের নেতৃত্বে সেখানে বাংলাদেশ বিরোধী কার্যকলাপ বৃদ্ধি পেয়েছিলো। চিলমারীতে অবস্থানরত পাকবাহিনীর উপর আঘাত হানাটা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ালো, তা যতই বিপদজ্জনক হোক না কেন। এবাবেই চিলমারী আক্রমণের পরিকল্পনা রূপ পেলো।

ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিম তীরে অবস্থিত চিলমারী একটি নদীবন্দর। চিলমারীর কয়েক মাইল দক্ষিণে তিস্তা নদী ব্রহ্মপুত্রের সাথে মিলিত হয়েছে। নদীপথ ছাড়াও চিলমারী রেল ও সড়ক দ্বারা যুক্ত। চিলমারিতে পাকবাহিনীর যাতাযাতের জন্য রেল এবং নদীপথ উন্মুক্ত ছিল। আমার অক্লান্ত গোয়েন্দা অফিসার ওয়ারেন্ট অফিসার শফিউল্লা শত্রু সম্পর্কীয় খবরাখবর সংগ্রহে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি শত্রুসৈন্যের সঠিক অবস্থানসহ চিলমারীর বিস্তারিত এবং হুবহু মাটির নকশা তৈরী করে ফেললেন। চিলমারীতে তখন পাকবাহিনীর

দুই কোম্পানী নিয়মিত সৈন্য এবং দুই কোম্পানী মিলিশিয়া অবস্থান করছিলো। তারা চিলমারীর ওয়াপদা ভবন, জোরগাছ, রাজভিটা, থানাহাট পুলিশ স্টেশন, বলবাড়ী রেলওয়ে স্টেশন এবং পুলিশ স্টেশন সংলগ্ন রেলওয়ে ব্রীজে মোতায়েন ছিল। তাদের সাথে ছিল কুখ্যাত ওয়ালী মাহমুদ ও পাচু মিয়ার নেতৃত্বে গড়ে ওঠা বড় আকারের এক রাজাকার বাহিনী।

শত্রুকে প্রচণ্ড আঘাতে হানার জন্য আমাদের দরকার ছিল একই সময়ে বিভিন্ন শত্রুসৈন্যদের আক্রমণ করা এবং স্ব অবস্থানে তাদের আটক রাখা যাতে করে তার একে অপরের সাহায্যে বিশেষ করে চিলমারীতে সাহায্যকারী শত্রুসেনা এগিয়ে আসতে না পারে। সেজন্য চিলমারীর বেশ পেছনে রেল এবং সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়ার জন্য একটি দল পাঠানোর প্রয়োজন ছিল। এ অভিযানের সাফল্যের চাবিকাঠি নিহিত ছিল শত্রুর অজ্ঞাতে অতর্কিত আক্রমণের উপর। এক বিরাট বাহিনীর পক্ষে সকলের অগোচরে প্রায় ৩২ মাইল প্রশস্ত ব্রক্ষ্মপুত্র পাড়ি দেয়া সহজ ব্যাপার ছিল না। এছাড়া মূল আক্রমণকে সমর্থন দেয়ার জন্য যে চারটি দূরপাল্লার কামান আমাদের কাছে ছিল সেগুলো নিকটবর্তী এক চরে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন ছিল। শত্রু সম্পর্কে বিভিন্ন খবর সংগৃহীত হলো। প্রস্তুতি পর্ব সম্পন্ন হলো। বিভিন্ন অবস্থানের শত্রুদের উপর একই সাথে আঘাত হানার জন্য বিভিন্ন সময়সূচী আমরা পুংখানুপুংখভাবে পরীক্ষা করে দেখলাম। এই অভিযান বিফল হয়ে যাওয়ার একটিমাত্র সম্ভাবনা ছিল, সেটি হচ্ছে যদি কোন অতিউৎসাহী মুক্তিযোদ্ধা আক্রমণ মুহূর্তের পূর্বেই উত্তেজনাবশতঃ কিছু করে বসে।

অক্টোবরের ৯ তারিখে সড়ক এবং রেল যোগাযোগ বিচ্ছিন্নকারী দলটি প্রত্যেকের নিদিষ্ট কাজের নির্দেশ নিয়ে সন্ধার পর রওনা হলো। গোপন ও অতি সন্তর্পণে এই দলটিকে উলিপুর এবং চিলমারীর মাঝামাঝি স্থানে ঘাঁটি স্থাপন করে মূল আক্রমণ শুরু না হওয়া পর্যন্ত আত্মগোপন করে থাকতে হবে। ১১ই অক্টোবর মূল বাহিনী চিলমারীর উদ্দেশ্যে রওনা হলো। অনেকগুলো বেশী নৌকা তাদের বহন করে এগিয়ে চললো। একসাথে এতগুলো দেশী নৌকার ব্যবস্থা করা ও তাদের বিভিন্ন অবস্থান থেকে গোপনে একই সময়ে শত্রুঘাঁটির কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া সে সময়ে বড় কঠিন ব্যাপার ছিলো। কমান্ডার আবুল কাসেম চাঁদ, ঢাকা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এ ব্যাপারে এগিয়ে এলো আর সমস্ত ব্যাবস্থা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করলো। রাতের অন্ধকারে দূরপাল্লার কামানগুলো চালিয়াপাড়ায় স্থাপন করা হলো। এই ভারী অস্ত্রগুলোকে নৌকা থেকে নামিয়ে বালুচরের উপরদিয়ে টেনে নিয়ে নির্ধারিত স্থানে স্থাপন করা হলো। এই ভারী অস্ত্রগুলোকে নৌকা থেকে নামিয়ে বালুচরের উপর দিয়ে টেনে নিয়ে নির্ধারিত স্থানে স্থাপন করা যে কি বিপজ্জনক এবং কঠিন ছিল তা লিখে বুঝানো যাবে না।

স্বাধীনতা যুদ্ধের আর এক অসমসাহসী সৈনিক নায়েব সুবেদার মান্নান। তার উপর ন্যস্ত ছিলো ওয়াপদা ভবন ধবংস করার দায়িত্ব। ওখানে পাকিস্তানী অফিসাররা প্রমোদ বিলাসে মত্ত থাকতো। আমরা মাত্র দুটি রকেট লাঞ্চার তার দলকে দিতে পেরেছিলাম। কমান্ডার চাঁদের নেতৃত্বে বিভিন্ন দল গোরগাছা, রাজভিটা, তানাহাট পুলিশ স্টেশন এবং ব্রীজ অবস্থান আক্রমণের জন্য নিদিষ্ট হলো। এদের অর্ধেকের সাথে ছিলো ৩০৩ রাইফেল, কিছু পুরোনো স্টেনগান আর বাকিদের কাছে শুধুমাত্র গ্রেনেড। মূল বাহিনীর এই ছোট ছোট দলগুলোর নেতৃত্ব দিচ্ছিলো খালেদ ডুল, সুলায়মান, নূর আহম্মেদ আলো আর নজরুল। বলবাড়ি পুলিশ স্টেশনের জন্য কোন দল পাঠানো হয়নি, কারণ আমাদের জানা ছিল শত্রুসেনারা রাতে সে অবস্থান ছেড়ে চলে আসতো। আক্রমণ পরিচালনার জন্য চালিয়াপাড়ায় আমি আমার হেডোকায়ার্টার স্থাপন করলাম। চিলমারীর দুই মাইল দক্ষিণে গাজীর চরকে আক্রমণকারী বাহিনীর আক্রমণের পূর্ব মুহুর্তের ঘাঁটি হিসেবে বেছে নেয়া হলো।

গভীর রাত। ১টা সময় খবর এলো আমাদের সম্পূর্ণ বাহিনী আক্রমণস্থলের নিকটবর্তী ঘাঁটিতে পৌঁছে গেছে এবং যার যার নিদিষ্ট আক্রমণস্থলের উদ্দেশ্যে যাত্রার প্রস্তুতি নিচ্ছে। গ্রাউন্ড সিট বিছিয়ে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম এবং সাড়ে তিনটায় আমাকে জানানো হলো কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার বাহিনী শত্রুসেনার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। নানা ভাবনা সেই স্বল্প সময়টুকুতে আমার মনে ভীড় জমালো। হাতিয়ারের অভাব, অল্পবয়সী ছেলেরা-এরা কি পারবে এই বিরাট আক্রমণে সাফল্য লাভ করতে? কি হবে ওখানকার জনসাধারণের, যখন

আমরা চিলমারী ছেড়ে চলে আসবো? রাত খুব কাছে থেকে রকেট লাঞ্চার দিয়ে ওয়াপদা ভবনের উপর আঘাত হানার সাথে সাথে সর্বাত্মক আক্রমণ শরু হলো। সমস্ত শত্রুঘাটিতে ধবংশযজ্ঞ নেমে এলো। দরপাল্লার কামান গুলো শত্রুসেনাদের গানবোটগুলোর সম্ভাব্য অবস্থানের উপর গোলাবর্ষণ করে চলেছে। কামানের গোলা, গ্রেনেড, মেশিনগান আর ছোট অস্ত্রের আওয়াজে রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে যেতে লাগলো। সকাল ৬টার মধ্যেই গোরগাছা. রাজভিটা, পুলিশ স্টেশন ও ব্রীজের অবস্থানগুলো আমাদের আয়ত্তে আসলো, কিন্তু ওয়াপদা ভবনের আশেপাশের চলাচল আমাদের নজরে পড়লো। আমাদের একমাত্র নির্ভর রকেট লাঞ্চার দুটি শত্রু বাংকারগুলিকে নিমূল করতে পারলো না বটে, তবে ওয়াপদা ভবনে অবস্থানরত প্রচুর শত্রুসেনা খতম করতে সক্ষম হলো। শুধুমাত্র এ দুটি অস্ত্রের উপর নির্ভর করায় আমরা শত্রুর এই অবস্থানটি দখল করতে সক্ষম হলাম না। যেহেতু সম্পুর্ণভাবে শত্রুকে আকড়ে থাকতে হলো। কারন একমাত্র রাতের অন্ধকারেই সফল পশ্চাদপসারণ সম্ভব। সকাল ৮ টা। আমার কাছে কবর এলে চাঁদ আরে সাহায্য চাচ্ছে। মনে হলো আবস্থা সংকটজনক। সে লক্ষ করছে বলবাড়ি রেল স্টেশন থেকে শত্রুসেনারা নতুন আক্রমনের প্রস্তুতি নিচ্ছে।আমার ছোট্ট স্পীডবোটটি নিয়ে নদী পার হয়ে চালিয়াপাড়া থেকে গাজীর চরে গিয়ে পৌছলাম। সেখানে গিয়ে দেখলাম স্কোয়াড্রন লিডার হামিদুল্লাহ বন্দীদের কাছ থেকে খবর বার করার চেষ্টা করছেন। তার ব্যবস্থাপনা মন্দ ছিল না। যাওয়ার সাথে সাথে এক মগ গরম চা পেলাম। আরও জানলাম চাঁদকে সাহায্য করার মত কোন বাড়তি দল রাখা হয়নি। তৎক্ষনাথ আমি আমার ছোট্ট রক্ষাকারী বাহিনী নিয়ে থানা অভিমুখে এগিয়ে গেলাম। ভাগ্যক্রমে আমাদের একটি এল- এম-জি ছিল। এই অস্ত্রটি সেদিন আমাদের ভীষণ উপকারে আসে। নানাদিক থেকে মাঝে- মধ্যেই গোলাগুলি চলছিলো। গ্রামবাসীরা যে যেদিকে পারছিলো দৌড়াচ্ছিল। কেউ কেউ জয় বাংলা জয় বাংলা বলে চিকৎকার করছিলো। থানার এক মাইলের মধ্যে চলে এসেছি, এমন সময় একটি ফেলে যাওয়া গরুর গাড়ী রাস্তার, মাঝখানে পেলাম। গাড়ীতে শুয়ে ছিল একজন মেয়েলোক। একটি হাত ভাংগা, বুকের স্তন নেই। পাকিস্তানী মর্টার শেলের শিকার। তার বাচ্চা ছেলেটি মায়ের রক্তে মাখা, বসে বসে কাঁদছে। এই নিস্পাপ শিশুটি তার মাকে ছেড়ে যেতে পারেনি। একজন গ্রামবাসীকে ডেকে জানলাম মেয়েটিকে হাসপাতালে নেয়া হচ্ছিলো। থানার পাশই হাসপাতাল। তার মাকে ছেড়ে যেতে পারেনি। আর ঐ দিক থেকেই গুলি আসছে। মাই মাকে ছেড়ে সবাই পালিয়েছে। আমি ঐ লোকটিকে গাড়ী চালিয়ে আমার সাথে আসতে বললাম। আমার সাথে থাকায় সে সাহস ফিরে পেলো। হাসপাতালে যখন পৌছলাম গুলি বর্ষণ তখন আরো তীব্রতর হয়েছে ঝাঁকে ঝাঁকে মেশিনগানের গুলি হাসপাতালের দেয়ালে আঘাত হানছে। ভাগ্যক্রমে হাসপাতালের ভেতর ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায় ডাক্তারকে পেলাম। আমি সেই হতভাগ্য মেয়েলোকটির ভার ডাক্তারের উপর ছেড়ে দিলাম,- জানি না আজ সে বেঁচে আছে কিনা। হাসপাতাল থেকে বের হয়েই দেখি চাঁদ দৌড়ে আসছে আমার দিকে। সে কাঁদছিলো। আমাকে জানালো, তার দলের ছেলেরা ৭৬ টি দখল করা অস্ত্র এবং প্রচুর গোলাবারুদ ফেলে থানার অবস্থান ছেড়ে চলে এসেছে। তাকে উৎসাহ দিয়ে আমরা এগিয়ে গেলাম পূর্ব অবস্থান পূর্ণদখলের জন্য। মেশিনগানের এক ঝাঁক গুলি আমাদের উপর দিয়ে চলে গেল। আমি দেখতে পাচ্ছিলাম পাকিস্থানী সৈন্যরা প্রায় ১০০ গজ দুরে রেললাইনের উপর অবস্থান নিয়েছে। বাঁশঝাড়ের আড়ালে আড়ালে আমরা এগিয়ে এবং শত্রুবাহিনীর একপাশে আমার রক্ষাকারী বাহিনীর এল-এম-জি টি স্থাপন করলাম। একনাগাড়ে গুলি করার পর কিছু পাকিস্থানী সেনা পড়ে গেল। বাকীরা তাদের অবস্থান ছেড়ে রেললাইনের উপরে চলে গেল। ত্বরিতগতিতে আমরা রেললাইন দখল করলাম। গুলি চালিয়ে আরো কিছু পলায়নপর পাকিস্তানী সৈন্য খতম করা হলো। কিছুক্ষন পরই বলবাড়ি স্টেশনের অবস্থান থেকে শত্রুসৈন্যরা আমাদের উপর গুলি চালালো। আমরা পিছু হটে পুলিশ স্টেশনে অবস্থান নিলাম। সেখানে পাকিস্থানীদের তৈরী পরিখার অভাব ছিল না। দখল করা অস্ত্র এবং গোলাবারুদ গাজীরচরে পাঠানো হলো। একটি ঘরে আমি দশ বস্তা চাল ও দুই বস্তা গম পেলাম। চেয়েছিলাম এগুলো গ্রামবাসীরা নিয়ে যাক, কিন্তু নেয়ার মত কেউ সেখানে ছিল না। বেশ কিছুক্ষণ পর আমি একজন বুড়ো লোককে পেলাম। আমি তাকে দরকার থাকলে কিছু চাল নিতে বললাম।

কিছুক্ষণের মধ্যেই চারদিক থেকে লোকজন আসতে লাগলো। মনে হচ্ছিলো তারা যেন মাটি ফুঁড়ে বের হচ্ছে। হট্টগোল শুরু হয়ে গেলো। ছেলে, বুড়ো, পুরুষ, মেয়েলোক সবাই কাড়াকাড়ি করছে যা পাচ্ছে তুলে নেয়ার জন্য। কয়েক মিনিটের মধ্যেই থানা ও থানার পাশের পুলিশের বাসাগুলো খালি হয়ে গেলা সে দৃশ্য ভোলার নয়।

রাতের অন্ধকার নেমে আসার সাথে সাথে আমি কিছুসংখ্যক মুক্তিযোদ্ধা রেখে প্রধান দলটি নিয়ে গাজীরচরে চলে এলাম। কিছু সংখ্যক মুক্তিযোদ্ধা রেখে আসার উদ্দেশ্য ছিলো যাতে পাকিস্তানীরা আমাদের পিছু নিতে না পারে। যদিও আমরা ওয়াপদা ভবনের বাংকারগুলো এবং বলবাড়ি রেলওয়ে স্টেশনের অবস্থান সম্পুর্ণ ধবংস করতে পারিনি, তবুও পকিস্তানী সেনাবাহিনী দারুন ভাবেক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। অতি নিকট থেকে সম্পুর্ণভবে ঘেরাও হয়েও শত্রুসৈন্যরা আত্মসমর্পন করেনি। সত্যিই তারা বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করছিলো। আমরা জানতাম আমাদের চলে আসার পর ঐ এলাকার জনসাধারণের উপর পাকিস্তানীরা কি ভয়াবহ অত্যাচার চালাবে! কিন্তু আমাদের উপায় ছিল না। পেছনে ব্রহ্মপুত্র নদীর বিরাট বাধা নিয়ে আমাদের পক্ষে দখল করা অবস্থান আঁকড়ে থাকা সম্ভব ছিলো না। এই আক্রমণের উদ্দেশ্যই ছিলো শত্রুকে অকস্মাৎ আঘাত হানা, যত বেশী সম্ভব শত্রুসেনা খতম করা, তাদের মনোবল ভেঙ্গে দেওয়া, অস্ত্র ও গোরাবারুদ দখল করা। আমরা সম্পূর্ণ সফল হয়েছিলাম।

আমরা চলে আসার দু'দিন পর পাকিস্তানীরা ঐ এলাকার নিরীহ, নিরস্ত্র গ্রামবাসীদের উপর নির্মম অত্যাচার চালায়। নিরস্ত্র জাতি এমনভাবে অত্যাচার সহ্য করেই বাংলার স্বাধীনতা এনেছে।

ওয়ারেন্ট অফিসার সফিউল্লার নেতৃত্বে যোগাযোগ বিচ্ছিন্নকারী দলটি অভূতপুর্ব সাফল্যের সাথে তাদের কাজ সম্পন্ন করে। তারা শুধু সড়ক এবং রেলপথের ব্রীজগুলো ভেঙ্গে দিয়ে ক্ষান্ত হয়নি, জায়গায় জায়গায় রেলওয়ে লাইন এবং রাস্তা কেটে তারা সমান করে দেয়। বেশ কিছুদিনের জন্য এই যোগাযোগ ব্যবস্থা পাকিস্থানীরা ব্যবহার করতে পারেনি।

১৩ই অক্টোবর। বিপুলসংখ্যক যুদ্ধবন্দী এবং প্রচুর অস্ত্র, গোলাবারুদ নিয়ে আমরা রৌমারী ফিরে এলাম। জনগনের আদালতে ওয়ালী মাহমুদ ও পাচু মিয়ার বিচার হলো। দেশপ্রেমিক হত্যা, রাজাকার বাহিনী সংগঠন এবং লুন্ঠনের অপরাধে তারা দোষী সাব্যস্ত হয় এবং তাদের মৃত্যুদন্ড দেওয়া হলো। বহুসংখ্যক বাঙ্গালী রাজাকার মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করে। ওয়ারেন্ট অফিসার সফিকউল্লাহ, নায়ের সুবেদার মান্নান, চাঁদ, দুলু, আলো সুলেমান, নজরুল এবং আরো অনেকের বীরত্ব এবং ত্যাগের কথা কোনদিনই ভোলা যাবেনা। এরাই বাংলার সোনার ছেলে।

॥ মুক্তিযোদ্ধাদের অবদান ও কামালপুর অভিযান ॥

পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এসে ১১ নং সেক্টরের দায়িত্ব নিয়ে একটা জিনিস দেখে বার বার অবাক হয়েছি। দেখেছি প্রত্যয় আর দৃঢ়তায় সকালের সূর্যের মত হাজার তরুণ মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেবার জন্য নির্বাচিত না হতে পেরে অতৃপ্তির ব্যথা নিয়ে ফিরে গেছে। তারপর যুব শিবিরে অপেক্ষা করেছে দিনের পর দিন, কখন জীবন দেবার ডাক আসে। মহেন্দ্রগঞ্জ,মাইকারচর, ডালুও অন্যান্য সীমান্ত এলাকায় ওরা আমাকে ঘিরে ধরেছে। সবারই এক প্রশ্ন, আর কতদিন অপেক্ষা করবো? একজন সৈনিক হিসেবে আমি বুঝতে পারি কখন মানুষ ভয়াবহ যুদ্ধকে সহজভাবে গ্রহণ করতে স্বতঃস্ফুর্তভাবে যুদ্ধে যোগ দেয়ার দৃষ্টান্ত আর নেই। গণচীন থেকে শুরুকরে ইন্দোচীনের স্বাধীনতা যুদ্ধ, কোনটাই বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধদের মত এ দৃষ্টান্ত রাখতে পারেনি। চীন ভিয়েৎনাম, কিউবাতে মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত হয়েছে, ব্যাপক রাজনৈতিক ও সামরিক প্রস্ত্ততির সংগে। সম্পূর্ণরূপে রাজনৈতিক ও সামরিক নেতৃত্ব ছাড়া বাংলার তরুণরা যেভাবে মুক্তিযুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়েছে, যুদ্ধক্ষেত্রে শৌর্য ও আত্মত্যাগের পরিচয়

দিয়েছে তার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর কোন মুক্তিযোদ্ধের ইতিহাসে নেই। মুক্তিযোদ্ধারা এই ইতিহাস সৃষ্টি করেছে অন্য কেউ নয়। যদি কোন দল বা গোষ্ঠী একভাবে মুক্তিযোদ্ধ তথা জনগনের এই বিজয়কে নিজের বলে মনে করে তা হবে অবৈধ, মিথ্যা। পাকিস্তানী উপনিবেশিক শক্তির শোষণ এত তীব্র ছিল যে বাঙ্গালী জাতির জাতীয়তাবোধ মুক্তিযুদ্ধের প্রধান কারন হবার প্রখরতা অর্জন করেছিল। জাতীয় শোষণ থেকে মুক্তি পাবার তীব্র আকাঙ্খা আদেশের জনগন তথা তরুণ সমাজকে মুক্তিযুদ্ধ শুরু করার শক্তি যুগিয়েছে। এ কৃতিত্ব জনগণের আর জনগণের যোদ্ধা তরুন সম্প্রদাযের নিজস্ব ।

আগষ্ট মাসে ১১ নং সেক্টরের কার্যভার গ্রহণ করার পর পাকিস্থানীদের ঘাঁটির উপর আমি কয়েকটি আক্রমণ পরিচালনা করি। এই আক্রমণগুলো চালাবার ফলে পাকিস্তানী রণনীতি সম্বন্ধে আমাদের একটি সুস্পষ্ট ধারনা জন্মে এবং সংগে সংগে মুক্তিযোদ্ধাদের দোষ গুণগুলোও প্রকাশ পায়। পাকিস্তানীরা সে সময় মুক্তিযোদ্ধাদের সম্ভাব্য প্রবেশপথগুলো বন্ধ করার জন্য সীমান্তে শক্তিশালী ঘাঁটি গড়ে তোলে। এই ঘাঁটিগুলোকে সুরক্ষিত করার জন্য তারা ব্যাপকভাবে কাঁটাতারের বেড়া ও মাইন ব্যবহার করে। ঘাঁটিগুলোর ভিতর মজবুত বাংকার তৈরী করা হয়, যা তাদেরকে কামানের গোলা থেকেও বাঁচাতে পারে। ঘাঁটিগুলোতে নিয়মিত পাকিস্তানী সামরিক বাহিনী ছাড়াও বেশ কিছুসংখ্যক রাজাকার ও আলবদর রাখা হয়। সীমান্তবর্তী এই সুরক্ষিত ঘাঁটিগুলো ছাড়াও সড়ক ও যোগাযোগ কেন্দ্রগুলোকে রক্ষা করার জন্য বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন স্থানে পাকিস্তানী ঘাঁটি গড়ে ওঠে। দেশের অভ্যন্তরে গড়ে ওঠে। দেশের অভ্যন্তরে গড়ে ওঠা ঘাঁটিগুলো ছিল অপেক্ষাকৃত কম সুরক্ষিত।

কামালপুর ছিল উত্তর সীমান্তে পাকিস্তানীদের একটি সুরক্ষিত ঘাঁটি। আগস্ট মাসের মাঝামাঝি এই ঘাঁটির উপর আমরা দু'বার প্রত্যক্ষ আক্রমণ চালাই। দু'বারই মুক্তিযোদ্ধরা ঘাঁটির অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়, তথাপি তারা ঘাঁটিটি দখল করতে ব্যর্থ হয়। মুক্তিযোদ্ধারা যখনই ঘাঁটিতে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছে সে সময়ই তাদের উপর পাকিস্তানীদের ব্যাপক ১২০ মিলিমিটার মর্টারের গোলা বর্ষিত হয়েছে। বকশীগঞ্জের পাকিস্তানী অবস্থান থেকে এই মর্টারের গোলা ছোঁড়া হতো। শত্রুসেনারা মজবুত বাংকারের ভেতর থাকত বলে এই আক্রমণে তাদের কোন ক্ষতি হত না এবং অবস্থা বেগতিক দেখলেই তারা নিজ অবস্থানের উপর নিজ মর্টার দ্বারা গোলাবর্ষণ করাতো । ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে পাকিস্তানীরা এই রণনীতির কথা চিন্তা করে এবং মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে তা ব্যাপকভাবে কাজে লাগায়। কামালপুর ঘাঁটির উপর দু'টি আক্রমণ চালিয়ে আমি মুক্তিযোদ্ধাদের দোষগুলোকে সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করি।

আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের দুর্বলতম দিক ছিল- রাজনৈতিক ও সামারিক নেতৃত্বের অভাব। যে রাজনৈতিক নেতৃত্ব মুক্তিযোদ্ধাকে মুক্তিযোদ্ধের প্রয়োজনীয়তা ও তার মূল লক্ষ্য অন্তরঙ্গ সাহচর্যের মাধ্যমে শিক্ষাদেয় তা কোন সময়ই ছিল না। রাজনৈতিক নেতৃত্বের অভাবে দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে কিভাবে গণসংযোগ করতে হয় তা কোন সময়ই ছিলনা। এ জন্য অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে, মুক্তিযোদ্ধাদের আচরণে তারা জনসমর্থন হারিয়েছে। দ্বিতীয়তঃ সামরিক নেতৃত্বের দুর্বলতা। কয়েক সপ্তাহের ট্রেনিংপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্য থেকে একজনকে নির্বাচিত করা হতো নেতা। প্রায় ক্ষেত্রেই সামরিক জ্ঞানের অভাবে সংকট মুহূর্তে সে নেতৃত্ব দিতে ব্যর্থ হতো। অবশ্য এই অল্প সময়ে সামরিক নেতৃত্ব সৃষ্টি করা সম্ভবপরও ছিলো না। এই দুটি প্রধান দুর্বলতা ছাড়াও মুক্তিযোদ্ধারা সে সময়ে সরবরাহ ও অস্ত্রের দিক থেকে প্রত্যক্ষ আক্রমণের ভূমিকা গ্রহণের উপযুক্ত হয়ে ওঠেন। আগষ্ট মাসের শেষের দিকে ১১ নং সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধাদের আমি নির্দেশ দিই শত্রুর শক্তিশালী ঘাঁটি আক্রমণ থেকে বিরত থাকো। শত্রুকে কৌশলে প্রলুব্ধ করে তার শক্তিশালী ঘাঁটি থেকে নির্ধারিত স্থানে বের করে আনো এবং হত্যা করো।'

৭ এবং ১০ই সেপ্টেম্বরের অভিযানগুলো সুরক্ষিত কামালপুর ঘাঁটি থেকে শত্রুসৈন্যদের কৌশলে প্রলুব্ধ করে নির্ধারিত স্থানে বের করে এনে হত্যা করার সুন্দর উদাহরণ। এই অভিযানগুলো ১১ নং সেক্টরের

মুক্তিযোদ্ধদের বহুদিন মনে থাকবে। গেরিলা যুদ্ধের ছাত্রদের জন্যেও এগুলো মূল্যবান শিক্ষণীয় বিষয় হয়ে থাকবে।

কামারপুরে শত্রুঘাঁটি থেকে ৫০০ গজ পশ্চিমে ধানুয়া কামালপুর গ্রাম, দক্ষিণ- পশ্চিম ও দক্ষিণে ঘাসীর গ্রাম ও উঠানের পাড়া। ধানুয়া কামারপুর, ঘাসীরগ্রাম, আর উঠানের পাড়া এই গ্রামের সারি এবং কামালপুরের মাঝে বিস্তীর্ন জলোমাঠ। শত্রুকে এই জলোমাঠে বের করে আনতে হবে। এই জলোমাঠই হবে তাদের মরণফাঁদ। এই উদ্দেশ্য সম্মুখে রেখে আমি ধানুয়া কামালপুর এবং ঘাষীরগ্রামে একটি নকল রক্ষাবূহ্য রচনা করি। মুক্তিযোদ্ধ মাহফুজকে এই রক্ষাবূহ্য গড়ে তোলার ভার দেয়া হয়। (বীর মুক্তিযোদ্ধা মাহফুজ পরবর্তীকারে একটি অভিযান পরিচালনা করতে গিয়ে শহীদ হন)। মাহফুজ রাতের অন্ধকারে গ্রামবাসীদের সহায়তায় বাংকার ও ট্রেঞ্চ তৈরী করে ধানুয়াকামালপুর ও ঘাসীরগ্রামে আশ্রয় নেয়।

কামালপুর থেকে সোজা দক্ষিণে চলে গেছে গুরুত্বপূর্ণ সড়ক, বকশিগঞ্জ-জামালপুরটাংগাইল সড়ক। ঢাকা দখলের জন্য সর্বাত্মক আক্রমণে এই্ সড়কটির গুরুত্ব অপরিসীম। পাকিস্তানীরা এই সড়কের গুরুত্ব উপলব্ধি করতো এবং সেজন্য তারা সড়কটির পাশে বিভিন্ন স্থানে মজবুত ঘাঁটি স্থাপন করেছিলো। এই সড়ক ধরেই ১৬ই ডিসেম্বর ১১ নং সেক্টরের বীর মুক্তিযোদ্ধার সর্বপ্রথম ঢাকা প্রবেশ করে।

কামালপুরের শত্রুঘাঁটিকে তার যোগাযোগ ব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে। নকল রক্ষাব্যূহ থেকে কামালপুর ও বকশিগঞ্জের মাঝের সড়কাটিতে মুক্তিযোদ্ধারা অনেক এন্টি- ট্যাংক মাইন স্থাপন করে। এই মাইন বিস্ফোরণে পাকিস্তানীদের ব্যাপক ক্ষতি হয়। আগস্ট মাসের শেষের দিকেই পাকিস্তানীদের নয়টি সরবরাহ ও সৈন্য বোঝাই ট্রাক এতে ধবংস হয়। ৬ই সেপ্টেম্বর বিকাল বেলা ধানুয়াকামালপুর রক্ষাব্যূহ গিয়ে মুক্তিবাহিনীরকেটি দলকে উঠানেরপাড়ার কাছে কামালপুর বকশিগঞ্জ সড়কের উপর এ্যামবুশ নেবার নিদে্শ দিই। সড়কের খুব কাছে গিয়ে কেমন করে অবস্থান নিতে হবে বার বার তার মহড়া দেয়া হয়। মাঝরাতে এ দলট তাদের নিদিষ্ট স্থানে গিয়ে এ্যামবুশ পাতে। তাদের উপর নির্দেশ ছিল যতক্ষণ পর্যন্ত এ্যামবুশ স্থলে শত্রু প্রবেশ না করে সে সময় পর্যন্ত তারা অপেক্ষা করবে। রক্ষাব্যূহ থেকে মহেন্দ্রগঞ্জ ক্যাম্পে ফিরে এসে আমি আর একটি কোম্পানীকে অস্ত্র নিয়ে রৌ থাকার নির্দেশ দিই। বামুনের পাড়া থেকে বনজংগলে পূর্ণ পথ দিয়ে কামালপুর ঘাঁটিতে পৌছান যায়। ভোর সাড়ে চারটার সময় এই পথ দিয়ে এগিয়ে কামালপুর ঘাঁটি আক্রমণ করতে হবে। আমরা জানতাম কামালপুর ঘাঁটি আক্রান্ত হলে ভোর হওয়ার সংগে সংগে পাকিস্তানী একটি সাহায্যকারী দল বকশিগঞ্জ থেকে কামালপুরের দিকে রওনা হবে। উঠনের পাড়ার কাছে মুক্তিবাহিনীর দলটি তাদের নিয়ে যাওযা হয় কামালপুর ঘাঁটিতে পৌছান যায়। ভোর সাড়ে চারটার সময় এই পথ দিয়ে এগিয়ে কামালপুর ঘাঁটি আক্রমণ করতে হবে। আমরা জানতাম কামালপুরের দিকে রওনা হবে। উঠানের পাড়ার কাছে মুক্তিবাহিনীর দলটি তাদের জন্য অপেক্ষা করছে। রাতের অন্ধকারে আমাদের চারটি তিন ইঞ্চি মর্টার বান রোডের উত্তর পাশে স্থাপন করি। ভোর চারটা। বাম রোডের উপর বসে আছি। আক্রমণকারী দলটি কামালপুরের দিকে এগিয়ে গেছে। সারারাত আমরা কেউ ঘুমাতে পারিনি। আসন্ন সংঘর্ষের উত্তেজনায় আমরা সমস্ত অবসাদ ভুলে গেছি। ভোর হয়ে আসছে। আক্রমণকারী দলটি কামালপুর ঘাঁটিতে পৌছে গেছে। হঠাৎ তাদের তীব্রাক্রিমণ ভোরের নিস্তব্ধতা ভেংগে দিল। আমাদের মর্টারগুলো কামালপুর পশ্চিম অংশে গোলা নিক্ষেপ শুরু করলো। কিছুক্ষণ পর সকালের আলোতে দেখা গের বেশকিছু মুক্তিযোদ্ধা কামালপুর ঘাঁটি অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছে। ঘাঁটির পূর্ব অংশ তাদের দখলে। ঘাঁটির পশ্চিম অংশের বাংকার থেকে ক্রমাগত মেশিনগানের গুলি আসতে থাকে এবং সংগে সংগে মর্টারের গোলা। অল্পক্ষণের মধ্যেই মুক্তিযোদ্ধারা পিছু হটতে বাধ্য হয়। এতে দুজন মুক্তিযোদ্ধা প্রাণ হারায় ও ১৭ জন আহত হয়। সকাল সাতটায় এ্যামবুশ স্থলে পাকিস্তানী সাহায্যকারী দলটির প্রথম ট্রাকটি এ্যামবুশকারী দলের স্থাপিত তাইন বিস্ফোরণে সম্পুর্ণরূপে ধবংস হয়। এতে বেশ কিছুসংখ্যক পাকিস্তানী সৈন্য নিহত ও আহত হয়। ধবংসপ্রাপ্ত ট্রাকটির পেছনেই ছিলকেটি জীপ ও অপর একটি ট্রাক। এই গাড়ী দুটো থেকে শত্রুসেন্যরা ত্বরিত নেমে রাস্তার পাশে অবস্থান নেয় ও এ্যামবুশকারী দলটির সাথে গুলি বিনিময় শুরু হয়। এতে আরো পাকিস্তানী সৈন্য নিহত হয়। বেলুচ রেজিমেন্টের মেজর আইয়ুব জীপ থেকে নেমে আসার সময় মুক্তিযোদ্ধাদের

গুলিতে নিহত হয়। যখন এই গুলি বিনিময় চলছিল তখন একদল পাকিস্তানী সৈন্য কামালপুর ঘাঁটি থেকে পালিয়ে বকশিগঞ্জ যাচ্ছিল। এই পলাতক দলটি সে সময় এ্যামবুশকারী দলটি পেছনে এসে অবস্থান নেয় ও তাদের উপর গুলি চালায়। এতে ৬ জন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন ও ৪ জন পাকিস্থানীদের হাতে ধরা পড়েন। এই আকস্মিক বিপর্যয়ে অ্যামবুশকারী দলটি তাদের অ্যামবুশস্থল পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়। এই বিপর্যয় না ঘটলে সেদিন একটি পাকিস্তনী ও এ্যমবুশস্থল থেকে ফিরে যেতে পারত না। সমগ্রিকভাবে এই অভিযোগটি ছিল একটি সফল অভিযান। অভিযান শেষে আনুমানিক ৩৩ জন পাকিস্তান সৈন্য নিহত হয়েছে বলে আমি মুজিব নগরে খবর পাঠাই। রেডিও পাকিস্তান ঢাকা থেকে সেদিনের রাতের খবরে বলা হয় যে শেষরাতে দুই ব্যাটিলিয়ান ভারতীয় সৈন্য পাকিস্তান সীমান্ত ঘাঁটি কামালপুর আক্রমণ করে। স্বল্প সংখ্যক পাকিস্তানী সেন্য এই আক্রমণ প্রতিহত করে এবং ভারতীয় সৈন্যদের পেছনে হটিয়ে দেয়। এতে ৩০০ ভারতীয় সেন্য নিহত হয় ও ৬৭ জন পাকিস্তানী সৈন্য শহীদ হয়। এখবর শোনার পর আমরা খুবই উল্লসিত হয়ে উঠি। নিঃসন্দেহে এই অভিযানে আমরা শত্রুকে প্রলুব্ধ করে নির্দিষ্ট স্থানে এনে বিপুল সংখ্যায় হত্যা করতে সক্ষম হয়েছিলাম।

১০ই সেপ্টেম্বরের অভিযানটি ও শত্রুকে কামালপুর ঘাঁটি থেকে বের করে আনার একটি সুন্দর কাহিনী। আমি লক্ষ্য করেছি মুক্তিবাহিনীর আক্রমণের পরপরই পাকিস্তানী সৈন্যরা বেপরোয়া হয়ে উঠতো। বাংলাদেশের ভেতর মুক্তিবাহিনী তাদের কোন ক্ষতিসাধন করতে পারে এই ধারণা তারা স্থানীয় জনসাধারণকে দিতে চাইতো না। তারা সবসময় এ কথা প্রমান চাইত যে, তারা অসীম শক্তির অধিকারী এবং পাকিস্তানকে তারা টিকিয়ে রাখবেই। তাদের এই মানসিকতার জন্য আমি নিশ্চিত ছিলাম যে এবার তারা আমাদের ধানুয়া কামালপুর ও ঘাসীরগ্রাম অবস্থানগুলোয় আক্রমণ করবে। ৭ তারিখ দুপুর থেকে আমরা পাকিস্তানী সৈন্যদের কামালপুর-বকশীগঞ্জ সড়কটি ব্যবহারের অবাধ সুযোগ দিই। এসময় তারা কামালপুরে অবস্থানরত ভীতসন্ত্রস্ত পাকিস্তানী সৈন্যদের সরিয়ে নতুন সৈন্য নিয়ে আসে। আমিও তাই চেয়েছিরাম। ৮ তারিখ বিকাল বেলা মেজর জিয়াউর রহমানের ব্রিগেডিয়ার প্রথম বেঙ্গল রেজিমেন্টের একটি কোম্পানী মহেন্দ্রগঞ্জে নিয়ে আসি। প্রথম বেঙ্গল রেজিমেন্টের অধিনায়ক ছিলেন মেজর জিয়াউদ্দিন। ৯ তারিখ ভোর বেলা মেজর জিয়াউদ্দিনকে আমি ধানুয়া কামালপুর ও ঘাসীরগ্রামের অবস্থানে যাই। কামালপুর ঘাটি থেকে বের হয়ে এসে পাকিস্তানী সৈন্যরা ঘাসীর গ্রামের অবস্থানের উপর আক্রমণ চালাবে বলে আমি ধারণা করি। এই অবস্থানকে মজবুত করার জন্যই প্রথম বেঙ্গল রেজিমেন্টের কোম্পানীটিকে সেখানে রক্ষাব্যুহ তৈরী করার নির্দেশ দিই। কোম্পানী কমান্ডার ছিলেন ক্যাপ্টেন পাটোয়ারী (বর্তমানে মেজর ও প্রথম বেঙ্গল রেজিমেন্টের অধিনায়ক)। ৯ ও ১০ তারিখ রাতে কোম্পানীটি নিজ অবস্থান নেয়। সে রাতেই মুক্তিযোদ্ধারা কামালপুর- বকশীগঞ্জ সড়কে এন্টি ট্যাংক ও এন্টি-পারসোনাল মাইন স্থাপন করে। সে সময় থেকে তারা ছোট ছোট দলে সড়কটির পাশে পেট্রোলিংও শুরু করে দেয়। কামালপুরের পূর্ব পাশেও একটি মুক্তিবাহিনী কোম্পনী নিয়োজিত করা হয়। তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয় বকশীগঞ্জ থেকে কোন সাহায্যকারী দল আসলে তাদের বাধা দেয়া এবং কামালপুর থেকে যদি কোন সৈন্য বের হয়ে যায় তাদের হত্যা করা।

১০ তারিখ ভোর বেলা থেকেই আমরা কামালপুর ঘাঁটিকে সম্পূর্ণরূপে অবরুদ্ধ করে ফেলি। সরবরাহ বন্ধ, সড়ক যোগাযোগ বন্ধ, শত্রুর জন্য কেবল দুটো পথ খোলা রয়েছে- হয় রাতের অন্ধকারে ছোট ছোট দলে পলায়ন করা অথবা একত্রিতভাবে আমাদের অবস্থানে আক্রমণ করা। দ্বিতীয় সম্ভাবনাটাই ঘটবে বলে আমি ধরে নিয়েছিলাম। এই আক্রমণ আসবে ১০ ও ১১ ই সেপ্টেম্বর রাতে। ১০ তারিখ ভোর বেলা আমি ক্যাপ্টেন পাটোয়ারী রক্ষাব্যূহ করি। রাতারাতি বেশ কতকগুলো বাংকার তৈরী করে তাদের অবস্থানকে মজবুত করে তুলেছে। তাদের অবস্থানের সামনে থেকেই জলোমাঠাটির শুরু। পানির গভীরতা এক ফুট থেকে তিনফুট। শত্রু একশত গজের মধ্যে আসলে গুলিবর্ষণ করার নির্দেশ দেয়া হয়। আমি স্থিরনিশ্চিত ছিলাম যে এবার আমরা বেশ কিছুসংখক সৈন্য নিধন করতে সক্ষম হবো। এর সাথে সাথে কামালপুর ঘাঁটিও আমাদের দখলে আসতে পারে। শত্রুসৈন্যরা কামালপুর ঘাঁটি থেকে বের হয়ে এসে যখন আক্রমণ চালাবে, তখন সম্পূর্ণ কিংবা আংশিক পরিত্যক্ত কামালপুর ঘাঁটিটি দখলের জন্য বেশ কিছু সংখ্যক মুক্তিযোদ্ধার প্রয়োজন হবে।

এজন্য আমি এক কোম্পানী মুক্তিযোদ্ধাকে মহেন্দ্রগঞ্জে ক্যাম্পে তৈরী হওয়ার নির্দেশ দিই। নিরাপত্তার খাতিরে এই কোম্পানীকে কি কাজ করতে হবে তা জানতে দিইনি। সে সময় সীমান্ত এলাকায় ছড়িয়ে ছিল বিভিন্ন শ্রেণীর লোক। নিরাপত্তা বজায় রাখা তখন একটি দুরুহ ব্যাপার।

সন্ধার পূর্বে কোন আক্রমণ পরিচালিত হবে না বলে আমি ধরে নিয়েছিলাম। আরও বেশ কয়েক ঘন্টা সময় হাতে রয়েছে। তাই দুপুর বেলা মহেন্দ্রগঞ্জ থেকে ১৮ মাইল দূরে মাইনকারচর সাবসেক্টরের দিকে রওনা হয়ে যাই- অপর একটি মুক্তিবাহিনী দলকে তাদের অভিযান সম্পর্কে নির্দেশ দেয়ার জন্য। মাইনকারচরে পৌঁছার সংগে সংগে আমি খবর পাই যে, ধানুয়া ও ঘাসীগ্রামে আমদের অবস্থানগুলো পাকিস্তানীরা আক্রমণ করছে। এ খবর পেয়েই আমি মহেন্দ্রগঞ্জে ফিরে আসি। বেলা তখন সাড়ে চারটা। ক্যাম্পে পৌঁছে যে কোম্পনীটিকে তৈরী থাকার নির্দেশ দিয়েছিলাম তাদের খোঁজ করি। আমার অনুপস্থিতিতে পাকিস্তানী আক্রমণের খবর পেয়ে এই কোম্পানীটিকে আমাদের অবস্থানগুলোর সুদৃঢ় করার জন্য প্রেরণ করা হয়। কোম্পানীটিকে এভাবে পাঠাবার ফলে আমার পরিকল্পনা আংশিকভাবে বানচাল হয়ে যায়। সেই সময় কিছুসংখ্যক মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে কামালপুর ঘাঁটিটি আক্রমণ করলে তা সহজেই দখল করা যেতো।

কামালপুর ঘাঁটি আক্রমণের কোন উপায় না দেখে আমি ধানুয়া কামালপুরের দিকে রওনা হয়ে যাই। পথে দেখি ছোট ছোট দলে পথম বেঙ্গল রেজিমেন্টের জোয়ানরা মহেন্দ্রগঞ্জ ক্যাম্পের দিকে ফিরে আসছে। তাদেরকে পূর্বস্থানে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে আমি ঘাসীরগ্রামে পৌঁছি। তখন প্রায় সন্ধা। পৌঁছে দেখি বেঙ্গল রেজিমেন্টের কোম্পানীটি বিশৃংখলভাবে তাদের অবস্থান ছেড়ে পালিয়ে গেছে। ক্যাপ্টেন পাটোয়ারী একজন সঙ্গীসহ তখনও সেখানে রয়ে গেছেন। জলোমাঠটির মাঝামাঝি জায়গা থেকে তখনও পাকিস্তানী সৈন্যরা তাদের নিহত এবং আহত সৈন্যদেরকে নিয়ে যেতে ব্যস্ত। ধানুয়া- কামালপুরের অবস্থানে মুক্তিযোদ্ধরা তখনও অটুট রয়েছে।

সেদিন বেলা আড়াইটার সময় আমার মহেন্দ্রঞ্জ ক্যাম্প ছেড়ে যাওয়ার পর পরই কামালপুর থেকে আনুমানিক দুই কোম্পানী সেন্য আক্রমণ ধারা রচনা করে ঘাসীরগ্রামের দিকে এগোতে থাকে। প্রথম বেঙ্গল রেজিমেন্টের কোম্পানীটি উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে নিদির্ষ্ট স্থানে শত্রু আসার পূর্বেই গুলিবর্ষণ শুরু করে। পাকিস্তানী সৈন্যরা এই গুলিবর্ষণ উপেক্ষা করে নানা যুদ্ধাস্ত্র সহকারে বেপরোয়াভাবে এগোতে থাকে। তাদের পাল্টা গুলিতে প্রথম বেঙ্গল রেজিমেন্টের একজন নায়েক সুবেদার ও অপর একজন জোয়ান নিহত হন। সে সময় পেছন দিকে কেউ চিৎকার করে বলে যে, বকশিগঞ্জ থেকেও সৈন্যদল তাদের আক্রমণ করতে আসছে। এতে কোম্পানীটিতে চরম বিশৃংখলা দেখা দেয় এবং তারা নিজ স্থান ছেড়ে পলায়ন করে। এসময় ধানুয়া কামালপুরের দক্ষিণ দিকে ছিল আমাদের একটি এল- এম-জি। এই এল-এম-জি’র কোনাকুনি গোলাবর্ষণে বহুসংখ্যক আক্রমণরত পাকিস্তানী সৈন্য নিহত হয় এবং শেষ পর্যায়ে তারা হটতে বাধ্য হয়। যে মুক্তিযোদ্ধা এল-এম-জি চালাচ্ছিল, উত্তেজনা বশত সে এল- এম-জি’র ব্যারেলটি বাম হাতে চেপে ধরে রাখে। এতে তার হাতের তালু সম্পূর্ণরূপে পুড়ে যায়। বিপুল সংখ্যক পাকিস্তানী সৈন্য হত্যা এবং আক্রমণকারী বাহিনীকে পিছু হটিয়ে দেয়ার কৃতিত্ব তারই। সন্ধ্যার পর ক্যাপ্টেন পাটোয়ারীকে আমি নির্দেশ দিই তার কোম্পানীটিকে পূর্বস্থানে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। রাত ন’টার সময় বোঝা গেল কোম্পানীটির মনোবল ভেঙ্গে গেছে। তাই তাদের ঘাসিরগ্রামে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না। তাদের জায়গায় পাঠানো হল আর একটি মুক্তিবাহিনী কোম্পানী। এই অভিযানটিতে যদিও আমাদের অনেক ভূল-ক্রুটি হয়েছে তথাপি পরিকল্পনার দিক থেকে এর মূল্য অপরিসীম। এই অভিযানকে একটি সুপরিকল্পিত এ্যামবুশও বলা চলে। শত্রুকে প্রলুব্ধ করে জলোমাঠিটিতে এনে বিপুল সংখ্যায় হত্যা করতে আমরা সমর্থ হয়েছিলাম। এই অভিযানটির পর মুক্তিযোদ্ধাদের সাহস ও আত্মনির্ভরতা বহুগুণ বেড়ে যায়। হত্যা কথাটি আমি বারবার ব্যবহার করেছি। অবশ্য নিয়মিত যুদ্ধে এই শব্দটির বিশেষ ব্যবহার নেই। শত্রুকে পরাজিত করাই মূল উদ্দেশ্য। গেরিলা যুদ্ধে চিহ্নিত শত্রুমানবিক প্রশ্নে বড় অপরাধী। হত্যাই তার যোগ্য শাস্তি।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২০। ১১ নং সেক্টরে সংঘটিত যুদ্ধ সম্পর্কে অন্যান্যের বিবরণ	বাংলা একাডেমীর দলিলপত্র	১৯৭১

সাক্ষাৎকারঃ মেজর আব্দুল আজিজ*
৭-৬-১৯৭৩

১১নং সেক্টরের যুদ্ধ বিবরণঃ ১১ নং সেক্টর ছিল বাংলাদেশের বৃহত্তম সেক্টর।ময়মনসিংহ জেলা, টাঙ্গাইল জেলা এবং রংপুর জেলার গাইবান্ধা মহকুমা নিয়ে গঠিত হয় এই সেক্টর। ভারতীয় সীমান্ত এলাকার ভারতীয় সিকিউরিটি পোস্ট মাইনকারচর থেকে মহেশখোলা পর্যন্ত এটি বিস্তৃত ছিল। ময়মনসিংহ জেলার প্রায় সম্পূর্ণএলাকা ২৪ শে এপ্রিল পর্যন্ত মুক্তিবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে ছিল। যদি তৎকালীন সামরিক নেতৃবৃন্দ সুষ্ঠুভাবে উপলদ্ধি করতে পারতেন তাহলে এই এলাকা মুক্তিযুদ্ধে আরও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারতো। কিন্তু এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি মুক্তিসেনারা তাড়াতাড়ি এলাকা ছেড়ে চলে যায় এবং পাকসেনারা স্থান দখল করে। নেতৃত্বহীন মুক্তিযোদ্ধারা ভারতের পথে পা বাড়ায় এবং বেশীর ভাগ লোক ভারতের ডালু এবং মহেন্দ্রগঞ্জে সমবেত হয়। তাদের মধ্যে কেউ কেউ দেশের অভ্যন্তরে অবস্থান করে উল্লেখযোগ্যভাবে দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ পড়ে তোলে। এদের মধ্যে টাঙ্গাইলের কাদের সিদ্দিকী, ময়মনসিংহের ভালুকার আফসারউদ্দীন এবং সিরাজগঞ্জের লতিফ মির্জার নাম উল্লেখযোগ্য। এই সেক্টরে সবচেয়ে গুরুত্ব পূর্ণ কামালপুর, জামালপুর, টাঙ্গাইল-ঢাকা রোড। ঢাকা সড়ক ঢাকা আক্রমণের জণ্যে অত্যন্ত জরুরী পথ। এই সেক্টরের সামরিক গুরুত্ব প্রাথমিক অবস্থায় ভারতীয় বা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সামরিক নেতৃবৃন্দ কেউই উপলব্ধি করেননি। যার ফলে এই সেক্টর সর্বদা ৭১ সনের জুন মাস পর্যন্ত অবহেলিত ছিল। আগস্ট মাসের পূর্ব পর্যন্ত এই সেক্টর একজন ভারতীয় অফিসার ব্রিগেডিয়ার সান্ত সিংহের পরিচালনাধীন ছিল এবং কোন বাঙ্গালী অফিসারকে সেক্টর কমান্ডার নিযুক্ত করা হয়নি। ব্রিগেডিয়ার সান্ত সিংহ সেক্টরকে নিম্নলিখিত সাবসেক্টরে বিভক্ত করেন (ক) মাইনকারচর (খ) মহেন্দ্রগঞ্জ (গ) পুরাখাশিয়া (ঘ) ঢালু (ঙ) বাগমারা (চ) শিববাড়ি ও (ছ) মহেশখোলা।

ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর অধিনায়করাই সাবসেক্টর কমান্ডার ছিলেন। এই সমগ্র সাবসেক্টরের অধীনে দেশের অভ্যন্তরে কোন উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ হয়নি। যুদ্ধ সাধারনতঃ সীমান্ত এলাকাতেই সীমাবদ্ধ ছিল। দুর্ভাগ্যবশত, তাদের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধারা দেশের অভ্যন্তরে সাবসেক্টর কমান্ডারদের উস্কানিতে ডাকাতি, রাহাজানি ও লুটতরাজ করছে বলে একটি সাংঘাতিক বদনাম রটে যায়। গেরিলা যুদ্ধে স্থানীয় জনসাধারণের সমর্থনে প্রয়োজনীয়তা ব্রিগেডিয়ার সান্ত সিং অনুধাবন করতে ব্যর্থ হওয়ায় দেশের অভ্যন্তরে উল্লেখযোগ্য প্রাতরোধ আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। অন্যপক্ষে পাকিস্থান দখলদার বাহিনী নিজেদের ক্ষমতা সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করে। সমস্ত প্রবেশ পথ বন্ধ করার জন্য সীমান্তের সর্বত্র্য তারা সুদৃঢ় ঘাঁটি নির্মাণ করে। তারা এই সুযোগে রাজাকার ও আলবদর নামে প্যারামিলিটারী বাহিনী গঠন করতে সক্ষম হয়। এই অসুবিধা থাকা সত্বেও রংপুর জেলা সম্পূর্ণ রৌমারী থানা এবং জামালপুরের দেওয়ানগঞ্জের বেশিরভাগ এলাকা সবসময়ে মুক্তিবাহিনীর অধীন ছিল। এই এলাকা ছিল বাংলাদেশের সবচেয়ে বৃহত্তম মুক্ত এলাকা। এই সেক্টরের অধীনে ভারতীয় বাহিনী মুক্তিবাহিনীর জন্যে একটি ট্রেনিং স্কুল খোলে। ব্রিগেডিয়ার সান্ত সিং এই সেক্টর ছাড়া ও ট্রেনিং এর দেখাশোনা করতেন। সীমান্ত এলাকার বিভিন্ন জায়গায় যুব শিবিরও স্থাপন করা হয়। এই শিবিরগুলি ট্রেনিং স্কুলের জন্য মুক্তিযোদ্ধা সরবরাহ করতো। জুন মাসের মাঝামাঝি সময়ে মেজর (বর্তমানে কর্নেল) জিয়াউর রহমান ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের তিনটি ব্যাটালিয়ান নিয়ে ১১ নং সেক্টরে আসেন এবং তাঁকে প্রথম নিয়মিত ব্রিগেড

* ১৯৭১ সালে ক্যাপ্টেন হিসাবে কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীকালে লেঃ কর্নেল পদে উন্নীত হন।

গঠন করার দায়িত্ব দেয়া হয়। তিনি অতি সংক্ষিপ্ত সময়ে ব্রিগেড গঠন করেন, যা পরে জেড ফোর্স নামে পরিচিত হয়। ঐ সময়ে মুক্ত এলাকা রৌমারী পাকিস্তানী বাহিনীর হুমকির সম্মুখীন হয় এবং তিনি তাঁর দু'টি ব্যাটালিয়ানকে রৌমারী রক্ষায় নিযুক্ত করেন । 'জেড' ফোর্স গঠিত হবার অল্প সময় পরে মেজর জিয়াউর রহমান কতিপয় দুঃসাহসিক অভিযান চালান যা স্বাধীনতা যুদ্ধের সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল অংশের দাবী করতে পারে।

আগস্ট মাসের শুরুতে মেজর আবু তাহের মুক্তিবাহিনীর সমন্বয়কল্পে সফরে বের হয়ে এই সেক্টরে আগমন করেন। এই এলাকায় অভিযানের গুরুত্ব উপলব্ধি করে তিনি এই সেক্টরে থাকার সিদ্ধান্ত নেন এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদর দফতর থেকে তাঁকে সেক্টর কমান্ডার নিযুক্ত হয়ে তিনি কামালপুর. জামালপুর, টাংগাইল এবং ঢাকা সড়কের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেন। এর উপর ভিত্তি করে কামালপুরের বিপরীতে ভারতে মহেন্দ্রগঞ্জে এই সেক্টরের সদর দফতরে স্থাপন করেন। এখান থেকে তিনি কতিপয় বিখ্যাত আক্রমণ অভিযান পরিচালনা করেন যা বিস্তারিত উল্লেখ করা যেতে পারে। এর মধ্যে চিলমারীর যুদ্ধ, কামালপুরের যুদ্ধ, তেরীখারীন যুদ্ধ, বাহাদুরাবাদ যুদ্ধ, দেশের অভ্যন্তরে টাঙ্গাইলের জাহাজ মারার যুদ্ধ, সরিষাবাড়ি যুদ্ধ, রংপুর অভিযান এবং নেভাল কমান্ডো অভিযান উল্লেখযোগ্য।

আগস্ট মাসের শেষ দিকে এবং সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম দিকে এই সেক্টরের সমস্ত সেক্টর ট্রুপস, মুক্তিযোদ্ধা এবং 'জেড' ফোর্স নিয়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশের প্রস্তুতি এবং পরিকল্পনা করা হয়েছিল যাতে দেশের অভ্যন্তরে গণযুদ্ধের রূপ দেওয়া যায়। তারপর স্বাভাবিকভাবে ঢাকা অভিযানের পরিকল্পনা করা হয়েছিল। এজন্য অন্যান্য সেক্টরেও ভারতীয় এলাকা ত্যাগ করে বাংলাদেশে প্রবেশ করার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। সেই অনুযায়ী মেজর জিয়াউর রহমান যুদ্ধের পরিকল্পনা তৈরী করেন, যা লেঃ জেনারেল অরোরা ও অন্যান্য ভারতীয় সামরিক উচ্চ অফিসারবৃন্দ কর্তৃক খুব প্রশংসিত হয়েছিল। সেপ্টেম্বরের প্রথম দিকে মুজিব নগরে সেক্টর কমান্ডার বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না, যার ফলে সেই পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়নি। পক্ষান্তরে সকলকে বিস্মিত করে কর্ণেল জিয়াকে তার 'জেড' ফোর্সসহ এই সেক্টর থেকে সিলেট পাঠিয়ে দেয়া হয়। 'জেড' ফোর্সের এই স্থানান্তর ১১ নং সেক্টরের জন্য ছিল সবচেয়ে মারাত্মক আঘাত। মুক্ত এলাকা প্রতিরক্ষা ব্যতীত মুক্তিযুদ্ধ দ্রুতগতিতে দেশের অভ্যন্তরে বিস্তার লাভ করতে পারেনা। 'জেড' ফোর্স চলে যাবার পর এই সেক্টরে মাত্র ২ জন নিয়মিত অফিসার অবস্থান করেন- স্কোয়াড্রন লীডার হামিদুল্লাহ ও লেঃ মান্নান। নানা অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও এই সেক্টর উল্লেখযোগ্য অপারেশনে অংশগ্রহণ করে।

১৫ ই নভেম্বর আমি ১১নং সেক্টরে পৌঁছি এবং মেজর তাহেরের অবর্তমানে অস্থায়ীভাবে সেক্টরের যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করি। সেক্টর হেডকোয়ার্টারে পৌঁছে আমি সেক্টরের গুমোট, নির্জীব অনিশ্চয়তার মধ্যে মুক্তিবাহিনীর ছেলেদের দেখতে পাই। মুক্তিবাহিনীর ছেলেরা তাদের নেতাকে হারিয়ে নিরুৎসাহিত হয়ে পড়েছিল। আমি এসে হেডকোয়ার্টার সাবসেক্টরের মহেন্দ্রগঞ্জে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে সাক্ষাৎ করি। বিস্তারিত যুদ্ধের অবস্থা অবলোকনের পর আমি কর্মপদ্ধতি স্থির করি এবং আক্রমণাত্মক অভিযান পরিত্যাগ করে অবরোধমূলক অভিযান পরিচালনার জন্য ভারতীয় নেতৃবৃন্দের কাছে পরামর্শ পাঠাই। সমগ্র সীমান্ত এলাকাতে অভিযান শুরু করে ।

কামালপুরের অবরোধঃ ১৩ নভেম্বরের ২৩ তারিখ দিবাগত রাতে কামালপুরে অবরোধ করা হয় এবং পাকিস্তানের অন্যতম শক্তিশালী ঘাঁটি কামালপুরকে তাদের মূল বাহিনী থেকে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন এবং রসদ বন্ধ করে দেয়া হয়। এই অবস্থায় ১১ দিন অবরুদ্ধ থাকার পর ৪ঠা ডিসেম্বর বিকাল ৩টার সময় কামালপুর মুক্তিবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে। নিয়মিত বাহিনীর ২২০ লোক এবং বিপুল অস্ত্র শস্ত্রসহ পাকসেনারা বন্দী হয়। এই অবরোধ চলাকালে তারা ১১ দিনের মধ্যে ৭ দিন বাইরে আসার চেষ্টা করলে বিপুল বাধার সম্মুখীন হয়ে

অপরিসীম ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছিল। তিনদিন কামালপুর থেকে মুক্তিবাহিনীর অবরোধ ভেঙ্গে পাকবাহিনী বের হয়ে যাবার চেষ্টা করলে অনেক ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে ৪ঠা ডিসেম্বর আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। কামালপুরের পতন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাকবাহিনী ময়মনসিংহের মেঘালয় সীমান্তের সব এলাকাতে মনোবল হারিয়ে ফেলে এবং দ্রুত পশ্চাদপসারণ করে জামালপুর, ময়মনসিংহ ও নেত্রকোনায় মুক্তিবাহিনীর অভিযোগ করার জন্য সমবেত হয়।

১১ নং সেক্টরের যুদ্ধের পরিকল্পনাঃ নভেম্বর মাসের ১৮ তারিখ ভারতীয় ৯৫ তম মাউন্টেন ব্রিগেডের ব্রিগেডিয়ার ক্লেয়ার, ভারতীয় এবজা সেক্টরের ব্রিগেডিয়ার সাম সিং এবং ভরতীয় পুর্বাঞ্চলীয় কম্যুনিশনের অধিনায়ক মেজর জেনারেল ভগৎ সিং এবং ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক হিসাবে আমার সমন্বয়ে জামালপুর, ময়মনসিংহ নেত্রকোনা প্রভৃতির সম্ভাব্য হামলার পরিকল্পনা করা হয়েছিল।

স্কোয়াড্রন লীডার হামিদুল্লার নেতৃত্বে রংপুর জেলার গাইবান্ধা দখল করার পরিকল্পনা করা হয়। সাবসেক্টর মহেন্দ্রগঞ্জ এবং পুরাখাশিয়ায় ভারতীয় মাউন্টেন ব্রিগেডের সহায়তায় জামালপুর দখল করার পরিকল্পনা করা হয়। সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী দেওয়ানগঞ্জ থানার হাতিবান্ধায় নিয়োজিত প্রায় ১০০০ মুক্তিযোদ্ধা লেঃ শামসুল আলমের নেতৃত্বে দেওয়ানগঞ্জ ও ইসলামপুর হয়ে জামালপুরের পশ্চিমে ব্রহ্মপুত্র নদ থেকে জামালপুর জগন্নাথগঞ্জ রেল ট্র্যাকে পর্যন্ত অবরোধ করার দায়িত্ব দেয়া হয়। পুরাখাশিয়া সাবসেক্টরের প্রায় ১০০০ মুক্তিযোদ্ধা লেঃ আসাদুজ্জামানের নেতৃত্বে ভায়াডাঙ্গা, নালিতাবাড়ি, নখলা, নুরুান্দ হয়ে জামালপুরের দক্ষিণে জামালপুর- জগন্নাথগঞ্জ রেলসড়ক থেকে জামালপুর টাঙ্গাইল সড়ক পর্যন্ত অবরোধ করার দায়িত্ব দেওয়া হয়। মহেন্দ্রগঞ্জ সাবসেক্টরের অন্য হাজারের একটি দলকে লে: মিজানুর রহমানের নেতৃত্বে ভারতীয় ৯৫ তম ব্রিগেডের অগ্রভাগে কামালপুর, বক্সিগঞ্জ ও ঝগড়ারচর হয়ে ব্রক্ষপুত্র নদের উত্তর থেকে জামালপুর শহর অবরোধ করার দায়িত্ব দেওয়া হয়। আমার নেতৃত্বে সেক্টরের মূল বাহিনীকে কামালপুর, বক্সিগঞ্জ, শ্রীবর্দি, শেরপর প্রভৃতি এলাকার শত্রু অবরোধ প্রতিহত করে নান্দিনা হয়ে জামালপুরের পূর্ব দিকে অবরোধ করার দায়িত্ব দেয়া হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে জামালপুর থেকে ১২মাইল পূর্বে লাহিড়ীকান্দা এবং কানিল নামক স্থানে ঢাকা, ময়মনসিংহ থেকে রেলপথে এবং সড়কপথে শত্রু রিইনফোর্সমেন্ট প্রতিহত করার জন্য সার্জেন্ট ভূইয়ার নেতৃত্বে রেল ও সড়ক পথে জামালপুরের সাথে ঢাকা ও ময়মনসিংহের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করার জন্য প্রায় ৫০০ মুক্তিযোদ্ধা পাঠান হয়। এবং বাকী ১৫০০ মুক্তিযোদ্ধা জামালপুরের দক্ষিন-পূর্বে ব্রক্ষাপুত্র নদ থেকে টাঙ্গাইল সড়ক পর্যন্ত আমার নেতৃত্বে জামালপুর অবরোধ করেন।

জামালপুর অবরোধ সমাপ্ত হয় ৬ই ডিসেম্বর। ৬ই ডিসেম্বর থেকে ২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত পাকিস্তান বাহিনীর ৩১ বেলুচ রেজিমেন্ট বহুবার মুক্তিবাহিনীর অবরোধ ভেঙ্গে পালাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয় এবং বহু ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে। ১১ ই ডিসেম্বর সকাল ৫৮টার সময় পাকিস্তান বাহিনী মুক্তিবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে।

এই যুদ্ধে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল ১০ই ডিসেম্বর বিকাল ৪টার সময় পাকিস্তানী বাহিনীর ৩১তম বেলুচ রেজিমেন্টের অধিনায়ককে আত্মসমর্পণ করার আহবান জানিয়ে একটি পত্র মুক্তিযোদ্ধা জহুরুল হক মুন্সীকে দিয়ে একটি সাদা পতাকা হাত নিয়ে পাকিস্তানীদের সদর দপ্তরে পাঠান হয়। উত্তর পাকিস্তানী অধিনায়ক ৭.৬২ চাইনিজ সাবমেশিনগানের একটি বুলেট একটি কাগজ মুড়ে পাঠিয়ে দেয়। তার অর্থ এই যে যুদ্ধই চুড়ান্ত ফয়সালা করবে। সেদিন সন্ধ্যা থেকেই মুক্তিবাহিনী চারদিক থেকে জামালপুর শহরে প্রবেশ করে এবং অন্যদিকে ভারতীয় বিমান বাহিনী থেকে পাকিস্তানী বাহিনীর উপর বোমাবর্ষণ করে পাকিস্তানী বাহিনীর অবস্থা শোচনীয় করে তোলে। তা সত্ত্বেও পাকিস্তান বাহিনী বীর বিক্রমে ১০ই এবং ১১ ই ডিসেম্বর সারা রাতব্যাপী যুদ্ধ চালায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ১১ই ডিসেম্বর সকাল ৫ টায় মুক্তিবাহিনীর কাছে আত্মসমমর্পণ করে। জামালপুর যুদ্ধে পাকিস্তান বাহিনীর ২১২ জন মৃত্যুবরণ করে, প্রায় ২০০ জন আহত হয় এবং ৫২২ জন আত্মসমর্পণ করে। তাদের অস্ত্রশস্ত্র

এবং গোলাবারুদের পরিমাণ এত ছিল যে, বাইরের কোন সাহায্য ব্যতিরেকেই জামালপুর সীমান্ত এলাকাতে তারা আরও তিন মাস যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারতো।

অন্যদিকে ডালু সাবসেক্টরেও প্রায় ১০০০ মুক্তিযোদ্ধা লেঃ আবু তাহেরের নেতৃত্বে ডালু, হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ রোডে অগ্রসর হয়ে বাঘমারা সেক্টরের আরো প্রায় ২০০০ মুক্তিযোদ্ধা লেঃ কামালের নেতৃত্বে হালুয়াঘাটের পশ্চিমে লেঃ তাহেরের সাথে মিলিত হয়ে ভারতীয় 'এবজা' সেক্টরের সহয়তায় উত্তর এবং উত্তর-পূর্ব দিক থেকে ময়মনসিংহ অবরোধ এবং আক্রমণ করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। অন্যদিকে জামালপুর পতনের পর ঐ অঞ্চলের মুক্তিযোদ্ধাদের ময়মনসিংহের পশ্চিম এবং দক্ষিন দিক থেকে ময়মনসিংহে অবরোধ করে একই সময়ে ময়মনসিংহ অক্রমণ করার পরিকল্পনা ছিল। সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী ডালু এবং বাঘমার সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধা লেঃ তাহের এবং লেঃ কামালের নেতৃত্বে ময়মনসিংহ শহরের দিকে অগ্রসর হয়। অন্যদিকে শিবপুর এবং মহেশখোলা সাবসেক্টরের প্রায় ৫০০ মুক্তিযোদ্ধাদের মেজর মতিউর রহমানের নেতৃত্বে নেত্রকোনা দখল করার পর কিশোরগঞ্জ হয়ে ঢাকার জয়দেবপুরে ১১ নং সেক্টরের সঙ্গে মিলিত হওয়ার পরিকল্পনা ছিল। আর ময়মনসিংহ ও জামালপুরের পতনের পর এই বিরাট মুক্তিযোদ্ধা বাহিনী টাঙ্গাইলের কাদের সিদ্দিকীর সঙ্গে সম্মিলিতভাবে টাঙ্গাইল দখল করে বিপুল বিক্রমে ঢাকার দিকে অগ্রসর হয়ে টঙ্গি পর্যন্ত অবরোধ করার পরিকল্পনা করা হয়। কিন্তু ১১ নং সেক্টরের হাতে জামালপুর পতনের পর ময়মনসিংহ এবং টাঙ্গাইল থেকে পাকিস্তানী বাহিনী পলায়ন করে। মুক্তিবাহিনী তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে এবং ভারতীয় প্যারাস্যুট বাহিনী টাঙ্গাইলের নিকটবর্তী পিগনা নামক স্থানে এক ব্যাটালিয়ন ছত্রীসেনা নামায়। একদিকে ছত্রীসেনা ও অন্যদিকে ধাবমান মুক্তিবাহিনীর সাম্মিলিত চাপে অসংখ্য গাড়ীসহ প্রায় ৩০০ পাক সৈন্য নিহত হয়। ময়মনসিংহ এবং টাঙ্গইল থেকে পলায়নরত পাকস্তানী বাহিনীর অধিনায়ক ব্রিগেডিয়ার কাদেরসহ সমস্ত ব্রিগেড স্টাফ ঢাকার কালিয়াকৈরের নিকট ধরা পড়ে। এরপর ঢাকা পৌঁছা পর্যন্ত মুক্তিবাহিনী আর উল্লেখযোগ্য কোন বাধার সম্মুখীন হয়নি।

১৬ই ডিসেম্বর বিকাল ৪টার সময় ১১ নং সেক্টর বাহিনী বীরবিক্রমে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকাতে প্রবেশ করে।

স্বাক্ষরঃ আব্দুল আজিজ
৭-৬-৭৩

সাক্ষাৎকারঃ সুবেদার মেজর জিয়াউল হক
২৭-৬-৭৪

আমরা ই-পি-আর' এর তিন কোম্পানী এবং আনসার- মুজাহিদের আনুমানিক ৬/৭ কোম্পানী নিয়ে ফুলপুর-হালুয়াঘাট হয়ে ভারতের ডালুতে আশ্রয় নিই। এবং বাংলাদেশের কমলাকান্দা থানার বিপরীতে ভারতের রংরায় সুবেদার আজিজ এক কোম্পানী, ডালুতে আমরা এক কোম্পানী এবং পুরাখাশিয়া-মহেন্দ্রগঞ্জে সুবেদার হাকিমের এক কোম্পানী- যেখানে আনসার, মুজাহিদ এবং পুলিশ ছিল। ডালু, বারেংগাপাড়ায় মুক্তিযোদ্ধা এবং হাকিমের এক কোম্পানী- যেখানে আনসার, মুজাহিদ এবং পুলিশ ছিল। ডালু, বারেংগাপাড়ায় মুক্তিযোদ্ধা এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের জন্য ভারতের পক্ষ থেকে ক্যাম্প স্থাপন করা হয়। জেলা সদর দফতর তুরা এখন থেকে নিকটবর্তী ছিল। পুরো এপ্রিল মাস মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্গঠন এবং প্রশিক্ষন দেয়া হয়। ইতিমধ্যে সীমান্ত এলাকার লোকজন পাক সামরিক বাহিনীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ভারতে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে।

মে মাস থেকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে 'আঘাত কর এবং পালাও' এ কৌশলে গেরিলা অপারেশন শুরু করা হয়। উল্লেখযোগ্য যে হাতেম আলী তালুকদার এম-সি- এ এবং আবুল মনসুর আহমদ এম-সি-এ ভারতে যাওয়ার আগ পর্যন্ত গেরিলা অপারেশনে আমাদের সংগে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন।

গেরিলা অপারেশনঃ ২রা মে তারিখে সিপাহী এ, কে, এম ফজলুল হক ৩৪ জন মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে হালুয়াঘাটের ফুলপুর থানার রামভদ্রপুরে গেরিলা আক্রমণ চালিয়ে রাজাকার বাহিনীর দু'জ কে হত্যা করে এবং ৬ টি রাইফেল ছিনিয়ে নেয়। ২৫-৬-৭১ তারিখে নায়েক ফরহাদ ১৩জন মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে নরুন্দী রেলওয়ে স্টেশনে এক্সপ্লোসিভের সাহায্যে অপারেশন করে এবং ৮-৭-৭১ তারিখে রেললাইনের নীচে এন্টি-ট্যাংক মাইন বসিয়ে পাক-বাহিনীর খাদ্যদ্রব্য- অস্ত্রশস্ত্র বোঝাই তিনঠি বগি ইঞ্জিনসহ ধবংস করে দেয়। ২৫-৬-৭১ তারিখে হাবিলদার হাফিজকে ৯ জন মুক্তিযোদ্ধাসহ পাঠানো হয়। ৬/৭ জুলাই তারিখে তারা মুক্তাগাছা আক্রমণ করে এবং ১৫টা রাইফেল, একটি এস-এম-জি, ২৮ টি এল- এম-জি ম্যাজিন এবং থানার টেলিফোন সেট সমেত সমস্ত গোলাবারুদ উদ্ধার করে নিয়ে আসে। ৪ জন বাঙ্গালী পুলিশ কনস্টেবলকে হত্যা করা হয়। থানার ওসি পালিয়ে যায়।

মুক্তিযোদ্ধা নূরুল ইসলাম। আরো নয়জন মক্তিযোদ্ধা নিয়ে করইতলি বি-ও-পি'তে (মহেশলাঠি গ্রাম) রাজাকারদের ক্যাম্পে হামলা চালায়। ক্যাম্পের সেন্ট্রিকে তারা ধরে নিয়ে আসে। ৯ ই জুন তারিখে আমি আমার সাহসী ল্যান্স নায়েক মেজজবাহউদ্দীন, আমার কুক আব্দুস সোবহান মোল্লাসহ নালিতাবাড়ি থানার অধীনে বারমারী বি-ও-পি এবং খৃষ্টানদের মিশনের মধ্যবর্তী জায়গায় মাইন পুঁতে রাখি। ঐ পথ দিয়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একজন মেজর সব সময় যাতায়াত করত। ৯ই জুন সকালে ঐ সকালে মজের, মিশনের সিস্টার, একজন সুবেদার, দুই সিপাহী ঐ পথে যাবার সময় মাইন বিস্ফোরণে নিহত হয়।

ই-পি-আর'এর ল্যান্স নায়েক আব্দুল্ল মান্নান এবং মুক্তিবাহিনীর অধিনায়ক আফসারউদ্দীন আহম্মদ ভালুকা থানার ভাউলিয়া বাজার এলাকাতে পাক বাহিনীর সঙ্গে এক সংঘর্ষে লিপ্ত হন। সাত থেকে সাড়ে সাতশ মুক্তিযোদ্ধ এই আক্রমণে অংশগ্রহণ করে। পাক বাহিনীর প্রায় এক ব্যাটালিয়ন সৈন্য মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণ করে। এই আক্রমণে ১৩জন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন। পাক বাহিনীর পক্ষে বেশ হতাহত হয়। পাক বাহিনী চারদিক থেকে ঘেরাও হয়ে যাওয়ায় ডাক থেকে হেলিকপ্টার গিয়ে তাদেরকে ৫ই জুলাই উদ্ধার করে। পাকিস্তানীদের পক্ষে প্রায় ৬০ জন নিহত হয়েছিল। মুক্তিযোদ্ধারা ৭১ টি রাইফেল, ১২টি চীনা রাইফেল, ৩টি এল-এম-জি, ২টি ২" মর্টার উদ্ধার করতে সক্ষম হয়।

১৩ই জুলাই ল্যান্স নায়েক মান্নান ১৩জন মুক্তিযোদ্ধা ও প্রায় ২০০ জন স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে ফুলবাড়িয়া থানার লক্ষীপুর গ্রামে একটি পাক আর্মি পেট্রলকে। এ্যামবুশ করে এবং ৪৩ টি রাইফেল, ৩টি-এল-এম-জি, ১টি চীনা এল-এম-জি, ২টি চীনা রাইফেল, ২টি এস- এম-জি ছিনিয়ে নিতে সক্ষম হয়।

৯ই জুলাই মুক্তিযোদ্ধা আবু হানিফকে ফকির বেশে ফুলপুর থানায় পাঠানো হয়। সে ভিক্ষা চাওয়ার ভাণ করে থানা সেন্ট্রির নিকট থেকে রাইফেল ছিনিয়ে নেয় এবং তাকে হত্যা করে থানা থেকে একটি রাইফেল এবং স্টেনগান নিয়ে আসতে সক্ষম হয়।

হালুয়াঘাট এবং শম্ভুগঞ্জের মধ্যবর্তী নাগাল পুল অবস্থিত। মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হক চৌধুরীকে ৩৮ জন মুক্তিযোদ্ধসহ উক্ত পুল ধবংসের ভার দেওয়া হয়। সে ১৬ই জুলাই রাত একটার সময় ঐ পুলে পাহারারত রাজাকারদেরকে হত্যা করে তাদের নিকট থেকে ৫টি স্টেনগান উদ্ধার এবং পুলটি ধবংস করে দেয়।

নালিতাবাড়ি থানায় বেগুনবাড়ি ব্রীজ ধবংস করার জন্য মুক্তিযোদ্ধা নাজমুল হকের নেতৃত্বে তার কোম্পানীকে পাঠানো হয়। সে উক্ত পুল ধবংস করে। পার্শ্ববর্তী গ্রামে সে আশ্রয় নেয়। পার্শ্ববতী গ্রামে সে আশ্রয় নেয়। ইতিমধ্যে পাকবাহিনী ওখানে এসে পড়ে এবং তাদেরকে আক্রমণ করে। এই আক্রমণে কোম্পানী কমান্ডার নাজমুল হক শাহাদাৎবরণ করেন। উল্লেখযোগ্য যে, নাজমুল হক ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ বর্ষের একজন মেধাবী ছাত্র ছিলেন। নালিতাবাড়ীতে তার নামে একটি কলেজের নামকরণ করা হয়েছে। ১৯শে জুলাই পাক সেনাবাহিনীর তিনটি

কোম্পানী ভোর পাচঁটার সময় হালুয়াঘাট ক্যাম্প থেকে রওনা হয়। এক কোম্পানী রামচন্দ্রকোরা বি-ও-পি হয়ে আমাদের হাইড-আউট ডালুর পূর্ব দিকে অবস্থান নেয়। আর এক কোম্পানী হাতি পাগার বি-ও-পি হয়ে আমাদের হাইড-আউটে আক্রমণের প্রস্ততি নেয়। আর এক কোম্পানী সোজা ডালু চেকপোস্ট অভিমুখে অগ্রসর হয়। আমার তিন দিক থেকে ঘেরাও হয়ে যাই। তখন ক্যাপ্টেন ত্যাগীও আমাদের সাথে ছিলেন। আমরা খুব অসুবিধায় পড়ে যাই এবং তাদের সাথে মোকাবেলা করি। আমাদের পক্ষে দু'জন শহীদ হন। এই আক্রমণে ভারতীয় বি-এস-এফ'এর ১১ জন সিপাহী নিহত হন এবং তাদের একজন জমাদার নায়েক সুবেদারকে পাকবাহিনী ধরে নিয়ে যায়।

২৭শে জুলাই ল্যান্স নায়েক মেজবাহউদ্দিন ও তার দলের সংগে নালিতাবাড়ি থানার অর্ন্তগত তন্তর এবং মায়াঘাসিতে পাকিস্তানী সৈন্যের এক পেট্রোল পার্টির সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এই সংঘর্ষে ১৬ জন পাকসেনা নিহত হয়। মেজবাহউদ্দিন ও মারাত্মক ভাবে আহত হন।

৬ই আগস্ট বান্দরকাটা বি-ও-পি ২ কোম্পানী এফ-এফ ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র মাসুদ, ছাত্রনেতা হাশেম এবং আমাদের নেতৃত্বে আক্রমণ চালানো হয়। বান্দরকোটা বি-ও-পি'তে পাকিস্তানীদের যথেষ্ট হতাহত হয়। শত্রুপক্ষের ৩০ জন নিহত ও ৩৫ জন আহত হয়। আমাদের পক্ষে পাচঁজন শাহাদাৎ বরণ করেন।

স্বাক্ষরঃ মোহাম্মদ জিয়াউল হক/২৭-৬-৭৪
সুবেদার মেজর

সাক্ষাৎকারঃ সুবেদার মোসলেহউদ্দীন আহমদ
২৬-৬-৭৩

আগস্ট মাসের ৩০ তারিখে ঢাকা সেনানিবাসের কড়া পাহারার মধ্যে দিয়ে অন্ধকার রাত্রিতে পাহারাদারের কাছ থেকে রাইফেল হস্তগত করে পালাতে সক্ষম হই। অতঃপর সেনানিবাসের কিছু দুরে এক জঙ্গলে রাত্রি অতিবাহিত করি। পরের দিন সকালে রাইফেলটি একটি গর্তে পুঁতে ছদ্মবেশে ময়মনসিংহের পথে রওনা হই। ১০ দিন চলার পর নেত্রকোনা মহকুমার উত্তর অংশের সীমান্ত মহেশখোলা দিয়ে ভারত প্রবেশ করি। ঐদিন ছিল মে মাসের ৯ তারিখ। সেখানে ডাক্তার আখলাক হোসেন এম-পি-এ'র কাছে হাজির হই। তার কাছ থেকে পরিচয়পত্র নিয়ে তুরা চলে যাই। সেখানে আমাদের ১১ নং সেক্টরের হেডকোর্য়াটার ছিল। তখন ঐ সেক্টরের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন কর্নেল আবু তাহের। তিনি কামালপুরের যুদ্ধে আহত হওয়ার পর স্কোয়াড্রন লীডার হামিদুল্লাহ নেতৃত্ব দেন। সেই সময় সাবসেক্টরের (কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা) নেতৃত্ব দিতেন ভারতীয় আর্মির একজন ক্যাপ্টেন। এর কিছুদিন পর বাংলাদেশ আর্মির ক্যাপ্টেন হামিদ (বর্তমানে মেজর মতিয়ার রহমান) ঐ কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোনা অর্থাৎ ১১নং সেক্টরের অধিনায়ক নিযুক্ত হন। ক্যাপ্টেন হামিদের নেতৃত্বে আর্মি মেডিক্যাল অফিসার মনোনীত হয়ে কয়েকশত মুক্তিযোদ্ধাসহ মহেশখোলা দিয়ে বাংলাদেশের ভিতরে প্রবেশ করি। সেখান থেকে নৌকাতে হাসপাতালের যাবতীয় ঔষধপত্র ও সরঞ্জাম নিয়ে বাংলাদেশের ভিতরে ধরমপাশা থানার দিকে রওনা হই। বাংলাদেশে প্রবেশ করার পথেই আমাদেরকে যোগাযোগ এবং নিরাপত্তার জন্য স্থানীয় আওয়ামী লীগ কর্মীবৃন্দের সহায়তায় স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্প তৈরী করে আসি।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, আমাদের প্রধান এবং প্রথম কাজ ছিল ধরমপাশা থানা মুক্ত করা। কারণ সেখানে তিন মাইল চর্তুদিকে খানদস্যুরা অগ্নিসংযোগ, নারী নির্যাতন, হত্যা, লুন্ঠন ও ব্যভিচার করে উক্ত স্থানে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিল। উক্ত থানা হেডকোর্য়াটারে প্রায় ২৫০ জন পাকসেনা, রাজাকার, আলবদর,

মুজাহিদ নিয়ে গঠিত এক ঘাঁটি ছিল। সেই দুর্ভেদ্য ঘাঁটিকে প্রথমে আমরা টার্গেট করলাম। কিন্তু কয়েকবারই আমরা ব্যর্থ হই। এর পরপরই মরণ পণ করে তিনটি প্লাটুনে বিভক্ত হয়ে তিনদিক থেকে আক্রমণ করি। প্রথম প্লাটুনের নেতৃত্ব দেন বর্তমান মেজর মতিয়র রহমান, ২নং প্লাটুনের নেতৃত দিই আমি নিজে এবং ৩নং প্লাটুনের নেতৃত্ব দেন নায়েক আব্দুর রহমান (বাংলাদেশ রাইফেল)। আমার ২নং প্লাটুন সামনের দিকে ছিল। তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে যায়। অয়ারলেস সেটের সাহায্যে আমরা অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ রক্ষা করে চলি। এই যুদ্ধে আমাকে নেতৃত্ব দেওয়া ছাড়াও মেডিক্যাল অফিসারের দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে। পাক বাহিনীর পাল্টা আক্রমণে মুক্তিযোদ্ধা মোয়াজ্জেম হোসেন শহীদ হন। প্রচন্ড আক্রমণের ভিতর দিয়ে শহীদ বীরের মৃতদেহ আমি নিজে বহন করে নিয়ে আসি। বাকী মুক্তিযোদ্ধাদেরকে উৎসাহের সহিত সামনের দিকে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দিই এবং আমি নিজে তাদের সংগে যুদ্ধ করি, যার ফলে তারা সাহস হারায়নি। মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত তাদের মনোবল অটুট থাকে। তিনদিকের প্রচন্ড আক্রমণে খানসেনারা দিশেহারা হয়ে ১৫ জনের মত খতম হয়। বাকিরা সন্ধ্যার অন্ধাকারে পালিয়ে মোহনগঞ্জ থানার দিকে চলে যায়। উক্ত স্থানে মুক্ত করে একটি প্লাটুনকে এখানে ডিফেন্সের জন্য রেখে বাকি দুই প্লাটুন ও অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধাসহ পরের দিন মোহনগঞ্জ আক্রমণ করি। উক্ত ধরমপাশা থানা মুক্ত হবার পর আমার সাবসেক্টর কমান্ডার মেজর মতিয়র রহমান আমার বীরত্বের পরিচয়সূচক বীর প্রতীক উপাধিতে আমাকে ভূষিত করেন- যা বাংলাদেশ সরকার শেষে মঞ্জুর করেছেন।

মোহনগঞ্জ আক্রমণ করে প্রায় ২৫জন খানসেনাকে হত্যা করি এবং উক্ত থানা মুক্ত করি। এরপর আমাদের কাজ পরিবর্তনের জন্য নির্দেশ পাই। ভৈরব বাজার থেকে কেন্দুয়া পর্যন্ত যে রেল যোগাযোগ আছে তা বিচ্ছিন্ন করার নির্দেশ পাই। এরপর ক্রমান্বয়ে কেন্দুয়া, আঠারোবাড়ি, নীলগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, করিমগঞ্জ, মদন প্রভৃতি স্থানে যুদ্ধ করি ও অসংখ্য খানপশুদের হত্যা করে উল্লেখিত স্থানগুলি মুক্ত করি। তখন ব্যাটালিয়ন অ্যাডজুট্যান্ট, এ্যাডমিনিসট্রেটিভ অফিসার ও অন্যান্য গুরুদায়িত্ব পালন করি। দেশ মুক্ত হবার পর সেক্টরের যাবতীয় কাগজপত্র সেক্টর হেডকোর্য়াটার ময়মনসিংহে জমা দিয়ে আমার পুরানো চাকরিতে যোগদান করি।

স্বাক্ষরঃ মোসলেহউদ্দীন আহমদ

সাক্ষাৎকারঃ মিজানুর রহমান খান
১১-১২-১৯৭৫

মহেন্দ্রগঞ্জ ছিল ১১ নং সেক্টরের হেডকোর্য়াটার। ২১শে জুলাই আমি মহেন্দ্রগঞ্জ সেক্টরে যোগ দিই। আগস্ট মাসের শেষের দিকে মেজর তাহের মহেন্দ্রগঞ্জ ১১ নং সেক্টরে যোগ দেন। মেজর তাহের আসার পর তিনি আমাদের ৪৮ জন নিয়ে একটি স্পেশাল পার্টি তৈরী করেন। আমরা তুরাতে ট্রেনিং নেওয়া সত্ত্বেও মেজর তাহের আমাদের বিশেষ ভাবে ট্রেনিং দেন। আমাদের কোম্পানী কমান্ডার ছিলেন হেলাল (সৈয়দ সদরুজ্জামান)। আমাদের পার্টি হেলাল পার্টি হিসাবে পরিচিত ছিল। আমরা ৪৮জন কলেজ- বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম। মেজর তাহের আমাদেরকে সব সময় সম্মুখযুদ্ধের জন্য রিজার্ভে রাখতেন। প্রতিটি প্রথাগত যুদ্ধে বা সম্মুখযুদ্ধে আমরা অংশ নিয়েছি। ক্যাপ্টেন মান্নান ছিলেন সেকেন্ড-ইন-কমান্ড। লেঃ মিজান, লেঃ আলম সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে সেক্টরে যোগ দেন। ১৫/১৬ই আগস্ট আমাদের ১৩৫ জনকে পাঠানো হয় কামালপুর আক্রমণের জন্য। কোম্পানী কমান্ডার ছিলেন সেনাবাহিনীর সুবেদার মনসুর। অন্যদিকে লেঃ মাহফুজ তার কোম্পানী নিয়ে ছিলেন। লেঃ মাহফুজ মহেন্দ্রগঞ্জ সাবসেক্টরের অধীনে যুদ্ধ করেছেন। পরবর্তীতে লেঃ মাহফুজ ডালু সাবসেক্টরে নভেম্বর মাসে এক অপারেশনে নিহত হন।

ভোর রাতে আমরা কামালপুর আক্রমণ করি। দিনের আলোতে আমরা পরস্পরকে দেখতে পাচ্ছিলাম। সংঘর্ষ আধঘন্টা স্থায়ী হয়। এই সংঘর্ষে ৭ জন নিহত হয়। পাকিস্তানীদের ৮/৯ জন নিহত হয় বলে জানা যায়।

মুক্তিবাহিনীর নিহতদের মধ্যে আমানুল্লাহ কবিরের নাম বিশেষভাবে বলা যায়। আব্দুল মালেকসহ আরও কয়েকজন আহত হন।

নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি মেজর তাহেরের নেতৃত্বে ৮টি কোম্পানীকে নিয়ে ভারতীয় সৈন্যসহ কামালপুর আক্রমণ করা হয়। রাত ১২টার দিকে ডিফেন্স পজিশনে চলে যাই। ভোর ৪টা ৩০মিনিটে আমরা কামালপুর আক্রমণ করি। আমরা ১০ জন মুক্তিযোদ্ধা মেজর তাহেরের সঙ্গে ছিলাম। আমাদের ওপর নির্দেশ ছিল কামালপুর দখলের পরপরই অস্ত্রশস্ত্র দখল করে নিয়ে আসতে হবে। ভোর ছ'টার দিকে মেজর তাহের সহ আমরা নয়াপাড়ার শেষপ্রান্তে গিয়ে পৌঁছাই। আমাদের অস্ত্র ছিল ২টি স্টেন, ৮টি এস-এল-আর এবং আমার সঙ্গে একটি অয়্যারলেস সেট ছিল। মেজর তাহেরের সঙ্গে একটি অয়্যারলেস সেট ছিল এবং তার সঙ্গে সর্ব মুহূর্তের জন্য একটি ছড়ি থাকতো।

রাস্তার পাশে আমরা পজিশন নিলাম। উভয়পক্ষে ব্যাপক সংঘর্ষ চলছে। সকাল প্রায় ৮টার দিকে একটি শেল মেজর তাহেরের বাঁ পায়ে এসে পড়ে। মেজর তাহের চিৎকার করে ওঠেন। আমি তার ছড়ি এবং অয়্যারলেস সেটটি নিয়ে নিই। আমি এবং সফি মেজর তাহেরকে ধরে পেছনে নিয়ে আসি। লেঃ মিজান তাড়াতাড়ি এসে ধরলেন। আমরা কাঁদছিলাম। মেজর তাহের চুপ করতে বলে সবাইকে অগ্রসর হতে বললেন। সেদিন কামালপুর দখলের পূর্ব মুহূর্তে এই দুর্ঘটনার পর কামালপুর আর দখল করা সম্ভব হয়নি। ভারতীয় বাহিনী মেজর তাহেরকে নিয়ে যায়।

৩০শে নভেম্বর আমরা প্রায় ৫০০ জন মুক্তিযোদ্ধা কামালপুর ঘিরে রাখি। কামালপুর পুরোপুরি অবরুদ্ধ করে রাখি।

৩০শে নভেম্বর ভারতীয় বাহিনীর একটি সম্পূর্ণ শেষ হয়ে যায়। ৪ঠা ডিসেম্বর পাকসেনারা কামালপুরে আত্মসর্মপণ করে। বিকাল ৪টায় ভারতীয় অফিসার আমাকে ডেকে জানতে চাইলেন কে চিঠি এবং পতাকা নিয়ে কামালপুর যেতে পারবে। মুক্তিযোদ্ধা বশীরকে নির্বাচন করি। আমার জাম্পারটি সবুজ রংয়ের ফুলহাতা ছিল। বশীরকে তা দিয়ে দিই ভারতীয় অফিসারের কথা মত। বশীর জাম্পারটি পরে আমার স্টেনটি নিয়ে রওনা হয়ে যায়। অপরদিক থেকে সঞ্জু নামক মুক্তিযোদ্ধাকে পাঠানো হয়েছিল। সন্ধ্যা ৬টায় বশীর এবং সঞ্জু ফিরে আসে। পাকসেনারা ছিল ১৬১ জন এবং দু'জন অবাঙ্গালী অপারেটর ছিল। দু'জনের মধ্যে ১জন মেয়েও ছিল। পাক সেনারা ভারতীয় বাহিনীর কাছে আত্মসর্মপণ করে। কামালপুর মুক্ত হয়। পরে ১১ই ডিসেম্বর জামালপুর মুক্ত হয়। মেজর তাহেরকে উদ্ধার করার জন্য সরকার আমাকে বীরপ্রতীক উপাধিতে ভূষিত করেন।

মিজানুর রহমান খান
১১-১২-১৯৭৫

সাক্ষাৎকারঃ লেঃ কর্নেল এম, এ, মান্নান*
১১-১২-৭৯

আমি (৩০-৩১ জুলাই 'জেড' ফোর্সের কামালপুর সংঘর্ষে) আহত হওয়ার পর আমাকে নিয়ে যাওয়া হয় পুনা। সেখানে একদিন চিকিৎসার পর হেলিকপ্টার যোগে আমাকে নিয়ে যাওয়া হয় ১৫১ বেইস হাসপাতাল গৌহাটিতে। সেই হাসপাতালে আমি এক মাসাধিককাল চিকিৎসাধীন ছিলাম। আগষ্ট মাসের শেষের দিকে জেঃ জিয়া আমাকে দেখতে সেখানে যান। ক্রমে আমি কিছুটা আরোগ্য লাভ করি। আমি খবর পাই যে, আমার

* ১৯৭১ সালে লেফটেন্যান্ট হিসাবে কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে লেঃ কর্নেল পদে উন্নীত হন। বিবরণটি প্রকল্প কর্তৃক ১১-১২-৭৯ তারিখে গৃহীত সাক্ষাৎকার থেকে সংকলিত।

পেরেন্টস কলকাতার দিকে গেছেন। তখন আমি জেঃ জিয়ার কাছে ক'দিনের ছুটি প্রার্থনা করি। তিনি আমার ছুটি মঞ্জুর করেন। আমি কলকাতা চলে যাই। সেখানে ৪/৫ দিন থাকার পর জেনারেল ইসলামের কাছে খবর পাই যে, সমস্ত সেক্টর কমান্ডার ৮ থিয়েটার রোডে কনফারেন্স ডাকা হয়েছে এবং জেনারেল জিয়াও কনফারেন্সে আসবেন। ঐ কনফারেন্সে বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ সেক্টরসমূহের রুপরেখা ও নানাবিধ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। এরপর আমি আমার ১নং বেঙ্গল রেজিমেন্টের ইউনিটে ফিরে আসি। তারপর শুনতে পাই যে ১১ নং সেক্টর নামে একটি নতুন সেক্টর গঠিত হয়েছে যার হেড কোর্য়াটার মহেন্দ্রগঞ্জে।কর্নেল তাহের সেক্টর কমান্ডারের দায়িত্ব নেন। আমি যেহেতু অসুস্থ ছিলাম তাই আমাকে দুই নং সাবসেক্টরে দেওয়া হয়। সেক্টর এক্সিকিউটিভ হিসাবে আমি দায়িত্ব ভার গ্রহণ করি।

এই সেক্টরে আমার যোগদান করা থেকে শুরু করে দেশ স্বাধীন হওয়া পর্যন্ত ছোট বড় উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলোই আমি বলবো।

কামালপুরে পাকিস্তান আর্মির যে ঘাঁটি ছিল তা অত্যন্ত সুদৃঢ় ছিল। ঐ ঘাঁটির সমস্ত বাংকারগুলো ছিল সিমেন্টের আর-সি-সি বাংকার। কমিউনিকেশন ট্রেঞ্চ দিয়ে সেগুলো কানেক্টেড ছিল। কামালপুর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি ছিল। তাই তারা এটাকে খুব শক্ত করেছিল, কারণ কামালপুরে যোগাযোগ বিস্তৃত ছিল বক্সিগঞ্জ, শেরপুর, জামালপুর, মধুপুর হয়ে ঢাকা পর্যন্ত। তাই এই সেক্টর পাকিস্তানীদের কাছে যেমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল তেমনি আমাদের দিক থেকেও ছিল গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য। পাকিস্তানীরা জানতো এই সেক্টরে তাদের পতন হলে ঢাকা পৌঁছা তাদের পক্ষে মুশকিল হয়ে পড়বে। আমি আমার সহকর্মীদের বলেছিলাম, কামালপুরের পতন হলে সাতদিনের ভিতর ঢাকার ও পতন ঘটবে। মূলতঃ কামালপুরের পতন হলো ৪ তারিখ বিকেলে এবং এর কয়েক দিনের মধ্যে ঢাকার ও পতন হলো। এই বাহিনীর ঢাকা পৌঁছাতে সময় লাগলো ৭/৮ দিনের মত। উল্লেখ্য, কামালপুরে যে ট্রুপস ঢুকেছিল তারাই প্রথম ঢাকা পৌঁছেছিল। কামালপুরে যুদ্ধে পাকিস্তানীদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। অবশ্য তারা যুদ্ধের ব্যাপারে প্রচুর মিথ্যা প্রচারণা চালিয়েছিল। তাদের প্রচারাণার এক-দশমাংশ সম্ভবত সত্য।

আমি এই সেক্টরে যোগদানের পর আরও অনেক ঘটনা বা যুদ্ধ হয়, যেমন ধানুয়া-কামালপুরের যুদ্ধ। ধানুয়াকামালপুর কামালপুরের পরেই একটি গ্রাম। এই গ্রামটির কন্টিনিউয়েশান ভারত সীমান্তের ওপারের গ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত। সীমিত হাতিয়ার নিয়ে যেহেতু আমার পাকিস্তানীদের সুগঠিত ক্যাম্প থেকে উৎখাত করতে পারছিলাম না তাই বিকল্প পন্থায় ধানুয়াকামালপুর থেকে এ্যামবুশ করার চেষ্টা করছিলাম একটা ডিফেন্স নিয়ে। এই ধানুয়াকামালপুর একটা কন্টিনিউয়েশান ছিল ফিরোজপুর হয়ে বক্সিগঞ্জের দিকে। এই পথে আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে আমি ৪ থেকে ৬ সপ্তাহের মধ্যে ৬/৭ খানা পাকিস্তানী আর্মির গাড়ি মাইনের সাহায্যে ধ্বংস করতে সক্ষম হয়েছিলাম। বক্সিগঞ্জ থেকে কামালপুরের দুরুত্ব ৭ মাইল। পরবর্তী পর্যায়ে তারা কোনো গাড়ী নিয়ে কখনো মাইনের ভয়ে এই দূরুত্ব অতিক্রম করতে পারেনি। অতিক্রম করতে চাইলেও গরু কিংবা মহিষের গাড়ী দিয়ে আগে পথ পরীক্ষা করে নিতো। তারপরও পরীক্ষিত পথে তারা বির্পযয়ের সম্মুখীন হয়েছিল। আমার মনে আছে, একদিন আমরা ছোট একটি দল নিয়ে কামালপুর এবং বক্সিগঞ্জের মাঝখানে এ্যামবুশ লাগিয়ে পাকিস্তানীদের অপেক্ষায় বসে ছিলাম। কামালপুরের পাকিস্তানীদের জন্যে খাবার-দাবার সরবরাহ হতো বক্সিগঞ্জ থেকে। এ পথে সন্দেহজনক এক লোক যাওয়ার সময় আমরা তাকে ধরি এবং এক অফিসারের জন্যে প্রেরিত খাবার-দাবার এবং পাকিস্তানীদের কিছু চিঠিপত্র হস্তগত করি। উর্দু- ইংরেজীতে লেখা ঐসব চিঠির পাঠ উদ্ধার করে আমরা জানতে পারি দিন আর বেশী নয়, তারা হ্যান্ডসআপ করবে।

আরও একটি ঘটনা- তারিখ ঠিক মনে পড়ছে না। সেদিন আমরা ৬০/৭০ জনকে নিয়ে আখক্ষেতের ভিতর ডিফেন্স নিয়েছি। পাকিস্তানীরা বেরিয়ে আসে।তাদের সাথে প্রচন্ড গোলাগুলি হয়। এতে পাকিস্তানীদের যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি হয়। আমার দুই জনের একটা ছোট্ট দল ছিল। তাদের নাম মনে পড়ছে না। ১১ নং সেক্টরের ১১৩ জনের যে লিস্ট আছে তাদের কেউ হবেন। তারা ট্রেঞ্চের পিছনে বসা ছিল। সেখান থেকে তারা

পাকিস্তানীদেরকে আক্রমণে ব্যস্ত ও মরীয়া হয়ে উঠেছিল। এক পর্যায়ে বুলেট শেষ হয়ে গেলে এরা পাকিস্তানীদের হাতে মারা যায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জাপানীদের মত লাস্ট বুলেট এরা লড়াই করেছিল। এদেরকে বাংলাদেশে নিয়ে এসে সামরিক মর্যাদায় দাফন করি। এদের স্মৃতিফলক বর্তমান।

ধানুয়াকামালপুরে আমরা যে ডিফেন্স নিয়েছিলাম তার একটি ঐতিহাসিক ঘটনা সেপ্টেম্বর মাসের কোন সময়ে ঘটেছিল। সেটা পরিচালনা করেছিলেন প্রথম বেঙ্গলের একটি কোম্পানী। অধিনায়ক ছিলেন মেজর জিয়াউদ্দিন। তার সাথে অফিসার ছিল বর্তমান কর্নেল পাটোয়ারী। তারা ধানুয়াকামালপুরে ডিফেন্স নিলেন। পাকিস্তানীরা এসে আক্রমণ করে, ফলে প্রচন্ড সংঘর্ষ বাধে। পাকিস্তানীদের প্রায় ৩০/৪০ জন মারা যায়, আমাদের পক্ষে মাত্র একজন আহত হয়। পাকিস্তানীদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। সেই অপারেশনে আমরা পাঞ্জাবীদের একটা মৃতদেহ নিয়ে আসতে সক্ষম হই। মৃতদেহের কপালে গুলি লাগে। এই মৃতদেহ আমাদের সকল সৈন্যকে দেখানো হয়। ফলে তাদের মনোবল বেড়ে যায়। অবশ্য পরে মুসলমান হিসেবে কবর দেওয়া হয়। পরে আমরা যখন ফিরে যাই তখন শুনতাম পাকিস্তানীরা কার নাম ধরে ডাকছে। সম্ভবতঃ মৃত লোকটিরই।

এ ছাড়াও কামালপুরে এমন কোন দিন ছিল না যে পাকিস্তানীরা শান্তিতে বসবাস করতে পারতো। কামালপুর-বক্সিগঞ্জে পাকিস্তানীদের যে টেলিফোন যোগাযোগ ছিল তা আমরা কেটে দিতাম। এক পর্যায়ে ১০/১২ জনের একটা ছোট দলকে এ ধরনের অপারেশনে পাঠাই। তারা প্রথমে টেলিফোনের তার কেটে দিয়ে ওঁৎ পেতে অপেক্ষা করতে থাকে। পরে যখন পাকিস্তানীদের তার ঠিক করার পার্টি আসে তখন তাদের উপর আক্রমণ করে বসে। গোলাগুলি করে। পাকিস্তানীদের ক্ষতিসাধন করে ফিরে আসে। আমাদের কোন ক্ষতিই হয়নি।

আরও একটি ঘটনা। অক্টোবর মাসের কোন এক সময় ইন্ডিয়ান আর্মির একটি ব্যাটালিয়ন দিয়ে পাকিস্তানীদের উপর আক্রমন চালানো হল। সেই আক্রমণে ইন্ডিয়ার একটি কোম্পানী কামালপুরের একটু পিছনে এ্যামবুশ করে। যখন তাদের উপর আক্রমণ চলছিল তখন মুক্তিযোদ্ধাদের দু'টি কোম্পানীও তাদের সাথে ছিল। কামালপুরের র্ফোসকে সহায়তা করার জন্য বক্সিগঞ্জ থেকে মর্টার নিয়ে তিনটি পাকিস্তানী গাড়ী আসছিল। তখন রাস্তায় এ্যামবুশ করে গাড়ী সমেত পাকিস্তানীদের খতম করা হয়।

তারপর সম্ভবতঃ নভেম্বর মাস হবে। ইন্ডিয়ান আর্মির মাউন্টেন বিগ্রেডের একটি ব্যাটালিয়ন নিয়ে কামালপুর আক্রমণ করানো হয় এবং একটি ব্যাটালিয়ন দিয়ে কামালপুর- বক্সিগঞ্জের মাঝে এ্যামবুশ লাগানো হয়। আমাদের দু'টি কোম্পানী। একটির কমান্ডার আমি নিজে, সেটা নিয়ে আমি একটা ব্লকিং পজিশন তৈরী করি। সেটা কামালপুর মেইন পজিশন থেকে প্রায় ১৫০ গজ দুরে। আমার বিপরীতে ছিলেন বর্তমান মেজর মিজান। তার কোম্পানী সমেত তাঁকে নিয়ে একটি ব্লকিং পজিশন তৈরী করা হয়। আমাদের উপর নির্দেশ ছিল আমরা আখ ক্ষেতের ভিতর ট্রেঞ্চ খুঁড়ে পজিশন নিয়ে বসে থাকবো, যেন পাকিস্তানীরা এই দিক থেকে পালিয়ে যেতে না পারে। যখন আমরা এই পজিশনে পৌঁছালাম তখন রাত প্রায় সাড়ে তিনটা। আমাদের সাপোর্টে ছিল ইন্ডিয়ান একটি আর্টিলারী রেজিমেন্ট এবং একটি মর্টার বাহিনী। তারা কামালপুরের উপর শেলিং করছিল। সকালের দিকে যোগাযোগের জন্য আমাদের কাছে ছোটছোট অয়্যারলেস সেট দেয়া হয়। কর্নেল তাহের থাকলেন ব্রিগেডিয়ার ক্লেয়ারের সঙ্গে যিনি ৯৫ মাউন্টেন ব্রিগেডের ব্রিগেড কমান্ডার ছিলেন। ওখানে তিনি তাদের সাথে এই অপারেশনটা কো-অর্ডিনেশন করছিলেন। আমি যখন আমার পজিশনে পৌঁছে গেলাম তখন ছিল সকাল সাড়ে চারটা। তখন ইন্ডিয়ান আর্টিলারী ফায়ার করছিল। বেশ কতগুলো আর্টিলারী শেল আমাদের পজিশনের উপর এসে পড়লো। আরা এই কোম্পানীতে মোট ১০৯ জন ছেলে ছিল। তার মধ্যে ৯ জন আমার অত্যন্ত বিশ্বস্ত ছিল। এরা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে এলোপাতারি দৌড়াদৌড়ি করে পালিয়ে যেতে লাগলো। মাত্র ক'জন ছেলে নিয়ে আমি সেই পজিশনে পৌঁছালাম। তারপর অয়্যারলেস সেটে কর্নেল তাহেরের সাথে যোগাযোগ করি এবং আমাদের পজিশনের উপর শেলিংয়ের বিস্তারিত ব্যাপার তাকে জানাই এবং ফায়ারিং বন্ধ করার জন্য তাঁকে অনুরোধ করলাম। আমি বুঝে উঠতে পারলাম না ফায়ারিং কোন পক্ষের, কারণ এই পজিশনের ওপর ফায়ার

করার কোন কথা ছিল না। তিনি ফায়ার বন্ধ করলেন। সম্ভবতঃ রেঞ্জিংয়ে কোন ডিফিকাল্টি ছিল, যার জন্য এটা হয়েছিল। পরে তাঁকে আমি ফায়ারিং কারেকশন জানাই। তখন সকাল হয়ে আসছে। কর্নেল তাহের এক পর্যায়ে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন লেঃ মিজানের সাথে আমার কোন যোগাযোগ আছে কিনা। আমি বললাম এখন নেই। তিনি বললেন তাকে কল দাও, আমিও তার খোঁজ নিচ্ছি। তিনি ৫/৬ জনকে নিয়ে মিজানের পজিশনের দিকে গেলেন। প্রায় ৪৫ মিনিট থেকে ঘন্টাখানেক পর আমি সেটে কান্নার আওয়াজ শুনতে পারলাম। কান্না বিজড়িত কণ্ঠে বেলাল বলতে লাগলো শেলিং-এ তাহের ভাইয়ের পা বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। মিজানের পজিশনের কাছে পাকিস্তানীরা তাকে দেখতে পেয়ে ৬০ এম-এম মর্টার থেকে শেলিং করে। তার একটি পা নষ্ট হয়ে যায়। ৩০/৪৫ মিনিট পর একটি হেলিকপ্টার এস কর্নেল তাহেরকে নিয়ে যায়। ১০-১১টা পর্যন্ত সেই পজিশনে থাকলাম। পরে আমার কাছে এক মেসেঞ্জার একটা কাগজ নিয়ে আসেন, কর্নেল তাহেরের লেখা। তাতে লেখা ছিল আমাকে এই সেক্টরের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। লেখাটুকু পুরোপুরি স্মরণ নাই। সম্ভবতঃ এ ধরনের "Clear the road from here to Dacca. Look after my bodys. I leave everything to you and God bless you." আরও অনেক কিছু ছিল। আমি অত্যন্ত মর্মাহত হলাম। কারণ আজ এই সেক্টরের দায়িত্ব আমার উপর দেয়া হয়েছে। আমি জানি না এই দায়িত্ব আমি সুষ্ঠভাবে পালন করতে পারবো কিনা। আমার মনে হচ্ছিল যেন আকাশটা আমার মাথায় ভেঙ্গে পড়েছে। যা হোক, সেই অবরুদ্ধ অবস্থায় আমরা বিকেল পর্যন্ত সেখানে থাকলাম। স্কোয়াড্রন লীডার হামিদউল্লাহকে এই দায়িত্ব না দিয়ে আমার উপর তিনি এই দায়িত্ব দেন। অবশ্য পরে হামিদউল্লাহ আসার পর তিনি নামে মাত্র কমান্ডার রইলেন। অপারেশনের দায়িত্ব আমার উপর দেন, কারণ তিনি বিমানবাহিনীর লোক। অপারেশনের এইসব ব্যাপারে তিনি ততো অভিজ্ঞ নন। কর্নেল তাহের আহত হওয়ার আমরা সবাই মর্মামত হই। একটা বিরাট শূন্যতারও সৃষ্টি হয়েছিল। অনেকটা গোটা পরিবার আকস্মিক পিতৃহীন হয়ে পড়ার মত। যাহোক অনেক কষ্টে আমি এই পরিস্থিতি সামলে নিয়ে ছিলাম। কর্নেল তাহের গৌহাটিতে চিকিৎসাধীন থাকাকালে আমি সেখানে গিয়ে তার সাথে দেখা করে যুদ্ধ বিষয়ক পরামর্শ করি এবং সেক্টরে ফিরে আসি।

ডিসেম্বরের তিন তারিখ ভারত আনুষ্ঠানিক যুদ্ধ ঘোষণা করে। ১ তারিখ থেকে আমরা কামালপুর অবরুদ্ধ করে রাখি। আমাদের সাথে ছিল এক ইন্ডিয়ান রেগুলার ব্যাটালিয়ান, মুক্তিযোদ্ধা তিন কোম্পানী। আর ৯৫ মাউন্টেন ব্রিগেডের দুইটি ব্যাটালিয়ন কামালপুর বাইপাস করে কামালপুর পতনের আগেই বক্সিগঞ্জের দিকে চলে যায়। তখন পাকবাহিনী বক্সিগঞ্জ থেকে পিছু হটে যাচ্ছে। ৪ তারিখ সকালে ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্সের দুটি বিমান কামালপুরের উপর স্ট্রাফিং শুরু করে। দ্বিতীয়বার আক্রমণ হয় ১২টা কি ২টায়- তৃতীয়বারের আক্রমণের কথা ছিল বিকাল চারটায়। ইতিমধ্যে পাকিস্তানী বাহিনী যথেষ্ট হেস্তনেস্ত হয়েছে। আমরা অয়্যারলেস সেটে ইন্ডিয়ানদের কনগ্র্যাচুলেশন শুনছিলাম। এক পর্যায়ে কামালপুরে তাদের যে ফোর্স ছিল তারা কন্টাক্ট করে ব্যাটালিয়ন হেডকোর্য়াটারের সাথে এবং সাহায্য চেয়ে পাঠায় ফোর্সের জন্য। তারা জানালো তাদের কিছু করণীয় নাই। এটা বুঝে তখন জেনারেল হিরা, ব্রিগেডিয়ার ক্লেয়ার ও আমি তিনজনে বসে বুঝাপড়া করে একটা সারেন্ডার নোট তৈয়ার করি। একজন ফ্রিডম ফাইটারকে একটি সাদা ফ্ল্যাগ হাতে দিয়ে তা কামালপুর ঘাঁটি ভিতর পাঠাই। প্রায় ঘন্টাখানেক পরে সে যখন ফেরে নাই, তখন আমি অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়লাম। দ্বিতীয়বার আর একটি ছেলেকে অয়ারলেস সেট সাথে দিয়ে আমার সাথে যোগাযোগ রেখে কামালপুর ঘাঁটিতে পাঠাই। সে ওখানে যাওয়ার পর পাকসেনার দ্বিতীয় ছেলেটিকে রেখে প্রথম ছেলেটিকে পাঠিয়ে দেয়। তাকে আমরা জিজ্ঞাসাবাদ করি। সে জানালো, আমাকে তারা উপরে শেলিং হচ্ছে বলে নীচে বাংকারে নিয়ে যায়। রুটিটুটি খেতে দেয়। তারা আমার সাথে ভাল ব্যবহার করে। যা হোক দ্বিতীয় ছেলেটির সাথে কয়েকবার সেটে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলাম। পারলাম না। সে তখন তাদের সাথে আলোচনায় ব্যস্ত ছিল। তাছাড়া তারা তাকে সেটে কথা বলতে দিতে এলাউ করেনি। কিছুক্ষন পর সে যখন সেটে আসলো তখন যোগাযোগ হলো। ছেলেটি জানালো তারা সারেন্ডার করতে প্রস্তুত আছে। তখন আমি তাকে বললাম যে, আমি আর একজনকে পাঠাচ্ছি, তাদের জে-সি-ও বা অফিসার লেবেলের কাউকে তার সাথে আসতে বলো। সে গেল। যাওয়ার পর পাকিস্তান

আর্মির একজন জে-সি-ও, মিলিশিয়া কাপড় পরা, সম্ভবতঃ মিলিশিয়াই হবে-ছেলেটির সাথে এসে আমাদের সাথে যোগাযোগ করে এবং সারেন্ডার- এর কথা ব্যক্ত করে। তখন আমরা তাদেরকে সারেন্ডার-এর পদ্ধতি বলে দিই। সে ফিরে যায় এবং হাতিয়ার মাটিতে রেখে সবাইকে সারেন্ডার করায়। আমরা তাদের সব হাতিয়ার এবং সকলকে আমাদের পজিশনে নিয়ে আসি। এদের মধ্যে একজন অফিসার, ইনি সম্ভবতঃ ক্যাপ্টেন হাসান কোরেশী, একজন জে-সি-ও, এবং ১০০ জনের মত সিপাই, ৩০ জনের মত রেঞ্জার এবং কিছুসংখ্যক রাজাকার ও ছিল। এদেরকে আনা হলো। সমস্ত হাতিয়ার আনা হলো। আমরা যে হাতিয়ার পেলাম তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলো এম-জি ৩৬টি এবং আরও ছোটখাট হাতিয়ার। যারা সারেন্ডার করে তাদেরকে রাখার ও খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করা হলো। তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে, আমি অবরুদ্ধ ২৪ ঘন্টা ব্যস্ত ছিলাম। খাওয়া-দাওয়া ছিল না। তাই বিশ্রামে চলে যাই। Next day morning about 8-O'clock I came back to the same place and there I found one Indian Capt. and one Indian Major. They were talking to Capt. Quoreishi etc.

যুদ্ধবন্দী আচরণ সংক্রান্ত কথাবার্তা হলো। তারপর দিন আমরা বক্সিগঞ্জ পৌছালাম। ব্রিগেডিয়ার ক্লেয়ার সেখানে একটি রেস্ট হাউজে ছিলেন। আমাকে দেখে জড়িয়ে ধরলেন এবং কনগ্র্যাচুলেশন জানালেন। বললেন Mannan, our country recognize your country as a sovereign state. Now your morale should be high. We are going to fight a real battle to the pakistanis.

বক্সিগঞ্জে তখন কোন পাকিস্তানী ছিল না। তারা জামালপুরের দিকে চলে গেল। আমি আমার মুক্তিবাহিনী নিয়ে জামালপুরের দিকে অগ্রসর হলাম। আমি আগেই বলেছিলাম তাদের দুটি ফোর্স কামালপুর বাইপাস করে চলে গিয়েছিল। এই ফোর্সগুলো যখন টাঙ্গাইলের দিকে যাচ্ছিল তখন ইন্ডিয়ান ফোর্স তাদেরকে বাধা দেয়, যেন তারা টাঙ্গাইল যেতে না পারে। তারা যখন বাধা পেল তখন এক ব্যাটালিয়ন নান্দাইল হয়ে ময়মনসিংহের দিকে যে রাস্তা ছিল সেদিকে যেতে চেষ্টা করে। তারাও বাধাপ্রাপ্ত হলো। আমি আমার ফ্রিডম ফাইটারদের নিয়ে শেরপুর হয়ে জামালপুরের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলাম। তখন আমি প্রচন্ড গোলাগুলির শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম। তখন আমি নদী পার হতে পারি নি, কারণ নদীতে কোন ফেরীর বন্দোবস্ত ছিল না। আর আমি দেখতে পাচ্ছিলাম দুটি ইন্ডিয়ান এয়ারক্রাফ্ট জামালপুরের উপর ভীষণভাবে গুলিবর্ষণ করে চলেছে। আমি তুমুল গোলাগুলির আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলাম। প্রায় ঘন্টা দু'য়েক সংঘর্ষের পর সব শান্ত হলো। ইন দি মিন টাইম আমি ব্রহ্মপুত্র নদ ক্রস করে জামালপুর সাইডে পৌঁছে গেলাম এবং অগ্রসর হতে লাগলাম। খবর পেলাম, পাকসেনাদের পুরো কনভয় ডেস্ট্রয় করা হয়েছে এবং প্রায় ৬ জন অফিসার সহ ৩৬০ জন পাকসেনাকে সেখানে বন্দী করা হয়েছে। তাদেরকে ইন্ডিয়ান আর্মি ঘেরাও করে জামালপুর পি.টি.আই-তে রাখে। তখন আমি সেখানে যেয়ে তাদের সাথে দেখা করি। বন্দী ছয় জন অফিসারের মধ্যে একজন মেডিক্যাল কোরের সদস্য ছিলেন। আর একজন সিনিয়র মেজর ছিলেন, যিনি এই ব্যাটালিয়নের ও-সি ছিলেন। তার নাম মনে নেই, তিনি পাঠান এবং কর্নেল তাহেরের কোর্স মেট। তার সাথে কর্নেল তাহের সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছিল। আলাপ-আলোচনার মধ্যে একজন ইন্ডিয়ান গার্ড রেজিমেন্টের সি-ও এসে যোগ দেন। পাক সিনিয়র মেজর আমাকে প্রশ্ন করেন, Mannan, we are fighting among us. আমি জবাব দেই, স্যার আপনারা পহেলা মার্চ থেকে ২৫শে মার্চ যে হত্যাকান্ড করেছেন তার রিঅ্যাকশন স্বরুপ এ ছাড়া আমাদের কিছু করণীয় ছিল না। তারপর আমি তাঁকে আরও ঘটনার কথা বললাম। তিনি বললেন Happy news that you are independent but I wish you are not like Bhutan. আমি প্রত্যুত্তরে বলি, Sir, if we can get rid of you, we can get rid of any one. We will never replace one master by another.

যাহোক, জামালপুর থেকে আমরা ময়মনসিংহের দিকে অগ্রসর হতে থাকলাম আর ইন্ডিয়ান আর্মির যে দু'টি ব্যাটালিয়ন ছিল তারা টাঙ্গাইলের দিকে অগ্রসর হলো। আমি সেই দিকে যেতে চেয়েছিলাম। কিন্তু জেনারেল নাগরা, যিনি এই ডিভিশনের কমান্ডার ছিলেন, তিনি আমাকে সেদিকে যেতে বারণ করেন। তিনি বললেন,

তোমার সেদিকে যাওয়া প্রয়োজন হবে না। তুমি বরং এখানে লোকাল এ্যাডমিনিস্ট্রেশন এবং অন্যান্য সবকিছু তদারক কর। যা হোক আমি আমি লোকাল এ্যাডমিনিস্ট্রেশন এবং সবকিছু যা যা অর্গানাইজ করার দরকার ছিল সবকিছু অর্গানাইজ করার চেষ্টা করলাম। আমি আমাদের ছেলেদের জামালপুর হাই স্কুলে ক্যাম্প করে তাদেরকে সেখানে থাকতে দিলাম। ইতিমধ্যে আমি সংবাদ পেলাম যে, জামালপুর থেকে মাইল দেড়েক দুরে পাক রাজাকার থেকে উদ্ধারকৃত ৩০০টির মত হাতিয়ার জড়ো করেছে এবং কোথায়ও সেগুলো সরিয়ে ফেলার চেষ্টা করছে। আমি সেখানে গেলাম এবং তাদের সাথে কথা বললাম। তারা জানালো এই সমস্ত হাতিয়ার পাবনা যাবে। পরে আমি সেগুলো সীজ করলাম। হাতিয়ার গুলো নিয়ে তারপরের দিন ময়মনসিংহে আসি। এসে দেখি ময়মনসিংহ ও মুক্ত। এটা আনুমানিক ১০ই ডিসেম্বর। আমার হেড কোর্য়াটার টাউন হলে খুলি এবং আমার ফৌজ অর্গানাইজ করি। তারপর সিভিল এ্যাডমিনিস্ট্রেশন চালানোর জন্য আমরা নিজেরা উদ্যোগ নিই।

১১নং সেক্টরের আরও যুদ্ধ বিবরণ*

মেজর তাহের আগস্ট মাসে ১১ নং সেক্টরে আসেন। কিন্তু এর আগে বিখ্যাত পাকবাহিনীর কামালপুর বাংকারে সদাসর্বদা ক্ষুদ্র ক্ষুদ আঘাত হানতে থাকে অল্প সামরিক শিক্ষাপ্রাপ্ত অথচ গভীর মনোবলের ভিত্তিতে গঠিত বাংলার বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ। এখানে মাঝে মাঝে বিভিন্ন সময়ে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের জুনিয়র অফিসাররাও যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতেন। এসময়ে তরুণ মুক্তিযোদ্ধারা কামালপুর শত্রু শিবিরে ছোটখাট গেরিলা আক্রমণ চালিয়ে কিছু কিছু করে পাক- সৈন্য হত্যা করে দস্যুদের সদা ব্যতিব্যস্ত ও সন্ত্রাসের মধ্যে রাখতো। এই সময় বাংলার স্বাধীনতার যুদ্ধক্ষেত্রে আর একটি অমর নাম শহীদ সালাউদ্দিন কামালপুর রণাঙ্গনে উপস্থিত ছিলেন। তাছাড়া অন্যান্যের মধ্যে যাদের নাম উল্লেখযোগ্য তাদের মধ্যে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেন হাফিজ ও লেঃ মান্নান এবং মুক্তিফৌজ কমান্ডারদের মধ্যে যারা নির্দিষ্ট ভুমিকা রাখেন, তারা হচেছন কমান্ডার মুক্তা, কমান্ডার হেলাল, কমান্ডার পান্না, কমান্ডার ফয়েজুর। এর মধ্যে হেলাল কোম্পানীর একটি দিক রয়েছে। সেটা হল পাক-বাহিনীর কামালপুর বাংকারে এই শক্তিশালী পাক-ঘাটিটিকে ১১ নং সেক্টর থেকে মোট ১৮ বার ছোট-বড় আক্রমণ করা হয়েছে। তার মধ্যে হেলাল কোম্পানী মোট ১৪টি সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছে এবং ৪ঠা ডিসেম্বর কামালপুর মুক্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত এই কোম্পানী এখানে যুদ্ধরত অবস্থায় ছিল।

একদিন, সম্ভবতঃ ২৪শে জুলাই তারিখে, ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের দু'জন জুনিয়র অফিসার ক্যাপ্টেন শহীদ সালাউদ্দিন ও লেঃ মান্নান কামালপুরে শত্রুশিবিরে বাংকারে সশরীরে উপস্থিত হয়ে দু'জন খানসেনাকে হত্যা করে একটা চাইনিজ ও একটা জি-থ্রি রাইফেল নিয়ে আসে।

কামালপুরে রণাঙ্গনের একটি স্মরণীয় দিন ৩১শে জুলাই তারিখ। শেষ রাত্রের দিকে কামালপুর বাংকারে এক বিরাট ধরনের দুর্ধর্ষ আক্রমণ করা হলো। এই দুর্ধর্ষ আক্রমণের নেতৃত্ব দিচ্ছেন সম্মুখভাগে ক্যাপ্টেন শহীদ সালাউদ্দিন, লেঃ মান্নান ও ক্যাপ্টেন হাফিজ। বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ তুমুলভাবে লড়ে যাচ্ছেন এবং পিছন থেকে ব্যাক্তিগতভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের পরিচালনা করছেন মেজন মঈনুদ্দীন। কর্নেল জিয়াও তাঁর সদর দপ্তর নিয়ে এ সময় উপস্থিত ছিলেন। মোট কথা এই দুর্ধর্ষ আক্রমণটি সেদিন খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রেখেছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে কিছুটা ভুল বুঝাবুঝি না হলে হয়তো সেই দিনই কামালপুর মুক্তিবাহিনীর দখলে আসতো- ভুল বুঝাবুঝি উৎরে যেয়ে তবুও হয়তো বা কামালপুর দখল করা সম্ভব হতো যদি সেদিন বাংলার বীর সন্তান ক্যাপ্টেন সালাউদ্দিন শহীদ না হতেন।

যুদ্ধক্ষেত্রে ক্যাপ্টেন হাফেজ একটি কোম্পানীকে কমান্ড করছিলেন। আর একটা একটি কোম্পানীকে কমান্ড করছেন স্বয়ং শহীদ সালাউদ্দিন। নির্দিষ্ট সময়ে শহীদ সালাউদ্দিন নির্ধারিত জায়গায় পৌঁছলেন কিন্তু হাফিজ

---

* জুলাই ১৯৭২-এর সাপ্তাহিক 'বিচিত্রা'য় প্রকাশিত ''লেঃ কর্ণেল আবু তাহের- স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর সৈনিক'' শীর্ষক খালেদুর রহমান-রচিত প্রতিবেদন থেকে সংকলিত।

একশ গজ পিছিয়ে ছিলেন। এর মধ্যেই আরটিলারী ফায়ার শুরু হয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর ক্যাপ্টেন সালাউদ্দিন কামালপুর ক্যাম্পের ভিতরে চলে যান এবং আরটিলারী ফায়ার বন্ধ করতে পারেন। ওদিকে ক্যাপ্টেন হাফিজ আরটিলারীকে একশগজ আগের ফায়ার দিতে বলেন এবং আরটিলারী অফিসার ক্যাপ্টেন হাফিজ সাহেবের সিগনাল ও গোলা বর্ষণ করেন। ফলে সালাউদ্দীন কোম্পানীর বেশ কিছু ছেলে হতাহত হন এবং ক্যাপ্টেন সালাউদ্দিন স্বয়ং আঘাতপ্রাপ্ত হন। তবুও তিনি দমেননি। শত্রুদের অনেকেই মারা পড়ছিল এবং কেউ কেউ পালাতে চেষ্টা করছিল ও একজন পালিয়েও ছিল। ইতিমধ্যেই শত্রুপক্ষের মেশিনগান ফায়ার পশ্চিম দিক থেকে অর্থাৎ কামালপুর পোস্ট অফিস ও গোডাউনের মাঝামাঝি থেকে সালাউদ্দীন কোম্পানীর দিকে আসতে থাকে। দুর্ধর্ষ সৈনিক সালাউদ্দীন ভেবেছিলেন ঐ এম-জিটাকে স্তব্ধ করে দিতে পারলেই বিখ্যাত কামালপুর দখলে আসবে এবং এই ভেবে তিনি একাই গিয়েছিলেন সেই এম-জিটাকে মারতে। তিনি যখন গোডাউনের কাছ থেকে ফায়ার করবেন, ঠিক সেই সময়েই পোস্ট অফিসের দিক থেকে একটি এল-এম-জি হঠাৎ গর্জে উঠলো এবং বাংলার বীর সন্তান ক্যাপ্টেন সালাউদ্দীনের বুক ঝাঁঝরা করে দিয়ে গেল। ক্যাপ্টেন সালাউদ্দীন বীরের মত শহীদ হলেন। তাঁর মৃতদেহ আনা সম্ভব হয়নি এবং তার মৃতদেহ আনতে গিয়ে ১৭জন বেঙ্গল রেজিমেণ্ট সৈন্য আহত হয়েছিলেন। পরে শোনা গেছে শহীদ সালাউদ্দীনের লাশ পাক সেনারা সামরিক কায়দায় সমাধিস্থ করেছে।

সেদিন এই র্মমন্তদ যুদ্ধে শুধু ক্যাপ্টেন সালাউদ্দীন শহীদ হননি, আরও দু'জন জুনিয়র অফিসার, ক্যাপ্টেন হাফিজ ও লেঃ মান্নান গুরুতরভাবে আহত হন এবং আরও তিনজন জুনিয়র কমিশন্ড অফিসার আহত হন। সেদিনের আক্রমণে মুক্তিবাহিনীর পক্ষে বেঙ্গল রেজিমেণ্টসহ মোট ৬১জন সৈন্য বীরের মত শহীদ হন। অপরদিকে পাকবাহিনী হারায় একজন অফিসারসহ মোট ৭০ জন সৈন্য। সেদিন কামালপুর দখল করা সম্ভব হয়নি।

তারপর অমিতবিক্রমে কামালপুর আক্রমণ করা হয়েছিল। সেদিন ছিল ৯ই আগস্ট। এই আক্রমণে মুক্তিযোদ্ধাদের ভুমিকাই বেশী। তাছাড়া বেঙ্গল রেজিমেন্টের কিছু সৈন্যও ছিল। ৯ই আগস্ট রাত ৮-৩০ মিনিটে হেলাল কোম্পানীর ৩৭জন ছেলে বক্সিগঞ্জ-কামালপুর সড়কে এ্যামবুশ নিয়ে থাকে এবং তারা টেলিফোনের তার কেটে দিয়ে পাক বাহিনীর তার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়। এই দলের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার হেলাল। সেই রাত্রিটি ছিল মেঘাচ্ছন্ন, বিদ্যৎ চমকাচ্ছিল।

এই এ্যামবুশে থাকাকালীন বক্সিগঞ্জ থেকে কামালপুর গমনরত দু'জন রাজাকারকে এইদল গ্রেফতার করে দুটি রাইফেল ও ১০ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করে। এদের কে মহেন্দ্রগঞ্জে ক্যাম্পে পাঠিয়ে দিয়ে এই দল এখানেই এ্যামবুশে থাকে। কিছুক্ষণ এখানে এ্যামবুশে থাকার পর এই দলের টু-আই-সি বিচক্ষন লতা দেখতে পেল তাদের পজিশন থেকে দশ হাত দুরে দুজন রাজাকারসহ পাকবাহিনীর বিরাট বাহিনী পজিশন নিচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে লতা দিক নির্দেশ করে ফায়ার- এর আদেশ দিল। ফলে পাক দস্যুরা আর পজিশন নিতে পারেনি। ৭টা এস-এল-আর ও একটি এল-এম-জি দিয়ে বৃষ্টির মত গুলি ছুড়লো হেলাল-লতার দল। গুলির আঘাতে পাকবাহিনী দলের কমান্ডার আহত হয়ে গেল, তারপর অকথ্য মুক্তিবাহিনীর দলকে গালাগালি করতে লাগলো। ওরা সার্চ শুরু করলো। ততক্ষণে হেলাল কোম্পানীর দল ওখান থেকে উইথড্র করে চলে এসেছে। কিন্তু সবাই বিচ্ছিন্ন অবস্থায়। সবাইকে পাওয়া গেল কিন্তু লতা ও আর একটি ছেলেকে হেলাল খুঁজে পেল না। পরে ওরা রাত ১২টার সময় নির্দিষ্ট স্থানে এলো এবং খবর দিল একজন কর্নেল আহত ও ৪৭ জন পাক সৈন্য খতম হয়েছে। এই দুর্ধর্ষ আক্রমণে হেলালের কৃতিত্বের জন্য ওর কোম্পানীর নাম সেদিন টাইগার দেওয়া হয়েছিল। তারপর মেজর তাহের আগস্ট মাসের ১১ তারিখে মহেন্দ্রগঞ্জে ১১ নং সেক্টর পরিদর্শনে আসেন।

মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার হেলাল লেঃ কর্নেল তাহেরের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে কামালপুর রণাঙ্গনে অভুতপূর্ব কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। ২৬শে অক্টোবর এক সময়ে তিনি তার দল সহকারে কর্নেল তাহেরের নির্দেশে কামালপুরের পেছনে গেদ্দা ও উঠানুরপাড়ায় পর পর তিনদিন এ্যামবুশে থেকে বিস্ফোরণ ঘটানোর কাজ করেন।

তার মাইন বিস্ফোরণে এই এলাকার পাক-বাহিনী খুবই বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এক সময় এক মাইন বিস্ফোরণে ৪৫জন খান সেনা আহত হয়।

লেঃ কর্নেল তাহের এই হেলাল কোম্পানীর বিশেষ কৃতিত্ব দেখে নভেম্বর মাসে বক্সীগঞ্জ আক্রমণ করার জন্য পাঠান। এর মধ্যে কর্নঝোরাতে তিনি পাক বাহিনীর সঙ্গে এক তুমুল সংঘর্ষে ৪জন খানসেনাকে খতম করেন। বাকী খানসেনা পালিয়ে প্রাণ রক্ষা করে। ঐ সময় হলাল লেঃ কর্নেল তাহেরের নির্দেশে এই কোম্পানী ফিরে আসে এবং পরে এক প্লাটুন মুক্তিযোদ্ধা সহকারে মেলান্দাহানার পাটের গুদাম ধ্বংস করার আদেশ পায়। হেলাল কোম্পানী এই নির্দেশ মেলান্দাহর দিকে যাত্রা করে। এর মধ্যে কোন এক নদীতে পাকবাহিনী দালালদের ১২০০ মণী নৌকা ধ্বংস করে এবং পাক বাহিনীর সঙ্গে এখানে এক সংর্ঘষ বাধে। তারা তিনদিক থেকে এই হেলাল কোম্পানীকে আক্রমণ করে। তরুন মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার অতি বিচক্ষণাতার সাথে আক্রমণ প্রতিহত করে ১৩জন শত্রুসেনাকে খতম করেন। পরে তার বাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে মেলান্দহ যাত্রার পথি দুরমুরির পুল ধ্বংস করেন। পুল ধ্বংসের সময় পুলরক্ষী বাহিনী ও রাজাকারদের সাথে এক সংঘর্ষে তিনি ১৭ জন রাজাকারকে খতম করে ৬টি রাইফেল উদ্ধার করে তাহেরের কাছে জমা দেন।

তারপর ১৪ই নভেম্বর। এই ঘটনাটির কথা মহেন্দ্রগঞ্জ ক্যাম্পের কয়েক হাজার মুক্তিযোদ্ধাসহ এই এলাকার বাসিন্দা ইন্ডিয়ার জনসাধারণ চিরদিন মনে রাখবে।

১৩ই নভেম্বর দিবাগত রাত্রি ৩-২০ মিনিট লেঃ কর্নেল তাহের মুক্তিফৌজ কোম্পানী কমান্ডার হেলাল, সাঈদ (লেঃ কর্নেল তাহেরের ছোট ভাই), পান্না, লেঃ মান্নান, গোয়েন্দা অফিসার মোঃ মনিরুজ্জামান, আবেদীন, ভুইয়া- এদের সবাইকে ডাকলেন এবং বল্লেন, আজকে কামালপুরে শক্তিশালী আক্রমণ করা হবে। তিনি কিভাবে কোথা থেকে আক্রমণ করা হবে তা সবাইকে বুঝিয়ে দিলেন। তিনি কোম্পানী কমান্ডারদের মোট ৮৫ জন মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে কামালপুরের আশেপাশের কোন এক গ্রামে এ্যামবুশ নিয়ে থাকতে বল্লেন কোনরকম সাড়াশব্দ ব্যতিরেকে। তিনি আরও বলে দিলেন, তার নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত যেন কোন রকম গুলি বর্ষণ করা না হয়-আর যদি পাক-বাহিনী পালাতে চেষ্টা করে, তবে যেন তাদেরকে ধরা হয়।

যথাসময়ে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। যুদ্ধ পরিচালনা করছেন লেঃ কর্নেল তাহের স্বয়ং। তিনি অয়ারলেসের মাধ্যমে মুক্তিফৌজের রণাঙ্গনের খবর রাখছেন এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিচ্ছেন। সকাল ৯-৩০ মিঃ হঠাৎ তুমুল সংঘর্ষ থেমে গেল। পাকবাহিনীর ওদিক থেকে কোন রকম গুরি আসছে না। সবাই মনে করলো ওরা সবাই খতম। মুক্তিফৌজের মনে দারুণ উৎফুলভাব পরিলক্ষিত হচ্ছিলো সে সময়।এই মুক্তিযোদ্ধাদের রণাঙ্গনে কর্নেল তাহের একটি অয়ারলেস সেট নিয়ে দৌড়ে গেলেন, কি ব্যাপার। তখন তার সঙ্গে ছিল তার দুই ভাই বেলাল ও বাহার- তারা উভয়েই আসন্ন জয়ের জন্য খুবই আনন্দিত। লেঃ কর্নেল মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডারদের জিজ্ঞাসাবাদ করছেন, ঠিক এই সময় লেঃ মিজান এস খবর দিল কামালপুর ক্যাম্প এখনই চার্জ করতে হবে। কর্নেল তাহের ভাবছেন কোন দিক থেকে কামালপুর চার্জ করা হবে। ঠিক এমন সময় একটি গোলা এসে তাঁর পায়ে লাগলো। আর্ত চিৎকারের সঙ্গে সব মুক্তিযোদ্ধা দৌড়ে ঘটনাস্থলে আসে। এসে দেখতে পায় এক অসহণীয় করুণ দৃশ্য-তাহের রণনেতা কর্নেল তাহের চিরদিনের মত তার একটি পা হারিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে মুক্তিফৌজদের মধ্যে কান্নার রোল পড়ে গেল যারা নাকি কিছুক্ষণ দুর্ধর্ষ পাক সৈন্যকে হত্যা করেছে- তারা সবাই শিশুর মত কাঁদছে। কিন্তু লেঃ কর্নেল তাহের, সেই অসীম সাহসী রণনেতা, এত বড়ো কঠিন আঘাত পেয়েও একটুও বিচলিত হননি। তখন তার মাত্র চারটি কথা ছিল, (১) যুদ্ধ চালিয়ে যাও-(২) ঐ জায়গা দখল কর (যে জায়গায় তিনি আহত হয়েছেন), (৩) কামালপুর দখল করতে হবে, (৪) আমি আসছি এবং এসে যেন দেখতে পাই কামালপুর থেকে ঢাকার রাস্তা পরিষ্কার।- তারপর আহত লেঃ কর্নেলকে কাঁধে করে নিয়ে আসে অশ্রুসিক্ত চোখে মুক্তিযোদ্ধা মিঠু (এই মুক্তিযোদ্ধা খুবই কৃতিত্বপূর্ণ ভুমিকা রেখেছে কামালপুর রণাঙ্গনে), সুজা, লেঃ মিজান. ভূইয়া ও আবেদীন। তারা গারোডোবা পর্যন্ত নিয়ে আসে তাঁকে। ওখান থেকে হেলিকপ্টারে লেঃ

কর্নেল তাহেরকে ভারতের পুনার হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ডাক্তারগণ কর্নেল তাহেরকে দেখে বলেছেন- তিনি যদি জ্ঞান হারাতেন তবে তাকে বাঁচানো সম্ভব হতো না। কর্নেল তাহেরের নেতৃত্বে সেদিনের সেই কামালপুরের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যুদ্ধে পাকবাহিনী ১৩৫ জন সৈন্য হারায়। ধ্বংস হয়েছিল ৬টি ট্রাক. ১টি জীপ এবং বহুসংখ্যক হাতিয়ার।

তারপর লেঃ কর্নেল তাহেরের অনুপস্থিতে এই সেক্টরটি সংযুক্তভাবে নেতৃত্ব দেন মেজর আজিজ, লেঃ মান্নান ও এয়ারফোর্সের অফিসার জনাব আবু তাহের সাহেবের বড় ভাই জনাব আবু ইউসুফ। এই সময়ে কর্নেল আহত হওয়ার পর মুক্তিযোদ্ধারা প্রতিনিয়তই কামালপুর আক্রমণ করতে থাকে।

১৬ই নভেম্বর তারিখের এক আক্রমণে খানসেনাদের মেজর রিয়াজ আহত হয় ও ১২ জন খান সেনা নিহত হয়।

২০শে নভেম্বর তারিখের আর এক আক্রমণে এই দিনের আগের রাত্রে পাকবাহিনীর রিইনফোর্সমেন্ট করার সময় ৮০ জন পাকসেনা মারা পড়ে। এই সময় প্রতিটি আক্রমণের সময়ে কামালপুরকে ঘেরাও অবস্থায় রেখে আক্রমণ করা হয়।

১লা ডিসেম্বর আর এক আক্রমণের সময় সমূহ ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয় পাকবাহিনীকে। এখানে একটি কথা বলে রাখা দরকার যে, কোম্পানী কমান্ডার হেলালসহ মেজর তাহেরের সহোদর বড় ভাই জনাব আবু ইউসুফ, ছোট ভাই কমান্ডার সাইদ (এক্সপ্লোসিভ এক্সপার্ট), বেলাল বাহার (এক্সপ্লোসিভ এক্সপার্ট) ও আনোয়ার হোসেন (এক্সপ্লোসিভ এক্সপার্ট)- এই পাঁচ ভাই প্রত্যেকটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন।

৪ঠা ডিসেম্বর কয়েকজন অফিসারসহ বেলুচ, পাঠান এবং পাঞ্জাবী সৈন্য-মোট ১৬২ জন পাক সৈন্য মুক্তিফৌজ ও মিত্রবাহিনীর কাছে আত্মসর্মপণ করে।

পাক বাহিনীর শিবিরে গিয়ে অসীম সাহসী মুক্তিযোদ্ধা সঞ্জু বাকযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত তারই জয় হয়। পাকবাহিনীর অফিসারকে দিয়ে সারেন্ডারপত্র সই করিয়ে সঞ্জুই প্রথম বাংলাদেশের পতাকা উড়ায়। তারপর ৬ তারিখে বক্সীগঞ্জ ও মোরাপুর মুক্তিবাহিনীর দখলে আসে। ৭ তারিখে দখল হয় দেওয়ানগঞ্জ ও বাহাদুরাবাদ ঘাট। এই বাহাদুরাবাদ ঘাট দখল কারী কমান্ডার ফয়েজুর রহমান জামালপুরের দিকে অগ্রসর হন। তারপর তুমুল সংঘর্ষে ৪০ জনের মতে পাকসেনা নিহত এবং ৬০০ জনের উপর শত্রুসেনা বন্দী হলে ১১ই ডিসেম্বর সকাল বেলা তিনিই জামালপুরের বুকে প্রথম স্বাধীনতার পতাকা উঠান। তারপর মেজর আজিজ লেঃ কর্নেল তাহেরের পরিকল্পনা অনুযায়ী টাঙ্গাইলের পথে রওনা হন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২১। 'জেড' ফোর্স গঠন ও তার যুদ্ধ তৎপরতা।	বাংলা একাডেমীর দলিলপত্র	.....১৯৭১

সাক্ষাৎকারঃ মেজর অলি আহমেদ*

মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের প্রথম ব্রিগেড 'জেড' ফোর্স গঠিত হয় ৭ই জুলাই। মেজর জিয়াউর রহমানের নামানুসারে এই ব্রিগেডের নামকরণ করা হয় 'জেড' ফোর্স (জিয়া র্ফোস)। বাংলার স্বাধীনতা যুদ্ধে 'জেড' র্ফোস এক বিশেষ অবদান রেখেছে। এই ফোর্সে তিনটি নিয়মিত পদাতিক বাহিনী ছিলো- যথাক্রমে ১ম ইস্ট বেঙ্গল, ৩য় ইস্ট বেঙ্গল এবং ৮ম ইস্ট বেঙ্গল ব্যাটালিয়ন। ব্রিগেড কমান্ড করেন তৎকালীন মেজর জিয়াউর রহমান (বর্তমান মেজর জেনারেল)। আমি নিজে ব্রিগেডের ব্রিগেড মেজরের দায়িত্ব পালন করি।

১ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে যেসব অফিসার কর্তব্য পালন করেছিলেন তাঁরা হলেনঃ

কমান্ডিং অফিসারঃ মেজর মঈনুল হোসেন চৌধুরী। আগস্ট মাস থেকে মেজর জিয়াউদ্দিন এই ব্যাটালিয়নের দায়িত্ব নেন। মেজর জিয়াউদ্দিন পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এসে বাংলার মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন।

সেকেন্ড-ইন-কমান্ডঃ ক্যাপ্টেন বজলুল গণি পাটোয়ারী এ্যাডজুট্যান্ট এবং কোর্য়াটার মাস্টারের দায়িত্ব পালন করেন ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট লিয়াকত আলী খান।

ব্যাটালিয়নে ৪টি কোম্পানী যাঁরা কমান্ড করেছেন তাঁরা হলেনঃ

'এ' কোম্পানী কমান্ডারঃ ক্যাপ্টেন মাহবুব।

'বি' কোম্পানী কমান্ডারঃ ক্যাপ্টেন হাফিজউদ্দীন।

'সি' কোম্পানী কমান্ডারঃ ক্যাপ্টেন আব্দুল কাইয়ুম চৌধুরী।

'ডি' কোম্পানী কমান্ডারঃ ক্যাপ্টেন বজলুল গণি পাটোয়ারী।

লেঃ আনিসুর রহমান এবং লেঃ এম, ওয়াকার হাসানও এই ব্যাটালিয়নে কাজ করেছেন।

৩য় বেঙ্গল ব্যাটালিয়নে যাঁরা দায়িত্ব পালন করেছেন তাঁরা হলেনঃ

কমান্ডিং অফিসারঃ মেজর শাফায়েত জামিল।

সেকেন্ড ইন- কমান্ডঃ ক্যাপ্টেন মহসীন।

'এ' কোম্পানী কমান্ডারঃ ক্যাপ্টেন আনোয়ার হোসেন।

'বি' কোম্পানী কমান্ডারঃ ক্যাপ্টেন আকবর হোসেন।

'সি' কোম্পানী কমান্ডারঃ ক্যাপ্টেন মহসীন।

'ডি' কোম্পানী কমান্ডারঃ লেঃ নুরুন্নবী চৌধুরী।

* ১৯৭১ সালে ক্যাপ্টেন হিসেবে ৮ বেঙ্গলে কর্মরত ছিলেন।

এছাড়া লেঃ মঞ্জুর, লেঃ ফজলে হোসেন, ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট আশরাফুল আলম প্রমুখ অফিসার এই ব্যাটালিয়নের বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। এই ব্যাটালিয়নে নায়েক সুবেদার আজিজের নেতৃত্বে একটি সার্পোট প্লাটুনও ছিল।

৮ম বেঙ্গলে যেসব অফিসার কমান্ড করেছেন তাঁরা হলেনঃ

কমান্ডিং অফিসারঃ মেজর এ, টি, এম আমিনুল হক।

সেকেন্ড ইন- কমান্ডঃ ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামান চৌধুরী।

‘এ’ কোম্পানী কমান্ডারঃ ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামান চৌধুরী।

‘বি’ কোম্পানী কমান্ডারঃ ক্যাপ্টেন সাদেক হোসেন।

‘সি’ কোম্পানী কমান্ডারঃ ক্যাপ্টেন মোদাসসের হোসেন।

‘ডি’ কোম্পানী কমান্ডারঃ লেঃ মাহবুবুর রহমান।

এছাড়া লেঃ এমদাদুল হক, লেঃ কাজী মনিবুর রহমান, লেঃ ওয়ালি-উল ইসলাম, লেঃ বাকের প্রমুখ তরুণ অফিসাররা এই ব্যাটালিয়নে কাজ করেন।

‘জেড’ র্ফোস কামালপুর, বাহদুরাবাদ ঘাট, দেওয়ানগঞ্জ থানা, চিলমারী, হাজীপাড়া, ছোটখাল, গোয়াইনঘাট, টেংরাটোলা,গোবিন্দগঞ্জ, সালুটিকর বিমানবন্দর, ধলাই চা-বাগান, ধামাই চা-বাগান, জাকিগঞ্জ, আলি ময়দান, এম সি কলেজ, ভানুগাছা, কানাইয়ের ঘাট, বয়মপুর, ফুলতলা চা-বাগান, বড়লেখা, লাতু, সাগরনাল চা-বাগান ইত্যাদি স্থানে পাকসেনাদের সঙ্গে সংঘর্ষে নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।

সাক্ষাৎকারঃ মেজর আমিন আহমদ চৌধুরী*

‘জেড’ ফোর্সের অপারেশনসমূহঃ ১ম ইস্ট বেঙ্গলের কামালপুর যুদ্ধ

মুক্তি সংগ্রামে শত্রুর সাথে মুখোমুখি লড়াই শুরু করি আগস্ট’৭১-এর পর থেকে। এর আগে আমরা ছিলাম ডিফেন্সে, আর শত্রুরা আমাদের উপর আক্রমণ করতো। বিলোনিয়া যুদ্ধের পর থেকে শত্রুরা আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের ভুমিকা গ্রহণ করে, আর আমরা আক্রমণকারীর। আমাদের ব্রিগেডের (‘জেড’ র্ফোস) প্রথম আক্রমণ পরিচালনা করেন মেজর (বর্তমানে লেঃ কর্নেল) মইনুল ইসলাম চৌধুরী। (১ম ইস্ট বেঙ্গল) ডেলটা কোম্পানী নিয়ে ক্যাপ্টেন সালাউদ্দীন মমতাজ ও ব্রেভো কোম্পানী নিয়ে ক্যাপ্টেন হাফিজ এ আক্রমণের ব্যুহ রচনা করেন। আর ক্যাপ্টেন মাহবুব (পরে সিলেট রণাঙ্গনে শহীদ হন) কাট-অফ পার্টি নিয়ে ওঁৎ পেতে বসেন শত্রুর ডিফেন্সের পেছনে। আক্রমণ করাকালীন একটি বস্তুর প্রয়োজন হয় বেশী, তা হলো সিংহহৃদয়। ইংরেজীতে যাকে বলে লায়নর্হাট। ডিফেন্সে যারা থাকে তারা বাংকারে থাকে, ফলে স্বভাবতই ছোট ছোট হাতিয়ার এমন কি ডাইরেক্ট আর্টিলারী শেল থেকে রক্ষা পায়। সে জন্যই সাধারনতঃ দেখা যায় যে, একটি ডিফেন্সকে আর্টিলারী থেকে শুরু করে ট্যাংক ও বিমান হামলা করে সেই ডিফেন্সকে তছনছ করে ফেলার পরেও মাত্র দু-একজন সাহসী যোদ্ধা অকুতোভয় মনোবলে বলীয়ান হয়ে বাংকার থেকে সেই প্রচন্ড গোলাগুলির মাঝে মাথা নিচু করে মুখ থুবরে পড়ে না থেকে আক্রমণকারীর আক্রমণ সম্পূর্ণরুপে ব্যর্থ করে দেয়। সকল প্রকার সুষ্ঠ আক্রমণই ব্যর্থ হয়ে যায় যদি র্পূবাহ্নে পরিকল্পনা গ্রহণ না করা হয়। আর সুষ্ঠ পরিকল্পনা নেওয়া তখনই সম্ভব হয় যখন কমান্ডার নিজে চুপি চুপি শত্রুশিবির দেখে আসে। মিলিটারী ভাষায় এই চুপি চুপি দেখে আসার নাম হচ্ছে রেকি পেট্রোলিং। বাংলা মায়ের দামাল ছেলে ক্যাপ্টেন সালাউদ্দিন মমতাজ ছিলেন এক অভূতপূর্ব ব্যতিক্রম, অনন্যসাধারণ সৈনিক- পাকিস্তানের

* ১৯৭১ সালের মার্চে ক্যাপ্টেন পদে কর্মরত ছিলেন।

কোয়েটা থেকে জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে পালিয়ে এসে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেন- যোগ দেওয়ার পর থেকে শত্রুর উপর প্রচন্ড আঘাত হানার জন্য অস্থির হয়ে পড়েন।

ময়মনসিংহের কামালপুর বি-ও-পি ছিল শত্রুদের দুর্ভেদ্য ঘাঁটি, কারণ জল ও স্থল উভয় পথেই কামালপুর- ময়মনসিংহ- ঢাকা সড়কের প্রবেশদ্বার ছিল এ কামালপুর। তাই শত্রুরা এখানে বাংকারগুলো অত্যন্ত মজবুত করে তৈরী করে। বাংকারের প্রথম আস্তরে মাটি ও টিনের দেয়াল, তারপর ৬ ইঞ্চি থেকে ১ ফুট ব্যবধানে রেলের লোহার বীম। এই একই প্রকার ব্যবধানে পাকা সিমেন্টের আস্তর। বাংকারের ওভারহেড কাভারের বেলায়ও একই প্রকার প্রস্তুতি নেওয়া হতো- প্রত্যেকটি বাংকারই প্রায় ঘরের মত উঁচু, অন্যদিকে সমস্ত ডিফেন্স টানেলের মারফত যোগাযোগের ব্যবস্থা ছিল। এদিকে মাইন, বুবিট্র্যাপ ও বাঁশের কঞ্চি সমস্ত ডিফেন্সটিকে দুর্ভেদ্য দুর্গের মত করে রেখেছিল। পরপর দুদিন রেকি করার পরেও সালাউদ্দীন স্বচক্ষে শত্রুশিবির দেখার জন্য লেঃ মান্নানকে সাথে করে তৃতীয়বারের মত রেকি পেট্রোলিং নিয়ে নিজে শত্রুশিবিরের দিকে গেলেন। বি-ও-পি'র কাছে পৌঁছে জমির আলীর উপর লেঃ মান্নান, সুবেদার হাসিম, নায়েক শফি, ও দলের অন্যান্য সবাইকে রেখে শুধু সুবেদার হাইকে সঙ্গে করে শত্রুর বাংকারগুলো রেকি করতে গেলেন। বলাবাহুল্য, পাকিস্তানীরা রাত্রিতে সব সময় সেকেন্ড ডিফেন্সে চলে যেত। কামালপুর রণাঙ্গনে শত্রুরা সাধারণতঃ দিনের বেলায় অনেক এলাকা জুড়ে ডিফেন্স নিয়ে থাকত, কিন্তু রাত্রিবেলায় দূরের বাংকারগুলো ছেড়ে দিয়ে ছোট অথচ ঘন ডিফেন্সে চলে যেত। খালি বাংকারগুলি দেখে সালাউদ্দীন ও হাই আরও ভিতরে চলে গেলেন। এমতাবস্থায় দুজন শত্রুসেন সম্ভবতঃ পেট্রোলিং করে ফিরে আসার সময় এদের দুজনের মুখোমুখি হয়ে পড়ে। একশত পাঁচ পাউন্ড ওজন আর ৫'-৫'' উচ্চতা বিশিষ্ট ক্যাপ্টেন সালাউদ্দীন মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়ল লম্বা খানসেনার উপর, যার হাতে ৩০৩ রাইফেল। অন্ধকারে খানসেনা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে ''আমি খালেদ'' বলে নিজেকে সঙ্গীর কবল থেকে ছাড়াতে গিয়ে নিজের ভুল বুঝতে পারল সে। আসলে তারা মুক্তিবাহিনী দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। মুহূর্তের মধ্যে খানসেনা সালাউদ্দীনের হালকা দেহ মাটিতে ফেলে দিয়ে গলা টিপতে শুরু করল। সালাউদ্দীন 'মান্নান' বলে চিৎকার করে উঠলেন। মান্নান ছুটে এসে স্টেন ধরে জিজ্ঞেস করলো ''উপরে কে?'' সালাউদ্দীন গোংড়ানীর স্বরে বললো ''উপরো তো ঐ শালা''। লেঃ মান্নান গাব গাছের নিচে তাড়াতাড়ি পজিশন নিলেন। এদিকে সুবেদার হাইকে 'হ্যান্ডস আপ' বলার সাথে সাথে রাইফেলের বাঁট দিয়ে আঘাত করে খানসেনার জি-থ্রি রাইফেল কেড়ে নিলেন। কিন্তু খানসেনা মুহূর্তের মধ্যে পেছনের বাংকারে ঢুকে পড়লো। আর নায়েক শফি, যে এতক্ষণ ইতস্ততঃ করছিল গুলি করবে কি করবে না (কেননা ঘুটঘুটে অন্ধকারে কার গায়ে গুলি লাগে বলা মুশকিল), মুহূর্তের মধ্যে ধাবমান শত্রুর দিকে গুলি ছুড়ল। অবশ্য ওই গুলি হাই ও খানসেনার মাঝখান দিয়ে চলে যায়। এদিকে শত্রুর বাংকার থেকে গুলি ছুড়ল। সম্ভবতঃ অন্ধকারে ঠাহর করতে পারেনি বলে বাঁ পাশের দালানে গিয়ে লাগে। সংগে সংগে হাই বাংকার লক্ষ্য করে স্টেনের এক ম্যাগাজিন গুলি ছূড়ল। গুলি ছুড়ে জি-থ্রি রাইফেলসহ ক্যাপ্টেন সালাউদ্দীনের দিকে এগিয়ে এলো। গাবগাছের পাশ দিয়ে যাবার সময় মান্নান আস্তে করে জিজ্ঞেস করলো- কে? ত্বরিত বেগে 'আমি হাই' বলে সালাউদ্দীনের উপরে অবস্থানরত খান সেনাকে স্টেনের ব্যালে দিয়ে গুঁতো দিল। উপরের লোকটি সালাউদ্দীনকে ফেলে দৌড়াতে শুরু করল। সুবেদার হাই ওকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়ল। অতঃপর রাইফেল দুটি নিয়ে ওরা ত্বরিত বেগে শত্রুশিবির ত্যাগ করে।

নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে বেঁচে এসে সালাউদ্দীনের সাহস গেল আরও বেড়ে । এ রেকী পেট্রোলিং থেকে দুটি জিনিস বিশেষভাবে পরিলক্ষিতহয়। তাহলো, সুবেদার হাই ও ক্যাপ্টেন সালাউদ্দীনের অদম্য সাহস ও অদ্ভুদ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব। কিন্তু এতে আবার একটি গুরুত্বপূর্ণ গোপনীয়তা প্রকাশ পায় যে মুক্তিবাহিনীর আক্রমণ আসন্ন, ফলে রাতারাতি শত্রুরা তাদের সৈন্য সংখ্যা বাড়িয়ে ফেললো, তাতে করে কামালপুরে পাকবাহিনীর ৩১- বেলুচ ব্যাটালিয়নের সৈন্য সংখ্যা দাঁড়ালো দুই কোম্পানীতে (রাজাকার ছাড়া)। দুদিন পর ৩০-৩১শে জুলাই প্রথম ইস্ট বেঙ্গল (সিনিয়র টাইগার) রাতের আঁধারে রওনা হলো। প্রথমে সালাউদ্দীনের ডেল্টা কোম্পানী, ফলো আপ কোম্পানী হলো ক্যাপ্টেন হাফিজের ব্রাভো, যার পিছে হলো ব্যাটালিয়ন 'আর' গ্রুপ এবং এই 'আর' গ্রুপে ছিলেন

মেজর (বর্তমানে লেঃ কর্নেল) মঈন এবং তার সাথে ছিলেন কর্নেল (বর্তমানে মেজর জেনারেল) জিয়াউর রহমান। সম্ভবতঃ ব্রিগেডের প্রথম এ্যাটাক সরেজমিনে তদারক করার জন্য কর্নেল জিয়া নিজেও এ্যাটাকিং ট্রুপসের সাথে রওনা হন। আক্রমণের এইচ-আওয়ার ছিল ৩০/৩১শে জুলাই-এর রাত ৩-৩০ মিনিট। কিন্তু গাইডের অভাবে প্রথম ইস্ট বেঙ্গল এফ-ইউ-পি' তে সময়মত পৌঁছাতে পারেনি। ফলে ৩-৩০ মিনিটের সময় টাইমপ্রোগ্রাম মোতাবেক আমাদের নিজস্ব আর্টিলারী ফায়ার যখন শুরু হয় (ফায়ারের সংকেতধ্বনি ছিল হিস করে অয়ারলেসের উপর শব্দ করা) তখনও আমাদের ছেলেরা এফ-ইউ-পি' তে পৌঁছার জন্য প্রাণপণ দৌড়াচ্ছে। কাদামাটিতে এতগুলো লোকের এই দৌড়াদৌড়ির ফলে যথেষ্ট শব্দ হয়, তাতে করে দুশমনের পক্ষে আক্রমণের ডাইরেকশন নির্ধারণ করা একেবারে সহজ হয় এবং নিমেষের মধ্যে তাদের আর্টিলারী ফায়ার এসে পড়তে থাকে। এদিকে প্লাটুন পর্যায়ে ডেপথ (টু-আপ) হওয়ার ফলে লোক আগে-পিছে হয়ে যায়। ফলে কমান্ড কণ্ট্রোল কায়েম করা মুশকিল হয়ে পড়ে। অন্যদিকে এসেম্বলি এরিয়া থেকে পূর্ব নির্ধারিত এফ-ইউ-পি' তে আসার মাঝপথে আমাদের নিজস্ব আর্টিলারী ফায়ার শুরু হওয়াতে প্রথম ইস্ট বেঙ্গল তৎক্ষণাৎ সেই অবস্থাতেই কোনক্রমে ফর্ম-আপ হতে থাকে। ফলে সে কি চিৎকার আর হট্টগোল। আবার ডাইরেকশনের অভাবে এডভান্স করাকালীন একে অন্যের উপর চড়ে বসে। আর অপেক্ষাকৃত নীচু কর্দমাক্ত জমির উপর আসার সাথে সাথে পাকিস্তানী ও আমাদের যুগ্ম আর্টিলারী ক্রস-ফায়ারিং-এর নীচে আসার ফলে আমাদের বেশকিছু ছেলে হতাহত হয়ে পড়ে। অন্যদিকে অয়ারলেস সেট জ্যাম হওয়াতে সংযোগ সম্পূর্ণরুপে বিচ্ছিন্ন হয়। তাতে বিশৃঙ্খলা চরমে পৌঁছায়। অবস্থা দেখে মনে হচ্ছিল হাটবাজার বসেছে আর নীলকর আদায়কারী সাহেবদের দেখে কে কোথায় পালাবে পথ পাচ্ছে না। এ অবস্থায় প্রথম ইস্ট বেঙ্গলের পক্ষে আক্রমণের ব্যূহ রচনা করা আদৌ সম্ভব ছিল না। বরং সৈন্যদের পক্ষে পালিয়ে আসাটাই অত্যন্ত স্বাভাবিক ছিল। কারণ ।এ্যাটাকিং ট্রুপস যদি ঠিকমত ফর্ম-আপ না হতে পারে তবে তাদের পক্ষে আক্রমণ করার প্রশ্নই ওঠেনা। ১৯৬৫ সনের যুদ্ধে বার্কি সেকটর বিআরবি'র ওপারে ভারতের এক ডিভিশন সৈন্য যখন ফর্ম-আপ হচ্ছিল তদানীন্তন পাকিস্তান তিনটি মাত্রা ট্যাংক আচম্বিতে সে সৈন্যদলের উপর হামলা চালায়। ফলে, ভারতীয় পালিয়ে যায়। যুদ্ধের ময়দানে এ ঘটনা অহরহ ঘটেছে এবং ঘটবে। এদিকে কর্নেল জিয়াউর রহমান বাঘের মত গর্জে উঠলেন,'কাম অন, এ্যাট এনি কষ্ট উই উইল লাঞ্চ দি এ্যাটাক'। মেজর মঈন (বর্তমানে লেঃ কর্নেল) অয়ারলেস ছেড়ে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছিলেন। আর ক্যাপ্টেন সালাউদ্দীন ও হাফিজ এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ছুটে বেড়াচ্ছেন। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। একদিকে প্রথম ইস্ট বেঙ্গল প্রসিডিউরের চামড়া পর্যন্ত তুলে ফেলছে, অন্যদিকে ক্যাপ্টেন সালাউদ্দিন মেগাফোনে বাংলা-ইংরেজী-উর্দুতে মিশিয়ে অকথ্য ভাষায় গালি দিচ্ছিল তার সৈন্যদলকে। কারুর বা কলার ধরে লাইন সোজা কারে আগের দিকে (টারগেটমুখী) মুখ করে দিচ্ছে, আর কাউকে বা হাফিজ স্টেনের বাঁট দিয়ে মারছে। মোগল-রাজপুতের প্রথম যুদ্ধে আশিটি যুদ্ধে বিজয়ী রানা সংগ্রাম সিংহের বিপুল রণাভিঙ্গ সৈন্যবাহিনীকে দেখে আকারে ছোট মোগল বাহিনী ভড়কে গিয়েছিল যুদ্ধের প্রারম্ভেই। কিন্তু ভেলকিবাজির মত বাবর সে সৈন্যবাহিনীকে বাগে এনে বিপুল বিক্রমে আক্রমণ করে শেষ পর্যন্ত জয়ী হন। তাই সামরিক নেতা হিসাবে ইতিহাসে বাবরের স্থান অতি উঁচুতে । ক্যাপ্টেন সালাউদ্দীন ও হাফিজের কৃতিত্ব বুঝি সেখানেই। মাঝে বিশৃংখলার মাঝে শুধুমাত্র মনের জোর ও অদম্য সাহসে বলীয়ান হয়ে সালাউদ্দিন ও হাফিজ প্রতিবন্ধকার ও প্রতিকূলতা অতিক্রম করে নিজ নিজ কোম্পানীকে অভীষ্ট লক্ষ্যে উপনীত সক্ষম হন এবং নিঃসন্দেহে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ আক্রমণ সুচারুরূপে সম্পন্ন করেন। যুদ্ধের ময়দানে ফলাফলটা সকল সবকিছুর সবকিছুর পরিমাপক নয়, বরং ঘটনাটি কিভাবে সংঘটিত হলো সেটাই সবচেয়ে লক্ষণীয়।

দ্বিতীয় মহাসমরে মন্টগোমারীর কাছে রোমেল চরমভাবে মার খেলেন। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, মাসের পর মাস, মাইলের পর মাইল পশ্চাদপসরণ অভিয়ান অব্যাহত রাখতে হয়েছে রোমেলকে সাহারার দুস্তর মরুর পথে পথে। অথচ মন্টগোমারীর বিজয়াভেযানের চেয়ে রোমেলের সেই পশ্চাদভিযানই সকলের মনে অণুপ্রেরণা যোগায়। তাই বুঝি রোমেল শুধুমাত্র রোমেলই।

এফ- ইউ- পি'র চরম বিশৃংখলা থেকে সামান্য রেহাই পেয়ে প্রথম বেঙ্গল সবেমাত্র অগ্রসর হয়েছে অমনি পাকিস্তানী আর্টিলারীর সেলভো ফায়ার এসে পড়লে, সংগে সংগে আমাদের হতোদ্যম সৈন্যরা মাটিতে শুয়ে পড়ল- শেষ মুহূর্ত বুঝি আর আক্রমণ করা সম্বব হলো না দেখে ক্যাপ্টেন সালাউদ্দীন একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়লেন। একদিকে সমগ্র বাংগালী জাতির মান-ইজ্জতের প্রশ্ন অন্যদিকে দুশো ছেলের জীবন। সালাউদ্দীল তার "ক্ষ্যাপা, দুর্বাসা ছিন্নমস্তা চন্ডী-রনদা সর্বনাশী, জাহান্নামের আগুরে বসে হাসছে পুষ্পের হাসি''- মারছে লাথির পর লাথি। কারো বা কলার চেপে ধরে অকথ্য ভাষায় গালি দিচ্ছিল- 'বেশরম' বেগায়রত, শালা নিমকহারামির দল- আগে বাড়ো'। আবার সৈন্যদলের মন চাংগা করার জন্য নিজের অবস্থান জাহির হয়ে যাবে জেনেও পাকবাহিনীকে লক্ষ্যে করে মেগাফে নে উর্দুতে বলেছিল, 'আভিতক ওয়াকত হায়, শালালোকে সারেন্ডার করো। নেহীতো জিন্দা নেহি ছোড়েংগা। ''তার পরের ইতিহাস প্রতিটি বাংগালীর প্রতিটি বাংগালীর গৌগালীর গৌরবের ইতিহাস। এ যেন শুধুমাত্র ইতিহাস নয়, মুক্তিকামী মানুষের প্রালবন্যার ইতিহাস। বাংগালী সৈন্যরা তখন ছুটছে ঝড়ের মতো করতালি দিয়ে স্বর্গমর্ত্য করতলে। বঙ্গোপসাগরের উত্তাল তরঙ্গমালার মত প্রথম ইস্ট বেঙ্গল মূহূর্তের মধ্যে ভাসিয়ে দিল পাক বাহিনীর ডিফেন্সের প্রথম সারির বাংকারগুলো। সুন্দরবনের রয়েল বেঙ্গল টাইগারের মত গুরুগর্জন করে সিনিয়র টাইগার 'জয় বাংলা' আর 'আকবর' ধ্বনিতে প্রকম্পিত করে তুললো যুদ্ধের ময়দানকে। বাংকার অতিক্রম করে বিশ-পঁচিশটা ছেলে কমিউনিটি সেন্টার ঢুকে পড়লো। তাদের মাত্র দু- একজন আহত অবস্থায় ফেরত আসতে পেরেছিল আর বাকি সবাই হাতাহাতি যুদ্ধে শাহাদৎ বরণ। প্রচন্ডভাবে তখন হাতাহাতি যুদ্ধ চলছে। বাঘের থাবাকে যত্রতত্র ভূপাতিত পাকসৈন্যরা। পিছনে কখন আমাদের পক্ষের লাশ আসা শুরু হয়ে গেছে। কর্নেল জিয়া তখন কলছেন, আই উইল একসেপ্ট নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট ক্যাজুয়েলটি বাট... দেম আউট মঈন'। আহত ক্ষতবিক্ষত জোয়ানরা বলেছে, 'স্যার-নিয়ে এলেন কেন? আর সামান্য বাকী- কি হত আমি না হয় মরে যেতাম।' গর্বে বুক ফুলে উঠছিল। পিছনের উঁচু পাহাড়ে দাঁড়িয়ে থাকা দর্শকেরাও বুঝতে পারছিলেন বাঙ্গালীরা শুধু বসে বসে (এমনকি না খেয়ে) কবিতা লিখে কিংবা গাল-গল্প করে আর শ্লোগান দিয়ে ভাবালুতার মাঝে দিন কাটায় না। যুদ্ধও করতে জানে বৈকি। আজকে শুধু আফসোস হচ্ছে যে, আজকের পেপার-টাইগার যদি সেদিন যুদ্ধের ময়দানে থাকতেন তবে সম্ভবত আজ আর তারা আমাদেরকে 'খোদার খাসী' রলার দুঃসাহস প্রকাশ করতেন না। ক্যাপ্টন সালাউদ্দীনের গায়ে তখনও সেই রিলিফের সাদা শার্টটা ছিল। মহানগরীর নিউ মার্কেটে গিয়ে মার্কেটিং করার অবসর তার ছিল না, না ছিল সংগতি কিংবা তেমন নীচু মনোবৃত্তি। তবে হ্যাঁ, বন্য পশুদের মত আমরা জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরেছি। তাই বুঝি লুঙ্গি মালকোচা বেঁধে সিভিল অফিসার তৌফিক এলাহি যশোর রণাঙ্গনকে কাঁপিয়ে রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন।

এদিকে মাইন-ফিল্ডে ফেঁসে যাওয়া সুবেদার হাই-এর প্লাটুনের ডানে অবস্থানরত ক্যাপ্টেন সালাউদ্দীন বুঝতে পারলেন যে, শত্রুরা মাইন-ফিল্ডের পেছনের বাংকারগুলো ছেড়ে দিয়ে পেছনে সেকেন্ড লাইনে সরে গিয়ে কাউন্টার এ্যাটাকের প্রস্তুতি নিচ্ছে। ক্যাপ্টেন সালাউদ্দীন মেগাফোনে হাইকে প্লাটুনের নিয়ে ডানে যেতে বললেন। প্রথম আক্রমণ শুরুকালে সুবেদার হাই-এর লোকসংখ্যা ছিল ৪০ জন। কিন্তু লক্ষ্যে পৌঁছা পর্যন্ত সংখ্যা দাঁড়াল ১৫ হতে ২০ জনে। এদিকে মাইনের আঘাতে নায়েক শফির হাত উড়ে গেল আর ধারমান শত্রুদের পিছু নেওয়াকালে জোয়ানরা বারবার সালাউদ্দীনকে অনুরোধ করলো,'স্যার, পজিশনে যান' (মাটিতে শুয়ে পড়া)। সালাউদ্দীন ধমকে উঠলো 'বেটা-স্যার করে চিৎকার করিস না, মক্ররা আমার অবস্থান টের পেয়ে যাবে। চিন্তা করিস না তুই বেটা আমার কাছে এসে দাঁড়া, গুলি লাগবে না, ইয়াহিয়া খান আজও আমার জন্য গুলি বানাতে পারেনি। দু'দিকে বৃষ্টির মত গুলির মাঝে দাঁড়িয়ে একাথা বলা চাট্টিখানি ব্যাপার নয়। তাই বুঝি আজও ১ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট কেঁদে কেঁদে খুঁজে বেড়াচ্ছে তাদের প্রাণপ্রিয় সালাইদ্দিনকে। দ্বিতীয় বার মেগাফোনে 'হাই' বলার সাথে সাথে ক্যাপ্টেন সালাউদ্দীনের সামনে ২/৩টি বোমা এসে পড়লো। মুহূর্তের মধ্যে সালাউদ্দিন ধরাশায়ী হলেন । তার দেহটা প্রথম বামে, পরে আধা ডানে ও শেষ দড়াম করে পেছনের দিকে পড়ে গেল। আশপাশের জোয়ানরা ছুটে আসে, 'স্যার, কলেমা পড়েন' কিন্তু বাংলার একান্ত গৌরব সালাউদ্দীন উত্তর দিল, 'আমার কলেমা পড়ার দরকার নেই। খোদার কসম, যে পেছনে হটবি তাকে গুলি করবো।' তারপর বিড় বিড়

করে আবার বলে উঠলো, 'মরতে হয় এদেরকে মেরে মর-বাংলাদেশের মাটিতে মর।' এমন মরণ দুনিয়ার ইতিহাসে যে বিরল তা হয় তবে এ মৃত্যুতে আছে আনন্দ, আছে গর্ব। উঁচু মাটির ঢিবিতে পড়ে থাকা সালাউদ্দীনের লাশটা ২/৩ জন জোয়ান শত্রুর এলাকা থেকে টেনে আনতে চেষ্টা করলো, কিন্তু ব্যর্থ হয়ে সকলেই মৃতুবরণ করে। পরিশেষে একটি বিহারী ছেলে ৮টি গুলি খেয়েও শেষবারের মত চেষ্টা করে নিজে গুরতরভাবে আহত হয় এবং লাশটি আনতে ব্যর্থ হয়। সালাউদ্দীনের গায়ে তখনও সেই সাদা শার্টটা ছিল যা তার খুলে ফেলার কথা ছিল, কারণ, সাদা শার্ট রাত্রিবেলায় বেশী দেখা যায়। শেষ পর্যন্ত ক্যাপ্টেন সালাউদ্দীনের ঘড়ি, স্টেন ও অন্যান্য কাগজ নিয়ে আসা হয়।

ওদিক ক্যাপ্টেন হাফিজ বেঁচে গেলেন অলৌকিভাবে। হাতের স্টেন তোপের মুখে উড়ে গেলেও সামান্য আহত হয় বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ ফুটবলার বেঁচে গেলেন, কিন্তু ৬০০ গজ পিছনে এফ-ইউ-পি তত্ত্বাবধানে কর্মরত লেঃ মান্নান ঊরুতে গুলি খেয়ে গুরুতরভাবে আহত হলেন, যদিও বা একই জায়গায় একই ভাবে ফ্লাইং অফিসার লিয়াকতও শুয়ে ছিলেন। অন্যদিকে আহত ক্যাপ্টেন হাফিজকে উদ্ধারকল্পে ল্যান্স নায়েক রবিউল ছুটলো শত্রুঅভিমুখে। কয়েক কদম যাওয়ার পর দুই হাতেই গুলি এসে লাগল, তথাপি তার প্রাণপ্রিয় তথা বাংলাদেশের অমূল্য রত্ন ক্যাপ্টেন হাফিজকে উদ্ধার করার সংকল্প থেকে এতটুকু টলাতে পারেনি। যথাস্থানে পৌঁছে দেখে হাফিজকে অন্য কেউ নিয়ে গেছে। পড়ে থাকা অয়ারলেস ও রকেট লাঞ্চার উঠাবার সময় রবিউলের বুকে গুলি লাগল। রবিউল মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। পাশের জোয়ান সাহায্যের ভয়ে পাশ কেটে চলে গেল। রাগে-দুঃখে রবিউল গ্রেনেডটা হাতে নিয়ে (উদ্দেশ্য, বন্দী হবে না) জীবনের আশা ত্যাগ করে নিকটবর্তী আখক্ষেতের দিকে দিল ভোঁ দৌড়। বৃষ্টির মত শত্রুর গুলি আসছিল। কিন্তু আশ্চর্য, রবিউলের গায়ে লাগল না। কোনমতে টেনে-হেঁচড়ে আখক্ষেতে গিয়ে পৌঁছতেই রবিউলের প্রতীতি জন্মালো সে সহজে মরছে না, আর অন্যের সাহায্য ব্যতীতই সে বাঁচতে পারবে। বাঁ হাত থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হচ্ছে। ডান হাতের হাড়টি বের হয়ে আছে। নাকে মুখে রক্তের ছোপ। এ অবস্থায় পালিয়ে যেতে দেখে এগিয়ে এসেছিল গ্রামের গৃহবধূরা, যদিও গৃহস্বামীরা প্রত্যাশী নয়। তাই গৃহবধূরা, যদিও গৃহস্বামীরা দরজায় দাঁড়িয়ে ইতস্তত করছিল। নিজের সাথী যখন মুখ ফিরিয়ে চলে গেল তখন সে আর কারো সাহায্য প্রত্যাশী নয়। তাই গৃহবধূদের হাত ছাড়িয়ে সে এগিয়ে যেতে চেষ্টা করলো কিন্তু পরের ইতিহাস আজও তার কাছে ঝাপসা হয়ে আছে। তার বিশ্বাস দুই রমণীর কাঁধে ভর দিয়ে সে এফ-ইউ-পি এরিয়া পর্যন্ত পৌঁছবে। এদিকে সালাউদ্দীনের মৃত্যুর পর আমাদের সৈন্যদল ছত্রভংগ হয়ে গেলেও সেই অবস্থায় ছোট ছোট গ্রুপে ওরা শত্রুর বাংকারগুলোর উপর আঘাতের পর আঘাত হানতে থাকে। বেলা তখন ৭টা বাজে। অযথা লোকক্ষয় না করে উইথড্র করা শ্রেয় জেনেও মেজর (বর্তমানে লেঃ কর্নেল) মঈন তার সৈন্যদলকে কিছুতেই পশ্চাদপসরণ করাতে পারছিলেন না। আমাদের আর শত্রুর লাশে কমিউনিটি সেন্টার ভরে গিয়েছে। শেষ পর্যন্ত বেলা সাড়ে কিংবা নিখোঁজ আর দুইজন অফিসারসহ ৬৬ জন আহত হয়। শত্রুদের লাশ তিনটা ট্রাক বোঝাই করে নিয়ে যেতে গ্রামের লোকেরা দেখেছে। পরদিন হেলিকপ্টারে পাক বাহিনীর উচ্চপদস্থ অফিসাররা, সম্ভবতঃ জি-ও-সি আসেন কামালপুর পরিদর্শন করতে। বলাবাহুল্য, ঐ দিনই পাক বেচতারে কামালপুর যুদ্ধের ভয়াবহ বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয় যে, প্রায় ৪০০ দুষ্কৃতকারী নিহত হয়েছে। এক অপারেশনে এত বড়সংখ্যক দুষ্কৃতকারীর নিহত হওয়ার সংবাদ ইয়াহিয়ার বেতারে আর কখনো প্রচার করা হয়নি।

ফলাফলঃ বাংকারে বসে থাকা খানসেনাদের মনে ভীতি সঞ্চার করাই এ যুদ্ধের সবচেয়ে বড় সাফল্য। এ যুদ্ধে প্রমাণিত হলো বাঙ্গালীরা দূর থেকেই আর পালিয়ে যাবে না বরং বাংকার থেকে খানসেনা তাড়ানোই তাদের উদ্দেশ্য। তাই বুঝি এই আক্রমণের পর থেকে খানসেনারা ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট তথা কামালপুরের নাম শুনলেই আঁতকে উঠত। তখনকার দিনে পাক শিবিরে বন্দী মেজর আজিজের ভাষায় বলতে হয় পাকিস্তানীদের নিজেদের মতে কামালপুর হলো পাকসৈন্যদের মরণঘাঁটি। জিজ্ঞাসাবাদের সময় আজিজকে জিজ্ঞাসা করা হতো, ''হয়ার ইজ ধানিয়া কামালপুর কিংবা হয়ার ইজ উত্তর ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট''। কথা প্রসংগে সেই জুলাই-আগস্ট (১৯৭১)

মাসে পাক অফিসাররা কখনও বা হঠাৎ বলে ফেলতো “ইওর বেঙ্গল রেজিমেন্ট ইজ ফাইটিং লাইক রিয়াল টাইগার্স”। আক্রমণটি ব্যর্থ হলেও এর চরম সাফল্য এ উক্তির মাঝেই নিহিত আছে। তাই বুঝি পরবর্তীকালে বন্দী শিবির থেকে পালিয়ে মেজর আজিজ শত দুঃখ কষ্টকে অবনত মস্তকে মেনে নিয়ে যুগ সৃষ্টিকারী কামালপুর রণাঙ্গনে যোগ দেন।

॥ বাহাদুরাবাদ ঘাট আক্রমণ ॥

‘জেড’ ফোর্সের দ্বিতীয় আক্রমণ পরিচালনা করেন লেঃ কর্নেল শাফায়াত জামিল (৩য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট) ৩১শে জুলাই তারিখে। প্রায় ৩৫০ জন লোক নিয়ে দেওয়ানগঞ্জ-বাহাদুরাবাদ ঘাট আক্রমণের জন্য ৩য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট রওনা হয়। ঐ অঞ্চলের একটি আই-এ পাস ছেলের বলরামপুর গ্রামের নাসের ছিল এই আক্রমণের পথপ্রদর্শক, যার দূরদর্শিতার ফলে ৩য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ৩টি বড় বড় নদী ক্ষীপ্র গতিতে সকলের অগোচরে ১১টি নৌকাসহ অতিক্রম করতে সক্ষম হয় এবং গানবোটে পাহারারত পাকসৈন্যদের শূন্যদৃষ্টি এড়িয়ে পাশ কেটে ১৫/২০ মাইল পথ নিরাপদে অতিক্রম করে রাত নিটার সময় পূর্ব নিদিষ্ট এফ-ইউ-পিহতে পৌঁছতে সক্ষম হয়। ক্যাপ্টেন আনোয়ারের অধীনে আলফা কোম্পানী নৌকাঘাটে (হাইড আউট) পাহারারত থাকে আর ১২ নম্বর প্লাটুন ই-পি-আর’এর নায়েক সুবেদার আলী আকবরের অধীনে কাট অফ পার্টির কাজ করে।

‘ডি’ কোম্পানী লেঃ নূরুন্নবীর অধীনে বাহাদুরাবাদ ঘাট আক্রমণের জন্য অগ্রসর হয়। নায়েক সুবেদার বুলু মিয়া ১১ নম্বর প্লাটুন নিয়ে যায় যাত্রীবাহী ট্রেনের দিকে। আর সুবেদার ১০ নম্বর প্লাটুন নিয়ে যায় রেলওয়ে জেটির দিকে। তখন ভোর হয় প্রায়। রেল লাইনের ওপাশে তখন দুশমনরা ‘স্ট্যান্ড-টু’র জন্য প্রস্ত্তত হচ্ছিল। এদিকে একটি যাত্রীবাহী ট্রেন তখন রেললাইনের উপর শানটিং করছিল। গাড়ী শানটিং করে পিছে যাওয়া সাথে সাথে সুবেদার করম আলী প্লাটুনের রকেট লাঞ্চটির নিজে কাঁধে করে এগিয়ে গিয়ে প্রথমে মালগাড়ীতে অবস্থানরত জেনারেটর এবং পর মুহূর্তে অগ্রসরমান শানটিং গাড়ীর ইঞ্জিনকে ফায়ার করে অকেজো করে দেন। আর সাথে সাথে ডানে অবস্থানরত সুবেদার ভুলু মিয়ার প্লাটুন ফায়ার শুরু করে এবং গ্রেনেড পার্টি রেলের প্রত্যেকে কামরায় গ্রেনেড ছুড়তে শুরু করে। প্রায় প্রত্যেক কামরাতেই ৩/৪ জন করে খাকি পোশাক পরিহিত লোক শুয়েছিল। এদিকে এ্যাকশন পার্টি (২টি প্লাটুন) ইউথড্রয়ালের সাথে সাথে ৩" মর্টার গর্জে ওঠে। ফলে স্থায়ীভাবে যে দুটি শ্রেণীর কামরা আর্মি গার্ডের জন্য রাখা হয়েছিল তা ধসে পড়ে। এছাড়া রেলওয়ে স্টেশন, বহু রেলওয়ে বগী এবং ঘাটে অবস্থানরত মালগাড়ীর বহনকারী স্টীমার এবং জেটির ছাদের উপর দুশমনের মেশিনগানের বাংকার ভীষনভাবে বিধ্বস্ত হয়। স্টেশন এরিয়া থেকে উইথড্র করাকালে দুশমনের একটি গুলি নায়েক সুবেদার ভুলু মিয়ার বাম বাহুতে লেগে পিঠ দিয়ে বের হয়ে যায়। এই আক্রমণকালে নায়েক সুবেদার ছাড়া আমাদের পক্ষে আর কেউ হতাহত হয়নি। পর দিন সুবেদার করম আলী গেলেন পার্শ্ববর্তী ব্রীজ উড়াতে। ব্রীজ উড়ানোর আওয়াজ শুনে দেওয়ানগঞ্জে অবস্থানরত পাকসৈন্যরা বাহাদুরাবাদ ঘাটের দিকে ধাবমান হল-সঙ্গে সঙ্গে আলফা ও ডেল্টা কোম্পানী ক্ষিপ্র গতিতে দেওয়ানগঞ্জ বাজার, সুগার মিল ও রাজাকার হেডকোয়ার্টার পর্যায়ক্রমে আক্রমণ করে সেই এলাকা সম্পূর্ণরূপে তছনছ করে দেয়।

তিনদিন বিজয়ের বেশে অবস্থান করার পর ৩য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট নিজ ক্যাম্পে ফেরত আসে। এই আক্রমণটিকে একটি পরিপূর্ণ সার্থক আক্রমণ বলা চলে। এই সফলতার প্রধান কারণ হচ্ছে চৌকস গাইড ধীরস্থির ও সিংহ-হৃদয়ের অধিকারী কর্নেল শাফায়াত জামিলের সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও দক্ষ পরিচালনা এবং ৩য় ইস্ট বেঙ্গলের ই-পি-আর ও বেঙ্গল রেজিমেন্টের লোক অধিক সংখ্যায় থাকার জন্য ব্যাটল প্রসিডিউর মোতাবেক কার্যক্রম বাস্তবায়িত করতে পেরেছিলেন বলেই। কিন্তু পূর্ব বর্ণিত ১ম ইস্ট বেঙ্গলের কামালপুর আক্রমণকে (৩০/৩১শে জুলাই) পূণাঙ্গ সার্থক আক্রমণ বলা চলে না কারণ এলাকা দখল করে নিজেদের কব্জার মধ্যে রাখার

প্রয়াস আমরা করিনি এবং ক্যাপ্টেন সালাউদ্দীনের মৃত্যুর পর পরই শত্রুরা ডিফেন্স ছেড়ে দিয়ে আমাদেরকে পাল্টা আক্রমণ করে, ফলে আমাদের হতোদ্যম, ক্ষতবিক্ষত সৈন্যরা আরো ভড়কে যায়, যার ফলে সালাউদ্দীনের লাশটাও ফেরত আনা সম্ভাব হয়নি- এমন প্রচন্ড আক্রমণের মুখে সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েও অতি অল্প সময়ের মধ্যেই শত্রুদের এই পাল্টা আক্রমণ সত্যই প্রশংসার যোগ্য। এ ধরনের আত্মরক্ষামূলক মনোভাবকে মিলিটারী ভাষায় 'এ্যাগ্রেসিভ ডিফেন্স' বলা হয়। ১ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের আক্রমণ যেহেতু ডেলিবারেট ছিল সেহেতু আর্টিলারী ফায়ারে টাইম প্রোগ্রাম মোতাবেক কিন্তু আক্রমণকালে এ জিনিসটা প্রকট হয়ে উঠেছিল যে ইংগিতে বা 'অনকল' রাখাই যেন ভাল ছিল, তাতে করে মনে হয় মাঝপথে আর্টিলারীর ক্রস-ফায়ারে যে হতাহত হয়েছিল তা এড়ানো যেত। এতদসত্ত্বেও, কামালপুর আক্রমণ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে এক চমকপ্রদ অধ্যায়ের সূচনা করে। এই আক্রমণের পূর্ব পর্যন্ত রেইড ও এ্যামবুশ করা ছাড়া বাংকারে বসে থাকা শত্রুর বিরুদ্ধে পরিপূর্ণভাবে মুখোমুখি লড়াইতে আমরা অবতীর্ণ হইনি। কিন্তু এই আক্রমণেই প্রমাণিত হল, বাঙ্গালীরা ব্রীজ উড়াতে কিংবা রাতের আঁধারে রেইড ও এ্যামবুশ করতে যেমন পারদর্শী, তেমনি হাতাহাতি যুদ্ধেও সমপারদর্শী। ঐ সময়ে এমন একটি এ্যাকশনের সবিশেষ দরকার ছিল। কারণ তখন পর্যন্ত খন্ড খন্ড যুদ্ধে পরাজিত হয়ে আমরা পিছু হটতে সীমান্তের ওপারে চলে যেতে বাধ্য হই। কারণ তখন পর্যন্ত খন্ড খন্ড যুদ্ধে পরাজিত হয়ে আমরা পিছু হটতে হটতে সীমান্তের ওপারে চলে যেতে বাধ্য হই। ফলে স্বভাবতঃই মনোবল কিছুটা ভেংগে পড়ে। তাই মনোবল চাংগা করার জন্য, বিশেষ করে আমাদের স্বল্প ট্রেনিংপ্রাপ্ত ছেলেদের মনে সাহস বাড়ানোর জন্য এবং এ বিশ্বাস জন্মাবার জন্য যে খান সেনাদেরকে বাংকার থেকে তাড়ানো তেমন কষ্টসাধ্য ব্যাপার নয়, যদি কেউ গুলিতে ভয় না করে। সালাউদ্দীন মেজর প্রাণ দিয়ে আমাদের মনে এ প্রতীতি জন্মিয়েছিলেন। নির্যাতিত, অবহেলিত ও পদদলিত মানবতার প্রতীক স্পার্টাকাস হয়তো বা নিজে মরে যায় কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে জন্ম নেয় নিষ্পেষিত মানবাত্মার লেলিহান বহ্নিশিখায় ইতিহাসের অমর বীরেরা। তাই বুঝি সালাউদ্দীনের মৃত্যু বাংলাদেশের অগ্রগামীতার অভিযানে এক স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায়-আপন মহিমায় সমুজ্জ্বল।

॥ নকশী বি-ও-পি আক্রমণ ॥

৩রা আগস্ট আমি ৮ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ব্রেভো ও ডেল্টা এই দুই কোম্পানী যোদ্ধা নিয়ে আক্রমণ করলাম নকশী বি-ও-পি। এর আগে আমি তিনদিন পুরা বি-ও-পি রেকি করেছি। নকশী বি-ও-পি'র পূর্বতন সুবেদার হাকিম ও তার সাথীরা আমাকে এ বিষয়ে সক্রিয় সাহায্য করেছেন। তার কারণ, এই বি-ও-পি তাদের নখদর্পণে ছিল।

প্রথম দিন আমি নিজে সুবেদার হাকিমসহ নকশী বি-ও-পি'র আশেপাশে রেকি একটি উঁচু টিলা থেকে। বাইনোকুলারে সুবেদার হাকিম আমাকে বলছিল কোথায় শত্রুদের বাংকার, বারবড আয়ার, বাঁশের কঞ্চি, মাইন ফিল্ড, কুক হাউস, মসজিদ ও বি-ও-পি'র প্রবেশ পথ, কোথায় কত সান্ত্রী থাকতে পারে ইত্যাদি। তারপর গারো পাড়ায় গিয়ে চুপি চুপি দেখা করলাম শত্রুশিবিরে আমাদের প্রেরিত বাবুর্চির সংগে। বাবুর্চি বললো, সে ৪৫ জন আর্মির খাওয়া পাকিয়েছে এবং আরো ৬৫ জন আর্মির লোক আসছে এবং ৫০/৬০ জন রাজাকারও বিভিন্ন ডিউটিতে আছে। দ্বিতীয় দিন প্লাটুন কমান্ডারকে নিয়ে আমি আবার স্বচক্ষে হালছটি গ্রাম, শালবন ও নালা পথ রেকি করে কোথায় কোন হাতিয়ার হবে এবং কোথায় এফ-ইউ-পি'র (ফর্ম আপ প্লেস) হবে সকলকে পই পই করে দেখিয়ে দিলাম। পহেলা আগস্ট আমি পুরো সেকশন কমান্ডারদের নিয়ে পূর্ব নির্দিষ্ট জায়গা আবার দেখিয়ে দিলাম যাতে করে রাতের আধাঁরে ভুল না করে। এদিকে সাপোর্টিং হাতিয়ার মেশিনগান, ১০৬ মিঃ মিঃ ও ৭৫ মিঃ মিঃ আর-আর-এর জন্য বাংকার বানাবার জন্য ২৫টি আড়াইমণী চটের বস্তা নিয়ে এলাম। এত প্রস্তুতি নেয়া সম্ভব হয়েছিল শালবনের ঘন আড়ালের জন্যই। অবশ্য পাকিস্তানীরা উত্তর দিকে বি-ও-পি'র চতুর্পাশ্বে প্রায় ৬০০ গজ এলাকায় সমস্ত গাছপালা, জংগল পরিষ্কার করে ফিলিং জোনের ফিল্ড অব ফায়ার একেবারে সাফ রেখেছিল। তৃতীয় দিনে রেকি করার কালে হালছটি গ্রামের নালার পাশে আমরা তখন একটি আমগাছের মাথায় লাল ফুলকে মানুষ (টাইপার) মনে করে থমকে দাঁড়ালাম। পরে নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে এক গাল হাসি হাসতে যাব এমন

সময় ঝুপ করে একটি শব্দ হলো, মনে হলো একটি লোক নালার ভিতর দিয়ে পালাচ্ছে। আমার সেকশন কমান্ডাররা জড়সড় হয়ে একে অপরের মুখোমুখি হয়ে পজিশনে গেল। দেখে জ্বলে গেলো। আসলে তাদের আরো ছড়িয়ে পড়ে একে অপরের বিপরীত দিকে মুখ খরে (ডায়মন্ড ফর্মেশন) অলরাউন্ড ডিফেন্স নেওয়া উচিত ছিল। বুঝলাম আরো অনেক ট্রেনিং-এর দরকার। ভাগ্যিস ঝুপ করে আওয়াজ হয়েছিল নালাতে পাড় ভেঙ্গে ধসে পড়া মাটি থেকে। তা না হলে গোল হয়ে বসে থাকা আমার দলটিকে নিমেষের মধ্যে শেষ করে দেয়া একজন শত্রুসৈন্যর পক্ষেই যথেষ্ট ছিল। ফেরত আসার সময় একটি গারো মেয়ে আমাকে দেখে চুপ করে পাহাড়ের গাছের সাথে মিশে রইল। আমি ধারণাই করতে পারিনি যে অমন ফাঁকা জায়গায় কোন মানুষ লুকিয়ে থাকতে পারে।

২রা আগস্ট বিকালে কর্নেল জিয়াউর রহমান স্বচক্ষে আমার প্ল্যান মোতাবেক হাতিয়ারের অবস্থানগুলো দেখলেন। রাতে রাস্তা থেকে গাড়ী পড়ে যাওয়াতে তখন বিশৃংখলা সৃষ্টি হয় তখন ব্রিগেড হেড-কোয়ার্টারে ১ম ইস্ট বেঙ্গল ক্যাপ্টেন মাহবুব (যিনি পরে ৮ই ডিসেম্বরে সিলেট রণাঙ্গণে শহীদ হন) আমাকে বললেন, ''স্যার মনে কনফিউশন থাকলে এ্যাটাক করতে যাবেন না।'' আমি হেসে বললাম, ''বেওকুফের মত মরতে আমি রাজী নই।'' ৩রা আগস্ট রাত ১২টার দিকে এসেম্বলী এরিয়া থেকে রওনা হবো-দেখি বাহাদুরাবাদ ঘাটে বিজয়ী বীর কর্নেল শাফায়াত জীপ নিয়ে হাজির-''আমিন, রিমেম্বার, ডোন্ট গো ফর ইমপসিবল টাস্ক অল বাই ইওরসেলফ-অল দি বেস্ট।

এসেম্বলি এরিয়া থেকে আমার সৈন্যরা অত্যন্ত সাবলীল গতিতে এফ-ইউ-পি'তে পৌঁছায়। এমনকি মাঝপথে নালা ক্রস করার সময়ও কোন শব্দ করেনি, কারণ পূর্ববর্তী দু'রাত বিনা শব্দে পানির উপার চলার প্র্যাকটিস করেছিলাম। অন্যদিকে একই সময়ে দুই প্লাটুন রাংগাটিয়াতে যায় কাট-আপ পার্টি হিসাবে। যদিও ই-পি-আর'ও গার্ড ছিল তথাপি মনে হয় এফ-ইউ-পি মাকিং করলে যে সামান্য বিশৃংখলাটুকু হয়েছিল তাও হত না। সৈন্যরা যখন এফ-ইউ-পি'তে যাচ্ছে আমি তখন ৮/১০ জ এফ-এফ ছাত্র নিয়ে এম-জি ও আর-আর'এর এম্যুনিশন বাংকারে পৌঁছিয়ে দিই। উদ্দেশ্য, ওদের মনে সাহস যোগানো। কারণ যুদ্ধের ফলাফল এদের উপর অনেকখানি নির্ভর করছিল। বাংকারের পিছে অবস্থানরত সুবেদার হাকিম তখন রীতিমহত ক্ষেপে গেছেন, কারণ ইন নিজে তো খাবার পাননি, নিজের ছেলেরা যারা সারারাত ঐ আড়াইমণী বস্তায় বালি ভরে বাংকার বানিয়েছে ওরাও পায়নি। দেমাক ঠান্ডা রেখে বললাম ''সব ভুলি নাই, তবে আপনাদের রুটি পিছনে এসেম্বলী এরিয়াতে রয়ে গেছে, কাউকে পাঠিয়ে দিয়ে নিয়ে আসুন।'' এফ-ইউ-পি'তে আমার কমান্ডিং অফিসার মেজর আমিন আমাকে একাকী শত্রুঅভিমুখে ঠেলে না দিয়ে আমার সাথে নিজেও যেতে চাইলেন। আমি সেই দুঃসাহসিক বীর যোদ্ধাকে ইকনমির কতাটা বুঝাতে চাইলাম। নিছক ভাবাবেগে কাজ হবে না- এক সংগে দুজন অফসার হারানো মুক্তিবাহিনীর নিছক বোকামি। রাত ৩-৩৫ মিনিটে এফ-ইউ-পি'তে পজিশন নিলাম। আমার ডানে ১২ নং প্লাটুন আমার এক ভাগ্নে আই-এ ক্লাশের ছাত্র জহিরুল আনোয়ার ওরফে সানু সাধারণ সৈনিক হিসেবে আমার পাশেই ছিল। আশ্চর্য, আজ আত্মীয়তার প্রশ্নটা তেমন করে দেখা দিচ্ছে (যেহেতু স্বজনপ্রীতি আমাদের মজ্জাগত হয়ে আছে) সেদিন কিন্তু এ প্রশ্নটা তেমন করে দেখা দেয়নি। সেদিন প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঝংকৃত হয়েছিল- 'ওই জিজ্ঞাসে কোন জন? কান্ডারী বল ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মার''। তাই বুঝি ঘূণাক্ষরেও যুদ্ধের ময়দানে আমার ভাগ্নের উপস্থিতি আমি টের পাইনি।

এফ-ইউ-পি'তে পজিশন নিয়ে ৩-৪৫ মিনিটে অয়ারলেসে বললাম -'জোরে মার।' সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আর্টিলারী গর্জে উঠলো। বুঝতে পারলাম আর্টিলার আওয়াজের ধমকে আমার স্বল্প ট্রেনিংপ্রাপ্ত সৈনিকরা এফ-ইউ-পি'তে মাটির সাথে মিশে যেতে চাইছে। মাটি কামড়ে পড়ে থাকাটা আরো প্রকট হয়ে উঠলো যখন নিজেদের এই প্রি-এইচ আওয়ার আর্টিলারী গোলাবর্ষণ কালে দু'তিনটি রাউন্ড ভুলবশত ঠিক আমাদের এফ-ইউ-পি'তে এসে পড়ে-যদিও বা টারগেট থেকে এফ-ইউ-পি ছিল প্রায় এক হাজার গজ দূরে। মনে হয়, এফ-ইউ-পি, শত্রুশিবির ও আমাদের আর্টিলারী পজিশন এক লাইনে ছিল বলে সহজে আর্টিলারীর গোলা এসে এফ-ইউ-পি'তে

পড়ছিল। অবশ্য পূর্বাহ্নে আর্টিলারীর কর্মক্ষমতা সম্বন্ধে সন্দিহান হলে কিংবা এত নিম্নমানের হতে পারে এ ধারণা থাকলে আমি হয়ত ডাইনে হালছটি গ্রামের শালবনকে এফ-ইউ-পি বানাতাম। হালটি গ্রামের শালবনটি শত্রুশিবির থেকে মাত্র তিনশ'গজ দূরে ছিল। কিন্তু যেহেতু আমাদের আক্রমণের বেশ কিছুদিন আগে ঐ শালবনকে এফ-ইউ-পি বানিয়ে এফ-এফ কোম্পানী বি-ও-পি'র উপর আক্রমণ করেছিল, তাই আমি ঐ শালবনটিকে এফ-ইউ-পি বানাইনি। অন্যদিকে পূর্বদিন আমার পরিকল্পনা ছিল সামনের নালাকে এফ-ইউ-পি বানিয়ে আর্টিলারীর 'ফায়ার অন কল' রেখে (দরকার মহত ব্যবহার করা) আক্রমণ করা। তাতে করে রাতের আধারে শত্রুর অজান্তে আমরা শত্রুশিবিরের ২/৩ শ' গজ ভিতরে পৌঁছে যেতাম আর নিজস্ব আর-আর ও মেশিনগান দিয়ে শত্রুকে আচম্বিতে ঘায়েল করে শত্রুর ব্যূহ অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারতাম বলে আমার বিশ্বাস ছিল। আর বিশেষ দরকার মত আর্টিলারী সাপোর্ট তো ছিলই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অবস্থার চাপে পূর্ব পরিকল্পনা বদল করে প্রি-এইচ আওয়ার (আক্রমণের পূর্বাহ্নে) গোলাবর্ষণের কার্যক্রম নিতে বাধ্য হলাম। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস, যুদ্ধের আগেই এফ-ইউ-পি'তে নিজেদের আর্টিলারীর এই দু-তিনটি রাউন্ড এসে পড়াতে আমার ছয়টি ছেলে ঘটনাস্থলে গুরুতর রুপে আহত হয়। ফলে পুরা প্লাটুন আহতদের শুশ্রুষার নামে এফ-ইউ-পি'তেই থেকে যায়। এতে যথেষ্ট শোরগোলও হয়। অপরদিকে প্রচন্ড গোলাগুলির মাঝে আমাদের আর্টিলারী গর্জে ওঠার মিনিট খানেকে ভিতর পাকিস্তানী আর্টিলারী গর্জে ওঠে। একবার মাটিতে শুয়ে পড়ে তারপর আবার দাঁড়িয়ে অগ্রসর হওয়া যথেষ্ট সাহসের কাজ বৈকি-বিশেষ করে আমার দুই কোম্পানীর জন্য। কারণ আমার দুই কোম্পানীতে (৮তম ইস্ট বেঙ্গল) দুশো জনের মধ্যে তখন মাত্র ১০ জন সামরিক বাহিনীর লোক, গোটা আটেক ই-পি-আর এবং দু তিনজন পুলিশের লোক ছাড়া বাকী সবাই সাতদিনের ট্রেনিং প্রাপ্ত গ্রামবাংলার একান্ত সাধারণ মানুষ। প্রি-এইচ আওয়ার গোলাবর্ষণের সাথে সাথে আমার ডানে অবস্থিত মেশিনগান ও আর -আর প্রচন্ডভাবে গর্জে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে হালছটি গ্রাম থেকে ই-পি-আর'এর প্লাটুনটি ভাঁওতা দেয়ার জন্য আক্রমণের ব্যূহ রচনা করে শত্রুদের ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া দিল। এই কার্যক্রমগুলো অত্যন্ত সুষ্ঠু ও সাবলীল গতিতে হতে থাকে। ই-পি-আর'এর আক্রমণ চলাকালীনই আমরা চুপি চুপি এক্সটেনডেড লাইন ফরমেশন করে পায়ে পায়ে এগুতে থাকি। এ অবস্থায় সুবেদার জালাল যথেষ্ট দৌড়াদৌড়ি করলেও পরবর্তীকালে তার আর সাক্ষাৎ পাইনি। এফ-ইউ-পি ছাড়ার সাথে সাথে একটি ছেলে কাঁদো কাঁদো স্বরে বলে উঠলো, ''স্যার বাঁ দিক থেকে গুলি আসছে যে'' -ভাবখানা এই গুলি তার পিছু ধাওয়া করছে। হাসি পেলেও চিৎকার করে উঠলাম- ''বেটা গুলি আসবে না তো বৃষ্টিধারা আসবে?'' ৫০০ গজ আগে নালার কাছে পৌঁছে শুধু ২" মর্টারওয়ালাদেরকে নালার পাড়কে আড়াল রেখে ৩০০ গজ আগে শত্রুশিবিরের উপর ফায়ার করার নির্দেশ দিলাম। এই নির্দেশ না দিলেই যেন ভাল হতো, কারণ আমার এই নির্দেশের সুযোগ আমার স্বল্প-ট্রেনিংপ্রাপ্ত সৈনিকরা নালাতে আড়াল নিয়ে নেয়, তাতে কমান্ডার কন্ট্রোল একেবারে শিথিল হয়ে পড়ে। নায়েক সুবেদার কাদের ও বাচ্চুর অধীনে ৫ও ৬ নং প্লাটুন বি-ও-পি'র গেটের ভিতর দিয়ে প্রবেশ করার কথা ছিল, কিন্তু তারাও নালার ভেতরে আড়াল নিয়ে মাথা নিচু করে আন্দাজে ফায়ার করতে শুরু করে। সম্ভবতঃ এই জন্যই এফ-ইউ-পি ত্যাগ করার পর ফায়ার এন্ড মুভ পদ্ধতিতে আক্রমণ করা মিলিটারী একাডেমীতে (পাকিস্তান) বিতর্কের বস্ত ছিল এবং প্রায়ই বলা হতো এফ-ইউ-পি ছাড়ার পর ডোন্ট গো টু দি গ্রাউন্ড এগেইন। নালাতে আমার সৈন্যদের এমন কান্ড দেখে শত্রুশিবিরের নিকটবর্তী এসেও আমি চিৎকার না করে পারিনি, এমন কি কাউকে কাউকে পর্যন্ত লাথিও মেরেছিলাম। শেষ পর্যন্ত উপায়ান্তর না দেখে করার চেপে ধরে আমি জোর করে আগে পাঠাতে চেষ্টা করি। আমার বামে হাবিলদার নাসির অত্যন্ত সাহসের সাথে ক্ষিপ্তগতিতে এগুতে থাকে এবং আমি নিজে নায়েক সিরাজকে সাথে করে ডানে বাংকারের দিকে এগুতে থাকি। আমাদের এই মনোবল দেখে তখন পলায়নরত। ইতিমধ্যে আমরা এসল্ট লাইন ফর্ম করি এবং সঙ্গে সঙ্গে 'চার্জ' বলে হুংকার দিই এবং পর মুহূর্তে 'ইয়া আলী' বলে আমার সৈন্যরা সংগীন উঁচু করে বেয়নেট চার্জের জন্য রীতিমত দৌড়াতে শুরু করে। এদের উত্তেজনাকে বাড়াবার জন্য নায়েক সুবেদার মুসলিম 'নারায়ে তকবির' ধ্বনি করলে সৈন্যরা ঘন ঘন 'আল্লাহ আকবর' ধ্বনি করে সমস্ত যুদ্ধের ময়দানকে প্রকম্পিত করে তোলে। আনন্দের আতিশয্যে আমার সিগনালম্যান অয়ারলেস সেট আমার সামনে এনে ধরলে আমি ধমকে

উঠলাম ‘তুমি নিজেই যা পার বলে পাঠাও’। পিছু পিছু সে অয়ারলেসে জোরের সংগে বলে বেড়াচ্ছিল, ‘‘হয়ে গেছে, আর একটু বাকি..বাংকারে বাংকারে যুদ্ধ জয় হচ্ছে’’....ইত্যাদি। ঠিক এমন সময় শত্রুদের আর্টিলারীর শেলভো ফায়ার (এয়ার ব্রাস্ট) এসে পড়লো আমাদের উপর। সংগে সংগে বেশ কয়েকজন ঢলে পড়ল, যার ভেতর সম্ভবতঃ হাবিলদার নাসিরও ছিল। আমাদের সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। আমার ডান পায়ে এসে একটা শেল লাগল, আঘাতটার গুরুত্ব উপলব্ধি করার আগেই জোশের সাথে এগিয়ে গেলাম আরো পঞ্চাশ গজ। শত্রুবাংকার মাত্র পাঁচগজ বাকি। আমাদের গুটিকতক ছেলে তখন পলায়নরত শত্রুদেরকে মারছে। কেউ কেউ মাইন-ফিল্ডে ফেঁসে গিয়ে শত্রুর মাইনে উড়ে যাচ্ছে। কেউবা শত্রুর গুলি খেয়ে পড়ে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় অনার্সের ছাত্র শামসুল আলম মাইন কিংবা শত্রুর তোপের মুখে উড়ে গেল। ঐ বিশ-পঁচিশটা ছেলের মন চাংগা রাখার জন্য জোরে জোরে চিৎকার করে উঠলাম- ‘‘বি-ও-পি একেবারে তছনছ হয়ে গেছে। আগে অগ্রসর হও’’ -যদিওবা বি-ও-পি’র মাটির দেওয়াল আগের মতই ঠিক খাড়া ছিল। এমন সময় আমার বাম পায়ে বাঁশের কঞ্চি বিঁধলো, আমি পড়ে গেলাম। সম্ভবতঃ পড়ে যাওয়ার আগের মুহূর্তে আহত এক খানসেনা এলো সংগীন নিয়ে। বাচ্চা ছেলে লালাম (অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র এবং এক সুবেদার মেজরের ছেলে) আগেই খতম করে দিল খানসেনাকে। এদিকে যারা মাথা নিচু করে আন্দাজে ফায়ার করছিল তাদের ফায়ারে আমাদের দুটি ছেলে জখম হল’। করার কিছুই নেই তখন। এর আগে এফ-ইউ-পি থেকে এডভান্স করাকালীন নালাতে অবস্থান করা কালে অমন মাথা নিচু করে আন্দাজে ফায়ার করার জন্য আমি একটি ছেলের কাছ থেকে রাইফেল কেড়ে নিয়ে পেছনে পাঠিয়ে দিই। মাটিতে পড়ে গিয়ে আমি দুটি ধাবমান শত্রুকে গুলি করে ডানদিকে বাংকারে অবস্থানরত শত্রুসেনাকে গুলি করার জন্য বিহারী ছেলে হানিফকে ঘন ঘন নির্দেশ দিচ্ছিলাম। অবশ্য হানিফ তখন ভীষণভাবে অনুরোধ করছিল। ‘‘স্যার, আব পিছে চলে যাইয়ে, ম্যায় কভারিং দে রাহাহু’’। বলা বাহুল্য, বিহারী ছেলে হানিফ ছিল আমার ব্যক্তিগত প্রহরী। বরিশালের এক বাংগালী মেয়েকে বিয়ে করেছিল হানিফ। বেশ কয়েকটা অপারেশন করার পরেও সন্দিহান হয়ে মুক্তিবাহিনী তাকে গ্রেফতার করে। বন্দীশিবিরে স্পষ্ট বাংলায় সে আমাকে বলল, ‘‘স্যার, আমি বেঈমান না, একটা চান্স দিন, জান দিয়ে প্রমাণ করবো।’’ পিঠ চাপড়িয়ে আমি বললাম- ‘‘হানিফ আজ থেকে তুমি আমার পারসোনাল গার্ড। পারবে?’’ ‘‘স্যার, আমার জান থাকতে আপনার গায়ে গুলি লাগবে না’’ -প্রত্যয় ভরা কণ্ঠে উত্তর দিয়েছিল হানিফ।

সত্যি সে জীবিত থাকাকালীন আমার পায়ে গুলি লাগেনি (যদিও শেল লেগেছে)। হানিফকে দ্বিতীয়বার নির্দেশ দেবার আগেই হিস শব্দ হল, হানিফ ঢলে পড়ল, মনে হয় ওর মাথায় গুলি লেগেছিল। তার মাথায় স্টীল হেলমেট ছিল না। ক্রল করে ওর হ্যাবারসেকে ধাক্কা দিয়ে ক্ষীণস্বরে বলে উঠলাম ‘হানিফ’- কোন সাড়া আসল না। প্রাণটা কেঁদে উঠল। সাথে সাথে শত্রুর গুলিতে পাশের মাটি উড়ে গেল। বুঝতে পারলাম শত্রু আমাকে দেখে ফেলেছে। সাইড রোল করে সরে যাওয়ার চেষ্টা করাকালীন বামদিক থেকে একটা গুলি এসে আমার ডানহাতের কনুইতে লাগল। ঝাঁ করে যেন বিদ্যুৎ প্রবাহিত হল, হাতের ষ্টেনটা ছিটকে পড়ল। বাঁ হাতে তা কুড়িয়ে নিলাম। কব্জিটা বেঁকে নিচের দিকে ঝুঁকে পড়লো। ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হচ্ছে। ফিল্ড-ড্রেসিংটা বের করব-একঝাঁক গুলি এসে পাশের জমির আইলটা উড়িয়ে দিল। বুঝতে পারলাম শত্রুর পাঁচগজের ভিতর আর থাকা সম্ভব নয়। আমার দু’ধারে শুধু লাশ আর লাশ। কারণ, এর আগের মুহূর্তে এস-ও-এস (সেইভ আওয়ার সোল) এয়ার ব্রাস্ট, আর্টিলারী ফায়ারে আমাদের যে ৮/১০ জন লোক শত্রুর বাংকারে ঢুকে পড়েছিলো তার ধরাশায়ী হলো। তার মধ্যে নায়েক সিরাজ এবং পুলিশের ল্যান্স নায়েক সুজা মিয়াও ছিল। পাশে তাকিয়ে দেখি একটি কচি ছেলের লাশ। ছেলেটি কিছুক্ষণ আগে শত্রুর গুলিতে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে শত্রুর ডান বাংকার এড়িয়ে কোনাকুনি আরো ডানে অধিকতর নিরাপদ স্থানে হালছটি গ্রামের দিকে যেতে চেষ্টা করছিল।

শত্রুশিবিরে পাঁচ গজের ভিতর থেকে বের হওয়ার জন্য ফিল্ড-ড্রেসিং আর বের না করে সাইড রোল শুরু করলাম। উদ্দেশ্য, ডানের ঢালু জমি দিয়ে অধিকতর নিরাপদ রাস্তাতে পশ্চাদপসরণ করা। কিছুক্ষণ সাইড রোল করার পর তাকিয়ে দেখি আসলে ডানে না গিয়ে আমি কোনাকুনি শত্রুশিবিরের দিকে যাচ্ছি। মাথাটা ঠান্ডা

রাখতে হবে, তাই একটু দম নিয়ে পিছনে তাকিয়ে লক্ষ্য ঠিক করে নিলাম। শরীর থাকতে থাকতেই আমাকে হাজার গজ দূরে শালবন এলাকায় পৌঁছতে হবে। ক্রলিং শুরু করব, এমন সময় দেখি বাচ্চা ছেলে সালাম, যে পঞ্চাশ গজ ক্রস করে পিছনে হটে গিয়েছিল, হঠাৎ করে আবার দৌড়ে এসে পড়ে থাকা একটা এল-এম-জি নিয়ে 'জয় বাংলা' বলে হুংকার দিয়ে শত্রুবেষ্টনীর দিকে ধাবিত হলো। ছত্রভংগ হয়ে যাওয়া শত্রু তখন পুনরায় কাউন্টার এ্যাটাক করার জন্য মাটির দেয়ালের পিছে জমায়েত হচ্ছিল এবং ঘন ঘন 'আল্লাহ আকবর' ধ্বনি করছিল। 'ওরে তোরা আমার মা-বাপ সবাইকে মেরেছিস, আমি ছেড়ে দেব?' বিড় বড় করে পাগলের মত সালাম শত্রুবেষ্টনীর মধ্যে ঢুকে পড়ল। অতি কষ্টে একবার ডাক দিলাম-'সালাম চলে এস।' কিছুক্ষণ আগে যে আমার জীবন রক্ষা করেছিল সেই সালামকে আর ফিরিয়ে আনতে পারিনি। অথচ বাচ্চা বলে এবং তার সংসারে একমাত্র জীবিত ব্যক্তি আমি তাকে যুদ্ধে সামিল করিনি। কিন্তু সে পালিয়ে এসে এসেম্বলী এরিয়াতে আমাদের সাথে চুপি চুপি যোগ দেয়। বাংলার শ্যামল গালিচার দুর্বাদলের মাঝে এমনি করে লুকিয়ে আছে হাজারো সালাম।

সমস্ত যুদ্ধক্ষেত্রটা তখন মহাশ্মশান, মৃতদেহ ছাড়া আর কোন জ্যান্ত মানুষ নেই-বৃষ্টির মত গুলিবর্ষণ হচ্ছে দু'দিক থেকে। শালবনে অবস্থানরত আমার মেশিনগান তখন ঘন ঘন গর্জে উঠেছে। তাই আমি নিজেদের ফায়ার থেকে বাঁচার জন্য ডাইনে অপেক্ষকৃত নিচু ধানক্ষেতের ভিতর দিয়ে এগুতে শুরু করি। এমন সময় কে যেন চিৎকার করে উঠলো-'এরে আঁই বাঁচতে চাই, তোরা কেউকি আঁর কথা শুনতাছ না। এরে আঁরে লই যা।' প্রাণটা কেঁদে উঠলো, যদিও করার কিছুই ছিল না। তবুও দাঁত খিঁচিয়ে বললাম, ''বেটা চিৎকার করিস না।'' তবে তার কাছে যাওয়ার কথা চিন্তা করার আগেই ঐ এলাকা বরাবর একটি আর্টিলারী শেল এসে পড়লো। মাথাটা নিচু করে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকাকালে আঁচ করলাম স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের গুলিতে আমার পাশের মাটি উড়ে গেল। আমি তাড়াতাড়ি বাঁ হাত ঠেলে ঠেলে নিজের আহত শরীরটাকে নালার দিকে নিয়ে গেলাম। ইতিমধ্যে আর কোন চিৎকার শুনিনি। নালার কাছে পৌঁছে সর্বশক্তি নিয়োগ করে খাড়া হয়ে চলতে টলতে টলতে কেমন করে জানি নালাটা পার হয়ে গেলাম আজ বলতে পারব না। মনে হচ্ছে বাঁচতে হবে এই জোরেই বুঝি নালাটা পার হয়েছিলাম। আর পাড়ে ওঠার সাথে সাথেই ধপ করে পড়ে গেলাম। তবুও স্বস্তিবোধ করলাম এই মনে করে যে, শত্রু থেকে অনেক দূরে গেছি এবং অপেক্ষাকৃত ঢালু জায়গায়। সেখানে এসেছি তাতে শত্রুর স্থল আর্ম ফায়ার থেকে প্রায় বেঁচে গেলাম। শরীরটা ক্রমশই ঠান্ডা হয়ে আসছিল, তাই বুঝি সমস্ত জোর দিয়ে খাড়া হয়ে দৌড় দিতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার আগেই টের ফেলাম ১০/১২ জন শত্রুসেনা এগিয়ে আসছে আমার দিকে। পিছনে নালার ওপারে আমার এক হতভাগ্য আহত জোয়নকে পেয়ে এক গাল হাসি হেসে ওরা গুলি করল। তারপর কিছুক্ষণ কোন সাড়াশব্দ পেলাম না। তারপর হঠাৎ করে শত্রুর দল থেকে এক বাংগালী আরেক বাংগালীকে বলছে, 'মকবুল এদিকে আয়, পাওয়া গেছে।' বোধ হয় ঠেলে ঠেলে আসার ফলে কর্দমাক্ত মাটিতে রাস্তা হয়ে গিয়েছিল আমার পালাবার পথ। সাথে হাতের ও ধানক্ষেতের আড়ালে আড়ালে প্রায় ৩০০ গজ আসার পর ধানক্ষেত শেষ হয়ে গেল। এর পরের ২০০ গজ সম্পূর্ণ খোলা ময়দান। ঐদিকে কর্দমাক্ত মাটিতে কোমর পর্যন্ত পানিতে থাকার ফলে শরীর ঠান্ডা হয়ে গেছে, ভীষণ শীত করছিল। ভাবলাম আর বোধ হয় বাঁচা সম্ভব নয়। আমাদের তরফ থেকে কোন জনপ্রাণীরই চিহ্ন নাই। যে মেশিনগান এতক্ষণ ধরে প্রচন্ড বেগে ফায়ার করছিল সেও চুপ হয়ে গেছে। এফ-ইউ-পি তত্ত্বাবধানে যারা ছিল তারাও চলে গেছে। আমার নিজস্ব কোন ঘড়ি ছিল না। আক্রমণের আগে আমার রকেট লাঞ্চারওয়ালা তার নিজের ঘড়িটা আমাকে দিয়েছিল। ঘড়িটার দিকে একবার তাকালাম। বেলা তখন ৮টা ১০ মিনিট। রোদটা পিঠে লাগছিল। তৃষ্ণায় বড় কাতর হয়ে পড়েছি। কেবলই মনে হচ্ছিল আমার একটা জওয়ান যদি একটা কাভারিং ফায়ার দেয় তবেই আমি রক্ষা পাই। শত্রু তখন পঞ্চাশ গজ দূরে আমায় খুঁজে বেড়াচ্ছে। ক্রমেই আমি তলিয়ে

যাচ্ছি। শেষবারের মত টেনে-হেঁচড়ে বিক্ষত দেহটাকে আর্টিলারী শেলে সৃষ্ট একটি কালো মাটির গর্তে নিয়ে গেলাম। শত্রু যাতে সহজে দেখতে না পায়-গলা পর্যন্ত ধীরে ধীরে বাঁ হাতের কর্দমাক্ত কালো মাটি দিয়ে লেপে দিয়ে স্টীল হেলমেট মাথার নীচে দিয়ে শুয়ে রইলাম। অপেক্ষায় রইলাম চরম মুহূর্তের, চোখ আপনা থেকেই বুজে আসছে, স্টেনটা বাঁ হাতে ধরা। বন্দী হবো না কোন ক্রমেই, বরং মেরে মরব। তবুও মনেপ্রাণে মরার কথাটা চিন্তা করতে পারছিলাম না। কেন জানি মনে হচ্ছিল এত অল্প বয়সে মরে যাব। চোখ দুটোকে আর খুলে রাখতে পারছিলাম না। ঠিক সময় আমার কমান্ডিং অফিসার মেজর আমিনের কণ্ঠস্বর ভেসে আসলো শালবন থেকে-‘‘আমিন, আস্তে আস্তে আসার চেষ্টা কর।’’ আহত হওয়ার তিনঘন্টা পর এই প্রথমবারের মত সক্রিয় সাহায্য পেলাম। বস্তুত, আমার নিহত বা নিখোঁজ হওয়ার সংবাদে কর্নেল জিয়াউর রহমানের নির্দেশে মেজর আমিন তখন কমান্ডো প্লাটুন নিয়ে আমার মৃতদেহ খুঁজতে বের হয়েছিলেন। আমার কাছে ক্রল করে আসতে ইতস্তত করছিল দেখে মেজর আমিন নিজেই খালি হাতে ক্রল শুরু করলেন। সাথে সাথে হাবিলদার তাহের মেজর আমিনের পিছু নিল। আমার কাছে এসে উভয়ে পর্যায়ক্রমে আমার পা ধরে মৃতদেহের মত টানতে শুরু করলো। পিঠের চামড়া উঠে যাচ্ছে, বিক্ষত ডান পায়ের ব্যাথার ডুকরে উঠলেও দাঁত কামড়ে রইলাম। সম্ভবতঃ আনন্দের আতিশয্যে ব্যথা ভুলেও গেলাম, লেফটেন্যান্ট মোদাসসের তখন চিৎকার করছে শালবন থেকে-‘তাড়াতাড়ি করেন স্যার।’ তার দুই এল-এম-জি-ওয়ালাকে হত্যা করে পায়ে পায়ে এগুচ্ছে। আমাদের দুই এল-এম-জি,ওয়ালা কেঁদে কেঁদে বলছে-‘‘আপনাদের ধরে ফেললো যে স্যার।’’ দাঁত খিঁচিয়ে আমরা বললাম-‘‘বেটা ফায়ার কর।’’ আমাদের উপর দিয়ে ফায়ার করতে হবে তাই জোয়ানরা ইতস্তত করছিল। শত্রু তখন আমাদের উপর চার্জ করে আর কি! সংগে সংগে এল-এম-জি গর্জে উঠলো। ৬/৭টি খান সেনা তৎক্ষণাৎ লুটিয়ে পড়লো। মকবুল আর তার সাথী দালালকে আমরা হাতেনাথে ধরে ফেললাম। দুটি খানসেনা পালিয়ে বাঁচলো। কিন্তু সংগে সংগে শত্রুর আর্টিলারী ফায়ার এসে পড়তে লাগলো। বৃষ্টির মত আর্টিলারী ফায়ারের মাঝে মেজর আমিন আমাকে কাঁধে নিতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু পরিশ্রান্ত মেজর আমিন নিজেই আমাকে নিয়ে নালায় পড়ে গেলেন। ‘‘স্যার প্লীজ আপনি চলে যান, তাহের আমাকে নিয়ে আসবে’’ আমি বলে উঠলাম। শেষ পর্যন্ত জোর করে আমি তাহেরের দিকে হাত বাড়ালাম। ‘‘স্যার প্লীজ আপনি চলে যান’’, আবার বললাম। আর বৃষ্টির মত আর্টিলারী ফায়ারের মধ্যে হাবিলদার তাহের আমাকে কাঁধে নিয়ে দিল এক ভোঁ দৌড়। ভীষণভাবে হাঁপাচ্ছিল তাহের। হাঁপাতে হাঁপাতে বলছে, ‘‘স্যার চিন্তা করবেন না, মরলে দু’জন একসাথেই মরব।’’

নকশী বি-ও-পি আক্রমণকালে যারা শহীদ বা নিখোঁজ হয়েছেন তাঁরা হলেনঃ ১। হাবিলদার নাসিরউদ্দিন ২। সিপাই মোহাম্মদ আলী ৩। সিপাই সিরাজুল হক ৪। ল্যাঃ নাঃ আবুল কালাম ৫। ল্যাঃ নাঃ মোঃ ইউসুফ মিয়া ৬। সিপাই হুমায়ন কবীর ৭। সিপাই মোঃ সুজা মিয়া ৮। সিপাই শামসুজ্জামান ৯। সিপাই আবদুস সাত্তার ১০। সিপাই ফয়েজ আহমদ ১১। সিপাই আবদুস সালাম ১২। সিপাই মোঃ হানিফ, এক্স ই-পি-আর ১৩। সিপাই আবদুস সালাম ১৪। সিপাই সদর উদ্দিন ১৫। সিপাই ফজলুল হক ১৬। সিপাই আবদুস সামাদ ১৭। সিপাই জামাল হোসেন ১৮। সিপাই আবু ইসমাইল ১৯। নায়েক আবদুস সালাম ২০। নায়েক সৈয়দ ফুল মিয়া ২১। নায়েক সতর উদ্দিন ২২। নায়েক হায়েত আলী ২৩। নায়েক আবদুল কুদ্দুস ২৪। রবিউল আলম ২৫। সিপাই শাহজাহান আলী ২৬। সিপাই মনসুর আলী।

৩১শে জুলাই ৭১ কামালপুর যুদ্ধে নিহত কিংবা নিখোঁজদের তালিকাঃ ১। ক্যাপ্টেন সালাউদ্দিন মমতাজ ২। সিপাই মোহাম্মদ আলী ৩। ল্যান্স নায়েক গোলাম মোস্তফা ৪। সিপাই মতিউর রহমান ৫। সিপাই রহিতুল্লাহ ৬। সিপাই আমিনুল ইসলাম ৭। সিপাই আবদুল লতিফ ৮। সিপাই রবিউল ইসলাম ৯। সিপাই রফিকুল ইসলাম ১০। সিপাই আবদুল ওয়াহাব ১১। সিপাই সদরউদ্দিন ১২। ল্যাঃ নায়েক সিরাজুল ইসলাম ১৩। সিপাই মোস্তফা কামাল ১৪। আনোয়ার হোসেন ১৫। আবদুস সোবহান।

সাক্ষাৎকারঃ ক্যাপ্টেন মাহবুবর রহমান
৫-৯-৭৩

During the 4th week of June 71 Col Osmani, C-in, Bangladesh Army posted Major Shafaat Jamil from 4 E Bengal Regt as the new Commanding Officer of 3 E Bengal Regt. Capt Motiur Rahman disembarked from the aircraft with our new CO. We were extremely glad to see him, but he was not to be with us as he was posted elsewhere. Along with him arrived a surprise for us. In the 1st week of July it was informed through a secret source that 3 E Bengal Regt will move to some other part of Bangladesh to carryout operation. And suddenly in short notice the battalion started off for its new destination. After 5/6 days journey the battalion re3ached at a place called Tel Dhala in the state of Meghalaya. There the first brigade of Bangladesh Army was formed. This brigade was put under the command of Major Zia-ur-Rahman which was later on named 'Z' force after the name of ifs first commander.

In Tel Dhala the strength of the battalion was made full by recruiting new boys from EPR, Police, Ansar, Mujahid and Students and training them.

After going through proper training the comd 'Z' force distributed "area of operation" to the individual battalion. The battalions were to carry out certain operation in their area of responsibilities during the course of their training. During this time our battalion carried out different operations in Bahadurabad Ghat. Dewangonj, Jamalpur and earned good fame. In Rangpur this battalion had been holding certain areas of Roumari, Ulipur, Chilmari which the Pak Army after repeated attacks could never occupy.

In Kodal Kati, Hazir Char, Roumari Pak Army lost many motor launches, steamers , arms and ammunitions, lost may lives to this battalion. It is notable that during this period Bangladesh Army was unable to hold any land inside Bangladesh other than 3 E Bengal Regt. Many well-known personalities like photographer and a journalist sent by Edward Kennedy in order to witness the liberated areas of Mukti Bahini came to Roumari which was occupied by 3 E Bengal Regt and was free since then. It was shown to them how 3 E Bengal fought with the enemy and got victory with its brave Mukti Bahini. It was also shown how this battalion occupied enemy territory, got arms and ammunition, motor launch from the enemy. An interview with Major Ziauddin Commanding Officer of 1 E Bengal Regt also shown. In that, Major Ziauddin tells how he crossed over from Rawalpindi.

In the second week of September the area of operation for 3 E Bengal was changed by Col Osmani with the consultation of Commander of friendly forces and once again the battalion started for an unknown destination. After few days of journey it came to Shillong. It was decided there that this battalion would attack Chhatak and Sunamgonj and occupy them. From there they would launch another attack on Sylhet town and occupy it. The battalion left Shillong and concentrated at a place called Pathorghata. In Pathorghata after going through some discussions and thorough planning the battalion commander issued certain orders to his company commanders. Capt Mohammad Anwar Hossain, Officer Commanding "A" Company and Major Akbar Hossain, Officer

Commanding ‘B’ Company were told to attack Chhatak. Company Commander ‘D’ Company Lt Nurunnabi Khan was told to advance via Telab towards East of Chhatak. Company Commander 'C' Company Major Mohsin Uddin Ahmed was told to attack Bangla Bazar and advance towards Tengra Tila.

Sylhet: According to the plan, in the second week of October, 'A' Company, B Company and Battalion HQ marched off for Chhatak. The battalion HQ was left behind at a place called Vijai Nagar and 'A' and 'B' company continued marching on till they were very close to the wall of Chhatak Cement Factory. B Company took up defence on the slope of a hillock the Eastern side of the factory.

With the help of 106 MM and 75 MM Recoilless Rifle they blew off S to 6 bunkers of the Pak defence. The troops inside the bunkers started running out of them. To them brust of LMG was fired. In it many Pak Army personnel were killed. In this clash one water transport full of ammunition was sunk in the river. On the other side of the river the means of communication was good and the Pak Army got reinforcement from Sylhet. They also brought artillery and started shelling on our side. After 6 days of fierce fighting both the companies were brought back to Baliura.

Tengra Tila: Company Commander C Coy Major Mohsin Uddin Ahmed attacked Tengra Tila and captured it . After this, he wanted to attack Doara Bazar and with this end in view he told his company to cross a river. The local collaborators on the other side of the river gave the information about our location to the Pak Army. Therefore, when our troops were still in the river trying to cross it the Pak Army surprised us by firing on us from all sides, Due to this surprising attack on us in the middle of the river the shock, havoc and confusion was so great that all our troops had to be pulled out of the river, and we all returned to Bangla Bazar.

On the direction given by Gen MAG Osmani, C-in C of Bangladesh Army, 'A' and 'C' company was asked to attack Kala Bazar and Tengra Tila respectively and advance towards Doara Bazar, A company commander Capt Mohammad Anwar4 Hossain, his 2IC 2 Lt Manzoor Ahmed and 'D' company commander Lt Nurunnabi his 2IC Sub Ali Newaz were asked to march toward Sylhet via Goain Ghat . These two companies were overall being commanded by Major Shafaat Jamil. On the 3rd week of October in one dark night Major Shafaat Jamil after crossing a long distance on foot reached with his two companies at Goain Ghat. He distributed his people to different places like: the Police station, Circle Office, Agriculture Office, etc. As there was a river by the side of Goain Ghat it took some time for us to cross it. And in that short time local collaborators gave information about our location to the Pak Army. As a result, there was a clash with the Pak Army which continued for three days. The Pak Army in the clash lost many lives. On our side there were 4 to 5 casualties and 7 to 8 wounded.

In the second week of November again an order was issued to capture Radha Nagar Tea Estate and then Goain Ghat. Major Shafaat jamil sent Cap, Mohammad Anwar Hossain Company Commander A Company to Nayapara. 'D' Company and battalion HQ put a defence at Luni and Pratappur . On 7 Dec Major Shafaat Jamil launched an attack on Choto Khel and Doari Khel. Choto Khel fell to us and the Pak Army had to give many

lives in this attack. We captured huge amount of arms and ammunition, ration , maps etc. From our side L/Naik Mosharaf Hossain was martyred in this battle and Major Shafaat Janmil got wounded. He was later on evacuated to the hospital at Shillong. In the absence Of Major Shafaat Jamil Capt Mohammad Anwar Hossain took over the command and captured Chota Khel. Doari Khel and Radha Nagar.

On 8 Dec Goain Ghat fell to us and there too we captured many leftover things by Pak Army. On the direction of Bharat Govt. Capt Mohammad Anwar Hossain Handed over Goain Ghat to the BSF of India and started marching toward Salita Bari with his two companies in order to capture Shalutikar airport of Sylhet. In Salita Bari there were already two companies of freedom fighters and one battalion of Indian Infantry which was commanded by a colonel. According to the direction of the Indian colonel these two companies attacked the airport on 10 Dec. In this attack 15 to 20 Pak army personnel died and two were captured. Three LMGs and few rifles were also captured in this attack. There were no casualties from our side.

On 12 Dec A and D company with another company of Indian BSF attacked Companygonj and captured Chhatak it. `B' and `C' companies after occupying tengra Tila and Doara Bazar captured Chhatak. On 13 Dec A and D company joined rest of the two companies i. e., C and B companies at Chhatak.

On 15 Dec Major Shafaat Jamil with four companies and his battalion HQ attacked Gobindagonj. Many Pak soldiers died in this attack and the remaining fled away to Sylhet.

Again on 16 Dec at Lamagazi another battle took place between this battalion and the Pak Army. In that clash we capture 6 mortars, 2 machine guns, and a huge amount of ammunition.

On 17 Dec. we kept on driving the Pak Army towards Shalutikar airport where they surrendered to the Allied Force.

সাক্ষরঃ মাহবুবুর রহমান
ক্যাপ্টেন
৩য় ইস্ট বেঙ্গল

সাক্ষাৎকারঃ ক্যাপ্টেন আব্দুল কাইয়ুম চৌধুরী
৩০-১১-১৯৭৩

সেক্টর কমান্ডার খালেদ মোশাররফের নির্দেশে কোনাবনে প্রথম প্রতিষ্ঠ করি বাংলাদেশ গোলন্দাজ বাহিনী। ৫৯ মাউন্টেন রেজিমেন্টের একটি ব্যাটারী দিয়ে এর যাত্রা। এই ব্যাটারীর সাথে প্রায় দেড় মাস থাকার পর আমি প্রয়োজনের তাগিদে পাকিস্তান থেকে আগত ক্যাপ্টেন পাশার কাছে আমার দায়িত্ব হস্তান্তর করে প্রথম বেঙ্গল রেজিমেন্টের কোম্পানী কমান্ডার হিসানে যোগদান করি।

প্রথম বেঙ্গল রেজিমেন্টে তখনি কমান্ডিং অফিসার ছিলেন তদানীন্তন মেজর (বর্তমানে কর্নেল) মাঈনুল হোসেন চৌধুরী। এই রেজিমেন্টটি তদানীন্তন পাকিস্তান সামরিক বাহিনীতে সিনিয়র টাইগার হিসাবে পরিচিত ছিল। সিনিয়র টাইগার তখন কামালপুর অপারেশনে ব্যস্ত ছিল। এই ব্যস্ততার মধ্যে আমি আমার দায়িত্ব ভার গ্রহন করি। যেহেতু প্রথম বঙ্গেল রেজিমেন্টের এলাকাভিত্তিক দায়িত্ব ছিল ময়মনসিংহ থেকে রংপুর পর্যন্ত সেহেতু আমাকে রংপুরের কোদালকাটি নামক স্থানে শত্রুর উপর হামলা চালাবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, আমার সাথে সাথে মেজর জিয়াউদ্দীন ব্যাটালিয়ানের নতুন কমান্ডিং অফিসার হিসাবে দায়িত্ব গ্রহন করেন। তার নির্দেশ আমি কোদাল মাটিতে সাময়িকভাবে ডিফেন্স স্থাপন করি। পরদিন পুরা এলাকা দেখার পর রাত্রি প্রায় ২ টার সময় শত্রুঘাঁটি পুরোপুরি ঘেরাও করে ফেলি। শত্রুরা চারদিক অবরুদ্ধ হবার পুর আমাদের উপর আক্রমণ চালায়। এ সময় এক প্লাটুনের উপর সাংঘাতিকভাবে আক্রমণ চলে এবং তারা প্রায় আমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সাথে সাথে আমি শত্রুর উপর প্রতি-আক্রমণ চালাই। আক্রমণের ফাঁকে প্রায় হাতাহাতি চলতে থাকে। আক্রমণের ফলে উভয় পক্ষে যথেষ্ট হতাহতের পর শত্রুপিছু হটতে বাধ্য হয়। শত্রু উপায়ন্তর না দেখে নিরীহ গ্রামবাসীর উপর তাদের জিঘাংসা চরিতার্থ করে।

ধলাই অপারেশন(২৮শে অক্টোবর, ১৯৭১): ধালাই সিলেট জেলার একটি অংশ। বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধে ধালাই রণাঙ্গন প্রখ্যাত ছিল। এই অপারেশনটা চালাবার জন্য প্রথম রেজিমেন্টকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। যদিও এটি ছিল পাক-বাহিনীর দুর্ভেদ্য ঘাঁটি তথাপি প্রথম বেঙ্গল রেচিমেন্টের এ-কোম্পানী কমান্ডার ক্যাপ্টেন মাহবুব (শহীদ) তার কোম্পনী নিয়ে একবার শত্রুর উপর আঘাত হানেন। কিন্তু স্বপক্ষের বেশ কিছু আহত সৈনিক নিয়ে তাকে ফিরে আসতে হয়। এদের মধ্যে যারা মারাত্মকভাবে আহত হন তাদের মধ্যে প্রথম দুইজন হচ্ছেন সুবেদার ইব্রাহীম এবং অন্যজন হচ্ছেন রকেট লাঞ্চার-এর নাম্বার ওয়ান হাওয়ালদার সোবহান। এদের দু'জনকেই ঘটনাস্থল থেকে হেলিকপ্টারে মুক্তিবাহিনী বেইস হসপিটালে পাঠানো হয়। এরপর আমি সফলতার সঙ্গে খেজুরীচর টারগেটকে দখল করার পর তদানীন্তর ব্যাটালিয়ন কমান্ডার ধালাই দখল করার ভার আমার উপর ন্যস্ত করেন। যদিও আমি জানতাম এই রণাঙ্গন থেকে ফিরে আসার সম্ভাবনা খুবই কম ছিল তথাপি দৃঢ়তার সঙ্গে আমাকে দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে একদিন ক্যাপ্টেন (বর্তমানে মেজর) হাফিজউদ্দিন ঠাট্রা করে বলেছিলেনঃ তোমার নতুন যে প্যান্টটা তৈরী করেছ তা অন্ততঃ একবার পরে যাও। নতুবা মরে গেলেও হয়ত দুঃখ থেকে যাবে।

১৯৭১ সালের ২৭শে অক্টোবর রণাঙ্গনের দামামা বেজে ওঠে। যেহেতু পুরা ব্যাটালিয়ন এতে অংশগ্রহণ করেছিল সেহেতু পরিকল্পনা অনুযায়ী 'এ'এবং 'ডি' কোম্পানী ২৭শে অক্টোবর রণাঙ্গনের দিকে যাত্রা করে। তাদের দায়িত্ব ছিল পেছন থেকে যাতে শত্রুযোগাযোগ করতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখা এবং শত্রুযাতে সৈন্য এবং রসদ-সরঞ্জামাদি পরিবহন করতে না পারে তা নিশ্চিত করা। ধালাই এলাকায় বেশ এক অংশ জুড়ে পাকিস্তানী সৈন্য মোতায়েন করা হয়েছিল। এমনকি প্রত্যেকটা বাংকার কংক্রিটে নির্মাণ করা হয়েছিল। বাংকারগুলো এমন ধরনের ছিল যে এর ভেতর থেকে বের হবার প্রয়োজন খুব একটা হতো না। কারণ রসদ সরঞ্জামাদি প্রচুর পরিমাণে মওজুত থাকত। রণকৌশলের দিক থেকে সন্মুখ সমরে ঝাঁপিয়ে পড়াছিল আমার পরিকল্পনা। সেদিক থেকে বিচার করে ২৭শে অক্টোবর সকাল ৪টার সময় আমি কোম্পানী নিয়ে অগ্রসর হই। বলাবাহুল্য, ক্যাপ্টেন নুর প্রথমবারের মত সেদিন আমার সাথে যোগ দেন। তিনি আমার এক নম্বর প্লাটুন নিয়ে বাম দিক থেকে অগ্রসর হতে থাকেন এবং আমি দুই নম্বর ও তিন নম্বর প্লাটুন নিয়ে ডান দিক দিয়ে অগ্রসর হতে থাকি। টারগেট থেকে যখন আমি প্রায় ৫০ গজ দুরে ছিলাম তখন কিছু গোলগুলির আওয়াজ শুনি। অয়ারলেসে জানতে পারলাম যে ক্যাপ্টেন নুর প্রায় শত্রুঘাঁটির ভিতরে ঢুকে গেছে। এই সময় আমি সুযোগ বুঝে শত্রুর উপর আক্রমণ চালাই। এখন শুধু বুলেটের আওয়াজ ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না। শত্রুপ্রত্যক্ষভাবে আমার সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। অবশেয়ে শুত্রুর অধিকাংশ আমার উপর নিয়োজিত হয়। সুতরাং এ সময়ে ক্যাপ্টেন বেশ হতাহত হয়। তিনি একটু পিছে এসে ডিফেন্স নেনে এবং আহতদেরকে পেছনে

পাঠাবার বন্দোবস্ত করেন। আমিও আর অগ্রসর হতে পারছিলাম না। তাই ডান দিকের বেশ একটা অংশ দখল করে শত্রুর নাকের ডগার উপরে বসে যাই। আমার সাথের বেশ কিছুসংখ্যক সৈন্য হতাহত হয়েছিল, তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী শৌর্যবীর্যের পরিচয় দিয়েছিলেন বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ হামিদুর রহমান। এই যুদ্ধে আরও দু'জন জোয়ান তাদের দৃঢ়তা ও বিচক্ষণতার পরিচয় দেন-তাদের একজন হলের হাওলাদর মকবুল হোসেন ও অপরজন সিপাই আব্দুর রহমান, যিনি দুলে পুলিশবাহিনী থেকে আমাদের সাথে যোগ দেন। তুমুল যুদ্ধের পর ব্রিগেড কমান্ডার জিয়াউর রহমান সাহেব আমাকে যেখানে ছিলাম সেখানে থাকতে নির্দেশ দেন।

পাত্রখোলা চা-বাগানের যুদ্ধঃ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, 'এ' 'বি' এবং 'ডি' কোম্পানী যারা পাত্রখোলা চা বাগানের মধ্যে তাদের আধিপত্য করেছিলেন তাদের উপর বেশ কয়েকটা আক্রমণ চলে। কিন্তু আক্রমণের ফলে যথেষ্ট হতাহতের পর শত্রুপিছু হটতে বাধ্য হয়। যেহেতু এই স্থানটা দখল করা ছিল একন্ত প্রয়োজন সেহেতু বড় ধরনের একটা পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল। ২৯শে অক্টোবর সকাল ৫টার সময় ভারতীয় সেনাবাহিনীর দ্বিতীয় জাঠ ব্যাটালিয়ন আমাদের সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে, কিন্তু সেখানেও আমরা বেশ একটা সুবিধা করতে পারিনি। পর্যায়ক্রমে এক ব্রিগেড ভারতীয় সৈন্য এক ডিভিশন আর্টিলারী নিয়ে আমাদের সাথে অংশ গ্রহণ করে। এভাবে একটানা পাঁচদিন যুদ্ধের পর শত্রুপক্ষ আত্বসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। উল্লেখযোগ্য যে, যুদ্ধে ভারতীয় ব্রিগেড কমান্ডার এবং দ্বিতীয় জাঠ ব্যাটালিয়নের কমান্ডিং অফিসার আহত হন। এই যুদ্ধে শত্রুপক্ষ যথেষ্ট দৃঢ়তার পরিচয় দেয়।

ধালাই যুদ্ধের ফলাফলঃ পাকিস্তান সেনাবাহিনী অনবরত পাঁচদিন যুদ্ধের পর আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। তাদের মধ্যে অবশ্য প্রায় এক ব্যাটালিয়ন সৈন্য নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। বাকী সৈন্যদের মধ্যে অনেকে ধরা পড়ে এবং অনেকে পালিয়ে যায়। পরাজয়ের একমাত্র কারণ ছিল শত্রুর লাইন অব কমিউনিকেশন চতুর্দিক থেকে কেটে দেওয়া হয়। তাই সম্মুখসমরে তারা সুবিধা করতে পারেনি। এ যুদ্ধে হতাহতের সংখ্যা পুরোপুরি নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। তবুও আনুমানিক বলা চরে আমাদের নিহতের চেয়ে আহতই বেশী হয়েছে। অন্যদিকে, শত্রুর নিহতের সংখ্যা ছিল অনেক বেশী। ধালাই যুদ্ধে পরাজয়ের পর সিলেটে শুক্র বাহিনীর ছোটাছুটি অনেক পরিলক্ষিত হয়। কারণ যে ক'টি বিখ্যাত ঘাঁটি ছিল তার মধ্যে ধালাই ছিল অন্যতম। এখান থেকেই প্রায় ৫০ মাইল এলাকাকে নিয়ন্ত্রণে রাখা হতো।

সিলেটে যুদ্ধ পরিকল্পনাঃ ১৯৭১ সালের ২০শে নভেম্বর প্রথম বেঙ্গল রেজিমেন্ট সিলেটে সমস্ত শত্রুর দুর্ভেদ্য ঘাঁটি দখল করার জন্যে সিলেটের ভিতর দিয়ে 'এডভান্স টু কন্ট্যাকট' চালাবার জন্য পরিকল্পনা করা হয়। ২০শে নভেম্বর ঈদের নামাজের পর ভারতের সীমানা অতিক্রম করে বালা গ্রামের কিছু পিছন অবস্থান করি। সমস্ত এলাকা দেখার পরে রাত প্রায় আটটার সময় পুরা ব্যাটালিয়ন নিয়ে আমরা কয়েকটি টারগেটের দিকে অগ্রসর হই। উল্লেখযোগ্য যে, বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে বেশ কয়েকটি টারগেট এখানে ছিল। এদের মধ্যে যেগুলোতে সৈন্যসংখ্যা বেশী ছিল সেগুলোর মধ্যে আটগ্রাম, চারগ্রাম ও বালা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া বিক্ষিপ্ত ছোট ছোট কতকগুলো শত্রু ছাউনি থাকতে সন্মুখে অগ্রসর হওয়া বেশ দুস্কর ছিল। কিছুদুর অগ্রসর হওয়ার পরেই চারদিক থেকে ছোট ছোট অস্ত্রের গোলাগুলি আসতে থাকে, ফলে আমাদেরকে কিছুক্ষণের জন্য অবস্থান নিতে হত। পুরা ট্রুপসকে পিছনে রেখে কোম্পানী কমান্ডারকে তার দল নিয়ে রেকি করতে হত, তারপর আবার পথ চলতে হতো। এভাবে রাত প্রায় ২টার সময় আমি 'সি' কোম্পানীকে নিয়ে বালায় অবস্থিত টারগেট থেকে প্রায় ১০০ গজ দুরে ডিফেন্স নিই। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ৪৫ গুর্খা বাহিনী ও আমাদের সাথে অংশগ্রহণ করেছিল। ৪৫গুর্খা বাহিনীর সাথে ছিল আমাদের 'ডি' কোম্পানী। তাদের দায়িত্ব ছিল আটগ্রামের শত্রু ঘাঁটি দখল করা। সব কোম্পানী নিজের নিজের দায়িত্ব পালন করার জন্য সুবিধামত টারগেটের নিকটবর্তী কোন জায়গায় হাইড-আউট করেছিল। শত্রু বাঙ্কারগুলো ইতস্তত বিক্ষিত থাকাতে আমাদের নড়াচড়া একটু সাবধানেই করতে হতো। আমাদের এইচ-আওয়ার ছিল সকাল ৬টা। সুতরাং এইচ-আওয়ারের পাঁচ মিনিট আগে গোলন্দাজ বাহিনীকে ডাকা হয়-যাকে বলা হয় প্রি-আওয়ার গোলাবর্ষণ। ৫

মিনিট নর্মাল ফায়ার এর পর গোলন্দাজ চুপ হয়ে যায়। তার সাথে বালা, চারগ্রাম ও আটগ্রামের উপর বঙ্গশার্দুল ও গুর্খারা ঝাঁপিয়ে পড়ে। অর্ধ ঘন্টার ও বেশী সময় তুমুল গোলগুলির পর তিনটি শত্রু ঘাঁটিই আমাদের করায়ত্ত হয়। এদের মধ্যে শত্রুর সরচেয়ে বেশী ক্ষয়ক্ষতি হয় আটগ্রামে। এটা শত্রুর ব্যাটালিয়ন হেডকোয়ার্টার এবং দুর্ভেদ্য ঘাঁটি ছিল। এখানে বেশকিছু এ্যামুনিশন ডাম্প ও ছিল। অবশ্য শত্রু সহজেই আত্মসমর্পণ কেরেনি। যথেষ্ট হতাহতের পর কিছু আত্মসমর্পণ করে এবং কিছু এদিক ওদিক পালিয়ে যায়। আটগ্রামের শত্রুর হতাহতের সংখ্যা ছিল প্রায় ১০০জন, এদের মধ্যে ৪জন অফিসার ছিলেন। যথেষ্ট গোলবারুদ আমাদের হস্তগত হয়। এখানে শত্রু বেশকিছু গোলাবারুদ ফেলে যায় এবং হতাহতের সংখ্যা ছিল শত্রু পক্ষে ১০-১৫জন এবং অস্ত্রসংবরণ করে ৭জন। চারগ্রামে অবশ্য শত্রু যথেষ্ট ছিল। কিন্তু আমাদের আক্রমণের আশংকা বুঝতে পেরে তারা পশ্চাদপসরণ করে এবং কোনরকম বাধা ছাড়াই আমরা চারগ্রাম দখর করি। এখানে অবশ্য হতাহতের সংখ্যা তেমন উল্লেখযোগ্য নয়।

বালা দখল করার পর আমরা করিমগঞ্জের দিকে রওনা হই। করিমগঞ্জ ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাহায্যে অষ্টম বেঙ্গল রেজিমেন্ট দখল করতে সমর্থ হয়। অষ্টম বেঙ্গল রেজিমেন্টের কমান্ডার ছিলেন মেজর (বর্তমানে লেঃ কর্নেল) এ. জে. এম আমিনুল হক।

এরপর করিমগঞ্জ থেকে আমরা বৈয়ামপুর রওনা হই এবং বৈয়ামপুর আমাদের দখল নেয়ার পরিকল্পনা কির। কিন্তু বৈয়ামপুর যাবার পথে পাকসেনা আমাদের উপর এ্যামবুশ করে। ফলে আমাদের দু'জন যোদ্ধা শহীদ হন, দু'জন নিখোঁজ হন এবং ৬জন গুরুতরভাবে আহত হন। ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট লিয়াকত গুরুতররুপে আহত হন। তিনি আহত হবার পর আমি সি কোম্পানী ক্যাপ্টেন নূরকে হস্তান্তর করে 'এ' কোম্পানী দায়িত্ব গ্রহণ করি। বৈয়ামপুর ছিল করিমগঞ্জ থেকে প্রায় ৩৫/৪০ মাইল দুরে। এ যুদ্ধে ক্যাপ্টেন মাহবুব আর্টিলারী শেলিং করেন। পাকসেনারাও আর্টিলারী শেলিং করা থেকে বিরত ছিল না। আর্টিলারী শেলিং বিনিময়ের এক পর্যায়ে ক্যাপ্টেন মাহবুব হঠাৎ চিৎকার করে ওঠেন। শেলিং এর টুকরা তার শরীরে আঘাত করে। অতঃপর ক্যাপ্টেন মাহবুবকে সরিয়ে নেয়া হয়। কিছুক্ষণ পর তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন এবং শহীদ হন। তাঁর সিগনালারও শহীদ হন এবং রানার আহত হন। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে এই তিনজন মুক্তিসেনার নাম অবিস্মরণীয় থাকবে যুগ যুগ ধরে, এই আশাই আমি রাখি। পরদিন সকালে ৩১তম রেজিমেন্ট আমাদেরকে আক্রমণ করে। কিন্তু এ আক্রমণে তারা ব্যর্থ হয় এবং তিনজন অফিসার ও তিনজন সুবেদার নিহত হয়। ১২ জন পাঞ্জাবী আমাদের হাতে বন্দী হয়।

এর পরদিন সকালে আমরা বৈয়ামপুর থেকে শহীদপুরের দিকে যাত্রা করি এবং এখানেও যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করি। আমাদের নয়জন হতাহত হন। তারপর আমরা কচুয়া পর্যন্ত অগ্রসর হই এবং ডিফেন্স নিই। ই-পি-আর বাহিনী ইতিপুর্বেই কানাইঘাট দখল করেছিল। আমরা সেখানে গিয়ে উপস্থিত হই।

রণকৌশলের দিক থেকে বিচার করলে কোন দূরদর্শী সেনাবাহিনীই তার শত্রুকে পেছনে ফেলে রাখতে চায় না, কারণ পিছনের আক্রমণকে প্রতিহত করা অনেক সময় বেশ কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। সে জন্যে আমরা শত্রু ঘাঁটির মধ্য দিয়ে এডভান্স টু কন্টাকট শুরু করি। কানাইঘাট থেকে বিকেল ৫টার সময় আমরা সিলেট এম. সি. কলেজ অভিমুখে যাত্রা করি। কারণ আমরা জানতাম এম. সি. কলেজকে পাকিস্তানী বাহিনী বিরাট একটা দুর্গে পরিণত করেছিল। সেই দুর্গকে অররোধ করে দখল করাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল। পরদিন বিকেল ৫টার সময় আমরা কেওয়াচরা চা বাগানে ডিফেন্স স্থাপন করি। রাত্রিবেলা পেট্রোল পার্টি পাঠানো হয়েছিল শত্রুর গতিবিধির খোঁজখবর নেয়ার জন্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমার পেট্রোল পার্টি শত্রুর এ্যামবুশে পড়ে এবং একজন নিখোঁজ হয়। শত্রুর অবস্থান সম্পর্কে খোঁজখবর পাওয়ার পর সকালবেলা আমি আমার কোম্পানীকে নিয়ে সনুম্খে অগ্রসর হচ্ছিলাম। কিন্তু শত্রুদ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়ে কতক্ষণ ডিফেন্স থাকি। এই দুই ঘন্টার মধ্যেই অন্যান্য

কোম্পানীও আমার বামদিকে গিয়ে অবস্থান নেয়। আমার কোম্পানীকে ফর্ম-আপ করে শত্রুর উপরে চার্জ করি। ফলে আমার একজন শহীদ এবং কয়েকজন আহত হন। শত্রু পিছু হটতে বাধ্য হয়। তাদের পক্ষেও যথেষ্ট হতাহত হয়। সেদিন সেখানেই অবস্থান করার পর সন্ধ্যার সময় আমরা এম, সি, কলেজ অভিমুখে যাত্রা করি। পরদিন সকাল চারটার সময় এম, সি, কলেজের টিলার উপরে এসে আমরা শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য করছিলাম। শত্রু কিন্তু আমাদের উপস্থিতি সম্বন্ধে একটুও সজাগ ছিল না। সুতরাং ডিফেন্সের ভিতর দিয়ে এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করছিল। আমরা এক ফাঁক দিয়ে পজিশন নেয়ার বন্দোবস্ত করছিলাম কিন্তু যথেষ্ট পাঞ্জাবী সেনা একসঙ্গে দেখাতে নিজেকে আর দাবিয়ে রাখতে পারছিলাম না। তাই পজিশন না নিয়েই ছয়টা মেশিনগান দ্বারা তিন দিক থেকে ফায়ার শুরু করলাম। শত্রুর মাথায় যেন বজ্র ভেঙ্গে পড়ল। তারা পাগলের মত এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করছিল। এর ভিতরেই বেশকিছু পাঞ্জাবী সৈন্য নিহত হয়। কিছু সৈন্য হাত তুলে স্যালেন্ডার করে। আর্টিলারী রেজিমেন্ট তাদের অস্ত্র নিয়ে তাড়াহুড়া করে স্মল আর্মস রেঞ্জের বাইরে চলে যায়। শত্রুপক্ষে বেশকিছু হতাহতের পর তারা আমাদের অবস্থান থেকে আরও একটু উঁচু টিলা দখল করে। তাদের সমস্ত শক্তি তারা টিলার উপর নিয়োগ করে। এরপর আমাদের 'ডি' এবং 'বি' কোম্পানীর উপরে কয়েকটা মেশিনগান দিয়ে ফায়ার শুরু করে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আর্টিলারী ফায়ারও চলতে থাকে। পরে 'বি' এবং 'ডি' কোম্পানীর যথেষ্ট ক্ষতি সাধিত হয়। তাদের একজন প্লাটুন কমান্ডার সুবেদার ফয়েজসহ বেশকিছু লোক নিহত হয়। যারা আহত হয়েছিল তাদেরকে আমরা পিছনে নিয়ে যাই। এভাবে আরও কতক্ষণ যুদ্ধ চলার পর 'বি' এবং 'ডি' কোম্পানী একটু আড়ালে গিয়ে অবস্থান করে। তারপর আমার উপর 'ডি' এবং 'বি' কোম্পানীর দায়িত্ব অর্পিত হয়। আমি শত্রুকে আর এক পা-ও সম্মুখে এগুতে দিইনি। কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর আমার দুইজন লোক আহত হয়।

১৫ই ডিসেম্বর থেকে ১৭ই ডিসেম্বর এগারটা পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে পাকবাহিনীর যুদ্ধ চলতে থাকে এবং আর্টিলার সমর্থনে আমরা কিছুদূর এগুতে সমর্থ হই। তারপরেই আসে আত্মসমর্পণের পালা। পাকবাহিনী তাদের সমস্ত হাতিয়ার আমাদের নিকট সমর্পণ করে।

পরিশেষে বলতে হয়, পৃথিবীর ইতিহাসে এমনি যুদ্ধ পরিচালনা করা বাঙ্গালী ছাড়া আর কারও পক্ষে সম্ভব হয়নি। যেখানে ছিল না বল, জন, অস্ত্রশস্ত্র সেখানে গড়ে ওঠে এক দুর্ধর্ষ সেনাবাহিনী। এদের নেতৃত্বে পুরো জাতিই মুক্তিবাহিনীর রুপ ধারণ করে। বাঙ্গালী যে যেখানেই ছিল কিছু সংখ্যক লোক ছাড়া বাকী সবাই প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে এই মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। সবশেষে আমি স্মরণ করি তাদেরকে, যারা মাতৃভূমির জন্যে নিজের শেষ রক্তটুকু বিলিয়ে দিয়েছেন। আমি স্মরণ করি তাদেরকে, যারা এই মুক্তিযুদ্ধের চরম দুঃসময়ে আমার সাথে ছিলেন এবং আমাকে প্রেরণা যুগিয়েছেন।

স্বাক্ষরঃ ক্যাপ্টেন এম, এ, কাইয়ুম চৌধুরী
৩০-১১-১৯৭৩

সাক্ষাৎকারঃ মেজর বজলুল গনি পাটোয়ারী*
....১৯৭৩

পাকিস্তানের ঝিলাম থেকে ১৯৭১-এর ২৫-২৬শে জুলাই শিয়ালকোট দিয়ে ভারতের পূর্ব পাঞ্জাব হয়ে কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে আমি পালিয়ে আসি। ভারতে পৌঁছানোর পর ভারতীয় সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে আমাকে ও আমার সঙ্গী আমার সঙ্গীদের নয়াদিল্লী নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে ১০ দিন জিজ্ঞাসাবাদ করার পর ৭ই আগস্ট মুজিব নগরে পৌঁছাই। ৮ তারিখে পোস্টিং হয়ে মেঘলয় সেক্টর ১১-এর প্রথম বেঙ্গলের সহ-অধিনায়ক ও কোম্পানী কমান্ডার হিসাবে কাজে যোগ দিই। আমি ঐ বাহিনীর 'ডি' কোম্পানীর কমান্ডার ছিলাম-যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত।

* ১৯৭১ সালে ক্যাপ্টেন হিসাবে কর্মরত ছিলেন।

আমার প্রথম অপারেশন হয় সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে কামালপুর (ময়মনসিংহ) বি-ও-পি'তে। ঐ যুদ্ধে পাক বাহিনীর আনুমানিক ৩০ জন নিহত ও ৩৩ জন আহত হয়। এ সংবাদ স্থানীয় জনগণ কর্তৃক পাওয়া যায়। আমাদের পক্ষের ২ জন শহীদ ও তিনজন আহত হন। ঐ যুদ্ধে পাক বাহিনী থেকে একখানি রাইফেল ও প্রচুর এ্যামুনিশন উদ্ধার করা হয় এবং একজন শত্রুর লাশও উদ্ধার করা হয়। সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিকে ব্যাটালিয়নকে মুভ করান হয় ৪ নং সেক্টরে (সিলেটের দিকে)। অক্টোবর মাসে ব্যাটালিয়ন বিভিন্ন স্থানে রেইড ও এ্যামবুশ করে, যেমন-চাবাগান, শ্রীমঙ্গল রেল স্টেশন, পাথরখোলা, রাজঘাট, খেজুরীচরা ইত্যাদি স্থানে। পাথরখোলাতে যুদ্ধ করার পর কিছু যুদ্ধবন্দীকে নিয়ে আসা হয় ও কিছু অস্ত্র উদ্ধার করা হয়।

নভেম্বর মাসের ২য় সপ্তাহে সিলেটের জাকিগঞ্জ ও আটগ্রাম রাস্তার দিকে আমার বাহিনী অগ্রসর হতে থাকে। নভেম্বর মাসের ৩য় সপ্তাহে সিলেটের কানাইঘাটের কাছে গৌরীপুরে এসে আমরা অপেক্ষা করি। কানাইঘাট ছিল পাক বাহিনীর ডিফেন্স। সেখানে যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে ১২৫ জন পাকসেনা নিহত ও ৬ জন বন্দী হয়। ৪টি মেশিনগান, ১৫টি এল-এম-জি ও ৩৬/৩৭টি রাইফেল উদ্ধার করা হয়। ঐ যুদ্ধে পাকবাহিনীর মেজর সারওয়ারও (৩১ পাঞ্জাব ব্যাটালিয়ন) নিহত হয়।

আমার বাহিনী ডিসেম্বর মাসের ৯/১০ তারিখে সিলেট এম, সি, কলেজে উপস্থিত হয়। ঐ এলাকায় ৫ দিন যুদ্ধ হয়। আমাদের ১২/১৩ জন নিহত ও ৩৬ জন সৈন্য আহত হন এবং পাকবাহিনীর ২০০-এর মত নিহত হয়। ১৭ই ডিসেম্বর সিলেট জেলায় পাক বাহিনী যৌথ বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে।

সাক্ষাৎকারঃ মেজর মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন*

১০ই জুন 'জেড' ফোর্সে যোগদানের জন্য ৩য় বেঙ্গল রেজিমেন্টের এডভান্স পার্টি হিসাবে ৪ জন জে-সি-ও ও ১১৯ জন জোয়ান নিয়ে হিলি থেকে তেলঢালার উদ্দেশ্যে রওনা হই। ১৪ই জুন তেলঢালায় পৌঁছে। তেলঢালায় ১ম বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ৩য় বেঙ্গল ও ৮ম বেঙ্গলের অফিসার ও জোয়ানদেরকে একত্রিত করে যুদ্ধের জন্য পুনর্গঠন করা হয়। ছাত্র-যুবকদেরকেও সৈনিক হিসাবে ভর্তি করে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ২৮শে জুলাই পর্যন্ত পূর্ণোদ্যমে প্রশিক্ষণ চলে। ৩য় বেঙ্গল রেজিমেন্টের অধিনায়ক ছিলেন তৎকালীন মেজর (বর্তমান কর্নেল) শাফায়াত জামিল সাহেব। আরও ছিলাম 'জেড' ফোর্সের 'এ' কোম্পানী কমান্ডার আমি ক্যাপ্টেন আনোয়ার হোসেন, 'বি' কোম্পানী মেজর আকবর, 'সি' কোম্পানী কমান্ডার মেজর মহসীন, 'ডি' কোম্পানী কমান্ডার লেঃ নূরুননবী।

'জেড' ফোর্সের প্রথম অপারেশন হিসাবে ৩য় বেঙ্গল রেজিমেন্টকে ময়মনসিংহ জেলার বাহাদুরাবাদ ঘাট, দেওয়ানগঞ্জ বাজার ও দেওয়ানগঞ্জ চিনির কলের পাক-বাহিনীর ঘাঁটির উপর আক্রমণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

২৯শে জুলাই সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় অধিনায়ক শাফায়াত জামিল এবং আমরা 'এ' ও 'ডি' কোম্পানী বাহাদুরাবাদ ঘাটের উদ্দেশে রওনা হই। সারা রাত ৩০ মাইল পায়ে হেটে বাহাদুরাবাদ ঘাটের অনতিদূরে ব্রহ্মপুত্র নদের অপর পাড়ে চরে পৌঁছি। সারাদিন জোয়ানগণ বিশ্রাম নেয়। বিকালে অধিনায়ক ও আমরা ২ কোম্পানী কমান্ডার এলাকা রেকি করি।

৩১শে জুলাই সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় ২ কোম্পানী বাহাদুরাবাদ ঘাটের উদ্দেশে রওনা হয়। রাত্রি সাড়ে এগারটায় ব্রহ্মপুত্র নদ পার হয়ে বাহাদুরাবাদ ঘাটে পৌঁছি। রাত্রি ১২টার সময় আমরা ২ কোম্পানী অতর্কিতভাবে পাক ডিফেন্সের উপর আক্রমণ করি। পাকবাহিনীর সহিত ১ ঘন্টা গুলি বিনিময় হয়। পরে পাকবাহিনীদের গোলাবারুদ বোঝাই একটি বার্জ ডুবে যায় এবং পাকবাহিনীর ১০০ সৈন্যের মত হতাহত হয়। সেখানে আমরা

* ১৯৭১ সালে ক্যাপ্টেন হিসাবে কর্মরত ছিলেন।

৩"" মর্টার, রকেট লাঞ্চার ও মেশিনগান ব্যবহার করি। রাত্রি ভোর হওয়ার আগেই পুনরায় ব্রক্ষ্মপুত্র নদ পার হয়ে ২ মাইল ভিতরে অপর এক চরে আমরা সকলে আত্মগোপন করি।

১লা আগস্ট পাকবাহিনীর একটি হেলিকপ্টার সারাদিন আমাদের খুঁজে বেড়ায় কিন্তু আমরা খুব সতর্ক থাকায় আমাদের সন্ধান পায়নি। তারপর আমরা দেওয়ানগঞ্জ অপারেশনের জন্য প্রস্তুত হই।

২রা আগস্ট সন্ধ্যার সময় ৬টা নৌকাযোগে দেওয়ানগঞ্জে বাজার ও চিনি কলের দিকে রওনা হই। পথে বাহাদুরবাদ ঘাট ও দেওয়ানগঞ্জের মাঝখানে একটি রেলওয়ে ব্রীজ লেঃ নুরুন্নবী উড়িয়ে দেন, যাতে পাকবাহিনী বাহাদুরবাদ সহজে আসতে না পারে। গভীর রাতে দেওয়ানগঞ্জের অনতিদুরে গিয়ে আমরা ‘এ’ কোম্পানী নিয়ে দেওয়ানগঞ্জের সুগার মিলে পাক ডিফেন্সের দিকে অগ্রসর হই। লেঃ নুরুন্নবী দেওয়ানগঞ্জ বাজারের দিকে চলে যান। রাত্রি পৌনে চারটায় একই সময়ে নিজ নিজ টারগেটের উপর আক্রমণ চালাই। ৪৫ মিনিট এই হামলা চলে। আমাদের আক্রমণে দেওয়ানগঞ্জ সুগার মিল ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং বহু পাকসেনা হতাহত হয়। দেওয়ানগঞ্জ বাজারে রাজাকার প্রশিক্ষন ক্যাম্প ও রেলওয়ে স্টেশনের বহু ক্ষতি সাধিত হয়। সেই সময় সেখান থেকে নৌকাযোগে আমরা অপর চরে আত্মগোপন করি। আমাদের এই দুটি আক্রমণে ঐ এলাকার স্থানীয় জনগণ ও স্থানীয় এফ-এফ কমান্ডার আমাদের সর্বপ্রকার সাহায্য করেন।

২রা আগস্ট আমরা তেলঢালার উদ্দেশ্যে রওনা হই। ৫ই আগস্ট আমরা তেলঢালায় এসে পৌঁছি।

৮ই আগস্ট আমার ‘এ’ কোম্পানী নিয়ে রৌমারী থানাকে আমাদের দখলে রাখার উদ্দেশ্যে কীর্তিমারী চরে ডিফেন্স নিই, পরে কোদালকাটির চর, পীরের চর ও চর সাজাইতে আমার বিভিন্ন প্লাটুনকে ডিফেন্সে লাগাই। উক্ত চরে ১৫ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ডিফেন্সে থাকি। এই পাঁচ সপ্তাহে পাকবাহিনী কয়েকবার নদীপথে হামলা চালায়, কিন্তু প্রতিবারই আমাদের হাতে আক্রান্ত হয়ে পিছনে হটে যায়। এখানে পাক বাহিনীর অনেক সৈন্য আহত হয়। আমাদের পক্ষে পনের জন জোয়ান আহত হয়। এই পাঁচ সপ্তাহে আমরা চীলমারী থানার কয়েকটি গেরিলা অপারেশন করি।

১৬ই সেপ্টেম্বর প্রথম বেঙ্গল রেজিমেন্টের লেঃ কাইয়ুম তার কোম্পানী নিয়ে আমাদের নিকট থেকে দায়িত্ব ভার গ্রহন করেন। আমি আমার কোম্পানী নিয়ে তেলঢালায় ফিরে আসি। ৪ঠা অক্টোবর পর্যন্ত তেলঢালার আশেপাশে কয়েকটি ছোট ছোট অপারেশন করি।

৬ই অক্টোবর ‘জেড’ ফোর্স তেলঢালা ছেড়ে দিয়ে তৎকালীন ৪ ও ৫ সেক্টরের দিকে সেক্টর কমান্ডার লেঃ কর্ণেল মীর শওকত আলী ছাতক আক্রমণের জন্য আমাদের কোম্পানী কমান্ডারদের নিয়ে আলোচনায় বসেন। ১০ তারিখ সকালে উক্ত এলাকা রেকি করা হয়। ১১ তারিখ রাত্রে ছাতকের সন্নিকটে মহড়াটিলা নামক জায়গা দখল করে ফেলি। আমার বাম পার্শ্বে মেজর আকবর তার কোম্পানী নিয়ে জয়নগর টিলাতে ডিফেন্স নেন। ১২ তারিখ সকালে পাক বাহিনী আমাদের গতিবিধি দেখতে পায় এবং সেখানে পাক বাহিনীর সাথে আমাদের সংঘর্ষ হয়। আমরা সেখানে সর্বাধুনিক হাতিয়ার ব্যবহার করি। এই যুদ্ধে পাকবাহিনীর ২ জন অফিসার নিহত হয় ও একজন কর্নেল আহত হয়। তাছাড়া বহু পাকসেনা হতাহত হয়। ঐ দিন রাত্রিতে আমরা সেখানেই থেকে যাই।

১৩ তারিখ রাত্রি ৯ ঘটিকার সময় সুরমা নদীর পাড়ে নড়াই গ্রাম ও সিমেন্ট কারখানার উপর আক্রমণ করি। আমাদের আক্রমণে পাকবাহিনী পিছু হটে যায়। আমরা নড়াই গ্রাম ও সিমেন্ট কারখানা দখল করে ফেলি এবং রাত্রেই সেখানে ডিফেন্স করি।

১৪ তারিখ সকালে পাক বাহিনীর একটি লঞ্চ ছাতক আসার পথে রকেট লাঞ্চারের সাহায্যে সেটিকে ডুবিয়ে দিই। সেখানে ৯ জন খান সেনা নিহত হয় এবং রাজাকার ইসাহাকসহ ৯ জন আমাদের হাতে ধরা পড়ে। এখানে ১৪ টি রাইফেল উদ্ধার করি। সারা দিন তাদের সাথে আমাদের যুদ্ধ চলে। আমাদের ৩ জন আহত হয়।

১৫ তারিখ আমরা ছাতক ঘিরে ফেলি। সেই দিন পাকবাহিনীর একটি গানবোট নদী পার হওয়ার চেষ্টা করলে রকেট লাঞ্চারের সাহায্যে ডুবিয়ে দিই। সেখানে ত জন খান সেনা নিহত হয়।

১৬ই অক্টোবর দুপুরের দিকে আমাদের ডিফেন্স পাক বাহিনী ভীষণ শেলিং করে এবং সন্ধ্যার দিকে 'বি' কোম্পানীর পজিশনে হামলা করে ও তাদের জয়নগর টিলা দখল করে নেয়। এই দিন বিকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত আমার জন্য সবচেয়ে বেশি বিভ্রান্তিজনক সময় ছিল। কারন অয়্যারলেস সেট নষ্ট ছিল। সন্ধ্যায় প্রথমে শুনতে পাই 'পাক ফৌজ জিন্দাবাদ' ও পরে শুনতে পাই 'মুক্তি ফৌজ জিন্দাবাদ'। এ নিয়ে সন্দেহে পড়ে যাই। তখন সঠিক সংবাদের জন্য ২ জনকে পাঠাই কিন্তু তারা আর ফিরে আসেনি। শেষে রাত্রি সাড়ে ন'টার সময় মেজর আকবর আমার সিমেন্ট কারখানায় এসে সঠিক খবর দেন। জয়নগর টিলা পাকবাহিনী দখল করে নেবার পর বাধ্য হয়ে রাত্রি ১০ টায় আমার কোম্পানী ও 'বি' কোম্পানী নিয়ে সমস্ত রাত্রি বিলের মাঝ দিয়ে পানিতে হেঁটে টিলাগাও আসি। সেই সময় পাক বাহিনীর উপর হামলার প্রস্ত্তুতি নেই। কিন্তু সেই সময় সেখানে পাকবাহিনী ছিলনা। পরে বলুয়া হয়ে বাঁশতলা ক্যাম্পে পৌছি। এই ৫ দিনের যুদ্ধে আমাদের ব্যাটালিয়নের হাতে পাক বাহিনীর প্রায় ৪০০ মত হতাহত হয়। আমাদের ৭ জন শহীদ ও বেশকিছুসংখ্যক আহত হয়।

ছাতক অপারেশনের পর ৩ নং ব্যাটালিয়ন নিয়ে সিলেটের বিমান বন্দর আক্রমণ করার জন্য তামাবিল সীমান্তে ডিফেন্স নেই। সেখানে বেশ কয়েকটি অপারেশনের পর আমার কোম্পানী গোয়াইনঘাট থানা মুক্ত করে। ডিসেম্বর মাসের ৯ তারিখে আমার কোম্পানী নিয়ে সালুকটির বিমান বন্দরের অনতিদূরে পৌঁছে যাই। তখন আমাদের সাথে ভারতীয় আসাম রেজিমেন্টের একটি কোম্পানী ছিল। সালুকটির নদী এলাকা পর্যন্ত মুক্ত হওয়ার পর ১০ই ডিসেম্বর আমাকে ও আসাম রেজিমেন্টের উক্ত কোম্পানীকে মীর শওকত ছাতক ডেকে পাঠান আমাদের ব্যাটালিয়নরে 'বি' ও 'সি' কোম্পানীকে সাহায্য করার জন্য। ১১ তারিখে সুনামগঞ্জ-ছাতক রোড জংশনে আমাদের উক্ত দুই কোম্পানীর সাথে একত্রিত হই এবং সম্মিলিতভাবে পাকবাহিনীর উপর তীব্র আক্রমণ চালাই। পাকবাহিনী আমাদের হাতে মার খেয়ে সিলেট অভিমুখে রওনা হয়। ১৬ই ডিসেম্বর আমরা মালাগাছ ফেরির পশ্চিম পাড়ে ডিফেন্স লাগাই। সেদিন পাকবাহিনী ঢাকায় আত্মসমর্পন করে। আমরা আমাদের ব্যাটালিয়নসহ সিলেটে পাক্কা ডিফেন্স করি।

স্বাক্ষরঃ মোঃ আনোয়ার হোসেন
মেজর
কুমিল্লা সেনানিবাস

সাক্ষাৎকারঃ ক্যাপ্টেন হাফিজউদ্দিন আহমদ
২৮-৯-১৯৭৩

মে মাসের প্রথম সপ্তাহে কর্নেল (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল, জাতীয় সংসদ সদস্য. বিমান ও নৌবাহিনীর মন্ত্রী) এম. এ. জি. ওসমানী বেনাপোল পরিদর্শন করতে আসেন। তিনি বেনাপোল পৌঁছে আমার সঙ্গে আলোচনা করেন এবং আমার ব্যাটালিয়ন পুনর্গঠিত করার কথা বলেন এবং ৬০০ জন তরুণ মুক্তিযোদ্ধাকে বাছাই করে নিতে বলেন। তাঁর নির্দেশমত আমি বাংলাদেশের বিভিন্ন যুব শিবির থেকে প্রায় ৬০০ জন তরুন মুক্তিযোদ্ধা ও ই-পি-আর বাছাই করে আমার ব্যাটালিয়নে নিয়ে নিই। উক্ত ই-পি-আর এবং তরুণদের বাছাই করার পর কর্ণেল ওসমানী আমাকে মেঘালয় প্রদেশের তেলঢালা নামক জায়গায় যেতে বলেন। আমি পুরা ব্যাটালিয়ান নিয়ে তেলঢালা চলে যাই। তেলঢালায় ১ম, ৩য় এবং ৮ম বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈন্যদের একত্রিত করা হয় এবং একটা ব্রিগেড গঠন করা হয়। ব্রিগেডের নাম ছিল 'জেড ফোর্স'। উক্ত ব্রিগেড ফোর্সের কমান্ডার হন মেজর জিয়াউর রহমান। এখানে ব্যাটালিয়নের নতুন রিক্রুট করা সৈন্যদেরও ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করা হয়।

১৩ই জুলাই মেজর(বর্তমানে লেঃ কঃ) মঈনুল হোসেন চৌধুরী আমার ব্যাটালিয়নের কমান্ডিং অফিসার নিযুক্ত হন এবং আমার নিকট থেকে ব্যাটালিয়নের দায়িত্ব গ্রহন করেন। তাছাড়া আরও কয়েকজন অফিসারকে ব্যাটালিয়ন অফিসার নিযুক্ত করেন- তারা হলেন যথাক্রমে ক্যাপ্টেন মাহবুবুর রহমান, লেফটেন্যান্ট (বর্তমানে ক্যাপ্টেন) আব্দুল মান্নান, লেফটেন্যান্ট (বর্তমানে ক্যাপ্টেন) আব্দুল কাইয়ুম চৌধুরী ও ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দিন এবং আমাদের ব্যাটালিয়ন এ যোগদান করেন।

কামালপুর যুদ্ধঃ মোটামুটি ট্রেনিং এর পর প্রথম অপারেশনের পরিকল্পনা করা হয়। ময়মনসিংহ জেলার কামালপুরে তখন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর শক্ত ঘাঁটি ছিল। এই ঘাঁটিকে আঘাত করার পরিকল্পনা আমরা প্রথম নিই। কামালপুর এলাকার চতুর্দিক দিয়ে আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে আমরা প্রথম ‘রেকি’ করি।

২৮শে জুলাই গভীর রাতে ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দিন মোমতাজ, লেফটেন্যান্ট মান্নান, নায়েক সুবেদার আবদুলহাইসহ আরও দু’জন সৈন্য ‘রেকী’ করতে করতে কামালপুর শত্রুঘাঁটির ভিতর ঢুকে একটা বাঙ্কার এর মধ্যে উঁকি মারে। এমন সময় পাকিস্তানী দু’জন সৈন্য অন্যদিক থেকে বাঙ্কারের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দিন তাদের দেখে ফেলেন এবং তৎক্ষনাৎ তাদেরকে ‘‘হ্যান্ডস আপ’’ করতে বলেন। দু’জনের একজন ‘‘হ্যান্ডস আপ’’ করে। অপরজন না করাতে ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দিন লাফ দিয়ে উক্ত পাকিস্তানী সৈন্যর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং দু’জনের মধ্যে ধস্তাধস্তি হয়। কিছুক্ষন ধস্তাধস্তির পর যখন তারা বুঝতে পারে যে, তারা মুক্তিযোদ্ধার দ্বারা ঘেরাও তখন তারা পালানোর চেষ্টা করলে সুবেদার হাই তাদের উদ্দেশ করে গুলি ছোড়েন এবং হত্যা করে রাইফেল দুটি নিয়ে নেন। পরে ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দিনসহ সবাই ঘাঁটিতে ফিরে আসেন। এ ঘটনায় আমাদের সৈন্যদের মনোবল অত্যন্ত বেড়ে যায়। নায়েক সুবেদার আবদুল হাইকে এজন্য বাংলাদেশ সরকার ‘‘বীর প্রতীক’’ উপাধীতে ভূষিত করেন।

৩১শে জুলাই ভোর সাড়ে তিনটার সময় দুই কোম্পানী সৈন্য (‘বি’ কোম্পানী, যার কমান্ডার ছিলাম আমি নিজে এবং ‘ড’ কোম্পানীল যার কমান্ডার ছিলেন ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দিন মোমতাজ) নিয়ে কামালপুর বর্ডার আউট পোস্ট আক্রমণ করি। আমরা একটা ফিল্ড ব্যাটারীর সাহায্য নিই। ক্যাপ্টেন মাহবুবের নেতৃত্বে ‘এ’ কোম্পানীকে পাঠানো হয় উঠানীপাড়াতে (কামাল পুর থেকে ২ মাইল দক্ষিণে)। ‘এ’ কোম্পানীকে পাঠানোর উদ্দেশ্য ছিল তারা ‘কাট অফ’ পার্টিতে যেন যোগ দিতে পারে। এফ-ইউ-পি’ তে যোগ দিতে পারে। এফ -ইউপি তে পৌঁছার পরই আর্টিলারী ব্যবহার করার কথা ছিল। কিন্তু এফ-ইউ-পি তে পৌঁছার পুর্বেই আমাদের পক্ষ থেকে আর্টিলারী গোলাগুলি শুরু হওয়ায় আমাদের সৈন্যরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। এ সময় শত্রু পক্ষও আর্টিলারী ও ভারী মর্টারের সাহায্যে গোলাগুলি শুরু করে। তা সত্ত্বেও আমি এবং সালাহউদ্দিন আমাদের কোম্পানীদ্বয়কে একত্রিত করে শত্রুদের আক্রমন করি এবং সম্মুখ দিকে অগ্রসর হই। দু’দিকেই আর্টিলারী ব্যবহার হওয়া সত্ত্বেও আমরা ‘জয় বাংলা’ ধ্বনি দিতে দিতে শত্রুর দিকে অগ্রসর হই। আমরা কাঁটাতার এবং মাইনফিল্ড অতিক্রম করে অগ্রসর হই এবং গোলাগুলি চলাকালীন সময়ের মধ্যেই শত্রুপক্ষের অর্ধেক জায়গা দখল করে নেই। ফলে শত্রুরা পিছনের দিকে হটে যায় এবং তাদের পূর্ব স্থানে আর্টিলারী ও মর্টারের গোলাবর্ষন করতে থাকে। এ সময় ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দিন যিনি অত্যন্ত দক্ষতা ও সাহসিকতার সাথে ‘ডি’ কোম্পানীকে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন, শত্রুর গুলিতে শহীদ হন। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি তাঁর সৈনিকদের উৎসাহ ও সাহস দিতে থাকেন এবং বার বার শত্রুপক্ষকে নির্মূল করার আকুল আহবান জানান। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে তাঁর মত দৃঢ় মনোবলসম্পন্ন সৎসাহসী বীর ও আত্মত্যাগী যোদ্ধার নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে। যে কোন দেশের যে কোন জাতির গর্ববোধ করতে পারে তাঁর মত বীর যোদ্ধার বীরত্বের জন্য। একটু পরেই আমি নিজেও শত্রুর মর্টারের গুলির আঘাতে আহত হই এবং আমাকে পেছনে নিয়ে যাওয়া হয়। আমার শরীরের পাঁচ জায়গায় মর্টারের গুলির টুকরো বিদ্ধ হয়। উভয় কোম্পানীতে কোন অফিসার ও অফিসার কমান্ডিং না থাকায় এবং ইতিমধ্যে যথেষ্ট সৈন্য হতাহত হওয়ায় আমাদের সৈন্যদের মনোবল

সাময়িকভাবে ভেঙ্গে পড়ে। ফলে তারা পিছিয়ে আসে। এই আক্রমণ এবং যুদ্ধে আমাদের পক্ষে একজন অফিসারসহ ৩১ জন যোদ্ধা শহীদ হন এবং দুইজন জুনিয়র কমিশন অফিসারসহ ৬৫ জন আহত হন। নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা যায় যে, শত্রুপক্ষের প্রায় ৫০ জন নিহত ও ৬০ জন আহত হয়। এই আক্রমণ যদিও পুরোপুরি সফলকাম হয়নি তবুও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে এটা একটা স্মরণীয় আক্রমণ ছিল। এই যুদ্ধে এটা প্রমাণ হয় যে, বাঙ্গালী সৈন্যরা সম্মুখসমরে যথেষ্ট দক্ষতার অধিকারী এবং সাহসী। এ যুদ্ধে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সৈন্যদের দ্বারা কাঁটাতারের ঘেরা এবং মাইন বসানোকে উপেক্ষা করে আমাদের যোদ্ধারা যেভাবে অসীম সাহসিকতার সাথে সম্মুখযুদ্ধে অবতীর্ণ হন তা থেকেই প্রমাণিত হয় যে, স্বল্পকালীন সাময়িক ট্রেনিং নেওয়া যুবকরাও অসীম বীরত্বের অধিকারী। এ যুদ্ধে অসীম সাহস ও বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করায় নিম্নলিখিত কয়েকজনকে বাংলাদেশ সরকার বীরত্বের পুরস্কার দেনঃ (১) শহীদ ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দিন মমতাজ (বীর উত্তম), (২) ক্যাপ্টেন হাফিজ উদ্দিন আহমদ (বীর বিক্রম), (৩) লেফটেন্যান্ট আব্দুল মান্নান (বীর বিক্রম), (৪) সিপাই আবদুল আজিজ (বীর বিক্রম), (৫) সিপাই গোলাম মোস্তফা কামাল (বীর বিক্রম), (৬) নায়েক সুবেদার আঃ হাই(বীর প্রতিক), (৭) নায়েক শফিকুর রহমান (বীর প্রতীক), (৮) শহীদ ল্যান্সনায়েক সিরাজুল ইসলাম (বীর প্রতীক), (৯) ল্যান্স নায়েক রবিউল্লাহ (বীর প্রতীক), (১০) ল্যান্স নায়েক তাজুল ইসলাম (বীর প্রতীক), (১১) সিপাই তারিকুল ইসলাম (বীর প্রতিক), (১২) সিপাই শফিউদ্দিন (বীর প্রতীক), (১৩) সিপাই সাইদুর রহমান (বীর প্রতীক)।

কিছুদিন পরই মেজর (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত লেঃ কঃ) মোঃ জিয়াউদ্দিন এবং ক্যাপ্টেন (বর্তমানে মেজর) বজলুল গনি পাটওয়ারী পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এসে আমাদের ব্যাটালিয়নে যোগদান করেন। মেজর জিয়াউদ্দিনকে ব্যাটালিয়ন কমান্ডিং অফিসার নিযুক্ত করা হয়। ৮ই সেপ্টেম্বর ‘ডি’ কোম্পানী ক্যাপ্টেন পাটওয়ারীর নেতৃত্বে কামালপুরের ১ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত ঘাসিপুর গ্রামে প্রতিরক্ষা ব্যাবস্থা গড়ে তোলে।

১০ই সেপ্টেম্বর শত্রুপক্ষকে দুই কোম্পানী সৈন্য মর্টার নিয়ে ঘাষিপুর আক্রমণ করে। ‘ডি’ কোম্পানী অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে এ আক্রমণ প্রতিরোধ করে ও তাদের আক্রমণকে ব্যর্থ করে দেয়। শত্রুপক্ষের প্রায় ৪০ জন সৈন্য নিহত হয়। আমাদের পক্ষে তিনজন শহীদ এবং আটজন আহত হন। নায়েক সুবেদার মোজাম্মেল হক এবং ল্যান্স নায়েক ইউসুফ আলী পূর্বেও কয়েকটি যুদ্ধে বীরত্বের পরিচয় দেন। বাংলাদেশ সরকার তার বীরত্বের জন্য ‘‘বীর প্রতীক’’ উপাধি প্রদান করেন। এর দুইদিন পর আরও দুইজন অফিসার আমাদের ব্যাটালিয়নে যোগদান করেন, তারা হলেন ফ্লাইং অফিসার আলী খান এবং ডাঃ (বর্তমানে লেফটেন্যান্ট) মজিবর রহমান ফকির। লিয়াকত আলী খানকে ব্যাটালিয়নের এ্যাডজুটেন্ট নিযুক্ত করা হয়।

কোদালকাটির যুদ্ধঃ ১৬ই সেপ্টেম্বর ‘সি’ কোম্পানীর একটি প্লাটুন লেফটেন্যান্ট কাইয়ুম চৌধুরীর নেতৃত্বে রৌমারীর চর কোদালকাটিতে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নেয়। ২১শে সেপ্টেম্বর শত্রুর দুই কোম্পানী সৈন্য মর্টারের সাহায্যে চরকোদাল আক্রমণ করে। আমাদের সৈন্যরা অত্যন্ত দক্ষতা ও সাহসিকতার সহিত তাদের আক্রমনকে ব্যর্থ করে দিতে সক্ষম হয়। এ যুদ্ধে শত্রুপক্ষের প্রায় ৩৫ জন সৈন্য নিহত হয়। আমাদের পক্ষে ৫ জন নিহত হয়। ২৪শে সেপ্টেম্বর সকাল বেলা শত্রুপক্ষ পুনরায় ১ ব্যাটালিয়ান সৈন্য নিয়ে কোদালটি আক্রমণ করে। এবারে তুমুল যুদ্ধ হয় এবং আমাদের সৈন্যরা এবারেও তাদের আক্রমণকে ব্যর্থ করে দেয়। যুদ্ধে শত্রুপক্ষের প্রায় ৭০ জন নিহত হয়। আমাদের পক্ষে ১৫ জন আহত হয়। কোদালকাটির এ যুদ্ধে নায়েক সুবেদার আবুল হাশেম, হাওলাদার মকবুল হোসেন, ল্যান্স নায়েক আতাউর রহমান, ল্যান্স নায়েক আবদুল হক প্রমুখ সৈন্যগণ অপূর্ব বীরত্ব প্রদর্শন করেন। এ যুদ্ধে নিম্নলিখিত সৈন্যগণ সাহসিকতার পদকপ্রাপ্ত হনঃ (১) ল্যান্সনায়েক আবদুল হক (বীর বিক্রম) এবং (২) হাবিলদার মকবুল হোসেন (বীর প্রতীক)।

কোদালকাটির যুদ্ধে পাকিস্তানী ৭০ জন সৈন্য নিহত হওয়ায় এবং আমাদের নিকট পরাজিত হওয়ায় পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর সৈন্যদের মনোবল অত্যন্ত ভেঙ্গে পড়ে। ফলে কোদালকাটি ও রৌমারী এলাকা সর্বসময় মুক্ত থাকে এবং সেখানে বাংলাদেশের পতাকা উড়তে থাকে।

সিলেটের চা বাগানসমূহ ও অন্যান এলাকায় যুদ্ধঃ অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে আমাদের ব্যাটালিয়নকে সিলেট সীমান্তে যাওয়ার জন্য আদেশ করা হয়। আমরা উক্ত আদেশ পাবার পর কোদালকাটি এবং রৌমারী ত্যাগ করে সিলেট সীমান্তের বিভিন্ন এলাকায় চলে যাই। সিলেটে বিভিন্ন চা বাগানে পাকিস্তানী সৈন্যরা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে থাকত। পাকিস্তান সরকারের উপর অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টির জন্য আমাদেরকে সিলেটের চা ফ্যাক্টরীগুলো সাময়িকভাবে নষ্ট করার আদেশ করা হয়। অক্টোবরের তৃতীয় সপ্তাহে আমাদের 'এ' এবং'সি' কোম্পানী শত্রুর ঘাঁটির মাঝখান দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে ধালাই এবং খাজুরী চা ফ্যাক্টরীর উপর 'রেইড' করে এবং ফ্যাক্টরীগুলোকে সাময়িকভাবে অচল করে দেয়।

১৯শে অক্টোবর আমি 'বি' কোম্পানী নিয়ে চম্পারায় চা ফ্যাক্টরীর উপর 'রেইড' করি এবং সেটা নষ্ট করে দিই। এ রকম রেইডের সাফল্যে পাকিস্তানী সৈন্যদের মনোবল কিছুটা ভেঙ্গে পড়ে এবং বাঙ্গালী জনসাধারনের মনে অনেক আশা ও উদ্দীপনার সঞ্চার হয়। এ সমস্ত রেইডের সময় ডাঃ মজিবর রহমান অত্যন্ত সাহসের সাথে আমাদের আহত সৈন্যিদের চিকিৎসা করেন এবং আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকেন। এ সময় সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট আনিসুর রহমান ও সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট ওয়াকার হাসান নতুন কমিশনপ্রাপ্তির পর আমাদের ব্যাটালিয়নে যোগদান করেন।

২৮শে অক্টোবর সকালে আমি 'বি' কোম্পানীকে নিয়ে পাত্রখোলা চা ফ্যাক্টরীর পাকিস্তানী ঘাঁটিতে আর্টিলারীর সাহায্য নিয়ে আক্রমণ করি এবং ঘাঁটিটি দখর করতে সক্ষম হই। একই দিন লেফটেন্যান্ট কাইয়ুমের নেতৃত্বে 'সি' কোম্পানী ধালাই শত্রুঘাটির উপর রেইড করে এবং শত্রুপক্ষের বহু সৈন্যকে হতাহত করে। সিপাই হামিদুর রহমান এ রেইডে অভূতপুর্ব সাহসের পরিচয় দেন এবং নিজে গুরুতর ভাবে আহত হওয়া সত্ত্বেও তার এল এম জির সাহায্যে একাই প্রায় ২০ জন সৈন্যকে নিহত করে এ যুদ্ধে অসীম সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে নিজের জীবন বিসর্জন দিয়ে শহীদ হন। বাংলাদেশ সরকার তার এ অসীম সাহসিকতার পুরস্কারস্বরুপ সর্বোচ্চ পুরস্কার ''বীরশ্রেষ্ঠ'' খেতাব দিয়ে তা শহীদী আত্মার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। তাঁর নাম ইতহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে বলে আমরা আশা রাখি।

ধালাই থেকে শত্রুরা পাত্রখোলার দিকে অগ্রসর হতে থাকে। ক্যাপ্টেন মাহবুব মাত্র চারজন সৈন্য সাথে নিয়ে ধালাই এবং পাত্রখোলার বড় সড়কের মাঝামাঝি স্থানে এ্যামবুশ করেন। পাকিস্তানী সৈন্যরা তাঁর ফাঁদে পা দিলে তিনি শত্রুপক্ষের প্রায় ২০ জন সৈন্যকে নিহত করেন এবং দুইজনকে জীবিত অবস্থায় বন্দী করেন। ঐ দিনই ক্যাপ্টেন পাটওয়ারীর নেতৃত্বে 'ডি' কোম্পানী পাত্রখোলা ফ্যাক্টরীর দুই মাইল দক্ষিণে কাট-অফ পার্টি হিসাবে অবস্থান নেয়। শত্রুর দুই কোম্পানী পাত্রখোলার দিকে অগ্রসর হতে থাকলে 'ডি' কোম্পানী তাদেরকে প্রবলভাবে বাধা দেয়। শত্রু তখন 'ডি' কোম্পানীর অবস্থানের উপর আক্রমণ চালায় কিন্তু 'ডি' কোম্পানী তাদের আক্রমণকে ব্যর্থ করে দেয়। শত্রুপক্ষের একজন ক্যাপ্টেনসহ প্রায় ৩০ জন নিহত হয়। আমাদের পক্ষে ৬ জন সৈন্য শহীদ হন।

১লা নভেম্বরঃ এই দিন মিত্র বাহিনীর দুই ব্যাটালিয়নসহ আমাদের ব্যাটালিয়ন মিলে ধালাই বি. ও. পি. এবং ফ্যাক্টরী এলাকা যা শত্রুর সুদৃঢ় ঘাঁটি ছিল তার উপর প্রচন্ড আক্রমণ চালায়। দুইদিন ধরে অনবরত প্রচন্ড যুদ্ধের পর শত্রুদের ঘাঁটি দখল করে। এ যুদ্ধে পাকিস্তানী বাহিনীর ৩০তম ফ্রন্টিয়ার ফোর্স রেজিমেন্টের প্রায় দুই কোম্পানী সৈন্য (প্রায় ২০০ সৈন্য) নিহত ও আরও বহু আহত হয়।

নভেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে সিলেটের চারগ্রাম ও আটগ্রাম এলাকার শত্রুঘাঁটির উপরে কড়া রকমের একটি আক্রমণের পরিকল্পনা করি। এজন্য আমরা সব কমান্ডিং এবং কোম্পানী কমান্ডারগণ এ এলাকা

ভালভাবে রেকি করি। ২২শে নভেম্বর সকালে আমি ’বি’ কোম্পানী নিয়ে আর্টিলারীর সাহায্যে চারগ্রাম শত্রু ঘাঁটি আক্রমণ করি। সারাদিন প্রচন্ড যুদ্ধের পর আমরা উক্ত ঘাঁটি দখল করে নেই। শত্রুপক্ষের প্রায় ৩০ জন হতাহত হত এবং কয়েকজনকে আমরা জীবিত অবস্থায় বন্দী করি। এ ঘাঁটি থেকে আমরা প্রচুর পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র গোলাগুলি, খাদ্যদ্রব্য এবং অন্যান্য যুদ্ধের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম দখল করি। এ আক্রমণে সাফল্য লাভ করাতে আমাদের সৈন্যদের মনোবল অনেক গুনে বেড়ে যায়। এ যুদ্ধে ‘বি’ কোম্পানী অত্যন্ত সাহস এবং রণকৌশল প্রদর্শন করে। একই দিনে ‘সি’ কোম্পানী ক্যাপ্টেন নূরের নেতৃত্বে আটগ্রাম ব্রীজ আক্রমণ করে এবং দখল করে নেয়। এ স্থানেও আমরা প্রচুর পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র এবং গোলাগুলি দখল করতে সক্ষম হই। এভাবে আমরা চারগ্রাম এবং আটগ্রাম এলাকাকে সম্পুর্ণ রুপে শত্রুমুক্ত করি। এ যুদ্ধে বীরত্বের পরিচয়স্বরুপ নিম্নলিখিত সৈন্যগণকে সাহসিকতার পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। যথাক্রমে তাঁরা হলেনঃ (১) ক্যাপ্টেন নূর চৌধুরী (বীর বিক্রম), (২) নায়েক সুবেদার আবুল হাশেম (বীরবিক্রম), (৩) নায়েক সুবেদার মোঃ ইব্রাহিম (বীরবিক্রম)। পাকিস্তানী সৈন্যরা প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে সিলেটের দিকে পশ্চাৎপদসরন করে। আমরা মেজর জিয়াউদ্দিনের সুযোগ্য নেতৃত্বে পাকিস্তানী সৈন্যদের অনুসরন করি। শত্রুরা পলায়নের সময় বেশ কয়েকটি পুল উড়িয়ে দেয় এবং রাস্তাঘাটে বহু মাইন পুঁতে রাখে। মাইন পোঁতা রাস্তা পরিস্কার করতে করতে তাদের পশ্চাৎ যেতে থাকি এবং গৌরিপুর এলাকায় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নেই।

২৮শে নভেম্বরঃ এদিন ভোরে পাকিস্তানী ৩১ তম পাঞ্জাব রেজিমেন্ট আমাদের ‘এ’ কোম্পানীর পজিশনের উপর আক্রমণ করে। ‘এ’ কোম্পানী অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে তাদের আক্রমণ ব্যর্থ করে দেয়। এ যুদ্ধে শত্রুপক্ষের প্রায় ১০০ জন সৈন্য নিহত হয়। একজন মেজর (মেজর সরোয়ার) এবং একজন ক্যাপ্টেনও নিহত হয়। আমাদের পক্ষে ১০/১১ জন শহীদ হয় এবং প্রায় ২০ জন যোদ্ধা আহত হয়। সমস্ত যুদ্ধক্ষেত্র শত্রুপক্ষের মরা লাশে ভরে যায়। ‘এ’ কোম্পানী কমান্ডার ক্যাপ্টেন মাহবুব বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে এই যুদ্ধে শহীদ হন। তাঁকে মরণোত্তর ‘‘বীর উত্তম’’ খেতাব দিয়ে ভুষিত করা হয়। যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ক্যাপ্টেন মাহবুব শহীদ হবার পর তদস্থলে ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট লিয়াকত আলী যুদ্ধকালীন সময়েই ‘এ’ কোম্পানীর কমান্ডার নিযুক্ত হন। তিনি সাবেক পাকিস্তান এয়ার ফোর্সের পাইলট ছিলেন। তবে এ ধরনের পদাতিক যুদ্ধে তার কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিলনা। একটু পরে তিনি শত্রুর বুলেটে মারাত্মকভাবে আহত হন। কিন্তু তবু তিনি আহত অবস্থায়ই বীরত্বের সাথে যুদ্ধ পরিচালনা করেন এবং শত্রুর আক্রমনকে ব্যহত করে দেন। এ যুদ্ধে অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য তাঁকে বীর উত্তম এবং লেফটেন্যান্ট ওয়াকার হাসানকে বীর প্রতীক উপাধিতে ভুষিত করা হয়। এ যুদ্ধে আমরা ৩১-পাঞ্জাব রেজিমেন্টের ২৫ জন সৈন্যকে জীবিত অবস্থায় বন্দী করি। যুদ্ধবন্দীদের জবানবন্দীতে জানতে পারি যে, ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট যে এত বীরত্বের সাথে এবং সাহসের সাথে যুদ্ধ করতে পারে তা কখনও ভাবতে পারেনি।

এ যুদ্ধে পরাজিত হবার পর তাদের মনোবল ভেঙ্গে পড়ে এবং সিলেটের দিকে পলায়ন করে। এ সময় মিত্রবাহিনীও পাকিস্তানী সৈন্যদের উপর ঝাপিয়ে পড়ে। ৪/৫ গুর্খা রেজিমেন্টকে ছয়টি আর্টিলারী গানসহ সিলেট শহর থেকে প্রায় দূরে হেলিকপ্টারযোগে নামিয়ে দেওয়া হয়। আমাদের ব্রিগেড কমান্ডার মেজর জিয়াউর রহমান স্থির করেন যে সিলেট সহরে অন্যান্য সকল বাহিনীর পুর্বেই আমাদের বিজয়ীর বেশে প্রবেশ করতে হবে। তখন আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে, পাকবাহিনীর শত্রু ঘাঁটির গুলি ভেদ করে অনুপ্রবেশ করব। মিত্রবাহিনী আমাদেরকে হেলিকপ্টারযোগে খাদ্য, রসদ ও অন্যান্য যুদ্ধাস্ত্র সরবরাহের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার প্রতিশ্রুতিও দিলেন। আমরা জলাভূমি, খাল, বিল ইত্যাদি অতিক্রম করে অনুপ্রবেশ শুরু করি। এ সময় অত্যন্ত শীত ছিল। আমাদের যোদ্ধাদের নিকট কোন শীতবস্ত্র মোটেই ছিলনা। তবু আমাদের সৈন্যদের মনোবল ছিল অত্যন্ত দৃঢ়। কেননা, আমরা বুঝতে পেরেছিলাম যে আমাদের চূড়ান্ত বিজয় অতি নিকটে। পর পর তিন রাত খাল, বিল এবং জলাভুমির মধ্য দিয়ে চলাচল করে শত্রুঘাঁটি দরবশত ও খাদেমনগর অতিক্রম করে আমরা গভীর চা বাগানের মধ্যে প্রবেশ করি। এ সময় আমাদের সঙ্গে কোন খাদ্যদ্রব্য ছিল না

এবং একটানা হাঁটার ফলে আমাদের সৈন্যরা অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তবুও বিপুল উৎসাহ এবং আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আমরা চা বাগানের ভিতর প্রবেশ করি। 'চিকনাগুল' চা বাগানে আমরা মোজাহিদ কোম্পানীকে লেফট্যানেন্ট মুদাসসির-এর নেতৃত্বে রেখে হেলিকপ্টারযোগে খাদ্যদ্রব্য এবং রসদ সংগ্রহ করার জন্য। অয়ারলেসের মাধ্যমে মেসেজ দেওয়া সত্ত্বেও আমরা কোন সাহায্য পেলাম না। শত্রুপক্ষ কালগুল চা বাগানে আমাদেরকে বাধা প্রদান করে এবং আমাদের অল্প কয়েকজন যোদ্ধা হতাহত হন। তখন আমরা এ শত্রুঘাঁটি এড়িয়ে যাই এবং ১৪ই ডিসেম্বর ভোরে সিলেট শহরে ঢুকে এম,সি, কলেজ এলাকায় প্রবেশ করি। এম,সি, কলেজে শত্রুর অত্যন্ত শক্ত ঘাঁটি ছিল। আমরা শত্রুপক্ষ থেকে পাঁচশত গজ দূরে এম, সি, কলেজের উত্তর দিকে টিলাগুলোর উপর ডিফেন্স নিই। এই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সামনে ছিল 'বি' কোম্পানী এবং 'সি' কোম্পানী- যথাক্রমে আমার এবং ক্যাপ্টেন পাটওয়ারীর নেতৃত্বে। পিছনে 'বি' কোম্পানী এবং 'সি' কোম্পানী যথাক্রমে ক্যাপ্টেন নূর এবং লেফটেন্যান্ট কাইয়ুমের নেতৃত্বে ছিল। ব্যাটালিয়ন হেডকোয়ার্টারসহ মেজর জিয়াউর রহমান এ চার কোম্পানীল মাঝামাঝি একটি টিলার উপর অবস্থান করছিলেন। আমাদের সাথে মিত্রবাহিনী আর্টিলারীর একজন ব্যাটারী কমান্ডার ছিলেন। কিন্তু অয়ারলেস সেটের মাধ্যমে তিনি তাঁর গান পজিশনের সাথে যোগাযোগ রাখতে ব্যর্থ হন। এ সময় আমাদের ৩" মর্টারের মাত্র ১৪টি গোলা অবশিষ্ট ছিল। প্রায় তিনদিন আমাদের সৈন্যরা বলতে গেলে অনাহারে ছিল, তথাপি শত্রুর নাকের ডগায় ট্রেঞ্চ খুঁড়ে পজিশন নিতে থাকে। শত্রুপক্ষ আমাদের অতি নিকটে ছিল এবং নির্বিকারে কার্যকলাপ লক্ষ করছিল। তারা চিন্তাও করতে পারেনি যে আমরা মুক্তিবাহিনীর দল। কারন আমাদের পোশাক, স্টীল হেলমেট। অস্ত্রশস্ত্র তাদের মতই ছিল। তাছাড়া এ সময় যুদ্ধ চলছিল আমাদের পিছনে এবং বাঁ দিকে প্রায় পাঁচ মাইল দূরে খাদেমনগরে। আমরা শত্রুর পজিশনের ভেতর দিয়ে এত তাড়াতাড়ি সিলেট শহরে প্রবেশ করব তা ভাবতেও পারিনি। এটু পরে চিৎকার করে তারা আমাদের পরিচয় জানতে চাইলে আমরা তাদের চিৎকারের জবাব না দিয়ে চুপচাপ ট্রেঞ্চ খুঁড়তে থাকি। এ সময় 'ডি' কোম্পানীর পজিশনের সামনের রাস্তায় একটি আর্টিলারী গান ও দুটি জীপের কনভয় থামে। তখন 'ডি' কোম্পানীর কমান্ডার মর্টারের সাহায্যে উক্ত কনভয়ের উপর গোলাবর্ষণ করেন, যার ফলে একটি জীপে আগুন ধরে যায়। শত্রু তখন আমাদের উপর সন্দিহান হয়ে পড়ে এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে এদিক-সেদিক চলাফেরা করতে থাকে। এ সুযোগে আমরা মেশিনগান এবং হালকা মেশিনগান দিয়ে তাদের উপর গোলাবর্ষণ করতে থাকি। ফলে পাকবাহিনীর ২৫ জন সৈন্য রাস্তার উপরেই হতাহত হয়। শত্রুপক্ষ তখন মর্টারের সাহায্যে আমাদের উপর গোলাবর্ষণ শুরু করে মৃতদেহ সরিয়ে নিতে চেষ্টা করে। কিন্তু তখন আমাদের নিখুত গুলিবর্ষণের ফলে শত্রুপক্ষের আরও বেশকিছু সৈন্য হতাহত হয়। দুপুরের সময় শত্রুরা বাধ্য হয়ে তাদের সর্বশক্তি নিয়ে এবং মর্টারের প্রবল গোলাবর্ষণের সাহায্যে আমাদের কোম্পানীর ('বি' কোম্পানী') উপর প্রচন্ড আক্রমন চালায়। অল্প কিছুক্ষনের মধ্যেই আমাদের মর্টারের গোলা শেষ হয়ে যায়। তবু আমরা মেশিনগান, হালকা মেশিনগান, এবং রাইফেলের সাহায্যে দৃঢ়তার সাথে শত্রুর আক্রমন প্রতিহত করি। এ আক্রমণের ফলে পাকবাহিনীর প্রায় ৮০ জন সৈন্য নিহত হয় এবং তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। আমাদের 'বি' কোম্পান এবং 'ডি' কোম্পানীর মোট ২০ জন সৈন্য শহীদ হন এবং প্রায় ২০ জন গুরুতরভাবে আহত হন। আমার কোম্পানীর সবচেয়ে সুযোগ্য সুবেদার ফয়েজ আহমদ অসীম সাহস এবং রণকৌশল প্রদর্শন করে শহীদ হন। তাঁকে ''বীর উত্তম'' খেতাবে সম্মান প্রদর্শন করা হয়। এ যুদ্ধে সিপাই বাচ্চু মিয়া, নায়েক নুরুন্নবদী, সিপাই ফজর আলী, সিপাই মহিউদ্দিন ও নায়েক আফসার আলী অসাধারণ সাহসের পরিচয় দিয়ে শহীদ হন।

এ যুদ্ধে নিম্নলিখিত যোদ্ধাগণ অত্যন্ত সাহসিকতার পরিচয় দেন এবং বীরত্বের জন্য বাংলাদেশ সরকার তাঁদেরকে খেতাবে ভূষিত করেন। তাঁরা হলেনঃ ক্যাপ্টেন বজলুল গনি পাটোয়ারী (বীর প্রতিক), নায়েক সুবেদার হোসেন আলী তালুকদার (বীর প্রতিক), হাবিলদার নুরুল হক (বীর বিক্রম), শহীদ সুবেদার ফয়েজ আহম্মদ (বীর উত্তম), হাবিলদার সাইফুদ্দীন (বীর প্রতীক), হাবিলদার রুহুল আমীন (বীর প্রতীক), হাবিদলদার আবদুল গফুর (বীর প্রতীক) সুবেদার খাইরুল বাশার (বীর প্রতীক), নায়েক

সুবেদার আবদুল লফিত (বীর প্রতীক), ল্যান্স নায়েক আবুল বাশার (বীর প্রতীক) ও হাবিলদার আবদুল লতিফ (বীর প্রতীক)।

১৫ই ডিসেম্বরঃ সিলেট শহরের উপর পাকবাহিনীর এই চরম পরাজয়ে তাঁদের মনোবল একেবারেই ভেঙ্গে যায়। যার ফলে পরদিনই পাকিস্তানী কমান্ডারগণ আমাদের এবং মিত্র বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পন করে। আমরা বিজয়ীর বেশে সিলেট শহরে প্রবেশ করি এবং শহরের জনগণের মনে বিপুল আশা ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। হাজার হাজার জনতা আমাদেরকে স্বাগাত জানাতে থাকে।

১৬ই ডিসেম্বরঃ পাকবাহিনীর ব্রিগেডিয়ার রানা ব্রিগেড নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে আমাদের এবং মিত্র বাহিনীর যৌথ কমান্ডের কাছে আত্মসমর্পনের করে। এভাবে আমাদের নয় মাস যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে এবং স্বাধীনতা অর্জন করি। আমাদের সৈন্যরা বিভিন্ন অসুবিধার সম্মুখীন হয়েও অসীম সাহসিকতার ও ত্যাগের পরিচয় দেয়। আমাদের তরুণ অফিসারগণ অসীম সাহসিকতা প্রদর্শণ করেন এবং ত্যাগ ও বীরত্বের নিদর্শণ স্থানপ করেন। তার প্রমাণস্বরুপ বলা যেতে পারে যে, এ ব্যাটালিয়নের তিনজন অফিসার সম্মুখসরে শহীদ হন এবং আরও তিনজন অফিসার গুরুতররুপে আহত হন। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে খুব কম ব্যাটালিয়নই এ ধরনের নেতৃত্ব দিয়েছে এবং যুদ্ধ পরিচালনা করেছে। মুক্তিযুদ্ধের দীর্ঘ ৯ মাস যুদ্ধে এই ব্যাটালিয়ন অসাধারণ কৃতিত্ব ও নৈপুণ্য প্রদর্শণ করে বহু শত্রুসৈন্যকে হতাহত এবং জীবিত অবস্থায় বন্দী করে। বাঙ্গালী সৈন্যরা গতানুগতিক সম্মুখযুদ্ধেও যে যথেষ্ট দক্ষ, তা এই ব্যাটালিয়নদের সৈন্যরা স্বীয় শৌর্যবীর্য এবং ত্যাগের মাধ্যমে প্রমাণ করেন।

স্বাক্ষরঃ হাফিজউদ্দীন আহমদ,
ক্যাপ্টেন
২৮-০৯-১৯৭৩

সাক্ষাৎকারঃ মেজর আবদুল হালিম
২২-১১-১৯৭৩
‘জেড’ ফোর্সের সিগনাল তৎপরতা

সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে তৎকালীন কমান্ডার-ইন-চীফ, কর্ণেল এম,এ,জি ওসমানী সাহেবের আদেশ মোতাবেক ‘জেড’ ফোর্সে সিগনাল কোম্পানীর কমান্ডার হিসাবে যোগদান করি। যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে এটাই প্রথম সিগনাল কোম্পানী। ‘জেড’ ফোর্সের অধীনে ৩টি পুরা ব্যাটালিয়ন আছে। অধিনায়ক ছিলেন বর্তমান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান।

প্রথমে সিগনাল কোম্পানীকে গঠন করিতে খুব কষ্ট করিতে হইয়াছে, কেননা যন্ত্রপাতির ছিল খুব অভাব। তাছাড়া সিগনালের জোয়ানের সংখ্যা ছিল কম। যুদ্ধক্ষেত্রে এক রণক্ষেত্র হইতে অপর প্রান্তে সংবাদ পৌঁছাইতে ছিল গাড়ির অভাব। তবুও আপ্রাণ চেষ্টার পর সুষ্ঠুভাবে সিগনাল কোম্পানী গঠন করিতে সক্ষম হই। অক্টোবর মাস হইতে যুদ্ধক্ষেত্রের সংবাদ ব্যাটালিয়ন হেডকোয়ার্টর ও ব্রিগেড হেডকোয়ার্টারে পৌঁছাই। আমার সিগনাল কোম্পানীতে সিগনাল কোরের সৈনিক খুব কম থাকায় প্রাথমিক অবস্থায় কিছুটা অসুবিধা হলেও পরের দিকে সুষ্ঠুভাবে সংবাদ পরিবেশন করি।

অক্টোবর মাসের শেষের দিক হইতে সিগনাল কোম্পানী ‘জেড’ ফোর্স এর অষ্টম বেঙ্গল রেজিমেন্টের সহিত তাহাদের প্রত্যেকটি রণাঙ্গনে সংকেত পরিবেশের দায়িত্ব পালন করে। ইহার মধ্যে সিলেট জেলার বড়লেখা, ফুলতলা, আদমটিলা, বিয়ানীবাজার যুদ্ধ উল্লেখযোগ্য।

স্বাক্ষরঃ আবদুল হালিম
মেজর
২২-১১-৭৩

সাক্ষাৎকারঃ মেজর সৈয়দ মুনিবুর রহমান

প্রশ্নঃ অক্টোবরে ৮ম বেঙ্গল রেজিমেন্টে যোগদান করার পর আপনাকে কোথায় পাঠানো হলো?

উত্তরঃ সেখানে একটা ইকো কোম্পানী ছিল। সেটা তৈরী হয়েছিল বেশীর ভাগ ময়মনসিংহের ছাত্রদের নিয়ে। আমাকে তারা সেখানকার কোম্পানী কমান্ডার করে পাঠান। আমি কোম্পানী কমান্ডার হিসাবে প্রথমে তাদেরকে কিছু ট্রেনিং করাই কদমতলায়, তারপর আমরা কিছু অপারেশন করি। আমাদের প্রথম অপারেশন হয় নভেম্বরের ২/৩ তারিখ। লাঠিটিলা বিওপি'র মধ্যে আমরা একটা এ্যামবুশ করি। তারপর আমি লাঠিটিলায় বিওপি'র উপর একটি রেইড কন্ডাক্ট করি।

প্রশ্নঃ কিভাবে কন্ডাক্ট করেন একটু খুলে বলবেন?

উত্তরঃ আমরা খবর পাই এক সেকশন পাকিস্তানী ভোরবেলায় লাঠিটিলার ভিতর দিয়ে রাস্তাঘাট ক্লিয়ার করার জন্য 'মুভ' করে এবং ব্রীজে ছিল রাজাকার পাহারায়। আমরা কিছু বেশী লোক নিয়ে এ্যামবুশ করি। তারা মাইনের বিরুদ্ধে প্রটেকশন নেয়ার জন্য প্রথমে একটা ট্রাকটর চালিয়ে যায়। তারপর তারা প্রুফ পেট্রোল হিসাবে একটা সেকশন মুভ করায়। এরা সব পাকিস্তানী সোলজার ছিল। আমরা রাতে এ্যামবুশ লাগাই। ভোরে খবর আসে লোক চলে আসে। আমাদের কাছে মাইন ছিল কিন্তু আমরা মাইন লাগাতে পারিনি। ট্রাক্টরটা চলে যাবার পর আমরা ফায়ার করি। ফায়ার করে আমরা এ্যামবুশ করি। এ্যামবুশ করার সময় দৌড়াদৌড়ির মধ্যে আমাদের একটা ছেলে হারিয়ে যায় এবং আমরা উইথড্র করে চলে আসি। আমাদের প্লাটুনের বেশ কিছু মুক্তিযোদ্ধা ছিল। আমার সিগনালার যে ছিল সে হারিয়ে যায়।

প্রশ্নঃ এ্যামবুশের ফলাফল কি ছিল?

উত্তরঃ এ্যামবুশের ফলাফল ছিল ১০ জন আর্মির মধ্যে ৫ জন মারা যায় এবং ১ জন আহত হয়েছিল। আমরা পরে অন্যান্যের কাছে খবর পাই। নিজেরা কোন ডেডবডি রিকভার করিনি ঐ এ্যামবুশে।

প্রশ্নঃ এই এ্যামবুশে আপনাদের কোন ক্ষতি হয়নি?

উত্তরঃ না, আমাদের কোন ক্ষতি হয়নি শুধুমাত্র আমার সিগনালার হারিয়ে যাওয়া ছাড়া। অবশ্য তাকে স্বাধীন হবার পর ফিরে পাই।

প্রশ্নঃ পরবর্তীতে আপনার অপারেশন কি?

উত্তরঃ পরের অপারেশনে লাঠিটিলা বিওপি'র উপর আমি রেইড করি। রেইড করার সময় আমাকে এ্যাসিস্ট করেছিলেন মর্টার দিয়ে কর্নেল সাদেক। তখন তিনি ক্যাপ্টেন ছিলেন। তিনি আমাদের ইউনিটে কোম্পানী কমান্ডার ছিলেন।

প্রশ্নঃ এটা কোন মাসে হয়েছিল?

উত্তরঃ এটা নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে হয়েছিল।

প্রশ্নঃ পাকিস্তানীদের কি পরিমান শক্তি ছিল সেখানে?

উত্তরঃ পাকিস্তানীদের শক্তি বলতে প্রায় দেড় প্লাটুনের মত রাজাকার ছিল এবং এক প্লাটুনের মত পশ্চিম পাকিস্তানী মিলিশিয়া ছিল। আর্মিরা তখন বর্ডারে ছিলনা, অন্যদিকে ছড়িয়ে ছিল। আমরা রেইড করেছিলাম

---

* ১৯৭১-এর অক্টোবরে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে কমিশনপ্রাপ্ত। সাক্ষাৎকারটি প্রকল্প কর্তৃক ১২-১০-৮০ তারিখে গ্রহীত।

এজন্য যে, তাদের বুঝিয়েছিলাম আমাদের অপারেশন এখনও চলছে এবং আমরা অপারেশন করার মত সামর্থ্য রাখি। আমরা ফিজিক্যালী রেইড করিনি। আমরা ফায়ারের মাধ্যমে রেইড করেছিলাম। মর্টার ফায়ার দিয়ে 'রেইড' করার কথা ছিল। আমরা একটা হিলটপে ছিলাম। বিওপি'টা অন্য হিলটপে ছিল। মাঝখানে দু-তিনশ গজের পার্থক্য।

প্রশ্নঃ আপনারা কতজন ছিলেন?

উত্তরঃ এই রেইডে আমি এক কোম্পানী নিয়ে গিয়েছিলাম। আমাদের ব্যাটালিয়নে ৩" মর্টার ছিল। মর্টার দিয়েই ফায়ার করা হয়েছিল। এটাতে কোন ক্যাজুয়ালটি হয়নি। এটা একটা মোরাল বুস্টিং-এর মত অপারেশন ছিল। এরপর আমি ইউনিটে ফিরে আসি। এ সময় আমাদেরকে বলা হয়, 'তোমাদের বাংলাদেশের ভিতর জায়গা ক্লিয়ার করে ডিফেন্স নিতে হবে'।

২২শে নভেম্বর আমরা বাংলাদেশে প্রবেশ করি। সিলেট বড়লেখা বলে একটা জায়গা আছে, সেই জায়গাতে আমরা ডিফেন্স নেই। এই ডিফেন্স নেয়ার সময় আমাদের উপর ২/৩ বার আক্রমণ চালায় পাকিস্তান আর্মি। কিন্তু আমরা প্রতিবারই এই আক্রমণ সাফল্যের সাথে দমন করি। মুজিব ব্যাটারী-২ যেটাতে মেজর রাশেদ এবং মেজর সাজ্জাদ ছিলেন- সেই ব্যাটারী প্রথমবারের মত ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ফায়ারিং সাপোর্ট দেয় এবং ফায়ার সাপোর্টের প্রথম গোলাই টার্গেটের উপর পড়ে। ২৯শে নভেম্বর আমরা কৈলাশ শহরে কনসেনট্রেট করি বাংলাদেশের অভ্যন্তরে চূড়ান্তভাবে প্রবেশের জন্য। ২৯ তারিখ রাতে বাংলাদেশে ঢোকার জন্য মার্চ করে যাই পুরো ব্যাটালিয়ন। এই সময় ইন্ডিয়ান বিগ্রেডের একটা কাজের জন্য আমাদেরকে বলা হয়। ব্রিগেডের প্ল্যান ছিল শমসেরনগরের উপর আক্রমণের। আমাদেরকে বলা হয় শমসেরনগর থেকে শ্রীমঙ্গলে যে এক্সেসেস আছে সেটাকে গার্ড করতে হবে। ভানুগাছে কিছু এ্যানিমি ট্রুপস আছে সেখানে আমাদেরকে কাট-অফ করে একটা ডিফেন্স লাগাতে হবে। আমাদের কাছে তথ্য ছিল যে ভানুগাছে এক আর্মি প্লাটুন আছে। আমরা সেভাবে ডিফেন্স নেই। কিন্তু আমরা যখন ১লা ডিসেম্বর ভানুগাছে পৌঁছি তখন দেখি সেখানে এক প্লাটুনের বেশী আর্মি আছে এবং কিছু ১২০ মিঃ মিঃ মর্টারও ছিল সেখানে। তারপর ২/৩ তারিখ ডিসেম্বরে আমাদেরকে ওদের উপর আক্রমণ চালাতে বলা হয়। প্রথমে আমাদের দুই কোম্পানী আক্রমণ চালায়। দুই কোম্পানী আক্রমণ চালালে আমাদের বেশ কিছু-প্রায় ১৭ জন নিহত ও বেশ কিছু আহত হয়।

প্রশ্নঃ দুই কোম্পানী কে কে নিয়ে গিয়েছিলেন?

উত্তরঃ একটা মেজর মাহবুব ও আর একটা মেজর ওয়ালিউল ইসলাম। একটা ছিল ব্রেভো কোম্পানী আর একটা ছিল আলফা কোম্পানী। পরে চার্লি কোম্পানীকে পাঠানো হয় এবং আমরা ইন্ডিয়ান আর্টিলারীর সাপোর্ট নিয়ে সেই আক্রমণকে সাকসেসফুল করি এবং পরের দিন সকালবেলায় আমরা ভানুগাছ দখল করি।

প্রশ্নঃ সেটা কত তারিখে হবে?

উত্তরঃ সেটা ডিসেম্বর ৩/৪ তারিখে হবে। আমার মনে আছে ভানুগাছে থাকতেই যুদ্ধ ঘোষণা করা হয় এবং ইন্দিরা গান্ধীর বক্তৃতা ভানুগাছেই শুনেছিলাম। এটা করার পর আমাদেরকে বলা হয় মঙ্গলাবাজার হয়ে ফেঞ্চুগঞ্জ আসতে হবে। আমরা ভানুগাছ থেকে মঙ্গলাবাজার রওনা হই। মঙ্গলাবাজারে আমাদের বেশকিছু ক্যাজুয়ালটি হয়। মাইন ক্যাজুয়ালটি ছিল। একটা ট্রাক এবং একটা বাস এন্টিট্যাঙ্ক মাইনে উড়ে যায়, ফলে বেশকিছু ক্যাজুয়ালটি হয়।

প্রশ্নঃ এটা কবে হয়?

উত্তরঃ এটা ৭/৮ ডিসেম্বরে। ভানুগাছ থেকে একটা কাঁচা রাস্তা আছে ফেঞ্চুগঞ্জের দিকে। আমরা সেই রাস্তা দিয়ে আসার সময় আমাদের ক্যাজুয়ালটি হয়। ফেঞ্চুগঞ্জ হয়ে সিলেটের কাছে গোলাপগঞ্জ বলে একটা

জায়গা আছে সেখানে এসে একটা স্কারমিশের মত হয়। সেখানে কিছু 'থলস' স্কাউট ছিল। তাদেরকে আমাদের ব্যাটালিয়ন ঘেরাও করে ফেলে। এক সেকশন 'থলস' স্কাউটকে আমরা বন্দী করে ফেলি।

প্রশ্নঃ এটা কত তারিখ ছিল?

উত্তরঃ এটা ৯/১০ তারিখ ছিল। ইতিমধ্যে আমরা দেখছিলাম যে, সিলেট রেডিও স্টেশনের ওপর ভারতীয় ৫৫ গুর্খা রাইফেলস হেলিকপ্টারযোগে নামিয়ে দেয়- তাদের সঙ্গে পাকিস্তান আর্মির বেশ যুদ্ধ চলছিল। আমাদের মধ্যে বেশ কিছু স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা ছিল। তাদেরকে আমরা নদী ক্রস করে ওপারে পাঠিয়ে দিই খবর নেয়ার জন্য। ১৩/১৪ তারিখে আমরা খবর পাই আমাদের আর ওদিকে যাবার দরকার নেই। কেননা পাকিস্তান আর্মিরা পালিয়ে গেছে এবং সালুকটিকরের দিকে ''কনসেনট্রেটেড'' হয়েছে। ১৬ তারিখ আমরা সিলেট প্রবেশ করি। কিন্তু আনফরচুনেটলি আমাদের সিলেট শহরে যেতে দেয়া হয়নি। আমাদের স্টেশনে থাকতে বলা হয়েছে।

প্রশ্নঃ কেন যেতে দেয়া হয় নাই?

উত্তরঃ আমাদেরকে বলা হয়েছিল, আমরা যদি পাকিস্তান আর্মিদের সাথে ঝগড়া করি কিংবা তাদের মেরে ফেলি। তাছাড়া আরো হয়ত কারণ ছিল। আমরা স্টেশনে থাকাকালীন সময়ই খবর পাই যে সমস্ত দখল করা ম্যাটেরিয়ালস, আর্মস সেগুলো ট্রেনে করে ইন্ডিয়ায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সিলেট স্টেশন থাকাকালীন সময়ই ফাস্ট বেঙ্গল আমাদের সাথে যোগদান করে। ঐ সময় জেনারেল ওসমানী আসেন, জেনারেল জিয়া আসেন। জেনারেল ওসমানী সিলেট স্টেশনে ফার্স্ট বেঙ্গল এবং ৮ম বেঙ্গলের উদ্দেশে ভাষণ দেন। ইন্ডিয়ান ডিভিশনাল কমান্ডার যিনি ছিলেন জেনারেল রাও বা অন্য কেউ, আমার নামটা ঠিক মনে নেই- তিনিও আমাদের উদ্দেশে ভাষণ দেন। সেখানে তিনি একটা কথা বলেছিলেন, আমার এখনও স্পষ্ট মনে আছে। তিনি বলেছিলেন,'' তোমরা মুক্তিযুদ্ধ করেছো খুব ভল তোমাদের যুদ্ধ এখন শেষ। এখন তোমরা যার যার জায়গায় চলে যাবে। এবং তোমাদের এখন কাজ হবে দেশের গঠনকাজে আত্মনিয়োগ করা''। হয়ত তিনি আমরা যেন আর্মি থেকে সরে যাই সেই উদ্দেশ্যে বলেছিলেন।

যাই হোক, আমরা 'জেড' ফোর্সের আন্ডারে ছিলাম। এর মধ্যে খবর পাই 'জেড' ফোর্সের আরেক ব্যাটালিয়ন, ৩য় বেঙ্গল যেটা ছিল ওটা ছাতক এসে পৌঁছে গেছে।

প্রশ্নঃ সিলেট পাকিস্তান সেনাবহিনী ফাইনালি কবে সারেণ্ডার করে?

উত্তরঃ ঢাকায় যেমন ১৬ই ডিসেম্বর করেছিল তখনও সম্পূর্ণ সারেণ্ডার করেনি। ১৩, ১৪, ১৫, ১৬ ডিসেম্বর এক জায়গায় এক এক সময় করেছে। তবে ঢাকায় যেদিন হয়েছে সেদিন সিলেটের কিছু কিছু জায়গা বাকী ছিল। ১৬ তারিখে যখন আমরা রেলওয়ে স্টেশনে আসি তখন আমরা শুনতে পাই যে পাকিস্তান আর্মিরা সালুটিকর এবং এখন যেটা সিলেট কলেজ সেখানে 'কনসেনট্রেট' করেছে। আমি নিজে ১৮তারিখ সেই ক্যাম্পে যাই এবং দেখি তারা অলরেডি সারেন্ডার করে ফেলেছে। এক এক জায়গায় এক এক সময় যেমন ৯/১০ তারিখে শ্রীমঙ্গল আমাদের দেখে পিছু হটে গেছে। মৌলভীবাজারে আরো আগে হয়েছে। আমরা মৌলভীবাজার হয়ে এসেছিলাম। তখন সেখানে ব্রিগেড কমাণ্ড বা আর কোন কমান্ডার ছিল তাদের শেষের দিকে কোন কমান্ড ছিলনা। ছাতকে কিছু আগে সারেন্ডার করেছে। ১৬ তারিখের দিকে সিলেট ক্যাডেট কলেজে সিলেটের পুরো আর্মি সেখানে জড়ো হয়। সেখানে পাকিস্তান আর্মির তিনজন ব্রিগেডিয়ার ছিল এবং বেশকিছু অফিসার ছিল।

প্রশ্নঃ আপনাদের মধ্যে কে কে ছিলেন সারেন্ডারের সময়?

উত্তরঃ সারেন্ডারের সময় আমরা কেউ ছিলাম না। ইন্ডিয়ান আর্মি সারেন্ডার কন্ডাক্ট করে। আমাদের বাংলাদেশের ফোর্সকে সিলেটে ঢুকতে দেয়া হয়নি। সুরমা ব্রীজ তখন ভেঙ্গে গিয়েছিল, ইন্ডিয়ান আর্মি তা

মেরামত করছিল। তাদেরকে বলে দেয়া হয়েছিল যে, বাংলাদেশের কোন গাড়ী এদিক-ওদিক করবেনা এবং আমাদেরকে যেতে নিষেধ করা হয়েছিল।

প্রশ্নঃ পরে আপনারা পুরো ব্যাটালিয়ন মুভ করেন কিভাবে?

উত্তরঃ পরে আমরা শ্রীমঙ্গল যাই। সেখানে জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ছিলাম। পরে ২১শে ফেব্রুয়ারী চিটাগাং এ পৌঁছাই কমান্ডিং অফিসারের সঙ্গে।

ইস্ট বেঙ্গলের গর্বঃ চিলমারী যুদ্ধ

১৫ই আগস্ট ১৯৭১। আর্টিলারীসহ এক ব্যাটালিয়ন পাক হানাদার ও তিন শতাধিক রাজাকার চিলমারীতে বীর ইস্ট বেঙ্গলের মুখোমুখি হয়।

ইস্ট বেঙ্গল ছিল কম্বাইণ্ড ফোর্স। এখানে ছিলেন সি-ও মেজর জামিল (থার্ড বেঙ্গল), সি-ও মেজর জিয়াউদ্দীন (ফার্স্ট বেঙ্গল) ও সি-ও মেজর আমিনুল হক (৮ম বেঙ্গল), আর ছিল মুক্তিবাহিনীর দুটি কলাম। মূল কমান্ডে ছিলেন 'জেড' ফোর্সের অধিনায়ক মেজর জিয়া।

১৫ই ও ১৬ই আগস্ট হানাদার পাকবাহিনী নেক-টু নেক ফাইট করেছে তাদের মোস্ট লেটেস্ট ও মোস্ট সফিস্টিকেটেড আর্মস নিয়ে। কখনো বা মনে হয়েছে পাক হানাদাররা ইস্ট বেঙ্গলে ডিফেন্সে ফাটল ধরাতে সমর্থ হবে। কিন্তু না, বাংলার বীর ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট দাঁতে দাঁতে কামড়ে পজিশন আগলে রেখে দু'দিন ধরে তাদের আক্রমণ রেসিস্ট করে গেছে। দুদিন ধরে মুক্তিযোদ্ধারা জঙ্গল ও বনের ফাঁক দিয়ে সংগ্রহ করে হানাদার বাহনীর ডিফেন্সের ফাঁক-ফোকর। ১৭ই আগস্ট চিলমারীর পূর্বদিক দিয়ে এগিয়ে গেল ৮ম বেঙ্গল। নাশ হয়ে গেল দু'টি হানাদার পজিশন। নিহত হল ৪ জন পাক হানাদার বাহিনী। জায়গা বদল করে এগুচ্ছে ফার্স্ট বেঙ্গল, থার্ড বেঙ্গল। রক্তক্ষয়ী চিলমারীর বুকে অসীম বীরবিক্রমে তিনদিন তিনরাত ধরে চলে যাচ্ছে বীরের বাহিনী ইস্ট বেঙ্গল শত্রুর লেটেস্ট আর্টিলারী ও সফিস্টিকেটেড আর্মস-এর সামনে ক'টা এস-এল-আর আর থ্রি-নটুথ্রি নিয়ে। অকুতোভয় বীর মুক্তিযোদ্ধারা হানাদারদের ইঞ্চি ইঞ্চি করে পিছু হটাচ্ছে চিলমারীর বুক থেকে, আর গ্রামের কৃষক-জনতা সবাই তাদের পিছনে ভলান্টিয়ারের কাজ করছে। জনগনের শ্রদ্ধা ও ভালবাসায় উদ্দীপ্ত ইস্ট বেঙ্গলের জোয়ানরা পাক বাহিনীর মরণ আঘাত উপেক্ষা করে প্রতি প্রহরে সামনে এগিয়েছে, নিখুত নিশানায় হানাদার বাঙ্কারে গুলি ছুড়েছে।

এলো ১৯শে আগস্ট। সারাদিনের পর সন্ধ্যায় হঠাৎ যেন দুলে উঠলো হানাদার পজিশন, বাঙ্কার। ইস্ট বেঙ্গল ও মুক্তিবাহিনী আক্রমণ শানিয়ে তুললো। বীরদর্পে অসীম দুঃসাহসে সন্ধ্যার আঁধার নামার সাথে সাথে থার্ড বেঙ্গল মেজর জামিলের সাথে আরও কয়েক গজ এগিয়ে সামনের একটা হানাদার বাঙ্কার দখল করে নিল। বাঙ্কারেই হত্যা করল ৪ জন হানাদারকে।

রাতের আঁধারে যুদ্ধ আরও রক্তক্ষয়ী ও হিংস্র হয়ে উঠলো। পাকিস্তানী স্ট্রং আর্টিলারীর কভারিং থাকা সত্ত্বেও চিলমারীর বুক থেকে পালাতে চায় ১ ব্যাটালিয়ন হানাদার। 'জেড' ফোর্সের অধিনায়ক জিয়ার অর্ডারঃ 'ওদেরকে রিট্রিট করতে দেয়া হবেনা। চিলমারীর বুকে ওদের কবর হবে'। মুক্তিযোদ্ধারা সন্তর্পণে ক্ষিপ্ত গতিতে গিয়ে পজিশন নেয় হানাদারদের পেছনে। ভোর রাতে জোর কদমে ইস্ট বেঙ্গল ঢুকে পড়ে পাকিস্তানী বাঙ্কারে, পজিশনে, ডিফেন্স লাইনে।

* দৈনিক 'ইত্তেফাক' ১৯৮২ বিজয় দিবস সংখ্যায় প্রকাশিত মুসা সাদিক রচিত প্রতিবেদন থেকে সংকলিত।

ইস্ট বেঙ্গলের নির্ভীক যোদ্ধাদের নিশ্চিত আঘাতে ভেঙ্গে পড়তে লাগলো ওদের বাঙ্কার, গুড়ো গুড়ো হয়ে গেল পাকিস্তানী ডিফেন্স। প্রাণভয়ে চিলমারী ডিফেন্স ছেড়ে পালাচ্ছে ৭০০ পাকসেনার হেড-বডি ও আহতদের নিয়ে ৭/৮ মাইল দূরে, চিলমারী রেলওয়ের দিকে। পালাবার পথে প্রাণ দিচ্ছে ওঁৎ পেতে থাকা মুক্তিযোদ্ধাদের গুলির ঘায়ে।

২০শে আগস্ট মুক্ত হয়ে গেল চিলমারী। রক্তক্ষয়ী পাঁচদিন পাঁচরাত যুদ্ধের পর শত প্রাণশক্তিতে ভরপুর ইস্ট বেঙ্গলের বীর জোয়ানরা এগিয়ে চললো পলাতক পাক হানাদারদের পরবর্তী ডিফেন্স লাইন চিলমারী রেলওয়েতে আঘাত হানার জন্য। পশ্চাতে পড়ে থাকলো রক্তস্নাত চিলমারী। আনন্দে উদ্বেলিত জনগণ চিলমারীর রণক্ষেত্রে এসে দেখতে পেলো বাঙ্কারে বাঙ্কারে পড়ে আছে শতাধিক হানাদার ও রাজাকারের লাশ। পাক হানাদারদের ডিফেন্স লাইন রক্তে ভেসে যাচ্ছে। মুক্তিযোদ্ধারা নিহত হানাদারদের চিলমারীতে কবর দেয়ার ব্যবস্থা করে। পাকিস্তানীদের দুইটি লঞ্চ ধরা পড়ে ও ২টি স্পীডবোট ধ্বংস হয়। ধ্বংস হয় কয়েকটি সাঁজোয়া গাড়ী। ইস্ট বেঙ্গলের ৩ জন সামান্য আহত হয়।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২২। নৌ বাহিনী গঠন ও তার যুদ্ধ তৎপরতা	বাংলা একাডেমীর দলিলপত্র	১৯৭১

সাক্ষাৎকারঃ মোঃ রহমত উল্লাহ

We reached Bombay airport on the 10th April 1971 and we3re warmly received and welcomed by the Major and Commissioner. Next day we reached New Delhi and were received by Lt. Cdr. Sarma, I.N staff of the Indian foreign office and Intelligence Branch. During the 1st 10 days of our stay in New Delhi we were interviewed by the Indian army officers Submarine and Surface officers of the navy and by the Intelligence Branch. Thereafter I was asked by the Captain Roy Choudhury and one Colonel of Inter Service Intelligence Branch about our aims and objects of coming to India. I suggested them to become naval commando and we wanted commando training. On completion of our training we will form a naval commando team from the students of Bangladesh under our supervision with the help of the Indian Government. The suggested plan was approved by the Indian authority.

Admiral Nanda and Intelligence Captain Roy Choudhury were very much pleased to arrange all sorts of help for Bangladesh Naval Commando and a training centre was established Plessey, Murshidabad,. On 22nd of April, 1971 late Lt, Sumir Das and petty officer Gupta were detailed to impart naval commando training to us in the river Jamuna (New Delhi).

Following trainings were imparted to us: (a)_ Swimming for 6\7 hours for under water demolition and sabotage operation; (b) mines; (c) land mines;(d) demolition of bridges; (e) unarmed combat. During our training we met col. (now General) M.A.G Osmani, C-in-C. Bangladesh Armed Forces in New Delhi. We discussed our plans and future programmes with them. He assured us that on going back to Calcutta all arrangements for naval commando training and recruitment from student group will be done to give fulfillment of our plan and programme.

Recruitment: We arrived Calcutta by air on 10th of May 1971. I alongwith col. (now General) M.A.G Osmani, the then C-in-C of Bangladesh Armed Forces, visited Takipur and Bhomra Youth camps on 21st of May 71 and recruited 120 boys Bangladesh for naval commando training. These camps were under Major M.A. Jalil and Lt. Col. Abu Osman. They were dispatched to Plassey camp (West Bengal) for training. The second batch of 200 boys were recruited from differently youth camps. based in Agartala. I was the in- charge of whole trainees for their training welfare, fooding and lodging and all other organization of further planning and operation.

* পাকিস্তান নৌ বাহিনীর অধীনে ফ্রান্সের তুঁলো নৌ ঘাঁটিতে পি-এন-এস ‘ম্যাংরো’তে ১৯৭১ সালের মার্চে প্রশিক্ষণ শেষে মোঃ রহমত উল্লাহ, সি-পিও, তাঁর অপর ৭ জন সহযোগী সাবমেরিন নৌ সেনাসহ পালিয়ে এসে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। অন্যান্য সহযোগীরা হলেনঃ মোঃ মোমারফ হোসেন, পি-ও, শেখ আমান, পি-ও, মোঃ আহসান উল্লাহ এমই-১, আবদুল ওয়াহিদ চৌধুরী, আর-ও-১, আঃ রজিব ইএন-১ এবং মোঃ আবেদুর রহমান, স্টুয়ার্ড-১।

The training started in full swing on the concurrence of the Indian authority. The training manual include the following programme: (a) minimum 9 to 10 hours swimming, such as surface swimming, under water swimming, swimming with weight of limpet mine, swimming with fins and without fins, soundless swimming at night, operation, tactics; (b) demolition practice; (c) grenade throwing practice; (d) use of small arms; (f) unarmed combat practice; and final 18 hour practice in the river Bhagirathi near Plassey where we lost our independence in 1757 A.D. This historical place inspired boys to undergo so much hard and tedious training to get back the independence of our beloved motherland. The training life was so miserable that the boys even could not be supplied with salt to have their food, nor the Government of Bangladesh could take interest for us. the training of 1st batch of naval commandos was completed on the 10th July, 71 and the 2nd batch completed their training on 31st July 1971.

Planning: A plan was now set with the concurrence of the Indian authority to sink the foreign and Pakistani ships stationed at the main ports of Bangladesh and block the river routes completely. Great emphasis was given for destruction works and for operations in the following ports of Bangladesh: (a) Chittagong port,(b) Mongla port, (c) Chandpur inland port, (d) Narayangonj inland port, (e) Daudkandi inland port etc. Accordingly 178 trained commandos were divided in four groups and were dispatched as under: (i) Ist group of 61 commandos were sent to Chittagong on 1st August, 71 under the command of A.W Choudhury, one of the deserters from France; (ii) 2nd group consisting of 28 commandos was sent to Chandpur on 2.8 1971 under the command of M.B Alam one of the deserters from France; (iii) 3rd group of 28 commandos was sent to Narayangonj on 2.8. 71 under the command of M.A Rahman one of the deserters from France; and (iv) 4th group consisting of 61 commandos was sent to Mongla on 4.8 71 under the command of M.A Ullah one of the desert from France. All the 4 group were instructed and advised to attack their respective ports at 0000 hours on the night of 16th August, 1971.

The freedom loving and the independent people of Bangladesh would really appreciate to hear that the group detailed for Chittagong. Narayangonj and Chandpur reached their destinations of operation on foot. For days together they did not have even a morsel of rice and were to cross through the paths where Punjab's the Rajakars local collaborators were vigilant of catching Mukti Fouj.

The Mongla group reached their destination by rowing country boat from India. Fresh water was not available in their journey path. They crossed through the deep jungle of Sundarban. All the four groups attacked on the night of 6th August 71 and the people of Bangladesh heard following precious news from the Radio of Bangladesh BBc, London: "The naval commandos of Bangladesh have sabotaged 6 ships and barges at Chittagong port, 5 ships and barges at Mongla port, 3 coasters and barges at Narayangonj, 1 ship and one pantban at Chandpur. Bridge of Daudkandi has completely been destroyed. The reverine routes of the Pakistani gunboats as well as the only path from Chittagong to Dacca have completely been cut off by naval commando of Bangladesh." Will the brethren of freedom fighters admit that not a single operation was done in so innermost place of Bangla Desh before this one? This is just to console the soul of the commandos

who actively participated in this operation. On completion of their task they returned to Plassey Camp. It pains me to express that one Mr. Aftabuddin NO. 0056, the greatest and beloved son of Bengal was caught by the Rajakars of Bhudhata of Khulna. He was mercilessly killed by the Rajakars.

More 60 boys joined our camps from Agartala Youth camps for commando training. Again 120 boys from youth camps of West Bengal also joined or camp for training. On or after 26th of August 71 small group consisting of 4 to 20 commandos in each group were sent to the following places for sabotage and destruction operation: Chittagong port, Barisal, Mongla, Sylhet, Aricha, Nagarbari, Madaripur, Narayangonj, Chandpur, Magura, Daudkandi, Fulchcarighat, Khulna Rajshahi, Bhola, Narsingdhi, Nabinagar, Rajbari, Austagram and other important reverine ports of Bangladesh. They used to complete their specific tasks and return to Plassey camp time to time. Attempts were made to sabotage the Hardinge bridge of Pakssey. In one operation 4 commandos were caught by the Rajakars and they were tortured severely by them. Even under inhuman torture the newly trained commandos did not disclose their identifications. In the longrun they were set free. In the operation of Faridpur Shaheed Kabizzaman No. 0067 was killed by the Punjabis. In one operation in Chittagong one of our commandos was missing when he went to outer anchorage operation. They could sink two days near patena. In an operation at Fulchharighat 3 commandos including late A.R Mian were killed when putting their mines to a moving gunboat.

The commander-in-chief of Bangladesh forces advised Brigadier Salek to send me for operation in Khulna with 11 boys. 1 let Plassey Camp on 26th September, 71 for 9 Sector HQ at Taki. I was provided with following arms and ammunitions; (a) 26 mines, (b)20ibs explosive, (c) 2 SLR, (d) 4 SMG and(e) taka 600/00.Lt. Arefin with 40 F.F. naval commandos, M.B Alam with 20 naval commandoes and group incharge Khiger Ali with 40 F.F. joined me in Taki on 30th September 71. Coming to khulna i did following operations and managed to open 19 camps including 3 training centers in Khulna and Sundarban areas. Eight thousand freedom fighters were trained in this training centres and they actively participated in the liberation war. From October to 16th December, 71 the operations done by me were(a) 6th October 71 In Assasuni operation 25 Rajakars were killed and wounded. (b) 9th October 71 In Chapra operation 6 Rajakars were killed and wounded. (c) 15th October and 28th October in Sundarban 6 dacoits were caught. (d) 26th October IN Koyra operation one ship one flat and two barges were sunk. (e) 2;nd November two ships were sunk in Mongla airport.(f) 8th November in Laksmikhola operation 6 Rajakars were killed and wounded; (g) 12th November one ship Was sunk in Mongla port; (i) 25th November in Chalna operation 10 Rajakars were killed and Dakope operation. (j) 5th December In Kapilmuni operation one hundred Rajakars were killed (I) 6th December In Assasuni operation 2 rajakars were killed and the other surrendered. (m) 7th December-In Debhata operation one killed and other Rajakars surrendered;, (n) 8th December In Mongla port operation captured guns and all Pak forces (Rajakars

surrendered): (0) 10th December-In Baitaghata Operation 2 Rajakars were killed and the other surrendered: (p) 14th December- In Gollamari operation retreated due to heavy shelling from Pak army: and (q) 16th and 17th December-8000 FF all Mujib Bahini of Khulna District was under my command, attacked Khulna town from all sides, 2barges fitted with captured 4 no. 40/60 mm guns had been shelling on Pak army position, and I entered into Khulna own on 17th December at 06/30 hours after heavy fighting with Pak army and Rajakars. 4 Pak military were killed.

The day I started operation and organization of the above training centre's the following commanders came under my command till the date of the liberation of the country: 1. Capt. Shafiqulla: 2. Lt. A. S. M. Arefin: 3. Mr. Kamruzzaman (Tuku), Mujib Bahini Chief, Khulna district : 4. Mr. Tawfiq (Mujib Bahini) : 5. Mr. Bahar Ali (Mujib Bahini): 6. Mr. Quayum (Mujib Bahini) : 7. Mr. A. Salam (Mujib Bahini): 8. Mr. Yunus Mujib Baini: 9. Mr. Khijir Ali, F.P.

It is to be noted that Khulna and Mongla rivers are full of shark and our commandos went into water with a simple limpet mine and fins in their legs. During operation not a single casualty fro shark. Though there was chilling winter still the commandos had to remain in water for days together. Heavy rains, heavy colds no rations no clothes no shelters even in Sundarban the tigers are there. The Commandos have done so many sea and operation which cannot be expressed. Zahurul Hoq. Abdul Khaleq, Shamser Ali were seriously injured while operating on Mongla. In commando operations about 76 sea-going ships small ship's cargo coasters launchers gunboats converted gunboats barges flats were sunk or partially damaged and few jetties and bridges were destroyed.

It may be mentioned here that two more camps Hasnabad and Haldia were organized to assemble the old defected ex sailors of P.N. Khurshid. In cooperation with major Jail, the Commander of 9 sectors a fleet was raised named Bangabandhu Fleet. This fleet was composed of small vessels fitted with small guns. They used to come to the locality of Sundarban of area and did small operations. They finally entered in Bangladesh after liberation.

Two more gunboats Padma and Plash clewed with the ex-sailors of erstwhile Pakistan Navy came for operation at Khulna area. Both the gunboats were sunk. After the sinking of the two gunboats, the position o the CPOS/sailors was as under: (a) Shahid: Mohd. Ruhul Amin-C. ERA, Mohd. Mumtajuddin Me-1 Mohidullah – A. B. M. D. H. Mullah A.B. M.M. Rahman A.B. M. Haque A. B. Rafiqul Islam naval commando, and Fariduddin Ahmed REN-1; (b) Injured: M. A. Taher- ME-1, A.R. Bhuyan-EN-1 M. Fazal LME A. Haque A. B. M.A. Mutalib A. B. M.A. Mazumder ME-1 Bashir Ahmed naval commando and M. Jalaluddin L/S (c) Caught by Rajakars and taken to Khulna jail after merciless torture M. A. Rauf L/S, M.S. Haque L/wrt., M. A. Sarkar- PO/RS, M. A. Hussain S/td, A.R. Khan To-2, Rafiqulla A. B. Jaker L/S, Taher ME/I.

A group of 8 Sailors also actively participated in the liberation war with the regular army in sector-3, at Hazamara. They are: Mr. Islam ER. IV M. M. Uddin L/wrt, Z.U. Ahmed-CK-I, K. N. Islam PM-1, Saleh Mohammad A D D

Amin-REN-I, and Sirajuddin A. B. These 8 sailors and a rigorous lift at the frontal fight with the Punjabis at Dharmanagar area (Sylhet) and were in B company under Col. Safiullah. They actively attacked the position of the Pakistanis in three attacks Moreover they used to go for operation inside Sylhet daily under Shaheed Lt. Badiuzzaman. They were engaged in operation inside Bangladesh as well as in border areas of Sylhet the other sailors who revolted also worked under army in different sectors and they also fought gallantly for their country.

The 17th of December 71 was a red letter day in my life as well as for the people of Bangladesh. At 06-45 hours on the 17th December I captured Khulna town and hoisted the independence flag of Bangladesh on the circuit house building. The people of the town greeted us with the cheers of Joy Bangla and heaved a sigh of relief seeing there own brethren Mukti Fouj amongst then. Major Jalil and the Indian military came to Khulna town at about 11-00 hours on the same day. They became astonished to see me and my group.

-Joy Bangla-

(Mohammad Rahmatullah)
Sub/Lieutenant, Bangladesh Navy
19-11-74

সাক্ষাৎকার*ঃ মোঃ বদিউল আলম
১১-৬-৭৯

প্রথম আক্রমনঃ আমাদের নৌ-পথে বাংলাদেশে প্রথম কর্মতৎপরতা শুরু হয় আগষ্ট মাসের তৃতীয় সপ্তাহে প্রথম দিকে। আমি কিছুসংখ্যক ছেলেসহ কলিকাতা হয়ে আগরতলায় আসি হিন্দুস্তান বোমরু বিমানে চড়ে। আগরতলা থেকে প্রয়োজনীয় গোলাবারুদসহ আমার সংগে বিশজন ছেলে নিয়ে আমি কুমিল্লা অভিমুখে রওনা দিই। আমার টারগেট ছিল কুমিল্লা-চাঁদপুর ফেরীঘাটসহ জাহাজ বিধ্বস্ত করা।

বিশজনের একটি গেরিলা দল নিয়ে আমি বকশনগর বর্ডার দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করি। পথটি ছিল পাহাড়ী ও বন্ধুর। দুই পাশে পাকসেনার প্রহরাশিবিরের মধ্য দিয়ে গভীর রাতে আমরা পাড়ি জমাই। স্থানীয় গ্রামবাসীরা এ ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করেছিলেন। সীমানা পার হয়ে আমি প্রথমে আমাদের বাংলাদেশে পদার্পন করি এবং পূর্ণ উদ্যমে সামনের দিকে এগিয়ে চলি। কোথাও ধানক্ষেত, কোথাও বন-জঙ্গল, কোথাও আবার ডোবা নালা বিল। অতি সংগোপনে আমরা সি-এন্ড বি বড় রাস্তা পার হয়ে নৌকা নিয়ে চলতে থাকি। এইভাবে কিছুদুর যাওয়ার পর আমরা পায়ে হেটে ভিতরে প্রবেশ করতে লাগলাম। এমন সময় সকাল হয়ে গেল। আমরা এক মাষ্টার সাহেবের বাড়িতে উঠলাম। মাষ্টার সাহেব আমাদেরকে সাহায্য করেছিলেন। সন্ধ্যার প্রারম্ভে আবার আমরা যাত্রা শুরু করি এবং চাঁদপুরের নিকট সফরমানী গ্রামে ইব্রাহিম মাষ্টার (বি-টি) সাহেবের বাড়িতে এসে উঠি। মাষ্টার সাহেবের দুই ছেলে সাজু ও দুলু আমার সঙ্গে ছিল। এর পরদিন আমরা ওখান থেকে গিয়ে উঠি এমসি মিজানুর রহমানের বাড়ীতে। ওখানে নিরাপত্তাবোধ না হওয়ায় আমরা আবার এসে উঠি এক বিখ্যাত মুসলিম লীগ নেতার বাড়িতে। সেখানে জোরপূর্বক তার বড় ছেলেকে জিম্মা হিসাবে আটক রেখে এই হুশিয়ারী দিই যে, আমাদের অবস্থানের কথা জানিয়ে দিলে আমরা তার ছেলেকে হত্যা করবো। এতে বেশ কাজ

---

* প্রকল্প কর্তৃক সংগ্রহীত।

হয়। আমরা মাঝির ছদ্মবেশে রাতে চাঁদপুরের নিকট দিয়ে নদী পাড়ি দিই। এমন সময় আমরা ঝড়ের মুখে পতিত হই। এর ফলে আমাদেরকে চরের মধ্যে বেশ কিছু সময় নৌকা নিয়ে অপেক্ষা করতে হয়েছিল। রাত্র ১১টা থেকে ৩টা পর্যন্ত আমাদের অভিযান চলার কথা ছিল। আমরা ঠিক সময় আমাদের অভিযন আরম্ব করি কিন্তু দুঃখের বিষয় ভাগ্য আমাদের সুপ্রসন্ন ছিল না। সবই আল্লাহর ইচ্ছা। অবশ্য আমাদের অভিযানের সংকেতধ্বনি বাজানো হয়েছিল তখনকার বাংলাদেশ বেতার কেন্দ্র থেকে। আমাদের সংকেত ছিল পঙ্কজ মলিকের লেখা একটা গানের কলি- বধূ আসবে পালকি চড়ে ইত্যাদি। আমাদের অভিযান মুরু হওয়ার কথা ছিল ১৪ই আগস্ট দিবাগত রাত্রে কিন্তু ঐ দিনটি মেঘাচ্ছন্ন দুর্যোগপূর্ণ থাকায় আর তাছাড়া আমাদের পৌঁছানোর নিরাপত্তা না থাকায় অভিযান দুইদিন পিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

১৭ই আগস্ট রাত ১১টায় আমি আমার প্রথম অভিযান চালাই। এর আগে আমি দিনের বেলায় চাঁদপুর শহর ও নদীপথ ভালভাবে পরিদর্শক করে আসি, যাকে 'রেকী' বলা হয়। আমি ছেলেদের ছয়টি দলে ভাগ করে প্রত্যেককে একটি করে লিমপেট মাইন পেটে বেথে উল্টাভাবে সাতার দিয়ে টারগেটের দিকে অগ্রসর হতে নির্দেশ দিই। সংগে আমিও পিছনে রওনা দেই দুইটি মাইনসহ। দুজন ছাড়া সবাই তাদের টার্গেটে মাইন লাগাতে সমর্থ হয়। আমার লক্ষ ছিল সবচাইতে বড় একটি গমের জাহাজ। এজন্য আমি দুটি মাইন নিয়ে অন্য দুজন ছেলেসহ প্রথমে গমের জাহাজের নিচে ডুব দিয়ে নিজ হাতে মাইন লাগাই এবং সংগে আমার সঙ্গী দুজনও মাইন লাগায়। এরপর সাতরিয়ে পদ্মার মুখে এসে পড়ি। এমন সময় সৈন্যবাহী জাহাজ গাজী আমাদেরকে সম্মুখে বাধা দেয়। তখন এদিকে জাহাজে লাগানো মাইন ধুম ধুম শব্দে ফুটতে শুরু করেছে। জাহাজের ভিতরে তখন হৈ হুল্লোড় চিৎকার শুরু হয়ে গিয়েছে। দুই ধার থেকে তখন প্রহরা বাহিনী নদীর মধ্যে অজস্র গুলি ছুড়তে আরম্ভ করেছে। আমার দল তখন গুলির মুখে টিকতে না পেরে ছত্রভঙ্গ হয়ে যে যার দিকে সম্ভব আত্নরক্ষার জন্য দ্রুত সরে পড়ে। অন্য দুই দলসহ আমরা ছয়জন তখন পদ্মা নদীরমুখে গাজী জাহাজের সামনে বাধা প্রাপ্ত হই। তখন আমি একটা বার্জ এর গা ধরে কিছু সময় নিজেকে লুকিয়ে রাখি। প্রায় ভোর হয়ে আসছিল। এদিকে জাহাজও আর সরে না, আমরাও আমাদের পথ চলতে পারি না। কিছু সময় অপেক্ষা করার পর আমার দলের শেষে লাগানো একটি মাইন জেটির কাছে বিস্ফোরিত হয় এবং গাজী তাড়াতাড়ি নদীর মুখে থেকে নদীর ভিতরে চলে যায়। তখন আমরা ঐ সুযোগে তাড়াতাড়ি পদ্মার মুখ পার হয়ে এক পাটক্ষেতের পাশে ঢুকে পড়ি। এমন সময় সকাল হয়ে গেছে। আমরা তখন ৬জন মাত্র একত্রে আছি বাকী যে যার মত পেরেছে নিজেকে বাচানোর জন্য ছুটে গেছে। পূর্ব নির্দেশ মোতাবেক যেখানে আমাদেরকে নৌকায় উঠারে কথা ছিল সেই পূর্বনির্ধারিত স্থানে নৌকা না পাওয়ায় আমরা সবাই বিমূঢ় হয়ে পড়ি। আমাদের তখন শূন্য হাত, কোন অস্ত্র নেই। আছে শুধু সাতার কাটার জন্য পায়ে ফিন। এ অবস্থায় আমি দলবসলসহ এক পাশের বাড়িতে গিয়ে উঠি এবং জোরপূর্বক এক নৌকায় উঠে বসি। নৌকার মালিক আমাদের দেখে জোরে চিৎকার দেয়। আমরা নৌকা নিয়ে অল্প কিছুদূর এসেছি মাত্র এমন সময় চারদিক থেকে আমাদেরকে প্রায় ১০০ নৌকা ঘিরে ফেলে। নৌকাগুলো ঐ সময় নদীতে ইলিশ মাছ ধরছিল। মাঝিরা আমাদেরকে ঘেরাও করে আমাদের দিকে আসতে থাকে। নিকটে আসার পর আমাদের অবস্থা বুঝতে পেরে আমাদেরকে ডুবুরী বলে চিৎকার দেয় এবং আমাদের হিন্দুস্তানী বলে চিহ্নিত করে। আমরা নৌকা প্রায় ধরা পড়ার উপক্রম। সামনে পিছনে সবদিকে পথ বন্ধ। সব নৌকার মাঝিরা চেচামেচি শুরু করে দিয়েছে। তখন বেলা উঠেছে, আমাদেরকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। এমন সময় আমাদের মাথায় উপস্থিত বুদ্ধি খেলে যায়। আমি আমাদের ছেলেদেরকে সবগুলি ফিন উপরের দিকে উচিয়ে ধরতে বলি। যে বলা সেই কাজ। আমি তখন চিৎকার করে বলি, আমাদের পথ ছাড়, নতুবা আমরা তোমাদেরকে গুলি করে মেরে ফেলবো। আমার হাতে টর্চ লাইট থাকায় সেটা তাদের দিকে উচিয়ে ধরি এবং পথ ছাড়তে বলি। ওদিকে অনবরত চাঁদপুর বন্দরে আমাদের লাগানো মাইন ফাটা আরম্ভ হয়েছে। আমি তাদেরকে ভয় দেখিয়ে বলি ঐ যে শব্দ শুনতে পারছ, আর এই যে আমাদের কাছে বোমা দেখছো, এটা তোমাদের উপর ছেড়ে দেব। যেমন বলা, আর যায় কোথায়, সবাই তখন নৌকা নিয়ে যার দিকে পালাতে শুরু করলো। এর

ফলে আমরা নৌকা বদল করে নান্নু নামক এক ছেলের অন্য এক নৌকায় উঠি। পরে শুনতে পাই, আমাদেরকে সাহায্য করার জন্য ছেলেটিকে পাকবাহিনী গুলি করে মেরে ফেলে।

এরপর আমি সোজা পশ্চিম দিকে নৌকা চালিয়ে কলমচোরা গ্রামে গিয়ে উপস্থিত হই। ওখানকার চেয়ারম্যন দেওয়ান সাহেব তার বাড়িতে দুপুর বারোটার সময় আমাদের খাবারের ব্যবস্থা করেন। ক্ষুধায় আমাদের তখন জান বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রমন হয়েছিল। আমাদের পরনে তখন মাত্র একটা জাংগিয়া ছাড়া আর কিছু ছিল না। অবশ্য তিনি আমাদের প্রত্যেককে একখানা করে লুঙ্গি দিয়েছিলেন আর কাউকে বা গেঞ্জি আর কাউকে বা শার্ট। আমাকে আগেই নান্নু ছেলেটা তার একটা গামছা ও গায়ের শার্ট খুলে গিয়েছিল। আমরা খাওয়ার সময় সংবাদ পাই যে, আমাদের ধরার জন্য পাকসেনা ও বেশকিছু রাজাকার আমাদের দিকে আসছে। এমতবস্থায় আমরা তাড়াতাড়ি অল্প কিছু নাকে মুখে দিয়ে ওখান থেকে সরে পড়ি। সন্ধ্যার সময় স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমানের বাড়িতে গিয়ে উঠি এবং রাত্রি যাপন করি অন্য এক বাড়িতে। সারারাত কোন রকম অনিদ্রায় কাটিয়ে দিই। সকাল হওয়ার সংগে সংগে আমি ছেলেদের খোজে বের হই। অনেক খোজাখুজির পর দুজনের দেখা পাই এবং তাদেরকে সংগে করে আমি চলে আসি সফরমানী গ্রামে ইব্রাহীম (হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক) সাহেবের বাড়িতে। এসে শুনতে পাই গতকাল্য চাঁদপুর বন্দরে যে অভিযান চালানো হয় তার জন্য মাস্টার সাহেবকে পাকবাহিনী দায়ী করে এবং পরের দিন তাকে গুলি করে হত্যা করে। বাড়িতে যা কিছু মালামাল ছিল সব কিছু লুট করে নিয়ে যায়। নারী নির্যাতন করতেও ছাড়ে নাই। ঘটনা শুনে মনে ভীষন ব্যাথা পাই এবং প্রতিজ্ঞা করি যে, এর প্রতিশোধ নেবই নেব খোদা যদি বাঁচিয়ে রাখেন। মাস্টার সাহেবের দুই ছেলে সাজু ও নিলুসহ আমি আমাদের শিবির আগরতলায় যাওয়ার জন্য তৈরী হতে থাকি। এমন সময় আরও দুজন বিমান বাহিনীর লোক আমার সংগে যোগ দেয়।

শিবিরে এসে শুনতে পাই আমি পাকসেনাদের হাতে ধরা পড়েছি এবং আমি তাদের নিকট আত্নসমর্পন করেছি। এই খবর পাকিস্তান রেডিও থেকে জোরে ফলাও করে প্রচার হয়েছিল। অবশ্য প্রথম অভিযানের দীর্ঘ ১১ দিন আমার কোনরূপ খোজখবর ছিল না। এতে আমার শিবিরের সকলের মনে দারুন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল। আমার আগমনে সবাই একসংগে হর্ষধ্বনি দিয়ে আমাকে ঘাড়ে উঠিয়ে আনন্দে হাততালি দিতে শুরু করলো। দুদিন যেতে না যেতে আমার ডাক পড়ে কলিকাতা ফিরে যাওয়ার জন্য। আমাকে বোমারু বিমান করে কলিকাতা নিয়ে যাওয়া হয়। কলিকাতায় এসে সুনতে পেলাম অন্যান্য নৌ-অভিযানের মধ্যে সবচাইতে বেশি জাহাজ চাঁদপুর ডুবেছিল। এবং চাঁদপুরের সংবাদ বি বি সি সংবাদ সংস্থা পর্যন্ত পরিবেশন করেছিল।

দ্বিতীয় আক্রমন: কলিকাতা থেকে আবার পলাশী শিবিরে চলে আসে। ইতিমধ্যে আমার জন্য নতুন করে অভিযান চার্ট তৈরী করে রাখা হয়েছে। আমাকে খুলনার মঙ্গলা পোর্ট অপারেশন করতে হবে। এর আগে যে দলকে আমরা মঙ্গলা পোর্ট অপারেশন করতে দিয়েছিলাম তারা বেশী একটা সুবিধা করে উঠতে পারেনি। প্রথম মঙ্গলা দলের অধিনায়ক ছিলেন আমার বন্ধু আহসানুল্লাহ।

আমি এবার ৩০জন ছেলে সংগে করে মঙ্গলা অপারেশননের জন্য তৈরী হতে লাগলাম। আগস্ট মাসের শেষদিন আমি ৩০ জন ছেলেসহ কলিকাতার ব্যারাকপুর চলে আসি। ওখানে আমাদের জন্য বিশ্রাম শিবির তৈয়ার করা ছিল। ব্যারাকপুর থেকে আমরা প্রয়োজনীয় গোলাবারুদ সহ ৯নং সেক্টর মেজর জলিল সাহেবের সংগে যোগ দিই। আমাকে সাহায্য করার জন্য মেজর জলিল আমাকে লেঃ শামসুল আরেফিন সাহেবকে সংগে দেন। আরও দেন ২০০ জন স্থল গেরিলা বাহিনী। স্থল গেরিলা বাহিনী আমাদেরকে সাহায্য করবে আর প্রয়োজনবোধে পাকবাহিনীর সংগে যুদ্ধ চালাবে। বাকুন্দিয়া শিবির থেকে আমরা আবার হিঙ্গলগঞ্জ শিবিরে চলে আসি। এখানে দুদিন অপেক্ষা করার পর লেঃ শামসুল আরেফিন সহ আমি দলবল নিয়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করি।

আমরা সাধারনত রাত্রিবেলায় চলাফেরা করতাম। দিনের বেলায় কোন জংগলে অথবা গ্রামের নির্জন বাড়িতে শিবির করতাম। এবং সব সময় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকতাম যাতে পাকবাহিনী আমাদেরকে আক্রমন করলে আমরা তার মোকাবেলা করতে পারি। এভাবে দুদিনে ৮০ মাইল পথ পেরিয়ে প্রায় ৩০০ লোকের একটা গেরিলা দল নিয়ে আমরা মঙ্গলা পোর্টের কাছে কৈলাশখালী গ্রামে আমাদের শিবির স্থাপন করি।

কৈলাশখালী গ্রামে লোকজন বেশী ছিল না। অধিকাংশ বাড়ছিল পরিত্যাক্ত। আমরা সুন্দরবনের ধারে এক হিন্দু ভদ্রলোকের বাড়িতে আশ্রয় নিই। আর অন্যান্য স্থলবাহিনী ছেলেদেরকে আমরা কয়েক ভাগে ভাগ করে পরিত্যাক্ত বাড়িতে রাখি, যাতে আমাদের উপর হঠাৎ পাকসেনা আক্রমন করলে সুবিধা করে উঠতে না পারে।

কৈলাশখালী গ্রামে একদিন বিশ্রামের পর আমি ও আমার বন্ধু শামসুল আরেফিনসহ আমরা মঙ্গলা পোর্টে 'রেকী' করার জন্য যাই ছোট এক নৌকাযোগে। ঐ সময় খিজির নামে এক মুক্তিযোদ্ধার সংগে আমাদের পরিচয় হয়। মঙ্গলা পোর্ট-এর নিকট সে আগে থেকেই গেরিলা তৎপরতা চালাচ্ছিল। আমাদের পেয়ে সে আরও সাহস অর্জন করলো। খিজির ওখানকার বাসিন্দা হওয়ায় আমাদের রাস্তাঘাট চলাচলে সুবিধা হয়েছিল। আরেফিন আমি খিজির ও নৌকা চালানোর জন্য আরও কয়েকজন ছেলেসহ আমরা ঠিক সন্ধ্যার আগে মঙ্গলা পোর্ট 'রেকী' করে আসি। পরদিন আমরা সন্ধ্যার সময় বড় বড় ছ'খানা নৌকায় মঙ্গলা পোর্টের কাছে এসে উঠি। স্থলবাহিনীকে আমরা তিন জায়গায় পজিশন মত বসিয়ে রাখি। যদি কোনরূপ আক্রমন হয় তারা পাল্টা জবাব দেবে। অবশ্য আরেফিন সাহেব এসব বন্দোবস্ত করেন। আমি আমার নৌ কমাণ্ডো ছেলেদেরকে বুকে বাধা মাইনসহ বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে নিজে এক দলসহ নদীতে সাতার দেই। আমাদের সংগে থাকতো শুধু ছোট একটি ছুরি, একজোড়া ফিন আর একটা লিমপেট মাইন। আর গ্রুপ লিডারের কাছে থাকতো একটি অথবা দুটি করে হাতবোমা। কোন জাহাজে চারজন, কোন জাহাজে ছজন এইভাবে ভাগ করা ছিল। আমার সংগে ছিল চারজন। আমার যে জাহাজটাতে মাইন লাগানোর কথা তা নদীর অপর প্রান্তে বাধা ছিল। যাদের টার্গেট নিকটবর্তী ছিল তারা সেখানে তা লাগিয়ে যে যার মত নিজেকে নিয়ে কেটে পড়ে। আমার জাহাজে যখন পৌঁছি তখন আমার একজন ছেলে তীব্র স্রোতের মধ্যে আমাদের দল ছাড়া হয়ে যায়। আমি ডুব দিয়ে জাহাজের গায়ে যখন মাইন লাগাচ্ছিলাম, তখন অন্য দল দ্বারা পূর্বে লাগানো মাইন বাস্ট হয়ে নদীর মধ্যে জাহাজ ডুবতে শুরু করেছে। আমি দ্রুত আমার কাজ শেষ করে অন্য ছেলে দুটিসহ ফিরে আসার চেষ্টা করি। এমন সময় জাহাজ থেকে খুব জোরে হুইসেল বাজানো আরম্ভ হয়। অনবরত এস ও এস (সেভ আওয়ার সোল) সংকেত ধ্বনি হতে থাকে। সংগে সংগে বন্দররক্ষী বাহিণী আমাদের লক্ষ্য করে নদীর মধ্যে গুলি ছুড়তে শুরু করে। নদীর মধ্যে বৃষ্টির গুলি চলছে। আমাদের মোতায়েন স্থলবাহিনীও পাল্টা জবাব দিচ্ছে। উভয়পক্ষে ভীষন রকম গোলাগুলি। নদীর উপরে আকাশ লালে লাল। সমস্ত বন্দরের আলো নেভানো। আমি আমার দলসহ নদীর কিনারায় আসতেই আমার উপর উঠে পড়ে একটি ছোট উদ্ধারকারী লঞ্চ। লঞ্চটির আলো বন্ধ ছিল। আর আমি উল্টাভাবে সাতার দিচ্ছিলাম। আমার মাথায় লঞ্চটি জোরে আঘাত করে। জোরে আঘাত পাওয়ায় আমার জ্ঞান হারানোর অবস্থা হয়। আমি তখন জোরে ডুব দিয়ে নিজেকে রক্ষা করার জন্য শ্রোতের অণুকুলে পানির নিচে চলতে আরম্ভ করি। জাহাজের নিচ থেকে নিজেকে রক্ষা করার পর পানির উপর ভেসে উঠে আমার কোন সংগী পেলাম না। তখন একা একা স্রোতের প্রতিকুলে গা ভাসিয়ে সাতার কাটতে থাকি। রাত্রি প্রায় তিনটার সময় আমার পায়ের নিচে মাটি লাগে তখন আমি সাতার ছেড়ে বুকে ভর দিয়ে নদীর কিনারায় উঠে বসি। এমন সময় আমার কানের পাশ দিয়ে শো শো শব্দে গুলি চলে যায়। আবার মাটিতে শুয়ে পড়ি। লক্ষ্য করে দেখি আমার থেকে মাত্র বিশ ত্রিশ গজ দুরে পাকসেনাদের বাংকার। ওর মধ্য থেকে অনবরত আমার দিকে গুলি আসছে। কোন উপায় না দেখে আমার কোমর থেকে শেষ গ্রেনেডটি বার করলাম। গ্রেনেডের চাবি দাত দিয়ে খুলে ফেললাম এবং জোরে বাংকারের মুখ লক্ষ্য করে ছুড়ে মারলাম এবং নিচের দিকে গড়িয়ে পড়লাম। আমার গ্রেনেড শব্দ করে ওঠার সংগে সংগে বাংকার থেকে গুলি ছোড়া বন্ধ হয়ে যায়। আমি তাড়াতাড়ি উঠে আমাদের নৌকা যেদিকে ছিল

সেদিকে দৌড় দিই। কিছুদুর যাওয়ার পর আমার সংগে একজন ছেলের দেখা হয়, ওকে সংগে করে আমি আবার পথ চলতে শুরু করি। এদিকে নদীর উভয় পাশ থেকে ভীষণ গোলাগুলি চলছে। আমরা মাথা নিচু করে নৌকার দিকে আসতে থাকি। প্রকৃতপক্ষে আমি এত দূরে চলে গিয়েছিলাম যে নির্দিষ্ট স্থানে আসতে প্রায় দুঘন্টা লাগে। আমার জন্য সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল। নদীতে ছটার মধ্যে পাচটা জাহাজ ডুবে গেছে আর একটি জাহাজ কাত হয়ে পড়ে আছে।

আমাকে পাওয়ার সংগে শামসুল আরেফিন ও খিজির সংগে সংগে গোলাগুলি বন্ধ করার জন্য আমাদের বাহিনীকে নির্দেশ দেন। গেরিলা বাহিনী একত্র করার পর লোক গণনাকালে আমার দুইজন নৌকমাণ্ডো কম দেখতে পাই। তাদের জন্য আরও প্রায় আধ ঘন্টা অপেক্ষা করা হলো। এদিকে পূর্ব আকাশ একেবারে ফর্সা হয়ে আসছে। আর অপেক্ষা করা সম্ভব নয় দেখে আমি নৌকা ছাড়ার জন্য নির্দেশ দেই। পাকসেনার আওতার বাইরে এসে এক নারিকেল বাগানে এসে কিছু ডাব ও নারিকেল পেড়ে খেয়ে সকালের নাস্তা সেরে দুপুরে শিবিরে ফিরে দেখি আমার ছেড়ে আসা ছেলে দুটি আমার আগেই শিবিরে পোঁছেছে। ঐদিন বিকাল বেলা পোস্ট মাস্টার সাহেব আমাদেরকে জানান যে, পাকসেনাদের মনোবল খুবই ভেঙ্গে পড়েছে। আরও জানা গেল, গোলাবারুদ ভর্তি দুটি জাহাজ চিটাগাং বন্দরে পাঠানোর জন্য একেবারে নদীর ধারে রাখ হয়েছে। এ ছাড়া আশে পাশে কয়েকখানা খাদ্য জাহাজও আছে।

আমি বিকালবেলা আমার অন্য সহকর্মী দ্বিতীয় কমাণ্ডার মালেকের সংগে অল্প কয়েকজন বাছা বাছা নৌ কমাণ্ডো ছেলে এবং আরেফিন ও খিজিরের একটি গ্রুপসহ মাত্র বারটা লিমপেট মাইন নিয়ে দুইটি নৌকা করে আবার নদীর ধারে চলে আসি। আগের দিন আমাদের আক্রমণ উল্টা দিক থেকে চালানো হয়েছিল। এবারে বনের পাশ ঘেষে সন্ধ্যার আগেই সি-এন্ড বি রাস্তায় এসে পড়ি। রাস্তা থেকে জাহাজের সমস্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা দেখতে পাই। তাতে মনে হলো,আমাদের কাজ খুব সহজ হবে। তিনটি জাহাজের উপর মাত্র কয়েকজন লোক দেখলাম।

আমার দ্বিতীয় কমাণ্ডার মালেক জাহাজ তিনটির অপারেশনে নিজে সংগে থাকার অনুমতি চাইল। কাল বিলম্ব না করে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসার সাথে সাথে সে অন্য দুইদলসহ চারটি করে মাইন নিয়ে নদীতে নেমে পড়ে। দূরত্ব বেশী না থাকায় ১৫ মিনিটের মধ্যে জাহাজের গায়ে মাইন লাগিয়ে নিকট ফিরে আসে। তাদেরকে নৌকায় যেতে নির্দেশ দিয়ে আমরা গাছের আড়ালে আত্নগোপন করে মাইন ফাটার অপেক্ষায় থাকলাম। এত তাড়াতাড়ি যে আমরা তিনটি জাহাজে মাইন লাগাতে পারবো তা ধারণা করতে পানিনি। বেশী সময় অপেক্ষা করতে হল না। ১৫মিনিটের মধ্যেই গোলবারুদ ভর্তি জাহাজে প্রথম মাইন বিস্ফোরিত হয়। সংগে সংগে বিকট আওয়াজ করে তিনটি জাহাজ প্রায় আধঘন্টার মধ্যে ডুবতে আরম্ভ করে। যখন বন্দররক্ষীদের নিকট থেকে গুলি ছোড়া আরম্ভ হয় তখন আমরা আমাদের অবস্থান গোপন রাখার জন্য পাল্টা গুলি ছুড়তে আমার প্রতিরক্ষা বাহিনীকে নিষেধ করি। ওখানে আর কাল বিলম্ব না করে দলবলসহ শিবিরে ফিরে আসি। পরদিন দুপুরে কোন রকমে চারটা পেটে দিয়ে আমরা ওখান থেকে নৌকাযোগে সরে পড়ি এবং গোলাবারুদ সংগ্রহ করার জণ্য পুনরায় বাকুন্দিয়া শিবিরে মেজর জলিল সাহেবের নিকট ফিরে আসি। মেজর জলিল আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরেন এবং আমাকে অশেষ ধন্যবাদ দেন। তিনি পরদিন আমাকে বারাকপুরে যেতে নির্দেশ দেন।

মঙ্গলা পোর্টে পর পর দুইটি অপারেশনে নয়টা জাহাজ ডুবেছিল। এ সংবাদ বড় বড় অক্ষরে আনন্দ বাজার পত্রিকায় ফলাও করে প্রচার কর হয়। তাছাড়া পৃথিবীর অন্যন্য সংবাদ সংস্তা যেমন বিবিসি, ভয়েস অব আমেরিকা থেকেও নাকি প্রচার করা হয়েছিল। তখন হিন্দুস্থান নেভী নাকি এস ও এর সংকেত ডায়মণ্ড হারবার থেকে শুনতে পেয়েছিল।

আমরা চালনা বন্দরেও ছোট ছোট দলে ভাল হয়ে অপারেশন চালাতাম। ছোট নৌকা আমাদের কাছে যথেষ্ট ছিল। ছোট নৌকায় যেমন দ্রুত চলাচল করা যেত তেমনি নিরাপত্তা ও ছিল। আমরা যে জায়গায় থাকতাম, সেখানথেকে অনেকদুরে গিয়ে অপারেশন করে আসতাম। ফলে আমাদের অবস্থান পাকসেনাদের দৃষ্টিগোচর হতো না। একদিন দিনের বেলা মাঝি সেজে এক জাহাজে মাইন লাগিয়ে চলে আসি। এক ঘন্টা পর জাহাজখানা ডুবে যায়। একদিন সংবাদ পেলাম যে দুইখানা আমেরিকান জাহাজ পোর্টের মধ্যে নোংগর করেছে, তার মধ্যে একখানা বোমা ও একখানা অস্ত্র গোলাবারুদ রয়েছে। এ কথা শোনার পর ভীষন আলোড়নের সৃষ্টি হলো। যেমন করে হোক জাহাজ দুইটি ডুবাইতেই হবে। ঐ রাত্রে আকাশের অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। প্রবল বেগে বাতাস বাইতেছিল। নদীতে খুব বড় বড় ঢেউ উঠছিল। এই সময় আমাদের লক্ষ্যর চন্য উপযুক্ত মনে করে সন্ধ্যার পরপরই ২৪ জন ছেলেসহ আমি নিজে তৈরী হলাম। রহমত উল্লা, আরেফিনও নদীর ধারে পজিশন নেওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন।

বনের মধ্য থেকে বের হয়ে আমাদের ছোট নৌকা বিলের মধ্য দিয়ে পোর্টের দিকে অগ্রসর হতে লাগল। লক্ষ্যের নিকটবর্তী হয়ে আমরা কিছু সময় সুযোগের অপেক্ষায় থাকতাম। এর মধ্যে স্থল বাহিনীকে বিভিন্ন স্থানে পজিশন নিয়ে পাল্টা আক্রমণের জন্য তৈরী থাকতে বললাম। এদিকে পোর্ট থেকে সার্চলাইট চারদিকে নজর রাখা হচ্ছে কিছু সময় অপেক্ষা করার পর এক সুযোগ নেমে পড়ি চার ভাগে ভাগ হয়ে ৪টা জাহাজ ডুবানোর জন্য। আমার জাহাজটা ছিল একটু দুরে। ঐ জাহাজটাতে ছিল অনেক গোলাবারুদ তাতে কড়া পাহারা ছিল। কোন ছেলে ঐ জাহাজটাতে যেতে সাহস পেল না। আমি ৬জন সাহসী ছেলে সহ নিজে রওয়ানা দিলাম। এদিকে বাকী তিনটি জাহাজে ছেলেরা প্রায় পৌঁছে গেছে। আমি জাহাজের নিকট পোঁছা মাত্রই আমার উপর সার্চ লাইট এসে পড়ে। পাহারারত সান্ত্রী আমাকে দেখতে পেয়ে আমার দিকে গুলি চালায়। গুলিটি আমার বাম হাতের কুনুইয়ে লেগে যায়। তখন আমি আমার কোমর থেকে একটা গ্রেনেড বের করে দাত দিয়ে পিনটা খুলে ফেলি। গুলি করার সংগে সংগে আমি পানিতে ডুব দিয়েছিলাম। ফলে বাকী গুলি আমার আর লাগেনি। তখন উপর থেকে আমাদের উপর ডেপথ চার্জ করা হয়। এবং পাহারাদার চিৎকার করে বলতে থাকে ‘ক্যাপ্টেন সাহাব, ক্যাপ্টেন সাহাব, মুক্তি আ' রাহা হাঁয়’। আমি আমার গ্রেনেড জাহাজের উপর ছুড়ে মারি। সংগে সংগে জাহাজে আগুন ধরে যায়। এদিকে সার্চ লাইট লক্ষ্য করে আমার দল গুলি চালায়, ফলে সার্চলাইট বন্ধ হয়ে যায় আমার দুটি ছেলে ডেপথ চার্জের ফলে ভীষণভাবে আহত হয়। আমি তখন বাকী ৪জনসহ ডুব দিয়ে জাহাজের গায়ে মাইন লাগিয়ে দিই। তখন আমার মৃত্যুভয় চলে গেছে। মরার আগে আমি জাহাজকে ডুবিয়ে মরবো। গ্রেনেড মারার ফলে জাহাজে আগুন ধরে যাওয়ায় আমাদের উপর আর আক্রমন হয়নি। তদুপরি আমাদের স্থলবাহিনী ওপর থেকে পাল্টা আক্রমন চালাচ্ছিল। ভীষণ গোলাগুলি চলতে থাকে। পোর্টে ব্ল্যাক আউট ঘোষনা করে আমাদেরকে ধরার জন্য স্পীডবোট নিয়ে নদীর মধ্যে খোজাখুজি শুরু করে দেয় পাকসেনারা। আমি তখনও জাহাজের গা ধরে কচুরিপানা মাথায় দিয়ে জাহাজের নিচে অপেক্ষা করছিলাম। বেশিক্ষন অপেক্ষা করতে পারলাম না। কেননা, আমার নির্দিষ্ট সময় পার হয়েগেলে মাইন ফেটে যাবে। আমার মাইন এর সময় ছিল ৪৫মিনিট। এসময়ের মধ্যে ৫০০ গজ দূরে না যেতে পারলে মাইন এর শব্দে বুক ফেটে মারা যাবো। আর দেরী করা নিরাপদ নয় দেখে বাধ্য হয়ে ওখান থেকে আহত ছেলে দুটোকে সংগে করে রওয়ানা দিতে গিয়ে দেখি তারা তখনও মাইন লাগাতে পারেনি। ফিরে চেয়ে দেখি আমার সঙ্গী বাকি ৪জন আমাকে ছেড়ে চলে গেছে। আহত ছেলে দুটির অবস্থা এতবেশি খারাপ হয়ে গেছিল যে ডুব দিয়ে জাহাজের গায়ে মাইন লাগানোর মত ক্ষমতা ছিল না। তাড়াতাড়ি মাইন দুটি নিয়ে জাহাজের গায়ে লাগিয়ে দিই। এবং দুইজনকে আমার সংগে আমার বাহুতে এক হাত রেখে সাতার দিতে বলি। তারা এত দুর্বল ছিল যে, সাতারের ক্ষমতা তাদের রহিত হয়ে গিয়েছিল। আমারও বাম বাহু থেকে রক্ত বার হচ্ছিল। কিছুদূর সাতার কাটার পর আমিও ভীষণ পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ি। এমন সময় আমার দিকে একখানা স্পীডবোট আসতে দেখে ৩ জন মিলে ডুব দিই। স্রোত এত বেশী ছিল যে, ডুব দেওয়ার পর আমরা দলছাড়া হয়ে পড়ি। তখন ছেলে দুটি যে কোন দিকে চলে গেল দেখতে পেলাম না। স্পীডবোট উপর দিয়ে চলে গেলে আমি পানির উপর উঠে আর ওদের সাথী

হতে পারলাম না। তখন একই কুলে গিয়ে উঠি। তখনও উভয় পক্ষে ভীষন গোলাগুলি চলছে। খুব বেশী রক্ত ঝরাতে আমিও প্রায় অবশ হয়ে পড়ি। ছেলে দুটোকে রক্ষা করতে না পেরে মনের অজান্তে চোখ দিয়া অশ্রু গড়িয়ে পড়লো। বেশ কিছু সময় বিশ্রাম নেয়ার পর কোমরের গামছা ছিড়ে হাতে বাধন দিই, তাতে রক্ত ঝরা বন্ধ হয়ে যায়। ছেলে দুটোকে রক্ষা করতে না পেরে ভারাক্রান্ত মনে ওয়াপদা বাধ পার হয়ে আমার নির্দিষ্ট জায়াগার দিকে এগোতে থাকি। এমন সময় নদীর মধ্যে মাইন ফাটা আরম্ভ হয়ে গেছে। এস ও এস শব্দে সারা পোর্ট ধ্বনিত হয়ে উঠেছে।

শিবিরে ফেরার পর আমরা বেশ কয়েক দিনের জণ্য অবরুদ্ধ হয়ে পড়ি। তখন বনের পার্শ্ববর্তী নদীমুখ গানবোট দিয়ে পাকবাহিনী পাহারা দিতে আরম্ভ করেছিল। বেশ কয়েকটি গানের আমাদের চলার পথে বাধা সৃষ্টি করে। আমাদের ঐ সময় গোলাবারুদ প্রায় শেষ হয়ে আসে। এ সময় পাকিস্তানীরা ঘোষনা করে যে, মংলা বন্দরে কোন জাহাজ ৭২ মাইলের মধ্যে আসতে পারবে না। যে জাহাজগুলি ঐ সময় ছিল সেগুলিকেও সমুদ্রের মধ্যে চলে যেতে নির্দেশ দেয় পাক সরকার। তখন বন্দর খালি হয়ে যায়। ঐ সময় গানবোট ও প্রয়োজনীয় জাহাজ ছাড়া আর কোন জাহাজ বন্দরে ছিল না।

আমাদের তৎপরতায় মংলা বন্দরে জাহাজ চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। আমরাও প্রায় অবরুদ্ধ হয়ে পড়ি। তাছাড়া আমাদের গোলাবারুদ শেষ হয়ে যাওয়াতে অপারেশন একরূপ বন্ধ হয়ে যায়। এই অবস্থায়ও আমি পাক জাহাজ অর্থাৎ গানবোটের উপর আক্রমন চালানোর চেষ্টা করি, কিন্তু গোলাবারুদ কম থাকায় সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তবে আমরা কলাগাছে মাইন বেধে জোয়ারের সংগে ছেড়ে দিতাম। কিছু সময় পর জোয়ারের স্রোতের সংগে ভেসে গিয়ে মাইন নদীর মধ্যে ফেটে যেতো। এতে পাকসেনারা ভীষণভাবে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়তো। আমরা কচুরিপানা একত্র করে তাতে ডিলো পেন্সিল সেট করে জোয়ারের সংগে ভাসিয়ে দিতাম। কিছু সময় পর নদীর মধ্যে বন্দরের কাছে গিয়ে তাতে আগুন ধরে যেতো, এতে সারা নদীতেই আগুন ধরে যেত। এইভাবে আমরা পাকসেনাদের মনে প্যানিক সৃষ্টি করি।

আমাদের তৎপরতায় পাকসেনারা অতিষ্ট হয়ে আমাদের জোর অনুসন্ধান চালাতে আরম্ভ করে। হেলিকপ্টারযোগে বনের উপর দিয়ে ভয়ে ভয়ে আমাদের সন্ধান করতে থাকে। পরে আমাদের গোপন শিবির জানতে পেয়ে আমাদের উপর একদিন হঠাৎ বিমান আক্রমণ চালায়। এতে আমাদের বেশ কয়েকটি ছেলে আহত হয়। আমরা শিবির পরিবর্তন করে আরও গভীর বনের মধ্যে চলে যাই এবং নতুন শিবির স্থাপন করি। গোলাবারুদ শেষ হয়ে আসায় আমি এসময় রহমতউল্লাহ সাহেবকে শিবিরে রেখে আবার মেজর জলিলের নিকট চলে যাই গোলাবারুদ সংগ্রহ করার জন্য। আমাকে তখন কলিকাতায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আমি কলিকাতা চলে আসি। ৮নংথিয়েটার রোডে ওসমানী সাহেবের সঙ্গে আমাকে দেখা করিয়ে দেওয়া হয়। তখন ওসমানী সাহেব আমাকে আমাদের চৌধুরী সাহেব ও নজুরুলের সংগে মিলিয়ে দেন এবং আমাদেরকে শিবিরে অপেক্ষা করতে নির্দেশ দেন। আমি কয়েকদিন অপেক্ষা করার পর কল্যানী শিবিরে চলে আসি। ওখান থেকে আবার আমাদের পলাশী শিবিরে প্রেরন করা হয়। পলাশীতে এসে দেখতে পেলাম শিবিরে আমার জন্য ২০০ ছেলে অপেক্ষা করছে ফুলছড়িঘাট অপারেশন করার জন্য। আরও শুনতে পেলাম ফুলছড়িঘাটে আমার বন্ধু রকিব অপারেশন করতে গিয়ে মারা পড়েছেন। শুনতে পেলাম চলিত জাহাজে মাইন লাগাতে গিয়ে জাহাজের নিচে পড়ে তিনি মারা যান। রকিব আমার বিশিষ্ট বন্ধু ছিল। তার মৃত্যুতে আমার মনে ভীষণ আঘাত লাগলো। বেশ কয়েকদিন পর আবার আমি তৈরী হতে থাকি। এমন সময় এক সন্ধ্যায় শুনতে পেলাম পাক সরকার হিন্দুস্থানের সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা করে দিয়েছে।

স্বাঃ বদিউল আলম
১১-৬-৭৯

ON THE WATER FRONTS
SPECTACULAR ACHIEVEMENT

The recent successful guerilla action in the Bangladesh waters is being viewed by the observers as a new dimension to the gradually intensifying activities of the freedom fighters. Their most significant achievement has been the sinking of nine ocean-going ships in the waters of Bangladesh

On the night of August 16, the Liberation Forces sank six cargo ships consisting of two American, two Chinese, one Japanese and one Pak flags at Mongla port (Khulna) all of them were of medium size. These ships were carrying arms and ammunitions and other supplies for the Pakistan army.

On August 16, brave commandos carried out a daring operation inside the Chittagong port and blew up the Shipas Al Abbas and Formosa with the capacities of 15,000 tons and 12500 tons respectively. The ship Al Abbas was launched by Ayub Khan in 1968 A barge loaded with jute products was sunk by the guerillas the same day.

A report from the Liberation Forces Headquarters says that special groups of guerillas in a week of wide spread operations captured 23 steamers launchers and barges and sank or damaged eight River crafts in Sylhet Dacca, Chandpur and Chittagong.

On August 23, 1971 a gunboat was sunk in the satkhira area. On August 21, the Liberation Forces captured one launch carrying food stuff and other goods from Dacca to Sylhet in the Chandpur area. In Chandpur the Commandos carried out another successful operation and destroyed two steamers and one big barge with Cargoborder.

On August 15, the guerillas captured one cargo launch, four barges and 16 launches from the Sachna area of Sunamgonj.

Guerilla activities have completely blocked the approach of the Chittagong port at present. It is reported that Lt. General Tikka Khan came to Chittagong personally next day to assess the damage. Some senior naval officers in charge of the Chittagong port and all the sentries on duty at the port had been arrested following the success of guerilla fighters.

MARINE COMMANDOS VITAL BLOW

The Marine Commandos of Bangladesh have again struck a vital blow at the sagging morale of the occupation army. Following the sinking of a number of sips by the Bangladesh Navy men in August and September, the Pakistan army took extreme precautionary measures to keep the port areas immune from guerilla onslaughts. Unhindered by this, marine commandos have successfully crippled the Greek oil tanker 'Burmah Jade'. An A. P. report from Dacca (quoting official sources) says chat a series of

* গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার মুজিবনগর প্রকাশিত 'Bangladesh' পত্রিকা ২৫ আগষ্ট ৭১-সংখ্যার রিপোর্ট।
* গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার মুজিবনগর প্রকাশিত 'Bangladesh' পত্রিকার ১০ আগষ্ট ৭১-সংখ্যার রিপোর্ট।

Explosions in a Chittagong port jetty has caused a Pakistan oil tanker "Mahtab Javed" to capsize and sink on November 3. The report further says that the port officials charged the Bangladesh guerillas with being responsible for explosions. We accept this charged the Bangladesh guerillas with being responsible for explosions. We accept this charge gladly.

Some berths of the Chittagong port are now completely out of commission. These naval actions have produced a far reaching effect in so far as these to the enhancement of insurance rates in the London Insurance Market for cargoes sailing to and from Bangladesh.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২৩। বাংলাদেশ বিমানবাহিনী গঠন ও তার যুদ্ধ তৎপরতা	বাংলাদেশ একাডেমীর দলিলপত্র	১৯৭১

সাক্ষাৎকারঃ এয়ার ভাইস মার্শাল আবদুল করিম খোন্দকার*
১৮-১০-১৯৭৩

১৫ই মে সকালে আমার আগরতলাতে পৌঁছি। ১৬ই মে সকালে আমি কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা হই। কর্নেল ওসমানির সাথে আমার দেখা হয়। ১৯/২০শে মে দিল্লিতে যাই ভারতীয় বিমানবাহিনীর সাথে যোগাযোগ করার জন্য। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল বিমান সংগ্রহ করে একটি বিমানবাহিনী গঠন করা এব্যাপারে সম্ভাব্য ভারতীয় সাহায্যের জন্য আমার সাথে যারা ছিল তারাও ইতিমধ্যে দিল্লী পৌঁছে যায়। সেখানে ভারতীয় বিমানবাহিনীর কর্মকর্তাদের সাথে আমার বিস্তারিত আলোচনা হয়। আমরা আমাদের বক্তব্য পেশ করলাম। আলোচনা করে বুঝতে পারলাম যে, রাজনৈতিক এবং নানাবিধ কারণে তারা এখন আমাদেরকে বিমান দিয়ে সাহায্য করতে পারবে না। তবে সময় আসলে তারা আমাদেরকে সাহায্য করবে। তারা পাকিস্তান বিমান বাহিনী সম্বন্ধে অনেক গুরুত্বপূর্ণ গোপনীয় তথ্য জেনে নেয়।

মে মাসের শেষের দিকে আমরা কলকাতায় চলে আসলে। তারপর সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে আমরা স্থলযুদ্ধে অংশগ্রহন করব। এই সময় আমাকে ডেপুটি চীফ অফ স্টাফের দায়িত্ব দেয়া হয়।

মুক্তিবাহিনীর প্রশিক্ষণ এবং অপারেশনঃ বিমান বাহিনীর অন্যান্য অফিসারদের বিভিন্ন সেক্টরে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহনের জন্য পাঠিয়ে দেয়া হয়। মুক্তিবহিনীর জন্য রিক্রুটমেন্ট, ট্রেনিং এবং তাদেরকে বিভিন্ন সেক্টরে পাঠানো এসব দায়িত্ব আমার ছিল। অস্ত্রশস্ত্র যোগাড় করার দায়িত্বও আমার ছিল। অস্ত্রশস্ত্র যোগাড় কারার দায়িত্বও আমার ছিল। অস্ত্রশস্ত্র ও ট্রেনিংপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্ন সেক্টরের প্রয়োজনানুসারে দেয়া হত। বিদেশী কোন রাষ্ট্র থেকে আমরা সরাসরিভাবে কোন সাহায্য পেতাম না। ভারত সরকার থেকে আমরা অস্ত্রশস্ত্র পেতাম। কিছু অয়ারলেস সেট আমেরিকা থেকে বাঙ্গালীরা পাঠিয়েছিল।

প্রথমে প্রত্যেক মাসে ২/৩ হাজার মুক্তিযোদ্ধাকে গেরিলা প্রশিক্ষণ দেয়া হত। কিন্তু পরে প্রত্যেক মাসে ১০/১২ হাজার গেরিলাকে প্রশিক্ষণ দেয়া হত। শেষ পর্যন্ত প্রায় ১ লক্ষ ১ হাজার গেরিলাকে ট্রেনিং দেয়া হয়েছিল। প্রথমে প্রত্যেক গেরিলাকে এক মাসের ট্রেনিং দিয়ে ভিতরে পাঠানো হত। কিন্তু পরে ট্রেনিং-এর সময় কমিয়ে দু’’সপ্তাহ করা হয় যাতে করে বেশী লোককে ট্রেনিং দেয়া যেতে পারে। যখন দেখা গেল দু’’সপ্তাহের ট্রেনিং-এ গেরিলারা ভাল কাজ করতে পারছে না তখন এটা বাড়িয়ে তিন সপ্তাহ করা হল।

গেরিলা ট্রেনিং শেষ হবার পর গেরিলাদের প্রথমে ভারতীয় সেক্টর কমাণ্ডারের কাছে রিপোর্ট করতে হত। পরে ভারতীয় সেক্টর কমাণ্ডারদের সাথে আলাপ করে ঠিক করা হল যে গেরিলারা বাংলাদেশের সেক্টর কমাণ্ডারদের কাছে রিপোর্ট করবে।

ট্রেনিং শেষ হবার পর গেরিলাদেরকে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনমত অস্ত্র দিত না বা দিতে পারত না। অনেক সময় মাত্র একটা গ্রেনেড দিয়ে তাদেরকে অপারেশনের জন্য পাঠানো হত। এতে অনেক সময়ের অপচয় হয়েছে এবং অনেক গেরিলাকেও আমরা হারিয়েছি। পরে এ ব্যাপার নিয়ে ভারতীয় সামরিক কর্তৃপক্ষের সাথে আমাদের বিতর্ক হয়। অবশ্য পরে গেরিলাদেরকে অস্ত্র দেয়া হত।

* ১৯৭১-এর মার্চে গ্রুপ ক্যাপ্টেন হিসাবে কর্মরত ছিলেন।

গেরিলা বাহিনীতে স্কুল-কলেজের ছাত্র এবং যুবকরা বেশির ভাগ যোগ দিয়েছিল। ট্রেনিং শেষ করার পর প্রত্যেক সেক্টরে কতজন গেরিলা পাঠানো হবে তা হেডকোয়ার্টার থেকে নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছিল এবং অস্ত্রশস্ত্রের পরিমানও নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছিল। গেরিলা যুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায়ে গেরিলারা সুশৃংখলভাবে কাজ করছিল না। অবশ্য তার কারণও অনেক ছিল, যেমন- তারা অস্ত্রশস্ত্র পেত না, নেতৃত্ব ও সংগঠন ছিল না। পরে আমরা ভারতীয় গোয়েন্দা বিভাগের লোকজনসহ বসে ঠিক করে দিতাম কোথায় গেরিলা অপারেশন চালাতে হবে কখন চালাতে হবে এবং অপারেশনের পর আমাদেরকে তার বিশদ বিবরণ জানাতে হবে। প্রকৃতপক্ষে তখন থেকেই গেরিলা যুদ্ধ কার্যকরী হয়েছিল।

গেরিলা যুদ্ধের শক্তি বৃদ্ধির সাথে সাথে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে গ্রাম এলাকায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর চলাচল মারাত্নক বিপন্ন হয়ে উঠেছিল। কোথায় যে মুক্তিযোদ্ধারা আছে তাও তারা বলতে পারত না। সব সময় একটা ভয় তাদের মধ্যে ছিল। মুক্তিবাহিণীর এই সাফল্য পাকিস্তান সেনাবহিনীর বাংলাদেশে পরাজয়ের অন্যতম প্রধান কারণ।

প্রথম দিকে বিমান বাহিনীর সমস্ত পাইলট টেকনিশিয়ান স্থল যুদ্ধে অংশগ্রহন করেছিল। পরে স্থির করা হল একটা এয়ার ফোর্স ইউনিট গঠন করতে হবে। ভারতীয় বিমান বাহিনী আমাদেরকে একটা অটার, একটা অলওয়েট হেলিকপ্টার এবং একটা ডিসি-৩ ডাকোটা বিমান দিয়েছিল।

পাইলটের মধ্যে ছিল স্কোয়াড্রন সুলতান মাহমুদ, ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট বদরুল আলম, ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট শামসুল আলম, ক্যাপ্টেন মরহুম মালেক, ক্যাপ্টেন মরহুম শরফুদ্দিন, ক্যাপ্টেন সাত্তার, ক্যাপ্টেন মুকিত, ক্যাপ্টেন শাহাব, ক্যাপ্টেন আকরাম, এবং এয়ার ফোর্সের প্রায় ৭০ জন টেকনিশিয়ান। যেহেতু আমাদের কমসংখ্যক পাইলট এবং বিমান ছিল সেহেতু আমরা পরিকল্পনা নিলাম যে আমরা এমনভাবে অপারেশন চালাব যাতে করে আমাদের পাইলট বা বিমান না হারায় বা ক্ষয়ক্ষতি হয়। এই সমস্ত বিমান বোমা, রকেট এবং মেশিনগান দিয়ে সজ্জিত করা হয়। ২৮শে সেপ্টেম্বর ন্যাগাল্যান্ডের ডিমাপুরে বিমানবন্দরে এদেরকে একত্রিত করা হল। আমরা রাতে আক্রমন চালাব ঠিক করলাম। প্লেনগুলোকে মাটির ওপর ৩০০ ফুটের নিচে দিয়ে ফ্লাই করার সিদ্ধান্ত নেয়া হল। কেননা ৩০০ ফুটের নিচে উড়লে রাডার স্ক্রিনে তা ধরা পরে না।

কোন নেভিগেশন সাহায্য ছাড়াই আমরা রাতে ট্রেনিং শুরু করি। বনজঙ্গলের মধ্যে গাছের ঠিক উপর দিয়েই আমরা উড়তাম। নিকটবর্তী এক পাহাড়ের চুড়ায় সাদা প্যারাসুট ফেলে সেটাকে টারগেট করে মেশিনগান, রকেট, বোমা ছোড়া হত বা নিক্ষেপ করা হত। আমি নিজে বিমানে উঠে ট্রেনিংয়ে সাহায্য করতাম। সারারাত ধরে ট্রেনিং এর কাজ চলত। অল্পদিন পরেই বুঝতে পারলাম যে নিচু লেভেলে উড়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে গিয়ে আমরা কার্যকরভাবে অপারেশন চালাতে পারব।

৩রা ডিসেম্বর পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা করে। এই যুদ্ধ ঘোষনার আগে ভারতের মাটি থেকে আমরা যদি বিমান হামলা চালাতাম তাতে অনেক অসুবিধা ছিল। তাই ভারতের সাথে এ ব্যাপারে আমাদের একটা বোঝাপড়া হয়েছিল কখন আমরা আক্রমন চালাব। সবশেষে সেই সুযোগ আসল।

৩রা ডিসেম্বর রাত ড়ুটোর সময় একই সময়ে আমাদের বিমান চট্টগ্রাম বন্দরের নিকটবর্তী অয়েল ডাম্প এবং নারায়নগঞ্জের কাছে গোদানাইলে বিমান হামলা চালায় এবং এ হামলা খুব কার্যকরী হয়েছিল। এর পর থেকে আমরা বিমানে দিনের বেলাতেও আক্রমন চালাতাম। মুক্তিবাহিনী এবং ভারতীয় বাহিনীকে আমরা এয়ার সাপোর্ট দিয়েছি। এমন অনেক জায়গা ছিল যেগুলো ভারতীয় পাইলটরা চিনত না বা জনত না, সেখানে আমাদের পাইলটরা গিয়ে আক্রমন চালিয়েছে। যুদ্ধর অগ্রগতির সাথে সাথে বিশাল এলাকা মুক্ত হতে লাগল। প্রথমত মুক্তি এলাকাগুলোর প্রশানস সেক্টর কমাণ্ডারদের উপর ন্যস্ত করা হয়। আমরা বুঝতে পেরেছিলাম যে যুদ্ধ খুব সুন্দরভাবে চলছে। ১৪ই ডিসেম্বর পর্যন্ত আমরা বুঝলাম যে পাকিস্তান সেনাবাহিনী আত্নসমর্পণ করবে।

১৬ই ডিসেম্বর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ আমাকে ডেকে পাঠালেন। সেখানে তৎকালীন প্রসিডেন্ট সৈয়দ নজরুল ইসলাম, জনাব মনসুর আলী, খন্দকার মুশতাক সবাই উপস্থিত ছিলেন। আমাকে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে অত্মসমর্পন অনুষ্ঠানে যাবার জন্য বলা হয়। আমি ভারতীয় সামরিক বাহিনীর হেডকোয়ার্টারের সাথে যোগাযোগ করি। আমাকে দমদম বিমানবন্দরে যেতে বলা হয়। আমি কলকাতা দমদম বিমানবন্দরে গেলাম। সেখানে জেনারেল আরোরা, জেনারেল জেকব এবং ভারতীয় সামরিক বাহিনীর অনেক উচ্চপদস্থ অফিসার ছিল। আমরা বাংলাদেশের পথে প্রথমে আগরতলাতে আসলাম। সেখান থেকে হেলিকপ্টারে রওনা হলাম।

ঢাকা বিমানবন্দরে রানওয়ে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। রাস্তাঘাটে খুব বেশি লোকজন ছিল না। এ অবস্থা আমরা বিমানে বসে লক্ষ করছিলাম। বিমানবন্দরে খুব একটা ভিড় ছিল না। আমরা বিমান থেকে অবতরন করলাম। জেনারেল নিয়াজী আমাদেরকে সংবর্ধণা জানালেন।

আমরা বিমানবন্দর থেকে সোজা রেসকোর্সের মাঠে গেলাম। সেখানেও আস্তে আস্তে লোকের ভিড় হচ্ছিল। ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু যেখান থেকে ভাষন দিয়েছিলেন সেখানে আত্মসমর্পন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। জনগন আনন্দে উল্লাসে ফেটে পড়েছিল। তারা জেনারেল আরোরাকে কাঁধের উপর উঠিয়ে নেয় এবং বিজয়োল্লাসে মেতে ওঠে। জেনারেল নিয়াজীকে খুব বিমর্ষ দেখা হচ্ছিল।

ভারতীয় সরকার এবং জনগন আমাদের মুক্তিযুদ্ধে অভূতপূর্ব সাহায্য এবং সহযোগিতা করেছেন। ভারতকে সবসময় অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষন করতে হয়েছে। বিশ্ব জনমতের প্রতিক্রিয়া কি, সেটাও লক্ষ্য রাখতে হয়েছে। তাদেরকে অনেক অনেক ভেবেচিন্তে আমাদের মুক্তিসংগ্রামে সাহায্য করতে হয়েছে।

আমি বলতে চাই তারা আবেগের বশবর্তী হয়ে কেনা কিছু করেনি। অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পরিস্থিতিকে পর্যবেক্ষন করেছে এবং ধীরে ধীরে এগিয়ে গেছে। রাজনৈতিক কুটনৈতিক এবং সামরিক দিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে তারা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সবকিছু করেছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী বিশ্বের বিভিন্নদেশ সফর করে বিশ্ব নেতৃবৃন্দকে উপমহাদেশের ঘটনাবলী অবহিত করেছিলেন। আমার মনে হয় ভারত যুদ্ধের জণ্য প্রথমে প্রস্ত্তত ছিলনা। কিন্তু বিভিন্ন দেশ সফর করার পর হয়ত ভারত যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।

ভারত প্রথমে আমাদেরকে স্বীকৃতিও দেয়নি। কারণ, যদি ভারত আমাদের প্রথমে স্বীকৃতি দিত তাহলে হয়ত বিশ্বজনমত যুদ্ধের জন্য ভারতকে দোষারোপ করত। অবশ্য ভারতীয় সেনাবহিনীর কিছু কিছু অফিসারের কার্যকলাপ জনসাধারনের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করেছে। যুদ্ধে ভারতের জয়ের তিনটি প্রধান কারণ ছিলঃ ১। মুক্তিযোদ্ধারা অপারেশন চালিয়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর যাতায়াত ব্যবস্থাকে পর্যুদস্ত করে দিয়েছিল। সেনাবাহিনীর চলাচলে কোন নিরাপত্তা ছিল না। তাদেরকে সব জায়গায় প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। ২। ভারতীয় বিমান বাহিনীর অভূতপূর্ব সাফল্য যুদ্ধের মোড় ঘুড়িয়ে দিয়েছিল। বিমান বহিনীর আক্রমণে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সব জায়গা থেকে পিছু হটতে বাধ্য হয়। ভারতীয় সেনাবাহিনী আমাদের সাহায্যে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সমস্ত গোপনীয় তথ্য জেনে নেয়।

স্বাক্ষরঃ আবদুল করিম খন্দকার
১৮-১০-১৯৭৩

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২৪। বিভিন্ন সেক্টরে চিকিৎসা তৎপরতা	বাংলাদেশ একাডেমীর দলিলপত্র	১৯৭১

সাক্ষাৎকারঃ কর্নেল মোহাম্মাদ শামসুল হক
১৭-৯-১৯৭৩

৩রা মে আমি ঢাকা ত্যাগ করি এবং দেশের বাড়িতে যাই (মতলব থানা কুমিল্লা জেলা)। ওখানে আমরা স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের নিয়ে এক সংক্ষিপ্ত রাইফেল ট্রেনিংয়ের ব্যাবস্থা করি। ওখান থেকে আমি লোক পাঠালাম আগরতলায়। মেসেঞ্জার এসে খবর দিল যে, সেখানে মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসার জন্য ডাক্তারের খুবই প্রয়োজন।

আমি আমার পরিবারকে গ্রামে রেখে মে মাসের দ্বিতীয় আগরতলার উদ্দেশ্যে রওনা হই। আগরতলায় পৌঁছে বাংলাদেশের অফিস কৃষ্ণনগরে আমার উপস্থিতি জানাই। ঐ দিন সন্ধ্যায় মেজর জিয়াউর রহমানের সাথে আমার দেখা হয়। ঐ দিন রাত জিয়াউর রহমানের সাথে ১নং সেক্টরের হরিনাতে যাই এবং ১ নং সেক্টরের মেডিকেল অফিসারের দায়িত্ব গ্রহণ করি। ১নং সেক্টরের বিভিন্ন সাব সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করি। কিছু ছেলেদের ফার্স্ট এইড ট্রেনিং দিই। তারপর আমাকে আগরতলায় নিয়ে আসা হয়। এবং ইস্টার্ন সেক্টরের মেডিকেল সার্ভিসেস এর সহকারী পরিচালকের দায়িত্ব দেয়া হয়। নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে আমাকে মুজিবনগরে ডাইরেক্টর জেনারেল, মেডিকেল সার্ভিসেস, বাংলাদেশ ফোর্স এর দায়িত্ব দেয়া হয়। আমার দায়িত্ব ছিল ১০টি সেক্টরে এবং তিনটি ব্রিগেড মেডিকেল অফিসার নার্সিং ও ঔষধপত্র প্রভৃতি পাঠানো। ভারতের বিভিন্ন সমাজসেবামূলক সংগঠন এবং ভারতীয় সেনাবাহিনী থেকে ঔষধপত্র পেতাম।

আমাদের বিশ্রামগঞ্জে একটি বাংলাদেশ হাসপাতাল ছিল। এখানে প্রায় ২৮০টি বেড ছিল। বাকি সমস্ত সেক্টরে এবং সাব সেক্টরে অগ্রবর্তী ড্রেসিং স্টেশন প্রতিষ্টা করা হয়। এ সকল প্রতিষ্টানের কাজ ছিল আহত এবং অসুস্ত মুক্তিযোদ্ধাদের প্রয়োজনীয় জীবন রক্ষাকারী চিকিৎসা করে তাদের ভারতীয় সেনাবাহিনীর ফিল্ড হাসপাতাল অথবা বেসামরিক হাসাপাতালে পাঠিয়ে দেয়া। এ ব্যাপারে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ফিল্ড হাসপাতাল এবং বেসামরিক হাসপাতালগুলো আমাদের পুরোপুরি সাহায্য করেছে।

বাংলাদেশ ফোর্সের হাসপাতাল যেটা বিশ্রামগঞ্জে ছিল সেই হসপিটাল প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে লন্ডনের বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশন ঔষধপত্র যন্ত্রপাতি টাকা পয়সা এবং ডাক্তার দিয়েও সাহায্য করেছেন। ডাক্তার জাফর উল্লাহ চৌধুরী, ডাক্তার মোমেনের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ডিসেম্বরে পাক-ভারত যুদ্ধ শুরু হওয়ায় আমাদের মনোবল বেড়ে গেল। আমরা বুঝতে পারলাম যে, কিছু দিনের মধ্যে আমাদের বাংলাদেশের ভিতরে যেতে হবে। তাই প্রত্যেক সেক্টরে নির্দেশ দিয়ে দিলাম মেডিকেল অফিসার এবং স্টাফদের তারা যেন ঔষধপত্র যন্ত্রপাতি সবকিছু নিয়ে প্রত্যেক সেক্টরের নিকটবর্তী সি-এম-এইচ এ রিপোর্ট করে।

পাকিস্তান সেনাবাহিনী আত্নসমর্পনের পূর্বে বাংলাদেশের সমস্ত সি-এম এইচগুলোর (ঢাকা, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, রংপুর, যশোর) তোষক, কম্বল প্রভৃতি সব পুড়িয়ে দিয়ে যায়।

বাংলাদেশে আসার পর বিভিন্ন এলাকার পাকিস্তান সেনাবাহিনী কর্তৃপক্ষ পরিত্যক্ত ঔষধপত্র ও অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী আমরা সংগ্রহ করি।

বিভিন্ন সেক্টরে সামরিক বাহিনীর মোট দশজন ডাক্তার ছিলেন। বাংলাদেশের বিভিন্ন মেডিকেল কলেজের যে সমস্ত ছাত্র ভারতে গিয়েছিল তাদের মধ্য থেকে বিভিন্ন সেক্টরে এবং সাবসেক্টরে মেডিকেল এ্যাসিট্যান্ট নিয়োগ করা হয়। প্রত্যেকটা সেক্টরে অন্ততপক্ষে যদি একজন করে সামরিক বাহিনীর ডাক্তার থাকত তাহলে মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা আরো সুষ্ঠুভাবে হত।

স্বাক্ষরঃ মোহাম্মদ শামসুল হক
কর্নেল
১৭-৯-৭৩

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২৪। বিভিন্ন সেক্টরে চিকিৎসা যোগাযোগের তৎপরতা	বাংলাদেশ একাডেমীর দলিলপত্র	১৯৭১

সাক্ষাৎকারঃ মেজর এম, এইচ, বাহার
২০-০১-৭৪

আগরতলা থেকে আমি রামগড়ে চলে আসি। সেখানে তখন মেজর জিয়ার নেতৃত্বে শুভপুর পুলের কাছে যুদ্ধ চলছিল। আমি যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু যন্ত্রপাতি এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লোকের অভাবে সেটা সম্ভবপর হয়নি। আমি আবার আগরতলাতে চলে আসি। সেখানে আমাদের সিগনালের কিছু লোক একত্রিত হয়েছিল। সেখানে তাদের জন্য একটা ক্যাম্প স্থাপন করা হয়। এই ব্যাপারে বি-এস-এফ-এর কর্নেল বানার্জী আমাকে অনেক সাহায্য করেছিলেন। সেখানে আমি সেনাবাহিনী, বিমানবাহিনী, নৌবাহিনী, ইপি আর এবং পুলিশের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লোকের সাহায্য আগরতলা থেকে চারটি সেক্টরের সাথে রামগড়, মেলাঘর, তেলিয়াপাড়া এবং করিমগঞ্জে বেতার যোগাযোগ স্থাপন করি। সেক্টর থেকে সাবসেক্টর পর্যন্ত বেতার ও লাইন যোগাযোগের বন্দোবস্ত করা হয়।

আগরতলা থেকে আমি জুলাই মাসে কলিকাতার ৮নং থিয়েটার রোডে অবস্থিত মুজিবনগরে চলে যাই পশ্চিম দিকে যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য। কর্নেল ওসমানী আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। তখন বিদেশ থেকে আমেরিকা, বৃটেন, ডুবাই এই সমস্ত দেশে অবস্থানরত প্রবাসী বাঙ্গালীরা উন্নত মানের যোগাযোগ ব্যবস্থার যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করে মুজিবনগরে পাঠাতে শুরু করেন। এই সমস্ত যন্ত্রপাতি আমাদের অনেক কাজে এসেছিল।

মুজিবনগরে স্থানাভাব হেতু আমি আমার লোকজন, যন্ত্রপাতি নিয়ে ৮নং সেক্টর হেডকোয়ার্টার কল্যাণী (নদীয়া জেলা) চলে গেলাম। ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ঐখান থেকে আমি কাজ চালিয়েছি।

স্বাক্ষরঃ এম,এইচ, বাহার
মেজর
২০-১-৭৪

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২৬। চূড়ান্ত পযায়ে সংঘটিত যুদ্ধের বিবরণ	....	১৯৭১

চূড়ান্ত যুদ্ধে মুক্তিবাহিনী

১৯৭১ সালের নভেম্বর মাসের শেষের দিকে প্রতিটি সেক্টর এলাকায় মুক্তিযোদ্ধাদের সাহস, ক্ষিপ্রতা ও অবশ্যম্ভাবী বিজয় দেখে পাকিস্তানী বাহিনী দিশেহারা হয়ে পড়ে। সীমান্ত অঞ্চলে বিরাট এলাকা মুক্তিবাহিনী দখল করে নেয়। সারাদেশে গেরিলা তৎপরতা এতো বৃদ্ধি পায় যে পাকসেনারা আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং তাদের মনোবল সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়ে।

পরিস্থিতি ক্রমশঃ পাকিস্তানী ও ভারতের মধ্যে সর্বাত্মক যুদ্ধের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলো। প্রায় এক কোটি শরণার্থী ভারতে আশ্রয় নেয়ার জন্য ভারতের অর্থনীতিতে প্রবল চাপ সৃষ্টি হয়। ভারত বৃহৎ শক্তিবর্গকে একটি রাজনৈতিক সমাধানের জন্য বারবার অনুরোধ জানানোর জন্য কোনো ফলপ্রসূ সমাধানে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। বিবিসির সাথে ২ আগস্ট এক সাক্ষাৎকারে ইয়াহিয়া খান ঘোষণা করেন,"পূর্ব পাকিস্তানী ও ভারতের সীমান্ত বরাবর সংঘর্ষ অব্যাহত থাকলে তা ভয়াবহ যুদ্ধে পরিণত হতে পারে।" আমেরিকান টেলিভিশন সংস্থার সাথে এক সাক্ষাৎকারে ১১ আগস্ট ইয়াহিয়া খান বলেন, "দুটো দেশই এখন যুদ্ধের খুব কাছাকাছি এসে পড়েছে। আমি হুঁশিয়ার করে দিতে চাই যে, পাকিস্তানকে রক্ষার জন্য আমরা যুদ্ধ করবো।"

ইয়াহিয়া খান প্যারিস থেকে প্রকাশিত 'লা ফিগারো' পত্রিকার সাথে এক সাক্ষাৎকারে ১ সেপ্টেম্বর বলেন, 'আমি এই মর্মে সমগ্র বিশ্বকে হুঁশিয়ার করে দিতে চাই যে তারা যদি মনে করে বিনা যুদ্ধে তারা এক বিন্দু জমি দখল করতে পারবে তবে তারা মারাত্মক ভুল করছে। এর অর্থই হবে সর্বাত্মক যুদ্ধ।' পূর্বাঞ্চলীয় কমাণ্ডার অধিনায়ক লেঃ জেঃ এ, এ, কে, নিয়াজী ৭ই অক্টোবর পাকিস্তান টাইমস-এ প্রকাশিত এক ঘোষণার বলেন, 'যদি ভারত পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ চায়, তাহলে সে যুদ্ধ হবে ভারতের ঘাঁটিতে।'

পাকিস্তানী সমরনায়কদের এসব বল্গাহীন বক্তব্যে এটা পরিষ্কার হয়ে উঠেছিলো যে ভারত ও পাকিস্তান সর্বাত্মক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে পারে। এমন একটি সর্বাত্মক পাকিস্তান চীন ও আমেরিকার সরাসরি হস্তক্ষেপ আশা করেছিলো। অবশেষে ইয়াহিয়া ২৫ নভেম্বর আমেরিকান সংবাদ সংস্থা এসোসিয়েটেড প্রেসের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে ঘোষণা করলেন 'আগামী দশদিন পরে আমাকে এই রাওয়ালপিন্ডিতে বসে থাকতে দেখবেন না। আমি তখন সীমান্তে যুদ্ধ করবো।' ইয়াহিয়া খান তার কথা অক্ষরে-অক্ষরে পালন করলেন। পাকিস্তান বিমান বাহিনী ৩ ডিসেম্বর বিকেল পৌনে ছ'টার সময় অমৃতসর, পাঠানকোট, শ্রীনগর, যোধপুর ও আগ্রার বিমানবন্দরগুলোতে অঘোষিত বোমার্ষণ করে সর্বাত্মক যুদ্ধের সূচনা করলো।

স্মরণাতীতকালের ইতিহাসে এই প্রথম একটি আক্রমণকারী দল অতিসহজেই বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়তে সক্ষম হয়। এর কারণ, সমগ্র দেশবাসী আক্রমণকারীদলকে শুধু অভ্যর্থনাই জানায়নি অত্যাচারী হানাদার বাহিনীর পরাজয়ের জন্য তারা আক্রমণকারীদলকে সর্বপ্রকার সাহায্য করেছে।

বাংলাদেশ অসংখ্য নদী-নালার দেশ। আক্রমণকারীকে বিলম্বিত ও প্রতিহত করার জন্য নদী-নালা অত্যন্ত অসুবিধাজনকভাবে ব্যবহার করা যায়। কয়েকটি নদী খুবই বিশাল। পাকা রাস্তা দিয়ে এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চল যেতে হলে অসংখ্য নদী অতিক্রম করতে হবে। এই বিশাল নদীগুলো সমগ্র দেশকে কয়েকটি ভৌগোলিক

'রোববার'-স্বাধীনতা দিবস সংখ্যা ১৯৮৩-তে প্রকাশিত মেজর (অবঃ) রফিকুল ইসলাম, পিএসসি-রচিত প্রতিবেদন থেকে সংকলিত।

এলাকায় বিভক্ত করেছে। রাস্তার উপরে ব্রীজগুলো ভেঙ্গে দিলে আক্রমণকারীকে বিরাট সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। এছাড়া বিরাট এলাকা ক্রমাগতভাবে নিচু ও জলাধারে পূর্ণ। এই সমস্ত এলাকায় ভারি অস্ত্রসহ অগ্রসর হওয়া দুঃসাধ্য ব্যাপার।

যুদ্ধ-কৌশল অনুযায়ী পশ্চিম ও উত্তর দিক থেকে আক্রমণের সম্ভাবনা ছিলো সব চাইতে বেশি, কারণ সমস্ত পাকা রাস্তা উত্তর ও পশ্চিম দিক থেকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ঢুকেছে এবং বড় বড় নদীগুলো উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত। তাছাড়া পশ্চিম ও উত্তরাঞ্চলে ভারতীয় বাহিনী যুদ্ধের সম্ভার ও যোগাগোগ ব্যবস্থা সুদৃঢ় করেছিলো।

মেঘালয় সীমান্ত থেকে অপেক্ষাকৃত শক্ত মাটির জন্য সৈন্য চলাচল সম্ভব ছিলো। কিন্তু গৌহাটি থেকে শিলং পর্যন্ত একটি মাত্র পাকা রাস্তা এবং তারপরই পাহাড়ী এলাকা দিয়ে সীমান্ত আসার পথ। এই এলাকায় বড় ধরনের সামরিক অভিযান সম্ভব ছিলো না বলেই সৈন্য সমাবেশ ছিলো সীমিত।

ত্রিপুরা ও শিলচর এলাকায় গোলাবারুদ ও রসদসম্ভার পর্যাপ্ত মজুত করা হয়নি। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা থেকে ধর্মনগর পর্যন্ত রেল লাইন বিস্তৃত। তারপর একটি মাত্র রাস্তা ধরে দক্ষিণ দিকে আগরতলা পর্যন্ত আসা যায়। পরিষ্কারভাবে অনুমান করা যায় যে এখানে বড় ধরনের অভিযান সম্ভব ছিলো না। অক্টোবরের শেষের দিকে অবশ্য পাকিস্তানীদের ভারতীয় সৈন্য সমাবেশের কথা জানতে পারে।

যেভাবেই হোক ভারতীয় বাহিনীকে সীমান্ত এলাকায় বাধা দিয়ে বিলম্ব ঘটানোই ছিলো নিয়াজীর পরিকল্পনা। সীমান্তে সব ক'টি পাকা রাস্তার উপরে শক্ত প্রতিরক্ষাব্যূহ রচনা করে অগ্রসরমান সম্মিলিত বাহিনীকে প্রতিহত করাই ছিলো এর উদ্দেশ্য। ১৪০০ মাইল বিস্তৃত সীমান্ত এলাকায় শক্ত-ঘাঁটি, প্রচুর গালাবারুদ এবং রসদপত্র সরবরাহ নিশ্চিত করে নিয়াজী অনির্দিষ্টকালের জন্য সম্মিলিত বাহিনীকে বিলম্বিত করতে চাইলেন।

অন্যদিকে সম্মিলিত বাহিনী এইসব শক্ত প্রতিরক্ষা অবস্থানগুলো এড়িয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করে। প্রথম লক্ষ্য ছিলো ক্ষিপ্রতা ও গতি। বিদ্যুৎ গতিতে খুব কম সময়ের মধ্যে যুদ্ধ শেষ করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ সীমান্তের সবদিক দিয়ে আক্রমণ পরিচালনা করে পাকসেনাদের ছড়িয়ে পড়তে বাধ্য করা। তৃতীয়তঃ ছড়িয়ে পড়া পাকবাহিনী যেন একত্রিত হয়ে পদ্মা ও মেঘনার মাঝামাঝি এলাকায় সৈন্য সমাবেশ না করতে পারে তা নিশ্চিত করা। চতুর্থতঃ পাকা রাস্তা বাদ দিয়ে কাঁচা রাস্তা দিয়ে অগ্রসর হয়ে পাকিস্তানী প্রতিরক্ষা ব্যূহকে এড়িয়ে যাওয়া। পঞ্চমতঃ মনস্তাত্ত্বিকভাবে যুদ্ধ চালিয়ে পাকিস্তানী বাহিনীর মনোবল ভেঙ্গে দিতে হবে-যাতে তারা যুদ্ধ না করে আত্মসমর্পণ করে।

পাকিস্তানী সমরনায়করা সম্ভবত ভেবেছিলেন ভারত সরকারকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য শুধুমাত্র সীমান্ত এলাকায় কয়েকটি জেলা বা মহকুমা শহর দখল করেই ক্ষান্ত হবে। সম্ভবত এই কারণেই তারা সীমান্ত এলাকায় শক্ত প্রতিরক্ষার পরিকল্পনা করেন। পাকিস্তানী জেনারেলরা যুদ্ধের গতি ও পরিণত সম্পর্কে উপলব্ধি করতে সক্ষম হননি। ফলে, ঢাকা রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীয় বাধা দিতে ব্যর্থ হয় পাকবাহিনী। বড় ধরনের যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই পলায়নপর পাকসেনারা আত্মসমর্পণ করে।

পাকিস্তানীদের সৈন্য সমাবেশ ছিল নিম্নরূপঃ

যশোর এলাকাঃ নবম ডিভিশন জেনারেল আনসারীর নেতৃত্বে যশোর এলাকায় মোতায়েন করা হয়। ১০৭ ব্রিগেড যশোরে এবং ৫৭ ব্রিগেড ঝিনাইদহে অবস্থিত ছিলো। এছাড়া ২টি ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারী ও একটি রেকি এবং সাপোর্ট ব্যাটালিয়ন ছিলো।

উত্তর বাংলাঃ মেজর জেনারেল নজর হোসেন শাহের নেতৃত্বে ১৬ ডিভিশনকে উত্তর বাংলা রক্ষার দায়িত্ব দেয়া হয়। ১৬ ডিভিশনের সদর দফতরে নাটোরে অবস্থিত ছিলো। ২৩ ব্রিগেড রংপুরে এবং ২০৫ ব্রিগেড বগুড়া

এলাকায় মোতায়েন করা হয়। একটি ফিল্ড রেজিমেণ্ট আর্টিলারী, ২টি মর্টার ব্যাটালিয়ন, একটি রেকি ও সাপোর্ট ব্যাটালিয়ন এবং একটি আমার্ড রেজিমেণ্ট ছিলো।

পূর্ব এলাকাঃ মেজর জেনারেল আবদুল মজিদ কাজীর নেতৃত্বে চতুর্দশ ডিভিশনকে পূর্বাঞ্চল রক্ষার দায়িত্ব দেয়া হয়। পরে মেজর জেনারেল জামসেদের নেতৃত্বে ৩৬ ডিভিশন ঢাকায় ও মেজর জেনারেল রহিমের নেতৃত্বে ৩৯ ডিভিশন চাঁদপুরে গড়ে তোলা হয়। অবশ্য এই দু'টি ডিভিশন কোনক্রমেই পাকশক্তি বৃদ্ধিতে সাহায্য করেনি, কারণ বিভিন্ন ইউনিট পুনর্বিন্যাস করেই এই ডিভিশন দু'টি গড়ে তোলা হয়। ১১৭ ব্রিগেড কুমিল্লায়, ২৭ ব্রিগেড ময়মনসিংহ ও ২১২ ব্রিগেড সিলেটে মোতায়েন করা হয়। সিলেটে একটি ফিল্ড রেজিমেণ্ট আর্টিলারী ও দুইটি মর্টার ব্যাটারী ও মাত্র চারটি ট্যাংক ছিলো।

চট্টগ্রাম এলাকাঃ চট্টগ্রামে ৯৩ ইণ্ডিপেডেণ্ড ব্রিগেড অবস্থিত ছিলো যার অধিনায়ক ছিলেন ব্রিগেডিয়ার আতাউল্লা।

অপর দিকে ভারতীয় ইস্টার্ন কমাণ্ডার অধিনায়ক লেঃ জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার অধীনে ছিলো তিনটি নিয়মিত কোর, একটি কমিউনিকেশন জোন ও প্রায় এক লাখ মুক্তিযোদ্ধা সমন্বিত ১১টি সেক্টর।

দ্বিতীয় কোরঃ কৃষ্ণনগরে ছিলো দ্বিতীয় কোরের সদর দপ্তর। লেঃ জেনারেল টি, এন, রায়না ছিলেন কোর কমাণ্ডার। এতে ছিলো নবম ও চতুর্থ পাবর্ত্য ডিভিশন। এছাড়া ছিলো টি-৫৫ (রাশিয়ান) ট্যাংক সমন্বয়ে গঠিত একটি মাঝারি আমার্ড রেজিমেন্ট, একটি পিটি-৭৬ (রাশিয়ান) ট্যাংকসজ্জিত একটি হালকা ট্যাংক রেজিমেণ্ট, ১৩০ মিলিমিটার (রাশিয়ান) একটি মাঝারি গোলন্দাজ ইউনিট ও ব্রিজিং ইউনিট।

তেত্রিশ কোরঃ তেত্রিশ কোরের সদর দপ্তর ছিলো শিলিগুড়িতে। লেঃ জেনারেল এম, এল, থাপান ছিলেন এই কোরের কমাণ্ডার। ৬ পার্বত্য ডিভিশন ও ২টি ব্রিগেড নিয়ে এই কোর গঠিত হয়। এছাড়া পিটি-৭৬ (রাশিয়ান) ট্যাংক সমন্বয়ে একটি হালকা আমার্ড রেজিমেন্ট, একটি মাঝারি গোলন্দাজ রেজিমেণ্ট (বৃটিশ৫.৫") ও একটি ইঞ্জিনিয়ার ব্রিজিং ইউনিট ছিলো।

চতুর্থ কোরঃ চতুর্থ কোরের সদর দপ্তর ছিলো আগরতলায়। লেঃ জেনারেল সাগত সিং এই কোরের কমাণ্ডার ছিলেন। অষ্টম, সাতান্ন ও তেইশ পার্বত্য ডিভিশন নিয়ে এই কোর গঠিত হয়। এছাড়া দুই স্কোয়াড্রন পিটি-৭৬ট্যাংক ও একটি মাঝারি গোলন্দাজ রেজিমেণ্ট (বৃটিশ ৫.৫") ছিলো।

১০১ কমিউনিকেশন জোনঃ ১০১ কমিউনিকেশন জোনের সদর দপ্তর ছিলো গৌহাটিতে। মেজর জেনারেল জি, এস, গিল ছিলেন এর কমাণ্ডার। যুদ্ধে জেনারেল গিল আহত হলে মেজর জেনারেল নাগরা কমাণ্ডার নিযুক্ত হন। একটি পদাতিক ব্রিগেডের সমান ছিলো এর আকার ও শক্তি। এছাড়া সমস্ত সীমান্ত এলাকা জুড়ে ছিলো মুক্তিবাহিনীর ১১টি সেক্টর।

দ্বিতীয় কোর ফ্রন্টে জেনারেল রায়নার কমাণ্ডে দুই ডিভিশন সৈন্য মধুমতি নদীর দিকে ধাবিত হয়। পদ্মা থেকে শাখা নদী মধুমতি দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়ে সুন্দরবন এলাকায় পতিত হয়েছে। এই ফ্রন্টের দায়িত্ব ছিলো পদ্মার পশ্চিম তীরবর্তী সমস্ত এলাকা মুক্ত করা। দ্বিতীয় কোর কমাণ্ডার পাকিস্তানী শক্ত প্রতিরক্ষার উপরে আক্রমণ অব্যাহত রেখে দ্রুতগতিতে একাধিক দলে মধুমতির দিকে অগ্রসর হওয়ায় পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

একটি দল কুষ্টিয়ার দিকে, অন্য একটি মাগুরা হয়ে যশোর বরাবর এবং অপর একটি দল খুলনা ও বরিশালের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। খুলনা-যশোর-কুষ্টিয়া রেলওয়ে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়। আট নম্বর সেক্টর কমাণ্ডার লেঃ কর্নেল মনজুরের নেতৃত্বে আগেই মুক্তিবাহিনী চৌগাছা দখল করে। ২৪ নভেম্বর সংঘটিত চৌগাছা যুদ্ধে পাকসেনারা ৪টি শাফি ট্যাংক হারায়। একটি ভারতীয় ব্রিগেড ধানক্ষেতের মধ্য দিয়ে যাত্রা শুরু

করে। একইভাবে কুষ্টিয়ার পথে দর্শনা আক্রমণ করা হয়। আট নম্বর সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধারা ডিসেম্বরের তিন তারিখে সিংহঝুলিতে পৌঁছায়। ঝিকরগাছার পতন হয় ডিসেম্বরের পাঁচ তারিখে। তারপর তিনদলে বিভক্ত হয়ে যশোর আক্রমণ করা হয়। উত্তরে দিকের দলটি যশোর-ঝিনাইদহ সড়ক ধরে আক্রমণ অব্যাহত রাকে। মধ্যবর্তী দলটি ধানক্ষেতের ভিতর দিয়ে চিতের বিল এলাকা দিয়ে অগ্রসর হয়। দক্ষিণ দিকে বেনাপোল-যশোর সড়কে অগ্রসর হয় অপর একটি দল।

ডিসেম্বর পাঁচ তারিখে কোটচাঁদপুরে যশোর-কুষ্টিয়া রেলওয়ে জংশন দখল করে রেলওয়ে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়। অগ্রসরমান এই দলটি উত্তর দিকে ধাবিত হয় এবং ৭ ডিসেম্বর আরও ৩০ মাইল অগ্রসর হয়ে ঝিনাইদহ দখল করে। ঝিনাইদহ যুদ্ধে মেজর মুস্তাফিজ আহত হন।

লেঃ জেনারেল নিয়াজী ৫ ডিসেম্বর রাত পাকবাহিনীকে পেছনে সরে আসতে নির্দেশ দেন। সম্ভবত ঢাকার পথে পেছনে এসে মেঘনার তীরে সৈন্য সমাবেশ করে ঢাকা রক্ষা করার পরিকল্পনা ছিলো। কিন্তু তা আর সম্ভব ছিলো না, কারণ যশোর-ঢাকা সড়ক মিত্রবাহিনীর দখলে চলে গেছে। মধুমতি অতিক্রম করে মিত্রবাহিনীর একটি দল খুলনার দিকে এবং অপর একটি দল কুষ্টিয়ার দিকে অভিযান অব্যাহত রাখে। পাকিস্তানী নবম ডিভিশন যশোর সেনানিবাস ছেড়ে মাগুরার দিকে চলে যায়। ৬ ডিসেম্বর যশোর মুক্ত হয়। পরবর্তীকালে মেহেরপুর দখলের পর চুয়াডাঙ্গা ও কুষ্টিয়ার দিকে যাত্রা অব্যাহত থাকে।

ডিসেম্বর ১২ তারিখে ফরিদপুরের ভাটিয়াপাড়ার মুক্তিবাহিনীর সাথে পাকসেনাদের সংঘর্ষ হয়। লেঃ সিদ্দিক ও ক্যাপ্টেন হুদা এই যুদ্ধে নেতৃত্ব দেন। লেঃ সিদ্দিকী ১৪ ডিসেম্বর এই যুদ্ধে একটি চোখ হারান। মুক্তিবাহিনী আক্রমণ প্রচণ্ড রূপ ধারণ করে এবং ১৮ ডিসেম্বর ১৫০ জন পাকসেনা আত্মসমর্পণ করে।

মেজর জলিলের নেতৃত্বে নয় নম্বর সেক্টরের মুক্তিবাহিনী বীর বিক্রমে অগ্রসর হচ্ছিলো। ৩ ডিসেম্বর সাতক্ষীরা শত্রুমুক্ত হয়। ১০ ডিসেম্বর মিত্র ও মুক্তিবাহিনী খুলনা দখল করে। ৭ ডিসেম্বর বরিশাল মুক্ত হয় এবং পাকসেনারা ক্যাপ্টেন বেগ ও নূরুল ইসলাম মঞ্জুর কাছে আত্মসমর্পণ করে। ১৭ ডিসেম্বর পাকবাহিনীর ব্রিগেডিয়ার হায়াত তার সৈন্যসামন্তসহ আত্মসমর্পণ করে।

৩৩ কোর ফ্রন্টে পরিকল্পনা অনুযায়ী বিভিন্ন দল পাকিস্তানী শক্ত প্রতিরক্ষা অবস্থানগুলোকে আক্রমণ করে এবং মূল আক্রমণ পরিচালিত হয় হিলিতে।

একটি ব্রিগেড জলপাইগুড়ি সীমান্তে এবং অন্য একটি ব্রিগেড কুচবিহার সীমান্তে অবস্থিত পাকঘাঁটি আক্রমণ করে। এক ডিভিশন সৈন্য হিলি আক্রমণ করে। হিলিতে পাকসেনারা প্রচণ্ড যুদ্ধ করে।

ডিসেম্বর পাঁচ তারিখে পীরগঞ্জ ও খানপুর দখল হয়। ৭ ডিসেম্বর লালমনিরহাট শত্রুমুক্ত হয়। দুর্গাপুর ৮ ডিসেম্বর দখল হয় এবং ৯ ডিসেম্বর রংপুর ও দিনাজপুর পাকঘাঁটি আক্রমণ করা হয়।

মিত্রবাহিনীর একটি দল হিলিকে এড়িয়ে পলাশবাড়ির দিকে অগ্রসর হয়।

উইং কমান্ডার এম, কে, বাশারের নেতৃত্বে ছয় নম্বর সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধারা ৫ ডিসেম্বর ধরলা নদী অতিক্রম করে কুড়িগ্রাম দখল করে। পাকসেনারা কুড়িগ্রাম থেকে পালিয়ে লালমনিরহাটে চলে যায়। ৬ ডিসেম্বর তিস্তা নদীর তীরে মুক্তিবাহিনী অবস্থান নেয়। ৩ ডিসেম্বর তারিখে ভজনপুর সাব-সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধারা ঠাকুরগাঁও বীরগঞ্জ দখল করে। ১২ ডিসেম্বর রংপুর ও সৈয়দপুর সেনানিবাস ছাড়া সমগ্র এলাকা মুক্তিবাহিনীর দখলে আসে। পাকসেনারা ১৭/১৮ ডিসেম্বর আত্মসমর্পণ করে।

সাত নম্বর সেক্টরে মুক্তিযোদ্ধারা নবাবগঞ্জের দিকে অভিযান শুরু করে। ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীরের নেতৃত্বে এই অভিযান শুরু হয়। অপর একটি দল লেঃ রফিকের নেতৃত্বে মহানন্দ নদী অতিক্রম করে রোহনপুর-

নাচোল-আমনুরা বরাবর অগ্রসর হয়ে নবাবগঞ্জ আক্রমণ করে। অপর একটি দল লেঃ রশিদের নেতৃত্বে গোমস্তাপুর হয়ে নবাবগঞ্জ অভিমুখে যাত্রা করে। ১৩ ডিসেম্বর বারঘরিয়ার নদী অতিক্রম করে প্রতিটি বাংকার চার্জ করার সময় এই নির্ভীক যোদ্ধা শহীদ হন। এই সেক্টরের তপন ও হামজা সাবসেক্টরে সৈন্যরা হিলি থেকে বগুড়া হয়ে দিনাজপুরের দিকে অগ্রসর হয়। মেজর গিয়াসের নেতৃত্বে লালগোলা সাবসেক্টরের মুক্তিযোদ্ধারা পদ্মা নদী পার হয়ে রাজশাহী আক্রমণ করে এবং শেখপাড়া সাব-সেক্টর কমাণ্ডার মেজর রশিদের নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনীর অপর একটি দল পাবনা অভিমুখে যাত্রা করে। পাকসেনারা রাজশাহী ছেড়ে নাটোরে আশ্রয় নেয়। ১৭ ডিসেম্বর সমবেত পাকসেনারা নাটোরে আত্মসমর্পণ করে।

এদিকে যশোর দখলের পর লেঃ আকতার কালিগঞ্জের দিকে এবং লেঃ অলীক কুমার গুপ্ত ঝিনাইদহের দিকে অগ্রসর হয়। মিত্রবাহিনী খুলনার দিকে অগ্রসর হয়। রূপদিয়া ও নোয়াপাড়া দখলের পর শিরমনিতে যুদ্ধ শুরু হয়। এখানে পাকিস্তানী ১৫ এফ এফ রেজিমেন্ট সুদৃঢ় প্রতিরক্ষা ব্যূহ রচনা করে। পশ্চিমে জলাধার আর পূর্বদিকে নদী। পাকসেনারা এখানে প্রবলভাবে বাধা দিতে সক্ষম হয়। পাঁচ দিনব্যাপী প্রচণ্ড যুদ্ধের পর শিরমনির পতন হয় ১৬ ডিসেম্বর সকালে। মেজর জয়নাল আবেদীনের নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনী রূপসা নদীর তীরে এসে পৌঁছায় এবং খুলনা আক্রমণ করে। ৭ ডিসেম্বর সাতক্ষীরার পতন হয়। নবম সেক্টর সৈন্যরা লেঃ হুদার নেতৃত্বে এবং অষ্টম সেক্টর সৈন্যরা ক্যাপ্টেন মাহবুবের নেতৃত্বে সাতক্ষীরা দখল করে।

ক্যাপ্টেন তৌফিক এলাহি, ফ্লাইং অফিসার কালাম ও লেঃ নূরুন্নবী কুষ্টিয়ায় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। মেজর আযম চৌধুরী দুই কোম্পানী নিয়ে ৬ ডিসেম্বর মেহেরপুর দখল করেন ও পরদিন চুয়াডাঙ্গা শত্রুমুক্ত করেন।

ফরিদপুরের দিকে অগ্রসরমান যৌথ বাহিনী কামারখালি ঘাটে ৮ ডিসেম্বর পাকিস্তানীদের সাথে সংঘর্ষ আসে। মধুমতি নদীর সকল সম্ভাব্য অতিক্রম স্থানে পাকসেনারা প্রহরারত ছিলো। লেঃ মোস্তফা স্থানীয় জনগণের কাছ থেকে নৌকা সংগ্রহ করে। ১৪ এপ্রিল মধুমতি নদী অতিক্রম করে মুক্তিবাহিনী পাকসেনাদের পিছু হটিয়ে দেয়। মিত্রবাহিনী এয়ারব্রিজ অপারেশন করে মধুমতি অতিক্রম করে।

চার নম্বর সেক্টর এলাকায় ৭ ডিসেম্বর পাকসেনারা মুক্তিবাহিনীর আক্রমণের ফলে দরবশত ছেড়ে হরিপুরে পলায়ন করে। ১১ ডিসেম্বর পাকবাহিনী নদী পার হয়ে মুক্তিবাহিনী ওপর আক্রমণ করে। এই আক্রমণের ফলে মুক্তিবাহিনী বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ১২ ডিসেম্বর মুক্তিবাহিনীর হরিপুর আক্রমণ করে এবং ১৩ ডিসেম্বর হরিপুর শত্রুমুক্ত হয়। ডিসেম্বর ১৫ তারিখে পাকিস্তানী ঘাঁটি খাদিমনগরের ডান দিক থেকে মিত্রবাহিনী ও বাম দিক থেকে সেক্টরবাহিনী আক্রমণ করে। সিলেট মুক্ত হয় ১৭ ডিসেম্বর।

পাঁচ নম্বর সেক্টরে ৩ ডিসেম্বর গোয়াইনঘাটে পাকবাহিনীর সাথে মুক্তিবাহিনীর যুদ্ধ হয। ৩ ডিসেম্বরেই গোয়াইনঘাট মুক্ত হয়। ৪ ডিসেম্বর করিমগঞ্জ থেকে মৌলবীবাজার হয়ে সিলেটের পথে যাত্রা শুরু করে মিত্রবাহিনী। ৬ ডিসেম্বর সুনামগঞ্জ মুক্ত হয়। সেক্টর কমাণ্ডার লেঃ কর্নেল শওকত ছাতক আক্রমণ করেন ৭ ডিসেম্বর এবং ঐ দিনই রাত আটটায় ছাতক দখল হয়। মেজর শাফায়াত জামিল সালুটিকর বিমান বন্দরের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। ৯ ডিসেম্বর গোবিন্দগঞ্জ আক্রমণ করে মুক্তিবাহিনী। ১৫ ডিসেম্বর এই বাহিনী বিশ্বনাথ দখল করে। প্রায় তিনশ' মুক্তিযোদ্ধার একটি দল নিয়ে ক্যাপ্টেন নবী রাধানগর গোয়াইনঘাট আর্টিলারী সাপোর্ট ছাড়াই আক্রমণ করে দখল করেন। এর আগে ভারতীয় গুর্খা রেজিমেন্ট দুইবার আক্রমণ করে বিফল হয়।

চতুর্থ কোর ফ্রন্টে তিন ডিভিশন ভারতীয় সৈন্য ও মুক্তিবাহিনী উত্তরে মেঘালয় সীমান্ত থেকে ত্রিপুরার দক্ষিণে ফেনী পর্যন্ত ২৪০ মাইল বিস্তৃত এলাকায় ধাবিত হয়। এই কোরের দায়িত্ব ছিলো সুরমা নদী থেকে মেঘনার

পূর্বতীর পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকা মুক্ত করা। চট্টগ্রাম যাওয়ার রেল-সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে মেঘনা পার হয়ে ঢাকার পথে অভিযান করার পরিকল্পনা নেয়া হয়।

পরিকল্পনা মোতাবেক জেনারেল সগত সিং এক ডিভিশন সৈন্য শিলচর-করিমগঞ্জ হয়ে সিলেটের দিকে পাঠান। অন্য একটি ডিভিশন আখাউড়া-আশুগঞ্জ বরাবর পাঠানো হয়। পরিকল্পনা মতো অপর ডিভিশনটি তিন দলে বিভক্ত হয়ে প্রথম দলটি কুমিল্লা আক্রমণ অব্যাহত রাখে এবং অন্য দল দুটির একটি লাকসাম-চাঁদপুর এলাকায় এবং অপরটি ফেনী থেকে দক্ষিণে অগ্রসর হতে থাকে।

মুক্তিবাহিনী করিমগঞ্জ জয় করে মুন্সীনগরের দিকে এগিয়ে চলে। মুন্সীনগরের পতন হয় ৫ ডিসেম্বর। এরপর একটি দল মৌলবীবাজারের দিকে অগ্রসর হয়। ডিসেম্বর ৮ তারিখে মৌলবীবাজার দখল হয়। অন্য একটি দল সিলেট অভিমুখে যাত্রা শুরু করে।

সিলেট আক্রমণ সহজসাধ্য ছিলো না। নদী অতিক্রম অপারেশনের জন্য যথেষ্ট ব্রীজ তৈরির যন্ত্রাদি ছিলো না। রাতের অন্ধকারে হেলিকপ্টারের সাহায্যে এয়ার ব্রিজিং অপারেশন শুরু হয়। পরদিন সাকলে এই দলটি সিলেটের উপকণ্ঠে আসতে সক্ষম হয়।

চতুর্থ কোরের যে ডিভিশনটি আখাউড়া অভিমুখে যাত্রা শুরু করে-জেনারেল সগত সিং মেঘনা অক্রিম করে ঢাকার দিকে অভিযানের সিদ্ধান্ত নেন। মুক্তিবাহিনীর তিন নম্বর সেক্টর ও 'এস' ফোর্স তখন আখাউড়ায় পাকবাহিনীর সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত।

আখাউড়া থেকে রেলওয়ে লাইন আশুগঞ্জের দিকে চলে গেছে। চলাচলের কোনো রাস্তা ছিলো না। শায়েস্তাগঞ্জ থেকে ভৈরববাজার প্রায় এক মাইল দীর্ঘ নদী একটি বিরাট বাধা হিসেবে দেখা দেয়।

অগ্রবর্তী ব্রিগেড আখাউড়া ঘিরে ফেলে এবং গঙ্গাসাগরের দিকে এগিয়ে চলে। এইসময়ে পাকিস্তানী স্যাবরজেট বিমানগুলো হামলা চালায়। ভারতীয় জঙ্গী বিমান পাল্টা আক্রমণ চালালে পাকিস্তানী বিমানগুলো পালিয়ে যায়। ৫ ডিসেম্বর আখাউড়ার পতন হয়।

ভারতীয় ৩১১ পার্বত্য ব্রিগেড, ৭৩ পার্বত্য ব্রিগেড তখন নরসিংদীতে অবস্থান করছিলো। মিত্রবাহিনী ১২ ডিসেম্বর ডেমরা দখল করে। 'এস' ফোর্স পদব্রজে বোলতাপুল হয়ে রূপগঞ্জ দিয়ে বালু নামক স্থানে নদী অতিক্রম করে ডেমরা পৌঁছায় ১৩ ডিসেম্বর। ১৬ ডিসেম্বর ১০টা পর্যন্ত সংঘর্ষ অব্যাহত থাকে। 'কে' ফোর্স দুই দলে বিভক্ত হয়ে একদল চট্টগ্রামের দিকে এবং অপর দল চাঁদপুরের দিকে অগ্রসর হয়। দশম ইস্ট বেঙ্গল মিত্রবাহিনীর ৮৩ ব্রিগেডের সাথে যৌথভাবে ফেনী শহর দখল করে। এই বাহিনীকে নোয়াখালী সদরে রাজাকার ও আলবদর বাহিনী বাধা দেয় কিন্তু তীব্র আক্রমণের মুখে তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। ঐদিনই তারা চট্টগ্রামের দিকে অগ্রসর হয়। ফেনী থেকে চট্টগ্রামের দূরত্ব ছিলো মাত্র ৬৫ মাইল। যৌথ বাহিনী ১৩ ডিসেম্বর কুমিরা পৌঁছায় দুপুর বারোটায়। ক্যাপ্টেন আইনুদ্দিনের নেতৃত্বে নবম বেঙ্গল এবং ক্যাপ্টেন গাফফারের নেতৃত্বে চতুর্থ বেঙ্গল প্রবল পরাক্রমে চট্টগ্রামের দিকে অগ্রসর হতে থাকে।

এখানে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, 'এস' ফোর্স কমাণ্ডার লেঃ কর্নেল শফিউল্লাহ দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে আখাউড়ার প্রতিরক্ষার নিয়োজিত রেখে ভৈরবের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী 'এস' ফোর্স মাধবপুর হয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরাইল পৌঁছায় ডিসেম্বর ৮ তারিখে। আখাউড়ার যুদ্ধে লেঃ বদিউজ্জামান শহীদ হন। পরিকল্পনা হয় ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দক্ষিণ থেকে অগ্রসর হয়ে একটি দল শহরে ঢুকবে, অপর দল উত্তর দিক থেকে সিলেট সড়ক দিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌঁছাবে- আর মিত্রবাহিনী আখাউড়া-ব্রাহ্মণবাড়িয়া রেললাইন এবং উজানী সর-ব্রাহ্মণবাড়িয়া সড়ক হয়ে অগ্রসর হবে। 'এস' ফোর্সের ১১ বেঙ্গলকে চান্দুরার উত্তরে রোড ব্লক করে চান্দুরা থেকে সরাইল পর্যন্ত এলাকা শত্রুমুক্ত করেন। ১১ বেঙ্গল পাইকপাড়ায় এলে মেজর নাসিম

শাহবাজপুর, সরাইল এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দিকে অগ্রসর হতে আদেশ দেন। এই সময় একটি দুর্ঘটনা ঘটে। পাকিস্তানীদের একটি গাড়ী তেলিয়াপাড়া থেকে মেজর ভূঁইয়াকে অতিক্রম করে চলে আসে। 'এস' ফোর্স কমাণ্ডার নিজেদের গাড়ী মনে করে গাড়ী থামান। গাড়ী থামলে দেখা গেল গাড়ীতে পাকসেনা। পাকিস্তানী সুবেদারের সাথে কর্নেল শফিউল্লাহর হাতাহাতি শুরু হয়। পাকসেনার গুলীবর্ষণে কর্নেল শফিউল্লার কোমরের পিস্তলটি বিধ্বস্ত হলো কিন্তু অলৌকিকভাবে তিনি বেঁচে যান। মেজর নাসিমসহ ১১ জন গুরুতরভাবে আহত হন। মেজর মতিন ১১ বেঙ্গলের অধিনায়ক নিযুক্ত হন। ৭ ডিসেম্বর শাহবাজপুর আক্রমণ করে শত্রুমুক্ত করেন। ৮ ডিসেম্বর মেজর ভূঁইয়া ও 'এস' ফোর্সের দলটি সরাইল হয়ে আশুগঞ্জের দিকে অগ্রসর হয়।

পাকবাহিনীর ১৪ ডিভিশন সুদৃঢ় ঘাঁটি নির্মাণ করেছিলো। ১০ ডিসেম্বর ১৮ রাজপুত রেজিমেন্ট পাকিস্তানী ব্যূহ ভেদ করে আশুগঞ্জে ঢুকে পড়ে। 'এস' ফোর্স ও তিন নম্বর সেক্টর সৈন্যরা বিপুল বিক্রমে এই যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ১০/১১ ডিসেম্বর পাকসেনারা আশুগঞ্জ ছেড়ে ভৈরব চলে যায় এবং ভৈরব ব্রিজটি ধ্বংস করে। ১১ ডিসেম্বর ভারতীয় ১৯ পাঞ্জাবকে হেলিকপ্টার যোগে নদীর অপর পাড়ে নামানো হয়। দ্বিতীয় বেঙ্গল ও তিন নম্বর সেক্টর সৈন্যরা পায়ে হেঁটে নরসিংদী অগ্রসর হয়। ১১ বেঙ্গল ভৈরব অবরোধ করে রাখে।

কুমিরাতে পাক ঘাঁটি ছিলো খুবই শক্তিশালী। ক্যাপ্টেন জাফর ইমাম দশম বেঙ্গলের এক কোম্পানী কুমিরায় রেখে পাহাড় পার হয়ে হাটহাজারী যাত্রা করেন। ১৪ ডিসেম্বর মুক্তিবাহিনী হাটহাজারী পৌঁছে যায়। চতুর্থ বেঙ্গল চট্টগ্রাম-রাংগামাটি সড়ক দিয়ে হাটহাজারীর সন্নিকটে এসে পড়ে। নবম বেঙ্গলও এখানে এসে পৌঁছায়। ১৫ ডিসেম্বর হাটহাজারীতে সন্নিকটে এসে পড়ে। নবম বেঙ্গলও এখানে পৌঁছায়। ১৫ ডিসেম্বর হাটহাজারীতে অবস্থানরত পাকসেনাদের ওপর মুক্তিবাহিনী আক্রমণ চালায়। পাকিস্তানী অফিসার মেজর হাদী এক কোম্পানী পাকসেনাসহ আত্মসমর্পণ করে। অপরদিকে পকসেনারা কুমিল্লা ছেড়ে ফৌজদারহাটে এসে অবস্থান নেয়। সম্মিলিত বাহিনী ফৌজদারহাট আক্রমণ করে। ১৬ ডিসেম্বর চট্টগ্রাম অবস্থানরত পাকসেনারা আত্মসমর্পণ করেন।

এক নম্বর সেক্টরে মুক্তিযোদ্ধারা ক্যাপ্টেন মাহফুজের নেতৃত্বে ছাগলনাইয়া দখল করে। ক্যাপ্টেন মাহফুজ 'কে' ফোর্সের সাথে যোগ দিয়ে ফেনী-চট্টগ্রাম সড়ক ধরে একটি দল মুহুরী নদী ধরে এবং অপর দলটি চট্টগ্রামের দিকে অগ্রসর হতে থাকে।

ক্যাপ্টেন মাহফুজ সম্মিলিত বাহিনীর সাথে ৯ ডিসেম্বর জোরারগঞ্জ এসে পৌঁছায়। জোরারগঞ্জ যুদ্ধে ১২ জন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন। পাকসেনারা মুক্তিবাহিনীর তীব্র আক্রমণের ফলে পিছু হটতে থাকে। শুভপুর ব্রিজটি পলায়নপুর পাকবাহিনী ধ্বংস করে দেয়।

সীতাকুণ্ড দখলের জন্য ক্যাপ্টেন মাহফুজ ডান দিক থেকে অগ্রসর হয় এবং মিত্রবাহিনী সম্মুখভাগে এগিয়ে চলে। যৌথবাহিনী চন্দ্রকান্তের মন্দিরে এসে পৌঁছলে পাকসেনারা আর্টিলারীর সাহায্যে প্রবলভাবে বাধা দেয়। ১১ ডিসেম্বর সীতাকুণ্ডের পতন হয়। ১৪ ডিসেম্বর এই বাহিনী কুমিরায় অবস্থানরত দশম বেঙ্গলের সাথে যোগদান করে।

চতুর্থ কোর ও মুক্তিবাহিনী যৌথভাবে দ্রুতগতিতে ঢাকার ভেতরে ঢুকে পড়ে। অপর একটি দল চট্টগ্রামের দিকে ধাবিত হয়। দ্বিতীয় কোর ও মুক্তিবাহিনী মধুমতি অতিক্রম করে অগ্রসর হতে থাকে। একটি দল মাগুরার দিক ও অন্য দলটি যশোর দখলের পর খুলনার দিকে অগ্রসর হয়। ১৪ ডিসেম্বর ভারতীয় বাহিনী ফরিদপুর দখল করে। দৌলতপুরের পতন হয় একই দিনে। পাকসেনাদের কুষ্টিয়া যশোরের দিকে পালানোর পথ বন্ধ হয়ে যায়।

উত্তর-পশ্চিম দিকে লালমনিরহাটের পতন হয়। এর আগে জয়মনিরহাট যুদ্ধে লেঃ সামাদ শহীদ হন। ১২ ডিসেম্বর ঘোড়াঘাট দখল হয় এবং মিত্রবাহিনী ও মুক্তিবাহিনী বগুড়ার দিকে অগ্রসর হতে থাকে। গোবিন্দপুর পরদিন শত্রুমুক্ত হয়। ১৪ ডিসেম্বর বগুড়ার পতন হয়।

১০১ কমিউনিকশন জোন এলাকায় সম্মিলিত বাহিনী তুরা থেকে জামালপুরের দিকে ধাবিত হয়। পাকবাহিনীর একটি ব্রিগেড এই এলাকায় মোতায়েন ছিলো। ব্রিগেড সদর দপ্তর ও দুইটি ব্যাটালিয়ন ময়মনসিংহে এবং একটি ব্যাটালিয়ন জামালপুরে প্রতিরক্ষা অবস্থান নেয়।

ডিসেম্বর ৯ তারিখে সম্মিলিত বাহিনী জামালপুরের নিকটবর্তী অঞ্চলে পৌঁছে যায়। একটি দল ব্রাহ্মপুত্র অতিক্রম করে জামালপুরকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। পাকবাহিনী ময়মনসিংহ থেকে একটি ব্যাটালিয়ন জামালপুরে স্থানন্তরিত করে।

১১ নম্বর সেক্টরে মুক্তিবাহিনী হালুয়াঘাট ও নালিতাবাড়ি হয়ে ময়মনসিংহের দিকে ধাবিত হয়। ৬ ডিসেম্বর ময়মনসিংহ শত্রুমুক্ত হয়। জামালপুরের মিত্র ও মুক্তিবাহিনীর সাথে পাকসেনাদের এক প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। ১১ ডিসেম্বর পাকবাহিনী পরাজিত হয়। মেজর জেনারেল গিল গুরুতরভাবে আহত হলে মেজর জেনারেল নাগরা অধিনায়ক নিযুক্ত হন। পাকসেনাদের একটি দল টাঙ্গাইল চলে যায়। সম্মিলিত বাহিনী টাঙ্গাইলের দিকে অগ্রসর হয়।

১২ ডিসেম্বর টাঙ্গাইলে ছত্রী সেনার একটি ব্যাটালিয়ন অবহরণ করে। জামালপুর যুদ্ধে পরাজিত পাকসেনারা টাঙ্গাইলের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলো। পাকিস্তানীদের পালাবার সকল পথ রুদ্ধ হয়ে যায়, কারণ ১০১ কমিউনিকেশন জোনের সৈন্যরা টাঙ্গাইলে পৌঁছে যায়। ১৩ ডিসেম্বর পাকবাহিনী টাঙ্গাইলে আত্মসমর্পণ করে। পলায়নপর বিপুলসংখ্যক পাক সেনা গ্রামবাসীর হাতে নিহত হয়। সম্মিলিত বাহিনী ঢাকার পথে মির্জাপুরের দিকে যাত্রা করে। ১৪ই ডিসেম্বর যৌথ দল টঙ্গীর কাছাকাছি এসে পড়ে। এই বাহিনী কালিয়াকৈর হয়ে সাভার এসে পৌছে। কিছুক্ষনের মধ্যেই সম্মিলিত বাহিনী ঢাকার উপকণ্ঠে মীরপুর ব্রীজের কাছে এসে পড়ে। ১১ই নভেম্বর নাগরা তার এডিসি'র মারফত নিয়াজীকে আত্মসমর্পনের উপদেশ দিয়ে পত্র পাঠালেন।

১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানী ১৪ই ডিভিশন কমান্ডার মেজর জেনারেল জামশেদ মীরপুর ব্রীজের কাছে এসে ভারতীয় জেনারেল গান্ধর্ব নাগরার কাছে আত্মসমর্পন করে। মুক্তিবাহিনী লক্ষ লক্ষ মানুষের জয়গান ও উল্লাসের মধ্যে ঢাকা দখল করে।

পাকিস্তান বিমানবাহিনীর পুর্বাঞ্চলে মাত্র এক স্কোয়াড্রন ১৮ স্যাবর জেট বিমান ছিলো। সর্বাত্মক যুদ্ধের দ্বিতীয় দিনে পাকিস্তানীরা বিমান শক্তি সম্পুর্ণভাবে হারায়। ভারতীয় বিমানবাহিনী একচ্ছত্র আধিপত্য লাভ করে।

ভারতীয় নৌবাহিনী ফ্লিট এয়ারক্র্যাফট ক্যারিয়ার 'ভিক্রান্ত' বঙ্গোপসাগরে ঢুকে সমুদ্র পথের গতিরোধ করে। 'ভিক্রান্ত' থেকে যুদ্ধ বিমানগুদেলা চট্রগ্রাম বন্দর, বিমান বিমান বন্দর ও চালনা বন্দর আক্রমন করে। এই যুদ্ধ জাহাজের প্রধান কর্তব্য ছিলো সমুদ্র পথে পাকসেনা পালিয়ে যেতে না দেয়া এবং সমুদ্র পথে কোন সাহায্য যাতে নাসতে পারে তা নিশ্চিত করা।

পাকিস্তান পূর্বাঞ্চালীয় নৌবাহিনীর কয়েকটি মাত্র গানবোট সর্বাত্মক যুদ্ধের প্রথম কয়েকদিনের মধ্যেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ১২ অক্টোবর 'পদ্মা ও পলাশ' নামে দু'টি গানবোট সমন্বদেয় বাংলাদেশ নৌবাহিনী সংযোজিত করা হদয়। ৬ ডিসেম্বর যশোরের পতনের পর 'পদ্মা ও পলাশ' এবং ভারতীয় গানবোট 'পানভেল' হিরণপয়েন্ট মঙ্গলা বমদর এবং খুলনার খালিশপুরে পাক নৌ ঘাঁটি পি,এন, এস 'তিতুমীর' দখলের জন্য অগ্রসর হয়। ৯ই ডিসেম্বর কোনো বাধা ছাড়াই এই গানবোটগুলো হিরণপয়েন্ট পৌঁছায়। পরদিন ১০ ডিসেম্বর অভিযান শুরু হয়।

বেলা ১২টার সময় খুলনা শিপইয়ার্ডের সন্নিকটে আকাশে তিনটি জংগী বিমান দেখা যায়। ভারতীয় নাবিক বলেন যে, বিমানগুলো ভারতীয়। আকস্মিকভাবে জংগী বিমানগুলো বোমাবর্ষণ শুরু করে। ভারতীয় নাবিক

সবাইকে জাহাজ ত্যাগ করতে বলেন। ইঞ্জিন আর্টিফিসার মুক্তিযোদ্ধা রুহুল আমিন উপরে এসে চিৎকার করে জানতে চান 'জাহাজ থামতে কেন বলা হয়েছে। আমরা মৃত্যুর ভয়ে ভীত নই-এগিয়ে যাবোই।" বীরশ্রেষ্ঠ রুহুল আমিন 'পলাশ'-এর উপরে পাকিস্তানী বোমাবর্ষণের ফলে শহীদ হন।

৬ ডিসেম্বর ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ যুদ্ধ বিরতির জন্য প্রস্তাব পাস করে। রাশিয়া এই প্রস্তাবে ভেটো দেয় এবং বৃটেন ও ফ্রান্স ভোটদানে বিরত থাকে। ইয়াহিয়া খান প্রত্যাশিত আমেরিকান ও চীনের সরাসরি হস্তক্ষেপ থেকে বঞ্চিত হন। পাকিস্তানী এক লক্ষ সৈন্যের শোচনীয় পরাজয় ও আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে মুক্তিবাহিনীর পরম বিজয় সূচিত হলো-পৃথিবীর মানচিত্রে সংযোজিত হলো স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২৭। মিত্রবাহিনীর তৎপরতা ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্য	'বাংলা নামে দেশ'-অভীক সরকার সম্পাদিত কলিকাতা, ১৯৭২, পৃষ্ঠা ৯৮-১৩৯	১৯৭১

৩ ডিসেম্বর, ১৯৭১। মধ্যরাত্রি থেকেই পুরোদমে শুরু হয়ে গেল ভারত পাক যুদ্ধ। এবং সেই সঙ্গে শুরু হয়ে গেল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়। চতুর্দিক থেকে বাংলাদেশের দখলদার পাকবাহিনীর উরপ আক্রমণ শুরু করল ভারতীয় সেনা, বিমান এবং নৌবাহিনী। আর বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধারা।

সব যুদ্ধই কোনও একটা মুহূর্তে শুরু হয়। কিন্তু তা বলে কোনও যুদ্ধই ঠিক আকস্মিক শুরু হয় না। প্রত্যেকটা যুদ্ধের পেছনে থাকে দীর্ঘদিনের প্রস্তুতি। থাকে বিস্তারিত পরিকল্পনা। যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দিলেই শুরু হয় সেই প্রস্তুতি আর পরিকল্পনা। দুপক্ষেরই প্রস্তুতি আর পরিকল্পনা। যেমন এ যুদ্ধেরও ছিল। এবারের ভারত পাক যুদ্ধের। এবং তারই মূল অংশ বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের চূড়ান্ত লড়াইয়েরও।

এপ্রিল-মে থেকেই ভারতীয় এবং পাকিস্তানী প্রতিরক্ষা বাহিনী বাংলাদেশ সম্পর্কে তাদের নিজ নিজ পরিকল্পনা রচনার কাজ শুরু করে দিয়েছিল। আর সেই সঙ্গেই শুরু হয়েছিল প্রস্তুতি। সাধারণত লক্ষ্যটা স্থির করে দেন রাষ্ট্রনায়করা। সমরনায়করা সেই অনুসারে তাদের পরিকল্পনা রচনা করেন এবং প্রস্তুতি গড়েন।

এপ্রিল মাসের শেষদিকেই ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীর সামনে ভারত সরকার বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের কয়েকটা দিক তুলে ধরেছিলেন। বলেছিলেনঃ (এক) বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম চালাবে মূলত বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী। ভারতীয় সেনাবাহিনী ট্রেনিং এবং অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে মুক্তি বাহিনীকে সাহায্য করবে। (দুই) মুক্তি বাহিনীকে ভারত সরকার সাহায্য দিচ্ছে বলে পাক বাহিনী যদি ভারতের উপর হামলা করে তাহলে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে সেই আক্রমণের জবাব দিতে হবে। (তিন) বাংলাদেশের সমস্যার যদি কোনও রাজনৈতিক সমাধান না হয় তাহলে ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীকেও বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের চূড়ান্ত লড়াইয়ের নামতে হতে পারে। (চার) যদি চূড়ান্ত লড়াইয়ে ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীকে নামতে হয়ই তাহলে তার লক্ষ্য হবে রাজধানী ঢাকাসহ গোটা বাংলাদেশকে দখলদার পাক বাহিনীর কবলমুক্ত করা। (পাঁচ) মুক্তি সংগ্রামে যদি প্রত্যক্ষভাবে ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনী নামে তাহলে রাজধানীসহ গোটা বাংলাদেশকে খুব দ্রুতগতিতে মুক্ত করতে হবে। (ছয়) বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধে ভারতীয় বাহিনীর অংশ নেওয়া মানেই হবে পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের যুদ্ধ। সুতরাং লড়াই শুধু পূর্বে হবে না, হবে পশ্চিমেও। এবং (সাত) পাক-ভারত লড়াই হলে উত্তর সীমান্তে চীনের কথাও মনে রাখতে হবে।

এই নির্দেশের উপর ভিত্তি করেই ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনী দুভাবে তাঁদের পরিকল্পনা রচনা করল এবং প্রস্তুতি গড়ে তুলল। (এক) মুক্তি বাহিনীকে ট্রেনিং দেওয়া এবং তাদের অস্ত্র সরবরাহ করা। (দুই) বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের চূড়ান্ত পর্যায়ের লড়াইয়ের জন্য পরিকল্পনা রচনা করা এবং তার প্রস্তুতি গড়ে তোলা।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে পরিকল্পনা রচনা করতে গিয়ে আমাদের প্রতিরক্ষা বাহিনীকে প্রথমেই কতকগুলি অসুবিধার কথা বিবেচনা করতে হয়। প্রথমত, বাংলাদেশের প্রকৃতি। বাংলাদেশে অসংখ্য নদীনালা। কতকগুলি নদী বিশাল। আর, বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্র জলাভূমি এবং এইসব জলাভূমিতেও শীতকালেও কিছু কিছু জল জমে থাকে। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশের নদীনালাগুলি অধিকাংশই উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রবাহিত। তাই পশ্চিম থেকে পূর্বে অগ্রসর হওয়া অত্যন্ত কঠিন। অথচ ভারত থেকে বাংলাদেশে কোনও বড় সেনাবাহিনীকে পাঠাতে হলে নানা কারণে পশ্চিম দিক থেকে পাঠানোই সুবিধা। তৃতীয়ত, বাংলাদেশে রাস্তাঘাট অত্যন্ত কম। সামান্য কয়েকটি মাত্র পাকা রাস্তা আছে। সেগুলিও অসংখ্য নদীনালার ওপর দিয়ে গিয়েছে। চতুর্থত, প্রয়োজনীয় সংখ্যায়

সৈন্য, বিমান এবং জাহাজ-বোট পাওয়া যাবে না। বাংলাদেশে পাক দখলদার বাহিনীতে মোট সৈন্য এবং আধা সৈন্য প্রায় চার ডিভিশন। সামরিক বিশেষজ্ঞদের হিসাব মত ঘাঁটি থেকে কোনও সেনাবাহিনীকে উচ্ছেদ করতে হলে আক্রমণকারীর অন্তত তিনগুণ শক্তি চাই। অর্থাৎ বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের জন্য অন্তত বারো ডিভিশন ভারতীয় সৈন্য প্রয়োজন। অথচ তা পাওয়া যাবে না। কারণ, পশ্চিম খন্ডেও বহু সৈন্য, বিমান এবং জাহাজ রাখা প্রয়োজন। আর, উত্তরের জন্যও কিছু সৈন্য এবং বিমান মজুত রাখতে হবে। পঞ্চমত, এইসব অসুবিধা সত্ত্বেও খুব দ্রুত ঢাকাসহ বাংলাদেশকে মুক্ত করতে হবে-কিন্তু বাংলাদেশে এমন সতর্কভাবে লড়াই চালাতে হবে যাতে সাধারণ নাগরিকের কোনও ক্ষতি না হয়, দেশের কোনও সম্পদ ধ্বংস না হয় এবং লড়াইটা চলে শুধু পাক বাহিনীর সঙ্গে। অর্থাৎ তাড়াতাড়ি লড়াই শেষ করতে হবে, কিন্তু আর পাঁচটা লড়াইয়ের মত সর্বাত্মক লড়াই করা যাবে না। এই পরিস্থিতিতে ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনী বাংলাদেশের চূড়ান্ত লড়াইয়ের জন্য একটা বিস্তারিত পরিকল্পনা রচনা করল।

সেই পরিকল্পনা পাঁচটা লক্ষ্য। প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য, ক্ষিপ্রতা। ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনী স্থির করল যদি যুদ্ধে নামতেই হয় তাহলে দু' সপ্তাহের মধ্যে ঢাকা পৌঁছতে হবে। কেন্দ্রবিন্দু ঢাকা। একমাত্রসেই দিকেই এগোতে হবে। অন্যান্য শহর বা ঘাঁটি দখলের জন্য সময় বা শক্তি নষ্ট করা হবে না। সেগুলিকে এড়িয়ে যেতে হবে।

দ্বিতীয় লক্ষ্য, শত্রুপক্ষকে ধোঁকা দেওয়া। তাকে বোঝাতে হবে যে তার চেয়ে অন্তত চারগুণ শক্তি নিয়ে ভারতীয় বাহিনী আক্রমণ করছে। আর তাকে দেখাতে হবে যে ভারতীয় বাহিনী সবদিক থেকেই আক্রমণ করতে যাচ্ছে যাতে শত্রুপক্ষ তার সৈন্যবাহিনী কোনও একটা এলাকায় জড় না করতে পারে এবং বাংলাদেশের চতুর্দিকে ছড়িয়ে রাখতে বাধ্য হয়।

তৃতীয় লক্ষ্য, সেই ছড়িয়ে পড়া পাকবহিনীকে আবার একত্রিত হতে না দেওয়া-যাতে পাক বহিনী রিগ্রুপড হয়ে কোনও দ্বিতীয় পর্যায়ের লড়াইয়ে না নামতে পারে এবং যাতে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সৈন্য সরিয়ে এনে তারা ঢাকা রক্ষার জন্য পদ্মা ও মেঘনার মাঝামাঝি অঞ্চলে কোনও শক্ত ব্যূহ না রচনা করতে পারে।

চতুর্থ লক্ষ্য, ভারতীয় বাহিনী যাতে পাক বাহিনীর সঙ্গে কোনও কোনও বড় দীর্ঘ যুদ্ধে লিপ্ত না হয়ে পড়ে এবং যেন ভারতীয় বাহিনীর ক্ষতি যথাসম্ভব কম হয়। ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীর পরিচালকরা এটাও জানতেন যে কোথাও কোন বড় দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধ হলে তাতে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের ক্ষতি হবে এবং জাতীয় সম্পদও ধ্বংস হতে বাধ্য। এই জন্য ভারতীয় বাহিনী প্রথম থেকেই টিক করল বাংলাদেশে ঢুকতে হলে বড় সড়কগুলি এড়িয়ে যাবে। এবং এগোবে কাঁচা পথ দিয়ে-যেখানে পাকবাহিনী তাকে আশা করবে না, যেখানে পাক-বাহিনীর প্রতিরক্ষা ব্যূহ বা মাইন থাকবে না, যেখানে শত্রুপক্ষ ভারী অস্ত্রশস্ত্র আনতে পারবে না এবং যেখানে জনবসতি খুবই কম থাকবে।

পঞ্চম লক্ষ্য, গোড়া থেকেই এমনভাবে আক্রমণটা চালানো এবং পরিচালনা করা যাতে বাংলাদেশের দখলদার পাকবাহিনীর মনোবল লড়াইয়ের প্রায় শুরুতেই ভেঙ্গে দেওয়া যায় এবং যাতে তারা শেষ পর্যন্ত লড়াই না করে আগেই আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়।

এই পাঁচটা লক্ষ্য সামনে রেখে ভারত বাংলাদেশের প্রায় চতুর্দিকে এইভাবে তার সেনাবাহিনীকে সাজালোঃ

২ নং কোর। সদর দফতর-কৃষ্ণনগর। প্রধান- লেঃ জেঃ টি, এন, রায়না। দুটো পার্বত্য ডিভিশন ৯ম ও ৪র্থ। তৎসহ টি-৫৫ এস রুশ ট্যাঙ্কে সজ্জিত একটি মাঝারি আর্মার্ড রেজিমেন্ট, পিটি-৭৬ সাঁতারু রুশ ট্যাঙ্ক সজ্জিত আর এক হাল্কা ট্যাঙ্ক রেজিমেন্ট, একটা মাঝারি আর্টিলারি রেজিমেন্ট-১৩০ মিলিমিটার দূরপাল্লার রূশ কামানসহ ব্রিজ তৈরী করতে পারে এমন একটি ইনজিনিয়ারিং ইউনিট। ৯ম ডিভিশন তার প্রধান ঘাঁটি করল ২৪ পরগনার বয়রার কাছাকাছি। ৪র্থ ডিভিশনের মূল ঘাঁটি হল কৃষ্ণনগর গেদের মাঝামাঝি।

৩৩নং কোর। সদর দফতর-শিলিগুড়ি। প্রধান- লেঃ জেঃ এম, এল, থাপান। ৬ এবং ২০নং পার্বত্য ডিভিশন। তৎসহ রুশ পিটি-৭৬ এস ট্যাঙ্কেসজ্জিত একটা হাল্কা আর্মার্ড রেজিমেন্ট, বৃটিশ ৫.৫ ইঞ্চি কামানে সজ্জিত একটি মাঝারি আর্টিলারি রেজিমেন্ট এবং ব্রিজ তৈরি করার একটি ইনজিনিয়ারিং ইউনিট। ২০নং পার্বত্য ডিভিশন প্রধান ঘাঁটি করল বালুরঘাটের কাছে। ৬নং ডিভিশন কোচবিহার জেলায়।

এই ৩৩নং কোরের আর একটা অংশের ঘাঁটি হল গোহাটিতে। পরিচিতিঃ ১০১নং কমিউনিকেশন জোন। প্রধানঃ মেঃ জেঃ জি এস, গিল। শক্তিঃ দুই ব্রিগেড পদাতিক সৈন্য। জামালপুরের কাছে প্রচণ্ড এক লড়াইয়ে জেনারেল গিল আহত হওয়ার পর এই বাহিনীর প্রধান হলেন মেঃ জেঃ জি, নাগরা।

৪ নং কোর। সদর দফতর-আগরতলা। প্রধান- লেঃ জেঃ সগত সিং। ৮, ৫৭ এবং ২৩নং পার্বত্য ডিভিশন। তৎসহ দু' স্কোয়াড্রন পিটি-৭৬ এস রুশ সাঁতারু ট্যাঙ্ক, বৃটিশ ৫.৫ ইঞ্চি কামানে সজ্জিত একটা মাঝারি রেজিমেন্ট এবং ব্রিজ তৈরীর ইনজিনিয়ারিং ইউনিট। ঐ তিনটি পার্বত্য ডিভিশনকে ভাগ ভাগ করে বাংলাদেশের পূর্ব সীমান্তে বিভিন্ন এলাকায় দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল।

এটা ভারতীয় সেনাবাহিনীর হিসাব। এর সঙ্গে ছিল কর্নেল ওসমানির অধীনস্থ প্রায় ৬০,০০০ মুক্তিসেনা। এরা মোটামুটি দুভাগে বিভক্ত ছিলঃ মুক্তিফৌজ এবং মুজিববাহিনী বা মুক্তিবাহিনী (এফ-এফ)। ট্রেনিংপ্রাপ্ত ও পুনর্গঠিত মুক্তিবাহিনীর সৈন্যরা নবপর্যায়ে জুন মাস থেকেই বাংলাদেশের ভেতরে লড়াই চালাতে শুরু করেছিল। ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীর পক্ষ থেকে এদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন মেঃ জেঃ বি, এন, সরকার। যুদ্ধ যখন পুরোদমে শুরু হয়ে গেল এবং যখন ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রত্যক্ষভাবে লড়াইয়ে অংশ নিলেন তখন বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় সেনাবাহিনীকে নিয়ে গঠিত হল একটি কমাণ্ড। এই কমান্ডের প্রধান হলেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় প্রধান লেঃ জেঃ জগজিৎ সিং অরোরা।

এখানে দুটো জিনিস বোধ হয় আগাম ব্যাখ্যা করে রাখা ভাল। ওপরের তালিকা থেকেই দেখা যাচ্ছে ভারত বাংলাদেশের চতুর্দিকে যে সৈন্য সাজালো তারা অধিকাংশই পার্বত্য ডিভিশনের। পার্বত্য ডিভিশন গঠনে যে কোনও অন্য ডিভিশনের মতই, কিন্তু যেহেতু প্রধানত পাহাড়ে লড়াই করার জন্য পার্বত্য ডিভিশন গঠিত হয় সেই জন্য তাদের অস্ত্রশস্ত্র হয় একটু হাল্কা ধরনের। ট্যাঙ্ক বা ভারী কামান পার্বত্য ডিভিশনে থাকে না। এই জন্যই বাংলাদেশে লড়াইয়ের পরিকল্পনা করতে গিয়ে ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনী প্রতিটি পার্বত্য ডিভিশনের সঙ্গে বাড়তি ট্যাঙ্ক ও আর্টিলারি রেজিমেন্ট যোগ করে। এর মধ্যে বেশকিছু রাশিয়ান সাঁতারু ট্যাঙ্কও ছিল। দ্বিতীয়ত, পার্বত্য ডিভিশনের সঙ্গে সাধারণত বড় ব্রিজ তৈরী করার মত ইউনিট থাকে না। কারণ, পাহাড়ের উপরে নদী চওড়া হয় না। অথচ বাংলাদেশ চওড়া নদীতে ভরা। কতকগুলি নদী বিশাল। এই জন্য বাংলাদেশে অপারেশনের দায়িত্ব দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকটি পার্বত্য ডিভিশনের সঙ্গে বড় বড় ব্রিজ তৈরীর ইনজিনিয়ারিং ইউনিটও দেওয়া হল।

স্বাধীনত সংগ্রাম শুরু হওয়ার পর থেকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রনায়করা বাংলাদেশের জন্য তিন পর্যায়ে তিন কিস্তি সামরিক পরিকল্পনা তৈরী করে। প্রথম পর্যায়, ২৫ মার্চ থেকে এপ্রিলের তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত। এই পর্যায়ের পাকিস্তানী সামরিক পরিকল্পনা ছিলঃ সমস্ত শহরগুলিতে ঝটিতি বাঙালীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়, যাকেই স্বাধীনতা সংগ্রামী বলে মনে হয় তাকেই শেষ করে দাও। দ্বিতীয় পর্যায়ে, অর্থাৎ যখন ট্রেনিংসহ পুনর্গঠিত মুক্তিবাহিনী গেরিলা কায়দায় আক্রমণ শুরু করল তখন পাক বাহিনীও বাংলাদেশে তার সামরিক পরিকল্পনা পাল্টালো। এই পর্যায়ে তারা শুধু সেনাবাহিনীর উপর নির্ভর করল না। গড়ে তুলল দুটো স্থানীয় বাহিনীও। এর একটা হল রাজাকার বাহিনী- সামান্য ট্রেনিংপ্রাপ্ত অত্যাচারীর দল। আর একটা আলবদর বাহিনী-প্রধানত ধর্মান্ধ যুবক এবং গুন্ডাশ্রেণীর লোকদের নিয়ে গঠিত সামরিক বহিনী। গেরিলা এবং পাক বিরোধীদের খতম করার জন্য পাক সামরিক বাহিনী এই দুই দালাল বাহিনীর সাহায্য নিল। রাজাকার বাহিনীর হাতে অস্ত্রও দেওয়া হল-প্রধানত রাইফেল। নানা রকমের দায়িত্ব পেল তারা। যেমন, গেরিলাদের খুঁজে বের করা, গেরিলাদের সহকারী এবং

আশ্রয়দাতাদের উপর অত্যাচার চালানো ও তাদের নাম-ধাম সেনাবাহিনীকে সরবরাহ করা, ব্রিজ-রেললাইন ইত্যাদি পাহারা দেওয়া। আলবদর বাহিনীকেও মোটামুটি একই রকমের দায়িত্ব দেওয়া হল-এক পাহারা দেওয়া ছাড়া। তাদের সক্রিয় করে তোলা হল প্রধানত শহর অঞ্চলে। শহরে এবং শহরের আশেপাশে যারা যারা পাকিস্তানবিরোধী এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সমর্থক তাদের খুঁজে বের করার দায়িত্ব পেল আলবদর। সেনাবাহিনী এই বাহিনীর কাজকর্ম নিয়মিত তদারক করত। এই দুই বাহিনীকেই সেনাবাহিনী ঢালাও সাহায্য দেওয়ারও ব্যবস্থা করেছিল।

মুক্তিবাহিনীকে গেরিলা আক্রমণ যত বাড়তে আরম্ভ করল পাক কর্তৃপক্ষও ততই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। সাধারণ বাঙালীর উপর সেনাবাহিনী ও তার দুই দালাল গোষ্ঠীর অত্যাচারও ততই বেড়ে চলল। একদিকে যখন সাধারণ মানুষের উপর, বিশেষ করে সাধারণ গ্রামবাসীর উপর অত্যাচার বাড়ল অন্যদিকে তখনই পাক সেনাবাহিনী সীমান্তেই মুক্তিবাহিনীর অনুপ্রবেশ বন্ধ করার জন্য ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের কাছাকাছি চলে আসার চেষ্টা করল। বর্ষাকালে এই কাজে তাদের অসুবিধা হচ্ছিল। কিন্তু বর্ষা একটু কমতেই তারা রাজাকারদের নিয়ে সীমান্তের যত কাছাকাছি সম্ভব চলে আসার চেষ্টা করল। সেপ্টেম্বর মাস নাগাদ এই ব্যাপারটা চূড়ান্ত পর্যায়ে উঠল। ২৭৪টা সীমান্ত চৌকির মধ্যে ওরা প্রায় ২১০টায় পৌঁছে গেল। ২৫ মার্চের পর পাক ফৌজ ও সীমান্ত রক্ষী বাহিনীকে প্রায় সব সীমান্ত চৌকি ছেড়ে দিতে হয়েছিল। এই রকম সময়ে পাক রাষ্ট্রনায়করা ঢাকার কর্তৃপক্ষের জন্য আবার তাদের নতুন নির্দেশাবলী প্রথম ভাগটা ছিল পরিস্থিতি বিশ্লেষণ। সমগ্র আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে পাক কর্তৃপক্ষ বললঃ আমরা মনে করি ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় বিচ্ছিন্নতাবাদীরা পূর্ব পাকিস্তানের কতকগুলি সীমান্ত অঞ্চল দখল করার চেষ্টা করবে এবং ভারত সরকার সেই দখল করা এলাকায় স্বাধীন বাংলা সরকার নামক বস্তুটিকে প্রতিষ্ঠিত করবে। তারপর সেই তথাকথিত স্বাধীন বাংলা সরকার দেখিয়ে আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক চাপ বাড়াবার চেষ্টা করবে। আমাদের মনে হয় না ভারত সরকার গোটা পূর্ব পাকিস্তান দখল করার পরিকল্পনা নিয়ে নামবে। সে সাহস তারা পাবে না। তারা চাইবে সীমান্তের কাছাকাছি কয়েকটা বড় শহরকে নিয়ে একটা তথাকথিত মুক্ত এলাকা গঠন করতে।

এই বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে ইসলামাবাদ ঢাকাকে নির্দেশ দিলঃ সুতরাং, এমনভাবে আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে সাজাতে হবে যাতে ওরা পূর্ব পাকিস্তানের কোনও বড় এলাকা না দখল করতে পারে। আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সীমান্তেই সুদৃঢ় করতে হবে। এবং দেখতে হবে যেন ভারতীয় সৈন্যবাহিনী স্বনামে বা বেনামে পূর্ব পাকিস্তানের কোনও অঞ্চলে ঢুকে তা না দখল করতে পারে। সীমান্ত অঞ্চলে এক আধ মাইল ওরা ঢুকে পড়লে ব্যস্ত হওয়ার কিছু নেই। কিন্তু বেশী দূর কিছুতেই এগোতে দেওয়া হবে না।

এই নির্দেশ পেয়েই বাংলাদেশে দখলদার পাক বাহিনীর প্রধান লেঃ জেঃ এ, এ, কে, নিয়াজি বোঝার চেষ্টা করল ভারতীয় সেনাবাহিনী কোন দিকটায় ঢোকায় চেষ্ট করতে পারে। নানাভাবে খবর নিল। পাত্রমিত্রদের নিয়ে বারবার পরামর্শ করল। কিন্তু কিছুতেই বুঝে উঠতে পারল না ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং মুক্তিবাহিনী কোন দিক দিয়ে এগিয়ে কোন এলাকা মুক্ত করতে চাইতে পারে। ততদিন সীমান্তে ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রস্তুতি পুরোদমে শুরু হয়ে গিয়েছে। নিয়াজি সব দিকের খবর নিল। এবং দেখল চতুর্দিকে প্রস্তুতি। যে কোনও দিক দিয়ে আক্রমণ হতে পারে। এই অবস্থায় নিয়াজি একটা "মাষ্টার প্ল্যান" তৈরী করল। তাঁর পরিকল্পনাটা হল এই রকমঃ সীমান্তের সবগুলি পাকা রাস্তার উপর সুদৃঢ় প্রতিরক্ষাব্যূহ তৈরী করা হবে। ভারতীয় বাহিনী যেখানে যেখানে জড় হয়েছে তার ঠিক উল্টো দিকে সুদৃঢ় বাঙ্কার তৈরী করে তাতে ভারী কামানসহ পাকসেনাদের বসিয়ে দেওয়া হবে। যে রাস্তা দিয়েই ভারতীয় বাহিনী অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করুক সেই রাস্তায়ই তাকে বাধা দেওয়া হবে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর মোকাবিলা করবে পাক সেনাবাহিনী। আর অন্যান্য আধা সৈনিকরা লড়বে মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে।

পরিকল্পনা পাকা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নিয়াজি তার গোটা সেনাবাহিনীকে বাংলাদেশের চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিল। সীমান্ত থেকে দেশের ভেতরে দশ-পনেরো মাইল, কোথাও কোথাও ত্রিশ-চল্লিশ মাইল পর্যন্ত বড় বড় সড়কের উপর অসংখ্য বাঙ্কার তৈরী করল এবং প্রধান প্রধান ভারতীয় ঘাঁটির মুখোমুখি ভারী কামান ও ট্যাঙ্কসহ পাক সেনাবাহিনীকে দাঁড় করিয়ে দিল।

ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীর কর্মকর্তারা তাই দেখে ভীষণ খুশি হলেন। তারা বুঝলেন পাখি ফাঁদে পা দিয়েছে। নিয়াজি তার সেনাবাহিনীকে দেশের চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিয়েছে, গোটা সীমান্তটা রক্ষা করতে চাইছে এবং বুঝতেই পারছে না যে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে প্রত্যক্ষভাবে যোগ দিলে ভারতীয় সেনাবহিনী ঠিক কোন দিক দিয়ে এগোবে। বাংলাদেশে নিয়াজির হাতে তখন পাক সেনাবাহিনীর প্রায় ৪২টা নিয়মিত ব্যাটালিয়ন। ৩৫ ব্যাটালিয়ন পাকসেনা এবং ৭ ব্যাটালিয়ন পশ্চিম পাকিস্তানী রেনজার। আর আধা সামরিকদের মধ্যে ইস্ট পাকিস্তান সিভিল আরমড ফোরসেসের ১৭টা উইংগ এবং ৫ উইংগ মোজাহেদ। অর্থাৎ মোট নিয়মিত সৈন্য প্রায় ৪০,০০০। এবং আধা সামরিক বাহিনীতে প্রায় ২৪,২০০ লোক। এছাড়াও পাক কর্তৃপক্ষের হাতে বাংলাদেশে আরও প্রায় ২৪,০০০ ইনডাস্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্স ছিল। মোট সৈন্য ছিল মাত্র ৪২ ব্যাটালিয়ন; কিন্তু নামে ডিভিশন ছিল চারটা। ১৪, ৩৯, ৯ ও ১৬। এছাড়াও ৩৬নং ডিভিশন নামে আর একটা ডিভিশন ছিল মেজর জেনারেল জামসেদের অধীনে। প্রধানত আধা-সৈনিকর এই ডিভিশনের আওতায় ছিল।

সীমান্তের চতুর্দিকে এই বাহিনীকে সাজিয়ে দিয়ে নিয়াজি বেশ একটু পরিতৃপ্ত হলেন। তার হাতে তখন গুলিগোলা প্রচুর। নিয়াজি যত সৈন্য চেয়েছিল পাক কর্তৃপক্ষ কখনো তা তাকে দেয়নি, তার চাহিদা মত ট্যাঙ্ক, বিমান ও কামানও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আসেনি। কিন্তু পাকিস্তানের কর্তারা নিয়াজিকে গোলাবারুদ দিতে কোন কার্পণ্য করেনি। যা চেয়েছিল তার চেয়েও বেশী দিয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চীন থেকে পাঠান প্রচুর গোলাগুলি তখন পাক কর্তৃপক্ষের হাতে। নিয়াজির নবম ডিভিশন তখন যশোরের ঘাঁটিতে। নবম ডিভিশনের সৈন্যরা সাতক্ষীরা থেকে কুষ্টিয়া পর্যন্ত ছড়িয়ে দাঁড়াল। ষোড়শ ডিভিশনের হেডকোয়ার্টার প্রথমে ছিল নাটোরে। সরিয়ে সেটাকে নিয়ে আসা হল বগুড়ায়। গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের মধ্যবর্তী অঞ্চলের সমগ্র সীমান্তে ষোড়শ পাক ডিভিশনের সৈন্যরা বাঙ্কার করে বসল। ১৪ এবং ৩৯ নং ডিভিশনের ভাগে পড়ল পূর্ব সীমান্ত রক্ষার দায়িত্ব। উত্তর সীমান্তের জামালপুর থেকে দক্ষিণে কক্সবাজার পর্যন্ত ১৪ এবং ৩৯ নং ডিভিশনের সৈন্যরা ছড়িয়ে।

বাংলাদেশের পাকবাহিনীর হাতে ছিল ৮৪টি মার্কিন স্যাফি ট্যাঙ্ক। আর ছিল শ' আড়াই মাঝারি বা ভারী কামান। নিয়াজি তাও সব সীমান্তের কাছাকাছি নিয়ে এল। এবং দৃশ্যমান প্রধান প্রধান ভারতীয় ঘাঁটিগুলির মুখোমুখি দাঁড়াবার জন্য এর প্রায় সব কিছু নিয়ে জড় করল পাঁচটা কেন্দ্রে--চৌগাছা, হিলি, জামালপুর, সিলেট এবং আখাউড়ায়। দু'পক্ষই বুঝেছিল যা হওয়ার শীতকালেই হবে। তাই দুপক্ষই অক্টোম্বর-নভেম্বর মধ্যেই সীমান্তে সৈন্য সামন্ত সাজিয়ে বসল। ওদিকে তখন খোদ পাক সৈন্যবাহিনীও গেরিলাদের আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত। গোটা সীমান্ত বরাবর এলাকায় রাত্রে পাক সৈন্যবাহিনীর পক্ষে চলাফেরা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। নিয়াজি বুঝল এবার একটা বড় দরের কিছু না করতে পারলেই নয়। তখন সীমান্তেও তার ন্যৈবাহিনী দাঁড়িয়ে গিয়েছে। নিয়াজির বুকে তাই বেশ বল। হাজার হাজার লোককে বেগার খাটিয়ে গোটা সীমাস্ত জুড়ে হাজার হাজার বাঙ্কারও তৈরী হয়ে গিয়েছে। পাক সেনাবাহিনীর লোকজনেরা সেই সব বাঙ্কারে পজিশনও নিয়ে নিয়েছে। নিয়াজি তাই নতুন হুকুম দিলঃ প্রয়োজনে সীমান্তের ওপারে গিয়ে মুক্তিবাহিনীকে ঘায়েল করে এস।

নভেম্বরেই শুরু হয়ে গেল পাক সেনাবাহিনীর ভারতীয় সীমা অতিক্রম। সর্বত্র এই ঘটনা ঘটতে আরম্ভ করল। চবিবশ পরগণায়, নদীয়ায়, দিনাজপুরে, কোচবিহারে, আসামের বিভিন্ন প্রান্তে এবং ত্রিপুরার নানা অঞ্চলে। ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং সীমান্ত রক্ষী বাহিনী অর্থাৎ বি, এস, এফ'ও সঙ্গে সঙ্গে এর প্রত্যুত্তর দিতে আরম্ভ করল। শুরু হয়ে গেল সীমান্তের বিভিন্ন অঞ্চলে গোলাগুলি বিনিময়। এবং প্রায় প্রতিদিনই এই জিনিস বেড়ে চলল।

নভেম্বরের গোড়ায় পাকিস্তানীরা ত্রিপুরায় প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ শুরু করল। তারা গোলাগুলি চালাল প্রধানত আখাউড়া অঞ্চল থেকে। এই গোলাবষর্ণে কমলপুর শহর এবং আশেপাশের কতকগুলি গ্রাম বেশ ক্ষতিগ্রস্থ হল। ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং সীমান্তরক্ষী বাহিনীও নিয়মিত এর জবাব দিল। ওদিকে তখন মুক্তিবাহিনীও ঢাকা-চট্টগ্রাম রেল লাইন ও সড়ক পথ কেটে দেওয়ার চেষ্টা করছে।

আখাউড়ার কাছে পাকিস্তানীরা একটা বড় ঘাঁটি করেছিল। এর কারণও ছিল। বাংলাদেশের ট্রেন-সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থায় আখাউড়ার স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। চট্টগ্রাম-ঢাকা-শ্রীহট্ট-ময়মনসিংহ রেলপথে আখাউড়া প্রধান জংশন। রেলপথ চট্টগ্রাম থেকে এসে আখাউড়ায় দুভাগ হয়ে গিয়েছে। একটা উত্তর-পূর্বে চলে গিয়েছে শ্রীহট্টের দিকে। আর একটা মেঘনা নদী ডিঙ্গিয়ে উত্তরে গিয়েছে ময়মনসিংহের পথে। দক্ষিণে লাইনটা গিয়েছে ঢাকায়। আখাউড়া তাই বেশ গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি। ভারতের একেবারে লাগোয়া। পাক সমর নায়করা জানত, সুযোগ পেলেই মুক্তিবাহিনী আখাউড়া দখল করে চট্টগ্রাম বন্দরের সঙ্গে বাংলাদেশের বাদ বাকি অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। তারা আরও জানত, লড়াই হলে ভারতীয় সেনাবাহিনীও সঙ্গে সঙ্গে আখাউড়া দখলের চেষ্টা করবে। তাই তারা আখাউড়ায় বেশ একটা শক্ত ঘাঁটি তৈরী করেছিল। এবং এই শক্ত ঘাঁটি থেকেই ত্রিপুরান নানা এলাকায় অবিরাম গোলাবর্ষণ করছিল। কিছুটা দক্ষিণে ফেনীর কাছাকাছি তারা আর একটা বড় ঘাঁটি তৈরী করেছিল। একই উদ্দেশ্য চট্টগ্রাম-ঢাকা-শ্রীহট্ট যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন চেষ্টায় বাধাদান।

এই ফেনীর ঘাঁটি থেকেও পাকিস্তানীরা ভারতীয় এলাকার উপর প্রচণ্ড গোলাগুলি চালানো শুরু করল। পাঁচ-ছয়দিন এইভাবে চলার পর ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনী দেখল এগিয়ে গিয়ে পাক ঘাঁটিগুলি ধ্বংস করে দিয়ে না এলে এই গোলাবর্ষণ বন্ধ করা যাবে না। কারণ, পাকিস্তানীরা কংক্রিটের বাঙ্কার তৈরী করে তার ভেতরে বসে গোলা চালাচ্ছে। দূর থেকে গোলা ছুড়ে কংক্রিটের ঘায়েল করা যাচ্ছে না। তাই পূর্ব সীমান্তের ভারতীয় সৈন্যবাহিনী তখন এগিয়ে গিয়ে পাক ঘাঁটি ধ্বংস করার অনুমতি চাইল দিল্লীতে। সমগ্র পরিস্থিতি বিবেচনা করে দিল্লীও সেই অনুমতি দিয়ে দিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হল অ্যাকশন। ৮ নভেম্বর জাতীয় ভারতীয় বাহিনী এগিয়ে গিয়ে ত্রিপুরা সীমান্তবর্তী পাক ঘাঁটিগুলিতে জোর আঘাত হানল। পাকিস্তানীরা বাধা দেওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। সীমান্তবর্তী ঘাঁটিগুলি ছেড়ে তাদের পালাতে হল।

এই অ্যাকশনের দুটো প্রত্যক্ষ ফল হল। প্রথমত, ত্রিপুরার বিভিন্ন এলাকার উপর কামানের গোলা বর্ষণ ততটা ক্ষমতা আর পাকিস্তানীদের থাকল না। দ্বিতীয়ত, মুক্তিবাহিনীও আরও জোরে পাকবাহিনীর উপর আক্রমণ করার সুযোগ পেল। কারণ, পাকবাহিনী তখন শক্ত ঘাঁটি থেকে উচ্ছেদ হয়েছে।

গোলাগুলি বিনিময় যেমন বাংলাদেশের পূর্ব প্রান্তে চলছিল তেমনি চলছিল পশ্চিম প্রান্তেও। পশ্চিম প্রান্তে সবচেয়ে বেশি চলছিল তিনটি এলাকা-বালুরঘাটে, গেদেতে এবং বয়রায়। অক্টোবরের শেষ থেকে প্রায় প্রতিদিনই পাকবাহিনী এই অঞ্চলে হানা দিচ্ছিল। বিভিন্ন ভারতীয় গ্রামের লোক পাক গোলাবর্ষণের ফলে মারাও যাচ্ছিলেন। নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকে পাকিস্তানীরা এই তিনটি ঘাঁটির উপর বড় বড় কামানের গোলাবর্ষণ শুরু করল। ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনী এবং সীমান্ত রক্ষীরা তার জবাবও দিচ্ছিল। কিন্তু এখানেও সেই একই সমস্যা দেখা দিল। পাকিস্তানীরা বাঙ্কারের মধ্যে বসে দূরপাল্লার কামান চালাচ্ছে। কখনও কখনও সেই কামানের গোলাবর্ষণের আড়ালে এসে ভারতীয় গ্রামগুলির উপরও আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। ফলে বাধ্য হয়ে এখানেও ভারতীয় সেনাবাহিনীকে এগিয়ে যেতে হল।

বয়রা অঞ্চলে সীমান্ত হল কপোতাক্ষ নদ। বয়রা থেকে একেবারে সোজা মাইল বারো-তেরোর মধ্যেই যশোর ক্যান্টনমেন্ট। ভারতীয় সেনাবাহিনী কপোতাক্ষের পশ্চিম পাড়ে জড় হতেই যশোর ক্যান্টনমেন্ট থেকে পাক সেনাবহিনীও এগিয়ে এসেছিল। কংক্রিটের প্রতিরক্ষা বাহিনী তখন দিল্লীর নতুন নির্দেশ পেয়ে গিয়েছে। সেই নির্দেশের মর্মকথা,

প্রয়োজন হলে সর্বত্র এগিয়ে গিয়ে ওদের ঘাঁটিগুলো ধ্বংস করে দিয়ে আসবে। যেন ওই সব ঘাঁটি থেকে আক্রমণ চালিয়ে ওরা না এপারের মানুষ মারতে পারে। ভারতীয় বাহিনী তাই কপোতাক্ষ অতিক্রম করে এগিয়ে গেল।

সেদিন ২১ নভেম্বর। ওদিক থেকে এগিয়ে এল পাকবাহিনীও। সঙ্গে নিয়ে এল ১৪টা চীনা স্যাফি ট্যাঙ্ক। ভারী ভারী কামান। এবং প্রায় পাঁচ হাজার সৈন্য।

শুরু হল তুমুল লড়াই। ভারতীয় বাহিনীও বাধ্য হয়ে ট্যাঙ্ক নিয়ে এসেছিল। ট্যাঙ্কে, কামানে, মেশিনগানে প্রচণ্ড যুদ্ধ হওয়ার পর দেখা গেল প্রথম রাত্রির লড়াইয়ের শেষে পাকিস্তানের ছয়'ঘন্টা স্যাফি ট্যাঙ্কই ঘায়েল। গোটা আটেক পিছু হটে পালিয়েছে। ভারতীয় বাহিনী কিন্তু সেখানেই পাকবাহিনীকে ছাড়ল না। আরও এগিয়ে গেল। জগন্নাথপুর এবং গরীবপুর ছাড়িয়ে। পাক সেনাবাহিনী ওখানেও বেশ শক্ত প্রতিরক্ষা ব্যূহ তৈরী করেছিল। দ্বিতীয় দিন আরও বড় লড়াই হল। এবং সেখানে আরও সাতটা পাকিস্তানী স্যাফি ট্যাঙ্ক ঘায়েল হল। দ্বিতীয় দিনের লড়াইয়ে পাকিস্তান তার বিমান বাহিনীকে পুরোপুরিভাবে আসরে নামাল। প্রথম দিনের লড়াইয়েই পাক বিমান বাহিনী যোগ দিয়েছিল। কিন্তু বেশীক্ষণের জন্য নয়। ভারতীয় বিমান বাহিনী আসার আগেই তারা পালিয়ে যায়। দ্বিতীয় দিন পাক বিমান বাহিনীর বিমান আকাশে ওড়া মাত্র ভারতীয় বিমানেও আকাশে উড়ল। শুরু হল বিমানযুদ্ধ। দুপুর বেলা। তিনখানা পাক স্যাবর জেট ধ্বংস হল সেই লড়াইয়ে।

তেরটা ট্যাঙ্ক, তিনখানা বিমান এবং বেশ কিছু সৈন্যসামন্ত হারিয়ে পাক সেনাবাহিনী রণে ভঙ্গ দিল। ভারতীয় সেনাবাহিনী আর এগোলা না। কারণ, তখনও দিল্লী থেকে তেমন নির্দেশ আসেনি। তবে, জগন্নাথপুর আর গরীবপুর ছেড়েও তারা চলে এল না। ওইখানেই ঘাঁটি গেড়ে বসে রইল। এখানেও একই ফল হল। ভারতীয় গ্রামের উপর গোলাবর্ষণ বন্ধ হল। মুক্তিবাহিনী যশোর ক্যান্টনমেন্টের চতুর্দিকে আক্রমণ করার সুযোগ পেল।

এই পর্যায়ে তৃতীয় বড় লড়াই হয় বালুরঘাটে। পূর্বে যেমন আখাউড়া, পশ্চিমে তেমনি হিলি। বালুরঘাট অঞ্চলটা কুঁজের মত এগিয়ে গিয়েছে বাংলাদেশের ভেতরে। এই কুঁজেরই শীর্ষবিন্দু হল হিলি। হিলি শহরটা পশ্চিম বাংলার ভেতরে, কিন্তু হিলি রেল স্টেশন বাংলাদেশের মধ্যে। এই হিলি স্টেশন হয়েই চলে গিয়েছে বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান রেলপথ- যে রেলপথ বাংলাদেশের উত্তর খন্ডের সঙ্গে বাদ বাকি অঞ্চলের যোগাযোগ রক্ষা করছে।

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাকবাহিনী বুঝল মুক্তিসেনারা এই রেলপথটা বিছিন্ন করে দেওয়ার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করবে। তাই শুরু থেকেই তারা হিলি স্টেশনে একটা শক্ত ঘাঁটি তৈরী করল। মুক্তিসেনারা কিন্তু তৎসত্ত্বেও শুরু থেকেই হিলির উপর আক্রমণ চালাচ্ছিল। অক্টোবরের শেষাশেষি ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীও বালুরঘাট অঞ্চলে একটা বড় ঘাঁটি তৈরী করল। পাকিস্তানীরাও ততদিনে হিলির ঘাঁটি আরও শক্ত করেছে। খুব বড় বড় এবং বেজায় মজবুত অসংখ্য বাঙ্কার তৈরী করেছে হিলির চতুর্দিকে। এমনকি রেল ওয়াগন দিয়েও ওরা কয়েকটা শক্ত বাঙ্কার তৈরী করেছিল।

সমগ্র সীমান্তে যখন উত্তেজনা এবং গোলাগুলি চলছে সেই সময় পাকিস্তানী সৈন্যরা ঐ কুঁজের উত্তর ও দক্ষিণ দিক থেকে বালুরঘাটের উপর প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ শুরু করল। প্রথম প্রথম কয়েকদিন ব্যাপারটা শুধু গোলাবর্ষণে সীমাবদ্ধ রইল। তারপর তারা এগোবার চেষ্টা করল তাদের আসল উদ্দেশ্য নিয়ে। সেই উদ্দেশ্য দক্ষিণ দিক থেকে প্রচণ্ড আক্রমণ করে ঐ কুঁজটা কেটে দেওয়া এবং ওইভাবে বালুরঘাটে ভারতীয় সামরিক ঘাঁটিটাকে মূল ভূখন্ড থেকে বিছিন্ন করে ফেলা। এজন্য তারা বাংলাদেশের ধামরাহাট এবং সাপাথের মাঝামাঝি অঞ্চল থেকে ট্যাঙ্ক এবং ভারী কামান নিয়ে ভারতীয় এলাকায় ঢুকে পড়ারও চেষ্টা করল। ওদিকে ভারতীয় বাহিনীও তখন চুপচাপ বসে নেই। কুঁজের উত্তর ও দক্ষিণ দিকে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর প্রস্তুতি দেখেই তারা শত্রুপক্ষের উদ্দেশ্যটা বুঝে গিয়েছিল এবং সেইমত প্রস্তুত হচ্ছিল।

নভেম্বর শেষাশেষি এই অঞ্চলে একটা পুরোদমের লড়াই- ই শুরু হয়ে গেল। প্রথম প্রথম ভারতীয় সেনাবাহিনী শুধু ঘাঁটিতে বসেই পাকিস্তানী গোলার জবাব দিচ্ছিল। কিন্তু যে মুহূর্তে ওরা ট্যাঙ্ক নিয়ে এগিয়ে আসার চেষ্টা করল ভারতীয় বাহিনী ও তখন ট্যাঙ্ক নিয়ে এগিয়ে গেল। ২৫, ২৬ ও ২৭ নভেম্বর গোটা অঞ্চল জুড়ে বড় ট্যাঙ্কের লড়াই হয়ে গেল। এবং শেষদিনের লড়াইয়ে পাক সেনারা এত মার খেল যে ধামরাহাটের দিক থেকে পালাতে বাধ্য হল। এই যুদ্ধে পাকিস্তান মোট পাঁচটা ট্যাঙ্ক হারলো। কিন্তু ট্যাঙ্ক হারিয়ে বা লড়াইয়ে বড় মার খেয়ে ও পাকবাহিনী হিলি স্টেশনের ঘাঁটি ছাড়তে চাইল না। ভারতীয় সেনাবাহিনী অবশ্য হিলি স্টেশন দখল করার জন্য তেমনভাবে অগ্রসর ও হল না।

এইভাবে গোটা সীমান্তে অঘোষিত লড়াই চলতে চলতেই শুরু হয়ে গেল পুরোপুরি যুদ্ধ - ঘোষিত হল পাক - ভারত লড়াই। এবং লড়াই ঘোষনার সঙ্গে সঙ্গেই বাংলাদেশের চতুর্দিক দিয়ে এগিয়ে গেল ভারতীয় সেনাবাহিনী আর বাংলাদেশের বীর মুক্তিযোদ্ধারা। নিয়াজি তখন চোখে সর্ষে ফুল দেখল। এবং এই সর্ষে ফুলেই বাংলাদেশের পাক সেনা নায়ক ইসলামাবাদ থেকে পূর্ণ যুদ্ধের খবর পেয়েও তারা রণকৌশল পাল্টালো না। তখনও তার সেনাবাহিনী এবং কামান-বন্দুক গোটা দেশের সীমান্তেই ছড়ানো রইল। এবং তখনও নিয়াজি সীমান্তের ভারতীয় সেনাবাগহনীকে প্রতিহত করার জন্য ব্যগ্র। এর মধ্যেও কিছুটা বাস্তব বুদ্ধির পরিচয় দিল পাক নবম ডিভিশনের প্রধান জেনারেল আনসারি। তার সদর ঘাঁটি সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল আর ও বেশ কিছুটা ভেতরে-মাগুরায়। শোনা যায় সেটাও প্রধানত কামানের গোলা খাওয়ার ভয়ে। গরীবপুরের লড়াইয়ের পর খোদা যশোর ক্যান্টনমেন্ট ভারতীয় কামানের রেঞ্জের মধ্যে এসে গিয়েছিল। নবম পাক ডিবিশনের হেডকোয়াটার যশোর থেকে সরলো; কিন্তু সৈন্যসামন্ত যেমন সীমান্তে ছিল তেমনি রইল। তখনও পাক সেনানায়কদের সংকল্প, বাঙ্কারে বসে গোরা চালিয়েই পাক-সৈন্যরা ভারতীয় সেনাবাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর অগ্রগতি রোধ করবে।

যে কোনও মুহূর্তে পাকিস্তান সর্বশক্তি দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে, এ খবর নভেম্বরের শেষদিকেই ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনী পেয়েছিল। তাই যে কোন মুহূর্তে লড়াইয়ে নামার জন্য ভারতীয় সেনা, বিমান এবং নৌবাহিনীও প্রস্তুত ছিল। ৩ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় বিমান যখন অতর্কিত ভারতের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল তখন তার জবাব পেতেও মোটেই দেরি হল না। দুই সীমান্তেই জবাব পেল সঙ্গে সঙ্গে। পূর্বেও । পশ্চিমেও।

৩ ডিসেম্বর: ফোর্ট উইলিয়াম থেকে সংকেত পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ৩ তারিখ রাত্রেই ভারতীয় সেনাবাহিনী চতুর্দিক দিয়ে বাংলাদেশের ঢুকে পড়ল। নবম ডিভিশন এগালো গরীবপুর, জগন্নাথপুর দিয়ে যশোর-ঢাকা হাইওয়ের দিকে। চতুর্থ ডিভিশন মেহেরপুরকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল কালিগঞ্জ-ঝিনাইদহের দিকে। বিংশতিতম ডিভিশন তার দায়িত্ব দুভাগে বিভক্ত করে নিল-একটা অংশ রইল হিলির পাক ঘাঁটির মোকাবিলা করার জন্য। আর একটা অংশ হিলিকে উত্তরে রেখে এগিয়ে চলল পুবে। ষষ্ঠ ডিভিশনও তিনভাগে বিভক্ত হয়ে অগ্রসর হল-একটা তেতুলিয়া থেকে ঠাকুরগাঁর দিকে, আর একটা পাটগ্রাম থেকে কালীগঞ্জের মুখে এবং তৃতীয়টা কোচবিহার থেকে নাগেশ্বরী-কড়িগ্রামের দিকে। উত্তরে মেঘালয়ের দিকে যে দুটো ব্রিগেড তৈরী হয়েছিল তারাও ওই রাত্রিতেই এগিয়ে গেল। একটা ঢালু থেকে নেমে এগিয়ে গেল জামালপুরের দিকে। আর একটা, এক বিশেষ উদ্দেশ্যে, একটু এগিয়ে দাঁড়িয়ে রইল হালুয়াঘাটের মুখোমুখি।

পূর্ব দিক থেকেও একই সঙ্গে ৮, ৫৭ এবং ২৩ নং ডিভিশন নানা ভাগে বিভক্ত হয়ে বাংলাদেশে ঢুকল। একটা বাহিনী এল সুনামগঞ্জ থেকে সিলেটের দিকে। ছোট ছোট তিনটা বাহিনী এগিয়ে চলল হবিগঞ্জ এবং মৌলভীবাজারের পথে। আখাউড় কে সোজাসুজি আঘাত করে একটা গোটা ব্রিগেডই এগিয়ে চলল ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দিকে।

ওদিকে কুমিল্লায় ময়নামতি ক্যান্টমেন্টে পাকিস্তানীদের বেশ একটা শক্ত ঘাঁটি ছিল। কমিল্লা সেক্টরের দায়িত্ব ছিল আমাদের ২৩ নং ডিবিশনের উপর। যুদ্ধ শরু হতেই ডিভিশন কুমিল্লা শহরকে পাশ কাটিয়ে।

এগিয় চলল দাউদকান্দির দিকে। ময়নামতি ক্যান্টমেন্টের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার জন্য রেখে গেল মাত্র কয়েক কোম্পানি সৈন্যকে। এই ২৩নং ডিভিশনেরই আর একটা ব্রিগেড চৌদ্দগ্রাম থেকে অগ্রসর হল লাকসামের দিকে। লক্ষ্য চাঁদপুর। পাকবাহিনীও এই আক্রমণ আঁচ করে লাকসাম একটা শক্ত ঘাঁটি তৈরী করে রেখেছিল। এখানেও ভারতীয় বাহিনী সেই একই কৌশল নিল। লাকসামের পাক ঘাঁটিকে ব্যস্ত রাখার জন্য একটা ছোট্র বাহিনীকে রেখে কলামটা এগিয়ে চলল চাঁদপুরের দিকে। পুরে এর একটা বড় বাহিনী এগালো বিলোনিয়া দিয়ে ফেনীর দিকে। লক্ষ্য চট্রগ্রাম যাতায়াতের পথ বন্ধ করে দেওয়া। এই বাহিনীরও সেই একই কৌশল। ফেনীতে পাকিস্তানীরা বেশ শক্ত ঘাঁটি তৈরী করেছিল। শুরুতেই সেই ধখল করার জন্য ভারতীয় বাহিনী কোনও চেষ্টা করল না। একটা ছোট্র বাহিনী রেখে যাওয়া হল ফেনীর পাক সৈন্যদের ব্যস্ত রাখার জন্য। আর মূল বাহিনীর পাশ কাটিয়ে এগিয়ে চলল দক্ষিণ পশ্চিম। পশ্চিম প্রান্তে বিমান হামলার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বিমান এবং নৌবাহিনী ও আসরে নেমে পড়ল। বাংলাদেশের ভারতীয় বিমান এবং নৌবাহিনীর অ্যাকশন শুরু হল ৩রা মধ্যরাত্রি থেকে। বিমান ও নৌবাহিনীর জঙ্গী বিমানগুলি ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে গিয়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন পাক ঘাঁটির ওপর আক্রমণ চালাল। প্রধান লক্ষ্য ছিল অবশ্য ঢাকা ছিল পাক বাহিনীর প্রধান ঘাঁটি। এই ঘাঁটিতে ছিল তাদের জঙ্গী বিমানগুলি। প্রথমে বাংলাদেশে পাক বিমান বাহিনীতে ছিল দুই স্কোয়াড্রন মার্কিনী স্যাবর জেট। যুদ্ধ শুরু হওয়ার কিছুদিন ইয়াহিয়া খাঁর নিদেশে মিগ-১৯ বিমানগুলি পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হল। বাংলাদেশে থাকল শুধু স্যাবরগুলি। তারও কয়েকটা ঘায়েল হয়ে গিয়েছিল বয়রার লড়াইয়ে।

বাংলাদেশের কাজে নেমেই ভারতীয় বিমান বাহিনীর প্রধান লক্ষ্য হল পাকিস্তানী জঙ্গী বিমানগুলিকে শেষ দেওয়া-যাতে অন্তরীক্ষে শত্রুপক্ষ কিছুই না করতে পারে, যাতে লড়াইয়ের শুরুতেই আকাশটা মিত্রপক্ষের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে।

সেই উদ্দেশ্য নিয়েই ৩রা মধ্যরাত্রে ভারতীয় বিমান বাহিনী একেবারে তেজগাঁও আক্রমণ করল। ঐ বিমানবন্দরেই পাকিস্তানের সব জেট মজুত ছিল। কারণ গোটা বাংলাদেশের তখন ওই একটি মাত্র বিমানবন্দর যেখান থেকে বিমান উড়তে পারে। ভারতীয় মিগ সেই ঘাঁটিতে হানা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানী স্যাবার জেট গুলিও বাধা দিতে এগিয়ে এল। প্রায় সারারাত ধরে চলল ঢাকার বিমানযুদ্ধ। পথম রাত্রির আক্রমণেই পাকবাহিনীর অর্ধেক বিমান ধ্বংস হয়ে গেল। বিমানবন্দর এবং কুর্মিটোলা ক্যান্টনমেন্টও নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হল।

ভারতীয় বিমান এবং নৌবাহিনীর বিমানগুলি সেদিন যে শুধু ঢাকা আক্রমণ করেছিল তাই নয়। আক্রমণ করেছিল কুমিল্লা, চাঁদপুর, নারায়লগঞ্জ, চট্রগ্রাম, কক্সবাজার এবং চাঁদপুরের অভিযান চালিয়েছিল প্রধানত নৌবাহিনীর বিমানগুলি। চট্রগ্রাম নৌবন্দরের প্রায় অর্ধেকটাই ধ্বংস হয়ে গেল। বন্দরের তেলের ডিপোগুলিও জ্বলে উঠল দাউ দাউ করে।

এর মধ্যে পাক বিমান বাহিনীর জঙ্গী বিমানগুলি একবার কলকতা শহরেও হানা দেওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু প্রতিবারই তাদের ফিরে যেতে হল। আমাদের বিমান বাহিনীর বিমানগুলি সেদিন প্রায় রাত ধরে কলকাতা শহরকে পাহারা দিয়েছিল।

৪ ডিসেম্বর সকালে প্রতিরক্ষা দফতরের প্রধানরা আলোচনায় বসে দেখলেন ভারতীয় বাহিনী পূর্বখন্ডে ঠিক ঠিকই এগিয়েছে। প্রথমত, তারা কোথাও শহর দখলের জন্য অগ্রসর হয়নি।

দ্বিতীয়ত, কোথাও শক্ত পাক ঘাঁটির সঙ্গে বড় লড়াইয়ে আটকে পড়েনি।

তৃতীয়ত, পাকিস্তানী সমরনায়করা তখনও বুঝতে পারেনি ভারতীয় বাহিনী ঠিক কোনদিন দিয়ে ঢাকা পৌছতে চাইছে। বরং তখনও তারা মনে করছে ভারতীয়বাহিনী সবদিক দিয়েই রাজধানী দিকে অগ্রসর হচ্ছে, এবং তখনও ভাবছে ভারতীয় বাহিনী সীমান্তের মূল পাক ঘাঁটিগুলির উপরই আক্রমন চালাবে।

চতুর্থত, ব্যাপক বিমান এবং স্থল আক্রমণে শত্রুপক্ষকে একেবারে বিহ্বল করে দেওয়া গিয়েছে।

পঞ্চমত, পাক বিমান বাহিনীকে অনেকটা ঘায়েল করে ফেলা হয়েছে। তাদের বিমান ঘাটিগুলিও বিধ্বস্ত।

ষষ্ঠত, পাকিস্তানের প্রধান নৌবন্দর গুলি অর্থাৎ চট্টাগ্রাম, কক্সবাজার, চালানা,চাঁদপুর এবং নারায়ণগঞ্জে জাহাজ বা স্টীমার ভেড়াবার ব্যাবস্থাও অনেকটা বিপর্যস্ত। এবং

সপ্তমত, বাংলাদেশের সাধারণ নাগরিক এবং বাড়িঘরও মোটেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। সেনা, বিমান এবং নৌবাহিনী তাই যুদ্ধের দ্বিতীয় দিনেও পূর্ব লক্ষ্য মতই এগিয়ে চলল।

পশ্চিম দিকে থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং মুক্তিফৌজের সব ক'টা কলামপুরে এগিয়ে চলল। কিন্তু কোথাও তারা সোজাসুজি পাক ঘাঁটিগলির দিক এগালো না। মূল বাহিনী সর্বদাই ঘাঁটিগুলিকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে চলল। এবং ঘাঁটিতে অপেক্ষমাণ পাকবাহিনী যাতে মনে করে যে ভারতীয় বাহিনী তাদের দিকেই এগিয়ে আসার চেষ্টা করছে সেই জন্য প্রত্যেক পাক ঘাঁটির সামনে ভারতীয় গোলন্দাজ বাহিনীর কিছু কিছু লোক রেখে যাওয়া হল।

ওদিকে মূল ভারতীয় বাহিনী যে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে পাকিস্তানীরা সে খবরও পেল না। কারণ, প্রথমত, তাদের সমর্থনে দেশের লোক ছিল না, যার খবরাখবর দিত পারে। দ্বিতীয়ত, তাদের বিমান বাহিনীও তখন বিধ্বস্ত। সর্বএ উড়ে পাক বিমান ভারতীয় বাহিনীর অগ্রগতির খবরাখবর পাক সেনাবাহিনীকে জানতে পারল না। তৃতীয়ত, বাংলাদেশে পাক বাহিনীর বেতার খবরাখবর পাঠাবার ব্যবস্থাও তেমন ভাল ছিল না। সুতারাং, নিজস্ব ব্যবস্থায়ও তারা খবরাখবর পেল না।

তাই ভারতীয় বাহিনী যখন সোজাসুজি যশোর, হিলি, শ্রীহট্ট, কুমিল্লা, ফেনী প্রভৃতি শক্ত পাক ঘাঁটির দিকে না গিয়ে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল তখন পাক বাহিনীর অধিনায়করা তা মোটেই বুঝতে পারল না। বরং ভারতীয় গোলন্দাজ বাহিনীর গোলাবর্ষণের বহর দেখে তখনও তারা মনে করছে ভারতীয় বাহিনী সোজাসুজিই এগোবার চেষ্টা করছে। সেইজন্য তখনও তারা মূল সড়কগুলি আগলে বসে রাইল। সীমান্তের কাছাকাছি শহরগুলিতে তখনও পাকবাহিনীতে অধিষ্ঠিত একমাত্র কুষ্টিয়া জেলার দর্শনা ছাড়া। দর্শনা যে মুহূর্তে আমাদের ৪নং পাবত্য ডিভিশনের কামানের পাল্লার মধ্যে এসে গেল পাকিস্তানীরা অমনি শহর ছেড়ে আরও পশ্চিমে পালাল।

এদিকে তখন ভারতীয় বিমান এবং নৌবাহিনীও প্রচণ্ড আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। লড়াইয়ের দ্বিতীয় দিনেও ভারতীয় বিমান এবং নৌবাহিনীর জঙ্গী বিমানগুলি বার বার ঢাকা, চট্রগ্রাম, চালনা প্রভিতি এলাকায় সামরিক ঘাঁটিগুলির ওপর আক্রমণ চালাল। ঢাকায় সেদিনও জোর বিমান যুদ্ধ হল। কিন্তু সেইদিনই প্রায় শেষ বিমান যুদ্ধ। অধিকাংশ পাক বিমানই ঘায়েল হল। বিমান বন্দরগুলিও প্রচন্ড ক্ষতিগ্রস্ত হল।

ওদিকে তখন মিত্রবাহিনীও প্রচণ্ড গতিতে এগিয়ে চলেছে- প্রধান সড়ক এবং পাক ঘাঁটিগুলি এড়িয়ে। তখনও পর্যন্ত প্রধান লক্ষ্য, বাংলাদেশের চতুর্দি কে কে ছড়ানো পাকবাহিনীকে পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছন্ন করে দেওয়া এবং আবার যাতে একত্র হয়ে ঢাকা রক্ষার জন্য কোন বড় লড়াইয়ে নামতে না পারে তার ব্যবস্থা করা।

৫ডিসেম্বর: লড়াইয়ের তৃতীয় দিনেই স্বাধীন বাংলার আকাশ স্বাধীন হয়ে গেল। বাংলাদেশে পাক বাহিনীর প্রায় সব বিমান এবং বিমানবন্দরই তখন বিধ্বস্ত। গোটা দিন ভারতীয় জঙ্গী বিমানগুলি অবাধে আকাশে উড়ে পাক সামরিক ঘাঁটিগুলিতে প্রচণ্ড আক্রমণ চালাল। ভারতীয় বিমান বাহিনীর হিসাব মত বারো ঘণ্টায় দু''শ

ত্রিশবার। তেজগাঁও এবং কুরমিটোলা বিমান ঘাঁটিতে পঞ্চাশ টনের মত বোমা ফেলল। কুরমিটোলা রানওয়েতে গোটা কয়েক হাজার পাউণ্ড বোমা ফেলায় ছোটখাটো কয়েকটা পুকুরই সৃষ্টি হয়ে গেল। পাক বিমান বাহিনীর শেষ স্যাবর জেট তিনটা ঐখানে আটকে ছিল। রানওয়ে বিধ্বস্ত হওয়ায় ছাউনিতেই সেগুলিকে আটকে থাকতে হয়। ভারতীয় বিমানের আক্রমণে সেদিন বড় রাস্তা দিয়ে পাক সেনাবাহিনীর যাতায়াতও প্রায় বন্ধ হয়ে গেল। পাকবাহিনীর প্রত্যেকটা কনভয়ের উপর ভারতীয় জঙ্গী বিমানগুলি আক্রমণ চালাল। ওদের নববুইটা গাড়ি ধ্বংস হল। ধ্বংস হল পাকিস্তানী সৈন্য বোঝাই বেশ কয়েকটা লঞ্চ এবং স্টীমারও।

জামালপুর আর ঝিনাইদহের পাক সামরিক ঘাঁটিও ভারতীয় বিমানের আক্রমণ বিধ্বস্ত হল।তেজগাঁও এবং কুর্মিটোলের বিমানবন্দর ধ্বংস ভারতীয় জঙ্গী বিমানগলি সারাদিন ধরে গোটা বাংলাদেশের সবক'টা বিমানবন্দরে হানা দিল। উদ্দেশ্য, আর কোথাও পাক বিমান আছে কিনা খুঁজে দেখা। কিন্তু কোথাও আর একটা ও পাক বিমান খুঁজে পাওয়া গেল না। পরে নিজেদেরই অর্থাৎ মিত্রপক্ষেরই কাজে লাগবে এই ভেবে ভারতীয় বিমান বাহিনী অধিকাংশ বিমান বন্দরকেই অক্ষত অবস্থায় ছেড়ে দিল।

পূর্ব খন্ডে ভারতীয় নৌবাহিনী ও সেদিন বিরাট সাফল্য অর্জন করেছে। বঙ্গোপসাগরে পাক সাবমেরিন ‘গাজী’ সেদিন ভারতীয় নৌবাহিনীর আক্রমণ শেষ হল। সাবমেরিন ‘গাজী’ ছিল পাক নৌবহরের গর্বের বস্ত।

ওইদিন ভারতীয় নৌবাহিনী প্রত্যেকটা নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের জাহাজকে হুশিয়ার করে দিল। প্রধান হুশিয়ারীটা চট্রগ্রাম বন্দর সম্পর্কে বলা হলঃ আপনারা সবাই চট্রগ্রাম বন্দর ছেড়ে চলে আসুন। আপনাদের স্বার্থ এবং নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে আমরা শনিবার চট্রগ্রাম উপর তেমন প্রচণ্ড ভাবে গোলাবর্ষণ করিনি। আজ রবিবার আপনাদের কথা চিন্তা করে আমরা শনিবার চট্রগ্রাম উপর তেমন প্রচণ্ডভাবে গোলাবর্ষণ করিনি। আজ রবিবার আপনাদের বন্দর থেকে বেরিয়ে আসার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। কাল সোমবার আমরা প্রচন্ডভাবে আক্রমণ চালাব। সুতরাং কাল থেকে আপনাদের নিরাপত্তা সম্পর্কে আমরা কোনও নিশ্চয়তা দিতে পারব না।

এই ‘ওয়ানিং’ এ দু'টো কাজ হল। (এক) বিশ্বের সব দেশ বুঝল বাংলাদেশের বন্দরগুলি রক্ষা করার কোনও ক্ষমতা আরপাক বাহিনীর নেই। এবং (দুই) ভারতীয় নৌবাহিনীর জাহাজ ও বিমানগুলি বাংলাদেশের সব বন্দরকে ঘায়েল করার অবাধ সুযোগ পেল।

এদিকে তখন স্থলে মিত্রবাহিনী ও এগিয়ে চলেছে। পাক স্থলবাহিনীর বিভিন্ন ইউনিটের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রায় বিচ্ছিন্ন। প্রধান সড়কগুলি দিয়ে না এগিয়ে ও ভারতীয় বাহিনী বিভিন্ন সেক্টরে প্রধান প্রধান সড়কের কতকগুলি এলাকায় অবরোধ সৃষ্টি করল। ফলে, ঢাকার সঙ্গে কুমিল্লা, চট্রগ্রাম ও সিলেটের, নাটোরের সঙ্গে ঢাকা ও রংপুরের এবং যশোরের সঙ্গে নাটোর ও রাজশাহীর যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল । শুধু ঢাকার সঙ্গে যশোর এবং খুলনার যোগাযোগ তখনও অব্যহত। কতকগুলি ঘাঁটি সেদিন কিছুটা লড়াইও হল। একটা বড় লড়াই হল লাকসামে। আর একটাহল ঝিনাইদহের কাছে কোট চাঁদপুরে। দু'টো লড়াইয়েই পাক সৈন্যরা বেজায় মার খেল এবং ঘাটি দু'টো ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হল।

এই দু'টো ঘাঁটি দখলের চেয়েও কিন্তু মিত্রবাহিনীর বড় লাভ হল পাকবাহিনীর যোগাযোগ ব্যবস্থাটা প্রায় বিচ্ছিন্ন করে দিত পারায়। এটাই ছিল প্রথম পর্যায়ে তাদের বড় লক্ষ্য, যাতে পাক সেনাবাহিনী কিছু হটে গিয়ে আবার না রিগ্রুপড হতে পারে-ঢাকা রক্ষার লড়াইয়ের জন্য পদ্মা ও মেঘনার মাঝখানে কোন ও নতুন শক্ত ব্যূহ না রচনা করতে পারে। বিভিন্ন বড় সড়কে অবরোধ সৃষ্টি করে মিত্রবাহিনী সীমান্তের ঘাঁটিগুলি থেকে পাকবাহিনীর ঢাকার দিকে ফেরার পথ প্রায় বন্ধ করে দিল। এ ব্যাপারে তাদের আরও সুবিধা হল আকাশে ভারতীয় বিমান বাহিনীর একাদিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ায়। গোটা বাংলাদেশের সব বড় সড়ক ও নদীর উপর তখন ভারতীয় জঙ্গী বিমান পাহারা দিচ্ছে। এবং পাক সেনাবাহিনীর কনভয় চোখে পড়লেই তাকে আক্রমণ করছে।

এই রকম যখন অবস্থা তখন নিয়াজিও সবটা বুঝতে পারল। চতুর্দিক থেকে মিত্রবাহিনীর অগ্রগতির খবর পৌঁছল ঢাকায়। আর পৌঁছল পাকবাহিনীর বিপর্যয়ের সংবাদ। নিয়াজি আরও জানতে পারল যে মিত্রবাহিনীর

সবক'টা কলাম মূল পাক ঘাঁটি এবং সুরক্ষিত পথগুলি এড়িয়ে এগিয়ে আসছে। পাক সমরনায়কদের তখন বুঝতে অসুবিধা হল না যে, মিত্রবাহিনীর মূল উদ্দেশ্য বিভিন্ন পাক ঘাঁটির যোগাযোগ কেটে দেওয়া। এবং পেছন থেকে পাক ঘাঁটিগুলির উপর অতর্কিত আক্রমণ করা। নিয়াজি এবং ঢাকার পাক সমরনায়করা ততক্ষণে আরও বুঝে গিয়েছে যে,মিত্রবাহিনী শুধু বাংলাদেশের অঞ্চল বিশেষ দখল করতে চায় না- তারা চায় গোটা বাংলাদেশের পাক বাহিনীকে পরাজিত করতে। তারা বুঝল মিত্রবাহিনী ঢাকার দিকে এগোবেই।কিন্তু তখনওতারা এটা ঠিক বুঝতে পারেনি যে, মিত্রবাহিনীর কোন কোন কলাম ঢাকার দিকে এগিয়ে আসবে। নিয়াজি তাই অন্যান্য পাক সমরনায়কদের সঙ্গে পরামর্শ করে সেইদিনই সর্বএ হুকুম পাঠিয়ে দিল-পুল ব্যাক। পুল ব্যাক করে তাদের ঢাকার কাছাকাছি অর্থাৎ পদ্মা- মেঘনার মাঝামাঝি অঞ্চলে ফিরে আসতে বলা হল।

৫ ডিসেম্বর সন্ধ্যে বেলায়ই সেই হুকুম সবগুলি পাক সামরিক ঘাঁটিতে চলে গেল।

৬ ডিসেম্বর : ৬ ডিসেম্বর সূর্য ওঠার আগেই কতকগুলি সীমান্ত ঘাটি থেকে পাকবাহিনীর পিছু হটা শুরু হল। কোনও কোনও ঘাঁটির পাক অধিনায়করা আবার অ্যাডভান্স পার্টি পাঠিয়ে পেছেনের খবর সংগ্রহের চেষ্টা করল। এবং অনেকেই দেখল পেছনের অবস্থাও ভাল নয়। একে তো যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন, তার উপর আবার বহু এলাকায় পেছনে গিয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনী ঘাঁটি করে বসে গিয়েছে। নিয়াজির 'পুল ব্যাক নিদের্শের পর তাই গোটা বাংলাদেশের পাকবাহিনীতে ইকটা সত্যিকারের অবাজক অবস্থা সৃষ্টি হল।

অধিকাংশ পাক সীমান্ত ঘাঁটির সামনেই থখন এক সমস্যা- সীমান্তে ঘাঁটিতে বসে থাকার চেষ্টা করলেও মৃত্যু অনিবার্য, আবার পিছাতে গেলেও বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী। কয়েকটা সীমান্তে ঘাঁটি থেকে তাই নিয়োজিকে জানান হল, পুল ব্যাক করার চেয়ে শক্ত বাঙ্কারে ঘেরা বসে লড়াই চালিয়ে যাওয়াই শ্রেয়।

কুরমিটোলার নির্দেশ তাই সর্বত্র সমানভাবে পালিত হল না। কোথাও পূর্ণ পুল ব্যাক হল। কোথাও হল আধা - পুল ব্যাক। কোথাও আবার যেমন ছিল তেমনই রইলা। যেসব ঘাঁটিতে ওরা থেকে গেল সেগুলির মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য ময়নামতি, চট্রগ্রাম, জামালপুর এবং হিলি। যেসব ঘাঁটি থেকে পালাল সেগুলির মধ্যে সবচেয়ে আগে নাম করতে হয় শ্রীহট্ট এবং যশোরের।

শ্রীহট্ট এবং যশোরের চতুর্দিকে পাকবাহিনী যতগুলি ঘাঁটি করেছিল সবগুলিই ছেড়ে পালাল। পাক নবম ডিভিশনের ইপর পদ্মার দক্ষিণের গোটা অঞ্চলটা রক্ষার দায়িত্ব ছিল। আগেই বলা হয়েছে যে, আনুষ্ঠানিকভাবে লড়াই শুরু হওয়ার আগেই পাক নবম ডিভিশনের সদর দফতর যশোর ক্যান্টনমেণ্ট থেকে সরিয়ে মাগুরার নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সদর দফতর সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরও কিন্তু নবম ডিভিশনের সৈন্যসামন্ত ঠিকই সীমান্তে ছিল। চৌগাছায় পরাজয়ের পর তারা তিনভাগে ছড়িয়ে ছিল। ঝিনাইদাহ-মেহেরপুর অঞ্চলে একটা অংশ, ঝিকরগাছার উত্তর-পশ্চিমে আর একটা অংশ এবং সাতক্ষিরা থেকে খুলনা পর্যন্ত আর একটা অংশ।

৫ ডিসেম্বর মাঝরাতে ভারতীয় চতুর্থ ডিভিশন আঘাত হানল ঝিনাইদাহের উত্তর-পশ্চিমের পাকবাহিনীর উপর। প্রায় একসঙ্গে ভারতীয় নবম ডিবিশন ঘা দিল ঝকরগাছ থেকে ঝিনাইদহের পশ্চিমে ছড়ানো অংশটার উপর। এই দুই প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়েই পাকবাহিনী একেবারে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। এবং দুদিক থেকে মিত্রবাহিনীর দুটো কলাম যশোর-ঢাকা হাইওয়ের ওপর এস দাঁড়াল। ততক্ষণে নিয়াজির পুল ব্যাক অর্ডার ও এসে গিয়েছে। ৬ ডিসেম্বর ভোর থেকেই তাই গোটা পাক নবম ডিবিশনের পলায়ন পর্ব শরু হয়ে গেল। ইচ্ছা ছিল গোটা বাহিনীটাই ঢাকার দিকে পালাবে। কিন্তু তা পারল না।কারণ ততক্ষণে ভারতীয় চতুর্থ এবং নবম ডিবিশন যশোর-ঢাকা হাইওয়ের দুটো অঞ্চলে ঘাঁটি করে বসেছে। বাধ্য হয়ে তাই পাক নবম ডিবিশনের একটা অংশ পালাল মাগুরা হয়ে মধুমতী ডিঙ্গিয়ে ঢাকার পথে। আর একটা অংশে পালাল খুলনার দিকে। কুষ্টিয়ার দিক দিয়ে ও পালাল একটা ছোট্র অংশ। সাতক্ষিরা অঞ্চলে যে পাকবাহিনীটা ছিল এতদিন তাদের সঙ্গে লড়াই চালাচ্ছিল প্রধানত মুক্তিবাহিনীর সৈন্যরা এবং বি-এস-এফের সেপাইরা। পুল ব্যাক অর্ডারের সঙ্গে সঙ্গে তারাও

পালাল খুলনার দিকে। পালাবার সঙ্গে সঙ্গে সবক'টা বাহিনীই রাস্তায় ওপারের সব ব্রীজ ভেঙ্গে যাওয়ার চেষ্টা করল। শ্রীহট্রেরও তখন প্রায় একই অবস্থা। দুপা'শ দিয়ে এগিয়ে মিত্রবাহিনীর শ্রীহট্রের পশ্চিমে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। পূর্বদিক থেকে একটা গোলান্দাজ বাহিনীও শ্রীহট্রের উপর গোলাবর্ষণ করে চলেছে। শ্রীহট্রের পাক সমরনায়ক পুল ব্যাক অর্ডার পাওয়া মাত্র পিছিয়ে যাওয়া চেষ্টা করল। ইচ্ছা ছিল আশুগঞ্জ থেকে মেঘনা অতিক্রম করে ঢাকার দিকে যাবে। কিন্তু পারল না। কিছুটা পিছিয়েই দেখল,সম্ভাব নয়-মিত্রবাহিনী তার আগেই পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছে। তখন গোটা বাহিনীটাকে দুভাগে ভাগ করা হল। একটা থাকল শ্রীহট্রে। আর একটা পেছনের দিকে দাঁড়িয়েছে। তখন গোটা বাহিনীটাকে দুভাগে ভাগ করা হল। একটা থাকলে শ্রীহট্রে। আর একটা পেছনের দিকে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করল। দু' দলই লড়াইয়ে হেরে গেল। শ্রীহট্রের বাহিনীটা বাঙ্কারে বসে ভালই লড়ল। ওই বাহিনীকে ঘায়েল করতে ভারতীয় বিমান বাহিনীকে ও বেশ কয়েক টন বোমাবর্ষণ করতে হল। সমগ্র বাংলাদেশেই মিত্রবাহিনী তখন দ্রুত এগিয়ে চলেছে। তখন ও এই লক্ষ্য-যাতে পিছু হটে গিয়ে পাকবাহিনী কোথাও না জড় হতে পারে, যাতে সীমান্তের কোনও পাকসৈন্য না ঢাকায় পৌঁছতে পারে।

৭ ডিসেম্বর: কার্যত যশোরের পতন হয়েছিল আগের দিনই। ৬ তারিখ সন্ধ্যা হত না হতেই পাকবাহিনীর সবাই যশোর ক্যান্টনমেন্ট ত্যাগ করে পালিয়ে যায়। কিন্তু ভারতীয় বাহিনী তখনই সে খবরটা পায়নি। ৭ ডিসেম্বর বেলা সাড়ে এগারটা নাগাদ ভারতীয় নবম ডিবিশনের প্রথম কলামটা উত্তর দিক দিয়ে যশোর ক্যান্টনমেন্টের কাছে এসে পৌছল। তখনও তারা জানে না যশোর ক্যান্টমেন্টর শূন্য। তখনও তাদের কাছে খবর, পাকবাহিনী যশোর রক্ষার জন্য বিরাট লড়াই লড়বে। কিন্তু মিত্রবাহিনীর কলামটা যতই এগিয়ে এল ততই আশ্চর্য হয়ে গেল। কোন ও প্রতিরোধ নেই! সামনে থেকে একটাও গোলগুলি আসছে না!প্রায় বিহবল অবস্থায় যখন কলামটা একেবারে ক্যান্টেনমেন্টর সামনে এসে দাঁড়াল তখন বুঝতে পারল ব্যাপারটা। জন্য দশ-পনেরো লোক "জয়বাংলা" ধ্বনি দিয়ে তাদের সামনে এসে দাঁড়াল। জড়িয়ে ধরে তাদের সম্বর্ধনা জানাল। আর জানাল যে, আগের দিন সব পাকসেনা যশোর ছেড়ে পালিয়েছে। ভারতীয় বাহিনী তখন গোটা ব্যাপারটা বুঝল। দেখতে দেখতে বেশ লোক এসে সেখানে জড় হল। তারাই ক্যান্টনমেন্টের ভেতরটা চিনিয়ে দিল ভারতীয় বাহিনীকে। পাক সেনারা যে ট্যাঙ্ক,কামান এবং ট্রাক-জিপ নিয়ে খুলনা পালিয়েছে যশোরের নাগরিকরা তাও ভারতীয় বাহিনীকে জানাল। সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় বাহিনী ছুটল খুলনার পথে।

ওদিকে তখন নবম ডিবিশনের সদর ঘাঁটিতেও সব খবর পৌছে গিয়েছে। ডিভিশনের প্রধান মেঃ জেনারেল দলবীর সিং বয়রা-ঝিকরগাছের পথ ধরে গোটা নবম ডিভিশনের নিয়ে এগিয়ে এলেন যশোর শহরে। যশোর ক্যান্টনমেন্ট পাক নবম ডিভিশনরে মত আমাদের নবম ডিবিশনের সদর দফতর হল।

শ্রীহট্রের ও পতন হল ওই দিনই দুপুরে। প্রথমে ভারতীয় ছত্রীসেনারা নামল শ্রীহট্রের নিকটবর্তী বিমানবন্দর শালুটিকরে। খুব ভোরে। তারপর চতুর্দিক থেকে মিত্রবাহিনী শ্রীহট্রের পাক ঘাঁটিগুলির উপর আক্রমণ চালাল। দুপুর বেলায়ই শ্রীহট্রের পাক সেনানায়ক আত্মসমর্পন করতে বাধ্য হল।

৮ ডিসেম্বর: বৃহস্পতিবার সকালে মিত্রপক্ষের সামরিক নেতার পূর্ব রণাঙ্গনের সমগ্র পরিস্থিতিটা বিশ্লেষণ করে দেখলেন, তাঁদের প্রথম লক্ষ্য সফল হয়েছে। বাংলাদেশের নানা খন্ডে পাক সেনাবাহিনী বিচ্ছিন্ন এবং অবরুদ্ধ। ঢাকার দিকে পালাবার কোন পথ নেই। দক্ষিণে একটা পাকবাহিনী আটকে পড়েছে খুলনার কাছে। ওরের গোটা পাকবাহিনী ও ব্রক্ষপুএ এবং পদ্মার মধ্যবর্তী তিন-চারটা অঞ্চলে অবুরুদ্ধ। একটি বড় বাহিনী, প্রায় একটা ব্রিগেড, হিলির কাছে অবরুদ্ধ। আর একটা ব্রিগেড আটকে রয়েছে জামালপুরে। ময়মনসিংহ থেকে যে বাহিনীটা সরিয়ে শ্রীহট্রের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সিটা কার্যত ফিনিসড। ময়নামতি ক্যান্টনমেন্টে অবরূদ্ধ আর একটা ব্রিগেড। আর একটা বড় পাকবাহিনী অবরুদ্ধ চট্রগ্রামে। একের সঙ্গে আর একের যোগ দেওয়ার কোন ও সুযোগ নেই। ঢাকার দিকে পিছু হটাও কারও পক্ষেই সম্ভব নয়।

মিত্রবাহিনীর কর্তারা তখন তিনটা ব্যবস্থা নিলেন। প্রথম ব্যবস্থায়, গোটা পাক সেনাবাহিনীকে আত্মসমর্পন করতে বলা হল। দ্বিতীয় ব্যবস্থায়, জেনারেল সগৎ সিংকে বলা হল তাঁর অন্তত তিনটা কলাম খুব দ্রুত ঢাকার দিকে এগিয়ে নিত। তৃতীয় ব্যাবস্থায়, একটা ব্রিগেডকে যথাশীঘ্র সম্ভব হালুয়াঘাটের দিকে থেকে ময়মনসিংহের দিকে নিয়ে আসা হল।

যুদ্ধের শুরুতেই ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল মানেকশ বাংলাদেশের দখলদার পাকবাহিনীর উদ্দেশে আত্মসমর্পনের আহবান জানিয়েছিলেন। ৮ডিসেম্বর আবার তার সেই আবেদন নানা ভাষায় বার বার আকাশবাণী থেকে প্রচার করা হল। তিনি পাকসেনাদের আত্মসমর্পণ করতে বললেন এবং সঙ্গে সঙ্গে এই আশ্বাস দিলেন যে, আত্মসমর্পণ করলে পাকবাহিনীর প্রতি জেনেভা কনভেনশনের রীতি অনুসারে সম্মানজনক ব্যবহার করা হবে। জেনারেল মানেকশ বললেন: আমি জানি আপনারা পালাবার জন্য বরিশাল এবং নারায়ণগঞ্জের কয়েক জায়গার জড় হচ্ছেন। আমি এও জানি, এখান থেকে আপনার উদ্ধার করা হবে বা পালাতে পারবেন এই আশাতেই আপনারা ওসব জায়গার নিয়ে মিলিত হচ্ছেন। কিন্তু আমি সমুদ্রপথে আপনাদের পালাবার সব পথ বন্ধ করে দিয়েছি। এজন্য নৌবাহিনীকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এখন ওযদি আপনার আমার পরামর্শ না শোনেন এবং ভারতীয় বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পন না করেন তাহলে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে কেউ আপনাদের রক্ষা করতে পারবে না।

বাংলাদেশের পূর্ব সীমান্তে থেকে জেনারেল সগৎ সিং এর প্রায় সবক'টা ডিভিশনই তখন প্রচণ্ড গতিতে পশ্চিমের দিকে এগোচ্ছিল। একটা এগোচ্ছিল ব্রাহ্মণবাড়িয়া দখল করে আশুগঞ্জের দিকে। আশুগঞ্জে মেঘনার একটা বাহিনী। ওদিকে সেদিন কুমিল্লার ও পতন ঘটেছে। ওই সেক্টরের সব পাকসৈন্য গিয়ে ময়নামতি ক্যান্টনমেন্টে আশ্রয় নিল। মিত্রবাহিনী প্রধান জেনারেল অরোরা সেদিন হেলিকপ্টারে কুমিল্লা ঘরে এলেন। ময়নামতিকে পাশ কাটিয়ে আর একটা বাহিনী দ্রুত অগ্রসর হল চাঁদপুরের মুখে। সবক'টা বাহিনীরই লক্ষ্য ঢাকা। যদি প্রয়োজন হয় তাহলে যাতে এই বাহিনীর নদী পথেই নারায়ণগঞ্জ-ঢাকার দিকে অগ্রসর হতে পারে। এই বাহিনীর আর বাহিনীর একটা লক্ষ্য ছিল চাঁদপুর বন্দর থেকে মেঘনা ও পদ্মার নদীপথের ওপর নজর রাখা।

বাংলাদেশের লড়াইয়ে নামতে হতে পারে এই কথা ভাবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় প্রতিরক্ষা দফতরের কর্তারা ঠিক করে রেখেছিলেন ঢাকার ওপর প্রধান আক্রমণটা করা হবে উত্তর দিক দিয়ে। ময়মনসিংহ টাঙ্গালের পথে একটা বড় বাহিনীকে দ্রুত নিয়ে যাওয়া হবে ঢাকায়। ওপথে নদীনালা খুব কম। সেই উদ্দেশ্যে গোড়া থেকেই তাঁরা গারো পাহাড়ে দু'ব্রিগেড সৈন্য মজুত করেছিলেন। বেশী সৈন্য ওই পথে জড় করেননি, কারণ ভয় ছিল যে, তাহলে পাকিস্তানীরা খবরটা আগাম পেয়ে যাবে এবং আগে থেকেই পথে জড় প্রতিরক্ষাবূহ রচনা করে রাখবে। সেই জন্য ওপথে কম সৈন্য জড় করা হল। এবং ঠিক করে রাখা হল যে পদাতিক সৈন্য টাঙ্গালের কাছাকাছি পৌছবার পর ওখানে একটা ছত্রীবাহিনীও নামানো হবে।

পাক-সমরনায়করাও ধরে রেখেছিল যে ভারত উত্তর দিক দিয়ে একটা বড় সেনাবাহিনী নামাবার চেষ্টা করবেই। সেই জন্য তারা জামালপুরের কাছে একটা শক্ত ঘাঁটি তৈরি করে রেখেছিল। আর একটা ছোট ঘাঁটি করে রেখেছিল হালুঘাটের কাছে। লড়াই শরু হতেই ১০১ নং কমিউনিকেশন জোনের একটা ব্রিগেড এগালো জামালপুরের দিকে।আর একটা গেল হালুয়াঘাটের কাছে। হালুয়াঘাটের সীমান্তবর্তী ভারতীয় বাহিনী প্রথমে অগ্রসর হল না। দু'চারদিন ওখানেই অপেক্ষা করল। জামালপুরে বড় লড়াই শুরু হতে পাক সামরিক নেতারা তাদের হালুয়াঘাটের বাহিনীকে সরিয়ে নিয়ে গেল জামালপুরের দিকে। আর ময়মনসিংহ থেকে একটা ব্রিগেড নিয়ে শ্রীহট্ট -ভৈরববাজার সেক্টরে। তারা তখন ভাবতেও পারেনি যে একটা ভারতীয় ব্রিগেড হালুয়াঘাটের মুখে অপেক্ষা করছে। হালুয়াঘাট থেকে ভারতীয় বাহিনীটা খুব দ্রত এগিয়ে এল ময়মনসিংহের দিকে। পথে বড়

কোন বাধাই পেল না। কারণ একটা পাকবাহিনী লড়াই করেছে জামালপুরে আর একটা গিয়েছে ভৈরববাজার-সিলেট সেক্টর। একই বিমান আক্রমণ ও বাড়ানো হল। বিমান ও নৌবাহিনীর জঙ্গী বিমানগুলি সারাদিনে অসংখ্যবার বিভিন্ন পাক সামরিক ঘাঁটিতে আক্রমণ চালাল। বিমান আক্রমনের ভয়ে দিনের বেলা পাক সামরিক বাহিনীর চলাচলও প্রায় বন্ধ হয়ে গেল। পরিকল্পনা মতই বিমান আক্রমণ বৃদ্ধি করা হল। লক্ষ্যটা একই। প্রথমত,পাক সেনাবাহিনীকে আবার কোথাও রিগ্রুপড হতে না দেওয়া। এবং দ্বিতীয়ত, তাদের মনোবল ভেঙ্গে দেওয়া ওরা অত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়।

৯ ডিসেম্বর: ৯তারিখ চতুর্দিক মিত্রবাহিনী ঢাকায় দিকে অগ্রসর হল। তখন তাদের চোখের সামনে শুধু ঢাকা। এর আগেই তাদের প্রথম লক্ষ্যটা পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ, মিত্রবাহিনী বাংলাদেশের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা পাকবাহিনীকে বেশ ভালোমত বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে, তাদের ঢাকা ফেরার বা পালাবার প্রায় সব পথ বন্ধ। এবার দ্বিতীয় লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে গেল ভারতীয় বাহিনী।

দ্বিতীয় লক্ষ্যটা হল খুব দ্রুত ঢাকার পাকবাহিনী মনোবল সম্পুর্ণ ভেঙ্গে দিয়ে নিয়োজিকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করা।

সব দিক থেকেই মিত্রবাহিনী ঢাকার দিকে অগ্রসর হল। পূর্বে পৌছে গেল আশুগঞ্জে, দাউদকান্দিতে এবং চাঁদপুরে। পশ্চিমে বাহিনী পৌছল মধুমতি নদীর তীরে। আর একটা বাহিনী কুষ্টিয়া মুক্ত করে চলল গোয়ালন্দ ঘাটের দিকে। হালুয়াঘাট থেকে এগিয়ে আসা বাহিনীও পৌঁছে গেল ময়মনসিংহের কাছাকাছি। নৌবাহিনীর গানবোটগুলিও ততক্ষণে নানা দিক থেকে এগোচ্ছে ঢাকার দিকে। এবং বিমান বাহিনীর আক্রমণও পুরোদমেই চলছে। সেদিন বিকালে মিত্রবাহিনীর প্রধান জেনারেল অরোরা কলকাতায় এক সাংবাদিক বৈঠকে বললেন: আমরা এখন ঢাকার লড়াইয়ের জন্য প্রস্ততত। সাংবাদিকরা জিজ্ঞেস করলেন: পাকিস্তানীরা যদি মাটি কামড়ে ঢাকার লড়াই চালাতে চায় তাহলে আপনি কী করবেন? জেনারেল অরোরা জবাব দিলেন: ওরা কী করবে জানি না। তবে আমরা বড়দের লড়াইয়ের জন্যই প্রস্ততত। জেনারেল অরোরাকে সাংবাদিকরা আবার জিজ্ঞেস করলেন: ঢাককে মুক্ত করার পথে আপনার সামনে সবচেয়ে বড় বাধা কী? আরোরা বললেন: নদী। তারপর আবার বললেন: নদী যদিও বড় বাধা সে বাধা অতিক্রমের ব্যবস্থা আমরা করে ফেলেছি। আমাদের পদাতিক সৈন্য এবং রসদ পারাপারের ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছে। আর আমাদের পি,টি ৬৭ ট্যাঙ্কগুলি নিজ থেকেই নদী সাঁতরে যেতে পারবে।

১০ ডিসেম্বর পরদিনই ৫৭ নং ডিভিশন গোটা বিশ্বকে দেখিয়ে দিল মিত্রবাহিনী কিভাবে রাজধানী ঢাকার মুক্তিযুদ্ধে নদীর বাধা অতিক্রম করবে। ভোররাত্রি থেকে ভৈরববাজারের তিন চার মাইল দক্ষিণে হেলিকাপ্টারে করে নামানো শুরু হল ৫৭ নং ডিভিশনের সৈন্য। সারাদিন ধরে মেঘনা অতিক্রমের সেই অভিযান চলল। প্রথম বাহিনীটা ওপারে নেমেই ঘাঁটি গেড়ে বসল। কিছুটা উওরে ভৈরববাজারের কাছেই পাক সৈন্যদের একটা বড় বাহিনী মজুত। ব্রিজেটার একটা অংশ ভেঙ্গে দিয়ে নদীর পশ্চিম পারে ওত পেতে বসে আছে। আকাশে সূর্য ইঠতেই তারা দেখতে পেল হেলিকপ্টার। নদী পার হচ্ছে। কিন্তু দেখেও তারা ঘাঁটি ছাড়তে সাহস পেল না। ভাবল, ওটা বোধহয় ভারতীয় বাহিনীর একটা ধাপ্পা। ওদিকে ছুটে গেলেই আশুগঞ্জ থেকে মূল ভারতীয় বাহিনীটা ভৈরববাজারের ওখানে এসে উঠবে। তারপর ভৈরববাজার-ঢাকা রাস্তা ধরবে। সত্যিই কিন্তু পাকবাহিনীকে ভূল বোঝাবার জন্য এসে মিত্রবাহিনীর একটা বড় কলাম তখন ভাবসাব দেখাচ্ছিল যে তারা আশুগঞ্জ দিয়েই মেঘনা পার হবে।

পাকবাহিনী এইভাবে ভুল বোঝায় মিত্রবাহিনীর সুবিধা হল। একরকম বিনা বাধায় মেঘনা পার হওয়া গেল। হেলিকপ্টারে নদী পার হল কিছু সৈন্য। অনেকে আবার নদী পার হল স্টীমারে এবং লঞ্চে করে। কিছু পার হল স্রেফ দেশী নৌকাতেই। ট্যাঙ্কগুলি নিয়ে কিছুটা সমস্যা দেখা দিয়েছিল প্রথমে। কিন্তু সে সম্যাও দূর হল এক

অভাবনীয় উপায়ে। রাশিয়ান ট্যাঙ্ক সাঁতরাতে পারে ঠিকই। কিন্তু একনাগাড়ে আধঘন্টার বেশী সাঁতরালেই ট্যাঙ্ক ভীষন গরম হয়ে যায়। অথচ মেঘনা পার হতে আধঘন্টার অনেক বেশী সময় লাগবে। তখন ঠিক হল, ট্যঙ্কগুলি যতটা সম্ভব নিজেই সাঁতরে এগোবে। তারপর নৌকাতে দড়ি বেধে ট্যাঙ্কগুলিকে টেনে নদীর ওপারে নিয়ে যাওয়া হবে। স্থানীয় মানুষের অভূতপূর্ব সাহায্য ছাড়া এই বিরাট অভিযান কিছুতেই সার্থক হত না। ওখানের মানুষ যে যেভাবে পারল মিত্রবাহিনীকে সাহায্য করল। শত শত নৌকা নিয়ে এল তারা। সেইসব নৌকা বার বার মেঘনা পারাপার করল। যেখানে থেকে মিত্রবাহিনী নদী পেরিয়েছিল সেখানে কোনও রাস্তাঘাট ছিল না। সেটা ছিল জলা জমি এই জলা জমি দিয়ে কামান বন্দুক ঘাড়ে করে নিয়ে গিয়েছিল ওই এলাকার শত শত শত বাঙ্গালী। বেশ কয়েক মাইল হেঁটে তারপর তারা পৌঁছেছিল ভৈরববাজার-ঢাকা মূল সড়কে। এবং পরদিনই তারা রায়পুর দখল করে নিল।

ওদিকে তখন উত্তরের বাহিনীটা ও দ্রুত এগিয়ে আসছে। ময়মনসিংহের কাছে পৌছে তার দাঁড়াল। খবর ছিল যে ময়মনসিংহের পাকবাহিনীর একটা ব্রিগেড রয়েছে। কিন্তু সে ব্রিগেড়টাকে যে আগেই ভৈরববাজারের দিকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে মিত্রবাহিনীর একটা ব্রিগেড রয়েছে। কিন্তু সে ব্রিগেডটাকে যে আগেই ভৈরববাজারের দিকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে মিত্রবাহিনী তা জানত না। তাই মিত্রবাহিনী ময়মনসিংহে বড় লড়াই করার জন্য সেদিনটা ব্রহ্মপুত্র নদীর ওপারে শম্ভগঞ্জে অপেক্ষা করল। অন্যদিকে ভারতীয় বিমান এবং নৌবাহিনীও সেদিন পাক সেনাবাহিনীকে আরও ভয় পাইয়ে দিল। বিমান বাহিনীর জঙ্গী বিমানগুলি ঢাকা বেতার কেন্দ্রটিকে স্তব্ধ করে দিয়ে এল। কুরমিটোলার উপর বার বার রকেট আর বোমা ছুড়ল।

নৌবাহিনীর বিমান আক্রমনে চট্রগ্রাম এবং চালনার অবস্থা ও তখন অত্যন্ত কাহিল। কয়েকটা ভর্তি হয়ে পাকবাহিনী বঙ্গোপসাগর দিয়ে পালাতে গিয়েছিল। একটা জাহাজে নিরপেক্ষ দেশের পতাকা উড়িয়েও কিছু পাকসৈন্য সিঙ্গাপুরের দিকে পালাচ্ছিল। সব ধরা পড়ল। কয়েকটা পাক বাণিজ্য জাহাজ ও মাঝ দরিয়ায় ঘায়েল হল।

১ডিসেম্বর : ১১তারিখ চতুর্দিকে পাক সেনাবাহিনীর প্রতিরোধ ভেঙ্গে পড়ল। বহু পাকঘাঁটির পতন হল সেদিন মুক্ত হল জামালপুর, ময়মনসিংহ, হিলি, গাইবান্ধা, ফুলছড়ি, বাহাদুরাবাদ, পিসপাড়া, দুর্গাদীঘি, বিগ্রাম এবং চন্ডীপুর। বিভিন্ন এলাকায় শত শত পাক সৈন্য আত্মসমর্পণ করল। এক জামালপুরেই আত্মসমর্পণ করল ৫৮১ জন। চাঁদপুরের উওরে মতলববাজারও বহু পাকসৈন্য আত্মসমর্পণ করল। কিছু আবার পেছনের দিকে পাল তে গিয়ে মার খেল। যেমন জামালপুরের বাহিনীর একটা অংশ। জামালপুরের পাকবাহিনী বেশকিছুদিন ধরে ভাল লড়াই ই চালিয়েছিল। মাটি কামড়ে তারা লড়াই চালাচ্ছিল। এই লড়াইয়ে ভারতীয় জেনারেল গিল মারাত্মক আহত হলেন। কিন্তু ১১ তারিখ আর পারল না। একটা বাহিনী আত্মসমর্পণ করল। আর একটা টাঙ্গইলের দিকে পালাল।

উত্তরে ১০১ নং কমিউনিকেশন জোনের একটা ব্রিগেড তখন ময়মনসিংহ দখল করে নিয়েছে। ময়মনসিংহ থেকে সোজা তারা ঢাকা এগাতে পারল না। কারণ রাস্তাটাই সোজা যায়নি। গিয়েছে টাঙ্গাইল ঘুরে। ময়মনসিংহ থেকে ঢাকার রেললাইনটা ছিল সোজাসুজি। কিন্তু পালাবার আগে পাকবাহিনী ব্রাহ্মপুত্রের ওপরের রেল সেতুটা ভেঙ্গে দিয়েছিল ওই পথের আরও কয়েকটা রেলপুল। তাই ভারতীয় বাহিনীকে টাঙ্গাইলের পথেই এগোতে হল। সেইটাই অবশ্য ছিল তাদের পরিকল্পনা।

ওদিকে ভৈরববাজারের দিক থেকেও তখন এগিয়ে ৫৭ নং ভারতীয় ডিভিশন। কিছুটা এগিয়ে তারা দুভাগে ভাগ হয়ে গেল। একটা গেল নরসিংদীর দিকে। বিমান বাহিনীও তখন পুরোদমে আক্রমণ চালাচ্ছে। পাকিস্তানীরা মিত্রপক্ষের সেনাবাহিনী হাত থেকে পালায় তো বিমান বাহিনীর হাতে গিয়ে পড়ে। বিমান বাহিনী সেদিন একমাত্র ঢাকাকে রেহাই দিল। কারণ ভারত সরকার আগেই ঘোষণা করেছিল, ওইদিন ঢাকাও করাচির উপর কোনও আক্রমণ করা হবে না। বিদেশীদের ঢাকা থেকে বের করে আনার জন্য আন্তর্জাতিক বিমান

তেজগাঁওয়ে নামতে দেওয়া হবে। এবং সেজন্য তেজগাঁও বিমানবন্দর সারাতেও দেওয়া হবে। নৌবাহিনী কিন্তু সেদিনও ভীষন সক্রিয়। চট্রগ্রাম, কক্সবাজার এবং চালানার উপর নৌবাহিনীর বিমানগুলি সেদিনও প্রচন্ড আক্রমণ চালাল।

১২ ডিসেম্বর: পরদিন ও ভারতীয় বিমানবাহিনী ঢাকার উপর কোনও অক্রমণ করল না। সেদিন বিদেশীদের নিয়ে ঢাকা থেকে তিনখানা আন্তর্জাতিক বিমান এল কলকাতায়। অবরুদ্ধ ঢাকা থেকে মুক্ত মানুষেরা এল কলকাতায়। বিমানবাহিনী সেদিন অন্যত্র ভীষন ব্যস্ত। ভোররাতেই ছত্রীসেন দের নামানো হল টাঙ্গাইলে। ময়মনসিংহ দিক থেকে মিত্রবাহিনীর ব্রিগেডটাও তখন দ্রুত এগিয়ে আসছে টাঙ্গাইলে। ভোররাত্রে ছত্রীসেনাদের নামানো হল নদীর দক্ষিণে। মীর্জাপুর আর টাঙ্গাইলের মাঝামাঝি।

ভুয়া ছত্রীদের নামানো হয়েছিল প্রথম রাত্রে। কিছু পাকসেনা সেই ভুয়া ছত্রীসেনা খুঁজতে ছুটল।তারপর ভোররাতে নদীর উওরে নামাতে হল আসল ছত্রীসেনা। এক ব্যাটালিয়ন-অর্থাৎ প্রায় এক হাজার। মাটিতে নামতে তারা স্থানীয় অধিবাসীদের সাহায্য পেল। স্থানীয় সবাই সহযোগিতা করতে এগিয়ে এল। বিমান থেকে যে অস্ত্রশস্ত্র ফেলা হয়েছিল স্থানীয় অধিবাসীরা ছোটাছুটি করে তা সব সংগ্রহ করে দিল ছত্রীসেনাদের।

উত্তর দিক তখন জামালপুরের পাকবাহিনীর একটা অংশ পিছু হটে আসছিল। এদের আগমনের খবর জানা ছিল না ভারতীয় বাহিনীর। কারণ, এরা প্রধানত রাতের অন্ধকারে কাঁচা রাস্তা দিয়ে আসছিল। আচমকা এই পাকবাহিনীটা এসে পড়ল ছত্রীসেনাদের সামনে। ওরাও আবার জানত না যে ভারতীয় ছত্রীসেনারা ওখানে নেমেছে। ভারতীয় ছত্রীসেনারাই প্রথমে দেখতে পেল পাকবাহিনীকে। দেখতে পেয়েই দমাদম গুলি চালাল। এবং সেই আচমকা আক্রমণে পাকবাহিনী একেবারে হতভম্ব হয়ে পড়ল।প্রথমেই তারা ছিটকে পড়ল। তারপর রিগ্রুপড হয়ে আবার দক্ষিণে এগোবার চেষ্টা করল। কিন্তু ততক্ষণে ভারতীয় ছত্রীসেনারা পুরোপুরি তৈরী। লড়াই হল। পাকসেনারা কিছুক্ষণ লড়াইয়ের পরই পিছু হটার চেষ্টা হরল। কিন্তু তাও পারল না। কারণ ততক্ষণে ময়মনসিংহের দিক থেকে ১০১নং কমিউনিকেশন জোনের ব্রিগেডটাও এসে গিয়েছে পেছনে। বাধ্য হয়ে পাকবাহিনী আত্মসমর্পণ করল।

টাঙ্গাইলের ছত্রীসেনারা কিছুক্ষণের মধ্যেই ছোট্র বিমানবন্দরটা দখল করে নিল। তারপর থেকেই প্রতি দশ মিনিট অন্তর সেখানে ক্যারিবু বিমানের অবতরণ শুরু হল। এল আরও সৈন্য। এল বহু অস্ত্রশস্ত্র। যুদ্ধের নানা সাজসরঞ্জাম। কয়েক ঘণ্টায় পর ১০১ নং কমিউনিকেশন জোনের ব্রিগেডটাও এসে যোগ দিল তাদের সঙ্গে। এবং দুই বাহিনী একত্রে এগিয়ে চলল ঢাকার পথে মির্জাপুরের দিকে।

ওদিকে তখন ৫৭ নং ডিভিশনও পূর্ব দিক থেকে এগিয়ে যাচ্ছে ঢাকার দিক। সেই দিন তারা নরসিংদী অতিক্রম করে বেশ কিছুটা এগিয়েছে। সেদিনই প্রথম ঢাকায় ভারতীয় কামানের গর্জন শোনা গেল। এবং সেই গর্জন শুনে নিয়োজিসহ ঢাকার পাকবাহিনী অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল।

এদিকে কলকাতায় পূর্বাঞ্চলীয় বাহিনীর চিফ অব স্টাফ জেনারেল জ্যাকবও আর কাণ্ড করে বসে আছেন। সকালে সাংবাদিক বৈঠক। জেনারেল জ্যাকব সেখানে সমগ্র যুদ্ধ পরিস্থিতি বোঝাচ্ছিলেন। সাংবাদিকরা তাঁকে এই ছত্রীসেনা নামাবার ব্যাপারটা জিজ্ঞেস করল। জেনারেল জ্যাকব বললেন, হ্যাঁ ছত্রীসেনা নেমেছে। তবে কোথায় নেমেছে, কত নেমেছে আমাকে জিজ্ঞেসা করো না। বিদেশী সাংবাদিকরা এই ব্যাপারে যত প্রশ্ন করেন, জেনারেল জ্যাকব ততই প্রশ্নটাকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। তারই মধ্যে তিনি ইঙ্গিতে এমন একটা ধারণা দিলেন যে এক ব্রিগেডের বেশি ছত্রীসেনা নামানো হয়েছে এবং ঢাকার কাছাকাছি বিভিন্ন এলাকায় তারা নেমেছে। আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থাগুলি এই খবর সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বে ছড়িয়ে দিল। খবরটা ঢাকায়ও গিয়ে পৌঁছল। এবং

পাক সমরনায়করা সেই খবর পেয়ে বিষম ভয় পেয়ে গেল। তারা ভাবল হয়ত ঢাকার চতুর্দিকেই মিত্রবাহিনী প্রচুর ছত্রীসেনা নামিয়েছে। এবং হয়ত সব খবর তারা তখনও পায়নি। ঢাকার সবাই বুঝল, এবার আর রক্ষা নেই জেনারেল মানেকশর আবেদনও তখন বার বার প্রচারিত হচ্ছে: বাচাঁতে চান তো আত্মসমর্পণ করুন। পালাবার কোন পথ নেই। লড়াই করা বৃথা। আত্মসমর্পণ করলে সব পাকসেনা জেনেভা কনভেনশন অনুসারে ব্যবহার পাবেন।

১৩ ডিসেম্বর: মিত্র সেনাবাহিনী যতই ঢাকার দিকে এগিয়ে আসছিল এবং ঢাকার উপর বিমান হানা যতই বাড়ছিল ঢাকার পাক সামরিক নেতাদের অবস্থাও ততই কাহিল হয়ে উঠেছিল। সাধারণত বিপদে পড়লে জেনারেলরা যা করে প্রথম প্রথম এরাও তাই করল- ইসলামবাদের কাছে বার বার আরও সাহয্য পাঠাবার আবেদন জানাল। বলল: ভারত অন্তত ন''ডিভিশন সৈন্য এবং দশ স্কোয়াড্রন বিমান নিয়ে আক্রমণ শুরু করেছে। সুতারাং আমাদেরও অভিলম্বে আরও কয়েক ডিভিশন সৈন্য এবং কয়েক স্কোয়ড্রন বিমান চাই। ইসলামাবাদ প্রথমে ঢাকার কর্তাদের বলেছিল : তোমরা মাত্র কয়েকটা দিন লড়াইটা চালিয়ে যাও। আমরা দিন সাতেকের মধ্যেই পশ্চিমখন্ডে ভারতীয় বাহিনীকে এমন মার দেব যে তারা নতজানু হয়ে ক্ষমা চাইতে বাধ্য হবে। এবং তখন যুদ্ধেই থেমে যাবে। সুতারাং তোমাদেরও আর কোনও অসুবিধা থাকবে না কিন্তু দিন পাঁচ ছয়ের মধ্যেই ঢাকার পাক কর্তারা বুঝতে পারল, ওদিকেও বেশি সুবিধা হচ্ছে না। ভারতীয় নতজানু হওয়ারও কোনওই সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না বরং ভারতীয় বাহিনী প্রচন্ড বেগে ঢাকার দিকে এগোচ্ছে। তখন তারা অনেকেই ভয় পেয়ে গেল। ভয় পেল প্রধানত দুটো কারণে। প্রথমে কারণ, পালাবার পথ নেই। কোথাও যে পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করবে তার উপায় নেই। বিমানবন্দরে পালাবার মত কোনও পথ নেই। মাথার উপরে ভারতীয় বিমান। সমুদ্রে ভারতীয় নৌবাহিনীর অবরোধ। স্থলপথে যেদিকেই যাওয়া যাবে, ভারতীয় সেনা। মুক্তিবাহিনী বা স্থানীয় মানুষের হাতে পড়লে মৃত্যু অনিবার্য। তাদের অত্যাচারের ফলে বাংলাদেশের মানুষ কতটা ক্ষেপে আছে সেটা তাদের জানতে তখন বাকি নেই। তাই মিত্রবাহিনী পদ্মা এবং মেঘনার কূলে এসে দাঁড়ানো মাত্রই ঢাকার পাক কর্তাদের মনোবল ভেঙ্গে পড়েছিল। তারা অসহায় বোধ করতে শুরু করেছিল। এর উপর যখন তারা দেখল যে বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়ানো পাকবাহিনীও আর ঢাকার দিকে ফিরতে পারছে না তখন তারা অনেকে একেবারে হাত-পা ছেড়ে দিল।

ওদিকে তখন পূর্ব ও উত্তর দিক থেকে মিত্রবাহিনী ঢাকায় প্রায় পনেরো মাইলের মধ্যে পৌঁছে গিয়েছে। ৫৭ নং ডিভিশনের দুটো ব্রিগেড এগিয়েছে পূর্ব দিক থেকে। উত্তর দিক থেকে এসেছে গন্ধর্ব নাগরার ব্রিগেড এবং টাঙ্গাইলে নামা ছত্রী সেনারা। পশ্চিমে সেদিন ৪নং ডিভিশণও মধুমতী পার হয়ে পৌঁছে গিয়েছে পদ্মার তীরে। উত্তর এবং পূর্ব দিক থেকে মিত্রবাহিনীর কামানের গোলা ও পড়া শুরু হয়েছে কুর্মিটোলা ক্যান্টনমেন্টে। এবং বিমান বাহীনীর জঙ্গী বিমানগুলিও বার বার হানা দিচ্ছে ঢাকার সব ক'টা সামরিক ঘাঁটির উপর। পাকবাহিনীর মনোবল ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য মিত্রপক্ষ সেদিন সর্বতোভাবে সচেষ্টা। একদিকে চলছে কামানে-বিমানে তীব্র আক্রমণ, আর একদিকে বেতার প্রচারিত হচ্ছে আত্মসমর্পণের আবেদন। জেনারেল মানেকশ: বাণী সেদিন প্রচারিত হল রাও ফরমান আলীর উদ্দেশে। জেনারেল মানেকশ বললেন: আমার সৈন্যরা এখন ঢাকাকে ঘিরে ধরেছে এবং তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হবে এবং তাদের প্রতি ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার করা হবে।

বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় সেদিন শত শত পাকসেনা আত্মসমর্পণ করল। এক ময়নামতিতেই আত্মসমর্পণ করল ১১৩৪ জন। কিন্তু তখনও নিয়াজি অবিচল। তখনও সেলড়াই চালিয়ে যেতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এবং তখনও তার সঙ্গে একমত হয়ে প্রচণ্ড লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে খুলনা, বগুড়া এবং চট্রগ্রামের পাক অধিনায়করা।

১৪ ডিসেম্বর : নিয়াজি তখনও গোঁ ধারে বসে আছে, কিন্তু আর প্রায় সকলেরই হৃদকম্প উঠে গিয়েছে। ১৩ তারিখ রাত থেকে ১৪ তারিখ ভোর পর্যন্ত পূর্ব এবং পশ্চিম দিক থেকে মিত্রবাহিনীর কামান অবিরাম গোলা মেরে চলল। গোলাগুলি পড়ল গিয়ে প্রধানত ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে। কিন্তু সে গোলার আওয়াজে সারারাত ধরে গোটা ঢাকা কাঁপল। ঢাকার সবাই সেদিন ভীষন আতঙ্কিত হয়ে পড়ল। বুঝল, আর রক্ষা নেই। গভর্নর মালিক সেদিন সকালেই 'সমগ্র পরিস্থিতি' বিবেচনার জন্য গভর্নর হাউসে মন্ত্রিসভার এক জরুরী বৈঠক ডাকল। এই বৈঠক বসবার ব্যাপারেও আলী এবং চীফ সেকরেটারি মুজাফফর হোসেনের হাত ছিল। তারা তখনও মনে করেছে, আত্মসমর্পন ছাড়া উপায় নেই, রক্ষা নেই।

মন্ত্রীসভার বৈঠক বসল এগারোটা নাগাদ। এবং একটা পাকিস্তানী ওয়ারলেস মেসেজ ধরে মিত্রবাহিনীও প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জেনে গেল সেই বৈঠকের খবরটা। সঙ্গে সঙ্গে সংবাদ চলে গেল ভারতীয় বিমান বাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় হেডকোয়ার্টারে। এবং কয়েক মিনেঠের মধ্যেই এক ঝাঁক ভারতীয় জঙ্গী বিমান উড়ে এল ঢাকা গভর্নর হাউসের উপর। একেবারে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে তারা ছুড়ল রকেট। গোটা পাঁচেক গিয়ে পড়ল একেবারে গভর্নর হাউসের ছাদের উপর। মিটিং তখনও চলছিল। মালিক এবং তার মন্ত্রীরা ভয়ে প্রায় কেঁদে উঠল।। চীফ সেকরেটারি,আইজি,পুলিশ প্রভৃতি বড় বড় অফিসাররাও মিটিং- এ উপস্থিত ছিল। তারাও ভয়ে যে পারল পালাল। বিমান হানা শেষ হওয়ার পর মালিক সাহেব তার পাত্র মিত্রদের সঙ্গে আবার বসলেন। এবং তারপর আর পাঁচ মিনিটও লাগল না তাদের সিদ্ধান্তে পৌছতে। তারা সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত করলেন: আমরা সবাই পদত্যাগ করলাম। সেই পদত্যাগের সিদ্ধান্ত তারা সঙ্গে সঙ্গে ঢাকার আন্তর্জাতিক রেডক্রস কমিটি প্রতিনিধি রেনড সাহেকে জানাল এবং তাঁর কাছে আশ্রয় চাইল। রেনড সাহেব তখন ইন্টারকনটিনেন্টাল হোটেলকে রেডক্রসের অধীনে ''নিরপেক্ষ এলাকা'' করে নিয়েছেন। এই ''নিরপেক্ষ এলাকা'' তখন ঢাকার একটি অদ্ভুত জিনিস। গোটা ঢাকা তখনও পাকিস্তানীদের দখলে, শুধু এই হোটেলটা ছাড়া। হোটেলটার উপর রেডক্রসের বিরাট বিরাট পতাকা উড়ছিল। বহু বিদেশী এবং পশ্চিম পাকিস্তানী আশ্রয় নিয়েছিল ওই হোটেল। ১৪ তারিখ সেখানে সদলবলে গিয়ে আশ্রয় নিল মালিক সাহেব। তখন ঢাকায় সবাই মনে করছে ওটাই একমাত্র নিরাপদ আশ্রয়- ভারতীয় বৈমানিকরা কিছুতেই রেডক্রসের বড় বড় পতাকা ওড়া বাড়িতে আক্রমণ করবে না। রেনড সাহেব তার এলাকায় ওদের আশ্রয় দিয়ে খবর পাঠালেন জেনিভায়। সেই বার্তায়: পূর্ব পাকিস্তান সরকারের সর্বোচ্চ অফিসাররা পদত্যাগ করেছেন এবং রেডক্রস আন্তর্জাতিক অঞ্চলে আশ্রয় চেয়েছেন। জেনিভা চুক্তি অনুযায়ী তাদের আশ্রয় দেওয়া হয়েছে। ভারত ও বাংলাদেশ সরকারকে যেন অবিলম্বে সমস্ত ঘটনা জানানো হয়। খবরটা যেন ভারতীয় সামরিক বাহিনীকে জানানো হয়।

মালিক এবং তার গোটা ''পূর্ব পাকিস্তান সরকারের'' এই সিদ্ধান্তের অবস্থা আরও কাহিল হল। ঢাকার উপর তখন প্রচণ্ড আক্রমণ চলছে। আক্রমণ চলছে কামানের। আক্রমণ চলছে বিমানের। প্রধান লক্ষ্য কুরমিটোলা ক্যান্টনমেণ্ট। নাগরার বাহিনী তখন টঙ্গির কাছে পৌছে গিয়েছে। এবং পাক শীতলক্ষা নদীর একটা শাখার উপরের ব্রিজটা উড়িয়ে দিয়ে ওপর থেকে তাদের বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছে। মূল পাকবাহিনীটা কিন্তু কামান এবং বিমান আক্রমণে প্রায় পাগল হয়ে গিয়ে কুরমিটোলা ছেড়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যায়ে আশ্রয় নিয়েছে। পূর্ব দিকের বাহিনীটা ও প্রায় পৌঁছে গিয়েছে ডেমরায়। তবু নিয়াজি তখনও বলছে: আমি শেষ পর্যন্ত লড়ে যাব। নিয়াজি অবশ্য এ কথাটা বলছিল প্রধাণত মারকিনীদের ভরসায়। মারকিনী সপ্তম নৌবহর যে বঙ্গোপসাগরের দিকে এগোচ্ছে এ খবর চার- পাঁচ দিন আগে থেকেই জানা গিয়েছিল। গোটা দুনিয়ায় তখন সপ্তম নৌবহরের বঙ্গোপসাগরে আগমনে নিয়ে জোর জল্পনা-কল্পনা চলছে। মারকিন সরকার যদিও ঘোষণা করলেন যে কিছু আমেরিকান নাগরিককে অবরুদ্ধ বাংলাদেশ থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়ার জন্যই সপ্তম নৌবহর বঙ্গোপসাগরে যাচ্ছে। আসলে কিন্তু কেউ তা বিশ্বাস করল না। সকলেরই মনে তখন বেজায় সন্দেহ। সকলেরই মনে তখন প্রশ্ন, প্রেসিডেন্ট নিকসন কি ইয়াহিয়ার রক্ষার্থে মারকিন নৌবহরকে আসরে নামাবেন। ঠিক কি মনে প্রশ্ন, প্রেসিডেণ্ট নিকসন কি ইয়াহিয়ার রক্ষার্থে নৌবহরকে আসরে নামাবেন? ঠিক কি উদ্দেশ্যে মারকিন সপ্তম নৌবহর বঙ্গোপসাগরে এসেছিল এবং কেনই বা তারা কিছু না করে (বা করতে না পেরে)

ফিরে গেল সে রহস্যের এখনও সম্পূর্ণ কিনারা হয়নি। তবে ইতিমধ্যেই ঢাকায় একটুকু গিয়েছে যে, ইসলামাদের খবর মত ১৪ ডিসেম্বর নিয়াজি আশা করেছিল যে সপ্তম নৌবাহিনীর জঙ্গী বিমানগুলি তার সাহায্যে আসবে নামবে। ইয়াহিয়া নিজে নাকি নিয়াজিকে সে খবর জানিয়েছিল। সেই ভরসায়ই ১৪ তারিখেও নিয়াজি বলে চলেছে: একেবারে শেষ পর্যন্ত শেষ পর্যন্ত লড়াই চালাব।

ওদিকে মিত্রবাহিনী তখন প্রচণ্ডভাবে ঢাকায় সামরিক লক্ষ্যবস্তুগুলির উপর আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে কিন্তু তখনও তারা ঠিক জানে না যে ঢাকার ভেতরের অবস্থাটা কী। অর্থাৎ পাকবাহিনী কিভাবে ঢাকার লড়াই লড়তে চায় এবং ঢাকায় তাদের শক্তিই বা কতই। সে খবর মিত্রবাহিনী জানে না। নানাভাবে এই খবর সংগ্রহের চেষ্টা হল। কিন্তু আসল খবরটা কিছুতেই পাওয়া গেল না। যা পাওয়া গেল সব ভুল। সেই ভুল খবরগুলির একটা: পাকিস্তানীরা গোটা শহরে ছড়িয়ে পড়ে পরিখা খনন করে হাউস-টু-হাউস লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। আর একটা খবর: ঢাকায় পাকবাহিনীর অন্তত দেড় ডিভিশন সৈন্য রয়েছে। এবং রয়েছে প্রচুর পরিমাণে অস্ত্রশস্ত্র। এই দুটো খবরই ভুল ছিল। কিন্তু তখনকার মত এই খবর দুটোই ঠিক মনে হয়েছিল। মিত্রবাহিনী এই অবস্থায় মনে করল যে ঢাকার ভেতরে লড়াই করার জন্য যদি সৈন্যদের এগিয়ে দেওয়া হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে যদি বিমান আক্রমণ চালানো হয় তাহলে লড়াইয়ে প্রচুর সাধারণ মানুষ ও মরবে। মিত্রবাহিনী এইটা কিছুতেই করতে চাইছিল না। তাই ওইদিনই তারা একদিক যেমন আবার পাকবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণের আবেদন জানাল এবং তেমনি আর একদিকে ঢাকার সাধারণ নাগরিকদের অনুরোধ জানাল, আপনারা শহর ছেড়ে চলে যান।যত তাড়াতাড়ি পারেন ঢাকা শহর ত্যাগ করুন। উত্তর এবং পূর্ব-রাজধানী দুদিকেই তখন আরও বহু মিত্রসেনা এসে উপস্থিত হয়েছে। চাঁদপুরেও আর একটা বাহিনী তৈরী হচ্ছে নদীপথে অগ্রসর হওয়ার জন্য।

১৫ডিসেম্বর: আগেই বলা হয়েছে, নিয়েজি মারকিন সপ্তন নৌবহরের সাহায্য আশা করছিল। এবং সেই ভরসায়ই দিন শুনছিল। কিন্তু ১৩বা ১৪ তারিখ কোনও একটা সময়ে নিয়াজি বুঝল না, মারকিন সপ্তম নৌবহর তাকে সাহায্য করতে আসরে নামবে না। এই জিনিসটা ঠিক কখন এবং কিভাবে নিয়াজি জানল সেটা বলা মুশকিল। একনও সে তথ্য প্রকাশিত হয়নি। ভবিষ্যতে হয়ত কোনও দিন জানা যাবে এবং তখন বোঝা যাবে আসল ব্যাপারটা। তবে ইতিমধ্যেই যতটা জানা গিয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে ১৪ ডিসেম্বর সকাল থেকেই নিয়াজি সব আশা ছেড়ে দিয়েছে। ওইদিনই সে শর্তসাপেক্ষ আত্মসমর্পণের প্রস্তাব নিয়ে ঢাকার বিভিন্ন বিদেশী দূতাবাসের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করল বিশেষত, মারকিনীদের সঙ্গে। ঢাকার মার্কিন দূতাবাসের কর্মীরা সেই প্রস্তাবটা পাঠিয়ে দিলেন দিল্লীর মারকিন দূতাবাসে। তারা আবার খবরটা পাঠালেন ওয়াশিংটনে। তখন ওয়াশিংটন ইসলামাবদের মারকেন দূতাবাস বহু চেষ্টা করেও সেদিন ইয়াহিয়াকে ধরতেই পারল না। ১৫ তারিখ দিল্লীর মারকিন দূতাবাস মারফৎ খবরটা পৌঁছল ভারত সরকারের কাছে- নিয়াজি আত্মসমর্পণ করতে চায়, তবে কতগুলি শর্তসহ। প্রধান শর্ত, পশ্চিম পাকিস্তানীদের সবাইকে চলে যাওয়ার সুযোগ দিতে হবে এবং কাউকে গ্রেফতার করা চলবে না। ভারত সরকার এ প্রস্তাবটা সঙ্গে সঙ্গে নাকচ করে দিলেন। বললেন: শর্তটর্ত নয়; বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ করতে। ভারতীয় বাহিনী বাংলাদেশের পাকবাহিনীকে অবশ্য এ আশ্বাস দিতে রাজি যে যুদ্ধবন্দীরা জেনিভা চুক্তিমত ব্যবহার পাবে। নিয়াজি যে পুরো ভেঙ্গে পড়েছে, ঢাকার যুদ্ধ চালাবার মত মনোবল যে তার বা তার বাহিনীর মোটেই নেই এটা কিন্তু ভারতীয় কর্তৃপক্ষ তখনও জানেন না। ঢাকার ভেতরে খবরাখবর ভারতীয় বাহিনী খুব কমই পাচ্ছিল। নিয়াজির শর্তসাপেক্ষ আত্মসমর্পণের প্রস্তাব পেয়ে ভারতীয় বাহিনী মনে করল, এটা নিয়াজির একটা কৌশল। আসলে সে কিছুটা সময় চাইছে যাতে সপ্তম নৌবহরের সাহায্যে সৈন্যসামন্ত পাত্রমিত্র নিয়ে বাংলাদেশ থেকে বেরিয়ে যেতে পারে। নিয়াজি যে প্রস্তাব দিল ভারতীয় কর্তৃপক্ষের কাছে তার একমাত্র মানে দাঁড়াল যুদ্ধবিরতি-আত্মসমর্পণ নয়। কিন্তু মিত্রবাহিনী তখন বিনাশর্তে পাকবাহিনীর আত্মসমর্পণ ছাড়া আর কিছুতেই রাজি নয়। দিল্লীর মারতিন দূতাবাস মারফৎ সেই কথা জানিয়ে দেয়া হল: আমাদের প্রস্তাব ভেবে দেখার জন্য আপনাকে ১৬ তারিখ সকাল ন'টা সময় দেয়া হল।

ভারতীয় বিমান বাহিনী ওই পর্যন্ত কোনও আক্রমণ করবে না। কিন্তু মিত্রপক্ষের স্থল ও নৌবাহিনী যথারীতি অগ্রসর হতে থাকবে। যদি সকাল ৯ টার মধ্যে আত্মসমর্পণের খবর না পাই তাহলে তখন থেকে আবার বিমান বাহিনীর আক্রমণ পুরোদমে শুরু হবে। ঢাকার ভেতর পাকবাহিনীর অবস্থা তখন অত্যন্ত শোচনীয়। তাদের মনোবল একেবারে ভেঙ্গে গিয়েছে।

জেনারেল মানেকশ তাঁর শেষ বার্তায় পিনডিকে বলেছিলেন: সকাল ন'টার মধ্যে বেতার জানতে হবে বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ করছেন কিনা। একটা বেতার ফ্রিকোয়েনসিও বলে দিয়েছিলেন।

শোনা যায়, নিয়াজি সেদিন সারারাত ধরে ইসলামাবাদের সঙ্গে যোগাযোগর চেষ্টা করে। এ ব্যাপারে বিভিন্ন বিদেশী দূতাবাসেরও সাহায্য নেয়। কিন্তু কোনও ফলই হল না।

ইয়াহিয়া খাঁকে কিছুতেই পাওয়া গেল না। ওদিকে তখন মিত্রবাহিনীর কামানের গোলার আওয়াজ। বাড়ছে এবং পাকবাহিনীতে এাসও বাড়ছে। ঢাকার অসামরিক পাকিস্তানীরাও আত্মসমর্পণের পক্ষে চাপ বাড়াচ্ছে। চাপ দিচ্ছে কয়েকটা বিদেশী দূতাবাসও।

১৬ ডিসেম্বর: সকালে নিয়োজি আবার কয়েকজন বিদেশী দূতের সঙ্গে কথা বলল এবং শেষ পর্যন্ত স্থির করল যে মানেকশর প্রস্তবই মেনে নেবে। তখন শুরু হল ওই ফ্রিকোয়েনসিতে গেয়ে ভারতীয় বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা। কয়েকজন বেদেশীর বসে নিয়াজি বারবার সেই চেষ্টা করতে থাকল। সকাল প্রায় সোয়া আটটা থেকে। কিন্তু কিছুতেই যোগাযোগ করতে পারল না। ন'টা যখন বাজে বাজে তখন গোটা ঢাকা আকাশবাণীর কলকাতা স্টেশন খুলে কান পেতে বসে রয়েছে। তারাও ভীষণ ভীত। তাঁরাও বুঝতে পারছিলেন, ঢাকার লড়াই যদি হয়ই তাহলে তাদেরও অনেকের প্রাণ যাবে। তারাও তখন জানতে একান্ত আগ্রহী নিয়াজি মানেকশর প্রস্তাবে রাজী হয় কিনা। কিন্তু হায়, ন'টার সংবাদে তারা আকাশবাণীর বাংলা খবরে জানতে পারলেন, নিয়াজি কোনও জবাবই দেয়নি! বিসান আক্রমণ বিরতির সময়ও শেষ হয়ে গিয়েছে! ঠিক তখনই নিয়াজি মিত্রবাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পেরেছে। জানিয়েও দিয়েছে যে তারা বাহিনী বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ করবে। তখনই ঠিক হল, বেলা বারোটা নাগাদ মিত্রবাহিনীর চীফ অব স্টাফ জেনারেল জ্যাকব ঢাকা যাবেন নিয়াজির সঙ্গে আত্মসমর্পণের ব্যাপারটা পাকা করতে। ওদিকে তখন জেনারেল নাগরার বাহিনীও প্রায় মীরপুরের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। ঢাকা-টাঙ্গাইল রোড়ের ওপর নাগরায় বাহিনীর আটকে পড়েছিল। টঙ্গির কাছাকাছি। নদীর ওপরের ব্রিজটা পাকিস্তানীরা ভেঙ্গে দিয়েছিল।

১৬ তারিখ ভোর নাগরার বাহিনী নয়ারহাট ফরেস্ট রোড় দিয়ে সাভারের কাছাকছি এসে ঢাকা-আরিচাঘাট রোড়ের উপর পড়ল। পাকবাহিনী এই রাস্তায় ভারতীয় বাহিনীকে আশাই করেনি। তাই ওদিকে কোনও প্রতিরোধের ব্যবস্তাই রাখেনি। এমনকি ব্রীজগুলি পর্যন্ত ভাঙ্গেনি। আরিচাঘাট রোড়ে পড়ে গন্ধর্ব নাগরার বাহিনী সোজা ঢাকার দিকে এগালো। মাত্র কয়েক মাইল। প্রথমেই মীরপুর। পাকবাহিনীর জেনারেল জামসেদ সেখানে গিয়ে নাগরার কাছে আত্মসমর্পণ করল। নাগরার বাহিনী ঢাকা কয়েক মিনিটের মধ্যেই জেনারেল জ্যাকব হেলিকাপ্টারে ঢাকা পৌঁছলেন। নিয়াজির সঙ্গে কথাবার্তা পাকা হল। আত্মসমর্পণের দলিলও তৈরী হল। বিকাল ৪টা নাগাদ সদলবলে ঢাকা পৌঁছলেন মিত্রবাহিনীর প্রধান জেনারেল অরোরা। ৪-২১ মিনিটে ঢাকার রেস কোর্সে জনতার "জয় বাংলা" ধ্বনির মধ্যে নিয়াজি আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পণ করল। বাংলাদেশের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে থাকা পাকবাহিনী কাছে ততক্ষণে আত্মসমর্পণের নির্দেশ চলে গিয়েছে। সেদিন লড়াই চলছিল শুধু চট্রগ্রাম এবং খুলনায়। পাক নবম ডিভিশনের প্রধান ওইদিন সকালে নিজে থেকেই আত্মসমর্পণ করেছিল। মধুমতী নদীর পূর্ব তীরে। চট্রগ্রাম শহরেও ভারতীয় সৈন্য তখন প্রায় ঢুকে পড়েছে। আর খুলনার পাকবাহিনীর একটা অংশ তখন খালিশপুরের অবাঙ্গালী জনবসতির মধ্যে ঢুকে পড়ে মিত্রবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ চালাচ্ছে।

নিয়াজির আত্মসমর্পণের পর সব যুদ্ধই থেমে গেল। ১৬ ডিসেম্বর থেকেই বাংলাদেশ মুক্ত এবং স্বাধীন।

পরিশিষ্ট

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২৮। স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর অনুসৃত রণনীত ও রণকৌশল	দৈনিক বাংলা ৪-৯ ডিসেম্বর, ১৯৭২	১৯৭১

জেনারেল ওসমানীর সঙ্গে বিশেষ সাক্ষাৎকার
হেয়াদেত হোসাইন মোরশেদ

প্রশ্ন : - মুক্তিবাহিনী কিভাবে সংগঠিত হয়েছিল এবং ২৬ শে মার্চের পর থেকে ৩রা ডিসেম্বর তারা কিন ধরনের রণনীতি ও রণকৌশল আবলম্বন করেছিলেন?

জেনারেল ওসমানী: আপনাদের মনে আছে ২৬ শে মার্চ থেকে শত্রুকে প্রতিরোধ এবং বাঙ্গালীকে দমনে শত্রুদের কার্যক্রম প্রতিরোধ করতে প্রথমে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বীর বাঙ্গালী সৈনিক, প্রাক্তন ই-পি-আর -এর বীর বাঙ্গালীরা এবং আনসার, মোজাহেদ ও সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর বীর জওয়ানেরা। সঙ্গে সঙ্গে এদরে সাথে এসে যোগ দিয়েছিলেন যুবক ও ছাত্ররা।

সর্বপ্রথমে যুদ্ধ হয় নিয়মিত পদ্ধতিতে। আর এই পদ্ধতিতে যুদ্ধ চালু থাকে মে মাস পর্যন্ত। শত্রুকে ছাউনিতে যথাসম্ভব আবদ্ধ রাখা এবং যোগাযোগ কেন্দ্রসমূহ তাকে কব্জা করতে না দেয়ার জন্য নিয়মিত বাহিনীর পদ্ধতিতে যুদ্ধ করা হয়েছিল। এ জন্যে পদ্ধতি ছিল- যত বেশী বাধা সৃষ্টি করা যায় তা সৃষ্টি করা হবে; যেসব ন্যাচারাল অবস্টাকল বা প্রতিবন্ধক রয়েছে তা রক্ষা করতে হবে এর সাথে সাথে শত্রুর প্রান্তভাগে ও যোগাযোগের পথে আঘাত হানা হবে। মূলত: এই পদ্ধতি ছিলো নিয়মিত বাহিনীর পদ্ধতি। আর সংখ্যায় কম হওয়াসত্ত্বেও নিয়মিত বাহিনী অত্যন্ত বীরত্বের সাথে এই পদ্বতিতে যুদ্ধকরে। এই পর্যায়ে বেশ কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ রয়েছে। যথা:- ভৈরব-আশুগঞ্জের যুদ্ধ। এই যুদ্ধে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টার শত্রুবাহিনীকে চারদিন আটকে রাখা হয়।

তবে একটা বিষয় আমি আলোকপাত করতে চাই। নিয়মিত বাহিনীর যেটা স্বাভঅবিক কৌশল তা আমাদের সংখ্যা কম হওয়ার জন্যে কিছুটা পরিবর্তন করা হয়েছিল। আমরা ছোট ছোট অংশে অর্থাৎ ছোট ছোট পেট্রোল বা ছোট ছোট কোম্পানী প্লাটুনের অংশ দিয়ে শত্রুবাহিনীর তুলনামূলক অধিকসংখ্যক লোককে রুদ্ধ করে রাখি এবং সাথে সাথে শত্রুর ওপর আঘাতও হানতে থাকি। এভাবে চট্রাগ্রাম ও অন্যান্য সর্বপ্রথমে যুদ্ধ শুরু হয়।

সে সময় আমার ও আমার অধিনায়কদের কাছে একথা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, আমার কেবলমাত্র নিয়মিত বাহিনীর পদ্ধতিতে যুদ্ধ করে চলতে পারব না। কারণ আমাদের সংখ্যা তখন সর্বমোট মাত্র ৫টি ব্যাটালিয়ন। এছাড়া আমাদের সাথে প্রাক্তন ই-পি-আর- এর বাঙ্গলী জওয়ানেরা, আনসার, মোজাহেদ, পুলিশ ও যুবকরাও ছিলেন। যুবকদের অস্ত্র দেয়া একটু কঠিন হয়ে পড়েছিল। আমরা ভেতর থেকে যে অস্ত্রগুলো নিয়ে গিয়েছিলাম সেগুলো দিয়ে তাদেরকে তাড়াতাড়ি মোটামুটি প্রশিক্ষণ নিয়ে দাঁড় করিয়েছিলাম। আমাদের বিরুদ্ধে তখন শত্রু বাহিনীর ছিলো তিন-চারটি ডিভিশন। এই তিনটি ডিভিশনকেই নিতম সংখ্যা হিসাবে ধরে নিয়ে আমরা দেখতে পেলাম যে এদেরকে প্রতিরোধ করা, ধ্বংস করা সোজা নয়, সম্ভব নয়। তাই এপ্রিল মাস নাগাদ এটি আমার কাছে পরিষ্কার ছিলো যে আমাদের একটি বিরাট গণবাহিনী এ রকম হতে হবে যেমন মানুষের পেটের অস্ত্রের মধ্যে একটি শক্তিশালী জীবানু অস্ত্রটিকে ধ্বংস করে দিতে পারে ভেতরে থেকে শক্তিশালী গেরিলা বাহিনী

শত্রুর অস্ত্রগলো বিনষ্ট করে দেবে। শত্রুকে ধ্বংস করা সম্ভব হবে না। কারণ তাদের সংখ্যা বেশী তাদের অস্ত্র বেশী, তাদের বিমান রয়েছে, আর আমাদের কাছে বিমান ছিলোনা। এছাড়া সম্বল তাদের অনেক বেশী।

কিন্তু এই সাথে সাথে পরিষ্কার ছিলো যে বাইরে লেখা কলাসিক্যাল ওয়ারফেয়ার করে দেশ মুক্ত করতে হলে বহুদিন যুদ্ধ করতে হবে ইতিমধ্যে আমাদের দেশ ধ্বংস হয়ে যাবে। আমাদের সবচেয়ে বড় জনসম্পদ ধ্বংস হয়ে যাবে। আর বিশেষ কিছু উদ্ধার করার থাকবেনা। সেজন্য এপ্রিল মাসের শেষের দিকে এটাও আমার কাছে পরিষ্কার ছিলো যে আমাদের একটি নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে সময় কমাবার জন্যে। সেই পদ্ধতিতে বড় একটি গেরিলা বাহিনী গঠন করে ভেতর থেকে শত্রুর আঁঘাত করতে হবে এবং সাথে সাথে নিয়মিত বাহিনীর ছোট ছোট ইউনিট কোম্পানী বা প্লাটুন দিয়ে শত্রুকে আঘাত করতে হবে এবং বিচ্ছিন্ন হওয়ার জন্যে তাকে বাধ্য করতে হবে- সে যেন কনসেনট্রেটিড না থেকে ডিসপার্জড হয়।এই বিচ্ছিন্নতার ফলে তার সংখ্যাগরিষ্ঠতাজনিত শক্তি বিলুপ্ত হয়ে যাবে। সে ছোট ছোট সংযোগের রাস্তা, তার রি-ইনফোস মেন্টের রাস্তা ধ্বংস করে তাকে ছোট ছোট পকেটে আইসোলেট বা বিচ্ছিন্ন করা যাবে।

এজন্য আমার অনেক নিয়মিত বাহিনীরও প্রয়োজন ছিলো। এই প্রয়োজনের কথা আমি মে মাসের শুরুতে সরকারকে লিখিতভাবে জানাই। এবং এর ভিত্তিতে মিত্রদের কাছ থেকে সাহায্যও চাই। তাতে আমরা উদ্দেশ্য ছিলো- (ক) কমপক্ষে ৬০ থেকে ৮০ হাজার গেরিলা বাহিনী ও (খ) ২৫ হাজারের মতো নিয়মিত বাহিনী গড়ে তুলতে হবে। এই বাহিনী সত্বর গড়ে তুলতে হবে।কারণ, একদিকে গেরিলা পদ্ধতি এবং সঙ্গে সঙ্গে শত্রুকে নিয়মিত বাহিনীর কমাণ্ডো ধরনের রণকৌশল দিয়ে শক্তি বণ্টন করার বাধ্য করতে হবে যাতে তার শক্তি হ্রাস পায়।

এই পদ্ধতি আমরা কার্যে পরিণত করি। ক্রমশ: গড়ে উঠলো একটি বিরাট গণবাহিনী- গেরিলা বাহিনী। জুন মাসের শেষের দিক থেকে গেরিলাদের বিভিন্ন জেলায় পাঠানো হয়। প্রথমে বিভিন্ন জায়গায় ঘাঁটি বানানো হয়।এবং জুন মাসের শেষের দিক থেকে আমাদের গণবাহিনী বা গেরিলা বাহিনী এ্যাকশনে নামে। তবে, জুলাই-আগষ্ট মাসের আগ পর্যন্ত শত্রুবাহিনী তাদের ওপর গেরিলা বাহিনীর প্রবল চাপ বুঝতে পারেনি। যদিও শুরু থেকে আমরা কিছুসংখ্যাক যুবককে ট্রেনিং দিয়ে ভেতরে পাঠিয়েছিলাম। তার চট্রগ্রাম বন্দরেও গিয়েছিলো, ঢাকায়ও এসেছিলো। তবে গেরিলাদের শত্রুরা জুলাই মাস থেকে অনুভব শুরু করে।

এর সাথে সাথে আরেক দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। আমাদের নৌবাহিনী ছিলো না। আমার কাছে নিয়মিত নৌবাহিনীর বহু অফিসার, ওয়ারেন্ট অফিসার ও নাবিক আসেন। ফ্রান্সের মতো জায়গা থেকে কয়েকজন পাকিস্তানের ডুবোজাহাজ ছেড়ে আমাদের সঙ্গে যোগদান করেন। আমি তাদেরকে ভিত্তি করে এবং আমাদের বড় শক্তি যুবশক্তিকে ব্যবহার করে নৌকম্যাণ্ডো গঠন করি। এই নৌকম্যাণ্ডো জলপথে শত্রুর চলাচল ধ্বংস করতে সক্ষম হয়।

১৯৭১ সালের ১৪ ই আগস্ট থেকে আমাদের এই নৌকম্যাণ্ডোদের আক্রমণ শুরু হয়। তারা যে বীরত্ব কৃতিত্ব দেখিয়েছে পৃথিবীর ইতিহাসে তার নজীর নেই। তারা মঙ্গলায় বহু জাহাজ ডুবায়। তারা শত্রুর জন্যে বিভিন্ন অস্ত্র-সামান নিয়ে যেসব জাহাজ আসছিল চট্রগ্রামে সেগুলো ধ্বংস করে। এজন্যে অত্যন্ত দুঃসাহসের প্রয়োজনে ছিলো। তারা শত্রুর দটো বন্দর করে দেয় এবং নদীপথেও তাদের যাতায়াত বন্ধ করে দেয়।

আমদের কৌশল অত্যন্ত ফলপ্রসূ বলে পমাণিত হয়। সেপ্টেম্বরের শেষনাগাদ শত্রুরক্তহীন হয় ওঠে। তার ২৫ হাজারের মতো সৈন্য বিনষ্ট হয়। বহু যানবাহনের লোকসান হয়।৩রা ডিসেম্বর পর্যন্ত শত্রুর এ অবস্থা দাঁড়ায় যে একজন বক্সার রিং- এর দ্বিতীয় রাউন্ডে ক্লান্ত হয়ে ঘুরছে এবং একটা কড়া ঘুষি খেলে পড়ে যাবে- তার যোগাযোগ অবস্থা সম্পূর্ণভাবে বিছিন্ন হয়ে পড়েছিল। যেভাবে আমার উদ্দেশ্য ছিলো সেভাবে বিভিন্ন

জায়গায় তারা ছোট ছোট পকেট বানিয়েছিলো। তারা কোটি কোটি টাকা খরচ করে রি-ইনফোর্স কংক্রিটের বাংকার বানিয়েছিল। সেগুলোর মধ্যে তারা ঢুকে ছিলো। রাতের বেলাতো বেরুতো না-ই, দিনের বেলায়ও বেশীসংখ্যক লোক ছাড়া বেরুতো না। শত্রুর তখন এই অবস্থা দাঁড়িয়েছিল।

অক্টোবর-নভেম্বর থেকেই শত্রু যুদ্ধকে আন্তর্জাতিকীকরণের প্রচেষ্টা চালাচ্ছিল। যাতে তাদের জান বাঁচে, জাতিসংঘের হস্তপেক্ষেপের পর একটা যুদ্ধবিরতি হয়, অবজারভার এসে যায় এবং জাতিসংঘের কাছে সমস্যাটি দিয়ে তাদের জান রাক্ষা হয়-শত্রপক্ষের এই ছলো প্রচেষ্টা। কারণ, তখন তারা নিশ্চিন্ত হয়ে গিয়েছিলো যে তাদের পরাজয় একেবারে অনিবার্য। জাতিসংঘ যখন হস্তক্ষেপ করলো না তখন তারা একটা আন্তর্জাতিক যুদ্ধের পরিস্থিতি সৃষ্টির প্রচেষ্টা চালালো যাতে জাতিসংঘ এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হয়। প্রথমে তারা আমাদের ঘাঁটি, পজিশন ও বেসগুলোর ওপর বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে হামলা করে। সাথে সাথে তারা পশ্চিমাবঙ্গ ও ত্রিপুরাঞ্চলেও গোলাগুলি শুরু করে।

আরেকটি ব্যাপার আমি বলতে চাই। আমার কাছে বিমান ছিলো না। তবে শেষের দিকে কয়েকটি বিমান নিয়ে আমি ছোটখাটো একটি বিমানবাহিনী গঠন করেছিলাম। আমি যে বিমান পেয়েছিলাম তা ছিলো দু'টো হেলিকপ্টর, একটি অটার এবং আমার যানবাহনস্বরুপ একটি ডাকোটা। সেই অটার ও হেলিক্টারগুলোতে মেশিনগান লাগিয়ে যথেষ্ট সজ্জিত করা হলো। আমাদের যেসব বৈমানিক স্থলযুদ্ধে রত ছিলেন তাদের মধ্যে থেকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক লোক নিয়ে অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে একটি ছোট বিমান বাহিনী গঠন করা হলো। এই বাহিনীর কৌশল ছিলো গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি ঘাঁটিতে হামলা করা এবং ইন্টারডিকসন অর্থাৎ শত্রুর যোগাযোগের পথকে বন্ধ করে দেবার জন্যে লক্ষ্যবস্তুর ওপর আঘাত হানা।

আপনারা জানেন কিনা জানি না, শত্রুর ওপর প্রথম যে বিমান হামলা হয়েছে তা বাংলাদেশের বীর বৈমানিকেরা করেছে। ২৬ শে মার্চ থেকে ৩রা ডিসেম্বর পর্যন্ত যে যুদ্ধ হয়েছে তাতে যদিও আমাদের কাছে বিমান ছিলো না কিন্তু আমরা বিমান ঘাঁটিগুলোতে আঘাত হেনেছি। শেষের দিকে একজন মুক্তিযোদ্ধা সিলেট বিমান ঘাঁটিতে একটি সি-১৩০ বিমানের ওপর অত্যন্ত বীরত্বের সাথে মেশিনগান চালায়। মেশিনগানের গুলিতে যদিও সি-১৩০ বিমানটি পড়ে যায়নি, তবে কোন রকমে ঢুলু ঢুলু করে চলে গিয়ে শমসেরনগরে নেমেছিলো এবং পরে অনেকদিন মেরামতে ছিল।

প্রশ্নঃ ৩রা ডিসেম্বর থেকে ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত সম্মিলিত বাহিনীর রণনীতি রণকৌশল কি ছিলো?

জেনারেল ওসমানী: প্রথমেই এ কথা নিচ্ছি, শেষের দিকে অর্থাৎ ডিসেম্বরের আগে শেষ পর্যায়ে শত্রুবাহিনী ভারতের উপর যথেষ্ট পরিমাণ হামলা শুরু করলো। পরিস্থিতি এমন দাঁড়ালো যে ভারতীয়দের যুদ্ধে নামতে হবে-যদিও উপর থেকে তারা তখনো নির্দেশ পাননি। এমন কি শেষের দিকে যখন যশোর সীমান্তে ভারতের উপর হামলা হয়েছে তখনো উপর থেকে ক্লিয়ারেন্স আসোনি।

একদিনের কথা আমার মনে পড়েছে। সেই অঞ্চলে যুদ্ধরত আমার মুক্তিবাহিনীর উপর মুক্তিবাহিনীর উপর আক্রমণ হচ্ছে। আমাদের কাছে ট্যাঙ্ক ছিলো না। পাকিস্তানী ট্যাঙ্কগুলো ভারতীয় অঞ্চলের উপরও গোলাবর্ষণ করছে। আমি তখন ওদের জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা এর জবাব দিচ্ছেন না কেন? তারা বললেন, 'পলিটিক্যাল ক্লিয়ারেন্স নেই। তখন আমার নিয়মিত বাহিনী ও গণবাহিনীর যোদ্ধারা অতি বীরত্ব ও কৃতিত্বের সহিত মোকাবেলা করেছে।

ভারতীয় বাহিনী ৩রা ডিসেম্বর যুদ্ধে নামে। এবং শত্রু আত্মসমর্পণ না করা পর্যন্ত ১৩ দিন যুদ্ধ করেছিলেন। অবশ্য এর আগে তারা আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। ভারতীয় বাহিনীর যখন যুদ্ধে নেমে আসার সম্ভাবনা দেখো দিল তখন আমরা সম্মিলিতভাবে পরিকল্পনা করে একটি রণনীতি অবলম্বন করি। সেই নীতি ছিলো যেহেতু ভারতীয়দের কাছে ট্যাঙ্ক, কামান ও বিমান রয়েছে সেজন্য যেখানে অধিক শক্তিশালী প্রতিরোধ রয়েছে এবং বড়

অস্ত্রশক্তি প্রয়োজন সেখানে তারা প্রথম লক্ষ্য দেবেন এবং আমাদের বাহিনী শত্রুকে 'আউটফ্লাঙ্ক' অর্থাৎ শত্রুকে দু'পাশ দিয়ে অতিক্রম করে- 'ক্রস কান্ট্রি' দিয়ে গিয়ে ব্যূহের পার্শ্বভাগে আক্রমণ করবে অর্থবা ভারতীয়রা সামনের দিকে শত্রুকে ঠেকিয়ে রাখবে এবং আমাদের বাহিনী 'আউটফ্লঙ্ক' করে পেছন দিক দিয়ে আক্রমণ করবে। যেহেতু অঞ্চলগুলো সম্পর্কে আমাদের বাহিনীর অভিজ্ঞতা ছিলো, আমার বাহিনী হাল্কা ছিলো ও ক্ষিপ্রতার সাথে রণাঙ্গনে চলাচলে সক্ষম এবং যেহেতু অঞ্চলাগুলো সম্পর্কে আমাদের বাহিনী সম্পূর্ণ সজাগ ছিলো। সে জন্যে এই কাজগুলো করার দায়িত্ব ছিলো আমাদের উপর। যেখানে অধিকসংখ্যক গোলাবারুদ, বিমান বা ট্যাঙ্কের আক্রমণ করতে হবে সেখানে ভারতীয় বাহিনী শক্তি নিয়োগ করবে।

যেসব অঞ্চল কেবলমাত্র বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী অর্থাৎ মুক্তিবাহিনী মুক্ত করেছিলো সেখানে আমাদের বাহিনী সম্পূর্ণভাবে আমাদের নিজেদের পরিকল্পিত পদ্ধতিতেই যুদ্ধ করেন। আমাদের বাহিনী যেসব অঞ্চল এভাবে মুক্ত করে তার মধ্যে উত্তরবঙ্গের কুড়িগ্রাম ও লালমনিরহাট অঞ্চল, সিলেটের সুনামগঞ্জ ও দুতিক অঞ্চল, হবিগঞ্জ, কুমিল্লা, আখাউড়া ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উত্তরাঞ্চল, চট্টগ্রামের করেহাট, হায়াকু, হাটহাজারী অঞ্চলের 'এক্সেস অব এডভান্স,' কুষ্টিয়ার আলমডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর অঞ্চল, যশোরের মনিররামপুর ও অভয়নগর অঞ্চল, খুলনার বাগেরহাট, সাতক্ষীরা ও কালিগঞ্জ অঞ্চল, ফরিদপুর সদর, মাদারীপুর ও গোপালগঞ্জ অঞ্চল, বরিশাল ও পটুয়াখালী অঞ্চল এবং ঢাকা পৌছার শেষ পর্যায়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ভৈরব, নরসিংদী, ঢাকা-এই 'এক্সেস অব এডভান্স' রয়েছে। শেষ পর্যন্ত মিত্ররাও এই পদ্ধতিটি বেশী কার্যকর বলে মেনে নিয়েছিলেন। এই পদ্ধতি ছিলো- শত্রুর সেখানে পাকা বাঙ্কার বা রি-ইনফোর্সড কংক্রিটের শক্তিশালী ব্যূহ বা ষ্ট্রং পয়েন্ট রয়েছে সেখানে গিয়ে সরাসরি ঢুঁ মারা বুরবকের কাজ। এ ক্ষেত্রে যা করতে হবে তা ১৯৪২ সালে জাপানীরা বৃটিশ বাহিনীকে (যাতে আমিও ছিলাম) শিখিয়েছিলো। এক্ষত্রে সামনে দিয়ে শত্রুকে ব্যস্ত রাখতে হবে এবং তাকে 'আউটফ্লঙ্ক' করে ওর পেছনে গিয়ে স্ট্রং পয়েন্ট বানিয়ে বসুন। সে যাবে কোথায় এবং ওর রি-ইনফোর্সমেণ্ট ও গেলাবারুদ, রসদ ইত্যাদি আসবে কেত্থেকে? এইভাবে তাকে বিছিন্ন করে তার ব্যূহের পেছনে ও পার্শ্বভাগে আঘাত করুন। প্রথম প্রথম মিত্রদের অনেকে ভাববেন তাকে বিচ্ছিন্ন করে তার ব্যূহকে পেছনে ও পার্শ্বভাগে আঘাত করেুন। প্রথম প্রথম মিত্রদের অনেকে ভাবতেন আমরা কি ভীতু নাকি! তারপর একটি অভিজ্ঞাতা হওয়ার পর বুঝলেন যে আমাদের পদ্ধতিই একমাত্র কার্যকর রণপদ্ধতি। এইভাবে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের কেবল একটি ব্যাটালিয়ন শত্রুর ১৪নং ডিভিশনকে আশুগঞ্জের যুদ্ধের পর ঘেরাও কের অকেজো করে দেয়।

তাই যেসব অঞ্চলে আমরা একা যুদ্ধ করেছি সেখানে আমাদের পদ্ধতি ছিলো, শত্রুর শক্তিশালী ঘাঁটিকে বিছিন্ন করে তাকে সম্মুখভাগে ব্যস্ত রেখে তাকে 'আউটফ্লাঙ্ক' করে পেছনে গিয়ে বসা এবং তারপর পার্শ্বভাগ ও পেছনের দিক থেকে আক্রমণ করে তাকে ধ্বংস করা। অভ্যন্তর ভাগের গেরিলাদের (গণবাহিনীর) ও আমাদের নিয়মিত বাহিনীর আক্রমণের সামঞ্জস্য বিধন করা। নির্দেশ থাকতো, গেরিলারা যখন অমুক জায়গায় আক্রমণ করবে তখন দৃষ্টিকে অন্যদিকে ধাবিত করতে হবে এবং শত্রুর যাতে গোলাগুলি ও রি-ইনফোর্সমেণ্ট না আসতে পারে তার ব্যবস্থা করবে। গেরিলারা অমুক জায়গায় অমুক পুলটি উড়াবেন। তবে আমরা বড় বড় পুলগুলোতে হাত দিইনি। সেই পুলগুলো শত্রুরাই আত্মসমর্পণের আগে ভেঙ্গেছিলো।

যেখানে সম্মিলিতভাবে কাজ করেছি সেখানে কৌশল ছিলো যেখানে অধিক অস্ত্র, গোলাবারুদ, ট্যাঙ্ক ব্যবহারের প্রয়োজন দেখা দবে, 'এক্সেস অব এডভান্স'-এ ভার শত্রুর স্ট্রং পয়েন্টের উপর চাপ প্রয়োগ করবে এবং বাংলাদেশ বাহিনী 'আউটফ্লাঙ্ক' করে গিয়ে পার্শ্বভাগে বা পেছনের দিক থেকে আক্রমণ করবে।

এর সঙ্গে সঙ্গে এটাও সুস্পষ্ট নীতি ছিলো যে, স্ট্রং পয়েন্টগুরো 'ক্লিয়ার' করার পরবর্তী পর্যায় শত্রুর অন্য পজিশনগুলো আয়ত্ত্ব করতে হবে, সেখানে মুক্তিবাহিনী অর্থাৎ বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী এগোবে। তাঁদের অগ্রাভিযানে ভারতীয় গোলন্দাজ বাহিনী যতোটুকু সাপোর্ট দেয়ার ঠিক ততোটুকু দেবে।

প্রঃ মক্তিবাননী ও ভারতীয় বাহিনী যখন একসাথে এগোতে তখন অগ্রবর্তী দল হিসেবে মুক্তিবাহিনী যেতো এবং সাপোর্ট আসতো ভারতীয় বাহিনীর কাছ থেকে-তাই কি?

জেনারেল ওসমানী : দু'রকমের ছিল। সেটা হয়েছে প্রথমে 'স্ট্রং পয়েন্টটি ক্লিয়ার কারার পরে। মনে করুন, শত্রুর খুব শক্তিশালী একটা ঘাঁটি রয়েছে। সেই ঘাটির উপর ভারতীয় বাহিনী ট্যাঙ্ক কামান দিয়ে হামলা করতো। সেই সঙ্গে সঙ্গে মুক্তিবাহিনী 'ক্রস কান্ট্রি' দিয়ে গিয়ে 'আউটফ্লাঙ্ক' করতো। ক্রস কান্ট্রি এগিয়ে যাওয়ার বিশেষ দক্ষতা মুক্তিবাহিনীর ছিল। এর দুটো কারণ ছিল- প্রথমতঃ আমরা ন''মাস নিজের অঞ্চলে যুদ্ধ করে আসছি এবং আমাদের বাহিনী তুলনায় হাল্কা ছিল। দ্বিতীয়তঃ আমাদের সংযোগ ছিল স্থানীয় লোকের সাথে, আমাদের প্রতি তাদের ছিলো পুরো সমর্থন। সেজন্য আমরা সঙ্গে সঙ্গে আউটফ্লাঙ্ক করে শত্রুপার্শ্বভাগ ও পেছন থেকে আক্রমণ করতাম যাতে সে আর টিকতে না পারে। তৎপর যখন অগ্রবর্তী অন্যান্য শত্রুপজিশন আক্রমণ করতে হতো বা এগিয়ে যেতে হতো তখন আমাদের বাহিনী অগ্রসর হতো ও আক্রমণ করতো কারণ অঞ্চলের পথঘাটগুলো আমাদের জানা ছিল, শত্রুর পজিশন সম্পর্কে প্রতি মুহূর্তের খবর আমাদের দেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত আমাদের সেলগুলোর থাকতো এবং গেরিলাদের সাথে আমাদের সমন্বয় ও সংযোগ ছিল। আবার এখানেও প্রয়োজন হলে ভারতীয় বাহিনী আমাদেরকে আর্টিলারী বা ভারী কামানের দ্বারা সাপোর্ট দিত।

প্রঃ ক'টি সেক্টর ছিল? হেডকোয়ার্টার কোথায় ছিল?

জেনারেল ওসমানীঃ বাংলাদেশকে আমি ১১টি সেক্টরে ভাগ করেছিলাম। ১১টি সেক্টর একেকজন অধিনায়কের অধীনে ছিল। এবং প্রত্যেক অধিনায়কের একটি সেক্টর হেডকোয়ার্টার ছিল। এবং এই সেক্টর হেডকোয়ার্টারগুলি বাংলাদশের ভেতরেই ছিল। এই সেক্টরগুলোর উপর ভিত্তি করে আমি যুদ্ধটি লড়েছি। কারণ, বাংলাদেশের মত এত বড় একটা 'থিয়েটার' অর্থাৎ দেশব্যাপী রণক্ষেত্রে-যার ১১টি সেক্টরের মধ্যে রয়েছ অসংখ্য নদীনালা ও ব্যাপক দূরত্ব-কেন্দ্রীভূতভাবে দৈনন্দিন যুদ্ধ পরিচালনার জন্যে যুক্ত সামরিক সদর দফতর, উপযুক্ত পরিমাণ অফিসার ও স্টাফ, যোগাযোগ ব্যাবস্থা ও সম্পদ এবং সঙ্গতির প্রয়োজন তা সংগ্রহ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। আমার ছিল মাত্র ১০ জন অফিসার বিশিষ্ট একটি ক্ষুদ্র সশস্ত বাহিনীর রণ পরিচালনার হেডকোয়ার্টার। এছাড়া, এতবড় একটা বিরাট অঞ্চলব্যাপী সামগ্রিক যুদ্ধে পরিচালনা আমাদের তখনকার পরিস্থিতিতে শুধু অসম্ভব নয়, অবাস্তবও ছিল। তাই আমি আমার চীফ অব স্টাফ ও অন্যান্য কমাণ্ডারদের কাছে আমাদের জাতীয় লক্ষ্য, আমাদের রাজনৈতিক ও সামরিক বিবেচ্য বিষয়ের সঠিক মূল্যায়ন এবং আমাদের ও শত্রুর কাছে কার্যক্রমের কেন কোন পথ উন্মুক্ত রয়েছে ইত্যাদি বিষয়ে সঠিক চিত্র তুলে ধরি। আমাদের সামরিক লক্ষ্য ও সে লক্ষ্য অর্জনের জন্য যুদ্ধ পরিচালনা সম্পর্কিত আমাদের নির্দেশের (অপারেশনাল ইনস্ট্রাকশন ও অপারেশনাল ডাইরেকটিভ) মাধ্যমে সাধারণভাবে আমাদের বাহিনীর করণীয়, প্রত্যেক সেক্টরে তাদের বিশেষ করণীয়, বিভিন্ন সেক্টরের কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন এবং সাংগঠনিক ও যুদ্ধ পরিচালনা বিষয়ে জানতাম। আমার এইসব নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিটি সেক্টর কমাণ্ডারদের সাথে আমি লিয়াজোঁ অফিসার ও মুক্তিযোদ্ধাদের মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করতাম। এছাড়া আমার কমাণ্ডারদের সাথে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রক্ষা এবং যুদ্ধের অবস্থা সমন্ধে সরাসরি অভিজ্ঞতা লাভের জন্য আমি এক সেক্টর থেকে যেতাম অন্য সেক্টরে। সে অবস্থায় আমি যখন যে সেক্টরে থাকতাম, সে সেক্টরের হেডকোয়ার্টারই হতো আমার হেডকোয়ার্টার। এভাবে প্রত্যক্ষভাবে পরিস্থিতির সঠিক মূল্যায়ন করতাম ও সে অনুযায়ী নির্দেশ দিতাম। এছাড়া যুদ্ধকালীণ মন্ত্রিসভাকেও আমি যুদ্ধের অগ্রগতি ও সামরিক পরিস্থিতির সম্বন্ধে অবহিত রাখতাম।

যখন বাংলাদেশ সরকার আমাকে সর্বাধিনায়ক হিসেবে নিয়োগ করেন তখন আমি তাদের অনুমোদন লেঃ কর্নেল (বর্তমানে মেজর জেনারেল) এম, এ, রবকে চীফ অব স্টাফ নিয়োগ করি। তিনি আমার পরে সবচেয়ে সিনিয়র ছিলেন। তিনি গণপরিষদেরও সদস্য।

বিভিন্ন সেক্টরের কমাণ্ডার নিয়োগ করিঃ (১) এক নম্বর সেক্টরে প্রথম মেজর (বর্তমানে কর্নেল) জিয়াউর রহমান, পরে মেজর রফিক। (২) দুই নম্বর সেক্টরের কমাণ্ডার মেজর (বর্তমানে কর্নেল) খালেদ মোশাররফ, পরে তিনি যখন 'কে' ফোর্স-এর কমাণ্ডার হয়ে যান তখন বেশ কিছুদিন তিনি দুটাই কমাণ্ড করছিলেন, তিনি আহত হওয়ার পরে মেজর আবু সালেক চৌধুরী কমান্ড করেন 'ক' ফোর্স এবং ২ নম্বর সেক্টরে মেজর হায়দার। (৩) তিন নম্বর সেক্টরের কমান্ডার ছিলেন প্রথমে মেজর (বর্তমানে কর্নেল) শফিউল্লাহ, পরে যখন তিনি 'এস' ফোর্সের কমান্ডার হয়ে যান তখন মেজর (বর্তমানে লেঃ কর্নেল) শফিউল্লাহ, নূরুজ্জামান-বর্তমানে যিনি জাতীয় রক্ষী বাহিনীর ডাইরেক্টর-তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। (৪) চার নম্বর সেক্টরে কমাণ্ডার ছিলেন মেজর (বর্তমানে কর্নেল) চিত্তরঞ্জন দত্ত, যিনি সকল নিয়মিত অফিসার যারা চাকুরীতে রয়েছেন তাদের সকলের মধ্যে সিনিয়র। আইয়ুব আমলে তাকে সুপারসিড করা হয়েছিল। (৫) পাঁচ নম্বর সেক্টরে ছিলেন মেজর (বর্তমানে কর্নেল) মীর শওকত আলী, যিনি যুদ্ধের প্রারম্ভে চট্টগ্রামে ও পার্বত্য চট্ট্রগ্রামে যুদ্ধ করেন। (৬) ছয় নম্বর সেক্টরে ছিলেন উইং কমাণ্ডার (বর্তমানে গ্রুপ ক্যাপ্টেন) বাশার, তিনি বৈমানিক কিন্তু স্থলে অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে যুদ্ধ করেছেন। (৭) সাত নম্বর সেক্টরে কমান্ডার ছিলেন মেজর (পরে লেঃ কর্ণেল) কাজী নূরুজ্জামান। তিনি পেনশনে ছিলেন ও আমার মতো যুদ্ধাবস্থায় এ্যাকটিভ লিস্টে কাজে যোগদান করেছিলেন। আবার পেনশনে চলে গেছেন। (৮) আট নম্বর সেক্টরের শুরুতে কমান্ডার ছিলেন মেজর (বর্তমানে কর্ণেল) ওসমান চৌধুরী এবং আগস্ট মাস থেকে মেজর (বর্তমানে কর্ণেল) মনজুর। (৯) নয় নম্বর সেক্টরে কমাণ্ডার ছিলেন প্রায় শেষের দিক পর্যন্ত মেজর এম. এ. জলিল। তিনি এখন চাকুরীতে নেই। তারপরে ছিলেন মেজর জয়নাল আবেদীন। (১০) দশ নম্বর সেক্টর (নৌকমাণ্ডো-সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চল ও আভ্যন্তরীণ নৌপথ)। এতে নৌকমান্ডোর বিভিন্ন সেক্টরে নির্দিষ্ট মিশনে সংশ্লিষ্ট কমাণ্ডারের অধীনে কাজ করতেন। (১১) এগারো নম্বর সেক্টরে ছিলেন মেজর (পরে লেঃ কর্ণেল) আবু তাহের, ইনি জখমের জন্যে বোর্ড আউট হয়েছেন। এছাড়া, তিনটি ব্রিগেড ফোর্স-জেড ফোস ও এস ফোস কমান্ডার ছিলেন যথাক্রমে জিয়াউর রহমান, খালেদ মোশাররফ ও শফিউল্লাহ। হেডকোয়ার্টারে ডেপুটি চীফ অব ষ্টাফ ছিলেন গ্রুপ ক্যাপ্টেন (বর্তমানে এয়ার কমাণ্ডার) এ, কে, খোন্দকার। চীফ অব স্টাফ রব সাহেব পূর্বাঞ্চলে থাকতেন। ওখানে আমার হেডকোয়ার্টারের একটি অংশ ছিল। ওখানে যতগুলো সমস্যা-প্রশাসন ও রণপরিচালনা সম্পর্কিত-তিনি সরাসরি ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন যেটা নীতি গ্রহণ সম্পর্কিত হত সে বিষয়ে আমার নির্দেশ চাওয়া হত।

প্রশ্নঃ নিয়মিত বাহিনীর সংখ্যা কত ছিল এবং কি ধরনের অস্ত্রে তারা সজ্জিত ছিল? গণবাহিনীর মোট সংখ্যা কত দাঁড়িয়েছিল?

জেনারেল ওসমানীঃ নিয়মিত বাহিনীর সংখ্যা বাড়াতে বেগ পেতে হয়েছিল। অস্ত্র নিয়ে বেগ পেতে হতো। বেশীর ভাগ সময় সকলের সদিচ্ছা থাকলেও অনেক জিনিস আমরা পেতাম না। আমার চেষ্টা ও চিন্তা এই ছিল যে, আমি বিভিন্ন অস্ত্র কত তাড়াতাড়ি যোগাড় করতে পারি। কারণ ভারতীয়রা যদি তরা ডিসেম্বর যুদ্ধে না নামতো তাহলে তখন যে পরিস্থিতি ছিল তাতে আমাকে আরো ছয় মাস যুদ্ধ করতে হতো। এতে দেশের আরো অনেক ক্ষতি হত। এজন্য শত্রুকে আরও সত্বর ধ্বংস করার জন্য অনেকগুলো অস্ত্রের আমাদের প্রয়োজন ছিল। সর্বশেষ একটি দেশের সাথে আমার সংযোগ হয়েছিল। সেই দেশটি তখনই অস্ত্র দিতে প্রস্তুত ছিল যদি আমার নিজের বিমান ঘাঁটি থাকতো। সে জন্যে আমি জেড ফোর্সকে (বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর প্রথম ব্রিগেড) সিলেট পাঠিয়েছিলাম। অনেকেই জানতেন না হঠাৎ কেন জেড ফোর্সকে সিলেটের উপর চাপালাম। তারা কেবলমাত্র স্ট্র্যাটেজিক কারণই জানতেন। আমার উদ্দেশ্য ছিল দুটো, বিমানঘাঁটি যত তাড়াতাড়ি পাই তত তাড়াতাড়ি আমি হয়তো অনেক জিনিস সরাসরি আনতে সক্ষম হবো। এছাড়া শত্রুর শক্তিকে অন্যদিকে আকর্ষণ করাও আমার উদ্দেশ্য ছিল।

যাহোক, যুদ্ধের শুরুতে খুব তাড়াতাড়ি একটা বিরাট বাহিনী গড়ে তোলা সম্ভব মনে হত না। কিন্তু আমার মুক্তিবাহিনীর সৈনিকদের, নিয়মিত বাহিনীর অফিসার ও অধিনায়কদের চেষ্টায় আমি যুদ্ধের শেষ পর্যন্ত প্রায় কুড়ি থেকে বাইশ হাজার সৈন্য সম্বলিত নিয়মিত বাহিনী গড়ে তুলেছিলাম। তারা সাধারণ ইনফ্যানট্রি অস্ত্রে সজ্জিত ছিলেন।

দুটো গোলন্দাজ ব্যাটারী আমরা গড়ে তুলেছিলাম। ভারতীয়দের প্রাচীন কিছু, কামান ছিল। ওগুলো দিয়ে প্রথম ব্যাটারীটি গড়ে উঠেছিল। ওর নাম দিয়েছিলাম 'নম্বর ওয়ান মুজিব ব্যাটারী।' এই ব্যাটারী যুদ্ধেও ছিল। এর পরে আমরা দ্বিতীয় ব্যাটারী গঠন করি। আগেরটির চেয়ে একটু ভাল কামান দিয়ে এটি সজ্জিত ছিল। এ ব্যাটারীও যুদ্ধ করে।

আমরা যুদ্ধ আরম্ভ করি প্রায় ৫টি ব্যাটালিয়ন সৈন্য দিয়ে। যুদ্ধের শুরুতেই অনেকগুলোর সংখ্যা পূরণ করতে হয়েছে। যেমন, ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের প্রথম ব্যাটালিয়ন-একটি অত্যন্ত ঐতিহ্যবাহী পুরোনো পল্টন। মাত্র ১৮৮ জনকে আমি পেয়েছিলাম। বাকীরা নিহত কিংবা আহত হয়েছিলেন যশোরের যুদ্ধে। তাদের সংখ্যা পূরণ করতে হলো। শেষ পর্যন্ত আমি ৫টি ব্যাটালিয়ন থেকে ৮টি ব্যাটালিয়নে উন্নীত করি। এগুলো ছিল ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের এক, দুই, তিন, চার, আট, নয়, দশ, এগারো নং ব্যাটালিয়ণ। নয়, দশ, এগারো নং ছিল নতুন।

এছাড়া সেক্টর ট্রুপস গড়ে তুলি। সেক্টর ট্রুপস-এর সংখ্যা শেষ পযন্ত ছিল দশ হাজার। যারা প্রাক্তন ইপিআর এবং নিয়মিত বাহিনীর বিভিন্ন ব্রাঞ্চ থেকে এসেছিলেন তাদেরকে ১১টি সেক্টরে নিয়মিত বাহিনীর সেক্টর ট্রুপস হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছিল। কোন সেক্টরে চারটি কোম্পানি, কোন সেক্টরে পাঁচটি কোম্পানি, কোন সেক্টরে ছ'টি কোম্পানী-এমনি বিভিন্ন সেক্টরে প্রয়োজন অনুসারে সংখ্যা বিভিন্ন ছিল। তারা সেক্টর কমাণ্ডারের অধীনে যুদ্ধ করতেন।

নিয়মিত ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ব্যাটালিয়ন দিয়ে গঠিত হয়েছিল ব্রিগেড। ব্রিগেডগুলোকে আমি ফোর্স নাম দিয়েছিলাম- জেড ফোর্স, কে ফোর্স, এস ফোর্স। ব্রিগেডগুলোর কমান্ডারদের নামে এই নামকরণ হয়েছিল। জেড ফোর্স কমাণ্ড করতেন জিয়াউর রহমান, কে ফোর্স খালেদ মোশাররফ এবং এস ফোর্স শফিউল্লাহ।

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের আগে যে অর্গানাইজেশন ছিল আমরা তার পরিবর্তন পরিবর্তন করিনি। এই অর্গানাইজেশন অনেক চিন্তা করে বিগত দশ বিগত দশ বছরে শান্তি ও যুদ্ধে পরীক্ষার ভিত্তিতে গড়া হয়েছিল, এর সঙ্গে আমি ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলাম, সেটা ভারতীয় অর্গানাইজেশনের চেয়ে একটু স্বতন্ত্র। আমি মনে করি আমাদেরটা সুষ্ঠু। সেই অর্গানাইজেশনের ভিত্তিতে আমাদের ব্যাটালিয়নগুলোর সাধারণ অস্ত্রসজ্জা ছিল। অন্যান্য দেশের ইনফ্যানট্রি ব্যাটালিয়নের যা সাধারণ অস্ত্র থাকে এখানেও তাই ছিল, তবে ফায়ার পাওয়ারটা এই অর্গানাইজেশনের কিছুটা বেশী। যেমন, সাধারণতঃ একটি সেকশনে একটি লাইট মেশিনগান থাকে আমাদের ছিলো দুটো মেশিনগান। আর অস্ত্র ছিল যা স্বাভাবিক ইনফ্যানট্রি ব্যাটালিয়নে থাকে-গ্রেনেড, রাইফেল, লাইট মেশিনগান, মিডিয়াম মেশিনগান, দুই ইঞ্চি এবং তিন ইঞ্চি বা ৮১ মিলিমিটার মর্টার এবং ট্যাংকবিধ্বংসী কামান।

সেক্টর ট্রুপস-এর অস্ত্রও প্রায় এ ধরনের ছিল। তবে ওদের স্কেল ছিল আলাদা। ওদের কাজ ঠিক নিয়মিত বাহিনীর মত ছিল না। তাদের ভূমিকা ছিল-প্রথম তারা ঘাঁটি করবেন। সেই ঘাঁটি থেকে গেরিলা ভেতরে পাঠানো হবে এবং গেরিলাদের সাথে সম্মিলিত হয়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে শত্রুর উপর বিভিন্ন হামলা ও অন্যান্য কাজ করবেন। তাই তাদের অস্ত্রের পরিমাণ বা স্কেল এ্যাকটিভ ব্যাটালিয়নের চেয়ে কিছুটা পৃথক ছিল, কিছু কিছু কম ছিল।

এবার গণবাহিনীর কথায় আসছি। সর্বমোট প্রায় ৮০ হাজারের মতো ছিল গণবাহিনীর সদস্য। আমি ৬০ থেকে ৭০ হাজার গণবাহিনী কাজে নিয়োগ করেছিলাম। এছাড়া কয়েক হাজার প্রশিক্ষণরত ছিল। এদের অস্ত্র যা দিতে চেয়েছিলাম, যে স্কেল আমরা তৈরী করেছিলাম ঠিক সেই পরিমাণ অস্ত্র সবসময় আমরা দিতে পারিনি। অস্ত্রের অভাবই ছিল এর কারণ। যা হোক, গণবাহিনীর বীর গেরিলাদের অস্ত্র ছিল প্রত্যেকের কাছে গ্রেনেড, কয়েকজনের কাছে স্টেনগান। এছাড়া ছিল রাইফেল, যদিও গেরিলাদের জন্যে রাইফেল সন্তোষজনক অস্ত্র নয়। কিন্তু যেহেতু আমাদের কাছে সম্বল ছিল না তাই যা পেতাম তাই ব্যবহার করতে হতো। এছাড়া ছিল অল্প কয়েকটি পিস্তল ও এসএলআর। খালি হাতেও তারা যুদ্ধ করেছেন। এছাড়া বিভিন্ন নির্দিষ্ট ধরনের অপারেশনের

জন্যে থাকতো বিভিন্ন ধরনের বিস্ফোরক। নৌ কমাণ্ডদের আত্মরক্ষার জন্যে হাল্কা অস্ত্র থাকতো, বেশীর ভাগ সময়ই গ্রেনেড। আর থাকতো অপারেশনের প্রয়োজনীয় সামগ্রী, যেমন-লিম্পেট মাইন।

যুদ্ধ শেষ হওয়া আমার তাই সৈন্যসংখ্যা ছিল ২০-২৫ হাজার নিয়মিত বাহিনী এবং ৭০/৮০ হাজার গণবাহিনী।

প্রশ্নঃ গণবাহিনীর কোন আলাদা সেক্টর ছিল কিনা? সি-ইন-সি স্পেশাল সংগঠনটিও বা কি ছিল?

জেনারেল ওসমানীঃ বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর নাম ছিল মুক্তিবাহিনী। এর ভেতর স্থল, জল, বিমান তিনটিই অন্তর্ভুক্ত ছিল। অনেকে মুক্তিবাহিনী শব্দে ভুল করেন। তারা মনে করেন শুধু গেরিলাদের বুঝি মুক্তিবাহিনী বলা হতো। আসলে তা নয়। বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর পুরোটা মিলিয়ে ছিল মুক্তিবাহিনী। এর দুটো অংশ ছিল-(১) নিয়মিত বাহিনী এবং (২) গণবাহিনী ও গেরিলা বাহিনী বা অনিয়মিত বাহিনী। ভারতীয়রা এই শেষোক্ত অংশকে বলতেন এফ-এফ অর্থাৎ 'ফ্রীডম ফাইটার'। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধা তো সবাই। আর গণবাহিনীর ও নিয়মিত বাহিনীর সেক্টর একই ছিল।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আনুগত্য স্বীকারকারী সকলেই এই ১১টি সেক্টরের কোন না কোন একটি সেক্টরে যুদ্ধ করেছেন।

সি-ইন-সি স্পেশাল সম্পর্কে এবার বলছি। শুরুতেই গেরিলাদের দু'সপ্তাহ ট্রেনিং দেয়া হতো। কিন্তু এটা যথেষ্ট ছিল না। পরে মেয়াদ খানিকটা বাড়ানো হলো। তখন তিন সপ্তাহের মতো সাধারণ গেরিলা ট্রেনিং দেয়া হতো। এছাড়া আমি কিছুসংখ্যক গেরিলার জন্যে একটি বিশেষ কোর্সের বন্দোবস্ত করেছিলাম। একে বলা হতো স্পেশাল কোর্স। ওটা ছয় সপ্তাহের ছিল। এই কোর্সে গেরিলা লীডারদের প্রশিক্ষণ দেয়া হতো। এবং আরবান গেরিলা ওয়ারফেয়ার অর্থাৎ শহরাঞ্চলে আবাসিক এলাকায় যুদ্ধ করার পদ্ধতিও তাদের শেখানো হতো। এদের ভূমিকা ছিল গেরিলাদের নায়কত্ব করা এবং সাধারণ গেরিলাদের দিয়ে সম্ভব নয় এমন সব কাজ সম্পন্ন করা। এই প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের সংখ্যা ছিল খুব কম। চাকুলিয়া নামে এক জায়গায় তাদের ট্রেনিং দেয়া হতো। এসব গেরিলারা বিশেষভাবে সিলেট হয়ে যেতো এবং এদের সিলেকশনের ব্যাপারে ব্যক্তিগতভাবে আমি লোক নিয়োগ করেছিলাম। তাই এদের নাম কেই বলতো সি-ইন-সি স্পেশাল। আসলে এ নামে স্বতন্ত্র বাহিনী ছিল না।

প্রঃ যুদ্ধ পরিচালনার নির্দেশ অর্থাৎ অপারেশনাল ইন্সট্রাকশন বা ডাইরেকটিভস সম্পর্কে কিছু বলুন।

জেঃ ওসমানী : সরকার গঠনের আগে আমি সর্বপ্রথমে এই যুদ্ধ পরিচালনা করেছি মুখে বলে, যোগাযোগ করে। তারপর আমি কমান্ডারদের আমাদের লক্ষ্য বা অবজেকটিভ এবং প্রত্যেক সেক্টরে কি ফলাফল অর্জন করতে হবে তা জানিয়েছি।

এ জন্যে আমি সাধারণতঃ অপারেশনাল ইন্সট্রাকশন দিতাম। তাতে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের অধিনায়কের উপর দায়িত্ব যথেষ্ট বিকেন্দ্রীকরণ করা হতো। সাধারণ লক্ষ এবং সেই বিশেষ বিশেষ লক্ষ্য ও দায়িত্বের কথা এই হুকুমনামা বা ইন্সট্রাকশনে লেখা থাকতো। এছাড়া আমি একটি জিনিস ব্যবহার করেছিলাম যা নতুন ছিল এবং আমার জানা মতে এর আগে কোন সামরিক বাহিনীতে তা ব্যবহার করা হয়নি। সেটা ছিল অপারেশনাল ডাইরেকটিভস নির্দেশ এবং উপদেশ। পরিস্থিতি যাচাই ও বিবেচনা করে কি পরিমাণ এই ডাইরেকটিভস একজন অধিনায়ক অনুসরণ করবেন তা তার উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছিল। কারণ তা না হলে আমরা যুদ্ধে এগিয়ে যেতে পারতাম না। তবে মৌলিক কয়েকটি বিষয় বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়নি।

সব সময়ই মন্ত্রীসভাকে- মাসে অন্তত একবার- রণাঙ্গনের মূল্যায়ন অবহিত করতাম।

এছাড়া আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ভিত্তিক যে নির্দেশ মন্ত্রীসভা আমাকে দিতেন তা আমার অধিনায়কদের কাছে পৌঁছে দিতাম।

প্রঃ বাংলাদেশের অভ্যন্তরভাগে কিভাবে যোগাযোগ রক্ষা করা যায়?

জেনারেল ওসমানী : বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন অঞ্চলে শুরু থেকেই আমরা ঘাঁটিগুলি গড়ে তুলেছিলাম। গণবাহিনী কাজ শুরু করার পর এই ঘাঁটিগুলি অধিকতর সক্রিয় হয়। ঢাকা নগরীতেও কয়েকটি ঘাঁটি ছিল। ঘাঁটি প্রায়ই পরিবর্তন করা হতো। কয়েকটি ঘাঁটি শত্রুর হতে ধরাও পড়েছিল। ঘাঁটিগুলোতে যে কেবল মুক্তিযোদ্ধা ছিল তা নয়, এতে আমাদের 'কনট্যাক্ট' এবং কোরিয়াররাও ছিলেন। একটা কোরিয়ার সার্ভিস পরিচালিত হতো। ছিল অয়ারলেস যোগাযোগ। কোরিয়ার-এর আসা যাওয়ার রাস্তা পরিবর্তন করা হতো। কোরিয়ার এর মাধ্যমে ভেতরের ঘাঁটিগুলোর মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করা হতো। ঘাঁটি সাধারণত তিন রকমের ছিল- (১) যেখানে অস্ত্র জমা থাকতো, (২) যেখানে তথ্যাবলী সংগ্রহ করা হতো ও যেখান থেকে পাঠানো হতো এবং (৩) যেখান থেকে শত্রুর উপর আক্রমণ করার প্রস্তুতি নেয়া হতো।

এছাড়া ভেতরে অনেকে ছিলেন, যারা মুক্তিযুদ্ধে বাইরে না গিয়ে ভেতরে থেকে সহযোগিতা করেছেন।

প্রঃ অধিকৃত এলাকার জনগণের কাছ থেকে কি ধরনের সাড়া পেয়েছিলেন?

জে: ওসমানী : বাংলাদেশের জনগণের কাছ থেকে আন্তরিক ও অকুণ্ঠ সমর্থন আমরা পেয়েছি- কেবলমাত্র গুটি কয়েক লোক ছাড়া। বাংলাদেশের লোক ২৬শে মার্চ থেকে সম্পূর্ণ সমর্থন দিয়ে এসেছেন। অনেকসময় নিজের প্রাণ বিপন্ন করে আমাদের আশ্রয় দিয়েছেন, সাহায্য করেছেন। এটা অবশ্য সত্য- যারা দালালী করেছেন- রাজাকার আর-বদরের যুদ্ধে অনেক জায়গায় পেয়েছি। তারা বেশীর ভাগ সাহস সেখানে যুদ্ধ করতে দেখিয়েছে যেখানে তাদের মালিক পাঞ্জাবীরা ছিল, আর তা না হলে তারা মুক্তিবাহিনী দেখামাত্র পালিয়ে যেতো। তবে অনেক জায়গায় শত্রুর একটা প্লাটুন থাকতো আর একশো-দুশোজন রাজাকার, আল-বদর হতো। জনগণের সাথে শুরু থেকেই যোগাযোগ ছিল। সাড়ে সাত কোটি মানুষের সম্পূর্ণ সমর্থন ছিল। আমার, আমার অধিনায়ক ও মুক্তিবাহিনীর যোদ্ধাদের সব সময় এমন মনে হতো যে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ আমাদের সঙ্গে শ্বাস নিচ্ছে।

প্রঃ অধিকৃত সময়ে আপনি কি কখনো ঢাকা এসেছিলেন?

জে: ওসমানী : ঢাকায় আসিনি। আমি জানি, অনেকে বলেছেন, আমি ঢাকায় এসেছিলাম। সেটা ঠিক নয়। আমি অন্যান্য অঞ্চলে এসেছি ও ঘুরেছি। কিন্তু ঢাকায় আসিনি এবং ঢাকায় আসা ঠিক সম্ভবপর ছিল না। আরেকটি কথা জনগণের সমর্থনের প্রসঙ্গে আমি বলেছি। যোগাযোগ আমাদের সব জায়গায় ছিল সশরীরে- সব জায়গায়, সব শহরে। আপনারা জানেন কিনা জানি না, অমুক তারিখে হাজির হতে হবে বলে টিক্কা খান আমাকে যখন সময় দিলেন তখন তার জওয়াব আমি দিয়েছিলাম। সেই জওয়াব টিক্কা খানকে পৌঁছানো হয়। আমার হতের লেখা জওয়াব। টিক্কা খানের বাড়ীর দেয়ালে একটি বালক গিয়ে সেই জওয়াবের কাগজ লাগিয়ে দিয়েছিল। পরের দিন সেই জাগজটি নাকি কেউ টিক্কা খানকে দেখাবার পর সে বলেছিল-হ্যাঁ, এটি ঐ...এর হাতের লেখা।

জেনারেল ওসমানী সাক্ষাৎকারে প্রবাসী বাঙ্গালী ও প্রবাসী বাঙ্গালীদের মেডিক্যাল সমিতির চিকিৎসা সাহায্য, ভারতীয় সেনাবাহিনীর সামরিক হাসপাতালসমূহের চিকিৎসা ও সেবা কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেন। ভারতীয় জনগণের ও সরকারের প্রতিও তাঁর কৃতজ্ঞতার কথা জানান। তিনি বলেন, তাদের অবদানের কথা ভুলবার নয়। ভারতীয় বিএসএফ (বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স) ও সশস্ত্র বাহিনীর প্রতি তিনি তাঁর আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানান।

সংযোজন

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২৯। বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর তৎপরতার আরও বিবরণ	'দৈনিক বাংলা' ১২ ডিসেম্বর, ১৯৭২	………… ১৯৭১

ছোট ছোট বিমান দিয়েও প্রচন্ড আক্রমণ চালিয়েছিল বাংলাদেশের বৈমানিকরা
ক্যাপ্টেন আবদুস সাত্তার

মে মাসের মাঝামাঝি আমি আগরতলায় মিলিত হই মরহুম ক্যাপ্টেন খালেক, বর্তমান বাংলাদেশ বিমানের ক্যাপ্টেন শাহাবুদ্দিন ও ক্যাপ্টেন সরফুদ্দিনের সাথে। ক্যাপ্টেন খালেক ছিলেন পিআইএ'র ট্রাইডেন্ট বিমানের একজন কমান্ডার। পিআইএতে বাঙ্গালীদের অভাবঅভিযোগের একজন প্রবক্তা হিসাবেও তিনি সুপরিচিত ছিলেন।

অল্প কয়েকদিনের মধ্যে মধ্যে আগরতলায় আমাদের দলে যোগ দিলেন ক্যাপ্টেন মুকিত। ক্যাপ্টেন মুকিত আদিতে ছিলেন পাকিস্তান বিমান বাহিনীর পাইলট। ১৯৬৫ সালের যুদ্ধের পরে তিনি বিমান বাহিনী ছেড়ে পিআইএতে যোগদান করেন। মুকিতের যোগদানের ফলে আমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেল। তখন থেকে আমাদের একমাত্র ধ্যান-ধারণা ও প্রচেষ্টা ছিল কেমন করে একটা ছোট বিমান বাহিনী গড়ে তোলা যায়।

জুলাই মাসের দিকে পাকিস্তান বৃক্ষ বিভাগের পাইলট আকরাম আহমেদ ও ঢাকা ফ্লাইং ক্লাবের সদস্য আহমেদুল আমিন আমাদের সাথে মিলিত হন। আকরাম আহমেদ ও আহমেদুল আমিনের আগরতলা গমনের ২/৩ দিনের মধ্যেই ক্যাপ্টেন খালেক, ক্যাপ্টেন শাহাবুদ্দিন ও আমাকে ভারতীয় বৈদেশিক দফতর দিল্লীতে ডেকে পাঠালেন। দিল্লীতে আমদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ছিল ভারতীয় বিমান বাহিনীর ও বৈদেশিক দফতরের উচ্চপদস্থ অফিসারদের অনুধাবন করানো যে ছোট ছোট দিয়েও কার্যকরী একটা বিমান বাহিনী গড়ে তোলা সম্ভব। বিমান বাহিনী প্রসঙ্গে আমাদের আরও পরিকল্পনা ছিল- ছোট ছোট বিমানে ফ্লোটিংর ডিভাইস সংযোজন করে শত্রুসৈন্যদের যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করা ও তাদের শক্ত ঘাঁটির উপর অতর্কিতে আঘাত হানা। আমাদের শক্তির সমর্থন আমরা বায়াফ্রার যুদ্ধে সুইডিশ বৈমানিক কাউন্ট ভনরজেন কর্তৃক রকেট সজ্জিত ছোট বিমানে ভূমিতেই অবস্থানরত ১১ খানা নাইজেরীয় মিগ-১৯ বিমান ধ্বংস করার ঘটনা দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করলাম। দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পরে দিল্লীর উচ্চপদস্থ অফিসাররা আমাদের সাথে একমত হলেন এবং তারা মুজিবনগরস্থ বাংলাদেশ সরকারের মাধ্যমে বর্তমান বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর প্রধান এয়ার কমোডর আবদুল করিম খোন্দকারের সাথে এ বিষয়ে যোগাযোগ স্থাপন করলেন। পরবর্তী পর্যায়ে এয়ার কমোডর খোন্দকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ও নেতৃত্বে জন্মলাভ করল বাংলাদেশ বিমান বাহিনী। ২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ তারিখে নাগাল্যান্ডের ডিমাপুরে আমরা বাংলাদেশ এয়ার ফোর্সের জন্মদিবস পালন করি।

বাংলাদেশ বিমান বাহিনীতে তখন এর প্রতিষ্ঠাতা এয়ার কমোডর এ কে খন্দকার ছাড়া আরও কয়েকজন বৈমানিক ছিলেন- মরহুম ক্যাপ্টেন খালেক, ক্যাপ্টেন সাত্তার (লেখক), ক্যাপ্টেন শাহাবুদ্দিন, ক্যাপ্টেন মুকিত, ক্যাপ্টেন আকরাম ও ক্যাপ্টেন সরফুদ্দিন। পাকিস্তান বিমান বাহিনী ছেড়ে যারা এসেছিলেন তারা হলেন স্কোয়াড্রন লীডার সুলতান মাহমুদ, ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট শামসুল আলম, ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট বদরুল আলম। আরও ছিলেন পাকিস্তান বিমান বাহিনী ত্যাগকারী ৬৭ জন এয়ারম্যান। আমাদের বিমান ছিল ডাকোটা অটার ও এলুভেট হেলিকপ্টার।

ডাকোটা বিমানকে পাঁচ হাজার পাউণ্ড বোমা বহন করার উপযোগী করা হলো এবং পরিচালনার জন্য নির্বাচিত করা হলো ক্যাপ্টেন খালেক, ক্যাপ্টেন মুকিত ও আমাকে। অটার বিমানকে সজ্জিত করা হলো সর্বধুনিক রকেট, মেশিনগান ও বোমাবর্ষণের উপযোগী করে।

পরিচালনার জন্য নির্বাচিত করা হলো ফ্লাঃ লেঃ শামসুল আলম, ক্যাপ্টেন আকরাম ও মরহুম সরফুদ্দিন। হেলিকপ্টারকে সজ্জিত করা হলো রকেট ও ভারী মেশিনগান দ্বারা। পরিচালনার জন্য নির্বাচিত করা হলো স্কোঃ লিঃ সুলতান মাহমুদ, ফ্লাঃ লেঃ বদরুল আলম এবং ক্যাপ্টেন শাহাবুদ্দিনকে।

অতঃপর অক্টোবর মাসের প্রথম তারিখ থেকে এয়ার কমোডর খোন্দকার সাহেবের নেতৃত্বে আমাদের ব্যাপক প্রশিক্ষণ, অনুশীলন ও মহড়া শুরু হলো। নাগাল্যান্ড, মনিপুর, অরুনাচল, ত্রিপুরা ও আসামের জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড়ী এলাকার কোন প্রকার পথ নির্ধারক ব্যতিরেকে শুধু কম্পাসের উপর নির্ভর করে রাত্রির পর রাত্রি আমরা অত্যন্ত নীচু দিয়ে উড্ডয়নের কৌশল আয়ত্ত করার অনুশীলন করতাম। শত্রুর রাডারকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন হয় অত্যন্ত নিচু দিয়ে বিমান চালনা করা এবং সত্যিকারের অভিযানকালে যাতে শত্রুর দৃষ্টিগোচর না হতে হয় সেজন্য প্রয়োজন ছিল রাত্রিতে সঠিক পথে বিমান চালনার অভ্যাস করা। রাত্রিবেলায় নীচু দিয়ে বিমান চালনা এবং প্রদীপবিহীন রানওয়েতে বিমান অবতরণের প্রক্রিয়া আয়ত্ত করার চেষ্টা ছাড়াও বিমান আক্রমণের অন্যান্য পদ্ধতিরও আমরা নিয়মিত অভ্যাস করতাম। এয়ার কমোডর খন্দকার সাহেবের তত্ত্বাবধানে আমাদের অনুশীলন যে কত নিখুঁত ভাবে পরিচালিত হয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় ৩রা ডিসেম্বর থেকে ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত বিভিন্ন রণাঙ্গনে বিমান আক্রমণে আমাদের দারুণ সফলতার মধ্য দিয়ে। পরিকল্পনা মাফিক ঠিকমত আক্রমণ পরিচালনা করতে পারলে ছোট ছোট বিমানও যে অত্যাধুনিক জঙ্গী বিমানের সমকক্ষ হতে পারে তা আমাদের বৈমানিকগণ দুনিয়াবাসীকে দেখিয়ে দিয়েছেন। আমাদের বৈমানিকদের দক্ষতা দেখে ভারতীয় বিমান বাহিনীর উচ্চপদস্থ অফিসাররা বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছেন।

আমাদের দক্ষতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্তঃ ৩রা ডিসেম্বর মধ্যরাত্রিতে স্কোয়াড্রন লিডার সুলতান মাহমুদ ও ফ্লাঃ লেঃ বদরুল আলম নারায়ণগঞ্জের গোদনাইলে পাকিস্তানী বিমান জ্বালানী ঘাঁটির উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। ফ্লাঃ লেঃ শামসুল আলম ও ক্যাপ্টেন আকরাম আহমদ ঐ একই সময়ে চট্টগ্রামে এক ব্যাপক বিমান আক্রমণ পরিচালনা করেন। চট্টগ্রামের অভিযানের পরে ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত ক্যাপ্টেন আকরাম মরহুম সরফুদ্দিনকে নিয়ে ১২ বারেরও বেশী বিভিন্ন রণাঙ্গনে পাক দুশমনদের শক্ত ঘাঁটি ও কনভয়ের উপর আক্রমণ পরিচালনা করে তাদের প্রভূত ক্ষতিসাধন করে। আমার মনে আছে, মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ডাকোটা, অটার ও হেলিকপ্টার এই তিন গ্রুপের মধ্যে শুধু একটি বিষয়েই প্রতিযোগিতার মনোভাব ছিল, তাহলো কোন্ গ্রুপ কত বেশী বিপজ্জনক অভিযানের দায়িত্ব লাভ করতে পারে। এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনা উল্লেখ করবো। ডাকোটা বিমান নিয়ে বাংলাদেশের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বোমাবর্ষণের জন্য একটি দিন স্থির করা হয়। অভিযানটি ছিল ভয়ানক বিপদসংকুল। কিন্তু নির্দিষ্ট দিনের মাত্র একদিন পূর্বে যখন বিশেষ কারণে এই অভিযান পরিকল্পনা বাতিল হয়ে গেল তখন ক্যাপ্টেন খালেক ও ক্যাপ্টেন মুকিত অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে যান।

বিমান আক্রমণ পরিচালনাকালে আমাদের বৈমানিকগণকে অনেকবার মারত্মক বিপদের মুখোমুখি হতে হয়। যেমন ৭ই ডিসেম্বর পরিকল্পনা অনুযায়ী সিলেট শহর শত্রুমুক্ত হয়েছে কিনা জানার জন্য ক্যাপ্টেন শাহাবুদ্দিন হেলিকপ্টারযোগে সিলেট বিমান বন্দরে অবতরণ করতে যান। সিলেট শহর তখনও শত্রুমুক্ত হয়নি। তাই অবতরণকালে হেলিকপ্টারটি আক্রান্ত হয়। মেশিনগানের বেশ কয়েক রাউন্ড গুলি হেলিকপ্টারটিকে বিদ্ধ করে কিন্তু ক্যাপ্টেন শাহাবুদ্দিন সফলতার সাথে কৈলাশহর বিমান ঘাঁটিতে ফিরে যান। আবার ১০ই ডিসেম্বর সিলেটের অগ্রবর্তী এলাকা পরিদর্শনকালে ক্যাপ্টেন শাহাবুদ্দিনের হেলিকপ্টারের টেইল রোটার ভূমি থেকে নিক্ষিপ্ত গুলির আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর ফলে ভারসাম্য যদিও ব্যহত হচ্ছিল তবু এবারেও ক্যাপ্টেন শাহবুদ্দিন আশ্চর্য পারদর্শিতার সাথে ঘাঁটিতে ফিরে গিয়ে নিরাপদে অবতরণ করেন।

আর একদিনের ঘটনা ফ্লাঃ লেঃ বদরুল আলম ও ক্যাপ্টেন শাহবুদ্দিন কুমিল্লা এলাকায় মিত্রবাহিনী ও মুক্তিবাহিনীকে এয়ার সাপোর্ট দিতে থাকাকালে তাদের হেলিকপ্টারের জ্বালানী ফুরিয়ে যায়। বাধ্য হয়ে তারা কুমিল্লা বিমান বন্দরে জরুরী অবতরণ করেন। ময়নামতি ক্যান্টনমেন্ট তখনও শত্রুকবলিত। সেখান থেকে শত্রু হেলিকপ্টার লক্ষ্য করে মর্টার ও ভারী কামানের গোলাবর্ষণ করতে থাকে। এত বিপদের মাঝেও স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় বদরুল আলম এবং শাহাবুদ্দিন বিমানের জ্বালানী সংগ্রহ করে নিরাপদে ফিরে আসেন। এমনি আরো বহুতর বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছিল আমাদের এই ছোট্ট এয়ার ফোর্সের প্রত্যেকটি বৈমানিককে কিন্তু তাই বলে দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য নিবেদিতপ্রাণ এই সকল বৈমানিকের কেউই কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হননি।

নির্ঘণ্ট

অপারেশন জ্যাকট ১০-১১, ১৩, ২৯৮
অপারেশন লোন রেঞ্জার' ২৯৮
অপারেশন শ্লেজ হ্যামার, ২৯৮
অপারেশন হট প্যান্টস ২০
অবরোধমূরক অভিযান ৪৬১-৬২
অরোরা, জগজিৎ সিং, লেঃ জেনারেল ২৯-৩১, ৩৯, ১৫৩, ১৫৭-৫৮, ২১৬, ২৩৫, ২৮৭-৮৮, ৩৮৫-৮৬, ৪১৮-১৯, ৪৬১-৬২, ৫২৪-২৫, ৫৩১-৩২, ৫৩৯-৪০, ৫৫২-৫৩, ৫৫৮
অল-ইন্ডিয়া রেডিও ৪১৫, ৪১৮
অষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ৬২, ১৩৫, ২৩৯, ৪৭৭, ৪৯৪-৯৫, ৪৯৬-৯৭, ৪৯৮-৯৯, ৫০৫-৫০৬, ৫০৮-০৯, ৫৬৬
অ্যাকশন ৩
অ্যামবুশ ৬, ১৯

আ
আইনউদ্দিন, ক্যাপ্টেন ৭৩, ৮৪, ৯৫, ৯৭-৯৮, ১১৭-১৮, ১৩২, ১৩৫, ১৪৪-১৪৫, ১৪৬-৫৩, ১৫৪, ৫৩৪-৩৫,
আইয়ুব, পাক মেজর ৪৫৭-৫৮
আউট ফ্লাঙ্ক ৫৬২-৬৩
আউয়াল, আবদুল সিপাহী ২৩২-৩৩
আউয়াল, আবদুল, ডি-সি ৪৩৪-৩৫
আওয়ামী লীগ ৪২২-২৩, ৪৬৫-৬৬
আওয়াল, হাবিলদার, ৮৪, ১৮৯
আকতার, লেফটেন্যান্ট ৫৩২-৩৩
আকবর, আলী, সিপাহী ৩২১
আকবর, আলী, ইপিআর নায়েব সুবেদার ৪৮২-৮৩
আকবর, সৈয়দ আলী, হাবিলদার ১০৬
আকবর (আকবর হোসেন), ক্যাপ্টেন ৭৩
আকরাম, ক্যাপ্টেন, (বাংলাদেশ বিমান বাহিনী) ৫২৩-২৪, ৫৬৮-৫৭০
আখঞ্জি, তাহের উদ্দিন, লেঃ ২৮৯-৯২, ২৯৩, ২৯৮
আখাউড়ার যুদ্ধ, ২৩১-৩২
আজম, গোলাম, সুবেদার ৪২২
আজাদ কাশ্মীর ট্রুপস ২৯১-২৯২, ২৯৫-৯৬
আজাদ, ৪৩৪
আজিজ, জেসিও সুবেদার ৩৯. ৩৯
আজিজ (খন্দকার আবদুল), লেঃ ১৩৫-১৩৬, ১৪০
আজিজ, (আজিজুর রহমান), ক্যাপ্টেন ২০৪, ২০৬, ২০৮, ২১৩, ২২৬
আজিজ, নায়েক (৩নং সেক্টর) ২২৯
আজিজ, নায়েক (৯নং সেক্টর) ২২৩-২২৪
আজিজ, (মুক্তিযুদ্ধ সংগঠক) ২৩৬-২৩৭
আজিজ, হাবিলদার, ৩৫৭-৫৮
আজি, নায়েক সুবেদার, ৪৭৭
আজিজ (ফুলমিয়া), হাবিলদার, বেঙ্গল রেজিমেন্ট ৪২২, ৪২৩-২৪, ৪৩৪-৩৫, ৪৩৪, ৪৩৮-৩৯
আজিজ, আবদুল, মেজর ৪৬০-৪৬৩, ৪৭৫, ৪৮১-৮২
আজিজ, সুবেদার, (১১ সেক্টর) ৪৬৩
আজিজ, আবদুল সিপাই, ৪৯৯-৫০০
'আত্ম-সমর্পণ' ৫৩৭, ৫৫৮
আতাউল্লাহ, পাক ব্রিগেডিয়ার, ৫৩১-৩২
আতাহার, ৪২৯-৩০
আন্তর্জাতিক কুটনীতি ৩৩
আন্তর্জাতিক রেডক্রস কমিটি, ৫৫৬-৫৭
'আনন্দ বাজার' (পত্রিকা) ৩২৮-২৯, ৩৩১-৩২
আনসার, ৫৫৯
আনসারী, এইচএম পাক মেজর জেনারেল ২৭, ৩৯, ৫৩১, ৫৪৫
আনসারী, রাজিনা, ৪৪১-৪২
আনোয়ার, সুবেদার ৪৩৫-৩৬
আনোয়ার, জহিরুল (সানু), ছাত্র ৪৮৪-৮৫
আফজাল, হাবিলদার, বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ৪০৬-৪০৭, ৪০৮, ৪১৪-১৫
আফতাব, সুবেদার, ৪৫১-৫২
আবদুল্লাহ, লেফটেন্যান্ট, ৩২৯-৩১
আবুল, ৪৩২
আবেদীন, জয়নাল, মেজর ৪২৮-২৯, ৫৩৩, ৫৬৪-৬৫

আবেদীন, এফ-এফ ৪৭৪-৭৫
আম্বিয়া, গোলাম, এপিআর সুবেদার, ১৬২, ১৬৫,
আমিন (এ জে এম আমিনুল হক)
মেজর, ১৫৬, ১৫৮, ২৩৯, ৪৭৭, ৪৮৪-৮৫,
৪৮৯, ৪৯৪-৯৫, ৫০৮-৫০৯
আমিন (আমিনুল ইসলাম) লেফটেন্যান্ট, ৩৫০-৫১, ৩৫৭-৫৮
আমিন, আহমেদুল ৫৬৮
আমিন, রুহুল, সিপাহী ২১০, ২৩৩-৩৫
আমিন, রুহুল ৪২৩-২৪, ৫৩৭
আমিন, রুহুল, হাবিলদার ৫০৪-০৫
আমিরুজ্জামান, সুবেদার ৩৫২-৫৫, ৩৫৫-৫৬
আমানউল্লহ, নায়েক সুবেদার, ৩৫২-৫৩, ৩৫৪-৫৫
আমানউল্লাহ, শেখ (নেভী) ৫১০
আমেরিকান টেলিভিশন সংস্থা ৫২৯
আরেফিন, শামসুল, সেকেন্ড লেঃ ৪১০-১১, ৪২২
আল আববাস ১২
আলতাফ, সুবেদার ৪৫০-৫১
আল বদর ৩০৮, ৩৫৩-৫৪, ৪২৪, ৪৬০-৬১, ৪৯৬-৯৭
আল মুরতজা ৪০৯-১০, ৪৪৬-৪৭
আল শামস ৩০৮, ৩৫৪
আলম, গেরিলা যোদ্ধা, ৭৯
আলম, ছাত্র ৪০৪-৪০৫
আলম, আনোয়ারুল, ক্যাপ্টেন ১৩৪
আলম, আশরাফুল, ফ্লাইট লেঃ ৪৭৭
আলম, খুরশিদ, সুবেদার ১৫৮
আলম, দিদারুল, লেফটেন্যান্ট ৭৩, ১০৬, ১৮৪-৮৫
আলম, বদরুল, ফ্লাইট লেঃ ২৯৯, ৫২৩-২৪,
৫৬৮-৬৯-৫৭০
আলম, বদরে, লেঃ ৪০০
আলম বাহিনী, ৩৬৩-৬৪
আলম, ডাঃ মাহবুবুল, ৩৫২-৩৫৪-৫৫
আলম, এম ইউ ৪২২
আলম, মোঃ বদিউল (নেভী) ৪২৭-২৮, ৪৪৬-
৪৭, ৫১০, ৫১৪, ৫২১
আলম, মোঃ রফিকুল ২৯৩-২৯৫-৯৬
আলম, মোহাম্মদ শাহ, হাবিলদার ৪৪২-৪৩
আলম, শামসুল (ছাত্র) ৪৮৬
আলম, মামসুল, লেঃ ৪৬২, ৪৬২-৬৩
আলম, শামসুল, ফ্লাইট লেঃ ৫২৩-২৪, ৫৬৮-৬৯-৫৭০
আলমগীর ৪২৩-২৪, ৪৩৪, ৪৪১-৪২
আলমগীর, ন,আ,ম ২৮৯-৯০, ২৯১-৯২, ২৯৭-২৯৮
'আল্লাহু আকবর' ৪৮০-৮১, ৪৮৬, ৪৮৮
আলিম, লেপটেন্যান্ট ৪৪-৫০
আলী, আকমল, হাবিলদার ২০৭
আলী, আনসার, এফ এফ ৩২০-২১
আলী, আনসার, সুবেদার ৪২৩-২৪
আলী, আফসার, সিপাহী ৫০৪-৫০৫
আলী, আরব, সুবেদার মেজর ৩২৯-৩০, ৩৩০
আলী, আশরাফ, নায়েক সুবেদার ২৩২-৩৩
আলী, আসাদ্দর, নায়েব সুবেদও ১৭০
আলী, ইউসুফ, ল্যান্স নায়েক ৫০০-৫০১
আলী, ডৎ (মুক্তিযুদ্ধ সঙগঠক), ২৩৬-২৩৭
আলী, তৈয়ব, হাবিরদার, ১৯৫
আলী, পঞ্চম, সিপাহী ৪৩৪-৩৫
আলী, ফজর, সিপাহী ৫০৪-৫০৫
আলী, বাছর, সুবেদার ২৪২-৪৩
আলী, মনসুর ৫২৪-২৫
আলী, মনোহর (রাজাকার) ২৯৫-৯৬
আলী, মীর শওকত, মেজর ২, ৪, ২৪২-৪৩,
২৮৪, ২৮৯-২৯১-৯২, ২৯৭-২৯৮, ৪৯৭-৯৮,
৪৯৮-৯৯, ৪৯৯-৫০০, ৫৬৪-৬৫
আলী, মুস্তফা, নায়েক ২১২
আলী, মুরাদ, নায়েক সুবেদার ৩১৫-১৬, ৩১৫, ৩১৮
আলী, মুহম্মদ ১১২
আলী, মুহাম্মদ, সিপাহী ৩২০
আলী, মোঃ (রাজাকার) ২৯৫-৯৬
আলী, মোহাম্মদ, সেকেন্ড লেঃ ৪১০-১১, ৪১২-
১৩, ৪১৪-১৫, ৪১৯-২০, ৪৪৬-৪৭
আলী, রাও ফরমান, ৩৫, ৫৫৬
আলী, লোকমান, ল্যান্স নায়েক, ১১৮
আলী, শহীদ ৪৩৯-৪০
আলী, স, ম, বাবর, এম-এন-এ ৪২৮-২৯, ৪৪২-৪৪৪-৪৪৫
আলী, সাহেব ৪৩৬-৩৭
আলী, সেকেন্দার, সিপাহী ৩১৯-২০

আলী, সোহরাব, এফ-এফ ৩২১
আলী, হুরমত ৩৫২-৫৩, ৩৫৩-৫৪
আলো, নূর আহমেদ, এফএফ ৪৫৩-৫৪, ৪৫৬
আশরাফ (আশরাফ হোসেন) ক্যাপ্টেন ১৬৫-১৬৬
আশগুঞ্জের লড়াই ২৩৪-৩৫
আশেক, মেজর, ২৪ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স ১৪৩-১৫৭
আসা, আবুল ৪৩৬
আসাদুজ্জামান, লেফটেন্যান্ট ৪৬২
আসাদুল্লাহ (নেভী) ৪০৭, ৪০৮-৪০৯, ৪৪৫-৪৬
আসাম রেজিমেন্ট ৪৯৮-৯৯
আহমদ, অলি মেজর ৬৯, ৭০, ৪৭৬-৭৭
আহমদ, আফসারউদ্দীন, মেজর ৪৪৯-৫০, ৪৫০-৫১, ৪৬০, ৪৬৩-৬৪
আহমদ, আবুল মনসুর, এমসিএ, ৪৬৩
আহমদ, ইয়ার, হাবিলদার ১৪১, ১৮০
আহমদ, খোন্দকার মোশতাক, ৫২৪-২৫
আমদ, তাজউদ্দিন ২, ৭, ২০২, ২৮৪-৮৫, ২৮৫-৮৬, ৩০১, ৩২৭, ৩৬৯-৭০, ৩৮২, ৪০৩-৪০৪, ৪০৬, ৫২৪-২৫
আহমদ, নাসির এম-এফ ৩২০-২১
আহমদ, নূরউদ্দীন, এফ-এফ ২৪৯
আহমদ, ফরিদ, এপিআর সুবেদার ১৫৮, ১৭০
আহমদ, মোঃ ফসিউদ্দিন, হাবিলদার ৩৬৫-৫৭
আহমদ, ফয়েজ, সুবেদার ৫০৪-৫০৫
আহমদ, মনজুর, লেঃ ৪৭৭
আহমদ, মনসুর, সিপাহী ৩১৬-১৭
আহমদ, মোসলেমউদ্দিন, সুবেদার ৪৬৫-৬৬
আহমদ, মোহাম্মদ বশির ২৩৯
আহমদ, শফিকউদ্দিন, নায়েক ২৩৮
আহমদ, সুলতান ৩৯৬, ৪১৫-১৬
আহমদ, সালেহ (ছাত্র নেতা) ১৯০
আহসান জামিলউদ্দিন, লেফটেন্যান্ট ১৭০
আহসানউল্লাহ, ল্যান্স নায়েক ১১৮
আহসানউল্লাহ, সেকেন্ড লেঃ ৪১০-১১, ৪১২-১৩
৪১৪-১৫, ৪৪৬-৪৭
আহসানউল্লাহ (নেভী) ৫১০, ৫১৬-১৭

ই

ইউসুফ ৪২৯-৩০
ইউসুফ, আবু, ৪৭৫
ইউসুফ, মওলানা ৩৩৫-৩৬
ইংলিশ চ্যানেল ৪৫০-৫১
ইকবাল, ফ্লাইট লেঃ ৩০০-৩০১, ৩০২-৩০৩
ইকো কোম্পানী ৫০৫-৫০৬
ইগনিশন ৯২
ইদ্রিস, ক্যাপ্টেন ৩৪৯-৩৪৯-৫০, ৩৫০-৫১, ৩৫৬-৫৭, ৩৫৭-৫৮, ৩৫৮-৫৯
ইনডাকশেন মানি ৫
ইনটেলিজেন্স নেট ৯৫
ইপকাপ ২৭, ১২৭, ১৩৮, ১৪২, ১৪৩, ১৬৬, ১৬৯-১৬৯, ৫৪২
ইপিআর ৪, ৫, ১৪, ৭৩, ১৭৪, ২০৬, ২১৮, ২২৩, ৫৫৯
ইফতেখার, পাকিস্তানী ক্যাপ্টেন ১৯৮
ইব্রাহিম, মোহাম্মদ, লেঃ ২০৮, ২০৯, ২৩৪-৩৫
ইব্রাহিম, মোহাম্মদ, নায়েক সুবেদার ৫০২-৫০৩
ইব্রাহিম (শিক্ষক) ৫১৪, ৫১৫-১৬
ইমতিয়াজ, ভয়ায়েচ, পাক লেঃ কর্নেল ৪২০
ইমাম, জাফর, ক্যাপ্টেন, ৭৩, ৭৪, ৭৬-৭৭, ৮৩, ৮৭, ১০৫, ১৪০, ১৪৪, ১৫৫-১৬০, ১৬৮, ১৭০, ১৭১, ১৭৪, ১৭৯, ১৯০, ১৯৯, ৫৩৫
ইমা, মেহেদী আলী, মেজর ৩৮২-৮৩, ৩৯০-৯১, ৪০৩-৪০৪, ৪২২-৪২৭-২৮, ৪৩০-৪৩১, ৪৩৪, ৪৩৬, ৪৪০, ৪৪২
ইমামুজ্জামান, লেফটেন্যান্ট ৭৩, ৭৪, ৭৭-৭৭, ৮৭, ১০০-১০০, ১০২, ১০৩, ১০৭, ১২৫-২৬, ১২৭-১২৭, ১২৮, ১৫০, ১৫৮-৫৯, ১৭১-৭১
ইলিয়াস, মোহাম্মদ, সুবেদার ৪০৯, ৪৪৫-৪৪৫-৪৬
ইলেকট্রিক ডেটনেটিং সিস্টেম, ২০৫
ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ৫৫৯
ইস্টার্ন কমাণ্ড ৬, ১২, ৩১, ৩৮
ইস্টার্ণ ফ্লীট ২১, ২৯, ৩১, ৩৬, ৩৭
ইসমাইল, সুবেদার ৩৫২-৫৩
ইসমাইল ৪৩০
ইসলাম, মেজর জেনারেল (মেজর নূরুল ইসলাম)
৪৬৭-৬৮
ইসলাম, আতিকুল ২৩৯
ইসলাম, ওয়ালিউল, লেফটেন্যান্ট ৪৭৭, ৫০৭
ইসলাম, তাজুল, সুবেদার ৪১০, ৪২২
ইসলাম, তাজুল ল্যান্স নায়েক ৪৯৯-৫০০

ইসলাম, তারিকুল, সিপাহী ৪৯৯-৫০০
ইসলাম, নজরুল, লেঃ ২০৮, ২১১, ২১২
ইসলাম নূরুল (মুক্তিযুদ্ধ সংগটক) ২৩৬-৩৭
ইসলাম নূরুল, এফএফ ৪৬৩-৬৪
ইসলাম, মোবাসসারুল, সুবেদার ৩৫০
ইসলাম, মোহাম্মদ মইজুল, ২৩৯
ইসলাম, রফিক-উল, মেজর (১নং সেক্টর) ১-৫৮, ৭০, ৭১, ৫৬৪-৬৫
ইসলাম, রফিকুল, লেঃ (৭নং সেক্টর) ৩৪৯, ৩৫০, ৩৫১, ৫২৯, ৫৩২-৩৩
ইসলাম, শামসুল ৫৯-৬২
ইসলাম, সিরাজুল, এমসিএ, ৩১৫-১৬
ইসলাম, সেরাজুল (ছেরু মিয়া) ১৮৫
ইসলাম, সৈয়দ নজরুল ৭, ৩০১, ৩৮২, ৪০৬, ৫২৪-২৫
ইসলামপুরের খন্ড যুদ্ধ ২১১-২১২
ইসহাক, নায়েক সুবেদার ১৮৮, ১৯১
ইসহাক (রাজাকার) ৪৯৮
ইয়ামিন, পাক মেজর ৪৩০-৩১, ৪৩১-৩২-৪৩৩-৩৪
ইয়াসিন, সুবেদার ৩৫৭-৫৮

উ
উনিশ পাঞ্জাব (ভারতীয় বাহিনী) ২১৪, ৫৩৪-৩৫

এ
একত্রিশ পাঞ্জাব রেজিমেন্ট ৪৯৫, ৫০২-৫০৩
একরাম, ছাত্র কমান্ডার ১৮৮
একাদশ বেঙ্গল ২০৮, ২১১, ২১৩, ২১৪, ২১৬, ২১৯, ২২৫, ২২৫, ২৩২, ২৩৪-৩৫, ২৩৫, ৫১০, ৫৩৪-৩৫, ৫৬৬
এজাজ, (এজাজ আহমেদ চৌধুরী), ক্যাপ্টেন ২০৪, ২০৮
‘এন্টারপ্রাইজ’ (মার্কিন বিমানবাহিনী জাহাজ) ৩৫
এনাম, ক্যাপ্টেন ২৩৬-৩৭, ২৪২-৪৩
এবজা সেক্টর ৪৬২, ৪৬৩
এবাদ বাহিনী ৩৬৩-৬৪
এমসিএ ১৪, ১৭৪, ৪১৫-১৬
‘এল-৬০’ ২০
এলুভেট হেলিকাপ্টার ৫৬৮-৬৯
এস ফোর্স ৫, ২৯, ১৭৬, ২০০, ২০৮, ২১০, ২১৩, ২১৫, ২২৫, ২৩২, ২৩৪-৩৫, ৫৩৩-৩৪, ৫৬৪-৬৫, ৫৬৬
এ্যাগ্রেসিভ ডিফেন্স’ ৪৮৩

ও
ওদুদ ৪৩০
‘ওমেগা’ রিলিফ দল ৩৭৫-৭৬
ওরিয়েন্ট-বার্জ, ১২
ওসমানী, এম, এ জি কর্নেল (অব.) ২, ১৫৪, ১৬২, ১৬৮, ২০০, ২০২, ২৩৭, ২৪১-৪২, ২৮৪-২৮৫-২৮৬, ২৮৭-৮৮, ২৮৮, ২৯৯, ৩০১, ৩২১-২২, ৩৬৯-৭০, ৩৭০, ৩৮২, ৩৮৬, ৩৯০-৯১, ৩৯৬, ৪০০, ৪০২-৪০৩, ৪০৩-৪০৪, ৪১৩-১৪, ৪৩৯-৪০, ৪৮৪, ৪৯৮-৯৯, ৫০৫-৫০৬, ৫০৮, ৫২১, ৫২৩, ৫২৮, ৫৩৯-৪০, ৫৫৯-৫৬৭
ওহাব, সুবেদার (২নং সেক্টর) ৭৩, ৮১, ১৩৮, ১৬২-১৬৩, ১৬৪, ১৬৬, ১৭০, ১৯১, ১৯২
ওহবা, আবদুল, এম এফ (ছাত্র) ৩১৯-২০
ওহাব, আবদুল, ক্যাপ্টেন ৩৬৮-৬৯, ৩৭৩
ওহাব, নূরুল, সিপাহী ২০৪
ওহাব, সুবেদার (৬নং সেক্টর) ৩২৮, ২৯
ওয়াকিউজ্জামান, লেঃ ২৩৬-৩৭, ২৩৯, ২৪৯, ২৭৮-৭৯
ওয়াটকে, ভারতীয় ব্রিগেডিয়ার, ২৪৪, ২৭৯, ২৮২
ওয়ালীউল্লাহ, সুবেদার ১৮৭-১৯০
ওয়েস্টার্ন ফ্লীট ৩১

ক
কটিয়াদী অ্যামবুশ ২০৪
কবির, লেফটেন্যান্ট (৩নং সেক্টর) ২০৮
কবির, আমানুল্লাহ, এফ এফ ৪৮১
কবির, এ কে ফজলুল, লেফটেন্যান্ট ১৭০
কবির, হুমায়ুন সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট, ৭৩, ৮২, ৮৭, ৯৩, ৯৮, ১৫৫-১৫৬, ১৭৬
‘ক্রস কান্ট্রি’ ৫৬২-৬৩
কাইয়ুম, কর্নেল, পাক সামরিক অফিসার ৭৩
কাইয়ুম, লেফটেন্যান্ট (৭নং সেক্টর) ৩৫০
কাজিমউদ্দিন, সুবেদার মেজর ৩১৪-১৫, ৩১৯-২০
কাজী, গেরিলা যোদ্ধা ৮৭, ১০২
কাদের, এ পাক ব্রিগেডিয়ার ২৭, ৪৬৩
কাদের, কাজী আবদুল, কোম্পানী কমান্ডার ২৯৮
কাদের, এফ এফ (২নং সেক্টর) ১৭০

কাদের, ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট (৪নং সেক্টর) ২৩৬-৩৭, ২৪২-৪৩, ২৯৯
কানাইঘাটের যুদ্ধ ২৪০
কামরুজ্জামান, এ এইচ, এম ৩০১, ৪১৪-১৫, ৪০৪
কামরুজ্জামান, হাবিলদার ২৩৩-৩৪
কামরুজ্জামান (টুকু) ৪২৮-২৯
কামাল, ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট ১৪০, ১৬৮
কামাল, লেফটেন্যান্ট (১১নং সেক্টর) ৪৪৯-৫০, ৪৫০, ৪৫৭
কামাল উদ্দিন, সিপাহী ২৪২-৪৩
কামাল, গোলাম মোস্তফা, সিপাই ৪৯৯-৫০০
কামাল, মোস্তফা, লেফটেন্যান্ট ১৭০, ১৭২
কামালপুর অপারেশন ৪৫০-৫১, ৪৫৬-৪৫৯, ৪৬১-৬২, ৪৬৭-৬৯, ৪৭১-৭৩, ৪৭৭-৮২, ৪৯৮-৯৯
কাশেম, আবুল ৩০৮
কাশেম, আবুল এম এফ (ছাত্র) ৩১৯-২০
কাশেম, আবুল, সিপাহী ৩১৯-২০
কাশেম, আবুল ৪৫১-৪৫২
কালাম, আবুল, সিপাহী ৩১৯-২০
কালাছড়া চা বাগান অপারেশন ১৪৭
কালাম, ফ্লাইং অফিসার ৫৩৩
কালাম, আবুল, হাবিলদার, ২১২
কালাম, আবুল (কুক) ৩২০
কালিগঞ্জ অপারেশন ৪৪৬-৪৭
কালেঙ্গা এ্যামবুশ ২০৬
ক্রাশ ট্রেনিং কোর্স ৪১০-১১
স্কাউট ৩০, ২৯১-৯২
কায়সার, লেফটেন্যান্ট (৭নং সেক্টর) ৩৫০-৫১, ৩৫৭-৫৮
কিলো ফোর্স ৩০, ৩২
কুটিমিয়া, মুক্তিযোদ্ধা ১৪১
কুতুব, নায়েব (৪নং সেক্টর) ২৩৭
কৃষক ৪২৬, ৪৩৬-৩৭, ৪৫০
কৃষ্ণরাও, মেজর জেনারেল ২৮
‘কে’ ফোর্স ৫, ২৯, ৭৩, ৮৯, ২৩৩-৩৫, ১৪০, ১৪২, ১৪৪, ১৬৮, ১৭০, ১৭৬, ১৯৫, ৫৩৩-৩৫, ৫৬৪-৬৬
ক্লেয়ার, হরদেব সিং, ব্রিগেডিয়ার ২৮, ৩৭, ৪৪৯-৫০, ৪৬২, ৪৬৮-৬৯, ৪৬৯-৭০
কোদালকাটির যুদ্ধ ৫০০-৫০১
কোরাইশী, আবদুর রাজ্জাক, ৯২
কারেশী, হাসান, ক্যাপ্টেন, পাক সামরিক অফিসার ৪৬৯-৭০

খ

খন্দকার, এ কে গ্রুপ ক্যাপ্টেন ২, ২১৬, ২৯৯, ৫২৩-২৫, ৫৬৪-৬৫, ৫৬৮-৬৯
খান, আশরাফ আলী, নায়েক সুবেদার ২১০
খান আবদুল হামিদ, জেনারেল (চীফ অব স্টাফ, পাকিস্তান সেনাবাহিনী) ৭৬, ১৫৭
খান, ইয়াসিন, সিপাহী ২৩২-৩৩
খান, ইয়াহিয়া, জেনারেল ২০-২১, ২৪, ২৬, ২৭, ২৯, ৩১, ৩৫, ৪১, ৩৮৮-৮৯, ৪১৫, ৪৮০-৮১, ৪৮১-৮২, ৫২৯, ৫৩০, ৫৩৭, ৫৫৬-৫৮
খান, জাফর আলী, পাকিস্তানী ক্যাপ্টেন ১১২
খান, টিক্কা, জেনারেল ৯, ৭৩, ৭৯, ৮০, ১৭৭-৭৮, ৫৬৭
খান, নূরুল কাদেও ২৮৪-৮৫
খান, পারভেজ, সেকেন্ড লেঃ ৩৩ বেলুচ রেজিমেন্ট ১৩৩
খান, মকবুল (পাঞ্জাবী সৈন্য) ৩২৮-২৯
খান, মিজানুর রহমান (ছাত্র) ৪৬৬-৬৭
খান, রহিম, পাক মেজর জেনারেল ২৮, ৫৩১
খান, লিয়াকত আলী, ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট, ৪৭৬, ৪৮১, ৪৯৪-৯৫, ৫০০-০১, ৫০৩
খান, লিয়াকত আলী ৫৩৮-৩৯
খান, হায়াত, পাক ব্রিগেডিয়ার ৪১৯-২১, ৪৪১-৪২, ৫৩২
খালেক, ইপিআর সুবেদার, ২৯৬, ৩১৫-১৬, ৩১৮
খালেক, ক্যাপ্টেন (বাংলাদেশ বিমান বাহিনী) ৫৬৮-৭০
খালেদ, এস এম মেজর ২৮৯-৯০, ২৯১, ২৯৮
খিজির, এফ এফ (৯নং সেক্টর) ৪০৭, ৪০৮, ৫১৭-১৯
খিলজী, পাক কর্নেল ২১৬
খুরশিদ, পাক মেজর ৩১৪
খুরশীদ, লেফটেন্যান্ট ৩৯৫-৯৬, ৪০০
খেপুপাড়া আক্রমণ ৪৩৪
খেরা, ভারতীয় কর্নেল ৩৮৫-৮৬
গেরিলা প্রশিক্ষণ ৪০০, ৫২৩-২৪, ৪৬৬

খোকন, এ্যাডজুট্যান্ট ৪৩৬-৩৭

গ
গণবাহিনী ৭৩, ৮২, ১৬৬, ১৭০, ২৩৬-৩৭, ৩৭০-৭১, ৩৭৫, ৫৫৯-৬৩, ৫৬৬
গণজালভেস, ভারতীয় মেজর জেনারেল ২৮
গনি, ওসমান, সুবেদার মেজর ৩০০-০১
গনি, আবদুল, ক্যাপ্টেন ৩৮০-৮১
গফফার, সুবেদার, ৪৩৭-৩৯
গফুর, আবদূল হাবিলদার ৫০৪-০৫
গফুর নায়েব সুবেদার ৪৪৫-৪৭
গফুর, সুবেদার ৪১২-১৩
গফুর, নৌকমাণ্ডো ৪২৭-২৮
গফুর, এমসিএ ৪২৮
গলাচিপা আক্রমণ ৪৩৩-৩৪
গাঙ্গুলী, মেজর, ভারতীয় সামরিক অফিসার ২২৫
গাজী, আয়ুব আলী ৪২৮
গাজী, দেওয়ান ফরিদ, জাতীয় সংসদ সদস্য ২৩৬-৩৭
গাজী পাক সাবমেরিন ৪১, ৫১৪-১৫, ৫৪৮-৪৯
গানবোট ৪০৬
গান্ধী, মিসেস ইন্দিরা ২৪, ২৫, ৩০, ৩১, ৩৪, ২৩৩-৩৪, ৪১৫, ৪৫০-৫১, ৫০৭-০৮, ৫২৫
গাফফার, আবদুল, ক্যাপ্টেন ৭৩, ৭৬, ৭৭, ৮০, ৮১, ৮৩, ৮৪, ৮৬, ৮৭, ৮৯-৯০, ৯৬-৯৭, ৯৮, ১০৫, ১১৪-১৬, ১৩২, ১৩৩, ১৩৬, ১৩৮, ১৩৯-৪০, ১৪২-৪৩, ১৫৪, ১৭১, ১৭৬-৭৭, ১৮৪-৮৫, ১৯১-৯২, ১৯৪, ৫৩৪-৩৫
গিল, জি এস ভারতীয় মেজর জেনারেল ২৯১, ৫৩১-৩২, ৫৩৬, ৫৩৯-৪০, ৬৫৪
গিয়াস, হাবিলদার ৮২, ৯১-১০০, ১০৪
গিয়াস, লেফটেন্যান্ট (৪নং সেক্টর) ২৪০-৪২
গুপ্ত, অলীক কুমার, মেজর ৩৭৭-৭৯, ৫৩২-৩৩
গুপ্ত, ভারতীয় কর্নেল ১৭৪
গুর্খা রেজিমেন্ট ২৪৩-৪৫, ৪৯৪-৯৫, ৫০৩, ৫০৭-০৮, ৫৩৩
গেরিলা ৫, ১৩, ১৫, ৭৮, ৪০৪-০৬, ৫৫৯-৬০, ৫৬০-৬১
গেরিলা ঘাঁটি ৩, ২০৭, ৪০২-০৩
গেরিলা অপারেশন (ঢাকা শহর) ৮৫, ৯০, ৮৮, ৯১, ১০১, ১০৭-০৯
গোয়েন্দা সেনা ৩
গোপিনাথপুর এ্যামবুশ ১৪৬

ঘ
ঘাঁটি ৫৬৭
ঘোষ, বিএসএফ ক্যাপ্টেন ৬৯

চ
চতুর্থ গার্ড রেজিমেন্ট ২১৩-১৫
চতুর্থ বেঙ্গল ৭৩, ৮৫, ৮৬, ৯৪, ১০৭, ১১৪, ১১৭, ১২২, ১২৪-২৫, ১৩২, ১৩৩, ১৩৫-৩৭, ১৪০, ১৪২-৪৪, ১৫৪, ৫৩৪-৩৫, ৫৬৬
চন্দ্রপুর অপারেশন ১৪৮
চবিবশ ফ্রন্টিয়ার রেজিমেন্ট ১৪২, ১৪৪, ১৯৯
চাকমা, অশোক কুমার ৬২
চাঁদ, আবুল কাশেম (ছাত্র, কমাণ্ডার) ৪৫২-৫৫
চাঁদপুর পোর্ট অপারেশন ৫১৪-১৫
চান মিয়া, সুবেদার ২২৬-২৭, ২৩৩-৩৪
চাপাইনওয়াবগঞ্জ অপারেশন ৩৫২-৩৫৫
চারগাছ অপারেশন ১৪৬
চালনা পোর্ট অপারেশন ৫১৯-২০
চার্লি সেক্টও ৩৯৬, ৪০১-০২, ৪০৩-০৪, ৪০৬, ৪০৯-১০, ৩৪৮
'চিত্রাঙ্গদা', ভারতীয় পেট্রল বোট ৩৮৬-৮৭
চিলমারী রেইড ৪৫০-৫১, ৪৫৫-৫৬, ৫০৮-০৯
চেসওয়ার্থ, ডোনাল্ড ৩৬৮
চৌধুরী, ভারতীয় মেজর ৭১
চৌধুরী, আমিন আহমদ, মেজর ৪৭৭-৯০
চৌধুরী, এ ওসমান মেজর ২৪, ৩৬৮, ৩৭৫-৭৬, ৩৮৫-৮৬, ৩৯০-৯১, ৩৯৬, ৪০১-৪২, ৫৬৪-৬৫
চৌধুরী, আবদুল ওয়াহিদ (নেভী) ৫১০
চৌধুরী, এ আর মেজর ২
চৌধুরী, আজম, ক্যাপ্টেন ৩৬৮, ৩৭২, ৩৭৪-৭৫, ৩৮০, ৫৩৩
চৌধুরী, আবতাব, মেজর ১৭৩
চৌধুরী, আবদুল কাইয়ুম, ক্যাপ্টেন ৪৭৬, ৪৯২-৯৬, ৪৯৭-৯৯, ৫০০-০৪
চৌধুরী, এ মতিন, সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট ৩১১-১৩, ৩১৮

চৌধুরী, আবদুস সালেক, মেজর ৭৩, ৮৪, ৮৭ ৮৯, ৯৬, ৯৭-৯৯, ১০০-০৩, ১৩২, ১৩৩, ১৩৫, ১৪২, ১৬১, ৫৬৪-৬৫
চৌধুরী, খালেকুজ্জামান, ক্যাপ্টেন ৪৭৭
চৌধুরী, গিয়াসউদ্দিন, ক্যাপ্টেন ৩৫৫, ৩৪৪, ৩৪৯, ৩৫০, ৩৫২-৫৭, ৩৬৪-৬৫, ৬৩২-৩৩
চৌধুরী, জামালউদ্দিন, ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট ৩৬৮-৬৯, ৩৭৪-৭৫
চৌধুরী, তৌফিক-ই-এলাহী (ক্যাপ্টেন) ৩৬৮, ৩৭২-৭৭, ৩৭৯, ৪৮০-৮১, ৫৩৩
চৌধুরী, নূরন্নবী, লেফটেন্যান্ট ৪৭৭, ৪৮২-৮৩, ৪৯৬-৯৮, ৫০২-০৪
চৌধুরী, নূরুল কায়েস ২৯৭
চৌধুরী, পিকে রায়, ভারতীয় মেজর জেনারেল ৪১০
চৌধুরী, ফকরুদ্দিন, কোম্পানী কমান্ডার ২৯৮
চৌধুরী, মঈনুল হোসেন, মেজর ২০৮-০৯, ২১৬, ২৩২, ৪৭১-৭২, ৪৭৬-৮২, ৪৯২, ৪৯৮-৯৯
চৌধুরী, মুনীর, অধ্যাপক ৯২
চৌধুরী, মুফাজ্জল হোসেন, হাবিলদার ২৩২-৩৩
চৌধুরী, শামসুল হুদা ২৮৪
ছ
ছত্রীসেনা ৪৬৩, ৫৩৬, ৫৫০, ৫৫৪-৫৫
ছাত্র ১৭১-৭২, ১৮৮-৮৯, ২১৮, ২২৩, ২৩৭, ৫২৩-২৪, ৫৫৯
জ
জববার, সুবেদার, বেঙ্গল রেজিমেন্ট ১২৯, ১১৮, ১৬৫, ১৭০
জববার , আবদুল, হাবিলদার ২৪২-৪৩
জালফুমিয়া, হাবিলদার ৪২৩-১৩
জলিল, এ সুবেদার মেজর ৪১২-১৩
জলিল, আবদুল, ইপিআর কমান্ডার ৩৭৭-৭৯
জলিল, এম এ মেজর ২, ৪, ৩৭০-৭১, ৩৮২, ৪২২-২৩, ৪২৬-২৭, ৪২৯-৩১, ৪৪০-৪১, ৪৪৪-৪৫, ৫১৬-১৭, ৫১৮-১৯, ৫২১, ৫৩২, ৫৬৪-৬৫
জহীর (সাজ্জাদ আলী জহীর) লেফটেন্যান্ট ২৩৬, ২৪০-৪৩, ৫০৭
জয় বাংলা ৩৯-৪১, ৬৯, ২০৬, ২১৬, ২১৮, ২২২-২৩, ২৩১, ২৩৭, ২৪১-৪২, ২৪৫, ৩২৩, ৩৩২, ৩৩৩, ৩৭১, ৩৯২, ৩৯৬-৯৭, ৪০৫-০৬, ৪২০-২১, ৪২২-২৩, ৪৩৬-৩৭, ৪৫৪-৫৫, ৪৮৮, ৪৯৯-৫০০, ৫৫০, ৫৫৮
জয় বঙ্গবন্ধু ২২৩
জয় মুজিব ২২২
জাতিসংঘ ৩৩, ৫৬১-৬২
জাতীয় পতাকা ৪১
জাফর, আবু, সিপাহী ২৩২-৩৩
জাফরউল্লাহ, ডাঃ ৫২৬
জামশেদ, পাক মেজর জেনারেল ৩৮, ৫৩১, ৫৩৬, ৫৪২, ৫৫৮
জামাতে ইসলাম ৪৩৫-৩৬
জামাল, গেরিলা কমাণ্ডো ৪৩০
জামালপুরের যুদ্ধ ৪৬২-৬৩
জামিল, শাফায়াত, মেজর ২২৫, ২৯১, ৪৭৭, ৪৮১-৮৩, ৪৮৪-৮৫, ৪৯৬-৯৭, ৫০৮-০৯,৫৩৩
জার্মান রাষ্টদূত ৩৭৭-৭৮
জালার, হাবিলদার ১৯১
জাহাঙ্গীল, এফ এফ ৮৩
জাহাঙ্গীর, লেফটেন্যান্ট (৩নং সেক্টর) ২০৮
জাহাঙ্গীর, মহীউদ্দিন, ক্যাপ্টেন (বীর শ্রেষ্ঠ) ২৩৯, ৩৫০-৫১, ৩৫৬, ৫৩২-৩৩
জাহাঙ্গীর, লেফটেন্যান্ট, (৮নং সেক্টর) ৩৬৮, ৩৭৪-৭৫, ৩৭৬-৭৭
জাহাঙ্গীর, সরদার ৪৩৪
জাহিদ (ছাত্র) ৪৪০-৪১
জিয়া, লেফটেন্যান্ট (৯নং সেক্টর) ৩৮২-৮৩, ৩৯০-৯১, ৪০১, ৪০৩-০৪, ৪০৭, ৪০৯, ৪১০-১১, ৪২২, ৪২৩-২৪, ৪৩০, ৪৩৪-৩৯, ৪৪০
জিয়াউদ্দিন, মেজর ২৩৯, ৩৭০-৭১, ৪৪৮, ৪৫৮, ৪৬৮, ৪৭৬, ৪৯২, ৪৯৯-৫০-০১, ৫০২-০৩, ৫০৮-০৯
'জেড' ফোর্স ৫, ২৯, ১৭৬, ২৩৬, ২৩৯-৪৩, ২৮৮, ৩৭৫-৭৬, ৪৬০-৬২, ৪৬৭-৬৮, ৪৭৬-৭৮, ৪৯৬-৯৮, ৪৯৮-৯৯, ৫০৫-০৬, ৫০৮, ৫০৯, ৫৬৪-৬৬
'জেড' ফোর্সের অপারেশনসমূহ ৪৭৭-৯০
'জোড়া' পদ্ধতি ৪০৮-০৯
জ্যাকব, ভারতীয় মেজর জেনারেল ৩৯, ২১৬, ৪১৮-১৯, ৫২৪-২৫, ৫৫৪-৫৬, ৫৫৮

ট

টমসন, কমান্ডার, শিখ জাঠ ব্যাটালিয়ন ১৫২
'টাইগার' ৪৭৩-৭৪
টার্গেট ৭৮
টিংকু, সৈয়দ মনসুর আলী ৩১৪-১৫

ঠ

ঠাকুর, ভারতীয় মেজর ৪১৬-১৭

ড

'ডি-ডে' ২১
'ডিলে সুইচ' ১১২
ডিলেয়িং পরিজশন ৭৪-৭৫
ডেপথ চার্জ ৩১
ডেমোলিশন ৭৮
'ডোগরা' পদাতিক বাহিনী ৪১৭-১৮

ত

তরারকউল্লাহ, সুবেদার মেজর ৩৭৯
তরফদার, এ জে এম শামসুদ্দিন ৩৫৮-৫৯
তলফদার, শামসুল আলম ৪৩৪-৪০
তাজুল, হাবিলদার, ৪ বেঙ্গল ৮৫
তাম্বুবুনিয়া, ইপি আর জওয়ান ১৯৫
তালুকদার, খুরশিদ জানে আলম ৪৩৯
তালুকদার, হাতেম আলী, এমসিএ ৪৬৩
তালুকদার, হোসেন আলী নায়েক সুবেদার ৫০৪-০৫
তাহের, আবু মেজর ৫, ৩৭০-৭১, ৪৪৮-৫৯, ৪৬০-৬২, ৪৬৮-৬৯, ৪৭০-৭১, ৪৭৩-৭৫, ৫৬৪-৬৫
তাহের, লেফটেন্যান্ট, ৪৫০, ৪৬২-৬৩
তাহের, হাবিলদার ৪৮৯
তিতুমীর, পাক সাবমেরিন ৫৩৭
তুলে, ভারতীয় ব্রিগেডিয়ার ১৪৮
তৃতীয় বেঙ্গল রেজিমেন্ট ২৪২-৪৩, ২৯১-৯২, ৩২১-২২, ৪৭৬, ৪৯৬-৯৭, ৪৯৮-৯৯, ৫০৮-০৯, ৫৬৬
তেত্রিশ বেলুচ রেজিমেন্ট ১৬৩
তৈয়ব, সুবেদার ২২৬-২৯
ত্যাগী, ক্যাপ্টেন, ভরতীয় সামরিক অফিসার ৪৬৪-৬৫

থ

'থলস' স্কাউট ৫০৭-০৮
থাপা, খরগ বাহাদুর, ভারতীয় হাবিলদার, ২৯৪-৯৫
থাপান, এম এল ভারতীয় লেঃ জেনারেল ২৭, ৫৩১-৩২, ৫৩২

দ

দত্ত, চিত্তরঞ্জন, মেজর ২, ৪, ২৩৬-৪৫, ২৮২, ৫৬৪-৬৫
দত্ত, ফ্লাইট লেঃ , ভারতীয় বৈমানিক ৪৮৭-৮৮, ৪২০
দরবস্ত অভিযান ২৪৩-৪৪
দশম বেঙ্গল ১৩৪-৩৫, ১৪০-৪২, ১৪৪, ১৭৯, ২০৮, ২২২, ৫৩৩-৩৪, ৫৩৫, ৫৬৬
দ্বাদশ বেঙ্গল, ১৭১
দালাল ১৮৫, ৩৮৮-৯০, ৪২৪
দাশগুপ্ত, বিধু ২৩৭
দাস, লেঃ ভারতীয় নৌ অফিসার ৪০৭
দ্বিতীয় বেঙ্গল ১৭৯, ১৯৫, ২০০, ২০৮-১০, ২১৩-১৬, ২১৯, ২২২, ২৩২, ২৩৪-৩৫, ৫৬৬,
দ্বিতীয় জাঠ ব্যাটালিয়ন ৪৯৩-৯৪
দুরবানী, মেজর, পাক সামরিক অফিসার ১৬৪-৬৫
দুলু, খালেদ এফএফ ৫৫৩-৫৪, ৪৫৬
দুলামিয়া, মুজাহিদ ২১৮, ২২৯-৩২
দেওয়ানগঞ্জ অপারেশন ৪৯৬-৯৭
দেওয়ান সাহেব ৫১৫-১৬
দেশপাণ্ডে, ভারতীয় কর্নেল ৪১৯-২০

ধ

ধরমপাশা থানা অপারেশন ৪৬৫-৬৬
ধালাই অপারেশন ৪৯২, ৬০১-০৩
ধোপাখালী বিওবিপ রেইড ৩৭৩-৭৪

ন

নওয়াজেশ উদ্দিন মেজর ২৯৯-৩০৬, ৩০৮-১০, ৩১৪-৩১৬, ৩১৯-৩২৪, ৩২৬-৩৩০
নওয়াবদী ৩৯৯-৪০১
নকশী বিওপি আক্রমণ ৪৮৩
নজরুল, ক্যাপ্টেন ৩০০-০১, ৩১৫-৩১৬
নজরুল, সুবেদার ১০৩, ১০৬
নজরুল, ছাত্র ২৪২-৪৩, ২৪৫
নজরুল (এফ-এফ) ৫৫৩-৫৪

নজরুল ৫২১
নজীবউদ্দিন, সিপাহী ৩৫৫-৫৬
নবম বেঙ্গল ১৩৪-৩৫, ১৪৪-৪৫, ১৫২-৫৩, ৫৬৬
নমব পাক ডিভিশন ৫৪৫-৪৬, ৫৪৯-৫০
নবীউল্লা, হাবিলদার ২৩২-৩৩
নাগরা, গান্ধর্ব, ভারতীয় মেজর জেনারেল ৩৭-৩৯, ২১৬, ৪৭০-৭১, ৫৩১-৩২, ৫৩৬, ৫৩৯-৪০, ৫৫৬-৫৭, ৫৫৮
নান্নু ৫১৫-১৬
'নারায়ে তকবির' ৪৮৬
নাসিম, (এএসএম নাসিম) ক্যাপ্টেন ২০৪, ২০৮-১০, ২১১, ২১২, ২১৯-২২, ২২৪-২৫, ২৩২, ৫৩৪-৩৫
নাসির, হাবিলদার ৪৮৬
নাসিরুজ্জামান, নায়েক ২৩২-৩৩
নাসের, লেফটেন্যান্ট ২০৮, ২১৩, ২২৫
নাসের, লেঃ (৯নং সেক্টর) ৩৮২-৮৩, ৩৮৬-৮৯, ৪২২
নাসের, ছাত্র (গাইড) ৪৮২-৮৩
নিক্সন, রিচার্ড ২৪, ৫৫৬-৫৭
নিজামউদ্দিন, খাজা ২৩৯
নিরপেক্ষ এলাকা ৫৫৬-৫৭
নিরানববুই মাউন্টেন রেজিমেন্ট ২৪০
নিরাপত্তা পরিষদ ৩৩
নিয়মিত বাহিনী ৫, ৩৭০-৭১, ৩৭৫, ৫৫-৬০, ৫৬২-৬৩, ৫৬৬
নিয়মিত আর্মি ব্যাটালিয়ন ৫
নিয়াজী, এ এ কে লেঃ জেনারেল ৯, ২১, ২৪, ২৬, ২৯, ৩৫, ৩৭-৩৯, ১৮৫, ২১৬, ৪১৮-১৯, ৫২৫, ৫২৯, ৫৩১-৩২, ৫৩৬, ৫৪১-৪৩, ৫৪৫, ৫৪৯-৫০, ৫৫৪-৫৫, ৫৬৫-৫৮
নূরু ৪৩০
নূরুজ্জামান, মেজর ২, ৪, ২০৮, ২১৯, ২২৪, ৫৬৪-৬৫
নূরুজ্জামান, কাজী, মেজর ৪, ৩৪৯, ৩৫০-৫১, ৫৬৪-৬৫
নূরুজ্জামান, হাবিলদার মেজর ২৩৩-৩৪
নূরুজ্জামান, মোঃ ৩১৯-২১
নূরুন্নবী, নায়েক ৫০৪-০৫
নূরুন্নবী, ক্যাপ্টেন ২৯৮, ৫৩৩
নূরুন্নবী, সিপাহী ১২৯, ১৮৮
নোমানউল্লাহ ৪১০-১১
নৌ-কমান্ডো ৪, ৪৫০-৬১, ৫৬৪-৬৫, ৪৬৬

প
পচাগড় যুদ্ধ ৩১২-১৩
পনটুন ব্রিজ ৩৩
পদ্মা (বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জাহাজ) ২০, ৫৩৭
প্রথম বেঙ্গল ২৩৬, ২৩৯, ২৪০-৪৩, ৪৭৬, ৪৯৬-৯৯, ৫০৮-০৯, ৫৬৬
প্রধান, মেজর, ভরতীয় সামরিক অফিসার, ১৭৮
'পলাশ' (বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জাহাজ) ২০, ৫৩৭
পলাশী ৪০৭, ৫১৬-১৭, ৫২১
'পাক বে' ৮১, ৮২
পাক যুদ্ধ পরিকল্পনা ২৫, ২৬
পাক সেনাবাহিনীর তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট ১৩
পাকিস্তানী ডিভিশন ৮
পাচুমিয়া ৪৫২-৫৩, ৪৫৬
পাটোয়ারী, আবদুল মতিন, সুবেদার মেজর ৩৭৯, ৩৮০-৮১
পাটোয়ারী, বজলুল গনি, ক্যাপ্টেন ৩৭০-৭১, ৪৪৮, ৪৫৮-৫৯, ৪৬৮-৬৯, ৪৭৬, ৪৯৬, ৪৯৯-৫০২, ৫০৩-০৫
পাটোয়ারী, আলী আকবর, সুবেদার বেঙ্গল রেজিমেন্ট ১২০-৩০
পাত্রখোলা চা বাগানের যুদ্ধ ৪৯৩-৯৪, ৫০১-০২
পান্ডে, ভারতীয় ব্রিগেডিয়ার ৬৯, ১৫২
পান্ডে, বিএসএফ ক্যাপ্টেন ৩৮৩-৮৪, ৩৯১
পান্না, এফ-এফ, কোম্পানী কমান্ডার ৪৭১-৭২, ৪৭৩-৭৪
পান পট্টির যুদ্ধ ৪৩০-৩৪
পানভেল (ভারতীয় গানবোট) ৫৩৭
পার্বত্য ডিভিসন ৫৩৯-৪০
পাল, পরিতোষ কুমার ৪৩৮-৪০
পাশা, আবদুল আজিজ, ক্যাপ্টেন ৮৯, ১৬৫, ১৭০, ১৯৯, ৩০৪, ৪৯২
পাসিং আউট প্যারেড ৩০১
'পুল ব্যাক' ৫৪৯-৫০

পুলিশ ৬৮, ২৩১-৩২, ৪০১-০২, ৫৫৯
'পূর্ব পাকিস্তান সরকার', ৫৫৬-৫৭
পেয়ারাবাগানের যুদ্ধ ৫৩৩-৩৪

ফ
ফক্সহোল ২২৪
ফকির, মজিবুর রহমান, ডাঃ ৫০০-০২
ফয়েজুর এফ-এফ কোম্পানী কমান্ডার ৪৭১-৭২, ৪৭৫
ফাইবার গ্লাস স্পীডবোট অপারেশন ৮২
ফারুক, লেফটেন্যান্ট ৭৩, ২৯৩-৯৫, ৩২৪-২৫, ৩২৬-২৭
ফালিয়া, বি কে ভারতীয় ক্যাপ্টেন ৭১
ফার্স্ট ফিল্ড রেজিমেন্ট ৮৯-৯০, ৯৪, ১৬৫, ৪৯২
'ফিন' ১০
ফিরোজ, এ-এফ ১৭০
ফিরোজ, মেজর, পাক সামরিক অফিসার ৪২০
ফোর্ট ইউলিয়ম ৫৪৫-৪৬
ফ্রগম্যান ৪০৭, ৪১১, ৪৪৫-৪৬
ফ্রন্টিয়ার ফোর্স রেজিমেন্ট ৫০২-০৩
ফ্রিডম ফাইটারর্স ৫, ৫৩৯-৪০, ৪৬৬

ব
বঙ্গবন্ধু ৫২৫
'বঙ্গবন্ধু জিন্দাবাদ' ৪২২-২৩
বঙ্গ শার্দুল ৪৯৪-৯৫
বকর, আবু, হাবিলদার ১৪৬
বকর, আবু ৪৩৫-৩৬
বর্গির যুদ্ধে ৪৩৯-৪০
বদিউজ্জামান, লেফটেন্যান্ট ২০৮-১০, ২২৯, ২৩৩-৩৫, ৫৩৪-৩৫
'বনবালা' (নৌযান) ৪০৯
'বন মৃগী' (নৌযান) ৪০৯
বশির (সিন্ধ), পাক নায়েক সুবেদার ১৬৪
বশীর, এফ-এফ ৪৬৭
বসন্তপুর অপারেশন ৩৯১-৯৪, ৪১১
বড়খাতা ব্রীজ অপারেশন ৩৩১
বাইশ বেলুচ রেজিমেন্ট ২৩৯
বাংলাদেশ বিমান বাহিনী ১৯, ৫২৩, ৫৬১-৬২, ৫৬৮-৬৯
বাংলাদেশ নৌবাহিনী ২০, ৪০০
বাংলাদেশ সরকার ২০২, ৪০৩-০৪, ৪৯৯-৫০২
'বাংলাদেশ' (মুক্তাঞ্চল থেকে প্রকাশিত পত্রিকা) ২৮২
বাংলাদেশ বেতার ৫১৪-১৫
বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশন (লন্ডন) ৫২৬
'বাকুন্দিয়া ক্যাম্প' ৪০১-০২
বাকের,হাবিলদার ৪২৬-২৪
বাকের, লেফটেন্যান্ট ৪৭৭
বাচ্চু, এফ-এফ ১৬৪
বাচ্চু, শামসুল হুদা, লেফটেন্যান্ট ২০৮, ২২৫-২৬
বাচ্চু মিয়া, সিপাই ৫০৪-০৫
'বট্টি মেবি (জাতিসংঘ নৌযান) ৪৩৩-৩৪
বাদল, শহীদুল আলম ৪৩৬
বানার্জী, বি এসএফ কর্নেল ৫২৮
বাবলু (সংবাদ বাহক) ৪৩০-৩১
বাবর (মোগল সম্রাট) ৪৮০
বারী, আবদুল, সিপাহী ২০৪
বারী, আবদুল, এফএফ ৩২০
বার্নেল, ভারতীয় ব্রিগেডিয়ার ২৪৪
বারেক, আবদুল, এমসিএ ৪৩০-৩১
বাশার, এম কে উইং কমান্ডার
বাশার, আবুল (রাজাকর কমান্ডার) ২, ৪, ২৯৯, ২৩২-৩৩, ৩০৪-০৬, ৩০৮, ৩১৪-১৬, ৩২০-২১, ২২৩-২৪, ৩২৬-২৭, ৩৩২-৩৩, ৫৩২-৩৩, ৫৬৪-৬৫
বাশার, আবুল (রাজাকর কমান্ডার) ১৮৮
বাশার, আবুল সুবেদার ২০৪
বাশার, নায়েক ৩৭২-৭৩
বাশার, আবুল ল্যান্স নায়েক ৫০৪-০৫
বাশার, খাইরুল, সুবেদর, ৫০৪-০৫
বাহাদুরাবাদ ঘাট অভিযান ৪৮১-৮২
বাহার, এফ এফ ৪৭৪-৭৫
বাহার এম এইচ মেজর ৫২৮
বিডিএফ (বাংলাদেশ ফোর্সেস) ১৭১, ৩৬৮, ৩৮৯-৭০
'বিপ্লবী বাংলাদেশ' (মুক্তাঞ্চল থেকে প্রকাশিত পত্রিকা) ৫৪৫

বিবিসি ১১৪, ৩৭৫-৭৬, ৫৪৬-৪৭, ৫১৮-১৯, ৫২৯
বিশ্রামগঞ্জ হাসপাতাল ৫২৬
বিহার রেজিমেন্ট ২১৩, ২১৫, ২২৬
ব্লিৎসক্রীগ ৪১৫
বকুকাবুনিয়া ট্রেনিং ক্যাম্প ৪২৩-২৪
বুবি ট্র্যাপ ৯১, ১২৮
বুড়ি গোয়ালিনী দখল ৪০০-০১
বৃটিশ পার্লামেন্টরী দল ৯১
ব্রিগেড ৫৬৬
বেগ, এম এ (ফ্রগমান) ৪০-৪৯, ৪০০-০১, ৪১০-১১, ৪৮৫-৮৬
বেগ লেফটেন্যান্ট ৪৪৫-৪৬, ৫৩২
বেনাপোল পতাকা ৩৭৫-৭৬
বেলাবো অপারেশন ২০৪
বেলাল, এফ এফ ৪৩৮-৬৯, ৪৭৪-৭৫
বেলায়েত, সুবেদার ১৩৮-৩৯, ১৫৯, ১৬৬-৬৭, ১৭০-৭১
বেলুনিয়ার যুদ্ধ ৭৪-৭৬, ১৭৯-৮২
বোখারী, ক্যাপ্টেন, পাক সামরিক অফিসার ৭৩, ১৬৩, ১৯২
বোরহানউদ্দিন, সুবেদার ২৯৯, ৩২০
বোয়ালিয়া ব্রীজ অপারেশন ২১৭-২৯
বৃহৎ শক্তি বর্গ ৩৪

ভ
ভট্টাচার্য, নিরঞ্জন, লেফটেন্যান্ট ২৩৬
ভট্টাচার্য ৩৯৭
ভট্টাচার্য, মেজর ভরতীয় স্টাফ অফিসার, ৪১৭-১৮
ভনরজেন, কাউন্ট, সুইডিশ বৈমানিক ৫৬৮
ভয়েস অব আমেরিকা ১১৪, ৫১৮-১৯
ভাদু মন্ডল ২৭৯-৮০
ভারত সরকার ৬, ২৪, ২৫, ৪০৩-৪০৪, ৫২৫, ৫৩৮
ভারত সোভিয়েত যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তি ১৯
ভারতীয় বিমান বাহিনী ৫৩৬
ভার্মা, ভরতীয় মেজর ৩৭৩
ভাষণ, গেরিলা যোদ্ধা ৯২
‘ভীক্রান্ত’ (ভারতীয় বিমানবাহী জাহাজ) ২৯, ৩১, ৩২, ৩৫-৩৬, ৫৩৬
ভুট্টো ৯
ভুরুঙ্গামারী রেইড ৩২১-২২, ৩৩০
ভুঁইয়া, ইঞ্জিনিয়ার ৭৯
ভুঁইয়া, রবীজউদ্দিন, এম এফ (ছাত্র) ৩১৯-২০
ভুঁইয়া, সুবেদার আলী, ক্যাপ্টেন ২০৪, ২০৮, ২১০-১১, ২১২-১৩, ২১৮, ২২২, ২২৬, ৫৩৪-৩৫
ভুঁইয়া সার্জেন্ট ৪৬২, ৪৭৪-৭৫
ভোমরা বিওপির যুদ্ধ ৩৭৪-৭৫

ম
মঈন, নায়েক সুবেদার ১৬৫, ১৭০-৭১
মাওলা.গোলাম, হাবিলদার ৪২৩-২৪
মঙ্গল মিয়া, সুবেদার ১৩৮, ১৬-৬৭
মঙ্গলা পোর্ট অপারেশন ৫১৬-১৭
মজিদ, আবদুল পাক মেজর জেনারেল ২৮, ৫১৩
মজিদ,সুবেদার মেজর ৩৪৯-৫০, ৩৭৬-৭৭
মজিদ প্রক্তন সৈনিক ৪২৩-২৪
মজিদ, আবদুল ডাঃ ৪৩৭-৩৮
মজুমদার, লেফটেন্যান্ট ২০৪-২০৮
মজুমদার, শাহজামান ২১৮
মজুমদার, বি এসএফ অফিসার ৩৮৫
মতিন, আবদুল (ছাত্র গেরিলা) ১০৬
মতিন এম এ মেজর ১৩৪, ১৭০, ২০৯, ২১৩, ২৩১-৩২, ২৩৩-৩৪, ৫০৪-৩৫
মতিন, আবদুল হবিলদার ১৮৬-৮৭, ১৯০
মতিন, এ ক্যাপ্টেন ২০৪, ২০৮, ২১৮, ২১৯, ২২১, ২২৯-৩০
মতিন, সুবেদার ২৪২-৪৩
মধু নায়েক সুবেদার ৪২২, ৪২৩-২৪, ৪৩৫-৩৮
মন্টগোমারী ৪৮০
মঞ্জুর, এম এ মেজর ৪, ৩৭০, ৩৭১, ৩৭৭-৭৯, ৪২৮-২৯, ৪৪৮, ৫৩২, ৫৬৫
মঞ্জুমিয়া, হাবিলদার ২৩২-৩৩
মঞ্জু, নূরুল ইসলাম ৩৮২-৮৩, ৩৮৩-৮৪, ৩৮৬-৮৭, ৪১৫-১৬, ৪৪১-৪২, ৫৩২
মন্তাজ, হাবিলদার ১৮৭
মনসুর, সুবেদার ৪৬৬-৬৭
মনস্তাত্বিক যুদ্ধ ৩৪, ২০৩
মনিরুজ্জামান, নায়েব সুবেদার ৬৯, ৭২, ১০৩
মনিরুজ্জামান, মোঃ সৈয়দ ৪৭৪-৭৫

মনোহরদী অবরোধ ২০৬
মফিজ ৪২২
মমতাজ, সিপাহী ১৯৫
মমতাজউদ্দিন, সিপাহী ২০৪
মমতাজ, সালাউদ্দিন, ক্যাপ্টেন ৪৭১-৭৩, ৪৭৭-৮২, ৪৮৩, ৪৯৮-৫০০
মল্লিক, আমজাদ ৪৩৬-৩৭
মল্লিক, পংকজ ৪১৪-১৫
মহীসন (মহসীনউদ্দিন আহমেদ), ক্যাপ্টেন ১৭০, ৪৭৭, ৪৯৬
মহিউদ্দিন, এমসিএ ৩৮৮-৮৯
মহিউদ্দিন, সিপাহী ৫০৪-০৫
মহী, এম এ ২০৮
মহীউদ্দিন, আবুল কালাম ৪৩৬
মান্নান, আবদুল নায়েক ২০৬
মান্নান, আবদুল, লেফটেন্যান্ট ৪৪৮-৪৯, ৪৫০, ৪৬১-৬২, ৪৬৬-৭৪, ৪৭৫, ৪৭৭-৭৯, ৪৮১, ৪৯৮-৫০০
মান্নান, সুবেদার ৪৫৩-৫৪
মান্নান, আবদুল ল্যান্স নায়েক ৪৬৩-৬৪
মানেকেশ, এসএইচ এফ জেনারেল ৩৪, ৩৮, ৫১৮, ৫৫০-৫১, ৫৫৫-৫৬, ৫৫৮
মার্কিন দূতাবাস ৫৫৮
মাট্রিস, লেঃ ভারতীয় নৌ কমান্ডার ৪০৭
মালেক, নৌ কমান্ডার ৫১৮-১৯
মালেক, আবদু সুবেদার ৩৩১-৩২
মালেক, ডঃ (মুক্তিযুদ্ধ সংগঠন) ২৩৬-৩৭
মালেক, ক্যাপ্টেন (বাংলাদেশ বিমান বাহিনী) ৩১৬
মালেক, আবদুল, গভর্নও ৫৫৬-৫৭
'মাস্টারপ্লান' (নিয়াজীর যুদ্ধ পরিকল্পনা) ৫৪১
মাসুদ, পাক ব্রিগেডিয়ার ১০৩
মাহফুজ, এফ-এফ ৪৫৭
মাহবুব, ক্যাপ্টেন ৭৩, ১০৪, ১২৪, ১২৬, ১৪৪
মাহবুব, লেফটেন্যান্ট ৭৩, ৮৩, ৯০, ৯৬
মাহবুব, এফ এফ ২৮৯-৯০
মাহবুবউদ্দিন, ক্যাপ্টেন ২৬৮, ৩৭২, ৩৭৪-৭৫, ৪১২-১৩, ৫৩৩
মাহবুব, (মাহবুবুর রহমান), ক্যাপ্টেন 'জেড' ফোর্স ৪৭৬, ৪৭৭-৭৮, ৪৮০-৮৪, ৪৯২, ৪৯৫, ৪৯৮-৯৯, ৫০১-০২, ৫০৩
মাহমুদ, আবদুল্লাহ (ছাত্র) ৪৬৪-৬৫
মাহমুদ, ওয়ালী ৪৫২-৫৩, ৪৫৬
মাহমুদ, নূরুদ্দীন ২০৮
মাহমুদ, সুলতান, লেঃ কর্নেল, পাক সামরিক অফিসার ২৭
মাহমুদ, সুলতান, স্কোয়াড্রন লীডার ৫২৩, ৫৬৮-৭০
মিজানুর, এফ-এফ ১৭০
মিঞা, আলকাস ২০৮
মিঠু, এফ-এফ ৪৭৪-৭৫
মিনহাজউদ্দিন, নায়েক ৩৫৩-৫৪
মিত্র বাহিনী ৩০, ৪২, ১৪৫, ১৭৯, ১৮৩, ১৮৫, ২১৯, ২৩৩-৩৫, ৪০৯-১০, ৫০৩, ৪৩৩, ৫৩৪-৩৫, ৫৩৮, ৫৫২-৫৫
মিত্র, ভারতীয় মেজর ২৯৩-৯৮
'মিশন' ১২
মীর্জা, লতিফ ৩২১-২২
মুক্তা, এফ-এফ (কোম্পানী কমান্ডার) ৩৩৩-৩৪
মুক্তি ফৌজ ৫৩৯-৪০
মুক্তি বাহিনী ৫৬৬
মুকিত, ক্যাপ্টেন (বাংলাদেশ বিমান বাহিনী) ৫২৩-২৪, ৫৬৮-৭০
মুকুন্দপুর, এ্যামবুশ ২০৫
মুকুল (গেরিলা কমাণ্ডো) ৪৩৬-৩৭
মুখার্জি, ভারতীয় ক্যাপ্টেন ১৭৪
মুখার্জি, বিএসএফ কমান্ডার ৩৮৩-৮৬, ৩৯০-৯১, ৪০০, ৪৪০-৪১
মুজাহিদ ২১৮, ৫৫৯
'মুজিবনগর' ২০২, ২৯৯, ২৬৮, ৩৮২, ৪৫০, ৪৬১-৬২, ৫০০-০১, ৫২৬, ৫২৮
মুজিব বাহিনী ৫৩৯-৪০
'মুজিব ব্যাটারী' (বাংলাদেশের প্রথম গোলন্দাজ বাহিনী) ৩২, ১১৪, ১৬৮, ১৯২, ১৯৩, ২২৬, ২৩৯, ৫০৭, ৫৬৫
মুজিবর (ছাত্র) ৪৪০-৪১
মুন্সী, জহরুল হক, এফ এফ ৪৬২-৬৩
মুর্তুজা ৪১৩-১৪
মুসলিম লীগ ৪০২-০৩, ৪৩৫-৩৬, ৪৪৮-৪৯
মুসলেহউদ্দিন, গেরিলা কমান্ডার ১০৪
মুয়িন, সেকেণ্ড লেঃ ৪১০-১১

মৃণাল (ছাত্র) ৪৪০-৪১
মেঘালয় সেক্টর, ৪৯৬
মেজবাহউদ্দিন, লেফটেন্যান্ট ৩৩১-৩২
মেজবাহউদ্দিন, ল্যান্স নায়েক ৪৬৩-৬৫
মেডিক্যাল টিম ২০৩
মেলাঘর কনফারেন্স ১৩৩
মোগলহাট ট্রেন অপারেশন ৩০৬-০৭
মোজাহিদ, গেরিলা কমান্ডার ৩১৯-২০
মোমেন, ডাঃ ৫২৬
মোরশেদ, গোলাম হেলার, ক্যাপ্টেন ১৭৯, ২০৪, ২০৬, ২০৯, ২১৮, ২২০, ২২৩-২৪, ২২৯-৩২, ২৩৪-৩৫
মোরশেদ, হেদায়েত হোসাইন ৫৫৯
মোল্লা, আবদুস সোবহান (কুক) ৪৬৩-৬৪
মোশাররফ, খালাদে, মেজর ২, ৪, ৭, ১৩, ১৪৫, ১৫৬-৫৭, ১৫৮-৬২, ১৬৫-৬৬, ১৭০, ১৭২, ১৭৪, ১৭৮, ১৮৫, ১৯৪, ১৯২, ৫৬৪-৬৫, ৫৬৬
মোশাররফ, মুক্তিযোদ্ধা ১৭০
মোশাররফ, সুবেদার ২৮৯-৯০
মোশাররফ, গাউড ৪০৮
মোস্তফা, গোলাম, সুবেদার ৩১৯-২০
মোস্তফা, লেফটেন্যান্ট ৩৭৩, ৫৩৩
মোহাববত, নায়েক ৩৭৩
মোহাম্মদ, নূর হাবিলদার ১৯০
মোহাম্মদ, নূর (গেরিলা প্রশিক্ষক) ৪০৩-০৪
মোড়লগঞ্জ, থানা আক্রমণ ৪৩৬-৩৭
মোয়াজ্জেম, সুবেদার ৩৪৯-৫০

য
যুদ্ধবাহিনী ৪০০-৪০১
যুবক, ৫৫-৬০, ৫৬০-৬১
যুব শিবির ৭, ৪৬০-৬১
যোশী, ভারতীয় ব্রিগেডিয়ার ৩১৪-১৫, ৩২০-২১
যৌথ কমান্ড ৩৫, ২১০, ২১৫-১৬, ২৩৩-৩৪, ২৮৭-৮৮, ৪৪১-৪২, ৫০৪-০৫, ৫১৭
যৌথ বাহিনী ৩৪, ৩৫, ৩৯, ৫৩৩, ৫৩৪-৩৬

র
রউফ, ফ্লাইট লেঃ ১৭৪, ২০৮
রঙ্গুনিয়া, হাবিলদার ৩২১, ৩২৬-২৭
রকবী, আবদুর (নেভী) ৫১০, ৫২১
রণকৌশল ৬ , ৭৮, ২৮৬-৮৭, ৩৭৪-৭৫, ৩৯৭-৯৮, ৪৫১-৫২, ৫৫৯
রফিক, হালিদার ২১২
রফিকউদ্দিন, ২৩৯
রফিক, মোহাম্মদ, গেরিলা যোদ্ধা ৯২
রব, এম এ লেঃ কর্নেল ২, ১৭৩, ৫৬৪-৬৫
রব মোঃ আবদুর, ক্যাপ্টেন ২৩৬, ২৩৮, ২৪০-৪৪, ২৬৪, ২৫৯
রব, আবদুর ১৮৯
রব, সুবেদার মেজর ৩৫৯-৫০
রববানী, গোলাম, এম এফ ৩১৯-২০
রবিউল, মুক্তিযোদ্ধা ১৭০
রবিউল (রবিউল্লাহ) লান্স নায়েক ৪৮১, ৪৯৯-৫০০
রবিন, ৪৩২-৩৩
রশিদ, ক্যাপ্টেন ৩৪৯-৫০, ৫৩২-৩৩
রশিদ, লেফটেন্যান্ট ৫৩২-৩৩
রশীদ, বজলূর সামরিক অফিসার ২২৫
রশীদ (এ এম রশীদ চৌধুরী) ক্যাপ্টেন ২৩৯
রসুর, গোলাম, হাবিলদার ২৪৫
রহমতউল্লাহ (নেভী) ৪০৭, ৪০৯-১০, ৪২৮-২৯, ৪৪৬-৪৭, ৫১০-১৪, ৫১৯-২০, ৫২১
রহমান, আতাউর, সিএস পি অফিসার ৪১৪-১৫
রহমান, আতাউর, ল্যান্স নায়েক ৫০০-০১
রহমান, আতিকুর (কুক) ৩১৯-২০
রহমান, আতিয়ার, ডাক্তার ৩০০-০১
রহমান, আনিসুর লেঃ ৪৭৬, ৫০১-০২
রহমান, আবদুর সুবেদার ১৭০
রহমান, আবদুর (প্রাক্তন সৈনিক) ৩৭৩, ৩৮০-৮১
রহমান, আবদুর, নায়েক ৪৬৫-৬৬
রহমান, আবদুর, সিপাই ৪৯৩
রহমান, আবেদুর (নেভী) ৫১০
রহমান জিয়াউল, মেজর ২, ৬৯-৯৯, ১৭৫, ২৩৯, ২৪২-৪৩, ২৮৪, ২৮৭-৮৮, ৪৪৮-৫০, ৪৫১-৫২, ৪৫৮, ৪৬০-৬২, ৪৬৭-৬৮, ৪৭১-৭২, ৪৭৬, ৪৭৯-৮৪, ৪৮৯, ৪৯৩, ৪৯৮-৯৯, ৫০৩-০৬ম ৫০৮-০৯ম ৫২৬ম ৫৬৪-৬৫, ৫৬৬
রহমান, ফজলুর, লেফটেন্যান্ট ১৬৯
রহমান, ফজলর, কোম্পানী কমান্ডার ৩২১

রহমান, মতিউর, ক্যাপ্টেন (৩নং সেক্টর) রহমান, ২০৪, ২০৮-০৯, ২৩৪-৩৫
মতিউর, ক্যাপ্টেন (৬নং সেক্টর) ৩০০-০৩, ৩০৪-০৫, ৩০৮, ৩১০, ৩২১-২৭, ৩৩১-৩২
রহমান, মতিউর, এমপি ৩২৭
রহমান, মতিউর (হামিদ), মেজর (১১নং সেক্টর) ৪৬২-৬৩, ৪৬৫-৬৭
রহমান, মাহফুজ, ক্যাপ্টেন ১৮, ৬২, ৫৩৫
রহমান, মাসুদুর, সেকেন্ড লেঃ ৩১১-১২, ৩১৮
রহমান, মাহবুবুর লেঃ ৪৭৭, ৪৮৯-৯২, ৫০৭
রহমান, মিজানুর, সিপাহী ২৩২-৩৩
রহমান, মিজানুর লেঃ ৪৪৯-৫০, ৪৬২, ৪৬৬-৬৯, ৪৭৪-৭৫
রহমান, মিজানুর, এমসিএ ৫১৪
রহমান, মুজিবুর, সিপাহী ২১২
রহমান, মুজিবুর, স্টুয়ার্ড ৫১৫-১৬
রহমান, মুস্তাফিজুর, সিপাহী ২১০
রহমান, মুস্তাফিজুর, ক্যাপ্টেন ৩৬৮, ৩৭২-৭৫, ৫৩২
রহমান, লুৎপর, সুবেদার, বেঙ্গল রেজিমেন্ট ১২৯, ১৮৫, ১৯১
রহমান, শফিকুর হাবিলদার, ৩৪৯-৫০, ৩৫৭-৫৮
রহমান, শেখ মুজিবর ৩২, ৩৪
রহমান, সাইদুর, সিপাহী ৪৯৯-৫০০
রহমান, সিদ্দিকুর, সিপাহী ২৩৩-৩৪
রহমান, সৈয়দ মুনিবুর, লেঃ ৪৭৭, ৫০৫-০৬, ৫০৮-০৯
রহমান, হাবীব (মুক্তিযুদ্ধ সংগঠক) ২৩৬-৩৭
রহমান, হাবীবুর, এ এস আই ২৯৪-৯৫
রহমান, হাবীবুর (শওকত) ৪৩০-৩২, ৪৩৩-৩৫
রহমান, আবদুর)গেরিলা) ১১২
রহীম, তোয়াবুর (মুক্তিযুদ্ধ সংগঠক) ২৩৬-৩৭
রয়জউদ্দিন (মাঝি) ৪০১-০২, ৪৩০
রাও, ভারতীয় মেজর ২৯৩-৯৪
রাজাকার ৭৯, ৯৫, ৩০৮, ৩৭১, ৪০৫-০৬, ৪৬০-৬১
রাজ্জাক, আবদুর সিপাই ৮৫
রাজ্জাক, আবদুর, পুলিশ ইন্সপেক্টও ১৭০
রাজনৈতিক উপদেষ্টা ২০৩
'রাজপুত' (ভারতীয় ডেস্ট্রয়ার) ৩১
রাজপুত বাহিনী, ৩২, ২১৩, ২১৫, ২২৫, ৪৫০, ৫৩৪-৩৫
রানা, পাক ব্রিগেডিয়ার ৫০৪-০৫
রাশেদ, মেজর ৫০৭
রায়গঞ্জের লড়াই ৩৩০-৩১
রায়চৌধুরী, ভারতীয় মেজর ৪০৭
রায়না, টি এন ভারতীয় লেঃ জেনারেল ২৭, ৩৩১-৩২, ৫৩২
রিযাজ, পাক মেজর ৪৭৫
রুমি,গেরিলা কমান্ডার ৭৯, ১১০
রুস্তমজী, বিএসএফ প্রধান ৩৮৫-৮৬
রেকী পেট্রলিং ৪৭৭-৭৮, ৫১৪-১৫
রেজা, এক্স ফ্লাইট লেঃ ২৯৯
রেডিও পাকিস্তান ঢাকা ১১৩, ৪৫৭-৫৮
রেঞ্জার, পাক পুলিশ ৮৩, ৯৫, ১২৯-৩০
রেনড, মিঃ (আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কর্মকর্তা) ৫৫৬-৫৭
'রোম ফোর্স' ৩৭
রোমেল ৪৮০

ল

লতা, এফ এফ ৪৭২-৭৩
লতিফ, আবদুল হাবিলদার ১৯০
লতিফ, আবদুল সিপাহী ২৩২-৩৩
লতিফ, (মুক্তিযুদ্ধসংগঠক) ২৩৬-৩৭
লতিফ, আবদুল নায়েক সুবেদার ৫০৪-৫০৫
লতিফ, আবদুল হাবিলদার ৫০৪-০৫
লস্কর সুবেদার ৪১২-১৩
'লাইটনিং' ৪০৯, ৪৪৬-৪৭
'লা ফিগারে' ৫২৯
'লাল শেরা' ৪২৮, ৪৪৩-৪৪
'লিমপেট' ১০, ৪০৭-০৯, ৫৬৬
লিয়াকত, ৩৯৮-৯৯
লুৎফর, নায়েক সুবেদার ৩২৭

শ

শওকদ (শওকত আলী) লেফটেন্যান্ট ১৪৩, ১৬৯-৭০

শওকত, মিসেস ২৮৯
শচীন্দ্র, কর্মকার, সেকেন্ড লেঃ ৪১০-১১, ৪৪৬-৪৭
শফি, (শফিকুর রহমান), নায়েক ৪৭৭-৭৯, ৪৮০-৮১, ৪৯৯-৫০০
শফিউদ্দিন, সিপাহী ৪৯৯-৫০০
শফিকুল্লাহ, ক্যাপ্টেন ৩৬৮, ৩৭৪-৭৫, ৪১৯-২০
শফিকউল্লা, ওয়ারেন্ট অফিসার ৪৫২-৫৩, ৪৫৫-৫৬
শরণার্থী সাহায্য ও পুনর্বাসন কর্মসূচি ২৭
শহীদ (মেজর শহীদুল ইসলাম), ক্যাপ্টেন ৭৩, ৭৭, ১৫৬, ১৭৪-৭৬
শহীদ, নায়েক সুবেদার ১৫৮-৫৯, ১৭০, ১৮৭
'শান্তি কমিটি' ৮৬, ৯০, ৯৫, ১০৭, ১১৮, ১২১, ১২৫, ১৭৫, ৪২৪-২৫
শামস, লেঃ কর্নেল , পাক সামরিক অফিসার ৩৮২, ৪২০
শালদা নদীর যুদ্ধ ১৩৭
শাহ, নজর হোসেন, পাক মেজর জেনারেল ২৭, ৫৩১
শাহ, সৈয়দ জাভেদ, পাক ক্যাপ্টেন ১২৭
শাহজাহান (মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার) ১০৫
শাহজাহান, (ওমর), ক্যাপ্টেন ৩০৪, ৪০৭, ৪১০-১১, ৪২২, ৪২৯-৩০, ৪৩৬, ৪৪০, ৪৪১-৪২
শাহজাহান, মোহাম্মদ, ডাক্তার ৩৯১-৯২, ৪১৬-১৭, ৪১৯-২০, ৪৪০-৪২
শাহজাহান (স্কুলশিক্ষক) ৩৯৩-৯৪, ৩৯৫-৯৬, ৪১১, ৪১২-১৩, ৪১৪-১৫, ৪৪০-৪১, ৪৪৪-৪৪৫
শাহজাহান (এয়ার ফোর্স) ৪৩৪
শাহাব, ক্যাপ্টেন (বাংলাদেশ বিমান বাহিনী) ৫২৩-২৪, ৫৬৮-৭০
শাহাবউদ্দিন, সিপাহী ২১০
শাহাবুদ্দীন, মোহাম্মদ ২৩৯
শাহরিয়ার (মেজর সুলতান শাহরিয়ার রশীদ খান), ক্যাপ্টেন ৩০০-০১, ৩০২-০৫, ৩১০-১৪, ৩১৬-১৮
শুকুর, এফ-এফ ৩৪
শোডি, কর্নের, ভরতীয় সামরিক অফিসার ৪৪৯-৫০
শ্যামনগর অপারেশন ৩৭৯-৯৯
শ্রমিক ১১০

ষ
ষোড়শ পাকিস্তানী ২৭

স
সকিম উদ্দিন, ল্যান্স নায়েক ৩১২-১৩, ৩১৮-১৯
সদরুদ্দিন, প্রিন্স ৭৯, ৮০
সদরুদ্দিন, স্কোয়াড্রন লীডার ২৯৯, ৩০০-০৫, ৩১৫-১৬
সনজু, এফ-এফ ৪৬৭, ৪৭৫
সপ্তম নৌবহর ৩৩, ৩৪-৩৬, ৫৫৬-৫৮
সফি, ছাত্র কমান্ডার ১৮৯
সফিউল্লাহ, কে এম মেজর ২, ৪, ২০০-১৭, ২১৮-২০, ২২৪-২৫, ২২৯-৩০, ২৩১-৩২
সফিউল্লাহ, সুবেদার ২২৭
সরকার, অভীক ৫৩৮
সরকার, নীলমনি, এফ-এফ ২৪২-৪৩
সরকার, বি এন ভারতীয় মেজর জেনারেল ৫৩৯-৪০
সরকার, হারেস উদ্দিন ৩৩১-৩৩
সরফুদ্দিন, ক্যাপ্টেন (বাংলাদেশ বিমান বাহিনী) ৫৩২, ৫৬৮-৭০
সরল, ছাত্র ৪৪০-৪১
সলিমুল্লাহ, ফ্লাইট সার্জেন্ট ৩৯২-৪০১
সভাপতি, ভারতীয় মেজর ২৯৪-৯৫
স্বপন,গেরিলা যোদ্ধা ১০২
স্বরূপ, আনন্দ, ভারতীয় ব্রিগেডিয়ার ৩২, ৩৫, ১৬৮-৬৯, ১৭০, ১৮৪
সাইফুউদ্দিন, হাবিলদার ৫০৪-০৫
সাইফুল্লাহ, পাকিস্তানী ব্রিগেড কমান্ডার ৩১৪
সাইফুল্লাহ, লেফটেন্যান্ট ৩৫০-৫১, ৩৫৭-৫৯
সাইদ, এফ-এফ ৪৫০, ৪৭৩-৪৭৫
সাইদ, লেঃ ২০৮, ২০৮
সাখাওয়াত ৪৩০
সাত্তার, ক্যাপ্টেন (বাংলাদেশ বিমান বাহিনী) ৫২৩-২৪, ৫৬৮-৬৯
সাতান্ন পার্বত্য ডিভিশন ২১৩
সাদিক, মুসা ৩৩০, ৩৫৫-৫৬
সাদী, মাহবুবুর রব, এফ-এফ কমান্ডার ২৩৬, ২৩৮-৩৯, ২৪৩-৪৪
সাদেক, (সৈয়দ আবু সাদেক) লেফটেন্যান্ট ২০৮

সাদেক, গেরিলা যোদ্ধা, ৭৯
সাধারণ পরিষদ ৩৪, ৫৩৭
সামাদ, লেফটেন্যাণ্ট ৩০২, ৩২১, ৩২৯-৩১, ৫৩৫
সারওয়ার, পাক মেজর ৪৯৬, ৫০৩
সালাম, আবদুস, (গেরিলা যোদ্ধা) ১১২
সালাম, আবদুস, সিপাহী ২০৪
সালাম, আবদুস, নয়েক ২৩২-৩৩
সালাম, সুবেদার ২৯৪-৯৫
সালাম, আবদুস মেজর ৩২৭-৩০
সালাম, ছাত্র, ৪৮৭-৮৮
সালাহউদ্দিন, ক্যাপ্টেন, ৩৬৮-৬৯, ৩৭২, ৩৭৪-৭৫
সালিক, এন এ ভারতীয় ব্রিগেডিয়ার ৪০৩-০৪, ৪৭৪-৭৫, ৪০৯-১০
সাঁড়াশী আক্রমণ ১০৫, ১৩৮, ১৪২, ১৪৫, ১৬৬, ৩৬৪-৬৫
স্পার্টাকাস ৪৮৩
সিইনসি স্পেশাল ৫৬৬
সিং ওয়াতর, ভারতীয় মেজর ৭১
সিং, গুরবক্স, ভারতীয় মেজর জেনারেল, ২৮
সিং, দলবীর, ভারতীয় মেজর জেনারেল ২৭, ৪১৭-১৯, ৪২০-২১, ৫৫০
সিং বিশ্রাম, ভারতীয় ক্যাপ্টেন ৩৮৩-৮৪
সিং ভগৎ ভারতীয় জেনারেল ৪৬১-৬২
সিং, মহিন্দর, ভারতীয় মেজর জেনারেল ২৭
সিং, মেঙ্গ, লেঃ কর্নেল (বিএসএফ কমান্ডার) ৩৭৩-৭৪, ৩৭৫-৭৬
সিং রাজ, ভারতীয় কর্নেল ২৯৮
সিংহ, রানা সংগ্রাম, ৪৮৯-৮০
সিং, সগত, ভারতীয় লেঃ জেনারেল ২৮, ৩২, ১৬৭, ১৯৬, ২১৬, ৫৩১-৩৪, ৫৩৯-৪০, ৫৫০-৫১
সিংহ, সান্ত ভারতীয় ব্রিগেডিয়ার ৪৪৮-৪৯, ৪৬০-৬১
সিংহ, সাম, ভারতীয় ব্রিগেডিয়ার ৪৬২
সিং, সাবেগ, ভারতীয় ব্রিগেডিয়ার ১০, ১৬, ৬৯, ৭০, ২১৬
সিং, হরদেব, ভারতীয় লেঃ কর্নেল ১৬৮
সিকদার, দোস্ত মোহাম্মদ, মেজর ২২৪-২৫
সিগন্যাল কোম্পানী ৫০৫-০৬
সিদ্দিকী, লেফটেন্যান্ট ৫৩২
সিদ্দিকী, কাদের ৩৫, ৪৪৯-৫১, ৪৬০, ৪৬২-৬৩
'সি-২পি' ক্যাম্প ১০
সিনিয়র টাইগার ৪৭৮-৭৯, ৪৮০-৮১, ৪৯২
সিরাজ, নায়েক সুবেদার ১৩৮, ১৬৬-৬৭, ১৭০
সিরাজ, হাবিলদার ১৬৬
সিরাজ, নায়েক ৪৮৬, ৪৯৯-৫০০
সিরাজুদ্দৌলাহ ৪০৭
সিলেট যুদ্ধ পরিকল্পনা ৪৪-৯৫, ৫০২-০৩
'সী হক' (ভারতীয় বিমান) ৩২
সুজা, এফ-এফ ৪৭৪-৭৫
সুঠিবাড়ি রেইড ৩২৪-২৫, ৩৩২-৩৪
সুধীর, ভারতীয় আর্টিলারী ক্যাপ্টেন ৩১৩
সুন্দরবন মুক্তিযোদ্ধা কনফারেন্স ৪৩৬
সুলতান, ফ্লাইট লেঃ ১৬, ২৯৮
সুলায়মান, এফ-এফ ৪৫৩-৫৪, ৪৫৬
সেক্টর ৪
সেক্টর কমান্ডার কনফারেন্স ২, ২০২-০৪, ২০৭, ৩৬৯-৭০, ৩৯০-৯১, ৪৬১-৬২, ৪৬৭-৬৮
সেক্টর ট্রুপস ৫, ২৯, ৩২, ২১৪, ২৩২, ২৩৫-৩৭, ২৪০, ৩৭৫, ৫৬৬
সেক্টর বিভাজন ৪-৫
সেনগুপ্ত, সুরঞ্জিত ২৩৭
সেনগুপ্ত, ভারতীয় লেঃ কর্নেল ২৯৯-৩০০
সেনবর্মা, ভারতীয় লেফটেন্যান্ট ২৯৮-৩০০
সেলিম, ক্যাপ্টেন, পাঞ্জাব রেজিমেন্ট ১১০
সেলিম, ছাত্র ২১৮
সেলিম, লেঃ ২০৮, ২৩৪-৩৫
সেলিম বাহিনী ৩৬৩-৬৪
সোবহান, আবদুস, সিপাহী ৩২০
সোবহান, হাবিলদার ৩৯২, ৩৯৮-৯৯, ৪৪৫-৪৭
সোভিয়েত ভেটো ৩৩, ৩৮
সোহরাব ৪৩৭-৩৮
স্টোনহাউস, জন, বৃটিশ এমপি ৩৬৭-৬৯
স্যাবর জেট ৫৩৬

হ
হক, আবদুল, সিপাহী ২০৪
হক, আবদুল, হাবিলদার ৪৪৫

হক, আবদুল লান্স নায়েক, ৫০০-০১
হক, আশরাফুল ২৪২-৪৩
হক, ইনামুল, লেফটেন্যান্স ৩৭৩-৭৪
হক, এ কে এম ফজলুল, সিপাহী ৪৬৩-৬৪
হক, এমদাদুল, লেফটেন্যান্ট ৪৭৭
হক, জহুরুল, ডাক্তার ১৭১
হক, জিয়াউল, সুবেদার মেজর ৪৬৩-৬৫
হক, ফজলুল, সুবেদার ২৪৩-৪৪
হক, ফজলুল, ফ্লাইট সার্জেন্ট ৪১০, ৪১৫-১৬, ৪২২
হক, নাজমুল, মেজর, ২, ৪, ২৯৯, ৩০৪, ৩৪৯-৫০
হক, নাজমুল (ছাত্র, কোম্পানী কমান্ডার) ৪৬৪-৬৫
হক, নূরুল, হাবিলদার, ৫০৪-০৫
হক, মজিবুল, ক্যাপ্টেন ১৯৯
হক, মোজাম্মেল, (কুক) ৩১৯-২০
হক, মোহাম্মদ, নায়েক সুবেদার ৫০০-০১
হক, মোহাম্মদ শামসুল, কর্নেল ৫২৬-২৭
হক, শরিফুল (ডালিম), ক্যাপ্টেন ২৩৬-৩৭, ২৩৮, ৩২১-২২
হক, শামসুল, সুবেদার, মেজর ১৩৫-৩৬, ১৬২, ১৮৬-৮৮, ১৯০, ১৯২
হক,শামসুল নায়েক সুবেদার ২৪২-৪৩
হক, শামসুল, স্কোয়াড্রন লিডার ১৭৩
হক, সিরাজুল, এফ-এফ ৩২১
হরমুজ' ১২, ১২
হাই, সুবেদার ৪৭৭-৭৯, ৪৮০-৮১, ৪৯৯-৫০০
হাওলাদার, নূর মোহাম্মদ ৪৩৬
হাকিম, ৪৩০
হাকিম, আবদুল সুবেদার ৪৬৩, ৪৮৩-৮৫
হাতীবান্ধা অপারেশন ৩২৬
হাতেম, নায়েক সুবেদার ৪২৩-২৪, ৪৩৪
হাদী, পাক মেজর ১৮৫, ৫৩৫
হানিফ ৪৮৭-৮৮
হাফিজ, (হাফিজউদ্দিন আহমদ) ক্যাপ্টেন ৩৭৪-৭৬, ৪৭১-৭৩, ৪৭৬, ৪৭৭-৮১, ৪৯৩,৪৯৮-৫০৫
হাফিজ, মোঃ আবদুল, সুবেদর ৩১৫-১৬
হাফিজ, হাবিলদার ৪৬৩-৬৪
হাবিব ব্যাংক ১১৩
হাবীব, ৪৩৪
হামিদ, ক্যাপ্টেন ৭০-৭৭
হামিদ, ভারতীয় ক্যাপ্টেন ২৮২
হমিদুল্লাহ, স্কোয়াড্রন লিডার ৫, ৪৪৮-৪৯, ৪৫০-৫১, ৪৫৪-৫৫, ৪৬১-৬২, ৪৬৫-৬৬
হার্ড কোর অব সার্জেন্টস' ৩৯৭
হালদার, মনোরঞ্জন ৪২৮
হালিম, হাবিলদার ১৪৭-১৪৮
হালিম, আবদুল, ক্যাপ্টেন ৩৬৮, ৭৭৫-৭৮, ৫০৫-০৬
হাশেম, আবুল, সুবেদার ৩১৬-১৭, ৩১৮
হাশেম, লেফটেন্যান্ট ৪৪৯-৫০
হাশেম, ছাত্র ৪৬৪-৬৫
হাশেম, আবুল নায়েক সুবেদার ৫০০-০৩
হাসান, আনিসুল, লেফটেন্যান্ট ২০৮
হাসান, সেলিম মোহাম্মদ কামরুল, লেফটেন্যান্ট ২০৮
হাসান, হবিলদার ৩৫৭-৫৮
হাসান, এম ওয়াকার, লেফটেন্যান্ট ৪৭৬, ৫০১-০২, ৫০৩
হায়াত পাকিস্তানী মেজর ৩৩২-৩৩
হায়দার, এটিএম মেজর ১৩৪-৩৫, ১৭২
হায়দার, আলতাফ ৪২৩-২৪, ৪৩০
হিটলার ৪১
হিন্দুস্থান নেভী ৫১৮-১৯
হিরা, আরডি, ভারতীয় মেজর জেনারেল ২৮, ১৭৯-৮০, ১৮২, ৪৬৯-৭০
হিলি সীমান্তের যুদ্ধ, ৩৬৩-৬৪
হুদা, নূরুল, ক্যাপ্টেন ৩৮২-৮৩, ৩৮৫-৮৭, ৩৯০-৯৪, ৩৯৫-৪০০, ১০০-১৩, ৪১৪-১৫, ৪১৬-১৭, ৪১৮-২০, ৪২২, ৪২৭-৩০, ৪৪৪-৪৭, ৫৩২, ৫৩৩
হুদা, নূরুল (ছাত্র-কমান্ডার) ৪২৩-২৪, ৪২৯-৩৫
হুদা, শামসুল, ক্যাপ্টেন ২১, ২২, ৬৯-৭৭
হুমায়ন, সিপাহী ২৩২-৩৩
হেনা, আবু, এমসিএ ৩০৮
হেমায়েত, হাবিলদার ৩৯০-৯১
হেলাল, মোস্তফা ৪৩৬

হেলাল (এ এম হেলালুদ্দিন), ক্যাপ্টেন ২৯৮
হেলাল, সৈয়দ সদরুজ্জামান, (ছাত্র-কোম্পানী কমান্ডার) ৪৬৬-৬৭,-৪৭১-৭৪
হেলাল পার্টি ৪৬৬-৬৭, ৪৭১-৭৪
হোচি মিন সড়ক ৪০০-০১
হোসেন, ডাঃ আক্তার, ক্যাপ্টেন ১৭০
হোসেন, আকতার, হবিলদার ২৩২-৩৩
হোসেন, আকবর, ক্যাপ্টেন ৪৭৭, ৪৯৬-৯৮
হোসেন, ডাঃ আখলাক, এমপিএ ৪৬৫-৬৬
হোসেন, আফজাল, এম-এফ ৩১৯-২০
হোসেন, আনোয়ার, সিপাহী ৩২০
হোসেন, আনোয়ার, এফ-এফ ৪৭৫
হোসেন, আনোয়ার, ক্যাপ্টেন ৪৭৭, ৪৮২-৮৩, ৪৯৬-৯৯
হোসেন, আবতার, সিপাই ২২৩
হোসেন, আবুল, লেঃ (মেডিক্যাল অফিসার) ২০৮, ২৩১
হোসেন, আবুল, নায়েক ১৮৭, ১৯০
হোসেন, আবুল, ক্যাপ্টেন ২০৮, ২২৫
হোসেন, আবুল, ইপিআর সুবেদার ৩১০-১১
হোসেন, আমির , সিপাহী ২১০
হোসেন, আশেখ ২০৮
হোসেন, আহমেদ, ইপিআর সুবেদার ৩১০-১১, ৩১৮
হোসেন জাকির, হাবিলদার ১৮৭
হোসেন, দিদার আতাউর, মেজর ১৯৫-৯৯
হোসেন, দেলোয়ার, ক্যাপ্টেন ৩০০-০১, ৩০২-১০
হোসেন, দেলওয়ার, এম-এফ ৩১৯-২০
হোসেন , ফজলে, লেফটেন্যান্ট ৪৭৭
হোসেন, মইনুল (মেডিক্যাল অফিসার) ২০৮,২১২
হোসেন, মকবুল, পাকিস্তানী সিপাহী ৩২০-২১
হোসেন, মকবুল হাওলাদার ৪৯৩, ৫০০-০১
হোসেন, মনির, নায়েক সুনেবদার ১৭০
হোসেন, মুজাফফর, চীফ সেক্রেটারী, পূর্ব পাকিস্তান সরকার ৫৫৬
হোসেন, মারুফ ৪৩৭-৩৮
হোসেন, মোদাসসের, লেফটেন্যান্ট ৪৭৭, ৪৮৯, ৫০৩
হোসেন, মোশাররফ, এমসিএ ২১, ৩৫
হোসেন, মুহম্মদ, নায়েক সুবেদার ১৩৮, ১৬৭, ১৭০
হোসেন, মোঃ মোশাররফ (নেভী) ৫১০
হোসেন, মোহাম্মদ ২৩৯
হোসেন, মোয়াজ্জেম, এফ-এফ ৪৬৫-৬৬
হোসেন, সাদেক, ক্যাপ্টেন ৪৭৭, ৫০৬-০৭
হোসেন, সিকদার আফজাল, নায়েক সুবেদার ১৩৬
হোসেন, সোহরাব, সিপাহী - ২০৪

INDEX

Aftabuddin (Nabval commando) 511-12
Agartala Youth Camp 511-12
Ahmed, Bashir (Naval commando) 513-14
Ahmed, Rafirduddin (Sailor) 513-14
Ahmed, Farooque, Lt 63-68
Ahmed Jalal, Subeder 62
Ahmed, Mohsinuddin, Major 490-91
Ahmed, Manzoor, 2 Lt, 491
Ahmed, Sayed, A/Sub (E. Bengal) 64
Ahmed, Tajuddin 53-63
Ahmed, Z.U (Sailor) 513-14
Ahsanullah, Md. (Navy) 511-12
Ainuding Major 148
Al-Abbas 521-22
Alam, Dr. 365
Alam, M.B (Navy) 511-12, 512-13
Alam, Md. Rafiqul, lt, 297
Alam, Narul, Sepoy 65
Alam, Shah, FF 57
Ali, Capt, Indian Army 68
Ali, Amjad, Sepoy 53
Ali, Arish, Havilder 260, 661
Ali, Babar, 513
Ali, Ekram, Naik 335-36
Alki, Hossain, Havilder 55
Ali, Jonnab, 276
Ali, Mohor, L/NK, 366-67
Ali, Raham, Subeder 44, 47, 63
Ali, Rahmat. N/Sub 63
Ali, Sabed, Subeder 62, 63
Ali, Shamser, (Naval Commando) 513
Ali, Shawakat, Major 62, 63
Ali Soab, Havilder 295-96
Ali, Sukur, Naik 296

Ali, Zulfiquar, NCO? Nk 62, 63
Amin, Mansurul, Lt 64, 65, 68, 69
Amin, P. (Sailor) 513-14
Amin, Ruhul 48
Amin Rahul (Sailor) 513-14
Fmiruzzaman, Hav. 335-36
Anam, Capt.246, 253-54
Ansar, 246
Anwar, (Anwar Hossain) Capt. 344, 490-492
Arefin, Shamsul, Lt. 512-13
Ashrafuddin, Barrister 63
Ashrfuzzaman, (FF Student) 259-60, 260-261
Agtgram Operagtion 253-54
Aurora, Jagjit Shingh, Lt. General, GOC, Eestern Command 46,344-45
Aziruddin, Hav. 259-60
Aziz, EPR, Subeder 64
Aziz, Capt. 246
Aziz, Abdul, Subeder 259-60

B

Babul, FF 252-53
Badiuzzaman, Mr. 346-65
Badiuzzaman, Lt, 513-14
Bajwa, Capt. Indian army 63,64
Bangabandhu Fleet' 513-14
Bangladesh Naval Commando Training 510-511
Bari, Mofizul, EPR Subeder 64-69
Battle of sutarkandi 248
BBC 511-12
Bengal Regiments 246, 278-79
Bhomra Youth Camp 510-11
Bhuiyan EPR Havilder 64
Bhuiyan, Dr. Safiqur Rahman 67
Bhuiyan, A. R. (Sailor) 513-14
Bisla, Lt, Col Indian Army 53,64,69
Biswas, Meser, Pak agent 335-36
Black shirt 63
Burmah Jade 521-22

C

Chowdhury, A. Matin, F.F 252-53, 257
Chowdhury, A. W. (Navy) 511-12
Chowdhury, A. Gyasuddin ,Brig. 344-48

D

Darkunde, Indian Capt 68
Das, Sumir, Indian Ltd. 510
Datta, Lt, Col, Indian army 66
Datta,Chitta Ranjan, Maj 246, 248, 250-51,252-54,255-56,257,277-78
Daturmura Theatre 148
Dayan, Abdul, N/Sub 259-60
Deveson, Lt. Indian Army 250

E

E Bengal (1) 254-56, 258, 490-91
E bengal (3) 344, 489-90, 490-91
E bengal (4) 489-90
Echo Sector 250, 256-57
Ejaz, Capt. 63
EPR 246
Ershad, N/Sub, Police 64

F

Faiz, Mohd. Mujahid Havilder 252-53
Fakhruddin, ER Sub Maj 63, 64, 66, 67
Farid, FF 49
Fazal, M, (Sailor) 513-14
Formosa 521-22

G

Gazi, Dewan Farid, MCA 247-48
Ghani, EPR Subeder 55, 63-64
Ghias, Lt. 257
Ghose, P.k. BSF Capt. 62, 63
Gono Bahini 246
GR (Gurkha Regimkent) 246
Gupta, Indian Officer 510
Guerilla Forces 345-56
Gurilla Operation Co-ordination Metting 45
Guerilla operations (Sector-1) 42-58
Gurung, Indian, Major 66-68

H

Haldia Camp 513
Hamid, Abdul, Lt 63
Hhque, A (Sailor) 513-14
Haque, Enamul, Capt 62, 63, 67
Haque, M (Sailor) 513-14
Haque, M.S (Sailor) 513-14
Hasnabad Camp 513
Hasnabis, Lt. Gi, Indian army 66
Heera, Maj-Gen, Indian army 66
Hemayet Bahini 246
Haq. Mozammel Ff, 55
Houque, Shamsul, Sqn-Ldr. 62
Hoque, Shamsul, Subeder 149-151
Hoque, Syed Emdadul, Havilder 276
Hossain, Akbar, Maj. 490-91
Hossain, Fazal, L/Naik 260
Huda, Shamsul, Capt 44
Huq, Hahrul (Naval commando) 513
Hussain, abul, Havider 44
Hussain, Muhamud, (Naval Cammando) 48
B Hussain, Musharaf, MCA 53, 68
Hussain, M. A. (Sailor) 513-14

I

Ilias, Mohd. Naik 261
Imam, Havilder, E Bengal 64
Imam, Zafar, Capt 64, 66
Indian corps Hd. Quarter 54
Inter Sector co-ordination Metting 50
Ishaque, Mr. 62
Islam, K. N (Sailor) 513-14
Islam, Manirul, Mujahid 335-336
Islam, Mubasharul, N/Sub 335-339
Islam, M. 513-514
Islam, Nurul, Maj 63
Islam, Rafiqul, Maj 62-63, 94-66, 68
Islam, Rafiqul, Subeder, Police 63-64
Islam, Rafiqul (Naval Commando) 513-14
Islam, Shafiqul, Hav 340-41
Islam, Syed Nazrul 53,64
Ismail, Mohd. N/Sub 335

J

Jabbar, Abdul, Naik 259-60
Jahangir, Mohiuddin, Capt 346-47, 348
Jaker, (sailor) 513-14
Jalaluddin, M. (Sailor) 513-14
Jalil, M. A. Maj. 510-11, 513-14
Jamil, Shafaat, Maj 489-92
Joy Bangla 513-14

K

`K' Froce 57
Kabir, M. Humayun, Hav 335-36
Kabizzaman (Naval Commando) 512-13
Kaderia Bahini 246
Kaisar, (Kaisar Haq), Lt 346-47
Kamruzzaman (Tuku)513
Kanighat Operation 258
Kawsaruddin, Hav 335-36
Kaykum, Abdul, Hav 260
Kennecdy, Edward 490-91
Khaiber Scouts, 254-55
Khai9ruddin, M, CA 63
Khairuzzaman, EPR Subeder 63
Khaleque, Capt. 62, 63
Khan, A. R 513-14
Khan, Ayub 521-22
Khan, Nurunnabi, Lt. 490-91
Khan, Tikra, Lt. Gen 521-22
Khan, Yahya, 53, 58
Kahddakar, A. K. Group Capt 45
Khurshid. Maj 62
`Khurshid. PNS 513-14
Kumar, Indian Capt 250
Kumud, Lt. Indian Army 66
Kutubuddin, EPR Hav 252-53, 360

L

Latif, Sepoy 53
Latitila Operation 250

M

Mahfuz (Mahfuzur Raham), Capt. 48, 52, 62, 69

Mahtab Javed 521-22
Majumder, Abdul Quader 66
Mannan, Sepoy 51
Mannan, Dr. (MP) 54
Mannan, Naik 252-53
Manzur, M. A.Lt. Col 344-45
Maratha Regiment (19) 344-45
Marry, Mrs. 148-51
Matin, Kh. A. Hav 335-36
Mazumder M. A. (Sailor) 513-14
MCAs 62
Mian, A. R (Navy) 512-13
Miah, Haris, Naik 45, 48
Mia, Loni, EPR Subeder, JCO 63-65, 66-67
Mia, Toha, Sepoy 44
Mia, Tunu, Cvilian Guide 296
Militia Troops (scouts) 257
Mohammad, Din, EPR N/Sub 64
Mohammad, Saleh (Sailor) 513-14
Mohiudullah, (Sailor) 513-14
Moinuddin, FF, 56
Mongla Group 511-12
Mosharraf, Khaled, Maj. 47, 50, 148-51
Motivators 345-46
Mujahids 246
Mujib Bahini 513
Mujib Nagar 344-45
Muktadir, FF 252-53
Mullah, M. D>H, (Sailor)513-14
Munir, DPR N/Sub, 64
Muree, Mr. 62
Murshed, Gulam Helal, Capt. 64
Mutalib, M. A. (Sailor) 513-14

N
Nadiruzzaman, Naik 47
Makimuddin, Peace Committee member 335
Nanda, India Admiral 510
Newaz, Ali, Subeder, 451
Niazi, A. A. K. Lt. Gen, 69
Niomito Bahini 246
Nizam, FF 46, 49
Nuruzzaman, EPR N/Sub 64

O
Oil (Oil Ahmed), Capt. 62, 63
Operation Avoya Bridge, 364-65
Operation `Kabzakara' 346-47
Operational Reconnissance, 47
Osman, (Abu Osman Chowdhury), Lt. Col 510-11
Osmani, M. A. G, Col, (C-in-C, Bangladesh Forces), 249, 259, 344-45, 489-91, 510-13

P
Padma 513-14
Palash 513-14
Planned military action 46
Plassey Camp 510, 511-13
Police 246
Prakash, Indian Major 68

Q
Qamruzzaman, A. H. 344-45
Qayum (Abdul Qayum Khan), Lt. 346-48
Quddus, Abdul, (N/Ris 64
Quddus, M. A. (Sailor) 513-14
Quayum, Mr. 513

R
Rab, Colonel 45
Rab, M. A. Capt 246-58, 540-41, 277
Radio Bangladesh 548-49
Rafiqullah, (Sailor) 513-14
Rahman, Azizur, Hav 335-36
Rahman, Fazlur, Sepoy 44
Rahman, Habibur 296
Rahman, Mahbubur, Capt 489-92
Rahman, Majibar, Hav335-36, 340-41
Rahman, Matiur, Capt 62, 63, 489-90
Rahman, Matiur, (N/Sub) 259
Rhaman, M. A (Navy) 511-12
Rahman, M. M. (Sailor) 511-12
Rhaman, Shariqur, L/Nk 335
Rahman, Sheik Mujibur 63

Rhaman, Ziaur, Maj. 62, 255-57, 489-91
Rahmatullah, Mohammad (Navy) 510-14
Rao, B. S, Indian Major 296
Rashid, Bazlur, Lt. 346-47
Rashid, M. Abdur, Major 344-46
Rauf, Abdur, Flt. Lt 62
Rauf, M. A (Sailor) 513-14
Roy Chowdhury, Indian Capt. 510
Regular Forces, 345-46

S
Sadeque, Capt 63
Salam, A. 513
Salek, Indian Bgigadier 512-13
Samad, Mr. Defence Secy, 63
Sarkar, Indian General 63
Sarker, M. A. (Sailor) 513-14
Sarma, Lt. Cdr. IN. Staff 510
Sattar, Abdus, Pak agent 335-36
Sahbazpur Railway station Battle 250-251
Shafiullah, K. M. Maj. 47, 513-14
Shafiullah, N/Sub 67
Safiqullah, Capt 513
Shaheed, EPR Havilder 49-66
Shamim, FF 252-53
Shams, Capt 62-65
Shandhu, Indian Brigadier 64
Sharma, BSF Naik 296
Sharma, Col, (Indian Army) 47, 52, 63
Shawkat, Lt.58,63,68
Shawkat, Flng Officer 62
Sheikh, Taheruddin, Subeder 149
Sikdar, Parmal, F. F 55
Singh, Horgobinda, Lt. Col, Indian Army 68
Singh, Narendar, Indian General 63
Shing, Sagat, Indian General 64
Singh, Shabeg, Indian brigadier 47, 50, 63
Sirajuddin (Sailor) 513-14
Sorup, Anand, Indian Brigadier 63
Sultan, (sqn Ldr. Sultan Mahmud), Flt. Lt. 62-63

T
Taher, M. A. (Sailor) 513-14
Taher (Sailor) 529
Takipur Youth Camp, 510-11
Tawfiq, Mr. 513
Thapa, K. B. BSF Hav. 296

U
uddin, M. M. 513-14
UN Observers 58

V
Vaskar, Indian Maj. 68
Virak, Indian Lt. Col. 64

W
Wodkey, Indian Brigadier 251-52, 257, 278

Y
`Ya Ali' (battle cry) 348
Yunus, Mr. 513

Z
`Z' Force, 255-56, 489-90
Zahir, S. Ali, Lt. 253-54, 256-58
Zaman, Q. N. Maj. 444-48
Ziauddin, Maj. 490-91
Zonal Council-57